নব্যভারত

ঊনত্রিংশ খণ্ড।

১৩১৮

অশ্রু।

"The divine in Jesus wept: and let not the holiest and best be ashamed to weep, if they can, with the poor and the mean."

"Tears save where teachings fail". *The Oriental Christ.*

"I childishly determined to dress always in black, fancying myself in mourning for my country."

"How many mothers had I caused to weep." *Joseph Mazzini.*

"What else am I who wept yesterday, who slept last night like a corpse and this morning stood & ran?" *Emerson.*

অশ্রু, সংসারের ত্রিতাপ-নাশের জন্য মানব-নয়নে দেবলীলা। অশ্রু মুক্তির সোপান, শোকের সান্ত্বনা, শান্তির অবলম্বন, বিনয়ের বিভূতি, ভালবাসার অহেতুক উচ্ছ্বাস, সহানুভূতির অনিন্দ্য অভিব্যক্তি, পুণ্যের প্রস্রবণ, অনুতাপের দুর্জ্জয় দুর্গ, ভক্তির প্রকট মূর্ত্তি। অশ্রু-সাধন ভিন্ন মানবের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি সুদূর-পরাহত। অশ্রুই, এই মর্ত্ত্যধামে, মানব-দেহে দেবমূর্ত্তি।

মা দেখিয়াছ, অথচ তাঁহার নয়নে বাৎসল্যের অশ্রু দেখ নাই; সাধক দেখিয়াছ অথচ তাঁহার কপোলে ভক্তির অশ্রু দেখ [illegible] প্রেমিক দেখিয়াছ, অথচ তাঁহার [illegible]ভূতির অশ্রু দেখ নাই;—ইহা [illegible] যদি কুত্রাপি দেখিয়া থাক, জানিয়া রাখ, তবে প্রকৃত মা, সাধক বা প্রেমিক দেখ নাই। মায়ের অতুল স্নেহের নিত্যসহচর অশ্রু, সাধকের ত্রিতাপনাশক মন্ত্র অশ্রু, প্রেমিকের নিত্যসহায়—ঐ অশ্রু। অশ্রুতে তাঁহারা উদ্ভূত, অশ্রুতে জীবিত, অশ্রুতেই পরম মোক্ষপ্রাপ্ত। অশ্রু-সাধনই এজগতের পরম সাধন।

মণি ও মুক্তায় কালিমা থাকিতে পারে, কুসুমে কীট থাকিতে পারে, সৌন্দর্য্যে মলিনতা থাকিতে পারে, কিন্তু অশ্রুতে কিছুই থাকিতে পারে না,—অশ্রু নিত্য পবিত্র, নিত্য উজ্জ্বল,—নিত্য শোভান্বিত। পৌর্ণমাসীর বিমলধারা, ঝরণার অস্ফুট মধুরিমা, পাখীর কণ্ঠের মধুর কাকলী, সাগরে প্রতিবিম্বিত অতল-নীলিমা, এ সকল পরাজিত

অশ্রুর কমনীয়তা এবং মধুরতার নিকট। অশ্রুর তুলনা কোথাও মিলে না,—অশ্রু সত্যই স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারা। অসুরের অসুরত্ব, দস্যুর দস্যুতা, ক্রোধীর ক্রোধ, বিলাসীর বিলাস, অশ্রু-সংগ্রামে সব পরাজিত। অশ্রু নিত্য পূজ্য, নিত্য আদৃত, নিত্য সম্ভোগ্য। যে ব্যক্তি অশ্রু-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এ সংসারকে সে জয় করিয়াছে, সে মোক্ষ-ধামের নৈকট্যে পৌঁছিয়াছে।

আমরা, ভারতবাসী, কি লইয়া বাঁচিয়া থাকি, জান কি? আমরা আর সব মায়া কাটাইতে পারি এবং কাটাইয়াছি, কিন্তু এক মহামায়ার মহাবন্ধনে নিত্যজড়িত রহিয়াছি। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আমাদের নিত্য সম্বল অশ্রু। আমরা সব ভুলিতে পারি এবং সব ভুলিয়াছি, কিন্তু জরা মরণ-চিত্র-দৃষ্ট শাক্যসিংহের মৌনীস্রাশ্রু, পুত্রবিরহকাতর শচী ও কৌশল্যার নীরবাশ্রু, স্বামীপ্রাণা সীতা ও সাবিত্রীর কৈবল্যাশ্রু এবং সংসারাসক্তি-বিহ্বল নিমাইচাঁদের সন্ন্যাসাশ্রু আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না। ভুলি নাই কি?—আমরা বেদ-বেদান্ত, গীতা-ভাগবত, পুরাণ-তন্ত্র—ভুলি নাই কি? ভারত-শ্মশানের বক্ষে দাঁড়াইয়া, বুকে হাত দিয়া, ভাই, তুমি বলত, আমরা ভুলি নাই কি? জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন, কাব্য-মহাকাব্য—আমরা সব ভুলিয়াছি। ব্যাস বাল্মীকি, শঙ্কর কপিল, কালিদাস ভবভূতি, আমরা ভুলি নাই কি? আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যত্ব,—শৌর্য্য, বীর্য্য, পুরুষত্ব, আমরা সব ভুলিয়াছি। রাণা প্রতাপ, রণজিৎ, দুর্গাদাস, লক্ষ্মীবাঈ, ঝিন্দন, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, আমরা ভুলি নাই কি? সব ভুলিবা নিশ্চিন্ত-মনে সম্বল করিয়াছি কি?—শাক্যের মৌনাস্রাশ্রু, চৈতন্যের প্রেমাশ্রু এবং শচী-কৌশল্যা-সীতা-সাবিত্রীর কৈবল্যাশ্রু। এখন দেখি, নিমাই-শাক্য, শচী-কৌশল্যা-সীতা-সাবিত্রী ভারতময়—ঘরে ঘরে। ইহাই ত মানব-জীবনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। এই শেষ সম্বল যদি যায়, আমাদের সব যাইবে। শান্তিপুরের নিকুঞ্জ নিকেতনে, ধনী দরিদ্র সকলের সম-অধিকার। এই অধিকার হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার কাহারও শক্তি নাই।

আমরা গভীর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত—আমরা মাতৃ-হন্তা, পিতৃহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা, স্ত্রী-পুত্র-হন্তা,—আমরা নিজ-হন্তা। আমরা যে কি হন্তা নই, জানি না। আবাল্য কেবল পাপই করিয়া আসিতেছি। পরনিন্দা আমাদের কণ্ঠের ভূষণ, পরশ্রীকাতরতা আমাদের নিত্য ধ্যানের বিষয়, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিতে নিত্য আমরা নিপীড়িত, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-জাল-জুয়াচুরির অসমীচীন অত্যাচারে সদা ম্রিয়-মাণ। আমরা খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিয়া তাহাদের কবলে গ্রাসিত হইতেছি—থাকিয়া থাকিয়া থাকিয়া, ডাকিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায়, কত অত্যা-চার ও অবিচার, কুজ্ঞান, কুশাস্ত্র, ছলনা, কুমন্ত্রণা, কত আধি-ব্যাধি আনি। তাহাতে গ্রাসিত হইয়া মরিতেছি! আমাদিগকে কে ধর্ম্মহীন করিয়াছে? ব্যভিচারী হইতে কে ইঙ্গিত করিয়াছে? পরপদ-লেহন কে শিখাই-য়াছে? আচারভ্রষ্টতাই বা কে শিখাইয়াছে? মহিলা-নির্য্যাতন এই নারী-পূজাময় ভারত-ভূমিতে কে আনিয়াছে?—আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু—স্বখাত সলিলে নিজেরাই ডুবিয়া মরিতেছি। ত্রিতাপনাশন অশ্রু আমা-দের নয়নে বহে না কেন? আমাদের অসংখ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?

আমাদের পাপ—আমরা সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা মাতৃভূমির উন্নতির জন্য তেমন কিছুই করিতেছি না। হাসি, খেলি, বেড়াই,—আমাদের সম্মুখে কত শত ব্যক্তি অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, দেখিয়াও দেখি না! বিলাসের দাস হইয়া মহাসুখে নিদ্রা যাই, কিন্তু চক্ষু মেলিয়া দেখি না, বিনা ঔষধে কত সহস্র ব্যক্তি রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে! ঘরে ঘরে হাহাকার এবং আর্ত্তনাদ, দেশময় বিষাদের গাঢ় ছায়া! কে কাহার জন্য ভাবে? কে কাহাকে উদ্ধার করে? ধর্ম্ম, শিক্ষা এবং চরিত্র-হীনতার অরাজকতায় সকলে অবসন্ন এবং অস্থির! কই, কে কাহার জন্য চিন্তা করে? সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া কত সহস্র সহস্র খ্রীষ্টভক্ত নরনারী এদেশের উদ্ধারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু আমরা চির উদাসীন,—দেখিয়া এবং বুঝিয়াও আপন আপন স্বার্থ সাধনেই বদ্ধপরিকর,—মহাসুখের উল্লাসে থাকিয়া থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছি। পরদুঃখ-কাতরতা কোথায়? সহানুভূতি কোথায়? প্রেম-বিহ্বলতা কোথায়? হায়—আমরা যে মহা পাপে নিমগ্ন! এই ভাবিলেও নয়নে অশ্রু বহে না কেন? হায়, আমরা যে মহাপাপী!!

কেহ কেহ বলেন, আমরা অত্যাচারিত। অত্যাচারিত ত বটেই। মূর্খলোকের রজ্জুতে সর্পভ্রমে বাঙ্গালা ভাবার সর্ব্বনাশ হইতেছে, কত পরিবার নির্ব্বংশ, নিরন্ন ও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে! হায়, কত নিরপরাধী ব্যক্তি অত্যাচারে ম্রিয়মাণ, ভাবিলে শরীর কম্পিত হয়। যে রাজভক্তি ভারতের জীবন, তাহা বায়ু-তাড়িত কুজ্ঝটিকার ন্যায়, অত্যাচার-তাড়নায় উড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচার, এ কেমন কথা? সাত্ত্বিক ভারতের ইহা ধর্ম্ম নয়। "এক গণ্ডে আঘাত করিলে অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দেও" খ্রীষ্টের এই অমূল্য উপদেশ, "বসুধৈবকুটুম্বকম্" ভারতের কি মহা সাধনা নয়? অত্যাচারিত খ্রীষ্ট বলিলেন,—"Father, forgive them; for they know not what they do."* একথা কি আমরা বাসীর নয়? আমরা কেন ইউরোপের আদর্শে চলিব? অত্যাচারিত হইয়া থাকি, সহ্য করিব; আবার কোন্ মুখে আমরা অন্যের প্রতি অত্যাচার করি? পরাধীন আমরা কেন? আমরা রিপুর অধীন বার মাস, সেজন্য নহে কি? আমরা যদি আত্মিক (spiritual freedom) স্বাধীনতা পাইতাম, তবে দৈহিক স্বাধীনতা সুদূর-পরাহত হইত না। কবি বলেন, "রিপুর অধীন যে বা বারমাস, স্বদেশ-উদ্ধার তার কার্য্য নয়।" আমাদের শত্রু আমাদের লোক; তাহারা ঐ দলে গেল কেন? আমরা যদি প্রতি অত্যাচার না করিতাম, বুঝি বা উহারা ঐ দলে যাইত না? আমরা ভ্রাতৃহন্তা হইয়া দাঁড়াইলাম, তাই কত ভাই বিপক্ষে গেল। হায়, সে সকল স্মরণ করিয়াও আমাদের অশ্রু পতন হয় কই? অত্যাচার স্মরণ করিয়াই বা অশ্রু-পতন হয় কৈ? কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তবুও আমরা আনন্দে নৃত্য করি। পরন্তু, আমরা যদি অত্যাচারী না হইতাম—চক্ষের জলে তাহাদের পা ধোয়াইতাম, তবে এমন কাঁদিয়া ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইত না। ডুবিয়াছি ত আমরা মহাপাপে ডুবিয়াছি! হায়, কি মহাপাপে আমাদের অশ্রু-সাধন হইল না গো?

এইজন্যই বুঝিবা, নিত্য রোগশোক, দুঃখ-দারিদ্র্যে আমরা ম্রিয়মাণ;—আধ্যাত্মিক,

* St. Luke, XXIII, 34.

আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। রোগের উপর রোগ, শোকের উপর শোক, জ্বালার উপর জ্বালা—ত্রিবিধ জ্বালায় সদা অস্থির। আমরা বুঝি না কি? কিন্তু বুঝিয়াও তাহা দূর করিতে সচেষ্ট হই না। এই রূপে আমাদের দিন যাইতেছে। "নামে রুচি এবং জীবে দয়া"—মহাসাধন। কিন্তু এই সাধনে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলাম না! নাম স্মরণেও অশ্রুপাত হইল না, জীবের দুঃখ স্মরণেও অশ্রুপাত হইল না! ধর্ম্ম-সাধনের মূল "নামে রুচি"; সংসার-সাধনের মূল "জীবে দয়া"। রুচি ভিন্ন ভক্তি নাই; দয়া ভিন্ন প্রেম নাই। প্রেম-ভক্তি-হীনতায় আমরা ঘোরতর পাপে নিমজ্জিত। প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? অনুতাপাগ্নি কই জ্বলিল? কই অশ্রুপাতে তাহার নির্ব্বাণ হইল?

খ্রীষ্ট রক্ত দিলেন, জীবের উদ্ধারের জন্য; চৈতন্য আসক্তি বিসর্জ্জন দিলেন, "নামে রুচি" প্রচারের জন্য। এমন অনাবিল প্রেম এবং অহেতুকী ভক্তি আজ কোথায়? হা জেরুজালেম্, হা পুরুষোত্তম, তোমরা রহিলে, কিন্তু প্রেম ভক্তি আজ কোথায়? খ্রীষ্ট-জগৎ এবং হিন্দু-জগৎ কেন আজ প্রেম-ভক্তি-হীন হইল? জেতা এবং জিতে অসদ্ভাব হইল কেন? পরস্পরের মনোমালিন্য হইল কেন? যে উদ্ধার করিতে আসিল, সে হন্তা হইল কেন? খ্রীষ্টের প্রেমাঞ্জন মাখিয়া যদি তাঁহারা আসিলেন, তবে কেন আমাদের উদ্ধার করিতে পারিলেন না? কেন ভক্তির পথ এবং উন্নতির পথে লইয়া গেলেন না? এই ভারতে খ্রীষ্ট এবং শ্রীচৈতন্যের মহামিলন হইল না কেন? আমরাই বা কেন অহেতুকী ভক্তির পথে তাঁহাদিগকে সাধনের সহায় মনে করিয়া, মহাকৈবল্যে উপনীত হইলাম না? ভারতের মাটীর দোষ—শিব গাড়তে বানর হইয়া গেল! খ্রীষ্টের ক্রুসে দেহত্যাগ এবং চৈতন্যের সন্ন্যাসের উপদেশ—এদেশে ব্যর্থ হইল। মহাপাপের মহা খেলা। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? এত দুঃখেও আমাদের হৃদয়-মন দ্রব হইয়া অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইল না কেন?

স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, সমাধি প্রভৃতি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ভক্তির চরম অভিব্যক্তি। প্রকৃত বিশ্বাস ভক্তি আছে, অথচ ঐ সকল প্রকাশিত হয় না, একথা সত্য নয়। যেখানে বিশ্বাস ভক্তি, সেই স্থানেই ক্রমানুসারে ঐ সকল সাধন-লব্ধ চরম ফল উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যেও অশ্রুর ন্যায় নির্ম্মল ও পূত জিনিস আর কিছুই নয়। সাধক জীবনে উহা স্বর্গের শোভা। মর্ত্ত্যধামের অপূর্ব্ব অমিয়ধারা। অশ্রু, মানবকে মোক্ষ এবং মুক্তির পথে উন্নীত করিবার পরম সহায়। মনে হয়, বিধাতা প্রেমে দ্রব হইয়া যেন ভক্ত-নয়নে প্রবাহিত হন। অশ্রু, উপেক্ষার জিনিস নয়। সকল উপদেশের সার উপদেশ অশ্রু। ইহা অমোঘ শক্তি। এই শক্তিই মণিকার নয়নে প্রবাহিত হইয়া আগষ্টাইনের মুক্তির কারণ হইয়াছিল। ম্যাট্‌সিনি সব ভুলিতে পারিতেন, কিন্তু মায়ের চক্ষের জল ভুলিতে পারিতেন না। তাহাতেই তিনি অজেয় হইয়াছিলেন। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"More powerful upon me than any advice or any danger were the exceeding grief and anxiety of my poor mother. Had it been possible for

me to have yielded, I should have yielded to that."

আমাদের মনে হয়, ঘরে ঘরে এই উপদেশ—অশ্রু জগতের একমাত্র দুর্দ্ধর্ষ এবং অজেয় শক্তি। স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য—অশ্রুতে বাঁধা। উহা ভুলিয়া যাও, সকল সম্বন্ধ আকাশ-কুসুমের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। উহাই স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের একমাত্র বন্ধন।

এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমাদের আর কোন সম্বল নাই। সব ভুলিয়াছি—কিন্তু অশ্রুর কথা ভুলি নাই—কিন্তু আমাদের তবু অশ্রু-সাধন হইতেছে না। হইলে, না জানি আমরা কেমন হইয়া যাইতাম। অশ্রু-সাধনে কেহ বাধা দিবার নাই, কিন্তু তবু আমরা অশ্রু সাধনা করিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি না;—কেবল উল্লাসে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছি!—সকল সাধনার সার সাধন অশ্রু-সাধন করিতেছি না;—তবু আমরা আদর-অনাদর, আপ্যায়ন-নির্য্যাতন-নিরপেক্ষ হইয়া ক্রন্দনকে সম্বল করিতে পারিতেছি না। দুর্গতির একশেষ হইয়াছে!! বিধাতা এই ঘোর দুর্দ্দিনে দ্রব হইয়া আমাদের নয়নে নয়নে প্রবাহিত হউন।

প্রতাপচন্দ্র বলিতেন, "Tears save where teachings fail"—সে নয়ন জলের এত ক্ষমতা, সে অশ্রু কোথায়? প্রেম-গঙ্গা-রূপী অশ্রুপাতের জন্য "প্রনব" অতি কষ্টে দেহ দিলেন;—আর ঐ নির্ম্মম "হাজতের অত্যাচার," সেও ত বলিয়া গেল—"দুঃখ শোকে, অত্যাচার নিপীড়নে তোদের অহর্নিশি দিবারাত্রি কেবল জল পড়ুক। ঘরে ঘরে দেশে দেশে অনুতাপ ও অনুশোচনার অশ্রু অবিরত না ঝরিলে এদেশের কালিমা দূর হইবে না, দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচিবে না।" এদেশের উদ্ধারের আর উপায় নাই। নয়নের জল মুক্তি আনিবে, দেশ জাগাইবে, ভালবাসা শিখাইবে—সহানুভূতি মিলাইবে,—মানুষকে মানুষ করিবে। সেকালে ভাগীরথীতে অবগাহন করিলে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত, এযুগে, "তুমি বল একটী একটী, আমার ত সকলেই আছে"—এই অমূল্য কথা ঘোষণা করিয়া "প্রনব" ইঙ্গিতে বলিয়া গেলেন—এখন "আমিত্বকে" নয়নের জলরূপী প্রেম-গঙ্গায় ভাসাইয়া, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং নির্ম্মল হইয়া সকল মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠুক বুদ্ধের মৌনীত্ব, চৈতন্যের ভক্তি এবং কৌশল্যা এবং শচীর অপরাজিত স্নেহ। দুঃখের আর বাকী আছে কি? সে দিন উমেশচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার এবং ইন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন!! এস ভাই, দিবারাত্রি এই মরুভূমিতে বসিয়া কেবল অশ্রুর সাধনা করি। এই এক সাধনে সিদ্ধিলাভ হইলে সকল অভাব পূর্ণ হইবে। তিনি সাধকের নয়নে অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইলে সকল দুঃখদারিদ্র্য ঘুচিবে। অশ্রুর এত শক্তি, আগে বুঝিতাম না; এখন দেখিতেছি—পাপময় সংসার সাগরের উহাই একমাত্র ভেলা। আমরা, জরা, মরণ, এবং অত্যাচারময় সংসারে কাঁদিতে জন্মিয়াছি, কাঁদিয়াই যাই। সকল উৎসব থামুক, এস ভাই, আমরা শুধু কাঁদি!

নব্যভারতের এখনকার কাজ কেবল চক্ষের জল ফেলা! তোমরা "হেন করিবে তেন করিবে" বলিয়া আস্ফালন করিতেছ,—তোমাদের কত আদর-আপ্যায়ন, কত জয়-জয়-কার, আর নব্যভারতের সাধন-সম্বল কেবল অশ্রু! সহায়হীন, সম্বলহীন, বিশ্বাসহীন, ভক্তিহীন, প্রেমহীন, চরিত্রহীন

নব্যভারতের আর কিছুই নাই। কিছুই নাই, কিছুই নাই; আছে কেবল অনাবিল অশ্রু। তবে আয়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, গতিহীনের গতি—অশ্রু, তুই কাছে আয়,—তুই দিবা-রাত্রি নয়নে, নয়ন হইতে বদনে, বদন হইতে সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বাঙ্গ হইতে সর্ব্বদেশে—প্রবাহিত হইয়া, রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায়, নব্যভারতকে পাপমুক্ত করিয়া, এক-জ্ঞান, একধ্যান, এবং এক-রস-সুধাপানের রাজ্যে লইয়া যা;—সরবটে না চিন্ময়ীকে দেখিয়া নব্যভারত একতার শান্তিময় কৈবল্য-ধামে নিত্য-নির্ব্বিকার নিরঞ্জনে সম্মোহিত হউক, আত্মহারা হউক, অহংজ্ঞান-বর্জ্জিত হউক। আজ নববর্ষে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা।

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষের উপনিষদ্ গ্রন্থগুলিতে ব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক-প্রমুখ এগারখানি উপনিষদ্ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি প্রাচীন। সুপ্রখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই এগারখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই উপনিষদ্ গুলিতে ব্রহ্মসম্বন্ধে সকল কথাই সুচারুরূপে ও সম্পূর্ণ ভাবে কথিত হইয়াছে। এই উপনিষদ্ গুলিই অদ্বৈত-বাদের মূল ভিত্তি।

কিন্তু আর একটী কথাও এস্থলে বলা আবশ্যক। এই উপনিষদ্গুলির অপর নাম 'বেদান্ত'। ঋগ্বেদাদি সুপ্রাচীন বেদ গ্রন্থের ইহারা শেষ অংশ বা পরিশিষ্ট। এই নিমিত্তই ইহাদিগের সাধারণ নাম—বেদান্ত। অথবা আর এক কারণেও ইহাদিগকে বেদান্ত বলা যায়। 'অন্ত' শব্দের অর্থ—মীমাংসাও হইতে পারে। ঋগ্বেদাদি বেদ-গ্রন্থের যাহা একমাত্র মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত, তাহাই সংক্ষেপে এই উপনিষদ্গুলিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যও ইহাদিগকে বেদান্ত নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ঋগ্বেদাদি বেদ গ্রন্থে সূর্য্য, বরুনাদি বিবিধ 'দেবতা' অবলম্বন করিয়া এবং দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বিবিধ যজ্ঞ-অবলম্বন করিয়া যে ব্রহ্মতত্ত্ব গূঢ়ভাবে উপাস্য বলিয়া স্তুত হইয়াছেন, উপনিষদে সেই ব্রহ্মই সংক্ষেপে এবং পৃথক্ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছেন।

ঋগ্বেদে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—দুই-ই আছে। যাহারা সংসারাসক্ত ও অজ্ঞানান্ধ, ঈদৃশ লোককে ব্রহ্ম-পথে ক্রমশঃ উন্নীত করিবার উদ্দেশে সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মার্জ্জিত-চিত্ত ও বহ্মধারণায় সমর্থ, তাঁহাদিগের জন্য জ্ঞানমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋগ্বেদে পাশাপাশি একত্রে এই উভয়বিধ প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার উপনিষদের ব্যাখ্যাগুলিতে দেখাইয়াছেন যে, এক অদ্বৈতবাদই সকল উপনিষদ্ গ্রন্থেরই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি অদ্বৈতবাদের মূল-প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, জগতে যত কিছু 'কার্য্য' পদার্থ আছে, সকলেরই মধ্যে এক 'কারণ-সত্তা'

অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রত্যেক কার্য্যই, সেই কারণ সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। কার্য্য-বর্গ, সেই কারণ-সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশাত্মক অবস্থা মাত্র। সুতরাং কোন কার্য্যেরই —কারণ সত্তা ব্যতীত পৃথক্ ও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কার্য্যবর্গের মধ্যে সেই কারণ-সত্তার বোধের নামই —অদ্বৈত-বাদ। *

ভাষ্যকার কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এই অদ্বৈত বাদ আমরা ঋগ্বেদেও দেখিতে পাই। সূর্য্য, বায়ু, বরুণাদি 'দেবতা' কার্য্যবর্গ মাত্র। ইঁহারা সকলেই এক পরম দেবতার বিকাশ মাত্র। এক পরমদেবতাই ইঁহাদিগের সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। সেই পরম দেবতার সত্তা ব্যতীত, ইঁহাদের কাহারই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা নাই। ঋগ্বেদে এই বিশাল তত্ত্বও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা কার্য্যবর্গের মধ্যে এই কারণ সত্তাকে হঠাৎ খুঁজিয়া পান না এবং কার্য্যবর্গকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পদার্থ বলিয়াই গ্রহণ করেন, ও কার্য্যবর্গ লইয়াই একান্ত ব্যস্ত, তাঁহাদিগের চিত্তে কারণ সত্তার জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে কর্ম্মকাণ্ডেরও ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদে প্রদর্শিত এই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড একত্রে পাশাপাশি বর্ণিত আছে। বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ' গুলিতে এই কর্ম্মকাণ্ডকে পৃথক্ করিয়া লইয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। আবার, বেদের "আরণ্যক ও উপনিষদ গ্রন্থ" গুলিতে সেই জ্ঞানকাণ্ডকে পৃথক করিয়া লইয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কিন্তু বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রন্থের সংখ্যা অনেক। বেদান্তর্গত আরণ্যক ও উপনিষদ্ গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। ব্রাহ্মণগ্রন্থ গুলিতে বেদ হইতে গৃহীত কর্ম্মকাণ্ডের যে সকল বিবিধ তথ্য আছে, সেগুলি বহু কথায় পরিপূর্ণ; তাহাদের মধ্যে আপাততঃ দৃষ্টিতে অনেকস্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ কথাও প্রতীয়মান হয়। এই সকল বিরোধ পরিহারের জন্য ও প্রতিপাদ্য সকল তত্ত্বের একটা প্রণালীবদ্ধ সমন্বয় প্রদর্শনের জন্য—জৈমিনির "কর্ম্ম-মীমাংসা দর্শনের" সৃষ্টি হইয়াছে। আবার, ঋগ্বেদ হইতে জ্ঞানকাণ্ডকে পৃথক্ করিয়া লইয়া যে সকল বিবিধ তথ্য উপনিষদ্‌গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারাও বিবিধ কথায় পূর্ণ; তাহাদের মধ্যেও পরস্পর অনেক বিরোধী কথা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল বিরোধ পরিহারের জন্য ও প্রতিপাদ্য সকল তত্ত্বের ও সকল গ্রন্থের একটা প্রণালী-বদ্ধ সমন্বয় প্রদর্শনের জন্য—বাদরায়ণের "বেদান্তদর্শনের" সৃষ্টি। এইরূপে, "মীমাংসা দর্শন" ও "বেদান্তদর্শন" সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রিয় পাঠক, এই সকল আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে, উপনিষদ্‌গ্রন্থ গুলিতে নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে যে সকল ব্রহ্মতত্ত্ব কথিত হইয়াছে, বেদান্তদর্শনে সেই সকল কথাই একটা প্রণালীবদ্ধ নিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর যে সকল অংশ বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সেই সকলের বিরোধ পরিহার করিয়া সমন্বয় দেখান হইয়াছে। এই-জন্যই, বেদান্তদর্শনের আগাগোড়া, প্রচলিত এগারখানি উপনিষদের নানাস্থান হইতে শ্লোক লইয়া, সেই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা, তাৎপর্য্য-নির্ণয় ও বিরোধ-পরিহার করা হই-

* [illegible] দৃষ্টা পরমাত্মতত্ত্বাৎ 'নানাত্বেন' নিরূ- [illegible] মৃদাদি বিকারবৎ বস্তন্তরে বস্তুতোন [illegible] াদি বিকারদেব।" —নহি পরমার্থাব- [illegible] ন্তরাস্তিহং প্রতিপদ্যামহে—ইত্যাদি

য়াছে। সর্ব্বপ্রধানরূপে, বেদান্তে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সকল উপনিষদের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড অদ্বৈত-বাদ আগাগোড়া বিরাজিত রহিয়াছে। পাঠক, তাহা হইলেই দেখিতেছেন যে, বেদান্তদর্শন জানা না থাকিলে, কেবলমাত্র উপনিষদ্ পাঠ করিলেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে না। উপনিষদ্ বুঝিতে হইলেই, বেদান্তদর্শন না পড়িলে কিছুতেই চলিবে না।

বোধ করি পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, আমরা আজ কয়েক বৎসর হইতে "উপনিষদের উপদেশ" নাম দিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রচলিত প্রাচীন সমুদয় উপনিষদগ্রন্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছি। সকল গ্রন্থেই শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সকল ব্যাখ্যায়, শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধেও এদেশে ও বিদেশে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, আমরা সে সকলেরও অযৌক্তিকতা দেখাইয়া, তাঁহার অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। উপনিষদের উপদেশের তৃতীয় খণ্ডে, আমরা অদ্বৈতবাদের সকল কথারই মূল যে ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও দেখাইয়াছি।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, বেদান্তদর্শনের শঙ্কর যে সুবিখ্যাত ও আশ্চর্য্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সেই ভাষ্য বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা না করিলে, উপনিষদ্গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমরা এই অসম্পূর্ণতা ও অভাব পরিমোচনের জন্য, সম্প্রতি বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইংরাজীভাষায় এবং বাঙ্গালাভাষায় বেদান্তদর্শনের শঙ্কর-ভাষ্য অনুবাদিত হইয়াছে, একথা পাঠক অবশ্যই জানেন। কিন্তু তথাপি বঙ্গভাষায় ভাষ্যব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের প্রচারিত উপনিষদ্গুলির শঙ্কর ভাষ্যব্যাখ্যায় পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আমাদের ব্যাখ্যাপ্রণালী একটু স্বতন্ত্র, একটু নূতন। আমরা কেবলমাত্র ভাষ্যের অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। কেবলমাত্র অনুবাদ করিলেই যথেষ্ট হয় না। ব্রহ্মতত্ত্ব বড় কঠিন জিনিষ। শঙ্কর-ভাষ্যও বড় দুরূহ। বিশেষতঃ, শঙ্করের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করাও সহজ ব্যাপার নহে। এইজন্যই বিস্তৃতভাবে ভাষ্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। কেবলমাত্র অনুবাদ করিয়া গেলে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্যই আমরা এই বেদান্তভাষ্যের কেবলমাত্র অনুবাদকেই যথেষ্ট মনে করি না। যাহাতে ভাষ্যের সকল কথাই সুস্পষ্টরূপে সকলে বুঝিতে পারেন এবং অদ্বৈতবাদের সকল অংশ ও সকল কথাই সহজে ও পরিষ্কারভাবে সকলের বোধগম্য হইতে পারে, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া, শঙ্করভাষ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু শঙ্করভাষ্যের স্থানে স্থানে কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ বিচার পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে ভারতে যাগযজ্ঞের বড় প্রচলন নাই। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে যে সকল বিচার আছে, বর্ত্তমান কালে সে অংশগুলির তত প্রয়োজনীয়তা নাই। আমরা এই ভাষ্যব্যাখ্যায় ঐ সকল অংশ পরিত্যাগ করিব। কিন্তু ঐ সকল অংশে যে সকল প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া, একটী 'অবতরণিকা'র মধ্যে তাহার বিবরণ দিব। তাহা হইলেই পাঠক, সে অংশগুলিরও সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম জানিতে পারিবেন।

বিধাতার কৃপা থাকিলে আগামী বার হইতে আমরা বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্যা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব। এ বিষয়ে আমরা পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও দয়া ভিক্ষা করিয়া অদ্য বিদায় লইতেছি। ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

অতীতে-বর্ত্তমানে।

পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া যায়, এই চির পরিবর্ত্তন-শীল জগতে চিরদিন কিছুই থাকে না, অনন্ত কাল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, একটী একটী করিয়া কত বর্ষ, কত যুগ—কত জিনিষ ভাসিয়া গিয়াছে, কত বর্ত্তমান অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবন-বীথি আক্রমণ করিতে করিতে যখনই আমরা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, বর্ত্তমানের তুলনায় যখন অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দেখ—অতীতের সেই সকল সুখময় ছবি যখন মানস নেত্রে অভিনব ভাবে প্রতিভাত হইতে থাকে, আর দেখিতে দেখিতে যখন বিভোর হইয়া যাই, বর্ত্তমান—জগৎ সংসার ভুলিয়া যাই, তখনই মনে হয়, সে দিন—সে সকল, কতই সুখের ছিল, আর আর সে যেন নাই—কি যেন হারাইয়াছি। এই সংসার পূর্ব্বেও ছিল, এখনও রহিয়াছে, কিন্তু যেন মরুভূমি সদৃশ। অতীতে বর্ত্তমানে, প্রাচীনে নবীনে তুলনায় হৃদয় বিষাদে ভরিয়া যায়, নৈরাশ্যে প্রাণ আকুল করিয়া তুলে। বর্ত্তমানের তুলনায় অতীতের অভাব অনুভব করিয়া মরমে মরমে দগ্ধ হইতে হয়, নয়নে শোকাশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। হায়! কি ছিল আর কি হইয়াছে!

এই সকল বিষয় আমরা কখন ভাবিয়া [illegible] নাই বা দেখিবার অব-[illegible] নাই। শৈশবে, যৌবনে, [illegible] সুখ-সিন্ধুর খর স্রোতে গা [illegible]তই মুগ্ধ থাকিয়া নিজের অনিষ্ট, নিজের অমঙ্গল বুঝিতে পারি নাই। যখন বার্দ্ধক্যের উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া, যৌবনের উদ্দাম, সজীবতা শ্লথ হইয়া আসে, অবস্থার বিপর্য্যয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, বয়োধর্ম্ম প্রযুক্ত প্রজ্ঞালোকে মানস ক্ষেত্র প্রদীপ্ত হইতে থাকে, তখনই আমরা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি, অমনি বুঝিতে পারি যে, আমাদের কি ছিল, আর এখন কি যেন নাই।

নিদাঘের নিশীথে, নিভৃতে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, ভাবিতে ভাবিতে কত কথাই মানস পটে উদিত হইতে লাগিল,—হৃদয়ের পরতে পরতে আলোক-চিত্রের ন্যায় অতীতের সেই সুখ সম্বলিত, মধুর পেলব চিত্রাবলী একটী একটী করিয়া উদয় হইতে লাগিল। মনে পড়ে, একদিন এই ভারতভূমি, মেদিনী মণ্ডলে মান দণ্ডের ন্যায় সমুন্নত ছিল; কি আধ্যাত্মিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশ সমূহ যখন লোক-লোচনের অন্তরালে ছিল, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে, সমুদ্র-মেখলা ধরিত্রীর মধ্যে ভারতবর্ষ একমাত্র সকল সুখের আকর বলিয়া পরিগণিত ছিল; আর্য্য হিন্দুগণের নিকট কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র, পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পূজিত হইত। প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যেও এই সুবিশাল ভারতভূমি চির বিভূষিতা, উত্তরে তুষার ধবল অভ্রংলিহ হিমগিরি, গিরিগাত্র-নিঃসৃত নয়ন-বিমোহন নির্ঝর-নিচয়। পাদদেশে কুসুম-

রাশি-পরিশোভিত, পাদপপুঞ্জ-পরিবেষ্টিত শান্তিময় তপোবন, কোথাও রজত-কণিকা-প্রবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী মৃদু কলনাদে প্রবাহিত। তাপসগণের সুধা-সম্পৃক্ত সুমধুর বেদগানে, বিহঙ্গকুলের কল কূজনে বনস্থলী মুখরিত। লোকালয়ে—অদূরে হরিদ্বর্ণা শস্য-শ্যামলা ক্ষেত্র, ভূগর্ভস্থিত অনন্ত রত্নরাজি প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, চির গৌরবান্বিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ, এমন কি বিদেশীয় পর্য্যটক ও ইতিবেত্তাগণও আপন আপন গ্রন্থাদিতে এতদ্‌ সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। * হায়! এই কামদুঘা ভারতে একদিন কতই ছিল, আর আজ কাল-চক্রের কুটিল আবর্ত্তনে, অথবা আমাদের কপাল বা কর্ম্মদোষে সে দিন নাই, সে বাহ্যিক, সে আভ্যন্তরিক, সে সার্ব্বভৌমিক সৌন্দর্য্য আর নাই।

সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলে, বেশী দিন গত হয় নাই—অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই হিন্দুসমাজ, জাতি, মানব-প্রকৃতি কি ছিল, আর আজ কি হইয়াছে। যে ধর্ম্মভাব জনসঙ্ঘের প্রত্যেক অস্থি মজ্জায় প্রবাহিত হইত, সে ধর্ম্মপ্রবণতা মানব অন্তর হইতে এখন প্রায়ই অন্তর্হিত হইয়াছে। একদিন এই হিন্দু স্থানের প্রত্যেক নগরে, গ্রামে, পল্লিতে সাদরে, সানুরাগে ধর্ম্মের আলোচনা, শাস্ত্রের অনুশীলন কতই হইয়াছে, কিন্তু হায়! এখন আর সে দিন নাই, 'ধর্ম্মের সহিত শাস্ত্রাদির প্রাধান্য তিরোহিত হইয়াছে, ধর্ম্মোপদেশ বণিক বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে'।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা বেদ-নিরত, শাস্ত্র-নিরত ছিল, ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যকলাপে ব্যাপৃত ছিল, ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণ কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল; দেব দ্বিজে ভক্তি, দীন দরিদ্রে দয়া, দাক্ষিণ্য ছিল; ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, শোকার্ত্ত প্রভৃতিকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগের প্রতি সেবা-নিরত ছিল। এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে মানব মন ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, স্বার্থপর কুটিল হইয়া পড়িয়াছে, বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়াছে। মানব মাত্রই শিশ্নোদরপরায়ণ—রমণীর হস্তক্রীড়নক। কামিনী কুলনরের অধিনেত্রী, সুতরাং ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কর্ত্তব্যপরায়ণতা স্বার্থপরায়ণতায় পরিণত হইয়াছে, দেবলীলা—পিশাচের তাণ্ডব লীলায় পরিণত হইয়াছে। হায়! সেই একদিন, আর এই একদিন—দুই-এ কত প্রভেদ।

অনন্তর রমণীবৃন্দের বিষয়; তাহার ত কথাই নাই। পূর্ব্বে রমণীগণ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বিরাজ করিতেন, স্নেহময়ী, কল্যাণী—লক্ষ্মী স্বরূপিনী ছিলেন। যে কামিনীকুল একদিন হিন্দু সংসারের স্তম্ভ স্বরূপা ছিলেন, আদর্শগৃহিণী, বধূ, কন্যা বলিয়া জগতে খ্যাতা হইতেন, এখন তাঁহারা গৃহের শোভা, বা চিত্র মাত্র, প্রেমময়ী—সঙ্গিনী; বিলাসিনী, চিত্ত-বিনোদিনী। পূর্ব্বে রমণীগণ গৃহাঙ্গনের বাহিরে পদার্পণ করিতে কম্পিতা হইত, পরপুরুষের সম্মুখে পড়িলে লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইত, এখন সেই জাতিই স্বামীসহ বহুজন সমক্ষে, হস্তে হস্ত দিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে বা প্রকাশ্য শকটে করিয়া বায়ু সেবন করিতে কুণ্ঠিতা নহে; যাহাদের হাসি এক সময় অধর প্রান্তে উত্থিত হইয়া নয়ন প্রান্তে মিলাইয়া যাইত,

* Thornton's History of India. P. P. 1-2
Miss Corner's— Do
Murray's— Do

এখন তাহা কক্ষে কক্ষে তরঙ্গায়িত হইয়া বায়ুসনে রাজপথে বাহিত হইতে থাকে। অধুনা লজ্জা একটা পুরাতন কুসংস্কার বলিয়া আখ্যাত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা একদিন সহধর্ম্মিণী বলিয়া পূজ্যা ছিলেন, এখন পরিতাপের বিষয়, তাঁহারা সহশায়িনী মাত্র। গৃহধর্ম্মে, ধর্ম্মকর্ম্মে পতি বা গুরুজনে ভক্তি, অনুরাগ নাই। আলস্য, নাটকানুরাগ, আত্ম-বেশভূষা প্রভৃতি সে স্থান অধিকার করিয়াছে। হায়! একদিন দেখিয়াছিলাম, "ফুল্ল জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী" আর এখন দেখিতেছি "ঘোর করাল মেঘে চমকিতা দামিনী।" তাই স্বতই মনে হয়, পূর্ব্বে কি ছিল, আর আজ কি হইয়াছে!

এই সকল অতীতের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আর একটী মর্ম্মন্তুদ স্মৃতি ধীরে ধীরে অন্তরের নিভৃত-কক্ষে জাগিয়া উঠিল। অতীতের সেই সুখ-সম্বলিনী জীবন-কাহিনী মনে উঠিয়া, হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া, সুখ-স্বপ্নের ন্যায় যেন কোন এক স্বর্গরাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময় দৃষ্টি, নিকটস্থ একটী কুসুমের উপর পতিত হইল। দেখিলাম, গবাক্ষ ভেদ করিয়া সুধাকরের সুস্নিগ্ধ, সুবিমল সুষমা—তাহার শীতল রশ্মি, সেই কুসুমের উপর পতিত হইয়াছে, তাহাতে ফুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে বটে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য অনন্ত-[illegible] নহে, তাহা অন্তঃসার-শূন্য। [illegible] সৌন্দর্য্যে রূপোন্মত্ত যুবক মুগ্ধ [illegible] অনন্ত প্রেমের উপাসক, [illegible] পক্ষপাতী, অন্তর্নিহিত [illegible] তাহাতে মুগ্ধ হইতে পারে? তাহাতে কি তাহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইবে?

মনে পড়ে এইরূপ একদিন—বসন্তের মৃদুমন্দ সমীরণে যখন জগত সুশীতল, আর একটী কুসুম,—পূর্ণিমা-শশাঙ্ক-করোজ্জ্বল রজনীতে স্বর্গীয় হাসি মিশাইয়া, অন্তর্নিহিত পবিত্র প্রেমের উৎস ছুটাইয়া, জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত যামিনীর প্রসূন-সুরভি-শীতল, অভাগার এই নিভৃত হৃদয়-কুঞ্জে, সেই পারিজাত-সদৃশ অন্তর্বাহ্য-সৌন্দর্য্য-বিশিষ্টা কুসুম প্রস্ফুটিত ছিল; আবার সেইরূপ নিদাঘের পৌর্ণমাসী রজনীতে, সেই কুসুম-কুল-শোভনা, নয়নমনানন্দ-দায়িনী, জ্যোৎস্নায় আপনার অঙ্গের সুষমা মিশাইয়া, আপনার সার্ব্বভৌমিক প্রেম নিষ্ঠা দেখাইয়া, জগতে স্মৃতিমাত্র রাখিয়া অনন্ত-গগনে মিলাইয়া গিয়াছে; কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, আর ফিরিল না, ঝরিয়া গেল, আর ফুটিল না। স্বর্গের কুসুম স্বর্গে চলিয়া গেল—রহিল কেবল স্মৃতি,—আর এই সংসার-সন্তপ্ত—অনন্ত-বিরহিত অভাগার তপ্ত অশ্রুধারা!

* * *

আমরা কথা-প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ পথচ্যুত হইয়া আসিয়াছি। পরন্তু ইহাও যে নিতান্ত ভিত্তিশূন্য অথবা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা নহে। কালের প্রভাবে, শিক্ষা ও দীক্ষার দোষে, মানব-প্রকৃতি এবং সমাজেরও বহুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু এই অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তনের সহিত কি আমাদের সংশ্লিষ্টভাব বা সংস্রব নাই? অবশ্যই আছে! তবে আমরা এই পরিবর্ত্তনের মুখ্য না হইলেও গৌণ কারণ। জাতি, ধর্ম্ম বা সমাজের উত্থান বা পতন, যাহা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে, মানবমাত্রই তাহার কারণ।

পূর্ব্বেও বহুবার এই হিন্দু-সমাজের, হিন্দু-ধর্ম্মের, হিন্দু-জাতির পতন হইয়াছিল, আবার কালে, এবং মহানুভব—মহাপুরুষগণের উদ্যোগে ও উৎসাহে পুনঃস্থাপিত হয়। যখন যে ধর্ম্ম, যে সম্প্রদায় প্রবল থাকে, সে তাহার প্রাধান্য সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পায়; প্রবলের প্রতাপ ও জয় চির প্রসিদ্ধ। যখন যবন-সম্রাট ঔরংজেবের বিজয় পতাকা পশ্চিম-প্রদেশে উড্ডীন, তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপে যখন হিন্দুস্থান—হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নিপীড়িত, তখন ধর্ম্মপ্রাণ—ধার্ম্মিক—বীরকেশরী শিবাজীর হৃদয়ে আঘাত করিল; তিনি হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে সংকল্প করিলেন। অনন্তর একদিন সহসা দিগন্ত কম্পিত করিয়া তাঁহার বিজয় ভেরীর গভীর নিনাদ উত্থিত হইল, ধার্ম্মিকগণের অন্তরে সে ধ্বনি প্রতি-ধ্বনিত হইল, সকলে বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিল। তাঁহার মনের দৃঢ়তা-বশে, ধর্ম্মপ্রবণতা হেতু হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

আবার যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম হীনপ্রভ ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, মহামুনি শঙ্করাচার্য্য তখন আবির্ভূত হইয়া, সেই বেগ প্রতিহত করেন এবং বহু যত্নে বিলুপ্তপ্রায় হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্মকে পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তুলেন। বহুদিন গত হয় নাই, যেদিন যবন ও তান্ত্রিকগণ নিজ নিজ আধিপত্য ধীরে ধীরে বঙ্গ ও তৎসান্নিধ্য দেশ-সমূহে বিস্তার করিতে লাগিল, তাহাদিগের প্রবল অত্যাচারে যখন হিন্দুগণ প্রপীড়িত, ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইতে লাগিল, সেই সময় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন। নিস্তেজিত সমাজ ও ধর্ম্ম সজীবতা প্রাপ্ত হইল। এইরূপ উত্থান ও পতন পর্য্যায়ক্রমে এতাবৎকাল ঘটিয়া আসিতেছে এবং প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের দ্বারাই সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতি-সাধন হইয়া আসিতেছে। এই সকল ব্যাপারে ব্যষ্টিগত ভাবে সাধনা সম্ভবপর নহে, পরন্তু ব্যষ্টিগত-ভাবে আরব্ধ হইলে, সমষ্টিতে পরিণত হইয়া কার্য্য করিলে তাহা অনায়াস-সাধ্য হইয়া থাকে। ইংরাজীতে আছে,—

"If every one before his door sweeps, the village remains clean."

অতএব যদ্যপি প্রত্যেক ব্যক্তি আপন সমাজ ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে যত্নবান হয়, তাহা হইলে অচিরে যে আবার আর্য্য-সমাজের প্রাচীন রীতি নীতি ধর্ম্মপ্রবণতা প্রভৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, ধর্ম্মকর্ম্ম-হীন অধঃপতিত হিন্দুজাতির ও ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কি কারণে এই বিশ্ববিদিত হিন্দুজাতির এরূপ অধঃপতন হইয়াছে এবং এই সকলের জন্য আমরা প্রকৃত দায়ী কি না? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমরা এই অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তন ও পতনের মুখ্য না হইলেও গৌণ-কারণ। কারণ আমাদের ধর্ম্ম-শিথিলতা-প্রযুক্ত আমরা এতদ্ সংস্করণে সম্পূর্ণ উদাসীন; শাস্ত্র ও সমাজ-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আপাতঃমধুর সুখসিন্ধুর খরস্রোতে গা ভাসাইয়া, আপনাদের অনিষ্ট উপলব্ধি করিতে অসমর্থ; সুতরাং আমরা যে এ সম্বন্ধে একবারে দায়ী নয়, এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না।

এক্ষণে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। এতদ্ সম্বন্ধে আলোচনা বা তত্তদ্ বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগের বিশেষ আয়াস

করিতে হইবে না। ইহা বোধ হয় সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, ধর্ম্মের সহিত আমাদের সমাজ, শরীর ও মনের নিত্য সংশ্রব। ধর্ম্মের অস্তিত্বে সমাজ, শরীর ও মনের অস্তিত্ব—বিপর্য্যয়ে পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ধর্ম্মের শিথিলতা প্রযুক্তই যে আমাদের এরূপ অধঃপতন হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু এইরূপ ধর্ম্ম শৈথিল্যের কারণ কি? ইহার কয়েকটী বিশিষ্ট কারণ আছে, তন্মধ্যে শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্য কলাপ এবং বিধি বাক্য প্রতিপালনে ঔদাস্যই প্রধান।

আমাদের শাস্ত্রে সমাজ ও ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ আশ্রম বিধির উল্লেখ আছে; আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে সংসারাশ্রমই শ্রেষ্ঠাশ্রম বলিয়া পরিগণিত, কারণ এই আশ্রম হইতে মানব চতুঃবর্গ লাভ করিয়া থাকে। যাহাতে সাধারণ মানব উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, যাহাতে শরীর ও মন স্বচ্ছন্দ ও পবিত্রভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, ঋষিগণ তদ্বিষয়ে বিবিধ শাস্ত্র ও বিধি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। সেই সকল প্রতিপালন করিয়া চলিলে মানব যে সমাজ ও ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রাদিতে এরূপ উপদেশ প্রদান করে যে, শরীর রক্ষা করা মানবের প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম, যেহেতু শরীর সুরক্ষিত হইলে মানসিক প্রফুল্লতা ও স্বচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধিত হয় এবং তৎসঙ্গে মনের উন্নতি হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে। অতএব শরীর ও মন—এতদুভয় স্থির থাকিলে পবিত্রতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্যতা সাধন দ্বারা সমাজের গ্রন্থি দৃঢ় হয়, এবং সংযত ভাবে রক্ষিত হয়। এবং এই তিনের সংরক্ষণ [illegible]তার পথ সুপরিষ্কৃত হইয়া থাকে, [illegible] মানব পারত্রিক তত্ত্বের উন্নতি সাধনে সফলকাম হয়, এবং যাবতীয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

সাধারণ মানব শাস্ত্রের এই সকল বিধি-বাক্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বিধায় এই সকলের শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতির নেতৃত্ব ব্রাহ্মণগণের উপর আরোপিত হয়, তাঁহারাই শাস্ত্রের সকল গুহ্যার্থ ব্রাহ্মণেতর বর্ণদিগকে বুঝাইয়া দিবেন; অপর সাধারণ যাহাতে সমাজ, রীতি, নীতি, আচার, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণগণ সুশিক্ষা প্রদান করিবেন। নৃপতিবর্গ তাঁহাদিগের সংসার প্রতিপালনের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, সুতরাং তাঁহাদের উদরান্নের জন্য চিন্তা করিতে হইত না। মুসলমানগণের সময় অনেকেই অর্থলোভে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, শাস্ত্র, শাস্ত্ররীতি নীতি বিসর্জ্জন দিয়া দাসত্ব স্বীকার করিলেন; যাঁহারা রহিলেন, তাহারাও অনেকে দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র গেলেন। অনেক গ্রন্থও সেই সময় বিলুপ্ত হইয়া গেল; সমাজও ধীরে ধীরে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। আধুনা ইংরাজ মহোদয়ের গুণে এবং তাহাদের উৎসাহে অনেক লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে ও সেই সকলের আলোচনার জন্য যত্ন করিতেছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থলোলুপ হওয়ায়, শাস্ত্রাধ্যয়নে বা অধ্যাপনা কার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধি সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের এবং অপর সাধারণের অজ্ঞতা জন্মিয়া গিয়াছে। বিলাস ও বিভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রাচার-বিহীনতা প্রযুক্ত নিজদের ও অপরের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতেছেন।

শাস্ত্রাচারের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞানটী একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শাস্ত্রাচার, এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আহারাদির সহিত, আমাদিগের শরীর, সমাজ ও ধর্ম্মের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ। আমাদের এই দেহ রসাদি সপ্তধাতু দ্বারা গঠিত। আহার্য্য বস্তুর দ্বারা সেই সকল ধাতু পুষ্ট হইয়া শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। ঐ সকল ভুক্তদ্রব্যের গুণাগুণ আমাদিগের মনোবৃত্তির উপর আরোপিত হয় এবং তদ্দ্বারা আমাদের প্রকৃতির তারতম্য ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এমন কি, এই বৃত্তি-নিচয় ক্রমপরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগের অধস্তন সন্তান সন্ততিগণের বৃত্তি-নিচয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। মনুষ্যদেহ মাত্রেই পশুধর্ম্মের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়; পান ভোজনের উৎকর্ষাপকর্ষ হেতু ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষ বা গুণাগুণ সাধিত হয়। সুতরাং আহারের সহিত আমাদের শরীর ও ধর্ম্মের যে কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। ফলতঃ শাস্ত্রীয় বিধি-বিরুদ্ধ যাদৃচ্ছিক আহার, বিহার ও নিয়ম প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া মানবগণ দিন দিন হীনবীর্য্য, হীনমতি হইয়া পড়িতেছে, এবং তদ্দ্বারা যে সমাজের অবনতি ঘটিতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কি উপায়ে আমাদের এই গতির নিরোধ হয়। আমাদিগের প্রথমতঃ প্রধান কর্ত্তব্য সমাজ সংরক্ষণের চেষ্টা, তজ্জন্য উপযুক্ত নেতা নির্ব্বাচন প্রয়োজন। ব্রাহ্মণগণ যাহাতে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যাপনা কার্য্যে কুশলী হইতে পারেন, ধর্ম্মাভিজ্ঞ হইতে পারেন, যজন-যাজন-ক্রিয়া-নিপুণ হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আজকাল ইংরাজ মহোদয়গণের সুশিক্ষা প্রভাবে আপনাপন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অনেকেই সুনিপুণ, সুতরাং যদ্যপি আমরা প্রাচীনে-বর্ত্তমানে তুলনা করিয়া সেই সনাতন আর্য্য রীতি নীতি প্রভৃতির অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে আবার আমরা যে সেই মেঘনির্ম্মুক্ত শারদীয় শশাঙ্কের সুবিমল হাস দেখিতে পাইব—মর্ত্ত্যে নন্দন কাননের—স্বর্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব, এইরূপ আশা করা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই সকল কার্য্য করিতে হইলে একের দ্বারা অসম্ভব, সুতরাং সমষ্টি দ্বারা সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষার প্রধান আবশ্যক। তবে ব্যষ্টি ভাবে, অর্থাৎ যদি প্রত্যেকেই, উন্নতির ইচ্ছা সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে তাহা সমষ্টিতে পরিণত হইয়া কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানা প্রয়োজন যে, সমাজ রক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মই তাহার মূল, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে সমাজ গঠিত হইতে পারে না, যেহেতু ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন। সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে প্রকৃত মানবের প্রয়োজন, এজন্য প্রকৃত মানব হইতে হইলে তাহাদিগের শাস্ত্রোক্ত আহার ও আচার নিষ্ঠা প্রভৃতি হওয়াও প্রয়োজন। তজ্জন্য আমাদিগের সুশিক্ষা, সৎগুরু-উপদেশ, শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য প্রতিপালন করা বিধেয়। অতএব যাবত না আমরা আমাদিগের শাস্ত্র বিধি প্রতিপালন করিয়া চলিতে শিক্ষা করি, ধর্ম্মপ্রবণতা, প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মভাব যত দিন না আমাদিগের হৃদয়ে জাগরিত হয়, ততদিন এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির—হিন্দু সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত। ধর্ম্মই একমাত্র সমাজের উন্নতির সোপান, ধর্ম্মহীন সমাজের

পরমায়ু স্বল্প। এজন্য সমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে, প্রাচীন আর্য্যসমাজের রীতি নীতি প্রভৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা—তাহার সংস্কার করিতে হইলে—ধর্ম্মবল প্রয়োগই প্রকৃষ্ট পন্থা। অতএব যাহাতে আমাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব জাগরিত হয়, ধর্ম্মপ্রবণতা প্রবল হয়, তদ্বিষয়ে সদনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু ধর্ম্মই আমাদিগের প্রাণ, ধর্ম্মই আমাদিগের মোক্ষ।

"ধর্ম্ম রক্ষতি ধার্ম্মিকং"। হায়! আর কি সেদিন আসিবে, আর কি সেই অতীতের সুখ-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন চির মধুময় দিন ফিরিয়া আসিবে? আর কি হৃদয়ে সেই নন্দন-কানন-বিনিন্দিত, নয়ন-মন-বিমোহিত পবিত্র প্রসূন প্রস্ফুটিত হইবে; প্রভাত-কমলের ন্যায় আবার কি আনন্দ হিল্লোলে উচ্ছ্বাসিত হইয়া ভারত-মাতার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে?

"যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব"।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

আমি কে ?

লোকলোচনের অন্তরালে, সাধের ভৌম-রাজ্যের অপর পারে বিরাজমান কোনও সুদূরদেশ হইতে সমাগমোন্মুখ যেই আমার সমাগমের পূর্ব্বে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, শ্রমাদি অপনয়নের নিমিত্ত কোনও কার্য্যকুশল সেবা-পরায়ণ বিশ্বস্ত পরিচারক* সুকোমল সুখাসন, সুখসেব্য ভোজ্য, মধুর পানীয় ও বিবিধ স্বর্গীয় সেবার উপকরণ সামগ্রী দ্বারা আমার সুখনিকেতন পরিদৃশ্যমান বিলাস-কানন সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে,—পরম বিনয়ী পরিচারক যেই সমাগত প্রভুর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে বা সম্মুখীন হইয়া স্বীয় কার্য্য কুশলতার পরিচয় দিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত, যেন অতিঘোর অপরাধীর মত লজ্জায় ম্রিয়মান ভাবে সর্ব্বদা প্রভুর অগোচরে অবস্থান পূর্ব্বক বাক্যাতীত নম্রতা প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রভুর আদেশের পূর্ব্বে তাহার অন্তরের সকল অভিপ্রায় অবগত হইয়া সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে বদ্ধপরিকর রহিয়াছে,—প্রভু যখন যাহা আবশ্যক মনে করিতেছেন, তখনই তাহা সজ্জীভূত দেখিতে পাইতেছেন, পরিচারককে একটীবার কোনও কথা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে না, এমন কি, এই রাজাধিরাজ প্রভু তাহার তাদৃশ পরিচারকের সত্তা-তেই অনভিজ্ঞ, কে এই সকল কার্য্য করিতেছে, তাহার বাসস্থান কোথায়? তাহাকে এই সকল কার্য্যের জন্য কোনও পারিতোষিকের ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় কিনা? ইত্যাদি বিষয়ে একবার খোঁজও লইতেছে না, কেবল পরমসুখে বিনা আয়াসে অনিন্দ্য নন্দন-শোভিত বৈজয়ন্তধামের স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অতুল সম্পদ ভোগ করিতেছেন। বল দেখি, সেই মহারাজাধিরাজ প্রভু আমি কে?

যাহার এই ভৌমরাজ্যে আগমন মাত্রই ক্ষুধা তৃষ্ণাদি নাশের জন্য মধুর সুধারসপূর্ণ মাতৃপয়োধর-যুগল কোমল বদনমণ্ডলে পীযূষ-ধারা ঢালিতেছে, যাহার শ্রান্তি অপনয়নের

* পরিচারক বা পরিচালক অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তর কর্ম্মজগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর।

নিমিত্ত স্নেহসুধা-বিধৌত করুণা-প্রস্রবণ-মেদুর জননীর কমনীয় ক্রোড়রূপ স্বর্ণসিংহাসন সুসজ্জিত,যাহার জীবাঙ্কুর সংবর্দ্ধনহেতু জনক জননীর বাৎসল্য জীমূতধারা যথানিয়মে অভিবর্ষিত, যাহার নিবাসার্থ পিতার স্নেহনিকেতন কারুণ্যস্তম্ভে সুদৃঢ়সংস্থাপিত, ও বিবিধ জ্যোতিষ্কমণ্ডলি সংমণ্ডিত গিরিস্তম্ভ-বিধৃত আকাশ বাতায়ন-ভূমণ্ডল রাজপ্রাসাদরূপে বিরাজিত, অধিক কি, উজ্জ্বল চন্দ্র নক্ষত্র গ্রহাদি-রত্নমালা-খচিত সুনীল নভস্তল যাহার হীরকাদিমণ্ডিত মনোহর নীলচন্দ্রাতপ,শারদাকাশ কুসুমরাজি শ্বেতচামর,বিকশিত পুণ্ডরীক শ্রেণী আতপত্র, মলয়জ-পরিমল-মালতী কুসুম সুগন্ধ দক্ষিণমলয় সমীরণ ব্যজনোদ্ভূত মন্দানিল, সুরস ফল শস্যরাজি মধুর রাজভোগ্য ভোজ্য, উত্তুঙ্গ হিমাদ্রিনিঃসৃত পদ্মরেণুসুগন্ধ গঙ্গাবারিধারা পানীয়, সেই রাজাধিরাজ আমি কে? যাহার সেবার নিমিত্ত শারদপার্ব্বণ শশধর সুধাধবল স্নিগ্ধশীতকিরণ দান করিয়া নৈশ অন্ধকার দূর করিতেছে, প্রচণ্ডতপাঃ তপন প্রতিদিন তাপ দান করিয়া শৈত্য অপনয়ন করিতেছে, অগ্নিদেব খাদ্যাদি পাক করিয়া দিতেছে, অধিক কি, সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা দেবী স্বীয় কোমল হৃদয়াসন দান করিয়া সর্ব্বদা ভার বহন করিতেছেন, বল সেই মহারাজাধিরাজ আমি কে?

যাহার অভিমত কার্য্যসিদ্ধির জন্য হস্তদ্বয় সর্ব্বদা কার্য্যতৎপর, যাহার অভীষ্টদেশে গতির নিমিত্ত পদযুগল বদ্ধপরিকর, যাহার মনোনীত অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য বাগিন্দ্রিয় অজ্ঞাতসারে কার্য্যে নিযুক্ত, যাহার শান্তিপ্রদানের জন্য শরীরস্থ দূষিতপদার্থ দূরীকরণ মানসে পায়ু সর্ব্বদা কার্য্যোন্মুখ, যাহার অতুল আনন্দ দানের নিমিত্ত উপস্থ সংযতভাবে বিশ্বস্ত-ভৃত্যের ন্যায় আদেশ পালনে নিযুক্ত, সেই রাজাধিরাজ প্রভু আমি কে?

এই বিশ্বব্যাপ্ত ঘোর তমিস্রাচ্ছন্ন অমানিশার অন্ধকার নাশ করিয়া যাহার কার্য্যসাধনের নিমিত্ত নয়নদ্বয় উজ্জ্বল মণিরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, শ্রোত্রেন্দ্রিয় যাহাকে তরুরাজিতে বিলীন কলকণ্ঠ বিহগগণের প্রাভাতিক-সঙ্গীত অনবরত উপহার দিতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় যাহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বতঃ বিস্ময়র কুসুমমলয়জ সৌরভ আনিয়া সেবা করিতেছে, যাহাকে রসনেন্দ্রিয় সুরস ভোজ্যান্নের স্বাদ আনয়ন করিয়া কররূপ প্রদান করিতেছে, স্পর্শেন্দ্রিয় সুশীতল চন্দনমাল্য বনিতাদির স্বর্গীয় স্পর্শ-জনিত প্রীতি উৎপাদন করিয়া দিতেছে, বল সেই রাজাধিরাজ আমি কে?

যেই আমি শিশুকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমনীয় স্নিগ্ধ দশনোজ্জ্বল-বদনে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় পিতামাতার আনন্দসংবর্দ্ধন করিতাম,বার্দ্ধক্যে পলিত-কেশ লোলিতচর্ম্মা দশন-হীন বিকৃতবদন হইয়া তাহাদের স্মরণ করিয়া অনুতাপদগ্ধ হইতেছি, সেই স্মর্ত্তা আমি কে? সর্ব্বদা আমার স্থূল শরীর পরিবর্ত্তনের অধীন হইলেও, এমন কি, প্রতি দশ বৎসরে পূর্ব্বশরীরের একটী পরমাণুর সত্তা না থাকিলেও, যেই আমি বাল্য, কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের প্রতি শরীরে অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছি, সেই আমি কে?

প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল এই হস্তপদাদি যেই আমার সেবার জন্য নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়া কার্য্যতৎপর, ইহারা পরিবর্ত্তনশীল ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা পরিবর্দ্ধিত হইলেও যেই আমি স্থির থাকিয়া তাহাদের সেবা উপভোগ করিতেছি, একদেহ অতীতের অন্তরালে ডুবিয়া পড়িতেছে, অন্য দেহ বর্ত্তমান মূর্ত্তি

পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, বাল্যের ক্ষুদ্র কোমলদেহ দেখিতে দেখিতে কালের ক্রোড়ে বিলীন হইতেছে, কৌমারের কান্ত-বপুঃ যৌবন ও প্রৌঢ়ের কঠোর বিগ্রহ সেইরূপ পলকে অতীতের অন্তরালে স্মৃতিরাজ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে, আমি ভূষণ্ডীকাকের মত অগণ্য ইন্দ্রের পতনদর্শী মহর্ষি লোমশের ন্যায় স্থির থাকিয়া দেখিতেছি, বল দেখি সেই দ্রষ্টা আমি কে? যখন নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকি, নিদ্রাদেবী স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়, ভূলোক, দেবলোক ও নাগলোকে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও আনন্দোল্লাসে বিভোর হইয়া আত্মবিস্মৃত হই, কখনও বা শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব ধারণ করি, ভূলোকে, এই পরিদৃশ্যমান ভূমণ্ডলের পরমাণু সদৃশ ক্ষুদ্রতম মদীয় গৃহ-কোণস্থিত শয্যা প্রান্তে শয়ান থাকিয়া অনন্ত পৃথিবীর অনন্তস্থানে মুহূর্তে বিচরণ করি, বিবিধ শোভন নদ, নদী, নগর, নগরী, প্রান্তর, কানন, গিরিসাগরের অপূর্ব শোভা দর্শনে মুগ্ধ হই, কখনও বা ভীম বক্র ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক কবলিত হইতে হইতে ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠি, কখনও স্বর্গে নৃত্যশীলা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী বালা, ইন্দ্র, চন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। বল সেই দেহহীন মানস রাজ্যে বিচরণপরায়ণ দেহাতিরিক্ত আমি কে? বস্তুতঃ এই দেহ আমি শব্দবাচ্য নহে, দেহ আমি হইলে [illegible]সুম-চ্যুতিতে স্থির সূত্রের ন্যায় [illegible] দেহের অভাবে "আমির" সত্তা [illegible] না। গৃহকোণস্থ ক্ষুদ্র শয্যায় [illegible]ও আমি শব্দবাচ্য আত্মা ত্রিজগতের দৃশ্য সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতে পারিত না। ইন্দ্রিয়গণও আমার, কিন্তু আমি নহি, তাহারা আমার সেবায় রত। আমি তাহাদের অসত্তায় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, এক বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের বিঘাতে আমার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না, আমি অন্ধ হইলেও আমার পূর্ব্বস্মৃতিচিত্র চিত্তপটে অঙ্কিত থাকে, বল এই ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্নরাজ্যের অনুভবিতা ও স্মর্ত্তা আমি কে?

যখন গাঢ় সুষুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল ইন্দ্রিয় ও মনের বিলয় বশতঃ মনোরাজ্যের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া অজ্ঞান মিশ্রিত আনন্দ ভোগ করিতে থাকি, সেই আনন্দরাজ্যের আনন্দময় আমি কে? সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া আমি সুখে ঘুমাইয়াছি বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকি, অনুভব না হইলে সংস্কার বা স্মৃতি হইতে পারে না, সুতরাং এই আনন্দ স্মৃতি তাৎকালীন অনুভব জন্য, মিথ্যা কল্পনা প্রসূত নহে।

আমি এই স্বভাবসুন্দর সর্ব্বমনোরম ভূমণ্ডলে কোথা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি, শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে, এইরূপ জাগরণ হইতে স্বপ্নে ও স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে যেমন আমি অনুগত রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি, এমন শৈশবের পূর্ব্বে কোথাও অজ্ঞাত ভাবে বর্ত্তমান ছিলাম কি না? পরন্তু বাল্যাদিশরীর নাশে বার্দ্ধক্যে যেমন আমি বর্ত্তমান থাকিয়া পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ ও সুখ দুঃখাদি ভোগ করি, তেমন বৃদ্ধাবস্থায় এই শরীর নাশের পর কোনও লোকে আমার সত্তা থাকিবে কিনা? ও পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিতে পারিব কিনা? যেমন বাল্যকৃত কর্ম্ম-ফল যৌবনে, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে ও যৌবন-

কৃত কর্ম্মফল তৎপরবর্ত্তী অবস্থায় ভোগ করি, তেমন পরিদৃশ্যমান জন্মকৃত কর্ম্মফল কোনও সময়ে ভোগ করিব কিনা? বর্ত্তমানাবস্থায় আমার জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থূল দেহাশ্রিত, মৃত্যুর পরে এই ইন্দ্রিয়াদি কোন দেহ আশ্রয় করিয়া থাকিবে কিনা?

আমাদের মানস-সাগরের দোধূয়মান বাসনা-তরঙ্গ-নিচয়ের উৎকট তাণ্ডব ক্রীড়া কি দেহের সহিতই বিলুপ্ত হইবে, জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে অনন্ত কামনাজাল হৃদয় জড়িত করিতেছে, মানবের চিত্ত-মীন বাসনাজলে দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে, বাল্যে অতৃপ্তচিত্তে আস্বাদিত ক্রীড়ারসের পূর্ণাভিব্যক্তি ও যৌবনের অস্ফুট কামনার বিকাশ হইতে না হইতেই শৈশব অনন্ত কালগর্ভে বিলীন হয়, তেমনি দেখিতে দেখিতে অপূর্ণ অভিলাষ লইয়া যৌবন অন্তর্দ্ধান করে, বার্দ্ধক্য ভোগহীন পূর্ব্বস্মৃতির কঠোর পীড়নে অতিবাহিত হয়, ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি, * আবার এই রাগদ্বেষ জন্য বাসনা রূপ চিত্তবৃত্তি আগ্রহের সহিত পরিভাবিত হইয়া বাসনা-সহস্রের উৎপাদন করিয়া দেয়, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল বাসনা কি চির-কাল অপূর্ণই থাকিবে? যাহা বর্দ্ধিত হয়, তাহার অবশ্য একস্থানে বৃদ্ধির শেষ সীমা আছে, এই সর্ব্ব-প্রাণি-সাধারণ সুখস্পৃহাও কেবল বর্দ্ধিত হইতেছে, এই বৃদ্ধিরও বোধহয় একস্থানে বিশ্রাম ঘটিবে। যদি বিশ্রাম হয়, হয়ত তাহাই দুঃখলেশ-শূন্য পরম সুখ-নিকেতন মোক্ষ। সেই সুখের আদি অন্ত বা কোনরূপ সীমা নাই। তাহা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-সাগরে আনন্দ-সলিল। পূর্ণকুম্ভের সলিলের ন্যায় সেই আনন্দ তৃষ্ণা-তরঙ্গ-শূন্য। এখন পুনরায় জিজ্ঞাস্য এই, সেই পূর্ণ সুখস্থান কোথায়? এবং কিরূপ? তাহা যদি পূর্ণ হয়, তাহার যদি কোথাও অভাব না থাকে (পূর্ণ বস্তুর অভাব থাকিতে পারে না) তবে জীবগণ সেই পূর্ণ সুখ স্বরূপতার উপলব্ধি করিতে পারেন না কেন? আমি সেই পূর্ণ হইতে পৃথক কিনা?

এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, নদ, নদী গিরি, কানন দেখিতে পাইতেছি, ইহারা কি চিরকালই এক ও একরূপ? কখনই নহে। নদ নদীর পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, অতীতের ইতিহাস পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দিতেছে, "পুরা যত্রস্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্"। দুইদিন পূর্ব্বে সেইস্থান সমুদ্রগর্ভে বিলীন ছিল, আজ তথায় অমরাবতী সদৃশী মনোহর নগরী শোভা পাইতেছে, এই তুঙ্গশৃঙ্গোন্নত হিমালয় এককালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, অতএব বোধহয় সকলই পরিবর্ত্তনশীল, একবার এক হয় অন্য যায়, সকল ভাঙ্গে আবার নূতন হয়। যখন সকলেরই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তখন এই পরিবর্ত্তনে-রও শেষসীমা আছে, একসময় এই ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্ত্তনের শেষ সীমায় পঁহুছিবে, সকলেরই বিলয় ঘটিবে, বোধহয় এই সর্ব্বব্যাপী বিলয়] সংঘটনের নামই মহাপ্রলয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বিলয় কোথায় হয়? জলে বুদ্বুদের, সুবর্ণ কুণ্ডলের, শুক্তিতে ভ্রমদৃষ্ট রজতের, রজ্জুতে পরিদৃষ্ট তাদৃশ সর্পের বিলয় হয়। এই সকল বিলয়ে একটী অধিকার দেখিতে

* জ্ঞান ও কর্ম্ম জন্য সংস্কারের নাম বাসনা, লোকের সুখ ও সুখসাধনের অনুরাগ পূর্ব্বক কায়বাক্য ও মনের পরিণতিরূপ ক্রিয়া হয়, এইরূপ দুঃখ ও সুখ সাধনে দ্বেষপূর্ব্বক জীবের তাদৃশ ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই সুখ ও দুঃখানুসারী সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তির নাম বাসনা। এই বাসনার কারণ রাগ ও দ্বেষ।

পাইতেছি, এই সকল ব্রহ্মাণ্ড বিলয়ে অধিকরণ কি? এই বিলয়ে আমার অস্তিত্ব থাকে কিনা? সেই বিলয়ে অধিকরণ আমি অথবা অন্য কোনও স্থির বস্তু? *

যদি প্রলয়ে সকল বস্তুর বিলয় অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে সেই প্রলয়ের পর পুনরায় নূতন উদ্ভূতি আছে কিনা? যদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পুনরুৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই উৎপত্তির হেতু কি? নিরবশেষ প্রলয়ের পর আবার কোথা হইতে কোন্ শক্তিতে পৃথগ্‌ভূত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হইলে অনন্তকাল প্রতিভাত অনন্ত শক্তি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র সকলেরই বিলয় হয় এবং পুনরুৎপত্তি হয়, স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদের যেমন উৎপত্তি লয় হয়, এমন মানবেরও উৎপত্তি লয় হয়। মানব কোনও অজ্ঞাত রাজ্য হইতে ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করে দেখিতে পাই, আবার কিয়ৎকাল এই ভৌম ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়া করিয়া পুনরায় প্রস্থান করে, ইহা লোক-নয়নের প্রত্যক্ষ ঘটনা। তবে সন্দেহ এই, যে যায় সে পুনরায় আসে কিনা? যে পুত্রহীনা জননী পুত্রশোকে ম্রিয়মানা হইয়া অনবরত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, সেই শোককাতরা জননীর প্রিয়পুত্র ইহলোকে ফিরিয়া আসিবে কিনা? কিম্বা লোকান্তরে তদুভয়ের মিলনের সম্ভাবনা আছে কিনা? পতি-বিরহ-বিধুরা সতী পতিশোকে অধীর হইয়া জীবনে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রিয়তমের সহিত ভস্মীভূত হইতে প্রবৃত্ত হয়, বাসনা—ইহলোকে পতি দেবতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও পরলোকে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না, তথায় আরাধ্য প্রাণের দেবতার সহিত চিরকালের জন্য সম্মিলিত হইতে পারিবে। সাধ্বীর এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে কিনা; পরকালে এই দম্পতীর সত্তা থাকিবে কিনা? অথবা চিতা ভস্মের সহিত সকল শেষ হইবে? পরন্তু যদি পরলোকে গমন স্থির হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের কথা মনে থাকেনা কেন? কেন এমন সর্ব্বগ্রাসী বিস্মৃতি উপস্থিত হয়? জীব কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত ইহলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে? আমরা নিজের অথবা অন্য কোনও ব্যক্তির, যেইরূপই হউক, কোনও প্রয়োজন ভিন্ন কদাপি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না। "প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য মন্দোপি ন প্রবর্ত্ততে"। অনুন্নত কোন মূর্খ ব্যক্তিও প্রয়োজন ভিন্ন কোন কাজ করে না। দরিদ্রের দুঃখ দূরীকরণ মানসে দানাদিকার্য্যে কদাচিৎ পরার্থা প্রবৃত্তি দেখা যায় বটে, পরার্থতা ভাবিতে গেলে ঐ দানও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, অন্যকোন স্বার্থ না থাকিলেও অন্ততঃ পরদুঃখ দর্শনে যে আত্মদুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার দূরীকরণ দানের এক মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা বিদেশে অর্থার্জ্জন প্রভৃতি প্রয়োজনে গমন করিয়া থাকি, প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে কার্য্যের গুরুত্ব হইয়া থাকে। লোকে গুরুতর প্রয়োজন সাধনের জন্য কঠোরতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ এই ভূমণ্ডলে যদি কোন মহৎ প্রয়োজন সাধন উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা কিরূপে সিদ্ধ করিব? অপিচ এই প্রয়োজন আমার

---

* মহাপ্রলয় অপ্রামাণিক নহে, নৈয়ায়িকাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় উদয়ন স্বীয় কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে দ্বিতীয় স্তবকে "জন্ম সংস্কার বিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্ম্মণোঃ। হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম্।" এই কারিকাদ্বারা প্রলয় প্রমাণিত করিয়াছেন। বেদান্ত [illegible] ব্যাখ্যাতে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় ঘটিয়া থাকে।

নিজের বা অন্যের? যদি নিজের হয়, তাহা হইলে কবে সেই প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিব? পরন্তু আমরা স্বাধীন ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ জীবন মরণের অধীন হইতেছি, অথবা অন্য কেহ আমাদের প্রেরক আছেন? যাঁহার ইচ্ছায় যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার ন্যায় বারম্বার গতায়াত করিতেছি, যদি কর্ম্ম ফলে জন্ম পরিগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম কেমন? তাহার প্রয়োজক কে? দেশকাল ও কার্য্যকারণ বিশেষ অভিজ্ঞ রাজা স্বীয় প্রকৃতি বর্গের কর্ম্মফল অনুসারে সৎকার ও দণ্ড প্রদান করেন, এই কর্ম্মফলপ্রদ রাজা কে? আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? আর আমি যদি তাঁহার প্রদত্ত ফল ভোগ করি, তবে তাঁহাকে জানিতে পারি না কেন? এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডইবা কাহার কর্ম্ম, ইহার পরিণতি কেন ঘটে? আমার সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ কি?

আমি কে, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ প্রতি জীব-হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক রহিয়াছে। সকল দার্শনিক মনীষিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে জ্ঞানাম্বুধি মন্থন করিয়া আসিতেছেন, প্রত্যেক উপনিষদে এই আত্মতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে, কঠোপনিষদে আত্মার পরলোক সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন সন্দেহের কথা উক্ত হইয়াছে। মহাত্মা নচিকেতা পিতৃআজ্ঞায় যমরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জীবের পরলোক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকেনায়মস্তীতি লোকে।
এতদ্বিদ্যা মনুশিষ্ট স্ত্বয়াহং
বরাণিবমেষবরস্তৃতীয়ঃ"॥

"জীবমাত্রই সর্ব্বদা মৃত্যুর অধীন হয়, কিন্তু মরণের পর পরলোকে বিদ্যমান থাকে কিনা, সন্দেহ মানবগণকে সর্ব্বদা আকুল করিতেছে। কেহ বলে জীব পরলোকে বিদ্যমান থাকিয়া স্বর্গাদি উপভোগ করে এবং কাহারও মতে জীবের পরলোকে সত্তা থাকে না। দেহের সহিতই জীবের বিলয় হয়, আপনি এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ করুন, ইহাই আমার তৃতীয় বর।

বস্তুতঃপক্ষে এই সকল সর্ব্বজীব সাধারণ প্রশ্নের উত্তর অদৃষ্টরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীর নিবিড়গিরিগুহা গর্ভে বিলীন। দার্শনিকগণ সকলেই ইহার সুমীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন, কে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। আমরা ক্রমশঃ ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের ও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন দার্শনিকগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যত্ন করিব ও যথাসম্ভব দার্শনিকগণের বিরুদ্ধমত সমূহের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীরমেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

ব্রহ্মোপাসনা ও অষ্টাঙ্গ সাধন-তত্ত্ব।

আমাকে 'মিডিয়ম' করিয়া একজন পরলোকবাসী আত্মা, 'আত্মতত্ত্ব' বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, গত চৈত্র মাসের নব্যভারতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উহার লেখক আপনাকে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পরলোকবাসী মহাত্মারা আমাকে 'মিডিয়ম' করিয়া ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং ক্রমাগতই লিখিতেছেন। এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া দেশের কল্যাণ হয়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। কোন কোন প্রবন্ধ মাসিক পত্রাদিতে এবং কোন কোন প্রবন্ধ গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা আমাকে অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব প্রকাশক ও সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, এবং আমার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বর্ত্তমান মাসের নব্যভারতে ব্রহ্মোপাসনা ও হিন্দুযোগ, অর্থাৎ অষ্টাঙ্গসাধন-তত্ত্ব বিষয়ে একটী প্রবন্ধ নিম্নে প্রকাশিত হইল। ইহার লেখক আপনাকে রাজা রামমোহন রায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া পাঠকবর্গের মনে এই এক প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাদিতে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার যে প্রণালী দেখা যায়, তাহার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোন সাদৃশ্য নাই। রাজার গ্রন্থাদির যে ভাষা, তাহা সেকেলে বাঙ্গালা। এখনকার বাঙ্গালার সহিত তাহার অনেক প্রভেদ। তবে এই প্রবন্ধের বাঙ্গালা আধুনিক বাঙ্গালার ন্যায় কেন হইল? এই প্রশ্ন সহজেই পাঠকবর্গের মনে উদিত হইবে। আমি রাজাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন যে, যদি পৃথিবীর সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিতাম, তাহা হইলে জীবদ্দশায় যেরূপ বাঙ্গালা লিখিতাম, এখনও সেইরূপ লিখিতাম, কিন্তু আমি দেশের সহিত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রাখিয়াছিলাম বলিয়া বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমারও বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। নতুবা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সেকেলে বাঙ্গালা লিখিতাম। রাজা দেশের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও বাঙ্গালা লিখিবার উন্নতি হইয়াছে। যাহা হউক, এখন পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করুন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকে প্রীতির সহিত উপাসনা করিবে। পরমাত্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবে। ইহাই জীবনের সার কাজ। কিন্তু শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের অর্থ কি? শ্রবণ অর্থে সাধুসঙ্গে বসিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ করা। তাঁহার কথা

বলা ও সাধুমুখে তাঁহার কথা শুনা। ইহাতে যে কি উপকার, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা ভগবৎ প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার উপকার বুঝিয়াছেন।

তার পর, মনন। মনন কিরূপ? ব্রহ্মের মহিমা, তাঁহার স্বরূপলক্ষণ সকল চিন্তা করাই মনন। সচরাচর আমরা তাঁহার যে সকল স্বরূপলক্ষণে বিশ্বাস করি, সেই সকলের প্রত্যেকটী চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এইরূপ চিন্তাই যথার্থ মনন। ঋষিরা এই প্রকার মননে চিত্তকে নিযুক্ত করিতেন। এইরূপ মননে চিত্ত উন্নত ও পবিত্র হয়। তাঁহাকে মনন করিতে হইলে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, এই উভয় জগতের বিষয় সকল চিন্তা করা আবশ্যক। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, তাঁহার দয়া সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়।

ইহাই প্রকৃত উপাসনা। তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ চিন্তাই যথার্থ উপাসনা। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, জগতে নানা কার্য্যে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিবিষ্ট-চিত্তে আলোচনা করিলে, তাঁহার সত্তা, তাঁহার শক্তি, তাঁহার প্রেম, তাঁহার করুণা পরিষ্কার রূপে অন্তরে প্রতিভাত হয়। চিত্তের স্থৈর্য্য একান্ত প্রয়োজনীয়। মন চঞ্চল হইলে এ কার্য্য সুচারুরূপে কখনই সম্পন্ন হয় না। সুন্দর উপাসনা করিতে হইলে, চিত্তের স্থৈর্য্য একান্ত আবশ্যক।

প্রত্যেক স্বরূপলক্ষণের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্বন্ধ আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিয়া আনন্দলাভ করা যায়। প্রত্যেক স্বরূপলক্ষণের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্বন্ধ অনুভব করা আবশ্যক। যতই সেই সম্বন্ধ অনুভব করিব, ততই আনন্দ ও ভক্তিতে হৃদয় পরিপ্লুত হইবে।

এক একটী স্বরূপলক্ষণ চিন্তা করা ও তাহার সহিত জীবনের সম্বন্ধ অনুভব করা নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ করিলে উন্নতি-পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ যত বুঝিব, ততই তাঁহাকে আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারিব। সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তা আবশ্যক। ঈশ্বরচিন্তা-বিরহিত হইয়া কেবল সংসারচিন্তায় দিনযাপন করার তুল্য শোচনীয় অবস্থা আর কি আছে?

তিনি জীবনের জীবন। 'প্রাণস্য প্রাণং।' তাঁহার মত আমার আর কেহ নাই। অন্য সকলের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তাহা তাঁহা-রই সম্বন্ধে। তিনি আমার সকলই। মাতা, পিতা, বন্ধু, আত্মীয়, গুরু সকলই তিনি। প্রকৃতভাবে তাঁহাকে চিনিতে পারিলে সকল দুঃখ দূর হয়।

মানুষের অনেক দুঃখ। কিন্তু কোন দুঃখ থাকে না, যদি আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি। তাঁহাকে চিনিলেই সকল দুঃখের অবসান। তিনি দুঃখহারী হরি। আমরা তাঁহাকে চিনিতে চেষ্টা করি না। চেষ্টা করিলে অবশ্য চিনিতে পারিতাম। যাঁহার তুল্য আপনার আর কেহ নাই, তাঁহাকেই চিনি না। ইহার তুল্য দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

কিন্তু তাঁহাকে কেমন করিয়া চিনিব? তাহার উপায় কি? তিনি স্বয়ংই তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। মানবাত্মা স্বভাবতঃ পরমাত্মাকে জানে। স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসে মানুষ আপনার স্রষ্টাকে জানে। ইহা ভিন্ন চারিদিকের প্রকৃতি নিরন্তর

তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সেইজন্য, মানুষ কোন কালেই ধর্ম্মহীন নহে। অতি প্রাচীনকালে, আদিম অবস্থাতেও মানুষ একেবারে ধর্ম্মহীন ছিল না। যত কেন হীন অবস্থা হউক না, সকল অবস্থাতেই মানুষের কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম ছিল। অন্য জীবের মধ্যে মানুষের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ ধর্ম্মজীবী জীব। একেবারে যে ধর্ম্মহীন, তাহাকে মনুষ্য বলাই উচিত নহে। ধর্ম্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার।

ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি? মূলতত্ত্ব, জীবনের মূলে এক জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী শক্তির অনুভূতি। এই অনুভূতিই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। মনুষ্য যত কেন অসভ্য অবস্থায় থাকুক না, একেবারে ধর্ম্মশূন্য হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। জ্ঞান যেমন স্বাভাবিক, ধর্ম্মও সেইরূপ স্বাভাবিক। জ্ঞান ও ধর্ম্ম, মানুষের লক্ষণ। এরূপ মনুষ্য কোথাও দেখা যায় নাই, যাহার একেবারে কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। বিশেষভাবে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখা হইয়াছে যে, এরূপ মনুষ্য কোথাও নাই, যাহার ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মের আকার যেরূপই কেন হউক না, ইহা নিশ্চয়ই যে, কোন না কোন আকারে সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম আছে। যেখানে মানুষ আছে, সেখানেই ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির সহিত একীভূত।

মানবের ধর্ম্ম-প্রকৃতি, তাহার উচ্চতম প্রকৃতির। এই উচ্চতম প্রকৃতির সহিত পরমাত্মার যোগ। সেই বিশ্বজনীন আত্মা, প্রতি মানবে আত্মারূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বজনীন আত্মা ও ব্যক্তিগত আত্মা, এই দুই আত্মা, বাস্তবিক এক। যেমন সূর্য্য ও তাহার রশ্মি; যেমন সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ; যেমন বড় নদী ও তাহার খাল; যেমন, উৎস ও তাহার স্রোত; সেইরূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মা। এই দুইয়ে অতি নিকট সম্বন্ধ। এই দুইয়ের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট রূপে বুঝাই সকল দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে যিনি যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহাই বিশেষ বিশেষ দর্শনের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান নাই, তাঁহারাই নিরীশ্বরবাদে উপনীত হইয়াছেন।

আমি কোথা হইতে আসিলাম? আমি কোথায় যাইব? এ সমস্ত তত্ত্ব আমাকে কে বলিয়া দিবে? আমার জীবনের আদি, মধ্য, অন্ত, আমার নিকট অবোধ্য। যিনি আমার স্রষ্টা, যিনি আমার রক্ষাকর্ত্তা, আমি যাঁহার দিকে চলিয়াছি, তাঁহাকে আমি প্রাপ্ত হইতে চাই। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই এজীবনের লক্ষ্য। তাঁহাকে না পাইলে এ জীবন বৃথা। তাঁহার জন্যই আমি।

কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব? কে তাঁহাকে আনিয়া দিবে? কে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে? যিনি পারেন, তিনিই যথার্থ গুরু। সে গুরু কোথায় পাই? পরিমিতে অনন্তে মিলন কি সহজ কথা? তিনি কি নিজেই গুরু হইয়া আমাকে তাঁহার চরণতলে লইয়া যাইতে পারেন না? তাহাই প্রকৃত কথা। তিনি নিয়তই সেই চেষ্টা করিতেছেন। তিনি একটু একটু করিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতেছেন। কতদিনে পৌছিব? অথবা কোন কালেই সম্পূর্ণরূপে পৌছিতে পারিব না? তিনি যে অনন্ত, আর আমি পরিমিত। তবে কেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিকটে যাইব? অনেকে বলেন যে, তাঁহারা পরমেশ্বরকে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথায় আমি সায় দিতে পারি না। ক্ষুদ্র পরিমিত

জীব, কেমন করিয়া অনন্তকে লাভ করিবে? ইহা কি সম্ভব? একভাবে সম্ভব। আর একভাবে সম্ভব নহে। কি ভাবে সম্ভব? এইভাবে যে, তিনি যে অনন্ত, ইহা বুঝা। তাঁহার সত্তা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা, তাঁহার স্বরূপলক্ষণ গুলি অনুভব করা; এইভাবে তাঁহাকে জানা সম্ভব। আর কি ভাবে তাঁহাকে জানা সম্ভব নহে? তিনি অনন্ত পুরুষ; আমি পরিমিত, ক্ষুদ্র। আমি তাঁহাকে কেমন করিয়া জানিব? যে পরিমিত, সে অনন্তকে কেমন করিয়া জানিবে? ক্ষুদ্র একটী পাত্রে কি মহাসাগরের সমুদয় জল ধরিতে পারে? তবে এক ভাবে বলা যায় যে, হইতে পারে। পাত্রের যতটুকু আয়তন, ততটুকু ধরিতে পারে। আমি অনন্তকে ধরিতে পারি না। তবে আমার হৃদয়, মনের যেরূপ আয়তন, তদনুরূপ, অবশ্য, হইতে পারে।

মনুষ্যের কি অনন্তের জ্ঞান আছে? আমি মনে করি, আছে। পরিমিতের জ্ঞান যখন আছে, তখন অনন্তের জ্ঞান অবশ্য আছে। কেন না, এ দুই আপেক্ষিক জ্ঞান। পরিমিত কি? না, যাহা অনন্ত নহে। অনন্ত কি? না, যাহা পরিমিত নহে। একই সত্যের দুই দিক্। সুতরাং বলিতে হইবে যে, মনুষ্যের অনন্তের জ্ঞান আছে।

সকল জাতীয় লোকেই পরমেশ্বরকে অনন্ত-স্বরূপ বলিয়া থাকে। একটা জ্ঞান না থাকিলে, এরূপ বলিবে কেন? সকল ভাষায় অনন্তের প্রতিশব্দ আছে। অনন্ত সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকিলে, ভাষায় তৎ-প্রকাশক শব্দ থাকিবে কেন? শব্দ থাকিলে এই বুঝায় যে, তৎপ্রকাশক জ্ঞান অবশ্য আছে। মানুষ পরিমিত হইলেও, অনন্তের অধিকারী। মানুষ, অনন্তকালের যাত্রী, অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। মানুষ, অনন্ত পুরুষের সন্তান; মানুষের জীবনের লক্ষ্য অনন্ত। মানুষ, পরিমিত, তাহাতে কি? মানুষ যে আপনাকে পরিমিত বলিয়া বুঝিতেছে, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, মানুষ পরিমিত হইয়াও, একভাবে, অনন্ত। মানুষের মধ্যে অনন্তত্ব আছে বলিয়াই, মানুষ, সেই অনন্তপুরুষকে জানিতে পারে।

এই অনন্তের জ্ঞানই মূল জ্ঞান। এ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই আছে। তবে পরিস্ফুট আর অপরিস্ফুট। অজ্ঞান মনুষ্যের মনে ইহা অপরিস্ফুটভাবে রহিয়াছে। উহা ক্রমে পরিস্ফুট হয়। অনন্তের জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান। অনন্ত ও পরমেশ্বর একই কথা। যাহা অনন্ত, তাহাই পরমেশ্বর। দুই অনন্ত নাই, দুই অনন্ত অসম্ভব। অনন্ত অর্থ কি? অনন্ত অর্থে যাঁহার মধ্যে সকলই। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, অসীম আকাশ, অসীম কাল, সকলই যাঁহার অন্তর্গত। তবেই হইল, দুই অনন্ত অসম্ভব। সকলই যাঁহার অন্তর্গত, ইহাই যদি অনন্তের অর্থ হইল, তাহা হইলে, ইহা নিশ্চয়, এক ব্যতীত দুই অনন্ত কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

এইরূপে পরমেশ্বরের একত্ব প্রতিপন্ন হয়। আদিকারণ হইলেই অনন্ত। আদিকারণ হইলেই যে অনন্ত হইবে, ইহা কেমন করিয়া বুঝা যায়? যিনি আদিকারণ, সকলই তাঁহার অধীন। কেন না, সকলই তাঁহার কার্য্য। তিনি কারণ, সকলই কার্য্য। সুতরাং সকলই তাঁহার অধীন। সুতরাং কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। তাঁহার শক্তি সকলকে অতিক্রম করে। সকলকে ছাড়াইয়া যায়। সুতরাং তিনি অনন্ত। এমন কিছু নাই যাহা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করে। সুতরাং তিনি অনন্ত।

এই অনন্ত পুরুষই পরমেশ্বর। তাঁহার সত্তা অনন্ত। তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনন্ত সত্তা। তাঁহার সত্তায় আর সকলে সত্তাবান। একমাত্র স্বাধীন সত্তা কেবল সেই অনন্ত পুরুষের। আর সকলই তাঁহার কার্য্য। সুতরাং তাঁহার অধীন।

এখন দেখ, তাঁহার স্বাধীন সত্তা, তাঁহার একত্ব ও তাঁহার অনন্তত্ব পাইলাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল স্বরূপ লক্ষণগুলি পাওয়া যায়। অন্য প্রবন্ধে ইহা সুস্পষ্ট রূপে দেখান হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্য কথা বলি। পরমাত্মার স্বরূপলক্ষণের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ আলোচনা করিলে আমরা যথার্থই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হই। তাহাও অন্য প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। তবে এখন কি আলোচনা করিব? আলোচনা করিবার অনেক বিষয় আছে। আমরা কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিয়াছি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ, জগতের সঙ্গে তাঁহার স্বরূপের সম্বন্ধ, এই কয়েকটী বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। এখন আর কি আলোচনা করিতে অবশিষ্ট আছে?

এখন উপাসনা তত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক। উপাসনা কি? উপাসনা শব্দের অর্থ কি? উপাসনা শব্দের অর্থ, নিকটে বসা। আমরা কি তাঁহার নিকটে নাই? আমরা তাঁহার যত নিকটে, এত নিকটে আর কে? তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত। তবে আমরা তো সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে? কিন্তু সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে কি হইবে? আমরা কি জানিতেছি যে, আমরা তাঁহার নিকটে? কেবল বুদ্ধিগত জানায় কিছু হয় না। প্রত্যক্ষ রূপে জানা চাই। আমরা কি প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাকে নিকটে আছেন বলিয়া জানিতেছি? তাহা হইলে, আর ভাবনা ছিল না। প্রাচীন কালের ঋষিগণ তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ অনুভব করিয়াছিলেন। আমরা কি সেইরূপ অনুভব করি? তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না।

যদি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে, তিনি আমার অন্তরে বাহিরে রহিয়াছেন, যদি দেখি, তিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, তাহা হইলে উপাসনার আর কি অবশিষ্ট থাকে? মহর্ষি বলিয়াছেন ;—

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবাদ্য স উশ্ব।

তিনি অধোতে, তিনি উপরে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনি বর্ত্তমানে, তিনি পরবর্ত্তীকালে।

ঋষিগণ যাঁহাকে এমন করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা কতটুকু অনুভব করিতে পারি? তাঁহারা তাঁহাকে ওতপ্রোত ভাবে দেশে ও কালে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন। আমরা কি তাহাই করিতেছি? আমরা তাঁহাদের সন্তান বটে, কিন্তু আমরা কি তাঁহাদের উপযুক্ত সন্তান?

মহর্ষির সাধনের লক্ষ্য এই ছিল যে, পরমাত্মাকে অন্তরে বাহিরে অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না হয়, ততক্ষণ তাঁহারা মনে করিতেন না যে, তাঁহাদের তপস্যায় সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। পরমেশ্বরকে অন্তরে, বাহিরে, না দেখিলে উপাসনাই হইল না। ইহাই উপাসনার প্রকৃত লক্ষণ।

আমরা কি সেইভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি? উপাসনা শব্দের অর্থই তাই। পৌত্তলিকেরা ব্রহ্ম সত্তা প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া তাহার অভাব দূর করিবার জন্য এক কল্পিত মূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপন করেন। কিন্তু তাহাতে কি বাস্তবিক অভাব দূর হয়? কখনই না। জ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রেমময়, পূর্ণ পবিত্র পরমেশ্বরের বিশ্বব্যাপী সর্ব্বগত সত্তার পরিবর্ত্তে একটী পুত্তলিকা স্থাপন করিলে কি সে অভাব দূর হইতে পারে? ইহা নিতান্ত কল্পনা মাত্র। সত্যের অভাব কি কল্পনা দ্বারা দূর হয়? ইহা নিতান্ত ভ্রান্তি।

একান্ত চিত্তে পরমেশ্বরে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহার চিন্তা করা সর্ব্বদা আবশ্যক। এইরূপে তাঁহার সত্তা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। অনেকে বলেন যে, নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান কখন সম্ভব নহে। তাঁহারা বলেন, নিরাকার পদার্থকে কেমন করিয়া চিন্তা করিব? একটা আকার ব্যতীত চিন্তা বা ধ্যান কেমন করিয়া হইবে? কিন্তু ইহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। আমি আপনাকে আপনি কেমন করিয়া চিন্তা করিতে পারি? আমার শরীর, অবশ্য সাকার। কিন্তু আত্মা নিরাকার। আমার জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, বাসনা সকলই নিরাকার। অথচ এ সকলকে কেমন করিয়া চিন্তা করিতে পারি? আমি আপনাকে আপনি যেমন জানি, সেরূপ আর কিছুই জানি না। আমার সুখ, দুঃখ, আমার হর্ষ, আনন্দ, আমার আশা ও নৈরাশ্য, এক কথায়, আমার মনোবৃত্তিনিচয়, সকলই নিরাকার। তবে সে সকলকে কেমন করিয়া চিন্তা করি? সাকার অপেক্ষাও নিরাকারকে আমরা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। আগে সাকার, না আগে নিরাকার? নিশ্চয়ই আগে নিরাকার। নিরাকার ভিত্তির উপরে সাকার জগৎ প্রতিষ্ঠিত। এই যে জগত প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহার কথা আমাকে কে বলিয়া দিতেছে? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়, ইহাদিগকে কেমন করিয়া জানিতে পারি? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া আমাদের মন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে গমন করে, এবং তাহার সংবাদ প্রাপ্ত হয়। মন ইন্দ্রিয় বিষয়ের সংবাদ আনয়ন করে। মন যদি না থাকিত, তাহা হইলে, আমরা কখনই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়কে জানিতে পারিতাম না। তবেই হইল যে, আগে নিরাকার মন, তার পর সাকার জগৎ। এই জগৎ কেবল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। এই পাঁচটী বিষয় লইয়া জগৎ। কিন্তু ঐ পাঁচটী বিষয়কে কে বলিয়া দেয়? নিশ্চয়ই আমাদের নিরাকার মন। একথা বলিলে চলিবে না যে, আমাদের মন সাকার। সাকার কাহাকে বলে? যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ আছে, তাহাই সাকার। মনের কি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ আছে? মনের কি কোন বর্ণ আছে? তবে কেমন করিয়া বলিব যে মন সাকার?

এই মন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ আনিয়া দেয়। তাহা হইলেই হইল যে, নিরাকার মন আগে, তারপর সাকার জগৎ।

তবে কেমন করিয়া বলিবে যে, নিরাকারকে চিন্তা করা যায় না? পৌত্তলিকতা সমর্থন করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তাহার মধ্যে এই একটী প্রধান যুক্তি। কিন্তু এ যুক্তির যুক্তিযুক্ততা কিছুই দেখিতে পাই না। অনেকে বলেন যে, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের বিষয় বটেন, কিন্তু

আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। আমরা কেমন করিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিব? প্রাচীন কালের মহা মহা জ্ঞানী ও মহর্ষিগণ অবশ্য ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের মত অজ্ঞান মনুষ্য কি ব্রহ্মধ্যানে সক্ষম হইতে পারে? এ কথা আপাততঃ কিছু সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই ইহার অসারত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়।

আমি নিজে যখন জ্ঞান পদার্থ, তখন জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে কেন পারিব না? জ্ঞান, জ্ঞানকে জানিতে পারে। ভাব, ভাবকে জানিতে পারে। প্রেম, প্রেমকে জানিতে পারে। ইচ্ছা, ইচ্ছাকে জানিতে পারে। যাহা আমার আছে, তাহা দ্বারাই অন্যের মধ্যে সেই পদার্থ থাকিলে, তাহা জানিতে পারি। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" অর্থাৎ যাহা আমার নাই, তাহা অন্যের থাকিলেও, আমি জানিতে পারি না। কেমন করিয়া পারিব? বধির কি সঙ্গীত সম্ভোগ করিতে পারে? অন্ধ কি বর্ণের জ্ঞানলাভ করিতে পারে? যে ব্যক্তির দয়া নাই, সে কি বুঝিতে পারে, দুঃখীজনকে দয়া করা কিরূপ? দয়াদ্বারা আমরা দয়া বুঝি। প্রেমদ্বারা আমরা প্রেম বুঝি। জ্ঞান-দ্বারা আমরা জ্ঞান বুঝি। কোন ব্যক্তির যদি সৌন্দর্য্যের অনুভূতি না থাকে, তাহা হইলে, বহির্জগতে যত কেন সুন্দর পদার্থ থাকুক না, তিনি তাহা কখনই অনুভব করিতে পারিবেন না।

সেইরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, নিরাকার, চিন্ময়, পরমেশ্বরকে জানিতে হইলে জ্ঞানদ্বারা জানিতে হয়। সেইরূপ, প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিতে হইলে, প্রেমদ্বারা জানিতে হয়। আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিতে হইলে, আনন্দদ্বারা জানিতে হয়। যদি এমন কল্পনা করা যায় যে, কোন ব্যক্তির আনন্দ নাই; আনন্দ কাহাকে বলে, সে কখন ভোগ করে নাই; তাহা হইলে সে ব্যক্তি কখনই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে না। যার যাহা নাই, তাহা অন্য ব্যক্তিতে থাকিলেও সে জানিতে পারে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আমি নিজে যখন নিরাকার, চিন্ময় পদার্থ, তখন, অবশ্য, আমি নিরাকার, চিন্ময় পরমেশ্বরকে জানিতে পারি।

সেইজন্য, নিরাকার উপাসনা কখন সম্ভব নহে, এ কথা অত্যন্ত অযুক্ত। মানুষ, নিরাকার, চিন্ময়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত পরমেশ্বরকে অবশ্য চিন্তা করিতে পারে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা নিরাকার, পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইহা যারপর নাই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা নিরাকার, চিন্ময় পরব্রহ্মকে উপাসনা করিতে সক্ষম হই না। সেইজন্য, আমরা সাকার মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকি। আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের উপযুক্ত সন্তান বলিয়া কেমন করিয়া পরিচয় দিতে পারি? পরমেশ্বর কৃপা করিয়া এমন দিন আনিয়া দিন, যখন ভারতবাসীগণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। ইহা বড়ই লজ্জার কথা যে, আমরা উপনিষদ্‌-কার মহর্ষিগণের সন্তান পরম্পরা হইয়াও, আমরা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় সক্ষম নহি। ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রহ্মোপাসনায় অক্ষম, ইহার তুল্য লজ্জা ও দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে?

পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার

উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য পথ নাই। প্রাচীন কালের ঋষিগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সন্তান পরম্পরা হইয়া তাঁহার উপাসনায় অক্ষম, ইহার তুল্য আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?

এখন মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক। প্রথমে পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। এখন, ব্রহ্মোপাসনা কি? কি প্রকারে করিতে হয়? তাহা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। হঠাৎ যদি এক জনকে বলা যায়, ব্রহ্মোপাসনা কর, সে কি করিতে পারে? সেইজন্য, প্রথমে উহা গুরুর নিকট শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এখন, ব্রহ্মোপাসনা কেমন করিয়া করিতে হয়, ক্রমে বলিতেছি।

প্রথম, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা আবশ্যক। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কাহাকে বলে? ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্মকে জানা যায় না। ইহার তুল্য অযুক্ত কথা আর কিছু নাই। ব্রহ্ম আছেন, যদি জানিলে, তবে তিনি কেমন, কেন না জানিবে? কেমন করিয়া জানিলে যে, তিনি আছেন? যে সকল কারণে তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর, সেই সকল কারণেই তাঁহার স্বরূপলক্ষণে বিশ্বাস করিতে হইবে। যদি বিশ্বাস কর যে, এই জগতের অদ্ভুত আশ্চর্য্য কৌশল সকল, এক জ্ঞানময়ী শক্তি ব্যতীত হইতে পারে না, তাহা হইলেই তো বিশ্বাস করিতে হইল যে, একজন জ্ঞানময় কর্ত্তা আছেন। কেবল শক্তি দেখিয়া যদি মনে কর, এক জন শক্তিমান পুরুষ আছেন, তাহা হইলেই তো তাঁহাকে মানিতে হইল। মানা ও জানা, একই কথা। পরমেশ্বরের সত্তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু প্রত্যেক প্রমাণে যেমন তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়, সেইরূপ তাঁহার স্বরূপলক্ষণও নিরূপিত হয়। এবিষয়ে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে, সেইজন্য আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না।

এখন ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে কিছু বলি। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ যখন জানা হইল, তখন আর উপাসনা করিবার অসুবিধা কি? তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপলক্ষণ আমাদের উপাসনার এক একটী বিষয়। "সত্যং"। তাঁহার সত্যস্বরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায়। "জ্ঞানং" তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায়। জ্ঞানস্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, সকল ভুবনে, অন্তরে বাহিরে, তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞানশক্তির বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। তাঁহার এক একটী স্বরূপলক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিবে, এবং জগৎকার্য্যের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিবে। জ্ঞানস্বরূপের সঙ্গে জগতের জ্ঞানকৌশল, প্রেমস্বরূপের সঙ্গে জীবের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেম, তাঁহার করুণস্বরূপের সঙ্গে জীবের প্রতি তাঁহার অসীম করুণা, এইরূপ তাঁহার সমুদয় স্বরূপলক্ষণের সহিত জীবজগৎ ও জড়জগতের সম্বন্ধ বিচার করিতে হইবে।

ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রণালী আছে। যেমন, ধ্যান। ধ্যান করিতে হইলে, মনের মধ্যে তাঁহার একটী নাম লইয়া, যেমন, ওঁ, বা দয়াময় নাম বা জগদীশ্বর নাম, এইরূপ কোন একটী নাম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া তাহাই পুনঃ পুনঃ হৃদয়ান্তরে জপ করিতে

হয়। কিন্তু কেবল জপ করিলে হয় না। অর্থাৎ ঐ নামের অর্থ চিন্তার সহিত জপ করা আবশ্যক। নতুবা বিশেষ ফলের সম্ভাবনা নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, অর্থ চিন্তা ব্যতীত কেবল মন্ত্রজপ দ্বারা বিশেষ কোন ফল হয় না। অর্থ চিন্তার সহিত জপ করা আবশ্যক। যত চিত্তনিবেশ করিয়া জপ করিবে, ততই উপকার পাইবে।

স্বরূপলক্ষণ চিন্তা ও নামজপ, এই দুটী বলা হইল। আরও আছে। যেমন ধ্যান। ধ্যান কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝান আবশ্যক। আর, ধ্যান যখন এক প্রকার নয়, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্যান, অবশ্য, বিভিন্ন প্রকারে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

ধ্যানের প্রথম অবস্থায়, জগৎ কার্য্যের সহিত স্বরূপলক্ষণের সামঞ্জস্য ভাবিয়া তাহা চিন্তা করা উচিত। তাহা কিরূপে করিতে হইবে, পূর্ব্বে বলিয়াছি। এরূপ উপাসনা ও ধ্যান একই বিষয়। ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায়, হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে হৃদয়ে আসীন জানিয়া স্থিরচিত্তে তাঁহাকে ভাবিবে। তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ স্মরণ করিয়া, এবং তাঁহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে আসীন জানিয়া তাঁহাতে চিত্তকে স্থির রাখিবে। কিন্তু ইহা বড় কঠিন; সকলে পারে না। কিছুদিন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। সেইজন্য, প্রাচীনকাল হইতে যোগের যে প্রণালী চলিয়া আসিতেছে, তাহাই অবলম্বন করা আবশ্যক।

উপাসনা বিষয়ে যাহা বলিলাম, তাহাই যথেষ্ট। তারপর উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ আছে। যেমন, প্রার্থনা, আরাধনা। সর্ব্বশুদ্ধ, উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা, ধ্যান। এই চারিটী প্রণালী। তাঁহার স্বরূপলক্ষণের সহিত মিলাইয়া জগৎকার্য্যের আলোচনা করিলেই উপাসনা। যখন, তাঁহার স্বরূপলক্ষণ দেখিয়া মোহিত হইয়া উপাসক তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখনই আরাধনা। যখন আপনার আধ্যাত্মিক অভাব মোচনের জন্য তাঁহার নিকট কিছু চাওয়া যায়, তাহাই প্রার্থনা। যখন তাঁহার কোন একটী নাম, অর্থসহিত বুঝিতে বুঝিতে তাঁহার চিন্তা হয়, অথবা তাঁহার স্বরূপলক্ষণের কোন একটী লক্ষণ চিত্তের স্থৈর্য্যের সহিত লোক ভাবিতে থাকে, তখনই ধ্যান। অনেকে সেই জ্ঞানময়, প্রেমময় পুরুষকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত জানিয়া তাঁহাকে তথায় চিন্তা করেন। ইহা একপ্রকার বিশেষ ধ্যান।

উপাসনার যে চারি অঙ্গের কথা বলিলাম, তাহার প্রত্যেকটীর বিষয় ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। উপাসনা বলিলে আমরা সচরাচর ঐ চারি অঙ্গই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু আবার বিশেষ ভাবে আমরা প্রথমটীকেই বুঝি। অর্থাৎ জগতে তাঁহার মহিমা ও করুণাচিন্তা। এইটীই সহজ। প্রবর্ত্ত অবস্থার লোকে ইহা সহজেই পারে। প্রত্যক্ষ জগতে তাঁহার মহিমা ও করুণা প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তা করা। সেইজন্য ইহাকেই উপাসনার প্রথম অবস্থা বলিয়াছি। তারপর আরাধনা। আরাধনা যে কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। পরমাত্মার স্বরূপলক্ষণ সকল দেখিয়া তাহাতে মোহিত হইয়া যে, তাঁহার স্তব করা, তাহাই আরাধনা। যদি প্রাণ মন মোহিত না হয়, তাহা হইলে ভগবানকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিবার অধিকার হয় না। মুখ

বলিতেছে, 'তুমি' কিন্তু প্রাণ মনের যে অবস্থা, তাহাতে তিনি বলাই শোভা পায়। অন্তরে সেরূপ ভাব নাই, ভক্তি নাই, অথচ এমন ভাবে কথা বলা হইতেছে, যেন ঈশ্বরকে দেখিতেছেন, ইহা কখনই উচিত নহে। যতক্ষণ উপযুক্ত ভাব না হয়, ততক্ষণ 'তুমি' বলা কখনই উচিত নহে। এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

তারপর প্রার্থনা। প্রার্থনা আত্মার একটী অবস্থা। সে অবস্থাটী কি? প্রার্থনার মধ্যে তিনটী বিষয় আছে। প্রথম, আধ্যাত্মিক অভাব বোধ। তারপর, সেই অভাব দূর করিবার ইচ্ছা। তারপর, সেইজন্য পরমেশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর। এই তিনটী লইয়া প্রার্থনা। উহার একটীকে ছাড়িলেও প্রার্থনা হয় না। একটী একটী করিয়া দেখা যাউক। প্রথম, আধ্যাত্মিক অভাব বোধ। ইহা ব্যতীত কি প্রার্থনা হয়? তাহার পর, সেই অভাব দূর করিবার ইচ্ছা ব্যতীতও কি প্রার্থনা হয়? তারপর পরমেশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর। ইহা ব্যতীতও কি প্রার্থনা হয়? এই তিনটীর একটী ছাড়িলে প্রার্থনা হয় না।

তারপর ধ্যান। ধ্যান কি প্রকার, কত প্রকার, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং সে বিষয়ে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু বলি। আমাদের উপাসনার বিষয়ে যাহা যাহা বলিবার, তাহা বলিলাম। এখন আর কিছু বলিব।

সর্ব্বসাধারণের উপযোগী যে ধর্ম্মসাধন, তাহা নামজপ ও কীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই ধর্ম্ম সাধন প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এই পথ অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোকে বিলক্ষণ তৃপ্তি পায়। নিরক্ষর মূর্খ লোকেও এই প্রণালী দ্বারা ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাতে দেশের কত যে উপকার হইয়াছে, ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজেও যখন সাধারণ লোক যোগ দিবে, তখন তাহাদিগকে এই প্রণালীই অবলম্বন করিতে হইবে। যে প্রণালীতে এখন ব্রাহ্মসমাজ সকলে উপাসনা হইয়া থাকে, তাহা সে শ্রেণীর লোকের উপযুক্ত নহে। উহা ভদ্রলোক ও শিক্ষিত লোকের বিশেষ উপযোগী।

এখন আমি যোগ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যোগ এদেশের অতি প্রাচীন সাধন প্রণালী। মহর্ষিগণের মধ্যে এই প্রণালী প্রচলিত ছিল। যোগসাধন এদেশ হইতে কখনই বিলুপ্ত হয় নাই। তবে প্রাচীনকালে ইহার প্রচার অধিক ছিল। তাহার প্রমাণ এই যে, সমুদয় শাস্ত্রেই যোগের কথা পাওয়া যায়। উপনিষদ্ হইতে স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সকল শাস্ত্রেই যোগের কথা। বর্ত্তমান সময়েও যোগ লইয়া চারিদিকে আন্দোল হইতেছে। সেইজন্য যোগসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করি।

যোগের আটটী অঙ্গ। আসন, প্রাণায়াম, যম, নিয়ম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার, সমাধি। এই আটটী অঙ্গ। প্রত্যেক অঙ্গের বিষয় কিছু কিছু বলিব।

প্রথম আসন। এমনভাবে বসিতে হইবে, যাহাতে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়। চিত্তের স্থৈর্য্য না হইলে, যোগ হয় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চুরাশি প্রকার আসন স্থির করিয়া গিয়াছেন। অতি সামান্য হইতে কঠিনতর

আসন ইহার মধ্যে নিবিষ্ট আছে। কিন্তু ইহার মূল উদ্দেশ্য চিত্তের স্থৈর্য্য। যিনি যে প্রকার অভ্যাস করেন। সুখাসন, প্রথম। আসন সকলের নাম করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা অভ্যাস সাপেক্ষ, তাহার নাম করিয়া কি ফল। তবে ময়ূরাসন, গরুড়াসন, বামাসন, পদ্মাসন প্রভৃতি চুরাশি প্রকার আসন চলিত। সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহা [illegible] দেখা যায়।

আসন সম্বন্ধে আমি অধিক বলিব না। তাহার কারণ ইহার অভ্যাস, যোগসিদ্ধি বিষয়ে একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। তবে চুরাশি প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকার আসন করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ যে সুখাসন, তাহাতেই কাজ হইতে পারে।

তারপর প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অর্থ কি? প্রাণ বায়ুর বিস্তার। নিশ্বাস প্রশ্বাসে আমরা যে বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা যে সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়, এরূপ নহে। উহা হৃদয় পর্য্যন্ত যায়। তাহার অধিক যায় না। তার পর যাহা যায়, তাহা এ বায়ু নয়। উহাকে ইংরেজী ভাষায় বলে Magnetic current. উহা এক প্রকার সূক্ষ্ম তাড়িত। ঐ সূক্ষ্ম তাড়িতের স্রোত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা যোগের বিশেষ সাহায্য হয়। প্রাণায়াম নানা প্রকার। তন্মধ্যে সাত প্রকার প্রধান। এরূপ কোন কোন সহজ প্রাণায়াম আছে, যাহাতে বিশেষ কষ্ট হয় না, অথচ উপকার হয়।

কেহ কেহ প্রাণায়ামের বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। একটী তর্ক এই যে, উহা শারীরিক সাধন। শারীরিক সাধন কেন করিব? আধ্যাত্মিক সাধনই করা আবশ্যক। একথা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। শরীরের সঙ্গে আত্মার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, শরীরকে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় আনিতে না পারিলে, আত্মার ক্রিয়াও সুন্দররূপ হয় না। শরীরের পীড়া হইলে, সে অবস্থায় কি আধ্যাত্মিক সাধন প্রকৃতরূপ হইতে পারে? পীড়িত অবস্থায় কি ভাল করিয়া উপাসনা হয়? আধ্যাত্মিক সাধনে শারীরিক, ভৌতিক, বা বাহ্যিক বিষয়ের সাহায্য সর্ব্বদা লইতে হয়। আমরা যে সঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ করি, তাহা কি শারীরিক ও বাহ্যিক নহে? শরীরের দ্বারা সঙ্গীতাদি হইয়া থাকে; এবং বাদ্য যন্ত্রাদি বাহ্য বিষয়, তদ্বিষয়ে সাহায্য করে। এই সকল শারীরিক ও বাহ্য বিষয় কি আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাহায্য করে না? সুতরাং প্রাণায়ামকে শারীরিক সাধন বলিয়া অগ্রাহ্য করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। প্রাণায়াম বিষয়ে আর অধিক কি বলিব?

তারপর যম। যম কাহাকে বলে? অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনকেই যম বলে। সচরাচর লোক ইহাকে সংযম বলে। আপনার মনোবৃত্তিকে দমন করিতে না পারিলে, কেমন করিয়া যোগ হইবে? পরমেশ্বর, মনুষ্যকে এমন এক শক্তি দিয়াছেন, যদ্দ্বারা মনুষ্য আপনাকে আপনি শাসন করিতে পারে। ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশে, আপনার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলকে দমন করা, এবং উচ্চ বৃত্তি গুলিকে কার্য্যে নিযুক্ত করা, একান্ত আবশ্যক। ইহারই নাম যম বা সংযম।

তারপর নিয়ম। নিয়ম অর্থ, নীতি। নীতিপালন ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না। সকল

ধর্ম্মের ভিত্তিই নীতি। সত্য, ন্যায়, দয়া, সৌজন্য, এই সকল নীতি। মূলে এসকল না থাকিলে কি লইয়া ধর্ম্ম হইবে? সেইজন্য অষ্টাঙ্গ সাধনের এক অঙ্গ নিয়ম।

তারপর, ধ্যান। ধ্যান অতি প্রধান বিষয়। ধ্যান কাহাকে বলে? ধ্যান দুই প্রকার। প্রথম, বহির্জগতে তাঁহার মহিমা ও করুণা দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তা করাই ধ্যান। ইহাই সহজ। প্রথমে, এইরূপ করাই আবশ্যক। প্রবর্ত্ত অবস্থায় এ প্রকার করিলে সহজে অগ্রসর হওয়া যায়।

তারপর, দ্বিতীয় প্রকার ধ্যান এই যে, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত পরমেশ্বরকে অন্তরে জানিয়া তথায় তাঁহার সত্তা চিন্তা করা। এই যে দ্বিতীয় প্রকার ধ্যান, ইহাই প্রকৃত ধ্যান। প্রথম প্রকার ধ্যানকে ধ্যান বলা হয় বটে, কিন্তু উহা বাস্তবিক ধ্যান নহে। দ্বিতীয় প্রকার ধ্যানই ধ্যান। তিনিই আত্মারূপে অন্তরে প্রকাশিত। ইহা জানিলে ধ্যানের বিশেষ সুবিধা হয়। জীবাত্মা তাঁহারই প্রকাশ। জীবাত্মাকেই তাঁহার প্রকাশ জানিয়া প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাকে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়। আত্মজ্ঞানের মধ্যদিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। আপনাকে জানিলেই তাঁহাকে জানা হয়। আত্মজ্ঞান রূপ দ্বার দিয়া পরমাত্মার নিকট যাওয়া যায়। আমার ভিতরে যে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা সেই বিশ্বব্যাপী, মহা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র।

তারপর, ধারণা। ধ্যান ও ধারণায় প্রভেদ কি? এই প্রভেদ যে, বিশেষ করিয়া কোন একটী ভাব বা জ্ঞানকে ধরিয়া রাখাই ধারণা। একটী ভাব বা জ্ঞানকে ধরিয়া রাখিতে হইবে। তাহার প্রতি চিত্তের একান্ত স্থৈর্য্যের দ্বারা তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া থাকা। ধ্যান ও ধারণার মধ্যে যে বিশেষ কিছু প্রভেদ আছে, এরূপ বোধ হয় না। তবে, পরিমাণের প্রভেদ। সমাধির অবস্থায় যখন সম্পূর্ণরূপে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, তখনই প্রকৃত ধারণা।

তারপর প্রত্যাহার। প্রত্যাহার কি? একত্রীভূত পাঁচটা বিষয় হইতে একটীকে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবাই প্রত্যাহার। আমাদের মন, রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ, এই পাঁচটী বিষয় লইয়া রহিয়াছে। বহির্জগতের এই পাঁচটী বিষয় হইতে মনকে ক্রমে ক্রমে অপসারিত করিয়া ব্রহ্মেতে লইয়া আসিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যাহার আবশ্যক। আমাদের মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া ক্রমাগত বহির্জগতে যাইতেছে। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বহির্জগতে রূপের নিকট যাইতেছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া ক্রমাগত শব্দের নিকট যাইতেছে। রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া রসের নিকট যাইতেছে। এইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ পঞ্চ দ্বার দিয়া পঞ্চ বিষয়ের নিকট যাইতেছে। এই মনকে টানিয়া রাখা, যাইতে না দেওয়াই প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হইলেই সমাধি।

এখন সমাধি কি, সেই বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। সমাধিই প্রধান বিষয়। সমাধিই লক্ষ্য। সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে আত্মা নিমজ্জিত হওয়ার নামই সমাধি। প্রাচীনকালের মহর্ষিগণ সমাধিস্থ হইয়া পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন লোক সকল আছেন, যাঁহারা সমাধিস্থ হইয়া

ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন। এই সমাধি অতি অপূর্ব্ব অবস্থা। অনেক যত্নে, অনেক তপস্যায় ইহা লাভ করা যায়। অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ইহা ঘটে। যখন পরব্রহ্মে সম্পূর্ণ চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, তখনই সমাধি হয়। সেই সময় সাধকের বাহ্যজ্ঞান লেশমাত্র থাকে না।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, সমাধির অবস্থা, মূর্চ্ছা মাত্র। কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি। সমাধির অবস্থায় উজ্জ্বল জ্ঞান ও আনন্দ থাকে। সে আনন্দের তুলনা নাই। কোন প্রকার সাংসারিক আনন্দের সহিত সে আনন্দের কোনক্রমেই তুলনা হয় না। ইহাই অষ্টাঙ্গ সাধন। সমাধিই ইহার চরম। ইহা নিশ্চয় যে, উন্নতি অনন্ত। কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি, তাহা এই সমাধি পর্য্যন্ত। তাহার পর কি আছে না আছে, তাহা আমরা কি বলিব? অনন্তকালের কথা সেই অনন্তপুরুষ জানেন। আমরা কীটাণুকীট, আমরা তাহার কি জানি? যখন জানাইবেন, জানিব। তাঁহার পদতলে বসিয়া কত নব নব তত্ত্ব শিক্ষা করিব। পিতা যেমন তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে নূতন নূতন পাঠ শিক্ষা দেন, সেইরূপ, তিনি আমাদিগকে কত নূতন পড়া পড়াইবেন। এখন এই পর্য্যন্ত।

নব বর্ষ।

হে বর্ষ, দুর্লভ শান্তি আন এ জীবনে,
আন সুধারসভরা রঙ্গিল রসাল!
আন রশ্মি সমুজ্জ্বল তপন কিরণে,
ভরি মধুগন্ধে বন ঘেরি ফুলজাল!
প্রাবৃট্ গগনে ঘন মেঘের ছায়ায়,
জুড়াও মেদিনী'বুক ঢালি জলধার;
দিগন্ত বিস্তৃত সিক্ত প্রান্তর কায়ায়,
বহাও হিল্লোলে শ্যাম শস্যের সম্ভার!
ফুটাইও শারদের জ্যোৎস্না সুন্দর,
করুণ অরুণ রাগে তরুণ নলিনী;
হেমন্ত সন্ধ্যার নব রাকা শশধর,
শীতের সুশান্ত নিদ্রা প্রশান্ত যামিনী!
এস গো বসন্ত লক্ষ্মী চিররুচি হাসে,
পুনঃ হর্ষে যেন চিত তোমারে সম্ভাষে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

জনক—উত্তররামচরিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—কর্ম্মণৈবহি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। অর্থাৎ কর্ম্মযোগ প্রভাবে জনকাদি ঋষি মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জনকঋষির চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যাওয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লেখকের বিড়ম্বনা মাত্র। যোগের [illegible] কথা নাই বলিলাম, সার্ব্বজনীন প্রেমে, শ্রেষ্ঠ জনের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠায়, মধুর সম্ভাষণে, আত্মীয় জনের ক্লেশে সমবেদনায়, ক্রোধাদি রিপুদলনে, রাজর্ষি প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্য। তাঁহার বাক্যাবলী এতই মূল্যবান ও হৃদয়স্পর্শী যে, তাহার এক একটী বাক্যের তরঙ্গমধ্যে যেন

সেই শক্তিধর পুরুষের অনন্ত তেজঃকণা বিস্ফুরিত হইতেছে।

অদৃশ্য-স্থান-জাত একটী প্রকাণ্ড মহীরুহের বিলম্বিত পত্র, পল্লব, শাখা, উপশাখা পথিমধ্যস্থ পথিকের প্রত্যক্ষীভূত হইলে সে যেমন দূরস্থ বৃক্ষের সামান্য অবয়ব দেখিয়াই উহার উচ্চতা ও বিস্তার কল্পনা করিয়া লইতে পারে, অনন্তবিস্তারী তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ বারিধির যে কোন স্থান পরিদর্শন করিয়া যেমন তাহার সুদৃঢ় ব্যাপিত্ব ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায়, তদ্রূপ, জনক-হৃদয়-সাগরের একটী বাকপরম্পরা-গ্রথিত উর্ম্মিমালা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব, গভীরত্ব ও অপরিমেয়ত্ব কল্পিত হইতে পারে। সকল অবস্থায়ই জনক তাঁহার আদরিণী কন্যা সীতাকে বালিকার ন্যায় স্নেহ করিতেন, বালিকাবৎ দেখিতেন। বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা পিতার নিকট বালিকা বই কি? বালিকার উপর স্নেহ প্রবল, বালিকা আত্মরক্ষণে অক্ষমা, আব্দারপ্রিয়া, পিতামাতার নয়নানন্দবর্দ্ধক। বালিকা স্বর্গের সৃষ্টি। সীতা বাল্যাবস্থায় যখন অহেতুক রোদন বা হাস্য করিতেন, তখন তাঁহার সুন্দর মুখকমল, তাঁহার কুন্দ-কোমল-বিরল-দশনপংক্তি, তাঁহার অসামঞ্জস্য ললিত-মধুর-বাক্যাবলী, জনকের অন্তঃকরণে অপরিসীম আনন্দ প্রদান করিত। তিনি সীতার ঐ সব ভাবভঙ্গিতে বড়ই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন, এত তন্ময় যে, সীতার যৌবনাবস্থায়ও উহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। জনকের হৃদয়ে সীতার ঐ বাল্যভাবের আধিপত্য জনককে অনেক সময় অযোধ্যায় সীতার সম্মুখে ফিরাইয়া নিয়া আসিত। জনক বাল্মীকির আশ্রমে বসিয়া সীতার নির্ব্বাসন-বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, সীতা নিষ্কারণ নির্ব্বাসিতা হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া জনকের হৃদয়ে অপার্থিব স্নেহরাশি উথলিয়া উঠিল। ক্রমান্বয় সীতা সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা স্মৃতি-পথারূঢ় হইল। তিনি এতদূর তাহাতে সঞ্চালিত হইলেন যে, সীতাশোক তাঁহার নিকট অসম্বরণীয় বোধ হইল। আত্মহত্যা যদি পাপানুষ্ঠান না হইত, তাহা হইলে তিনি সীতাশোকে আত্মহত্যা করিতেও বুঝি কুণ্ঠিত হইতেন না। রঘুনন্দনের সীতা বর্জ্জন জনকের হৃদয়ে কিরূপ লাগিয়াছিলঃ—

অন্ধতামিশ্রাহ্যসূর্য্যা নাম তে লোকাস্তেভ্যঃ
প্রতিবিধীয়ন্তে যে আত্মঘাতিন ইতেবমৃষয়ো-
মন্যন্তে।

ঋষিরা মনে করেন যে, আত্মঘাতীরা অন্ধতামিশ্রা অসূর্য্য নামক লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজর্ষি জনক কেবল ঋষিদের বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। কতদূর যন্ত্রণার আতিশয্যে জনকের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ ঋষির আত্মঘাতের জন্য চিত্ত বিভ্রান্ত হইতে পারে, ইহা সহজেই অনুমেয়। এই স্নেহ-পারাবারের ন্যায় অতলস্পর্শ। সীতা নিষ্কারণ ত্যক্তা, পতিলাঞ্ছিতা, তাঁহার এই যন্ত্রণা মুখব্যাদান করিবার নহে। পতি পত্নীকে নির্ব্বাসিত করিলে পত্নী কি আর অন্যের নিকট পোড়ামুখ দেখাইতে পারে? তাঁহার নীরব রোদনই সার হয়। যে রোদনে পরে দুঃখিত হইয়া দুইটী সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিবে না, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবে না, সে রোদন বড়ই অন্তর্দাহকারী, বড়ই ভীষণ। পরদুঃখকাতর জনক বুঝিলেন, সীতার রোদন এই শ্রেণীয়, তাই তিনি চিন্তাকুলিত হইয়া বলিলেনঃ—

ঈদৃশস্তে নির্ম্মাণভাগঃ পরিণতঃ যেন লজ্জয়া স্বচ্ছন্দমাক্রন্দিতুম ন শক্যতে, হা হা পুত্রি!

ভগবান তোমাকে এইরূপ ভাবেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, লজ্জা বশতঃ তুমি স্বাধীন ভাবে ক্রন্দন করিতে পারিতেছ না।

জনকের দৃষ্টি কেবল সীতার বাহ্যিক অবয়বের উপর সংনিবদ্ধ ছিল না, অন্তরখানির উপরও ছিল। প্রকৃত যে ভালবাসিতে জানে, সে কেবল প্রিয়পাত্রের শারীরিক মঙ্গল কামনা করে না, মানসিক উন্নতিরও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। সীতা হিংস্র জন্তু-সমাকুল অরণ্যবিহারিণী, তাহার এই অবস্থায় যে জীবন নিরাপদ নহে, জনক কেবল এই চিন্তায়ই অস্থির হইলেন না, সীতা যতকাল বাঁচিয়া থাকিবে, তাঁহার মন বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তির বিষজ্বালা অপেক্ষাও তীব্রতর যাতনা অনুভব করিবে, জনক এখন সেই ভাবনায়ই অস্থির। রাজর্ষির এই চিন্তাটী বড়ই উদারতা ও স্নেহ-জ্ঞাপক। জনক যে সীতা হৃদয়ে প্রবেশ দক্ষ, জনকের এই ভাবটী দ্বারা তাহা ভালই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সীতার নিকলঙ্ক চরিত্রে কেবল জনক কেন, বসুন্ধরা প্রভৃতি বিশ্বাসবতী ছিলেন, সীতার এই দশা বিপর্য্যয় দর্শন করিয়া তাঁহারাও যেন নীরবে সহ্য করিতেছেন, এজন্য তাঁহাদের উপর জনকের ক্ষোভ উদ্রিক্ত হইল। তিনি তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—

ত্বং বহ্নির্মুনয়ো বশিষ্ঠগৃহিণী গঙ্গা চ যস্যাবিদু-
র্মাহাত্ম্যং যদি বা রঘোঃকুলগুরুর্দেবঃ স্বয়ং ভাস্করঃ।
বিদ্যাং বাগিব যামসূত ভগবতী, শুদ্ধিং গতায়াঃপুর-
স্তস্যাং ত্বং দুহিতুস্তথা বিশসনং কিং দারুণে! মৃষ্যথাঃ॥

তুমি অগ্নি, বাল্মীকি, অরুন্ধতী, গঙ্গা, রঘুকুলদেব স্বয়ং ভাস্কর সীতার মাহাত্ম্য জানিয়াছি, তুমি যে সীতাকে, বাগ্বাদিনী বিদ্যার ন্যায় জন্ম দিয়াছ, হে কঠিন হৃদয়ে! শুদ্ধিপ্রাপ্তা সীতার সেই দারুণ নির্ব্বাসন তুমি কিরূপে সহ্য করিতেছ?

জনক পূর্ব্বে একাকী রোদন করিয়া মানসিক কান্তি দূর করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে মনক্ষোভ নিবারিত না হওয়ায়, সীতা-গুণ-গ্রাহীগণের নিকট সীতা-নির্ব্বাসন-দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা কিরূপে সীতার প্রতি এ নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিয়াছ?" এস্থলে একটী সুন্দর ভাব জনকের বাক্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। যে কারণে পিতা সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ, জনকের স্নেহ ঠিক সেই কারণ হইতেই উদ্ভূত নহে। সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ স্বাভাবিক, এখানে জনক সেই স্বাভাবিক স্নেহপরবশ হইয়াই কেবল সীতা-নির্ব্বাসনে মনক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন না। সীতার অলোক-সামান্য গুণগ্রহণও তাঁহার মনক্ষোভের একটী প্রধান কারণ। সীতার গুণ-সৌরভ যে কেবল জনকের চিত্তই প্রফুল্ল করিয়াছিল, এমন নহে, সূর্য্য, বাল্মীকি, বসুন্ধরা, অরুন্ধতী প্রভৃতিও তাঁহার গুণসৌরভে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, জনক তাই সর্ব্বলোক-প্রশংসিতা নিরপরাধিনী সীতার জন্য বিলাপ করিতেছেন। জনক এখানে সন্তানের স্নেহ দেখাইতেছেন না, এখানে সীতাগুণ বিমুগ্ধতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত প্রেম, জনক এই প্রেমের উজ্জ্বল মূর্ত্তি। কতদূর গুণে সঞ্চালিত হইলে, এতদূর প্রেমের উচ্চ-সোপানে অধিরোহণ করা যায়, তাহা কঞ্চুকীর প্রতি জনকের এই তেজঃপুঞ্জ বাক্যটী দ্বারাই নিরূপিত হইবে।

আঃ কোঽয়মগ্নির্নামাস্মৎ প্রসূতি পরিশোধনে, কষ্টমেবং বাদিনা জনেন রামপরিভূতা অপি বয়ংপুনঃ পরিভূয়ামহে।

আমার সন্তানের বিশুদ্ধি জ্ঞাপন করিতে অগ্নি কে? একেত রামের নিকট পরাভূত হইয়াছি, তাহাতে আবার এইরূপ (অগ্নি-শুদ্ধির কথা উল্লেখকারী) লোকের নিকট পরাভূত হইতেছি।

সীতার অপেক্ষা যে অগ্নির প্রভুত্ব অধিক, জনক ইহা স্বীকার করিলেন না। এই স্থানেই জনকের ব্রহ্মতেজঃ উদ্দীরিত হইল। সীতার পরিশুদ্ধতা সম্বন্ধে জনক এতই দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ যে, তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ পক্ষে তিনি অগ্নিকে অতি লঘু মনে করিলেন, ইহাই আত্মমর্য্যাদা-শীলের আত্মমর্য্যাদার কথা। সীতার পবিত্রতার মানদণ্ড অগ্নির সঙ্গে তুলনা করিয়া রাজর্ষি জনক সীতার সম্মান রক্ষা করিলেন। কোন বিষয় প্রগাঢ় ভাবে চিন্তা করিলে, সেই চিন্তার ফলে চিন্তা-শীল ব্যক্তির চরিত্রে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, রাজর্ষি জনকের চরিত্রেও তাহার দুই একটী লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

রাজর্ষির হৃদয় ক্রমে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য্যবিচ্যুত হইলেন না। তিনি আমাদের ন্যায় চরিত্র-বিশ্লেষণে অনভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি স্বীয় অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্দীপনা দেখিয়া বলি-লেন :—

এতদ্বৈশসঘোর বজ্রপতনং শশ্বন্মমোৎপশ্যতঃ
ক্রোধস্যজ্বলিতুংধগিত্যবসরশ্চাপেন শাপেনবা।

সীতা নির্ব্বাসনরূপ বজ্রপতন নিরন্তর চিন্তা করায় আমার ক্রোধ, শাপ বা অভি-সম্পাতদ্বারা ধগ এইরূপ শব্দ করিয়া জ্বলিবার উপযুক্ত সময়।

ক্রোধে জনকের চিত্ত একটু বিক্ষুব্ধ হইল বটে, জনক তাহাতে বশীভূত হইলেন না। কেবল সীতাই কি তাঁহার প্রিয়, শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার প্রজা ও পৌরজন প্রভৃতি কি তাঁহার কিছুই নহে? সীতার জন্য জগতের মঙ্গলা-ধার শ্রীরামচন্দ্রকে অভিসন্তপ্ত করিলে জনকের শান্তি হইবে না, উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হইবে না, তাই জিতেন্দ্রিয় জনক বিদ্যুৎতুল্য প্রভাবশালী ক্রোধাগ্নি অচিরে হৃদয়ে বিলীন করিলেন, সীতার ক্লেশে জনক প্রচণ্ড কোপে উত্তেজিত হইলেন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি পবিত্র স্নেহধারা সেই ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিয়াছিল। তখন জনক প্রাণাধিক শ্রীরামচন্দ্রের গুণ-পণার কথা স্মরণ করিয়া স্নেহবশতঃ বলি-লেন :—

শান্তং বা রঘুনন্দনে তদুভয়ং তৎপুত্রভাণ্ডংহিমে,
ভূয়িষ্ট দ্বিজবালবৃদ্ধবিকল স্ত্রৈণশ্চ পৌরজনঃ।

চাপ এবং শাপ রঘুনন্দনের উপর প্রযোজ্য নহে। কারণ সে আমার পুত্ররূপ স্নেহের পাত্র। পৌরজন, বহুদ্বিজ, শিশু, বৃদ্ধ, খঞ্জ, কুব্জ, অন্ধ, বধির, স্ত্রীসমূহ আমার শাপ বা চাপের যোগ্য নহে।

যে জনক সীতাশোকে অভিভূত হইয়া আত্মহত্যার সংকল্প করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন, সেই জনকই অধুনা সীতার দণ্ডদাতা-গণকে শাস্তি দিতে সমর্থ হইয়াও স্নেহবশতঃ দয়া প্রকাশ করিলেন, যে ক্রোধের প্রলয়মেঘ জনকের হৃদয়খানি আবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই মেঘস্নেহ-বাত্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে তিরোহিত হইল। জনক যে অনন্যসাধারণ সংযত পুরুষ, এই ক্রোধদলন ব্যাপারে যেমন কবি আমাদিগকে উহার পরিচয় দিয়া মোহিত ও স্তম্ভিত করিলেন, তেমনি শ্রীরামচন্দ্রও তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতি যে জনক সীতার ন্যায়ই প্রগাঢ় স্নেহসম্পন্ন ছিলেন, তাহাও অভিব্যক্ত হইল। ইন্দ্রিয়ের আক্রমণ, বা আধিপত্য সকলের হৃদয়েই কোন না কোন

সময় সূচিত হইতে পারে, যে তাহা দ্বারা চালিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের গোলাম। যিনি তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া কর্ত্তব্যপথে প্রধাবিত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সংযমী বা সাধু পুরুষ।'

জনকের ন্যায় চরিত্র কোন দেশের কবি এপর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কিনা জানিনা, দেব চরিত্র ও মানব চরিত্রের সংমিশ্রণেই যেন এই জনক ঋষির চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে।

দশরথের প্রতি জনকের সৌহার্দ্দও অপরিসীম, কৌশল্যাকে বাল্মীকির আশ্রমে দর্শন করিয়া জনকের হৃদয়ে দশরথের সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। জনক পূর্ব্বে দশরথ ও কৌশল্যার কত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা প্রকাশছলে বলিতে লাগিলেন।

যদস্যাঃ পত্যুর্ব্বা রহসি পরমং দূষিতমভূ
দভবং দম্পত্যোঃ পৃথগহমুপালম্ভ বিষয়ঃ
প্রসাদে কোপে বা তদনুমদধীনো বিধিরভূ-
দলম্বা তত্ স্মৃত্বা দহতি যদবস্কন্দ্য হৃদয়ম্।

এই কৌশল্যা বা তাঁহার পতি দশরথের নির্জ্জনে যে প্রণয় কলহ উপস্থিত হইত, আমি দম্পতির দোষগুণ সমালোচনার পাত্র হইতাম, তাঁহাদের দোষগুণ শ্রবণান্তর পরস্পরের প্রসাদে বা কোপে উহার বিধিব্যবস্থা আমার ইচ্ছাধীন থাকিত, সে সব বিষয় স্মরণ নিরর্থক। ঐ স্মৃতি আমার হৃদয়কে আক্রমণ করিয়া দগ্ধ করিতেছে।

দশরথ ও তাঁহার পত্নীর সঙ্গে জনকের কিদৃশী ভালবাসা ছিল, ঐ উপরোক্ত শ্লোকটী দ্বারা তাহার পরিমাণ করা যাইতে পারে। দম্পতির কলহ নিভৃত স্থানেই হইয়া থাকে, সে কলহ ভঞ্জন করার ভার সকলের উপর অর্পিত হইতে পারে না। গৃহধর্ম্মে পত্নী ও পতি একযোগে ধর্ম্মাচরণ করিয়া মুক্তিকামী হয়, পরস্পরের মধ্যে সাময়িক বিবাদ হইলেও ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত ঘটে, রাজর্ষি জনক তপঃনিষ্ঠ হইয়াও দশরথ ও তাঁহার পত্নীর বিবাদ ভঞ্জন করিয়া গৃহধর্ম্মের সাহায্য করিতেন, জনক একদেশদর্শী ছিলেন না, পত্নী কিম্বা পতির অপরাধ প্রমাণীত হইলে মীমাংসাকালে তিনি মধ্যস্থ হইয়া পরস্পরের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন। জনক কেবল সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের করে অর্পণ করিয়াই কর্ত্তব্যতা শেষ করেন নাই; সীতার শ্বশুরালয়ে যাহাতে নিত্য শান্তি বিরাজ করে, তজ্জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেন। জনক ও দশরথের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল, উহা বড়ই উদারতাপূর্ণ। জনকের কথায়ই তাহা অভিব্যক্ত হইবে।

কন্যায়াঃ কিল পূজয়ন্তি পিতরো জামাতুরাপ্তং জনম্
সম্বন্ধে বিপরীতমেব তদভূদারাধনং তে ময়ি।
ত্বং কালেন তথাবিধোঽপ্যপহৃতঃ সম্বন্ধ বীজস্তদ্
ঘোরেঽস্মিন মম জীবলোক নরকে পাপস্য ধিগ্ জীবিতম্॥

কন্যার পিতা জামাতার আত্মীয় জনকে পূজা করেন, আমার সম্বন্ধে দশরথের আরাধনা বিপরীত। কালক্রমে সেই সম্বন্ধবীজ কেবল মাত্র অপহৃত হয় নাই, সেই বৈবাহিক সম্বন্ধের বীজ সীতা অপহৃত হইয়াছে। দারুণ এই জীবলোক-নরকে আমি শোকে মলিন, আমার জীবনধারণে ধিক।

উপযুক্ত লোকের প্রতিও রাজর্ষির ভক্তি অনন্যসাধারণ। রঘুবংশের গুরুপত্নী অরুন্ধতীকে বাল্মীকির আশ্রমে সাক্ষাৎ পাইয়া প্রণাম করার সময় জনক ভক্তিগদ্গদ স্বরে বলিলেন—

যস্যা পুত্রস্ত্বো নিধিরপি পবিত্রস্য মহসঃ
পতিস্তে পূর্ব্বেষামপি খলু গুরুণাং গুরুতমঃ।
ত্রিলোকীমঙ্গল্যামবনিতললোলেন শিরসা
জগদ্বন্দ্যাং দেবী মুষসামিব বন্দেভগবতীম্॥

প্রাচীন গুরুগণের পূজ্যতম পবিত্র তেজের আধার তোমার পতি বশিষ্ঠ যাহার সংস্পর্শে আত্মাকে পবিত্র মনে করেন, সেই ত্রিলোকের মঙ্গলকারিণী জগদ্বন্দ্যা ভগবতীকে প্রাতঃ সন্ধ্যাদেবীর ন্যায় ভূমিতে নতশির হইয়া প্রণাম করিতেছি।

জনকের ভক্তি বৃত্তির স্ফূর্ত্তি দেখিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অরুন্ধতী যেমনই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রমণী, জনকের বাক্যগুলিও তেমনি সর্ব্বগুণের পরিচায়ক। রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ লোকের সম্মুখে এতই নত হইতে পারিতেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপে যেন স্বকীয় পদগৌরব ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের সেবায় তন্ময় হইয়া প্রীতিলাভ করিতেন।

সীতার প্রতি স্নেহ, রঘুবংশের মঙ্গল কামনা, গুরুজনের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি জনকের চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান উপাদান ছিল। জনকের মানব-চরিত্রের উপর দেবচরিত্রের রং ফলাইয়া মহাকবি ভবভূতি অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন, আমরা রাজর্ষির চরিত্রে কতকগুলি প্রদীপ্ত গুণালোক দেখিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

৺রমেশচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার গ্রন্থনিচয়। (১)

বাল্যে রমেশচন্দ্র।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থেরই উন্নতি ও পতন আছে। ঐ যে নক্ষত্রগুলি দেখিতেছ, উহাদের কোনটী কখন ম্লান হইতেছে, কোনটী বা কখন উজ্জ্বল হইতেছে। এই পৃথিবীতে কোথাও মরুভূমি সুন্দর অলকা সদৃশ নয়নাভিরাম নগরে পরিণত হইতেছে, কখন বা সুন্দর অমরাবতী সদৃশ সুদৃশ নগর বিজন অরণ্যে পরিণত হইতেছে। জীব ও মানব জগতেও এইরূপ উত্থান পতনের চির ক্রীড়া দেখা যায়। এই উত্থান পতন যেন জগতের ক্রিয়া, এই উত্থান পতনের কারণ কি?

মানব, পশু ও দেবতার মধ্যবর্ত্তী জীব। ইহার উচ্চতর আদর্শ দেবতা ও নিম্নতর আদর্শ পশু। যখন মানব যে আদর্শের দিক অধিকতর ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন মানবের সেই দিকেই গতি হয়। মানব যখন দেব আদর্শ ধরিয়া কার্য্য করে, তখন মানবের দেবত্ব প্রতিফলিত হয়, তখন মানবের উন্নতি-স্রোত প্রবাহিত হয়। মানব যেন দেবত্বের দিকে অধিকতর অগ্রসর হয়। ইহাই মানবের উন্নতি ক্রিয়া, ইহাই মানবের প্রকৃত সুখের মূলীভূত কারণ। কিন্তু মানবের পাশবিক আকর্ষণও কম শক্তিশালিনী নহে, অনেক সময়ে এই পাশবিক আকর্ষণে দেব প্রভাব অন্তর্হিত হয়, পাশবিক সুখ ও আমোদে মানব মত্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানবের সমষ্টিগত ভাবে জাতীয় অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব ও ইন্দ্রিয়গণের উদ্দাম প্রবৃত্তির সজীব ক্রিয়া লক্ষিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মানবের ইহলৌকিক ও পার-

লৌকিক অধঃপতন ঘটে ; ক্রমে মানব ঘোর অজ্ঞানতা-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়, আর মানব-চেষ্টায় তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায় থাকে না। তখন ভগবানের আসন টলে। ভগবান যেন মানবের দুরবস্থায় ব্যথিত হন। মানবের সেই অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য ভগবানের নিজ শক্তির জ্যোতি মানব সমাজে বিকশিত হয়। ইহাই অবতার। এই শক্তি বিকাশেরও পরিমাণ আছে, কখন সামান্য ভাবে, কখন বা সমধিক রূপে ভগবানের এই বিভূতি বিকশিত হইয়া মনুষ্যের অজ্ঞানতা দূর করে। যখন ভগবানের এই প্রভা অধিকতর রূপে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহা ভগবানের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল।

অবতার না হইলেও সাধারণ মানবেও এই শক্তির ক্ষীণ আলো লক্ষিত হয়। সেই প্রভায় মানব অজ্ঞানতা রূপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকে; সমাজে সজীবতা লক্ষিত হয়, জাতীয় অবসাদ বিদূরিত হয়, মানব সেই আলোক দৃষ্টে পাশব প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া দৈবশক্তির দিকে প্রধাবিত হয়। সাধারণত ইঁহারা সমাজ-সংস্কারক বা জাতি-রক্ষক আখ্যায় অভিহিত হন। লুথার, ম্যাট্‌সিনী, ওয়াশিংটন, বিষমার্ক, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও রমেশচন্দ্র ইহার উদাহরণ স্থল।

দিল্লীর প্রভাব চির অস্তমিত, মহারাষ্ট্র [illegible]ন ক্রিয়ার অবসান হইয়াছে। [illegible] ভারত শাসন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজ-প্রচারিত ইংরাজী আইন কানুনে দেশ প্লাবিত। প্রতীচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য [illegible]বের স্রোত ভারতে প্রবাহিত। কিন্তু সপ্তশত বর্ষ পরাধীনতায় দেশ রাজনীতি শাস্ত্রে অজ্ঞ। ভারতে রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। ইংরাজ-দত্ত রাজনৈতিক অনুগ্রহ লাভের পাত্রের অভাব। লোক সব রাজার শাসনের গুণ গ্রহণে অসমর্থ। দুই একটী ক্ষীণ নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোক বিস্তৃত বঙ্গে দেখা দিয়াছে, কিন্তু সুবিস্তীর্ণ বঙ্গে তাহা ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ক্ষীণ রশ্মিবৎ কখন দৃষ্ট, কখন বা অদৃষ্ট। সপ্তকোটী বাঙ্গালীর পক্ষে সে ক্ষীণ আলো একেবারেই গণনীয় নহে। বাঙ্গালী কোন্ আদর্শ ধরিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে? এহেন সময়ে রমেশচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের আবির্ভাব। বঙ্গ-রাজনৈতিকক্ষেত্রে যেন তিন ঐশীশক্তির ত্রিধারা প্রবাহিত। বাঙ্গালীর সুপ্রভাত! বঙ্গে নবযুগের নবনায়কগণের অভ্যুদয়ে বঙ্গে নবস্রোত প্রবাহিত। কুসংস্কার রূপ অজ্ঞানতা বিদূরিত।

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "Child is the father of man" বাস্তবিকই মানব প্রকৃতির প্রথম নিদর্শন আমরা বালক চরিত্রেই দেখিতে পাই। সেই কারণেই আমরা বীর Nelson বালকের মুখে শুনিতে পাই, "Grand mother, what is fear, I never have seen it"? সেই জন্যই বালক শ্রীরামচন্দ্র শান্তিপ্রদ দীর্ঘতর পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপদসঙ্কুল তারকা-নিকেতনের পার্শ্ববর্ত্তী পথই অবলম্বনীয় মনে করিয়াছিলেন। আমাদের রমেশচন্দ্রের বাল্য জীবনেও নির্ভীকতা, স্থির-প্রতিজ্ঞতা ও অসাধারণ কার্য্য তৎপরতা দেখিতে পাই। যাহা সৎ বলিয়া তাঁহার জ্ঞান জন্মিত, তাহা কখন তিনি ত্যাগ করিতেন না। সেইজন্যই মধ্য জীবনে তিনি বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রকাশে

কৃতকার্য্য। সেইজন্যই বৃদ্ধজীবনে কর্জ্জনের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের নীতিজ্ঞতার ভুল প্রদর্শন করিতে সমর্থ। সেইজন্যই তাঁহার "সমাজ" ও "সংসারের" আবির্ভাব। সেইজন্যই তাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপ রমাপ্রসাদ-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা।

রমেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই নির্ভীক, সদাশয়, উদারচেতা, সত্যপ্রিয়, কুসংস্কার-বর্জ্জিত ও জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই দুষ্ট বালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ছুটাছুটী ও বৃক্ষারোহণ প্রভৃতির প্রতি তাঁহার বড়ই আসক্তি ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি সৎ ও দুর্ব্বলপক্ষের পক্ষপাতী ছিলেন। দুষ্ট হইলেও অন্যায় কার্য্যের প্রতি তাঁহার নরকবৎ ঘৃণা ছিল। তিনি কাহাকেও তোষামোদ করিতে জানিতেন না। সৎপক্ষ অবলম্বন করিবার সময়ে বিপদ আপদের প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। সেইজন্যই কর্ম্মজীবনে তিনি প্রজার হিতকামী। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয় স্নেহপূর্ণ— বিদ্যাসাগরের ন্যায় তাঁহার নিজ আহারীয় খাদ্য অন্ন অভাবগ্রস্তকে দিয়া উপবাসী থাকার কথাও শুনা যায়। এইজন্যই কর্ম্মজীবনে তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মুখে সকাতরে অন্নমুষ্টি তুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাল্যে তিনি দুষ্ট হইলেও লেখা পড়ায় কোনদিনই তাঁহার অবহেলা দেখা যায় নাই। যখন যেখানেই তিনি পড়িয়াছেন,সেখানেই তাঁহার শ্রেণীর মধ্যে তিনি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় পুরস্কার-বিতরণ সভায় তিনি কেবল ভাল পড়িতেন বলিয়াই যে পুরস্কার পাইতেন, এমন নহে। চরিত্র, আবৃত্তি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারগুলিই তিনি অধিকার করিতেন। সেইজন্যই তাঁহার সমপাঠী ছাত্রগণ বলিত যে, পুরস্কার-বিতরণ-ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের সিংহের অংশ (Lion's share) প্রাপ্য। বাল্যকাল হইতেই কুসংস্কারের উপর তাঁহার যেমন বিজাতীয় ঘৃণা, আবার জ্ঞানার্জ্জনের প্রতিও তাঁহার সেই প্রকার আগ্রহ ছিল। সেই জন্যই সপ্তদশ বর্ষীয় বালক সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সেই কচি বয়সেই জ্ঞানার্জ্জন জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া,পশ্চিম সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক জ্ঞানরূপ কৌস্তভে শোভিত হইয়া কর্ম্মজীবনে ধন্য হইয়াছিলেন।

শিক্ষাবস্থায় রমেশচন্দ্র।

গিরিরাজ হিমালয়ের নিভৃত-কন্দরস্থিত তিনটী ক্ষুদ্র উৎস হইতে তিনটী ক্ষীণ স্বচ্ছ-জলধারা নির্গত হইল। কিছুদিন সেই নিভৃত অন্ধকারময়ী কন্দরে আঁকা বাঁকা পথে প্রবাহিত হইয়া নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া,নাচিতে নাচিতে, কলকল নাদে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইল এবং ক্রমে বর্দ্ধিত আকারে প্রবাহিত হইয়া, কত নগর, কত নগরী, কত কেদারখণ্ডের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। তখন কে জানিত যে, তাঁহাদের পবিত্রসঙ্গমে পবিত্র প্রয়াগ তীর্থের সৃষ্টি হইবে? তখন কে জানিত, তাহাদের পরিণতিতে মানব-পূত-সাগর-সঙ্গমের আবির্ভাব হইবে? তখন কে জানিত, এই নবযুগের নব-গঙ্গা-যমুনা ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে উদ্ভূত হইয়াও একই সূত্রে গ্রথিত ও অধিকতর বলশালী হইয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত অমিয় তুল্য উন্নতি-তরঙ্গ তুলিয়া, এক অভিনবযুগের বাল-অরুণ-রশ্মির বিকাশ করিবে? আর সেই অমৃত তুল্য পবিত্র জলপানে ভারত-সন্তানগণ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে? আবার

তখন কেই বা জানিত যে, সেই পবিত্রময়ী সরস্বতী ক্ষীণদেহে, নীরবে লোকের তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবে?

কুরু-পিতামহ পবিত্রাত্মা মহানুভব ভীষ্ম-দেবের সেই ভীষণ-পিপাসা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মহারাজ দুর্য্যোধনের সযত্ন-সংগৃহীত স্বর্ণপাত্রস্থিত সুবাসিত জলে তৃপ্ত হয় নাই। কর্ম্মবীর অর্জ্জুনাকর্ষিত ভোগবতী জলপানে তিনি তৃপ্তিলাভ করেন। আমাদের রমেশ-চন্দ্রের শিক্ষার সহিত তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বদেশে যতদূর পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্ভবপর, তাহাতেও তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী পিপাসার তৃপ্তিলাভ হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে জ্ঞান-পিপাসা তাঁহার হৃদয়ে এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, তিনি সুদূরস্থিত লক্ষ্মী সরস্বতীর লীলাক্ষেত্র বৃটন-রাজধানী লণ্ডন নগরে শিক্ষার্থ যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কর্ম্মবীরের কর্ম্মপথে কোনদিন কেহ বাধা প্রদান করিয়া কৃতকার্য্য হয় না। প্রভাতকালীন নিষ্ফল মেঘের ন্যায় হৃদার তর্জ্জন, গর্জ্জন করিয়া কালে সেই বিঘ্নকারী জলদরাশি কোথায় বিলীন হইয়া যায়। আমাদের রমেশচন্দ্রের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল।

সেই সময় প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বঙ্গের সুসন্তান সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষার্থ বিলাতগমনে উদ্যত। তিনি সামাজিক বাধা বিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্ভীকচিত্তে বিলাত যাইতেছেন। [illegible] রমেশচন্দ্রের হৃদয়ও নাচিল। [illegible] শান্তির পূর্ণ অবসর বুঝিয়া তাঁহার বন্ধুবর সুরেন্দ্রের সহিত ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মহাত্মাদের কোন কার্য্যই কোন [illegible] বাধায় সম্পন্ন হয় নাই। রমেশ ও সুরেনের এই সাধুকার্য্যও বিনা বাধায় সম্পন্ন হইল না। সমাজে বিষম হৈ চৈ উঠিল। জাতি গেল, ধর্ম্ম গেল, সমাজ গেল, অনাচারে দেশ উচ্ছেন্ন হইল, প্রভৃতিরূপ নানা চীৎকার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। রমেশচন্দ্রের অবোধ কুসংস্কারাপন্ন বন্ধুবান্ধবও তাঁহার এই সাধুসঙ্কল্পে অল্প বাধা দেয় নাই। করীরাজ নিজ গন্তব্যপথে চলিয়া যাইবার সময় যেমন পার্শ্বস্থিত সারমেয়ের চীৎকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, সেইপ্রকার, ধীর রমেশচন্দ্র বন্ধুবর সুরেন্দ্র ও বিহারীর সহিত জ্ঞান-পিপাসা শান্তির জন্য জ্ঞানালোক-প্রভাসিত লণ্ডন নগরের প্রতি ধাবিত হইলেন।

দুই বন্ধুর সহিত রমেশচন্দ্র ইউরোপে গমন করিলেন, তথায় তিনজনেই সুখ্যাতির সহিত সিভিল সারভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বল করিলেন। এই সিভিল-সারভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি পাঠ সাঙ্গ করেন নাই। তিনি ইউরোপের নানাদেশে যাইয়া নানাভাবে জ্ঞান-পিপাসা শান্তি করিয়াছেন। তাঁহার অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা কোন কালেই তৃপ্তিলাভ করে নাই। তাঁহার কর্ম্মজীবনেও দেখি, জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে প্রবৃত্ত। কবিবর পোপের সেই মহাবাক্য "Drink deep or taste not the Pyriance spring" তিনিই সার্থক করিয়াছেন। বাল্যে যে জ্ঞান-পিপাসার উৎপত্তি, পার্থিব নশ্বর শরীরের পতনের সহিত তাঁহার নিবৃত্তি।

রাজসেবায় রমেশচন্দ্র।

ভারতীয় কলকণ্ঠ তিনটী পক্ষী আগ্রহে [illegible]

তাহাদের জ্ঞান পিপাসা তৃপ্তিলাভ করিল না। পাখী তিনটী পশ্চিম গগনে উড়িয়া গেল। সেখানে তাহারা কলা বিদ্যায় নিপুণ হইয়া দেশে ফিরিল, সুন্দর গানে দেশবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিল। একটী সতেজ উদার কণ্ঠে তেমন গাইতে পারিল না, দুইটী মধুর বুলি ধরিল। দেশের গীতির স্রোত নূতন পথে প্রবাহিত হইল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত সে জ্ঞানে বিভোর হইল। অকস্মাৎ কাল মেঘ দেখা দিল, একটী পাখী সেই বায়ুতাড়নে কোথায় উড়িয়া গেল, সে মধুর তান ফুরাইল। ভারতের হৃদয় ভাঙ্গিল, অন্য একটী পাখীর পানে চাহিয়া রহিল।

তিনবন্ধু এদেশে আসিয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকার্য্যে রমেশচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পাইল। সৎকার্য্যে যে জ্বলন্ত উৎসাহ ও বিশ্বজনীন প্রেমের আবশ্যক, প্রথমেই রমেশচন্দ্রের কার্য্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তাঁহার রাজকার্য্যে অবতীর্ণ হওয়ার অল্পদিন পরই ভয়ানক ঝড় ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণ সাবাজপুর দ্বীপ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হয়। সেই ঝড় ও সাগর-তরঙ্গ অবসারিত হওয়ার পরই দেখা-গেল যে, শত শত শব ইতস্তত ভাসমান। অনেক গৃহ ভূপতিত—গৃহ মধ্যেই কত শত হতভাগ্য সপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে! দ্বীপটী যেন একটী ভয়ানক শশ্মান-ক্ষেত্রে পরিণত। গো মহিষাদি পশু কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—বৃক্ষাদি চূর্ণ বিচূর্ণ—শস্য-ক্ষেত্র মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। তদুপরি ভয়ানক দেশব্যাপী ওলাউঠা করাল বদন বিস্তার করিল। এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রমেশচন্দ্র তথায় প্রেরিত হন। সেই দৃশ্য দেখিয়া রমেশচন্দ্রের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি দিবারাত্র অদম্য পরিশ্রম করিয়া দুর্দ্দশা-গ্রস্ত প্রজাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে তিনি নিজ শরীর বা স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। আহার তৃষ্ণা গ্রাহ্য করেন নাই। কিসে প্রজাদের রক্ষা হইবে, সেই দিকেই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। অনেক সময় জীবনের প্রতিও মমতাশূন্য হইয়া ওলাউঠাগ্রস্ত রোগীর পার্শ্বে বসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এ অবস্থায় প্রকৃত মানবের বা প্রকৃত রাজকর্ম্ম-চারীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী তাঁহার কার্য্যে লক্ষিত হয় নাই। আতুর ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজাগণ মুক্ত হৃদয়ে দুইহাত তুলিয়া রমেশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। অনেকে বলিতে পারেন,"ইহাতে রমেশচন্দ্রের বিশেষ মহত্ত্ব কোথায়?" আমরা বলিব, সরকার বাহাদুর ত অনেক স্থলেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজার দুঃখ তাহাতে অতি অল্পই লাঘব হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট হইতে লম্বা লম্বা রিপোর্ট বাহির হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মচারীদের দোষে অনেক স্থলেই বাস্তবিক উপকার আশানুরূপ হয় না। কিন্তু এই দক্ষিণ সাবাজপুরেই রমেশচন্দ্রের সহৃদয়তা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা বা রমেশচন্দ্রের রমেশচন্দ্রত্বের প্রথম বিকাশ।

তাহার পর আবার আমরা বর্দ্ধমান জেলার জল-প্লাবন-সময়ে রমেশচন্দ্রকে দেখিতে পাই। দামোদর নদের জল-প্লাবনে বর্দ্ধমানের অনেকস্থল প্লাবিত হয়। গো মহিষাদি অনেক পশু কোথায় ভাসিয়া যায়। গরীব কৃষকদের কুটীর সকল কোথায় চলিয়া

যায়। একেবারে শত শত লোক গৃহশূন্য হইয়া পড়ে। দেশের সমস্ত ধান্য ডুবিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এখানেও আমরা রমেশ-চন্দ্রের সেই মহানুভবতা, সহৃদয়তা, পরদুঃখে সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়াছি। রমেশচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এখানেও গরীব প্রজা একমুষ্টি অন্নের মুখ দেখিতে পায় এবং তাহাদের মাথা রাখিবার স্থল সংগৃহীত হয়।

গরীব প্রজার জন্য রমেশচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, অতি অল্প রাজকর্ম্মচারীই তাহা করিয়া থাকেন। রাজকার্য্যে কখন তাঁহাকে আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতে দেখিতে পাই নাই। ইংরাজ রাজও তাঁহার কার্য্যক্ষমতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া ক্রমে তাঁহাকে উচ্চতর পদ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট কালেকটার হইতে বিভা-গীয় কমিসনর পদে উন্নীত হন। যদি তিনি এই হতভাগ্য দেশে জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাদে-শিক শাসন-কর্ত্তার আসনে অধিষ্ঠিত দেখি-তাম। প্রজার দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিত। জমিদারের অত্যাচার হইতে প্রজাদের রক্ষা তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার বহুবর্ষ-ব্যাপী চেষ্টার ফলেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আইন বিধিবদ্ধ হয়। উক্ত আইনের ফলে বঙ্গীয় প্রজার যে উন্নতি হইয়াছে, এ তাঁহারই কৃতিত্ব। কর্ম্মজীবনে তাঁহার কৃতিত্ব অসীম, তিনি যখন বিভাগীয় কমিসনরের পদে অধিষ্ঠিত, তখনও অনেক গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউ-রোপীয় কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন, কিন্তু কখন তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার অভাবে বা পক্ষপাতিত্বের কথা শ্রুত হওয়া যায় নাই। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী সর্ব্বদাই তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন। সরকার পক্ষেও তাঁহাকে ভারতীয় রাজকর্ম্মচারী-দের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক, ন্যায়পর, বিচক্ষণ ও কর্ত্তব্যতৎপর বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

অবসরে রমেশচন্দ্র।

"Lives of great men all remind us.
We may make our lives sublime,
And, departing, leave behind us,
Foot-prints on the sands of time."

দেশের ও দেশবাসীর উন্নতিকল্পে রমেশ-চন্দ্র রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। দেশ ও দেশবাসীর উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টা অসাধারণ ও অতুলনীয়। এই কার্য্য সাধন জন্য মাঝে মাঝে তিনি অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই বঙ্গীয় প্রজাদের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিল, তিনি প্রজার পক্ষে সতেজ লিখনী ধারণ করিলেন, তাহারই ফলে তাঁহার "The Peasantry of Bengal" প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক বাহির করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। বারম্বার সরকারে রিপোর্ট করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার ফলেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮ আইন প্রচারিত এবং তাহাতেই বঙ্গীয় প্রজাগণ জমিদারের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাওয়ার এক নূতন পথ প্রাপ্ত হয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান-সভ্যতা মূলক। তাহাদের ধারণা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার চেয়ে প্রাচীনতর সভ্যতা আর নাই। ঊন-বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোক্ষমূলার, গোল্ডষ্টুকার প্রভৃতি মনীষিবর্গ এই মতের

ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন, তাহাতে ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ ভারতীয় সভ্যতাই যে আদি, তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু বিলাতের সাধারণ সমাজের ভ্রম তাহাতে বিদূরিত হয় নাই। তাঁহারা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেই অজ্ঞতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিয়া —"The Lake of Palms," "The slave girl of Agra" প্রকাশ করেন এবং সাধারণ ইংরাজদের ভারতীয় প্রাচীনত্ব বিষয়ের ভ্রান্তি বহুপরিমাণে দূর করিতে কৃতকার্য্য হন। তিনি রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ইংরাজজাতি ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের অভাব ও অভিযোগ বিষয়ে বিশেষ অবগত নহেন। আমাদের বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ও ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। শাসক ও শাসিত জাতির মধ্যে এরূপ ভাব উভয়ের পক্ষেই ঘোর অপকারী। এই অবস্থা দূর করিবার অভিপ্রায়ে "Economic History of British India," "India in the Victorian age," "Open letter to Lord Curzon." প্রভৃতি লেখেন, ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও প্রজাদের অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞান প্রচারিত হয়। একদিকে প্রজার উপকার, অন্যদিকে তাঁহার অসাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রের বিমল জ্ঞান চারিদিকে বিঘোষিত হইল। লোক বিস্ময়ে বাঙ্গালী-মস্তিষ্কের উৎকর্ষতায় কর্জ্জনের ন্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পরাভব দেখিয়া বিমোহিত হইল। বাঙ্গালী যে রাজনীতি-শাস্ত্রে অপটু, এই অপবাদ বিদূরিত হইল।

ইতিহাসই জাতীয়-চরিত্র-গঠন ও জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়। আমাদের লোকসাধারণের ঐতিহাসিক জ্ঞান নিতান্ত অল্প দেখিয়া তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; তাহাতে সাধারণের ইতিহাস শিক্ষার পথ অনেক সুগম হইয়াছে। ত্রিশ বৎসর অতীত হইল, তিনি বাঙ্গালায় একখানি ভারতের ইতিহাস লিখেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইতিহাস বঙ্গভাষায় লিখিত হয় নাই। জাতীয় চরিত্র, জাতীয় উন্নতির প্রধান ও একমাত্র উপায়। যাহাতে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম ও সফলতা অতুলনীয়। ধর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপন না করিতে পারিলে, কিছুরই স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই, সেইজন্য তিনি শত ঝঞ্ঝাবাতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অটল বীরের ন্যায় ঋকবেদের অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ঋক্‌বেদ প্রচার দ্বারা সেই প্রাচীনকালের সভ্যতা, শৌর্য্য, সরলতা, ব্যসনহীনতা ও স্বাধীন জীবনের বিচরণ-ক্ষেত্র এই বৈদিক ভারতের আলেখ্য, আধুনিক ভারতীয় জাতির সম্মুখে ধরিয়া, তাঁহাদের চরিত্র-গঠিত করিতে তিনি একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কেন এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা তাঁহার কথাতেই আমরা প্রকাশ করিব। তিনি "সমাজ" নামক উপন্যাস গ্রন্থে রমাপ্রসাদের মুখ দিয়া ইহা বাহির করাইয়াছেন। আর তিনি এই সাধুকার্য্যে কেমন বাধা পাইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারই কথায় প্রকাশ পাইতেছে :—

"রমাপ্রসাদের নূতন প্রণালীর শাস্ত্র প্রচার লইয়া গ্রামে অনেক আন্দোলন হইতে লাগিল। নানারূপ লোকে নানারূপ কথা কহিতে লাগিল। যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারা রমাপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা

করিতে লাগিলেন, যাঁহারা পাণ্ডিত্যের ভাণ করেন, তাঁহারা রমাপ্রসাদকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া ছুটা গালি দিলেন। পরের একটু উপকার করিলে যাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ হয়, তাঁহারা রমাপ্রসাদের সাহায্য করিলেন। পরের নিন্দা রটাইয়া বেড়াইয়া যাঁহারা দুই পয়সা আয় করেন, সেই ক্ষুদ্র-ভাগ্যগণ রমাপ্রসাদের নিন্দা রটাইয়া দুপয়সা আয় করিলেন। শাস্ত্রশিক্ষা দিয়া দেশের লোকের হৃদয় উন্নত করা, চরিত্র-গঠিত করা যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা রমাপ্রসাদের সহিত সহানুভূতি করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্রপ্রচার হইলে যাঁহাদের ব্যবসা উঠিয়া যায়, অন্ন উঠিয়া যায়, তাঁহারা রমাপ্রসাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। গ্রামের উন্নতি, দেশের উন্নতি হইলে যাঁহারা তুষ্ট হন, তাঁহারাই রমাপ্রসাদের শিক্ষাদানে আনন্দিত হইলেন এবং দেশের সামাজিক বা ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি হইলে যাঁহাদের একচেটিয়া ব্যবসা উঠিয়া যায়, তাঁহারা রমাপ্রসাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি-চেষ্টা দেখিয়া গালি দিলেন।"

শাস্ত্রপ্রকাশ-পক্ষে রমেশচন্দ্র অটল, অচল। তিনি কোন বাধার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বেদ-প্রচার করিলেন। এই শাস্ত্র প্রকাশের গূঢ় উদ্দেশ্য তিনি স্থানান্তরে নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন।

"শাস্ত্র প্রকাশ করা শিক্ষিত লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য, যে যতটুকু পারে, তাহার সেই টুকু করা কর্ত্তব্য। কে শাস্ত্র প্রকাশ করিবে,—তুমি প্রকাশ করিবে, আমি প্রকাশ করিব,—যে দেশানুরাগী, সে যতটুকু পারে, প্রকাশ করিবে। এইরূপে দেশে দেশে প্রকৃত শাস্ত্রশিক্ষা প্রচার হইবে, অজ্ঞানতা তিরোহিত হইবে, কুরীতি ও কুপ্রথা উঠিয়া যাইবে,—এ কার্য্যে রাজার মুখ চাহিয়া থাকিব না, রাজপুরুষদিগের ইহাতে অধিকার নাই—ক্ষমতাও নাই—হিন্দুদিগের মধ্যে শাস্ত্রপ্রচার হিন্দুদিগেরই কার্য্য।"

সকল হিন্দুরই শাস্ত্রশিক্ষার অধিকার আছে, সকল হিন্দুই এ মহৎ শিক্ষালাভ করুক, জন সাধারণের শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন উন্নতির উপায়ান্তর নাই। পুরাকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেরই শাস্ত্রশিক্ষার অধিকার ছিল, এখন সেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভাঙ্গিয়া তোমরা শত শত ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছ, তোমাদের পৈতৃক অধিকার কে কাড়িয়া লয়? হায়, আর্য্যগণ কবে এই উদার মতগ্রহণ করিবে? কবে ভারত উন্নতিমার্গে উত্থিত হইবে? ভগবান সেদিন কি দিবেন?"

বাঙ্গালা ভাষায় বেদের অনুবাদ প্রচারিত হইল। রমেশচন্দ্র দেখিলেন, ইহাতে সমগ্র ভারতের উপকার হইবে না। কাজেই উহার সার ভাগ অবলম্বন করিয়া স্থিরলক্ষ্য রমেশচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে Civilizataion in Ancient India রচিত ও প্রকাশিত করিলেন। ভারতসন্তান আদরে ও আগ্রহে উহা গ্রহণ করিল। রমেশচন্দ্রের চিরপিপাসিত জাতীয়চরিত্র গঠনের সূত্রপাত হইল, দেশের শ্রোতৃবর্গ ভিন্নপথে প্রধাবিত হইল। যে জাতীয় চরিত্রগঠনের জন্য তিনি আমরণ প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সেই জাতীয় চরিত্রের বালসূর্য্যের তরুণরশ্মি তিনি জীবিতকালেই লক্ষ্য করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। কর্ম্মবীর তুমি স্বর্গে গিয়াছ, তোমার কর্ম্মের ক্ষয় নাই। যতদিন এজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তুমি এই জাতির হৃদয় হইতে অন্তর হইবে না। যেদিন এই জাতি তোমার মহিমা ভুলিবে, সেইদিনই এই জাতির দুর্ভাগ্যের দিন বলিতে হইবে। তোমার কার্য্য স্মরণ করিয়া ভারতবাসী নিত্যই কবির সুরে গাইবে:—

"মহাযোগী মহাজন যে পথে করি গমন
হ'য়েছেন চিরস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করি ধরমের ধ্বজা তুলি
আমরাও হব বরণীয়।

শেষ জীবনে রমেশচন্দ্র।

একদিন ইংরাজ কবি Grey সাহেব নিভৃত গীর্জ্জায় বসিয়া গাইয়াছিলেনঃ—

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desert air."

বাস্তবিকই ইহা আমাদের জীবনে বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত। গত শতাব্দীতে ইউরোপ-ক্ষেত্রে কত কত রাজনীতিজ্ঞের আবির্ভাব হইল। আমাদের হতভাগ্য দেশে কি একজন রাজনীতি-বিশারদের আবির্ভাবও হইবে না? রাজনীতিজ্ঞের অভাব বাস্তবিকই হয় নাই, কিন্তু এই মরুভূমিতে কোন সুগন্ধি ফুল জন্মিলে, তাহা লোক-লোচনের প্রত্যক্ষী-ভূত হয় না, অযথা স্থলে সুবাস বিতরণ করিয়া অন্তর্হিত হয়। যে গুণ থাকাতে ইউরোপ ক্ষেত্রে গ্লাডষ্টোন, ডিজরেলী বা বিষমার্কের আবির্ভাব, সেইরূপ গুণশালী ব্যক্তি ভারতে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা এইরূপ কোন কার্য্যে নিয়োজিত!

সম্যক ভাবে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর উপকার করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি বিভাগীয় কমিসনরের ন্যায় উচ্চপদ পরিত্যাগ করেন, এরূপ নিঃস্বার্থ স্বদেশ-সেবা অতি অল্প লোককেই করিতে দেখা যায়। তিনি প্রথমতঃ কিছুদিন বিলাতে থাকিয়া অধ্যাপনাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। তারপর দেশে আসিয়া দেশীয় রাজ্যের উন্নতি-কল্পে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য বরদা রাজ্যে। যাহাতে বরদারাজ্য দেশীয়রাজ্য সমস্তের আদর্শ-স্থানীয় হয়, সেইজন্য তিনি অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতে থাকেন। এবিষয়ে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের দুর্ভাগ্য, তাই একার্য্যের প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনে ফুটাইয়া উঠে নাই। বরদায় বিনা-বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাঁহার জীবনের একটী অমর ও চিরস্মরণীয় কার্য্য।

গুণীর গুণ কখনও অপ্রকাশিত থাকে না। অল্পকাল মধ্যেই তিনি রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া, কি দেশে কি ইউরোপে, প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কর্জ্জনের মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও তাহার রাজ-নীতি জ্ঞান দর্শনে স্তম্ভিত। দেশের লোকে তাঁহাকে অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিত, এবং দেশের অপক্ষপাতী নেতা বলিয়া স্বীকার করিত। সেইজন্য তাঁহাকে স্বদেশ-বাসীগণ সাদরে National Congress-এর সভাপতি পদে বরণ করেন। তাঁহার অসা-ধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান গভর্ণমেণ্টের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক-করণের প্রস্তাব শেষে গভর্ণমেণ্টের নিকটও সমীচীন বলিয়া বোধ-হইয়াছে। যদি কখনও বিচার ও শাসন বিভাগের স্বাতন্ত্র্য কার্য্যে পরিণত হয়, তবে উহা রমেশচন্দ্রের প্রসাদাৎ হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। Decentralization Commission এ তিনিই একমাত্র দেশীয় সদস্য ছিলেন, এবং তাঁহার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার অতুল জ্ঞান সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। সেইজন্য লর্ড মরলী Reform Scheme প্রস্তুত কালে সাদরে তাঁহার পরা-মর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একা-ধারে রাজনীতিজ্ঞ, কবি, ঐতিহাসিক,

বক্তা ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালী যাহা হারাইয়াছেন, বহুদিন পর্য্যন্ত আর তাহা আর পূর্ণ হইবার আশা নাই। সর্ব্বোপরি, তিনি জাতীয় চরিত্র-গঠনের যে সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতে নবযুগের আবির্ভাব হইবে। ভগবান তাঁহাকে যে সকল গুণ দিয়া মর্ত্ত্যধামে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি সেই সকল গুণের সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। সেই কর্ম্মবীর এই কর্ম্ম ভূমি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেই অদ্বিতীয় কর্ম্মযোগ বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হৃদয়ে প্রবাহিত থাকিবে ও এই পতিত জাতির উদ্ধারের কারণ হইবে। তাঁহার পার্থিব শরীরের লয় হইয়াছে, কিন্তু তিনি চিরকাল ভারতবাসীর হৃদয়ে অমর।

"চলং চিত্তং চলং বিত্তং চলং জীবন যৌবনং।
চলাচলম্ জগৎ সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি।"

আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বকই রমেশচন্দ্রের জীবনী সাধারণ ভাবে লিখিলাম, কারণ আমরা জানি, তাঁহার জীবনী শীঘ্রই যোগ্যতর ব্যক্তিদের দ্বারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় বাহির হইবে। জীবনের যে কার্য্যগুলি ধরিয়া সাধারণ লোক তাঁহার পদানুসরণ করিতে পারে, আমরা কেবল সেই ঘটনা কয়েকটী মোটামুটি ভাবে বিবৃত করিলাম। আর কেনই বা এই ভাবে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান কয়েকটী ঘটনা মাত্র উল্লেখ করিলাম, তাহা আমাদের একজন বিজ্ঞ প্রবীণ লেখকের মুখেই প্রকাশ করিতেছি:—

"পুরাণে অনেক নরনারীর আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় জীবনী ও জীবনচরিত যে প্রণালীতে লিখিত হয়, ঐ সকল আখ্যায়িকা সে প্রণালীতে লিখিত নহে। পুরাণের আখ্যায়িকা এবং ইউরোপের জীবনচরিতের মধ্যে যে সকল প্রভেদ লক্ষিত হয়, এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। এস্থলে একটী কি দুইটী প্রভেদের উল্লেখ করিতে হইবে। সে প্রভেদ কিছু গুরুতর। পুরাণের আখ্যায়িকা এবং ইউরোপের জীবনচরিত, দুইয়েতেই জন্মকথা থাকে। কিন্তু সে কথা দুইয়েতে এক প্রকার নহে। ইউরোপের জীবনচরিতে জন্মস্থান, বর্ষ, বার প্রভৃতির উল্লেখ থাকে। কারণ জন্ম সম্বন্ধে ঐ গুলি অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। —পুরাণের আখ্যায়িকার জন্ম কথায় এসব নাই। সন তারিখে বিশেষ কিছু আছে বলিয়া পুরাণকারদিগের জ্ঞান থাকিলে অন্ততঃ জন্ম কথায় সে সংবাদ থাকিত।"

ফল কথা, পাঠক যাহাতে পুরাণোল্লিখিত ব্যক্তিদের জীবনের দোষগুণ দেখিয়া, নিজ জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে, সেই ভাবেই ঐ সকল লিখিত হইত। জীবনী পাঠের বোধ হয় মুখ্য উদ্দেশ্যও তাহাই।

ক্রমশঃ

শ্রীর[illegible]নাথ মজুমদার।

সুন্দরে সুন্দর।

[illegible]ায় আজি অধীর, চঞ্চল,
[illegible]বিভোর ভৃঙ্গ পিয়ে পরিমল;
[illegible]াবনে কৌমুদী বন্যায়,

শোভন সুযোগ কিগো করিলে বিধান,
হে নাথ, মোহিতে মম ক্ষুব্ধ মনপ্রাণ?
নয়নে পড়িল তাই শান্ত, নির্নিমিখ,

উচ্ছ্বসিল বিশ্বময় স্মিত সম্ভাষণ,
মোর বক্ষে প্রতিধ্বনি করে অন্বেষণ;
জীবনের শ্যামকুঞ্জে আঁধার নিবিড়
বেঁধেছিল বাসা, এবে ভাঙিল সে নীড়!

গুঞ্জরে সে তপোবনে করি সঞ্চরণ,
অনন্ত মরণ মাঝে অনন্ত জীবন,
অরুন্তুদ যাতনার শর শয্যা'পরে,
হের মম স্বেচ্ছা-ভীষ্ম দেহত্যাগ করে!

হৃদয়-পাষাণ ভেদি গঙ্গোত্রী-নির্ঝর
প্রেম বারি উৎসারিয়া বহে নিরন্তর;
অস্ফুট, অশ্রান্ত তার মধুর নিক্কণ
বিশ্বের প্লাবন-গীতে করিছে স্পন্দন!

উৎক্ষিপ্ত অমিয়রাশি ত্রিদিব-মন্থনে,
চরাচর মুখরিত এক নিমন্ত্রণে!
ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে করে ডাকিছে দয়ালু,
ভ'রে দাও আজি মোর ক্ষুদ্র কমণ্ডলু।

ওগো বিশ্ব-পুরোহিত, প্রেমের যাজ্ঞিক,
আমারে সাজায়ে দাও যজ্ঞের ঋত্বিক্;
প্রাণের সর্ব্বস্বধন অর্ঘ্য ল'য়ে পায়,
আমারে উদাসী কর মত্ত মলয়ায়।

পূরে দাও ক্ষীণ কণ্ঠে তব সুধাস্বর,
রাখগো জাগায়ে মোরে ঝঙ্কারে মধুর।
যেন এ জীবন-কুঞ্জে যুগ যুগান্তর,
গীতে, পুষ্পে বাঁধা হেরি সুন্দরে সুন্দর!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন এবার ময়মনসিংহে হইয়া গেল। বিগত খ্রীষ্টমাস্-এর বন্ধে এই অধিবেশন হইবার কথা ছিল; কিন্তু তখন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া থাকে, সেই নিমিত্ত সাহিত্য-সম্মিলনে বাধা পড়িয়াছিল। ফলে এই হইল যে, ১৩১৭ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইল না। কংগ্রেস এলাহাবাদে হইয়াছিল—এবং শুনিতেছি যে "ক্রীড্" লইয়া গোলযোগ হওয়ায় বাঙ্গালীদের অধিকাংশ লোক ইহাতে যোগ দান করেন না। বিশেষতঃ কংগ্রেস্ রাজনীতি-বিষয়ক—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নাহি। কংগ্রেসে যাঁহারা গিয়া থাকেন, তাঁহাদের কয়জন সাহিত্য-সম্মিলনে যান? এই ধরুন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র; তিনি একজন সাহিত্য-সেবক—ময়মনসিংহ তাঁহার আপন স্থান। অথচ কই তিনিত সম্মিলনে উপস্থিত হইলেন না! অথচ সম্মিলন খ্রীষ্টমাস্-এর সময় হইবার পক্ষে বোধ হয় তিনিই প্রধান আপত্তি-কারক। সম্মিলন খ্রীষ্টমাস যোগে হওয়াই উচিত ছিল; যখন পূর্ব্বে ঐ সময়ে সম্মিলন হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, তখন সময়পরিবর্ত্তন করা ভাল হয় নাই—এইরূপ ব্যাপার বশতই জাতীয় চরিত্রে অলক্ষিতে কলঙ্ক আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ সম্মিলন যে রাজনীতির সহিত সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত, তাহাও এই সময়ে ইহার অধিবেশন দ্বারা স্পষ্ট সূচিত হইত—নানা কারণে ঈদৃশ সূচনায় প্রয়োজনও ছিল। যাউক, গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধ উপলক্ষে হওয়াতে একটু সুবিধা এই হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যাপার সমাপ্ত হওয়াতে এবং কলেজগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়াতে, ছাত্রগণ স্বচ্ছন্দ মনে সম্মিলনের সেবা করিতে পারিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে সম্মিলনের এই প্রথম অধিবেশন—যদিও বরিশালে ইহার উদ্বোধন হইবার কথা ছিল। কাশিমবাজারের প্রথম অধিবেশনের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু রাজশাহী বা ভাগলপুরের অধিবেশনে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সেবী অতি কম লোকেই যোগদান করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহে যাঁহারা এই সম্মিলনের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বতন অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই; তথাপি সম্মিলনের কার্য্য যাহাতে সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই অশেষ-প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গের সৌভাগ্য বশতঃ ইহার জমিদারবর্গ প্রায়শঃ শিক্ষানুরাগী এবং সাহিত্যের পরিপুষ্টি-কল্পে বদ্ধপরিকর। এই জমিদার-সঙ্কুল ময়মনসিংহের ভূম্যধিকারিবর্গ এতদ্বিষয়ে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছেন—পুণ্যশ্লোক ব্রজেন্দ্রকিশোর শিক্ষাকল্পে অতুলনীয় মুক্তহস্ততা দেখাইয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন; বি-এ-উপাধিধারী মহারাজ কুমুদচন্দ্র জমিদার কুলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও নানা বিষয়ে গবেষণা-সূচক প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যের যেরূপ সেবা করিতেছেন, তাহার তুলনা কোথায়? এই ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার কথা এবং অনেকটা হইয়াছেও বটে। তবে [illegible]কৃত ব্যাপারে ত্রুটী থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক; ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ ত্রুটী না থাকে, তজ্জন্য দুই একটীর কথা প্রসঙ্গক্রমে এই প্রবন্ধে অবতারিত হইবে।

কিন্তু [illegible] সকল সামান্য প্রমাদের কথা তুলিবার পূর্ব্বে সম্মিলনের অধ্যক্ষবর্গ যে তজ্জন্য দায়ী নহেন, ইহা বলিতেই হইবে। তাঁহারা কত যত্ন করিয়া সম্মিলন ডাকিয়াছেন, মুক্তহস্তে এতজ্জন্য কত অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানতঃ কোনরূপ ত্রুটীপ্রমাদ ঘটিতে [illegible] ঘটিতেই পারে না। তাঁহারা যেভাবে [illegible] সাহিত্য-সেবিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া[illegible] তাহাতে তাঁহাদের সম্যক উদারতা [illegible]তা প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং অভ্যর্থনা-[illegible] সভাপতি বনিয়াদি বংশের [illegible] [illegible]পতি এবং সম্পাদক রাম-গোপালপুরের কুমার বাহাদুর প্রত্যেক আমন্ত্রিতের নিকট একপ্রকার গললগ্নীকৃত-বাস!" ইঁহারা যাদৃশ বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, ইঁহাতে তাঁহাদেরই মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। অথচ ভোজনাদি-ব্যাপারে রাজোচিত আয়োজন করিয়া ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ আতিথেয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই অভ্যর্থনাদি ব্যাপারেও ত্রুটী যে কিছু কিছু না ছিল, তাহা বলা যায় না, কিন্তু সেগুলি এত সামান্য যে, তাহাদের উল্লেখ করা তাদৃশ সাদর-অভ্যর্থনায়-আপ্যায়িত কোনও ব্যক্তির পক্ষে অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র হইবে।

নব বর্ষের প্রথম দিবসে সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হইবে—তাই আমরা চৈত্রের শেষ দিবস ময়মনসিংহ সহরে উপস্থিত হইলাম। সেইদিন সেই গাড়ীতেই সভাপতিসহ সাহিত্য-পরিষদের প্রধান প্রধান সভ্যগণও ময়মনসিংহে পদার্পণ করিয়াছেন। পথিমধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত ডাক্তার জগদীশ চন্দ্রের নিকট পরিচিত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। বঙ্গমাতার এই শ্লাঘ্য সন্তানটী জ্ঞানগরিমায় জগদ্বিখ্যাত হইলেও বিনয় ও অমায়িকতার আধার; তাহার আকৃতির মধ্যেই এমন একটা গাম্ভীর্য্য আছে, যাহাতে রঘুবংশের সেই "অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ" শ্লোকটীর স্মরণ হয়। সম্মিলনে জনতাকর্ষণে এই একটী ব্যক্তিই প্রচুর; তাঁহাকে দেখিবার জন্যই ময়মনসিংহ ষ্টেশনে এত ভিড় হইয়াছিল যে, অভ্যাগত অনেক সাহিত্য-সেবীর খোঁজ লইতে গিয়া ময়মনসিংহের ভদ্রলোকদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, এইবার সভামণ্ডপ যেস্থলে হইয়াছিল, তৎস্থলেই—আনন্দমোহন কলেজে—অভ্যাগতগণের অধিকাংশেরই থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর পরিচিত হইবার অথবা আলাপসম্ভাষণ করিবার বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ অবস্থা-বিশেষে বাধ্য হইয়া আমাকে স্বতন্ত্র অবস্থান করিতে হইয়াছিল, তথাপি মধ্যে মধ্যে এই স্থানে আসিয়া যতটা পারি, অপরিচিতগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া লইলাম। সম্মিলনের ইহাতেই সার্থকতা।

প্রথম দিন প্রাতঃকালে বিশেষ কোনও কাজ হয় নাই। সভাপতি মহাশয়ের আবাসস্থলে—সার্কিট্‌-হাউসে—কয়েকজন একত্র হইয়া সেইদিনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিলেন। অপরাহ্ণ তিনটার সময় সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইল। সভাস্থলে লোকের বড় ভিড়—শুনিলাম, ময়মনসিংহের মফঃস্বল হইতে, ব্যাপারটা কি, দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

নিমন্ত্রিতগণের স্থান মঞ্চের উপর করা হইয়াছিল। তৎপশ্চাৎ মহিলাগণের নিমিত্ত কলেজগৃহের বারান্দায় চিক্‌ দেওয়া হইয়াছিল। সেই স্থান মঞ্চের এত সন্নিকটে যে, চিকের আড়ালে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকে স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। কয়েকটী ব্রাহ্মমহিলা প্রথমতঃ মঞ্চের উপর অভ্যাগতগণের সমাসনে বসিয়াছিলেন, তৎপর স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় ঐ বারান্দায় চলিয়া যান; কিন্তু তাঁহাদের সম্মুখে কোনরূপ পরদা ছিল না। ফলে যাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের একটা দিক্‌ নেত্রপাতের অবিষয়ীভূত হওয়াতে একটু অসুবিধা হইয়াছিল—বিশেষতঃ যাঁহাদের ঐ দিক সম্মুখের ভাগে পড়িয়াছিল। ময়মনসিংহ সম্মিলনে অভিনব বিষয়াবলীর এইটী একতম। সঙ্গীত ও কবিতাদি পাঠ হইলে পর বিগত বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হইল। এইটীও এক অভিনব ব্যাপার। পূর্ব্বতন অধিবেশনদ্বয়ে ইহা দেখি নাই—কংগ্রেস্‌ প্রভৃতিতে এতাদৃশ কিছু আছে কিনা, জানি না। বিষয়টী মন্দ নয়—তবে গত বর্ষের অধিবেশনের পর সম্মিলনের পক্ষ হইতে কি কি কাজ হইয়াছে, কি কি কাজ হয় নাই—কেন হয় নাই ইত্যাদির আলোচনা বিস্তারিতভাবে থাকিলেই শোভন হইত। গত বর্ষের সাহিত্যের এক ইতিহাস এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে—তদুপলক্ষে উল্লেখযোগ্য নূতন গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঈদৃশ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইবার যোগ্য অনেক গ্রন্থ প্রবন্ধকার হয়ত দর্শনই করেন নাই!*

অতঃপর সুসঙ্গাধিপত মহারাজ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে স্বীয় সম্ভাষণ পাঠ করেন। এতাদৃশ প্রবন্ধে বিষয়ের একটা বাঁধাধরা ছাঁচ নাই; সুশিক্ষিত মহারাজ বাহাদুর ইহাতে অনেক কথারই অবতারণ করিয়াছেন। তবে ময়মনসিংহ জেলার কথাই অনেকটা এই প্রবন্ধে শুনিতে পাইব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, ইহাতে সেইকথা খুব কমই ছিল।

তারপর আর একটী দৃশ্য দেখিলাম, যাহা অভিনব হইলেও প্রকৃতই মনোরম। জেলার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্লাকউড সাহেব সভাস্থ হইয়া এই সম্মিলন ব্যাপারে নিজের সহানুভূতি বিজ্ঞাপিত করিয়া স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার সুখ্যাতি ময়মনসিংহের সাধারণের মনে অনবরত শুনা গিয়াছে—এমন সৎকার্য্য নাই, যাহাতে ব্লাকউড সাহেব প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াছেন। ময়মনসিংহবাসীরা এইরূপ শাসনকর্ত্তা পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

তৎপরে বদান্যাগ্রগণ্য রাজর্ষিকল্প রাজা জগৎকিশোরের প্রস্তাবে এবং বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সমর্থনে সর্ব্বজন বরেণ্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে ডাক্তার জগদীশকে সভাপতিরূপে পাইয়া, সম্মিলন কৃতার্থ হইয়াছে—পৃথিবী ব্যাপিনী যাঁহার যশোভাতি, এই অধঃপতিত ভারতের ম্লানমুখ

*এই বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত দুইবৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন। তবে অমূল্য বাবু মাসিকপত্রে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধেরও নামোল্লেখ করিয়া আপত্তির কার্য্য এই করেন যে (১) মাসিকপত্র সমস্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের তিনি নাম করিতে পারেন নাই। (২) নিজের পত্রিকায়ও প্রবন্ধের উল্লেখ (বোধ হয় বাধ্য হইয়া) করিয়া থাকেন। (৩) মাসিক পত্র ব্যতীত সাপ্তাহিক পত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ থাকে, তাহাদের কথা থাকে না। ফলতঃ যে বিষয়ে চূড়ান্ত করা যায় না, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই সঙ্গত।

উজ্জ্বল করিয়াছে, তাঁহার আনন-বিনিঃসৃত মাতৃভাষায় গ্রথিত বচনরাজি সমবেত জনমণ্ডলী মনমুগ্ধবৎ শুনিবে, ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু হায়, সমবেত জনসঙ্ঘের কোলাহলে তাঁহার স্বাভাবিক মৃদুস্বর ডুবিয়া গেল। তাঁহার হইয়া আরও দুই একজন তদায় মুদ্রিত বক্তৃতাখানি পাঠ করিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। বক্তৃতাখানির কয়েকশত কাপি মুদ্রিত করিয়া জনমণ্ডলী মধ্যে বিতরণ করিতে পারিলে জনতার চক্ষুঃ কর্ণের সহায়তা করিত, কোলাহলও হইত না। গতস্যশোচনা নাস্তি।

কেবল স্বরের অনুচ্চতাবশতঃ যে বক্তৃতা শুনিতে লোকে গোলযোগ করিয়াছে—তাহা নহে; উচ্চতর স্বরবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ঐ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। লোকে শুনিল কৈ? আমার বোধ হয়, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র সম্মিলনের সমবেত জনগণের নাড়ী ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানের কঠোর কাহিনী শুনিয়া উপদেশ লাভ করিবার জন্য সম্মিলিত ব্যক্তিবৃন্দ ব্যাকুল হইয়াছিল বলিয়া বোধ করিবার কোনও কারণ নাই।

"বিজ্ঞানে সাহিত্য" বা "সাহিত্য-বিজ্ঞান" আমদানি করিবার জন্য আমাদের সম্মিলনের অভিভাবক মহাশয়েরা যতই চেষ্টা করুন না কেন, নীরস বিজ্ঞানকে সাহিত্যের রসময়ী ধারায় সিক্ত করিতে না পারিলে উহা রুচিকর হইবে না; যদি যন্ত্রাদির দ্বারা ছায়াবাজির আকারে তামসা দেখান যায়, তবে [illegible] কথা।

এখানে একটা কৈফিয়ৎ দিয়া রাখি। আমি বিজ্ঞানের বিরোধী নই। বিজ্ঞানের চর্চা হউক—আমাদের দেশের লোক বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্বাবিষ্কার করিয়া জগৎ সমক্ষে গৌরবান্বিত হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা প্রার্থনীয়। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা [illegible]রিত সত্যের প্রমাণ পাওয়া যাইবে, ইহা [illegible] আমার দৃঢ় ধারণা। এই জগদীশচ[illegible] আবিষ্কারাদি বিষয়ে মহর্ষি [illegible]—

(১—৪৯)

"তমসা [illegible] বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃ[illegible]স্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ॥"

এই মতই মন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত করিতেছে। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের হাতে পরিভাষা ব্যাকরণ, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় রহিয়াছে। তাহারই অনেক কাজ বাকী আছে—তদুপরি বিজ্ঞানের বোঝা চাপাইয়া কাজ বাড়ান মাত্র হইতেছে। যাউক, এই বিষয় বোধ হয় কিছু বেশী বলিয়াছি, আর বলিতে চাহিনা। এই ক্ষুদ্রের কথা কেহ গ্রাহ্য করিবে বলিয়াও মনে হয় না।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর তাঁহারই কর্ত্তৃক পরলোকগত সাহিত্যিকগণের উদ্দেশে শোক-প্রকাশক একটী মন্তব্য উপস্থাপিত হইয়া সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। বঙ্গের দুর্ভাগ্য বশতঃ এইবার এই তালিকা সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে; এতগুলি খ্যাতনামা সাহিত্যিক আর কোনও বর্ষে বঙ্গজননীর পূজা করিয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করেন নাই---বর্ত্তমানে সেই দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতুর আবির্ভাব বিফল হয় নাই। কিন্তু এই তালিকার শেষ দুই একটা নাম সাহিত্যের সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে আর শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তারপর গতসম্মিলনে ভাগলপুরের উপর যে যে কার্য্যের ভারার্পণ করা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। গত সম্মিলনের পর বারমাসের স্থলে চৌদ্দমাসে এই সম্মিলন হইল, তথাপি ভাগলপুরের কাজের পরিমাণ একটী সুবৃহৎ শূন্য বলিলেই চলে। ভাগ্যে কাশিমবাজারের বদান্য মহারাজের একটী প্রেস ছিল, তাই সম্মিলনের রিপোর্টখান ছাপা হইয়াছে মাত্র। রাজসাহীতে অনেকটা কাজ হইয়াছে। গত সম্মিলনেও তাহা উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় যে বিষয়টী ধরিয়া সম্মিলনের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ঐ বিষয়েই যা কিছু কাজ হইতেছে; তবে তাহার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অতি কম। "বারেন্দ্র ভ্রমণ" ব্যাপারটার সঙ্গে সম্মিলনের যোগ আছে কিনা, জানিনা—ঐদিকে একটা কার্য্যের চেষ্টা হইতেছে, সন্দেহ নাই। অতঃ-

পর ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনার জন্য যে নিয়মাবলীর খাসড়া উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা গতবর্ষে বিবেচিত হইয়া এই সম্মিলনে ঈষৎ পরিবর্ত্তিতাকারে পরিগৃহীত হইল। নিয়মাবলী যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, একথা বলিতে পারি না—আবশ্যক হইলে যে পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও আছে। তবে এতদিনে সম্মিলনের একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল, ইহাই সুখের বিষয়।

উপসংহারে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠিত হইয়া প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হইল।

রাত্রি আটটার সময় আলেকজেণ্ড্রা ক্যাসেল নামক প্রাসাদে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হয়। কাশিমবাজারের মহারাজ ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রায় তিনঘণ্টাকাল বিচার বিতর্ক হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মিলনের প্রস্তাবগুলির নূতনকলেবরের সঙ্গে দুই একটী নবীন প্রস্তাবও যোজিত হইয়াছিল।

পরদিন শনিবার ৭টার সময় সম্মিলনের পূর্ব্বাহ্ণিক অধিবেশন হইয়াছিল। আর একটী অভিনব বিষয় এই দিনে লক্ষ্য হইল। প্রথম দিবসে সভাস্থলে দুইটী সাহেব এবং অপর একটী এদেশীয় ব্যক্তি কোট-পেণ্ট-পরিহিত হইয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন; এই তৃতীয় ব্যক্তিটীকে তখন কোনও সরকারী কর্ম্মচারী সভাস্থলের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। পরদিন অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ইনিও আমন্ত্রিত হইয়া মাতৃভাষার সেবার্থ এই সম্মিলন ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি বিলাত ফেরত বলিয়াই বোধ হয় দেশীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করা উপযুক্ত মনে করেন নাই। কিন্তু স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের উদার আদর্শ দেখিয়াও যে তাঁহার সঙ্কোচ হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। পূর্ব্বতন সম্মিলনেও ঈদৃশ অনেকে সভায় গিয়াছিলেন,কিন্তু কেহই ধুতি চাদর পরিধান না করিয়া সভাস্থ হন নাই।

এইদিন প্রথমেই পূর্ব্ব রজনীতে নির্ব্বাচিত প্রস্তাবগুলির অনেকটী সভাপতি মহাশয় উপস্থাপিত করিলেন, এবং সভা কর্ত্তৃক ঐ গুলি পরিগৃহীত হইল। তৎপর ময়মনসিংহের অন্তর্গত সহর সেরপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর মহাশয় একটী প্রস্তাব করিলেন যে, দুঃস্থ সাহিত্যসেবিগণের সাহায্যার্থ একটী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক। তিনি স্বয়ং ইহাতে ১০০০৲ টাকা দান করিলেন, এবং আরও ৪০০০৲ টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অধিকন্তু নিজের রচিত একখানি কাব্য গ্রন্থের উপস্বত্ব এই ভাণ্ডারে অর্পণ করিয়া সভার ধন্যবাদ-পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর কলিকাতার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ও এই তহবিলে কিছু অর্থ এবং তৎপ্রণীত একখানি পুস্তকের উপস্বত্ব সমর্পণ করিয়া সহৃদয়তা প্রদর্শন করিলেন। ভগবান করুন যেন এই ভাণ্ডার চিরস্থায়ী হয়।

ইতিমধ্যে ময়মনসিংহের জনৈক ব্যক্তি তারস্বরে সভাপতি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, সভার কার্য্য অবৈধ রীতিতে পরিচালিত হইতেছে, কারণ ময়মনসিংহের অধিবাসীরা একটী "বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি" পূর্ব্বেই গঠন করিয়া রাখিয়াছিলেন, ঐ সমিতির মতানুসারে বিষয় নির্ব্বাচিত হয় নাই ইত্যাদি। ইঁহার আপত্তির মূলে সারবত্তা ছিল কিনা, জানি না, বিগত দিবসে সর্ব্বসমক্ষে যখন ঐ সমিতি গঠিত হয়, তখন যা-কিছু আপত্তি করা উচিত ছিল; বিশেষতঃ সম্মিলনে সমাগত সভ্যগণ ভিন্ন অন্য কাহারও বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন করিবার ক্ষমতা আছে কিনা সন্দেহ। এই বিষয়ে আপত্তিকারী এবং আরও দুই একজন ব্যক্তি সভাস্থলে যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে উপস্থিত সভ্যমাত্রেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। সকলেরই ইহা ধ্রুব জানা আছে যে, যেখানে বাঙ্গালী সেখানেই দলাদলি; তবে সভায় দূরদূরান্তর স্থান হইতে সমাগত ব্যক্তিগণের সমক্ষে ঐরূপ অহমিকা, কলহ-প্রিয়তা প্রভৃতি না দেখানই শিষ্টাচার-সঙ্গত। যাহা হউক, গম্ভীর-প্রকৃতি সভাপতি মহাশয় কথঞ্চিত প্রবোধ দিয়া এই গোলযোগের প্রতিবিধান করিলেন,—স্থির হইল,এই আপত্তিকারীর দল

রাত্রিতে আলেক্‌জান্দ্রা ক্যাসেলে গিয়া তাঁহাদের অভিযোগ মিটাইবেন।

এই বেলা হইতেই প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ হইল। অনেক প্রবন্ধের আমদানি হইয়াছিল—বিষয়ও নানাবিধ—ইস্তক গোরক্ষা নাগায়ৎ সূতিকাগৃহ। তবে রক্ষার পথ এই ছিল যে, প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই প্রকারান্তরে 'কবন্ধে' পরিণত হইয়াছিল, যাহা পড়িতে অৰ্দ্ধঘণ্টার দরকার, তাহা ১৩ মিনিটে পড়িবার ব্যবস্থা করাতে প্রবন্ধপাঠক স্বয়ংই উহার মুণ্ডপাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, যদি প্রবন্ধই পড়ার দরকার হয়, তবে স্থানীয় বিষয়ে স্থানীয় লোকগণ কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পাঠ নানা কারণে সমীচান—ইহাতে অভ্যাগত ব্যক্তি একই স্থানের তথ্য ও লেখকগণের পরিচয় পাইতে পারেন। সুখের বিষয়, এই সম্বন্ধে ময়মনসিংহ ভাল ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক রাজা কমলকৃষ্ণ হইতে নিতান্ত নবীন-লেখক পর্য্যন্ত অনেকের প্রবন্ধই সভাস্থলে পঠিত হইয়াছিল। এই বেলা পঠিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দুইটী প্রবন্ধ এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একটী জনৈক মুসলমান নব্য যুবক কর্ত্তৃক পঠিত "আরবী, পারস্য" শব্দাবলী বঙ্গাক্ষরে কিরূপে লিখিত হইবে, তৎসম্বন্ধীয়; অপরটী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত "ব্যাকরণ-বিভীষিকা।" শেষোক্ত প্রবন্ধটীতে ললিতবাবু রসালভাষায় বঙ্গীয় লেখকগণ যে সকল ব্যাকরণগত ভুল করিয়া থাকেন, তাহা প্রদর্শিত করিয়া সভাস্থলে হাস্যরসের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠের সময় সভাস্থলে অল্পবিস্তর গোলমাল চলিতেছিল, কিন্তু এই প্রবন্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী "নিবাত-নিষ্কম্প" দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া শুনিয়াছে—কেবল হাসির কথায় কলকোলাহলে আনন্দ প্রকাশ [illegible]তঃ সম্মিলনের মজলিসে [illegible]বন্ধ থাকিলে আসরে জমাট [illegible]নিক্ত করিয়া যদি চালাইতে [illegible] প্রকৃতি-নীরস ব্যাকরণের [illegible] হাস্তমুখে হজম করিতে [illegible]

প্রবন্ধের কাজ এইরূপে মধুরেন সমাপ্ত হইল।

অপরাহ্নে শনির শেষে সভায় গিয়া যেন একটা গরম হাওয়া অনুভব করিতে লাগিলাম, ললিত বাবুর সেই সুললিত ও সুমধুর প্রবন্ধে নাকি কোনও কোনও মহিলার রুচিতে আঘাত লাগিয়াছে! সভাপতি গম্ভীরপ্রকৃতি ডাক্তার জগদীশচন্দ্র নাকি কথাটা শুনিয়াই বলিয়াছিলেন "যদি তাঁহাদের চামড়া এইরূপ পাতলা হয়, তবে সভায় আসাই উচিত হয় নাই।" কিন্তু পরিশেষে স্বীয় সম্প্রদায়ের খাতিরেই হউক বা যে জন্যই হউক, তিনি যাহা করিলেন, তাহাতে একটু দুঃখিত হইলাম। "ললিত বাবু কোথায়?" বেচারা ললিত বাবু মহাপরাধ করিয়াছিলেন কিনা? তাই তাঁহাকে প্রকাশ্য সভায় প্রবন্ধটীর জন্য ক্রটী স্বীকার করিতে অনুরোধ করা হইল। তাঁহার হইয়া সভাপতি মহাশয় স্বয়ং দুটী কথা বলুন, ললিত বাবু পুনঃপুনঃ এই কথা বলাতেও পার পান নাই। তারপর ললিতবাবু উঠিয়া যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—আমি মনে করিয়াছিলাম আমার প্রবন্ধের লক্ষ্য লেখকবর্গ চটিবেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যে তাঁহারা চটেন নাই—ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন নাকি কয়েকজন মহিলা, যাঁহাদের এ সভায় আগমন অপ্রত্যাশিত এবং এই প্রথম; বলা আবশ্যক, যদিও তাঁহাদের শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসি নাই—তথাপি প্রবন্ধটীতে তাঁহাদের আপত্তিকর কোনও কিছু আছে বলিয়া আমার ত মনে হয় না। ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনিলাম, এই বক্তৃতায়ও নাকি কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

মহিলা-পর্ব্বের এখানে শেষ হয় নাই। "ভারত-মহিলা" পত্রের শ্রীমতী সম্পাদিকা একটী প্রবন্ধ সভায় পড়িবার জন্য আনিয়াছিলেন, উহা সম্মিলনের একজন বিশিষ্ট সভ্য পড়িয়া নাকি স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রবন্ধটী আমূল পরিবর্ত্তিত না করিলে সভায় ইহা পঠিত হইতে পারে না। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমতীর স্বামীর সঙ্গে নাকি ঐ সভ্যের এতৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। অবশেষে স্থির হয় যে, স্থানে

স্থানে বাদ দিয়া প্রবন্ধটীর কিয়দংশ পাঠ করা হইবে। তদনুসারে শ্রীমতী আসিয়া প্রবন্ধ পাঠ করেন—কিন্তু গোলমালের মধ্যে পুরুষের কণ্ঠই শুনা যায় না, রমণীর কণ্ঠত দূরের কথা। তাঁহার হইয়া অপর একব্যক্তি কিছুটা পাঠ করিলেন, তাহাও সকলে যে শুনিয়াছে, বোধ হইল না। যাহা হউক, কিন্তু প্রবন্ধপাঠের পর দেখিলাম, একখানি চির-কুটে সভাপতি মহাশয়কে জনৈক ব্যক্তি অনুরোধ করিলেন যে, এই মহিলাটীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ সকলের দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। অমনি সভাপতি মহাশয় তদর্থে আদেশ করিলেন এবং সভাস্থব্যক্তিবৃন্দ তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।*

ময়মনসিংহের এই অভিনব ব্যাপার অবলোকনে আমার মনে একটী চিত্র উদিত হইল; কেন হইল, হওয়া ঠিক কিনা, তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। পুরীধামে ৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়ার নিকটে একটী অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। সেই বৃক্ষের বীজ কোথায় সমূলে উৎপাটিত হইবে, না, তাহাতে একখণ্ড বস্ত্র ধ্বজ-রূপে অদূর-দর্শী পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" যাঁহার অংশভূতা, সেই মহামায়া এই সম্মিলনের কুশল করুন।

এই বৎসর সম্মিলনে কয়েকজন প্রাচীন ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী যোগদান পূর্ব্বক ইহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বহুকাল পরে "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ সহ সভাস্থ হইয়া আবার সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হইবার সূচনা দেখাইয়াছেন। বর্ষীয়ান শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও একটী বৈদিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করিয়া বিরাট সভামণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অতিশয় সময়োপযোগিনী হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে প্রাদেশিকতা যাহাতে প্রচলিত না হয়, তজ্জন্য তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের সমবেত সাহিত্যসেবীদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রাত্রি সাত ঘটিকার সময় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হইল।

সেই রজনীতে ময়মনসিংহের আপত্তি-কারিগণের তুষ্টির নিমিত্ত পুনশ্চ বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল—ইহাতে স্থির হয় যে, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা কল্পে সম্মিলনের অধিবেশনে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে।

তদনুসারে পরদিন রবিবার সাড়ে সাত ঘটিকার সময় যখন সভায় তৃতীয়দিনের অধিবেশন আরম্ভ হইল, তখনই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্বন্ধে যথারীতি বক্তৃতাদি হইয়া তদীয় স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব সভায় পরিগৃহীত হয়। এইদিনে আর একটী প্রস্তাব—বোধ হয় পূর্ব্বরাত্রের বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটিতে গঠিত—সভাস্থলে গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্ট রূপে বিভিন্ন ভাষা হইতে নানা বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ-সঙ্কলনার্থ সাহ বিধান নিমিত্ত একটী স্থায়ী ভাণ্ডার সৃষ্ট হ ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন যে ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন, তাহা ঐ দিনকার উল্লেখযোগ্য বিষয়। দিগন্তনিনাদী পটহ নির্ঘোষের পর যেমন মৃদঙ্গমুরজাদির ধ্বনি "নিষ্প্রভ" হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ঐ বক্তৃপ্রবরের বাক্‌ব্যাপারের পর কোমলকণ্ঠ সাহিত্যিকগণের বক্তৃতা বা প্রবন্ধ অবসাদজনক হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ তাদৃশ বক্তৃতা উচ্চকণ্ঠে বক্তৃবহুল রাজনীতিক সভায়ই শোভা পায়। সাহিত্যের আসর অনেকটা মাটি করিয়া দেয়। তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রের ইহা অনুপযোগী হইয়াছিল বলিতে পারি না। যেরূপ গোলযোগের আসর, তাহাতে এরূপ "বাঘা তেঁতুল" প্রয়োজনীয়ই

* প্রকৃত ব্যাপার যাহা, তাহা লিখিত হইল। ইহা লইয়া পত্রিকা বিশেষে সংস্কারকের ঢক্কানিনাদ হইতেছে—তাহা কতদূর সমীচীন, ভাবিবার বিষয়।

বটে। তারপর কতকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হইল; গোলমালে প্রায় গুলিই শুনা যায় নাই। তবে শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বঙ্গাক্ষরের ক্রমবিকাশ" কাষ্ঠফলকে প্রদর্শিত হওয়াতে সকলেরই মনোযোগ আকর্ষিত করিতে পারিয়াছিল।

অতঃপর ধন্যবাদ-পর্ব আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ ময়মনসিংহের ভদ্রলোকগণ সভাপতি-প্রমুখ অভ্যাগতদিগকে উপলক্ষ করিয়া ধন্যবাদ রাশি রাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তবে মাত্রা কিছু বেশী—একাদিক্রমে প্রায় সাত আটজন অনবরত লাগিলেন। মন্দ নয়—আমরা প্রবন্ধ পাঠে, প্রস্তাবাদি উপস্থাপন, সমর্থন এবং এই ধন্যবাদ প্রদানে ময়মনসিংহের অনেকেরই পরিচয় গ্রহণে সমর্থ হইলাম। তারপর যদিও বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর, তথাপি অভ্যাগতগণের পক্ষেও পাল্টা ধন্যবাদ প্রতিদান নিমিত্ত তিন চারিজনকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয়ের আমমোক্তার-নামা লইয়া সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করিয়া সম্মিলনের মধুরেণ সমাপন করিলেন।

সকলে গাত্রোত্থান করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এমন সময় জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি উঠিয়া ৺ চন্দ্রকান্ত—সূর্য্যকান্তের দোহাই দিয়া সভ্যগণের আরও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য পরীক্ষার্থ তাঁহাদিগকে থামাইয়া হঠাৎ ডাক্তার জগদীশকে সভাপতির আসন হইতে সরাইয়া, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে তাঁহার স্থানে সংস্থাপিত করিয়া ৺ চন্দ্রকান্তের স্মৃতিরক্ষার্থ এবং সহসা-উত্থাপিত ৺ সূর্য্যকান্তের স্মৃতি রক্ষার্থ দুইটী কমিটি গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। এই কার্য্যে বিশেষ বিলম্ব হইল না বটে, কিন্তু সভাপতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, তথা হঠাৎ চন্দ্রের [illegible]বণ ইত্যাদি ব্যাপার সম্যক হৃদয়ঙ্গম [illegible] অসমর্থ হইয়া অনেক বিরক্তি প্রকা[illegible]লেন। বেলা প্রায় ৯টার [illegible] সম্মিলনের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা প[illegible]

[illegible]লে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টিঝড় হইতে লাগিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইতঃপূর্ব্বে ঐরূপ হয় নাই; তাহা হইলে সম্মিলনের কার্য্যের বহু ব্যাঘাত ঘটিত। যাহা হউক, ময়মনসিংহে এই সম্মিলন উপলক্ষে একটী প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল, বৃষ্টিঝড় উপেক্ষা করিয়া অনেকে উহা সেইদিন সায়ংকালে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রদর্শনী সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইলেও, উহাতে কৃষিজ, প্রাণিজ, খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের ভূরি সমাবেশ হইয়াছিল। এই জন্যই বোধহয় উহা ভিন্ন-স্থলে স্বতন্ত্র ভাবে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক সম্মিলনের অধিবেশনের একটু পূর্ব্বেই খোলা হইয়াছিল। কিন্তু প্রদর্শনীতে সাহিত্য-সেবিগণের দেখিবার ও জানিবার অনেক জিনিষ ছিল। প্রদর্শনীতে ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক উপকরণ বহু সংগৃহীত হইয়াছিল। এমন কি, অনেক পল্লীগ্রামের কাহিনীও নথিবদ্ধ হইয়া প্রদর্শনী-গৃহের প্রাচীরে ঝুলিতেছিল। হায়, এই প্রদর্শনীটী যদি সভামণ্ডপের, তথা অভ্যাগতগণের আবাস-স্থলের একপার্শ্বে হইতে পারিত, যদি অন্ততঃ একটী দিন রচনা বক্তৃতাদি বন্ধ করিয়া সভাসমক্ষে একে একে ঐতিহাসিক জিনিস গুলির প্রদর্শন বা অন্ততঃ নামোল্লেখও হইত, তবে সম্মিলনের সমবেত সাহিত্যসেবিগণ ময়মনসিংহের অনেক কথা জানিয়া যাইতে পারিতেন! ফলকথা, প্রদর্শনী যাঁহাদের দেখা উচিত ছিল, তাঁহারা অনেকে ইহা আদৌ দেখিতেই পান নাই। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাও দ্রুত কাজ সারিতে গিয়া সমাহৃত দ্রব্যগুলির উপর চক্ষুঃ বুলাইয়া মাত্র আসিয়াছেন। যাহা হউক, এতদুপলক্ষে যে এই আয়োজন হইয়াছিল, তজ্জন্যই ময়মনসিংহের উদ্‌যোগিগণ ধন্যবাদের পাত্র। দূর দেশান্তর হইতে আগত অভ্যাগতেরা নাই দেখিলেন, যদি ময়মনসিংহের লোকেরা তাঁহাদের আপন জেলার জিনিষগুলি তন্ন তন্ন ভাবে দেখেন, এবং তৎসম্বন্ধে সাহিত্যিক আলোচনা করেন, তাহাতেও অনেক লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

ঐ দিন রাত্রি আট ঘটিকার সময় টাউন-

হল গৃহে ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র তদীয় অভিভাষণে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক বিষয় যন্ত্র ও আলোক-সাহায্যে বিবৃত করিয়াছিলেন। মেঘবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়াও বহুলোক ঐ হলে উপস্থিত হইয়া নীরব নিষ্পন্দভাবে ডাক্তার বাবুর বক্তৃতা শ্রবণ ও তৎপ্রদর্শিত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই জনতায় কোনও রাজা মহারাজা ছিলেন না; শুনিলাম, তাঁহারা পূর্ব্বদিনই এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছেন—অর্থাৎ কেবল তাঁহাদেরই জন্য ডাক্তার জগদীশ শনিবার রাত্রিতেও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। এই জমিদার সঙ্কুল ময়মনসিংহে তাঁহাদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থাটার বোধ হয় নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছিল!

বক্তৃতাবসানে জনৈক সাহিত্যিক ডাক্তার বসুর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সমকালে বঙ্গভাষায় যে ঈদৃশ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হইতে পারে, ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করাতে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত বাঙ্গালীরই জানিয়া রাখা উচিত, তিনি বলিলেন, "দোষ ভাষার নয়, দোষ আমাদের, বলিতে জানিলে বঙ্গভাষায় সমস্তই প্রকাশ করা যাইতে পারে।"

দুই একজন ব্যতীত প্রায় সমস্ত অভ্যাগত সাহিত্য-সেবী পরদিন সোমবারে ভোরের গাড়ীতে ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

গীত ও কবিতা। *

রোধিত কণ্ঠে বোধিত বীণা
আজ বাজিবে কিনা আজ বাজিবে কিনা,
মূকের যেমন বুকের বাসনা
রহে চিরদিন আঁধারে লীনা!
রুদ্ধকণ্ঠে কেমনে সেবি,
কণ্ঠবাসিনী বাক্‌দেবী,
সকলি বিফল সকলি ব্যর্থ
স্বাধীনা ভাষা ভৈরবী বীণা!
ত্রাসিত অন্তর ত্রাসিত অস্ত্র,
বিবশ বিকল জীবন যন্ত্র,
শোষিত পুরাণ ক্লেশিত তন্ত্র,
কাতর মন্ত্র শকতি-হীনা!
পূজিব জননী তথাপি আশা,
না থাক্ শক্তি না থাক্ ভাষা,
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে আকাঙ্ক্ষা পিপাসা,
বুঝিবে জননী সরোজাসীনা!

১

ভ্রাতৃগণ!
আজি এই পুণ্যতীর্থে মিলেছি আমরা,
হেথা ব্রহ্মপুত্র নদ,—দেয় মোক্ষ মুক্তি পদ,—
জগতের অবিনাশী পাপ নাশ করা!
প্রভাসে পুষ্করে আহা, ঘুচে না মুছে না যাহা,
যে পাতক শত অশ্রু শত শোক ভরা,
শত তীর্থ গয়া কাশী, নাশে না যে পাপরাশি,
যমুনা জাহ্নবী শত শত পাপ হরা,
আজি সেই পুণ্যতীর্থে মিলেছি আমরা।

২

তুলনা মিলে না এর খুঁজে দেখ ধরা,
কোন্ তীর্থে মাতৃঘাতী হারে ভারতের জাতি,
হাতের কুঠার খসে মাতৃবধ করা?
হারে হিন্দু মুসলমান, ভাই ভাই ভিন্নজ্ঞান,
এমন অবোধ কেরে আপনা পাসরা,
এমন জঘন্য ঘৃণা, এ জগতে তোরা ভিন্ন,
কে হেন পতিত চির মহাপাপে মরা?
এই তীর্থে মাতৃবধে, এই ব্রহ্মপুত্র নদে
সে পাপ ধুইয়ে যায় শত দুঃখভরা,
কোথা আছে হেন তীর্থ খুঁজে দেখ ধরা!

৩

মাতৃহত্যা পাপে কারো নাহি পরিত্রাণ,
নাহি প্রায়শ্চিত্ত তার, নাহিক উদ্ধার আর,
অনন্ত নরকে তার চির অবস্থান।

---

* কবিতাটী ১৩১৮ সালের ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হইয়াছে।

সে যে জগতের কাছে, জীবনে মরিয়া আছে,
কেবল অদৃষ্টে তার ঘৃণা অপমান,
নাহি মিলে ভিক্ষা তার, শুধু অশ্রু হাহাকার,
অনাহারে অনশনে সদা যায় প্রাণ !
বাহু-শূন্য রাহু যথা, ভ্রমে হায় যথা তথা
লইয়া অনন্ত ব্যথা নিশি দিনমান,
তেমনি সে হায় হায়, সুখ চায় শান্তি চায়,
রাখেনি তাহার শান্তি কোথা ভগবান !
মাতৃহত্যা পাপে কারো নাহি পরিত্রাণ !

৪

মাতৃভক্তি ব্রহ্মকুণ্ড পবিত্র নির্ম্মল—
বহি আনে ব্রহ্মপুত্র পুণ্যপূত জল !
তাই ইহা পুত্র নামে, বিখ্যাত ধরণীধামে,
নাশে মহা অবিনাশী পাতক সকল,
মাতৃঘাতী ভৃগুরাম বিধাতা যাহারে বাম—
দিল তারে মহামুক্তি মহা মোক্ষ ফল !
কুঠার খসিল হাতে, মাতৃভক্তি মহিমাতে,
লভিল মায়ের নামে পুনঃ তপোবল,
জগতে হইল ধন্য, গেল যত দুঃখদৈন্য,
[illegible] শিরে মঙ্গল কুশল !
মায়ের চরণামৃত ব্রহ্মপুত্র জল !

৫

[illegible]পুণ্য তীর্থে আজ মিলেছি আমরা,
তুলনা মিলে না এর খুঁজে দেখ ধরা !
হিন্দু মুসলমানে দ্বেষ, নাহি ভ্রাতৃস্নেহ লেশ,
পর[illegible]প্রাণ ঈর্ষা বুকভরা,
এ বিষম ভ্রাতৃভেদ-কুঠারে হইল ছেদ
মায়ের কোমল বক্ষ—মা ইহাতে মরা !
এস আজ হেথা ভাই, এ পাতক ধুয়ে যাই,
এই দ্বেষ এই হিংসা—মাতৃবধ করা,
এ কুঠারে আমি তুমি, ছেদিয়াছি মাতৃভূমি
জননী আনন্দময়ী শ্যামলা উর্ব্বরা !
ব্রহ্মপুত্র পুণ্যজলে, জননী-ভক্তির বলে,
পাইব অনন্ত মুক্তি শোকতাপ-হরা !
ঘুচিবে সকল ক্লেশ, ঘুচিবে মলিন বেশ,
উজলিবে দিক্ দেশ সারা বসুন্ধরা,
বিশ্ব দিবে জয়ধ্বনি, অলকা বর্ষিবে মণি,
দেবতা বর্ষিবে সুধা পারিজাত ভরা,
জগতে হইব ধন্য আবার আমরা !

৬

জগতে আমরা ধন্য হইব আবার,
উদার ইংরাজ-রাজ, মোদের সহায় আজ,
নাহিক অবধি তার কৃপা করুণার !
আমাদের রক্ষা হেতু, দিগ্বিজয়ী সিংহকেতু,
ভারত-আকাশে আজি উড়িয়াছে তার,
বিধির এ অনুগ্রহ, আনন্দে আহ্লাদে লহ,
অবহেলে এ সুযোগ হারায়ো না আর !
এস ভাই গলা ধরি, সবে আলিঙ্গন করি,
ভুলিয়া নীচতা স্বার্থ যাহা আছে যার,
জগতে আমরা ধন্য হইব আবার !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সাংখ্যসূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[illegible]কার্য্য নিরূপণ।

[illegible]ভাব আত্মার মোক্ষার্থ, [illegible]য প্রধানের (কর্ত্তৃত্ব।) [illegible]ামীত্ব প্রতিপাদন জন্য [illegible]তি হইতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বুঝান হইয়াছে। ইহা বুঝিলে পুরুষের বিবেক সিদ্ধি হয়। শাস্ত্রে আছে—

"বিকারং প্রকৃতিঞ্চৈব
পুরুষঞ্চ সনাতনং।
যো যথাবদ্বিজানাতি
স বিতৃষ্ণো বিমুচ্যতে॥"

এই বিবেক জন্য এই অধ্যায়ে বিকার বা সৃষ্টির তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

এই সূত্রে সৃষ্টির প্রয়োজন নিরূপিত হইয়াছে।

পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত বটে, কিন্তু প্রতি-বিম্বরূপ দুঃখ সে ভোগ করে। সেই প্রতি-বিম্বরূপ বা প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ হেতু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পুরুষের ভোগের জন্য ও মোক্ষের জন্য প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু মোক্ষই প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। এজন্য এস্থলে কেবল মোক্ষই উল্লিখিত হইয়াছে। (বিঃ ভিঃ)

মুক্তস্বভাব আত্মার অভিমানিত্ব কর্ত্তৃত্বাদি হইতে বিমুক্তর জন্য প্রকৃতি বা প্রধানের জগৎ সৃষ্টি প্রবৃত্তি। প্রকৃতি হইতে সুখ দুঃখ মোহাত্মক জগৎ সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে দুঃখে পুরুষের স্বভাবতই বৈরাগ্য হয়। এবং তাহা হইতে মুক্তির জন্য পুরুষ প্রবর্ত্তিত হয়। আর সুখও দুঃখযুক্ত বলিয়া, সুখসম্বন্ধেও বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। বৈরাগ্য চতুর্ব্বিধ :—যতমান সংজ্ঞা, ব্যতিরেক সংজ্ঞা, একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা ও বশীকার সংজ্ঞা।

যে অনাগত দুঃখ হয়, তাহা ২১ প্রকার, যথা—শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয় বিষয়, ছয় বুদ্ধি ও সুখ এবং দুঃখ। ইহার মধ্যে শরীর দুঃখের আয়তন। ইন্দ্রিয়, বিষয়ও বুদ্ধি তাহার সাধন। সুখ দুঃখানুসঙ্গী বলিয়া দুঃখ। দুঃখ—যাতনা, পীড়া সন্তাপাত্মক।

অবিদ্যা, তৃষ্ণা বা ধর্ম্মাধর্ম্ম—দুঃখের অসাধারণ কারণ। অবিদ্যা = বিপরীত জ্ঞান ও তাহার সংস্কার। ইহাই তৃষ্ণাদির অসাধারণ হেতু।

দুঃখোৎপত্তির অত্যন্ত নিবৃত্তি = হান (অর্থাৎ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি)।

আত্মজ্ঞান = হানোপায়। তাহাতে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়। শ্রুতিতে আছে :—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপ-পত্তিভিঃ।

"মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

"তরতি শোকমাত্মবিদ্"...ইত্যাদি শ্রুতি।

আত্মা দ্বিবিধ—পর ও অপর। শ্রুতিতে আছে :—

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চা পরমেব।"

পরাত্মা = বিভু ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট, সংসারধর্ম্মে অসংসৃষ্ট—ভগবান্ মহেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা। তাঁহাকে—অনুমান ও আগম হইতে জানা যায়। অনুমান দ্বারা তাঁহাকে সামান্যভাবে জানা যায়। যথা—"বিবাদাধ্যাসিতং উপলব্ধং সৎকারণকং অভূত্বাভাবিত্বাৎ চিত্রবৎ—ইতি অনুমানং।"

সামান্য অনুমানের পরে, যোগের দ্বারা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানা যায়।

অপর আত্মা = জীব। তাহা নিজ অনু-ভবসিদ্ধ।

এই পর ও অপর আত্মার বিবেক-জ্ঞান জন্মাইবার জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। ইহাই প্রকৃতির পরার্থ প্রবৃত্তি। আর পুরুষকে নিজের রূপ দেখাইবার জন্য যে প্রকৃতির প্রবৃত্তি, তাহা স্বার্থ। যেমন বৃক্ষের ফল জন্মাইবার প্রবৃত্তি, সেইরূপ। (অনিঃ)

(বলা বাহুল্য যে অনিরুদ্ধের উক্ত ব্যাখ্যা বেদান্তের অনুযায়ী।)

২। বিরক্ত পুরুষেরই মোক্ষ সিদ্ধি হয়।

তীব্র বৈরাগ্যই মোক্ষের কারণ। শ্রুতিতে আছে—পুত্রৈষনায়াশ্চ, বিত্তৈষণায়াশ্চ, লোকৈ-

ষনায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।"

"শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যেৎ।" (অনিঃ)

বিরক্ত = জন্মমরণ পীড়াদিরূপ নানা দুঃখে অত্যন্ত তাপিত। একবার সৃষ্টি হইতে মোক্ষ সম্ভব নহে। পুরুষ বহুবার জন্মমরণ-ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ দুঃখ দ্বারা পরিতপ্ত হইলে, তবে তাহার বৈরাগ্য জন্মে, ও বৈরাগ্য হইতে মুক্তি হয়। এজন্য পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির প্রয়োজন। (বিঃ)

৩। শ্রবণ মাত্রেই তাহার সিদ্ধি হয় না। কারণ অনাদিবাসনা অতি প্রবল, তাহার সিদ্ধি—অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধি।

বৈরাগ্য হইলে শাস্ত্রার্থ শ্রবণ ও গুরূপদেশ গ্রহণদ্বারা মুক্তি হয় বটে, কিন্তু যত কাল অনাদি বাসনা প্রবল থাকে, বৈরাগ্য জন্মে না, ততকাল শাস্ত্রার্থ শ্রবণে ফল হয় না। বাসনা থাকিলে বৈরাগ্য দূর হয় না, চিত্ত বিক্ষেপ থাকে, নিদিধ্যাসন হয় না। (অনিঃ)

বহু জন্মকৃত পুণ্যফলে শ্রবণ হয় বটে, কিন্তু শ্রবণমাত্রে বৈরাগ্য সিদ্ধি হয় না। তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন। তাহাও [illegible] ঘটে না। কেন না অনাদি মিথ্যা-বাসনা বড় প্রবল থাকে। তাহাতে দুঃখকে দুঃখ বলিয়া সহজে বোধ হয় না। যোগ-নিষ্ঠা দ্বারাই বৈরাগ্য সাক্ষাৎকার হয়। তাহাতে বহু বিঘ্ন, এজন্য বহুজন্মের প্রয়োজন।

এই জনাই বহুবার সৃষ্টির প্রয়োজন। দুঃখাদি ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাতে বিরক্তি জন্মে। তাহা দুঃখ বলিয়া ধারণা হয়। তখন বৈরাগ্য হয়। পরে মুক্তি হয়। (বিঃ)

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ইহা সাধনার [illegible]। কেবল শ্রবণে সিদ্ধি হয় না। মনন দ্বারা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া পরে নিদিধ্যাসনে তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতে হয়। পূর্ব্বজন্মে যাহাদের নিদিধ্যাসন পরিপাক হইয়াছে, তাহাদেরই কেবল শ্রবণ দ্বারা সিদ্ধি হয়।

৪। অথবা যেমন বহু ভৃত্যের মধ্যে প্রত্যেককে (মুক্ত করিতে প্রকৃতির প্রবৃত্তি।)

যেমন বহু ভৃত্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় (প্রত্যেক অর্থে এস্থলে কোন এক) সেইরূপ কোন জীব উৎকট বৈরাগ্য লাভ করিলে মুক্ত হইতে পারে।

বহু দাস মধ্যে প্রভুকে যে বিশেষ আরাধনা দ্বারা তুষ্ট করে, সেই মুক্ত হয়। জীবসম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রকৃতিকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তবে মুক্তি হয়। (অনিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন :—

যেমন এক গৃহস্থকে অনেক পোষ্যের ভরণ পোষণ করিতে হয়, কাহারও ভরণ পোষণের ব্যবস্থা হইলেও অন্যের ভরণপোষণ জন্য গৃহস্থের চেষ্টা করিতে হয়, তেমনি, কোন কোন পুরুষের মুক্তি হইলেও অন্য পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতির বহুবার চেষ্টা করিতে হয়। সত্ত্বাদি গুণের প্রত্যেকেরও সেইরূপ অসংখ্য পুরুষকে মুক্তিসাধনযোগ্য করিতে হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সাংখ্য মতে পুরুষ এক নহে, বহু—অনন্ত। সকল পুরুষেরই এককালে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এজন্য যতদিন সকল পুরুষ মুক্ত না হইবে, ততদিন সৃষ্টি থাকিবে। আবার অনন্ত সংখ্যার মধ্যে কতকের মুক্তি হইলেও সেই অনন্ত সংখ্যার মুক্তিই বাকী থাকে। অনন্ত হইতে সান্ত সংখ্যা বাদ দিলে সেই অনন্তই অবশিষ্ট থাকে। এজন্য সৃষ্টি অনাদি অনন্ত। এজন্য পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয়।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ—এই যোগ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫। প্রকৃতি বাস্তব হেতু তাহাতে পুরুষের অধ্যাস সিদ্ধি হয়।

প্রকৃতি নিত্য সর্ব্বব্যাপী। তাহাতে বদ্ধ পুরুষের অধ্যাস হয় বা ছায়া পড়ে। সেইজন্য প্রকৃতির পরিণামীত্ব কর্ত্তৃত্বাদি পুরুষ আপনাতে অধ্যাস বা আরোপ করে। পরস্পর প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, প্রকৃতি পুরুষ ভাবাপন্ন হয়, ও পুরুষ প্রকৃতি ভাবাপন্ন হয়। এজন্য উভয়ের বিবেক জ্ঞান সহজে হয় না। কেবল যে বিবেক দ্বারা প্রকৃতিপুরুষের স্বরূপ দেখিতে পায়, সে-ই মুক্ত হয়। (অনিঃ)

"যস্যাত্মা মালিনোঽস্বচ্ছো
বিকারীস্যাৎ স্বভাবতঃ।
নহি তস্য ভবেন্মুক্তি
জন্মান্তর শতৈরপি॥"

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেনঃ—

বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব—প্রকৃতির, পুরুষের নাই। পুরুষে তাহা আরোপিত হয়। যেমন যোদ্ধার জয় পরাজয় রাজাতে আরোপিত হয়।

কিন্তু পুরুষ হইতে সৃষ্টির কথা শ্রুতিতে আছে। যথা—

"এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ।" ইত্যাদি। অর্থাৎ এই আত্মা হইতে আকাশের সৃষ্টি হয়—ইত্যাদি। কিন্তু এই সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব অধ্যাস মাত্র। প্রকৃতিই স্রষ্টা। পুরুষে তাহার অধ্যাস হয় মাত্র। "অজামেকং" প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কল্পিত হয়। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। কূর্ম্মপুরাণে আছে—

শক্তি শক্তিমতোর্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ।
অভেদং চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ব চিন্তকাঃ॥

৬। কার্য্য হইতেই তাহা সিদ্ধ হয়।

প্রকৃতির কার্য্যের অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদির বিরাম বা বিচ্ছেদ নাই। তাহাতেই প্রকৃতির বন্ধকত্ব সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি প্রবৃত্তিস্বভাব বলিয়া পুরুষদের বদ্ধ করিয়া প্রবর্তিত করে। (অনিঃ)

প্রকৃতি স্বপ্নতুল্য—না বাস্তব? কর্ত্তার ব্যাপার ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কার্য্য অর্থ ক্রিয়াকারী, অতএব ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণের দ্বারা বাস্তবিক কার্য্য হইতে প্রকৃতির সৃষ্টি কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতে কার্য্য অনিত্য বলিয়া প্রকৃতিকে অসৎ বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় একেবারে অলীক নহে।

৭। কণ্টক হইতে মুক্তির ন্যায় চেতনের উদ্দেশে এই নিয়ম।

পথে কণ্টক দেখিলে, যেমন বিজ্ঞলোক সেই পথগামী ব্যক্তিকেই সাবধান করিয়া দেয়, অন্যকে দেয় না, তেমনই প্রকৃতি সকল চেতনের উদ্দেশে প্রবৃত্তিমতী হয় না। কেবল বদ্ধ আত্মার মুক্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি। বদ্ধ পুরুষকেই প্রকৃতি আপন কার্য্য দেখায়। অন্যের নিকট উদাসীন থাকে। (অনিঃ)

চেতন=অভিজ্ঞ। যে কণ্টকের স্বরূপ জানে, সে কণ্টক পরিহার করিতে পারে; যে স্বরূপ জানে না, সে কণ্টকবিদ্ধ হয়। সেইরূপ প্রকৃতি জ্ঞানীকে বা মুক্তকে দুঃখ দিতে বা বদ্ধ করিতে পারে না; কেবল অবিবেকীকেই বদ্ধ করে।

আর এক অর্থ। কথায় আছে "কণ্টকেনৈব কণ্টকং।" পুরুষকে অবিবেক হইতে মুক্তি দিবার জন্যই প্রকৃতি তাহার কর্তৃত্ব পুরুষে অধ্যাস করে।

৮। অন্য যোগেও তাহা সিদ্ধ হয়,

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে; যেমন (অগ্নি-যোগে) লৌহ দাহ করে।

অন্যের সহিত অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত যোগ হওয়াতেই—তাহা অর্থাৎ পুরুষের বন্ধন সিদ্ধ হয়। বা প্রকৃতির প্রবর্ত্তন সিদ্ধ হয়। তাহা তত্ত্বতঃ নহে। যেমন লৌহের দাহকত্ব। অগ্নি সংযোগেই লৌহের দাহকত্ব উক্ত হয়।

(অনিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,—প্রকৃতির সহিত যোগ থাকিলেও পুরুষের সাক্ষাৎ সৃষ্টি কর্তৃত্বের সিদ্ধি হইতে পারে না। সংযোগ বশতঃ তাহা পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। অতএব পুরুষের মহত্তত্বাদি রূপ পরিণাম হইতে পারে না। তাহা প্রকৃতির। তবে পুরুষে তাহা আরোপিত হয় মাত্র।

যেমন তপ্ত লৌহ দগ্ধ করিলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লৌহের দাহিকা শক্তি নাই। সেইরূপ প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই।

৯। রাগ ও বিরাগের যোগই সৃষ্টি।

ভাষ্যকারদের অর্থ হইতেই এই সূত্রের এইরূপ অনুবাদ হইবে, যথা—

রাগ বৈরাগ্য হইতে যোগ ও সৃষ্টি।

রাগ হইতে প্রকৃতির প্রতি আসক্তি। আসক্তি হইতে সৃষ্টি হয়। আর বৈরাগ্য হইতে যোগ বা (মুক্তি) হয়।

বিষয়ে অনুরাগ হইতে সৃষ্টি হয়, এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগ—অর্থাৎ আত্মা স্বরূপে অবস্থান হয়। তখন চিত্তের কোন বৃত্তি প্রকাশ পায় না। তাহাতে মুক্তি হয়।

[illegible] ইহা সিদ্ধ হয়। রাগ ও বৈরাগ্য উভয়ই প্রকৃতির ধর্ম্ম। রাগ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। বৈরাগ্য মুক্তির কারণ।

ভাষ্যকারদের উক্ত অর্থ ব্যতীত এ সূত্রের অন্য অর্থ হয়। তদনুসারে এই সূত্রের অনুবাদ হইয়াছে। রাগ = সুখজ বিষয়ে আকর্ষণ; বিরাগ দুঃখজ বিষয়ে দ্বেষ বা প্রত্যাখ্যান। সৃষ্টির সর্ব্বত্র এই রাগ দ্বেষ বা আকর্ষণ বিক্ষেপের ক্রিয়া। ইহাদের যোগই সৃষ্টির মূল। যখন সকল রাগ বিরাগ দূর হয়, বৈরাগ্য হয়, তখন মুক্তি হয়।

১০। মহদাদি ক্রমে পঞ্চভূতদের (সৃষ্টি।)

শ্রুতিতে আছে, আত্মা হইতে আকাশের সৃষ্টি, ইত্যাদি স্থলে মহত্তত্বাদি পূর্ব্বক সৃষ্টি বুঝিতে হইবে। ইহার প্রমাণ এই যে, যেমন ঘট সৃষ্টিতে অন্তঃকরণ বৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তীতা আবশ্যক, সেইরূপ অন্তঃকরণ অতিরিক্ত সমুদায় সৃষ্টিতেই অন্তঃকরণ বৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তীত্বের অনুমান করিতে হয়। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ।
খং বায়ুর্জ্যোতি রাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী॥

শ্রুতিতে আছে,—

স প্রাণমসৃজৎ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ু ইতি।

শ্রুতি উক্ত এই প্রাণই মহত্তত্ব। বেদান্ত সূত্রে আছে—

'অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ।'

ইত্যাদি সূত্রে মহত্তত্বাদি ক্রমে সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মার বহু হইবার কল্পনা, কামনা বা ভাবনাই মহত্তত্ব বা বুদ্ধিতত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে মন, তাহা হইতে অহঙ্কার। আত্মা হইতে এই মহ-

স্তত্ত্বাদি ক্রমে আকাশাদির উৎপত্তি হইয়াছে।
(বিঃ ভিঃ)

১১। ইহাদিগের আরম্ভ আত্মার জন্য,ইহাদের নিজের জন্য নহে।

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র। তন্মাত্র হইতে স্থূলভূত, এইরূপে প্রকৃতির ন্যায় মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র ইহারাও সৃষ্টির কারণ। ইহারা এক অবস্থায় কার্য্য,আর এক অবস্থায় কারণ। ইহারা কার্য্যকারণ উভয়াত্মক। এইজন্য ইহাদের প্রকৃতিবিকৃতি বলে। ইহাদের এই সৃষ্টি পুরুষের প্রয়োজন জন্য।

পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধনার্থই এই মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি কর্তৃত্ব নিরূপিত আছে। তাহাদের স্বার্থ হেতু কোন আরম্ভ নাই। মহত্তত্ত্বাদি বিনাশী, তাহা প্রধানে লয় হয়, এজন্য তাহাদের মোক্ষত্ব নাই। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি হয়। তাহারা পুরুষের জন্য ক্রিয়াশীল হয় মাত্র। তাহাদের নিজের কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের মোক্ষের নিমিত্ত সৃষ্ট কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বল্লাল সেনের তাম্র-শাসন।

বিগত ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের প্রবাসী পত্রে "বল্লাল সেনের তাম্রশাসন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু পাঠ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। কারণ শাসন পত্রের পাঠ ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, এবং বিশ্বরূপ সেন দেবের কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু বংশের স্থাপন-কর্ত্তা বিজয়সেন কিম্বা তৎপুত্র বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং নূতন আবিষ্কৃত বল্লাল সেনের তাম্র-শাসনের ঐতিহাসিক মূল্য যে খুব বেশী,তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণসেন দেবের একখণ্ড তাম্র-শাসন সর্ব্বপ্রথম সুন্দরবনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ৺ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে"র দ্বিতীয় ভাগের ৩৭১ পৃষ্ঠায় তাহার ভ্রমসঙ্কুল পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভারতীতে তাহা আমি সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছিলাম। (১) লক্ষ্মণসেন দেবের দ্বিতীয় তাম্রশাসন দিনাজপুরের অন্তর্গত প্রাচীন দেবকোট নগরীর ৬।৭ মাইল দূরবর্ত্তী তর্পণদীঘির নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। (২) লক্ষ্মণ সেন দেবের তৃতীয় তাম্র শাসন রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আনুলীয়া নামক গ্রামে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মালদহের পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার পাঠোদ্ধার করেন। বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। (৩) উল্লিখিত তিন

(১) ভারতী। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ, ৪৩৩ পৃষ্ঠা।

(২) J. A. S. B. Vol XLIV, Part I, p 1—15

(৩) J. A. S. Vol LXIX, Part 1, p 61—65

খণ্ড তাম্র-শাসনের মধ্যে সুন্দর বনের তাম্র-শাসন ২ লক্ষ্মণাব্দ, আনুলীয়ার তাম্রশাসন ৩ লক্ষ্মণাব্দ এবং তর্পণদিঘীর তাম্রশাসন ৭ লক্ষ্মণাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ কেশব সেন দেবের তাম্রশাসন বাখরগাঞ্জর অন্তর্গত ইদিলপুর পরগণায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার পাঠ ও অনুবাদ বিজ্ঞবর প্রিন্‌সেপ সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। (৪) লক্ষ্মণসেন দেবের তৃতীয়পুত্র বিশ্বরূপ সেন দেবের তাম্রশাসন শ্রীমান্ বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশ করিয়াছেন। (৫)

রাজসাহীর (দেওপাড়ার) শিলালিপি ব্যতীত, বল্লালসেনের তাম্রশাসন সেন রাজগণের সর্ব্ব প্রাচীন ক্ষোদিতলিপি। রাজসাহীর শিলালিপি মহারাজ বিজয় সেনদেবের নির্ম্মিত শিবমন্দির গাত্রে সংযোজিত ছিল। বিজেতা মুসলমানগণ সেই মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার উপকরণ দ্বারা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করত শিলালিপিখানা নিকটস্থ পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আর বিজেতা ইংরেজ তাহা উদ্ধার করত জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। ধন্য ইংরেজ। পণ্ডিতমণ্ডলির সাহায্যে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করত শুদ্ধ অনুবাদের সহিত শ্রীযুক্ত মেটকাফ সাহেব এসিয়াটীক সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় স্বীয় মন্তব্যের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। (৬) তাহাতে নানা প্রকার ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়ায়, ডাক্তার কিলহরণ উক্ত শিলালিপির প্রতিলিপি, পাঠ ও অনুবাদ স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। (৭) ডাক্তার কিলহরণের অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। "ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী" পত্রিকায় ডাক্তার কিলহরণের মৃত্যুসংবাদ পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি খাটী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা বহু পরিমাণ ঐতিহাসিক ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে।

বল্লাল সেনের তাম্রশাসনের বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী অধ্যায়ের তর্কিত বিষয়গুলি অভ্রান্ত ভাবে নির্নীত হইবে। শাসন পত্রের প্রথম শ্লোক ছন্দঃপাত ও অন্যান্য দোষে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকের কোনরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। তৃতীয় শ্লোকের বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইলে একটী প্রবল তর্কের মীংমাসা হওয়ার সম্ভব। পাঠাশুদ্ধি ব্যতীত কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। তৎসমস্ত মুদ্রাকর প্রমাদও হইতে পারে।

উক্ত শাসনপত্রে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" বীরসেনের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই বীরসেনকে আদিশূর নির্ণয় করিয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় বলেন বলেন যে, এই বীরসেন সামন্ত সেনের পিতা, হেমন্ত সেনের পিতামহ, বিজয় সেনের প্রপিতামহ এবং বল্লাল সেনের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। বীরসেন, সামন্ত সেন এবং হেমন্তসেন পূর্ব্ববঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। বিজয় সেন সমগ্র বাঙ্গালা অধিকার করত গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। (৮) আমাদের

---

(৪) J. A. S. B. Vol. VII, p 40—57

(৫) J. A. S. B. Vol LXV, Part I, p 1—15

(৬) J. A. S. B. Vol, XXXIV, Part I, p 128—154

(৭) Ipigraphia Indica, Vol I, p 305-315

(৮) Indo-Aryans Vol II, p 203

মতে বীরসেন দাক্ষিণাপথ-নিবাসী জনৈক নরপতি। তিনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। বরং বলিলে তাঁহাকে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে। তাঁহার সহিত বঙ্গদেশের কোন সংশ্রব নাই। এই বীর সেনের বংশে সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন; তৎপুত্র বিজয় সেন। এই বিজয় সেনই প্রথমত গৌড়ে বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। সামন্ত সেন কিম্বা হেমন্ত সেনের সহিত বঙ্গদেশের কোন সম্পর্ক ছিল না।

বল্লাল সেনের তাম্রশাসনের বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইলে মৎপ্রণীত "সেনরাজগণ" পুস্তক পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইবে।

উক্ত তাম্রশাসনের সত্বাধিকারী শীঘ্র ইহা বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করিলে আমরা নিতান্ত উপকৃত হইব। আপাততঃ তাঁহার পক্ষে ইহা সুবিধাজনক না হইলে, যদি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কার্য্য-শেষে তাম্রশাসন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

মানব সমাজ। (১৬)

মানব স্বয়ংই নিম্নতম জীব হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার সকলই বিবর্ত্তনের ফল। তাহার খাদ্য, আবাস, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, দ্রব্যাদি, অস্ত্র-শস্ত্র, যান বাহন, আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার সমাজবন্ধনও তদ্রূপই হইবে, ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সমাজবন্ধন প্রধানতঃ মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। মন, দেহের ন্যায়, বিবর্ত্তনের অধীন; দেহের ন্যায়ই পূর্ব্ব পুরুষ হইতে প্রাপ্ত অর্থাৎ বংশানুগত। * দেহ ও মন আদিম কাল হইতেই পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সমাজ-বন্ধনও তদ্রূপই হইবে, ইহা অন্য প্রমাণ ব্যতীতও অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। আজি ধরাতলে বহু মানব বাস করিতেছে; ইহাদিগকে পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ তিনি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ। সকলের মধ্যেই সভ্য অসভ্য, দুইই আছে। তথাপিও শ্বেতকায়গণ অধিকাংশই সভ্য, পীতগণও প্রায় তদ্রূপই, কিন্তু কৃষ্ণকায়গণ মধ্যে অধিকাংশ মানব অসভ্য, অল্পাংশ সভ্য। ইহাদিগের সংমিশ্রণে যে সকল মানব জাত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে বিবিধ বর্ণই লক্ষিত হয়, এবং সভ্য অসভ্য উভয় প্রকারই দেখা যায়। নানা প্রকার মানবের খাদ্য পরিচ্ছদাদিও নানাবিধ। ব্যাঙের ছাতা, গুগলি হইতে চাউল,

* There is no doubt that good and bad physique * * * the moral character and mental temperament are inherited in man and with much the same intesity.—Pearson's—The scope and Importance to the state of the Science of National Eugenics, p—33

গধুম পর্যান্ত, আম মাংস হইতে সুপক্ক সুস্বাদু অন্ন পর্য্যন্ত, সকলই মানবের খাদ্য। বিশ্বসন হইতে পত্র বল্কল, চর্ম্ম, কার্পাস, রোম, রেশম সকলই তাহার পরিচ্ছদ। অলঙ্কারও নানা সমাজে নিত্যই নানারূপ গঠিত হইতেছে; পত্র পুষ্প, অস্থি, করোটী, শঙ্খ, শম্বুক, ধাতু দ্রব্য, হারক, মণি, মুক্তা সকলই তাহার অলঙ্কার। গোযান হইতে মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেন পর্য্যন্ত, মানবের যান; গো, অশ্ব, মহিষ, গর্দ্দভ, হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি সকলই তাহার বাহন। আচার ব্যবহারও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ধর্ম্ম-বিশ্বাসও মানব সমাজে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। ভূত, প্রেত, সাপ, ব্যাঙ, পশু, পক্ষী, গাছ পালা, পাহাড় পর্ব্বত, নদী-নালা, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র হইতে অদ্বিতীয় অরূপ নিষ্কল ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলই মানব ঈশ্বর বোধে পূজা করিয়া থাকে। ঈশ্বরকে কেহবা খাম খেয়ালী উপদ্রবকারী মাত্রই মনে করে, কেহবা ভাল মন্দ মিশাইয়া হিতকারী এবং অহিতকারী উভয় প্রকারই মনে করে, কেহবা নিয়ত মঙ্গলময় বিবেচনা করে, আবার কোন মানুষ মঙ্গলের এক ঈশ্বর, অমঙ্গলের অন্য ঈশ্বর কল্পনা করিয়া থাকে। এই সকল মতই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং একরূপ হইতে সহজেই অন্যরূপে চলিয়া যায়; আবার এই সকল মত মিলিয়া মিশিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট রূপও ধারণ করে; ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে অস্ত্র, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, দ্রব্যজাত, ভূত প্রেতের মূর্ত্তি, দেব মূর্ত্তি ইত্যাদি অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানব-সমাজ কোন বিষয়েই অপরিবর্ত্তিত নহে; সকল বিষয়েই যুগ যুগান্তর হইতে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

এমন কোন সভ্য সমাজ নাই, যাহার মধ্যে প্রাচীন [illegible] যুগের চিহ্ন অদ্যাপি [illegible] হিন্দুসমাজ সময় [illegible] ডোঙ্গা ভোজনপাত্র [illegible] এবং কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকেন। এমন কোন সভ্য সমাজ নাই, যাহার অন্ন পরিচ্ছদাদি এখনও পরিবর্ত্তিত না হইতেছে। ঐ সকল ক্রমোন্নতির অধীন। সমাজ কখনই চিরদিন এক ভাবে থাকে না, উন্নতি অবনতি তাহার চির সহচর।

মানব, সুতরাং মানব সমাজ ত্রিবিধ সম্বন্ধের অধীন, (১) বাহ্য প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ, (২) অন্যান্য মানবের সহিত সম্বন্ধ, (৩) অতিপ্রাকৃতের সহিত সম্বন্ধ। সামাজিক বিবর্ত্তনের দিক হইতে এই কয়েকটী বিষয়ই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(১) বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানবের প্রথম সম্বন্ধ খাদ্য বিষয়ে; পরে বাসগৃহ, দ্রব্যজাত, পরিচ্ছদ, যান বাহন ইত্যাদি যথাক্রমে মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

খাদ্য।

প্রাথমিক অবস্থায় মানব যখন কোন বস্তুই প্রস্তুত অথবা রন্ধন করিয়া আহার করিতে জানিত না, তখন উদ্ভিদ, ও প্রাণী অথবা প্রাণিগণের সঞ্চিত পদার্থ, * যাহা সহজেই সংগ্রহ হইতে পারিত, তাহাই তাহার আহার ছিল। সুসভ্য খ্রীষ্টান সমাজে এখনও পঙ্গপাল এবং বন্য মধুই সনাতন পবিত্র আহার বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু এরূপ আহার অতীব অনিশ্চিত, ইহার উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করা যায় না। তখন চেষ্টা পূর্ব্বক প্রাণী বধ করিয়া আহার সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়। এই যুগ মৃগয়া-প্রধান। কিন্তু মৃগয়া নিরস্ত্রের কর্ম্ম নহে। অস্ত্রনির্ম্মাণ ব্যতীত এ উপায়েও সকল সময় আহার মিলে না; সুতরাং অস্থি, প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ধাতু-নির্ম্মিত অস্ত্র যথাক্রমে উদ্ভাবিত হইল। অস্থি-প্রস্তর দ্বারা সূচ্যগ্রবৎ সর্কী, বল্লম, লাঠী, গদা প্রভৃতি অস্ত্র নির্ম্মাণ করা এবং পরবর্ত্তীকালে তাহার উপর নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত অথবা খোদিত করা এত নিপুণ-হস্তের কার্য্য, এমন কৌশলের এবং মনোযোগের ফল, এরূপ একাগ্রতার পরিচায়ক এবং এতদূর সৌন্দর্য্য-বোধের পরি-

* মধু প্রভৃতি।

পায় যে, অসভ্যগণ তাহা কোথায় পাইল, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যাহা হউক, মানব মৃগয়া-যুগে এই সকল অস্ত্রদ্বারা পশু পক্ষ্যাদি বধ করতঃ কোনরূপে জীবন ধারণ করিত। কিন্তু এ উপায়েও সকল সময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির আশা করা যায় না। কোন দিন শিকার জুটিল, কোন দিন জুটিল না। তখন কিরূপে দেহ রক্ষা হইবে, ঈদৃশ চিন্তা হইতে এবং শিকারে সাহায্য পাইবার আশায়, মানব পশু পক্ষী ও উদ্ভিদ-গণকে গৃহপালিত করিতে আরম্ভ করে। উহারা গৃহে সঞ্চিত থাকিতে অভাব-সময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আর ব্যাকুল হইতে হয় না। মৃগয়া যুগে মানব সর্ব্বদা একস্থানে বাস করিতে পারে নাই, শিকার পাইবার নিমিত্ত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অদ্যাপিও তদ্রূপ মানব-সমাজ দেখা যাই-তেছে। কিন্তু যেদিন হইতে মানব উদ্ভিদ-গণকে গৃহপালিত করিতে আরম্ভ করে, সেইদিন কৃষিযুগের সূত্রপাত হয়। তাহার সমক্ষে গাছ হইতে মাটীতে বীজ পড়িয়া অন্য গাছ উৎপন্ন হইত, পতিত জমিতে পশুপক্ষীরা বীজ আনিয়া ফেলিলে গাছ জন্মিত। এ সকল সে সর্ব্বদাই দেখিত। তাহা হইতে কৃষিকার্য্যের মূল উত্তেজনা পাইতে অধিক দিন আবশ্যক হয় নাই। যাহা হউক, মানব যখন কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে আর পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইল না; কৃষিকার্য্যের প্রয়োজন বশতঃই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করিতে হইল। তখন হইতেই অবসর সময় জ্ঞান চর্চ্চায় নিযুক্ত হওয়া সম্ভব হইয়া উঠিল। এইরূপে মানব ক্রমে সভ্যতায় উন্নত হইতে লাগিল। কিন্তু যে কৃষিকার্য্য একদিকে মানব সমাজের উন্নতির প্রধান কারণ, তাহাই আবার কাল-ক্রমে তাহাদিগের পতনেরও অন্যতর কারণ হইয়া উঠিল। কৃষক তাহার কর্ম্মের প্রয়ো-জন বশতঃই স্থিরস্বভাব বিশিষ্ট হয়; সুতরাং উদ্যম, সাহসিকতা ও পরিবর্ত্তনের স্থল কম হইয়া যায়। অভাব কমিয়া গেলে এ সকলই কম হয়। মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তি স্বভাবত উদ্যম-শীল, সাহসী ও পরিবর্ত্তনে অক্ষুণ্ণ। কিন্তু কৃষক অন্য কোন গুরুতর কারণে বিশেষ উত্তেজিত না হইলে তাহার উত্তেজনার সম্ভাবনা থাকে না। অভাব কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই জীবন-সংগ্রামও কমিয়া আসে, সুতরাং উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না। কৃষিকার্য্য-প্রধান সমাজ প্রথমে ক্রমেই উন্নত হয়, কিন্তু সেই উন্নতি হইতেই কাল সহকারে নিকৃষ্টতা ও জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা বর্ত্তমান সভ্যসমাজ-সকলের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

আবাস।

শীতাতপ ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে আত্ম-রক্ষা ও অপত্যরক্ষা করিবার নিমিত্ত, খাদ্য দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত বাসগৃহ আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমে মানব স্বয়ং তাহা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইত না। প্রকৃতি-নির্ম্মিত পর্ব্বতগুহা, বৃক্ষকোটর বা বৃক্ষশাখা প্রভৃতি তাহার প্রথমাবাস। পরে প্রস্তর, বংশদণ্ড, পত্রপল্লব, কাষ্ঠ, ইষ্টক, ধাতু, কাচ, স্ফটিক প্রভৃতি দ্বারাও আবাস-নির্ম্মিত হইতেছে। সৌন্দর্য্য-বোধ ও বিলাসিতা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, আবাসও ততই নানাবিধ মনোরম আকার ধারণ করিতেছে। সৌন্দর্য্য-বোধ অতীব নিম্নশ্রেণীর জীবেও দেখা যায়, সুতরাং মানবেও প্রথম হইতেই বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

দ্রব্য।

মানব যখন প্রথমে দ্রব্য ব্যবহার করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিল, তখন প্রকৃতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না; কারণ তখন তাহার নিজের নির্ম্মাণ-কৌশল ছিল না বলিলেই হয়। তাই, লাউয়ের বস, কুমড়ার ত্বক, সুপারীর খোলা, কলার ডোঙ্গা, গাছের গুঁড়ির খোল, বাঁশের চোঙ্গা ইত্যাদি উদ্ভিদজাত পদার্থ, অথবা জন্তুর ত্বক্, অস্থি, স্নায়ু, শিরা প্রভৃতি প্রাণী-জাত পদার্থ, কিম্বা প্রস্তর খণ্ড, মাটীর ঢিপি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ তাহার প্রথম অবস্থার দ্রব্য ছিল। যখন সে চেষ্টা পূর্ব্বক দ্রব্যাদি

নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে প্রস্তর, মৃত্তিকা, অস্থি, কাষ্ঠ, ধাতু ইত্যাদি দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। অসভ্যগণ অনেকস্থলে বৃক্ষত্বককে কিম্বা মৃণ্ময়দ্রব্যে যেরূপ চিত্র ও অন্যপ্রকার শিল্পকার্য্য করে, তাহা দেখিলে তাহাদিগকে আর অসভ্য বলিতে ইচ্ছা হয় না।

পরিচ্ছদ।

সৌন্দর্য্য-বোধ হইতেই পরিচ্ছদের উৎপত্তি, শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নহে। মানব অলঙ্কার-স্বরূপেই প্রথম পরিচ্ছদ ব্যবহার করে; শীতগ্রীষ্মের সহিত পরিচ্ছদের গুরুতর সম্বন্ধ নাই; অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই ছিল না। ফিউজিয়াথ্গণ অত্যন্ত শীত-প্রধান তুষারাবৃত দেশে বাস করে, তথাপিও তাহারা প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বুসমেন্, টুরেগ, নিলোটীক্ জাতিসমূহ গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা দেশে পুরুষ-পরম্পরায় বাস করিতেছে, উহারাও প্রায় উলঙ্গ। পরিচ্ছদ শীতাতপ নিবৃত্তির নিমিত্ত উদ্ভাবিত হয় নাই।* যে সৌন্দর্য্য-বোধ অতি নিম্ন জীবেরও আছে, প্রাথমিক মানব সেই প্রবৃত্তির উত্তেজনাতেই দেহের কতিপয় স্থানে লতা, পাতা, উদ্ভিদ-তন্তু, জন্তুর রোঁয়াল, পক্ষ, পালক, দন্ত, কপাল, শঙ্খ, শম্বুক ইত্যাদি উদ্ভিদজাত এবং প্রাণীজাত পদার্থদ্বারা সজ্জিত করিয়া আসিতেছে। হস্ত, [illegible] বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, কটি ও তন্নিম্ন স্থান এবং মস্তক অলঙ্কারেরও স্থান, প্রাথমিক পরিচ্ছদেরও স্থান। বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম পরিচ্ছদ মস্তকেই ব্যবহৃত হয়। যে অসভ্যের সমস্ত দেহ নগ্ন, তাহাদিগের মধ্যেও কতিপয়ের মস্তকে পক্ষ, পালক অলঙ্কারের কার্য্য করে এবং নানাবিধ বীভৎস মুখোশ অথবা শিরস্ত্রাণ অলঙ্কার এবং পরিচ্ছদ, উভয়েরই কার্য্য করিয়া থাকে। অসভ্যগণ বৃক্ষপত্র অথবা বল্কল প্রথমতঃ অলঙ্কার, পরে আবরণরূপে কটিতে এবং তন্নিম্নে ধারণ করে। ইহা হইতেই ক্রমে একটা লজ্জাশীলতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন নানাবিধ পরিচ্ছদ উদ্ভাবিত হয় এবং কালক্রমে বিবিধ কারণবশতঃ তাহার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

কিন্তু মানবজাতি লজ্জা নিবৃত্তির সহিত স্বাস্থ্য বিধান ও সৌন্দর্য্যের মিলন করিয়া, উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিতে অদ্যাপি শিক্ষা করে নাই। সভ্য মানব বর্ত্তমান সময়ে যদিও শীতাতপ, বৃষ্টি প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিচ্ছদ রচনা করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্য অথবা লজ্জাশীলতার দিকে এখনও বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই। কোন কোন দেশে সভ্য সমাজেও নৃত্যগীত, নৈশভোজ, ইত্যাদি ব্যাপারে লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ করাই যেন পরিচ্ছদ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখনও মানবসমাজ পরিচ্ছদ ধারণ করিতে সৌন্দর্য্যের দিকে যত দৃষ্টি রাখে, অন্য দিকে তাদৃশ নহে।

পরিচ্ছদে কার্য্যোপযোগীতাও লক্ষ্য রাখা হয়। সৈনিকের পরিচ্ছদ একরূপ, কৃষকের অন্যরূপ। কিন্তু এই কারণ অতি সামান্য মাত্র ফলোৎপাদন করে, তাহাও সাময়িক মাত্র।

যান বাহন।

প্রথমে কি নিমিত্ত যান বাহন উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমার বোধ হয়, মৃগয়া-যুগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে বাস পরিবর্ত্তন উপলক্ষে, শিশু সন্তানদিগকে এবং দ্রব্য সম্ভার বহন করিবার নিমিত্ত গৃহপালিত পশু প্রথমে বাহন স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। এই কারণবশতঃই পরবর্ত্তী সময়ে প্রথম যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপর শিকার বহন, শস্য বহন, অবশেষে প্রাপ্তবয়স্কদিগের গতায়াতের নিমিত্তও ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা এখন নিত্য নূতন প্রকার গঠিত হইতেছে। বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শকট, বাষ্পীয় পোত এবং এরোপ্লেন, বাইপ্লেন প্রভৃতি বিমান নিত্যই নূতন রূপ নির্ম্মিত হইতেছে। কালক্রমে পদযুগল থাকা না থাকা সমান হইয়া উঠিতে পারে; এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ হইতেছে। শ্রীশশধর রায়।

---

* From the immense variety of objects attached as ornaments to the head and body arose [illegible] climate naturally has [illegible] ice in determining the deve[illegible] ing, but it is not the [illegible] bid p, 25.

NONSENSE.

I laugh only at the apes that look so গম্ভীর,
চায় যারা মানী মান লইতে ছিনায়ে,
দলপতি পশুপতি দন্তেতে ফেণায়ে,
পান করি গরবের তেজস্বী মদির।
কৃতী জনকের সুত ! ওহে কীর্ত্তিমান !
চঞ্চল বিলাস-স্নাত জনকের বুকে,
লালিত পালিত তুমি হ'য়েছিলে সুখে,
সেই তুমি arbiter চিন্তার শ্রীমান !!
দলবল পরিবৃত পরম ধীমান,
সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে তন্ময়,
উপেক্ষার হলাহলে, রক্ষিত হৃদয়,
শিরে শুধু মহত্বের শোভে শিরস্ত্রাণ।
সঙ্গিসহ বীরবর গরবে বিলীন,
যাই কর ironic laughter is mine

সাল্‌সা-পুষ্ট বিজ্ঞতার বর-বপু খানি,
এলাইয়া যারে ইচ্ছা, করাও দর্শন ;
তীক্ষ্ণদর্শী মৃদুহাসি, ফেরাবে বদন,
স্বরে বিজ্ঞাপিবে সেই নীলপ্রাণীবাণী।
অনুবাদ ধার জেনো, ধারে না এজন,
রে পতঙ্গ পুড়ে ছাই, হইবি এখনি,
নহে ইহা পাউডারের ক্ষণিক লাবণি,
নহে ইহা বিজ্ঞাপন-বিশ্রুত কাঞ্চন।
আমাদের কুঞ্জবনে, গুঞ্জরিয়া বেড়ায় অলি,
সাঁঝের বেলায়, মলয় পবন আস্তে আস্তে
যায় রে চলি।

পাণ্ডা সেজে, জবার মালা দুলিয়ে দিয়ে গলে,
চল্‌ছে সবে হেলিয়ে বপু শুনছে কে কি বলে।
দলের মাঝে, Depoeর দাদা একটী black-
gem,
নিকষেতে টানা আছে যেন কাঁচা হেম।
কালবুকে নীতি-ফোয়ারা ছুট্‌ছে ঊর্দ্ধ মুখে,
দিয়ে তালি শ্রোতৃবৃন্দ, ভুঞ্জিতেছে সুখে।
শিশির ভেজা কিশলয়ে কাঁচা ভানুর রেখা,
ভাবের রাণীর নূতনগাথা, সেথায় থাকে লেখা।
সেথায় থাকে প্রাণ জুড়ান হরিত বরণ কত,
যূথীর গায়ে জড়িয়ে থাকে সুরভি মনোমত।
নবীন ফুলের আলো করা মধুর গলাগলি,
স্রোতের মত শূন্য পথে সদাই যাচ্ছে চলি।

বেণুবনের ঘন ছায়ায় শান্তি দেবীর বাস,
পিক বধূর প্রাণ মাতান সুধা ভরা ভাষ।
পাখীর গীতে ভিজে থাকে কবির পরাণখানি,
হেথায় বৃথা দম্ভ তোমার করে কানাকাণি।
যশের তরে ছুট্‌ছে যারা, থাকুক তোদের দলে,
তোদের গাথা কাশের মালা পরুক তারা গলে।
যাহার চরণ স্পর্শী অশোক, হাসে রঙ্গা হাসি
সেই কবিতা বধায় আমার আমি ভালবাসি।
তোদের
বক্তৃতাতে মাটির দেয়াল যাক্ না কেন টুটি,
আমরা
ফুলের বনে অলির মত ফুলের মধু লুটি।
আকাশ জুড়ে উঠুক তোদের Bœtian শির,
কবির কুঞ্জে বহিবে সদাই মলয় সমীর।

সুকবি গোবিন্দ দাস, চন্দনে চর্চ্চিত,
শঙ্খ হস্তে মৃদুহাসি, বান্ধব অক্ষয়,
রোগক্লিষ্ট তবু মিষ্ট—'জীরেন্দ্র' নির্ভয়
কাব্য স্পৃহা হেরি যার প্রবীণ মোহিত।
প্রহেলিকা প্রিয় রবি—যাহার ঝঙ্কার
ভাবস্রোতে ভেসে যায় দুরন্ত বারণ,
প্রতিভার বলে ঈর্ষা করিয়া সৃজন,
সেই কবি ওই শোভে আবরি বদন।

যৌবনে বিদায় দিয়া 'অনন্ত যৌবন'
আপনারে ভাবিতেছে বৃদ্ধের মতন,
চিত্রাঙ্গদা চিত্রকর, ভাবুক রঞ্জন,
"উর্ব্বশী" "মানসী" যার গৌরবের ধন,
সেই কবি যশতৃষা করিয়া বর্জ্জন,
শান্তিগৃহে সুযনায় করিছে বর্দ্ধন।

রে বালীশ কবি নহে যশের ভিখারী,
নরতত্ত্ব নাহি লেখে, ঘাঁটি ডারউইন,
প্রত্নতত্ত্বে নাহি চায় হইতে প্রবীণ
কল্পনার সঙ্গে কবি অনন্ত-বিহারী।
বার্দ্ধক্যের স্পর্শ লভি কবীন্দ্র দেবেন; *
এখনো যৌবন রসে আপনি রসিয়া

---

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, [illegible] দাদা বলি—তাই বউদিদির উল্লেখ [illegible]।

বুড়া বউ দিদি সহ আনন্দে মাতিয়া
রঙ্গরসে "হরি বোলা" প্রমত্ত আছেন।
কেশবের শ্যাম অঙ্গে কৌস্তুভের ন্যায়,
প্রেমরস কবি বক্ষে, সতত জুয়ায়
বুড়া হ'য়ে "ফুল ববি" তবু বুড়া নয়,
উজ্জ্বল রসেতে বুড়া জুড়ায় হৃদয়।
মানের মুকুট ধরি থাক্ তোরা বসি,
কবির ললাটে শোভে আকাশের শশী।

আমারি তরে, হাসিয়া উষা জাগায় বিহগেরে,
আমারি তরে মলয় বায়ু কানন মাঝে ফেরে,
আমারি তরে বেণুর বনে ঘন ছায়ার বাস,
আমারি তরে বেলা বালিকার বদন জোড়া
হাস।

* * *

* * *

আবার যখন জন্ম নিয়ে একটু মানুষ হবি,
আমারি লেখা পাড়য়ে তখন, আমারে কবি
কবি।
আমারি লেখায় মুগ্ধ হয়ে হবি নলিনাথ,
মুগ্ধ হয়ে লিখে ফেল্‌বি কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।
ঠেলে ঠুলে বামন শিরটা গোঁজো মেঘের
কোলে,
আমরা বুড়ো যাচ্ছি চলে হরি নামটী বলে।
তোদের নামটা থাকে যেন ইতিহাসের মাঝে,
তোদের নামটা জগৎ জুড়ে যেন সবাই
গাজে।
বঙ্গ ভাষার ভাবনা কি আর ভূঁই ফোঁড়া
সব চাঁই
Activity বগলেতে ছুট্‌ছে সব ঠাঁই।
কাণ পেতেছি খোলে দিয়ে, সমর জয়ী হও,
গরীব বলে পরুষ ভাষে যাহা ইচ্ছা কও।
শ্রীবেণোয়ারী লাল গোস্বামী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অর্ঘ্য *

সংযত সজ্জনবর্গ জননীর সুকৃতি সন্তান!
প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি, বিহঙ্গের ললিত সুতান,
প্রফুল্ল প্রসূনপুঞ্জ, মলয়ের মৃদুল হিল্লোল,
সিন্ধুর উত্তালগীতি, তটিনীর মধুর কল্লোল,
অক্ষমের মুক্ত হৃদি, দরিদ্রের কুটীর প্রাঙ্গণ
তোমা সবাকারে আজ করিতেছে হর্ষে আবাহন,
এস আজ এস সবে।
নব বর্ষ এল আজি দ্বারে,
নবীন-আশ্বাস-আশা-সুখ-শান্তি-আনন্দ-ঝঙ্কারে
পূর্ণ করি বসুন্ধরা, অভিনব কর্ম্ম কোলাহল,
জাগাইয়া দিকে দিকে সত্যস্নিগ্ধ গৌরব উজ্জ্বল,
একনিষ্ঠ সাধনার সনে সর্ব্বদৈন্য-দ্বিধা লাজ,
বিশ্বের হৃদয়সুধা প রহরি, অসঙ্কোচে আজ,
বিকশি উঠিল যেন অনুপম সৌন্দর্য্য সুধায়,
বন্দিবারে তোমা সবে! অফুরন্ত করুণাধারায়
প্লাবি সারা মনোপ্রাণ হে উদার পূজার্হ মণ্ডলি,
এস সবে এস আজ!
জীবনের মহার্ঘ অঞ্জলি
সাজাইয়া অর্ঘ্যপুটে, বিরচিয়া পুণ্যহোমাগারে,
সহস্র ব্যাকুলচিত্ত অপেক্ষায় আছে অনিবার,
আজি হেথা মাতৃযজ্ঞ-ভারতীর অর্চ্চনা-উৎসব
মুক্ত করে দিতে হবে অন্তরের গোপন বৈভব
ক্ষীরোদ-পঙ্কজে মার! কে কুড়াবে পাত্রসমিধ,
অরণি আনিবে কেবা, হব্য দিতে ব্যস্ত [illegible],

---

* [ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন সভায় পঠিত]
এবার ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে তিনটী কবিতা পঠিত হইয়াছিল, তিনটী কবিতাই ভাবসম্পদ-বিশিষ্টা। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রতিভা-সম্পন্ন যুবক। তাঁহার আবাহন-গীতি শ্রুতিমাধুর্য্যে ও ভাবগাম্ভীর্য্যে সুন্দর হইয়াছিল। [illegible] আমার আশীষসিক্ত ভালবাসায় কবিকে [illegible]ন করিয়া নব্যভারতের [illegible] উহা উপহার দিলাম। [illegible]াস্থ্যের সূর্য্যকিরণ উপভোগ [illegible]
শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

কে জ্বালিবে হোমানল, কে করিবে কুসুমচয়ন
বেণুবীণা শঙ্খভেরী কারা আজ করিবে বাদন,
এস সবে এস হেথা ! ধর্ম্মে কর্ম্মে ছোটবড় বলি
বিন্দুমাত্র ব্যবধান নাহি রবে ভ্রান্তিবশে দলি'
কাহারো কোমল প্রাণ ! আজি হেথা সোদর
সবাই,—
মায়ের পূজারি ভৃত্য ! প্রাণে প্রাণে অমৃত
বিলাই
গাঢ় আলিঙ্গন শুধু !
হে আচার্য্য ঋত্বিক প্রধান,
মহান্ উদাত্তস্বরে আজ তুমি গাহিবে কি গান,
কোন্ পূত দিব্যমন্ত্রে করিবেগো আহুতি অর্পণ,
সুশাশ্বত ধ্রুববাণী লক্ষ চিতে জাগাবে স্পন্দন,
সকলি অজ্ঞাত মোর ! শুধু দেব,ভক্তিনম্রশিরে
এনেছি হৃদয়-অর্ঘ্য উৎসর্গিতে পুলকাশ্রু নীরে,
বিশ্বজননীর পদে, অক্ষমের পূজা আয়োজন—
ক্ষুদ্র সেফালীর কলি ! লহ তুমি, কর নিবে দন
মাতৃযজ্ঞে কৃপা-বারি ! জননীর অযোগ্য সেবক
হউক কৃতার্থ ধন্য !
হে বিরাট ত্রিলোকপাবক,
সকল অশুভে করি সুখপ্রদ পবিত্র মঙ্গল,
তোমার প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ উদ্ভাসিয়া অবনীমণ্ডল
সাফল্যের বার্ত্তা লয়ে, যজ্ঞচরু করি আহরণ
আজি হেথা হউক প্রকাশ ! মাতৃপূজা নিকেতন
তপোবনে হোক্ পরিণত ! হে অনাদি নারায়ণ
চিরশান্তি-তৃপ্তিসুখে শুধু করি মুমুক্ষু জীবন,
নবশক্তি চেতনায়, অন্তহীন আশীষ তোমার
অলক্ষিতে অভিষিক্ত করে দিক্ অন্তর সবার !
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

নববর্ষের আবাহন ।

গেল বর্ষ পুরাতন স্মৃতির আলেখ্য রাখি,
এস এস নববর্ষ ভবিষ্য বারতা বাহি ।
প্রকৃতি সুন্দরী আজি ফুল পরিমল মাখি,
পুলকে রোমাঞ্চ কায়া তোমার পদাঙ্ক চাহি ।
মঞ্জরিত তরুলতা তোমার পরশ লাগি,
ছুটিছে আনন্দরাশি সমীরে লহর তুলি ;
কলকণ্ঠে পাখী গাহে তোমার মঙ্গল মাগি ।
পেলব পরশে তব বিশ্বময় কোলাকুলি,
দিগাঙ্গনা স্মিতহাস্তে নন্দনের দ্বার খুলি,
দাঁড়াইয়া নীলাম্বরে সোণার দীপালি জ্বালি,
উন্মুখ প্রকৃতি-রাণী গিয়েছে আপনা ভুলি,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে সাজায়ে পূজার ডালি,
উঠিছে ধরণী জুড়ি উদাত্ত আকুল বাণী—
এসহে নবীন পান্থ রহস্যের ধ্বজা ধরি ।
ছুটিছে কালের গতি তোমার ইঙ্গিত মানি,
দাঁড়াও এ বিশ্বরাজ্যে নিয়তির চক্র ধরি ।
অতীতেরে দূরে রাখি হও তুমি প্রতিষ্ঠিত,
নব্যভারতের মাঝে হ'ক তব মহিমা জাগ্রত ।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন ।

কবিতা ।

জীবন সাগরে, শোকে আনন্দে,
উঠেছে তরঙ্গ রাশি ; সেইত কবিতা ।
দারিদ্র্যে সম্পদে, বিকার-বিহীন,
ফুটেছে অশ্রু হাসি ; সেইত কবিতা ।
বিপদের সনে, এসেছে শাসন,
শোকের উপরে তাপ ; সেইত কবিতা ।
প্রেমের আলোকে, বিচ্ছেদ আঁধার,
পুণ্যের পরে পাপ ; সেইত কবিতা ।
জীবন ফুটিল, নূতন আলোকে
আনন্দে ভরিল প্রাণ ; সেইত কবিতা ।
গগনে উঠিল, হাসির উচ্ছ্বাস,
হৃদয়ে জাগিল গান ; সেইত কবিতা ।
বক্ষ হইতে করিয়া ছিন্ন,
মৃত্যু হরিল মায়া ; সেইত কবিতা ।
আনন্দ ঘেরা জীর্ণ কুটীরে,
ঘেরিল করাল ছায়া ; সেইত কবিতা ।
জীবন গ্রন্থে পদ্যে গদ্যে,
রচেছি কাব্য খানি ,
বিশ্ব হইতে আশা নিরাশায়
সকল ঐশ্বর্য্য আনি ।
যবনিকা তার, হইলে পতন
পাতা গুলি সব খুলে,
প্রতি ছত্রে তার কবিতার ভাষা
পাড়ও সকলে মিলে ।
শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন ।

আবাহন ।

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সিটী-কলেজের
প্রধান অধ্যাপক মহাশয়ের সুদূর ইউরোপ
হইতে স্বদেশ-প্রত্যাগমন-উপলক্ষে লিখিত ।

এস, দেব! এস, তুমি জ্ঞানের মুরতি,
বাণীর শ্রদ্ধার পাত্র, বঙ্গের গৌরব।
দয়ার-সাগর তুমি ধার্ম্মিক সুমতি,
ধর্ম্মেতে উন্মুক্ত প্রাণ ভারত-বিভব॥
এ মহা কর্ম্মের ক্ষেত্র শত বিঘ্নময়,
শ্রান্তিহীন তব ওই বিচিত্র সাধনা,
পবিত্র ধর্ম্মেতে হৃদি করিতে তন্ময়,
সয়েছ অশেষ ক্লেশ অসহ্য যাতনা॥
জ্ঞানের উন্নতি তরে তোমার প্রয়াস,
আজীবন সমুজ্জ্বল রবে সমুন্নত।
বিশ্বের মঙ্গল তরে পূর্ণ অভিলাষ,
রেখেছ হৃদয়ে তব সদাই জাগ্রত॥
দিগব্যাপী গগনেতে ধ্রুবতারা যথা,
তোমার মঙ্গল চেষ্টা আদর্শ প্রধান।
উন্নতির উচ্চে শির প্রকাশিয়া সদা,
সাধিছ বিশ্বের হিত, প্রভূত কল্যাণ॥
প্রাচ্যের মহিমা ক'রে পাশ্চাত্যে বিস্তার,
দিগ্বিজয়ী বীর সেজে এসেছ ফিরিয়া,
তাই তোমা পাইবারে জননী আমার
সাগ্রহে রহিছে আজি বক্ষ বিস্তারিয়া॥
ঝরিছে প্রেমাশ্রু তাঁর পাইয়ে তোমারে,
তুমিই তাঁহার, দেব, সুযোগ্য সন্তান।
পেয়েছেন তোমা ফিরে হাসিমুখে ক্রোড়ে,
তাই তাঁর আজি বুঝি উৎফুল্ল প্রাণ॥
নির্জীব হৃদয়ে দেব! ছিনু এত দিন,
সাধা ওই সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি নাহি হেরে।
আশীষ করিতে কত সাধিয়া কল্যাণ,
জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রদানি দীনেরে॥
প্রীতির চন্দন মাখি এনেছি সাজায়ে,
সযতনে র'চে এই ভকতির হার।
অরপিতে তোমা আজি এ শুভ সময়ে
লও, দেব! দয়া করে দীন উপহার॥
আমি, দেব! অতি দীন নাহি কি স্মরণ;
কি দিয়ে পূজিব তোমা, কি আছে আমার?
দয়া করে দাও ভিক্ষা তব ওচরণ,
দলিও না কভু দীনে মিনতি দীনের॥

ইতি, স্নেহের ভিখারী সেবকাধম—
শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

শক্তিতত্ত্ব।* (১)

পদার্থবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে জগতে দুইটী পদার্থ আছে, যাহাদের প্রকৃত সত্ত্বা আছে। সে দুইটী জড় ও শক্তি।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই সভায় জড় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

[illegible] মানবের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ [illegible] কালপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের জ্ঞান রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইতেছে। কল্য যাহা অন্ধকারাবৃত ছিল, অদ্য তাহা আলোকোদ্ভাসিত হইয়াছে। দিনের পর [illegible] বিস্তৃত হইতেছে সঙ্গে [illegible] মানুষের জ্ঞান পূর্ণতা [illegible] হেলমহোলজে ম্যাকস- [illegible] টনের পূর্ব্বে জগৎটাকে [illegible] ত, অদ্য তাহা হইতে [illegible] থাকে। ধন্য তাঁহাদের জীবন, যাঁহারা জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা জ্ঞান রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শক্তি কাহাকে বলে:—পদার্থ শাস্ত্রে 'শক্তি' 'কার্য্য' 'বল' প্রভৃতি কথাগুলি এক একটী বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শক্তি কাহাকে বলে, বুঝিতে হইলে কার্য্য কাহাকে বলে বুঝিতে হইবে, এবং কার্য্য কাহাকে বলে বুঝিতে হইলে 'বল' কাহাকে বলে, বুঝিতে হয়।

পদার্থ শাস্ত্রে 'বল' বলে সেই জিনিসটাকে, যাহা পদার্থের গতির পরিবর্ত্তন সাধন করে। জড়ের একটা ধর্ম্ম এই যে, কোন জড় পদার্থ আপনা হইতে তাহার গতির পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। নিশ্চল অবস্থায় থাকিলে আপনা আপনি চলিতে পারে না; আবার গতি বিশিষ্ট হইলে আপনা আপনি থামিতে

* গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার পঠিত।

পারে না, যে বেগে যে দিকে চলিতেছিল, সেই বেগে সেই দিকে চলিতেই থাকে। জড়ের এই ধর্ম্মের নাম নিশ্চেষ্টতা। যাহা হউক, জড় জগতের দিকে তাকাইলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জড়ের গতি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এখন যে পদার্থটা নিশ্চল অবস্থায় আছে, একটু পরে তাহাকে চলমান দেখা যায়। এখন যেটা যে বেগে যে দিকে যাইতেছে, একটু পরে সেটাকে ভিন্ন বেগে ভিন্ন দিকে যাইতে দেখা যায়। প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, যখনই কোন একটা পদার্থের এইরূপ গতির পরিবর্ত্তন হয়, তখনই দ্বিতীয় কোন পদার্থ তাহার উপর একটা ধাক্কা, একটা টান, একটা ঠেলা বা এইরূপই কিছু একটা প্রয়োগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ 'ক' নামক কোন পদার্থের গতির পরিবর্ত্তন হইতে হইলে 'খ' নামাক দ্বিতীয় কোন পদার্থকে 'ক' এর উপর একটা টান বা ধাক্কা বা ঠেলা বা এইরূপই একটা কিছু প্রয়োগ করিতে হইবে। নতুবা 'ক' এর গতির—গতিবেগ বা গতির দিক কোনটারই পরিবর্ত্তন হইবে না। চলিত ভাষায় যাহাকে আমরা টান, ধাক্কা, ঠেলা ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকি, বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকেই বল বলে। ঘোড়া দড়ির ভিতর দিয়া গাড়ীকে টানে; এখানে গাড়ীর উপর ঘোড়ার টান একটা বল। সঙ্গে সঙ্গে নির্জীব প্রাণহীন গাড়ীও ঘোড়াকে উল্টাদিকে সমান টান দেয়। এই ঘোড়ার উপর গাড়ীর টানও আর একটা বল। সূর্য্য পৃথিবীকে টানে, পৃথিবী সূর্য্যকে পাল্টা টান দেয়। চুম্বক ও লৌহ পরস্পরকে টানে। বইখানা টেবিলকে নীচের দিকে ঠেলে—টেবিল বইকে উপরের দিকে ঠেলে। এইরূপ জড়জগতে পদার্থ সমূহ পরস্পরের উপর বলপ্রয়োগ করিতেছে।

তারপর, জড়ের কার্য্য বলিতে কি বুঝায়? যদি কোন একটা পদার্থ 'ক' এর উপর অপর একটা পদার্থ বল প্রয়োগ করিতে থাকে এবং 'ক' যদি যদি সেই বলের বিপরীত দিকে চলিতে থাকে, তখন বলা যায় যে 'ক' এই বলের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে। ঘোড়া যখন গাড়ীকে টানিয়া লইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়, তখন ঘোড়া তাহার উপর পিছন দিকে যে টান পড়ে, তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া থাকে। কামাখ্যা পাহাড়ে উঠিতে হইলে, পৃথিবীর আকর্ষণের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে হয়, কাজেই কার্য্য করিতে হয়। ঘাড়ে একটা বোঝা লইয়া উঠিতে হইলে নীচমুখে টানটা বাড়িয়া যায়, উঠিবার কার্য্যও সেই অনুপাতে বেশী করিতে হয়। আরও উঁচুতে—ভুবনেশ্বরীতে উঠিতে হইলে আকর্ষণের বিরুদ্ধে আরও খানিকদূর যাইতে হয়—কার্য্যও সেই অনুপাতে বেশী করিতে হয়।

উপরে কার্য্যের যে সংজ্ঞা বলা গেল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, কোন পদার্থকে কার্য্য করিতে হইলে তাহাকে চলিতে হইবে এবং কোন একটা বলের বিপরীত দিকে চলিতে হইবে। যদি কেবল গতি থাকে, এবং সেই গতি বলের বিপরীত মুখী না হয়, তাহা হইলে কার্য্য করা হয় না। বরফের উপর দিয়া কোন জিনিস টানিয়া নিতে অল্প কার্য্য করিতে হয়, কেননা বরফ পিচ্ছল—জিনিসটা অগ্রসর হইতে বাধা পায় কম। বরফ যদি মোটেই বন্ধুর না হইত, তাহা হইলে জিনিসটার গতির বিপরীত দিকে কোন বল প্রযুক্ত হইত না, এবং জিনিসটাকে টানিতে কার্য্যও করিতে হইত নাই। পৃথিবী যদি কোন পদার্থকে আকর্ষণ না করিত, তাহা হইলে কামাখ্যা পাহাড় ৫০ মাইল উচু হইলেও তাহার উপর উঠিতে কোন কার্য্য করা হইত না। ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আত্মজ্ঞান।

চৈত্র মাসের নব্যভারতে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর লিখিত একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে বৈশাখ মাসে রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এখন বর্ত্তমান সংখ্যায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত আর একটী প্রবন্ধ বাহির হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধ যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, ইহাও সেইভাবে লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমাকে মিডিয়ম করিয়া উক্ত মহাত্মা ইহা লিখিয়াছেন। অধিক আর কি বলিব?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আত্মা কি পদার্থ? আত্মার স্বরূপ কি? আত্মা বলিলে কি বুঝায়? আমি এস্থলে মানবাত্মা মনে করিয়াই আত্মা শব্দ ব্যবহার করিতেছি। মানবাত্মা কি? নানা দেশের পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। আমি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

আত্মা ও আমি একই পদার্থ। আত্মা বলিলে যাহা বুঝায়, আমি বলিলেও তাহাই বুঝায়। [illegible] চরাচর লোকে মনে করে যে, আত্মা যেন একটা কি নিগূঢ়, অজ্ঞাত পদার্থ। বাস্তবিক, যাহাকে আমি বলি, তাহাই আত্মা। আত্মার তুল্য নিকটের পদার্থ আর কি আছে? আমি, আমার যত নিকটে, এত নিকটে আর কে? আমাকে আমি যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে জানিতেছি, এমন আর কি জানি, কাহাকেই বা জানি?

[illegible] এই যে, এই যে আমি বা [illegible] ইহার স্বরূপ কি? এবিষয়ে পূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছি। কিন্তু তাহা যথেষ্ট হয় নাই। সেইজন্য পুনর্ব্বার আর কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

জীবাত্মা পরমাত্মার প্রকাশ। প্রকাশ বলিলে কি বুঝায়? পরমাত্মা কাহার নিকট প্রকাশ হইতেছেন? আমি কাহার নিকট প্রকাশ হইতেছি? আমি আমার নিকট কি প্রকাশ হইতেছি? অন্যের নিকটেও প্রকাশ হইতেছি। তাহা হইলে, এই বলা হইল যে, পরমাত্মা জীবের নিকট প্রকাশ হইতেছেন; এবং আপনার নিকটেও প্রকাশ হইতেছেন। যখন তিনি জীবরূপে প্রকাশ হইলেন, তখন জীবের নিকট ও নিজের নিকট উভয়ের নিকটই প্রকাশ হইলেন।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একটী গূঢ় প্রশ্ন আছে। বাস্তবিক জীবাত্মা যে পরমাত্মার প্রকাশ, তাহার প্রমাণ কি? কে বলিল যে, এই মানবাত্মা সেই পরমাত্মার প্রকাশ? এ বিষয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথম কথা এই যে, জীবাত্মা যে পরমাত্মার প্রকাশ, তাহার প্রমাণ কি? জ্ঞানীলোকে প্রমাণ ভিন্ন কিছুই স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং প্রমাণ আবশ্যক। ক্রমে আমি সেই প্রমাণ দিতেছি। প্রথম প্রমাণ এই যে, জীবের যে জ্ঞান, তাহার নিজের নিকটে অজ্ঞাত থাকে, তাহা কোথায় থাকে? আমরা যাহা কিছু জানি, অর্থাৎ আমার জ্ঞানের যাহা সমষ্টি, সকলই কি এক সময়ে

আমি জানি? কত বিষয়ে আমি কত কথা জানি, সকল কথাই কি সকল সময়ে মনে পড়ে? নিশ্চয়ই সব কথা সব সময়ে মনে পড়ে না। প্রতি মুহূর্ত্তে একটা বা দুইটা কথা মনে পড়ে। তবে প্রশ্ন এই যে, অবশিষ্ট জ্ঞান কোথায় থাকে?

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে মস্তিষ্কে থাকে। এ উত্তর যুক্তিযুক্ত হইল না। কেননা মস্তিষ্ক জড় পদার্থ, জ্ঞান কেমন করিয়া জড়ে থাকিবে? আর এক কথা এই যে, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে, মস্তিষ্ক জড় নহে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই যে পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এ পাঁচটীই জ্ঞান মাত্র। রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়ের জ্ঞান; রস, রসনেন্দ্রিয়ের জ্ঞান; গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের জ্ঞান; স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের জ্ঞান; শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের জ্ঞান। পাঁচটীই জ্ঞান। তবে মস্তিষ্ককে জড় বলিব কেমন করিয়া?

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, সকলই এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে, ইহাই বলিতে হয় যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, সকলই জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে এখন প্রশ্ন এই যে, আমাদের যে জ্ঞান আমাদের অজ্ঞাত থাকে, সে জ্ঞান কোথায় থাকে? জ্ঞান অবশ্য জ্ঞানেই থাকে। আমার যে জ্ঞান, আমি জানিতেছি না, তাহা কে জানিতেছে? ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয় প্রশ্ন।

তার পর আর এক কথা। জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা বুঝায়। আমার জ্ঞানের জ্ঞাতা, অবশ্য আমি। কিন্তু আমার যে জ্ঞান, আমি জানিতেছি না, কে তাহা জানিতেছে? জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই তিন ভিন্ন জ্ঞান হয় না। জ্ঞান বলিলেই জ্ঞেয় বুঝায়। আবার জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা বুঝায়। জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞাতা নাই, ইহা অসম্ভব কথা। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, একজন জ্ঞাতা আছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, সেই জ্ঞাতা, এক কি বহু? ইহার পরিষ্কার উত্তর দিতেছি। যদিও এ প্রশ্নটী বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে, তথাচ ইহা আনুষঙ্গিক আসিয়া পড়িল, এবং প্রশ্নটী অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে একই জ্ঞান; ইহার প্রমাণ কি? এক শক্তি সকল ব্রহ্মাণ্ডে। ইহা বিজ্ঞানের স্থির মীমাংসা। সকল ব্রহ্মাণ্ডে যখন এক শক্তি, তখন সকল ব্রহ্মাণ্ডে অবশ্য এক জ্ঞান। কেন না, শক্তি বলিলেই জ্ঞান বুঝায়। শক্তি কি? বহির্জগতে শক্তির অস্তিত্বে সকলেই বিশ্বাস করে। কিন্তু শক্তি কি তথায় প্রত্যক্ষ হয়? কখনই না। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে শক্তি কোথায় প্রত্যক্ষ হয়? অন্তরে। আমরা যাহাকে ইচ্ছাশক্তি বলি, তাহাই প্রত্যক্ষশক্তি। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানময়ী। এখন প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে শক্তি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা যখন জ্ঞানময়ী, তখন শক্তি মাত্রই জ্ঞানময়ী। জড়জগতে যাহাকে শক্তি বলিতেছি, তাহাও শক্তি, আবার অন্তর্জগতে যাহাকে শক্তি বলিতেছি, তাহাও শক্তি। দুইই যখন শক্তি, তখন অবশ্য ইহাদের স্বরূপ এক। এক পদার্থ না হইলে, কেমন করিয়া এক নাম হইবে? বহির্জগতে যাহা, তাহা শক্তি, আবার অন্তরে যাহা, তাহাও শক্তি, সুতরাং এক পদার্থ। তার পর অন্তরস্থ শক্তি যখন নিশ্চয়ই জ্ঞান-

ময়ী শক্তি, তখন বহির্জগতের শক্তিকেও জ্ঞানময়ী বলিতে হইবে। তবেই হইল, এক জ্ঞানময়ী শক্তি অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে। সকল ব্রহ্মাণ্ডে এক শক্তি, এক জ্ঞান। এই যে মীমাংসা, ইহার খণ্ডন সম্ভব নহে।

এখন মূল বিষয়ের অনুসরণ করি। সকল ব্রহ্মাণ্ডে যে শক্তি ও যে জ্ঞান, তাহা এক শক্তি ও এক জ্ঞান। এই যে মানবাত্মা, ইহা সেই জ্ঞান, সেই শক্তিরই প্রকাশ। ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আমাদের যে জ্ঞান, আমাদের মধ্যে থাকে না, তাহা কোথায় থাকে? এখন এ কথার উত্তর দিব।

জীবাত্মার যে জ্ঞান জীবাত্মায় থাকে না, তাহা পরমাত্মায় থাকে। নতুবা কোথায় থাকিবে? জ্ঞাতা ভিন্ন, জ্ঞান সম্ভব নহে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অবশ্য একজন জ্ঞাতা আছেন। যখন এক শক্তি, তখন অবশ্য এক জ্ঞান। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যখন এক শক্তি, এবং সেই শক্তি যখন জ্ঞানময়ী, তখন বলিতেই হইবে যে, এক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জ্ঞান রহিয়াছে। আবার যখন ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী জ্ঞান রহিয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জ্ঞাতা রহিয়াছেন। এই যে যুক্তিশৃঙ্খল, ইহা খণ্ডিত হইতে পারে না। কোন নিরীশ্বরবাদীর পক্ষে ইহা খণ্ডন করা সম্ভব নহে। নিরীশ্বরবাদী বহির্জগতে শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া এই যুক্তি অস্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু বহির্জগতে শক্তির সত্তা অস্বীকার করা অস্বাভাবিক। এবিষয়ে [illegible] অনেক কথা বলিয়াছি, সেইজন্য, [illegible]আর কিছু বলিলাম না।

[illegible]ন আবার মূল প্রশ্নের অনুসরণ করি। জীবাত্মা কি? ইহাই মূল প্রশ্ন। আমরা এই পর্যান্ত বুঝিলাম যে, জীবাত্মার জ্ঞান পরমাত্মায় থাকে। ইহার অধিক আর কিছু বুঝি নাই। কিন্তু আরও বুঝিবার আছে। তাহা কি? যখন মনুষ্য সুষুপ্তির অবস্থায় থাকে, তখন তাহার জ্ঞান কোথায় থাকে? ইহা বলিতেই হইবে, পরমাত্মাতে থাকে। আর কোথায় থাকিবে? যখন সকলই জ্ঞান, আর সেই জ্ঞান পরমাত্মারই জ্ঞান; আর যখন জ্ঞান, জ্ঞানেতেই থাকিতে পারে, তখন সুষুপ্তি অবস্থায় মনুষ্যের জ্ঞান, অবশ্য পরমাত্মাতেই থাকে। ইহা ভিন্ন আর কোন মীমাংসা অসম্ভব।

এখন দেখ, মানুষের জ্ঞান, সকল অবস্থাতেই কতক পরিমাণে পরমাত্মাতে থাকে। জাগ্রত ও সুষুপ্তি, উভয় অবস্থাতেই পরমাত্মাতেই থাকে। আমার জ্ঞান তাঁহাতে যাইতেছে এবং তাঁহা হইতে আমাতে আসিতেছে। যেমন, খালের জল, বড় নদীতে যাইতেছে, এবং বড় নদীর জল, খালে আসিতেছে। দুইয়ের মধ্যে একটা যোগ রহিয়াছে।

বড়নদী হইতে যদি জল না আসে, তাহা হইলে খাল শুকাইয়া যায়। বড়নদী খালের প্রাণ। বড় নদী, খালকে জল দেয় বলিয়া, খাল জীবিত থাকে। সেইরূপ, পরমাত্মা, জীবাত্মার প্রাণ।

এবিষয়ে শঙ্কর কি বলিয়াছেন? তিনি বলেন, জীবাত্মা, পরমাত্মার প্রকাশ। কিন্তু তাহা অনাদি, অনন্ত প্রকাশ। অনাদি অনন্ত প্রকাশ, কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন নাই। প্রকাশ বলিলেই একটা ক্রিয়া বুঝায়। ক্রিয়া হইলেই উহা, অবশ্য, কালে হইবে। যাহা কালে হইবে, তাহা কেমন করিয়া অনাদি হইতে পারে?

সেইজন্য আমি জীবাত্মার অনাদিত্ব স্বীকার করি না। আমরা সৃষ্ট পদার্থ। পরমাত্মা হইতে আসিয়াছি, সুতরাং আমাদের উৎপত্তি আছে। আমরা অনাদি নহি। তবে অনন্ত-কাল স্থায়ী, ইহা নিশ্চিত সত্য।

নিশ্চিত সত্য কেন? আমরা যখন তাঁহার সন্তান, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে চিরকাল থাকিব। মাতাপিতা কি ইচ্ছা করেন যে, সন্তানের মৃত্যু হয়? বিশেষতঃ তিনি যখন অনন্ত প্রেমময়ী মা, তখন কেমন করিয়া ইচ্ছা করিবেন যে, তাঁহার সন্তানের মৃত্যু হয়? তিনি নিয়তই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তাঁহার সন্তান চিরজীবী হয়।

আর একটী কথা। আত্মা অনন্তমুখীন। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত সেবা যে আত্মার লক্ষ্য, সে আত্মা অবশ্য অনন্তজীবী। আত্মা স্বভাবতঃ অনন্তের দিকে ধাববান। পরিমিতে তাহার তৃপ্তি নাই। সেইজন্য ঋষিরা বলিয়াছেন ;—

যোবৈ ভূমা তৎসুখংনাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈবসুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য॥

যিনি ভূমা, অর্থাৎ অনন্ত, তাঁহাতেই সুখ। পরিমিত পদার্থে সুখ নাই। ভূমাতেই সুখ। ভূমাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে।

অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার দিকে ধাবমান হইব। অনন্ত হইতে আসিয়াছি। অনন্তের দিকে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত যাইব। অনন্ত পরমাত্মা ব্যতীত, জীবাত্মার তৃপ্তি নাই।

এখন প্রশ্ন আসিতেছে যে, এমন সময় আসিবে কি না, যখন জীবাত্মা তাঁহাকে পূর্ণরূপে লাভ করিবে। আমি বলি, কখনই আসিবে না। আমরা যতই কেন উন্নতি করি না, তিনি অনন্ত, আমরা পরিমিত, এই পার্থক্য চিরকালই থাকিবে। আমরা কথনই অনন্ত হইতে পারিব না। আমরা চির উন্নতিশীল সত্য, কিন্তু যতই কেন উন্নতি করি না, আমি পরিমিত, তিনি অনন্ত, এই প্রভেদ, চিরকালই থাকিবে।

তাঁহার সহিত আমাদের সেব্য সেবক সম্বন্ধ। তিনি উপাস্য, আমরা উপাসক ; তিনি ভক্তিভাজন, আমরা ভক্ত। আমরা চিরকালই তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইব। চিরকালই তাঁহাকে পাইতে থাকিব ; কিন্তু কোন কালেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইব না। আমরা ক্রমাগত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইব; অথচ তাঁহার সহিত আমাদের যে দূরত্ব, তাহা সমানই থাকিবে। এক ভাবে, আমরা তাঁহার ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইব। আর এক ভাবে আমরা চিরদিনই তাঁহা হইতে সমান দূরে থাকিব। এই দুইটী বিপরীত কথা আপাততঃ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ক্রমাগত নিকটবর্ত্তী হইতেছি, অথচ সমান দূরে রহিয়াছি, এই দুইটী কথাই কি সত্য? নিশ্চয়ই সত্য। চিরদিন নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, আমরা তাঁহার সত্তা ক্রমশঃ অধিকতর রূপে অনুভব করিতেছি। ইহার আরও অর্থ এই যে, আমরা তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, তাঁহার মহিমা অধিকতর রূপে জানিতে পারিব। অথচ সমান দূরে থাকিব, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অনন্ত, আমরা পরিমিত, এই যে প্রভেদ, ইহা চিরকালই থাকিবে। তাঁহার সঙ্গে আমাদের যে প্রভেদ, তাহা অনন্ত। এই অনন্ত প্রভেদ চিরকালই থাকিবে। এই দুটী বিপরীত কথা, আপাততঃ পরস্পর-বিরুদ্ধ ও অমূলক বলিয়া মনে

হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দুটী কথাই সত্য। অধ্যাত্ম রাজ্যে এমন আরও অনেক কথা আছে, যাহা আপাততঃ পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত দিতে পারি। যেমন আমরা তাঁহার এত নিকটে যে, তদপেক্ষা অধিকতর নিকটে কেহ থাকিতে পারে না, অথচ আমরা অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইব। একথারও অর্থ ঐরূপ। বাস্তবিক, কথা এই যে, তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত, তখন আমরা তাঁহার এত নিকটে যে, তাহা হইতে অধিকতর নিকটে কিছু থাকিতে পারে না। আবার ইহাও সত্য যে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইব। অর্থাৎ আমরা ক্রমশঃই তাঁহার সন্নিকর্ষ অধিকতররূপে অনুভব করিব।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রকাশ হইয়াছেন। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে দিয়াছি। সে প্রমাণ ভিন্ন আরও অন্য প্রমাণ আছে। তাহা এই যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন পরস্পর সমবায়-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তখন এ কথা বলিতেই হইবে যে, পরমাত্মা, জীবাত্মারূপে প্রকাশ হইতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সমবায়-সম্বন্ধ কাহাকে বলে? যখন দুইটী পদার্থ পরস্পর একীভূত হইয়া যায়, কিন্তু তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে স্থায়ীসম্বন্ধ থাকে, তখনই তাহাকে সমবায়-সম্বন্ধ বলে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। মনে কর, একটী সমগুণ বিশিষ্ট পদার্থের সহিত আর একটী [illegible] বিশিষ্ট পদার্থ যুক্ত হইল। তারপর [illegible] পদার্থই একীভূত হইল। এখন [illegible] এক বলিয়া মনে করিতে হইবে কি না? এখন দেখ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমগুণ বিশিষ্ট পদার্থ কিনা? তারপর দেখ, উভয়ে একীভূত হইয়াছে কিনা? এখন দেখ, দুইকে এক বলিতে হয় কিনা? জীবাত্মার যে সকল গুণ, সে সকল গুণই পরমাত্মাতে আছে। জীবাত্মার জ্ঞান, জীবাত্মার পবিত্রতা, জীবাত্মার শক্তি, ইত্যাদি যাহা কিছু গুণ, তাহা অবশ্য পরমাত্মাতে আছে। সুতরাং উভয়ে সমগুণ-বিশিষ্ট। তারপর এই উভয়ে একীভূত হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত বলিয়া মনে করিতে হইবে যে, জীবাত্মার সঙ্গে তিনি একীভূত হইয়া আছেন। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, একটী আর একটীর প্রকাশ।

উপরে যে যুক্তিটী দেওয়া হইল, উহা সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শঙ্করের যুক্তি। যুক্তিটী সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যাহা হউক, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অবিকল বলা হইল। এখন অন্য কথা বলিব।

জীবাত্মা কি? পরমাত্মা বা কি? বলিয়াছি যে, জীবাত্মা, পরমাত্মার প্রকাশ। অর্থাৎ পরমাত্মা, জীবাত্মারূপে প্রকাশ হইতেছেন। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি জীবাত্মারূপে প্রকাশ হইয়াছে। জীবাত্মার জ্ঞান, তাঁহারই জ্ঞান, জীবাত্মার প্রেম, তাঁহারই প্রেম; জীবাত্মার ইচ্ছাশক্তি, তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি; জীবাত্মার পবিত্রতা, তাঁহারই পবিত্রতা; জীবাত্মার মধ্যে যে অনন্তের জ্ঞান রহিয়াছে, ইহা তাঁহারই জ্ঞান, অস্ফুটভাবে প্রকাশ হইতেছে। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, তিনিই প্রকাশ হইতেছেন। কিন্তু ইহা কি বলিব যে, তিনি স্বয়ং প্রকাশ হইতেছেন? তাহা বলিতে পারি না। কেননা, জীবাত্মার জ্ঞান, তাঁহার

জ্ঞান হইলেও, এ জ্ঞান পরিমিত। জীবাত্মার প্রেম, পরমাত্মার প্রেম হইলেও, উহা পরিমিত প্রেম। জীবাত্মার শক্তি পরমাত্মার শক্তি হইলেও উহা পরিমিত শক্তি।

এখন প্রশ্ন এই যে, পরমাত্মার স্বরূপলক্ষণ সকল প্রকাশ হইলে, উহা পরিমিত হয় কেন? পরমাত্মার যে কোন স্বরূপলক্ষণ, তাহা অবশ্য অনন্ত হইবে। যাহা অনন্ত, তাহা প্রকাশ হইলে, অবশ্য পরিমিত হয়। কেন হয়, বুঝা আবশ্যক। যাহা অনন্ত, তাহা সৃষ্টির মধ্যে আসিলে, পরিমিত হইবেই হইবে। প্রকাশ হইল, ইহার অর্থ সৃষ্ট হইল। সৃষ্ট হইল, এ কথারই বা অর্থ কি? সৃজ্ ধাতুর অর্থ ত্যাগ করা। অর্থাৎ পরমেশ্বর আপনার জ্ঞান, আপনার প্রেম, আপনার ইচ্ছাশক্তি কিছু ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাশক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা বুঝায়। প্রেম বলিলেই কোন প্রেমময় ব্যক্তি বুঝায়। ইচ্ছাশক্তি বলিলেই উক্ত শক্তিবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বুঝায়। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাশক্তি নিজে নিজে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না। ব্যক্তিত্ব আবশ্যক। একজন জ্ঞানী, প্রেমিক, শক্তিমান ব্যক্তি চাই। পরমেশ্বর যখন আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন, অথবা আত্মস্বরূপ সৃজন করিলেন, তাহার সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিত্বকেও প্রকাশ করিতে হইল। সেই ব্যক্তিত্ব লইয়া যে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ হইল, তাহাই জীবাত্মা।

এখন বুঝাইতে হইবে যে, জীবাত্মার স্বরূপলক্ষণ সকল মূলে অনন্ত হইলেও পরিমিত কেন? ইহার উত্তর এই যে, যাহা সৃষ্ট, তাহা স্রষ্টার অধীন; অধীন হইলেই পরিমিত।

জীবাত্মা সৃষ্ট বলিয়া পরিমিত হইলেও তাহার অন্যদিকে অনন্তত্ব প্রকাশ পাইতেছে। জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে, উহাকে পরিমিত বা অনন্ত, এ দুইয়ের কোন স্বরূপলক্ষণ-বিশিষ্ট বলা যায় না। একদিকে, জীবাত্মা নিশ্চয়ই পরিমিত। আর একদিকে, জীবাত্মার অনন্তত্বও স্বীকার করিতে হইবে। জীবাত্মা যদি বাস্তবিক সম্পূর্ণ পরিমিত পদার্থ হইত, তাহা হইলে, জীবাত্মা নিজে বুঝিতে পারিত না যে সে পরিমিত। কেন না, পরিমিত অর্থ কি? যাহা অনন্ত নয়। অনন্ত অর্থ কি? যাহা পরিমিত নয়। তবে, বলিতে হইবে যে, জীবাত্মার অনন্তের জ্ঞান আছে। না থাকিলে, পরিমিত কি, তাহাও বুঝিতে পারিত না। পরিমিত ও অনন্ত, একই জ্ঞানের দুই দিক্। ইহাকে আপেক্ষিক জ্ঞান বলে।

এখন বুঝা গেল যে, জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ এবং পরমাত্মার প্রকাশ হইলেও উহা পরিমিত কেন, তাহাও বুঝা গেল। জীবাত্মা যে পরমাত্মার প্রকাশ, এবিষয়ে যে দুটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার প্রথমটী জর্ম্মাণদেশীয় মহা দার্শনিক হিগেলের ব্যাখ্যাত যুক্তি। দ্বিতীয়টী, আমাদের স্বদেশীয় মহা দার্শনিক শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাত যুক্তি।

আমাদের আলোচ্য বিষয়, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইতে হয়। সেইজন্য, আমাদের উচিত আত্মজ্ঞান লাভ করা। আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে কখনই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না। আমাকে না জানিলে, তাঁহাকে জানিতে পারিব না।

আত্মজ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা সেই পরমাত্মাকে

দর্শন করা যায়। আত্মজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি। সক্রেটিস বলিয়াছেন যে, আপনাকে আপনি জান, তাহা হইলেই সকল জ্ঞান লাভ হইবে। আত্মজ্ঞানই মূলজ্ঞান। আপনাকে না জানিলে অন্য কাহাকেও জানা যায় না। আপনাকে ভুলিয়া উপস্থিত লোক গণনা করিলে যেমন যথার্থ গণনা হয় না, সেইরূপ আপনাকে না জানিয়া জগৎসংসারকে জানিতে চেষ্টা করিলে, কিছুই প্রকৃত রূপে জানা যায় না। অগ্রে আপনাকে জান, তারপর আর সব জানিবে। এমন কি, যিনি পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর, তাঁহাকে জানিতে হইলেও অগ্রে আপনাকে জানিতে হইবে। সকল জ্ঞানের মূল আত্মজ্ঞান। দর্শনজ্ঞান, শ্রবণজ্ঞান, আস্বাদ জ্ঞান, আঘ্রাণ জ্ঞান, এই পঞ্চজ্ঞানের মূল কোথায়? নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান। আমি দেখিতেছি, এই যে দর্শনজ্ঞান, ইহা সম্ভব হইত না, যদি না জানিতাম যে, আমি আছি। আমি শুনিতেছি; এই যে শ্রবণ জ্ঞান, ইহা সম্ভব হইত না, যদি না জানিতাম যে, আমি আছি। সকল জ্ঞানের মূল আমি। আমি না থাকিলে, কিছুই নাই। ব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা হইয়া যায়; সুতরাং যিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি, তাঁহাকেও পাইতে পারি না। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" আমাতে যাহা নাই, তাহা ব্রহ্মাণ্ডে থাকিলেও নাই। কেননা, তাহা আমার পক্ষে জানা অসম্ভব।

আমার প্রকৃত স্বরূপ যদি জানিতে পারি, তাহা হইলে, আমার যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকেও জানিতে পারি। আমাকে জানিলে আমার কর্ত্তাকে জানি, আবার আমার কর্ত্তাকে জানিলে আমাকে আরও ভাল করিয়া জানি। অতএব, অগ্রে আমাকে জানিতে হইবে; তারপর, আমার কর্ত্তাকে ভাল করিয়া জানিব। তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিলে আমাকে আরও ভাল করিয়া জানিতে পারিব। আত্মজ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান; আবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আত্মজ্ঞান উজ্জ্বলতর হয়।

এই দুই জ্ঞানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা আবশ্যক। আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ অতি চমৎকার সম্বন্ধ। জীবাত্মা বলিলেই পরমাত্মা, আর পরমাত্মা বলিলেই জীবাত্মা। একই পদার্থের দুইদিক্। যেমন, অনন্ত বলিলে পরিমিত এবং পরিমিত বলিলেই অনন্ত। জীবাত্মা বলিলে পরমাত্মা বুঝায় কেন? এইজন্য যে, জীবের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আমি যখন পরিমিত, তখন আমার অবশ্য পরিমিত সত্তা। পরিমিত সত্তা হইলেই অধীন সত্তা; পরিমিত হইলেই সীমাবদ্ধ, তাহা হইলেই এমন কিছু আছে, যাহা তাহাকে সীমাবদ্ধ করে, সুতরাং তাহার স্বাধীন সত্তা নাই।

এই কথাটী আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায়, যদি দেখি, আমরা একটী কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অন্তর্গত। তাহাই যদি হইল, তবে নিশ্চয়ই আমরা পরিমিত। পরিমিত ও অধীন। অধীন বলিলেই কাহার অধীন? আমাদের যখন অধীন অবস্থা, তখন বলিতে হইবে, কাহার অধীন? কেহ বলিতে পারেন, জগৎ যে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলময়, সেই শৃঙ্খলের অধীন। কিন্তু একথায় সকলে সন্তুষ্ট হইবেন না। কেননা, জীবাত্মা জাগতিক শৃঙ্খলের অতীত। তবে কাহার অধীন? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, পরমাত্মার অধীন। মানবের দেহ ও মন জাগতিক শৃঙ্খলের অন্তর্গত। আত্মা, সে শৃঙ্খলের অতীত। আত্মা, অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার

প্রকাশ। প্রকাশ হইলেই তাঁহার সৃষ্ট। সৃষ্ট হইলেই স্রষ্টার অধীন। জীবাত্মা, পরমাত্মার অধীন। সুতরাং এ উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং একের জ্ঞান, অন্যের জ্ঞান সাপেক্ষ। আত্মজ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে, এবং ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আত্মজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে না।

আত্মজ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের মূল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা এস্থলে পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক।

আত্মজ্ঞানের প্রথম লক্ষণ এই যে, আত্মজ্ঞান মূলজ্ঞান। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যাহাই কেন বলিনা, ইহা যে মূলজ্ঞান, এ বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, ইহার উপর অন্য সকল জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়, আত্মজ্ঞান ভিন্ন। যে কোন জ্ঞানই লাভ কর না কেন, তাহার মূলে আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের সহিত সকল জ্ঞান জড়িত। আত্মজ্ঞানের তৃতীয় লক্ষণ এই যে, ইহাকে কোন ক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। ইহা অনতিক্রমণীয়। যাহাই কেন জানিনা, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানিতেই হইবে। যাহা কেন জানিনা, আমি জানিতেছি, এরূপ মনে করিতেই হইবে। আত্মজ্ঞানের চতুর্থ লক্ষণ এই যে, আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের সাহচর্য্য করে। যাহাই কেন জানিনা, তাহার সঙ্গে আত্মজ্ঞান থাকিবেই থাকিবে। কেহ কেহ বলেন যে, গভীর সমাধির মূলে আত্মজ্ঞান থাকে না। মানুষ যখন সমাধিতে মগ্ন হইয়া যায়, তখন তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া যান। আনন্দ, ঈশ্বরানুভূতি সকলই থাকে; কিন্তু আত্মজ্ঞান কোথায়? একথার উত্তর এই যে, উহা অব্যক্তভাবে থাকে। সমাধির পর, সাধকের অবশ্য মনে হয় যে, 'আমার সমাধি হইয়াছিল'। যাহার স্মৃতি আছে, তাহা অবশ্য কখন ছিল। যখন সমাধির পর মনে হয় যে, আমার সমাধি হইয়াছিল, তখন বলিতেই হইবে যে, অব্যক্তভাবে আত্মজ্ঞান অবশ্য ছিল। যাহা আমার কখন হয় নাই, তাহার স্মৃতি কেমন করিয়া হইবে? মাথা নাই মাথা ধরা কি সম্ভব?

এই আত্মজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী যোগ। আমাকে জানিলেই ব্রহ্মকে জানা হয়। আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব? আমার জীবনের লক্ষ্য কি? এই সকল অতি গুরুতর প্রশ্ন। প্রত্যেকটীর সদুত্তর পাওয়া চাই।

আমি কে? এ প্রশ্নের উত্তর কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি অনন্ত পরমাত্মার প্রকাশ। অনন্ত পরমাত্মা হইতেই আসিয়াছি। সেই অনন্ত পরমাত্মাতেই যাইব। আমার জীবনের লক্ষ্য তাঁহাকে লাভ করা।

আত্মা ও পরমাত্মা এক সত্যের দুই দিক্। তিনি অনন্ত, আমি পরিমিত। অনন্ত বলিলেই পরিমিত বুঝায়। অনন্তের অপর দিক্ পরিমিত। তাঁহার অপর দিক্ আমি, আমার অপর দিক্ তিনি। গণিত শাস্ত্রে যাহাকে Complement বলে, উভয়ে উভয়ের পক্ষে তাহাই।

জগৎ সাদি কি অনাদি? যদি সাদি হয়, তাহা হইলে, যখন জগৎ ছিল না, তখন অনন্তের অপর দিক্ কোথায় ছিল? আর যদি অনাদি হয়, তাহা হইলে, পরমেশ্বরকে কেমন করিয়া স্রষ্টা বলা যায়? এ দুই অতি কঠিন প্রশ্ন। ইহার যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। প্রথম প্রশ্ন এই যে, যদি সৃষ্টি

হয়, তখন অনন্তের অপর দিক্ কোথায় ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলি, জগৎ সাদি নহে। বর্ত্তমান জগৎ অবশ্য সাদি। বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু জগৎ বলিলেই বর্ত্তমান জগৎ বুঝায় না। ইহাই সত্য যে, এক অনাদি অনন্ত সৃষ্টিলীলা চলিতেছে। এক যায়, আর আসে। ক্রমাগত সৃষ্টি পরম্পরা আসিতেছে, যাইতেছে। সম্পূর্ণরূপে প্রথম জগৎ, অথবা সম্পূর্ণরূপে শেষ জগৎ বলিয়া কোন জগৎ নাই।

আমার বিবেচনায় জগৎ অনাদি ও অনন্ত। বিশেষ বিশেষ জগতের আদি ও অন্ত আছে; কিন্তু সৃষ্টির প্রথম ও শেষ সম্ভব নহে। অনাদি অনন্ত সৃষ্টি। পরমেশ্বর যখন অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপ, তখন ইহা বলা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে যে, তিনি অনাদিকাল নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল, আর অমনি তিনি সৃষ্টিলীলা আরম্ভ করিলেন। সৃষ্টি ক্রমাগত চলিতেছে। সকল শাস্ত্রেই আছে যে, সৃষ্টির আরম্ভ আছে। বেদ, কোরাণ, বাইবেল, সকল শাস্ত্রেই সৃষ্টির আরম্ভের কথা রহিয়াছে। ইহার কারণ আছে; মানুষ অনাদি সৃষ্টি মনে ভাবিতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম আছে, ইহা সহজেই মনে হয়। আর একটী কারণ [illegible]। এই যে বর্ত্তমান জগৎ, ইহার যে আদি আছে, বিজ্ঞান একথা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছে। বিজ্ঞান যেমন জগতের আদি আছে বলেন, সেইরূপ, আবার ইহার অন্ত আছে, ইহাও বলেন। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, এই তিনের কথাই বিজ্ঞান বলেন। সুতরাং বর্ত্তমান জগতের আদি আছে বলিয়া একটা সৃষ্টি কল্পনা করা হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। আমি বলিয়াছি যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, পরস্পর সমধর্ম্মাবলম্বী। অর্থাৎ জীবাত্মার যে সকল মূল স্বরূপ লক্ষণ ও পরমাত্মার যে সকল মূল স্বরূপ লক্ষণ, এ উভয় সমান। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই স্বরূপ লক্ষণ। উভয়েরই যখন স্বরূপ লক্ষণ হইল, তখন প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ, পরিমাণে। জীবাত্মা, পরিমিত, পরমাত্মা অনন্ত। সুতরাং উভয়ে অনন্ত প্রভেদ। অনন্ত প্রভেদ হইলেও উভয়ে এক। এক কেন? জীবাত্মার জ্ঞান, পরমাত্মায় ও পরমাত্মার জ্ঞান জীবাত্মায় আসিতেছে ও যাইতেছে, ইহা স্পষ্ট দেখিতেছি। উভয়ে জ্ঞানে এক। ইহা ভিন্ন শঙ্করের যে যুক্তি, তাহাও বলিয়াছি। এই দুই যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবাত্মা, পরমাত্মার প্রকাশ। প্রকাশ বলিলে কি বুঝায়? ইহাই বুঝায় যে, পরমাত্মা সৃষ্টির মধ্যে আসেন। সৃষ্টির মধ্যে আসার অর্থ কি? অর্থ এই যে, তিনি জীবরূপে প্রকাশিত হন। কাহার নিকট প্রকাশিত হন? জীবরূপে আপনার নিকটে আপনি প্রকাশিত হন। এই শেষ কথাটীর অর্থ বুঝা কঠিন। জীবরূপে আপনার নিকটে আপনি প্রকাশিত হওয়ার অর্থ কি? জীব দেখিতে পায় যে, সে জীব। আর পরমাত্মাও দেখিতে পান যে, তিনি জীবরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। লক্ষ লক্ষ জীবরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; অথচ নিজের অনন্ত স্বরূপ যেমন, তেমনি আছে। ইহাই সৃষ্টিলীলা। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বহির্জগৎও তাহাই। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ এই বহির্জগৎ। কিন্তু জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা বুঝায়, এবং শক্তি বলিলেই শক্তিমান বুঝায়, সুতরাং গীতায়

যে বিশ্বরূপের কথা আছে, তাহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। যেমন, সমুদ্র ও তরঙ্গ; যেমন বড় নদী ও খাল; সেইরূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মা।

এখন জীবাত্মার অনাদিত্ব বিষয়ে কিছু বলি। জীবাত্মা যখন পরমাত্মার প্রকাশ, তখন জীবাত্মার উৎপত্তি অবশ্য কালে। পরমাত্মা, জীবাত্মারূপে প্রকাশ হইতেছেন; ইহা বলিলে, এই বুঝায় যে, পূর্ব্বে পরমাত্মা ছিলেন, তিনি জীবাত্মা হইলেন। অনাদি কাল হইতেই যদি পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই আছেন, এমন হয়, তবে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে প্রকাশিত, কেমন করিয়া বলিব? প্রকাশ হইলেন, বলিলেই পরমাত্মার পূর্ব্ববর্ত্তী অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কেহ বলিতে পারেন যে, যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি, এ দুই চিরকালই রহিয়াছেন, সেইরূপ, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ে চিরকাল রহিয়াছেন। এ কথার উত্তর এই যে, রশ্মিকে ছাড়িয়া সূর্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি একই পদার্থ। রশ্মিকে ছাড়িয়া সূর্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সত্তা নাই। রশ্মিরূপে সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। সুতরাং এ উপমা এস্থলে খাটিতেছে না। অন্যান্য যে উপমাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা খাটিতেছে। কেন না, সমুদ্র ও তরঙ্গ, এ উভয়ের মধ্যে সমুদ্র পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলে তরঙ্গ হইতে পারে না। বড় নদী, পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলে, তাহা হইতে খাল হইতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মা, পরমাত্মার প্রকাশ বলিলে, ইহাই বলা হয় যে, পরমাত্মা পূর্ব্ববর্ত্তী, জীবাত্মা পরবর্ত্তী।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিলে, এমন অনেক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, তাহার মীমাংসা বড়ই কঠিন। সেজন্য, সে সকল সূক্ষ্ম প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিবার জন্য, প্রয়াস পাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের পক্ষে যে জ্ঞান সম্ভব, আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

সৃষ্টিলীলা অনাদিকাল চলিতেছে, এবং অনন্তকাল চলিবে, ইহা বিশ্বাস করি। তবে পরমেশ্বর যে আমার অর্থাৎ জীবাত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু সৃষ্টিলীলা, অনাদি বলিলে জীবাত্মার আদি কেমন করিয়া থাকে? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ই কঠিন। কিন্তু জীবাত্মার সৃষ্টি স্বীকার করিলে, জগতের ন্যায় জীবাত্মাও পরম্পরা ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে, বলিতে হয়। যাহা হউক, এ বিষয়ের সূক্ষ্ম তর্কে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না।

আত্মা ও পরমাত্মার যে সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলিলাম। আর কি বলিব? তাঁহার সহিত আমাদের যে কার্য্যগত সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব।

প্রথম, তিনি আমাদের উপাস্য। তাঁহার সহিত আমাদের উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ। তিনি ভক্তিভাজন, আমরা ভক্ত; তিনি মাতাপিতা; আমরা সন্তান। তাঁহাকে আমরা ভক্তি করিব। আমাদের প্রেমভক্তি, তাঁহার প্রাপ্য। আমাদের সকল ভাব, তিনি দিয়াছেন; তাঁহারই প্রাপ্য। আমাদিগকে তিনি জ্ঞান দিয়াছেন, আমরা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানিব। তিনি আমাদিগকে প্রেম দিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিব; তিনি ভক্তি দিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিব। তিনি আমাদের পরমারাধ্য। হৃদয়ের যত পবিত্র ভাব,

সকলই তাঁহার দেওয়া। অতএব সকলই তাঁহাকে দিব। পৃথিবীর যে সকল সম্বন্ধ, সকল সম্বন্ধই তাঁহার সঙ্গে। তিনি রাজা, আমরা প্রজা; তিনি মাতাপিতা; আমরা সন্তান। তিনি প্রভু, আমরা ভৃত্য; তিনি আমাদের হৃদয় বন্ধু। এমন বন্ধু আর কে আছে? তারপর মধুর। এভাবের কথা বলিতে ভয় করে। সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে এভাবের অধিকারী হয় না। যিনি সম্পূর্ণ-রূপে নির্ম্মল হইয়াছেন, তিনিই এভাবের সাধন করিতে পারেন। নতুবা মধুর ভাবের সাধনে অধিকারী হয় না। আগে পবিত্র হও, তারপর ঐ প্রকার উচ্চ সাধনে সাহস করিও। অনধিকারী হইয়া উচ্চতর সাধনে প্রবৃত্ত হইলে অপরাধ হইবে।

আমার এ প্রবন্ধটী শেষ হইল। আমি আর কি বলিব? নগেন্দ্রের দ্বারা লিখিবার সুবিধা পাইয়া অনেক লিখিলাম। আমি জানি, এসকল ক্রমে প্রকাশিত হইবে। ইহা লইয়া দেশে অনেক আন্দোলন হইবে। অনেক কথা উঠিবে। সকলই জানি। কিন্তু ইহাও জানি যে, পরিণামে ইহাতে নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। সেই জন্যই লিখিলাম। আরও লিখিব। আমার সহযোগী হইয়া শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনেক লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখাও প্রকাশ হইবে। লোকে মনে করিতে পারে, উহা তাঁহার লেখা নয়। কিন্তু তাহা হইলেও উহা দ্বারা উপকার হইবে। সেই জন্যই তিনি লিখিতেছেন। পরমেশ্বর যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা ছাড়িতে পারি না। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ হইবে, এবং উহা লইয়া আন্দোলন হইবে। যাহাই হউক, পরিণামে যে মঙ্গল হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহা বিশ্বাস করি। সেই জন্যই লিখিয়াছি। আর কি বলিব? পরমেশ্বরকে ও মিডিয়মকে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শক্তিতত্ত্ব। (২)

কথা দাঁড়াইল এই যে, একটা জড় পদার্থ 'ক' কে কার্য্য করিতে হইলে ইহাকে চলিতে হইবে—এবং বলের বিপরীত দিকে চলিতে হইবে—তা 'ক' একটা নির্জ্জীব জড়ই হোক বা সজীব জড়ই হোক। একটা খট্‌কা এখানে উপস্থিত হইতে পারে যে, 'ক' টা যদি একটা জন্তু হয়, তবে না হয় উহা বলের বিপরীত দিকে চলিতে থাকুক এবং কার্য্য করিতে থাকুক, কিন্তু একটা নির্জ্জীব জড় পদার্থ বলের বিপরীত দিকে চলিবে কেমন করিয়া? নির্জ্জীব জড় পদার্থ কার্য্য করিবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, অবস্থা বিশেষে নির্জ্জীব জড়পদার্থও বলের বিপরীত দিকে চলিতে পারে—অর্থাৎ কার্য্য করিতে পারে। জড়ের দুইটা অবস্থা আছে, যে অবস্থায় উহা বলের বিপরীত দিকে যাইতে পারে। উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

একখণ্ড লৌহ একটী জড় পদার্থ। পৃথিবী আর একটী জড় পদার্থ। লৌহের সঙ্গে

পৃথিবীর আকর্ষণ আছে। পৃথিবী লৌহকে নীচের দিকে টানিতেছে। এখন, লৌহ খণ্ডকে যদি পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া খানিকটা উঁচু করিয়া ধরা যায় এবং ঐ উচ্চ স্থান হইতে উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে লৌহখণ্ড পৃথিবীর আকর্ষণে নীচের দিকে যাইবে। এখন যদি একখানা চুম্বক লৌহখণ্ডের উপর ধরা যায়,তাহা হইলে ঐ চুম্বকখানা লৌহকে উপরের দিকে টানিবে। ঐ উপরের দিকের টান যদি পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে লৌহখণ্ড নীচের দিকেই যাইবে—অর্থাৎ চুম্বক উহার উপর যে বল প্রয়োগ করিতেছে, তাহার বিপরীত দিকে যাইবে, তবে ভূমিস্পর্শ করিলে আর যাইতে পারিবে না। এখানে দেখা গেল যে, অবস্থা বিশেষে একখণ্ড লৌহ উহার উপর চুম্বকের আকর্ষণের বিপরীত দিকে যাইতে পারে—অর্থাৎ উহা চুম্বকের আকর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যদি পৃথিবী লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ না করিত,অথবা পৃথিবী লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিলেও, যদি লৌহখণ্ডকে উপরে তুলিয়া না ধরা যাইত, তাহা হইলে উহা চুম্বকের আকর্ষণের বিপরীত দিকে অর্থাৎ নীচের দিকে যাইত না এবং ঐ আকর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য্য করিত না। মোটের উপর, পৃথিবীর সহিত লৌহখণ্ডের আকর্ষণ আছে বলিয়া এবং লৌহখণ্ডকে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া, এইক্ষেত্রে, লৌহখণ্ড চুম্বকের আকর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল, যদি কোন একটী পদার্থ 'ক'কে অন্য অন্য একটী পদার্থ 'খ' হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা যায় এবং তাহাদের যদি পরস্পরে আকর্ষণ থাকে,তাহা হইলে ঐ অবস্থায় উহারা কার্য্য করিতে পারে।

ইহা ভিন্ন আরও একটা অবস্থা আছে,যে অবস্থাতেও জড় কার্য্য করিতে পারে। যদি জড় পদার্থ গতি-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলেও উহা কার্য্য করিতে পারে—অর্থাৎ বলের বিপরীত দিকে যাইতে পারে। 'ক' একটী জড়পদার্থ, পৃথিবী ইহাকে নীচের দিকে টানিতেছে। 'ক' যতক্ষণ নিশ্চল অবস্থায় আছে, ততক্ষণ উহা এই আকর্ষণের বিপরীত দিকে যাইতে পারিতেছে না। এখন 'ক' কে যদি গতিবিশিষ্ট করা যায়—উহাকে যদি উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা উপরের দিকে উঠিতে থাকে—অন্ততঃ খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আকর্ষণের বিপরীত দিকে চলিতে থাকে। যতক্ষণ উহা উপরের দিকে উঠিতে থাকে, ততক্ষণ উহাকে পৃথিবীর আকর্ষণের বিপরীত দিকে চলিতে হয়, অর্থাৎ কার্য্য করিতে হয়। এখানে 'ক' এর কার্য্য করিবার ক্ষমতার কারণ হইতেছে উহার গতি।

দেখা গেল, জড়পদার্থ দুইটী বিভিন্ন অবস্থায় কার্য্য করিতে পারে:—(১) অন্য জড় হইতে ইহার বিচ্ছিন্নাবস্থায়, (২) যখন উহা গতিবিশিষ্ট হয়।

আমরা সাধারণতঃ কার্য্যের অর্থ যাহা বুঝি, পদার্থ-শাস্ত্রে কার্য্যের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়। জল তোলা, বাসন মাজা, কাঠ চেরা, পাখা টানা, এই সকলকে আমরা কার্য্য করা বলি। এই সকল ব্যাপারেও বলের বিপরীত দিকে গতি উৎপন্ন করিতে হয়। জল তুলিতে পৃথিবীর আকর্ষণের বিপরীত দিকে উহাকে উঠাইতে হয়, কাঠ চিরিতে কাঠের অণুগুলিকে তাহাদিগের

পরস্পরের আকর্ষণের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। পাখা টানিবার সময় বায়ুতে উহার গতির বাধা জন্মায়, তজ্জন্যই পাখা টানিতে কার্য্য করিতে হয় এবং কার্য্যের মূল্যস্বরূপ মাসে পঞ্চমুদ্রা দক্ষিণা দিতে হয়। বায়ু না থাকিলে কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইত না। একবার টানিয়া ছাড়িয়া দিলে পাখা আপনি আন্দোলিত হইতে থাকিত। পাখাওয়ালার পয়সা বাঁচিয়া যাইত, তবে দুঃখের বিষয়, হাওয়া খাওয়া হইত না।

এখন জড়ের শক্তি কাহাকে বলে, বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিয়াছি, অবস্থা বিশেষে জড়পদার্থ কার্য্য করিতে পারে। অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে জড় কার্য্যক্ষম—বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে কার্য্য বলে, সেইরূপ কার্য্যে সক্ষম। জড় পদার্থের এই কার্য্য করিবার ক্ষমতার নাম উহার শক্তি। যখন কোন একটা জড়, কার্য্য করিতে পারে এরূপ অবস্থায় থাকে, তখন উহার শক্তি আছে, এইরূপ বলা যায়—তখন উহা শক্তিসম্পন্ন বা শক্তির আধার—উহা যে পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে, তাহাই হইতেছে উহার শক্তির পরিমাণ। একটা জড়পদার্থের আর একটা হইতে অধিক পরিমাণে কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে। একই জড় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে। জড়পদার্থ যখন যে পরিমাণ কার্য্য করিতে পারে, তাহা দ্বারাই উহার তখনকার শক্তির পরিমাপ হয়।

শক্তি দুই প্রকার:—আমরা দেখিয়াছি, দুই অবস্থায় জড় কার্য্য করিতে পারে; এই জন্য জড়ের শক্তিও দুই প্রকার। যদি 'ক' ও 'খ' পরস্পরে আকর্ষণ থাকে এবং তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহারা প্রত্যেকেই কার্য্য করিতে পারে—উহারা শক্তিসম্পন্ন। উহারা কার্য্য করিতেছে কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা। কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকা ও কার্য্য করা এক কথা নহে। তবে বর্ত্তমানে যাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহাই ভবিষ্যতে কার্য্য করিয়া থাকে। অন্য জড় হইতে বিচ্ছিন্নাবস্থার জন্য জড়ের যে শক্তি, আমরা উহাকে জড়ের প্রচ্ছন্ন শক্তি বলিব। যেখানে যেখানে জড়ে জড়ে আকর্ষণ আছে, মহাকর্ষণই হউক বা মধ্যাকর্ষণই হউক বা অণুসমূহের পরস্পরে আকর্ষণই হউক, যেখানে যেখানে আকর্ষণ আছে এবং আকর্ষণ সত্ত্বেও জড় হইতে জড় বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, সেইখানেই প্রচ্ছন্নভাবে জড় শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ছাদের কানিশের উপর একখানা পাথর রাখিলে উহা ঐ অবস্থায় কতটা প্রচ্ছন্ন শক্তির আধার! পৃথিবীর আকর্ষণে নামিবার সময় উহা কতটা কাজ করিতে পারে! গিরিশৃঙ্গস্থিত নদীর জল কতটা প্রচ্ছন্ন শক্তির আধার! কয়লা ও বায়ুর অণুসমূহে আকর্ষণ আছে, উহারা যতক্ষণ না মিলিতেছে, ততক্ষণ উহারা কতটা প্রচ্ছন্ন শক্তির আধার! ঘড়িতে দম দিতে উহার স্প্রিংএর অণুসমূহকে পরস্পরের আকর্ষণের বিরুদ্ধে টানিতে হয়। এই দম দেওয়া অবস্থায় ঘড়ির স্প্রিং প্রচ্ছন্ন শক্তির আধার। উহা এখন ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইতে পারে—উহা কার্য্য করিতে পারে। সূর্য্যের অণুসমূহ পরস্পরের আকর্ষণে আরও কত সঙ্কুচিত হইতে পারে—উহা কতটা প্রচ্ছন্ন শক্তির আধার! এই প্রকাণ্ড জগতে কত সূর্য্য, কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, পরস্পরকে টানাটানি করিতেছে—তাহাদের পরস্পরের

দূরত্বই বা কত, সমগ্র জড় জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিমাণই বা কত!

জড়ের কার্য্য করিবার ক্ষমতার দ্বিতীয় অবস্থা হইতেছে, উহার গতি। গতি থাকিলেই জড় কার্য্য করিতে পারে। গতিশীল জড় পদার্থ-মাত্রেই শক্তিবিশিষ্ট। গতির জন্য জড় পদার্থের যে শক্তি, তাহাকে উহার গতিশক্তি বলা যাইতে পারে। গতির জন্য উহা যে পরিমাণ কার্য্য করিতে পারে, তাহাই উহার গতিশক্তির পরিমাণ। গতি যে ভাবেরই হউক না কেন—সরল পথেই হউক বা বক্র পথেই হউক, কম্পন গতিই হউক বা ঘূর্ণন গতিই হউক, গতি থাকিলেই জড় পদার্থের কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে। উহা তখন শক্তিবিশিষ্ট।

গতিশীল কামানের গোলা, বেগবতী স্রোতস্বতী, কম্পমান জড়পরমাণু, ঘূর্ণ্যমান পৃথিবী, ধাবমান সৌরজগৎ, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জল-সাগর বা ঈথর-সাগর, সকলই শক্তির আধার। অগণিত নক্ষত্র, অসংখ্য ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে, অনন্ত আকাশে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—জড় প্রকৃতি শক্তিময়।

শব্দ কি? জড় পদার্থের অনুসমূহের কম্পন বিশেষ। তাপ কি? আলোক কি? জড় পরমাণুর দ্রুততর কম্পন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই আণবিক কম্পন বায়ুমণ্ডলে বা ঈথর-সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এবং আমাদের ইন্দ্রিয় নিচয়ে আন্দোলন উৎপন্ন করিয়া, শব্দ বা তাপ বা আলোকের অনুভূতি জন্মাইতেছে। শব্দ, তাপ বা আলোক, ইহারা শক্তিরই মূর্ত্তিভেদ।

এখন শক্তির কয়েকটী বিশেষত্বের উল্লেখ করিতে হইতেছে। শক্তির একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। জড় মাত্রেই শক্তির আধার, কিন্তু ইহার শক্তির পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে না, কোন জড় সম্বন্ধেই এই কথা খাটে না—এই মুহূর্ত্তে যেটায় যতখানি শক্তি আছে, পর মুহূর্ত্তে হয়ত আর সেটায় ততখানি নাই। এই মুহূর্ত্তে যেটা যতখানি কার্য্য করিতে পারে, একটু পরে হয়ত আর সেটার ততখানি কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। উহার খানিকটা শক্তি অন্যটায় সঞ্চালিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সূর্য্যটা কত গরম, উহা কত শক্তির আধার। কিন্তু অনন্ত আকাশে, তরঙ্গের আকারে উহার শক্তি অনবরত ছড়াইয়া পড়িতেছে। শত বৎসর পূর্ব্বে উহার শক্তির পরিমাণ যত ছিল, আজ তাহা নাই। আজ উহা যে পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন, শতবৎসর পরে উহার শক্তির পরিমাণ আর তাহা থাকিবে না। কে বলিতে পারে, আমাদের ঐ সূর্য্যটার মত কত সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডে আছে? কে বলিতে পারে, প্রতিমুহূর্ত্তে কত না শক্তি গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে, সূর্য্য হইতে সূর্য্যান্তরে, ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্তরে সঞ্চালিত হইতেছে?

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটার দিকে তাকাইলেও আমাদিগকে শক্তির এই দিগন্ত প্রসারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ধনুকের গুণ ধরিয়া টান দিতে, আমার শরীরের খানিকটা শক্তি গুণে সংক্রামিত হয়। গুণ ছাড়িয়া দিতে গুণের এই প্রচ্ছন্ন শক্তি তীরে সঞ্চালিত হয়। কামান ছুড়িতে বারুদের প্রচ্ছন্ন শক্তি গোলাতে সঞ্চালিত হয়। ঘড়িতে দম দিতে আমার শরীরের শক্তি স্প্রিংএ সঞ্চালিত হয়, আবার উহা স্প্রিং হইতে ক্রমে

কাঁটায় সঞ্চালিত হইয়া কাঁটাকে ঘুরাইয়া দেয়। ব্যাটারি ও তারের সাহায্যে আমরা একরাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে আমাদের ইচ্ছামত শক্তি সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং তারের খবর পাঠাই। উপযুক্ত যন্ত্রযোগে ঈথর-সমুদ্রের একপ্রদেশে বৈদ্যুতিক কম্পন উৎপন্ন করি এবং এই শক্তি অন্য প্রদেশে সঞ্চালিত হইয়া যন্ত্রবিশেষ সাড়া উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমরা বিনা তারে খবর পাঠাই। আমাদের উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে শক্তি পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে সঞ্চালিত হইতেছে। জড়জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তনের মূলে এই শক্তি-সঞ্চালন।

রূপান্তর গ্রহণ :—শক্তির আর একটী বিশেষত্ব এই যে, শক্তি বহুরূপা—একই শক্তি কখন শব্দরূপে, কখনও আলোক রূপে, কখনও তাপরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। একরূপ ছাড়িয়া শক্তি সহজেই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রচ্ছন্ন শক্তি গতি শক্তিতে ও গতি শক্তি প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণত হইতেছে। ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহাকে শক্তির রূপান্তর গ্রহণ বলা যাইতে পারে। জগতের প্রতি কার্য্যে, প্রতি পরিবর্ত্তনে শক্তির রূপান্তর সাধিত হইতেছে। সূর্য্যের উত্তাপে সাগরের জল গরম হইয়া বাষ্পাকারে আকাশে উঠিতেছে—অর্থাৎ তাপ শক্তি প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণত হইতেছে। যখন বৃষ্টি পড়ে, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি গতি শক্তিতে পরিণত হয়। বৃষ্টি ফোঁটা ভূমি স্পর্শ করিবার পর কতকটা শব্দ, কতকটা তাপ উৎপন্ন হয়—উহার গতি শক্তি শব্দ ও তাপ শক্তিতে পরিণত হয়।

• শক্তির রূপান্তর গ্রহণের উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী পরীক্ষা করা যাইতেছে :—

প্রচ্ছন্ন শক্তির গতি শক্তিতে এবং গতি শক্তির প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণতি।

এখানে একটা পেণ্ডুলাম ঝুলিতেছে। পেণ্ডুলামটাকে খানিকটা টানিয়া তোলা গেল। ইহাতে আমাকে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে খানিকটা কার্য্য করিতে হইল। খানিকটা শক্তি ব্যয় করিতে হইল। আমাকে যে পরিমাণে শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছে, পেণ্ডুলামটা এখন সেই পরিমাণ শক্তির আধার। পেণ্ডুলামের শক্তি এখন প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে; উহার গতি শক্তি নাই। পেণ্ডুলামটী ছাড়িয়া দেওয়া গেল—উহার প্রচ্ছন্ন শক্তি কমিতেছে কিন্তু সেই পরিমাণে উহার গতিশক্তি বাড়িতেছে। প্রচ্ছন্ন শক্তি গতি শক্তিতে পরিণত হইতেছে। মধ্য পথে আসিয়া উহার প্রচ্ছন্ন শক্তি সবটাই গতি শক্তিতে পরিণত হইল। এখন উহা মধ্য পথ ছাড়াইয়া গেল—এখন উহার গতিশক্তি কমিতেছে, প্রচ্ছন্ন শক্তি বাড়িতেছে—গতি শক্তি প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণত হইতেছে। এখন উহা উহার পথের অপর প্রান্তে আসিয়াছে, এখন অতটা গতিশক্তি প্রচ্ছন্ন শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। পেণ্ডুলম কেবল একবার দুলিয়াই স্থির হইল না, এখনও দুলিতেছে, কেননা উহাতে যতখানি শক্তি নিহিত করা গিয়াছে, তাহা এখনও ফুরায় নাই। প্রতি দোলনে খানিকটা শক্তি বায়ুতে সঞ্চালিত হইতেছে। যদি শক্তি এইরূপে সঞ্চালিত হইয়া না যাইত, তবে উহা চিরকাল দুলিতে থাকিত। কিন্তু বায়ুর ঘর্ষণে ক্রমে উহার শক্তি তাপে পরিণত হইয়া বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দেখা গেল, প্রচ্ছন্ন শক্তি গতি শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইলেও স্থূল গতিই

উহার পরিণাম নহে। শেষটা শক্তি তাপরূপ ধারণ করে।

গতি শক্তির তাপে পরিণতিঃ—হাতে হাতে বাঁধা গেল। এখানে গতিশক্তি তাপে পরিণত হইল। জগতের প্রতি ব্যাপারেই গতিশক্তি তাপে পরিণত হইতেছে।

তাপের গতি শক্তিতে পরিণতি—একটা পিতলের দণ্ডের একপ্রান্তে স্ক্রু দিয়া আটকাইয়া রাখা গিয়াছে। উহার অপর প্রান্ত ঘুরিতে পারে, এইরূপ একটা কাঁটার এক প্রান্তের সহিত সংলগ্ন আছে। পিত্তলের দণ্ডটা গরম করা গেল। উহার আয়তন বাড়িয়া যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাটাও ঘুরিয়া যাইতেছে। এখানে তাপ শক্তি গতি শক্তিতে পরিণত হইল।

একটা কাঁচের পাত্রের ভিতর সহজে ঘুরিতে পারে,এইরূপ কয়েকটী চাকতি সাজান আছে। চাকতি গুলির এক এক পিঠ কালী মাখান। কাঁচের পাত্রটী হইতে বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন উহার ভিতরে যে বায়ু আছে, তাহা অতি সামান্য, তাহাতে চাকতির গতির বাধা জন্মায় না। পাত্রটীর নিকটে একটা স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালান গেল—চাকতিগুলি ঘুরিতে আরম্ভ করিল—তাপ গতি শক্তিতে পরিণত হইল।

একটী যন্ত্র এখানে রাখা হইয়াছে। ইহা ষ্টীম ইঞ্জিনের একটী ক্ষুদ্র আদর্শ। তাপ সহযোগে ইহার বয়লারের ভিতরকার জল গরম করা গেল। গরমজল হইতে গরম বাষ্প উঠিয়া বাহিরের বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের চাকা ঘুরিতেছে। বয়লার হইতে বাষ্প যতখানি তাপ লইয়া যাইতেছে, ইঞ্জিন হইতে বাহির হইবার সময় আর ততখানি তাপ লইয়া বাহির হইতেছে না। খানিকটা তাপ ইঞ্জিনের চাকা ঘুরাইতে ব্যয়িত হইতেছে। এখানেও তাপশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হইতেছে।

তাপের তাড়িত শক্তিতে পরিণতি—

একখণ্ড তাম্রের দুই প্রান্তের সঙ্গে একখণ্ড লৌহের দুই প্রান্ত ঝালাইয়া জোড় লাগান হইয়াছে। ভিতরে একটা কম্পাসের কাঁটা আছে। একমুখ গরম করিতেই কম্পাসের কাঁটা ঘুরিয়া গেল—গরম করাতে ধাতু খণ্ডদ্বয়ের ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত হইল, তাই কম্পাসের কাঁটা ঘুরিয়া গেল। এখানে তাপশক্তি তাড়িত শক্তিতে পরিণত হইল।

এই তাড়িত শক্তি আবার সহজেই রূপান্তরিত হইয়া তাপে পরিণত হয়। তাড়িত প্রবাহকালে ধাতুখণ্ডদ্বয় একটু গরম হয়।

তাড়িত শক্তির তাপে পরিণতি —একটা কাঁচের গোলকের ভিতর একটা প্লাটিনাম নামক ধাতুর তার আছে। এই তারের দুই প্রান্ত ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া গেল। এখন প্লাটিনাম তারের ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উহা উত্তপ্ত হইতেছে—উহা এখন এত উত্তপ্ত হইয়াছে যে, উহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। এখন আমরা ষ্টীমারে, রেলে, ঘাটে, পথে এই বিজলী-বাতি সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এখানে তাড়িত শক্তি তাপ ও আলোকে পরিণত হইতেছে।

তাড়িত শক্তির শব্দে পরিণতি ঃ—একখণ্ড লৌহের চারিদিকে তার জড়ান আছে। এই তারের দুই প্রান্ত ব্যাটারির সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ির আঘাতে ধাতুনির্ম্মিত বাটিটা

বাজিতে আরম্ভ করিল। এখানে তাড়িত শক্তি শব্দে পরিণত হইতেছে। কিন্তু এই খানেই শেষ নহে। বাটিটা বাজিতেছে, অর্থাৎ ইহার অণুগুলি কম্পিত হইতেছে—এই আণবিক কম্পন বায়ুসাগরে তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পুনরায় বিভিন্ন পদার্থে আণবিক কম্পন উৎপন্ন করিয়া তাপে পরিণত হইতেছে।

সাধারণ গতি শক্তির তাড়িত শক্তিতে পরিণতি :—

একটা বৃহৎ চুম্বকে দুইমুখের কাছে একটা তারের গুটী ঘুরান যাইতেছে। ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই তারে তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে। তারের দুইপ্রান্ত একবার একত্র করা যাইতেছে—একবার ফাঁক করা যাইতেছে। বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। শারীরিক শক্তি ব্যয় করিয়া তারের গুটিতে গতি উৎপন্ন করিতে হইতেছে। এই গতিশক্তি হইতে তাড়িত-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। এই যন্ত্রকে ডাইনামো বলে। এইরূপ যন্ত্র সহযোগে রেল ষ্টীমারে বিজলীবাতি জ্বালান হয়।

তাড়িত-শক্তির সাধারণ গতি-শক্তিতে পরিণতি :—

একখণ্ড চুম্বকের মুখের কাছে একটা তারের গুটি সহজে ঘুরিতে পারে, এইরূপ অবস্থায় আছে। তারের গুটির দুইপ্রান্ত ব্যাটারির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া গেল—তারের গুটি বেগে ঘুরিতে লাগিল। এখানে তাড়িত-শক্তি সাধারণ গতি-শক্তিতে পরিণত হইল। এইরূপ যন্ত্রকে ইলেক্‌ট্রিক মোটর বলে। এইরূপ যন্ত্রযোগে তাড়িতশক্তি ব্যয় করিয়া পাখাটানা, গাড়ী চালান হইতে জল তোলা, বাসনমাজা প্রভৃতি সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে এবং দেশ বিশেষে হইতেছেও।

এখানেও সাধারণ গতিই শক্তির পরিণাম নহে। শেষটা শক্তি তাপে পরিণত হইয়া যায়। তারের গুটি ঘুরিবার কালে বায়ুর সহিত, যন্ত্রের অপরাংশের সহিত ঘর্ষণ হইয়া থাকে—ঘর্ষণে শক্তি তাপে পরিণত হয়।

আকর্ষণ-জনিত শক্তির তাপে পরিণতি :—

পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে এই বলটাকে খানিকটা উপরে তুলিয়া ধরা হইল। পৃথিবীর সহিত উহার আকর্ষণ আছে। উহা আকর্ষণজনিত প্রচ্ছন্ন-শক্তির আধার। বলটা ছাড়িয়া দেওয়া গেল—উহা পড়িতে থাকিল; প্রচ্ছন্ন-শক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হইল। ভূমি স্পর্শ করিলে একটা শব্দ হইল, খানিকটা তাপ উৎপন্ন হইল। এখানে প্রচ্ছন্ন-শক্তি গতি-শক্তি, গতিশক্তি শব্দ ও তাপে পরিণত হইল।

খানিকটা ক্লোরেট অব পটাস ও চিনি একত্র করিয়া এই পাত্রে রাখা হইয়াছে। একটার অণুসমূহ অন্যটার অণুসমূহকে টানিতেছে, কিন্তু উহারা এখন মিশিতে পারিতেছে না। রাসায়নিক আকর্ষণ-জনিত এই মিশ্রিত পদার্থ প্রভূত প্রচ্ছন্নশক্তির আধার। এক ফোঁটা গন্ধকদ্রাবক এই মিশ্রিত পদার্থের উপর ফেলিয়া দেওয়া গেল। আকর্ষণ-জনিত প্রচ্ছন্নশক্তির লোপ হইল—শক্তি রূপান্তরিত হইয়া গন্ধ, আলোক ও তাপে পরিণত হইল।

তাড়িতশক্তির আলোকে পরিণতি :—

এই কাঁচনির্ম্মিত পাত্রের ভিতর হইতে বায়ু নিষ্কাষণ যন্ত্রদ্বারা বায়ু বহির্গত করা হইয়াছে। এখন উহার ভিতরে অতি সামান্য পরিমাণে বায়ু আছে। কাঁচের পাত্রমধ্যে উহার দুই

দিকে দুইখানা ধাতুনির্ম্মিত চাকতি বসান আছে। চাকতি দুইখান হইতে দুইটী তার পাত্রের বাহিরে আসিয়াছে। এই তার দুইটীর সহিত তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রের যোগ করিয়া দিয়া পাত্রের ভিতর তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন করা গেল। ইহার ফলে চাকতি দুইখানার ভিতরে যে শ্বেতপদার্থ রহিয়াছে, তাহা দীপ্ত হইয়া উঠিল। এখানে তাড়িতশক্তি আলোকে পরিণত হইল।

আর একটা কাঁচপাত্র লওয়া গেল। ইহাও একপ্রকার বায়ুশূন্য। ইহারও দুই প্রান্তে দুইখানা ধাতুময় চাকতি আছে। তবে দুইপ্রান্তে দুইখানা চাকতি ছাড়া ইহার মধ্যস্থলেও একখানা চাকতি বসান আছে। প্রান্তের চাকতি দুইখানা তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করা গেল। এখন পাত্রের ভিতর তাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে। এখন বায়ুর অণুকয়টা আর আস্ত নাই। কতকগুলি পরমাণু ভাঙ্গিয়া চূরিয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পরমাণুর এই ভগ্নাংশগুলির নাম ইলেক্ট্রন। এই ইলেক্ট্রন গুলি তাড়িতবস্তু—এই বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্রন গুলি কাঁচপাত্রের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। তাহাতেই পাত্রের ভিতর তাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে। ছুটিয়া যাইতে ইহারা মধ্যখানকার প্লাটিনাম চাকতির গাত্রে পড়িয়া উহাকে ধাক্কা দিতেছে। ইহার ফলে ঐ মাঝখানকার চাকতি হইতে একপ্রকার নূতন আলোক বাহির হইয়া আসিতেছে। জার্ম্মণি দেশের রঞ্জন সাহেব এই আলোকের আবিষ্কার করেন। এখানেও তাড়িতশক্তি আলোকে পরিণত হইতেছে।

এই আলোকের কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে। সূর্য্য হইতে আমরা যে আলোক পাই, কিম্বা, কেরোসিন বা মোমবাতি জ্বালাইয়া আমরা যে আলোক উৎপন্ন করি, রঞ্জনের এই আলোক তাহা হইতে অনেকটা ভিন্নপ্রকৃতির। সাধারণ আলোক যে সকল পদার্থ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, রঞ্জনের আলোক এইরূপ অনেকগুলি পদার্থের ভিতর দিয়া অক্লেশে চলিয়া যাইতে পারে। কাগজ, কাপড়, কাঠ ইত্যাদি এই আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ পদার্থ। ধাতুগুলি এই আলোকের পক্ষে অস্বচ্ছ, সাধারণ আলোকের পক্ষে কাঁচ স্বচ্ছ, এই আলোকের পক্ষে কাঁচ অনেকটা অস্বচ্ছ। এই আলোকের দ্বারা চামড়া ও মাংসের ভিতর দিয়া মানুষ বা অন্য প্রাণীর হাড় দেখিতে পাওয়া যায়।

শক্তির আর একটী বিশেষত্ব,ইহার অনশ্বরতা। এবিষয়ে জড় ও শক্তিসম্বন্ধে একই নিয়ম। যেমন জড় সৃষ্টি করা বা ধ্বংস করা চলে না, সেইরূপ শক্তিরও সৃষ্টি বা ধ্বংস চলে না। শক্তি, পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে সঞ্চালিত হইতে পারে, শক্তি একমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু শক্তির সৃষ্টি কিম্বা ধ্বংস নাই। জড়বিশেষে শক্তির পরিমাণ কমিতে পারে বা বাড়িতে পারে, মূর্ত্তিবিশেষে শক্তির লোপপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে, কিন্তু সমগ্র জড়জগতের শক্তির পরিমাণ কল্য যাহা ছিল, অদ্যও তাহাই আছে এবং কল্যও তাহাই থাকিবে। সমগ্র জগতের শক্তির পরিমাণ—নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। কোন একটী পদার্থের শক্তির পরিমাণ বাড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য পদার্থের শক্তি সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে এবং একটী পদার্থের শক্তির পরিমাণ কমিয়া গেলে, অন্য পদার্থের শক্তি সেই পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। শক্তি একস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে

যাইতে পারে, কিন্তু সৃষ্ট বা নষ্ট হইতে পারে না। পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিলে শক্তিকে নূতন কোন গৃহে আশ্রয় লইতেই হইবে এবং নূতন গৃহে আসিতে হইলে পুরাতন গৃহ ত্যাগ করিতেই হইবে। আবার শক্তি এখন যে মূর্ত্তিতে আছে, একটু পরে তাহা হইতে ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু একমূর্ত্তিতে শক্তির পরিমাণ যতখানি কমিয়া যাইবে, অন্য মূর্ত্তিতে উহা ঠিক ততখানি বাড়িয়া যাইবে। নূতন মূর্ত্তিতে শক্তির উদ্ভব হইতে হইলে, উহার পুরাতন একমূর্ত্তির লোপ পাইতেই হইবে, এবং শক্তির পুরাতন মূর্ত্তির লোপ হইলে নূতন মূর্ত্তিতে উহাকে ফুটিয়া উঠিতেই হইবে। জগতের প্রতি কার্য্যে শক্তি স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে, একমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। শক্তির সঞ্চালন ও শক্তির রূপান্তর গ্রহণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহাতেই জগতের বৈচিত্র্য, ইহাতেই জগতের সৌন্দর্য্য। আমাদের উঠিতে, বসিতে, হাটিতে, খেলিতে শক্তি স্থানান্তরিত ও রূপান্তরিত হইতেছে। জগতের প্রতি কার্য্যে—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কার্য্যের মূলে শক্তির এই লীলা। শক্তি বহুরূপী, শক্তি চঞ্চল, শক্তি লীলাময়ী। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড, এই বৃহৎ জড়জগৎ, ঐ অনন্ত আকাশ-শক্তির লীলাক্ষেত্র। জড় নিশ্চল নিষ্ক্রিয়, শক্তি চঞ্চল, ক্রিয়াশীল। জড় আধার, শক্তি আধেয়; জড় দেহ, শক্তি প্রাণ। জড়কে আশ্রয় করিয়াই শক্তির অস্তিত্ব, আবার শক্তি আছে বলিয়াই আমরা জড়জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি।

আছে কেবল এক বিরাট জড় প্রকৃতি, আর আছে উহার উপর এক মহাশক্তির উদ্দাম ক্রীড়া। ইহাই জগতের একমাত্র ব্যাপার—ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। নৃত্যকারীর নৃত্যে, পরমাণুর কম্পনে, স্রোতস্বতীর গতিতে, তাড়িতের প্রবাহে, লাটিমের ঘূর্ণনে, পৃথিবীর আবর্ত্তনে, আমরা একই মহাশক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে পাই। ঐ সূর্য্যে এই মহাশক্তিরই কিয়দংশমাত্র নিহিত আছে। অণু সমূহের আকর্ষণে সূর্য্যের বিরাট দেহ অল্পে অল্পে সঙ্কুচিত হইতেছে, সূর্য্যের প্রচ্ছন্ন শক্তি তাপ ও আলোকে পরিণত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই আলোক ও তাপের আলো অতি সামান্য অংশমাত্র। এই ধরাপৃষ্ঠে পৌঁছিয়া পৃথিবীকে মনুষ্য বাসোচিত করিয়াছে। এই শক্তিরই বলে পৃথিবীতে জল পড়ে, পাতা নড়ে, ইঞ্জিন চলে, মানুষ হাঁসে কাঁদে, বই পড়ে এবং শক্তির রীতিনীতি সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়। অপর এই মহাশক্তিরই কিয়দংশ মাত্র, সাগর বক্ষে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনে ভীতি উৎপাদন করে। শক্তি কখনও মাতৃ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া জীব সমূহের সুখ ও সম্পদের আকর হইতেছে, কখনও রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবের ত্রাস জন্মাইতেছে। কিন্তু শক্তিরই এই লীলা-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানুষ উহার অবিনাশিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে। শক্তির অবিনশ্বরতা উনবিংশ শতাব্দীর প্রধানতম আবিষ্কার। আমরা তজ্জন্য রুমফোর্ড, ডেভি, জুল্ ও হেল্‌ম্‌হোলৎজের নিকট ঋণি। মানুষের উন্নতির ইতিহাসের সঙ্গে শক্তির ইতিহাস গ্রথিত থাকিবে। যাহারা জানিতেছে ও শিখিতেছে, তাহারা এই জড় শক্তিকে প্রয়োজনমত কাজে লাগাইয়া সুখ ও সম্পদের অধিকারী হই-

তেছে। যাহারা জানেনা বা জানিতে চাহে না, জড়শক্তি তাহাদের মৃত্যুর পথ উন্মুক্ত করিতেছে। এই জড়শক্তির উপর প্রভুত্বই মানবের উন্নতির মূল। জড়শক্তির সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া যে যত উহাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, জড়জগৎ তাহার পক্ষে ততই সুবিধার স্থান। বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাস, জড়শক্তিকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়োজিত করিবার ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। শারীরিক বলে মনুষ্য হস্তী, ব্যাঘ্র অপেক্ষা হীন—যন্ত্র সাহায্যে মনুষ্য পশু হইতে কতগুণে বলবান!

যন্ত্রের কার্য্য কি? জড় শক্তিকে সুবিধা মত একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উহাকে রূপান্তরিত করা। ষ্টীম ইঞ্জিন কি? জড় শক্তিতে গতি শক্তিতে পরিণত করিবার যন্ত্র। ডাইনামো কি? শারীরিক শক্তিকে তাড়িত শক্তিতে পরিণত করিবার যন্ত্র। টেলিগ্রাফ কি? তাড়িত শক্তিকে নূতন মূর্ত্তিতে স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার যন্ত্র। যন্ত্র সহকারে মানুষ জড় শক্তিকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া আপনি আপনার বিজয়ডঙ্কা বাজাইতেছে। কিন্তু হায়, জগৎটা যে সকল নিয়ম মানিয়া চলিতেছে, সে সকল নিয়ম মানুষের সৃষ্ট নহে—ঐ সকল নিয়ম মানুষের মুখাপেক্ষী নহে—উহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। মানুষ ইচ্ছা করিলে আইন করিয়া সকল গরীবের ফাঁসি দিতে পারে, ইচ্ছা করিলে আইন করিয়া পরীক্ষার প্রশ্ন সম্ভবাতিরিক্ত কঠিন করিয়া বিদ্যালয়ের বালক সমূহের কোমল মস্তিষ্ক কতখানি মিষ্ট, তাহা আস্বাদন করিয়া দেখিতে পারে; কিন্তু জড়ে জড়ে আকর্ষণ, ইহাই যদি জগতের নিয়ম হয়, তবে মানুষ ইচ্ছা করিলে জড়ে জড়ে বিকর্ষণের সৃষ্টি করিতে পারে না। যদি জড় ও শক্তির অনশ্বরত্বই প্রকৃতির নিয়ম হয়, তবে মানুষে ইচ্ছা করিলে জড় ও শক্তিকে নশ্বর করিয়া ফেলিতে পারে না। এ নিয়মের রাজত্বে মানুষের প্রভুত্ব একেবারেই নাই। নিয়ম যা আছে, আছেই। মানুষ নিয়ম জানিয়া আপনার পথ দেখিয়া লইতে পারে, কিন্তু নিজের সুবিধার জন্য নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

শক্তির অপচয়;—শক্তি সম্বন্ধে আর একটা নিয়ম আছে, জড় শক্তির আর একটী বিশেষত্ব আছে, তাহার উল্লেখ করিলেই শ্রোতৃবর্গ নিষ্কৃতি পান। যদিও জড় শক্তি অবিনশ্বর, তথাপি বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, দিনে দিনে শক্তির কার্য্যকারিতা কমিয়া যাইতেছে—শক্তির অপচয় সাধিত হইতেছে। এই অপচয় নিবারণ করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। জগতের বর্ত্তমান নিয়মে শক্তির এই স্বভাব যে, উহা সকল মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া তাপরূপে প্রকাশিত হইতে চাহে। আকর্ষণ বলে জড় পদার্থ সমূহ পরস্পরের কাছাকাছি হইতে চাহে, তাহার ফলে প্রচ্ছন্ন শক্তি অনবরত গতি-শক্তিতে পরিণত হইতে চাহে। আবার ঘাত প্রতিঘাত, ঘর্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে স্থূল-জড়ের স্থূল গতি, সূক্ষ্ম পরমাণুর সূক্ষ্ম কম্পনে পরিণত হইয়া তাপরূপে প্রকাশিত হইতে চাহে। তাপমূর্ত্তিই শক্তির দাঁড়াইবার স্থল—উহার স্থায়ী মূর্ত্তি। জগতের সমগ্র শক্তি ক্রমে তাপে পরিণত হইতেছে। তাপের আবার একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তাপ সর্ব্বদাই গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যাইতে চাহে। একটা গরম ও একটা ঠাণ্ডা জিনিষ কাছাকাছি রাখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,

গরম জিনিষটা ঠাণ্ডা হয়, আর ঠাণ্ডা জিনিষটা গরম হয় এবং শেষকালে দুইটার উষ্ণতা সমান হইয়া যায়—অর্থাৎ তাপের স্বভাবই হইতেছে গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গায় যাওয়া। বিকীরণ, পরিচালন, পরিবাহন (Radiation, Conduction, Convection,) ইত্যাদি জাগতিক ব্যাপারে তাপ সর্ব্বদাই উষ্ণ স্থল হইতে শীতল স্থলে যাইতেছে এবং পদার্থ সমূহের উষ্ণতার পার্থক্য কমাইতেছে। ইহার পরিণাম এই যে, একদিন না একদিন সমগ্র বিশ্বশক্তি তাপমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া একবার উষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে। ইহার ফল মানুষের পক্ষে বড় ভরসাপ্রদ নহে—এই দিনে জগতের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। কেন না, তাপ সম্বন্ধে আর একটী নিয়ম এই যে, তাপ হইতে কার্য্য পাইতে হইলে, উহাকে গরম জিনিস হইতে ঠাণ্ডা জিনিসে যাইতে হইবে। লর্ড কেলবিন এই নিয়মের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। যেমন জল স্বভাবতঃই উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে যায়, সেইরূপ তাপ স্বভাবতঃই উচ্চ স্থল হইতে শীতল স্থলে যায়। যেমন জল যখন নীচের দিকে যায়, কেবল তখনই আমরা উপযুক্ত যন্ত্র যোগে উহার শক্তির কিয়দংশ আমাদের কাজে লাগাইতে পারি, সেইরূপ তাপ যখন উষ্ণ স্থল হইতে শীতল স্থলে যায়, যন্ত্র যোগে কেবল তখনই আমরা উহার কিয়দংশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। তাপ হইতে কার্য্য পাইতে হইলে কোন কোন জিনিস ঠাণ্ডা, কোন কোন জিনিস গরম, এইরূপ না হইলে চলিবে না। সকল জিনিস সমান গরম হইলে তাপ হইবে, কোন কার্য্য পাওয়া যাইবে না। যেদিন বিশ্বের সমগ্র শক্তি তাপে পরিণত হইয়া একাকার উষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে, সেদিন ঠাণ্ডা গরম, এ প্রভেদ আর থাকিবে না,—সেদিন জড়শক্তির পরিমাণ পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাই থাকিবে, কিন্তু সেই একাকার প্রাপ্ত শক্তি হইতে কোন কার্য্য পাওয়া যাইবে না, সেদিন মানুষের পক্ষে ভয়ঙ্কর দিন—সেদিন প্রলয়ের দিন। জড় পরিমাণ তাহাই থাকিবে—সমগ্র শক্তি পরিমাণ তাহাই থাকিবে, কিন্তু যেটী যে ভাবে ছিল, সেটী আর সেভাবে থাকিবে না। তখন জগতের বৈচিত্র্য লোপ পাইবে—বিশ্ব-যন্ত্রের চাকাগুলি আর ঘুরিবে না। তখন জল পড়িবে না, চাকা নড়িবে না, পৃথিবী ঘুরিবে না, দিবা রাত্রির প্রভেদ থাকিবে না। তখন মানুষ কাঁদিবে না, ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইবেনা—এক অননুভবনীয় মূক ও বধির রাজ্য এক বিকট মহাশক্তির বিজয় ঘোষণা করিবে।

সে ভয়ঙ্কর দিন কবে আসিবে? সে দিনের আর ক'দিন বাকী? দু চার হাজার বা দু চার লক্ষ বৎসরে সে দিন আসিতেছে না। শীঘ্র আসিতেছে না, তাহা ঠিক, কিন্তু আসিতেছে যে তাহাও ঠিক—অন্ততঃ যদি জগতের নিয়ম একই ভাবে চলিতে থাকে। আমাদের ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যবংশীয়েরা? তাহাদের জন্য আমরা কি চিন্তা করিয়া থাকি? তাহাদের জন্য কি আমাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে? কিন্তু চিন্তা করিয়া ফল কি? চিন্তা করিয়া কি আমরা সে দিনের আগমন নিবারণ করিতে পারি? না। তবু চিন্তা করিলে ফল আছে—সেই দিনের আগমন নিবারণ করিতে পারি না বটে, কিন্তু সেই দিনকে পিছাইয়া ফেলিবার পক্ষে আমাদের সামান্য একটু ক্ষমতা আছে। সে চেষ্টা আমরা করিতেছি কি?

না। আমরা তাহার বিপরীত কার্য্যই করিতেছি। ইহার কতকটা আমাদের অজ্ঞতার ফল, কতকটা আমাদের স্বার্থপরতার ফল। আমরা চাই, রাত্রিকালে ঘরের অন্ধকার দূর করিতে—আমরা চাই, একখানা বই পড়িবার জন্য একটু আলো—আমরা কেরোচিনের বাতি জ্বালাইয়া আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাপোৎপন্ন করিয়া অযথা কতকটা শক্তি অপব্যয় করি। তাপ বাদ দিয়া আলোক উৎপন্ন করা যায় কি? অসম্ভব নয়—উদাহরণ, জোনাকী পোকা। আমরা চাই, কাঠের আগুনে ভাত রান্না করিতে; আমরা চাই তাপ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কতকটা আলো উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আমরা অজ্ঞ, আমরা এ অপচয় কিরূপে নিরারণ করিব? কিন্তু আমরা কেবল অজ্ঞ নহি, আমরা স্বার্থপর। ভবিষ্যবংশীয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া চলিতে হইলে যেটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, সেটুকু ত্যাগ স্বীকার আমাদের নাই। যন্ত্র যোগে আমরা শক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের কাজে লাগাই, কিন্তু তাহার ফলে কত না শক্তি আমরা অপব্যয় করিতেছি! কত না শক্তির অপচয় সাধন হইতেছে! আমাদের এই দেহ শক্তির রূপান্তর সাধন করিবার পক্ষে একটী প্রকৃষ্ট যন্ত্র। মানুষের হাতে গড়া যন্ত্রসমূহ এই যন্ত্রের তুলনায় কত নিকৃষ্ট। একটা গরুকে যতখানি খড় খাওয়াইয়া যতখানি কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে, ততখানি খড় জ্বালাইয়া সেই তাপে মানুষের গড়া কোন যন্ত্র চালাইলে তাহা হইতে সিকি কাজও পাইবার আশা দুরাশা।' বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির অপচয় বাড়িয়া যাইতেছে। হাতপাখা এখন আর আমাদের ক্লান্তি দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে—আমাদের ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্ চাই, যন্ত্র না হইলে চলে না। গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ী আর সুখকর বাহন নহে, আমাদের মোটরকার চাই, ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম, ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিন চাই। তেলের বাতি, মোমের বাতি বা গ্যাসের আলোতেও আর আমাদের গৃহের অন্ধকার দূর করিতে সক্ষম নহে—আমাদের ইলেক্‌ট্রিক লাইট চাই। এখন বাসন মাজিতে, কাপড় কাচিতে, বিছানা ঝাড়িতে, ঘর ঝাঁট দিতে পর্য্যন্ত আমরা যন্ত্র চাই। এই সকল যন্ত্রদ্বারা শক্তি রূপান্তরিত করিতে গিয়া আমরা কত না শক্তি অপব্যয় করিয়া ফেলি। ইহা আমাদের বাহাদুরির পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের সহৃদয়তার পরিচয় নিশ্চয়ই নয়। এই সকল যন্ত্র, এই সকল কল কারখানা, এই সভ্যতার অঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সেই প্রলয়ের দিন কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হইতে পারে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

"জব্বলপুর।"

হাবড়া হইতে রাত্রে বোম্বাই মেলে উঠিলে তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময় জব্বলপুরে পৌঁছা যায়। ভাড়া তৃতীয় শ্রেণী ৬৸৹। ষ্টেসনের নিকটেই একটী সরাই আছে, তাহার দুইটী ঘর ভদ্রলোকের বাসের যোগ্য। নিকটে একটী মুদির দোকান আছে। সেখানে

চাউল, দাইল, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। আমি দুইবার জব্বলপুরে যাই, দুই বারই সরাইয়ে বাস করি। ষ্টেসন হইতে সহর এক মাইল দূরে। সহরে থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা আছে। যাঁহারা হিন্দুয়ানী রক্ষা করিয়া চলিবার তত আবশ্যকতা মনে করেন না, তাঁহারা ডাক বাঙ্গালা, বা হোটেলে আরও সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন।

জব্বলপুরের প্রধান দৃশ্য নর্ম্মদা-প্রপাত ও মর্ম্মর-শৈল (Marble rocks)। এই অপূর্ব্ব-দর্শন মনোরম দৃশ্য দেখিবার জন্য নানা দেশ বিদেশ হইতে ভ্রমণকারিগণ আসিয়া থাকে। জব্বলপুর হইতে ১৩ মাইল দূরে ভেড়াঘাটে নর্ম্মদা পার হইয়া জলপ্রপাত দেখিতে যাইতে হয়। ষ্টেসন হইতে ভেড়াঘাট পর্য্যন্ত যাতায়াতের টোঙ্গাভাড়া সমস্ত দিনের জন্য ৩৷৪ টাকা মাত্র।

আমরা প্রাতে ৭টার সময় রওনা হই। ভেড়াঘাট যাইবার বৃক্ষছায়াময় শীতল রাস্তাটী অতি সুন্দর। তাহার উভয় পার্শ্বের দৃশ্যও চিত্তাকর্ষক। কোথাও শস্য-শ্যামল-ক্ষেত্র, কোথায়ও বসতি-শূন্য জঙ্গল ও প্রান্তর; মধ্য-পথে একটী ক্ষুদ্রপল্লী ও বাজার আছে। পল্লীর মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বের গ্রাম্য-কুটীরগুলি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কুটীরের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দেওয়ালগুলি চূণকাজ করা ও চিত্রিত। গৃহের রোয়াকে বা প্রাঙ্গণে বসিয়া পল্লীবাসিনিগণ কেহবা উদূখলে শস্যচূর্ণ করিতেছে, কেহবা ধনুদ্বারা তুলার বীজ ছাড়াইতেছে, কেহবা যাঁতায় গোধূম পেষণ করিতেছে। ছোট ছোট বালক বালিকাগণ পথে ছুটাছুটী করিতেছে। বাজারে কয়েক খানি মুদির মুদির ও মিষ্টান্নের দোকান দেখিলাম। মিষ্টান্নের মধ্যে ভুট্টার খই, কৃষ্ণবর্ণ-মুড়ি, গুড়, বাতাসা ও পুরাতন সন্দেশ দৃষ্ট হইল। অনেক পুরাতন জিনিষের আদর আছে, কিন্তু পুরাতন সন্দেশের আদর দেখা যায় না, তবে স্থান-মাহাত্ম্যে ও ক্ষুধার আধিক্যে কখনও কখনও যে পুরাতন সন্দেশ আদরণীয় না হয়, এমন কথা বলা যায় না। অন্ততঃ আমাদের নিকট আদরণীয় হইয়াছিল।

ভেড়াঘাটে একটী পাহাড়ের দুইদিক হইতে দুইটী স্রোতস্বিনী আসিয়া মিলিয়াছে। একটী অতি ক্ষীণধারা নাম "বাণগঙ্গা", অপরটী অপেক্ষাকৃত বিপুলকায়া, নাম নর্ম্মদা। সঙ্গম-মাত্রেই হিন্দুর তীর্থ; এখানেও পাণ্ডা আছে, যাত্রী হিন্দু হইলে তীর্থ-স্নানের জন্য ধরিয়া থাকে। আমাদের তীর্থকার্য্যের জন্য পাণ্ডা অপেক্ষা একজন গাইড ও মধ্যাহ্নের আহার্য্য প্রস্তুত জন্য একজন লোকের দরকার ছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা উভয়বিধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবে জানিয়া একজন পাণ্ডা স্থির করা গেল।

নদী পার হইয়া পর্ব্বতারোহণে প্রায় এক মাইল গেলে জলপ্রপাতের সম্মুখীন হওয়া যায়। নদীর কথা শুনিয়া কেহ যেন আমাদের দেশের গঙ্গা বা পদ্মা মনে না করেন। এ পার্ব্বত্য সরিৎ বর্ষাকালে নৌকা ব্যতীত পার হওয়া যায় না বটে, কিন্তু এসময়ে (পৌষ মাসে) পাদুকা উন্মোচন না করিয়াই পরপর উপল খণ্ডের উপর দিয়া পার হওয়া যায়। আমরাও এই প্রকারে ক্ষীণধারা বাণগঙ্গা পার হইয়া পর্ব্বতারোহণে প্রপাতাভিমুখে চলিলাম।

অর্দ্ধ মাইল যাইতে না যাইতে একটী মহান্ গম্ভীর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই শব্দ

গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর বোধ হইতে লাগিল। নিকটে গিয়া বিস্ময়-বিপ্লুত চিত্তে দেখিলাম, একটী বিশাল জলস্রোত পর্ব্বতের উপর হইতে ঘোর আস্ফালনে এবং ভীম গর্জ্জনে পর্ব্বতশিখর কম্পিত করিতে করিতে প্রায় শতাধিক ফুট নিম্নে পড়িতেছে। এবং অসংখ্য জল-শীকর উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে সহস্র সহস্র রামধনু সৃষ্টি করিতেছে। অশিষ্ট দুর্দ্দান্ত বালক-বালিকা রাস্তায় ছুটাছুটী করিয়া মায়ের ক্রোড়ে গিয়া যেমন শান্ত ও শিষ্ট ভাব অবলম্বন করে, তেমনি নর্ম্মদা ঘোর আস্ফালনে ও দুর্দ্দমনীয় বেগে পর্ব্বতশৃঙ্গ মথিত করিয়া সহসা মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর ক্রোড়ে গিয়া শান্ত ও সুধীর ভাব ধারণ করিয়া গভীর স্রোতস্বিনী রূপে পরিণত হইয়াছে। সেখানে তার কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই, কলরব নাই, অতি শান্ত—যেন স্রোত অনুভূত হয় না—গভীর অথচ নাতি-পরিসর হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে।

নর্ম্মদা-প্রপাত দৃষ্টে মনে হয়, ধূর্জ্জটির জটাবিহারিণী গঙ্গার ন্যায় নর্ম্মদাও যেন ধ্যান-মগ্ন শিবসঙ্কাশ রজতশুভ্র গিরি-শিখরস্থিত জটাজুট সদৃশ উপল রাশির মধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া নিম্নে ব্রহ্মার কমণ্ডলু রূপ পর্ব্বত গহ্বরে পতিত হইয়া ধরণী পবিত্র করিতেছেন। আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একখানি উপলখণ্ডের উপর বসিয়া প্রকৃতির সেই উদ্দাম অথচ নয়নাভিরাম, সেই তাণ্ডব অথচ চিত্তাকর্ষক, অপূর্ব্ব ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, দিবা নাই, রাত্রি নাই প্রকৃতি তাহার এই উদ্দাম উন্মত্ততা, উৎকট আনন্দোচ্ছ্বাস দিগন্তকম্পিত জলকল্লোলে প্রকাশ করিয়া দর্শকদিগকে বিমোহিত করিতেছে ও অনন্ত শক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা হৃদয়ে জাগরূক করাইয়া দিতেছে। উচ্চ হইতে নিম্নে বেগে জলধারা পতন-জনিত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত জলকণা সমূহ দূর হইতে ধূমের ন্যায় দৃষ্ট হয় বলিয়া লোকে এই প্রপাতকে ধূমধরা বলিয়া থাকে।

ঐ জলপ্রপাতের নিকটে পর্ব্বতের উপর দুইটী কবর আছে। উহার উপরিস্থ প্রস্তর-ফলক দৃষ্টে জানিতে পারিলাম যে, একজন ইংরেজ এই মর্ম্মর-শৈল দেখিতে আসিয়া মৌমাছি দংশনে ও অপর একজন নর্ম্মদা প্রপাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। ঐ দুইটী কবরে তাঁহাদের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে।

এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। প্রতিষ্ঠিত দেবের নাম গৌরীশঙ্কর। পাহাড়ের উপর উঠিবার সিঁড়ি আছে। প্রস্তরের প্রাচীর-বেষ্টিত একটী প্রাঙ্গন, তন্মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে গৌরীশঙ্কর অবস্থিত আছেন। একজন সন্ন্যাসীকে তথায় দেখিলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে চারিদিকে অসংখ্য ভগ্ন দেবমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। লোকে সে গুলিকে চৌষট্টী যোগিনী বলিয়া থাকে।

এইখানে মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম ছিল। এখন যেখানে ডাকবাঙ্গালা অবস্থিত, তাহার নিকটেই একটী তুলসামঞ্চ ও নিশানদণ্ড মহর্ষির পবিত্র আশ্রমস্থল নির্দ্দেশ করিতেছে। আশ্রমটীর প্রায় শত হস্ত নিম্নে নর্ম্মদা তুষার-শুভ্র মর্ম্মর পর্ব্বতের মধ্য দিয়া কলনাদে প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকে হরিৎ তরু-রাজি-সমন্বিত শ্বেত পর্ব্বতমালা শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ উঠাইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব সুন্দর রম্য-নিকেতন মহর্ষির আশ্রমের উপযুক্ত স্থান বটে।

আমরা নর্ম্মদা বিহারের জন্য বোট ভাড়া করিলাম। দর্শকদের সুবিধার জন্য দুইখানা বোট তথায় রক্ষিত আছে। দুইধারে অতি উচ্চ শ্বেতমর্ম্মর পর্ব্বত প্রাচীর, মধ্যস্থলে নর্ম্মদা। জল অত্যন্ত গভীর বলিয়া স্রোত অনুভব হয় না। স্ফটিকবৎ স্বচ্ছনির্ম্মল জল, আমরা সেই নদী বাহিয়া প্রায় এক মাইল গমন করি, তাহার উর্দ্ধে আর নৌকা চলে না। দুইদিকে অতি উচ্চ তুষারধবল পর্ব্বত-ভিত্তি, মধ্যে ধীর স্থির স্বচ্ছ দর্পণবৎ নীল বারিরাশি। সেই নীল জলে শ্বেত-পর্ব্বতের ছায়াপাত দেখিয়া মনে হয় যেন নীলাকাশে শুভ্র মেঘমালা ভাসিয়া চলিয়াছে, আহা কি সুন্দর দৃশ্য! মানব-হস্ত-নির্ম্মিত একটী "তাজ-মহল" দেখিয়াই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই, কিন্তু এখানে আসিলে প্রকৃতি-হস্তনির্ম্মিত এইরূপ শত শত "তাজমহল" অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের তুলনা জগতে কোথায়ও আছে কি না, জানি না। এই শান্ত মধুর-সৌন্দর্য্যের অনুভূতি পুষ্পের সৌরভে নাই, মলয়হিল্লোলে নাই, কবিত্বে নাই, কল্পনায় নাই।

জব্বলপুরের মর্ম্মর-শৈল দেখিতে হইলে পূর্ণিমা সম্মুখে আইসা উচিত। শৈলোপরি ডাকবাঙ্গলা আছে, তথাতে বাস করিয়া জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে নৌকাবিহারে গমন করিলে, সৌন্দর্য্যের পূর্ণমাত্রা উপভোগ করিতে পারা যায়। যাহাদের রসনাতৃপ্তিকর ইংরাজী খাদ্যে অরুচি নাই, তাঁহারা ডাকবাঙ্গলার প্রাঙ্গণে অথবা নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন।

জব্বলপুর হইতে মর্ম্মর-শৈলে যাইবার পথে পর্ব্বতের শিখরদেশে মদন-মহল। যিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগল সম্রাট আক-বরের সহিত সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, সেই গড়মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতীর রাজধানী এইখানে ছিল। মদন-মহল তাঁহার বিলাস ভবন। এই ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত মদন-মহল, শুনিয়াছি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, প্রকৃতই মদনমহল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি দুইবার জব্বলপুর গিয়াও উহা দেখি-বার অবকাশ পাই নাই।

এখানে একটী কাপড়ের কল আছে। সুপ্রসিদ্ধ ধনী রায় বাহাদুর গোকুল দাস এই মিলের সত্ত্বাধিকারী। আমরা প্রথমবারে এই মিল দেখিতে পাই। তথাতে তুলার বীজ ছাড়ান হইতে সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হই-তেছে, দেখিলাম। এই মিল দেখিবার জন্য এক আনা করিয়া টিকেট ক্রয় করিতে হয়। একজন গাইড পাওয়া যায়, সে সকল বিভা-গের কার্য্য সুচারুরূপে দেখাইয়া দেয়। জব্বলপুরের বাজারে সকল প্রকার জিনিষের দোকান আছে, দেখিলাম; স্থানীয় কাপড়ের মিল থাকা সত্ত্বেও বাজারে বিলাতী কাপড়ের অভাব দেখিলাম না। বাজারের মধ্যস্থলে একটী কৃত্রিম উৎস আছে।

এক সময় এইস্থানে ঠগীদের প্রধান আড্ডা ছিল। ইংরাজের শুভাগমনে ঠগীর উপদ্রব দূর হইয়াছে। এখানে ঠগীদের জন্য একটী জেল স্থাপিত হয়। এখন সেই জেলে একটী শিল্প-বিদ্যালয় আছে। সেই-স্থানে সুন্দর সুন্দর গালিচা ও কার্পেট প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়। জব্বলপুর অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে ৩।৪টী স্কুল ও একটী কলেজ আছে। এখানে ইংরাজের একটী সুবৃহৎ সেনা-নিবাস আছে। জব্বলপুর

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সন্ধিস্থল। উত্তর পশ্চিম, মধ্যভারত ও মহারাষ্ট্রীয় সকল দেশের লোকই এখানে বাস করে। কার্য্যব্যপদেশে অনেক বাঙ্গালীও সেখানে বাস করিতেছেন।

শ্রীকুঞ্জলাল সাহা।

বেদান্ত-ভাষ্যের ব্যাখ্যা। (২)

বিদ্যা ও অবিদ্যা কাহাকে বলে?

আমরা বেদান্তসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতে যে কারণে এবং যে প্রণালীতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা বিগত সংখ্যায় পাঠকবর্গকে নিবেদন করা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটী বিষয়ের একটা সমালোচনা করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য রচনা করিবার পূর্ব্বে, একটী ভূমিকা লিপিয়াছেন। সেই ভূমিকায় তিনি "অধ্যাস" বা "অবিদ্যার" স্বরূপ সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর ও সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবিদ্যার নিবৃত্তিই, ব্রহ্মবিদ্যালোচনার প্রকৃত লক্ষ্য। সুতরাং অবিদ্যার প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। তাই, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই ভূমিকায় অবিদ্যা ও বিদ্যার স্বরূপ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। আমরাও বর্ত্তমান সংখ্যায় সেই আলোচনাটী পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

বিষয়ী ও বিষয়—চেতন ও জড়—উভয় অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু। আলোক এবং অন্ধকার যেমন ভিন্ন বস্তু, ইহাদের মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক্য। চেতন ও জড়ে, বিষয়ী ও বিষয়ে—পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। চেতনের যে সকল ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সহিত, জড়ের যে সকল ধর্ম্ম আছে, তাহাদেরও পরস্পর সম্বন্ধ বা সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। চেতন—জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। জড়—অচেতন ও দুঃখাত্মক। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইবে কিরূপে? চেতন—সকলের সাক্ষী, সকলের দ্রষ্টা। আর জড়—সেই দ্রষ্টার দৃশ্য, সেই বিষয়ীর বিষয়। চেতন—জড়বর্গের প্রকাশক; জড়—সেই চেতনের প্রকাশ্য বস্তু। সুতরাং উভয়ই উভয় হইতে স্বতন্ত্র; উহাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব।

কিন্তু তথাপি অনাদিকাল হইতে জীব, জড়ে ও চেতনে একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছে। ইহা জীবের বিষম ভ্রম। কিন্তু অনাদি কাল হইতে জীব এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই ভ্রমের দুই প্রকার অবস্থা। জীব—উভয়ের মধ্যে দুই প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইয়াছে। একপ্রকার ভ্রমের বশে জীব মনে করে—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি পীড়িত, আমি দুর্ম্মগ্ন। আর এক প্রকার ভ্রমের বশে জীব মনে করে—এ গৃহ আমার, এ পুত্র-কলত্র আমার। একটী—চেতনে জড়ের আরোপ। অপরটী—জড়ে চেতনের আরোপ। একটীর নাম তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ; অপরটীর নাম সংসর্গ-সম্বন্ধ। উভয়ের মূলেই অভেদ-বুদ্ধি স্থাপিত আছে। চেতন ও জড়—প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু ভ্রমবশতঃ, দুইটীকে লোকে অভিন্ন বলিয়াই মনে করে। তজ্জন্যই ঐরূপ ভ্রমাত্মক বুদ্ধি উপস্থিত হয়।

আত্মা যে জড়বর্গ হইতে নিতান্ত স্বতন্ত্র বস্তু, তাহা ভুলিয়া গিয়া, উভয়কে এক ও অভিন্ন মনে করিয়া লইয়া, লোকে পদার্থ বর্গকে গ্রহণ করে। ভ্রমের প্রকৃত বীজ ইহাই। জড়ের সঙ্গে আত্মাকে একেবারে মিশাইয়া দিয়া, আমরা জড়কেই আত্মা বলিয়া ধরিয়া লই; আত্মার স্বাতন্ত্র্যের কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। ইহাই ভ্রম, ইহাই অবিদ্যা, ইহাই অধ্যাস নামে পরিচিত।

এই ভ্রমের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিলে, এই ভ্রমের বিশ্লেষণ করিলে, আমরা ইহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিব। একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক্। মনে কর, অল্পান্ধকারে পথিমধ্যে পতিত একটা রজ্জুতে আমার সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। এস্থলে কি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

আমি রজ্জুটাকেই সর্প বলিয়া ধরিয়া লইয়া, ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছি। রজ্জুর সত্তা, রজ্জুর দৈর্ঘ্য, রজ্জুর আকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই একটা আগন্তুক সর্পের প্রতীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু এস্থলে প্রকৃতপক্ষে রজ্জুটাই সর্প হইয়া উঠে নাই। আমি রজ্জুর সত্তা ভুলিয়া গিয়া, উহাকে সর্পসত্তা বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। রজ্জুর সত্তাতেই, ঐ সর্পের সত্তার প্রতীতি জন্মিয়াছে। রজ্জুর সত্তাকে বাদ দিলে, সর্পের সত্তা থাকে না। রজ্জুর সত্তার উপরেই একটা আগন্তুক আকারের (সর্পের) প্রতীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু এস্থলে, রজ্জুর সত্তাই প্রকৃত বস্তু। ঐ সত্তাকে আশ্রয় করিয়া যে অপর একটা বস্তুর (সর্পের আকারের) বোধ জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা। রজ্জুর সত্তা বা দৈর্ঘ্যকেই আমি একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে (সর্পরূপে) ধরিয়া লইয়াছিলাম। রজ্জুর সত্তার স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সর্প বলিয়া ধরিয়া লইবার সময়ে, যদি উহাকে রজ্জু বলিয়া মনে করিতে পারিতাম; যদি রজ্জুর সত্তার কথা মনে থাকিত;—তাহা হইলে এই ভ্রম হইত না; উহাকে সর্প বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম না। কিন্তু যখন উহাকে সর্প বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, তখন রজ্জুর যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সেই সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই যে সর্পবুদ্ধি জন্মিয়াছে, সেটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। রজ্জুর সত্তাটার কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিলে, উহাতে একটা স্বতন্ত্র পদার্থান্তরের (সর্পের) বোধ কখনই জন্মিতে পারিত না।

এইরূপ, চেতনের স্বতন্ত্রতার কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিলে, উহাতে জড়ের সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব হইত। আমি সুখী, আমি বধির, আমার পুত্র, আমার দুঃখ—এ প্রকার প্রতীতিও অসম্ভব হইত। কিন্তু আমরা সেই স্বতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। চেতন যে জড় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা ভুলিয়া যাইয়া, আমরা চেতনকে জড়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছি এবং জড়ের ধর্ম্মকে চেতনের সঙ্গে মাখামাখি করিয়া অনুভব করিতেছি। ইহাই ভ্রম, ইহাই অবিদ্যা। ইহারই নাম চেতনে জড়ের অধ্যাস বা আরোপ। ইহারই নাম জড়ে চেতনের অধ্যাস বা আরোপ।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ধারণা করার নামই "অধ্যাস।" এই প্রকার ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বাহ্যবস্তুর ধর্ম্মকে আত্মাতে আরোপিত করিয়া পুত্রভার্য্যাদি ক্লেশ পাইলে, নিজকেই ক্লিষ্ট বলিয়া মনে করি। স্থূলতা, কৃশতা, বধিরতা প্রভৃতি শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আত্মাতে

আরোপিত করিয়া, নিজেকেই স্থূল, কৃশ ও বধির বলিয়া অনুভব করি। কামনা, সংকল্প, ভয়, লজ্জাদি—মনের ধর্ম্ম; এই সকল মনের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত করিয়া বিশ্বকে লজ্জিত, কামনাযুক্ত বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি। আবার এই সর্ব্বদ্রষ্টা আত্মাকেও ঐ সকল জড়ীয় পদার্থে আরোপিত করিয়া আমার দেহ, আমার ভয়, আমার লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করি।

পশু, পক্ষী মানুষ—সকলেই এই ভ্রম-জ্ঞানের সমান বশীভূত। পশু পক্ষ্যাদি অপেক্ষা মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি অনেক বেশী, একথা সত্য। কিন্তু যে ভ্রমের কথা বলিয়া আসিলাম, ইহার হস্ত হইতে মানুষেরও উদ্ধার নাই। এই ভ্রম, সকলের উপরেই সমান প্রতাপ স্থাপন করিয়াছে। পশু, পক্ষী, মানুষ, দেবতা—সকলেই এই ভ্রম-রাজের প্রজা। সকলের উপরেই ইহার দোর্দ্দণ্ড শাসন। এই সংসারই—সেই ভ্রমজ্ঞানের উপরে স্থাপিত। সংসারের সকল ব্যবহার, সকল পদার্থ—এই ভ্রম-জ্ঞানের আয়ত্তাধীন। ইহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, অসামান্য অধিকার। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই, ঐন্দ্রিয়িক সকল প্রকার ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। হরিত তৃণমুষ্টি লইয়া অগ্রসর হইলে যেমন গাভী, তাহার লোভে আকৃষ্ট হইয়া হস্ত লেহন করিতে উদ্যত হয়, আবার দণ্ড উদ্যত করিয়া ধাবিত হইলে যেমন পশুটী ভীতিবিহ্বলচিত্তে পলায়নপর হয়, মনুষ্যও অবিকল এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। তোমার যাহা ইন্দ্রিয়ের প্রতিকূল, কষ্টকর, তুমি তাহা করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাক। আবার, প্রাণমন-তৃপ্তিকর বস্তু ইন্দ্রিয়পথে উপস্থিত হইলে, তুমি তাহাতে আকৃষ্ট হও। সুতরাং পশুতে ও মনুষ্যে পার্থক্য কোথায়? উভয়ের আচরণও ব্যবহার ঠিক্ একরূপ।

তবে কি এই ভ্রমজ্ঞানের হস্ত হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই? আছে, উপায় আছে। আগামীবার হইতে সেই উপায়ই পরিচিন্তিত হইবে। ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

একটী জিজ্ঞাসা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "আত্মতত্ত্ব" বিষয়ে যে একটী প্রবন্ধ চৈত্র মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মনে যারপর নাই একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। ভাবটীকে অনির্ব্বচনীয় বলিতেছি এইজন্য যে, ইহাকে হর্ষ কি বিষাদ, সংশয় কি সংশয়োচ্ছেদ বলিব, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মনটা এতই আন্দোলিত হইয়াছে যে, ঐ সম্বন্ধে আরো একটুকু আলোক না পাইলে উহা শান্তভাব ধারণ করিতে পারিতেছে না। আমার কয়েকজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মবন্ধুকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইয়া তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু আলো পাইলাম না।

নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় একজন স্বার্থত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ, প্রবীণ ও দার্শনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচা-

রক নিজ জীবনের পরীক্ষিত সত্য বলিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে কোনরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করা একদিকে যেমন ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তেমনই অন্য-দিকে, একটা অশ্রুতপূর্ব্ব মত না বুঝিয়া গ্রহণ বা উপেক্ষা করাও কাহারও পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। তাই, ঐ প্রবন্ধ বিষয়ে আমার মনে যে কয়টী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম। তিনিই যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রশ্নগুলির সদুত্তর দান করেন, তাহা হইলেত কথাই নাই। আর তাহা যদি না ঘটে, প্রকাশ্য পত্রিকাতেই যখন প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছে, তখন উহার সমালোচনা প্রকাশ্য পত্রিকাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অপিচ, বিষয়টী এতই গুরুতর এবং ব্রাহ্মসমাজের আত্মাসম্বন্ধীয় গৃহীত মত হইতে এতই ভিন্ন ভাবাপন্ন যে, উহাকে তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষেই উচিত বলিয়া আমি মনে করি।

উক্ত প্রবন্ধের সূচনায় নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন "আমি কথা বলিবার মিডিয়ম্ (Medium) হইয়াছি। ইহা ভিন্ন আমি পরলোকবাসীদিগকে দেখিতে পাই। কিন্তু দেখা অপেক্ষাও তাঁহাদের কথা শুনিবার শক্তি আমার অধিক। আত্মারা আমার নিকট আসিয়া কোন কথা বলিলে আমি তাহা শুনিতে পাই। এমন কি, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে কথা কহিলেও আমি তাহা শুনিতে পাই। আত্মারা সঙ্গীত করিলে সঙ্গীতের সুর ও কথাগুলি বেশ শুনিতে পাই"।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে, এই দেখা ও শোনাকে আমরা কোন্ অর্থে গ্রহণ করিব? ইহা কি চর্ম্মচক্ষের ও চর্ম্মকর্ণের দেখা শোনা? উদ্ধৃত কথাগুলি পড়িয়া ত তাহাই মনে হয়। তবে কি পরলোকবাসী আত্মা একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু? দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যদি আত্মাকে দেখা যায়, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যদি তাহার বাক্য, এমন কি, তাহার গান পর্য্যন্ত শুনা যায়, তাহা হইলে মানুষের ন্যায় বাগিন্দ্রিয়-বিশিষ্ট তাহার একটা আকৃতি থাকা আবশ্যক নয় কি? নগেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে কি বলেন, জানিবার জন্য ঔৎসুক্য রহিল।

এক সময়ে তিনি তাঁহার স্বরচিত 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে নিজেই যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রমাণীকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন যে, "পরকাল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে।" এইক্ষণ কি সেই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? আত্মার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহের (astral bodyর) কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু উহা সাপ না ব্যাঙ্গ, জানি না। স্পিরিচুয়েলিজম্‌-বাদী-গণের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, উহা ইথর্-নির্ম্মিত। তাহা হইলেও তো উহাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু বলা যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক-গণ ইথর্ বলিয়া একটা জিনিষের বিদ্যমানতা মানিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহারাই তো আবার বলেন, উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। আমি যতদূর জানি, ব্রাহ্মসমাজ পরলোকবাসী আত্মার লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহের পক্ষপাতী নন। আত্মা অজড়, অমর, নিরাকার, অখণ্ড এবং আংশিকভাবে হইলেও, পরমাত্মারই গুণ বিশিষ্ট, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা গ্রন্থে নগেন্দ্র বাবুও এই বিশ্বা-সের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণ কি আমাদিগকে মানিতে হইবে, আত্মা নিরাকার নহে—আকার-বিশিষ্ট, সুতরাং ভঙ্গুর? এই সম্বন্ধে তাঁহার আগেকার মত উদ্ধৃত

করিতেছি :—"যাহা পরমাণু সমষ্টি, তাহাই ভঙ্গুর হওয়ার সম্ভব। যাহা পরমাণু সমষ্টি নহে, তাহা কেমন করিয়া ভঙ্গ হইবে? ভঙ্গ হওয়া সম্ভব নহে! ভঙ্গ হওয়ার অর্থ কি? পরমাণু বিচ্ছিন্ন হওয়া। সুতরাং অজড় অখণ্ড আত্মার পক্ষে ভঙ্গ হওয়া অসম্ভব ইত্যাদি।"

আত্মা যদি পরমাণু সমষ্টি না হইল, তবে কেমন করিয়া উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে? অথচ এক্ষণ তিনি বলিতেছেন, কেবল মাত্র যে আত্মাগণকে তিনি দেখিতে পান এবং তাহাদের কথা ও গান শুনিতে পান, এমন নহে। আত্মাগণ তাহার দ্বারা দীর্ঘ ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধও লেখাইতেছে, এবং তিনি তাহা শ্রুতলিপি লেখার মত লিখিয়া যাইতেছেন। এইরূপ মিডিয়মের কথা ইতিপূর্ব্বে কখনও কেহ শুনিয়াছে কি? Psychical Research Societyর দ্বারা পরীক্ষিত এবং প্রশংসিত Mrs. Piper আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার সময়ে অচেতন হইয়া পড়েন (falls into a trance) এবং সেই অবস্থায় তাহার মুখ দিয়া আত্মাগণ কথা বলেন। মিডিয়মকে mesmerise বা hypnotise করিয়া তাহার ভিতরে আত্মা আনিবার কাহিনীও শুনিয়াছি এবং পাঠ করিয়াছি। তদ্রূপ মিডিয়মের প্রতারণা যে সময়ে সময়ে ধরা পরিয়াছে, নগেন্দ্র বাবু অবশ্যই তাহা অবগত আছেন। Madam Blavatskyর কুত্হুমি বিষয়ক প্রতারণা Psychical Research Societyর অন্যতম অগ্রণী Dr. R. Hodgson ধরিয়াছিলেন। Eusapia Pallœdino নাম্নিকা মিডিয়মের চাতুরীজালও ইনিই ছিন্ন করিয়াছিলেন। সকল মিডিয়মই প্রতারক কিম্বা আত্মপ্রতারিত, ইহা বলা কখনই আমার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমি কেবল মাত্র ইহাই বলিতে চাই যে, Psychical Research Society ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও যেরূপ মিডিয়মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, নগেন্দ্র বাবু বলেন, তাহাই তিনি বিনা চেষ্টায় হইয়াছেন। ইহা কি বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? সজ্ঞানে ও সচৈতন্যে আত্মাগণের সহিত কথোপকথন করা, তাহাদিগকে দর্শন করা, এবং তাহাদের বক্তব্য বিষয় শ্রুতিলিপি লেখার মত লিখিতে পারা, ইতিপূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তাই সানুনয়ে নগেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি কথাগুলি আরো একটুকু খুলিয়া বলুন। যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনি এতদিন কত লেখা লিখিয়াছেন—কত তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, সেই প্রণালী কি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অবলম্বিত হইতে পারে না?

আমি "মানসিক প্রত্যক্ষ" ও "আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ" দ্বারা বিষয়টী বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

স্বনামখ্যাত মিঃ ষ্টেড্ (Mr. Stead) তাঁহার 'After Death' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, পরলোকবাসী জুলিয়ার যে সকল পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে, যদিও তাহার সকলগুলিই তাঁহার (Mr. Steadর) হস্ত দ্বারাই লিখিত, কিন্তু জুলিয়ার আত্মা তিনি স্বচক্ষে কখনও দেখিতে পান নাই, কিম্বা তাঁহার বাক্য স্বকর্ণে শুনিতে পান নাই। কেবল মাত্র তাঁহার হস্তখানি জুলিয়ার আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া পত্রগুলির লেখা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। এই প্রকারের শক্তি লাভ যে নগেন্দ্র বাবুর কথিত শক্তিলাভ হইতে সম্পূর্ণরূপ স্বতন্ত্র, ইহা বলাই

বাহুল্য। তবে জুলিয়া এক চিঠিতে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিল বটে যে, চর্ম্মচক্ষুকেও বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা এইরূপ শিক্ষিত করা যায় যে, তদ্দ্বারা পরলোকবাসী আত্মাকে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতিবাদে Swedenborgয়ের শিষ্য Mr. Lockবলেন, "No change in optical focus could make a pure spirit visible." তদুত্তরে জুলিয়াকে স্বীকার করিতে হয়, "There is no focus in the strict sense which would reveal the invisibles to the eye of the mind."

মনশ্চক্ষুকেই যদি হার মানিতে হয়, তবে চর্ম্মচক্ষু কোথায় লাগে? জুলিয়া অন্যরূপ কথা বলিলেও তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না, কেননা, জুলিয়া এক্ষণ পরলোকবাসী, ইহলোকবাসী আত্মার শক্তি সামর্থ্য বিষয়ে তাহার মতামতের বিশেষ কিছু মূল্য থাকিতে পারে না।

নগেন্দ্রবাবু আরো বলেন "আমার স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণী উপাসনা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্বর্গগত ভবানীপুরের হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজী ভাষায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার বিষয় Religious Basis of National Reformation. স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহা ভিন্ন স্বর্গগত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আত্ম-জ্ঞান বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধটী নব্যভারতের পাঠকবর্গের পাঠের জন্য নিয়ে প্রকাশিত হইল।"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কেবল মাত্র সুদীর্ঘ প্রবন্ধ নয়, আত্মাগণের কেহ কেহ নগেন্দ্রবাবুর দ্বারা গ্রন্থও লেখাইতেছেন। একটা গ্রন্থ লেখা বহুদিন সাপেক্ষ হইলে কি হয়? আত্মাগণ তাহাতেও পশ্চাৎপদ নন। বঙ্কিম বাবুর কথিত প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, উহার সহিত নগেন্দ্রবাবুর আগেকার লেখার যত সাদৃশ্য রহিয়াছে, বঙ্কিমবাবুর তত নহে। নগেন্দ্র বাবুর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্বের লেখা এই প্রবন্ধটীর সহিত মিলাইয়া দেখিলেই আমার প্রাগুক্ত কথার সত্যতা অনুভূত হইবে। আমি এইস্থলে কেবলমাত্র একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। এই প্রবন্ধে শক্তি কি, তাহার ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে, "অন্তর্জ্জগতে যে শক্তি, উহা জ্ঞানময়ী। বহির্জ্জগতের যে শক্তি, উহা কি অন্ধশক্তি? অন্ধশক্তি অর্থ শূন্য বাক্য।" আবার "শক্তির স্বরূপ কি? যেখানে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেখানে শক্তি জ্ঞানময়ী—ইচ্ছা শক্তি। সুতরাংই বলিতেই হইবে বহির্জ্জগতে যে শক্তিতে বিশ্বাস করিতেছি, তাহাও জ্ঞানময়ী, ইচ্ছাশক্তি। অন্তর্জ্জগতে যে শক্তি, তাহা আমার ইচ্ছা শক্তি। বহির্জ্জগতে যে শক্তি তাহা কাহার ইচ্ছশক্তি? যিনি বহির্জ্জগতের কর্ত্তা, তাঁহারই ইচ্ছা শক্তি।"

উদ্ধৃত উক্তিগুলির সহিত নগেন্দ্রবাবুর ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার "অন্ধশক্তি অর্থশূন্য বাক্য" শীর্ষক প্রবন্ধটী মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এই উভয় লেখার মধ্যে কেবলমাত্র ভাবের একত্ব নয়, ভাষারও একত্ব জাজ্বল্যমান। অথচ নগেন্দ্র বাবু বলিতেছেন "প্রবন্ধের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। পাঠকবর্গ সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। তবে ইহাই বলা বিশেষ আবশ্যক যে, এই প্রবন্ধের সঙ্গে আমার এইমাত্র সম্বন্ধ যে

বঙ্কিম বাবুর আত্মা উহা আমাকে বলিয়াছেন, আমি শুনিয়া লিখিয়াছি। শ্রুতলিপি (Dictation) লেখার মত আমি উহা লিখিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি। ঐ প্রবন্ধের একটী বর্ণও আমার নহে।”

বাস্তবিক এই কথাগুলি পাঠ করিয়া বিস্ময় রাখিবার স্থান পাইতেছি না। মাথার উপরে কিম্বা পায়ের উপরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, তাহা যেন ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। নগেন্দ্রবাবু কি অনুগ্রহ করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিবেন না? যদি এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয় যে নগেন্দ্রবাবু সত্যই চর্ম্মচক্ষে আত্মাগণকে দর্শন করিতেছেন না, কেবল মাত্র একটা রূপক কল্পনাচ্ছলে তাহাদিগকে আসরে নামাইয়া তাহাদের মুখে নিজ বক্তব্য কথাই বলিয়াছেন, তাহা হইলে অবশ্য বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে একপ্রকারের আলোক পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি তাহা বলিতেছেন কৈ? ইহা ছাড়াও যাঁহারা তাঁহাকে ভালরূপ জানেন,তাঁহারা বলেন যে, তিনি কেবলমাত্র আজকাল নয়, বহুদিবসাবধিই স্পিরিচুয়েলিজ্‌ম্‌ লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন, এবং তাহাতে বিশ্বাসী। এরূপাবস্থায় তাঁহার পক্ষে একটা রূপক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে।

যে দিক দিয়াই বিষয়টী দেখা যাকনা কেন, উহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাইতেছি না। এই প্রবন্ধটী লিখিবার ইহাই আমার কারণ—ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়।

একালের সমাজ।

অতীতকে কেহ ফিরাইতে পারে না; চিরদিনই অতীতের ভিত্তিতে নূতন গড়িয়া উঠে। জীর্ণ পুরাতন মরিয়া যায় এবং মানুষের উন্নতির জন্য নববিধান প্রাচীনের স্থান অধিকার করে। প্রতি পলে প্রাচীন খসিয়া পড়িতেছে, এবং নূতন শক্তিতে নবতা জাগিয়া উঠিতেছে; এই কালের নিয়ম জানিয়াও প্রাচীন যখন চলিয়া যায়,তখন আমরা তাহার জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। যে লুপ্ত প্রাচীনতার মধ্য দিয়া আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি, অথবা অতীতকালে সমাজ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, অনেকের মনে সেই প্রাচীনতার প্রতি মমতা অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল লোকের মন বুঝাইয়া যখন জীবনপ্রদ নবীনকে আহ্বান করিতে বলা যায়, তখন কলে কৌশলে কথা কহিতে হয়। কবি কালিদাস যখন নাট্য শাস্ত্রের প্রাচীন জটিল নিয়ম উপেক্ষা করিয়া নাটক রচনায় নববিধান প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রথম রচিত নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন:—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বম
ন চাপি কাব্যম নবমিত্যবদ্যম্।

এটা হইল কৌশল পূর্ব্বক কথা বলা। অনেক সময়ে কৌশল করিয়া পুরাতনের নামে নূতন চালাইতে হয়। এই ফাঁকি বা কৌশল, অনেক শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে। কেহ কেহ বা লোকের এই প্রাচীনের প্রতি মমতাকে উপেক্ষা করিয়া ফাঁকির ব্যাখ্যাকে ভণ্ডামি বলিয়া উড়াইয়া

দিয়া যাহা জীবনপ্রদ, যাহা কল্যাণকর, তাহার অনুষ্ঠানের জন্য সহজ ভাষায় লোকদিগকে আহ্বান করেন।

সুপ্রসিদ্ধ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইউরোপ হইতে ঘরে ফিরিবার পর ১৮৮৫ খ্রীঃ "একঘরে" নাম দিয়া যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অতি সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় আপনার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আজ আবার ২৫বৎসর পরে কবি তাঁহার "একঘরে" প্রবন্ধটীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন। বহুদিন পরে এই প্রবন্ধটী ফিরিয়া পড়িয়া বুঝিলাম যে,কবি প্রথম যৌবনে যাহা লিখিয়াছিলেন, এই প্রৌঢ় বয়সের পরিপক্কতায় এবং অভিজ্ঞতায় তাহার একটী কথাও পরিবর্ত্তিত হইবার মত নাই। প্রবন্ধটী একখানি ২০ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় প্রকাশিত, কিন্তু উহার প্রত্যেক ছত্র সরস, সজীব এবং সুপাঠ্য। তিনি যে তেজস্বিতার সহিত ভণ্ডামির পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছেন এবং যে সরস ব্যঙ্গে বিতণ্ডাবাদীদিগকে উপহাস করিয়াছেন, তাহাতে সমাজের মঙ্গলসাধন হইবে, বিশ্বাস করি।

আনন্দের বিষয় যে, এই সময় আমাদের সামাজিক বিষয়ের বিচারে "ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা" নামে আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানির লেখক গৌহাটী গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ এম-এ। পণ্ডিত বেদান্ততীর্থ শাস্ত্র হইতে অনুকূল বচন সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নূতন যুগের আদর্শটী সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আপনার স্বাধীন মত অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং পণ্ডিত বনমালী বেদান্ততীর্থের গ্রন্থ দুইখানি বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে পঠিত হইবে বলিয়া আশা করি। প্রথম খানির মূল্য ।• আনা এবং দ্বিতীয় খানির মূল্য ॥• আট আনা মাত্র।

যে হাস্যরসাত্মক রচনায় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গদেশে এখন অদ্বিতীয়, সে রচনা তাঁহার যৌবনের প্রথম ভাগেও কেমন সরস ছিল, তাহা এই "একঘরে" গ্রন্থে হরিদাস রায়ের নামের ব্যঙ্গ কবিতাটীতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ কবিতাটীর একস্থানে আছে—

বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়
দলে মিশে ভণ্ড ঋষি হতে যদি চায়,
পেটের মধ্যে থেকে থেকে
মুরগীগুলো উঠে ডেকে ;
গরুগুলো হাম্বা করে—একি হল দায়।

এখন দেশের দশা এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাঁহারা সুপণ্ডিত এবং বহুদর্শী, যাঁহারা সমাজ-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ, কি করিলে সমাজ উন্নততর এবং পবিত্রতর হয়, একথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা হইলেন ইংরাজীনবীশ। আর যে শ্রেণীর লোক প্রাচীনকালে নেতা হইবার উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু একালে বহুদর্শন এবং নবশিক্ষার অভাবে সুবিজ্ঞ বলিয়া আদৃত নহেন, তাঁহারা নবশিক্ষিতদিগের নেতা হইতে প্রয়াস পান। কেহই অঘটন ঘটাইতে পারে না ; কাজেই যাঁহারা নেতা হইবার উপযুক্ত নহেন, কেহই তাঁহাদিগকে আর গ্রাহ্য করিতে পারে না। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তেজস্বী ভাষায় লিখিয়াছেন—

"একঘরে হওয়াতে কিছু লজ্জার বিষয় নাই। আমাদের দেশে প্রথমে যিনি মেডিকেল কলেজে পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি

একঘরে হইয়াছিলেন। যিনি প্রথমে পৌত্তলিকতার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি একঘরে হইয়াছিলেন। যিনি হিন্দু-বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন, তিনি একঘরে হইয়াছিলেন।”

আবার অন্যত্র দেশের জীর্ণতার রক্ষকদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন—“একঘরে করা বা জাতে তোলা, এ কথাটাই আপনাদের আস্পর্দ্ধা। হিন্দুসমাজে যদি বিলাত ফেরতদিগের সহিত মিশিতে চাহে ত ইহাকে অগ্রসর হইতে হইবে; তাহারা পিছাইবে না। হিন্দুসমাজকে দরওয়াজা প্রশস্ততর ও উচ্চতর করিতে হইবে, তাহার মৌরসী নীতি ও প্রথা ছাড়িতে হইবে। সেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সে একঘরেতে কেহ ভীত হইবে না, কারণ তাহার অর্থ জাতির মান্য, দেশের ভক্তি। সে একঘরের অর্থ বিদ্যা, প্রতিভা, সত্য, ন্যায়, ও ধর্ম্ম।”

শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ ইউরোপ ভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—“আমাদের সমাজের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যে সকল পুরুষশ্রেষ্ঠ কঠোর সামাজিক শাসনে ভীত না হইয়া শত ক্লেশ সহ্য করিয়া বিদেশে গিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সমাজে স্থান দিই না। যে সমাজে দার্শনিক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, বৈজ্ঞানিক ঋষি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এবং সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ স্থান পান নাই, সে সমাজ কত দিন টিকিবে? ইহারা সমাজের মস্তক স্থানীয়। ইঁহাদিগকে ছাটিয়া ফেলিলে সমাজ মস্তকহীন হইয়া শীঘ্রই উৎসন্ন যাইবে। যে সকল মহা পুরুষকে সমুদ্রযাত্রার দোষে আমরা একঘরে করিয়াছি—তাঁহারা সমাজের মুখপাত্র, কাজেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ। কেন না বেদে আছে যে ‘ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ।’ ইহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া ব্রাহ্মণবধের পাপে সমাজ ডুবিয়া গেল।

একালে যথার্থতঃ যাঁহারা সমাজের নেতা, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। এখন রাজদ্বারে, ব্যবহারালয়ে এবং বৈষয়িক বিপদে যাঁহাদিগের ব্যবস্থা না লইলে চলে না, তাঁহারা এ যুগের নবশিক্ষায় সুশিক্ষিত দল। যাঁহারা ভণ্ডামির পরিবর্ত্তে যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতার দিকে স্বদেশীয়দিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহারাও নবযুগের সুধীদল। আমাদের স্বদেশের সাহিত্যকে যাঁহারা উন্নত করিয়া নবভূষণে বিভূষিত করিতেছেন, তাঁহারাও এ কালের পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত কৃতীদল।

এ কালের সর্ব্ববিধ বিষয়ের চালক ইংরাজীশিক্ষিতেরা; এ কথায় অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু কথাটা কি সত্য নয়? ইংরাজী আমলের বিশেষ ব্যবস্থায় ইংরাজীশিক্ষা ভিন্ন গতি নাই। নহিলে অন্ন সংস্থান হয় না, মান সম্ভ্রম বজায় থাকে না। সম্পদ ও সম্ভ্রমের জন্য কে না লালায়িত? কাজেই যাহাদের কিছুমাত্র সুবিধা আছে, তাহারা সকলেই ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। যাহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে, বিদ্যায় অনুরাগ আছে, তাহারা যখন প্রধানতঃ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল, তখন সংস্কৃত টোলের জন্য যাঁহারা বাকী রহিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে সরস্বতীর বরপুত্র হইবার ক্ষমতা কজনের রহিল? যাঁহারা বুদ্ধিবলে শ্রেষ্ঠ, সম্পদে পটু এবং পদমর্য্যাদায় জ্যেষ্ঠ, তাঁহারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে বিশেষ পটু না হই-

লেও সমাজের নেতা এবং সাহিত্যের চালক হইলেন। স্বাভাবিকতাকে কেহ উল্টাইয়া দিতে পারে না। সমাজে যাঁহাদের পদমর্য্যাদা অধিক ছিল, তাঁহারা আদর করিতেন বলিয়াই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রাচীনকালে আদৃত হইতেন। রঘুর সভায় কৌৎস হইতে আরম্ভ করিয়া অতি লঘু সভায় কুৎসিত পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই একই ব্যবস্থা। যে অবস্থায় আজিকালি পদমর্য্যাদা বাড়ে, তাহা নব্য শিক্ষিতদের অধিক; এবং তাহা ইউরোপ-প্রত্যাগতদিগের আরো অধিক। তাহা ছাড়াও একালে যাঁহারা ইংরাজীশিক্ষার ফলে পদমর্য্যাদা লাভ করেন, টোলের হিসাবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনাচার-দুষ্ট। এই উচ্চপদস্থেরা একালের স্মৃতির ব্যবস্থাদাতাদিগকে বিদ্যাবুদ্ধি বা বহুদর্শিতায় বড় মনে করেন না বলিয়া আদর পাইবার যথার্থ স্থান হইতে পণ্ডিতদের আদর চলিয়া গিয়াছে। মুখে যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ সকলেই ইংরাজীওয়ালাদিগকেই নেতা বলিয়া মানিয়া চলেন। কি রাষ্ট্র-সমস্যায়, কি বিচারালয়ে কোথাও একালের সুধীগণের ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া কাহারো পক্ষে আর নবদ্বীপ, ভাটপাড়ায় যাওয়া চলে না। যে কারণেই যাহা হউক, ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাই দেখাইতেছি। একালের শিক্ষায় যাঁহারা কৃতী হইয়াছেন, সমাজের অন্যবিধ অবস্থা থাকিলেও এই শ্রেণীর বুদ্ধিমানেরাই আত্মগুণে যশস্বী হইতেন। ক্ষমতা ও বিদ্যা অর্জ্জনের সুবিধা লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, কোন কালের সমাজেই তাঁহাদের নেতৃত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না।

আমরা প্রতিপদে প্রত্যেক ব্যবহারে এ কালের শিক্ষিতদিগকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিতেছি, অথচ দু একদিন প্রকাশ্যতঃ এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিবার সময় দুচারিজন প্রাচীনতার মৌখিক রক্ষকের নাম করিয়া থাকি। একটা গল্প আছে যে, একজন এক বৈদ্যের হজমি গুলির প্রশংসার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিল যে, হজমি গুলিটি পূর্ণমাত্রায় খাইয়াছিল বলিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ হজম হইয়া গিয়াছিল, কেবল বাকী ছিল তাহার টীকটি। প্রাচীনকালের নেতা শ্রেণীর সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, সকল বিভাগ হইতেই তাঁহাদের নেতৃত্ব যখন উঠিয়া গিয়াছে, তখন কেবল বাকী আছে দু একদিনের ফলার ভোগের সময়ে নেতৃত্বের টিকিটি। এ অবস্থায় ঐ টিকিটি আর অধিক দিন টিকিবে না।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কালধর্ম্মে যাহা হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি। কেবলমাত্র সংস্কৃত জ্ঞানের ফলে যে পণ্ডিত-বর্গের মধ্যে কোন নূতনত্বের বিকাশ নাই, এবং টোলের পণ্ডিতের সমালোচনায় যে তীক্ষ্ণতা, গভীরতা বা সর্ব্বদেশদর্শিতা নাই, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। একালের জ্ঞানের সহিত ইহাঁদের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, অথচ ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখায় নিতান্ত না বুঝিয়াই বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া খেলা করিতে চাহেন। কাজেই একালের শিক্ষিতদের নিকটে উহারা "হিং টিং ছট্" বলিয়া পদে পদে উপহাসাস্পদ মাত্র হইতেছেন। সকল বিষয়ের নেতৃত্ব হারাইয়া যে মোক্ষশাস্ত্র লইয়াছিলেন, তাহাতেও ঐরূপ ব্যাখ্যার ফলে কেবল অভক্তির ও হাসির সৃষ্টি হইতেছে।

স্বার্থপরতার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে হয়ত জীর্ণ প্রাচীনতাকে পরিত্যাগ করা অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু উন্নতি ক্ষুদ্র

স্বার্থকে পদদলন করিয়া মাথা তুলিবে। যাহা হিতকর, যাহা জীবনপ্রদ, যাহা জাতীয়ত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশের হেতুভূত, তাহার অপ্রতিহত গতিকে যে বাধা দিবে, সেই ভাসিয়া যাইবে, সেই মরিবে; এবং বিধাতার কৃপায় উন্নততর সমাজ নব আদর্শ স্থাপন করিয়া জাতিকে জীবন্ত করিবে এবং জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জীবনের সার্থকতা। *

জড়বিজ্ঞানের যতই অনুশীলন হইতেছে, ততই আমরা দেখিতেছি যে, সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই বিধাতার নানাপ্রকার উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। একই বস্তু দ্বারা কত বিভিন্ন অভিপ্রায় সংসিদ্ধ হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই যে সূর্য্য, ইহা কত দূরে অবস্থিত, কিন্তু ইহার কিরণমালার সহিত এই পৃথিবীস্থ অতি ক্ষুদ্র কীটাণুরও দর্শনশক্তির সংযোগ রহিয়াছে। এই সূর্য্যালোক পুরোস্থিতা নয়নমনমুগ্ধকারিণী প্রকৃতির বিবিধ বর্ণবৈচিত্র্য ও রূপমাধুরীর মূলীভূত কারণ। এই সূর্য্যের উত্তাপেই অবিরাম-সঞ্চারী সুখদ সমীর প্রবাহিত হয়। ঐ সুদূর নীলাকাশে যদি সূর্য্যের প্রকাশ না হইত, তাহা হইলে কি সরসীর নীল জলে কমলিনী প্রস্ফুটিত হইত, না কবি-কল্পনায় আকর্ণায়ত, মধুস্রাবি পদ্মপলাশলোচনের কথা আমরা শুনিতে পাইতাম? বর্ষা গগনের নবীন জলদজাল তখন কোথায় থাকিত, মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতই বা কোথায় থাকিত, আর বৈষ্ণব কবির কমনীয় ভাষার পুষ্পছন্দে শ্রীকৃষ্ণের নবঘনশ্যাম রূপ ও 'শ্যামর ঝামর কোরে বিজুরী জনু' বলিয়া শ্রীরাধার শ্রীমুখের বর্ণনার অনির্ব্বচনীয় রসাস্বাদ কি কাহারো ভাগ্যে ঘটিত? আবার হিন্দুগণ এই সূর্য্যকেই "ধ্বাণ্ডারিং সর্ব্বপাপঘ্নং" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। সূর্য্যরশ্মি কত প্রাণসংহারক ব্যাধিবীজাণুর ধ্বংসসাধন করিয়া আমাদিগকে বিষম অনিষ্ট সম্পাতের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? এই সূর্য্যের কিরণই তো চন্দ্রকে আলোকিত এবং পৃথিবীকে কৌমুদীবসনে আবৃত ও নন্দন-সুষমায় সুশোভিত করিয়া আমাদের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে। এই যে সামান্য শৃগাল, কুক্কুর, কাক, চিল প্রভৃতি প্রাণিগণ, ইহারাও প্রতিনিয়ত মিউনিসিপ্যাল্ স্কেভেঞ্জারের ন্যায় কার্য্য করিয়া আমাদের কত কল্যাণ সাধন করিতেছে, অতি ক্ষুদ্র যে পিপীলিকা, তাহাও ঐ কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। বিশ্ববিধাতা বিপুল সৃষ্টি কার্য্যের দ্বারা যে কত অশেষবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তাহা ভাবিয়ে অবাক্ হইতে হয়। একটা সামান্য বীজের মধ্যে কত বিচিত্র কৌশলে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইতেছে! ভবিষ্যতে ঐ বীজ হইতে যে বৃক্ষের উদ্গম হইবে, যাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া কত প্রাণী দেহপ্রাণ শীতল করিবে, ও সুস্বাদু ফল আহার করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবে, এবং যাহার পুষ্পের সৌরভাঘ্রাণে

* বিগত ১৭ই এপ্রিল, দেবালয়ে উপাসনাকালে বিবৃত।

আমাদের চিত্ত আমোদিত ও পুলকিত হইবে, সেই বৃক্ষের সূক্ষ্মদেহ ভাবী শক্তিবিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা (potentiality) লইয়া ঐ বীজের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ঐ বীজাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ যাহাতে মৃত্তিকা হইতে পরিবর্দ্ধনের উপযোগী আহার্য্য সংগ্রহের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে, তাহারও আয়োজন ঐ বীজের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। কুলের আঁটীর ন্যায় কোন কোন বীজের সন্ততির উদ্দেশ্যে বিধাতা অন্য প্রকার কৌশলও প্রয়োগ করিয়াছেন। যে বৃক্ষে কুল জন্মগ্রহণ করে, যদি তাহারই নীচে সমস্ত কুলগুলি ঝড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে বৃক্ষের ছায়া দ্বারা সূর্য্যালোকের প্রতিরোধ হেতু ও একই স্থানে অসংখ্য বৃক্ষশিশুর জন্ম নিবন্ধন পূর্ণবিকাশের অনুকূল যথোপযুক্ত স্থানাভাবে নবজাত সমস্ত বৃক্ষশিশুগুলিরই মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্য এবং অন্যান্য কারণে কুলবীজের একটী অম্ল মধুর বহিরাবেষ্টনের সৃষ্টি হইয়াছে; ইহার লোভে পক্ষীগণ ইহাদিগকে চঞ্চুপুটে করিয়া নানাস্থানে লইয়া যায়, এবং বীজগুলি তত্তৎ স্থানের ভূমিতে নিপতিত হইয়া বর্দ্ধনের উপযোগী স্থান, আলোক ও উত্তাপ লাভ করিয়া সময়ে পূর্ণায়তবৃক্ষরূপে পরিণত হয়। আবার এই বৃক্ষগুলির দ্বারাই না কত বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ফল, পুষ্প ও ছায়া প্রদান প্রভৃতি ব্যতীত ইহারা প্রচুর বৃষ্টিপাতের এক প্রধান কারণ। বৃক্ষরাজি বিনষ্ট করিলে বৃষ্টিপাতের লাঘব হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, যে সকল আরণ্য অঞ্চলে এক সময়ে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইত, অরণ্য ধ্বংস করার পর হইতে সেই সমুদয় স্থানে আর তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। এই বৃক্ষগুলির সহিত আমাদের জীবনেরও অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা প্রশ্বাসের সহিত যে বাষ্প উন্মোচন করি, ইহারা তাহা শোষণ করিয়া বায়ু পরিষ্কার করে, এবং আমাদের জীবনধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় যে বাষ্প, তাহা সরবরাহ করিয়া আমাদিগকে স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে বাঁচাইয়া রাখে। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্য হইতে আমি আর একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এই যে উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে আমরা কুঁজ দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। অনেক সময় উষ্ট্রকে মরুভূপথে তৃণশস্যাদির অভাব প্রযুক্ত একাদিক্রমে বহুদিবস পর্য্যন্ত অনাহারে কালাতিবাহন করিতে হয়, তখন ঐ কুঁজের অভ্যন্তরস্থিত চর্ব্বি ইহার দেহে সঞ্চারিত হইয়া ইহাকে পোষণ করে, এবং তজ্জন্য ঐ কুঁজ সেই সময়ে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ সর্ব্বত্রই স্রষ্টার বিবিধ উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের অতি আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এখন আমাদের দেহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। যাহা বলিব, তাহা অতি পুরাতন ও সর্ব্বজনবিহিত, কিন্তু এইরূপ কথারও নূতন উল্লেখে উপকার আছে। এই দেহকে একটী microcosm বা ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব বলা হইয়াছে। একভাবে দেখিতে গেলে এই দেহভাণ্ডে যাহা আছে, ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই আছে, কেবল রূপান্তরে মাত্র। দেহ ও জড়জগতের উপাদান একই, উভয়ত্রই পঞ্চভূতের বিকার ও বিকাশ। আমি প্রাচীন রীত্যনুসারেই পঞ্চভূত বলিলাম, বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানে

বোধ হয় পঞ্চাধিক ষাট অথবা তারও উপরে ভূতের আবিষ্কার হইয়াছে। যাহা হউক, এই যে ক্ষুদ্রায়তন ব্রহ্মাণ্ডরূপী দেহ, ইহা একটী আজব কারখানা, অতি অদ্ভুত যাদুঘর। ইহাকে কখনও একটা আশ্চর্য্য টেলীগ্রাফ আপিস বলিয়া মনে হয়, এখানে তড়িতবেগে সংবাদের যাতায়াত টেলীগ্রাফ-মাষ্টার, পিয়ন, তার—এ সমস্তই আছে। মনে করুন আপনার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কেহ স্পর্শ করিল, অমনি সেই ষ্টেসন হইতে সংবাদটা সিগ্‌ন্যাল্ করিয়া হেড্ আপিসে অর্থাৎ মস্তিষ্কে পাঠান হইল, আর মন সেইখানে বসিয়াই জানিতে পারিল যে,কে যেন তাহার বাসগৃহের অংশবিশেষ স্পর্শ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে চক্ষুর মধ্যস্থিত আপিসের ষ্টেসন মাষ্টারকে সিগ্‌ন্যাল্ করিয়া অথবা হরকরার সহযোগে সংবাদ পাঠাইয়া কে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিল। যখন চক্ষু অঙ্গুলীর অনতিদূরে জনৈক শত্রুকে দণ্ডায়মান দেখিয়া হেড্ আপিসে সংবাদ পাঠাইল, তখনই মনের হুকুমে হস্ত উত্তোলিত হইয়া ঐ শত্রুর পৃষ্ঠদেশে কিলের আকারে পুনঃপুনঃ পতিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনা বাক্যব্যয়ে এতগুলি ব্যাপার সংঘটিত হইল। রূপক ও রহস্য ছাড়িয়া দেখিতে পাই,বিজ্ঞানমতে দেহমধ্যে sensory ও motor, এই দুই শ্রেণীর স্নায়ু আছে। প্রথমোক্ত স্নায়ুর কার্য্য আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মস্তিষ্কে মনের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া এবং শেষোক্ত স্নায়ুর কার্য্য আমাদের মনোভব ইচ্ছাকে দেহের সহযোগে কার্য্যে পরিণত করা। এই অদ্ভুত কৌশলে আমাদের দ্বারা কত উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে। জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশের দ্বারা আমাদের আত্মাকে পরিপুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে চক্ষুকর্ণাদিকে কি অসাধারণ শক্তি ই না প্রদান করা হইয়াছে! চক্ষের মণিটী কত ক্ষুদ্র এক বিন্দু জিনিষ, কিন্তু তাহাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য রাশির ছায়াপাত হয়, বিশ্বকর্ম্মার এ কি অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য! এইরূপে বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বত্র স্রষ্টার অপরূপ অগণিত উদ্দেশ্যনিচয় পরিলক্ষিত হয়, মানুষের কি সাধ্য যে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ণনা করে।

এই যে জড়জগৎ, ইতরপ্রাণী ও মানব দেহের মধ্যে স্রষ্টার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম, ইহাদের সেই উদ্দেশ্য পরিচায়ক কার্য্যের একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই। জড়জগৎ প্রভৃতি দ্বারা বিধাতার উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু উহারা জানেনা যে উহাদের দ্বারা ঐরূপ কার্য্য হইতেছে। চৈতন্যস্বরূপ মানবাত্মার কথা কিন্তু অন্যরূপ। মানবাত্মা সে উদ্দেশ্য বুঝিতে ও জ্ঞাতসারে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অল্পাধিক পরিমাণে সক্ষম। এই খানেই কার্য্যাকার্য্যের জন্য মানবাত্মার দায়িত্ব। জড় ও ইতর প্রাণীর সে দায়িত্ব একেবারেই নাই। মানব যথা সম্ভব স্রষ্টাকে জানিবে এবং তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবে, ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য যিনি যে পরিমাণে সংসিদ্ধ করিবেন, তাঁহার জীবন সেই পরিমাণে সার্থক হইবে। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে পারা নিরতিশয় কঠিন ব্যাপার। যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি যারপর নাই সৌভাগ্যশালী। তাঁহাকে আর অন্ধকারে সন্তর্পণে চলিতে হয় না, তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ হয়েন।

জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করিতে হইলে

প্রথমতঃ 'আমি কে' ইহা জানা আবশ্যক। আমি যে আমার বিজ্ঞানাত্মক দেহ হইতে স্বতন্ত্র,ইহা শুধু কথায় নয়, শুধু বুদ্ধি ও তর্কের দ্বারা নয়, কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে সম্যকরূপে উপলব্ধি ও অনুভব করিতে হইবে। সংসারের জীব কার্য্যতঃ দেহাত্মবাদ লইয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সর্ব্বদা আহার বিহার, প্রমোদ বিলাস, পোষাক পরিচ্ছদাদির আড়ম্বর, অঙ্গসৌষ্ঠব সংবর্দ্ধনাদি ব্যাপার, এবং পার্থিব সম্পদ ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতি লইয়াই বিব্রত। ইহাদের নিকট 'টাকাই স্বর্গঃ, টাকাই ধর্ম্মঃ, টাকাই পরমন্তপঃ, টাকাতে প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।' রৌপ্য মুদ্রাই ইহাদের একমাত্র উপাস্য ও নমস্য 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং,' কেননা ইহারা প্রত্যেক পদে পদেই দেখিতে পায় যে 'সর্ব্বে গুণাঃ কাঞ্চন মাশ্রয়ন্তি।' দুঃখ করিয়া একজন দারিদ্র্য-নিপীড়িত ব্যক্তি গান রচনা করিয়াছিলেন, 'যার টাকা নাইরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল।' দুর্লভ মানব জন্মের এইরূপ money value দ্বারাই সচরাচর মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। এদেশের বিজ্ঞপণ্ডিত বৃদ্ধ বিষ্ণুশর্ম্মা ভূয়োদর্শনের ফলে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, 'যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ, স এব বক্তা সচ দর্শনীয়ঃ' ইত্যাদি। এখন আর 'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্, নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্,' এই কথা বলিলে চলিবে না। উপনিষদের ঋষিগণের দেশে বর্ত্তমান যুগে চরিত্র ও ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বাহ্যসম্পদ কৌলীন্যের কতদূর নিদর্শন স্বরূপ হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা গ্রাম্য কবির নিম্নলিখিত কৌলীন্য-নির্ণায়ক বাক্যে অতি পরিস্ফুটরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। কবি বলিয়াছেন—

> ইংরেজ। গোত্র, দালান গাই,
> এর সমান আর কুলীন নাই ;
> আর যে আছে দুই এক ঘর,
> লোহার সিন্দুক আর টিনের ঘর।
> বিলাতফেরতা এঁদের সেরা,
> জাপানফেরতাও খোরা থোরা।
> গুণের বিচার ভাই করে যে,
> নিতান্তই বর্ব্বর জানোয়ার সে।

যাহা হউক, প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য বিষয় হইতে একটু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। আমি বলিতেছিলাম, জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে হইলে দেহাত্মবাদকে অতিক্রম করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। দৈহিক ব্যাপারে পশু ও মানবে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, আত্মিক বিষয়েই মানবের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব। মানবের প্রাণে আত্মতত্ত্বের চিন্তা জাগ্রত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ আরম্ভ হয় এবং বিশ্ববিধাতা কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাহাকে জগতে পাঠাইয়াছেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই তাহার মনে উদিত হয়। এই বিশাল বিশ্বচক্রের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই উদ্দেশ্যবিহীন নহে, একটা কলের সামান্য যে আলপিন্‌টী, তাহারও বিশেষ কার্য্য আছে, আর জগতের সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত যে মানব, তাহার জীবনের কি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই? নিশ্চয়ই আছে, এবং তাহা বুঝিয়া তৎসাধনে নিজকে নিযুক্ত করিতে পারিলেই জীবনে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া মানব ধন্য ও সুখী হইতে পারে। ফুলের সৌরভ আঘ্রাণ করিলে উহা যে বস্তু-বিশেষ হইতে নিঃসৃত, আমরা তাহা বুঝি, কিন্তু সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের

প্রকৃত জ্ঞান হয় না। ভূমিকম্পের দ্বারা ভূগর্ভ-নিহিত কারণ বিশেষের আভাস পাই বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না সেই কারণ গন্ধক ও অগ্নির সংযোগে বলিয়া জানিতে পারি,সে পর্য্যন্ত তৎ-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না, তখন বাসুকি, বা কূর্ম্ম, বা গজ প্রভৃতির স্পন্দন বা সঞ্চলন তৎকারণ রূপে কল্পিত হইয়া সত্যকে আচ্ছন্ন করে। সেইরূপ আত্মজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্ম-জ্ঞানের স্ফুরণ মাত্রই যথেষ্ট নহে, ব্রহ্মের সহিত প্রত্যেক মানবাত্মার সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় হওয়া একান্ত আবশ্যক, নইলে কাঁহার নিকট হইতে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জ্ঞান লাভ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্র-সর হইব ? যতদিন এই পরিচয়লাভ না হয়, ততদিন মানবের চিত্ত স্থির হয় না, মানব ঊর্দ্ধশ্বাসে নানা কার্য্যের পশ্চাদ্ধাবিত হয়, অথচ কোন্‌টী তাহার বিশেষ কার্য্য, তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না। বিশেষ কার্য্য যখনই বোঝা যায়,তখনই চিত্তচাঞ্চল্যের চির নির্ব্বাণ হয়। মধুমক্ষিকা যতক্ষণ না মধুর সন্ধান পায়, ততক্ষণ ভোঁ ভোঁ করিয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে ছটফট করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু যেই সে মধুর সাক্ষাৎকার লাভ করিল,আর তাহার ক্রন্দন নাই, চাঞ্চল্য নাই, অমনি সে মধুভাণ্ডে বসিয়া পড়িল, আর আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। মানবাত্মা সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞগণ এইরূপই বলিয়াছেন। আনন্দরসের আস্বাদ লাভ লক্ষ্যজ্ঞানের একটী প্রকৃষ্ট লক্ষণ। লক্ষ্যজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার তৃপ্তি এবং বিমলানন্দ ও নিত্যানন্দ রসের সম্ভোগ অসম্ভব। "যো বৈ ভূমা তৎসুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।"—

সেই ভূমা মহান্‌কে না জানা পর্য্যন্ত সুখ নাই, মানবের অগস্ত্য-পিপাসার কিঞ্চিন্মাত্রও শান্তি নাই। লক্ষ্যজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত 'যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ' এই বাক্য কথার কথা মাত্র। লক্ষ্যজ্ঞান হইলেই তদনুযায়ী কার্য্যের সূত্রপাত হয়, তখন মানবের সকল কার্য্য ব্রহ্মেতে অর্পিত হইয়া পূত হইয়া যায়, আর তাহার মানাপ-মান বোধ থাকে না, আত্মগ্লানির সম্ভাবনা থাকে না, বিষাদ, বিতর্ক প্রভৃতি চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া যায় ; এক প্রেমসূর্য্যের কিরণ সম্পাতে তাহার আত্মা-চন্দ্র আলো-কিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে ; অজ্ঞানতা, সন্দেহ ও দ্বিধার তমিস্রা একেবারে বিদূরিত হইয়া যায় ; ইন্দ্রিয়ের তাড়না আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, পরন্তু ইন্দ্রিয়গণ শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্য-সাধনে তাহার সহায়তা করিতে আরম্ভ করে। মানব যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার মধ্যে কতকগুলি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

সৎকার্য্য, সদালাপ, উপাসনা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতিতে তাহার এক অপূর্ব্ব অভিনব রস-বোধ জন্মিতে আরম্ভ করে, এই সমুদয় তাহার নিকট আর জ্ঞাননির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যমাত্র থাকে না, ইহারা তাহার দৈনন্দিন জীবনের একটা স্বাভাবিক অবস্থাতে পরিণত হয়। নৈসর্গিক নিয়মে যেমন ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, তেমনই তাহার উপাসনাও পায়, এইরূপই অবস্থা হয়। ইহার ফলে তাহার আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই ক্রমশঃ একেবারে বদলাইয়া যায়,সে আর লোক দেখান রূপ সাধু সাজিতে পারে না, আর বক-তপস্বী, বা মর্কটবৈরাগী, বা বিড়াল ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে পারে না ; সে খাঁটী মানুষ হইয়া যায়, Saul Paul হইয়া যায়, রত্নাকর বাল্মীকি হয়, লম্পট বিল্বমঙ্গল বিল্বমঙ্গলঠাকুরে পরিণত হয়।

যেদিন লক্ষ্যের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতেই প্রকৃত পাপবোধের আরম্ভ হয়, সেইদিনই বিল্বমঙ্গলের পাপচক্ষুর উৎপাটন ও দিব্যচক্ষুর বিকাশ। যেদিন জগাই মাধাই হরিনামের রসাস্বাদ লাভ করিল, সেইদিন হইতেই পাপের জ্বালায় তাহারা অস্থির হইয়া উঠিল, তারপর মহাপ্রভুর আদেশে তাহারা যাহাকে পথে পাইল, তাহারই পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাথায় দিতে আরম্ভ করিল এবং এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপের নিদারুণ জ্বালা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিল। এই যে কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে আমরা বাঁধান পথের উপরে কোন কোন ব্যক্তির নাম খোদিত দেখিতে পাই, ইহাতে জগাই মাধাইর ন্যায় সেই সেই ব্যক্তির কি আন্তরিক পাপবোধ ও প্রায়শ্চিত্তের ভাব বিজ্ঞাপিত করে! মনে হয়, তাঁহাদের প্রাণের যেন এই আকুল আকাঙ্ক্ষা যে, যতলোক সেইপথে যাতায়াত করে, তাহাদের সকলের চরণ যেন সেই নাম দলিত করিয়া যায়, যেন তীর্থাগত ভক্তবৃন্দের পদধূলিস্পর্শে তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। এইরূপ আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা ও লক্ষ্য পরিচয়ের একটী অন্যতম লক্ষণ। শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের সাধন-কাহিনীতে আমরা কি ব্যাকুলতার কথাই না শুনিতে পাই! তিনি কখনো মুক্তকচ্ছ বৈষ্ণব সাজিয়াছেন, কখনো ফকির সাজিয়াছেন, কখনো বা গোপিকাবেশ ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও নাকি কখনো মস্তকমুণ্ডন ও গৈরিক পরিধান করিয়া বৈরাগ্য-সাধন করিয়াছেন, কখনো হোম করিয়াছেন, কখনো বা শিশুর রক্তমাংস পানাহার করিয়াছেন। কে কিরূপ উন্মত্তবৎ লক্ষ্যের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। একের ব্যাকুলতা-ব্যঞ্জক কার্য্য অন্যের অনুকরণীয় নহে এবং অন্যের অনুমোদিতও না হইতে পারে। এই ব্যাকুলতা যাহার পক্ষে স্বতঃ যেভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাই অকৃত্রিম। কৃত্রিম কিছুতেই আন্তরিক প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যায় না। নামাবলীই পরিধান করা হউক, অথবা তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা দ্বারাই বাহু বলয়িত করা হউক, আসল ব্যক্তিটীকে লুক্কায়িত করিয়া রাখা অসম্ভব; তাহার মুখ, তাহার চক্ষু, তাহার চালচলন সমস্তই তাহাকে তাহার অজ্ঞাতসারে পৃথিবীর নিকট ধরাইয়া দেয়, কেহই তাহার কপটতা ও চতুরতার সহায় হয় না। একটা সুন্দর গল্প আছে:—ফ্রিজিয়া দেশের রাজা মিদসের কাণ কোন দেবীর অভিসম্পাতে গর্দ্দভের কাণের ন্যায় লোমযুক্ত ও দীর্ঘায়তন হইয়া যায়। আমাদের দেশের বৈরাগীগণ যে একপ্রকার কাণঢাকা টুপী ব্যবহার করে, মিদস্ তাঁহার স্বদেশজাত ঐরূপ একটী টুপী দ্বারা তাঁহার কাণ সর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখিতেন, যেন তাঁহার প্রজাবৃন্দ সেই সলোম লম্বকর্ণ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে উপহাস ও তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে না পারে। কিন্তু যখন তাঁহার কেশ দীর্ঘ হইল, তখন তিনি বাধ্য হইয়া উহা ছেদনের জন্য এক ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া আনিয়া অতি সংগোপনে তাহার নিকট মস্তকের আবরণ উত্তোলন করিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, দেখ, তুমি যদি আমার এইরূপ কাণের কথা কাহাকেও বল, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণ সংহার করিব।' ক্ষৌরকার বলিল, 'আজ্ঞে না, তাও কি কখনো হয়? আমি যে আপনার প্রজা, আমি কি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিতে

পারি ?' ক্ষৌরকারের কিন্তু সেই নিষিদ্ধ বাক্য হজম করা বড় কঠিন হইয়া পড়িল, কথাটা চাপিয়া রাখার চেষ্টা করাতে তাহার মধ্যে একটা ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহার আর কিছুতেই শোয়াস্তি নাই, পেট ফাঁপিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, অগত্যা সে মানবের গতায়াতশূন্য এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তাহাতে অবতরণ করিয়া প্রাণ খুলিয়া 'রাজা মিদসের কাণ গাধার কাণের মত,' 'রাজা মিদসের কাণ গাধার কাণের মত' এই কথা গুলি পুনঃ পুনঃ সাধ মিটাইয়া বলিল, তবে তাহার মুস্কিল আসান হইল। তার পর সে গর্ত্ত হইতে উঠিয়া মাটী দ্বারা সেই কথা গুলি গর্ত্তের মধ্যে চাপা দিয়া রাখিল, কিন্তু এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, সেই গর্ত্তের উপরে কালক্রমে যে সমস্ত নল খাগ্‌ড়ার গাছ জন্মিয়াছিল, সেই গুলি যখন বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইত, তখন 'রাজা মিদসের কাণ গাধার কাণের মত' এই কথা সেই সঞ্চালন হইতে উদ্ভূত হইত বলিয়া শোনা যাইত। কপটাচারীদের মনোমধ্যস্থিত লুক্কায়িত ভাবও এইরূপ অসম্ভাবিত উপায়েই প্রকাশিত হইয়া পড়ে,—ধর্ম্মধ্বজী হওয়ার মত বিড়ম্বনা আর দ্বিতীয় নাই।

এই যে লক্ষ্য পরিচয়ের কথা বলিতেছিলাম, ইহার সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন—আত্মাহুতি বা স্বাতন্ত্র্যের নির্ব্বাণ, স্বেচ্ছার উৎসর্জ্জন ও ভগবদিচ্ছার প্রতিষ্ঠাপন। ইহা যিশুর 'আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' এই উক্তির অবস্থা, ইহাই 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এই মহাবাক্যের মূলীভূত আত্মবিলোপ বা মহাযোগ। ইহা আত্মহত্যা নহে, ইহা প্রকৃত আত্মলাভ। রামায়ণের (অরণ্যকাণ্ড, চতুঃসপ্ততিতম সর্গ) একটী আখ্যায়িকা মনে পড়িল। পঞ্চবটী বনৈকদেশস্থ মতঙ্গবনে পম্পানদীর তীরে তাপসী শবরী যখন স্বীয় আরাধ্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎলাভ করিলেন, তখন তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল ? উক্ত আছে, শবরী রামের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া "হুত্বাত্মানং হুতাশনে" আপনাকে হুতাশনে আহুত করিয়া 'প্রজ্বলিত অগ্নিপ্রতিম শরীরে' স্বর্গে গমন করিলেন, সেই বিশুদ্ধচিত্ত পরমর্ষিগণ যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, "আত্মসমাধি" দ্বারা সেই পুণ্যস্থানে গমন করিলেন। রাম কি শবরীকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, না শবরী ঐরূপ পাতকের দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন ? তাহা কখনই হইতে পারে না। শবরী নিশ্চয়ই নিজকে অর্থাৎ স্বীয় স্বাতন্ত্র্যকে যোগানলে ভস্মীভূত করিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত নিত্যযোগে যুক্ত হইয়াছিলেন, অহংজ্ঞান ও স্বেচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতাকে চিরদিনের মত আত্মমন্দিরে প্রতিষ্টিত করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

আমার বক্তব্য শেষ হইল, এখন সংক্ষেপে বিবৃত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিয়া নিরস্ত হইব। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই স্রষ্টার বিভিন্ন উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়। জড় ও ইতরপ্রাণী নৈসর্গিক নিয়মে সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করিতেছে, কিন্তু কি করিতেছে, তাহারা তাহা জানে না। মানব জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সেই উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বুঝিতে ও তদনুযায়ী স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও কার্য্য নির্ণয় করিতে সক্ষম, তজ্জন্য আত্মতত্ত্বের চিন্তা আবশ্যক। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মানব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে,

এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মের সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। এই সময়ে একান্ত ব্যাকুলতা আসিয়া তাহাকে দিব্যোন্মাদে মাতাইয়া তোলে ক্রমে সমস্ত চাঞ্চল্য দূর হয়; সে উপাসনাদির প্রকৃত রসস্বাদনে সমর্থ হয়, তাহার আত্যন্তিক পাপবোধ জন্মে, এবং যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সে নির্ম্মল হয় ও একেবারে নূতন মানুষ হইয়া যায়, তখন সমস্ত লক্ষণ তাহার নবজীবন লাভের সাক্ষ্য প্রদান করে। অবশেষে তপস্বিনী শবরীর ন্যায় সে স্বেচ্ছাকে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া তৎস্থানে বিধাতার ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজকে ধন্য করে। ইহাই মানবজীবনের সার্থকতা।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

মা *

যাও চলি দেব-দেশে বিশ্বাসী সন্তান!
তেজস্বী যশস্বী বীর,
"মণিরত্ন" পৃথিবীর,
অমর অমৃতালোকে চির দীপ্তিমান;
কৈশোরে—ষোড়শ বর্ষে
লভি খ্যাতি চির হর্ষে,
যাও বাবা, সুসজ্জিত হিরণ্ময় যান;
তোর কভু মৃত্যু নাহি, অমর সন্তান।

২

পূর্ণ-কামা কীর্ত্তি-লক্ষ্মী রয়েছে দাঁড়া'য়ে,
অই শুভ্র অভ্রোপরি,
রূপে দিক্ আলো করি,
আনন্দ করুণা আশা দিতেছে ছড়ায়ে।
সুযশঃ মুকুট করে,
জয়মাল্য সমাদরে,
তোমারে উন্নত শিরে দিবে মা' পরায়ে,
তোমা লাগি কীর্ত্তিলক্ষ্মী রয়েছে দাঁড়ায়ে।

গাহিছে নিখিল বিশ্ব তব "জয় জয়"
পরান্তক-পরাক্রম,
দৃপ্ত হুতাশন সম,
আত্মত্যাগী কর্ম্মযোগী নির্ম্মুক্ত নির্ভয়;
দেশের কর্দ্দম কালি,
ধুয়ে দিলে রক্ত ঢালি,
হোমানলে হুতি দিলে ও দেব হৃদয়,
স্বদেশ-কল্যাণ-তরে প্রাণ বিনিময়!

৪

শুনিয়াছি, দৈত্য দেশে দেবতা প্রহ্লাদ—
আত্মজয়ী, আত্মারাম,
ইষ্ট মন্ত্র হরিনাম,
বুঝিত না বিঘ্ন বাধা বিপত্তি বিষাদ;
পোড়েনি সে মন্ত্রানলে,
ডোবেনি সে সিন্ধুজলে,
শমন আপনি দিল শুভ আশীর্ব্বাদ,
সেই চির-কালজয়ী দেবতা প্রহ্লাদ।

৫

আর সে অমর পার্থ ভারত সমরে,
জানিত না পরাজয়,
অস্ত্র তার অগ্নিময়,
বাহুবলে তুষিলা সে ত্রিশূলী শঙ্করে;

* রাজপুত মহিলা বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী—তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় বীরপুত্র পুত্তসিংহ, প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া যখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নিহত হন, বীর-মাতার সেই সময়ের উক্তি।

আকাঙ্ক্ষিত সত্য ধর্ম্ম,
করিত নিষ্কাম কর্ম্ম,
শক্তিমান সব্যসাচী পূর্ণ ভক্তি ভরে—
সখা যার নারায়ণ—সারথি সমরে!

৯

আর দেখিলাম আজি প্রাণের তনয়!
তেমনি সাধনা তোর কর্ম্ম ধর্ম্মময়!
সুশীল সংযমী ধীর,
অরিন্দম মহাবীর,
মহারণে পরন্তপ, নিশ্চিন্ত নির্ভয়;
চক্রব্যূহ ভেদ করি,
বিনাশি সহস্র অরি,
অস্তগত প্রভাকর প্রভাত সময়!
শত্রু মিত্র কহে "ধন্য"
এ মহা সুখ্যাতি-জন্য,
কি গর্ব্বিত উল্লাসিত মায়ের হৃদয়,
প্রহ্লাদ অর্জ্জুন সম সাধক তনয়।

১০

কি বলিব শেষ কথা—কি বলিব আর,
লইলা স্বদেশ-লক্ষ্মী পুত্রে উপহার!—
যার পুত্র বিশ্ব প্রিয়,
শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয়,
এ মর মরতে মরি! কত ভাগ্য তার;
না জানিরে কচি ছেলে,
এ শকতি কোথা পেলে,
কে শিখালে এ মহত্ত্ব শত তপস্যার,
হেন অনাসক্তি দান কোন্ দেবতার?

১১

যাও বাবা—আঁখিজল ফেলি কেন আর,
তুচ্ছ অশ্রু দিব কেন তোরে উপহার?
মন্ত্রমুগ্ধ যুদ্ধ ক্ষেত্র,
চমকিত বিশ্ব নেত্র,
হেরি তব বীরপণা মহিমা তোমার!
বসুধা হইল ধন্যা,
জননী কৃতার্থম্মন্যা,
কুলের গৌরবে তৃপ্তি কুল দেবতার।
ধরা ভরা জয়গীতি,
উথলিত ভক্তি প্রীতি,
মর দেহে অমরতা লহ পুরস্কার।
ধর বাবা, দেব বেশ
পরিহরি মর্ত্ত্য দেশ,
যাও চলি পুষ্পরথে অমর-আগার,
পুত্র মম মৃত্যুঞ্জয়, জানুক সংসার।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

মানব-সমাজ। (১৭)

(২) এক্ষণে অন্যান্য মানবের সহিত সংশ্রবের কথা আলোচনা করা আবশ্যক। বর্ত্তমান কালীয় অসভ্য এবং সভ্য সমাজ, উভয়ের দিকেই দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, এক-বীজ পুরুষের সন্তান সন্ততিগণ সংখ্যায় যতদিন অল্প থাকে, ততদিন একত্রে বাস করিতে পারে, কিন্তু কালে সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় পৃথক হইয়া যায়। ইহাতেই বহু গোষ্ঠী উৎপন্ন হয়। এই সকল গোষ্ঠী হইতে ক্রমে দল, জাতি, পরিবার ও সমাজ কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, কাল ক্রমে এক-বীজ পুরুষের কথা ভুলিয়া গিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি কল্পনা করে। যাহারা প্রকৃতপক্ষেই বিভিন্ন বীজ-পুরুষ হইতে জাত, তাহারা তো তদ্রূপ কল্পনা

করিবেই। কিন্তু এই সকল কল্পনার মধ্যে এক আশ্চর্য্য-জনক ভাব সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। প্রাথমিক সমাজ, কি জানি কি অবোধ-গম্য কারণে, মানবেতর উৎপত্তি-কল্পনা করিতেই ভালবাসে। সর্ব্বত্রই অসভ্যসমাজে মানবেতর জন্মবাদ * শুনিতে পাওয়া যায়। বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আমি "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" কার্য্যোপলক্ষে কতিপয় সাঁওতালকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহারা কেহবা হংস হইতে জাত, কেহবা হরিণ হইতে জাত, ইত্যাদি বলিয়াছিল। গোদাগাড়ী ও মালদহ-প্রদেশে সাঁওতালের সংখ্যা বেশী নহে; তাহারই মধ্যে আট নয় দলের সন্ধান পাইলাম। ইহাদিগের একদলও মানুষ বীজপুরুষ হইতে জাত বলিয়া নিজদিগকে বিশ্বাস করে না। প্রথম অবস্থায় মানব পশু পক্ষী, গাছ পাথর, গ্রহ নক্ষত্র হইতেই উৎপন্ন হওয়া বিশ্বাস করে। এই অদ্ভুত বিশ্বাসের ফল এই হয় যে, যাহারা এক বীজ-পদার্থ হইতে জাত বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রায়ই বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যায়, এবং বীজপদার্থ অভক্ষ্য হয়। যে হরিণ হইতে জাত, সে হরিণ খায় না; যে হাঁস হইতে জাত, সে হাঁস খায় না; এইরূপ। কিন্তু এইরূপ স্থলে বিবাহ-নিষেধ সর্ব্বত্র দেখা যায় না। কোন কোন স্থলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আগ্রহ-সহকারে এক-বীজের সন্তান সন্ততি মধ্যেও বিবাহ হইয়া থাকে। যাহারা একবীজোদ্ভূত বলিয়া বিবাহ নিষিদ্ধ মনে করে, তাহারাই কালে যখন গোত্র গঠিত করে, তখন এক গোত্র মধ্যেও ঐ নিষেধ-প্রচলন করিয়া থাকে। স্বগোত্র বিবাহ নিষেধ হইবার মূলে মানবেতর জন্মবাদ আছে বলিয়া বোধ হয়। ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয়ের মূলেও একবারেই নাই, তাহা নহে। ভিন্ন দল হইতে স্ত্রীসংগ্রহ করিবার প্রথাই কখন কখন আসুর অথবা পৈশাচ বিবাহে পরিণত হয়। কারণ যখন সহজে স্ত্রী সংগ্রহ হয় না, তখন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনিতে হয়। মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়নকালেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।*

* Toternism.

পূর্ব্বে বাহ্য-প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ আলোচনার সময়ে পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি বিষয়ে দেখাইয়াছি যে, ও সকল মানবের সৌন্দর্য্য-বোধ হইতেই প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সৌন্দর্য্য-বোধ দাম্পত্য-ভাবেরই সহায়ক। নর-নারী পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই প্রধানতঃ সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং এ সকলও বিবাহের সহিতই সংসৃষ্ট। পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি (১) প্রথম বিভাগে আলোচনা করিয়াছি, (২) দ্বিতীয় বিভাগেও আলোচিত হইতে পারিত।

যাহা হউক, স্ত্রী সংগ্রহ এবং আহার-সংগ্রহের নিমিত্তই মানবীয় একদল অন্যদলের সহিত সংস্রবে আসিয়াছিল। কোন দেশে বহু দল বাস করিতে করিতে কালক্রমে আহার্য্য-সামগ্রীর অভাব অনুভব করে। কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে এ ফল হইবেই। সুতরাং একদলের সহিত অন্য দলের আহার্য্য লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ হওয়া অনিবার্য্য। এখনও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রধানতঃ বাণিজ্য-মূলক।

প্রাথমিক সমাজে ব্যক্তির স্থান কোথায় ছিল ও তাহার প্রভাব কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, ঐ সমাজ আহার ও স্ত্রী সংগ্রহার্থ

* মনুসংহিতা, ৩।২১

কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে বাধ্য হইত। এ নিমিত্ত দলপতির সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। বিগ্রহ-প্রধান সমাজে দলপতির আজ্ঞা বিনা-বিচারেই আশু প্রতিপাল্য। এখনও যুদ্ধকালে সেনা-পতির আদেশ ঐ ভাবেই পালন করিতে হয়, নচেৎ কঠিন দণ্ড ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি নগণ্য, সমাজই প্রভু; সমাজের হিতার্থে দলপতিই সর্ব্বেসর্ব্বা। দলের পরকালে পরিবার ও সমাজ জাত হইয়াছে; সুতরাং পরিবারের কর্ত্তা এবং সমাজের প্রভু * এতদুভয়ও দলপতির ন্যায় মাননীয় হইয়াছেন। ইঁহাদিগের আদেশও বিনা-বিচারে অবশ্য পালনীয়। প্রথমাবস্থায় দলপতির বিবর্ত্তনে কর্ত্তা ও রাজা,এইরূপই হওয়া স্বাভা-বিক। বর্ত্তমান-যুগে উভয়েরই আরও বিব-র্ত্তন সাধিত হইতেছে। ইঁহাদিগের আজ্ঞা এখন আর বিচারের বহির্ভূত নহে, বিনা বিচারে তৎক্ষণাৎ পালনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে না। কোথাও বা কর্ত্তা অথবা রাজার লোপ হইয়াছে। যেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বহুব্যক্তি একত্র বাস করার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে পূর্ব্ববৎ কর্ত্তা আর নাই। যে দেশে রাজশক্তি ব্যক্তিগত নাই,তথায় উহা সমাজ মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, রাজপদ লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপে ব্যক্তিত্বের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে এবং দলপতির পারিবারিক কর্ত্তার ও সমাজপতি রাজার অপ্রতিহত প্রভুত্ব, যাহা সামরিক-যুগের উপযোগী ছিল, যাহা সমাজের প্রথমাবস্থায় অত্যাবশ্যক ছিল, তাহা এখন হ্রাস হইতেছে। ইহা বিবর্ত্তনের ফল, সামাজিক বিবর্ত্তনে এফল হইবেই। কারণ ইহা মৌলিক সমাজ-নীতিরই ক্রম-বিকাশ। সে নীতি, সমাজের মঙ্গল। প্রাথ-মিক সমাজে দলপতির আদেশ যে বিনা-বিচারে প্রতিপালিত হইত, তাঁহার প্রভুত্ব যে অপ্রতিহত ছিল, তাহাও সমাজের হিতার্থে; আর এযুগে সর্ব্বত্রই যে রাজশক্তি হ্রাস হইয়া সমাজশক্তির বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাও সমাজের হিতার্থেই। এক মূলসূত্রই বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। ইহার গতিরোধ করিবার সাধ্য বোধ হয় কাহারও নাই; চেষ্টা করিলেও সুফল উৎপন্ন হইতে পারে না। বিনয়, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত উহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, পরিবার বা সমাজের হিতার্থে সমাজ-শক্তিকে বিস্তৃত করা আবশ্যক, কেন্দ্রীভূত আর থাকিতে পারে না। সকল শক্তিই এক অনাদি অদ্বিতীয় শক্তির অংশমাত্র; একথা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বুঝিবেন যে, "যাহা একছিল, তাহাই বহু হইয়াছে।" সামাজিক-শক্তিও আদিতে এক ছিল, এখন বহুবিস্তৃত হইতেছে এবং হইবে। ইহাই প্রকৃতির মূল সূত্র।

প্রথমে উল্লেখ-যোগ্য স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই পরিবারের অথবা সমাজের ছিল, ব্যক্তির নহে; এখনও অসভ্য-সমাজে এবং কোন কোন অতীব সভ্য-সমাজেও তদ্রূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। মিতাক্ষরা-শাসিত সুসভ্য হিন্দুসমাজে এখনও ব্যক্তিত্বের বেশী বিকাশ হয় নাই; সম্পত্তি ব্যক্তির নহে, দান-ক্রিয়াদি সকল সময়ে ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নহে। দায়ভাগ-শাসিত বঙ্গদেশে ব্যক্তিত্বের অধিকতর বিকাশ হইয়াছে। যাহা হউক, নিতান্ত অসভ্য-সমাজেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তি ব্যক্তির বলিয়া স্বীকৃত হয়। নিজের ও সমাজের অধিকার যেরূপ মৌলিক ভাবের উপর আদি

* রাজা।

যুগ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সমাজ-তত্ত্ববিৎ ভেনিকার সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি নিজ হস্তে এই পাথরখানি হইতে অস্ত্র গড়িয়াছি। সুতরাং ইহা আমার"—এইরূপ ভাব হইতে স্বাধিকার উৎপন্ন হয়। আর "আমার স্ত্রী পুত্রাদির সাহায্যে আমি এই গৃহখানি নির্ম্মাণ করিয়াছি; অতএব ইহা সমস্ত পরিবারের"—এইরূপ ভাব হইতে পারিবারিক অধিকার স্বীকৃত হয়। আর "আমি সমস্ত দলবলের সহিত একত্রে এই সকল পশু পক্ষী শীকার করিয়াছি, অতএব এ সকল সকল সমস্ত দলের সম্পত্তি"—এইরূপ ভাব হইতে সমগ্র দলের বা সমাজের অধিকার স্বীকৃত হয়। † ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে অধিকারের মূল, কর্ম্ম অথবা চেষ্টা। যাহা ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় সিদ্ধ হয়, তাহা ব্যক্তির; যাহা পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় সিদ্ধ হয়, তাহা পরিবারের; আর, যাহা সমাজস্থ বহু ব্যক্তির চেষ্টায় সিদ্ধ হয়, তাহা সমাজের এজমালী সম্পত্তি। এই ভাবের বিকাশেই ব্যক্তির এবং সমাজের অধিকার পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ব্যক্তির সমষ্টিতেই সমাজ গঠিত। সুতরাং ব্যক্তিকে যদিও সমাজের অধীন থাকিতেই হইবে, এবং থাকাও অশেষ প্রকারে মঙ্গলজনক, তথাপি ব্যক্তিকে একবারে চাপিয়া মারিলে সমাজ অধঃপতিত হইবেই। ব্যক্তিকে সর্ব্ব বিষয়ে অথবা বহুবিষয়ে সমাজের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া ফেলিলে, অথবা সম্পূর্ণরূপে সমাজের মুখাপেক্ষী করিয়া তুলিলে, ব্যক্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং সমাজও তদ্রূপই হইবেই। ইহা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

ব্যক্তিকে সমাজের অধীন হইতেই হইবে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিতে হইবে না। এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে সকল বিষয়েই স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে; কেবল সমাজদ্রোহীতা করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সমাজহিতে পুরস্কার, অহিতে দণ্ড। কিন্তু প্রাথমিক সমাজে পুরস্কারের ব্যবস্থা তত থাকে না। দণ্ডের ব্যবস্থাই প্রধান। সে সমাজে দণ্ডও অতীব গুরুতর। কিন্তু সমাজ যতই উন্নত হয়, লোক-চরিত্র যতই অধিক মাত্রায় আলোকিত ও পরিজ্ঞাত হয়, দণ্ডের মাত্রাও ততই কমিয়া আসে। গুরুতর দণ্ডবিধান তখন অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। * দুশ্চরিত্রগণের অত্যাচার হইতে সমাজ আত্মরক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, তজ্জন্য সমাজের সংশ্রব হইতে উহাদিগকে দূরে রাখিবার অধিকারও সমাজের অবশ্যই আছে। কিন্তু যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তি আরও দুরাচারী হয়, এরূপ সংশ্রবে ও স্থানে উহাদিগকে আবদ্ধ করিবার সমাজের কোন অধিকার নাই। বর্ত্তমানকালে কারাগার সকল যে প্রণালীতে রক্ষিত হইতেছে, উহা সমাজের অমঙ্গলজনক। ওরূপ ভাবে অপরাধিগণকে রাখিবার সমাজের কোন অধিকার নাই। ফলেও দেখা যাইতেছে যে, বহু ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হইয়াও অপরাধের কার্য্য করিতেছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অতীব ভয়ঙ্কর; ঈদৃশ ভয়ানক বিধি

† Hand Book to Ethnographical collections, British Museum· P 25.

* Cruelty in the penal code and the tendency to exaggerate punishment are sure signs of a low civilization and of an imperfect educational system.—Prof Loeb's Comparative physiology of the brain· p 134.

দ্বারা সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে। জীবনে একটু স্থিতিস্থাপকতা, সাহসিকতা, এমন কি, একটু অশান্তিপ্রিয়তাও আবশ্যক; তাহাকে কঠিন রাজবিধি দ্বারা নিষ্পেসিত করিলে শান্তিরক্ষা হইতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। সমাজ ক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।* এই রক্ত প্রলিপ্ত আইন অচিরে সংশোধিত হওয়া উচিত।

যাহা হউক, দণ্ড বিধানের পূর্ব্বে বিবেচনা করা আবশ্যক যে, ব্যক্তির অপরাধ কতটুকু। ‡ ব্যক্তি বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। কিন্তু ইহার জন্য কি সে স্বয়ং দায়ী? মানব সমাজের আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ইহা যথাযোগ্য ভাবে বিবেচিতই হয় নাই। রাম ক্রোধী, অতিশয় উদ্ধত! সে শ্যামকে হত্যা করিয়াছে। সে যে ক্রোধী হইয়াছে; ইহা কি তাহার দোষ? হয়ত তাহার কোন পূর্ব্ব পুরুষ তদ্রূপ ছিল, হয়ত উন্মাদ ছিল। এমত অবস্থায় সমাজ সে ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে দিয়াছে, তাহার বিবাহের দিনে আনন্দ উৎসব করিয়াছে, উদর পূর্ণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াছে, শুধু তাহাই নহে। তাহার সন্তান সন্ততি উৎপাদনের কোনরূপ বাধা দেয় নাই, বরং উত্তেজিত করিয়াছে। সে ব্যক্তির সন্তান ক্রোধী এবং উদ্ধত হইবেইতো। বংশানুক্রমের নিয়ম বিবৃত হইবার নহে। যে সমাজ উন্মত্তকে বিবাহ দিয়াছে, সেই উন্মত্তের উদ্ধত সন্তান নরহত্যা করিলে ঐ সমাজের আপত্তি করিবার কি দণ্ড দিবার কোন অধিকারই নাই। বালবিধবা ভ্রূণহত্যা করিতেছে। সমাজ তাহাকে প্রাণদণ্ডের অথবা নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিতেছেন। আমি বলি, এরূপ করিবার সমাজের কোন অধিকার নাই। সেই বালবিধবা হয়ত এরূপ বংশজাত এবং এরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত যে, সে ভ্রূণহত্যা না করিয়াই পারে না। এরূপ স্থলে শাস্তির উদ্দেশ্যে দণ্ড দিবার কোন অর্থই নাই। ইহাতে দুরাচার নিবৃত্ত হইতে পারে না। সমাজের শাসনকর্ত্তা বংশানুক্রমের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথাটা বিবেচনা না করিয়াই দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন। অথচ ঐ দুই এর উপরেই মানবের সকল কর্ম্ম নির্ভর করে। ইহা অতীব অসঙ্গত। সেই জর্ম্মান রমণীর কথা স্মরণ করুন। ৭৫ বৎসর মধ্যে তাহার বংশে কেবল বদমায়েস। খুনী ভ্রষ্টা ইত্যাদিই জন্মগ্রহণ করিল; কারণ সে নিজে অতীব দুশ্চরিত্রা ছিল। রাজকোষ হইতে তাহার বংশধরগণের নিমিত্ত ঐ কাল মধ্যে ৩৭,৫০,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। ইহাদিগকে সমাজ পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? যাহারা পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হয়, তেমন দাগীদিগকে পর পর বারে উত্তরোত্তর অধিক দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এরূপ করায় ফল তো হয়ই না,

*I now see a direct association between the achievements of Greece and the intensity of her internal struggles. The pax romane did not provide the Greeks spirit with an atmospenre as bracing to either bodily or spiritual devolpment, as the instability and storm which accompanied the earlier conditions.—Pearson's the scope and importance to the state of the science of National Eugenics. p. 21-22.

‡ Ibid p 37—No man is responsible for his own being and nature and nurture over which he had no control have made him the being he is good or evil—সুতরাং দণ্ডের উদ্দেশ্য শাস্তি হইতেই পারে না।

বরং আরও কুফল হয়। জীব-বিজ্ঞানের বিধান সকল যতই পরিজ্ঞাত হইতেছে, বংশানুক্রমের নিয়ম সকল যতই আলোচিত হইতেছে, ততই সমাজ সম্বন্ধে (শুধু দণ্ড বিষয়ে নহে) অনেক বিষয়ে প্রাচীন ব্যবস্থা সকল বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের, সুতরাং সমাজের প্রভুর অর্থাৎ রাজার অথবা রাজস্থানীয় ব্যক্তিগণের, এক্ষণে মহাপরীক্ষার সময় উপনীত হইয়াছে। তাঁহারা অন্যদিকে যাহাই কেন করুন না, সে সকল কিছুই নহে। তাঁহাদিগের এক মাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মই হইতেছে, দেহ ও মনে সুস্থ ব্যক্তি গঠন করা। * ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি বিধানই তাঁহাদিগের একমাত্র মুখ্য কর্ম্ম। যে সমাজ বা সমাজের প্রভু এই কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে অক্ষম, তিনি বা তাঁহারা ঐ পদের যোগ্য নহে। তাঁহারা মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রথমে নির্দ্দিষ্ট বিচারক ছিল না, † সমাজই দণ্ডবিধান করিত; পরে সমাজ যতই উন্নত হইতে [illegible]ল, ততই, দলপতি, রাজা এবং প্রাড়্‌বিবাক যথাক্রমে এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ইহার অসম্পূর্ণতার দায়ীও তাঁহারাই।

মানুষই সমাজের একমাত্র সম্পত্তি। এই সম্পত্তি গেলে আর কিছুই থাকে না। মানুষ যদি অধঃপতিত হইল, তাহা হইলে সমাজ কিছুতেই উন্নত থাকিতে পারে না। সমাজের প্রভুর অর্থাৎ রাজার প্রধান কার্য্যই যদি সমাজের হিত সাধন হয়, সমাজকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করা এবং তাহার উন্নতি বিধান করা যদি তাহার কর্ত্তব্য হয়, তবে মানুষ গড়াই রাজার প্রধান কর্ম্ম, দেহ ও মনে উন্নত মানব গঠিত করাই তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম। মানুষ বংশানুক্রম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়মিত। সুতরাং এই দিকে সুব্যবস্থা করাই রাজার একমাত্র কর্ম্ম। বংশানুক্রম বিবাহ বিধির উপর নির্ভর করে। এই নিমিত্তই বিবাহ বিষয়ক বিধি নিষেধ প্রণয়ন করা ও তাহা সমাজ কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। শিক্ষা, সংসর্গ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা; সুতরাং ইহারও উন্নতি বিধান করা তাঁহার গুরুতর কর্ম্ম। ব্যক্তির নিমিত্ত এ সকল ব্যবস্থা না করিলে সমাজের কর্ত্তব্য পালন করা হইল না। ইহা অসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

(৩) এক্ষণে আমরা তৃতীয় বিভাগে উপনীত হইয়াছি:—অতিপ্রাকৃতের সহিত মানবের সম্বন্ধ। সত্য বলিতে, অতিপ্রাকৃত কথাটাই অসঙ্গত। বাহ্য জগতে অথবা অন্তর্জগতে যাহা কিছু অনুভূত ও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, সকলই প্রকৃতি। জ্ঞাতা পুরুষ ভিন্ন আর সকলেই প্রকৃতি। ‡ যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহা তো প্রকৃতিই; যাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও অনুমান সিদ্ধ, তাহাও প্রকৃতি। কিন্তু এস্থলে অতিপ্রাকৃত শব্দ পরলোক,

† The nation as a whole shall possess sanity ; it must be sound in body and sound in mind. This is the bed rock on which alone a great nation can be built up , by aid of this sanity alone an empire once founded can be preserved—Ibid P 9.

†† এখনও অনেক অনুন্নত (?) সমাজে মজলিস করিয়া দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

* সাংখ্যদর্শন। (৩)

ধর্ম্মভাব ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করিতেছি। এ সকল মতও বিবর্ত্তনের অধীন, সুতরাং চিরাতীত কাল হইতে নানা আকারের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে অসভ্য সমাজগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহাদিগের কোন ধর্ম্মভাব নাই, তাহারাও কোন পর্ব্বত, নদী অথবা বৃক্ষের নিকটে নৃত্য করে এবং কোনরূপ বাদ্যসহ গান করিয়া থাকে। তাহারা কি নিমিত্ত ঐরূপ করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে ভালরূপ কিছুই বলিতে পারে না। তবে অনেক সময়েই পীড়া প্রভৃতি বিপৎপাতে ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকে। যাঁহারা অসভ্যগণের এই সকল নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে,উহা মানব অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কাহারও উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ এক শ্রেণীর অনুষ্ঠান। অসভ্য শ্রেণীতে আর এক শ্রেণীর অনুষ্ঠান এই দেখা যায় যে, তাহারা পীড়াদি বিপৎকালে নানাবিধ বিকৃত মুখস পরিয়া পীড়িতের ভীতি উৎপাদন করে; কখন বা তাহাকে প্রহার করে, কখন বা জলে ভিজাইয়া লয়; কখন বা নানা প্রকার বিকট স্বরে চীৎকার করিতে থাকে। আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আন্দামান দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ অসভ্য সমাজ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায় যে, প্রাথমিক সময়ে মানব আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। পরে যখন আত্মনির্ভর-পরায়ণতার হ্রাস হইতে লাগিল, তখন হতাশ মানব অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় শক্তি বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পীড়াদি বিপৎকালে, প্রথম অবস্থায় মানব স্বচেষ্টায়ই বিপদ-মুক্ত হইবে, এরূপ সাহস করিত; আর এই সাহসেই সে মুখস পরিধান, রোগীকে প্রহার ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিত। সে যেন পীড়াকে মারিয়াই তাড়াইবে, সে যেন ভয় দেখাইয়াই খেদাইবে। পীড়াকে সে যাহাই মনে করুক, পীড়িতের দেহ মধ্যে যাহাই প্রবেশ করা কল্পনা করুক, তাহাকে সে নিজেই দূর করিবে, অন্যের সাহায্য অথবা অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবে না। কিন্তু যখন এ চেষ্টায় সর্ব্বদা কৃতকার্য্য হইতে পারে না, তখন তাহার আত্মনির্ভরতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। তখন সে অধিকতর শক্তিশালী অতীন্দ্রিয় কাহারও উপর নির্ভর করিয়া শান্তি লাভ করে, এবং তজ্জন্যই বিশাল মহীরুহ অথবা প্রকাণ্ড পর্ব্বত মূলে কি জানি কাহার উদ্দেশে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই বৃক্ষ অথবা পর্ব্বত, অথবা কোন মৃত আত্মীয় স্বগণকে বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত আহ্বান করে। আত্মনির্ভরতার ভাবকে হ্যারিসন্ বলিয়াছেন "My will be done," পরনির্ভরতার ভাবকে তিনি বলিয়াছেন, "Thy will be done," এই শেষোক্ত বাক্যই ধর্ম্মভাবের শেষ কথা। অসভ্য-সমাজের ব্যবহার বিশ্লেষণ করিলে গর্ব্বিত আত্মনির্ভরতাকেই আদিভাব এবং পরনির্ভরতাকে তদনন্তর উৎপন্ন হওয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষেও কেহ আপনি পারিলে অন্যের আশ্রয় লয় না। ধর্ম্মভাব বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, অসভ্য-সমাজে তাহা ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আত্মীয়-স্বগণের প্রেতাত্মার অস্তিত্ব অতীত অসভ্য সময়েও স্বীকৃত হইত; ইহার প্রমাণ অদ্যাদি বিদ্যমান আছে। নিতান্ত অসভ্যও মৃতকে স্বপ্ন দেখিত,

সন্দেহ নাই। কুকুরাদি ইতর জীবও স্বপ্ন দেখে, সুতরাং অসভ্য মানবও দেখিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। স্বপ্নদর্শনের প্রকৃত কারণ এখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। অসভ্য তাহা কি বুঝিবে? সে নিশ্চয় মনে করিত, যাঁহাকে স্বপ্ন দেখিতেছে, তিনি কোথায়ও কোন ভাবে আছেন। সেইস্থান পরিদৃশ্যমান বায়ুমণ্ডলও হইতে পারে, অথবা অতীন্দ্রিয় পরলোকও হইতে পারে। যথায়ই হউক, তিনি ছায়াবৎ, তিনি অস্থূল, তাঁহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। ইহা সে অসভ্যাবস্থাতেও সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সে দেখিত, মানুষ চলাফেরা করিতেছে, কার্য্য কর্ম্ম করিতেছে; হঠাৎ একদিন আর করে না; নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া গেল। অসভ্যমানব শিশুর ন্যায় অনুসন্ধিৎসু। তাই সে মনে করিল, জীবিতের কি যেন ছিল, মৃতের তাহা যেন নাই, কি যেন চলিয়া গিয়াছে। উপরের লিখিত অনির্দ্দিষ্ট-সংস্কারের সহিত এই সংস্কার মিলিত হইয়া তাহাকে মৃতের অস্তিত্বে ও পরলোকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিল। বিজ্ঞানবিৎ এ সকলকে যুক্তি বলে সমর্থন করুন, কিন্তু সে যুক্তি বুঝে নাই; পরলোক ও মৃতের অস্তিত্ব সে প্রত্যক্ষের বিষয় জানিয়া বিশ্বাস করিত; তাই সে প্রিয়জনের মৃত্যু হইলে তাহার ব্যবহারোপযোগী খাদ্য অস্ত্র শস্ত্র ও দ্রব্যাদি মৃতের পার্শ্বে রাখিয়া দিত, অথবা সে সকলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। আত্মীয় স্বগণের মরণের সমকালে ঐ সকলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, উহাদিগের মধ্যস্থ রুদ্ধ আত্মা মুক্ত হইয়া মৃতের সহিত মিলিত হইতে পারে। অসভ্য-মানব সকল পদার্থেরই আত্মা থাকা বিশ্বাস করে। দার্শনিকযুগের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পৃথক কথা। কিন্তু ইহার মূল অসভ্য সমাজেই নিহিত। ডারুইনের কুকুর কাপড় নড়া দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করিত; অপরিচিত ব্যক্তি আসিলেও ঘেউ ঘেউ করিত। সে নিশ্চয়ই কাপড়কে সজীব মনে করিয়াছিল। শিশুগণ মাটীর পুতুলকে পুত্রবৎ স্নেহ করে; শাসন করে; কলার ডগাকে অশ্ব মনে করিয়া মারে ও ঘোড়দৌড় খেলে। নিজে যাহা, জগৎকে তাহাই বিবেচনা করা প্রায় সকল মানুষেরই স্বভাবসিদ্ধ। গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, তীর-ধনু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী—সকলকেই নিজের ন্যায় সজীব মনে করা অসভ্য মানবের পক্ষে অতীব স্বাভাবিক। কালক্রমে সে সজীব আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা করে। শিশু দর্পণে নিজমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার পশ্চাৎভাগে দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকা অনুমান করে, তাহার সহিত কথা কয়, নিজকেই যেন ডবল্ ভাবে। এই সকল এবং আরও নানাবিধ কারণে মানুষের মধ্যে একটা ছায়াময় আত্মার কল্পনা করা অসভ্য মানবের পক্ষেও অতীব সহজ হইয়া থাকে। মরিবার সময় উহাই চলিয়া যায়, কিন্তু দেখা যায় না, অথচ স্বপ্নে মৃতব্যক্তিকে দেখা যায়। সুতরাং সেই ছায়াময় পুরুষদৃশ্য এবং অদৃশ্য উভয় প্রকারই হইতে পারে। আত্মাকে অ-বস্তু কল্পনা করিতে কেহই পারে না, অসভ্যও না; সুসভ্যও না। তাহাকে বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্মপদার্থ-কল্পনা করা কঠিন নহে। অদৃশ্য আত্মাকে এই ভাবেই কল্পনা করা স্বাভাবিক। তিনি যখন আত্মীয় স্বগণের দেহ হইতে বাহির হইতেছেন, তখন তাঁহাকে ধরিয়া রাখাও যাইতে পারে; তিনি সূক্ষ্ম, তথাপিও বস্তু; সুতরাং ধরা যাইবে না কেন? এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ ডেল্লার দ্বীপের অসভ্যগণ

আত্মা ধরিবার ফাঁদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহারা এই ফাঁদ দ্বারা মৃতের আত্মাকে ধরিয়া রাখে। পার্শ্বে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম।* উহার গোলাকার চক্রগুলির মধ্যে আত্মা আবদ্ধ থাকে। পরলোক এবং অমর আত্মা এইরূপ প্রাথমিক সমাজ হইতে সভ্য সমাজে নানাবিধ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা ভাববিবর্ত্তনের ফল। বলিয়াছি, এমন সভ্য-সমাজ নাই, যাহাতে অসভ্য যুগের চিহ্ন সকল সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে। সে সকল ভিন্ন আকারে, ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন উদ্দেশ্যে, কোন না কোন প্রকারে সুসভ্য সমাজেও অনেক সময়েই দেখা যায়। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় চাউল গমাদি, খাটবিছানাদি, তৈজস্ বাসনাদি, বিনামা কাষ্ঠপাদুকাদি, ছত্র চামরাদি প্রদান করা সভ্য-সমাজেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃতের শেষ বিশ্রামস্থানে তাহার হস্তী অশ্ব, দাস দাসী এবং পত্নীকেও লইয়া যাইবার প্রথা ছিল; এবং মৃতের সহিত পুতিয়া অথবা পুড়িয়া ফেলিবার আভাস জগতের সাহিত্যে অদ্যাপি দুষ্প্রাপ্য নহে। এ সকলের বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকিতে পারে এবং সম্ভবতঃ আছেও; কিন্তু ইহাদিগের মূল অসভ্যসমাজের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের ও বিশ্বাসের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। ধরাতলে এখনও যে সকল অসভ্য জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের মধ্যে বীজরূপে সভ্য-সমাজের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান অনেক পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে আত্ম-নির্ভরতা ও পর-নির্ভরতার উল্লেখ করিয়াছি। মানব যখন অতি-প্রাকৃত বিষয়ে আত্ম-নির্ভরতা হইতে এক শক্তিশালী অজ্ঞাত-সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহার হৃদয়ে নম্রতা, বিনয়, ভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণের আবির্ভাব হয়। এই সকল গুণই উন্নত ধর্ম্মভাবের জীবনস্বরূপ। কালক্রমে এই সকল বৃত্তি হইতে ভগবৎ-প্রেম ও আত্মত্যাগ সঞ্জাত হয়। শক্তিমানে একান্ত নির্ভরতা, তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়ায় সম্পূর্ণ আস্থা, তাঁহার ন্যায়-বিচারে একান্ত বিশ্বাস, মানবহৃদয়ের অলঙ্কার-স্বরূপ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল বৃত্তির মূল প্রভুভক্ত পশু-পক্ষীগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না, এরূপ নহে; অন্ততঃ বীজরূপেও পাওয়া যায়।

আদিকাল হইতেই আত্মায় বিশ্বাস লক্ষিত হইতেছে। এ বিশ্বাসের সহিত শুভাশুভ কর্ম্মের যোগ থাকিবেই, জীবিত ব্যক্তি ঐরূপ কর্ম্ম করে, সুতরাং মৃতের আত্মাও ভাল মন্দ, মঙ্গলামঙ্গল উভয়বিধ কর্ম্মই করিতে পারে। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে বাক্যদ্বারা তুষ্ট করা, দ্রব্যাদি দান করতঃ তৃপ্ত করা, বিপদগ্রস্ত সমাজের নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠে। কখন বা মানব বিকট বেশভূষা করিয়া ভয়ঙ্কর মুখস্ ইত্যাদি পরিধান করিয়া, অথবা ভৈরব বিকৃতস্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ঐ আত্মাকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধির চেষ্টা করে। অবশেষে যখন পৃথক্ পৃথক্ আত্মা হইতে এক সর্ব্বব্যাপ্ত বিরাট বিশ্বাত্মার ভাব মানবহৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখনও উপরের লিখিত দ্বিবিধ উপায়ে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় না। চৈত পূজার গাজন সময়ে সন্ন্যাসীদিগের ভয়াল মূর্ত্তি ও বিকট মন্ত্রোচ্চারণ, আর লোমহর্ষণ বোয়ার-যুদ্ধ সময়ে প্রেমাবতার যীশুর নিকট গির্জ্জায় গির্জ্জায় নরহত্যা কর্ম্মের

* ব্রিটিশ মিউজিয়মের এথনোগ্রাফিকেল হ্যাণ্ডবুক হইতে গৃহীত।

সহায়তা প্রার্থনা, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে যষ্টি পুঁতিয়া তাহার অগ্রভাগে চূর্ণলিপ্ত কাল হাঁড়ী স্থাপন করা এবং স্নেহময় পুত্রের পীড়িত কালে বটুক ভৈরবের স্তব পাঠ—এ সকল মূলে এক প্রকার ভাব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন অন্য প্রকারে এ সকলের উপকারিতা উপলব্ধ হয়, তখন ইহার বিবিধ ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এ সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নহে, মানব মন এই সকলকে আশ্রয় করিয়াই উন্নত হইয়াছে এবং আরও হইবে। এই সকল ভিত্তির উপরই নিষ্কল, নিরঞ্জন, অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় পুরুষ মানব মনে আপন সিংহাসন রচনা করিয়াছেন।

শ্রীশশধর রায়।

১০০

অর্থশাস্ত্র।

বিংশ অধ্যায়।

(দেশকালমান)

মানাধ্যক্ষ স্থান ও সময় নিরূপণের পদ্ধতি জ্ঞাত থাকিবেন।

৮ পরমাণু = ১ রথচক্র বিপ্রুট (অর্থাৎ রথচক্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অণু)

৮ রথচক্র বিপ্রুট = ১ লিক্ষা।

৮ লিক্ষা = ১ উকুনের মধ্য (অথবা মধ্যম আকারের ১ উকুন)

৮ উকুন (যুকা) = ১ যব।

৮ যবে = অঙ্গুলি (অথবা মধ্যমাকার মনুষ্যের মধ্যে অঙ্গুলির মধ্যস্থ সন্ধি)

৪ অঙ্গুলি = ১ ধনুগ্রহ; ৮ অঙ্গুলি = ধনুর্মুষ্টি; ১২ অঙ্গুলি = ১ বিতস্তি; ১৪ অঙ্গুলি = ১ শাম, শল, পরিচয় বা পদ। ২ বিতস্তি = আরত্নি বা ২ প্রাজা পত্যহস্ত। ২ বিতস্তি + ১ ধনুগ্রহ = ১ হস্ত; ২ বিতস্তি + ১ ধনুর্মুষ্টি = কিষ্কু বা কংশ; ৪২ অঙ্গুলি = করাতি ও কর্ম্মকারকের ১ কিষ্কু (ইহা সৈন্যাবাস, দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ৫৪ অঙ্গুলি = ১ হস্ত (বন পরিমাপে ব্যবহৃত) ৮৪ অঙ্গুলি = ১ ব্যাম। (ইহা রজ্জু ও খননে গভীরতা পরিমাণে ব্যবহৃত) ৪ অরত্নি = ১ দণ্ড, বা ১ ধনু, বা ১ নালিকা এবং ১ পৌরুষ (মনুষ্যের ছায়া)। ১০৮ অঙ্গুলিতে = গার্হপত্য ধনু (সূত্রধরের ব্যবহৃত পরিমাপ; ইহা রাজপথ ও দুর্গ প্রাচীর পরিমাপে ব্যবহৃত হইত। ১০৮ অঙ্গুলি = ১ পৌরুষ (ইহা বেদী নির্ম্মাণে ব্যবহৃত)। ৬ কংশ = ১ দণ্ড (ব্রাহ্মণ-

* মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত 'অর্থশাস্ত্র' প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রবাসীর সমালোচক মহাশয় সমালোচনা করিয়াছেন। আমি সমালোচকের গুরুতর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে আসি নাই; সে ধৃষ্টতা আমার নাই। আমার প্রবন্ধের সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলিতে আসিয়াছি।

প্রথম প্রবাসী-সমালোচক অর্থশাস্ত্র ও অর্থনীতি এক ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। সকলেই জানেন (অন্ততঃ আমার এই ধারণা ছিল) যে, এক্ষেত্রে প্রথমটী Political Philosophy অর্থাৎ চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র বা Science or Politicsর অনুবাদ; দ্বিতীয়টী Political Economy. কিন্তু সমালোচক মহাশয় জানিয়া শুনিয়াই (বোধ হয় মন্তব্য প্রকাশের জন্যই) এরূপ কেন করিলেন, বুঝিলাম না।

দিগকে দত্ত ভূমি পরিমাপে ব্যবহৃত)। ১০ দণ্ড = ১ রজ্জু। ২ রজ্জু = ১ পরিদেশ। ৩ রজ্জু = ১ নিবর্ত্তন। ৩ রজ্জু + ২ দণ্ড = ১ বাহু। ১০০০ ধনু = ১ গোরুত (গোরুর ডাক)। ৪ গোরুত = ১ যোজন। এই প্রকারে 'দেশ মান' ব্যাখ্যাত হয়। এইক্ষণ "কালমানের" কথা বিবৃত হইতেছে।

সময় ত্রুটী, লব, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, নালিকা, মুহূর্ত্ত, পূর্ব্বাপরভাগ (পূর্ব্বাহ্ন) দিবস, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর এবং যুগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ২ ত্রুটী = ১ লব। ২ লব = ১ নিমেষ। ৫ নিমেষ = ১ কাষ্ঠ। ৩০ কাষ্ঠে = ১ কলা। ৪০ কলা = ১ নালিক (যে সময়ের মধ্যে এক আঢক জল ৪ অঙ্গুলি লম্বা ও মাসা সুবর্ণ নির্ম্মিত ছিদ্র দ্বারা বাহির হয়।) ২ নালিক = ১ মুহূর্ত্ত। ১৫ = ১দিন বা ১ রাত্রি। এই প্রকার দিন ও রাত্রি চৈত্র ও আশ্বযুজে ঘটে। ছয় মাস পর তিন মুহূর্ত্তের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যখন ছায়া ৮ পৌরুষ দীর্ঘ হয়। তখন দিবসে $\frac{১}{১৮}$ অতিবাহিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৬ পৌরুষ দৈর্ঘ হইলে $\frac{১}{১৪}$, ৪ পৌরুষে $\frac{১}{৮}$, ২ পৌরুষে $\frac{১}{৬}$, ১ পৌরুষে $\frac{১}{৪}$ অতিবাহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ৮ অঙ্গুলি হইলে $\frac{৩}{১০}$, ৪ অঙ্গুলিতে $\frac{৩}{৮}$ অংশ এবং মধ্যাহ্নকালে ছায়া দৃষ্ট হইবে না। দিবা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে

দ্বিতীয়তঃ সমালোচক লিখিয়াছেন যে, "উহা কেবলই বিদেশী অবস্থার উপর দেশী খোলস চড়ানো না হয়ে সে বিষয়ের দৃষ্টি ও দেশী অবস্থার পর্য্যবেক্ষণের শ্রম স্বীকার আবশ্যক।" লিখিতে বাধ্য হইলাম যে, নব্যভারতে প্রকাশিত অর্থশাস্ত্র খাঁটী স্বদেশী। উহা (আমার ভাষার কথাটী বাদ দিলে) সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয়—উহাতে বিদেশীর বাতাসও লাগে নাই। চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রে কি প্রকারে বিদেশী খোলস চড়াইয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রবাসী-সম্পাদক পূজ্যপাদ রামানন্দ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাও ইহার সহিত পাঠাইলাম। দয়া প্রকাশে ছাপাইলে বাধিত হইব।

"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় ভক্তিভাজনেষু।

মাঘ ও ফাল্গুনের নব্যভারতে প্রকাশিত 'অর্থশাস্ত্র' প্রবন্ধের সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিতে চাই। দয়া প্রকাশে বলিতে দিলে বাধিত হইব।

প্রথমে, এক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র অর্থনীতি নয়—এ কথা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। প্রথমটী Political Philosophy, দ্বিতীয়টী Political Economy. উভয়ের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্টতা থাকিলেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।

দ্বিতীয়তঃ, আপনার সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে "উহা, বিদেশী অবস্থার দেশী খোলস চড়ানো হয়েছে।" উহার অর্থ সমালোচক মহাশয় দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন কি? সমালোচক মহাশয় যদি দয়া প্রকাশে পড়িয়া দেখিতেন, তবে সহজেই দেখিতে পাইতেন যে, উহা সম্পূর্ণ স্বদেশী—অর্থাৎ উহা আমাদেরই দেশীয় চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের অনুবাদ। উহাতে বিদেশীর কোন সংস্রব নাই। সমালোচক মহাশয়ের এ ভুল হইবার কারণ দেখি না। কেবল মাত্র কারণ এই যে, আমি (আমার উপাধিটার বিকটত্বের ন্যায়) অনেকটা উপহাসের ন্যায় হইয়া পড়িতেছি।

তৃতীয়তঃ, সমালোচক মহাশয় আমার প্রবন্ধগুলি অনুবাদ বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চন করিয়াছেন। আমি তাহাতে দুঃখিত নই। কেন না, আমি তাঁহার ন্যায় original নই। তবে এ কথা বলিলে বোধ হয় দোষের হইবে না যে, বঙ্গভাষা ১০।২০ বৎসর ধরিয়া অনুবাদ করিলেও তাহার শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছুই হইবে না। শুনিয়াছি, জাপানে ২।৪ শত বৎসর অপর দেশীয় নাটক নভেলই অনুবাদ হইতেছে—অন্য বইর ত কথাই নাই।

চতুর্থতঃ, অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ইংরাজি বইর অবলম্বনে লিখিত হইলেও, উহা অনুবাদ রূপে,

পূর্ব্বোক্ত ভাবে ঘটে। আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্নে কোন ছায়া দৃষ্ট হয় না। আষাঢ়ের পরে, শ্রাবণ হইতে ছয়মাস ধরিয়া ছায়া ২ অঙ্গুলি করিয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং মাঘমাস হইতে ক্রমে ক্রমে দুই অঙ্গুলি করিয়া হ্রাস হয়।

পনর দিবারাত্রিতে একপক্ষ হয়। যে পক্ষে চন্দ্র বৃদ্ধি পায়, উহাকে শুক্ল এবং যে পক্ষে হ্রাস হয়, উহাকে বহুল পক্ষ বলে। ২ পক্ষে একমাস হয়। ৩০ দিন ও রাত্রিতে একমাস হয়। ৩০ দিন রাত্রি ও অর্দ্ধ দিবসে সৌর মাস হয়। ৩০ দিন রাত্রি হইতে অর্দ্ধ দিবস কম হইলে চান্দ্রমাস বলে। ২৭ দিবা রাত্রকে নক্ষত্র মাস বলে। ৩২ দিনে মাস হইলে উহাকে মলমাস বলে। ৩৫ দিনে অশ্বারোহীগণের, ৪০ দিনে হস্তিচালকগণের মাস হয়। ২ মাসে এক ঋতু হয়। শ্রাবণ ও প্রৌষ্ঠপদ মাস বর্ষাকাল বলিয়া পরিগণিত হয়। আশ্বযুজ এবং কার্ত্তিক মাস শরৎ, মার্গশীর্ষ এবং পৌষ হেমন্ত, ও মাঘ ও ফাল্গুন শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস গ্রীষ্ম ঋতু। 'শিশির' হইতে উত্তরায়ন এবং বর্ষ হইতে দক্ষিণায়ন হয়। ২ অয়নে এক সম্বৎসর এবং পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়। সূর্য্য প্রত্যহ দিবসের $\frac{1}{60}$-অংশ হরণ করে এবং এই প্রকারে ২ মাস একদিন পূর্ণ করে। চন্দ্রের এই প্রকারে $\frac{1}{60}$ অংশ ছেদ হয় এবং এই হেতু ২ মাসে এক দিন কম হয়। সুতরাং প্রতি তিন বৎসরের মধ্যভাগে সূর্য্য ও চন্দ্র ১ অধিমাস (গ্রীষ্মে প্রথমে এবং পাঁচবৎসরের শেষে দ্বিতীয় বার) পূর্ণ করে।

এবং সাধ্যমত উহাতে দেশী অবস্থারও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া সমালোচকের কর্ত্তব্য, কিন্তু সমালোচকের ভ্রম দেখাইবেন কে?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রবাসী নূতন মাসিক সমালোচকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। সমালোচনা (বিশেষতঃ সাধারণতঃ আমাদের দেশে যেরূপ সমালোচনা হয়) ভাল করিয়া করাই উচিত বোধ করি। প্রবাসীর পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে, কোন সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার সুপরিচিত সমালোচকের সমালোচনায় ত্যক্ত হইয়া প্রবাসীকে বৃদ্ধের স্কন্ধে সিঁড়ি লাগাইয়া ক্ষুদ্র বালকের দ্বারা ঐ বৃদ্ধের কর্ণ মর্দ্দনের ছবি প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।"

যোগীন্দ্র বাবু "প্রবাসী সম্পাদক" সম্বন্ধে কোন কথা না লিখিলেই সুখী হইতাম। প্রথম অবস্থায় তিনি প্রতি মাসে নিজ পত্রিকার সমালোচনা করিয়া অন্যান্য সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাইতেন। সব কাগজে প্রবাসীর একরূপ সমালোচনা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম। "সময়" যখন তাঁহার এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন, তখন তিনি কৈফিয়তে লিখিলেন, বিলাতেও এরূপ হয়। এই কৈফিয়তে কেহ ভুলিল না দেখিয়া, এ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কলন-পন্থা অবলম্বন করিলেন। প্রবাসীর বিপুল কলেবর সঙ্কলিত বিষয়ের শোভায়, ছবি ও গল্পে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কৃতকার্য্যতার গৌরবে তাঁহার অতুল প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। এখন তিনি দেখিতেছেন, অন্যকে খর্ব্ব করিতে না পারিলে তাঁহার এ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিনা সন্দেহ, কেন না, "ভারতী" ও "সাহিত্য"ও, গল্প ছাড়া, ছবি দিতেছেন। বিপুল কলেবর সম্বন্ধে হিন্দুরঞ্জিকা এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন, "গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকারও ত বিপুল কলেবর, তাহাতে কি আসিয়া যায়? বালক চারুচন্দ্রের দ্বারা আর বেশী কি হইবে?" এই সব দেখিয়া তিনি, "সাহিত্যে"র ন্যায়, মাসিক-সাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাহিত্য-সম্পাদক মহা সাহসী, নিজ নামেই সমালোচনা করেন। প্রবাসীর সমালোচনার ভার বালকের উপর অর্পিত, তাই ভয়ে ভয়ে "গয়েবুল্লার" পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন! অন্যের নিন্দা প্রচার অপেক্ষা প্রতিপত্তি লাভের দ্বিতীয় পন্থা আছে কি? "কবির লড়াই" যে কারণে এদেশে এক সময়ে আদৃত হইয়াছিল, সাহিত্যের নিন্দা প্রচারও,

একবিংশ অধ্যায়।

শুল্কাধ্যক্ষ।

শুল্কাধ্যক্ষ নগরের সিংহদ্বারের নিকটে উত্তর বা দক্ষিণমুখী করিয়া শুল্কগৃহ এবং শুল্কশালাধ্বজ স্থাপন করিবেন। যখন বণিকগণ পণ্যসহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইবেন, তখন ৪।৫ জন শুল্ক আদায়কারী নিম্নলিখিত বিষয় গুলি লিপিবদ্ধ করিবে, যথা—"বণিকগণকে, কোন স্থান হইতে তাহারা আগমন করিল, কতখানি পণ্য তাহারা আনয়ন করিয়াছে এবং প্রথম কোন স্থানে তাহাদের পণ্যের উপর অভিজ্ঞান মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের পণ্যে মুদ্রা দেওয়া হয় নাই, তাহারা দ্বিগুণ শুল্ক প্রদান করিবে। কূট মুদ্রা ব্যবহার করিলে অষ্টগুণ শুল্ক প্রদান করিবে। যদি মুদ্রা নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে বণিকগণকে ঘটিকাস্থানে যাইতে বাধ্য করা হইবে। যখন একপ্রকার মুদ্রার পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার মুদ্রা ব্যবহার করা হইবে, অথবা একপ্রকার পণ্যের পরিবর্ত্তে অন্য নাম দেওয়া হইয়া থাকে, তখন প্রত্যেক বোঝায় ১¼ পণ দণ্ড দিতে হইবে। শুল্কধ্বজার নিকট পণ্যদ্রব্য স্থাপন করিয়া, বণিকগণ পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য জ্ঞাপন করিয়া তিনবার ঘোষণা করিবে "কে এই মূল্যে এই পণ্য ক্রয় করিবে" এবং যাহারা উহা ক্রয়ে অভিলাষী হইবে, তাহাদের উহা বিক্রয় করিবে। যখন ক্রেতা অধিক মূল্যে উহা ক্রয় করিবে, তখন শুল্ক ও এই মূল্য (প্রার্থিত মূল্যাপেক্ষা অধিক) রাজকোষে প্রদান করিতে হইবে। যখন অধিক শুল্ক দিবার ভয়ে পণ্যের পরিমাণ বা মূল্য কম করা হয়, তখন বাহুল্য অংশ রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইবে, অথবা বণিক নির্দ্ধারিত শুল্কের ৮ গুণ শুল্ক প্রদান করিবে। যখন থলিমধ্যস্থিত পণ্যের মূল্য নিকৃষ্ট নমুনা দেখাইয়া, অথবা যখন মূল্যবান পণ্য স্বল্পমূল্যের পণ্য দ্বারা ঢাকিয়া মূল্য কম দেখান হইবে, তখনও ঐ শাস্তি হইবে।

যখন ক্রেতার ভয়ে কোন পণ্যের মূল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পায়, তখন এই বাহুল্য মূল্য অথবা দ্বিগুণ শুল্ক রাজা গ্রহণ করিবেন। যদি শুল্কাধ্যক্ষ পণ্য গোপন করেন, তবে তাঁহারও ঐরূপ দণ্ড বা আটগুণ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। এইজন্য সুনিশ্চিতরূপে পণ্যের ওজন, পরিমাণ ও সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া পরে উহা বিক্রয় করিতে হইবে।

নিকৃষ্ট পণ্য বা যাহা বিনাশুল্কে বিক্রয়

সেই কারণে, আদৃত হইতে পারে, এইজন্যই বুঝি বা তিনিও এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা" বা "নিজ চক্ষের কুটা ফেলা"র নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার অতি সাধের "গয়েবুল্লার" শাণিত "কায়েন্সির কাঁচি"খানি যদি "প্রবাসীর" প্রবন্ধ সকলের প্রতি চালনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত, তিনি নিরপেক্ষতার সীমা অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু নিজ-প্রশংসা-লোলুপের নিকট তাহা আশা করাও ভুল। তাঁহার এখন সময় ভাল, তাঁহার প্রতিপত্তিতে দেশ ডগমগ করিতেছে, তিনি ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন কোন পুস্তক ছাপাইয়া বিধবাদের এবং যামারণ ছাপাইয়া কাল্পনিক ছবি-সৌষ্ঠবে যোগীন্দ্রনাথ বসুর অন্নের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া এখন ধন-গৌরবে প্রমত্ত। অকাল-পক্কতা, কেবল তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রুতে নয়, সর্ব্বাঙ্গে স্থান পাইয়াছে, তাই তিনি বালকের দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধ ভক্ত নগেন্দ্র বাবুকে গালাগালি দিয়াছেন, এবং পুরাতন ও নূতন পত্রিকা সকলের প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি ঐতিহাসিক "বেদী" ভাঙ্গার সহায়তা করিয়া এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট "চাঁই" হইয়াছেন। যে দুষ্ট পুত্র পিতার কাণ মলিতে চায়, সে ধৃষ্ট ধুরন্ধর সম্বন্ধে কিছু লিখিবার সময় যোগীন্দ্রনাথের একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। ন, স,।

করিতে দিতে হইবে, উহাদের শুল্ক বিশেষ বিবেচনার সহিত নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। যে সকল বণিক শুল্ক না দিয়া শুল্কশালা অতিক্রম করে, তাহাদের দেয় শুল্কের আট গুণ দণ্ড হইবে। যাহারা নগরে গমনাগমন করে, তাহারা কোন পণ্যের শুল্ক দেওয়া হইয়াছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবে।

বিবাহের জন্য, অন্বায়ন (পিতৃগৃহ হইতে স্বামীগৃহে যাইবার জন্য স্ত্রীর পণ্য), বা যাহা উপহারার্থ লওয়া হইতেছে, যাহা যজ্ঞের জন্য, প্রসর, দেবপূজা, চূড়া, উপনয়ন, গোদান, ব্রত, দীক্ষা এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য পণ্য বিনা শুল্কে লওয়া যাইবে। যাহারা শুল্ক সম্বন্ধে মিথ্যাকথা বলিবে, তাহাদের চোরের ন্যায় শাস্তি হইবে। বিনা শুল্কে যাহারা পণ্য গোপনে প্রেরণ করিবে, অথবা যাহারা মুদ্রা দেওয়া শুল্কের সহিত অপর পণ্য প্রেরণ করিবে, তাহাদের গোপনে প্রেরিত পণ্যের মূল্যের সমান দণ্ড হইবে।

যে মিথ্যা পূর্ব্বক গোময় স্পর্শ করিয়া পণ্য গোপনে প্রেরণ করিবে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড হইবে। যখন কোন ব্যক্তি নিষিদ্ধ পণ্য, যথা শস্ত্র, বর্ম্ম, কবচ, লোহ, রথ, রত্ন, ধান্য, পশু আমদানা করিবে, তাহার অন্যত্র বর্ণিত শাস্তি ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্যে সত্বচ্যুতি হইবে।

অন্তপাল পণ্যের প্রত্যেক বোঝা প্রতি ১¼পণ-বর্ত্তনী (রোডসেস) পাইবে। এক ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুর উপর একপণ, অন্যান্য পশুর উপর অর্দ্ধপণ এবং ক্ষুদ্রপশুর উপর ¼পণ এবং মাথায় করিয়া বহা বোঝা প্রতি এক মাশা শুল্ক আদায় করিবেন। তাঁহার অধিকারস্থ স্থানে বণিকগণের কিছু ক্ষতি হইলে, তিনিই তাহা পূরণ করিবেন। বৈদেশিক পণ্য বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া এবং নিজ মুদ্রা ঐ পণ্যে স্থাপন করিয়া তিনি উহা শুল্কাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। অথবা তিনি, কোন গুপ্ত চরকে বণিকের বেশে পণ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ সহ রাজার নিকট প্রেরণ করিবেন। রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ঐ সংবাদ শুল্কাধ্যক্ষকে প্রেরণ করিবেন। শুল্কাধ্যক্ষ সকল বণিককে বলিবেন যে, এই দুই বণিক এই এই প্রকারের পণ্য আনয়ন করিয়াছে এবং ইহা গোপন করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কেননা সর্ব্বজ্ঞ রাজা এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

নিকৃষ্টপণ্য গোপন করিলে শুল্কের আট গুণ দণ্ড হইবে এবং উৎকৃষ্ট পণ্য গোপন করিলে ঐ পণ্য রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। যাহা অনিষ্টকারক বা অনাবশ্যক, তাহা প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না এবং যাহা উপকারী এবং যে সকল বীজ সহজ-লভ্য নহে, তাহা বিনাশুল্কে আনিতে দেওয়া হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শুল্কব্যবহার।

বাহ্যিক (প্রদেশজাত) ও আভ্যন্তরিক (দুর্গমধ্যে প্রস্তুত) পণ্য অথবা বৈদেশিক পণ্য আমদানী এবং রপ্তানি, উভয় সময়েই শুল্ক দিতে হইবে। আমদানী পণ্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। পুষ্প, ফল, শাক, মূল, কন্দ, পল্লিক, বীজ, শুষ্কমৎস্য ও মাংসে অধ্যক্ষ ⅙ শুল্করূপে গ্রহণ করিবেন। শঙ্খ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে সময়, ব্যয় এবং বেতন প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তি শুল্ক নির্দ্ধারণ করিবেন। ক্ষৌম, দুকুল, ক্রিমিতান (রেশম), কঙ্কট, হরিতাল, মনশিলা, হিঙ্গুল, লৌহ, বর্ণধাতু, চন্দন, অগরু, কটুক,

কিম্ব (উচ্ছলন) আবরণ, মস্ত, হস্তিদন্ত, অজিন, ক্ষৌম, আস্তরণ, প্রাচরণ, ক্রিমিজাতদ্রব্য, মেষজাতপশম ও অন্যান্য দ্রব্যে শুল্কাধ্যক্ষ $\frac{১}{১০}$ হইতে $\frac{১}{১৫}$ শুল্করূপে গ্রহণ করিবেন।

বস্ত্র, চতুষ্পদ, দ্বিপদ, সূত্র, কার্পাস, গন্ধ, ঔষধ, বেণু, বল্কল, চর্ম্ম, মৃৎপাত্র, শস্য, তৈল, ক্ষার, লবণ, মস্ত, পক্কান্নে তিনি $\frac{১}{২০}$ হইতে $\frac{১}{২৫}$ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। দ্বারদেশে গৃহীত শুল্ক অন্য শুল্কের অপেক্ষা এক পঞ্চমাংশ কম হইবে। যেস্থানে পণ্য উৎপাদিত বা প্রস্তুত হইবে, তথায় কোন কারণেই ঐ পণ্য বিক্রয় করা বিধেয় নহে। যখন খনিজ এবং অন্যান্য পণ্য আকর হইতে ক্রয় করা হয়, তখন ৬০০ শত পণ অর্থদণ্ড হইবে। যখন পুষ্প ও ফল উদ্যান হইতে ক্রয় করা হইবে, তখন ৫৪পণ অর্থদণ্ড হইবে। যখন শাক, মূল, কন্দ, উদ্যান হইতে ক্রয় করা হইবে,তখন ৫১$\frac{৩}{৪}$ পণ অর্থদণ্ড হইবে। যখন ক্ষেত্র হইতে কোন প্রকার ঘাস খরিদ করা হইবে, তখন ৫৩ পণ অর্থদণ্ড হইবে। সীতাত্যয় (কৃষিজাতদ্রব্যে) এক ও অর্দ্ধপণ স্থায়ীদণ্ড আদায় করিতে হইবে।

এইজন্য দেশ বা জাতির নিয়মানুসারে পণ্যের শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ড নির্দ্ধারিত হইবে।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

সূনাধ্যক্ষ।

(কসাইখানা)

যখন কোন ব্যক্তি অভয়ারণ্যে স্থিত মৃগ পশু পক্ষী মৎস্য (ফাঁদে) ধরিবে, বা হত্যা করিবে,অথবা উৎপীড়ন করিবে,তখন তাহার উত্তম প্রকারের দণ্ড হইবে। ঐ প্রকার অরণ্যে গৃহস্থগণ প্রবেশ করিলে তাহাদের দ্বিতীয় প্রকার অর্থদণ্ড হইবে। যখন কোন ব্যক্তি অহিংসাকারী মৎস্য বা পক্ষী বন্ধন, বধ বা উৎপীড়ন করিবে, তখন তাহার ২৭$\frac{৩}{৪}$ পণ অর্থদণ্ড হইবে এবং যখন ঐ ব্যক্তি মৃগ এবং অন্যান্য পশুর প্রতি ঐরূপ আচরণ করিবে, তখন দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ধৃত হিংসুক পক্ষীর ষষ্ঠাংশ অধ্যক্ষ গ্রহণ করিবে; তদ্রূপ মৎস্য ও পক্ষীর দশমাংশ বা দশমাংশের অধিক গ্রহণ করিবে; ধৃত মৃগ বা পশুর দশমাংশ বা দশমাংশের অধিক গ্রহণ করিবে। অভয়ারণ্যে জীবিত পশু ও পক্ষীর ষষ্ঠাংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। হস্তী, অশ্ব অথবা মনুষ্যাকারী জন্তু, ষণ্ড, গর্দ্দভ এবং সমুদ্র, নদী, হ্রদ এবং খালস্থ মৎস্য ধৃত করিবে না। ক্রৌঞ্চ, উৎক্রোশক, দাত্যুহ, হংস, চক্রবাক, জীবনঞ্জীবক, ভৃঙ্গরাজ, চকোর, মত্তকোকিল, ময়ূর, শুক, ময়না এবং অন্যান্য মঙ্গলসূচক পক্ষী বা পশু সকলপ্রকার নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিতে হইবে। যাহারা উপরোক্ত নিষেধ প্রতিপালন না করিবে, তাহাদের প্রথম প্রকারের শাস্তি হইবে। সদ্যহত এবং অস্থিশূন্য মাংস বিক্রয় করিতে হইবে। অস্থিশূন্য মাংস বিক্রয় করিলে ক্ষতি-পূরণ দিবে। ওজনে কম দিলে অষ্টগুণ অধিক দিবে। গোবৎস, বৃষ বা ধেনু বধ করিবে না। যাহারা উহাদের বধ করিবে বা নির্য্যাতন করিবে, তাহাদের ৫০ পণ অর্থ দণ্ড হইবে। যে সকল পশু কসাইখানার বহির্ভাগে নিহত করা হইয়াছে, মস্তক বা পদশূন্য পশু, অস্থিশূন্য মাংস, পচামাংস এবং যে জন্তু অকস্মাৎ মৃত হইয়াছে,ইহাদের মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ। অন্যথা দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। পশু,বন্যজন্তু, হস্তী এবং মৎস্য যাহারা অভয়ারণ্যে বাস করে, তাহারা দুষ্ট হইলে তাহাদের অন্যত্র বন্ধ বা হত্যা করিতে হইবে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

গোহধ্যক্ষ।

গোহধ্যক্ষ 'বেতনোপগ্রাহিক', 'কর-প্রতিকর', 'ভগ্নোৎসৃষ্টক', 'ভাগানুপ্রবিষ্টক', 'ব্রজপর্য্যগ্র', 'নষ্ট', 'বিনষ্ট', এবং সংগৃহীত দুগ্ধ ও ঘৃতের তত্ত্বাবধান করিবেন। যখন কোন গোপালক, মহিষপালক, দোহক, মন্থনকারক এবং লুব্ধক বেতনভুক হইয়া শত শত ধেনু চরায়, (অন্যথা দুগ্ধ ও ঘৃতের লোভে তাহারা বৎসকে বিশেষ পীড়ন করিবে) তখন ঐ প্রথাকে বেতনোপগ্রাহিক বলে। যখন কোন এক ব্যক্তি প্রত্যেক প্রকারের সমসংখ্যক জরদ্গব (বৃদ্ধ) ধেনু, গর্ভিনী, বন্ধ্যা, বৎসতরী প্রতিপালন করে এবং নির্দ্ধারিত পরিমাণে ঘৃত এবং মৃতগাভীর চর্ম্মাদি সরবরাহ করে, তখন উহাকে 'করপ্রতিকর' বলে। যাহারা সমপরিমাণ শত শত ব্যাধি, পঙ্গু, যে সকল ধেনু অন্যের দ্বারা দোহন করা যায় না, যাহাদের সহজে দোহন করা যায় না এবং যে সকল পশু নিজ সন্তান নষ্ট করে, এই প্রকারের পশু যাহারা প্রতিপালন করিয়া মালিককে গব্যাগারে উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ দান করে, তাহাকে ভগ্নোৎসৃষ্টক বলে। যখন পশ্বাদি চুরি হইবার ভয়ে উহাদিগকে অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং ঐজন্য তাঁহাকে উৎপাদিত দ্রব্যের একদশমাংশ দেওয়া হয়, তখন উহাকে 'ভাগানুপ্রবিষ্টক' বলে। যখন অধ্যক্ষ নিম্নলিখিত শ্রেণীবদ্ধ করেন (যথা বৎস, বৎসতরা, দম্য) যাহাদের দমন রাখা যায়), বহিনী (ভারবাহী), বৃষ (যুগবাহন, শকটবহা) মহিষ, বাৎসকা (বকন বাছুর), বৎসতরী, বন্ধ্যা, গর্ভিনী, ধেনু, বন্ধ্যা, একমাস কি দুইমাস বয়স্ক বা তাহারও কম বয়স্ক বৎস ও বৎসিকা, এবং যে সকল পশু ২।১ মাস কেহই দাবী করে নাই, এবং যখন অঙ্ক, চিহ্ন, বর্ণ, শৃঙ্গ, এবং অন্যান্য লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিবেন, তখন উহাকে ব্রজপর্য্যগ্র বলে। যখন কোন পশু চুরি করে, অথবা অপর পশু সহিত মিশিয়া যায়, তখন উহাকে নষ্ট বলে। যখন কোন পশু বিষমপঙ্কে পতিত হয়, অথবা জরাগ্রস্ত হইয়া বা বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা জলমগ্ন হয়, অথবা যখন উহার বৃক্ষপতনে বা নদীতটে মৃত্যু হয়, অথবা যখন কাষ্ঠ বা শিলাঘাতে, বা বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়, অথবা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, বা সর্পাঘাত বা কুম্ভীরের হস্তে পতিত হয়, অথবা বাড়বাগ্নিতে বিপন্ন হয়, তখন উহাকে বিনষ্ট বলে। পশুপালকগণ পশুদিগকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

যখন কোন ব্যক্তি রাজচিহ্নিত কোন পশুর অঙ্গে নিজ চিহ্ন অঙ্কিত করে, তখন উহাকে প্রথম প্রকারের দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। যখন কোন ব্যক্তি চোরের নিকট হইতে স্থানীয় পশু উদ্ধার করে, তখন উহাকে পুরস্কার প্রদান করিতে হইবে এবং যখন কোন ব্যক্তি বৈদেশিক পশু উদ্ধার করে, তখন তাহাকে পশুর অর্দ্ধেক মূল্য প্রদান করিতে হইবে। পশুপালকগণ বাল-বৃদ্ধ পশুগণকে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নির্দ্ধারিত বনে উহারা পশুচারণ করিবে। ঐ সকল বন হইতে শীকারী ও তাহাদের কুকুরগণ, চোর, ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য হিংস্রক পশু সকলকে দূর করিবে। সর্প ও ব্যাঘ্রকে ভীতি প্রদর্শনার্থ এবং তাহাদের সঠিক স্থান নির্দ্দেশ জন্য উহাদের গলদেশে ঘণ্টা দিতে হইবে। যে সকল নদী বা হ্রদ সকলস্থানেই সমপরিমাণ গভীর এবং প্রশস্ত এবং যথাক্র

কর্দ্দম বা কুম্ভীর নাই, গোপালকগণ তথায় পশুদের যাইতে দিবে এবং তাহাদের রক্ষা করিবে। চারণকালে বর্ণানুযায়ী পশুদিগকে শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। গোপালকগণের রক্ষণের শক্তি অনুযায়ী এবং পশুগণের অধিক দূরে যাইবার ক্ষমতা বুঝিয়া পালকগণ নিকটে থাকিবে বা অধিক দূরে যাইবে। প্রতি-ছয়মাস অন্তর মেষ ও অন্যান্য জন্তুর লোম ছাঁটিতে হইবে। উপরোক্ত নিয়ম অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, এবং বরাহের প্রতিও খাটিবে।

যখন চোর, ব্যাঘ্র, সর্প বা কুমীরের হস্তে কোন পশু পতিত হইবে, অথবা ব্যাধি বা জরাগ্রস্ত হইবে, তখন গোপালকগণ ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করবে। অন্যথায় তাহাদের ক্ষতি-পূরণ দিতে হইবে। যখন কোন পশু মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, পশুপালকগণ গো বা মাহষ হইলে উহার মর্ম্ম অধ্যক্ষকে প্রদান করিবে। মেষ বা ভেড়া হইলে চর্ম্ম ও কর্ণলক্ষণ, গর্দ্দভ বা উষ্ট্র হইলে লেজ ও চর্ম্ম, যদি অল্পবয়স্ক হয়, তবে কেবল মাত্র চর্ম্ম প্রদান করিবে। তদ্ব্যতীত বস্তি (মেদ) পিত্ত, স্নায়ু, দন্ত, ক্ষুর, শৃঙ্গ এবং অস্থিও অধ্যক্ষকে দিবে। সদ্য বা শুষ্ক মাংস গোপালকগণ বিক্রয় করিতে পারিবে। বরাহ ও কুকুরকে তাহারা প্রদান করিবে। এবং পিত্তল পাত্রে নিজেদের আহারের জন্য কিছু রক্ষা করিবে। নিজে-দের জন্য ঘনীভূত দুগ্ধ বা পনীরও কিছু রক্ষা করিবে।

গাভী বিক্রয় করিলে রাজকোষে গাভীর মূল্যের একচতুর্থাংশ প্রদান করিতে হইবে।

বর্ষা, শরৎ, এবং হেমন্তকালে গোপালক-গণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দোহন করিবে। শীত-ঋতুর শেষ ভাগে এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কেবলমাত্র প্রাতে দোহন করিবে। শেষোক্ত কয় ঋতু যে গোপালক দুইবার দোহন করিবে, তাহার অঙ্গুষ্ঠ ছেদন হইবে। যদি দোহন-কাল অতিক্রম করে, তবে সে লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। বৃষের নাসায় সময়ানুযায়ী সূত্র না দিলে অথবা তাহাদের বশীভূত না করিলেও ঐ প্রকার দণ্ড হইবে।

এক দ্রোণ গোদুগ্ধে একপ্রস্থ ঘৃত হয়; ঐ পরিমাণ মহিষের দুগ্ধে উহাপেক্ষা ½ প্রস্থ অধিক হয়; ঐ পরিমাণ ছাগ দুগ্ধে ½ প্রস্থ অধিক ঘৃত হয়। প্রত্যেক প্রকার দুগ্ধই মন্থন দ্বারা কি প্রকার ঘৃত উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কেননা ঘৃত ও দুগ্ধের পরিমাণ ভূমি, তৃণ ও জলের উপর নির্ভর করে। যখন কোন-ব্যক্তি এক যূথের এক বৃষকে অন্য বৃষের সহিত * * করিতে দেয়, তখন উহাকে প্রথম প্রকারের দণ্ড দিতে হইবে। যদি বৃষ আঘাতিত হয়, তবে উহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দণ্ড হইবে।

যে সকল বৃষের নাসিকায় সূত্র আছে, এবং যাহা গতিতে ও ভার বহনে অশ্বের তুল্য, তাহাকে অর্দ্ধভার যবসা (একপ্রকার ঘাস) এক ভার তৃণ, এক তুলা খৈল, ১০ আঢক ভূষি, ৫ পলা লবণ, নাসিকা মর্দ্দ-নের জন্য এক কুটুম্ব তৈল, একপ্রস্থ পানীয় জল, একতুলা মাংস, ১ আঢক দধি, ১ দ্রোণ যব, ১ দ্রোণ দুগ্ধ, (অথবা অর্দ্ধদ্রোণ মদ) এক প্রস্থ তৈল বা ঘৃত, ১০ পলা শর্করা বা গুড়, একপলা আদা আহারের জন্য দিতে হইবে। অশ্বতর, গো এবং গর্দ্দভকে উপ-রোক্ত খাদ্যের একচতুর্থাংশ কম দিতে হইবে। মহিষ ও উষ্ট্রকে উহার দ্বিগুণ পরিমাণ দিতে হইবে। ভারবাহী বৃষও ধেনুকে বৃষের কার্য্যকাল এবং ধেনুদত্ত দুগ্ধের

পরিমাণানুযায়ী আহার প্রদান করিতে হইবে। সকল প্রকার পশুকেই প্রচুর আহার ও পানীয় প্রদান করিতে হইবে।

একশত গর্দ্দভে ও অশ্বতরে ৫টী, মেষে ১০টী এবং দশটী গো মহিষ বা উষ্ট্র যূতে ৪টী পুরুষ জাতীয় পশু থাকিবে।

অশ্বাধ্যক্ষ।

অশ্বাধ্যক্ষ অশ্বগণের কুল, বয়স, বর্ণ, চিহ্ন, এবং বর্গ নিম্নলিখিত ধারায় লিপিবদ্ধ করিবেন যথা—(১) পণ্যাগারিক (২) ক্রয়োপগত (৩) আহবলব্ধ (৪) অজাতি (৫) সাহায্যকাগত (৬) পণস্থিত (৭) যাবৎকালিক। তিনি রাজাকে, যে সকল অশ্ব অশুভচিহ্নাত্মক, পঙ্গু এবং ব্যাধিত, তাহাদের বিষয় জ্ঞাত করিবেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী কোষাগার ও কোষ্ঠাগার হইতে যাহা পাইবে, তাহা ব্যবহার করিবে। অশ্বাধ্যক্ষ অশ্বের পরিমাণানুযায়ী অশ্বশালা নির্ম্মাণ করিবেন। অশ্বের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ বিস্তৃতি সহ এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে ৪টী দ্বার থাকিবে। মধ্যের গৃহতল অশ্বের আবর্ত্তনের জন্য রাখিয়া দ্বারদেশে কাষ্ঠাসন এবং বানর ময়ূর, মৃগ, নকুল, চকোর, শুক, শারিকা রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক অশ্বের গৃহ অশ্বাপেক্ষা চতুর্গুণ দৈর্ঘ এবং প্রস্থ করিতে হইবে এবং মধ্যস্থ ভূমি কাষ্ঠফলক দ্বারা আবৃত করিতে হইবে। মূত্র ও মল বহির্গমনের পথ রাখিতে হইবে এবং খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে (খোপে) রাখিতে হইবে। এই গৃহের দ্বার উত্তর কি পূর্ব্বাভিমুখী হইবে। দিগ্‌বিভাগ অশ্বালয়ের স্থানানুযায়ী স্থির করাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অশ্ব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিতে হইবে।

যে অশ্বিনী সদ্য শিশু প্রসব করিয়াছে, তাহাকে প্রথম তিন দিবস একপ্রস্থ ঘৃত আহারার্থ দিতে হইবে। পরে একপ্রস্থ শক্তু এবং তৈলমিশ্রিত ঔষধ দশ রাত্রি আহার করাইতে হইবে। পরে ইহাকে সিদ্ধশস্য, ঘাস এবং সময়োপযোগী অন্যান্য খাদ্য দিতে হইবে। দশদিনের অশ্বশাবককে ১ কুটুম্ব-শক্তু ও ¼ কুটুম্ব ঘৃত এবং একপ্রস্থ দুগ্ধ যতদিন ছয়মাস বয়স্ক না হয়, ততদিন দিতে হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ খাদ্যবৃদ্ধি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে একপ্রস্থ যব দিতে হইবে। দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই খাদ্য দিতে হইবে। পরে চারি বৎসর পর্য্যন্ত একদ্রোণ যব। ৪।৫ বৎসর বয়স্ক হইলে ইহা কার্য্যোপযোগী হয়।

অশ্বের মুখের পরিমাণ ৩২ অঙ্গুলি; মুখাপেক্ষা অশ্বের দৈর্ঘ পাঁচগুণ, ইহার জঙ্ঘাস্থি ২০ অঙ্গুলি এবং উচ্চে জঙ্ঘাস্থির চতুর্গুণ। মধ্যম ও নিম্নাকারের অশ্বের মাপ পূর্ব্বোক্ত মাপ অপেক্ষা ২।৩ অঙ্গুলি কম হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বের পরিণাহ একশত অঙ্গুলি। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বকে ২ দ্রোণ শস্য, চাউল, যব, প্রিয়ঙ্গু, কিছু মুগ অথবা মাস, একপ্রস্থ তৈল, ৫০ পল মাংস, এক আধক রস, অথা ২ আধক দধি, ৫ পল ক্ষার, একপ্রস্থ মদ্য অথবা দুই প্রস্থ দুগ্ধ। যাহারা অধিক দূর গমনাগমন বা ভার বহনের জন্য ক্লান্ত হইয়াছে, তাহাদেরও ঐ পরিমাণ পানীয় প্রদান করিতে হইবে। অণুবাসের জন্য একপ্রস্থ তৈল, নাসিকায় মর্দ্দনের জন্য এককুটুম্ব. একসহস্র-পল ঘাস এবং দুই সহস্র পল তৃণ এবং ছয় অরত্নি স্থান লইয়া ঘাস পরীক্ষা করিতে হইবে। মধ্যম বা ক্ষুদ্রাকারের অশ্বের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক চতুর্থাংশ আহার কম দিতে হইবে। ভারবাহী অশ্বকেও ঐ প্রকার খাদ্য প্রদান করিতে হইবে। বড়ব ও পারশমানকে

(বিভিন্ন প্রকার অশ্বের নাম) একচতুর্থাংশ কম দিতে হইবে।

যাহারা অশ্বের আহার সিদ্ধ করে, অর্থাৎ সূত্রগ্রাহক এবং পশুবৈদ্য, আহারের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। যে সকল অশ্ব যুদ্ধে, ব্যাধি বা জরাগ্রস্ত হইয়া কার্য্যাক্ষম হইয়াছে, তাহাদিগকে পৌরজনপদের হিতার্থে বৃষের সহিত সংমিশ্রিত করিবে। কাম্বোজ, সিন্ধু, আরট্ট, বনায়ু দেশীয় অশ্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বহ্লিক, পাপেয়, সৌবীর, এবং তৈতল দেশের অশ্ব মধ্যম। অন্যান্য দেশীয় অশ্ব নিকৃষ্ট। এই তিন প্রকারের অশ্ব তাক্ষ, ভদ্র কি মন্দাকিনী বুঝিয়া যুদ্ধের জন্য বা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। অশ্বের প্রকৃত কার্য্যই হইতেছে যুদ্ধের জন্য শিক্ষা দেওয়া। বল্গন, নীচগত, লঙ্ঘন, ধারণ এবং নারোষ্ট্র, এই প্রকার হইতেছে অশ্বের কৌশল।

তৎপর অশ্বের নানাপ্রকার গতির বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

দিন ফুরায়ে যায়

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায় !
মাঝের রবি ডুব্‌ছে সাঁঝে, দিনটা গেল বৃথা কাজে,
এক পা কেবল পারে আছে এক পা দিচ্ছি নায় !
আজ করব না করব কালি, এই ভাবে দিন গেল খালি,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়,
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়।

২

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায় !
ক্ষুধায় কাতর অবসন্ন, কারে দিলাম কয়টী অন্ন,
কয় অঁজল দিয়েছি বা জল আকুল পিপাসায় ?
দিন ভিখারী কয়টী অতিথ, অন্ধ আতুর পাপী পতিত,
কে পেয়েছে আমার দয়া অনাথ অসহায় ?
পতিহারা, পুত্রহারা, দুর্ভাগা জননী যারা,
কার জুড়ালাম শোকের আগুন শীতল সান্ত্বনায় ?
পিতৃমাতৃহীন শিশুকে, কখন কি স্থান দিলাম বুকে,
পিতার বদল পিতা হয়ে মায়ের বদল মায় ?
কবে বা কোন্ বিপদগ্রস্ত, উদ্ধারিতে দিলাম হস্ত,
কার করিলাম কোন্ উপকার ব্যাকুল বেদনায় ?
সংসারে যে ঘৃণার পাত্র, রুগ্ন কুষ্ঠী গলৎগাত্র,
নিরাশ প্রাণে ব্যোমের দিকে ডোমের দিকে চায় ?
কারে দিলাম পথ্য পাচন রোগের যাতনায় ?
যারা আমার প্রতিবেশী, ভাই ভগিনী আমার দেশী,
যাদের কাছে বাঁধা আমি স্নেহ ঋণের দায়,
যার রেণুতে দেহগড়া যার কোলে শেষ শয়ন করা,
তার করিলাম কোন্ উপকার প্রাণের মমতায় ?
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায় !

৩

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায় !
রোজ নাম্‌চা—ডায়েরি পাতা, খুঁজে দেখি প্রাণের পাতা,
দিন গিয়েছে নারীর কেবল আকুল তপস্যায় !
কার বা কেমন রূপরাশি, কার বা সদ্য কার বা বাসি,
কার বা কেমন কান্না হাসি কাজল চখে চায় !
কোন্ মানিনীর মানের ছাঁচে, চকোর চাতক হাসে কাঁদে,
চুমায় চুমায় ঘুমায় কেবা চমকে চুমো খায় !
বিরহে কার মিলন আশে, বর্ষাতে কদম্ব ভাসে,
কার বা নয়ন মুদে আসে অলস অবশ গায় !
কার নয়নে লজ্জা ভরা, কার নয়নে লজ্জা মরা,
মজ্জাপায়ী কার বা নয়ন শয্যা লালসায় !
কার অধর অমৃতে তিক্ত, কার বা বিষে সুধাসিক্ত,
কার বা অধর তীক্ষ্ণ উগ্র মধুর মদিরায়।
কার বা কেমন প্রেমের ধারা, কেবা সিন্ধু কে সাহারা,

কেবা তোষে কেবা শোষে বিভল বাসনায়।
এইত কেবল চিন্তা—ধ্যান, এই ত কথা এই ত গান,
তরুণ তপ্ত অভিশপ্ত করুণ কবিতায়!
ক্ষিপ্ত চিত্ত লিপ্ত কেবল নারীর পদ্ম পায়!

৪

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়!
সারা জীবন হরি হরি, খুজ্‌লেম কেবল টাকা কড়ি,
পূজ্‌লেম কত গরু গাধা নর পশুর পায়!
(তবু) গেলনা রে অর্থ কষ্ট, হায় কি কপাল—কি অদৃষ্ট!
ইহকাল পরকাল নষ্ট দারুণ দুরাশায়!
চিঠি লিখ্‌ছে চন্দ্রমালা, চাচ্ছেন তিনি সোণার বালা,
হাতের জোকা পাঠায়েছে পত্রে—লেপাফায়,
"আজ পরবনা পরব কবে, এদিন কি চিরদিন রবে,
দিন ফুরায়ে যায় যে আমার দিন ফুরায়ে যায়!"
আর চাহেননি মুখটী ফেটে, আজ চাহিলেন জিহ্বা কেটে!
চিন্তা আমার রক্ত চেটে কলজে খুলে খায়!
ভাব্‌না ভারি দু'জনারি দিন ফুরায়ে যায়!

৫

দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়,
না ভজিলাম মদনমোহন গুরু গোঁসাইর পায়!
কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজপতি, না ভজিলাম মূঢ়মতি
ব্রজ বধূর মত আহা মধুর মমতায়!
নন্দ যশোমতী সম, রাখাল সম চিত্ত মম,
পুত্র বলি সখা বলি না ডাকিল তায়!
ব্রজধামের রজ গুলি, রাধা কৃষ্ণের পদধূলি,
না লইলাম বক্ষে তুলি না মাখিলাম গায়,
না ভজিলাম নিতাই চাঁদে, তার লাগি না পরাণ কাঁদে
গড়াগড়ি দিলাম না সে গৌরের নদিয়ায়!
যীশুর মত শিশু কভু, না ডাকিলাম পিতা প্রভু,
রামপ্রসাদের মত নাহি ডাক্‌লেম শ্যামা মায়,
নাহি গেলাম গয়া কাশী, না হইলাম তীর্থবাসী,
নাহি গেলাম জেরুজেলাম মক্কা মদিনায়!
পড়ে আছি দেশান্তরে, কেবল পোড়া পেটের তরে,
পাপে পাপে অনুতাপে চিত্ত জ্বলে যায়,
"শাওণ মাসে * * র বিয়া, মায়রে যাবে নায়র নিয়া,
খালি হাতে খালি গায় কেম্‌নে যাবে মায়?"
লিখ্‌ছে পত্র ছেলের হাতে, টাট্‌কা মানুষ আট্‌কে যাতে,
নিমন্ত্রণের ছলে নারী মধুর মন্ত্রণায়!
এদিক্ নেয়ে কেলে সোণা, চাচ্ছে রাধার কাণের সোণা,
পার করিতে ভবের পারে জীবন-যমুনায়,
কারে দিব মোহন মালা, কারে দিব সোণার বালা,
জ্বালার উপর জ্বালা আমার দুদিক্ দুজনায়।
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলন।

সাহিত্য-সম্মিলনের উন্নতিতে যাঁহাদের আনন্দ হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সাহিত্য-সম্মিলনের আদি-প্রবর্ত্তক ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় স্বর্গত হইয়াছেন, না জানি তিনি জীবিত থাকিলে আজ কত ক্লেশ পাইতেন। অন্যতর প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ মিত্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় না জানি আজ কত ক্লেশ পাইতেছেন। মহাভারতী মহাশয় প্রায় প্রতিদিন নব্যভারত কার্য্যালয়ে আসিয়া সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন! হায়, তিনি আজ স্বর্গে! কিন্তু তাঁহার নাম সাহিত্য-সম্মিলনে কোনদিনও উঠিল না! জিজ্ঞাসা করি, প্রথম যখন সাহিত্য-সম্মিলনের কথা উঠে, তখন তাহার মূলে কে ছিলেন, কেহ সংবাদ রাখেন কি?

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য

সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতেছি,—পশ্চিমবঙ্গ কি পূর্ব্ববঙ্গকে বাদ দিয়া সাহিত্যের গৌরব করিতে পারেন? মাইকেল, নবীনচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, দুই দীনেশ, গিরীশচন্দ্র, শিশির-কুমার, দুই রজনীকান্ত, গৌরগোবিন্দ, গোবিন্দচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার, গিরিজাপ্রসন্ন, শশধর, কাঙ্গাল হরিনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, দেবকুমার, প্রমথ, শশাঙ্কমোহন, কামিনী ও মান-কুমারী, কৈলাসচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতিকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বাদ দেওয়া চলে কি? যদি সাহিত্য লইয়া দলাদলি করিতে চাও, তবে আর "সম্মিলন" নাম রাখিও না।

সাহিত্য-সংসারের কার্য্যপ্রণালী আজকাল কিছু অদ্ভুত রকমে চলিতেছে। এইজন্যই বুঝিবা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, "সাহিত্যে এখন অরাজকতা উপস্থিত।" রমেশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ বা শিশিরকুমারকে "সাহিত্য-সম্মিলনে" সভাপতি করা হয় নাই। জীবিতকালে সম্মান প্রদত্ত হয় নাই, এখন মৃত্যুর পর সম্মান প্রদত্ত হই-তেছে! অক্ষয়চন্দ্র ও ক্ষীরোদচন্দ্রও উপেক্ষিত। চারিবারের সভাপতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, আর একজনও সাহিত্যিক সভা-পতি হন নাই। সাহিত্য-পরিষদের সভা-পতিও সাহিত্যিক নন্! তোমরা রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করিলে, দ্বিজেন্দ্রলালকে একবার সভাপতি করিলে কি দোষ ছিল? তিনি কাহাপেক্ষা হীন? সাহিত্যকে বিজ্ঞান-মূলক করা মন্দ নয়, কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন খোঁজ রাখেন না, বাঙ্গালা পুস্তক বা সংবাদ পত্র কদাচিৎ পড়েন, তাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় হইলেও, মহা সাহিত্যিক-দিগকে বাদ দিয়া তাঁহাদিগকে সভাপতি করিলে সাহিত্যকে খর্ব্ব করা হয়। সর্ব্বত্রই যদি কর্ত্তাভজার প্রাদুর্ভাব হয়, তবে যাই কোথায়? যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব ছিলেন, "সম্মিলন" কোনদিন তাঁহাদিগের সম্মান বাড়াইলেন না; নানা গুণবিশিষ্ট পরগাছা বসাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন এবং ইহারই নাম রাখিলেন "সাহিত্য-সম্মিলন!" এরূপ করিলে সাহিত্য-সম্মিলনে প্রবীণ সাহিত্যিকেরা যোগ দিবে কেন? বাহিরের লোককে উদ্বুদ্ধ করা ভাল, কিন্তু ঘরের লোককে নিরুদ্ধ করিয়া নহে। যাঁহারা আজীবন উদরে অন্ন না দিয়া কঠোর সাহিত্য-সাধনা করিলেন, তাঁহারা আজ উপেক্ষিত, আর "কর্ত্তাগিরির" অযথা সম্মান বাড়িতেছে, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই।

আমরা সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে কোন কথা লিখিব না, ভাবিয়াছিলাম। ক্রমাগত চতুর্দ্দিক হইতে পত্র পাইতেছি,—এবার ময়-মনসিংহে অনেক যোগ্য সাহিত্যিক উপেক্ষিত হইয়াছেন!—সম্মিলন-ক্ষেত্রে দলাদলি, মর্ম্ম-পীড়ক হইলেও, তাহাও হজম করিতাম। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথের প্রবন্ধের কোন কোন স্থল আমাদের চিরপোষিত মতের বিরুদ্ধ হইলেও, তাহার প্রতিবাদ ছাপাইব না মনে করিয়া-ছিলাম, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল গোবিন্দ-চন্দ্র প্রভৃতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন সহ্য হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল দলাদলিতে পড়িয়া উপে-ক্ষিত, গোবিন্দচন্দ্র প্রভৃতি দরিদ্র বলিয়া হত-মান। পদ্মনাথের একটী প্রতিবাদ এই জ্যৈষ্ঠের সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে* সুতরাং অন্য প্রতিবাদ ছাপাইবার আবশ্য-কতা দেখি না। সাহিত্য-সম্মিলনীতে ভূত-

---

* ঐ প্রতিবাদ প্রবন্ধ নব্যভারতের নিকট কখনও উপস্থিত হয় নাই।

পূর্ব্ব সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে নব্য-ভারত, সঞ্জীবনী, প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয় নাই; ইহাতে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি তীব্র মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের চরণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রণাম করিয়া জানাইতেছি, ব্রাহ্মসমাজকে বাদ দেওয়া সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য নয়। যদি তাহা হইত, চারিজন সভাপতির মধ্যে তিনজন ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে মনোনীত হইতেন না। পাঠকগণ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর সহৃদয়তা-পূর্ণ পত্র পাঠ করিবেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতির বিবরণ নানা কারণে প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না। এই প্রবন্ধে অনেক কথা আছে, যাহা পদ্মনাথ বাবুর প্রবন্ধে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে কিনা, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

বহরমপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী এবং মৈমনসিংহ, ধন-ঐশ্বর্য্য-গৌরবে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাহিত্য-সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। দরিদ্র সাহিত্য-সেবিগণকে আদর আপ্যায়ন করিয়া ঐ সকল দেশ আজ ধন্য!—কি কথায় কৃতজ্ঞতা জানাইব, ভাষায় তাহা পাই না। বিধাতা এই সকল দেশের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য কয়েক বৎসর যাহা করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার নাম এদেশে অক্ষয় হউক। আর শশধর?—তিনি যদি বন্ধু না হইতেন, তাঁহার স্বর্ণ-প্রতিমা নির্ম্মাণের প্রস্তাব করি-তাম, জিজ্ঞাসা করি, তিনি কেন এবার পূর্ব্ববঙ্গের সম্মান বাড়াইবার জন্য ময়মনসিংহ-সম্মিলনের নেতৃত্ব করিলেন না? বুঝিবা, তাহা হইলে কাহারও প্রতি কোনরূপ অবিচার হইত না। যে সকল দেশ সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন, সেই সব দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মহা কল্যাণ সাধন করিয়া তিনি ধন্য হই-তেছেন।

এস্থলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর পত্র এবং যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম।

(১)

"২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩১৮, তারিখ ১লা জ্যৈষ্ঠ।

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার পোষ্টকার্ড পাইলাম। আপনি যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার বিব-রণ এই, সারদা বাবু পূর্ব্ববৎসরে সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন। তিনি এবার উপস্থিত হইতে না পারিয়া নিজ অভিভাষণ স্বরূপ একটি প্রবন্ধ আমার হস্তে দেন, উহা পড়ি-বার ভারও আমাকেই দিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি সংক্ষেপে ১৩১৭ সালে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতির আলোচনা করেন। মাসিক পত্রের উল্লেখ কালে তিনি, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, প্রবাসী, মানসী, বাণী, ভারত-মহিলা, সুপ্র-ভাত, এই কয়খানির নাম লিখিয়া তাহার পার্শ্বে "&c" ও 'ইত্যাদি' শব্দ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,—পার্শ্বে কিনারায় আরও কয়েক খানির নাম লেখা ছিল, তাহার মধ্যে "নব্যভারত" "ভারতী" প্রভৃতি কয়খানি পত্রের নাম লেখা ছিল। আমার গলা বসিয়া যাওয়ায় এবং সভায় আসিতে বিলম্ব হওয়ায় অন্য একব্যক্তি উহা পাঠ করেন। তিনি কিনারার লেখাগুলি পড়িতে পারেন নাই, অর্থাৎ তাড়াতাড়িতে সে দিকে দৃষ্টি না দিয়াই পড়িয়া গিয়াছেন। ঐরূপ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের নামাবলীর মধ্যে বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতীর নামের পর "ইত্যাদি" দিয়া কিনারায় 'কলিকাতার অন্য বিখ্যাত

পত্র এবং প্রতি জেলার শ্রেষ্ঠ পত্র' এইটুকু টুকিয়া রাখা হয়—সুতরাং পাঠকের মুখে সঞ্জীবনী, সময় প্রভৃতির নামও হয় নাই। আমি পড়িতে পারিলে প্রবন্ধ-লেখকের ঐ কিনারার লেখা হইতে উদ্দেশ্য বুঝিয়া আরও নাম করিয়া যাইতে পারিতাম, নূতন এবং ছেলে মানুষ পাঠক তাহা পারেন নাই। এই আসল ব্যাপার। ইহা হইতে পরম্পরায় আমি শুনিয়াছি যে, কথা হইয়াছে, "ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্ম-পত্রের নামগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে"—এ সিদ্ধান্ত অমূলক,—কারণ "প্রবাসী, সুপ্রভাত, ভারত-মহিলার নাম আছে। অবস্থাটা ঘটিয়াছে এইরূপ, লিখিবার কালে যে কটা নাম কলমের মুখে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়াছে, সেই কয়টাই লিখিয়া লেখক "ইত্যাদি" দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন এবং দ্বিতীয় বার পাঠকালে আর গোটাকত নাম কিনারায় লিখিয়া "&c" দিয়া ভবিষ্যতে ছাপার সময় তালিকা পূর্ণ করিয়া দিবেন, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন,—ইহার মধ্যে কোন দুষ্ট কল্পনা অনুভব করিবার অবসর আছে কি?—ঐ প্রবন্ধ "মানসী" পত্রে সম্ভবতঃ ছাপা হইবে, তখন সমস্ত দোষই দূর করিয়া দেওয়া হইবে। নব্যভারতে পদ্মনাথ বাবু এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্মিলন-বিবরণ-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—অনেক ভালভাল পুস্তকের নাম করা হয় নাই—হইতে পারে সেগুলি লেখকের গোচরীভূত হয় নাই—ইহাই ঠিক কথা।

এই আসল ব্যাপার জানাইলাম—ইহা হইতে আপনি যাহা বিবেচনা করেন। "নব্যভারত" সম্বন্ধে বা "সঞ্জীবনী" সম্বন্ধে সারদাবাবুর কোন বিদ্বেষ আছে, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু আছে কি?—আমিত জানি না। এসম্বন্ধে আপনার কি ধারণা জানিতে পারিলে বাধিত হইব।

এসম্বন্ধে কোন গ্লানিকর কথা প্রকাশের পূর্ব্বে আপনি যে তথ্য অনুসন্ধান করিয়া আমায় পত্র লিখিয়াছেন,—ইহা সম্পাদকোচিত দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক। আমি সত্য ঘটনা জানাইলাম, এক্ষণে যেরূপ অভিপ্রায় হয় করিবেন, নিবেদন ইতি।

পুঃ "নায়ক," "সঞ্জীবনী" "বসুমতী" "ঢাকা-প্রকাশ" প্রভৃতিতে যে বৃথা গ্লানি স্থান পাইতেছে, ইহা কেবল সম্পাদকোচিত ধৈর্য্য ও তথ্যানুসন্ধান প্রবৃত্তির অভাবে। কথায় কথা বাড়িয়া যায়, আসলে কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কথা থাকে। বুদ্ধিমানের কার্য্যগতি অন্যরূপ। আপনার এই পোষ্টকার্ডখানি আপনার সম্পাদকীয় নিপুণতার উৎকৃষ্ট পরিচয়। আপনার এই পত্র পাইয়া আপনার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। সম্মিলন সম্বন্ধে আর যদি কিছু জানার আবশ্যক হয়—আমায় লিখিবেন—আমি সত্য সংবাদ দিব। বশংবদ

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

(২)

সাহিত্য-সম্মিলন জাতীয় জীবন স্ফুরণের এক প্রধানতম উপায়। সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রত্যেক জাতির পরিচয় নখদর্পণে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যিকগণের সম্মিলন এবং পরস্পর পরিচয়ে সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-জগতের এবং বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কিশোর-কবি দক্ষিণারঞ্জন ও স্বর্গীয় প্রবীণ-লেখক ধর্ম্মানন্দের

কল্পনা, কবি দেবকুমারের ভিত্তি ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সংগঠনে যে সাহিত্যসম্মিলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা চিরকাল বঙ্গসাহিত্য-সেবীদিগের কল্যাণ-কল্পে নিয়োজিত থাকুক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। এবার ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্মিলনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি;—আমার বুঝিবার ভুল না হইলে, তাহার পরিণাম বড় মঙ্গলজনক নহে। ভগবান করুন, আমার ধারণা যেন ভ্রান্তই হয়। এই প্রবন্ধে আমি আমার বক্তব্য ক্রমে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইব।

অভ্যর্থনা।

১লা বৈশাখ, ১৩১৮, শুক্রবার, প্রত্যূষে ট্রেণ ময়মনসিংহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। ষ্টেসনটী ছোট কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ষ্টেসনে বহু ভদ্র লোক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। একটী যুবক একখানি ঠিকাগাড়ী করিয়া শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম-এ, বি-এল্ (ঢাকা) ও অপর দুইটী ভদ্রলোক সহ আমাকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট বাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সহরের রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! কিন্তু জলসিঞ্চনের বন্দোবস্তের ত্রুটী লক্ষিত হইল। শ্যামল বৃক্ষবহুল এই সহরটী বেশ মনোরম। প্রদর্শনী-ভবনের নিকট দিয়া আমাদের গাড়ী চলিয়া গেল। প্রদর্শনী ভবনের দ্বারে খুব জনতা দেখিলাম। কতিপয় যুবক দ্বারে টিকিট পরীক্ষা করিয়া সকলকে ভিতরে প্রবেশাধিকার দিতেছিলেন।

৺আনন্দমোহন বসুর স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে প্রতিষ্ঠিত আনন্দমোহন কলেজের দ্বারে আমরা উপনীত হইলাম। স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি এজেলা-বাসীর গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন এই প্রকাণ্ড কলেজগৃহ; এই গৃহনির্ম্মাণে স্থানীয় মহাপ্রাণ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউড্ ও স্বর্গীয় প্রিন্সিপ্যাল বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগ ও চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কলেজগৃহ প্রস্তুত হইল, হায় বৈকুণ্ঠ বাবু তাহাতে একদিনও তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রগণের অধ্যাপনা করিতে পারিলেন না; নিয়তির কঠোর আক্রমণ বৈকুণ্ঠ বাবুর জীবন সংহার করিল! জানি না, ছাত্রগণ এই মহাত্মার—তাঁহাদের গুরুদেবের, স্মৃতিরক্ষার কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন?

তিন দিকে কলেজের প্রকাণ্ড গৃহ। ভিতরের সুবিস্তৃত চত্বরে সাহিত্য-সম্মিলনের বিশাল মণ্ডপ।

কলেজের একাংশে এবং কলেজ বোর্ডিংয়ে প্রতিনিধিগণের বাসস্থান নির্দ্ধারিত ছিল। গাড়ী থামিবামাত্র একটী যুবক আমাদের বিছানাপত্র লইয়া গেল এবং যথাস্থানে আস্তীর্ণ করিয়া দিয়া একখানি পাখা দিয়া চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে হাতমুখ ধোয়ার বন্দোবস্ত হইল। চা ও জলখাবার আসিল; কিন্তু হায়, তাহার এই পরিশ্রম ব্যর্থ হইল; কারণ চা নামক পদার্থের সহিত এই অধমের অধরোষ্ঠের কস্মিনকালেও সাক্ষাৎ হয় নাই। জলখাবারের প্রতিও আমার অভিবাদন অর্পিত হইল, কারণ—

"গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি এমন ধোলাই পৈতে"

বলিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম, ময়মনসিংহবাসীর সব কাজেই বাড়াবাড়ি! সাহিত্যের সভার জন্য যে মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে, এ মণ্ডপের অর্দ্ধেকও ত পূর্ণ হইল না! এমন সময় বন্ধুবর "—" আসিয়া হাত ধরিয়া লইয়া বাহির হইলেন।

চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া অধ্যাপক রামেন্দ্র বাবু, ললিতবাবু, রাখাল বাবু, ক্ষীরোদ বাবু, পরিষদের পেস্কার ব্যোমকেশ বাবু প্রভৃতিকে

দর্শন করিলাম! মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র ও মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ, পদ্মনাথ বাবু, সভাপতি অধ্যাপক বসু, জলধর বাবু প্রভৃতির বাসস্থান স্থানান্তরে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ব্যোমকেশ বাবুও নাকি অন্যত্র বাসা গাড়িয়াছেন।

রন্ধনশালার নিকট গিয়া দেখিলাম, রাজসূয়ের আয়োজন। আমাদের রসনার তৃপ্তি ও উদরের পরিপুষ্টির জন্য এই রাজসূয়ে সর্ব্ব সমেত সোয়া শত অজনন্দন স্বর্গ কামনায় দেহত্যাগ করিয়াছে। এখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত অতীব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল! খাদ্যসামগ্রীর ফিরিস্তি দিয়া পাঠকের বিরাগভাজন হইবার বাসনা রাখি না।

অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় সভার অধিবেশন হওয়ার কথা। আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছি, দেখিলাম, সভামণ্ডপ এক মুহূর্ত্তে জনপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্বাররক্ষকের অনবধানতায় এই উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। তথাপি দেখিয়া বড় আনন্দ হইল, এত জনতা—সাহিত্যের আসরে, অন্যূন ৮ হাজার লোক সাহিত্যের টানে জমায়েৎ! বড় আশার কথা, বড় আনন্দের কথা।

বন্ধুবর "—বাবু" ততক্ষণ আহারাদি করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার হাত ধরিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম, বহুকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া মঞ্চের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। সর্ব্বত্র ভিড়। "ন স্থান তিল ধারণে!" ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রতিনিধিবর্গ মণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারিলেন না! এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক প্রাণের আবেগে দণ্ডায়মান হইয়া যোড়করে ময়মনসিংহবাসীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন—"আপনারা স্থান ত্যাগ করিয়া ভিন্ন জেলার সকলকে স্থান দিন্—জেলার সম্মান রক্ষা করুন।" তাঁহার নাম সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী। তিনি স্থানীয় উকীল। সতীশ বাবুর বক্তৃতার পর স্বয়ং মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ) ও রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা) যোড়করে সকলকে জেলার সম্মান রক্ষার্থ অনুরোধ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের জন্য স্থান হইল। তবে শৃঙ্খলা বিশেষ হয় নাই—এস্থলে হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। তথাপি আমরা বড় আমোদ বোধ করিলাম।

অপরাহ্ণে ৭ঘটিকার সময় সভার আরম্ভসূচক সঙ্গীত আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র উকীল, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উচ্চকণ্ঠে সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী-বিরচিত সঙ্গীত দ্বারা সভা মন্ত্রমুগ্ধ করিলেন। অতঃপর নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি গত বর্ষের সাম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহোদয়ের প্রেরিত গত বৎসরের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করেন। ভ্রুভঙ্গি ও শির-সঞ্চালনের ভঙ্গিতে নলিনীরঞ্জনকে বেশ দেখাইতেছিল! তৎপর শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী একটী কবিতা পাঠ করেন। তদনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সুসঙ্গের রাজবংশধর মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। অতঃপর স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহামতি মিঃ ব্ল্যাক্উড্ সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করতঃ ডাক্তার বসু ও উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহোদয়ের প্রস্তাবে ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের সমর্থনে বঙ্গের গৌরব বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভা-

পতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতি মহাশয় "বিজ্ঞানে সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। জনসঙ্ঘের কলরবে ক্রমে ক্রমে তিন ব্যক্তি দ্বারা পঠিত হইলেও ঐ অভিভাষণ অনেকেই শুনিতে পাইলেন না।

অতঃপর কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল। শুনিলাম, এইদিন সম্মিলনের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। এই নিয়ম সম্বন্ধে উপস্থিত জনসাধারণ কিছুই জ্ঞাত নহেন। এই নিয়ম হইতে এক অনর্থের সূত্রপাত হইবে।

(দ্বিতীয় দিবস)

দ্বিতীয় দিবস, ২রা বৈশাখ, শনিবার। রাত্রি প্রভাত হইলে দেখিলাম, মণ্ডপের দ্বার সুরক্ষিত। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া আসিলাম, ইতিমধ্যেই মণ্ডপের অর্দ্ধাংশ জনপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া বড় আনন্দ বোধ করিলাম। ততোধিক আনন্দ হইল, আমাদের শিক্ষা-গুরু স্বার্থত্যাগী কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সভায় সমুপস্থিত দেখিয়া। বুঝিলাম, সাহিত্য-সম্মিলন সার্থক! যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত চর্চ্চার মোহে বঙ্গ-ভাষার একটা খোঁজ খবরও লইতেন না, আজ তাঁহারা বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত! মঞ্চের নিম্নে সভাপতি মহোদয়ের বাম পার্শ্বে ইঁহাদের আসন নির্ণীত ছিল।

এখানে একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। ময়মনসিংহে গিয়াই একটু দলাদলির গন্ধ পাইয়াছিলাম। আজ শুনিলাম, যে সেক্রেটরী ষ্টেসনে প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আজ ষ্টেসনে যান নাই। তিনি নাকি এ কাজ করিবেন না। ট্রেণ আসিয়াছে, আমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণ ষ্টেসনে উপস্থিত, লজ্জার কথা, সকলেই বিমর্ষ হইলেন। কয়েকজন মহাব্যস্ত হইয়া ষ্টেসনে ছুটিলেন। ছি ছি, যাহার যে কার্য্যে অধিকার নাই বা ইচ্ছা নাই, সে এমন কার্য্য গ্রহণ করে কেন? সেক্রেটরী হওয়ার এমনই সাধ!

সভার কার্য্যারম্ভ হইল। সুকণ্ঠ গায়ক চতুষ্টয় ময়মনসিংহের উদীয়মান জমিদার-কবি শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী-বিরচিত একটী সঙ্গীত গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন। গানটী এই:—

"তীর্থ আজি এ পুণ্য নগর
কমলা বাণীর মিলনে।
বরষ এসেছে, নব আশা নিয়ে
অবসাদ গেছে মরণে।
বাজুক তন্ত্রী বাণীর বীণার,
অম্বর ঝাঁপি উঠুক ঝঙ্কার;
যাক্ জীবনের নিরাশা আঁধার
জ্ঞানের বিমল কিরণে।
এসেছি সকলে লয়ে অর্ঘ্যভার:
হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি-উপহার,
এসো জীবনের সাধনা আমার,
বসো এ হৃদয় আসনে॥"

এই দিনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সেরপুরের অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত করেন। দরিদ্র সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করার মানসে তিনি এক সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। নিজে সম্প্রতি ১০০০্ হাজার টাকা, দশানন-বধ মহাকাব্যের স্বত্ব এবং তাঁহার অবস্থা অবনত না হইলে আরও ৪০০০্ চারি হাজার টাকা এই কার্য্যে দান করিবেন। সভায় মহা আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত নগদ ২৫্ টাকা

এবং "কবি রজনীকান্তের জীবনী" নামক প্রবন্ধের ১০০ খণ্ড দান করিতে স্বীকার করিলেন। এই সভায় আরও বহু টাকা স্বীকৃত হইত, কিন্তু কোনও অলক্ষিত শক্তি এই প্রস্তাব ঢাকিয়া অন্যের উপস্থিতি কামনা করিল! অতঃপর কয়েকটী প্রবন্ধ পঠিত (?) হইল। প্রবন্ধ গুলিকে ২।৪।৫ মিনিট সময়ে শেষ করিতে আদেশ ছিল। ব্যোমকেশ বাবুর কলম যাহার জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল—উহাই তাহার প্রবন্ধের নিয়ামক ছিল। ব্যোমকেশ বাবুর কলমের খোঁচায় অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, অনেক শ্রেষ্ঠ লেখক "কবন্ধ" হইয়া পড়িলেন!

পশ্চিমবঙ্গের কর্ত্তারা যাহাকে বড় করিতে ধরিবেন—তাহাকে উঠানই চাই! এবার নলিনী পণ্ডিতকে বড় করিবার জন্য আনিয়াছেন! প্রত্যেক প্রবন্ধ ও প্রত্যেক কবিতার পাঠক নলিনীরঞ্জন! একমাত্র তাঁহাকে পাঠাইলেই বোধ হয় প্রবন্ধ-রচয়িতাদের এই যাতায়াতের পরিশ্রম করিতে হইত না! নলিনী বাবু নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহাতে যত রামু শ্যামু স্থান পাইল, আর বর্ত্তমান নাট্য-জগতের মহারথী—যাহার যশঃ-প্রভায় অন্যান্য নাট্যকারগণ মলিন, সেই সুকবি (D. L. Roy) দ্বিজেন্দ্রলালের নামটী উচ্চারিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্র-ভক্তগণ দ্বিজেন্দ্রলালকে ছাঁটিয়া ফেলিতে অত ব্যগ্র কেন?

ময়মনসিংহের উকীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এম-এ, বি-এল উঠিয়া সভাপতি-মহাশয়কে কহিলেন:—"সভার কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নাম সাধারণকে জানিতে দিন ইত্যাদি।" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম-এ, বি-এল প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভাপতি মহোদয়, অপরাহ্নে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, বলিলেন।

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ব্যাকরণ বিভীষিকা"র সরসতায় সভা হাস্য-মুখরিত করিয়া তুলিলেন। শিক্ষকের নিকট রুচি-বিগর্হিত রসিকতার আশা করি নাই। যাঁহার ইচ্ছা হয়, ললিত বাবুর প্রশংসা করুন, আমরা প্রশংসা করিতে না পারিয়া দুঃখিত। রসিকতা গণ্ডী ছাড়াইলে তাহাকে বেয়াদবী বলা অসঙ্গত নহে।

অপরাহ্ন ৪—২০ মিনিটের সময় পুনরায় সভার অধিবেশন হইল। সভারম্ভেই—শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু পূর্ব্বাহ্নের প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরায় সভাপতির মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সভাপতি মহাশয় সভাভঙ্গের পর এসম্বন্ধে আলোচনা করিবেন বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু সভা এই কথায় শান্ত হইল না। আমরা চারিদিক হইতে একটা উষ্ণ নিশ্বাস প্রাপ্ত হইতেছিলাম। ইহার মধ্যেই সভার কার্য্য চলিতেছিল। ক্রমে শুনিলাম, পূর্ব্ব রাত্রিতে যে বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটী বসিয়াছিল, তাহাতে ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ব্যতীত অন্যান্য সভ্যের নাম ব্যোমকেশ বাবু কাটিয়া দিয়াছেন! এবং দ্বিতীয়তঃ রমেশ-ভবনের সঙ্গে চন্দ্রকান্ত ভবন স্থাপনের প্রস্তাব হওয়ায় চন্দ্রকান্ত-ভবনের প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়। এই দুই কারণে বহু লোক উত্তেজিত হইয়া উঠেন। যাঁহারা ঘটনা অবগত ছিলেন না, তাঁহারা অক্ষয় বাবু প্রভৃতির উপর চটিয়া উঠিলেন।

যাহা হউক, এই কার্য্যে ব্যোমকেশ বাবুর চতুরতা ধরা পড়িল। সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ পূর্ব্ববঙ্গের প্রবীণ সাহিত্যিক প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কার্য্যান্তরে গমন করেন। ক্রমে অন্যান্য প্রবন্ধ-পাঠ চলিতে লাগিল। ময়মনসিংহের প্রবীণ সাহিত্যিক জ্ঞান-বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় অক্ষয় বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরায় সভাপতি মহাশয়কে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মজুমদার এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এম-এ, বি-এল, ভূতপূর্ব্ব "আরতি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার এবং আরও বহুলোক অমর বাবুর সমর্থন করেন। সভায় এক অসহিষ্ণুতার ভাব সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল। সভাপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা মহাশয় এই ভাবটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। ময়মনসিংহের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব রক্ষার জন্য ইহাঁরা পুনঃ পুনঃ সভাপতিকে ন্যায় বিচারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ অবনি বলিয়া উঠিলেন "আমাদিগকে অপমানিত করিবার যদি ইচ্ছা থাকে, বলুন—আমরা চলিয়া যাই।" মহারাজের এই বালকোচিত বাক্য শ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইলেন। একজন ব্রাহ্মণ কাহারো বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া, তাহার শালগ্রামটী চাহিয়াছিল। শালগ্রাম না দিলে তিনি চলিয়া আসিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের ভীতিপ্রদর্শনও এই শ্রেণীর। যাহা হউক, আসল কথা ক্রমে প্রকাশিত হইল। আমরা এস্থলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের সম্বন্ধে দুইটী কথা বলিব। তিনি, ব্যোমকেশ বাবু যে ময়মনসিংহের গঠিত কমিটীর মেম্বরদিগের নাম কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাহা, ময়মনসিংহে কলিকাতার নিমন্ত্রিতদিগের মানরক্ষার্থ সভাস্থলে প্রকাশ না করিয়া, সমুদয় দোষ নিজে মাথা পাতিয়া লইলেন। আমাদের মনে হয়, কেদার বাবু এই কার্য্যে একদিকে যেমন সম্পাদকীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, অপরদিকে পূর্ব্ববঙ্গের সাহসহীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, স্থানীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সোম (চারুমিহির-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ, শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সাহিত্য-সেবীদিগকে বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটীতে স্থান দেওয়া হয় নাই! আশ্চর্য্য ধৃষ্টতা বটে! ইহাঁদের নাম কাটিয়া দিয়া ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্মিলন হয় কি? কাজেই অমরবাবু প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিবর্গ জনসাধারণের উত্তেজনায় প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা অবধারিত সত্য যে, স্থানীয় বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটীর অনুমোদনের পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্মিলনের যাবতীয় প্রস্তাব উপেক্ষণীয়। অবশেষে সুসঙ্গের মহারাজা যাবতীয় দোষ নিজে স্বীকার করিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করার জন্য অনুরোধ করিলে, সভা শান্তভাব ধারণ

করিল এবং যথারীতি সভার কার্য্য শেষ হইল। এই দিন সুকবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা :(নব্যভারত ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত) সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

"ভারত-মহিলা" সম্পাদিকা শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত মহোদয়া "সাহিত্যে বঙ্গনারী" প্রবন্ধ সভায় পাঠ করেন। সমুদয় লোক দণ্ডায়মান হইয়া এই মহিলার সম্বর্দ্ধনা করেন।

সভা ভঙ্গের পর মণ্ডপের দ্বারে এক কোলাহল শোনা গেল। এই ব্যাপারটী ময়মনসিংহের একমাত্র কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছিল।

তৃতীয় দিবস।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "সম্মিলন" নামে এক কবিতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বাবু পাঠ করেন। কবিতাটী এইদিনই লিখিত হয়। ইহাতে কবি গোবিন্দ দাসের পূর্ব্বদিনের কবিতার ভাব বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু কবিত্ব ছিল না। স্থানে স্থানে গোবিন্দ বাবুর ভাষাও আসিয়া পড়িয়াছিল।

তৎপরে "চন্দ্রকান্ত"-ভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব সমর্থনে বৃদ্ধ সাহিত্যিক অমর বাবু এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। এই দিবস শ্রীযুক্ত বিধুচরণ বটব্যাল "ভাষা শিক্ষার" কৌশল প্রদর্শন করেন। তারপর ভাষা সম্বন্ধে বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা সরস এবং অতি সময়োপযোগী হইয়াছিল।

অতঃপর ধন্যবাদের পালা পড়িল। ময়মনসিংহের বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ ময়মনসিংহের পক্ষে সমাগত অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তাঁহার ভাষা, স্বর-লালিত্য এবং বক্তৃতা-কৌশল সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ৭।৮ জন ময়মনসিংহবাসী অতিথিদিগের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিলেন। এ সহৃদয়তা প্রশংসনীয়। আমরা এই তিন দিন ধরিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়ের বক্তৃতা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। আজ তাহা পূর্ণ হইল। হীরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইয়াছিল। এমন সারগর্ভ মধুর বক্তৃতা অনেক দিন শুনি নাই। বেলা ১২টার পর সভা ভঙ্গ হইল।

সভা শেষ হইয়া গেল। আমরা এসম্বন্ধে ২।১টী মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না।

১। কলিকাতার জনৈক যুবক আগামী বর্ষে সাহিত্য-সম্মিলনকে কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে বাধা দিলেন কেন? কলিকাতা বঙ্গদেশের রাজধানী, সেখানে অধিবেশন হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয় কি?

২। এবারকার কার্য্যাবলী দৃষ্টে পূর্ব্ব বঙ্গবাসী ব্যক্তিগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কথায় ও কার্য্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য সমাজ-গঠিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ-পরিষদ "শাখা" ও নাকি কুমার জিতেন্দ্র কিশোর, সৌরীন্দ্রকিশোর প্রভৃতির সহায়তায় "মূলে" পরিণত হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক বিভাগ একরূপ অবধারিত। উত্তরবঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলনের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন পৃথক্ হইয়া যাইবে, আমরা তাহার সূচনা দেখিয়াছি।

৩। কোনও স্থান হইতেই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন এবং উদ্ধত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বাঞ্ছনীয়

নহে। আমরা এবার ২।৩টী প্রতিনিধির ঔদ্ধত্য ও অর্ব্বাচীনতা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

৪। আমাদের ঢাকার প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে দু'এক জনের ব্যবহার আমাকে ব্যথিত করিয়াছে।

৫। যাঁহারা আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এখানে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত দেখিয়া, কর্ম্মকর্ত্তাগণকে অযথা আক্রমণ করিতেছিলেন! হায়—রসনা!

৬। কলিকাতার জনৈক যুবক সাহিত্য-সেবীর পূর্ব্ববঙ্গ-বিরাগ দেখিয়া সুখী হইয়াছি। এই সকল ব্যক্তির বিরাগে যদি আমাদের চৈতন্য হয়, যদি পূর্ব্ববঙ্গের ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠে, তবু ভাল।

এ সমুদয় খুঁটীনাটীর উল্লেখ অকর্ত্তব্য হইলেও অনাবশ্যক নহে। সত্য তিক্ত হইলেও উপকারী।

উপসংহারে ময়মনসিংহের জমিদারবর্গের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (জমিদার মস্থয়া) মহাশয়ের প্রশংসার ধ্বনিতে ময়মনসিংহ প্রতিধ্বনিত। শুনিলাম, তাঁহার চেষ্টায় এখানকার দলাদলির অবসান এবং তাঁহার চেষ্টায় সম্মিলন-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আমরা এই তিন দিন তাঁহার পরিশ্রম, মধুর ব্যবহার, সর্ব্বদর্শিনী শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। মণ্ডপের টিকেট-মাষ্টার রমেশচন্দ্র সেন নামক ব্যক্তি কতিপয় ছাত্রকে টিকেট না দিয়া বিমুখ করিলে নরেন্দ্র বাবু যাইয়া ইহাদিগকে টিকেট লইয়া দিলেন। অর্থাৎ সমুদয় কার্য্যেই ইঁহার উপস্থিতি আবশ্যক ছিল। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ২রা তারিখ রাত্রিতে আমার বিছানায়, আমার জনৈক বন্ধুর সঙ্গে, একটী অনিন্দ্য সুন্দর-কান্তি, সুবর্ণ চশমাযুক্ত সহাস্য-বদন যুবক আসিয়া উপবেশন করিলেন। শুনিয়াছি, ইনিই "তীর্থ আজি" সঙ্গীত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী! তাঁহার ব্যবহারে ও মধুর কথায় আমি নিজকে ধন্য মনে করিয়াছি। ময়মনসিংহের জমিদারগণের সৌজন্য এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় বটে! ইঁহাদের ধনগর্ব্ব, পরিচ্ছদের গর্ব্ব, আসনের গর্ব্ব, আভিজাত্যের গর্ব্ব, শিক্ষার গর্ব্ব, যেন কিছুই নাই। ইঁহারা ধন্য, ময়মনসিংহ ধন্য! ইঁহাদের দর্শন লাভে আমরাও ধন্য!

আমরা ময়মনসিংহ শাখা পরিষদের কয়েকটী ত্রুটীর উল্লেখ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

১। শাখা পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত পরমেশ প্রসন্ন রায়, বি-এ, মহোদয়কে কোনও পরামর্শ সভায় ডাকা হইয়াছিল কি?

২। স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণকে আহ্বান করা হয় নাই কেন?

৩। জেলার অন্যতম প্রবীণ সাহিত্যক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল কি? তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত বলিয়া—তাঁহার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় না হইলে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কি সভায় উপস্থিত ছিলেন না?

৪। "বরিশাল-হিতৈষী"র সম্পাদক ও অশ্বিনী বাবুর কি নিমন্ত্রণ হইয়াছিল?

ময়মনসিংহের এই সকল ত্রুটী প্রকৃত হইলে ত্রুটী অমার্জ্জনীয় বটে।

কেহ কেহ নাকি ময়মনসিংহ সম্মিলনের কার্য্যবিবরণী লিখিবার ভার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর হাতে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহে কি সাহিত্য-সম্মিলনের একটা রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার লোকও মিলে না; যাঁহারা এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন—তাঁহারা ধন্যবাদার্হ বটেন! সুখের বিষয়, প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সকল দিক দিয়া দেখিলে ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্মিলন এক বিরাট ব্যাপার হইয়াছে! ইহার সফলতাও অতি প্রশংসনীয়!

সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবী মহোদয়গণের পরস্পর পরিচয় ও আলাপ একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা সাহিত্যসেবী নহি, কিন্তু সাহিত্যসেবীবর্গের অনুগমন করিয়াছিলাম বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, মহারথী, অর্দ্ধরথী, পদাতিক সাহিত্যিকগণ আমাদের মত লোককে 'কলিকা' দিতে বড় বেশী প্রস্তুত ছিলেন না!

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৩)

ময়মনসিংহের প্রদর্শনী।

বর্ত্তমান বর্ষে ময়মনসিংহ নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে সাহিত্যসেবিগণ আগমন করিয়া ময়মনসিংহকে তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন! তাঁহাদের পদার্পণে আমরা নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে এবার ময়মনসিংহবাসী এক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। চৈত্র মাসের শেষ তারিখে এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। জনপ্রিয় উদারচেতা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লাকউড্ স্বয়ং প্রদর্শনীর দ্বারোন্মোচন করিয়াছিলেন। সেদিন ময়মনসিংহের জমিদারবর্গ ও সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গে প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা এবং সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম-এ, বি-এল এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম-আর-এ-এস মহোদয়দ্বয় প্রদর্শনীর বিবরণী সম্বলিত রিপোর্ট পাঠ করেন। অতঃপর প্রদর্শনীর উপযোগীতা সম্বন্ধে সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এক সারগর্ভ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ভাগলপুরবাসীগণ প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত সাহিত্য-প্রদর্শনীর এই সম্বন্ধ ভাগলপুরে ব্যবস্থিত হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্য ও ঐতিহাসিক-সম্পদের প্রথম প্রদর্শনী ময়মনসিংহের সারস্বত সমিতিতেই ১৩০৫ সালে সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

১৩০৫ সালের সাহিত্য-প্রদর্শনীতে কেবল মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এবার এই সাহিত্য-প্রদর্শনীতে প্রত্নতত্ত্ব, ঐতিহাসিক চিত্র, ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ, এই চারিটী বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১ম ঐতিহাসিক চিত্র বিভাগ।—এই বিভাগে (সুসঙ্গ রাজধানী হইতে সংগৃহীত) বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায়ের গৃহদেবতা, প্রাচীন রাজগৃহ মাধববাড়ীর ভগ্নাবশেষ, কিশোরগঞ্জ হইতে সংগৃহীত ঈশাখাঁর গুপ্ত

রাজধানী, জঙ্গলবাড়ীর চতুর্দ্দিক-বেষ্টিত পরিখা, এগারসিন্দুর দুর্গ, ঈশাখাঁর কামান, প্রামাণিকের একুশরত্ন, জলটঙ্গী, অতিথিশালা, নবরঙ্গ রায়ের দীর্ঘিকা, রাজা গাণিক্য রায়ের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন, কবি দ্বিজ বংশীদাসের মঠ, ঐতিহাসিক স্থান ও দ্রব্য সমূহের আলোক-চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। টাঙ্গাইল, মধুপুর হইতে জয়সিংগীরের ভগ্ন দুর্গ, নবরত্ন, যশোধর নৃপতির মদনগোপাল ও তাহার প্রাচীন রাজ-ধানী ফলদার ভগ্নাবশেষ, রাজ গোলাবাড়ীর রাজা বসন্ত রায়ের রাজভবন, নারলার ধ্বংসাবশেষ,আটীয়া হইতে সাহেনসার মসজিদ, করটীয়ার মসজিদ, সেরপুরের রঘুনাথজীর মন্দির, ভোগবেতালের গোপীনাথজীর মন্দির, রামগোপালপুর হইতে তাওপুর কেল্লা, বোকাইনগর কেল্লা, রোয়াইল বাড়ীর সুরম্য রাজভবনের শেষ চিহ্ন প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের আলোক চিত্র ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে।

২য় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।—এই বিভাগে প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রাদি রক্ষিত হইয়াছে। পরগণা নসিরুজিয়ালের অন্তর্গত মোয়াজ্জমাবাদে এক সময় টাকশাল অবস্থিত ছিল। ইক্লিম মোজ্জমাবাদের টাকশালের টাকা, রাজা গৌরীনাথ সিংহ ও ব্রজনাথ সিংহ নামীয় বঙ্গাক্ষরে অঙ্কিত মুদ্রা, সুসঙ্গ পাহাড়ে প্রাপ্ত প্রাচীন কালের অদ্ভুত গ্রন্থ, সুসঙ্গের রাজা-দিগের ব্যবহৃত কামানের গোলা, বহু প্রাচীন কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক, দেওয়াল গায়ের মসৃন আবরণী, ভবানীপুর ও অন্যান্য নানাস্থান হইতে সংগৃহীত প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্ত্তিসমূহ এই বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩য় প্রাচীন গ্রন্থ বিভাগ।—এই বিভাগে এই জেলার প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রূপনারায়ণ দাসের ও অন্ধকবি ভবানী দাসের চণ্ডী, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত,অনন্ত দত্তের ক্রিয়াযোগসার, কৃষ্ণদাসের বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী, রাজা রাজসিংহের রাগমালা, দ্বিজ বংশীদাসের কৃষ্ণগুণার্ণব, বৈদ্য রঘুদাসের স্বরূপচরিত, গঙ্গানারায়ণের ভাস্করপরাভব, জগন্নাথ দেবের হাড়মালা, মুক্তারাম নাগের কালীপুরাণ, বিষ্ণুরাম নন্দীর উদ্ধবগীতা, রাজা জগন্নাথের জগদ্ধাত্রী গীতাবলী, রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহের পদ্মপুরাণ ইত্যাদি অন্যান্য বহু কবির গ্রন্থ ও প্রাচীন দলিলাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

৪র্থ ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ বিভাগ।—এই বিভাগে এই জেলার বহু গ্রামের ও বহু শ্রেষ্ঠ পরিবারের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলি অকিঞ্চিৎকর কি না, ইহার বিচার বর্ত্তমান সময় হইতে পারে না। এগুলি কি পর্য্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে,তাহার সূচী মুদ্রিত করিয়া প্রদর্শনী কক্ষে রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগে এই জিলার ভাষা, প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য, ব্রতকথা প্রভৃতিও সংগৃহীত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর সহিত বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্র, হস্তশিল্প, বয়ন-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, ধাতব শিল্প প্রভৃতিও সংগৃহীত হইয়াছিল। হস্তী দন্তে নির্ম্মিত চেয়ার, পাটী, শাখার দ্রব্য, শঙ্খের বিবিধ খেলানা, উলের কাজ, কার্পেটের কাজ ও কতিপয় সূচী-শিল্প প্রত্যেক দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। চিত্র বিভাগে বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়ের চিত্রখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল। স্থানীয় হোমিওপ্যাথি স্কুল, ন্যাশনাল স্কুল, জেলাস্কুল প্রভৃতির ছাত্রগণের পেন্সিল চিত্র, প্রবোধ কুমারের কৃত আনন্দমোহন

বসুর চিত্র, ও বিজয় বাবুর অঙ্কিত চিত্র উল্লেখযোগ্য। কতিপয় উৎকৃষ্ট তৈলচিত্রও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সুসঙ্গ রাজধানী হইতে আনীত অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের শ্রমণ মহোদয় পাঠ করিয়া উহা প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের অনুবাদ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। গ্রন্থের পাতাগুলি কি পদার্থে নির্ম্মিত, তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই।

প্রদর্শনীর দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহে হেমনগরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, সেরপুরের শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নবগ্রাম) শ্রীযুক্ত কুমার সৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (রামগোপাল পুর) শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

"বাণার (Banar) নদীর বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা ভূতত্ত্ববিদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

প্রদর্শনীর সুশৃঙ্খলা বিধান জন্য প্রবীণ সাহিত্যিক সিটি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম-এ বি-এল, শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বিদ্যাবিনোদ এবং ছাত্রগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ময়মনসিংহ-বাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মহিলাগণের জন্যও একদিন প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটিত ছিল। দুঃখের বিষয়, এ ব্যবস্থাসত্ত্বেও কতিপয় ব্রাহ্মমহিলা অন্যান্য দিনেও প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে একটু অসুবিধা হইয়াছিল। আমরা এই ভাবের সমর্থন করিতে অক্ষম।

এবারের প্রদর্শনীতে আমরা ময়মনসিংহের বিভিন্ন বিভাগের ঐতিহাসিক সম্পদ দেখিয়া হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছি। আমরা ভরসা করিতেছি, অদূর ভবিষ্যতে ময়মনসিংহের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত প্রণীত হইবে। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তুই কেন?

তুই কেন ব'সে হেথা ?
এ যে বীরের জগৎ,
এ যে কর্ম্মের জগৎ,
এ যে ন্যায়ের জগৎ,
হেথা তুই কেন ব'সে বৃথা ?

২

দূর হ' এখান হ'তে।
তুই যা চলি সেই জগতে,
যেথা ভীরুর রাজ্য ;
নাহিক কার্য্য,
অলস জড়ের দেশ ;
যেথা নাহি কর্ম্ম,
যেথা নাহি ধর্ম্ম,
ন্যায়ের নাহিক লেশ।
যেথা, কথা কাটাকাটী সার,
বৃথা কচ্‌কচি,
শুধু হিজিবিজি,

কথায় ক্ষুরের ধার।
তুই কেন হেথা ব'সে ?
তুই যা না চলি সেই দেশে।
হেথা এ জগতে
এ কর্ম্মজগতে,
তুই কি লাজে বসিস্ এসে ?

৩

হেথা উধাও হইয়া
গগনে উড়িয়া
গ্রহ তারাগণে ল'য়ে,
ভাঙ্গিতে গড়িতে,
উঠিতে পড়িতে,
হইবে ব্যাকুল হ'য়ে।
হেথা অভীষ্ট সাধিতে
সাগর নদীতে
ডুবিতে হইবে কভু ;
ভেদি' মরু গিরি,
আপনা পাসরি
কর্ম্মেরে করিবি প্রভু।
হেথা অনল অনিল,
আকাশ সলিল,
বজ্র শকতি দেয় ;
জীব জড়ে হেথা
একত্র হইয়া,
বিশ্ব বুঝিয়া লয়।
তুই কি আশায় হেথা ব'সে ?
প্রতি অঙ্গ তোর,
প্রতি গ্রন্থি তোর
পচিয়া পড়িছে খ'সে।
তুই কি আশায় হেথা ব'সে ?

৪

হেথা উষ্ণ শোণিত
ঝরি অগণিত
মুকুতা প্রসব করে ;
তোর শীতল সলিলে পূর্ণ ধমনী
হেথায় কিসের তরে ?
হেথা অদম্য সাহস, অনন্ত আশা,
অক্লান্ত ধারণা, একান্ত শ্রম,
উদ্দাম আবেগ, অচ্ছেদ্য একতা,
হেথা প্রতিষ্ঠিত একাগ্র মন।

৫

তুই কোথা পাবি সে একাগ্র মন ?
তোর শুধু তর্ক, দ্বিধা, নিরুদ্যম ;
তুই জীর্ণ কন্থা উলটি পালটি
বড়ই বিচক্ষণ।
তোর অলস বিজ্ঞতা,
বিজ্ঞ জড়তা—
তুই বড় বিচক্ষণ।
তুই প্রতি পদে পদে দিন গণে যাস্,
বার গণে যাস্ তুই ;
কি জানি কি হয়, সদা এই ভয়,
বাঁচিয়া মরিস্ তুই।
তোর জীবনের মায়া কভু ফুরাবে না,
মলি মলি বলি আকুল প্রাণ,
যেন তু' অমর [illegible]
[illegible] নয়ায় তোর অচল [illegible]।

৬

[illegible] ক্ষুদ্র ধূলি কণা
ধরি [illegible]ষ্টি বাঁধি,
তুই ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড জড়াই ধরি
বাঁধিস কালের নদী।
একবার দেখিস না তুই,
একবার ভাবিস না তুই,
হাসিছে জগৎ-জন ;
তোর [illegible] উড়ে [illegible]
নদী [illegible]
শুধু হাসিছে জগৎ-জন।
জগতের ঘৃণা, জগতের তুচ্ছ,

জগতের টিটিকারী
বহিস মাথায়, ওরেরে নির্লজ্জ
ভারতের নর-নারী!
তোরে দেখি সবে ফিরায় মুখ,
তোরে দেখি সবে ফুলায় বুক,
তোরে দূরে রাখে পদাঘাতে;
দেয় না আসিতে,
দেয় না ছুঁইতে,
তুই অস্পৃশ্য এ জগতে।

তবুও রে তোর জীবনের মায়া,
তবুও রে তোর দেহের আশা,
চাস না ছাড়িতে,
চাস না ভুলিতে,
এম্‌নি রে তোর মোহের নেশা!
যাক্, জীবনের কথা যাক্,
যাক্, দেহের ও কথা থাক্,
পারিস কি তুই ছাড়িতে একটী কড়ি?
বিন্দুমাত্র তোর স্বার্থে হাত প'লে
বীভৎস চীৎকার করি ভূমণ্ডলে
যাস ধরায় গড়াগড়ি।
তুই কিছুই দিবি না,
জগতেরে তুই কিছুই দিবি না;
কিছুই পাবিনা;
তুই জানিস না বিনিময়;—
তুই শুধু চাস্
হাত পাতি, মুখ পাতি, তুই শুধু চাস্,
ভিক্ষা মাগি মাগি ধারে ধারে যা'স্,
তাই তোর সব আশা বৃথা হয়।
তুই আজি কলঙ্কিত,
আজি উপেক্ষিত,
তোর এখানে নাহিক স্থান।

তোর নাহি কর্ম্ম,
তোর নাহি ধর্ম্ম,
মান কিবা অপমান।

৮

তাই বলি, তুই যা না চলি
যেথা ভীরুর রাজ্য,
নাহিক কার্য্য,—
অলস জড়ের দেশ,
তুই সে দেশে কর্ প্রবেশ।
তুই কেন ব'সে হেথা?
এযে কর্ম্মের জগৎ,
এযে ন্যায়ের জগৎ,
হেথা তুই কেন ব'সে বৃথা?
পরপুষ্ট, হ'স না রুষ্ট,
জগতে নাহিক স্থান;
জীবের ধর্ম্ম কেবল কর্ম্ম,
মান কিবা অপমান।

আপনারে যদি চিনিস্ তোরা,
আবার পূর্ণ হইবে ধরা।
কেবা তোরা সবে, জনম কোথায়,
কি হেতু জগতে, কিবা পরিচয়;
জগতে তোদের কোথায় স্থান;
জানিস যদ্যপি, বুঝিস্ যদ্যপি,
তবে অনন্তের পাবি সন্ধান।
জ্ঞানের রাজ্যে, কি ঐশ্বর্য্যে,
বাজিয়া উঠিবে তোদের ভেরি!
আপন আসন পাইবি তখন;—
যেমন ছিলিরি হইবি তেমন,
ভারতের তোরা ধন্য নরনারী।

শ্রীশশধর রায়।

বঙ্কিমচন্দ্র।

রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ওই পদগৌরবে বঙ্গভাষা যথেচ্ছভাবে চলিতে পারিতেছিল না, বাঙ্গালা গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, 'মেঠো' গ্রাম্য পথে, পুষ্করিণীর ঘাটে, দিদিমার রূপকথার সভায় যাতায়াত করিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা, যোগ্যতা বা অবসর ছিল না, সে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে পারিত, দার্শনিক গবেষণা করিতে পারিত, উহা কেবল মাতামহী সংস্কৃত ভাষার জোরে। এক কথায় এক পুঁথি ব্যক্ত করিতে, কটাক্ষে 'তাক্' লাগাইয়া দিতে, হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে, পারিত না। তাহার জন্য, সমুচিত দৃষ্টান্ত শিখাইবার জন্য, প্রতিভার আবশ্যক ছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা।

কথা কহিতে, কথা শিখাইতেও প্রতিভার আবশ্যক। বলিতে কি, প্রতিভার প্রধান পরিচয় এই কথায়। একই অভিধানের শব্দ, সকলেই হয় ত জানি; কিন্তু কেহ প্রতিভার লক্ষণযুক্ত কথা কহিতে পারি না, এই স্থলেই পার্থক্য। কথার বাঁধুনীতে অনির্ব্বচনীয়তা আছে, বিশিষ্ট পরিচিহ্ন ও ছন্দ আছে—বর্ণ আছে। সেই বর্ণ, যাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয়, তাহারই প্রাণের বর্ণ—অভিধান ব্যাকরণের বাহিরে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় এইরূপ বর্ণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা হাসিতে, নাচিতে, ছুটিতে, কাঁদিতে জানিত; প্রেম করিতে, কলহ করিতে, যুদ্ধ করিতে জানিত; ঘৃণা করিতে, আস্ফালন করিতে, ভীত ও বিস্মিত, শান্ত স্তিমিত হইতে জানিত, বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব শান্তমতী এই সরস্বতী। বিশ্বভাবে, সমগ্র হৃদয় বলে বিভোর হইবার শক্তি ইহার আছে, অথচ ইহার মধ্যে কোনরূপ ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা নাই; তাই, বঙ্গসাহিত্যে ইহার আবশ্যকতা ছিল। রামমোহন তর্ক করিতে, নিরস্ত করিতে, ধ্যানস্থ করিতে জানিতেন; কেশবচন্দ্র উদ্দীপ্ত করিতে, অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন, বিদ্যাসাগর বুঝাইতে, কাঁদাইতে জানিতেন; সঞ্জীবচন্দ্র দেখাইতে, দীনবন্ধু হাসাইতে জানিতেন; বঙ্কিমচন্দ্র ন্যূনাধিক সমস্ত এবং তাহারও অধিক জানিতেন। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণগঠিত—পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে কোন অযথা দৌর্ব্বল্য বা প্রাবল্য নাই। তাঁহার ভাষা ও ভাব, অর্থ ও ছন্দ পরস্পরকে ব্যভিচারিত করে না। সম্পূর্ণ আত্মসিদ্ধ এই সরস্বতী—শ্রেষ্ঠ কাব্য-শিল্পীর উপযুক্ত। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমের আবশ্যক ছিল।

আমরা অদ্য এই পূর্ণবয়স্ক ও সম্পন্ন বাক্যার্থ প্রতিভার সংসর্গ করিব; শিল্পীর ও শিল্পের অন্তস্তত্বে দৃষ্টি করিব। কোন রচনা বা কোন শিল্পীই পরস্পর সম্পর্কহীন বা সূত্রহীন পদার্থ নহে। প্রত্যেক অকৃত্রিম ও অকপট কবির কাব্য ও জীবন অপরিহার্য্য ভাবে—কার্য্য কারণ সূত্রে সম্বদ্ধ। অমর শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সংসর্গ করিতে, অন্তরঙ্গ

পরিচয় করিতে আনন্দ আছে, পুণ্যও আছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে একটা বিশিষ্ট ভাবের ও আদর্শের পীঠস্থান। আমরা সেই পীঠস্থানে যথাযোগ্য ভক্তির সহিত তীর্থযাত্রা করিব, বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মা যেই ভাব-যাত্রা করিয়াছিল, তাহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব। দোষ দর্শনের আবশ্যক নাই—দোষ দর্শনে পুণ্য নাই। মনুষ্যাকৃতি মাত্রেই ন্যূনাধিক দোষাবহ না হইয়া পারে না। উত্তরাধিকারীর যাহা পরম স্বত্ব—পূর্ব্ববর্ত্তীর রিকৃথ ভোগ, তাহাই অগ্র লাভ করিতে চেষ্টা করিব। বঙ্গসাহিত্যে শিল্পীর সংখ্যা পরিমিত, সর্ব্বত্র ভাবুকের সংখ্যাই বেশী। বঙ্কিমচন্দ্র একজন সম্পূর্ণ শিল্পীর দৃষ্টান্ত—নানাদিকে বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভের যোগ্য। বাঙ্গালী আমরা, এই সৌভাগ্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করিব।

দুর্গেশনন্দিনী।

দুর্গেশনন্দিনী গ্রহণ করুন—নবজাগ্রত প্রতিভা শিশুর খেলা! কিন্তু অকাল-জাগ্রত নহে। পূর্ণগঠিত শিশু হৃদয়ের নব বলে বিহার করিতেছে; উহা একটা test শিল্প—আত্ম পরীক্ষার চেষ্টা। দুর্গেশনন্দিনীর অন্য উদ্দেশ্য নাই—উহা প্রতিভার ব্যায়াম-ক্রীড়া মাত্র—শক্তিমান্ ব্যক্তি, অজ্ঞাত বলে বলীয়ান্ ব্যক্তি আস্ফালন করিতেছে! প্রতিভা কি করিবে, তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি, শিল্পের উদ্দেশ্য কি, এইরূপ কোন প্রশ্ন যুবকের মনে উদিত হয় নাই। বলিতে পারেন—তখনও তাহার আদর্শ art for art's sake.

কপালকুণ্ডলা।

তার পর কপালকুণ্ডলা। সমুদ্র-পারবাসিনী প্রতিভার আনন্দ-স্ফূর্ত্তি এই কপালকুণ্ডলা। কবি আপনাকে চিনিয়াছেন; আপন হৃদয়ের প্রতিভা মূর্ত্তির পরিচয় পাইয়াছেন, কিন্তু সে তখনও বন্য,—অসামাজিক—সামুদ্রিক। কবি সমাজ-পরিচ্ছদের অন্তরালস্থিত মনুষ্যের বন্য নগ্ন মূর্ত্তিকে চিনিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজে তাহার স্থান কোথায়, তাহার অদৃষ্ট কি, তাহাও বুঝিয়াছেন। তাঁহার সেই জ্ঞান, সেই ভাবযুক্ত মানুষকে না দেখাইয়া পারেন নাই। কবির লেখনীর স্বতঃস্ফূর্ত্তি অপরিহার্য্য ছিল, তাহাও আমরা বুঝিতেছি।

কপালকুণ্ডলার চিত্রাঙ্কনে কবির বিশেষ শিল্প-কারুকার্য্য নাই; তাঁহার অনুভব শক্তি কবি-জনোচিত প্রবল, ইহাই আমরা দেখিতেছি। স্বয়ং কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পাঠকের যথানুরূপ সহানুভূতি জন্মে না; পাঠক তাহার দুঃখদুর্গাত দর্শনে যথোচিত ব্যথিত হয় না। এই গ্রন্থে Poetic justice নাই; প্রকৃত স্থায়ী ভাব-ব্যক্তি বা ফলশ্রুতি নাই। উহা আদ্যন্ত অদৃষ্টবাদে পরিপূর্ণ—কিয়ৎ পরিমাণে গ্রীক অদৃষ্টবাদ। ভারতবর্ষে এইরূপ অদৃষ্টবাদের আদর নাই। কিন্তু, তবু কপালকুণ্ডলা 'ভাল লাগে'। তাহার হেতু কি? লেখকের প্রতিভা-পরিচয়। এই লেখকের প্রতিভায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার শক্তি আছে; তাই শত দোষ অসঙ্গতি সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলা সজীব, যে একবার তাহাকে দেখিয়াছে—গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, আগুল্ফলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশরাজী মধ্যস্থা সেই অকপট নিসর্গ বর্ব্বর প্রমদা মূর্ত্তি মানস-পটে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে, সে তাহাকে ভুলিতে পারিবে না। Elemental or Primitive মৌলিক মানব প্রকৃতি বর্ত্তমান সমাজে কত অসঙ্গত, কত 'খাপছাড়া'! তাহার সঙ্গে কত বিষয়ে আমাদের অন্যোন্যভাব নাই—

সহানুভূতি নাই! তাহার মরণ অনিবার্য্য, তাহাকে মারিয়াও শান্তি নাই, রাখিয়াও সুখ নাই। অদৃষ্টের এই নিদারুণ পরিহাস! তথাপি তাহার নির্দ্দোষ বর্ব্বরতা ও নিদারুণ অদৃষ্ট আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে!

কপালকুণ্ডলা স্বয়ং কবি বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিচিতা। তিনিও উহার ছায়ামাত্র দেখিয়াছেন; এবং ঐ ছায়াচিত্রই আঁকিয়াছেন। আপন হৃদয়-সিন্ধুর তীরে অপরিচিত আরণ্য দেশে তিনি এই অর্দ্ধ উলঙ্গ নিসর্গ-সুন্দরীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, নিজেও চিনেন নাই—পাঠককে তাহার সন্ধান দিয়াছেন মাত্র। উহা অধ্যাত্মভাবে তাঁহার স্বীয় অর্দ্ধপরিচিত প্রতিভাসুন্দরীর মূর্ত্তি! নবীনচন্দ্রের যেমন পলাশীর যুদ্ধ, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা—উভয়ের কোন অর্থ নাই,—Purpose নাই। তবু সুন্দর—অদৃষ্টপূর্ব্ব একক সৌন্দর্য্য! কপালকুণ্ডলা tale নহে—উপন্যাস নহে; উহা গদ্যরীতির কাব্য—নাটক—গ্রীক নাটক। কবি নিজে যাহা বুঝেন নাই, আমাদিগকে তাহা কি বুঝাইবেন? তবু উহার প্রাণ আছে—প্রতিভার প্রাণ। উহা অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—উহাকে ভাল লাগে। এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রতিভা-জীবনে একবার বই মিলে না। তাহার পরেই কবি আত্মজাগ্রত হন, সেই আধ-আলো-আধ-ছায়াময় উষামূর্ত্তি মুহূর্ত্ত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়; তাহার পর স্ফুট প্রকাশ! জাগ্রত ভাবে, তীব্র উদ্দেশ্য-গম্ভীর গ্রহণ-বর্জ্জনের-ক্ষেত্রে, প্রকৃত শিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশ! সেক্সপীয়রের প্রতিভাও এই উষাস্বপ্ন দেখিয়াছে—নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন দেখিয়াই কবি সেক্সপীয়র, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁহার প্রতিভা সর্ব্বোতোভাবে অনির্ব্বচনীয়, যিনি চিরজীবন অনুপমভাবে সত্য ও স্বপ্নের সামঞ্জস্যপুরে—আদিম বর্ব্বরতা ও সুমার্জ্জিত ধ্যান-কান্তির-মিলন-পুরে বাস করিতে গিয়াছেন ও পরিশেষে প্রস্পোরোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মায়াদণ্ড ভূপ্রোথিত করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন, সেই পরম মায়াবী সেক্সপীয়র!

বঙ্কিমচন্দ্রও কবি প্রতিভা-সম্পন্ন; তাঁহার প্রতিভা গল্পকথকের প্রতিভা নহে। ক্ষুদ্র খুঁটিনাটির মধ্যে বাক্যজাল বিস্তারে পাঠকের মনকে আবদ্ধ রাখাও তাঁহার art নহে। একমাত্র উদগ্র তুলিস্পর্শে তিনি এক একটী ভাব চিরতরে মনোমুদ্রিত করিয়া যান। তাঁহার ভাব-সংযম, তাঁহার প্রকাশের সংহতি-শক্তি অসাধারণ। উহা শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত।

মনে হয়, এই লক্ষণ—প্রতিভার এই নিরোদ্দেশ্য শিল্পমূর্ত্তি লক্ষণ যদি চিরস্থায়ী হইত, বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত জীবন যদি এই অবস্থায় থাকিতে পারিতেন, তবে কেমন হইত? একদিকে নিঃসন্দেহ সুন্দর মধুর প্রকাশ্য ও অনির্ব্বচনীয় হইত বই কি! কিন্তু উহা অসম্ভব। জীবন গতিশীল, সংসার জোর করিয়া 'খোঁচাইয়া' কবি প্রতিভায় কপালকুণ্ডলাকে নিজের অনুরূপ করিয়া তুলিবে; নতুবা তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। ইংরেজের মত শক্তি-প্রচণ্ড জাতি—ওই জাতীয় জীবনে এলিজাবেথ যুগ—এবং যুগস্বামী সেক্সপীয়রের সংযোগ জগতে আর দ্বিতীয়বার ঘটে নাই। কবিবিশেষেও এই নবজীবনাবস্থা সুলভ নহে। পলাশীর যুদ্ধ কবিজীবনে দ্বিতীয়বার বরিত হইতে পারে না—কপালকুণ্ডলাও নহে। কবি কীট্‌সের এইরূপ নিরুদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য বুদ্ধি

ছিল, নবেলের ক্ষেত্রে এমিলী ব্রণ্টীরও ছিল; কিন্তু উভয়েই অল্পায়ু; কেহই পূর্ণ বয়সে (the year which brings the philosophic mind) পদার্পণ করেন নাই, করিলে কি হইত, তাহা অনিশ্চিত। দেখিতেছি, সুইনবার্ণ অতিজীবী হইয়াও আর দ্বিতীয় আটলাণ্টা লিখিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পলাশী কিম্বা দ্বিতীয় কপালকুণ্ডলাও লিখিত হয় নাই।

এই পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তনের প্রত্যেক রেখা পরিদৃষ্ট হইতেছে। পলাশীর যুদ্ধের পরে নবীনচন্দ্রের যেমন রঙ্গমতী, কপালকুণ্ডলার পরেও তেমনি মৃণালিনী। স্বদেশের, স্বসমাজের দিকে, মনুষ্য সমাজের দিকে কবির দৃষ্টি গিয়াছে। প্রতিভা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছে। ইহার পর সে সামাজিক, দোষে গুণে সামাজিক; যাহা অপরিহার্য্য ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আত্মভাবিনী গিরিজায়ার মুখে বলিতেছে :—

সময়ে চলিনু আমি, হানে না ফিরাও রে!

কপালকুণ্ডলা tale বা উপন্যাস নহে, আমরা বলিয়াছি। উপন্যাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব কি? লেখক ও পাঠকের পরস্পর সহানুভূতি ও সহচারিত্ব। উভয়ে একই সমভূমে অকপট দাক্ষিণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন; লেখক পাঠককে চারিদিক দেখাইয়া, 'কথাবাত্রা' কহিতে কহিতে, স্বয়ং কাঁদিয়া হাসিয়া, পাঠককে তাঁহার সহানুভাবক করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। কথাবার্ত্তার প্রণালীর প্রধান গুণ পাঠকের নিজের শ্রম সামান্য; লেখকের নিজত্বও যৎসামান্য। পাঠকের নির্ভর বা সহানুভূতি লাভই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য; শিল্পকৃতির আদর্শ বা সৌষ্ঠব সৌন্দর্য্য রক্ষায় তিনি একরূপ নিশ্চিন্ত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সাহিত্য-জগতের উপন্যাস প্রণালী ইহার সাক্ষ্য দিবে। বলা বাহুল্য, কপালকুণ্ডলা সেই জাতীয় কথাবার্ত্তার গ্রন্থ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কহিয়া যাইতেছেন, সকল পাঠক তাহা বুঝিল কিনা, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই। এই নিরুদ্বেগ নিঃশঙ্ক আত্মনিষ্ঠা কেবল মাত্র কাব্য—নাটকেই সঙ্গত। পাঠক স্বয়ং জানিয়া কবির অনুসাধনা করিবেন। কবির পাঠকের দিকে মোটেই লক্ষ্য থাকে না—থাকিলে কাব্য হয় না।

মৃণালিনী।

কপালকুণ্ডলার পর মৃণালিনী। মৃণালিনী উপন্যাস হইতে চলিয়াছে; লেখক দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার উচ্চকণ্ঠ নামাইয়া আনিয়াছেন। মৃণালিনী তিলোত্তমার ভগিনী, হেমচন্দ্র, জগৎসিংহও নবকুমারের, গিরিজায়া বিমলার, মনোরমা কপালকুণ্ডলার বঙ্গীয় সংস্করণ—সামাজিক মিশ্রসংস্করণ, সর্ব্বোপরি দেশদর্শন ও দেশানুরাগের একটা নূতন বাতাস গ্রন্থখানির মধ্যে বহিতেছে—দেশের জন্য দশের জন্য ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থ উৎসৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই অনুরাগের কোন ফল হয় নাই, হেমচন্দ্রের বীরবাহু ও নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতীর ন্যায়, এই দেশানুরাগ কেবল অলক্ষ্যে নিরুদ্দেশ্য উচ্ছাসে ব্যয়িত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গালী লেখক কি করিবে? পলিটিক্স্ বা রাজনীতির ক্ষেত্রে সে নিজের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না; অথচ দেশানুরাগ ত প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিরই আছে! প্রতিভা জাগিয়া উঠিয়া সর্ব্বপ্রথম দেশের দিকে দৃষ্টি না করিয়া পারে না।

বঙ্গদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে এই দেশানুরাগের ফল কি হইল? দীর্ঘদিন চিন্তা করিয়া একটা পন্থা অবলম্বন করে নাই কি? প্রতিভা তাহা না করিয়া পারে না; তাহার কর্ম্ম করা আবশ্যক, সর্ব্বোপরি দেশে প্রতিষ্ঠাযোগ্য কর্ম্ম করা আবশ্যক, দেশের তখনকার অবস্থায় শিক্ষা নাই, আলোচনা নাই, চিন্তা নাই; কোনদিকেই বাঙ্গালীর মন খুলে নাই, বঙ্গভাষা, বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির পরম শক্তিনিদান সারস্বতকুঞ্জ প্রজ্বলিত হয় নাই; ঘরে ঘরে সাহিত্যের গার্হস্থ্য অগ্নিসেবা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই অভাবের দিকে বঙ্কিমের দৃষ্টি না যাইয়া পারে না; তাহার ফল 'বঙ্গদর্শন', সমস্ত বঙ্গদেশকে যেন প্রতিভা নখদর্পণে দর্শন করিতে, আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার আশাসমুদ্ভাসিত, একোদ্দিষ্ট প্রযত্নের নাম হইল 'বঙ্গদর্শন'। চিন্তা করিয়া দেখুন, রামমোহন রায়ের পর সাতকোটী বাঙ্গালীর মধ্যে আর একটী ব্যক্তি মাথা তুলিয়া বঙ্গদর্শন করিতেছে! কি দেখিতেছে? বাঙ্গালার সমাজ, পরিবার, রাজা-রাজ্য, সাহিত্য-সঙ্গীত, শিল্প-ইতিহাস, দর্শন-বিজ্ঞান, সমস্ত অণুবীক্ষণে ও দূরবীক্ষণে দর্শন করিতেছে।

ইহার ফল কি? বঙ্কিমচন্দ্র কেবল দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী ও দার্শনিক, উভয়; প্রবীণ 'বঙ্গদর্শন' তাহার সাক্ষ্য দিবে। 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গদেশে যুগান্তর সূচনা করিয়াছে। মনে জ্ঞানে যুগান্তর ভিন্ন, জীবনে কর্ম্মে যুগান্তর ঘটিতে পারে না। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যাহার সূচনা হইয়াছে, তাহার চক্র এখনো নিজের সম্পূর্ণ আবর্ত্তন সমাধা করিয়া ফিরে নাই; কে জানে কতদিন লাগিবে!

বিষবৃক্ষ।

বিষবৃক্ষ বঙ্গদর্শনে বাহির হইতে থাকে। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টচক্রে পড়িয়া বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, জীবনের মধ্যে এই বিষবৃক্ষ রোপণের নিদারুণতার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, মনে হয়। দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতেও 'সংশয়' এই বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, তাহার ফল সৌভাগ্যক্রমে ফলিতে পারে নাই। কপালকুণ্ডলায় অদৃষ্ট জয়ী হইয়াছে। বিষবৃক্ষ কতক অদৃষ্ট, কতক মানুষ স্বয়ং এই বৃক্ষ রোপণ ও সংবর্দ্ধন করিয়াছে; এবং কপালকুণ্ডলা ও মনোরমা কুন্দনন্দিনীরূপে উপস্থিত হইয়া এই ফল খাইয়া মরিয়াছে; নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখী অনেক ঘুরাঘুরি করিয়া কোনমতে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে আরও একাধিক ব্যক্তি এই বিষফলের আস্বাদ লইয়াছে। পারিবারিক জীবন ভিন্ন জাতীয়জীবন গঠিত হইতে পারে না, পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রথম সূক্ষ্মদৃষ্টি করিলেন। জীবনী পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিব, যত বড়, যত গভীরদর্শী, বিস্তৃতদর্শী কবি শিল্পী বা দার্শনিক হউক না কেন, মানুষ প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনের দুই চারিটী কথামাত্র ভাল করিয়া, পরকে বুঝাইবার উপযুক্ত করিয়া বুঝিতে পারে; অনুরূপ শক্তি সৌভাগ্য ঘটিলে তাহার প্রকাশ দ্বারেই অমরত্ব অর্জ্জন করিয়া যায়। ওই বিশেষজ্ঞানের জন্যই অন্য মনুষ্য তাহাদের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হয়—জগতে সর্ব্বত্র এই বিশিষ্ট অর্জ্জনেরই জয়! পরিবারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ একজন বিশেষ জ্ঞানী ও বিশিষ্ট শিল্পী। বিষবৃক্ষ বঙ্কিমের প্রথম পারিবারিক উপন্যাস।

কিন্তু, এই ক্ষেত্রে এতদপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর শিল্পকীর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহার অন্তর্লোকে কপালকুণ্ডলার কল্পনাশক্তি ও বিষবৃক্ষের সূক্ষ্মদৃষ্টি একত্রে সমুচিত অভিব্যক্তি খুঁজিতেছিল, নবকুমার, হেমচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ, এই তিন ব্যক্তি সর্ব্বসদ্‌গুণ-সাকুল্যে একত্র হইয়া একবার রণজয়ীর অভিনয় প্রদর্শন করিতে চাহিতেছিল—প্রতাপ প্রদর্শন করিতে চাহিতেছিল। সুতরাং নিরীহ কুন্দনন্দিনীকে তাহার 'নীরবমাধুরী' বর্জ্জনে শৈবলিনীরূপে পরম রূপসী ও বিলাসিনী মূর্ত্তিতে প্রতাপের প্রতিকূলে উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। ইহার ফল চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখরে প্রতাপ মরিয়াছে, কিন্তু ওই মরণের নাম প্রকৃতপ্রস্তাবে 'রণজয়', বিলাসিনী শৈবলিনীর বিষবৃক্ষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য চন্দ্রশেখরের উন্নতলক্ষ্য, স্থিরসংযত প্রীতিমূর্ত্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে। পুনশ্চ শৈবলিনীর তরফেও দাম্পত্য-আদর্শের মানসিক ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ করিতে হইয়াছে। দাম্পত্য আদর্শে মানসিক ব্যভিচার করিলেও গুরুপ্রায়শ্চিত্ত! চন্দ্রশেখর উপন্যাস,—গার্হস্থ্যজীবনের বিষবৃক্ষ বিজয়ের ইতিহাস! কবিরাজ এইস্থলে বিষব্যাধির সুস্পষ্ট প্রতিকার নির্দ্দেশ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। তবু চন্দ্রশেখরেও কিঞ্চিৎ অদৃষ্ট আছে, শৈবলিনী তাহা চন্দ্রশেখরকে শুনাইয়া দিয়াছে—"আমরা (প্রতাপ ও শৈবলিনী) এক বৃন্তে দুই ফুল ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়াছিলেন কেন?" লালসাবিনাশিনী শৈবলিনীর পক্ষে গ্রহকীট চন্দ্রশেখরও সামান্য 'অদৃষ্ট' কি?

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় শিল্পী; আমাদের পরম আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি কেবল য়ুরোপীয় ঔপন্যাসাদর্শের অনুকরণ করিতে যান নাই। স্বীয় অন্তঃকরণতত্ত্বের প্রবল স্বাতন্ত্র্যবশে, কতকটা জাগ্রত ভাবেই তিনি য়ুরোপীয় সংশ্রব যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রণয় পূর্ব্বক বিবাহের প্রতিষ্ঠা নাই—প্রথম রচনা দুর্গেশনন্দিনীতেও, তাই বঙ্কিম, তদুদ্দিষ্টভাবে প্রণয়পূর্ব্বতার অবতারণা করেন নাই। আবার, ভারতবর্ষীয় দাম্পত্য আদর্শে পরিণয় কেবল চুক্তি নহে, এই আদর্শে ব্যভিচার করিয়া দম্পতি নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিশেষে পুনর্ম্মিলিত হইতে পারেন না। দাম্পত্য আদর্শে, যাহা ভাঙ্গে, তাহা আর পূর্ব্ববৎ জোড়া লাগে না। রাণী ভবানী সিরাজদ্দৌলাকে লিখিয়াছিলেন:—"স্ত্রীলোকের সতীত্ব মৃৎপাত্রের ন্যায়, ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগে না।" জুড়িয়া দিলেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্ত্তিনীর মতন সেই অতীত পাপছায়া দম্পতির মিলনমধ্যস্থলে জাগিয়া থাকে। এই তত্ত্ব নির্দ্দয়, নির্ম্মম হইতে পারে; কিন্তু ইহা অধ্যাত্মজীবনের চিরন্তন সত্য। তাহাকে উপেক্ষা করার যো নাই।

চন্দ্রশেখর লিখিতে লিখিতেই বোধ করি, বঙ্কিম প্রবীণ প্রাচ্য ঋষির সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই সত্য দর্শন করিয়াছিলেন। তাই, নিদারুণ নির্দ্দয়ভাবে কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি, শ্রেষ্ঠ পারিবারিক উপন্যাস, উহার পরিসর-ক্ষেত্র ক্ষুদ্র একটী মাত্র বঙ্গীয় পরিবার। উহার মধ্যে, কপালকুণ্ডলা কিম্বা চন্দ্রশেখরের কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের

অবকাশ নাই। কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই বঙ্কিম যে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। উহা বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ইংরাজী সাহিত্যেও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। দাম্পত্য প্রেমের এই পরম সূক্ষ্ম আদর্শ প্রাচ্য ঋষির আবিষ্কার। বঙ্কিমচন্দ্রের, পরে এই আদর্শে ইংরাজী সাহিত্যে Rita একটী নবেল লিখিয়াছেন, Sarah Grand এর বহু প্রসিদ্ধ Heavenly Twins ও এই আদর্শ স্থাপন করিবে। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থ বঙ্কিমের পরবর্ত্তী—তাঁহারা বঙ্কিমের পন্থার চলিয়াছেন কিনা, জানিবার আবশ্যকতা নাই। য়ুরোপে এই জাতীয় উপন্যাস বা নাট্যকবির এরূপ পথপ্রদর্শক নরোয়ের কবি ঈবসেন; তিনি তখনও এই জাতীয় গ্রন্থ হস্তে আসরে নামেন নাই। কৃষ্ণকান্তের উইল ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে এবং ইহাও সত্য যে, ইংরাজী নবেলিষ্টগণ প্রাচ্য অথবা অপরিজ্ঞাত কোন গ্রন্থ পাইলে ব্যাঘ্রের মত তাহার তত্ত্বকে গ্রাস করিতে চাহেন। তন্মধ্যে কোন অভিনব শিল্পাদর্শ পাইতে পারিলে অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতের 'তাক লাগাইয়া' দিতে পারা যায়, এই সুযোগ সন্ধানে য়ুরোপীয় সাহিত্যিকগণ প্রাচ্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ-লেখকগণ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে কোন সাহায্য পাইয়াছেন কিনা, জানি না; উভয়ই রমণী, তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির প্রণালীতে দাম্পত্য-ধর্ম্মের এই লক্ষণ স্ফূর্ত্ত হওয়া অসম্ভব নহে। যাহাই হোক, বঙ্কিমের কৃতিত্ব কোনমতেই ক্ষীণ হয় না। কথিত গ্রন্থচয় হইতে শিল্পগৌরবে, সমাধানে ও আদর্শ বিষয়েও কৃষ্ণকান্তের উইল শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র কি দেখাইয়াছেন? পাঠক, বঙ্কিমের আদর্শ ও তাঁহার মৌলিক ভাব-প্রবাহের গতি ও অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিবেন—বিষবৃক্ষে রমণী কুন্দনন্দিনী বিষ-ফল খাইয়া মরিয়াছে, পুরুষ নগেন্দ্রনাথ নানা পাকচক্রে সারিয়া উঠিয়াছেন, হতভাগিনীর শ্মশানক্রিয়া সমাধা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সূর্য্যমুখীর সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছেন, চন্দ্রশেখরে রমণী শৈবলিনীকে দাম্পত্যধর্ম্মের মানসিক ব্যভিচারের দরুণও মৃত্যুবৎ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে; যেরূপে হউক, বিজয়ী প্রতাপকেও মরিতে হইয়াছে। এই চন্দ্রশেখর রচনার শেষে সুত্রসঙ্গতিবশে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যেন এক অলৌকিক সূক্ষ্মতর তত্ত্ব সমুদিত হইয়াছে। উহা তাঁহার নিজস্ব; কৃষ্ণকান্তের উইলের সর্ব্বস্ব। দাম্পত্য ধর্ম্ম ও দায়িত্ব কি পরস্পর নহে? ব্যভিচারে কি কেবল রমণীরই প্রায়শ্চিত্তবিধি, পুরুষের নহে? দাম্পত্য আদর্শ হইতে স্খলিত হইলে, বিষবৃক্ষের ফল খাইলে কি পুরুষকেও মরিতে হইবে না? চিরকালের জন্য সত্যচ্যুত হইতে হইবে না? এই চিন্তার ফল কৃষ্ণকান্তের উইল।

এই গ্রন্থে কুন্দনন্দিনী ও শৈবলিনী আসিল, প্রচ্ছন্নকুলটাবৎ লালসালিপ্সাময়ী বিধবা রোহিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছে; নগেন্দ্রনাথ মৌলিক সদ্গুণ গরিষ্ঠ গোবিন্দলালের মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছেন। সূর্য্যমুখী কৃষ্ণাঙ্গী ভ্রমররূপে অপূর্ব্ব আদর্শপ্রাণা ও ভারতীয় পতিপ্রাণা মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছেন। গোবিন্দলাল ব্যভিচার করিল, রোহিণীকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার দাম্পত্যরাজ্যে ফিরিতে চাহিল! ভ্রমর পতিপ্রাণা বটে, কিন্তু তাহার পাতিব্রত্যে ও পরমার্থে কিছুমাত্র

পার্থক্য নাই। যে পতি ব্যভিচার করিয়াছে—নরহত্যা করিয়াছে, তাহার সঙ্গে ইহজন্মে আর ভ্রমরের শারীরবন্ধন ঘটিতে পারে না। ভ্রমর স্বামীকে বলিয়াছিল—"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি", ভ্রমর নির্ম্মমভাবে গোবিন্দলালের প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইল—মরিল—গোবিন্দলালও মরিতে বাধ্য হইল।

ইহা একটা চরমপন্থীয় কথা, সন্দেহ নাই; এবং প্রবল পুরুষজাতির অসন্তোষজনক, কিন্তু ধর্ম্মের আদর্শ—পবিত্রতার আদর্শ একবার মানিয়া লইলে, ধর্ম্মলঙ্ঘনে সমুচিত প্রায়শ্চিত্তই বিহিত। যে বঙ্কিমচন্দ্র পাপমতি শৈবলিনীর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ছাড়িয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পাপিষ্ঠতর গোবিন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান সঙ্গত ও স্বাভাবিক। "ভীমা পুষ্করিণী"র জলে নিমজ্জন ভিন্ন গোবিন্দলালের অন্য প্রায়শ্চিত্ত ছিল না।

আমরা এইস্থলে, এই পরম দাম্পত্যতত্ত্বদর্শী শিল্পীর ত্রিগাথার—বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইলের আত্মাভ্যন্তরে, কবির মনোগতির ও আদর্শের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে পারিতেছি। তিন গ্রন্থই পরম্পরাসম্পৃক্ত বিষফল ভক্ষণের ও প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস। ভারত-কবির পক্ষে ভারতবর্ষীয় আদর্শের যাহ সঙ্গত ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। অতঃপর বঙ্কিম আর এই সূত্রে দাম্পত্যধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করেন নাই,—এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের বা ধ্বংসলক্ষণের দিকে মুখ্যভাবে দৃষ্টি করেন নাই। এই ব্রাহ্মণশিল্পীর মর্ম্মেতিহাস পরম কৌতুকাবহ, তাঁহার মনোগতি অতঃপর কোন্ সূত্রে কোন্ ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইয়াছে, অগ্রসর হইয়াছে, আমরা তাহাই দেখিব।

রাজসিংহ।

কৃষ্ণকান্তের উইলের তত্ত্বাদর্শে উপনীত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় এক বিষম সমস্যায় পড়িল—অতঃপর কি করিবেন? তিনি দীর্ঘজীবন পারিবারিক আদর্শই চিন্তা করিয়াছেন, পরিবারের উন্নতিতেই সমাজের ও দেশের উন্নতি, এই ধারণায় লেখনীতৎপর হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার আর কি বক্তব্য আছে? এই ইতস্ততঃ ভাবের সময় তিনি পূর্ব্বরচনা রাজসিংহ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন—উহার পুনর্গঠন করিয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনীতে যে ঐতিহাসিক-সূত্রের জন্ম হইয়াছে, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখরে যাহার সূক্ষ্মতন্তু প্রসারিত না হইয়া পারে নাই, নবসংস্কৃত রাজসিংহে তাহারই অনুসরণ। কিন্তু অনুসরণ করিয়া কবি কোথায় গিয়াছেন? পারিবারিক আদর্শে, দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শেই উপনীত হইয়াছেন, সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ এবং অস্ত্রঝনৎকারের মধ্যে একটী কথা, একটী ঘটনাই কেবল আমাদের মনে চিরতরে বিদ্ধ হইয়া যায়—'বাদসাহ্জাদী প্রেম জানে না'। সেই স্থির প্রেমের রাজ্যে বাদশাহজাদীর কি গতি—কি পরিণতি, নবসংস্করণ রাজসিংহের উহাই মেরুদণ্ড।

কিন্তু ইহা প্রকারান্তরে পরিচিত ক্ষেত্রে বিচরণ মাত্র; গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হওয়া নহে। ততোধিক, এই রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে কবির স্বদেশ-প্রেম জাগ্রতভাবে আত্মপন্থা খুজিয়াছে—দাম্পত্য প্রেমের শুভ্রপন্থাও খুজিয়াছে—ভারতীয় আদর্শ খুজিয়াছে; তাহাই লক্ষ্য করিতেছি। বর্ত্তমানে এই পন্থা কি?

আনন্দমঠ।

এই চিন্তার ফল আনন্দমঠ। এই গ্রন্থে

স্বদেশ-প্রেম ও দাম্পত্য ধর্ম্ম সমগ্রসিক আদর্শ অন্বেষণ করিয়াছে, আনন্দমঠ রচনার সময় বঙ্কিমের বয়স ৫৩ বৎসর। স্বীয় শিল্প-প্রতিভার সুবর্ণ যুগের চরম রেখা তিনি অতিক্রম করিতেছেন। স্থবির গাম্ভীর্য্য ও দার্শনিকতার উদ্দেশ্য-পরিপক্কতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছিলেন। এই গ্রন্থ-শিল্প-সমাধান ও প্রাণশক্তিতে কৃষ্ণকান্তের উইল হইতে অগ্রসর না হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিত আদর্শের হিসাবে ইহার সামর্থ্য অসাধারণ। শিল্পক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেমের সন্দেহ ও ব্যভিচারভূমি বঙ্কিম চিরতরে পরিহার করিতেছিলেন, য়ুরোপীয় সমাজ সভ্যতার সম্পর্কও অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাই এই প্রেম আনন্দমঠে তাঁহার মানস-সূত্রসঙ্গতে, যেন সতর্কিত অথচ স্থির জ্ঞানে, ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসাদর্শ খুজিয়াছে, তাই বঙ্কিম একদিকে নিষ্কাম কর্ম্ম সন্ধানে দেশানুরাগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাস-সংযম-নিষ্ঠার ও উন্নত লক্ষ্যসাধনার এবং দম্পতির পরস্পর-প্রাণতার স্থির লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া, পরিশেষে আদর্শের তুহিনশীর্ষে—সংসারের উচ্চতাশিখরে—অনন্তলক্ষ্য ধর্ম্মমন্দির তলে দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; ও পরম আনন্দোচ্ছ্বাসে এই আনন্দমঠের উপসংহার করিয়াছেন। সংসারে ও সন্ন্যাসে, গৃহে ও বনে আনন্দমন্দির প্রতিষ্ঠার নামই 'আনন্দমঠ'।

এই গ্রন্থের শেষে ব্রাহ্মণের হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইদানীং চন্দ্রশেখরের শেষে, প্রতাপের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বেও একবার এইরূপ উপন্যাস ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছেন, অতঃপরে দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামের শেষেও এই উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার অবসর খুজিয়াছেন, উহা পৌরাণিক ব্রাহ্মণেরই রীতি; তাঁহারা আত্মজীবনের, হৃদয়ের সদ্ভাব-পুণ্যসমুচ্চয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া—শিল্প মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া, পরিশেষে পরম-ভক্তিভাবে উহাকে প্রণাম করিয়া উপসংহার করেন। পৌরাণিক একদিকে অদ্বৈতবাদী, অন্যদিকে মূর্ত্তিপূজক। ভারতবর্ষীয় মূর্ত্তি-পূজক চিরকাল আপনার মন হইতে ব্রহ্মের—বৃহতের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহারই পূজা করিয়া আসিতেছেন; উহা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মজ্ঞান, আত্মোন্নয়ন বা আত্মপূজা। পূজ্য পদার্থের বিচার করিলেই আমরা এই ক্ষেত্রে পূজকের অধ্যাত্ম পরিচয় লাভ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপকে নিন্দা ও প্রফুল্লকে, জীবানন্দ ও শান্তিকে জয়ন্তীকে পূজা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তাৎকালিক হৃদয় জীবনাদর্শ এই পূজার মধ্যে দেখিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের সময় হইতেই স্থাপিত আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত উপন্যাস কেবল প্রতিভার উদ্দাম প্রলাপ মাত্র নহে, প্রত্যেকের বিশিষ্ট মঙ্গলাদর্শ বর্ত্তমান।

এই ক্ষেত্রে ভারতের একটা পরমোন্নত ও মৌলিক সাহিত্যাদর্শের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া উচিত মনে করি। ভারতীয় সাহিত্য উহাকে অধিকার করিয়া সর্ব্বদা তদ্গত ভাবে অনুসরণ করিতে পারে নাই সত্য, অন্তর্বহিবিপ্লবে নানামতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। য়ুরোপে দুইপ্রকার সাহিত্য রীতি প্রচলিত। প্রথম, গ্রন্থে ভাষার ভাবে সত্য-নির্দ্দিশে, চরিত্রাঙ্কনে সর্ব্বদা প্রাকৃতের (real) অনুসরণ। দ্বিতীয় ঐ ঐ বিষয়ে আদর্শের (ideal) অনুসরণ। য়ুরোপীয় গ্রন্থ নিচয়কে স্থূলতঃ এই দুই রীতির অন্তর্ভাবিত

করিতে পারা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ এই উভয় আদর্শকেই ন্যূনাধিক সম্মুখে রাখিয়া এক স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট তৃতীয় আদর্শ স্থির করিয়াছে; তাহা গ্রন্থটীরই চরিত্র বা ফলশ্রুতি। প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত জীবনের সত্যশিব সৌন্দর্য্যের দর্শন বা নিরূপণ কবির প্রধান কার্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত কাব্য মাত্রেই স্বতন্ত্র একটা বাক্যশিল্প উদ্দেশ্যহীন সৌন্দর্য্যদর্শন বা নিরূপণ উহার মাহাত্ম্য বিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে। কাব্য কেবল সত্য-ভাব-সৌন্দর্য্য বিষয়ে অভিধান বা কোষ মাত্র নহে। প্রত্যেক কাব্যের সমাধানেই কবির একটা স্বতন্ত্র বক্তব্য বা অভিপ্রায় থাকা আবশ্যক। কাব্যের প্রত্যেক বাক্যের, দৃশ্যের, সর্গের বা অঙ্কের সহিত সমগ্র গ্রন্থের সমাধানের সামঞ্জস্য থাকার নামই ফলশ্রুতি। এই আদর্শের ব্যভিচার বশতঃই আপাততঃ অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও বিদ্যাসুন্দরের ফলশ্রুতি কামেন্দ্রিয়ের পরিপোষক হইয়া ভয়াবহ হইয়া গিয়াছে। লণ্ডনরহস্য গ্রন্থ অনেক সচ্চরিত্রের অবতারণা করিয়া থাকিলেও, রেনল্ডের হৃদয়তার পরিচায়ক হইয়াছে ও পাঠকের সর্ব্বনাশকর হইয়াছে। এই আদর্শের জাগ্রতজ্ঞানাভাবে সেক্সপীয়ারের অনেক নাটক কবিত্ব মূর্ত্তি ও মানব চরিত্র দর্শনে পরম গৌরবাবহ হইয়াও বলটেয়ারের কথিতরূপে বর্ব্বর সংজ্ঞাযোগ্য হইয়াছে, ও টলষ্টয়ের বিরাগভাজন হইয়াছে। অন্যদিকে ভট্টিকাব্য প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্য হইতে পারে নাই। আদর্শত্রয়ের যথাযোগ্য সামঞ্জস্য আছে বলিয়া গেটের ফাউষ্ট আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য, এই ফাউষ্টের একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য বা ফলশ্রুতি আছে, এবং সমগ্র গ্রন্থের ঘটনা-গতি সত্যসৌন্দর্য্য দর্শন ও চরিত্র সৃজন গ্রন্থ-ফলশ্রুতির সহিত নির্ব্বিরোধ সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ফাউষ্টে সংস্কৃত কাব্যদর্শন-প্রভাব—কালিদাসের প্রভাবও দৃষ্টিগম্য হইয়াছে। কেবল উহার আদ্যন্তে কবির মঙ্গলাচরণ আছে বলিয়া নহে, গ্রন্থের পাঠ-ফলের ব্যভিচারী হইলে কাব্যের মাহাত্ম্য সিদ্ধ হয় না। গ্রন্থ সামগ্রীর শ্রেয়োনিষ্ঠ ফলশ্রুতি ব্যতিরিক্ত কাব্য 'মাতালের প্রলাপ' মাত্র—সত্যবাদী মাতাল হইলেও যথেষ্ট নহে।

আনন্দমঠে দেশানুরাগ প্রণোদিত নিষ্কাম ডাকাইতি আছে। এই জাতীয় ডাকাইতি স্কটে, লীটনে, তথা বায়রণেও দেখিতে পাই। আনন্দ সন্ন্যাসীর দলও ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী উপন্যাসাদি পাঠে উৎসাহিত হইয়া স্বদেশীয় প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শিল্পীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অন্যদিকে গোবিন্দলালের মৃত্যু প্রায়শ্চিত্তের পর, দাম্পত্য প্রেমের গঠনাদর্শেও প্রেরিত হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ এই ক্ষেত্রে উভয়তঃ নিষ্কাম তন্ত্রে উপনীত হইয়াছিলেন—ভারতবর্ষীয় নিষ্কামতন্ত্র। এই সূক্ষ্ম আদর্শ হইতে স্বপ্নের প্রায়শ্চিত্তও দেখিতেছি—ভবানন্দ এই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

এইরূপে নিজের শিল্প-সামর্থ্য অর্জ্জনের চরম অভ্যুন্নতি শিখরে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই আনন্দমঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আনন্দমঠ ভারতবর্ষীয় আদর্শের—অনাবিল পৌরানিক আদর্শের—সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ আদর্শের শিল্প।

অতঃপর বঙ্কিমের প্রতিভা আর কত দূর অগ্রসর হইতে পারে? দেশানুরাগ ও দাম্পত্য আদর্শকে কোথায় লইয়া যাইতে

পারে, নিষ্কাম নিস্ত্রৈগুণ্য পথে অতিরিক্ত অগ্রসর হইলে তাহার আর কার্য্যাকার্য্য কি ? 'কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'! শিল্পসংসারের ক্ষেত্রে তাহার নীরব হওয়াই ভাল; কেন না, ইহার পর সে আর একদেশদর্শী—একদেশাবর্ত্তী না হইয়া পারে না। তাহার আদর্শের দিকেই তাহার একান্ত লক্ষ্য, শিল্প-সৌকর্য্যের দিকে নহে। সুতরাং অতঃপর তাহার শিল্প উন্নত বা উৎকৃষ্ট জাতীয় হইতে পারিলেও নৈসর্গিকতার বা সার্ব্বজনীনতার অবজ্ঞা করিতে পারে না। পৌরাণিকতা অতিরিক্ত হইলে রোগে পরিণত হয়; ব্রাহ্মণ আদর্শও অত্যন্ত হইয়া ব্রাহ্মণ্য বা Brahmanism হইয়া পড়ে। কিন্তু আনন্দমঠের পর শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র নীরব হন নাই। পারিবারিক প্রেমে ও দেশানুরাগে তিনি যে নিষ্কাম আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা আরও সূক্ষ্মভাবে—অত্যন্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন—তাহার ফল দেবীচৌধুরাণী।

দেবীচৌধুরাণী।

দেবীচৌধুরাণী ডাকাইত; কিন্তু, নিষ্কাম ডাকাইত। আবার দেবীচৌধুরাণী হিন্দু গৃহিণী, কর্ত্তব্যের নিষ্কাম আদর্শানুসারিণী প্রফুল্লমুখী। এই ক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেমে সন্দেহ বা ব্যভিচারের আঘাত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সপত্নীর ভাগাভাগির দাবীই অগ্রমুখ হইয়াছে। রমণী প্রফুল্লমুখী সপত্নীর বা সংসারের দাবিসাপক্ষ্যে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিয়া একমাত্র নিষ্কাম প্রেম বা গৃহিণী-কর্ত্তব্য-বুদ্ধির 'হিন্দু' আদর্শেই শিক্ষিতা হইয়াছেন। কবিকে প্রফুল্লের প্রতিযোগী সপত্নীঘটনা করিতে হইয়াছে; তৎকল্পে ব্রজেশ্বর রায়কে ভারতীয় পারিবারিক আদর্শে অত্যন্ত পিতৃভক্ত করিয়া খাড়া করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত নির্ব্বিশেষ আদর্শবাদিতার ফল। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যেন হিন্দু পারিবারিক আদর্শকে নিষ্কাম বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন; ও পরিশেষে সেই আদর্শে সৃষ্ট মূর্ত্তির সমক্ষে ভক্তিভরে প্রণত হইতে চাহেন। ইহাকেই অতিরিক্ত পৌরাণিকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। আনন্দমঠের স্বার্থকামনাবিরহিত প্রেম দেবীচৌধুরাণীতে ঈর্ষাহীন ও ঐশ্বর্য্যমোহমত্ততার প্রকট সংগ্রামে বিজয়ী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই দেবীচৌধুরাণী রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্দেশ্য সম্পাদন করিয়াছেন। সর্ব্বমনোমত রূপে সম্পাদন করিয়াছেন কিনা, বলা যায় না; কিন্তু হিন্দু আদর্শবাদীগণের ইহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবার কারণ নাই।

সন্ন্যাসিনী প্রফুল্লমুখী নিষ্কাম গৃহিণী-আদর্শে শিক্ষিতা ও পরীক্ষিতা হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে—দেবীচৌধুরাণী মরিয়াছে। কঠোরবিরাগিনী ও সন্ন্যাসিনীর অবস্থাতিক্ত প্রীতিতন্ত্র গৃহজীবনের ও স্বামী-সঙ্গের জন্য প্রফুল্লের রমণীহৃদয়ের সরল দীর্ঘনিঃশ্বাস আমাদের হৃদয়কে পরম সহানুভবে ও কারুণ্যে পূর্ণ করে! অগিভস্ম চর্ম্ম-বর্ম্মের ও বৈরাগীর 'ভেক'ভেক্ষীর আবরণ-স্থিত তাহার মনুষ্যহৃদয়টী—রমণীহৃদয়টী প্রতিবাক্যে আমাদের মনকে পুলকিত করে। পরিশেষে, যখন এই পূজাগৌরবান্বিতা রাজ-রাজেশ্বরীকে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ব্রজেশ্বরের খিড়কী পুকুরে প্রফুল্লমুখে 'বাসন মাজিতে' দেখিতে পাই ও অমৃতনিষ্ঠান্বিত কটাক্ষে 'দেবী চৌধুরাণীর' মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতে দেখিতে পাই, তখন সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে মাতৃ সম্বোধনে নতশির হওয়া অপ-

রিহার্য্য হইয়া উঠে; ওই মূর্ত্তি চিরতরে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়; এবং এই ব্রাহ্মণ-শিল্পীর প্রতি সাধুবাদ স্বতঃপ্রবাহিত হইয়া যায়! ইহা গ্রন্থখানির প্রকট শক্তি, সন্দেহ নাই।

দেবীচৌধুরাণীতে সন্ন্যাসিনী সংসার-জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, একটা আদর্শের সৃষ্টি বা গঠন; প্রায়শ্চিত্ত কিম্বা ধ্বংস নহে। ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাস-আদর্শের দিকে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সন্ন্যাস ভারতীয় ব্রহ্মবাদী-গণেরও আদর্শ। প্রাচীনকালের নিরীশ্বর-গণের আরণ্যক কিম্বা বৌদ্ধগণের আদর্শ হইতে এই ব্রহ্মবাদীর আদর্শ কত বিভিন্ন, তাহা আমরা পরে দেখিব। এই নিরীশ্বর কিম্বা ব্রাহ্মসন্ন্যাসের বিভিন্ন আদর্শের অমৃত বা বিষফল ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকট অভ্যুত্থানের পর হইতেই ভোগ করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের জয় পরাজয়, গৌরব অগৌরব, সামাজিক সুখ দুঃখ, মুখ্য ভাবে, এই আদর্শ দর্শন ও তাহার সাধন সমর্থনের উপরেই নির্ভর করিয়া আসিতেছে। আমরা যথাস্থানে তাহার যথোচিত আলো-চনা করিব। এখন, এই আদর্শের গতি 'চুল চেড়া' সূক্ষ্ম; ইহার এক হাতে সুধা, অন্য হাতে গরল—একই জ্ঞানবৃক্ষের দুই ফল। ভারতবর্ষে মানুষ বহুকাল ধরিয়া এই জ্ঞান-ফল খাইয়া আসিতেছে—কেহ বাঁচি-তেছে, কেহ মরিতেছে! গীতা প্রাচীন ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের উপস্থাপনে নিরীশ্বর নৈষ্কর্ম্মবাদের সঙ্গে একটা-সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছিলেন। পারি-বারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিষ্কাম আদর্শের বিষয় অনুধাবন করিতে করিতে বঙ্কিম চন্দ্রের দৃষ্টি-পথে প্রাচীন ভারতবর্ষের এই 'সন্ন্যাসতত্ত্ব' উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রমে অতিজাগ্রত হইয়া দার্শনিক হইয়া পড়ি-ছিলেন, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আনন্দ-মঠে ইহার সূত্রপাত; দেবীচৌধুরাণীতে নিশা ও প্রফুল্লের মধ্যে প্রকারান্তরে এই উভয় সন্ন্যাসাদর্শের প্রচ্ছন্ন সংগ্রামই দেখিতে পাই। ব্রহ্মবাদিনী নিশা বলিতেছেন, "তোমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর আছেন, আমাকে কাঁদাইবার জন্য কেহই নাই।" নিশা প্রবল ব্রহ্মানুরাগবলে জগতের অনুরাগ বিষয়ে বিরাগিণী হইয়া ভক্তি-যোগীর একমেবা-দ্বিতীয়ং তত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রফুল্ল তাহা পারেন নাই—চাহেন নাই বলিয়াই; প্রফুল্লকে নির্ব্বাসন বৈরাগ্য-আদর্শ পরিহার করিয়া আপনার সমুচিত সাধন-লোকে ফিরিতে হইয়াছিল। তবু দেবীচৌধুরাণী বিজয়ের ইতিহাস; পতিযোগিনী প্রফুল্লমুখী বিজয়িনী ও কবির অন্তরঙ্গ পূজাভাগিনী হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে একরূপ সতর্কভাবে ব্রাহ্ম-আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া-ছেন।

আদর্শের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মানবজাতি প্রায়ই দুই দুই বিচারে—দ্বৈতবিচারে—জয় পরাজয় বিচারে অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের গ্রন্থের মধ্যে, অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে আমরা সর্ব্বত্র এই মনোগতির প্রকট পরিচয় লাভ করি। বঙ্কিমের প্রথম রচনা দুর্গেশনন্দিনীর পর হইতেই আমরা সর্ব্বত্র পারিবারিক জীবনের ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সন্দেহ ব্যভিচার বা সকাম নিষ্কামতার ফলা-ফল সূত্রই পরিদর্শন ও অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সর্ব্বত্র [অতর্কিতে?] ক্রমান্বয়ে এই জয়পরাজয়, এই অমৃত ও বিষফলই প্রদর্শন করিয়া আসি-

য়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্যশিল্পী—ভারতবর্ষীয়—ব্রাহ্মণশিল্পী,'আত্ম-নিষ্ঠ শিল্পকলা' তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি জগতের মঙ্গলনীতিবিৎ ও দার্শনিক—তাঁহার শিল্পশক্তি নিয়ত একাগ্র ভাবে সমাজের মঙ্গল-নীতিমুখী। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদিতে পাশ্চাত্য সত্যসৌন্দর্য্যাদর্শের অধিকন্তু অথচ সমঞ্জসিত একটা তৃতীয় আদর্শ আছে—জাগ্রত ফলশ্রুতি আছে।

বলা বাহুল্য,সাহিত্যের ক্ষেত্রে—উপন্যাসের ক্ষেত্রে নীতিবাদিতার বা মঙ্গলবাদিতার একটা সীমা আছে ; ঐ সীমা উল্লঙ্ঘন করিলেই শিল্প স্বীয় নামের অযোগ্য হয়—নীতি শাস্ত্র বা দর্শন শাস্ত্র হইয়া যায়। সাহিত্য না হইয়া পুরাণ হইয়া যায়। আমরা দেখিব, বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে শিল্পসীমা অতিক্রম করিয়া দার্শনিকতার নিরবচ্ছিন্ন নীতি-বাদিতায় বা পৌরাণিক প্রৌঢ়তায় পদার্পণ করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্ফুটজাগ্রতশিল্পী, তাই তিনি স্বীয় শিল্পশক্তি ও প্রতিভার হ্রাস বুঝিতে পারিয়া একদিন বিরত হইয়াছেন, শিল্পের ক্ষেত্র হইতে এককালে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

দেবীচৌধুরাণীতে বধূ প্রফুল্ল সন্ন্যাসিনী হইয়াও সংসারে সমাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা দেখিয়াছি। সংসারেই তিনি নিজের চরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, ও সংসার তাঁহার পদস্পর্শে সুখ সৌভাগ্যে চরিতার্থ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মানুসরণে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। এইত বধূধর্ম্ম—নিষ্কাম নারীধর্ম্ম। সধবা রমণীর জন্য সন্ন্যাস নহে, বাসনাবশী দেহধারী মনুষ্যের জন্যও নহে. বঙ্কিমচন্দ্রের যেন ইহাই বক্তব্য। প্রফুল্ল ও নিশার উক্তি প্রত্যুক্তিতে শিল্পের দেশে ভগবৎগীতার শ্লোক গুলি একরূপ অনধিকার প্রবেশ করিয়াই আমাদিগের এই বিশ্বাস জন্মাইয়া গিয়াছিল।

অতঃপর শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র কি করিতে পারেন ? এই পন্থা অনুসরণ করিয়া কোথায় যাইতে পারেন ? উপরোক্ত আদর্শের ব্যভিচার কতদূর মারাত্মক হইতে পারে, অতঃপর তিনি যেন তাহা দেখাইতেই অগ্রসর হইলেন। ইহার ফল সীতারাম।

সীতারাম।

সীতারাম গীতার শ্লোক মস্তকে ধরিয়া আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে উপস্থিত হইয়াছে। উহা দার্শনিকের উদ্দেশ্য—পৌরাণিকের উদ্দেশ্য।

সীতারাম বহুগুণধর বীর চরিত্র। আবার ভারতীয় পারিবারিক আদর্শের চরমপন্থীতা দেখাইবার জন্য বহুপত্নীক। বহুপত্নীক সীতারামের মধ্যেও সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা ছিল ; নিজের পরিত্যক্ত স্ত্রীর দর্শন মাত্র সীতারাম মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। এই দিকে বধূধর্ম্মিণী স্ত্রী আরণ্যক সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি একদিকে হৃদয়বশে সীতারামের প্রতি অনুরাগিনী, অন্যদিকে সন্ন্যাসাদর্শের ও জ্যোতিষের ভবিষ্যৎ বাণী ভয়ে বিরাগিনী। এই সংসার ও সন্ন্যাসের আদর্শ-সংঘর্ষে সীতারাম-গ্রন্থের ঘটনা-প্রবাহ পরিচালিত ও মুখরিত হইয়াছে। পরিশেষে ধ্বংস—সীতারামের সংসার পুরীর ধ্বংস! সন্ন্যাস আদর্শানুসারিনী স্বীয় পত্নীর প্রতি বাসনা-ব্যভিচার ফলে গৃহস্থ সীতারামের সর্ব্বনাশ! আবার ধ্বংসই বা কিরূপে বলিব? সীতারামও সন্ন্যাসী হইলেন—আদিদেব পুরাণ পুরুষকে বলিলেন—জটা-কৌপীনধারী হইলেন! স্ত্রী জ্যোতিষের

বাক্য সার্থক করিয়া প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইলেন বটে, কিন্তু সীতারামের জীবন-সম্পর্ক হইতে চিরতরে অদৃশ্য হইলেন—পলায়ন করিলেন। প্রকৃত সন্ন্যাসিনী [বধূধর্ম্মের অব্যভিচারিণী ?] জয়ন্তীও কবির শেষ পূজা প্রণতি লাভ করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

আমরা এই ব্যাখ্যার অনেক স্থলে, প্রশ্ন চিহ্ন বা সন্দেহ চিহ্ন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কুতূহলী পাঠকও নিবিষ্ট মনে গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে বসিলে বহুস্থলে এইরূপ সন্দেহে অভিনিবেশ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কি, গ্রন্থের ফলশ্রুতি কি—নিশ্চিত নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। একটা বিষয় স্থির হইবে—কবি গ্রন্থ-ঘটনায় গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন; অনেক স্থলে গীতা-মর্ম্মের সঙ্কেত বা symbol স্বরূপেই ঘটনা গতি বিগঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে।

কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন—সংসার ভাল, না সন্ন্যাস ভাল ? ইহার কোন নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যাইবে না। বধূর পক্ষে সন্ন্যাস বিপদাবহ, ইহাই বোধ করি কবি বলিতে চাহেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানির কোন একোদ্দিষ্ট শিল্পাদর্শ বা ফলশ্রুতি আত্মপ্রকাশ করিতে বা উজ্জ্বল হইতে পারে নাই। কবি তখন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ে স্থির আদর্শ-ভূমিতে উপনীত হইতে পারেন নাই! এই গ্রন্থের ঘটনা নির্বহের মধ্যে সেই-রূপ কোন সুসঙ্গতি নাই; অন্যদিকে শিল্পী প্রকট পৌরাণিক ও দার্শনিক হইয়া পড়িয়াছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই-রূপ বিপরিণতি দীর্ঘজীবী কবি বা লেখকের পক্ষে অনেক দেখা গিয়াছে, নবীনচন্দ্রেও ইহার পরিচয় পাই—নবীনচন্দ্রের অসম্পূর্ণ গ্রন্থ চৈতন্য দেখুন। প্রবাসী-পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশ্যেই ঐ গ্রন্থ লিখিত; প্রত্যেক সর্গের শেষেই তাহার স্বীকার প্রার্থনা আছে। ইহা নির্ব্বিশেষ পৌরাণিকতার আদর্শ! জর্ম্মণীর ঋষি-কবি গেটের শেষবয়সের দ্বিতীয়ভাগ ফাউষ্ট-কাব্যে এইরূপ দার্শনিকতার বা শিল্পব্যভিচারের ভূরি ভূরি পরিচয় আছে। গেটের ন্যায় সতর্কশিল্পীও বয়োধর্ম্মে শিল্পব্যভিচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। গেটে পরিশেষে কেবল তত্ত্বনিরূপণ, নির্ব্বাচন ও ব্যাখ্যানেই নিযুক্ত থাকিয়া ফাউষ্টের শেষ করিয়াছেন। সাহিত্য-শিল্পের বিশেষত্ব রক্ষার দিকে তাঁহার কিছু-মাত্র দৃষ্টি নাই। কোন প্রবীণ সমালোচক বলিয়াছেন :—

"As Goethe grew older and colder, the balance between those two elements of art would not be preserved. Hence arose Goethe's last manner. He has passed from representing character to representing the ideal (in Tasso, Iphyginia and first part of Faust). He is now to pass from the ideal to the symbol * * * They are mere mass of symbols, hieroglyphics and sometimes even mystification."

সীতারাম রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন—উহা যে শিল্প হইল না, কাব্য বা উপন্যাস হইল না বুঝিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জাগ্রত মনুষ্য, তিনি যে জীবনের শিল্পীযুগ পার হইয়া আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সুতরাং তিতিক্ষা—সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্র হইতে বঙ্কিম চিরতরে অবসর গ্রহণ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অবসর গ্রহণ সাহিত্য-সেবীর পরম কৌতূহলাস্পদ। পশ্চাতে দৃষ্টি করুন। ১৮৬১ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সেই হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত, এই কয়েকটী বৎসরমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য কার্য্য। উহার পর আরও একাদশ বৎসর

বঙ্কিমচন্দ্র এই ভবলোকে ছিলেন—শিল্পের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই।

সম্ভবতঃ ১৮৮৪ ইংরাজীতে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' বাহির হয়। সীতারাম 'প্রচারে' প্রথম বাহির হইতে থাকে। পত্রিকাদ্বয়ের সংজ্ঞার্থ বিবেচনা করিবেন, আগে 'বঙ্গদর্শন', পরে 'নবজীবন' ও 'প্রচার' এই নামকরণের কর্ত্তাও সম্ভবতঃ স্বয়ং বঁঙ্কিমচন্দ্র।

'নবজীবনের' সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের নবজীবন আরম্ভ হইয়াছে। এই নবজীবন সর্ব্বথা কবির ধর্ম্মজীবন বিষয়েই প্রযুক্ত, যে যুবক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বঙ্গদেশ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, যিনি সীতারামের লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে কবিকৃত্যের জয়ন্তী প্রতিভার সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই উত্তর জীবন। এই জীবন কি হইতে পারে ?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণকবি উত্তরকালে ঋষিত্ব লাভ করেন। কবিকৃত্য ও ঋষিকৃত্যের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন বা পরস্পর শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ, এই প্রসঙ্গের আবশ্যক নাই। পরম সাদৃশ্য এই যে, কবি ও ঋষি উভয়েই উপদেষ্টা—উভয়ের কার্য্যই সামাজিক মঙ্গল লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত। কবির উপদেশের বিশেষত্ব কি ? তাহা প্রবীণ সাহিত্য-দার্শনিক একমাত্র বাক্যে অনুপমভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"কাব্যং কান্তা সম্মিতোপদেশাযুক্তে।"

বঙ্কিমচন্দ্র ঋষিজীবনে প্রবেশ করিলেন—প্রচার আরম্ভ করিলেন। সীতারামের শিল্পীর উত্তরকালে এই জীবন অপরিহার্য্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফলেই এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার স্বীয় জীবন, স্বীয় হৃদয়, স্বীয় মস্তিষ্কই এই ক্ষেত্রে তাঁহার গুরু। তাঁহার শেষ জীবনে এক সন্ন্যাসীর প্রভাব কার্য্য করিয়াছিল, শুনিতে পাই। উক্ত সন্ন্যাসীপুরুষ, কোন্ জাতীয়, কোন্ তন্ত্রীয় সন্ন্যাসী ছিলেন, জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরজীবন তাঁহার পূর্ব্বজীবনের অপরিহার্য্য পরিণতি—তাহাই দেখিতেছি ও তাহা দেখিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি।

'প্রচারে' গীতার ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণচরিত্র এবং নবজীবনে মানবধর্ম্মতত্ত্ব বাহির হইতে থাকে। ইহাই সারস্বত জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ কার্য্য, এই কার্য্যের স্বরূপ ও পূর্ব্বপর বিশেষত্ব সংক্ষেপতঃ চিন্তা করিয়াই আমরা এই প্রসঙ্গ-সূত্রের গ্রহণ ও উপসংহার করিব। ক্রমশঃ

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

সাংখ্য-সূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১২। দিক্ ও কাল—আকাশাদি হইতে।

সাংখ্য মতে দিক্ ও কাল স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। আকাশই উপাধি বিশেষে উপহিত হইয়া এই রূপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (সূর্য্যের উদয়াস্ত উপলক্ষিত আকাশই দিক্, আর তাহার গতি ক্রিয়া উপলক্ষিত আকাশ কাল। (অনিঃ)

নিত্য যে দিক্ ও কাল, ইহারা অখণ্ড, আকাশ প্রকৃতিভূত, প্রকৃতির গুণবিশেষ। ইহারা বিভু। যাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী তাহাই বিভু।...খণ্ড দিক্ কাল স্ব স্ব উপাধি সংযোগবশতঃ আকাশ হইতে উৎপন্ন। আকা-

শাদি...এস্থলে "আদি" শব্দের দ্বারা উপাধি-গ্রহণ বুঝাইতেছে। খণ্ড দিক্ উপাধিবিশিষ্ট আকাশই দিক্, খণ্ড কাল উপাধিবিশিষ্ট আকাশই কাল। এই উপাধিযোগেই ইহাদের কার্য্যত্ব।

(৩) অনন্ত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন বিস্তৃতি, যাহা অবকাশাত্মক, তাহাকে আকাশ বলে। আবার আকাশই ভূত। তাহা সকল ভূতের মূল। তাহার আধুনিক ইংরাজী নাম ইথর। স্থান-ব্যাপকত্ব এই পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম। এই স্থান-ব্যাপকতা হইতে দিক্। আর সেই পদার্থ নিরবস্থি ক্রিয়াশীল—সেই ক্রিয়া হইতে সৃষ্টি। সেই ক্রিয়া হইতেই কাল। এই কালব্যাপকত্বও পদার্থের ধর্ম্ম। এইজন্য দিক্ কাল সাংখ্যমতে আকাশাদির ধর্ম্ম। (বিঃ ভিঃ)

১৩। অধ্যবসায়ই বুদ্ধি।

ইহা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। আমি নিশ্চয় ইহা করিব, আমি নিশ্চয় ইহা জানিয়াছি বা নিশ্চয় ইহা অনুভব করিয়াছি—ইত্যাদি নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিই অধ্যবসায়। ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম। এস্থলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভেদ করা হইয়াছে।

মহত্তত্ত্বেরই এক নাম বুদ্ধি। অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি—ইহার বিশেষ ধর্ম্ম বা গুণ। ১।৭১ সূত্র দ্রষ্টব্য। বুদ্ধিকে কেন মহত্তত্ত্ব বলে, তাহা এই অধ্যায়ের শেষ ৪১—৪৭ সূত্রে বুঝান আছে।

বুদ্ধিই সকল কার্য্যের ব্যাপক, অন্যান্য সকল কার্য্য হইতে ইহার শক্তি বা ঐশ্বর্য্য অধিক; এইজন্য বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্ব বলে।

"অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্, ঋগ্বেদ·· ইতি শ্রুতিঃ।" সবিকার প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি। এজন্য ইহাকে "মহান্" বলে। ইহাই প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বুদ্ধির অভিমানিত্ব রূপেই চেতন হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে মহান্ বলা হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবী অভিমানী চৈতন্যকে পৃথিবী, অহঙ্কারাদি অভিমানী চেতনকে রুদ্র ··ইত্যাদি বলা হয়। প্রকৃতি অভিমানী দেবতা হইতে ভূতাভিমানী দেবতা পর্য্যন্ত—সকলের যে স্বস্ব বুদ্ধি রূপ প্রতিনিয়ত উপাধি আছে—সে সমুদায়ই মহত্তত্ত্বের অংশ। (বিঃ ভিঃ)

১৪। ধর্ম্মাদি মহত্তত্ত্বের কার্য্য।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এ সকলেরই উপাদান মহত্তত্ত্ব। কার্য্যকারণ পরস্পর অভেদ বলিয়া,উহারা মহত্তত্ত্বের অন্তর্ভূত। আর এ সকল যেমন সত্ত্বগুণ প্রধান, মহত্তত্ত্বও তেমনই সত্ত্বগুণ প্রধান। ঐশ্বর্য্য = অনিমাদি অষ্ট যোগজ ধর্ম্ম।

১৫। ইহাদের যাহা বিপরীত, তাহা মহত্তত্ত্বের উপরাগ হইতে হয়।

উপরাগ = রজঃ ও তমঃ আবরণ।

বুদ্ধিতত্ত্ব—রজঃ তমঃ গুণের উদ্ভবদ্বারা কলুষিত বা বিপরীত ভাবাপন্ন হইলে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য উৎপন্ন হয়।

(রজস্তম মলা না থাকিলে সকল পুরুষই ঈশ্বর বা ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইত ইহা প্রতিপন্ন হয়।)

(প্রশ্ন—ধর্ম্মাদির অবস্থান জন্য বুদ্ধির নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে—তাহার কার্য্য হয় কিরূপে?

উত্তর—প্রকৃতির অংশরূপ বীজাবস্থাপন্ন সত্ত্ববিশেষ মহত্তত্ত্বেই কর্ম্মবাসনাদির অবস্থান সম্ভব। বুদ্ধি জ্ঞানের কারণ, এবং অবস্থা বিশেষে তাহা জ্ঞানের কার্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়। জ্ঞান এস্থলে বৃত্তিজ্ঞান।

যাহা হউক, বুদ্ধিতত্ত্ব সাত্ত্বিক হইলেও, এবং জ্ঞান বৈরাগ্যাদি তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন জীবে বুদ্ধি বিকৃত হইয়াই, তাহা হইতে অজ্ঞান অধর্ম্মাদি উৎপন্ন হয়।

১৬। অভিমানই অহঙ্কার।

বুদ্ধিতে "আমি" এইরূপ স্ফুরণকে অহংকার বা অভিমান বলে। যাহা হইতে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অহঙ্কার বলে। আমি করি, আমি ইহা জানি, আমি ইহা অনুভব করি, এই রূপ অভিমানই অহঙ্কার। ইহা অন্তঃকরণ। অভিমান, অহংকারের বৃত্তি বা ধর্ম্ম। অভিমান অন্তঃকরণের বিশেষ ধর্ম্ম, ইহা বুঝাইবার জন্য এ স্থানে ধর্ম্ম ধর্ম্মীর অভেদ করা হইয়াছে। অহঙ্কার বুদ্ধিতে নিহিত থাকিয়া বিষয়ে "এই আমি এবং ইহা আমার" এই আকারে অভিমান জন্মায়।

অতএব বুদ্ধির বৃত্তি অহঙ্কার, ও অহঙ্কারের বৃত্তি অভিমান। এক অন্তঃকরণই বীজ অঙ্কুর ও বৃক্ষাদির ন্যায় অবস্থাত্রয় ভেদে কার্য্যকারণ ভাবাপন্ন হইয়া—অন্তঃকরণ বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হয়।

১৭। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই অহঙ্কারের কার্য্য।

সাংখ্যমতে ইহাই ষোড়শ বিকৃতি। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়। সাংখ্য মতে মন উভয়াত্মক ইন্দ্রিয়। (অণিঃ)

আমি ইন্দ্রিয় দ্বারা এই রূপাদি বিষয় (রূপ রস প্রভৃতি) ভোগ করিব—এবং আমার সুখসাধন হউক—ইত্যাদি অভিমান বশতঃ আদি সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়গণ ও তাহার ভোগ্য বিষয়ের মূল উপাদান পঞ্চতন্মাত্র উৎপত্তি দ্বারা—অহঙ্কারকেই ইন্দ্রিয়ের হেতু বলিয়া অনুমিত হয়। দেখা যায় যে, ভোগাভিমানিরাই অনুরাগ বশতঃ ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করে। 'রূপরাগাৎ অভূৎ চক্ষুঃ'—এই মোক্ষ ধর্ম্ম প্রমাণে হিরণ্যগর্ভের রূপে অনুরাগ জন্য তিনি রূপ সমষ্টি রূপ চক্ষু ইন্দ্রিয় উৎপাদন করেন। এই ষোড়শ বিকার মধ্যে রাগাত্মক মনই আদিতে অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (বিঃ ভিঃ)

১৮। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক একাদশ (ইন্দ্রিয়) প্রবর্ত্তিত হয়।

বৈকারিক = সাত্ত্বিক।

একাদশ = মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়।

মহতের বিকার অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয় মনের সহিত অন্য দশ ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তিত হয়। আর তমোপঞ্চের সহিত গুণ তন্মাত্র প্রবর্ত্তিত হয়। (অণিঃ)

অহঙ্কারের কার্য্য সকলের মধ্যে মনই সাত্ত্বিক। মন—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে-উৎপন্ন। দশ ইন্দ্রিয় রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। আর পঞ্চ তন্মাত্র—তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন।

"বৈকারিকা তৈজসশ্চ তামসশ্চত্যহং ত্রিধা।
অহন্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাত্মনো বৈকারিকাদ ভূৎ॥
বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভি ব্যঞ্জনং যতঃ।
তৈজসাদিন্দ্রিয়াস্তের জ্ঞানকর্ম্মময়ানি চ॥
তমসো সূক্ষ্মভূতাদি যতঃ যৎ লিঙ্গমাত্মনঃ।
ইতি স্মৃতি।

কারিকায় আছে—

"সাত্ত্বিক একাদশক প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ং॥"

তৈজস্ = রাজস্ তেজ বা গতি সম্পন্ন।

"দেবতানয় শ্রুতিঃ"—পরে এই সূত্রে ইন্দ্রিয়গণের দেবতা কথিত হইবে। এই দেবগণ কি সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য? ইহার উত্তর এই যে, সমষ্টি চক্ষুরাদি—শরীরী সূর্য্যাদি চৈতন্যই চক্ষুরাদির দেবতা। অতএব ব্যষ্টি করণের (ইন্দ্রিয়াদির) সমষ্টিকরণই দেবতা। এই ব্যষ্টি সমষ্টির একীকরণ অভিপ্রায়ে এস্থলে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় দেবতার মধ্যে পার্থক্য দেখান হয় নাই।

সমষ্টি ইন্দ্রিয় মন অপেক্ষা অল্প সত্ত্ব। এজন্য ইন্দ্রিয় রাজসিক অহঙ্কারের কার্য্য। (মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য।)

যখন অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধ—তখন তাহার কারণ মহত্তত্ত্বও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। স্মৃতিতেও একথা আছে। ব্যক্তি ভেদে বা অংশ ভেদে এইরূপ ত্রিবিধ হইয়াছে।
(বিঃ ভিঃ)

১৯। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সহিতই আন্তর ইন্দ্রিয় একাদশক।

পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় = বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় = চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

মন = আন্তরেন্দ্রিয়। ইহা দ্বারা আন্তরিক সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্মাদি অনুভূত হয়।

ইন্দ্র হইতে ইন্দ্রিয়।

যাহারা অহঙ্কারের কার্য্য অথচ করণ, তাহারাই ইন্দ্রিয়। "ইন্দ্রস্য সংঘাতেশ্বরস্য করণম্ ইন্দ্রিয়ম্।" ইতি বিজ্ঞানভিক্ষু উদ্ধৃত বচন। (বিঃ ভিঃ)

২০। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই ইন্দ্রিয়গণই আহঙ্কারিক (অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন)। ইহারা ভৌতিক (বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন) নহে।

ভূতে মলিনতা থাকায় তৎপ্রভব পদার্থে চৈতন্য সংক্রমণের ব্যাঘাত হয়। ইন্দ্রিয়ে চৈতন্য সংক্রমণ হয় বলিয়া তাহারা অভৌতিক। (অণিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, এই সম্বন্ধীয় শ্রুতি কালবশে লুপ্ত হইয়াছে। এখন এক মাত্র প্রত্যক্ষ শ্রুতি—"বহুস্যাং প্রজায়েয়" "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ"—এ শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব উক্ত হইয়াছে—ইহা বলা যায় না। ভূতসকল হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পজাত। সুতরাং অন্নও মনোজন্য। তবে ব্যষ্টি মন অন্ন হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

২১। ইন্দ্রিয়গণ দেবতাতে লীন হয়, এই শ্রুতি হইতে তাহাদের আরম্ভ বা কারণ যে দেবতা, তাহা সিদ্ধ হয় না।

(শ্রুতিতে আছে,—"আদিত্যং বৈ চক্ষু র্গচ্ছতি" মৃত্যুকালে চক্ষু আদিত্যেতে লীন হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"নাশঃ কারণলয়ঃ"। ইহাতে আশঙ্কা হয় যে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের কারণ আদিত্য বা তেজ। কিন্তু শ্রুতির অর্থ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উক্তস্থলে দেবতাদিগকে ইন্দ্রিয়ের কারণ বলা হয় নাই—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক বলা হইয়াছে মাত্র। (অণিঃ)

শ্রুতিতে আছে, "অস্য পুরুষস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং "...... ইতি।" ইহাদ্বারা দেবতাতেই ইন্দ্রিয়গণের লয় কথিত হইয়াছে।......যাহাতে যাহা লয় হয়, তাহা যে আরম্ভক বা কারণ হইবেই, এরূপ নিয়ম নাই। যেমন মৃত্তিকা জল শোষণ

করে, মৃত্তিকায় জল লীন হয়। কিন্তু তা বলিয়া মৃত্তিকা জলের কারণ নহে। (বিঃ ভিঃ)

২২। শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণের কথা আছে। উহাদের বিনাশও দেখা যায়।

শ্রুতিতে আছে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ।"

যাহা উৎপন্ন তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। আর বৃদ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয় শক্তির শিথিলতা ও বিনাশ দেখা যায়। শাস্ত্রেও আছে—

দশকেন নিবর্ত্তন্তে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ।

অর্থাৎ বৃদ্ধের দশম দশায়, মনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ শক্তি প্রভৃতি ক্রমে হ্রাস হইয়া বিনষ্ট হয়।

অতএব অবস্থাভেদে জীবিতাবস্থায়ই ইন্দ্রিয়ের বিনাশ দেখা যায়।

২৩। ইন্দ্রিয় সকল অতীন্দ্রিয় (বা অপ্রত্যক্ষ)। ভ্রান্ত লোকেই, তাহার অধিষ্ঠানকে ইন্দ্রিয় মনে করে।

নাস্তিকেরা ইন্দ্রিয় গোলককেই ইন্দ্রিয় বলে। ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়—ইন্দ্রিয় গোলক।

২৪। ইন্দ্রিয়গণ এক নহে। শক্তি ভেদে তাহাদের ভেদ সিদ্ধ হয়।

ইন্দ্রিয় এক—তাহার উপাধি ভিন্ন, এরূপ বলা যায় না। কেন না প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটী নির্দ্দিষ্ট শক্তি অবধারিত আছে। এজন্য তাহারা পৃথক্। চক্ষুশক্তিতে দর্শন হয়, শ্রবণশক্তিতে শ্রবণ হয়।…ইত্যাদি।

২৫। যাহা প্রমাণদৃষ্ট, তাহার কল্পনা বিরোধ হয় না।

ইন্দ্রিয়শক্তির পার্থক্য সিদ্ধ। তাহার একত্ব কল্পনা, এই প্রমাণ বিরুদ্ধ।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, "প্রমাণদ্বারা এক অহঙ্কার হইতেই বিবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি অবধারিত আছে।

২৬। মন—উভয়াত্মক।

মন বুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মক ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক। মনের অধিষ্ঠান জন্য উভয় ইন্দ্রিয়ই প্রবর্ত্তিত। এক মনই মুখ্য ইন্দ্রিয়—অন্য ইন্দ্রিয় তাহার বিশেষ বিশেষ শক্তি বা তাহার শক্তিভেদ মাত্র। (বিঃ ভিঃ) শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

আসাম ও আসামী ভাষা।

বঙ্গের প্রাকৃতিক সীমা।

মগধ সীমান্ত হইতে তাম্রলিপ্তি, হিমালয় হইতে কলিঙ্গ সীমস্থ নদ, নদী, পাহাড় পর্ব্বত, অরণ্যানী সমাকীর্ণ (সাগর অধিকৃতাংশ ব্যতীত) ভূভাগই প্রাচীন বঙ্গ।

মনুসংহিতা।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ। মনুর ন্যায় বৌধায়নও কামরূপের কোন উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু বঙ্গের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

খ্রীঃ পূঃ ৭৭৭।

এই সময় পুণ্ড্র, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তিতে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল; তখন প্রাগ্জ্যোতিষে * আর্য্য প্রভাব থাকিলে জৈনধর্ম্ম প্রবেশ ও প্রচার না হইয়া থাকিত না।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত পৃঃ ১০১, ১১৩, ১২৪।

খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী।

এই শতাব্দীতে মহাত্মা বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হন, তিনি তৎকাল-প্রচলিত ৬৪টী লিপি পাঠ করেন; (বঃ ভাঃ ও সাঃ এবং Kaccayan's Pali Grammar, Introduction Page XI.) তন্মধ্যে বঙ্গলিপি একটী। ললিতবিস্তারে কামরূপী লিপি বলিয়া কোন লিপির উল্লেখ নাই।

খ্রীঃ পূঃ ৩০০ শতাব্দী।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থেনিস্ (Magathenis) তাঁহার গ্রীক ইতিহাসে গঙ্গারেটী দেশের উল্লেখ করিয়াছেন; কামরূপের পৃথক অস্তিত্ব থাকিলে অবশ্যই উল্লেখ করিতেন।

খ্রীঃ পূঃ ২৫০ বৎসর। *

২১৬১ বৎসর অতীত হইতে চলিল, বঙ্গ বর্ণমালা, পরিবর্ত্তন চক্রের নিষ্পেষণে বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কামরূপী বা আসামীয়া বর্ণমালার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই।

খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী। †

জৈন অঙ্গ মধ্যে "রাঢ়ে"র উল্লেখ আছে কামরূপ বা আসামের কোন উল্লেখ নাই।

খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী। ‡

প্রসিদ্ধ গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি গঙ্গারাঢ়ের উল্লেখ করিয়াছেন, কামরূপ বা আসামের উল্লেখ করেন নাই। পৃথক অস্তিত্ব থাকিলে অবশ্যই করিতেন।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী। §

এই শতাব্দীতে কামরূপের নাম পাই, ইহা তখন কান্যকুব্জের বিখ্যাত গুপ্তবংশের শাসিত। মহারাজ সমুদ্র গুপ্ত তখন কামরূপাধীশ্বর।

খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী।

এই শতাব্দীর প্রাক্কালে পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতে আসেন; তাঁহার সময়ে মথুরা * হইতে মগধ পর্য্যন্ত মধ্য ভারত ছিল। এবং মগধ হইতে তাম্রলিপ্তি সীমা পর্য্যন্ত পূর্ব্বভারত ছিল, সুতরাং তখন প্রাগজ্যোতিষের কামরূপ বঙ্গ অঙ্গই ছিল।

৭ম শতাব্দী।

এই শতাব্দীতে বিখ্যাত ভ্রমণকারী হুয়েনসাং (Houn Tsang) ভারত-ভ্রমণে আসেন, তাঁহার সময়ে † বঙ্গপাঁচটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সময় কামরূপের রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বতন্ত্র; তাঁহার কামরূপ বিবরণে দুইটী প্রধান তত্ত্ব পাই, লোকতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্ব। লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মাননীয় E. A. Gait I. C. S, মহোদয় তাঁহার Koch Kings of Kamrup পুস্তিকার ৮ এবং ৯ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন "* * * * it seems not unreasonable to presume that he (the then) কামরূপাধিপতি কুমার ভাস্কর বর্ম্মা was a Hindu convert from some aboriginal tribes. The presumption is strengthened by the fact that his subjects are described as being of small stature with dark yellow complexions."

অতএব জাতি অনুযায়ী ভাষা "spoke a language different from that of Mid India" অনার্য্যই ছিল।

গুপ্ত শক ৫১০—খ্রীঃ অঃ ৮২০—৩০।

তেজপুরের ১½ মাইল পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

† সাহিত্য-সম্মিলন-বিবরণী, কাশিমবাজার।

‡ ৩য় সংখ্যা ১২ বর্ষ, সাহিত্য, পৃঃ ২১৭।

§ Karim's History of India & Dutt's Civilisation of Ancient India, Page 49.

* Dutt's Civilisation, Page 60.

† —do—do—do 15.

নদ-চুম্বিত শিলডুবি নামে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, এই পাহাড়ের পাদমূলে ব্রহ্মপুত্র, তটগর্ভে একটী প্রকাণ্ডকায় শিলাখণ্ডের উপর ৯ ছত্র উৎকীর্ণ লিপি আছে, এই লিপির পাঠোদ্ধার হয় নাই—অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। লিপির শেষে উৎকীর্ণ মোহরে গুপ্ত শক ৫১০ উৎকীর্ণ; এই গুপ্ত শক খ্রীষ্টীয় ৮২০৮-৩০ অব্দ কোন না কোন গুপ্ত-বংশেরই অধীনতা জ্ঞাপক।

৮৫০—৯১৫ শতাব্দী। *

দিনাজপুর অঞ্চলের পালবংশের অধীনে কামরূপ থাকিয়া উত্তর বঙ্গের শব্দ প্রভৃতি আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। এবং বর্ত্তমানে যে না করিতেছে, তাহা নহে।

১০৪৬—১০৬৬ শতাব্দী।

উক্ত পালবংশের ধ্বংস-স্তূপে বঙ্গের সেন বংশীয় বিজয় সেন কামরূপাধীশ্বর হইয়াছিলেন।

১১ শতাব্দী। †

আবু রইহান (Abu Raihan) তাঁহার ভারত-বিবরণে গৌড়ী (বঙ্গ) বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কামরূপী অথবা আসামীয়া বর্ণ বলিয়া কোন বর্ণের উল্লেখ করেন [illegible]।

উত্তর বঙ্গের ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী জিতারি। ‡

জলপাইগুড়ির সন্নিকট জল্পেশ্বরে জিতারির রাজধানী ছিল; তিনি জলপাইগুড়ি হইতে কামরূপ শাসন করিতেন।

উত্তর বঙ্গের কমতাপুর রাজবংশের অধীনে কামরূপ। §

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে খেন জাতীয় নীলধ্বজ কামরূপের অধিপতি হন। তখন কামরূপ বঙ্গের শাসনাধীন।

কুচবিহার রাজবংশের অধীনে কামরূপ বা আসাম ১৫০৬—১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ। ‡

কামরূপাঞ্চল ১০৫ বৎসর কোচ রাজাদিগের অধীনে ছিল। এই বংশের শাসন সময়েই "কোচবিহারত পূর্ব্বে যি ভাষা চলিত আছিল,সেই ভাষাই অসম দেশর আজি চলিত অসমীয়া ভাষা" (রায় ৺ মাধবচন্দ্র বড় দলই বাহাদুর প্রকাশিত অসমীয়া রামায়ণর পাতনী) কিন্তু রায় বাহাদুর মহাশয়ের ঐ উক্তি মূল্যহীন, কারণ রাজা নরনারায়ণের সময়ে কুচবিহারে ‡ রাজভাষা বাঙ্গালাই ছিল।

লোকতত্ত্ব। (১)

"নন্দ বংশ-লোপর পাছত মগধ-প্রদেশত যি হুল স্থূল হয় সেই সময়তো অনেক লোক এই দেশলৈ আহে। * * * * আরু দেশ জয় করিবলৈ অনেক লোকে এই দেশলৈ আহে। সময়ে সময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অনেক লোক আহি ইয়াতে বিবাহাদি করি

* ৺গুণাভিরাম বড়ুয়া প্রণীত আসাম বুরঞ্জী ৫২ পৃ।

† ঐ ঐ ৬৩ পৃ।

‡ আসাম বন্তি ১৯০১—২৭ জুন রাজা নরনারায়ণ লিখিত ১৪৭৭ শকের একখানি চিঠি।

(১) ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে কামরূপের পূর্ব্ব ভাগে আর্য্য ভাষা ভাষীর সংখ্যা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না; থাকিলে শানেরা (উত্তর ব্রহ্মের শান-প্রদেশ হইতে আগত) অবশ্যই বিশেষরূপে বাধা পাইত, সহজে পূর্ব্বভাগে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত না। ইহাদের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যভাষা ভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং ভাষাটাও নানা প্রকারের মঙ্গলীয় জাতির সহিত মিশিয়া বিরূপ ভাব ধারণ করিবার সুযোগ পায়।

* Koch Kings of Kamrup, page 12, 13 and 14.

† Dutt's Civilisation P. 319.

‡ Koch Kings of Kamrup by E. A Gait I. C. S.

§ Do Do Page 15.

রইগল। এই নিয়ম এতিয়াও চলিছে। * * * * * তেতিয়া বখতিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশ জয় করি এই দেশলৈ আহি ইয়াক আক্রমণ করে। তেতিয়াই যি বিলাক মানুহ এই দেশত থাকিলে সেই সকল গরীয়া বুলি প্রসিদ্ধ হল। কোচবেহার রজাই শ্রীহট্ট আরু কোচবেহারর পরা এই দেশলৈ কিছুমাণ ব্রাহ্মণ অনাই ইয়াত পাতে। কামরূপর পূর্ব্বর রজা সকলে (পাল, সেন, খেন বংশীয়) অনেক ব্রাহ্মণাদি আনি এই দেশত বসতি করায়। কোচবেহারর নরনারায়ণ রজা সময়ত ইয়ালৈ সেই দেশর অনেক লোক আহে। শঙ্কর দেবর সময়তো অনেক বাঙ্গালী আরু উড়িয়া মানুহ এই দেশলৈ আহে। রুদ্রসিংহ স্বর্গদেবে অনেক শিল্পকর আরু পণ্ডিত লোক ভাটীর (বঙ্গের) পরা এই দেশলৈ অনাই যথাযোগ্যরূপে বসতি করায়। মণিপুর জয়ন্তা কাছার কমতাপুর প্রভৃতি দেশর পরাও অনেক মানুহ যুদ্ধাদির পাছত বা মিত্রতা উপলক্ষে এই দেশলৈ আছে।" (৺গুণাভিরাম বড়ুয়া প্রণীত আসাম বুরঞ্জী ২১,২২,২৩,৫৪ ও ৫১ পৃষ্ঠা)।

ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং লৌকিক তত্ত্বে আসাম বা ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার সংস্থান দেখিলাম, এখন ভাষার ভিতর দিয়া দেখিব "অসামীয়া ভাষার" স্থান কোথায়।

মানুষ লইয়া ভাষা—আর্য্যের ভাষা আর্য্য, অনার্য্যের ভাষা অনার্য্য। যদি তাই হয়, তবে ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার বা আসামের বর্ত্তমান ভাষা ১টী আর্য্য, আর ১টী অনার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভারতে আর্য্য অনার্য্য মিশ্রিত, কে আর্য্য কে অনার্য্য নির্ণয় করা দুরূহ। যে সকল দস্যু আর্য্যকৃত হইয়া আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহাদের ভাষাও এখন আর্য্য। তবে যাহারা এখনো অমিশ্র আছে, তাহাদের ভাষার পরিবর্ত্তন হয় নাই, যথা এই উপত্যকার পূর্ব্বভাগস্থ (১) আসামে মিরি, মিকির, মিশমি, মিথি, কছারি, কুকি, নাগা, খাসি, ডফলা, আবর ইত্যাদি। ঋগ্বেদের "দস্যুণ আর্য্য বর্ণং" দুইটীই জাতিবাচক শব্দ। ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যদিগের নিকট দস্যুরা হেয় ছিল, এখন যে সে ভাব নাই, তাহা নহে; তবে যে সকল দস্যু আর্য্য বশ্যতা স্বীকার ও আর্য্য ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহারা দস্যুস্তর হইতে আর্য্যস্তরে অগ্রসর বলিয়া আর্য্য আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সিন্ধু হইতে গঙ্গা-প্লাবিত গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত যখন উপনিবেশের পর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া আর্য্য বিস্তৃতি হইতেছিল, তখন দস্যুরা দূরবর্ত্তী গিরিশ্রেণী ও অরণ্যানীতে প্রবেশ করিতেছিল। এইরূপে আর্য্যগণ যখন বিস্তৃত হইয়া করতোয়ার পশ্চিম তীরভূমি পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া গেল, যখন করতোয়ার পশ্চিমতট-প্রদেশ আর্য্যদিগের আহার যোগাইতে অক্ষমভাব প্রকাশ করিল, তখন বর্দ্ধিতাংশ আর্য্যভাগ করতোয়ার পূর্ব্বতটস্থ নীরাপদ ব্রহ্মপুত্রোপত্যকায়—কামরূপে—প্রাগজ্যোতিষে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। ব্রহ্মপুত্রোপত্যকায়—প্রাগজ্যোতিষে এই প্রথম আর্য্য উপনিবেশ—এই উপনিবেশের প্রসার বৃদ্ধি হয় নাই, কারণ দস্যুপূর্ণ

(১) ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে উত্তর ব্রহ্মের শানপ্রদেশ হইতে কতকগুলি শান আসিয়া শিবসাগরাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করে, ইহারা আহোম নামে পরিচিত হয়। ইহাদের নামানুসারে কামরূপের পূর্ব্বভাগ আসাম নাম হয়।

এককালে আসামে মারিলে টেঙ্গুবাণি।
আসামক ভয়তে পলাইল সবে প্রাণী॥ ৯৮
কবি দৈত্যারি ঠাকুর প্রণীত শঙ্কর মাধব চরিত্র ২০ পৃঃ।

উপত্যকায় ক্ষীণকায় আর্য্য উপনিবেশের জীবন ধারণই দুরূহ হইয়াছিল। এই উপনিবেশের বংশধরেরা পরবর্ত্তীকালের কলতা কলিতা। (১) ইহাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ যে ভাষা ও আচার ব্যবহার আনিয়াছিলেন, তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল এবং ক্রমশঃ আদানপ্রদান অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল,—এইজন্য খ্রীষ্ট পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই উপত্যকার পূর্ব্বভাগে—আসামে আর্য্যজাতির ও ভাষার কোন বিশেষ পরিপুষ্টি হইতে পারে নাই; ইতিহাসের আভাসে ইহা বেশ উপলব্ধি হয়।

সভ্যতা সংক্রামক'। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার উপর ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সমুদয় ভারতে বিস্তৃত—আর্য্য হইতে অনার্য্য পর্য্যন্ত এই সভ্যতার ফলভোগী। কলিতাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সভ্যতা আনিল, তদ্দ্বারায় এই উপত্যকার সকল অসভ্যকে সভ্য না করিলেও অধিকাংশকে সভ্যতার রসাস্বাদন করাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে যখন মিথিলা, শ্রীহট্ট, কুচবিহার, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে দলে দলে জন-তরঙ্গ আসিয়া ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার পূর্ব্বোক্ত রসাস্বাদিত উপত্যকাবাসীদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল—যখন ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসীর একত্র সংঘর্ষ হইল, তখন ত ভাষার বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। ভীষণ ভাষা-বিপ্লব প্রকাশিত হইতে কতকাল গিয়াছে—এই সময় মধ্যে যে সকল শব্দ সম্পদ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহার ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর বাংলা।

পুরা, নিদি, নোলবা = নোলওয়া, নলও। পণ, গিয়, নোওলা = নতলা। (১৩১৭বৈশাখ ভারতী ৩৪শ বর্ষ ১১ পৃঃ।)

৯ম শতাব্দীর বাংলা গ্রন্থ শূন্য পুরাণ।

এই শতাব্দীর লিখিত ব্যবহারের "ধান দাওয়া" গঙ্গারাঢ় (বাঁকুড়া প্রভৃতি) হইতে আসিয়া এখনো আসাম এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশের কথিত ভাষার উপর রাজত্ব করিতেছে। এই শতাব্দীর কহেন্ত, দহেন্ত, বলেন্ত, দেয়ন্তি, বলন্তি, সুনিলেন্ত, দিলেন্ত প্রভৃতি রূপ শব্দ কামরূপের কবি শঙ্কর মাধব প্রভৃতির বড় প্রিয় ছিল।

১০ম এবং ১১শ শতাব্দী।

পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে, বাটত, মাঠত, পাণিত, ঘরত, করস, যোজস, আমারার, তোমরার, তারার, তোহোর, রাজাএ, হরি এ, ভাম্বক, বাটক, মোহোক, রাজক প্রভৃতি রূপ শব্দ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে আসিয়া এই উপত্যকা অধিকার করিয়াছিল।

বীরভূম ও মিথিলার শব্দ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যে সকল শব্দের লিখিত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, ভাষার ক্রম বিকাশে সে সমুদয় শব্দ লিখিত ব্যবহারে পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু আসামের ভাষা পৃথক দেখাইতে এখনো সে শব্দগুলি প্রায়ই বর্ত্তমান। যথা:—তেঞি দিঞা, বিজলী, ওঝা, পিধন, কেনি, তুমি সব, ঝিয়ারি, কৈরাছে,সিনিয়া,আথর, গাত, ঠেটা—ঢেটা, টেটন, কহয় (হলোপে—কয়) (য় = এ, পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হইলে = কহে) অত এ, ঠাম (ম = ই) = ঠাই, করল (ই আগমে) করিল, যো, সো, যে, সি, সে, যি হৈলা, হৈল, করো, পিয়া, পুব, ঘোর,তীরক, ওর, পাসরি (স = হ) পাহরি, মরম, নারি, নোব্রি, করু, করই করৈ, করং, যেনেহ, পিয়াস, পাণি, অরু, আরু, থির, মোহে, ঝাপি, কত্না, তিতিল, মুনিহক বর্থা, আন বদরী, বগরি, গোপত (ও = উ) গুপত, পতিয়ার, সাওন,লাজ, ভাখা, বুঝি = বুঝিবে, জানিবে = জানি, পদুম দোল, শোওরি, দিমু, করিমু, তিরি, রাতি, মাহ, বোল, নিকস, কটারি, তাকর (অল্প) মএ, তুএ, তুঅ (অ = য়) ৩য়, চীন, কৈছে, হউ (উ = ই) হই,তিহ, তাক, তায়, তাঙ্ক, তান, তাহান,তাই (শ্রীহট্টে—তাঁইন ইত্যাদি ২।

বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কথিত এবং লিখিত ভাষা আর আসামের লিখিত এবং কথিত আসামী ভাষার পার্থক্য দেখুন,যথা:—

(১) যোষীয় জাতিসম্ভূত

বঙ্গ।

বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কথিত ভাষার শব্দ।	লিখিত ব্যবহার পুস্তকগত শব্দ
হামি, আম্তি, মুক্রি, মই, মুই, আমি,	আমি
আম্রি, মো, মএ, আমরা	আমরা
তুক্ষি, তুহু, তঞি	তুমি
তুমি, তুম্তাকে, তুমাকে, তোর,	তোমাকে
তুম্তি, তোমাকে, তোহোর	যিনি, তি'ন
যে, ছে, সে তার	তাঁহার
	তিনি স্ত্রী
	এইদিং
বিহা, বয়ে	বিবাহ
দুধ	দুগ্ধ
দিপ,	প্রদীপ, দীপ
পাখা	প্রান্তর
এটা, এড এইটে,	একটা, একটী
আই মা	এইটী
ভাই, বহিন	মাতা, জননী
তিরি, সি,..	ভ্রাতা, ভগিনী
না করব, করিব ন কর্বনা	স্ত্রী
হন্তে, হলে, তোংতে, হতে	করিব
করুম, করিম, করিব, কর	হইতে
যাম, যাব, যাইব	করিব
	যাইব
কতি, কুথা, কুঠি, কোথা কোথায়	কোথায়
জার	শীত
ওঝা, রোঝা, ওজা, বেজ, বৈদ্য	কবিরাজ
ছ্যানা, ছাইলা, ছ্যামড়ী	ছেলে,
ছুঁড়ী	পুত্র, ব
কুশোর, কুশাইর, আক	ইক্ষু
ভোইড়, পা, ঠ্যাঙ্গ	পদ্ম
ওবা, ঐ	ঐ
ইত্যাদি	ইত্যাদি

কামরূপের পূর্ব্বভাগ আসামের কথিত শব্দ।	লিখিত ব্যবহার পুস্তকগত শব্দ।	মন্তব্য
মএ, ময়, মই	মএ, ময়, মই	
আমি, আমালোক	আমি আমালোক	"আমি" আসামে
তএ, তয়, তুমি	তয়, তুমি	বহুবচন
যি, সি	যি, সি	
তার	তার	স্ত্রীলিং
তাই	তাই	
ইপিনে, এনি	ইপিনে, এনি	
বিহা	বিহা	
গাথির	গাথির	
ঢাকি	ঢাকি	
পথার	পথার	
এটা, অ্যাটা	অ্যাটা, এটা	
বৌ, আই	বৌ, আই	
ভাই, ককাই, বাই, ভনি	বাই, ভনি, ককাই	
তিরি, মাইকী	তিরি, মাইকী	
ন করো করোঁ	নকর, নকরোঁ	কর (আসামে
হন্তে	হন্তে	চারণ র=রে
করোঁ	করোঁ	
যাম	যাম	
কত (ক=উঃ কো) কেনি	কোনি, কত	
জার	জার	
ওঝা, বেজ	ওঝা, বেজ	
লড়া, ছোয়ালী	লড়া ছোয়ালী	
কুঁহিয়ার	কুঁহিয়ার	
ভরি	ভরি	
ওয়া, হউয়া	ওয়া, হউয়া	
ইত্যাদি	ইত্যাদি	

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আসামের আসামী ভাষার মেরুদণ্ড বঙ্গের নিভৃত গ্রাম্য মন্দিরে। কামরূপীয় কবি ও সাধক লিখিত পুঁথি প্রভৃতিও তাহাই বলিতেছে, যথাঃ—

"কথা"।—জয় জয় পরমানন্দনন্দন পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপীনাথ কমলা কান্ত সুশান্ত! পরমীশ্বর! তোমার পদার বিন্দত নম কোটি কোটি প্রণাম করো। যার নাম মাত্রে সকল জগতর পাপ হরে; চিত্তকো পবিত্র করে পরম জ্ঞান মিলায়ে, ভুক্তি মুক্তি হরিভক্তিকো দেই, হেন দৈবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণক প্রণাম করো। ব্রহ্মা মহেশ্বরেয়ো আজ্ঞা করে লক্ষীয়ো যাক সতত সেবা করে; হেন সর্ব্বেশ্বর ভগবন্তক সহস্র কোটি দণ্ডবৎ করো। হে কৃপার সাগর দামোদর তবু গুণ গীতামৃত কথা বন্ধে রচিতে ইচ্ছা করো। যদি কৃপা একলেশ করা তেবে পারো। তোমার চরণ পদ্মত কায় বাক্য মনে শরণ পশিলো। যদ্যপি আমি শ্রীকৃষ্ণর প্রসাদে শ্রীধরী শঙ্করী দামোদরী ভাস্করী চারি ও টীকা বিচার করিছো, তথাপি প্রায় শ্রীধরা টীকার মতে কথা নিবন্ধিবো। তাহার যুক্তি শুনাঃ শঙ্করী টীকা জ্ঞানক প্রধান করি,ব্যাখ্যা করে, ভাস্করী কর্ম্মক প্রধান কহেঃ শ্রীধর ভক্তিক মাত্র নিরূপণ কহে। দামোদরী তিনিয়ো যোগক সমান কহেঃ। এতেকে ব সবর প্রীতির অর্থে, ভক্তি প্রধান মতক প্রায় লিখিবোঃ ভক্তির অনুকুল দেখি, কিছো কিছো তারার মতকো নিবন্ধিবো। জ্ঞান কর্ম্মরাথতে শঙ্করী ভাস্করীর বিবাদ ভক্তিত কিছো বিবাদ ন করিছে এতেকে ভক্তি পন্থ সবারে সম্মতঃ প্রথমে শ্রীধর স্বামী আপুনার ইষ্ট গুরুক প্রণাম করন্তঃ যি ভগবন্তে অনন্তর মুখর ব্যাখ্যা চাতুর্য্যক একে মুখেধরা, হেন অদ্ভুত পরমানন্দ সাধক বন্দো। ইদানীক হরিহর মূর্ত্তিক অভেদে প্রণাম করো—কাজক নির্ণয় করন্ত,—লক্ষ্মীপতি জগদীশকঃ; উমাপতি বিশ্বনাথক আদরে প্রণাম করি, সাধু সবর ভক্তিত বশ্য হৈয়া গীতার ব্যাখ্যা সুবোধিনী নাম টীকা করিবো। ভাষ্যকার শঙ্করীর মতক মতি অনুসারে বিচারিয়া, তার ব্যাখ্যা রূপ আনন্দ গিরির বচনক অনুসরি, গীতার অর্থ ব্যাখ্যা করা যাই। সেই সুবোধিনী টীকাক বুদ্ধিমন্ত সবে চিন্তন করোক। আবে সর্ব্বটীকার অনুসারে গীতাকথনর কারণ কহো—ভগবন্ত পুরুষোত্তমে, জীবক কৃপায়ে ছাব্বিশ তত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ড স্রজি তাতে ব্রহ্মাণ্ডক উদ্ভব করিলা। ব্রহ্মার পুত্র মরীচ্যাদির মুখে প্রবৃত্তি মার্গ প্রবর্ত্তাইলা

* * * *

আন শাস্ত্র বিস্তরত কি প্রয়োজন, যি গীতা ভগবন্তর মুখ পদ্মত ব্যক্ত হৈয়াছো। তাত প্রথমে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সংবাদ প্রস্তাব কহন্ত। ধৃতরাষ্টে সঞ্জয়ত প্রশ্ন করন্ত—হে সঞ্জয় মোর পুত্র সব ধর্ম্ম ভূমি কুরুক্ষেত্রত, যুদ্ধক ইচ্ছায়ে কি কর্ম্ম করিলা, তাক মোত কহ। সঞ্জয় কহন্ত শুনা রাজা * * * তুমার পুত্র দুর্য্যোধন, দ্রোণ আচার্য্যর সমীপক গৈয়া বুলিবে লাগিলা * * * সঞ্জয়ে বোলন্ত, জানা রাজা অর্জ্জুনর এহি বাক্য শুনি শ্রীকৃষ্ণে সকলে রাজার মাঝত ভীষ্ম দ্রোণ সমুখত, দুই সেনার মধ্যত উত্তম রথ রাখি বুলিলা, হে পার্থ কুরু বীর সবক কুমেলি দেখা,তাত অর্জ্জুনে পিতৃব্য, পিতামহ আচার্য্য মাতুল ভাতৃ পুত্র, পৌত্র, সখি শ্বশুর সুহৃদ্ সব দুই সেনাত দেখিলা। এই সব বন্ধু যুদ্ধক ইচ্ছায়ে. সমুখে থাকিবার দেখি, পরম কৃপায়ে ব্যাপ্ত হৈয়া মহাদুখ পাই কুন্তি পুত্র অর্জ্জুনে শ্রীকৃষ্ণক বাক্য বুলিলা হে কৃষ্ণ এই জ্ঞাতি সবক যুঝিবে ইচ্ছায়ে যুদ্ধও উপস্থিত দেখি মোর কর চরণাদি ভাগি যাই, মুখো শুখাই শরীরো কাম্পে রোমো শিহড়য়, গাণ্ডিবধনু হাতর খসি পড়ে, চর্ম্মো তাপকরে আছোক যুজিবো আগত থাকিবে নপারো মনো মহাভ্রম হয় বিমঙ্গল সবো দেখো। উপরত শগুন কুরে শৃকালে আরাব করে যুদ্ধত স্বজনক বধি কিছো ফল নে দেখো, বিজয়কো আকাঙ্ক্ষা করো রাজ্যক ইচ্ছা নাই, সুখকো ন বঞ্চো, গোবিন্দ আমার রাজ্য ভোগত কি প্রয়োজন যি বন্ধুসবর অর্থে আমি রাজ্য ভোগ ইচ্ছা করো সি বন্ধু সব প্রাণধন ত্যাগক অঙ্গীকার করি যুদ্ধত উপস্থিত হৈয়া আছে তাক শুনা,আচার্য্য পিতৃব্য, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর

শ্যালা সৰ্ব্বন্ধি সব,—আরা যদি আমাকে মারে তথাপি আরাক আমি বধিতে ইচ্ছা ন করো। ত্রৈলোক্য রাজ্য অর্থেও ন বধি পৃথিবী মাত্রর পদে ন বধি ডাক কি বুলিবো। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্টর পুত্র সব বধিলে আমার কি প্রীতি হৈব। যদ্যপি আরা আলাক বিষ দিছে অগ্নিতো দহিছে, ধন সর্ব্বস্ব হরিছে, রাজ্য ভারো কাঢ়ি লৈয়া আছে, এই ছয় দোষে আরা সবে আততায়ী, অর্থশাস্ত্রর মতে আততায়ীক বধিলেয়ো দোষ নাই, তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রক অপেক্ষায়ে, আরাক বধিলে আমাক দোষ পাইব, এতেকে ধৃতরাষ্টর পুত্র সব আমার বান্ধব। তারাক বধিবে আমার ভাল নো হে। যাতে বন্ধু সব বধক অন্যায়ে অধর্ম্ম দেখি।

হে মাধব! বন্ধু সকলক বধি কেমনে সুখী হৈবো! যদ্যপি আরা লোভত থাকি কুলক্ষয় দোষ মিত্রদ্রোহ পাপক নে দেখে তথাপি আমি সেই দোষ দেখি কেনে পাপত নিবৃত্তি নহৈবো? আবে সেই দোষকে শুনা, —কুলক্ষয় হৈলে কুলধর্ম্ম নষ্ট হৈব, ধর্ম্মনষ্ট হৈলে অবশিষ্ট কুলকো অধর্ম্মে ব্যাপিব, অধর্ম্মে ব্যাপিলে কুলস্ত্রী সব দুষ্টা হৈব, স্ত্রী দুষ্টা হলে বর্ণত শঙ্কর হৈব, কুল নরকগতি হৈব; তেবে পিতৃ সব লুপ্তপিণ্ড জলাঞ্জলি হৈয়া পড়িব। এই দোষে সবে জাতিধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম্মনষ্ট হৈয়া মনুষ্য সব নরকত বাস করিব, তাক আমি শ্রুতিত শুনিছো। অহো কি কষ্ট! মহাপাপ করিতে আমি নিশ্চয় করিলো, রাজ্য সুখলোভে স্বজন বধিবে উদ্যত হৈলো, এমনে মহাতাপ করি মরিবে নিশ্চয় করন্ত, মই অস্ত্র ন ধরিমানে রহো, তেবে দুর্য্যোধনাদি যদি অস্ত্রধরি মোক বধে তেবে মোর মহা প্রিয় হয়। যাতো পাপ নিসিজিব। সঞ্জয়ে কহন্ত, জানা রাজা যুদ্ধর সমুখত অর্জ্জুনে এই বাক্য বুলি ধনুশর এড়ি কম্পিত হৈয়া রথর উপরতে বসিলা। ইতি শ্রীভগবদ্গীতা কথায়াং।"

শ্রীভাগবত ভট্টাচার্য্য কৃতায়াং সৈন দর্শনো নাম প্রথমাধ্যায়ঃ। *

পত্র এই। + স্বস্তি সমস্ত গুণগনাগার পরম নিজ কুল ধৈর্য্য মর্য্যাদি ভিরত শ্রীযুক্ত নবাব আনায়ার খাঁ মহাশয়েষু শিবশুভয়ন্তঃ সস্নেহ লেখনং কার্য্যঞ্চ আগে জেমত জবাব লেখি আর রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্যেরও পর ৺র ইরশাল জামা গুণাগার গাঢ় হৈতেছে ইতর ফেত তোমার এইরূপ অবেগ্যো বেবহার জেখন জাক জিকাল ৺রে জিরূপ ভোগ অভ্যাপন করিতে থাকে সেকাল মাফিক বহুবিধ প্রকার সামর্থ হৈয়া থাকে আরু দেখ জেতক্ত তোমার চৈয়দ বাবাকর প্রমুখ্যে ২২ উমরাও সহিত লোক লস্কর পিয়াদা ঢালি বরকন্দার নিশেষ সরিয়ন করিয়া ৺ থাণ্ডায়ে দেহোর খণ্ড খণ্ড করিলেক তেতিয়া নেকি তোমার সমান ৺ ঠাইর মহিম জরোবার ওমরাও নাচিল নেকি তুমি জে এমতবিধ বিচার নাহি কর আরু বিশেষ সমাচার অতিপূর্ব্বে আমা ৺র আমাত্য ফাচেঙ্গ মুনর বেটা চনথাম বড় গোসাঞি ও ঘর সন্দিকৈ বড়ুয়া চন্দনাচল পর্ব্বতত হস্তে একটা মহাবলবস্ত রাজক আনি তার সসন্য সহিত মারিয়া উত্তর দেবালয়র কোনে মুড়মালা দোল বান্ধিলেক তার অবশেষ হস্তী ২৭ টাঙ্গন ১০০০ হিলৈ নৌকা প্রজা অপরিমিত মারিয়া ৺ আনিলেক আপন দেশক পাচে উত্তর কোণ পর্ব্বতর মাঝে তাকিদ করিয়া কমতেশ্বরর পাট গোপালপুর পরগনার দোসিমানার হে চাড়িয়া করতিয়ার জলে সোনা[illegible] খাণ্ডার কলুপ সব দূর করিলেক সেই কাল তোমার গৌড়েশ্বর পাৎসার মচন্দর গাজির জামাতা দিন দিবাউল গাজিক ভেজায়া প্রীত সাহ্লাদ করিয়া এখার সিন্দুর ঘোড়াঘাট ফড়িয়াবাদ তাহে তকার ভাতি এই সকল

* ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ দামোদর দেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে মত্ত ছিলেন, তাঁহার শিষ্য কবিরত্ন উপাধি-ভূষিত ভট্টদেব বা ভাগবত ভট্টাচার্য্য তাঁহার আদেশে "কথা বন্ধে একখণ্ড ভাগবৎ করা, গীতা আদির কথায় (গদ্যে) অনুদিত করেন।

+ গদ্য ইতিহাসখানি খণ্ডিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানি আমার বন্ধু বাবু রজনীনাথ দাস মহাশয় দরঙ্গ জেলার হুতিয়া থানার বড়ুয়া বংশীয় কোন ব্যক্তির নিকট পাইয়াছেন। ইহাতেও ষোড়শ শতাব্দীর শিবসাগরীয় ভাষা পাইতেছি।

ইহার মধ্যে ঘোড়াঘাট পুখুরিয়া আঘার সিন্দুর জেখানে শাহত পরঙ্গনা রায়ত গুণাগার দিবেক * * আরু যৎকিঞ্চিৎ বচন শঙ্কিত আমাটের উকিল সনাতন ও শ্রীকানু শর্ম্মা প্রমুখাক প্রণীত সম্প্রতিত দ্বারেফ সব' মুদ্রু হয় আর অধিক আমরা কত লেখিবার অপর সমাচার আমার উকিল প্রমুখাত জ্ঞাত হৈবেক ইতি শক ১৫৫৫ ভাদ্রমাস।"

এখন বেশ দেখা গেল যে,ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে কামরূপের ভাষা কি ছিল। সুতরাং বলিতে পারি, ভূগোলে, ইতিহাসে, লোকতত্ত্বে এবং ভাষায় কামরূপ (আহোমদিগের আসাম ব্যতীত) বঙ্গেরই অঙ্গ ছিল এবং এখনো আছে।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

লক্ষ্মণ সেন দেবের তাম্রশাসন।

"বল্লাল সেনের তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হওয়ার পর, লক্ষ্মণ সেনের আর একখানি তাম্রশাসনের সংবাদ প্রাপ্ত হই। এই তাম্রশাসন পাবনা জেলার অন্তর্গত মাধাইনগর নামক গ্রামে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার পাঠোদ্ধার করতঃ স্বীয় মন্তব্যের সহিত তাহা "রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" প্রকাশ করিয়াছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল দাস কুণ্ড মহাশয় উক্ত পত্রিকা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। উদীয়মান লেখক রাখাল বাবু উক্ত প্রবন্ধে স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধের সহিত যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে কেবল মাদৃশ বৃদ্ধের পক্ষে অপাঠ্য, এমত নহে, বোধ হয় রাখাল বাবুর ন্যায় বালকেও তাহা পাঠ করিতে পারিবেন না। সুতরাং রাখাল বাবুর উদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে ২।৪টী কথা বলিতে হইলে।

এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, লক্ষ্মণ সেনের ৪খানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল শাসনে দাতার এইরূপ পরিচয় লিখিত হইয়াছে :—

১। তর্পণদীঘির তাম্রশাসন—"পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবঃ—।"

২। আনুলীয়ার তাম্রশাসন—"পরমেশ্বর পরম বৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব :—।"

৩। মাধাই নগরের তাম্রশাসন—"পরমেশ্বর পরম নারসিংহ পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব।"

৪। সুন্দরবনের তাম্রশাসন—"পরমেশ্বর পরম বীরসিংহ পরমস্তুভাবক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব :—।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে, "পরমভট্টারক" স্থলে "পরমস্তুভাবক" প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। (১) মাধাইনগরের তাম্রশাসনের সাহায্যে এক্ষণ বলিতে পারি যে, "পরমনারসিংহ" স্থলে তিনি "পরমবীরসিংহ" প্রকাশ করিয়াছেন। তর্পণদীঘি ও আনুলীয়ার তাম্রশাসনে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনকে "পরম বৈষ্ণব" বলা হইয়াছে। মাধাই-

(১) ভারতী। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ। ৪৫৮ পৃষ্ঠা

নগরের তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি নৃসিংহ মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। সুন্দরবনের তাম্রশাসন পাঠ করিতে না পারিয়া ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় "পরম নারসিংহ" স্থলে পরম বীরসিংহ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় মক্ষিকা চিত্র-বৃত্তি অবলম্বন করত তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

অষ্টাবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে আমি লিখিয়াছিলাম যে, "রাজসাহি ও মন্দরগিরির প্রস্তর লিপি এবং কুলতুঙ্গার শাসনপত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে, বিজয় সেন চোলরাজবংশের সেনাপতি বা আত্মীয় রাজপুত্র। তিনি কুলোতুঙ্গা দ্বারা গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।" (২)

এই সকল কথা লইয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত চিঠি পত্র দ্বারা প্রায় তিনমাস কাল তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল। মিত্র মহাশয় তর্ক সংগ্রামে পরাজিত হইয়া যখন স্বীয় পরাজয় স্বীকারে কুণ্ঠিত হইলেন, তখন আমাদের উভয়ের লিখিত পত্রগুলি কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তৎকালে বৃদ্ধ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন "কখনও একর্ম্ম করিবেন না।" তাঁহার আর্ত্তনাদ শ্রবণে নিতান্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। লোকসমাজে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। সত্য উদ্ধারই আমার জীবনের ব্রত। মিত্র মহাশয় জীবিত থাকা কালে যাহা প্রকাশ করি নাই, এক্ষণ তাহা প্রকাশ করা আমি সঙ্গত বোধ করি না।

বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর পথ-প্রদর্শক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত কলহ করিয়া যে ঐতিহাসিক তথ্য প্রচার করিয়াছিলাম, দীর্ঘকাল অন্তে মাধাই-নগরের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া তাহার সত্যতা দৃঢ়তর রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। রাখাল বাবু এ বৃদ্ধের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া (৩) লিখিয়াছেন যে "মাধাই নগরের তাম্র শাসন হইতে চারিটি নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ঃ—

১। সেনরাজগণ-দাক্ষিণাত্যবাসী (৪) ও সম্ভবতঃ অনার্য্যবংশ-সম্ভূত (৫)। কিন্তু ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বঙ্গীয় কায়স্থ বা বৈদ্য ছিলেন না। (৬) দাক্ষিণাত্যরাজ রাজেন্দ্র চোড়ের দিগ্বিজয় কালে তাঁহার কোন সেনানী বোধ হয়

---

(২) মৎপ্রণীত সেনরাজগণ, ৯ পৃষ্ঠা। (দ্বিতীয় সংস্করণ)

(৩) বঙ্গের পুরাতত্ত্ববিৎ অনেক পণ্ডিতই আমার প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কোটেসন দ্বারা আমার লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু নামটী প্রকাশ করেন নাই। জনৈক C. I. E.কে তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছিলাম, তিনি দ্বিতীয় বার সেই ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু আমার নাম উল্লেখ করেন নাই। মেকলে সাহেব কি সাধে আমাদের গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৪) দক্ষিণাপথ-নিবাসী ?

(৫) "সম্ভবত অনার্য্য বংশ-সম্ভূত" ইহা রাখাল বাবুর কল্পিত নূতন ঐতিহাসিক তথ্য বটে। এরূপ প্রমাণহীন বাক্য যে কিরূপে তিনি সেনবংশের প্রতি আরোপ করিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

(৬) ইহা সত্য যে, তাঁহারা বঙ্গীয় কায়স্থ বা বৈদ্য নহেন। কিন্তু তাঁহারা যে, দক্ষিণাপথ-নিবাসী চন্দ্রবংশীয় (কায়স্থ) ক্ষত্রিয়, তাহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। সেন-রাজগণ পুস্তক পুন মুদ্রাঙ্কন কালে তাহা প্রমাণের সহিত প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন, সেনরাজগণ তাঁহার বংশজাত।" (৭)

২। "মহারাজ বল্লাল সেন দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত চালুক্য বংশে রামদেবী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (৮) ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, সেনরাজগণ স্বাধীন হইবার পরেও দাক্ষিণাত্যে বিবাহ করিতেন। হইতে পারে যে, এদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ কন্যা-দানে অসম্মত হইলে, তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এপর্য্যন্ত নিশ্চয় যে, সাময়িক ইতিহাসে অধিক দূর-বর্ত্তী, রাজগণের মধ্যে বিবাহ অতীব বিরল।" (৯)

৩। "মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেব কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই উড়িষ্যা হস্তগত করিয়াছিলেন। তিনি কাশী-রাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কাশী ও ত্রিবেণী বিজয়ের কথা কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্র-শাসনেও পাওয়া যায়:—

"বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধর-গদাপাণি সংবাস বেদ্যাং ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষ গঙ্গোর্ম্মিভাজি। তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্ব্যাজে পূতে, যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযুপৈঃ সহ সমর-জয়স্তম্ভ মালাস্তধায়ি॥(১০)

"৪। মাধাইনগরের তাম্রশাসনের ৩২ পংক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, লক্ষ্মণসেন দেব কামরূপ বা আসাম জয় করিয়াছিলেন। দেওপাড়ার ক্ষোদিত লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বিজয় সেন দেবও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বিজয় সেন দেবের রাজত্বের শেষভাগে বা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে কামরূপ সেন-রাজগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।"

প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় যাহা সত্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যতটুক প্রকৃত সত্য, তাহা পূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছি। যতটুক

---

(৭) এই কথা আমি অষ্টাবিংশতি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি। রাখাল বাবু যাহাকে রাজেন্দ্র চোড় বলিয়াছেন, তাঁহার অন্য নাম কুলোত্তুঙ্গ দেব। চালুক্য বংশের বংশাবলী প্রকাশিত হইবে।

(৮) মহারাজ বিজয় সেন কুলোত্তুঙ্গ দেবের সম্পর্কিত কিম্বা সেনাপতি বলিয়া আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(৯) রাখাল বাবু যে কি রূপে এই সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। (১) কাশ্মীরপতি জয়পীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজকন্যা বিবাহ করেন। (২) নেপালপতি দ্বিতীয় জয়দেব গৌড়েশ্বর শ্রীহর্ষ দেবের কন্যা বিবাহ করেন। (৩) মহারাজ গোপাল ভূগুরাজের রাজকন্যা বিবাহ করেন। (৪) মহারাজ ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকুট বংশীয় রাজকন্যা বিবাহ করেন। (৫) মহারাজ প্রথম বিগ্রহ পাল চেদীর রাজ-কন্যা বিবাহ করেন। (৬) মহারাজ রাজ্য-পাল রাষ্ট্রকুটপতি জগত্তুঙ্গের কন্যা বিবাহ করেন। (৭) মহারাজ দ্বিতীয় গোপাল বল্লভীর রাজকন্যা বিবাহ করেন। (৮) মহা-রাজ নরপালের পুত্র বিগ্রহ পাল চেদীপতি কর্ণের কন্যা বিবাহ করেন। ভারত-সম্রাট মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের কন্যা বল্লভিরাজ বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজগণের মধ্যে দূরবর্ত্তী বিবাহই চির প্রচলিত প্রথা। বর্ত্ত-মান ত্রিপুরেশ্বর নেপাল রাজবংশে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঢোল-পুরের রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন। কোথায় ত্রিপুরা কোথায় নেপাল, কোথায় ঢোলপুর।

(১০) কেশবসেনের তাম্রশাসন। ১৩ শ্লোক। বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন, ১২ শ্লোক। ইহার অর্থ—দক্ষিণ সাগরের বেলা-ভূমিস্থিত মুষলধারী ও গদাপাণির মন্দিরের সন্নিকর্ষে, অশী-বরুণা-গঙ্গা সঙ্গমে—বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে, এবং কমলজ ব্রহ্মা কর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞস্থলী ত্রিবেণীতটে তিনি উচ্চ শীর্ষ যজ্ঞযূপ সমূহের সহিত সমর বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন।

কল্পনাপ্রসূত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ দফার লিখিত বিষয়ের ঐতিহাসিক সত্য কতদূর দৃঢ়তর, তাহা স্থির রূপে বলা যাইতে পারে না। সনন্দ লেখক কবিগণ স্ব স্ব প্রভুর গৌরব কাহিনী অতিবর্ণ চিত্রিত করিয়াছেন। রাজসাহি (দেওপাড়ার) শিলি লিপিতে লিখিত আছে :—

পাশ্চাত্য চক্রজয়কেলিষু যস্য যাবদ্
গঙ্গা প্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক
লগ্নোজ্‌ঝিতেব তবিবিন্দুকলা চকাস্তি॥ ২২॥

পাশ্চাত্য রাজন্যবর্গকে জয় করিবার জন্য গঙ্গাপথে তিনি (বিজয় সেন) যে সকল রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার একখানা গঙ্গার উৎপত্তি স্থানে ভঙ্গ হইয়াছিল। (১১)

ইহাদ্বারা এরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বিজয় সেন হরিদ্বার কিম্বা গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনা অবশ্যই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

তাম্রশাসন সমূহে লক্ষ্মণ সেনের বিজয় বৃত্তান্ত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত সম্পূর্ণ সত্য কি না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কোন কোন সময়ে কামরূপ-পতি বাঙ্গালায় জয়ডঙ্কা নিনাদিত করিয়াছেন, তদ্রূপ কোন কোন গৌড়েশ্বরও কামরূপে বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। কাথোলির তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, কামরূপাধিপতি বৈদ্যদেব গৌড়েশ্বরের কুমার পাল দেবের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি ছিলেন। (১২) তদ্ব্যতীত গৌড়ের অন্য কোন নরপতি কামরূপে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। উড়িষ্যা সম্বন্ধেও তদ্রূপই বটে।

এক্ষণ আমরা চালুক্য বংশীয় রাজেন্দ্র চোল (কুলোতুঙ্গ দেব) ও তাঁহার বিজয় বৃত্তান্তের কথা উল্লেখ করিব। উৎকল দেশে ল এবং র এর মধ্যবর্ত্তী একটী অক্ষর আছে। আমরা তাহার উচ্চারণ করিতে পারি না। এবং এই অক্ষরের কৃপায় উড়িয়াগণও লবণ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না। দক্ষিণ দেশে এই অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই অক্ষরের কৃপায় আমাদের রাঢ় দেশ দক্ষিণ দেশীয় গ্রন্থ ঐ ক্ষোদিত লিপি সমূহে লাঢ় বা লাল নামে পরিচিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র চোলকে আমরা রাজেন্দ্র চোল কিম্বা রাজেন্দ্র চোঢ় লিখিব, তাহাও স্থির করিতে পারি না। (১৩)

---

(১১) ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, মেটকাফ সাহেবের কৃত শিলালিপির অনুবাদ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। (J. A. S. B. Vol XXXIV, Part I. p. 149.) তৎপর ডাক্তার কিলহরণ সেই শিলালিপির চিত্র পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। (Ep. Indica. Vol. I, P. 309.) উদ্ধৃত শ্লোকের অনুবাদ করিতে যাইয়া তাহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছে। অত্যুক্তিপ্রিয় কবি উমাপতি ধর গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের উল্লেখ করিতে যাইয়া শিবের ললাট ভূষণ শশাঙ্ক দেবকে লইয়া টানাটানি করিতে বিরত হন নাই। বিজয় সেনের রণতরী যে ব্রহ্মার কমণ্ডলু পর্য্যন্ত গমন করে নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই জন্যই জয়দেব বলিয়াছেন:— "বাচঃপল্লবয়ত্যুমাধিপতিধরঃ।"

(১২) Ep. Indica. Vol: II. p. 350.

(১৩) আমার বোধ হয়, সৌর শব্দ হইতে ক্রমে ক্রমে চোড় বা চোল শব্দের উৎপত্তি। সৌর মণ্ডল হইতে ক্রমে চোলমণ্ডল এবং

প্রাচীন কালে দ্রাবিড় বা তামিল ভাষা প্রচলিত দেশ তিনটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যথা:—চোল, পাণ্ড্য, ও চের বা কেরল রাজ্য। আধুনিক মাদ্রাজ বা করমণ্ডল (বা সৌরমণ্ডল) উপকূলের পূর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া চোল বা চোলমণ্ডল রাজ্য অবস্থিত ছিল।* ইহার উত্তর সীমা পেন্নার ও দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ বেল্লারু নদী। আধুনিক মাদ্রাজ ও অন্যান্য কয়েকটী জেলা এবং মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল।

সপ্তদশ কি অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজপুত্র দ্বারা চোলরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল তাঁহার বংশধরগণ এই রাজ্য উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। শকাব্দের দশম শতাব্দীতে চোলপতি রাজরাজ দেব প্র চা চালুক্যবংশীয় বিমলাদিত্যের করে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করেন। বিমলাদিত্যের পুত্র রাজরাজ দেব স্বীয় মাতুল রাজেন্দ্র চোলদেবের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোল বা কুলোত্তুঙ্গদেব মাতামহের নাম ও উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনিও তাঁহার মাতুল কন্যা মধুরান্তকিকে বিবাহ করিয়া চোলরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে সূর্য্যবংশের বিলোপ ও চালুক্যবংশের অভ্যুদয়। এই চালুক্যবংশীয় রাজেন্দ্র চোল (কুলোত্তুঙ্গ দেব) দিগ্বিজয় উপলক্ষে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া সমগ্র বাঙ্গালা লণ্ডভণ্ড করিয়াছিলেন। তিরমুলাইর ক্ষোদিত লিপিতে লিখিত আছে যে, "কোকেশরীবর্ম্মণ ওরফে উদিয়ার শ্রীরাজেন্দ্র চোল দেব, উড্ডবিষয় (উড়িষ্যা) ও কোশলনাড় (দক্ষিণ কোশল) জয় করিয়া দণ্ডভুক্তি (দণ্ডভুক্তি) (১৪) রাজ্যে উপনীত হন, তুমুলসংগ্রামে সেই রাজ্যাধিপতি ধর্ম্মপালকে জয় করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি তক্ষণলাড় (দক্ষিণরাঢ়) (১৫) আক্রমণ করেন, তৎকালে রণশূর সেই দেশের অধিপতি ছিলেন। (১৬) তৎপর তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন; যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গেশ্বর গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করেন। তৎপর সঙ্গকোট্ট (সমতট ?) পতি মহিপালের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপর তিনি উত্তর রাঢ় জয় করিয়াছিলেন।"

উল্লিখিত বর্ণনার ঐতিহাসিক সত্য কি পরিমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ বিবেচনা করা যাইবে।

চালুক্যবংশাবলী আগামীবারে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

* চোল মণ্ডল হইতে ইংরেজি করমণ্ডল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

(১৪) দণ্ডভুক্তি-বিহার; দণ্ডপুর নগরে পূর্ব্বে বিহারের রাজধানী ছিল। দণ্ডপুর নগরে বৌদ্ধদিগের একটী বিহার ছিল। বখতিয়ার খিলজী এই বিহার ভস্মীভূত করেন। তাঁহার অনুচরগণ দণ্ডপুর শব্দ পরিত্যাগ করত সেই প্রদেশকে বিহার-আখ্যা দ্বারা পরিচিত করিয়াছেন।

(১৫) ক্ষোদিত লিপির অনুবাদক-ডাক্তার হুলটুন রাঢ় দেশের অস্তিত্ব অবগত নহেন, এজন্য তিনি দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ়কে গুর্জ্জর দেশীয় লাটদেশ স্থির করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মধ্যে মধ্যে এরূপ ভ্রম করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে মেলেরিয়া বিষের ন্যায় সেই সকল ভ্রম সংক্রামিত হইয়া থাকে। কনিংহামের "বৃজি" শব্দটী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত বর্জ্জি, পালি বর্জ্জি কনিংহামের কৃপায় বৃজিতে পরিণত হইয়াছে।

(১৬) রণশূর বোধ হয় আদিশূর বংশীয় হইবেন।

কোচবিহার রাজবংশ

কোচবিহার পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুরাজ্য কামরূপের অন্তর্গত ছিল। এই রাজ্য চারি জাতীয় রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত—নরকবংশ, পালবংশ, খেনবংশ ও কোচবংশ।

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অসুররাজ নরক শ্রীকৃষ্ণের একজন সহযোগী সহায় স্বরূপ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কামরূপ রাজ্য প্রদান করেন। নরকরাজ কিরাতদিগের দলপতি ঘটক নামক জনৈক রাজাকে বিতাড়িত করিয়া দীর্ঘকাল গৌহাটীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অসুররাজ নরক কালক্রমে অহঙ্কৃত ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া নরক রাজ্য তাঁহার পুত্র ভগদত্তকে প্রদান করিতে বাধ্য হন। ভগদত্তের সময়ে কামরূপ চারিটী জেলায় বিভক্ত ছিল। তিনি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে বিশ্ববিজয়ী মহাবীর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। স্থানীয় লোকের মধ্যে প্রবাদ আছে, কামরূপেশ্বর ভগদত্ত রঙ্গপুর নগরের স্থাপনকর্ত্তা।

গুপ্তবংশোদ্ভব মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহাবল পরাক্রমশালী সমুদ্রগুপ্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে কামরূপকে তাঁহার বিরাট সাম্রাজ্যের অধীন করিয়াছিলেন।

অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাল রাজগণ বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। এই সময়ে কামরূপেও পাল শাসনকর্ত্তাদিগের কথা জ্ঞাত হওয়া যায়।

পাল রাজগণের পর খেন নামে পরিচিত আদিম অধিবাসীদিগের জনৈক সর্দ্দার এই রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বগুড়া জেলার কোন এক ব্রাহ্মণের গোরক্ষক ছিলেন। সে সময়ে কামরূপের ধর্ম্মপালের বংশীয় এক রাজা দুর্ব্বল হওয়ায়, সেই গোরক্ষক তাঁহাকে বিনাশ করিয়া "নীলধ্বজ" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা হন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পদে বরণ করেন। রাজা নীলধ্বজ বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কামতাপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কোচবিহার হইতে বার মাইল দক্ষিণ পশ্চিম ধরলা নদীর পশ্চিম তীরে এই স্থান। বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার উত্তর দিকে কামতাপুর রাজ্যের অধিকাংশ লইয়া পরে কোচবিহার রাজ্য স্থাপিত হয়। লালবাজার নামক স্থানে অদ্যাপি ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কামতাপুরের তিন জন রাজার নাম পাওয়া যায়—নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর। রাজা নীলধ্বজ ১৩১৮—১৩২৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্বরাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। তিনি ঘোড়াঘাটের গড় ও অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করেন।

রাজা নীলধ্বজের পর তাঁহার পুত্র চক্রধ্বজ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাঁহার সময়ে গোসানীমারি তীর্থ আবিষ্কার হয়। তিনি কয়েক বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

চক্রধ্বজের পুত্র নীলাম্বর তৎপরে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা রাজ্যের উন্নতি ও বৃদ্ধি করেন। তিনি বড়

বড় রাস্তা, পুষ্করিণী, মন্দির প্রভৃতি স্থাপন করেন। বঙ্গদেশের মুসলমান রাজগণের উপদ্রব নিবারণার্থ ঘোড়াঘাট, হাতিবাঁধ, আলিপুর নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। রাজা নীলাম্বরই খেন বংশের শেষ রাজা। তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী শচীপাত্রের পুত্র রাজান্তঃপুর দূষিত করায়, রাজা মন্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস মন্ত্রীকে ভোজন করাইয়াছিলেন। মন্ত্রী তাহা জানিতে পারিয়া দারুণ মনঃক্ষোভে কামতাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌড়ে বাঙ্গালার তাৎকালীন নবাব হোসেন শাহের নিকট আগমন করেন। হোসেন শাহ তাঁহার প্রবর্ত্তনায় ১৪৯৮ খ্রীঃ কামতাপুর রাজধানী অধিকার করেন। রাজা নীলাম্বর বন্দী হইয়া গৌড়ে প্রেরিত হন। কেহ কেহ বলেন, তিনি নিহত হন। এই সময়ে মুসলমানেরা কামতাপুরের কামেশ্বরীর মন্দির ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। দেবী প্রতিমার একটী কবচ ছিল, প্রবাদ আছে, উহা ভগদত্তের হস্তের কবচ। সিংহমারী নদীর তীরবর্ত্তী গোসানীমারির দেবী মূর্ত্তির মধ্যে অদ্যাপি সেই কবচ বিদ্যমান আছে। কামতাপুর রাজধানী অধিকৃত ও বিনষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাজ্য অধিকৃত হয় নাই। তৎপরে আসামীগণ মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিলে কিছু দিন অরাজকতা হয়; সেই সময়ে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

রাজা নীলাম্বরের পতন হইলে ১৪৮০ খ্রীঃ কামরূপ রাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। সেই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের একটীতে কুচি বা কোচারি নামে এক জাতি বাস করিত। কালে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে এই কোচারি রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী হইয়া উঠিল। কোচদিগের আক্রমণে মুসলমানেরা কামতাপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর কামতাপুর রাজ্যের অধিকাংশ কোচদিগের অধিকৃত হইয়া কোচবিহার নাম ধারণ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোচহাজো নামে একজন দলপতি ছিলেন। হাজো আত্মশক্তি ও ক্ষমতা বলে সকলের প্রভু হন। তিনি ক্রমে সমগ্র রঙ্গপুর ও কামরূপের অধিকাংশ আপন শাসনাধীন করেন। হাজোর জীরা ও হীরা নামে দুইটী কন্যা ছিল। হরিদয় নামে জনৈক মিকিরের সহিত তাঁহাদের উভয়ের বিবাহ হয়। জীরার দুই পুত্র—চন্দন ও মদন। হীরারও দুই পুত্র—বিশু ও শিশু। এই সময়ে কয়েকখানি গ্রাম লইয়া তথায় একটী হিন্দুরাজ্য ছিল। তাঁহারা চারি ভ্রাতায় মিলিত হইয়া ঐ হিন্দু রাজাকে হত্যা করেন। সেই যুদ্ধে জীরার কনিষ্ঠ পুত্র মদন নিহত হয়।

(১) চন্দন। (১৪৮৪—১৪৯৭)—অতঃপর তিন ভ্রাতায় মিলিত হইয়া ১৪৮৪ খ্রীঃ চন্দনকে হিন্দুরাজ চিকনের সিংহাসন প্রদান করেন, এবং বিশু নিজে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিন ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত চিক্‌নরাজের তিন কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা চন্দন কামরূপের রাজাকে তাঁহার বশীভূত করেন। অতঃপর রাজা চন্দন ত্রয়োদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৯৭ খ্রীঃ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(২)। বিশ্বসিংহ। (১৪৯৭-১৫২৮)—তৎপরে বিশু রাজা হন। তিনি এই সময় "বিশ্ব সিংহ" নাম গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁহার সম্প্রদায়টীও রাজপুত নামে পরিচিত হয়। হীরার বংশধরগণ সকলেই সাধারণভাবে "দেব

-বা ভূপ” নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যিনি সিংহাসনে সমাসীন হইতেন, তাঁহাকে “নারায়ণ” নামে সম্বোধন করা হইত। বিশ্বসিংহ দলপতি হইয়া পৈতৃক বাসস্থান চিকনা পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোচবিহারে আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বে কোলিতাজাতি কোচবিহার রাজপরিবারের গুরু ও পুরোহিত ছিল। বিশ্বসিংহ মিথিলা হইতে মৈথিল ও শ্রীহট্ট হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে গুরু ও পুরোহিত পদে বরণ করেন। তিনি ভয়ানক যোদ্ধা ছিলেন এবং অনেকগুলি দেশ জয় করেন। তিনি গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকার করিতে পারেন নাই। ১৪৯৮ খ্রীঃ হইতে ১৫০৮ খ্রীঃ মধ্যে তিনি কামরূপ অধিকার করিয়া তথা হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করেন। তৎকালে ভুটানে দেববর্ম্মা নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। ভুটানিরা সর্ব্বদা উৎপাত করিত বলিয়া বিশ্বসিংহ তাহাদের সহিত সহিত সন্ধি করেন। উত্তর আসামের আহোম জাতির সহিতও সন্ধি করিতে হয়। তিনি মিকীদের মধ্য হইতে দ্বাদশ জন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি ৫২২০০০ সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রাজা বিশ্বসিংহ একত্রিংশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

(৩) নরনারায়ণ। (১৫২৮-১৫৮৪) রাজা বিশ্বসিংহ অষ্টাদশটী পুত্র সন্তান রাখিয়া যান, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র নরনারায়ণ সিংহ। তিনি ১৫২৮ খ্রীঃ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি আসাম, কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা, কায়রুম্, ডিমারিয়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অনেক স্থান অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে ঐ সকল স্থানের রাজগণ রাজস্ব দিয়া করদরাজ হন। তৎকালে কোচবিহার রাজ্য বহুবিস্তীর্ণ ছিল এবং এই রাজ্যের পরাক্রম নিতান্ত সামান্য ছিল না। রাজার লক্ষ পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারোহী ও এক সহস্র রণপোত ছিল। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা নিজ নামে নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কোচরাজগণের রৌপ্য, পিত্তল ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; উহা নারায়ণী মুদ্রা নামে পরিচিত। রাজা নরনারায়ণের পর, কোচবিহারে আর কোন পরাক্রম-শালী রাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৫৫০ খ্রীঃ তিনি গৌহাটীর নিকট কামাখ্যা দেবীর মন্দির স্থাপন করেন এবং তাহার শৃঙ্গটী স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি গৌহাটীর সন্নিকট মহামুনির মন্দিরও স্থাপন করেন। এই দুইটীর জন্য সম্পত্তি করিয়া দিয়া যান। অদ্যাপি কামাখ্যা দেবীর পুষ্প কোচবিহার প্রাসাদে প্রেরিত হইয়া থাকে। উভয় তীর্থই পূর্ব্বে বৌদ্ধতীর্থ ছিল, তিনি স্বয়ং বৌদ্ধমতের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রজাগণ ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিল। ১৫৫৩ খ্রীঃ হিন্দুদেবদ্বেষী মুসলমানধর্ম্মী কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করিয়া বহু সংখ্যক দেবমূর্ত্তি ও দেব মন্দিরের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতে পারেন নাই। তিনি বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহার সভায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, উভয় ভাষারই সমাদর ছিল। তাঁহার সময়ে পণ্ডিতগণ বিশেষ সমাদর লাভ করিত। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ প্রয়োগ-রত্নমালা নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ তাঁহার সময়ে রচনা করেন এবং রাম সরস্বতী ভাগবৎ পুরাণের

অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে ভাগবত, মহাভারত এবং অন্যান্য গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল। রাজা নরনারায়ণ ১৫৮৪ খ্রীঃ পরলোকগত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পশ্চিম ভাগ অথবা কোচবিহার তিনি আপন পুত্র লক্ষ্মী নারায়ণের জন্য রাখিয়া যান। পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ আসাম অঞ্চল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে দেওয়া হয়। রাজা রঘুদেব নারায়ণের পর তাঁহার পুত্র পরীক্ষিত রাজ্যাধিকার লাভ করেন। রাজা পরীক্ষিতের সময় জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট এবং বাঙ্গালার নবাব ইসলাম খাঁ ছিলেন। বঙ্গেশ্বর ইস্‌লাম্ খাঁ ঢাকার মসনদ হইতে একদল সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক রাজা পরীক্ষিতের রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে পরীক্ষিত পরাভূত ও বন্দীকৃত হন। অতঃপর তাঁহার রাজ্য মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

অমর গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্র সেন

ইংরাজিতে একটী কথা আছে, "প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিন্‌কিং"। এই কথাটী এদেশের একজন মহাপুরুষের জীবন-চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহার নাম ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। ঢাকার অধীন পাঁচদোনা গ্রামের দেওয়ান বংশে তাঁহার জন্ম। সম্ভবত ১২৪২ সালের বৈশাখ মাসে জন্ম, তারিখ অজ্ঞাত—এবং ঢাকা নগরে ১৩১৭ সালের শেষে শ্রাবণ, ৭৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ। আমরা অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ আড়ম্বরহীন, নিষ্ঠাপূর্ণ, জ্ঞান-কর্ম্মের সামঞ্জস্যময় জীবন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গিরিশচন্দ্রের জীবনে বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মজীবন হইতে একটু একটু উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ তাহা পাঠে বুঝিতে পারিবেন, কিরূপ জীবনের কথার আলোচনা করিতেছি।

১। "আমি কৃতবিদ্য পণ্ডিত হই নাই, গরিবাণা রূপে যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছি, চিরকাল গরিবাণা চালে চলিয়া আসিয়াছি। আমি এক টাকা দেড় টাকার অধিক মূল্যের বিনামা বোধ হয় কখনও চরণে স্পর্শ করি নাই, বাল্যকালে তিন চারি আনা মূল্যের তালতলার চটি জুতা ব্যবহার করিয়াছি। তাহাও প্রায় তোলা থাকিত, আমি সর্ব্বদা এক আনা দেড় আনা মূল্যের কাষ্ঠপাদুকাই ব্যবহার করিতাম। কখনও কোন কুটুম্বালয়ে যাইতে হইলে বিনামা জোড়া চরণস্পর্শ করিত। এইরূপ জুতা ও খড়মে তিন চারি-বৎসর কাটিয়া যাইত। একবার বড় দাদা মখমল বস্ত্রে জড়িত এক জোরা চটি জুতা আমার জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা পাইয়া আমার যে কত আনন্দ হইয়াছিল, আমি তাহা ভুলিতে পারি না। সেই বিনামা জোড়ার মূল্য ছয় আনার অধিক হইবে না। একদা আমি ঢাকা নগরে কল্কাদার ঢাকাই চাদর ও বার্ণিশ করা জুতা ব্যবহার করিয়াছিলাম। সেরূপ চাদর গায়ে জড়াইয়া ও চকচকে জুতা পরিয়া রাজপথে বাহির হইলে আমার মন একটু অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল। আমি ছাত্রীয় জীবনে সামান্য পিরাণ বা মির্জাই কখন কখন ব্যবহার করিতাম, সর্ব্বদা নয়। বিকালে জল খাওয়ার জন্য চিঁড়ে মুড়ী লাড়ু ইত্যাদিই নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি সেই

মুড়ার মায়া এক্ষণও ছাড়িতে পারি নাই, বিকালে জল খাওয়ার জন্য অর্দ্ধ পয়সার মুড়ী বরাদ্দ আছে। পরে আমি মুড়ীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়ি, তজ্জন্য এক বৎসরের জন্য মুড়ী খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এখন ছাত্রগণ বাটি বাটি চায়ের জল পান করে, এবং সর্ব্বাঙ্গে সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া থাকে। এ সকল বিলাসিতার সঙ্গে আমার কখনও কোন সম্পর্ক ছিল না, এখনও নাই। বাল্যকালে চা কিরূপ বস্তু, জানিতাম না, এখন অনেক পরিবারে চায়ের স্রোত চলিয়াছে, মেয়েরা পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া চা-পান করেন, কিন্তু আমাকে কেহ সহজে চা পান করাইতে পারেন না। তাহার গুণের শত গুণ বর্ণনা শুনিয়াও আমি মুগ্ধ হই না। আমি চায়ের বিরুদ্ধে অনেক সময় লেখনী চালনা করিয়াছি, তাহাতে চায়ের ভক্তগণ আমার প্রতি বিরক্ত। কিন্তু আমি রোগ বিশেষে ঔষধ-স্বরূপ চা পান করিয়া থাকি।

স্কুল কলেজের বর্ত্তমান ছাত্রগণ রন্ধনে নিতান্ত অক্ষম, একবেলা রন্ধন করিতে হইলে তাহারা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখে, অনেকে উপবাস করিয়া থাকিতে বরং রাজি হয়, কিন্তু রন্ধনশালায় যাইয়া রাঁধিতে রাজি হয় না। তাহারা রাঁধিতে গেলে হয়ত ভাতের ফেন গালিতে হাত পা পুড়াইয়া ফেলে, অথবা ডাইল তরকারিতে লবণ মসলার যোগ না করিয়া সিদ্ধ না হইতে নামাইয়া বসে। যুবক ছাত্রদের কথা আর কি বলিব? অনেক যুবতী ছাত্রীরও এই দশা। ডাইলে ফোড়ন দিলে ঝাঁং করিয়া যে একটা শব্দ হয়, সেই শব্দে আমার এক যুবতী নাতনীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইয়া থাকে। তিনি ফোড়নের সময় দুই কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া রন্ধনশালা হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করেন। যাহা হউক, আমি বাল্য কালে ও যৌবন কালেতে প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছি। তখন জাতিভেদের বড় আঁটাআঁটি ছিল. এখন মোসলমানে রাঁধিলেও যেমন হিন্দুর চলে, তখন শূদ্র চাকরে রাঁধিলেও খাওয়া হইত না। পূর্ব্ববঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ সুলভ ছিল না, এখনও নয়। সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের কি আর পাচক রাখা ঘটিয়া উঠে? আমি যখন ছোট দাদার সঙ্গে ময়মনসিংহে স্থিতি করিতেছিলাম, এক বেলা তিনি রন্ধন করিতেন, এক বেলা আমি রাঁধিতাম। আমার জীবনের এই সকল সভ্যতা-বিরোধী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অনেকে হয়তো আমাকে একজন অদ্ভুত জানোয়ার মনে করিবেন। আমি কখনও নিজের সুখ বিলাসের জন্য অর্থশোষণ করিয়া অভিভাবকদিগকে ক্লেশ দান করি নাই; সামান্য অর্থব্যয়ে সামান্যরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া সামান্য চাকুরী করিয়াছি, অমিতাচারী কখনও হই নাই, নিজের সামান্য আয় হইতে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া প্রতিবৎসর বড় দাদার হস্তে সমর্পণ করিতাম।"

২। "সেই সময় বিশ টাকামাত্র আমার মাসিক আয় ছিল, তাহা হইতে নিজের ও অন্য অনেকের অন্নের সংস্থান করিতে হইত, এবং নিয়মিতরূপে মাসিক একটী টাকা কলিকাতার প্রচারভাণ্ডারে প্রেরণ করা যাইত, অপিচ ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ চাঁদাও দিতে হইত।"

৩। "সামান্য ভাবে জীবন যাপন করা আমার চিরকালের অভ্যাস। আমি সামান্য অন্ন বস্ত্রাদিতে সন্তুষ্ট। ব্রস ও চিরুণী দ্বারা কেশবিন্যাস এবং আর্শিতে মুখাবলোকন, ইহা আমাদ্বারা জীবনে বড় ঘটে নাই।"

৪। "আমি ১৮৭২ সালে ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা যাইয়া ১৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে স্থিতি করি। সুলভ সমাচার পত্রিকার ল্যাবেল মোড়ার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল।"

৫। "আমি একজন সভ্যজগতের বহির্ভূত লোক। আমি কখনও ইংরাজী জুতা পদে স্পর্শ করি নাই, কোনরূপ বিলাতী পোষাক পরি নাই। আমি নিরেট স্বদেশী; স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া আমি স্বদেশী হই নাই।"

৬। "তদবধি দাদা প্রতি মাসে ৭৲ টাকা পাঠাইতে থাকেন।"

৭। "পরে আমি ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ভাই

কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে জ্ঞাপন করি যে, সম্পত্তি মাসিক ৭৲ পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা আমার জীবনযাত্রার সমুদয় আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া প্রয়োজন। তিনি ছয় টাকা তাঁহার হস্তে দান করিয়া এক টাকা ক্ষুদ্র ব্যয়ের জন্য আমার হস্তে রাখিবার ব্যবস্থা করেন। ছয় টাকায় খোরাকি ও আংশিকভাবে চাকরের মাহিয়ানা ও বাড়ীভাড়া ইত্যাদি চালাইবার কথা। তখন খাদ্য সামগ্রীর সুলভ মূল্য ছিল, ৩৷৪ টাকায় এক জনের সামান্যভাবে এক মাসের খোরাক চলিত। বিনামা, কাপড় খরিদ ও কাপড় ধোলাই ইত্যাদিতে ব্যয়িত হইয়া এক টাকার প্রায় কিছুই বাঁচিত না যে,জল খাওয়া ও দুগ্ধ পানাদি হইতে পারে। তবে প্রচারকার্য্যোপলক্ষে সময় সময়ে স্থানান্তরে বিশেষ বিশেষ বন্ধুর আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে হইত, তাহাতে খোরাকি খরচ বাঁচিয়া যাইত। তাহাতে অর্থাভাব কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইত। কখন কখন তদ্দ্বারা পাথেয়ের অভাবও কিছু পূরণ করা যাইতে পারিত। কয়েক বৎসর পরে আমার কষ্ট হয় ভাবিয়া মাতৃদেবীর অনুরোধমতে দাদা মাসিক ৮৲ বরাদ্দ করেন, তাহাতে এক পোয়া দুগ্ধ এবং বিকালে জল খাওয়ার অর্দ্ধ পয়সার মুড়ীর ব্যয় স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতে পারিতেছিল। দাদার পরলোক গমনের পর শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সম্পত্তিরক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরান্তে মাসিক ১০৲ করিয়া পাঠাইতে থাকেন। তাহাতেও আমার কষ্টের নিবৃত্তি হইতেছে না ভাবিয়া কয়েক মাস হইতে শ্রীমান্ ১২৲ করিয়া পাঠাইতেছেন। প্রচারভাণ্ডারের অধ্যক্ষকেও ৬৲ স্থানে ৭৲ করিয়া দান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইরূপে আচার্য্যদেবের অনুমোদনে প্রচারভাণ্ডারের অধ্যক্ষের ব্যবস্থামতে তাঁহার হস্তে অর্থদানে জীবিকা নির্ব্বাহ করা যাইতেছে।"

৮। "উইল—এই সকল (১২খানি) পুস্তকের চারি ভাগের তিন ভাগ উপস্বত্ব আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। উক্ত পুস্তক সকল কলিকাতাস্থ নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়া বিক্রয় হইতে থাকিবে। প্রচারকার্য্যালয়ের উক্ত অধ্যক্ষ এ বিষয়ে য়েক্‌জিকিউটার (সম্পাদক) হইবেন। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনাদি বাবতে ঋণ থাকিলে প্রথমতঃ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় প্রেরিত দরবারের অর্থাৎ উক্ত নামধেয় প্রচারক সভার অভিমত এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ ও শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র সেনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উক্ত ঋণ পারশোধাদি বিষয়ে অর্থব্যয়াদি করিবেন। ঋণপরিশোধ ও পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অর্থ সঞ্চিত থাকিলে দরবার প্রচারককার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য শতকরা ২৫৲ পঁচিশ টাকা রাখিবেন, অবশিষ্ট ৭৫৲ পঁচাত্তোর টাকা আমার জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামের দুঃখিনী বিধবা, নিরাশ্রয় বালক বালিকা, দরিদ্র বৃদ্ধ ও নিরুপায় রোগী এবং নিঃসম্বল ছাত্র ও ছাত্রীদিগের অন্নবস্ত্র, চিকিৎসা ও বিদ্যা শিক্ষার সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। জলকষ্ট দূর ও গৃহহীন দরিদ্রদিগের গৃহাভাব মোচন করার সাহায্যে সেই অর্থ দ্বারা হইতে পারিবে। কোন কোন নববিধান প্রচারক মহেশ্বরদি পরগণার কোন স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলে তাঁহাদের পাথেয়াদির সাহায্য সেই পুস্তকের ফণ্ড হইতে দান করা যাইতে পারিবে।"

৯। "মদ্রচিত উক্ত পুস্তক সকলের উপস্বত্ব আমি যেমন নিজের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করিতেছি না, তদ্রূপ আমার উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির ভোগাদির জন্য তাহাতে কোন স্বত্বাধিকার থাকিবে না। আমার পরিশ্রমজাত অর্থ ধর্ম্মপ্রচার ও পরসেবাতে ব্যয়িত হইবে।"

১০। "মোসলমান জাতির মূলধর্ম্ম শাস্ত্র কোরাণ পাঠ করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য আমি ১৮৭৬ সালে লক্ষ্ণৌ নগরে আরব্য ভাষার চর্চ্চা করিতে গিয়াছিলাম। তখন আমার ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ এবিষয়ে আমার যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। মৌলবী সাহেবের

বেতন এবং আমার অবস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা সমাজ হইতে হইয়াছিল। আমি প্রায় এক বৎসর কাল তত্রত্য বন্ধুবর শিবকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আবাসে স্থিতি করিয়া সুবিজ্ঞ বৃদ্ধ মৌলবী এহসানআলি সাহেবের নিকটে আরবা ব্যাকরণ এবং পারস্য দেওয়ান হাফেজের চর্চ্চা করিয়াছিলাম।"

১১। "আমার শাস্ত্র ও ভাষা সকলে পল্লবগ্রাহিণী বিদ্যা, কোন শাস্ত্রে ও কোন ভাষায় গভীর জ্ঞান নাই।"

সর্ব্বসমেত তাঁহার পুস্তকের সংখ্যা ২৩; যথা—(১) কোরাণের বঙ্গানুবাদ, (২) মহাপুরুষ ইব্রাহিমের জীবন-চরিত, (৩) মুসার জীবন-চরিত, (৪) দাউদের জীবন-চরিত, (৫) মহম্মদের জীবন-চরিত ৩ খণ্ড, (৬) হদিশের বঙ্গানুবাদ ৪ খণ্ড, (৭-৮) হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, (৯) নীতিমালা, (১০) তত্ত্বরত্নমালা, (১১) তত্ত্বসন্দর্ভমালা, (১২) চারি জন ধর্ম্মনেতা, (১৩) তাপসমালা ছয়ভাগ (১৪) দেওয়ান হাফেজ, (১৫) তত্ত্বকুসুম, (১৬) কোরাণের বচনাবলী, (১৭) দরবেশদিগের সাধন-প্রণালী, (১৮) ঐ ক্রিয়া, (১৯) ঐ উক্তি, (২০) দরবেশী, (২১) ব্রহ্মময়ী-চরিত (২২) সতী-চরিত, (২৩) পরমহংসদেবের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন।

"আত্ম-জীবনী" হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের জীবন মোটামুটী তাহাতেই, বোধ করি, পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি শ্রীযুক্ত কে,জি, গুপ্ত, ৺প্যারীমোহন ও গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়দিগের মাতুল, ৺কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের শ্যালক—কিন্তু স্বাধীনচেতা গিরিশচন্দ্র আজীবন স্বাধীনভাবে দুঃখ দারিদ্র্য প্রসন্ন চিত্তে সহ্য করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন,—একদিনের জন্যও বিলাস-বাসনার দাসত্ব করেন নাই। প্রকৃত ঋষি-জীবন-যাপনের সময় যে সকল অন্তরায় উপস্থিত হইত, অতি সাবধানে সর্ব্বদা তাহা পরিত্যাগ করিতেন। সংযম,নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও পবিত্রতা-সাধন করিয়া তিনি যে আদর্শ-জীবনের ছায়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রতি সাধকের অনুধ্যানের বিষয়। এরূপ নিষ্কাম জীবন সর্ব্বদেশের পূজ্য।

কেহ কেহ বলেন, গিরিশচন্দ্র "স্বদেশী" ছিলেন না,—এই কথার প্রতিবাদস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন "আমি কখনও ইংরাজী জুতা পদে স্পর্শ করি নাই, কোনরূপ বিলাতী পোষাক পড়ি নাই। আমি নিরেট স্বদেশী, স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া আমি স্বদেশী হই নাই।" গিরিশচন্দ্র স্বগ্রাম, স্বদেশ, স্বজন প্রভৃতির প্রতি যেরূপ আজীবন অনুরাগী ছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজের লোক-সাধারণের মধ্যে বড় অধিক দেখা যায় না। তাঁহারা "বসুধৈব কুটুম্বকম" মন্ত্রের নাকি সাধক, তাই স্বদেশ,স্বজন,স্বপরিবার,স্বগোষ্ঠীর বড় ধার ধারেন না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জীবন অন্য প্রকার;—তিনি চিরকাল স্বজনপ্রিয়, স্বদেশের অনুরক্ত ভক্ত। তবে একথা স্বীকার করি, তিনি কপট স্বদেশীয়তাকে, বড়ই ঘৃণা করিতেন। সীমায় প্রেম-সাধনের আরম্ভ, অসীমে পরিব্যাপ্তি—ইহাই প্রকৃত সাধক-জীবনের সাধন-সোপান। একজনকে যে কখনও ভালবাসে নাই,তাঁহার বিশ্বপ্রেম আকাশ-কুসুম, অশ্বডিম্ববৎ, প্রতারকের ভেল্কী। স্বদেশকে যে ভুলিয়া যায়—স্বদেশের যে অমঙ্গল-সাধন করে, কাজে বা কল্পনায় যে স্বদেশের অহিত করে, তাহার ন্যায় ঘোর পাপী আর কে? সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু স্বদেশ-দ্রোহীতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। গিরিশচন্দ্র স্বপত্নী,স্বদেশ,স্বজন হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া অনন্তের পথে ছুটিয়াছিলেন। তাঁহার দাম্পত্য-

জীবনের কথা স্মরণ করিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। পত্নীবিয়োগের পর কঠোর সংযম-ব্রত-পরায়ণতার বলে তিনি নিষ্কাম পূতজীবন অর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। আহারে বিহারে, বাক্যে-কার্য্যে, গমনে-উপবেশনে তিনি ধীর, স্থির ও সংযত;—উচ্ছ্বাস বা উল্লম্ফন, বিহ্বলতা বা প্রমত্ততা তদীয় জীবনে কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি অতলে ডুবিয়া তন্ময়তার গাম্ভার্য্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূত-চরিত্র—সকলেরই আদর্শ।

তিনি বাঙ্গালা ভাষার একজন প্রকৃত সাধক। ভক্ত কেশবচন্দ্র কমল-সরোবরের জলসংস্কারের দিন তাঁহার মস্তকে তৈলার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি মহাপুরুষ মোহম্মদের অঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করিতেছি।" কোরাণ সরিফ, হদিশ এবং মুসলমান সাধুদিগের জীবন-চরিতের দ্বারা অনু-প্রাণিত হইয়া গিরিশচন্দ্র ভক্ত কেশবচন্দ্রের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত দিন সামান্য আহারে পরিতুষ্ট থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতেন—বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জন্য। কেবল তাহা নয়। যে দেশ মুসলমানদিগকে চির-কাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, সেই দেশে অমর মুসলমান-সাধুদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া, ভারতের হিন্দুজাতির মুসলমান-বিদ্বেষ উন্মূ-লিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এদেশে এরূপ ব্রতপরায়ণ দ্বিতীয় ব্যক্তি আর অভ্যুদিত হন নাই। হিন্দু মুসলমান—এক-মায়ের দুই সন্তান, প্রাণের ভাই;—কিন্তু আমরা পরস্পর কত বিদ্বেষ্টা, ভাবিলে চক্ষে জলধারা বহে। গিরিশচন্দ্র এই জাতি-বিদ্বে-ষের মূল উৎপাটন করিয়া জীবনপাত করিয়া প্রকৃত মৌলবীর কাজ করিয়া গিয়াছেন। এহেন ব্যক্তিকে এদেশ যদি ভোলে, তবে দেশের দুর্গতির একশেষ হইবে।

যজন যাজন এদেশের একশ্রেণীর নিত্য-ব্যবসা। যাঁহারা নিজেরা ধর্ম্মলাভের জন্য চেষ্টা করে না, তাঁহারাও অন্যকে ভজাইতে সদা লালায়িত! ধর্ম্ম যেন একালের একটা বাহ্য পোষাক,—শুধু বাহ্য-পোষাক নয়, ধর্ম্ম যেন একালের একটা ব্যবসা! যাহা মুক্তির পথে লইয়া যাইবার একমাত্র উপায়, তাহাই যেন এখন স্বার্থ-সাধনের চরমগতি হইয়াছে! ধর্ম্ম বেচিয়া খাওয়ার ন্যায় ঘৃণিত কাজ সংসারে আর নাই। যে উপাসনা করিতে জানে না, সেও ব্যবসার খাতিরে উপাসনা করিবে, যে কখনও সাধন ভজন করে নাই, সেও অন্যকে ভজাইবে! যে মন্ত্রতন্ত্র জানে না, সেও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করিবে! ভণ্ডের উপাসনা ও অবিশ্বাসীর ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনিয়া শুনিয়া আমরা হতজ্ঞান! গিরিশচন্দ্রের আচার্য্য-নির্দ্ধারিত কার্য্য ছিল—সত্যানুরাগ এবং মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা। তিনি "আত্মজীবনে" লিখিয়াছেন "আমি ব্রহ্ম-মন্দিরে নিয়মিতরূপে উপাসনার কার্য্য করি-বার জন্য অনেকবার শ্রীদরবার ও মণ্ডলী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু সেই কার্য্যের অনপযুক্ত ভাবিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছি।" সত্যানুসন্ধান যাঁহার জীব-নের ব্রত, যজন যাজন তাঁহার জীবনে শোভা পায় না। অন্যকে ভজাইতে গেলেই কপটতা ও অসত্য প্রশ্রয় পায়। সত্য-বিচ্যুতি ঘটে এইজন্য যে, উপাসনার ভাষায় অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য আত্ম-গোপন করিয়া চলিতে হয়। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম ব্যবসায়ে পরি-ণত হয়;—বাহ্যের সহিত মনের সঙ্গতি থাকে না,—কাপট্যের খড়্গে সরলতা খণ্ডিত হয়।

অনেক অসংযত ব্যক্তিকে বক্তৃতার ন্যায় সুর করিয়া উপাসনা করিতে শুনিয়াছি,--আজকাল ত ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে—আরাধনা যেন বক্তৃতা বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। কতজনের কতপ্রকার সুরসাধন! কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে এরূপ কাজে বড় লিপ্ত হইতে দেখি নাই। তিনি উপাসনা করিয়াছেন, কিন্তু সুর করিয়া, বক্তৃতা করার ন্যায় অসংযত বাক্য কখনও বলিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই,—তিনি দেশে দেশে প্রচারার্থ গিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহা জীবনে উপলব্ধি করেন নাই, এমন কোন সত্য ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি বাক্যবীর ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন কার্য্যবীর। সাধনার চরম সীমায় উপনীত হইয়া নৈষ্ঠিক জীবন লাভ করিয়াছিলেন ;—খাটিতে আরম্ভ, খাটিতে খাটিতেই তদীয় জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ন্যায় লেখনী-সিদ্ধ কর্ম্মবীর মহাজ্ঞানী ঐ সমাজে আর একজন আছেন, কিন্তু তিনি এখনও জীবিত, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে চাহি না। গিরিশচন্দ্র ও তিনি যেন এক পুণ্যতোয়ার দ্বিধারা,—এক রমণীয় উদ্যানের দুই অমৃত ফল। দেখিয়াছি, সম্ভোগ করিয়াছি,—কিন্তু ভাষা পাই না যে সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি। এই দুয়ের জ্ঞানভক্তিময় কর্ম্মজীবনের সুশীতল পুণ্যপ্রবাহ এদেশে অক্ষয় হউক। তাঁহাদের জ্ঞানে অহঙ্কার নাই, প্রেমে কপটতা নাই, চরিত্রে কলঙ্ক নাই, ভক্তিতে উচ্ছ্বাস নাই, বিশ্বাসে কাপট্য নাই—দুই যেন সোণার ছবি। এদেশে ঐ ছবি অক্ষয় হউক।

কেশবচন্দ্র অনেক তপস্যা করিয়া, ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের ন্যায়, নববিধানকে এই দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু নববিধান ব্যর্থ হইত, যদি কোন জীবনে উহা অনুশীলিত বা প্রতিফলিত না হইত। নববিধান ব্যাপ্ত, জমিত, সঞ্চিত, অনুশীলিত, প্রতিফলিত, অনুরঞ্জিত, অনুপ্রাণিত ও সম্যক আচরিত প্রতাপচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রে এবং আরো কাহারও কাহারও জীবনে। পাথক, ক্ষণকাল দাঁড়াও এবং তত্ত্বকথা শুনিয়া যাও। নববিধান উপেক্ষিত ও উপহসিত হইতে পারিত, যদি প্রতাপচন্দ্র বা গিরিশচন্দ্রের এবং আরো কতিপয় মহাপুরুষের এদেশে অভ্যুদয় না হইত। কেশবচন্দ্রের ভক্তি অনুরঞ্জিত যাঁহাদের জীবনে, তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অন্যতর। বলিতে সঙ্কোচ কি যে, কেশবজীবন এবং নববিধান সার্থক হইয়াছে? নববিধান বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর; বাঙ্গালা ভাষা বাঁচিয়া থাকে যদি, গিরিশচন্দ্র অমর ; মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র বাঁচিয়া থাকে যদি, গিরিশচন্দ্র অমর; বাঙ্গালা দেশ বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর এবং নির্ভয়ে লিখিতেছি, পুণ্য, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, ভক্তি, চরিত্র এবং স্বদেশপ্রেম বাঁচিয়া থাকে যদি, তবে গিরিশচন্দ্র অমর! অমর-জীবনের অমর কাহিনী পাঠক নিবিষ্টচিত্তে একবার অধ্যয়ন কর, জীবন সার্থক হইবে।

কাঙ্গাল হরিনাথের স্মৃতিলিপি।

(হরিনাথের স্বর্গারোহণ-তিথি উপলক্ষে উৎসবের দিনে পঠিত।)

আমরা অনেক স্থলেই দেখিয়া থাকি, যে সমস্ত বালক পিতামাতার কোমল ক্রোড়ে স্থান না পাইয়া প্রতিপালিত হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই

স্বাধীনচেতা ও প্রতিভা সম্পন্ন। কাঙ্গাল হরিনাথ, শৈশবেই পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া, কেবল মাত্র নিরাশ্রয়া খুল্লপিতামহীর যত্নে ও স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মহৎ লোকের জীবনী পাঠে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে প্রায়ই দেখা যায়, যে সমস্ত শিশু শৈশবে অত্যন্ত দুষ্ট ও দুর্দ্দমনীয় থাকে, বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহারাই আবার বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হরিনাথের জীবনে অমূলক নহে। হরিনাথের বাল্যজীবনের বৃত্তান্ত সমুদায় স্বচক্ষে অবলোকন করি নাই, কিন্তু তাঁহার মুখনিঃসৃত উপদেশামৃত যখনই আমাদের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখনই আমরা সেই গুণালোকে মুগ্ধ হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সেই গল্প শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তাঁহার বাল্যজীবনের অনেক বিষয়, আমরা তাঁহার নিকটেই অবগত হইয়া, সময়ে সময়ে বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছি। বালক হরিনাথ অত্যন্ত কোপন স্বভাব ও অনাবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে যদি কোনও অন্য বালক সমপাঠী কিম্বা সমলেখকদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ করিত, সে বিষয় তাহার পিতামাতার কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বে, বালক হরিনাথ নিজ হস্তেই চপেটাঘাত দ্বারা দুষ্টবালকের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিতেন। হরিনাথের দূরসম্বন্ধে যাঁহারা অভিভাবক ছিলেন, তাঁহারাও, হরিনাথ অত্যন্ত দুষ্টছেলে বা কোপনস্বভাব বলিয়া, তাঁহার চরিত্র সংশোধনে অগ্রসর হইতেন না। অভিভাবিকা এক খুল্লপিতামহী। তাঁহার কথায় হরিনাথ প্রায়ই কর্ণপাত করিতেন না। এমন কি, খাবার সময় হইলেও ইচ্ছা না হইলে তাঁহাকে আহার করান তাঁহার পক্ষে বিষম দায় হইয়া উঠিত। কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার খুল্লপিতামহীকে দুধ-মা বলিয়া ডাকিতেন, দুধ-মাও তাঁহাকে সন্তান হইতেও অধিকতর স্নেহ করিতেন। এই অবস্থায় ছেলের লেখা পড়া পক্ষে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষিত হয়। তৎকালে আমাদের তিলি সম্প্রদায়ের লেখা পড়ার মধ্যে কোন প্রকারে ফলা বানান বোধ ও শুভঙ্করী শিক্ষা হইলেই লেখাপড়া শেষ হইত এবং তাহা হইলেই তিলি জাতীয় বালকগণ ব্যবসার কার্য্যে দক্ষ হইয়া অর্থোপার্জ্জনে ব্রতী হইত। দুষ্ট হরিনাথ সে অর্থোপার্জ্জনে পারক হইবেন না বলিয়া তাঁহার দুধ-মা অতিক্লেশে তৎকালোপযুক্ত গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গুরুমহাশয়দিগের যমদূতের মত বেত্রদণ্ডের কথা যাঁহার স্মরণ আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, সেই আদিমকালের গুরুমহাশয়দিগের কি কঠোর শাসন ছিল। কেবলমাত্র কঠোর শাসনও নহে, ইহার উপরে সামান্য উৎকোচ গ্রহণোপলক্ষে গুরুরা উৎসাহ দিয়া বালকগণকে কেমন করিয়া গুপ্ত ভাবে পিতামাতার অজ্ঞাতসারে পিতামাতার গৃহসামগ্রী সকল আত্মসাৎ করিয়া শিক্ষাগুরুর চরণে সমর্পণ করিতে হয়, ছাত্রদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়া, অকুতোভয়ে এই সমস্ত পাপ প্রলোভনের প্রশ্রয় দিতেন। হরিনাথ এই সকল প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে সমর্থ হয়েন নাই। অনেক সময়ে তিনি তাঁহার খুল্লপিতামহীর অনাটন সংসার হইতে গুরুমহাশয়ের সন্তোষ লাভের জন্য অনেক জিনিস গুপ্তভাবে গুরুমহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই হরিনাথের

ঘুড়ি-উড়া-নলিপ্সা অত্যন্ত বলবতী ছিল। ঘুড়ি উড়ানের অনুরোধে অনেক সময় পাঠশালায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। একদিন এই ঘুড়ির অনুরোধে তিনি পাঠশালায় যান নাই। গুরুমহাশয় তৎশ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ৫।৭ জন ছাত্রকে হরিনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া পাঠশালায় আনিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তৎকালে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন বালক অন্যায় পূর্ব্বক চৌপাটীতে কামাই করিলে, গুরুমহাশয় ফৌজদারী আসামীর মত, অন্য বালকদিগের দ্বারা তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া আনিতেন। সে দিবস হরিনাথের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। যেমন ছাত্রেরা হরিনাথকে ধরিবার জন্য তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিল, অমনি হরিনাথ অন্য উপায় না দেখিয়া তাঁহাদের মণ্ডপঘরের নিকট যে কূপ ছিল, ঐ কূপের জল-কুটুরীতে প্রবেশ করিলেন। বালকের অদমনীয় সাহস দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া রহিল। ছাত্রেরা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। অবশেষে সে দিবস তাঁহার খুল্লপিতামহীর সমস্ত দিন আহার হইল না। সমস্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে উপরে উঠিবার জন্য কত অনুনয়, বিনয় এবং তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্ষুধায় কাতর হইয়া হরিনাথ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কূপ হইতে উপরে উঠিয়া বলিলেন, দুধমা, আমায় ভাত দাও। হরিনাথও আহার করিলেন এবং তাঁহার দুধমাও আহার করিয়া সন্ধ্যার পর হরিনাথকে ক্রোড়ে করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইলেন। সেদিনকার গোলমাল এইরূপেই চুকিয়া গেল, কিন্তু এই হইতেই হরিনাথের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার যবনিকা পতন হইল।

বালক হরিনাথ এইরূপে পাঠশালা হইতে অপসৃত হইয়া কেবল খেলিয়া বেড়াইবার অবসর পাইলেন। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে তাঁহার ভরণপোষণেরও বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল, এমন কি, পরিধানের একখানি মাত্র ধুতি ছিল, সেও আবার শতগ্রন্থিযুক্ত। এই সময় ৺শীতলচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র পরলোকগত নবীনচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় সেই সময়ের একখানি নূতন গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি পাইয়াছিলেন। ঐ খানি তাঁহার নকল করিয়া লইবার আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি হরিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন যে, হরিনাথ, তুমি যদি এই গ্রন্থখানি একরাত্রির মধ্যে নকল করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে কল্য তোমাকে আমি একখানি নূতন কাপড় প্রদান করিব। হরিনাথ তাহাতেই কৃতসংকল্প হইয়া, এক রাত্রিতে ঐ পুস্তক নকল করিয়া দিয়া, পরদিন একখানি নূতন কাপড় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই হরিনাথের শিক্ষার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। যেখানে যে পুস্তক দেখিতে লাগিলেন, তাহাই আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া ছাড়িতেন না। এই সময়ে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদনে তত্ত্ববোধিনী মাসিক পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জমিদারী কুমারখালীতে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত হয়, এজন্য পণ্ডিত দয়ালচাঁদ শিরোমণিকে এস্থানে প্রেরণ করেন এবং তিনি প্রথমে এখানে এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করেন। সেই সময়ে এখানকার অনেক ভদ্র সন্তানগণই ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই এখানে তত্ত্ব-

বোধিনী পত্রিকা প্রেরিত হইত। ঐ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়মিতরূপে পাঠ করাতেই হরিনাথের মস্তিষ্কের প্রাখর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাঙ্গালা পয়ার লিখিতে অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পয়ার লিখিবার কালেই তিনি অদ্বিতীয় গীতরচনার শক্তি পাইয়াছিলেন। যে সমস্ত কবিগান, সঙ্কীর্ত্তন ও পাঁচালী গান তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন অংশেই মহাজন-পদ হইতে নিকৃষ্ট নহে। এই সময়ে তাঁহার যত্নে কুমারখালী বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হয় এবং তিনি অধিক দিন পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা পাঠশালায় প্রথম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন এবং আপনিও শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষ যশঃলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিজয়-বসন্ত গ্রন্থ রচিত হয়। প্রথমে ইহা পদ্য পয়ারে লিখিত হয়, পরে তৎকালের আদর্শ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দিগের ভাষানুকরণে লিখিত হয়। তাঁহার চারুচরিত্র, চিত্তচপলা, পদ্ম পুণ্ডরীক, কবিতাকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধি ও সুশোভন করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে, তাঁহারা কখনও একবিষয় লইয়া স্থির থাকেন না। এই সময়ে তিনি এস্থানে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজে হাতে লইয়া অনেকদিন যাবত বালিকাদিগের শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আপনিও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং বালিকাগণের মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষার স্পৃহা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানের যে সকল বালিকাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই এক্ষণে বালক বালিকার প্রপিতামহী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই তিনি সংবাদ-প্রভাকরের contributor ছিলেন, অর্থাৎ সংবাদ-প্রভাকরে অনেক বিষয় লিখিতেন, এবং ক্রমে তাঁহার পত্রিকা লিখিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হওয়ায় নিজে গ্রামবার্ত্তা নামক সংবাদ পত্রের সৃষ্টি করেন। এই পত্রিকা কলিকাতা গিরীশ বিদ্যারত্ন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া এপ্রদেশে বিতরিত হইত। এই গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকাতে প্রকাশিত প্রস্তাব সমুদায় এত সুন্দর ও সজোরে লিখিত হইত যে, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সেই সময়ে গ্রামবার্ত্তা দ্বিতীয় পত্রিকা নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহার পরে গ্রামবার্ত্তা মাসিক ও সাপ্তাহিক, দুই আকারে প্রকাশিত হইত। সাপ্তাহিক পত্রিকায় রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয় লিখিত হইত। এই সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তাতে ইনিই প্রথমে পোষ্টাফিসে মনি-অর্ডার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন এবং তাহাতেই এই বর্ত্তমান নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় পোষ্টাল বিভাগের বহুতর টাকা আয় হইয়াছে এবং প্রজাগণেরও প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। মাসিকে কেবল সমাজ, ধর্ম্ম ও অন্যান্য সমুদায় বিষয় লিখিত হইত। অবশেষে শিক্ষকতা কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হওয়াতে শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া কেবল মাত্র স্বদেশের মঙ্গলের জন্য-মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং কেবল দেশের মঙ্গলের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি এই মহৎকার্য্যে ঋণগ্রস্ত হইয়া উত্তমর্ণের যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

যখন ঋণভারাক্রান্ত হওয়ায় গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইল, তখন তিনি নশ্বর বিষয় পরিহার পূর্ব্বক সাধনতত্ত্বের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বিস্তারের জন্য ব্রহ্মাণ্ড-বেদের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি কঠোর ব্রত আরম্ভ করেন। একাদশী ব্রত এমনি কঠোররূপে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন যে, ইহাতেই অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময়ে তিনি স্থানীয় কতিপয় যুবকবৃন্দকে লইয়া একাদশী সভা নামে একটী সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভার অধিবেশন একাদশীর দিনেই হইত। ইহাতে যুবকবৃন্দ তাঁহাদের লিখিত নৈতিক প্রস্তাব সমুদায় পাঠ করিতেন এবং অবশেষে তিনি সেই সকল প্রস্তাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেন,

কখনও বা অতি সুমধুর ফলপ্রদ উপদেশ প্রদান করিতেন। তাহার ফলে যুবকবৃন্দ সচ্চরিত্র হইয়া উঠেন। এখনও সেই সময়ের এমন সকল ব্যক্তি দেখিতে পাই, যাহাদের চরিত্রে এপর্য্যন্ত কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহা দ্বারা এই সময়ে এস্থানের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত এই সময়ে তাঁহার সংযোগ হওয়াতে সাধনরাজ্যে তিনি বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহার সাধন-কুটীরে আমরা তাঁহার উপাসনায় যোগ দিতাম। এমনভাবে অনেক দিন রাত্রি গত হইয়াছে, যে, তিনি কি আমরা, কেহই তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। এক এক দিনের উপাসনায় কতমধুর ভাব তাঁহার হৃদয়ে যে প্রকাশ হইত, অন্য লোক শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিত। আমি তাঁহার নিকট স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে, তাঁহার রচিত কৃষ্ণকালী বা ভাব উচ্ছ্বাস তাঁহার সেই আধ্যাত্মিকতত্ত্বের ছবিমাত্র। ব্রহ্মাণ্ডবেদে যে সমস্ত অমূল্যসাধনতত্ত্ব নিহিত করিয়া গিয়াছেন, সে সকলই তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার ফল। এই সময়ই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের বাউল সঙ্গীত প্রচার করিয়া করিয়া সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ একেবারে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া এবং সংসারে নিতান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া বাটীকামারা মাঠে রাস্তার মধ্যে প্রায় মাসাধিককাল অতিবাহিত করেন। সেই সময় হইতেই দুরন্ত যক্ষ্মারোগে তিনি আক্রান্ত হয়েন। তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমনের পর কয়েকমাসের মধ্যে জীবন-লীলা সংবরণ করিয়া, কুমারখালীর প্রদীপ নির্ব্বাণ করতঃ, সেই পরমপিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। বৎসরান্তে আমরা সেই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হই। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের কোন শিষ্যের মুখে শুনিয়াছি যে, ঠাকুরের সাধনের কথা যখনই স্মরণ হয়, তখনই হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছাসিত হইয়া হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলে। আমরাও তদ্রূপ যখনই কাঙ্গাল হরিনাথের গুণামৃত স্মরণ বা পান করি, তখনই আত্মহারা হইয়া এক অতুল আনন্দ উপভোগ করি। সেদিন আমাদের ভাগ্যে কবে হবে, যেদিন একত্রে আমরা সকলে সেই আনন্দ উপভোগ করিব, যে আনন্দে হরিনাথসদৃশ সাধুভক্তগণ আজ মাতোয়ারা।

শ্রীরাধারমণ সাহা।

ডঙ্কেশ্বর

ডঙ্কেশ্বর ডঙ্কা ওই বাজে
জগভরি রুদ্র স্বর গাজে,
লুটিতে যশঃ চাটিতে রস
দলে দলে সেনা সাজে
গরবে ডঙ্কা বাজে।

২

তীব্র গর্ব্বে সর্ব্ব অঙ্গ ভরা,
দর্প ভরে বিশ্ব দেখে শরা,
ভাবিছে মনে এবার রণে
লুটিয়া লইব ধরা
(ইচ্ছা) দিক্ বিজয় করা

ওরে দিগ্বিজয়ি, খাড়া রহ,
হাম পুঁছে যো সো বাত কহ,
কিসের তরে, সাহস ভরে
গাধার পসরা বহ,
দিগ্বিজয়ি খাড়া রহ।

৪

দ্বারে বাঁধা শত হার্কুলিস্
ভীত নহি দেখে দীর্ঘ কীশ,
ভাঙায় হুপ শব্দে হাপ,
পরাণে ঈর্ষিয়া বিষ
আমি কি ডরাই কীশ।

কবির আয়ুধ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ,
কবির আয়ুধ তীক্ষ্ণ রঙ্গ,
গুটায়ে পুচ্ছ, বাঁধিয়া কুচ্ছ,
বাঁচাও আপন অঙ্গ
ওরে রে mortal পঙ্গ।

৬

কিরণ বসনে তনু ঢাকা
রাম ধনু রঙে দেহ আঁকা,
প্রকাশি হাব অদেহা ভাব
শোভিতেছে যথা মধুরাকা,
কিরণ বসনে তনু ঢাকা।

৭

অশরীরী ভাবে তনু দিতে,
উঠেরে তরঙ্গ কবি চিতে,
পেয়ে বিভব স্পন্দন সব,
দাঁড়ায় অমিয় গীতে
ভাবে শুধু তনু দিতে।

৮

রূপসী বরষা খুলি হিয়া
কবরীর ভার এলাইয়া
তমাল ধনে নীলিমা দানে
দিবে যবে বিভূষিয়া
(তখন) কবির কলাপী হিয়া—

৯

বিথারিয়া কলাপ নিচয়
ভাব রাশি করিবে সঞ্চয়,
নাচিবে ধীরে বেড়াবে ফিরে
করি হর্ষ অভিনয়,
(পিশুনে) কবির নাহিক ভয়।

১০

কবিরে জানিও মধু লিট্
কবি নাহি চাহে paraclete,
অর্থী আসিয়া মন্দ হাসিয়া
ভাবুক তোদের কীট,
(কবি) চাহে নাত paraclete.

১১

Motley যারা কিসের গরব
থাকে থাকুক বিপুল বিভব,
থাকুক অস্ত্র চেল বস্ত্র
ওগো শত অভিনব,
কবি-চিত্ত সদা অকৈতব।

১২

ওগো Lash, Cudgel, Truncheon
ধরিতে চাহে না আর মন
তবু আমায় সদা জ্বালায়
উচ্চারিয়া রাসভ স্বনন্
(তাই) বেত্র করি আস্ফালন

১৩

হৃদয়ের মাঝে যদি প্রতিভা কণিকা
ঝলকিয়া বিচ্ছুরিয়া উঠিত বারেক,
সখা ব'লে দিব্যাসনে বসায়ে আদরে
অস্থয়া লাঞ্ছিত পদ পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া
পূজা করি কৃতকর্ম্মা ভাবিতাম নিজে।
তোমাদের যশঃস্পৃহা যবে মনে জাগে,
সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে প্রাণের ভিতর—
The bookful blockhead,
ignorantly read
With loads of learned
lumber in his head.

১৪

মল্লিকা বসনে দেহ সাজায়ে যতনে,
কুন্দবর্ণা যশঃরাণী আসে কবিদ্বারে
হাতে ল'য়ে পুষ্পহার হ'তে স্বয়ম্বরা,
সবাই হ'তেছে বড় তুলিতেছে শির
দুর্ব্বল চরণোপরি। বাতস্ফীতোদর
অবোধের ;—বিজ্ঞতার ভাণ দেখাইয়া
কাঁপিতেছে মৃদুমন্দ। ব্যঙ্গ কষাঘাতে
পতিষ্যতি মরিষ্যতি কে বলিতে পারে ?

(১৫)

বিদ্যাসাগরের ওই গুণগানকারী
ভক্ত চণ্ডী দরপের আয়ুধ আঘাতে
ব্যথিত হইয়া আজ আছেন বসিয়া।
শিবনাথ এ প্রাবীণ্যে ভোলানাথ সাজি
ঔদাসীন্য মন্ত্রমালা করিছেন জপ।
"শ্যামতনু হবে সখি যমুনার জল" *
হেন তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষে দিয়া বিসর্জ্জন
স্বয়ং শিব করিছেন হরির সাধন।

* বঙ্কিম বাবুর আকাঙ্ক্ষা নামে কবিতা বঙ্গদর্শনে বাহির হইলে—শিবনাথ বাবু উত্তর আকাঙ্ক্ষা নামে একটী তীব্র কবিতা বাহির করেন—সেই কবিতা পাঠে বঙ্কিম বাবু বৃশ্চিক-দংশন যাতনা অনুভব করেন।

(১৬)

যে সমাজে বিধি নাই, নাহিক বিধান
হেন কুলে জন্ম কেন হইল বলিয়া
বিষাদে মরম তল হয় বিলোড়িত।
সম্মিলনে সেইদিন দ্বিজেন্দ্র লাঞ্ছিত †
কলির জেফেরী হস্তে প্রবীণ জ্ঞানেন্দ্র
হইলেন মানচ্যুত ; হা ধিক হা ধিক
স্পষ্ট কথা স্পষ্টবাদী বলিল না কিছু
"জোঁকের গায়ে জোঁক বসেনা" ইহা মনে করি
কঠোর সমাজপতি রহিল নীরব।
হা দুর্মুখ !
শাসনের ভাষা তব রহিল কোথায় ?
তুমিও কি প্রিয় সখা বিষ উদ্গারিণী,
লেখনীরে বেচিয়াছ বণিকের ঘরে ?
গর্ব্ব তব কোথা গেল, কোথা গেল তেজ,
সম্মুখেতে Etheopian শোভিছে ধবল
উঠ ফেল নিষ্ঠীবন ধবল বরণ
মুহূর্ত্তেই দূরে যাবে, কালো—কালো হবে।

(১৭)

রবিতো শারদ পদ্ম তাহাতে আবার
সারদা আপন হাতে দিয়াছেন রঙ,
হেগেলের ভাবগুলি ভিজায়ে সুধায়
দিয়াছেন 'ব্রজ' নিজে মকরন্দে মধু।

(১৮)

সতত নিরত-চেষ্টাঃ কাব্য সাহিত্য সজ্জন
বিলসিত বিভবেশো নির্ব্বিলাসো মণীন্দ্রঃ
ক্ষয় মাঝে রাখি পদ অক্ষয়ের লাগি
হ'য়েছেন মুক্তহস্ত। ওই মহাভাগ
সাহিত্যের শিবকল্পে ; হায় মা ভারতি
তোমার রবীন্দ্র ধনে গাঁথিয়া মালিকা
সাজালেন। ইহা দেখি পিশুনের দলে
একে একে ঢাকিতেছে আপন বদন।
এখনো এখনো কেন ডঙ্কা নাদ শুনি
Cat o' nine tails ধরিবারে ধাই।

(১৯)

কতশ্মি দগ্ধশ্মি ত্যজি যে বুধ হীরেন্দ্র
ধরেছেন 'তত্ত্বমসি' বুকের ভিতর
"(অবাম) অপাম সোমঃ অমৃত ভবামঃ"
উচ্ছ্বলিয়া উঠিতেছে ধারা জল সম
যাহার সুষুম্না হতে, যে মনীষীবর
অবজ্ঞায় বিনির্ম্মল একটী রতন—
উপরায় বাহাদুর। হায়রে কপাল
বৈদূর্য্য মণিয়া ভাতি বিলসিত বোধ
সে হীরেন্দ্র আজি মম আলোচ্য বিষয়।
Tools are my theme, let satire be
my song
বলুন প্রেমের কবি শুনিতে না চাই।
বর্ত্তমানে theme মম সান্দ্র বুদ্ধিধারী
"নবীনের" আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিকাশক,
জ্ঞান লিলসু জ্যোতির্ম্ময় জীবন্ত জৈমিনি।
যাহার বুকের মাঝে white-headed hope
খেলে সদা girt with golden wings.
সে হীরেন্দ্র যত্ন করি আমার রবীন্দ্রে
সাজাইল গাঁথি মালা পরম যতনে।

(২০)

বঙ্গের আশার স্থল বঙ্গ কবিকুল—
যতীন, রমণী, সত্য, রায় কালিদাস,
মৃণালিনী, প্রিয়ম্বদা বালিকা হেমন্ত §
সাহিত্য জাতির প্রাণ জাতীয় জীবন
কুসাহিত্যে করে লোকে দুর্ব্বল অল্পায়ু।
ব্যাকরণ উপেক্ষিত অল্প বিদ্যা লয়ে
উঠিতেছে বঙ্গদেশে লেখক নিচয়,
বলিতেছে উচ্চৈঃস্বরে দেহি দেহি মান
মান মণি দান নহে মান সুধা পান।

(২১)

কর্ম্মবীর রামানন্দ নিত্যানন্দ প্রাণ
Prejudice যাঁর ভয়ে সদা কম্পমান,
শিখে নিয়ে ঠাকুরালি অঠাকুর হ'য়ে
সকল ঠাকুর দলে রেখেছেন বাঁধি।
সেই শুভ্র রামানন্দ আমার রবীন্দ্রে,
মালা গাঁথি পরালেন ;—হয়ত তাঁহার
কুন্দ শুভ্র মন মাঝে কে বলিতে পারে
উঠেছিল ভবিষ্যৎ গোরা বপু সম
আর একখানি—হুঁ হুঁ—আর একখানি।

† ময়মনসিংহ সাহিত্য বৈঠকে নাটক লেখকদিগের নাম উল্লেখের সময় ডি এল রায়ের নাম উল্লিখিত না হওয়ায় কোন কোন মহিলা প্রতিবাদ করেন।

§ হেমন্তবালা নূতন কবি, তাহার "শিশির" কবিতা-কমলের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে। কবির নিজের একটী ঝঙ্কার আছে।

(২৮)

বুভুক্ষা কাতর হয়ে শকুনি গৃধিনী
ধায় যথা তীরবেগে মাংসখণ্ড লোভে,
তেমনি তেমনি হায় যশ মাংস তরে
শকুনি লেখক বৃন্দ ব্যগ্র অবিরাম।
দধিবৎ খধিবৎ যশের আশায়
মোসাহেবি করিতেছে সম্পাদক দলে।
বলিতেছে দল বাঁধি দেহি দেহি মান
(এ জয়দেবের)
মান মণি দান নহে মান সুধাপান।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পুলিনে।

পুলিন বালুকা মাত্র,স্থল মাত্র নহে জল,
কঠোর কঠিন দ্রব্য নহে স্নিগ্ধ পানিফল,
[illegible]
বিভূষণে দিবা ভূষা,
অঞ্চলে ব্রহ্মাণ্ড বাঁধি চঞ্চল নাচায়,
আকুল পবন রঙ্গে দুকূল উড়ায়,
বিভল নয়নে বৃদ্ধ নেহারে কিশোরী,
গরবিণী হেসে বলে আমি লো কাণ্ডারী।

পুলিন লীলার ক্ষেত্র নহে পাত্র মতিমান,
দ্রষ্টা মাত্র নহে ভোগী বৃথা কেন অভিমান,
কুটিলা যমুনা বালা,
চুপি চুপি করে খেলা
গুপ্ত প্রেম অবসাদে চলিতে না পারি,
উজানে তুলিছে ক্ষুদ্র প্রলাপ লহরী।
জটিলা জটলা করি রাধা পানে চায়,
আকুল চুবানি খেয়ে জব্দ শ্যামরায়।

কে যাবে কে যাবে সখা কঠিন পুলিনে,
প্রাণের প্রবল সাধ মিটিবে কেমনে,
উষা যবে হবে ম্লান,
হবে জ্যোতি অবসান,
দড়ি ও কলসি লয়ে কর সখা আত্মদান,
শীতল সুনীল বক্ষে প্রেম-লীলা অবসান,
আবার উঠন্ত বক্ষে কটাক্ষে হাসিবে উষা,
রহিবে না চির লয় চির মৃত্যু চির নিশা।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল।

নিদাঘ।

দুয়ারের দুই পাশে যায় গড়াগড়ি
শুষ্ক দুটি কলাগাছ ছিন্ন রসহীন,
আধভাঙ্গা ঘট দুটী রহিয়াছে পড়ি
ছিল যাহা বারিভরা একদা নবীন
দেবালয়ে থামে থামে ফুল পাতাগুলি
শুকাইয়া ঝুলিতেছে উঠে মরমরি।
মুছে গেছে আলিপনা,উড়ে আসে ধূলি,
আঁকা আছে কালী রেখা দেওয়াল উপরি,
আঙ্গিনাতে আটচালা, করে রোমন্থন
দুটী গাভী শুয়ে তথা, ঘুরিছে কপোত
গৃহ মাঝে পড়ি আছে শূন্য সিংহাসন,
উচ্চ মাচা দাঁড়াইয়া, নাহি নহবৎ।
বাসন্তী লক্ষ্মীর পূজা হ'য়ে গেছে শেষ,
নিদাঘ এ গৃহ মাঝে করেছে প্রবেশ।

শ্রীকালিদাস রায়, বি এ।

পদ্মাবক্ষে।

কি মনোমোহিনী তুই রাক্ষসী তটিনী
তোর বক্ষে কার প্রাণ স্থির অচঞ্চল!
কে বুঝেরে তোর মায়া যবে মায়াবিনী,
প্রলয়কারিণী রূপে এলাস কুন্তল!
হেরি সে দামিনীঘটা বৈশাখী আকাশে,
কি রণ-রঙ্গিনী ভীমা হোস্ তরঙ্গিণী।
শিহরিত প্রাণীকুল তোর তটবাসে।
তরঙ্গ-বিভঙ্গে গর্জ্জে কাল-কাদম্বিনী।
এমন নির্ম্মল শোভা শ্যামল পুলিনে,
নহে কি নয়নে তোর চির-মধুময়!
তাই কি বিকটরূপে প্রাবৃট দুর্দ্দিনে,
দেখাস্ চামুণ্ডারূপে তাণ্ডবে প্রলয়!
করুণ কল্লোলে কোথা হিল্লোল উচ্ছ্বাস!
সিনানে বিলাস কোথা সুতানে সুভাষ!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

শক্তে ভাবে।

আমারে পাঠালে হেথা শৌর্য্যবীর্য্য দিয়ে,
সাহসকৌশল দিলে বাছিয়ে বাছিয়ে।
আমি আসিলাম হেথা, তুমিত এলেনা;

দূর দেশে এতকাল অচেনা অজানা।
কি কথা বলিয়া দিলে আসিবার কালে,
কিছুইত মনে নাই সব গেছি ভুলে।
সব গেছি ভুলে নাথ, ভুলেছি তোমায়,
একবারে বিস্মরণ তোমায় আমায়।
তোমার এদেশে মোরে কেন বা পাঠালে?
এমন বিচিত্র দেশ কেন বা গড়িলে?
এদেশের তরু লতা, শ্বাপদ, মানব,
সব দেখি অত্যদ্ভুত, সব অভিনব।
হেথাকার সবে মোরে ডাকিল আদরে,
কে জানিত তারা সবে দাগা বাজি করে?
ক্ষণ পরে দেখি সবে ফাঁকি দিয়ে যায়,
আমারে মোহের ডোরে বাঁধিয়া ঘুরায়।
কই সে বিপদ কালে তুমিত এলেনা!
স্মরণেও পড়িল না তব মুখ খানা।
ছিল মোর শৌর্য্যবীর্য্য, দেওয়া সে তোমারি,
যুঝিলাম তাই নিয়ে দিবস শর্ব্বরী।
কোথা শত্রু জিনিলাম, লাঞ্ছিত কেথায়,
তবুত তোমার দয়া হল না আমায়!!

হিংসা দ্বেষ বেড়ে গেছে শত্রুতায় মতি,
শত্রু তার পাত্র যারা বিলুপ্ত সম্প্রতি।
কেহ জিত কেহ হত, কেহ মিত্র গণ্য,
কেহ বা পালিয়ে গেল, তার স্থান শূন্য।
কার সনে যুঝে এবে মিটাই আকাঙ্ক্ষা?
দাঁড়াও হে শত্রুরূপে না করিব শঙ্কা।
দাস্য নাই, সৌখ্য নাই, বাৎসল্য প্রণয়,
পৃথিবীতে সাধুভাব হল না সঞ্চয়।
বৈর কার্য্য শিখিয়াছ, বৈরিতায় মন,
তুমি বৈরী হও ওহে প্রাণারাধ্য ধন।
আকাঙ্ক্ষা বৃশ্চিকে মোরে দংশে বারবার;
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ আদি বড়ই দুর্ব্বার।
দাঁড়াও হে 'সর্ব্বতোক্ষি' বাণ ধনু হাতে;
তুমি শূন্য স্থান নাই, পালাবে কি মতে?
ততদিন হবে যুদ্ধ যতদিনে শান্তি,
মোহ ছিন্ন হবে মোর, পালাবে অশান্তি।
তার পরে তব পদ হয় লভ্য হবে;
মহাশত্রু এস কাছে, যদিও এ ভাবে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন, বি-এ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। দেশভ্রমণ। শ্রীমৌলিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বোবা ও কালা স্কুলের ছাত্র মৌলিভূষণের এই পুস্তক খানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। বোবা ও কালা স্কুলের দ্বারা এ দেশের যে কিরূপ মঙ্গল সাধিত হইতেছে, এই ক্ষুদ্র পুস্তক তাহার উদাহরণ। সরল এবং সরস লেখা।

২। তোতলাম ও তাহার প্রতিকার। শ্রীযামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲। যামিনী বাবু একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে বিষয়টী বিবৃত করিয়াছেন। আশা করি, অনেকের বিশেষ উপকারে আসিবে। পুস্তকের মূল্য বড় বেশী হইয়াছে।

৩। Report of the Calcutta Orphanage for the year 1910. ৺প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত এই আশ্রমের কার্য্য আজও চলিতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। ব্রাহ্মসমাজের ইহা একটা অক্ষয়-কীর্ত্তি। এই আশ্রমটীকে এখন ব্রাহ্মসংশ্রব হইতে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ব্রাহ্মসমাজ আশ্রয় না দিলে বয়স্থা মেয়েরা কোথায় আশ্রয় পাইবে, কামটীর সহৃদয় সভ্যগণের ইহা চিন্তা করা উচিত। আয়—৫২২৪৸৴১১, বিল্ডিংফণ্ড ১৯৭১৯৷৵৫, ব্যয় ৭৬০৭৶১০ প্রতি ব্যক্তির বাড়ীভাড়া বাদে ৮৻৫ পাই ব্যয় লাগিয়াছে। ইহা আমাদের নিকট বেশী বলিয়া মনে হইল। বিধাতার আশীর্ব্বাদ এই আশ্রমের প্রতি বর্ষিত হউক।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম—প্রাচীন ও নবীন। শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক বিবৃত। সুচিন্তিত প্রবন্ধ। সীতানাথ বাবুর ভাষা দিন দিনই প্রাঞ্জল হইতেছে, দেখিতেছি। এই প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা উপকৃত হইলাম।

৫। নারী-শিক্ষা। প্রথম ভাগ, শ্রীসুমতিবালা গুপ্তা, মূল্য ৴০। ছোট ছোট উপদেশ

সরল ভাষায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মহিলা-দিগের বিশেষ উপকার হইবে।

৬। অশ্রুমালা। বাক্য। শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য।৵০। লেখা বেশ। স্থানে স্থানে গম্ভীর ভাব নিবদ্ধ হইয়াছে।

৭। কলেরা চিকিৎসা। ডাক্তার এ,সি মজুমদার এল্-এম্-এস্, প্রণীত, মূল্য ॥০।

হোমিওপেথিক মতে ওলাউঠা চিকিৎসার যাবতীয় কথা, সরল ভাষায় লিখিত। অতি সুন্দর পুস্তক।

৮। চন্দ্রধর। শ্রীরামদয়াল দাস, মূল্য।০। পদ্মপুরাণের আখ্যায়িকা অবলম্বনে মনসা-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনচ্ছলে চন্দ্রধরের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী। লেখা মন্দ নহে।

৯। নির্ব্বাসন-কাহিনী। শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত, মূল্য ॥০। এই কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় মনোরম, পড়িতে পড়িতে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়। প্রিয়দর্শন সৌম্য-মূর্ত্তি মনোরঞ্জনের প্রতি অবিচার হইয়াছে কিনা, বিধাতা তাহার সাক্ষী, আমরা সে কথা লিখিতে চাই না; বলিতে চাই, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কৃতিত্ব বা পুরুষত্ব বাড়ে নাই। সে যাহাই হউক, বাঙ্গালা ভাষা উপকৃত হইল। মনোরঞ্জন বাবু কর্ম্মচারীদিগের প্রশংসা করিয়া নিত্যানন্দ ও খ্রীষ্ট-যোগাপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইবার যোগ্য।

১০। রাণী দুর্গাবতী। ঐতিহাসিক কাব্য। শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৸০। অপূর্ব্ব ইতিহাস, অপূর্ব্ব গাথায় লিপিবদ্ধ। দুর্গাবতীর আত্মোৎসর্গ স্বদেশ-প্রেমের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়নে জলধারা বহে। গ্রন্থকার যদি বিদেশী কাগজে এই সোণার কাহিনী না ছাপাইতেন, তবে আমরা বড়ই সুখী হইতাম। স্বদেশের কথা যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারাও "স্বদেশী" ভুলিয়া যান, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই।

১১। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন। তৃতীয় অধিবেশন। ১৩১৫ সালের ১৩ই আষাঢ় রঙ্গপুরে এই অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, বি-এল,সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই কার্য্যবিবরণ পড়িয়া আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইলাম। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য কত কত-মহারথী আজ বদ্ধপরিকর, ইহা ভাবিতেও সুখ। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা চালাইয়া যে উপকার করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। আর উপকার করিতেছেন—সাহিত্য-সভা, সাহিত্য পরিষদ এবং সাহিত্য-সম্মিলন সমূহ। হায়, আজ গবর্ণ-মেণ্ট যদি বিমুখ না হইতেন, তবে বাঙ্গালা ভাষার কত উপকার হইত!

১২। ১৩। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ত্রৈমাসিক, দ্বিতীয় সংখ্যা ও অতিরিক্ত সংখ্যা। অতিরিক্ত সংখ্যায় সেরপুরের ইতিহাস লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ মহাশয়ের অভি-ভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছে। এরূপ সুচিন্তিত প্রবন্ধ বহুদিন পড়ি নাই। এই সাহিত্য-পরিষ-দের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি।

১৪। মহারাজগঞ্জ মহাজন জাতীয় বিদ্যা-লয়—ঝালকাটী, ১৯০৯—১০। এই জাতীয় বিদ্যালয় দেশের গৌরববিশেষ। এই নিরা-শার দিনেও সুন্দর প্রণালীতে এই স্কুলের কার্য্য চলিতেছে দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। বিধাতার কৃপা ও সজ্জন-গণের সহানুভূতি ও সাহায্য বর্দ্ধিত হউক।

১৫। জাতি-বিকাশ। শ্রীপীতাম্বর সর-কার, মূল্য ১৲। পুস্তকখানি গবেষণা ও সুচিন্তাপূর্ণ। উদারভাবে লেখা। গ্রন্থকারের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই-লাম। বিদেশী কাগজে ছাপা না হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত। ভাষা পরিপাটী এবং ভাব সংযত।

১৬। প্রবন্ধাষ্টক। শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত। মূল্য ॥৵০। প্রবন্ধ কয়েকটী গবেষণাপূর্ণ; বিশেষতঃ কালিদাসের কাহিনী বড়ই উপাদেয় হই-য়াছে। সব বিষয়ে আমাদের মত না লিখি-লেও আমরা একথা লিখিতে সঙ্কুচিত নই যে, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভাষার প্রাচুর্য্য এবং লালিত্যের আমরা একান্ত পক্ষপাতী।

তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা যে বিশেষরূপে উপকৃত হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্ব্বত্র এই পুস্তক আদৃত হউক।

১৭। ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় সংস্করণ, চারি আনা। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। মহেশ বাবু ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি—আপন শক্তি বলে তিনি ব্যবসায়ের যে প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিয়ত অনুধ্যানের বিষয়। তাঁহার জীবনব্যাপী মহাতপস্যা—ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন। এই পুস্তকে এই তপস্যার ফল প্রতিফলিত। আমরা পড়িয়া বড়ই তৃপ্তি পাইলাম। ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত হউক। স্বদেশী কাগজে ছাপাইয়া ভালই করিয়াছেন।

১৮। দারোগার দপ্তর। ১৮শ বর্ষ, পৌষ, ৪র্থ খণ্ড। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৴০। প্রিয়নাথ বাবু অবসর গ্রহণ করিয়া এখন বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভাষা প্রাঞ্জল এবং রুচি মার্জ্জিত। প্রিয়নাথ বাবুর দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত।

১৯। ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ। প্রথম খণ্ড। কবিরাজ হেমচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ২॥০। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত। এরূপ গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ এদেশে অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

২০। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীবিনয়কুমার সরকার। ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনের বিবেচনার্থ। ১৩১৮। বিলাতী কাগজে ছাপা। বিনয়কুমার বাবুকে খাঁটী স্বদেশী বলিয়া জানিতাম;—তাঁহারও এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, দেখিয়া চক্ষের জল পড়িল, আর কাহার নিকট কি আশা করিব? হায় "স্বদেশী", নানা অযোগ্য হস্তে পড়িয়া তোমার এত লাঞ্ছনা হইল!

পুস্তকখানিতে অতি প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা আছে।

২১। অন্ন-সংস্থান। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ। ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত। অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা। সুচিন্তিত এবং সুলিখিত।

২২। ভারতে শক্তিপূজা। স্বামী সারদানন্দ। ৺বিবেকানন্দের জীবনে যেরূপ স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পাইয়াছিলাম, এরূপ আর কোথাও পাই নাই। তাঁহার শিষ্যবর্গ "স্বদেশ-প্রেম" ভুলিবেন, ভাবিতেও কষ্ট পাই। পুস্তকখানি বিদেশী কাগজে ছাপা।

পুস্তকখানি সুন্দর ভাবে লিখিত। শক্তি পূজা ভিন্ন মানবের মঙ্গল নাই, একথা ঠিক। এরূপ পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে।

২৩। মোহনভোগ। শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত, মূল্য ।৵০। বিলাতী কাগজে পারিপাটী ছাপা। ঢাকায় এরূপ ছাপার কার্য্য হইতেছে, ইহা গৌরবের বিষয়। ঢাকা বাঙ্গালা সাহিত্য-গৌরবে মণ্ডিত হইতেছেন, দেখিয়া আমরা সুখী। কিন্তু মনোমোহন বাবুও দেশী কাগজে পুস্তক ছাপাইতে পারিলেন না, ইহাতে বড়ই কষ্ট পাইলাম। পুস্তকখানি সরল সুন্দর সুন্দর কবিতাতে পূর্ণ। ছবিগুলিও অতি সুন্দর হইয়াছে। কবিতাগুলি এত সুন্দর হইয়াছে যে, কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী উদ্ধৃত করিব, বুঝি না। এরূপ মধুর কবিতা বহুদিন পড়ি নাই। এ পুস্তক ঘরে ঘরে আদৃত হউক।

২৪। The Religion of the Future by Hemendranath Sinha, B.A. যেমন বাঙ্গালা, তেমনি ইংরাজি, হেমেন্দ্র বাবু দুই ভাষাতেই সিদ্ধ ব্যক্তি। সংযত ভাষা, সুন্দর ভাব, মার্জ্জিত রুচি। পুস্তক খানি গভীর চিন্তাপূর্ণ।

২৫। বাল্যবিনোদ। শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৵০। ছেলেদের পুস্তক চিত্র সম্বলিত—বিলাতী কাগজে ছাপা—বিশেষত্ব বড় অধিক নাই।

পশ্চিমের অধিকারবাদ ও পূর্ব্বের ঋণবাদ।

কবিবর সাদি বলেন—"বন্ধুসমাজের সাহায্য আমার সুবিধাজনক নহে, কারণ আমার দোষকেও তাহারা গুণ মনে করে, কিন্তু এমন তীক্ষ্ণ পরম অসুহৃৎ কোথায়, যে আমার ত্রুটির দিকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে?"

কবিবরের উচ্চভাবকে প্রশংসা করিয়াও বলিতে হয়, মক্ষিকাধর্ম্মী হওয়া অপেক্ষা ষটপদধর্ম্মী হওয়ায় অধিকতর আনন্দ আছে;—অলীক তুলনায় উচ্ছ্বসিত হওয়ার জন্য নহে, আত্মাদরকে বাড়াইয়া তোলার উৎসাহে নহে—ঐতিহাসিক বিচারের খাতিরে।

পূর্ব্বদেশীয় সমাজের বিধান গুলিকে পশ্চিমের সহিত মুখোমুখী করান—একের উপর অন্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য নহে—বর্ত্তমানের অবশ্যম্ভাবী সংযোগের মাঝে উভয়ের পরিমাণ রক্ষা করার জন্য। পশ্চিম নিজকে প্রচুর ভাবে পর্য্যালোচনা করিতেছে, এজন্য সেই পদ্ধতি অনুসারে পশ্চিম দেশীয় সমাজতত্ত্বের আলোকে পৌরস্ত্য সমাজের প্রাণ-দেহ বিচার্য্য, সন্দেহ নাই।

পশ্চিমের পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত সমূহকে স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা যাইবে এবং যথা সম্ভব ঐতিহাসিক মূলের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইবে।

এইজন্য ইউরোপের ঐতিহাসিক স্তর-গুলি একে একে অতিক্রম করা প্রয়োজন। কার্য্যটী শুষ্ক হইলেও উপেক্ষা করা সম্ভব নহে।

অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত রোমান সাম্রাজ্যের চতুর্থ শতাব্দীর দুর্দ্দশার চিত্র চিন্তা করিব। অগ্রসর হওয়া যাক্। অপূর্ব্ব সম্পদশালী নগর পূর্ব্বের চূর্ণিত চিহ্ন, নিপুণ বাস্তুকর কর্ত্তৃক বর্জ্জিত সঙ্গীত যন্ত্রের ভগ্নাবশেষের ন্যায়, নিঃশব্দে নিজের ব্যর্থতা ঘোষণা করে। ইহাদের মাঝে কোনরূপ ঐক্য বিধানের চেষ্টার শেষ নিষ্ফলতা হনরিয়াস এবং কনিষ্ঠ থিউডসিয়াস্ বহন করে, ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দেয়।

ইহার কিছুপূর্ব্ব হইতেই খ্রীষ্টমূলক ধর্ম্ম সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে থাকে। নানা সন্দেহে, নানা আশঙ্কায় দোদুল্যমান হইয়া ধীরে ধীরে এই অপরিচিত পথিকটী সমাজ-হৃদয়ের মানচিত্র আঁকিয়া জিষ্ণু সৈনিকের ন্যায় অগ্রসর হইতেছিল।

ঠিক পূর্ব্বোক্ত সময়ে খ্রীষ্টমূলক ধর্ম্ম শুধু ধর্ম্মমত মাত্র ছিল না। ফরাসীভাবুক গিজো ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে বলেন, *

* "At the end of the fourth century and the beginning of the fifth, christianity was no longer merely individual belief, it wasan unstitution ; it was constituted ; it had its government, a clergy, an hierarchy calculated for the different function of the clergy, revenue, means of independent action, rallying point suited for a great society, provincial, national and general councils and the custom of debating in common upon the affairs of the society," History of Civilization.

"চতুর্থ শতাব্দীর প্রান্তভাগে এবং পঞ্চম-শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্রীষ্টধর্ম্ম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসে আশ্রিত ছিল না, তাহা বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। ইহার শাসন শৃঙ্খলা, উচ্চ নীচ শ্রেণীবদ্ধ যাজক সম্প্রদায়, কর আদায়ের ব্যবস্থা, এবং স্বাধীন কার্য্যকরী ক্ষমতা ছিল। বৃহৎ সমাজের ন্যায় সংহত হইবার সুযোগ, প্রাদেশিক জাতীয় এবং সাধারণ মন্ত্রণা সভা, সামাজিক বহুবিধ ব্যাপার সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক এবং আলোচনা করার প্রথাও ছিল।"

এই উভয়ের সম্পর্ক, সংযোগ এবং সংঘর্ষ ইউরোপীয় সমাজের মর্ম্ম কথা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাথমিক খ্রীষ্টধর্ম্ম বড়ই সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছিল। তখনকার দরবারীরা চতুর এবং দ্বারোয়ানগণও ধূর্ত্ত ছিল; কাজেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঠিক সরল পথে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে নাই। তাহা নানা সুবিধা এবং সুযোগ খুঁজিয়া অগ্রসর হওয়াতে ইউরোপের সমাজ চক্ষে নানা প্রতিকূল ব্যাপার ঘটিয়াছে। গিজো বলেন—"খ্রীষ্টধর্ম্ম সূত্রপাতে এবং ইহার প্রাথমিক অবস্থায় প্রাচীন সামাজিক বিধিব্যবস্থা এবং গঠন বিষয় সম্বন্ধে নীরব ছিল। ইহা স্পষ্টই ঘোষণা করে যে, তাৎকালিক সামাজিক ব্যবস্থার উপর ইহা হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহা দাসগণকে প্রভুদের আজ্ঞাধীনে থাকিতে অনুশাসন করে এবং সমসাময়িক সামাজিক বহুবিধ জঘন্য প্রথা, দুর্নীতি এবং অত্যাচার সমূহকে কোনরূপে আক্রমণ করে নাই, কিম্বা গর্হিত বলিয়া ঘোষণা করে নাই।"

যখন পঞ্চম শতাব্দীতে "বার্ব্বরিয়ান"-প্রমুখ অসভ্য জাতিগণ ছিন্নশীর্ষা রোমান সাম্রাজ্যের কবন্ধের উপর শকুনি-দংষ্ট্রা ন্যস্ত করে, তখন খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ এই নব্য জাতিগুলিকে স্বীয় ধর্ম্মকবলে আনয়নের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু নব্য তন্ত্রসমূহের সহিত খ্রীষ্টীয়গণের ভাবগত, কিম্বা কর্ম্মগত কোন সাম্য না থাকাতে বিষময় ফল ফলিয়া উঠে। ঐতিহাসিকের উক্তিই উল্লেখ করি :—

"বার্ব্বরিয়ানগণের নৃশংসতা, অনবধানতা, প্রভৃতি এত অধিক ছিল যে, নব জাগ্রত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও ভাব কিছুমাত্র আধিপত্য করিতে সমর্থ হয় নাই। সহজেই রক্তারক্তি উচ্চস্থান অধিকার করিল এবং খ্রীষ্টীয় চার্চ্চও সমাজের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় তাহার কবলিত হইল। এইজন্য আত্মরক্ষার্থে সাম্রাজ্য-যুগে যে ব্যবস্থাটী মাত্র অস্পষ্টভাবে ছিল, সম্প্রতি তাহা মুক্তভাবে প্রকাশ করিতে হইল। তাহা হচ্ছে ধর্ম্মজগতের সহিত রাষ্ট্রজগতের সম্বন্ধবিহীনতা ও স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ এতদুভয়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য ও বিভিন্নতা।" *

খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ এই ব্যবস্থা দ্বারা ইউরোপীয় ইতিহাসে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

* The brutality and recklessness of the barbarians were such that the new creeds and sentiments with which they were inspired exercised but little empire over them· Violence soon re-assumed the upper hand, and the church like the rest of the society was its victim. For her defence she proclaimed a principle formerly laid down under the Empire although more vaguely—*this was the separation of the spiritual from the temporal power* and their reciprocal independences that spiritual world and the temporal world were entirely distinct·

ইতিহাসে সামাজিক এবং ব্যক্তি-স্বার্থের থাকে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা একটা প্রধান ঘটনা। পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং পারমার্থিক কর্ত্তব্য সমূহের সামঞ্জস্য যে সমাজে স্বীকৃত এবং অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেই সমাজ আত্মকলেবরে উৎকট পীড়ার বীজ বহন করিতেছে।

মানবের পক্ষে ঐহিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডীজালে নিবদ্ধ হইয়া থাকা সম্ভব নহে। অতীন্দ্রিয়, অজ্ঞাত, রহস্যান্দোলন তাহার চিত্তপটে তুফান উপস্থিত করে, অস্বীকার করিবার যো নাই। ধর্ম্মমতের গোপন ভিত্তিও এই ব্যাপারে নিহিত, সন্দেহ নাই।

অবশ্য একথা ঠিক, সমাজ নানা ভাবে বিচিত্র ঘটনা সঙ্ঘাতের মাঝে বাড়িয়া উঠে, তাহার জটিল শাখাপর্য্যায় কোন ব্যক্তি চিত্তের খেয়ালের দ্বারা গ্রথিত হয় না এবং কৃষ্ণচূড়ার ন্যায় তাহার সারাদেহব্যাপী পুষ্পিত শ্রীর প্রাচুর্য্য কোন স্থানে বিন্দু হইতে শোণিত সংগ্রহ করে না।

উপরোক্ত ভাবে পশ্চিমে, মধ্যযুগে, সমাজে ধর্ম্মানুশাসনের ব্যর্থতায় মানবের গতিবিধি এক বিশিষ্ট দিকে প্রসারিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ দেখা যায়, ইউরোপের ফিউডাল্ যুগের ভিত্তি কোন্ বিশেষ ভাব এবং আকাঙ্ক্ষার উপর ন্যস্ত ছিল।

পশ্চিম ইউরোপের ফিউডাল যুগ ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থূলতঃ কার্য্যকরী ছিল। তাহার ফলে দেখিতে পাই, জনসাধারণ এবং ক্ষুদ্র ভূমাধিকারিগণ ফিউডাল প্রভুগণের অত্যাচারে শিহরিয়া উঠে এবং পদদলিত বৃশ্চিকের ন্যায় প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে।

সাধারণের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি রক্ষা ব্যাপারে ইউরোপ তখন হইতে হাতে খড়ি দেয়, এবং ক্রমশঃ এই ক্রীড়ায় পাকা ওস্তাদ্ হইয়া উঠে। সম্প্রতি এই প্রবৃত্তিটী ইউরোপের সংস্কারগত হইয়াছে। ইউরোপীয় জনতা নিজেদের ধনধান্য-লালায়িত হস্ত হইতে রক্ষা করিতে শিখিয়াছে, অপরপক্ষে তেমনি বহিঃশক্তির আক্রমণে আত্মবিরোধ ভুলিয়া স্বার্থরক্ষার্থ জমাট হইতেও তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে।

এই দিকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হইয়াছে বলিয়া সমরবিষয়ক আসুরী-বিদ্যায় তাহারা চরম ডিপ্লোমা পাইয়াছে। পুরাকালে যেমন ইন্দ্রজিত, রাবণ, কিম্বা অর্জ্জুন প্রভৃতি দেবভূমিতে গমন করিয়া পাশুপাত, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি অস্ত্র সংগ্রহ ও শিক্ষা করিত, বর্ত্তমানেও ইউরোপে নানাদেশের লোক অস্ত্রবিদ্যার 'কখ' পড়িতে চায়, ইহা একটা স্বীকৃত সত্য।

১১৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর সহরগুলি পোপের আনুকূল্যে অনিচ্ছুক জর্ম্মন-সম্রাট ফ্রেডারিক বারবরোসাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ইউরোপীয় ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম চার্টার প্রাপ্ত হয়।

জর্ম্মনীর সহরগুলিও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্যারণগণের প্রতিকূলে Hanseatic league গঠন করে। ইংলণ্ডের Magna Charta প্রাপ্তিও ইহার সমসাময়িক ঘটনা (১২১৫ খ্রীঃ)। ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় হেন্‌রীর রাজত্বকালে যে জাতীয় সভা আহূত হয়, তাহাতে "নাইট"গণ ছাড়া সহরের প্রতিনিধিগণকেও আহ্বান করা হয়।

স্পেনের জনসাধারণও শনৈঃ শনৈঃ এই বিদ্যালাভের দুরাশায় ককুদ্বান বৃষভের ন্যায় নিজের শিং দুটীকে শাণিত করিতে থাকে।

উত্তর স্পেনের অধিবাসিগণ এ সময়ে "কেষ্টাইল", "য়্যারাগণ", "লিয়ঁ", "নেভার" প্রভৃতির ন্যায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করে। য়্যারাগণের অধিবাসিগণ "Cortes" বা জাতীয় সভায় জনসাধারণের প্রতিনিধি পাঠাইবার স্বত্বলাভ করে; প্রধান বিচারপতির নির্ব্বাচনও তাহাদের হাতে ছিল।

ফরাসীরাজ্যে নবম লুই ব্যারণগণের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দেয় এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে জাতীয় সভায় প্রবেশের অধিকার দান করে।

এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব ফিউড্যাল প্রথার ধ্বংস পর্য্যন্ত জাগ্রত ছিল, এমন নহে। তাহা বর্ত্তমান সময়েও,স্থলভূমে দীর্ঘপুচ্ছ কুম্ভীরের ন্যায়, রৌদ্র পোহাইতেছে মাত্র, আঘাত পাইলে তাহার কণ্টকিত পুচ্ছের তাড়না অজ্ঞলোককে চমকিত এবং লণ্ডভণ্ড করিবে। কাজেই উভয়পক্ষের অহর্নিশ চাঞ্চল্য ও জাগরণ, প্রত্যেক রাজ্যে, ব্যক্তির স্বত্ব ও স্বাতন্ত্র্য, সৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছে।

ফলে গ্রীক্‌ ও রোমাণ আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া সমাজের এই নব্য আদর্শ সৃষ্ট হইয়াছে। গ্রীক্‌ ও রোমান-আদর্শ অনুসারে ষ্টেটের অঙ্গীভূত বলিয়াই ব্যক্তির দাবীর মূল্য আছে, অন্যথা ষ্টেট হইতে বিযুক্তভাবে তাহার কোন মূল্য, স্বত্ব বা অধিকার নাই। এই আদর্শ অনুসারে ষ্টেটের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিবর্গের অকল্যাণ করাও দূষণীয় নহে। হার্বাট স্পেন্সার বলেন, গ্রীক আদর্শ অনুসারে ষ্টেট ও সমাজ অভিন্ন পদার্থ।

আধুনিক ইউরোপ ইহা স্বীকার করে না। ষ্টেটের কোন কল্পিত মঙ্গলের জন্য সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দেওয়া যায় না, ইহাই বর্ত্তমান ইউরোপের মত।

ইউরোপের চিন্তা-গুরু হার্বার্ট স্পেন্সার সাহেব বিবর্ত্তনবাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হইতে বলেন:—*

"প্রাণীর প্রত্যেক অঙ্গের বিচ্ছিন্ন জীবনীশক্তি সমগ্রের মাঝে বিলীন হওয়া মঙ্গলজনক, কারণ সমগ্রের একটা যুক্ত সজ্ঞানসত্বা আছে —যাহা সুখ দুঃখের দ্বারা আন্দোলিত হয়। কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে একথা খাটে না, কারণ ইহার জীবন্ত অঙ্গসমূহের বিচ্ছিন্ন জীবনীশক্তি লুপ্ত করা যায় না; অপরপক্ষে সমগ্র সমাজেরও কোন যুক্ত সজ্ঞান অনুভূতি নাই। এই চিরস্থায়ী কারণ অনুসারে মনে হয়, ষ্টেটের কোন কল্পিত মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিসমূহের মঙ্গল বলি দেওয়া যায় না, কারণ ষ্টেট ব্যক্তিবর্গের মঙ্গলের জন্যই প্রতিষ্ঠিত। কাজেই প্রয়োজন হইলে মঙ্গলের জীবন-বিধান ও পুষ্টি রক্ষণের জন্য সমগ্রের প্রাণসত্ত্বা ক্ষয় করা উচিত—সমগ্রের জন্য অংশের নহে।"

হাক্সলী সাহেবের মতে মানবের নীতিজ্ঞান, জীবন সংগ্রামের এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের

* It is well that the lives of all parts of an animal should be merged in the life of the whole, because the whole has a corporate consciousness capable of happiness or misery, but it is not so with a society ; hence its living units do not and cannot lose individual consciousness ; and since the community as a whole has no corporate consciousness and this is an everlasting reason why the welfare of citizens cannot rightly be sacrificed to some supposed benefit of the state ; why on the other hand the state is to be maintained solely for the benefit of citizens. The corporate life here must be sacrificed to the lives of the parts instead of the lives of the parts being subservient to the corporate life.

প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমাজগঠন করিতেছে। কিন্তু ইউরোপীয় মনীষী বেঞ্জামিন কিড্ (Benjamin Kidd) ইহাদের মাঝে সামঞ্জস্য সংস্থাপনের জন্য বলেন :*—

নীতিজ্ঞানানুমোদিত পন্থা বিবর্ত্তনবাদ বা জীবন সংগ্রামের প্রতিকূল হওয়া দূরে থাক্, প্রকৃতরূপে নৈতিক প্রণালী ও প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা, উভয়েই অভিন্ন। নৈতিক প্রণালীকে নিয়ম ও যত্নে চালিত হইয়াই, জীবন সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিশিষ্ট ব্যাপকতা লাভ করিয়া উত্তরোত্তর সফল হইয়া উঠিতেছে।

ভারতবর্ষে স্থূলতঃ ব্যক্তির মুক্তিমুখী স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেও সামাজিক মঙ্গলে এবং ব্যক্তিগত মঙ্গলে কোন দ্বন্দ্ব নাই। কারণ যুগাগত ধর্ম্মানুশাসন কেবল লৌকিক ঘটনাবর্ত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত বা লৌকিক সংঘর্ষ হইতে সৃষ্ট হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত আভ্যন্তরীণ বিরোধ যেমন ইউরোপীয় সমাজকে একটা বিচিত্রতা দান করিয়াছে, তেমনি ধন-লোলুপ বহির্রাষ্ট্র সমূহের দ্বারা পীড়িত হইয়া ইউরোপের প্রত্যেক ষ্টেট্ আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণ ও শাণিত করিয়া তুলিয়াছে।

ফিউডাল প্রভুগণের পীড়নে এবং অত্যাচারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বকীয় স্বত্ব এবং অধিকার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিশেষতঃ ফিউডাল ধর্ম্মই একটা চুক্তির উপর নিহিত। নানা নৃশংস অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া সাধারণের আত্মসম্মান জ্ঞান প্রখর হইয়া উঠে।

সার হেন্‌রি মেইন ব্যক্তিতন্ত্রতার প্রথা সম্বন্ধে ইউরোপের সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বলেন :—†

"উন্নতিমুখী সমাজসমূহের গতি একটা দিকে এক ভাবেই চলিয়াছে। সমাজের এই উন্নয়ন পথে পারিবারিক বন্ধন ও বশ্যতা অন্তর্হিত হইয়া ব্যক্তির দায়িত্বের প্রসার সৃষ্টি করিতেছে। ব্যবহার-শাস্ত্র ক্রমশঃই পরিবারের পরিবর্ত্তে ব্যক্তির সহিতই (অনুকূলে হউক বা প্রতিকূলেই হউক) দায়িত্ব

* So far from it being possible to regard the ethical process, it must, it would appear, be taken that the ethical process is the cosmic process and that it is through the principles * * * of the ethical process that the struggle for existence and natural selection are producing on the largest scale and in the most effective manner.

† The movement of progressive societies has been uniform in one respect. Through all its course it has been distinguished by the gradual dissolution of family dependency and the growth of individual obligation in its place. The individual is steadily substituted for the family as the unit of which civil laws take account. The advance has been accomplished at varying rates of celerity and there are societies not absolutely stationary in which the collapse of the ancient organisation can only be perceived by careful study of the phenomena they present.........Nor is it difficult to see what is the tie between man & man, which replaces by degrees those forms of reciprocity in rights and duties, which have their origin in the family. It is contract starting as from an terminus of history, from a condition of society in which all the relations of persons are summed up in the relations of family, we seem to have steadily moved towards a phase of social order, in which all these relations arise from the free agreement of individuals.

নির্দ্দেশ করিতেছে। এই উন্নতির অগ্রগতি কখনও বা দ্রুত, কখনও বা মৃদুভাবে প্রসারিত হইয়াছে। এমন সমাজও আছে, যাহা তত্তটা স্থিতিশীল নহে, যেখানে প্রাচীন সমাজ বন্ধনের ভগ্ন ও লুপ্ত রেখা সমষ্টি, বর্ত্তমানের অবস্থা খুব সতর্কভাবে অধ্যয়নে অনুমান করা যাইতে পারে। এক ব্যক্তির সহিত অন্যের বন্ধনের সূত্রটী বাস্তবিক কি, তাহা লক্ষ্য করাও যে বড় দুরূহ, এমন নহে। ইহাই ক্রমশঃ পারিবারিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব ব্যক্তিতে সংক্রামিত করিতেছে। ইহাই চুক্তি। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যক্তির যাবতীয় সম্পর্কই পরিবারের সম্পর্কের মাঝেই নিবদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ আমরা এখন সামাজিক শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, যেখানে যাবতীয় সম্পর্কই ব্যক্তির চুক্তির উপর আশ্রিত।"

মেইন সাহেব আরও বলেন :—"পশ্চিম ইউরোপে এই সম্বন্ধে অনেকটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে। দাসত্ব অন্তর্হিত হইয়া প্রভু ও ভৃত্যের চুক্তি-গঠিত সম্পর্ক সৃষ্ট হইয়াছে। কাজেই আমরা বলিতে পারি, উন্নতি-প্রবণ সমাজ সমূহে ধীরে ধীরে চুক্তির ভাব-প্রাধান্য লাভ করিয়া ষ্টেটাস-এর আদর্শ রহিত হইয়াছে।"

এইরূপে ক্রমশঃ সমাজ এবং পরিবারের বন্ধন হইতে "ব্যক্তি" নির্ম্মুক্ত হইয়া একাকীত্বের সিংহাসনে আবদ্ধ হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে চুক্তি আইনের বিস্ময়জনক প্রসার হইয়াছে। এই সময় হইতে ব্যক্তি-তন্ত্রতা এবং পৃথক স্বত্ব জ্ঞানের আতিরিক্ত্য এত উৎকট হইয়া পড়িয়াছে যে, সোশিয়ালিজম নামক সামাজিক মতবাদ অনুযায়ী সর্ব্বাধিকারিত্ব বা সমাজ-নিবদ্ধ অধিকারিত্ব জ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজ এইরূপে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ব পিতামহের যুগের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে।

ব্যক্তির অধিকার বা স্বত্ব এবং অপরদিকে ব্যক্তির কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাপকগণ দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে—নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য স্বত্ব এবং সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ব্যক্তিগত অধিকার। অষ্টিনের ভাষায় ব্যক্তিগত আইন এবং বস্তুগত আইন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নব্য ইউরোপ ব্যক্তি-তন্ত্রতার খাতিরে গ্রীক ও রোমান আদর্শ অনুসারে সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত ব্যক্তির প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার অনুমোদন করে নাই।

ব্যক্তির অধিকার এবং অধিকারিত্ব ইউরোপ অতি সম্মানের চোখে দেখে।

এইরূপে ইউরোপের যাবতীয় অনুষ্ঠান চুক্তির উপর নির্ভর করে। শাসনতন্ত্র, রাজা প্রজার সম্পর্ক, পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, বিবাহ প্রভৃতি ব্যবস্থার মূলে চুক্তির বিজয় ঘোষিত হইতেছে।

যদিও আধুনিক বিচার প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রতন্ত্রীয় ব্যাপার প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রণালীমতে * অধীত হইতেছে, তবুও ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে মনীষী রুসোর প্রচারিত সামাজিক চুক্তিবাদের প্রভাব এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। পশ্চিমের প্রজা রাজবিধির সহিত চুক্তি করিয়া স্বীয় অধিকার ও স্বত্ব রক্ষা করিতেছে।

ক্রমে তুলনা-মূলক আলোচনার কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইবে।

পূর্ব্ব দেশীয় সমাজ কখনও রাজবিধি কিম্বা ব্যবস্থার উপর কখনও ন্যস্ত নহে।

* Historical method,

অপরপক্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম,ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ-সম্পৃক্ত যে শাসন ঘোষণা করিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান ইউরোপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মগত বা ধর্ম্ম সম্পৃক্ত কোন-রূপ শাসন পশ্চিমের কোন রাজ্য স্বীকার করিতে চাহে নাই। এইজন্যই ইউরোপের রিফরম্যাসন বা সংস্কার যুগের ধর্ম্ম আলোচনা প্রলোভনের ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত চুক্তি দ্বারা যখন প্রত্যেক লোকেই চারিদিকের জনতার সহিত আবদ্ধ, তখন যতটুকু দাবী চুক্তিমূলে তোমার আছে—ততটুকু সম্বন্ধে তুমি তাহাকে প্রশ্ন করিতে পার। তদপেক্ষা অধিক কিম্বা তদন্যথা আলোচনা হইলে তাহাতে চলিত কথায় অনধিকার চর্চ্চা বলা হয়। সে রাজ্যে তোমার প্রবেশের অধিকার নাই, সেটা বাহিরের ব্যাপার। এই উৎকট স্বাতন্ত্রিকতা ইউ-রোপের রক্তবিন্দুতে জোয়ারের প্রবাহ আনিয়াছে।

সেখানে সাধারণতঃ দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইলে শীর্ষোপরি ভাসমান আকাশের স্বাস্থ্য, আর্ত্তব আব্‌-হাওয়া, প্রভাতের বৈচিত্র্য সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠে, ব্যক্তিগত প্রশ্ন উঠে না, কেন না "আপনি কেমন আছেন?"—এই অনুসন্ধিৎসার মূলেই প্রশ্ন উঠে, প্রশ্নকর্ত্তার এই প্রশ্নে কি "অধিকার" আছে? আমার ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তির কি "অধিকার" আছে?" নিজের দৈন্য বা দুর্ব্বলতা জানিবার অধিকার সে পরকে দিতে চাহে না। ঐশ্বর্য্য প্রকাশের ত নানা কথাই আছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, পৌরস্ত্য জন-পদসমূহে কেবল অন্দর মহলের দ্বারেই অবগুণ্ঠন থাকে—পশ্চিম প্রতি ব্যক্তির চিত্ত-দ্বারে এই পর্দ্দা ঝুলাইয়াছে।

বর্ত্তমানে আমরাও এই পাশ্চাত্য ভাবে এতটা অনুরঞ্জিত হইয়াছি যে, কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ সহায়তা যাচ্ঞা করিবার সময় স্বতঃই মনে উঠে—তাহাকে এই বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা কিম্বা তাহার সহায়তা প্রার্থনা করার আমার কি অধিকার আছে? এইরূপে ইতস্ততঃ করিয়া আমরা অনেক কাজে হাত দিতে পারি না। অথচ যাহাদের পশ্চিমের আদর্শে চিত্তবৈকল্য ঘটে নাই, তাহারা নিঃসঙ্কোচে সহজেই এমন আত্মীয়-তার সূত্রপাত করিতে পারেন, অন্যের পারিবারিক সুখ দুঃখের মাঝে এমন জড়িত হইতে পারেন যে, বোধ হয় "বসুধা" তাহার কেবল বন্ধু মাত্র নহে—তাহার "কুটুম্ব"। আমাদের গ্রাম্য-জীবন ইহার দৃষ্টান্ত—সেখানে সহজেই ইহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

প্রাচ্য বিধিতে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক অতি নিবিড় এবং হিন্দু পরিবার মাত্রেই পারস্পরিক সাহায্য ও সাহচর্য্য একটা নৈসর্গিক স্নেহ হইতে উৎসারিত হইয়াছে। এজন্য পরিবার বিশেষে নূতন আগন্তুক সহ-জেই দাদা, ভাই, খুড়ো, কাকা প্রভৃতি নামে আহূত হইয়া আত্মীয়তা সৃজন করে। ইহা কোন বিচার বিবেচনারও অপেক্ষা করে না—কেন না, পারিবারিক ভাব, কুটুম্বত্ব বা আত্মীয়ত্ব আমাদের মজ্জাগত। ইহাই ভারতের ব্যক্তিগত জীবনের প্রধান ঘটনা এবং ইহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম্মের অনুশাসনে চালিত হইতেছে।

এই ব্যাপারে অধিকার বা স্বত্বের কোন প্রশ্ন নাই। যিনি আমার খুড়ো বাবা জ্যেঠা না হন, তাঁহাকে আমার খুড়ো ডাকিবার কি অধিকার—কিম্বা যিনি আমার 'মা' বা 'মামীমা' নহেন, তাহার মাতৃত্ব ইত্যাদি

ঘোষণা করিতে আমার স্বত্ব আছে কিনা, এই সমস্ত প্রশ্ন উঠে না॥

এই অন্তর্গূঢ় সামাজিক সম্পর্ক বর্ত্তমান দৈন্যের মাঝেও সরলতা সৃষ্টি করিয়াছে। এজন্য পরস্পর হইতে সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করা অস্বাভাবিক নহে।

প্রত্যেকেরই সামাজিক এই ধর্ম্মানুরঞ্জিত আব হাওয়ার মাঝে অন্যোন্যের সাহায্য করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহার মূলে উভয় পক্ষের মাঝে কোন চুক্তি নাই। এক পক্ষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অন্য পক্ষ স্বত্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে না।

এ দেশের ধর্ম্মানুশাসন প্রত্যেকের কর্ত্তব্য-ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতেছে, কিন্তু অধিকার-ক্ষেত্র স্বীকার করে নাই। পশ্চিম দেশীয় "স্বত্ব" বলিয়া আমাদের কোন ব্যাপার ছিল না। আমরা কর্ত্তব্য মাত্র জানি। পরের নিকট উৎপীড়ন ও দাবী করিয়া, আদায় করাটা সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি আমার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য না করে, তবে ক্ষতি আমার নহে। কারণ আমিত্ব-বর্জ্জিত ও ফলবর্জ্জিত কর্ম্মের স্পৃহা যাহার হয় নাই, তাহার মুক্তি সুদূর-পরাহত, তাহাকে হয় ত সহস্র বৎসর কাল আত্মচর্চ্চা দ্বারা বিভিন্ন জন্মে সেই দুর্ব্বলতা ক্ষয় করিতে হইবে। অপর পক্ষে আমি আমার কর্ত্তব্য করিলে, আমার চরমাকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন বাধা দিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য করিবেন বলিয়া ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা অন্যায়, কারণ একমাত্র নিজের কার্য্যদ্বারাই আমরা পরমার্থ লাভ করিতে পারি।

আমাদের লক্ষ্যটা লৌকিক সুখস্পৃহার দিকে নহে, আপাততঃ সুখকর লাভ বা জয়ে আমরা মুগ্ধ হইয়া একের পরাজয়েও বিচলিত হই না, কারণ অধর্ম্মের দ্বারা নরনারী ক্ষণিক সুখলাভ করিতে পারে। কিন্তু চিরন্তন চিত্ত-চরিত্রের ইতিহাসে ফল বিভিন্ন দাঁড়াইবে।

ইউরোপ পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী লাভের দিকে বরাবর দৃষ্টি রাখে। উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

এদেশের রাজা প্রজা সকলেই "দেহ" ত্যাগ করিলে একই শ্মশানের ভস্মস্তূপে পরিণত হয়—ইহাতে কোন অপ্রমাণের কারণ থাকে না। কিন্তু ইউরোপ মৃত্যুকেও যেন স্বীকার না করিয়া, মৃতদেহকে নানা রাসায়নিক দ্রব্যে সিক্ত করিয়া বহুমূল্য কফিনে স্বর্ণ, হীরক, ভেলবেট্ মস্‌লিন প্রভৃতি জড়াইয়া তাহাকে পার্থিবতা হইতে ছুটি দেওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তারপর কবর-ক্ষেত্রে বহুমূল্য মর্ম্মর শোভিত মূর্ত্তি, ছায়াচিত্র, মনুমেণ্ট প্রভৃতি দেওয়া হয়। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যহ তাহার উপর ফুলের মাল্য অর্পণ করা হয়, তাহাকে বুকে আলিঙ্গন করা হয় ইত্যাদি। পশ্চিমের সমাধিস্থানগুলিও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে, দম্ভের গর্ব্বিত পদক্ষেপে মুখরিত, লক্ষাধিপতি মণিমুক্তাদ্বারা তাহার কবর শোভিত করিতেছে, তাহার ভোগাদেহের পরিণামকে অলঙ্কৃত করিতেছে। যে দরিদ্র, মৃত্যুর পরেও তাহার দৈন্য ও নগ্নতা পরিস্ফুট হইতেছে। মৃত্যুর পরেও ধনী-দরিদ্র এক হইতে পারে নাই। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে। অপরদিকে হিন্দুর শ্মশান জ্বলন্ত অনলে হাহাকার তুলিয়া পার্থিব দম্ভের ক্ষণস্থায়িত্ব, বিরাট মানব-সমাজের শতলক্ষস্তর-শায়িত লোকারণ্যের এই একটী সঙ্গমস্থলকে অল-

স্কৃত করিতেছে। যেন অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মানবীয় আত্মা কোন দুর্লক্ষ্যপথে ছুটিতেছে! জীবনের দুর্ব্বলতা, উচ্চনীচ-ভেদ, ঐশ্বর্য্যদম্ভ প্রভৃতি এক মুহূর্ত্তে এক ক্ষেত্রে ধূলিসাৎ হইতেছে। রাজা, প্রজা, ধনী-দরিদ্র, অন্ততঃ এই মহাক্ষেত্রে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। মৃত্যুর পরে হিন্দুর দেহকে গৈরিকভূষণে আবৃত করা হয়, পরকালের সম্বলস্বরূপ ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লগ্ন করা হয়। কোটীপতিরও ভিক্ষার ঝুলিটীমাত্র সন্ন্যাসের শেষ সম্বলরূপে থাকে। কি নিষ্ঠুর পরমসাহসের কার্য্য! ইহলোককে যাহারা আত্মার চরম ব্যাপার বলিয়া মনে করে না, তাহারা নিষ্ঠুর হইলেও এই স্বাভাবিক সত্যকে কেন না প্রকাশিত করিবে?

মৃত্যুর পরে ইউরোপে ব্যাণ্ডবাদ্য বাজাইয়া শবকে সম্মানিত করে। কি ক্ষুদ্রতা! মৃতদেহ লইয়া এমন অলীক আড়ম্বর কি এই বিজ্ঞান-যুগের সাধনার ফল? ইহাদ্বারা যেন আত্মার সনাতন সত্ত্বাকে বিদ্রূপ করা হয়। কি নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা। অপরপক্ষে সঙ্কীর্ত্তন এবং ব্রহ্মনাম ছাড়া হিন্দুর শব-সন্নিধানে আর কোনও ধ্বনি শোনা যায় না। কোটী-পতি ও ভিখারীর একই ব্যবস্থা।

শুধু তাহাই নহে, প্রাণকর্ত্তৃক ও আত্মা-কর্ত্তৃক ত্যক্ত শবদেহ হিন্দুর অস্পৃশ্য, সে ইহার ক্ষুদ্রতা সহজেই উপলব্ধি করে। যদি আত্মাই যথার্থ ব্যাপার হয়, দেহের গৌরবও আত্মাকে ছাড়া সম্ভব নহে।

ইউরোপ মৃত্যুর পরে প্রার্থনা করে, May his soul rest in peace, অর্থাৎ তাহার আত্মা যেন শান্তিলাভ করে। ইউরোপ ইহা দ্বারা স্বীকার করে 'আত্মা'টী তাহার অর্থাৎ দেহের, দেহটী আত্মার নহে। অপরপক্ষে হিন্দু পিতৃবিয়োগে বলে, তাহার পিতা "দেহ" ত্যাগ করিয়াছেন। দেহটী তাহার পিতা নহে—তাহার পিতাই দেহটী ত্যাগ করে। তাহার পিতা দেহের অতীত ব্যাপার—মৃত্যুর পরে, বিজয়ার প্রতিমার ন্যায়, মৃতদেহ দূরে শ্মশানে ভস্মীভূত করিতে এইজন্যই হিন্দু ইতস্ততঃ করে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের ঐহিকতার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে নানা ঘটনার মাঝে সমাজচিত্ত সহজেই ধরা পড়ে। মুখে আত্মগোপন সম্ভব হইলেও কার্য্যে তাহা সব সময় সহজ হয় না।

ব্যক্তিগত কার্য্যের মাঝে চুক্তির বাহিরের ব্যাপারেও ইউরোপে লিখিত বা অলিখিত কোন একটা কোড প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা পরস্পরের অধিকার এবং দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের খাতিরে যে সমস্ত বন্ধন আছে, তাহা এই কোডদ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্তের উৎপীড়ন বৃদ্ধ মনুর অপেক্ষা বড় কম নহে।

গৃহচ্যুত, হোটেল-আশ্রিত জনতার হোটেলে স্বীয় অধিকার এবং দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, ক্লাবের ক্ষেত্র কাঁটাবনের ন্যায় জটিল, টিক্‌টিকির আওয়াজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যাপারেও যেখানে খাণ্ডবদাহ ঘটিতে পারে, ষ্টেজের ইষ্ট বা অনিষ্ট সম্বন্ধে দর্শকের হস্তপদ-সঞ্চালনও জড়িত, সেখানে কর্ত্তব্য পরি-চিহ্নিত, একবার কোন রাজপুত্র হঠাৎ থিয়েটারে উপস্থিত হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষগণ আনন্দে নাটকটী কিয়ৎকাল স্থগিত রাখিয়া "God save the king" আরম্ভ করে। ইহাতে নিম্নলিখিত প্রশ্ন উঠে:—

(১) রাজপুত্রের আগমনে নাটককারগ-ণের demonstration করিয়া ভদ্রতা লঙ্ঘন করিবার স্বত্ব আছে কি?

(২) নাটককারগণের নাটক বন্ধ করিয়া সাধারণের আনন্দে বিঘ্ন জন্মাইবার অধিকার আছে কি?

(৩) রাজপুত্রেরও ঐরূপ অধিকার আছে কি? ইত্যাদি।

রাজপুত্র কৈফিয়ৎ তলব করাতে নাটকীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ষ্টেজ ছাড়া, ক্রীড়াক্ষেত্র, ঘোড়দৌড়ের আড্ডা প্রভৃতির মাঝে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বড়ই কড়াকড়; কাজেই গতিবিধি বড়ই পিচ্ছিল।

এসব ছাড়া ডিনার-রূপী মানব জীবনের নিতান্ত গুরুতর, গম্ভীর পরীক্ষা, ক্ষেত্রে-"টি"-পার্টির প্রয়াগ-তীর্থে, বল-নৃত্যের চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের মাঝে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকলের নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব ও দায়িত্ব রহিয়াছে। "এট-হোম্" প্রভৃতির গলায় দোদুল্যমান ঘণ্টাধ্বনি জগতে নানা প্রচলিত কঠিন দায়িত্ব প্রচার করিতেছে। ভদ্রতার অপরিহার্য্য ব্যাপার না হইলেও ইহাদের নাম এটিকেট্ বা গুড্ ম্যানারস। বিবাহ-পার্টি, আফিস্, মদ্যবিপণি, ক্লাব, ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ, সর্ব্বত্র সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সময়ের সহিতও যেন ইহাদের চুক্তি আছে। কারণ সন্ধ্যা হইলে একরূপ পরিচ্ছদ, প্রভাতে অন্যরূপ, মধ্যাহ্নে ভিন্নরূপ, ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে। ইহা প্রাচ্যদের দুর্ব্বোধ্য।

প্রস্ফুট বা প্রদত্ত চুক্তির উপর সামাজিক সম্পর্ক নির্ভর করে বলিয়া ইউরোপে আরও একটা ব্যাপার ঘটিয়া আসিতেছে। চুক্তির মর্ম্ম হইতেছে, উভয় পক্ষ স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে, একের ত্রুটি অন্যকে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবে। কাজেই এক পক্ষ স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন না করিলে, অপর পক্ষ তাহার কার্য্য করিতে বাধ্য নহে। চুক্তির এক অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিলে অপর অঙ্গ কেন পূর্ণ হইবে? পশ্চিমের জনতা আজ যদি আহার্য্য দ্রব্য না পায়, তবে মন্ত্রী সমাজের গৃহ লুণ্ঠন করিতে পারে। * ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত কত-বার দেখা গিয়াছে।

ইহার কারণ,—সেখানে সকলেই নানা সঙ্ঘর্ষ দ্বারা স্বত্বমূলক এই বিশ্বাসে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে যে, পরিশ্রমের বিনিময়ে কাহা-রও খাদ্য দ্রব্য অপ্রাপ্য নহে। আত্মসৃষ্ট রাজবিধির উপর তাঁহাদের সেই পূর্ণ অধি-কার আছে। নির্ব্বাচিত শাসক-সম্প্রদায় তাহা পালন না করিলে তাহাদিগকে পদচ্যুত করা কিম্বা কোন বিধি পালন না করা, জনতা স্বাধিকারের সাধারণ গণ্ডীভুক্ত মনে করে। এক পক্ষ স্বেচ্ছায় চুক্তি ভঙ্গ করিলে অপরপক্ষও তাহার অপর অঙ্গ ভঙ্গ করিবে। ইউরোপ এই অধিকার সহস্র-বর্ষের অর্দ্ধ সংগ্রাম দ্বারা লাভ করিয়াছে, ইহারই দৃষ্টান্ত ব্রেড্-রায়ট বা অন্নসংগ্রাম! ইহা ইউরোপের মজ্জাগত, ইহার জন্য সে জগতের সমক্ষে লজ্জিত নহে।

এসিয়াতে উক্ত মত গৃহীত হয় নাই। রাজদণ্ড কোথায়ও বা ধর্ম্মের প্রতিভূ, অন্যত্র পিতার বেত্রদণ্ডের ন্যায় অনুভূত হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার পর্য্যটকগণ কিছু-তেই বুঝিতে পারে না, দারিদ্র্য-পীড়িত, অন্নহীন, ক্ষুধার্ত্ত, কুটীরবাসী, ভারতের কৃষক-গণ, গর্ব্বপুষ্ট, ঐশ্বর্য্যপুলকিত, ধনীদের গৃহ লুণ্ঠন না করিয়া, কিম্বা কোন মারাত্মক অশান্তির সৃষ্টি না করিয়া, কি করিয়া চুপ করিয়া আছে। ধীরে ধীরে জীর্ণশীর্ণ হইয়া

* ফরাসী এবং অন্যান্য ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

মৃত্যু স্বীকার করিতেছে, অথচ গ্রাম্য সমৃদ্ধ লোকগণ বিনা চিন্তায় সুখে নিদ্রিত। *

হাজার বৎসরের পুরাতন ধর্ম্ম ও নীতিবাদ এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতের চিত্তে নিজের সিংহাসন অলুণ্ঠিত রাখিয়াছে, এজন্যই ভারতের তথা-কথিত শান্তি, নচেৎ ইউরোপ যাহা চাহিয়া শান্তি পায়, এবং যাহা লাভ করিয়া শান্তি পাইয়াছে, ভারতের জনসাধারণ তাহা পাইয়াছে কি?

শান্তির আদর্শ বিভিন্ন হওয়াতেই এই সংযম এবং সহিষ্ণুতা সম্ভব হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সকলের মাঝেই কর্ত্তব্য জ্ঞান পরিস্ফুট করিয়াছে, কিন্তু দাবী, স্বত্ব বা অধিকার জ্ঞানের দ্বারা চিত্তকে স্ফীত, এবং সংগ্রাম-প্রবণ করিয়া তোলে নাই। ভারতের সমাজ রাষ্ট্র-সমাজ নহে—ধর্ম্ম-সমাজ; ভারতে রাষ্ট্র-রাজ্য নাই—ধর্ম্ম-রাজ্য আছে; এমন কি,রাষ্ট্রীয় যুদ্ধও নাই—আছে ধর্ম্ম-যুদ্ধ! অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিব।

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যের উপর ব্রাহ্মণ্যের কর্ত্তব্য নির্ভর করে না। কিম্বা বৈশ্য নিজের কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে শূদ্র সকলকে অবজ্ঞা করিবে, এমন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে নাই। এদেশের ধর্ম্মমূলক সমাজের বিধান প্রভৃতির স্রষ্টা রাজাও নহে, প্রজাও নহে; কিম্বা এতদুভয়ের কোন সঙ্ঘর্ষ বা সংগ্রাম দ্বারা এ সমস্ত গঠিত হয় নাই। তেমনি, ভারতের পল্লীসমাজের থাকেও কোন রক্তারক্তি পরস্পরের অধিকার অঙ্কিত করিয়া তোলে নাই। সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য সনাতন যুগাগত ধর্ম্মবন্ধন ও সংস্কার হইতে প্রবর্ত্তিত, এই বিশ্বাস দ্বারা ভারতবর্ষ পুষ্ট হইয়াছে। কাজেই ক্ষত্রিয় স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিলেও কৃষিজীবী তজ্জন্য কলরব তোলে নাই।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আতিরিক্ত্য ভেদের দিক্‌টা অঙ্কিত করিলেও নানা সামাজিক কারণে ঐক্যেরও একটা দিক ইউরোপে আশ্চর্য্য রূপে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতার খাতিরে সৃষ্ট পশ্চিম দেশীয় প্রকৃতিগত বৈষম্য পূর্ব্বদেশে দেখা যায় না। কারণ এখানে সমাজবদ্ধ পারিবারিক জীবনই কেন্দ্রের কার্য্য করিতেছে। কাজেই আচার ব্যবহার, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রস্ফুট হয় নাই, কারণ তাহার প্রয়োজনও ছিল না।

ইউরোপে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও অতিবর্দ্ধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রয়োজন হইলে ইউরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় জনতা সমগ্র বিরোধ ত্যাগ করিয়া একীভূত হইবার শিক্ষা নানা কারণে পাইয়াছে, সম্প্রতি উহা যেন সংস্কারে পরিণত হইয়াছে।

ইউরোপের ষ্টেট সমূহের ইতিহাসে দেখা যায়, সেখানে কোন রাজ্যই আলস্য হইতে বিমুক্ত হইয়া একাকী বৰ্দ্ধিত হইতে পারে নাই, একটা সংস্কৃত উক্তি আছে ঃ—

"অপরাধেন মেহস্তাতি নৈতদ্ বিশ্বাস কারণম্"

এজন্য ছোটবড় প্রত্যেককেই পরস্পরের সঙ্গে অসংখ্য সংঙ্ঘর্ষণে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। ফলে প্রত্যেক রাজ্যেরই আত্মরক্ষার একটা ভাব বিস্ময়জনক ভাবে সংস্কারগত হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য জাতিগতভাবে ইউরোপের যে কোন রাজ্য আশ্চর্য্য ঐক্য এবং ত্যাগ দেখাইতে পারে।

ইউরোপীয় ইতিহাসের যুগ গুলিকে পরীক্ষা করা যাক্।

---

* Bryan সাহেবের এবং অন্যান্য পর্য্যটকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রথম যুগ জাতিগত সংগ্রামের (৮০০খ্রীঃ—১০৫০ খ্রীঃ)। এই যুগে হুঙ্গরীয়, রুষীয়, নর্ম্মান, তুরস্ক প্রভৃতি জাতিগুলি কোন বিশেষ স্থলবদ্ধ না হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছে। ইহাকে Tribe Sovereignty বলা হইয়া থাকে। ফ্রাঙ্ক, বার্গণ্ডীয়, ভণ্ডাল, লম্বার্ড, ভিসিগথ প্রভৃতির রাজা গোষ্ঠীর রাজা, কোন স্থলখণ্ডের রাজা নহে। ফরাসী রাজ্যে Hugues capet এবং ইংলণ্ডে নর্ম্মানগণই রাষ্ট্রগত প্রভুত্ব বা সাম্রাজ্যের ভাব জাগ্রত করিয়া তোলে। তারপর দ্বিতীয়যুগের প্রথমভাগে (১০৫০ খ্রীঃ—১২৫০ খ্রীঃ) ক্রুসেড-সংগ্রামে ইউরোপের রাজ্যগুলি নব্যমন্ত্রের দীক্ষা লইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগে (১২৫০ খ্রীঃ—১৪৫০ খ্রীঃ) ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলসের যুদ্ধ (১২৭১ খ্রীঃ) বহুকালব্যাপী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ (১৪১৫ খ্রীঃ) ফ্রান্স ও সিসিলীর যুদ্ধ, ফ্রান্সের লুই ও বারগণ্ডীর ডিউকের সংগ্রাম, স্পেন ও মোস্লেম যুদ্ধ, ফার্ডিনেণ্ডের সংগ্রাম (১৪৮৩ খ্রীঃ) —(১৪৯৮ খ্রীঃ) অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মনী ও সুইজারলেণ্ডের সংগ্রাম (১৩০৮ খ্রীঃ) জর্ম্মান সেনাপতি Ziskaর সংগ্রাম (১৪১৫ খ্রীঃ) ইতালী ও ফ্রান্সের সংগ্রাম প্রভৃতি। তৃতীয় ভাগে (১৪৫০—১৬৪৮ খ্রীঃ) স্পেন ও ফ্রান্সের সংগ্রাম, স্পেন ও টিউনিসের যুদ্ধ, তুরস্ক ও হুঙ্গরীর যুদ্ধ প্রভৃতি।

এই সময় সুইডেন বিখ্যাত রাজা Gustavus Adolphusএর অধীনে জর্ম্মনীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইহাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জড়িত থাকে। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি এই ত্রিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরিণতি। এই সময় স্পেনীয় সেনাপতি Cortez মেক্সিকো জয় করে, (১৫২১ খ্রীঃ) এবং Pizarro পেরুর স্বাধীনতা হরণ করে। এই রূপে প্রতিদিন আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে অস্ত্রবিদ্যা, ব্যূহবন্ধন প্রভৃতি ব্যাপারে সুশিক্ষিত হইয়া ইউরোপ পৃথিবীর অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন আরম্ভ করে। এই সময়ে Dutch-গণের সহিত স্পেনের যুদ্ধ (১৫৮০ খ্রীঃ) ফরাসী ও ইংরাজের যুদ্ধ (১৫৮৮ খ্রীঃ) ফরাসী ও ইতালীর সংগ্রাম (১৪৮৩ খ্রীঃ) সংঘটিত হয়।

তৃতীয় যুগের (১৬০০—১৮০০ খ্রীঃ) অসংখ্য এবং অপ্রাপ্ত খণ্ড ও বৃহৎ যুদ্ধের নাম উল্লেখও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর ইতিহাস পাঠ করাই ভাল।

এইরূপে অশ্রান্ত সংগ্রাম প্রভৃতি দ্বারা ইউরোপ নিজের সীমানা ও স্বত্ব, এবং যুদ্ধোদ্যমে প্রযুক্ত কার্য্যকারী সমবায় শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বীয় জ্ঞান পরিপুষ্ট করে। নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ international courtএর দ্বারা স্থির করিয়া, নবলব্ধ অস্ত্রবিদ্যা সহ দিগ্বিজয় করিতে ছোটে।

পাশ্চমের তথাকথিত ধর্ম্মান্দোলনের মূলেও ঐহিকতা রহিয়াছে। এদেশে অনেকেই ইউরোপের প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম বিস্তারকে ধর্ম্মান্দোলন মনে করে, কিন্তু ধর্ম্ম কিছু পরিমাণ যুক্ত থাকিলেও তাহাকে ধর্ম্মান্দোলন বলা যায় না। তাহাও বহির্রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘর্ষ হইতে সঞ্জাত, আত্মরক্ষা এবং আত্মবিস্তারের জন্যই তাহার সৃষ্টি। যাঁহারা ভারতের আধুনিক ধর্ম্মান্দোলনের সহিত উহার তুলনা করেন, তাঁহারা একটু চিন্তা করিলে ভাল হয়।

ইউরোপের "রি-ফরমেশন" বা সংস্কার-যুগকে মোটামুটি ১৪৮৫ খ্রীঃ হইতে দুই

শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী মনে করা যাইতে পারে।

সংস্কার-যুগের মূল কথা পোপের আধিপত্য খর্ব্ব করা, কারণ পোপ্ কেবল মাত্র ধর্ম্মগুরু ছিল না, রাষ্ট্রের উপর তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতা ইউরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও জর্ম্মনীর দুঃসহ হইয়াছিল। কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :— *

সংস্কার যুগের সমগ্র ইতিহাসে এবং তাহার কিছু পূর্ব্বেও পোপের কর্তৃশক্তির সহিত ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তির রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক বিশেষ অনুধাবনার বিষয়। বহুকাল হইতেই অনেক ক্ষমতালোভী পোপের রাষ্ট্র-সম্রাট হইয়া স্বীয় বংশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা ছিল। কিন্তু জুলিয়স্ ইহা অপেক্ষা উচ্চ লক্ষ্য স্থির করিয়াছিল; তাহার উদ্দেশ্য ইতালীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব লাভ করিয়া অন্যান্য নৃপতির সমকক্ষ হওয়া। ফরাসী ও স্পেনের সম্রাটগণও ইহাতে আশঙ্কিত ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিল। প্রায় এক শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত স্পষ্টই দেখা যায়, ইউরোপের ধর্ম্মশক্তি-সমূহের যাবতীয় পলিসিই রোমের সম্পর্কে রাষ্ট্রনৈতিক হইয়া উঠে।

ফ্রান্সে দ্বাদশ-লুইর সহিত প্রথম সজ্ঘর্ষেই পোপ তাহাকে ধর্ম্মচ্যুত করে। ইংলণ্ডীয় রাজা জনের ধর্ম্মচ্যুতি সকলেই জানেন। ইংলণ্ডের প্রথম হেন্‌রী পোপের একজন দূতকে, এমন কি, স্থায়ীভাবে বাস করিবার অনুমতি পর্য্যন্ত প্রদান করে।

জর্ম্মণীতে ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে পাদরীগণের অত্যাচার, কর-আদায়, লুণ্ঠন প্রভৃতি বিষয়ক এক আবেদন জনসাধারণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই কিন্তু অন্তর্রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদি লইয়া, ধর্ম্মগত কোন সংস্কারের প্রশ্ন লইয়া নহে।

তারপর জর্ম্মনীর বিদ্বজ্জনেরা সাধারণের করভার-পীড়িত ক্রন্দন শুনিয়া হস্তে লেখনী গ্রহণ করিল এবং পোপের পক্ষে রাষ্ট্রীয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ মারাত্মক, এই ঘোষণা প্রচার করিল। Goch, Wessel, Erasmus প্রভৃতি এই সময়ে নানাদিক হইতে পোপকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

বিখ্যাত মার্টিন লুথারও বিশুদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি লইয়া প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ঘোষণা করে নাই। কোন সুবিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন :—

"Already burning with resentment at the systematic extortion to which countrymen were subjected, his feelings were still further intensified as he listened to the contemptuous language and observ-

---

* In the whole history of Reformation and of the period by which it was immediately preceded the political relations of the Popedom to the other European powers constitute in-fact *elements of primary importance*......It had long before been the aim of each more ambitious Pope to become a great territorial prince and thus to lay the foundation of the private fortunes of his house. But Julius aimed at something more than this—at the assertion of political supremacy throughout Italy and of the right to rank with the great powers of Europe......Even the great powers of France and Spain could not but regard with Jealousy and apprehension his genius and policy......For nearly quarter of a century we find the policy of the great powers in relation to Rome almost entirely determined by purely political consideration.

ed supercilious demeanour which marked the Roman estimate of those who love Germau name."

অর্থাৎ তিনি তাঁহার দেশবাসিগণ হইতে ধারাবাহিক অর্থ শোষণে ক্রোধান্বিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠেন। ক্রমশঃ তাহার এই রোষাগ্নি দ্বিগুণিত হইয়া উঠে, কারণ জর্ম্মণ-নামধারীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভাষা ও গর্ব্বিত ব্যবহার রোমকগণের যেন স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল।

এমন কি, লুথারের প্রথম কার্য্যাদি পোপের ধর্ম্মের প্রতিকূল ছিল না। Tetzel এবং লুথারের সহিত সংগ্রামে পোপের আনুকূল্য বরং লুথারের দিকেই ছিল। ইংলণ্ডও Wolsey's কর-ভারে পীড়িত হইয়া সাধারণ বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়াছিল। কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলেন :—

"But the unsparing extortion practised by Wolsey's agents after his appointment as legatus a latere was severely resented and appeared all the more grievous when entrusted with that immunity from arbitrary taxation which it was the Englishmans' special boast to inherit as his birth-right."

এইরূপে নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, এই রি-ফরমেশন ব্যাপারটী ভূয়িষ্টপরিমাণে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার। ইউরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বকীয় স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্ত বাহিরের কোন শক্তির নিকট, তাহা রাষ্ট্রশক্তিই হোক্ বা ধর্ম্মশাসন-শক্তিই হোক্, মস্তক অবনত করিতে স্বীকার করে নাই। এজন্ত কত রক্তপাত হইয়াছে, ইয়ত্তা নাই।

বহুকালের সাধনার পর আত্মরক্ষার সহজ ও নৈসর্গিক সংস্কার হইতেই পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে সমগ্র শক্তি সংহত করিবার শিক্ষা পাইয়াছে। এই শিক্ষা ও সংস্কারের অবিচ্ছেন্ন ফলে আজ পশ্চিমের রণতরী-পর্য্যায় সমুদ্রে ভাসমান, কামান শ্রান্তিহীন, ব্যোম-রথ আবিষ্কৃত এবং তারবিহীন সংবাদ প্রেরণযন্ত্র উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে।

স্বাতন্ত্র্যের আতিরিক্ত্য একদিকে, অন্যদিকে স্বার্থে আঘাত কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ অপ্রত্যাশিত সামাজিক একতা দ্বারা পশ্চিমের প্রাণধারা ঐতিহাসিক কাল হইতে কম্পিত হইতেছে।

এইরূপে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রাধান্য পশ্চিমকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। ধর্ম্মব্যবস্থাদি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমের চূড়ান্ত শিক্ষা হইয়াছে।

এদেশে রাজার অভাবেও ধর্ম্মমূলক সমাজবন্ধনের ফলে দেশে শান্তি সম্ভব, উচ্ছৃঙ্খলতা সম্ভব নহে। এখনও দেশের সমাজ আচার-অর্চ্চনামূলক প্রাত্যহিক কৃত্যাদির সহিত রাজকীয় শাসনের কোথায়ও যোগ নাই। তাহা যুগাগত ধর্ম্মবিধানের নৈসর্গিক শক্তিদ্বারা চালিত হইতেছে। ইউরোপের ক্ষে ইহা উপলব্ধি করা কঠিন।

ইদানীং ভারতবর্ষ ক্রমশঃই অশান্ত হইয়া উঠিতেছে, কারণ পশ্চিমের ব্যবস্থা ও বিধান দাহকরী ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়া যে বীজ রোপণ করিয়াছিল, তাহা সম্প্রতি পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাসন পশ্চিমের কাছে এমন দুর্ব্বোধ্য যে, কোন বিশেষ মনীষী, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক যে সমস্ত গবেষণা হয়, তাহার আলোচনায়

"প্রভুত্ব" শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে পণ্ডিত অষ্টিনের ব্যাখ্যা নিরাকরণার্থ বলেন,এমন দেশ আছে, যেখানে রাজকীয় ক্ষমতা কর্তৃক আইন গঠিত হয় না, অথচ যেখানে আইন অবিসম্বাদিত ভাবে কার্য্যকরী। অতএব রাজাকেই যে আইন প্রণয়ন সব সময় করিতে হয়, এমন নহে। তারপর পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের উল্লেখ করিয়া বলেন :—

"At first sight there could be no more perfect embodiment than Runjeet Singh of sovereignty as conceived by Austin. He was absolutely despotic·····He could have commanded anything; the smallest disobedience to his com mands would have been followed by death or mutilation......Yet I doubt whether once in all his life issued a command which Austin would call 'Law'. He have made a "law". *

এইটুকু পাশ্চাত্য খণ্ড বুঝিতে পারিল মাত্র। কিন্তু রাজ্যের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যে গুপ্ত ধর্ম্মানুশাসন যাবতীয় কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহা পশ্চিমের মস্তিষ্ক দেখেও না বোঝেও না। সে আলোক হইতে তাহারা বঞ্চিত !—

"The rules which regulated the lives of subjects were derived from immemorial usages and these men were administered in accordance with their unceremonial usages a nd were administered by domestic tribunals in families or village communities.†

এই usage বা আচারের মৌলিক ভাবসম্পদ এখনও কোন্ প্রাণধারা সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহা পশ্চিম সহজে উপলব্ধ করিতে পারে না।

স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম্মগ্রন্থাদি এদেশের আব হাওয়া সৃজন করিয়াছে, এখনও তাহা অক্লান্তভাবে ঘন আলিঙ্গনে সকলকে বেষ্টন করিয়া আছে। ভারতের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসমাজের সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য। এমন কি, ইউরোপীয় নীতির প্রথম সংঘর্ষেও এদেশে রাষ্ট্রীয়-বিপ্লব ঘটিয়া উঠে নাই—ধর্ম্ম-বিপ্লব জাগ্রত হইয়াছে।

শতশীর্ষা পুরুষ, রাজর্ষি রামমোহন রায় ঠিক ভারতীয় অধ্যাত্মনীতির অনুশীলন বলে আধুনিক যুগে সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মান্দোলন উত্থাপিত করিয়া এদেশের ধর্ম্মপ্রবণতা প্রমাণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

অপরপক্ষে পশ্চিমদেশীয় জনসাধারণও রাজনীতির যাবতীয় খবর রাখে,কিন্তু ধর্ম্মগত প্রশ্নাদি তাহার মুখরোচক নহে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রশ্নে একটী শ্রমজীবী উত্তর করিয়াছিল—"আমরা ঐ সবের বেশী কিছু খবর রাখি না—চার্চ্চে যাই মাত্র।"

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি,ভারতবর্ষ তাহার কোন কর্ত্তব্যকে চুক্তির দ্বারা যুক্ত মনে করে না, কারণ এই শ্রেণীর কোন সঙ্ঘর্ষ দ্বারা তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান বা দায়িত্ব-জ্ঞান নির্ণীত হয় নাই।

তাহার নিগূঢ় কারণও আছে। দুঃখ জয় করা মোটামুটি মানবের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। পশ্চিমের চেষ্টা-বাহুল্যের মাঝে দেখা যায়, ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পদের আতিরিক্যে তাহারা যাবতীয় দুঃখ জয় করিতে যত্নবান। এজন্য তাহাদের চেষ্টা, শ্রম, এবং সর্ব্বত্র বিস্তার বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। চীনের ন্যায়

* Early History of Institutions.

† Early History of Institutions.

ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র কখনও কখনও লুণ্ঠনের ইচ্ছায় নিজদেশ পরিত্যাগ করিয়া পরের মাঝে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু কাষ্ঠমার্জ্জারের ন্যায় পশ্চিমের ক্ষুদ্র রাজ্যও ধর্ম্ম রাজ্যের জন্য দেশ ছাড়িয়া বিদেশে ছুটিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম সংখ্যাহীন আসবাব, প্রত্যেকটীর অগণ্য ভঙ্গীতে রচনা, পরিচ্ছদের সীমাহীন উপকরণ, নির্ম্মাণ প্রণালী প্রভৃতি লইয়া ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতেছে এবং এজন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র কণ্টকজাল নিক্ষেপ করিতেছে। কাজেই নিজের মধ্যে বা অন্যত্র যে সমস্ত সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং অহরহ ঘটিতেছে, তাহার ফলে নানা সন্ধি, চুক্তি, ক্ষমতার পরিধি, সীমানা, প্রভৃতি নির্ণীত হইতেছে। এজন্য স্বত্বজ্ঞান বা অধিকারিত্ব জ্ঞান এবং অপরপক্ষে দায়িত্বজ্ঞান উৎকট হইয়া উঠিতেছে।

অপরপক্ষে পরকালের দিকে প্রভূতভাবে আকৃষ্ট ভারতবর্ষ প্রবৃত্তি দ্বারা ভোগ লালসা বাড়াইয়া দুঃখ জয় করা অসম্ভব মনে করিয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে নিবৃত্তির পথ খুঁজিয়াছে। কাজেই প্রবৃত্তির উদ্দমতা যেখানেই সম্ভব মনে করিয়াছে, সেখানেই আত্মসংহরণের নানা পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে।

এজন্য ব্যক্তির মাঝে আত্মচর্চ্চা এবং আত্মনিষ্ঠা সংক্রমণের জন্য, ভারতবর্ষ যত্নবান হইয়াছে। রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের অনুশাসন পাইয়াছে। একের কর্ত্তব্য অন্যের কার্য্যাকার্য্যের উপর নির্ভর করে না।

ইহা ইহকাল এবং পরকাল উভয়ের মঙ্গলজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া দেহত্যাগ করিলে অক্ষয় স্বর্গ তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যের কর্ত্তব্যস্খলনে তাহার দায়িত্ব নাই। তেমনি ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্য-বিমুখ হইলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কর্ত্তব্য ত্যাগ দূষণীয়।

এই ব্যাপারে লৌকিক কোন চুক্তি নাই, কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর সহিত কাহার দায়িত্ব বদ্ধ নহে। যদি এই উক্তির অপরপক্ষ কেহ থাকে, তবে তিনি ভগবান। এখানকার দায়িত্ব যদি কোন চুক্তি হইতে জন্মে, তবে তাহা ভগবানের সহিত চুক্তি। কাজেই কর্ত্তব্যত্যাগ কিম্বা এই অলৌকিক চুক্তি ভঙ্গ অসম্ভব। লৌকিক ও অলৌকিক চুক্তির এই পার্থক্য দেখা যাইতেছে।

অন্ততঃ ইহকালে দেখিতেছি, এই নীতিবাদের ফলে সাধারণের শান্তি এবং সন্তোষ বৃদ্ধি এবং প্রবৃত্তি খর্ব্ব হইয়াছে। তাহারা সামান্য আহার্য্যে তৃপ্ত, ছিন্ন বস্ত্রের জন্য হিংসা-পরায়ণ নহে। অহরহ পরচর্চ্চা করিবার ইচ্ছা নিরুদ্ধ; এবং স্বীয় সামাজিক কর্ত্তব্য অবহেলার সুযোগও দূরীভূত হইয়াছে। রামের কর্ত্তব্য বা কার্য্যাকার্য্যের উপর শ্যামের কর্ত্তব্য নির্ভর করার আদর্শটী যে ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ণ ইউরোপও স্বীকার করে। এজন্য কেহ কেহ বলে—Duty for Duties sakeই ভাল।

ভারতবর্ষ পরের দায়িত্ব বা পরের উপর, নিজের কিম্বা অন্যের অধিকার (যাহা প্রচ্ছন্ন বা প্রস্ফুট চুক্তিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত) আলোচনা করা দূরে থাকুক—কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ফলের প্রতি দৃক্‌পাত করাও নিন্দনীয় মনে করিয়াছে। গীতাকারের

"মা ফলেষু কদাচন"

ভারতবর্ষ কি এখনও প্রমাণ করিতেছেন?

কিন্তু পাছে ইহাতেও অসন্তোষের কারণ থাকে, তজ্জন্য আরও চিন্তা করিতে হইয়াছে। কারণ কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য করাও নিরাপদ নহে। চিত্তে এরূপ অলীক দম্ভ হওয়া অসম্ভব নহে যে, সংসারের উপকারের জন্য আমি কিম্বা আমরা কর্ত্তব্যবোধে কত কাজ করিলাম! আমিই, সংসারের সম্পদ যেন কিছুটা যোগ করিয়া দিলাম! সংসার যেন আমার অনুগ্রহের পাত্র হইল! সে যেন আমার কাছে কিছু পরিমাণে ঋণী রহিল। তাহার উপর আমার এই কার্য্যের দ্বারা যেন কিছু অধিকারও জন্মিল! অন্ততঃ কৃপাপ্রদর্শনের অধিকারও হইতে পারে।

এজন্য এইভাবও ভারতের আদর্শে মারাত্মক। "আমার" অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই "পরের" অনুষ্ঠান দেখিবার ইচ্ছা হয়—মনে হয়, অন্যেরও কিছু করা উচিত। ইহাতে একদিকে আত্মস্ফীতি, অন্যদিকে পর হইতে কামনা চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। এজন্য গীতাকার বলিয়াছেন :—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।
৪।১৯।

অর্থাৎ যাহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পবিহীন, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মীকে পণ্ডিত বলেন।

এই উচ্চ উপদেশের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও ইহার গভীর এবং ব্যাপক অর্থ সাধারণের পক্ষে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপরোক্ত উপায়ে অধিকারিত্বজ্ঞানের ছায়া পর্য্যন্ত নিরাকরণের চেষ্টা হইয়াছে।

সহজ উপায়ে প্রাচীন মনীষীগণ এক ঋণবাদও প্রচার করিয়াছেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, পরের উপরে অধিকার বা দাবী করার প্রলোভন দূরীভূত করা। ইহাতেও স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের প্রশ্নমাত্র চিত্তে উঠিতে পারে—পরার্থ-সাধনের দুর্ব্বল স্পর্দ্ধা মনেও উঠিতে পারে না।

ঋণবাদ মতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ অন্যের উপর কোন অধিকার বা স্বত্ব পাওয়া দূরে থাকুক, স্বয়ংই চিরজীবন ঋণভার গ্রহণ করে। সমস্ত জীবন এই ঋণপরিশোধে ব্যয়িত হয়! ঋণীব্যক্তির আবার দাবী কি? স্বত্ব কি? অধিকার কি? সমগ্র জগতের অধিকার তাহারই স্কন্ধে, কিন্তু তাহার নিজের কোন অধিকার নাই। সে কর্ত্তব্যমাত্র করিবে—কাহারও নিকট কিছু আশা করিতে পারে না!

ঋণ তিন প্রকার—পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, ও দেবঋণ। কাহারও মতে মানবীয় ঋণ নামক চতুর্থ ঋণও আছে। সন্তান উৎপাদনে পিতৃঋণ, অধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষিঋণ, এবং ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। মানবীয় ঋণ অহিংসাদ্বারা পরিশোধ করিতে হয় :—

"ঋণৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে মানবা ভুবি।
পিতৃদেবর্ষিমনুজৈর্দেয়ং তেভ্যাশ্চ ধর্ম্মতঃ॥
যজ্ঞৈস্তু দেবান্ প্রীণাতি স্বাধ্যায় তপসামুনীন্
পুত্রৈঃশ্রাদ্ধৈঃ পিতৃংশ্চাপি আনৃশংস্যেন মানবান্।

পশ্চিমের মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান ঠিক এই নীতিমূলক ঋণ না হইলেও পূর্ব্ব পুরুষদের নিকট ক্রমবিকাশ আধুনিক মানবের দেহে ও মনে, গঠন ও সংস্কারের নানা ঋণ ঘোষণা করে। কত ভাব-সমষ্টি লইয়া নরনারী জন্মগ্রহণ করে, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কত সহস্র বর্ষের পূর্ব্বপুরুষের কত চিহ্ন ও সাধনার ফল লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। সেই ঋণের কি পরিশোধ হইবে না?

প্রাচ্য ঋণবাদটী সমাজের মজ্জাগত হইয়াছে—স্বত্বজ্ঞানের ঠিক বিপরীত-ধর্ম্মী হওয়ায় ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যে জগতের কার্য্য পরম্পরাকে পরিণত ও নিঃশেষ করিয়া অধিকারিত্ববাদের সামান্য প্রভাবও দূর করিয়াছে।

কার্য্যতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ঋণবাদে বিশেষ কোন তফাৎ নাই। জনতার পক্ষে ঋণবাদ সহজ বোধ্য ও উপাদেয়—ফল-নিরপেক্ষ কার্য্য দুর্বোধ্য ও নীরস। উভয় প্রণালী মতেই দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট দাবী করা অসম্ভব। চিরঋণী ব্যক্তি মহাজনের খাতাপত্র কি বুঝিবে?

পশ্চিমে এই ঋণবাদের মর্ম্ম গৃহীত হউক, এইরূপ কল্পনা সম্ভব কি? যদি গৃহীত হয়—যদি উৎকট অধিকার ও স্বত্ব সম্বন্ধে ধারণার সামর্থ্যই হয়, তবে কোথায় থাকে ম্যাক্সিমের কলরব ও টর্পিডোর বিভীষিকা? অধিকারিত্বজ্ঞান হইতে উদ্গত দম্ভ ও নিষ্ঠুর আলিঙ্গন হইতে জনতা মুক্তিলাভ করিবে।

এই মুক্তিমন্ত্র অবৈজ্ঞানিক না হইলেও বিজ্ঞানের দোহাই দ্বারা এতকাল বল লাভ করে নাই। ইহা একটা ভাবমাত্র, ঔদার্য্য, ত্যাগ, সেবা, সৎকার, ইহারই সংস্কারজাত শক্তিতে এতদিন চালিত হইয়াছে।

অধিকারবাদ অনুসারে মানবজাতির উপর প্রত্যেকের প্রচুর দাবী আছে—এই মন্ত্রেই ফরাসী অনেক অধিকারের বোঝাকে স্কন্ধে লইয়া আসে। ইউরোপের সকল জাতির পক্ষেই এক কথা। এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহারা কলহ করিতে অপ্রস্তুত নহে—সমাজগত ও রাষ্ট্রগত অধিকাংশ পলিশির ভিত্তিও এই অধিকার মন্ত্র। এসিয়া ও ইউরোপের সম্পর্কও ইহার সহিত যুক্ত।

সংক্ষেপতঃ এই মতবাদ অনুসারে জগৎ আমার নিকট ঋণী—ঋণবাদ অনুসারে আমিই জগতের নিকট ঋণী—আমার কার্য্য পরম্পরা এই পরিশোধ মাত্র।

কোনটী শ্রেষ্ঠতর বা মহত্তর, কিম্বা অধিকারবাদ বা ঋণবাদ একভাবে সমাজের বহুমুখী মঙ্গলসাধন করিতে পারে কিনা, বিবেচনার বিষয়—তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

আমার চিতায় দিবে মঠ।*

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!
আজ যে আমি উপাস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌,
সে দিকেতে নাইক দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জ্জলা এ স্নেহ বৃষ্টি
শিল পড়িছে পট্‌ পট্‌!
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!

২

দুধটুকু নাই নারীর বুকে,
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে,

* কোন রাজকুমারকে তাঁহার একজন সহচর, আমি মরিলে আমার চিতায় একটী মঠ দিতে বলিয়াছিলেন, ইহা তচ্ছ্রবণে লিখিত।

ক্ষুধায় কাতর শিশু ছেলে
ধূলায় লুটে লট্‌পট্‌,
শুষ্ক চক্ষু কণ্ঠতল,
এক বিন্দু নাইক জল,
লোল-রসনা, ভীম-লোচনা
চাহিছে নারী কট্‌মট্‌!
শত ছিন্ন বসন গায়,
শত চক্ষে লজ্জা চায়,
এমনি দৈন্য এমনি দুঃখ,
যোটেনা মোটে ছালার চট
নীলগিরি নাহি সে খোপা,
শুক্‌না মরা বীগ্না ছোপা,
তৈল বিনা রুক্ষ কেশ
অযতনে শিবের জট!
শুষ্ক শীর্ণ শ্মশানকালী
সারিন্দার খোল পেটটী—খালি,
আকাল ভারে বাঁকাল দেহ
কাঁকাল ভাঙ্গা কটিতট!
আমি মলে,
তোম্‌রা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী!

৩

পাখীও ত গাছের ডালে,
আপন বাসায় শাবক পালে,
আমার, নাই সে আশা নাই সে বাসা,
কেমন বিপদ, কি সঙ্কট!
আমি থাকি পরের বাড়ী,
নিয়ে ছেলেপিলে নারী,
নাই যে ডালা কুলা হাঁড়ি
বাপ দাদার সে ভাঙ্গা ঘট!
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে
তোম্‌রা আমার চিতায় দিবে মঠ!

৪

আমি আজ
স্বদেশ-চ্যুত বিদেশবাসী,
পরদেশে পর-প্রত্যাশী,
না জানিয়া মলে'ম আসি,
ব্যাসকাশী—এ পদ্মার তট!
দেখিনি এমন দারুণ জা'গা,
লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা,
তিন পয়সা এক বেতের আগা,—
কি মহার্ঘ, কি দুর্ঘট!
আমি মলে,তোম্‌রা আমার চিতায় দিবে মঠ!

৫

হেথা, ছলনা বঞ্চনা খালি,
কে কার ভোগে দিবে বালি,
এ কিষ্কিন্ধ্যায় সবাই বালী
আত্মম্ভরী মর্কট!
জানে না এরা সত্য বাক্য,
ব্যবসা দেওয়া মিথ্যা সাক্ষ্য,
চোর গিরস্থ দু'জনারি পক্ষ
উভচর সব কর্কট!
এরা, শিকড়ে শিকড়ে বাঁশ বাঁধা,
সকল কলার এক ছড়া—কাঁধা,
এদের,অসাধ্য নাই,—স্বার্থে আঁধা,
আকাশে 'ব' নামায় বট,
কুক্ষণে হেথা আসিয়াছি,
এখন,পলাতে পালে' প্রাণে বাঁচি,
এরা, পশুর চেয়ে অধম পশু
আত্মগুপ্ত কূর্ম্ম কমঠ!
আমি মলে,তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!

৬

কথার বন্ধু অনেক আছে,
অথায় তুলে দিবে গাছে,
বিপদ কালে পাইনা কাছে
কেমন স্নেহ অকপট,
অভাব দুঃখ শুন্‌লে পরে,
পাছে কিছু চাইব ডরে,
স্বভাব দোষে স'রে পড়ে
চোরের মত দেয় চম্পট!

কত বন্ধু দেশের নেতা,
মুখবন্ধ স্বাধীন চেতা,
কাযের বেলায় আরেক কেতা
হৃদয় ভরা ঘোর কপট,
লেখক মেরে অনাহারে,
লুঠবে টাকা উপহারে,
সাহিত্যের সে কসাই বন্ধু
বিষম ধূর্ত্ত, বিষম শঠ!
আমি মলে, তোম্‌রা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী!

৭

যা হোক্, আমি শত ধন্য,
কৃতজ্ঞ কৃতার্থম্মন্য
তোমাদের এ স্নেহের জন্য
আজ্ তোমাদের সন্নিকট,
চিতায় মঠ বা দিবে কেহ,
গড়্‌বে উঁচু অর্দ্ধ-দেহ,
ছায়া-চিত্র রাখ্‌বে কেহ
কেউ বা তৈল চিত্রপট!
কর্‌বে তোম্‌রা শোক-সভা,
চক্ষে চস্‌মা শ্বেত জবা,
ওষ্ঠে চুরট ধূমপ্রভা,
করতালি চট্ চট্,
স্বর্গ কিম্বা নরক হতে,
আস্‌ব তখন আকাশ পথে,
দেখ্‌তে আমার শোক সভা
সঙ্গে নিয়ে অলকট্!
সত্যই কি লজ্জা শরম
বাঙ্গালীরে করেছে বয়কট্?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

জিজ্ঞাসার উত্তর।

বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় মহাশয় "একটী জিজ্ঞাসা" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যথাসাধ্য সদুত্তর প্রদান করিবার জন্য এই প্রবন্ধটী 'নব্যভারতে' প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। অতুল বাবু এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়া বড় ভাল করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, আমাকে মিডিয়ম করিয়া মহাত্মারা যাহা লিখিতেছেন, এবং যাহা নব্যভারতে প্রকাশিত হইতেছে, কেহ তাহার প্রতিবাদ করেন। প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে, অথবা যে প্রণালীতে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, উভয় সম্বন্ধেই প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিতেছিলাম। ভাগ্যক্রমে অতুল বাবু সেই প্রতিবাদ করিয়া আমার আশা পূর্ণ করিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

অতুল বাবু প্রথমেই বলিতেছেন যে, নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইল। আমি তাঁহার ঠিক ভাষা উদ্ধৃত করিলাম না; তাঁহার বাক্যের ভাব লইয়াই লিখিলাম। এরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব হৃদয়ে উদয় হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম, এদেশে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রেততত্ত্ব লইয়া আলোচনা চলিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু আবার বহুকাল হইতে উহা রহিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল, এই বিষয় লইয়া স্থানে স্থানে আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে অনেকে প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন

কিন্তু কি কারণে জানিনা, সে আলোচনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অতুল বাবু এ বিষয়ের কথা নব্যভারতের স্তম্ভে দেখিয়া যে অনির্ব্বচনীয় ভাবাপন্ন হইবেন, আশ্চর্য্য কি? যে বিষয় সম্বন্ধে কিছু নূতনত্ব থাকে, তাহাতেই লোক চমৎকৃত হয়, ও অনির্ব্বচনীয় ভাব অনুভব করে। তিনি এ সম্বন্ধে আলোক চাহিয়াছেন। আলোক দিতে পারিব কিনা, জানি না। তবে এই বিশ্বাস করি যে, তিনি যখন সরল ও সত্যপ্রার্থী, তখন নিশ্চয়ই আলোক পাইবেন।

অতুল বাবু দ্বিতীয় প্যারায় আমার প্রশংসা করিয়াছেন। আমি সে প্রশংসার যোগ্য না হইলেও, তিনি যখন প্রশংসা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিতেছি যে, প্রশংসা না করিয়া আমি যে সত্যটী প্রচার করিবার চেষ্টা করিযাছি, তাহা বুঝিতে যত্ন করিলে, অধিক আনন্দিত হইতাম। যাহা হউক, তিনি যখন প্রকাশ্য পত্রিকায় আমাকেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহার সদুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে কথা এই যে, অতুল বাবু বলিতেছেন যে, নগেন্দ্র বাবু যে আত্মার কথা বলিতেছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের গৃহীত মত হইতে এতই ভিন্ন যে, তাহা তলাইয়া বুঝিতে প্রত্যেক ব্রাহ্মের চেষ্টা করা উচিত। আমি কি এমন লিখিয়াছি, যাহা ব্রাহ্মসমাজের আত্মা সম্বন্ধীয় মত হইতে অতিশয় ভিন্ন? আত্মা সম্বন্ধে কি ব্রাহ্মসমাজের একটা বিধিবদ্ধ মত আছে? ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সূত্র চারিটী। সেই চারিটীতে আত্মা কেমন, কিরূপ স্বরূপ লক্ষণবিশিষ্ট, তাহার কোন কথাই নাই। মহর্ষির যে ব্যাখ্যান পুস্তক আছে, তাহাতেতো আত্মার স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে কোন কথা দেখিতে পাই না। এতদ্ভিন্ন আর যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কোন গ্রন্থেই তো আত্মার স্বরূপলক্ষণ পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলা হয় নাই। তবে কেমন করিয়া অতুল বাবু বলিলেন যে, নগেন্দ্র বাবুর আত্মা সম্বন্ধীয় মত ব্রাহ্মসমাজের মত হইতে বহু গুণে ভিন্ন? আত্মা কি? আত্মার স্বরূপলক্ষণ কি? এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের যে কোন নির্দ্দিষ্ট মত আছে, এমন আমি জানি না। তবে এই এক কথা অতুল বাবু বলিতে পারেন যে, নগেন্দ্র বাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, আত্মা নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। চৈত্রমাসের প্রবন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে ইহার বিরুদ্ধ কথা কিছু বলা হইয়াছে কি? আমি তো তাহা জানি না।

অতুল বাবু বলিতে পারেন, নগেন্দ্র বাবুর আত্মারা যখন কথা কহেন, যখন তাঁহাদিগকে দেখা যায়, তখন তাঁহারা কেমন করিয়া নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ হইতে পারেন? একথার উত্তরে বলি, অতুল বাবু আপনাকে আপনি একটী আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন কিনা? যদি করেন, তবে প্রশ্ন এই যে, তাঁহাকে দেখা যায় কি না, ও তাঁহার কথা শুনা যায় কি না? যদি যায়, তাঁহাকে দেখা যায়, ও তাঁহার কথা শুনা যায়, তবে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ আত্মাদের কথা শুনা যাইবে না কেন? এবং তাঁহাদের দেখাইবা যাইবেনা কেন?

এস্থলে অতুল বাবু বলিবেন, আমার যে একটা দেহ আছে, সেই দেহ দ্বারা আমি কথা কই, এবং সেই দেহ আছে বলিয়া আমাকে দেখা যায়। কিন্তু পরলোকবাসী আত্মাদের কি দেহ আছে? তাঁহারা যখন

পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তাঁহাদের অবশ্য দেহ ছিল। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাদিগকে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলা ভিন্ন উপায় কি? এবং সেই নিরাকার অবস্থায় তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া দেখা যাইবে, এবং তাহাদের কথাই বা কেমন করিয়া শুনা যাইবে? এ সকল কথা অতুল বাবু বলিতে পারেন।

এখন কথা এই যে, এসকল কথার উত্তর কি? উত্তর এই যে, মৃত্যুর পরেও তাঁহাদের দেহ থাকে। আমাদের শাস্ত্র, বৌদ্ধ শাস্ত্র, এমন কি খ্রীষ্টীয়ান শাস্ত্র পর্যান্ত পরলোকবাসীর দেহ স্বীকার করেন। সে দেহে এদেহের সকল অঙ্গ নাই বটে, কিন্তু পরলোকবাসীর যে দেহ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেন্টপল স্বয়ং spiritual body স্বীকার করিয়াছেন। অতুল বাবু অবশ্য বাইবেল পড়িয়াছেন, না পড়িয়া থাকেন, পড়িয়া দেখিবেন, তাহাতে spiritual bodyর কথা আছে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম দেহের কথা আছে, ইহা সকলেই জানেন।

এখন অতুল বাবু বলিতে পারেন যে, পৃথিবীবাসী মানুষ যে, সে দেহ দেখিতে পায়, এবং তাহা দ্বারা যে কথা কওয়া হয়, তাহা শুনিতে পায়, ইহার প্রমাণ কি? ইহার অনেক প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ শাস্ত্র। কোন্ শাস্ত্রে না আছে যে, মানুষ পরলোকবাসীর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছে? বেদাদি শাস্ত্র ইহার প্রমাণে পূর্ণ।

রামায়ণে স্পষ্ট আছে, রামচন্দ্র যখন স্বর্গীয় পিতাকে পিণ্ডদান করেন, তখন দশরথ পিণ্ড গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন। উপনিষদে আছে, একজন মহর্ষি পরলোকবাসীদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন। মহাভারতে আছে যে, কুরুক্ষেত্র মহা যুদ্ধের পর, কুলস্ত্রীগণ মৃত স্বামী পুত্রদের জন্য শোকার্ত্ত হইলে, বেদব্যাস আপনার যোগবলে তাহাদিগকে আনাইয়া দেখাইলেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও ঐরূপ আছে। এবিষয়ে অধিক প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি না।

এস্থলে অতুল বাবু বলিতে পারেন যে, নগেন্দ্র বাবু এতদিন পরে কি আবার শাস্ত্র মানিতে আরম্ভ করিলেন? শাস্ত্রের অভ্রান্ততার বিরুদ্ধে এত বক্তৃতা করিয়া আবার শাস্ত্রের প্রমাণ কেন? একথার উত্তরে বলি যে, শাস্ত্রকে যদিও সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলি না, তথাচ শাস্ত্রকে মান্য করি। শাস্ত্র বাস্তবিক কি? মানবজাতির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, শাস্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং তাহা মান্য করি। তবে মনুষ্য কখনই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে। সুতরাং শাস্ত্রকে ভ্রান্তিশূন্য বলি না; অথচ অত্যন্ত সম্মান করি।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, এসকল প্রাচীন কাহিনী, বিশ্বাসযোগ্য নহে। একথা বলা কি যুক্তিযুক্ত? বর্ত্তমান সময়েও যখন তৎসদৃশ ঘটনা হইতেছে, তখন কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন?

প্রেততত্ত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে মার্কিন দেশে যে সকল ঘটনা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার বিষয় অবগত হইলে, কেহ আর বলিতে পারেন না যে, ইহা একটী অসম্ভব ব্যাপার। মার্কিন দেশে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ বিবরণ এস্থলে দেওয়া যাইতে পারে না। কেবল তৎসম্বন্ধে একটী কথা বলি যে, মার্কিন দেশে যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত অধ্য-

য়ন করিলে যথার্থই আশ্চর্য্য হইতে হয়। উক্ত দেশের উচ্চতম মিডিয়ম আণ্ড জ্যাক্‌স্যান ডেবিস যেরূপ অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত জানিলে যথার্থই চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি কখনও রীতিমত লেখাপড়া শিখেন নাই, অথচ সকল বিজ্ঞানে তিনি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা গভীর জ্ঞান পূর্ণ। তাঁহার লিখিত Great Harmonia নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। মার্কিন দেশে প্রেততত্ত্ব কিরূপ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, উক্তদেশ হইতে উক্ত বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, তাহার বিবরণ অনেক জানা যায়।

ইয়োরোপে আজকাল প্রেততত্ত্ব বিষয়ে অনেক চর্চ্চা হইতেছে। Psychical Research Society দ্বারা এবিষয়ে যে অনুসন্ধান হইতেছে, তাহাও শিক্ষিত লোকের জানিবার যোগ্য। ক্রুক্‌স্ এবং ওয়ালেস এ সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রুক্‌স্ সাহেবের গ্রন্থে তিনি এতদূর স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে যে ঘটনা সকলের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সেই-সকল ঘটনায় এমন এক জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে যে, যে গৃহে সেই সকল বিষয়ের পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে যে সকল জীবিত মনুষ্য ছিলেন, সে জ্ঞান তাহাদের কাহারও নহে। এই ক্রুক্‌স্ সাহেব বিলাতের মধ্যে একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক, Chemical News পত্রিকার সম্পাদক। ইনি অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা। তারপর ওয়ালেস। ইনি ডারউয়িনের সমকক্ষ ব্যক্তি। বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে ইঁহার অনেক গবেষণা। ডারউয়িন এবং ইনি উভয়েই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। যদিও ডারউয়িন শেষে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ওয়ালেসও এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেন, এবং অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ওয়ালেস বিশেষভাবে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) বিষয়ে অনুসন্ধান করেন ও তদ্বিষয়ে গ্রন্থ লেখেন। ইনি প্রেততত্ত্ব বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাহাতে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম, Miracles and Modern spiritualism. আমি এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। তাহাতে তিনি এতদূর স্বীকার করিয়াছেন যে, আত্মাদের photo পর্য্যন্ত হইতে পারে ও সেরূপ হইতে দেখিয়াছেন। ওয়ালেস ও ক্রুক্‌স, উভয়ের পুস্তকই আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

Psychical Research Society এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করিতেছেন, তদ্বিষয়ে অন্ততঃ পনর খানি রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। সেই সকল পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রেততত্ত্ব অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছেন না। অনেকেরই উহাতে বিশ্বাস হইতেছে। অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক এই সভায় যোগ দিয়া প্রেততত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছেন, এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাসী হইয়াছেন।

ইহা ভিন্ন মাইয়ার্স সাহেবের লিখিত Survival of Human personlity নামক গ্রন্থ শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকে পাঠ করিতেছেন। একজন শিক্ষিত বন্ধু বলিলেন যে, উহা একখানি Epoch-making book.

অতুল বাবু বলিয়াছেন যে, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আত্মা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ; অথচ বর্ত্তমান সময়ে তিনি সাকার আত্মায় বিশ্বাস করিতেছেন। বাস্তবিক আমি সাকার আত্মায় বিশ্বাস করি না। আমি এই বিশ্বাস করি যে, আত্মা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হইলেও, তাহা কোন দেহে সংযুক্ত থাকিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রের মতে শরীর তিন প্রকার, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এই তিন প্রকার শরীরের তিন প্রকার বিবরণ আছে। প্রথম স্থূল দেহ যে কি, আমরা সকলেই জানি। সে বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তারপর, সূক্ষ্মদেহ। এই সূক্ষ্মদেহই পরলোকবাসীদের দেহ। তারপর, কারণ দেহ। যাঁহারা সপ্তম লোকের উপরে উচ্চতর লোকে চলিয়া যান, তাঁহাদেরই কারণদেহ। সে দেহ সপ্তম লোকবাসীরাও দেখিতে পান না। এই তিন প্রকার দেহের বৃত্তান্ত। অতুল বাবুর নিকট সূক্ষ্মদেহ সাপ কি ব্যাঙ কিছু বোধ হইতে না পারে, কিন্তু উহা যে বাস্তব পদার্থ, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। আত্মার দেহ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম, তাহা বলিতাম না, যদি না অতুল বাবু উহা নিতান্ত একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন। আত্মারা যে কথা বলেন, তাঁহাদের যে দেখা যায়, সমস্তই ঐ দেহ আছে বলিয়া। আত্মা, অবশ্য নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ; কিন্তু উহা যে একটী দেহের সহিত সংযুক্ত, তাহা নিশ্চয় সত্য। সে দেহ দেখা যায়, সে দেহ হইতে যে শব্দ নিঃসৃত হয়, তাহাও শুনা যায়। অতুল বাবু বলিতে পারেন, তবে সকলে তাহা দেখিতে পায় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই তাহা দেখিতে পান। সকলের কি সকল শক্তি থাকে? অনেক লোকের এমন অলৌকিক শক্তি থাকে, যাহা সাধারণের থাকে না। ইহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তদ্বিষয়ে আপাততঃ নিরস্ত হইতেছি। কোন পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সে বিষয় লিখিবার ইচ্ছা রহিল। অতুল বাবু বলিতেছেন যে, যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় বলিয়াছেন যে, আত্মা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই আবার এখন বলিতেছেন যে, আত্মাকে দেখা যায়, আত্মা কথাও কয়, তখন এই দুই বিপরীত কথার সামঞ্জস্য কেমন করিয়া স্বীকার করি? এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

অতুল বাবু আরও বলিয়াছেন, যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় বলিয়াছেন, পরকাল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; তিনিই আবার কি করিয়া বলেন যে, আত্মাকে দেখা যায়, তাহার কথা শুনা যায়? একথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

অতুল বাবুর কথার উত্তর এই যে, একথা নিশ্চয়ই আমি বলিয়াছি যে, পরকাল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। কিন্তু আত্মাদিগকে যে দেখা যায়, তাহা কি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ? এস্থলে স্পষ্ট করিয়া বলি যে, আমি যে আত্মা দেখিয়াছি, তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের দ্বারা দেখি নাই। অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষের দ্বারা দেখি নাই। যাহাকে ইংরাজীতে clairvoyance বলে, বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে যাহাকে দিব্যচক্ষু বলে, তাহা দ্বারাই দেখিয়াছি। চক্ষু দুই প্রকার, চর্ম্মচক্ষু ও দিব্যচক্ষু। আমি যে আত্মাদের দেখি, তাহা নিশ্চয়ই দিব্য চক্ষু দ্বারা। যেমন আমার clairvoyance কিছু আছে, সেইরূপ আমার clairaudience আছে। বাঙ্গালা ভাষায় বলিতে হইলে,

একটীকে দিব্যচক্ষু, আর একটীকে দিব্যকর্ণ বলা যাইতে পারে। অতুল বাবুর প্রেততত্ত্ব বিষয়ে এতদূর অনভিজ্ঞতা যে, কথা কহিবার মিডিয়ম, লিখিবার মিডিয়ম, শুনিবার মিডিয়ম প্রভৃতি মিডিয়ম যে অনেক প্রকার আছে, ইহাও তিনি জানেন না।

তারপর অতুল বাবু বলিতেছেন যে, নগেন্দ্র বাবুর ধর্ম্মজিজ্ঞাসার লেখা ও বঙ্কিম বাবুর লেখা, এ দুইয়ের সঙ্গে বর্ত্তমান প্রবন্ধের তুলনা করিলে, নগেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বের লেখার সঙ্গেই অধিক মিলে। একথার উত্তরে বলি, ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য যে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে যথেষ্ট থাকে, তাহা কে না জানে? সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই একথা স্বীকার করিবেন। সুতরাং এবিষয়ে অধিক বলা বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র। তারপর বলি, অনেকেই বলেন যে, চৈত্র মাসের 'আত্মতত্ত্ব' বিষয়ক প্রবন্ধের রচনা-প্রণালীর সহিত বঙ্কিম বাবুর রচনা প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

তারপর অতুল বাবু বলিতেছেন যে, Psychical Research Society পঁচিশ বৎসর চেষ্টা করিয়া যেরূপ মিডিয়ম পাইলেন না, নগেন্দ্র বাবু বিনা চেষ্টায় সেরূপ একজন মিডিয়ম হইলেন। তাঁহার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমা দ্বারা যখন আত্মারা লেখান, তখন আমার জ্ঞান থাকে, কিন্তু Research Societyর মিডিয়মগণ অজ্ঞান হইয়া যান। অতুল বাবুর প্রেততত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহার কোন বন্ধু যদি একথা তাঁহার প্রবন্ধে দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেন।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এই সামান্য কথাটা অতুল বাবু জানেন না যে, মিডিয়ম দুই প্রকার। এক প্রকার মিডিয়ম অজ্ঞান হইয়া যান, আর এক প্রকারের জ্ঞান থাকে। যাঁহাদের জ্ঞান থাকে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর। আমেরিকার ডেভিস সাহেবের পরিষ্কার জ্ঞান থাকে। তিনিই জগতের মিডিয়মদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।

তাহার পর এই বলি যে, যে সকল আত্মা আমা দ্বারা এদেশে প্রেততত্ত্ব প্রচারের এবং সাধারণতঃ সত্য প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, অতুল বাবুর মত লোক প্রেততত্ত্বের সত্য পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারেন। যে কোন ব্যক্তি সরল ভাবে এবিষয়ের অনুসন্ধান করিলে, নিশ্চয়ই ইহার সত্য জানিতে পারিবেন। অধিক আর কি বলিব? প্রেততত্ত্বে আমি কেন বিশ্বাস করি, এবং আপনাকে মিডিয়ম বলিয়াই বা কেন বিশ্বাস করি, তদ্বিষয়ে ভবিষ্যতে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

মেঘ-গীতা।*

সারাদিন হেরিতেছি মেঘ-আচরণ
প্রশান্ত আকাশে—
কেহ মরালের মত আলোক-সাগরে
লীলারঙ্গে ভাসে!

* এই কবিতা লেখককের অপ্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ নিসর্গ সুন্দরী হইতে গৃহীত।

কেহ বহে মন্দ মন্দ—অতি সুকোমল
আকাশের সুখস্বপ্ন প্রায়,
প্রতি অণু মহিমায় ওতপ্রোত যার—
দেবতার মহিমা আভায়।
কেহ স্থির; কেহ চলে, দেখিতে দেখিতে
কেহ যায় মজিয়া সমীরে;
কেহ পলকের তরে দৃষ্টিসীমে আসি
মিলে পুনঃ ব্যোমের গভীরে!

আকাশের মধুজীবী প্রজাপতি দল
কিরণের কুসুম অতিথি—
বিন্দু ও সিন্ধুর মাঝে জীবযাত্রা পথে
চিরকাল যাদের বসতি,
নানাবর্ণ পক্ষ তুলি আহুতি-বিহীন
স্থির সুখে চলে,
পথে পথে পলসেব্য পান্থশালা যার
নদ নদী সাগরে ও শৈলে।

ঊষার উৎসাহ রাগে, সুবর্ণা সন্ধ্যার
অঞ্চলেতে করিয়া শয়ন,
সেবা করে তাহাদেরে সুদীর্ঘ কুন্তলা,
প্রীতিমুখী দিগঙ্গনাগণ;
সবিতা উদয় অস্তে সিন্দূর উজ্জ্বল
চুম্ব রাগে তাহাদের ভালে;
বায়ুগণ স্নেহ ভরে লালনে পোষণে
রাখে সদা হৃদয়ে ও কোলে!

পৃথিবীর স্বর্গে ক্ষিপ্ত ভাবনা মধুর—
পৃথিবীর জীবন যৌবন!
ফুলের আনন্দ স্বপ্ন, নিখিল বিশ্বের
সুষমা ও শোভার কারণ!
বরে যাহে গুণভুগ্ন প্রতিভা সুন্দরী
সৌদামিনী আকাশের বালা!
সঙ্কেতে ঈঙ্গিতে ধ্বনি গুণে সুমধুর
স্বর্গমুখী কবিতার ডালা!

জীবনে মরণে জীবী শত রূপধর
নিত্য নব কবি!
দেবতার পদরজে সম্ভূত সুন্দর
হৃদয়ের ছবি!
তাই কভু আবেগের ঘোর ঘনঘটা,
কভু উচ্চ হাসি!
অন্তর্গূঢ় ঈঙ্গিতের তড়িদ্দাম ছটা,
কভু অশ্রুরাশি!
উদ্বেলিত আনন্দের অশ্রুর প্রপাতে
ভরি' দিয়ে ভুবন-হৃদয়,
কভু আত্মহারা! কভু স্থির ব্যোমপথে
ধ্যান-লীন শান্তি মনোময়!

হের' আজি এ মধ্যাহ্নে—ভেদি নীলাকাশ,
জ্যোতির্লীলা এসেছে নামিয়া!
নীলাকাশে মেঘমালা কিরণ সিন্ধুর
ননী সম গিয়াছে জমিয়া!
পূর্ণ প্রেম-ভরে স্থির নিস্তরঙ্গ আজি
হৃদয়ের ক্ষীরোদ সাগর!
জমিয়াছে ননী সম তাহে ভাবরাজি
তুলে না লহর।

ভাব অন্তরালে বসি' কেবা সেই কবি
দিয়াছেন বীণায় উচ্ছ্বাস!
যে ধ্বনি অনন্তময় দ্যুলোকে ভূলোকে
রূপে হয়ে হয় সুপ্রকাশ!
এই সৃষ্টি মেঘপুরী, দেশকাল ভূমে
বিন্দু ও সিন্ধুর মধ্যদেশে,
ক্ষণজীবী প্রপঞ্চের বিপুল প্রস্ফোট সম
যাহাতে প্রকাশে।
পলকে সে'রূপ পুনঃ পশিছে ফিরিয়া
সুর হয়ে যাহার শ্রবণে!
এ আমার মেঘ-গীতা—ভাষাহারা ব্যথা
স্তুতি হোক তাঁহারি চরণে!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, বি-এল।

আমার হৃদয়-রাণী।

১

সারা জীবন যাহার তরে,
বিকিয়ে দিলাম মাটীর দরে,
হীরার মূল্য অসামান্য কচিৎ-হাস্য যার,
কেশের গুচ্ছ ময়ূরপুচ্ছ জীবন মৃত্যু সার,
নয়নটী যার পদ্মপলাশ প্রাণের কারাগার,
রুদ্ধ জীবন পেল না মন এতই অহঙ্কার।
যাহার তরে শরীর মাটী,
ভ্রষ্ট মোক্ষ-পরকালটী,

সে যে আমার তপ্ত তরল সরল শুভ্র রাণী,
সে যে আমার কঠোর কোমল মোহমুগ্ধ বাণী।

২

সঙ্কেতে যার তন্দ্রা আনে ঘুমিয়ে পড়ি বুকে,
কমল হাতে মুলয় পাখা ইচ্ছা মরণ সুখে,
রক্তপদ্ম নিন্দি চরণ তারণকর্ত্তা মোর,
লুপ্ত সুপ্ত চিত্ত আমার হয়ে আছে ভোর ;
একটী হাসি দেখব বলে,
প্রাণটী গেল জ্বলে জ্বলে,
কে সে শুভ্র কোমল বালা বীণার তারের প্রায়,
আপন মনে আপনি বাজে,বল্‌লে থেমে যায়।

৩

আকাশ জুড়ে কৃষ্ণ ঘন মেঘ করেছে কালো,
কোলেতে তার নধর শিশু হাস্‌ছে কিন্তু ভালো,
পড়ছে বারি অবসাদে,
দুঃখ দেখে জগৎ কাঁদে,
ভরা বাদল বিষাদ ঘেরা আঁধার ঘোরা নিশি,
হতাশ জীবন কোথা কোমল চারু হাস্যরাশি—
কোথায় আমার চপলবালা,
নিবিড় রাজ্য হায় একেলা,
নিজের গর্ব্বে রুদ্ধ কক্ষে তন্দ্রা বক্ষে লীন,
শুষ্ক-কণ্ঠ ভক্ত ক্ষুণ্ণ প্রাণে প্রাণহীন।

৪

কঠোর কপট চতুর নারী হিংসা গর্ব্বে পোরা,
নয়নে তার প্রেমের জ্যোতিঃ হৃদয় বিষে ভরা,
বক্ষ হস্ত চরণ বরণ সবই বিলাসভরা,
ভাদ্র মাসের ভরা নদী দারুণ স্রোতের ধারা।
গরল পোরা গরবিনী তীব্র বিষের মালা,
ফুল্ল জীবন সদ্য শুকায় মলেও থাকে জ্বালা।

৫

সারা জীবন যাহার তরে,
বিকিয়ে দিলাম মাটীর দরে,
শান্ত স্নিগ্ধ শারদ শশী কোমল প্রসূন নিভা,
বিমল আস্য কোমল স্পর্শ শীতল হাস্য বিভা,
শান্ত চক্ষে শান্ত দৃষ্টি হৃদয় প্রেমের ধারা,
জগৎ তুষ্ট সবাই হৃষ্ট জগন্ময়ী তারা!
ক্ষুব্ধ জীবন স্নিগ্ধ স্নাত পুণ্যপূত বাণী,
সে যে আমার প্রাণের শান্তি আমার হৃদয়রাণী।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ,বি-এল।

ভিক্ষা।

বেলা দ্বিপ্রহর। রৌদ্র-দীপ্ত পথ পাশে,
স্বেদ-সিক্ত কলেবর,
পরিহিত চীরাম্বর,
মলিন ভিক্ষুক এক বিশ্রামের আশে,
বৃক্ষচ্ছায়ে তৃণাসনে,
বসিল হতাশ মনে ;—
জীর্ণ শীর্ণ তনু খানি ক্লান্ত উপবাসে।

গৃহে তার বৃদ্ধা মাতা ; আর শিশু দুটি,—
হায়, তা'রা মাতৃহীন,
উপবাসী দুই দিন!
আজি মিলিয়াছে শুধু অন্ন এক মুঠি।
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কর,
জ্বালাময় খরতর,
যেন কোন দানবের করাল ভ্রূকুটি!

দীপ্তিহীন আঁখি তারা তুলিয়া আকাশে,
উদাস ব্যথিত স্বরে,
ক্ষুব্ধ আবেগের ভরে,
ডাকিলা 'হে ভগবান'! কম্পিত নিঃশ্বাসে।
দূরে অই সৌধমালা
বিলাসের নাট্যশালা—
ঐশ্বর্য্যের মদ-গর্ব্বে সৌরকরে হাসে!

হেন কালে দীন এক তাহারি মতন,
ধনীদের গৃহ হতে,
বিতাড়িত হয়ে পথে,
দাঁড়াইল উর্দ্ধে তুলি বিষণ্ণ নয়ন!
হেরি এর ম্লান মুখ
উদ্বেলিত হ'ল বুক।
দুঃখীর প্রাণের ব্যথা বোঝে দুঃখী জন!

বৃক্ষতল ত্যজি ধীরে উঠিলা তখন ;
নিজ ভাণ্ড শূন্য করি,
দিল তা'র পাত্র ভরি,
এতক্ষণ কারো মুখে নাহিক বচন।
তারপর, একি হায়—
এ উহার পানে চায়,
দোহে দোহা গলা ধরি করিছে ক্রন্দন!

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সন্ধান।

তোমারে খুজিয়া সারা নিখিল ভুবন।
বাঞ্ছিত সুন্দর মোর হৃদয় দেবতা!
চিরদিন তুমি কি গো রহিবে গোপন?
অতীত শুনাবে কাণে তোমার বারতা।
কোন্ থানে তুমি মোর আছ লুকাইয়া,
কোন বন্যবীথিতলে পেতেছ আসন।
কোথা হতে আসে গান সমীরে ভাসিয়া,
তোমার মহিমা ছটা উজলে ভুবন।
কখন জাগিয়া উঠ নীলিমার তলে,
হাসি হয়ে ভাস কভু ফুলের আননে,
তোমারি বন্দনা গায় নন্দী কল্ কলে,
তোমার অমিয় গাথা বিহগ কূজনে।
তোমারে ধরিতে গিয়ে হারাই আপনা,
তোমারে আড়াল করি ফিরি দূরে দূরে,
কে তুমি কোথায় আছ, হে মোর সাধনা!
তুমি কি গো নাহি মোর হৃদি অন্তঃপুরে?
বৃথা ঘুরি দিন মোর হল অবসান।
আমাতে রয়েছে দেব! তোমার সন্ধান।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেন।

কে তুমি আকুল কর প্রাণ?

১

কে তুমি আকুল কর প্রাণ?
ভাবিতে তোমারি কথা,
ভুলে যাই শোক ব্যথা,
দুঃখ অন্ধকার নিশি যেন অবসান;
আছি আমি কেন আছি,
ভুলে যাই কোথা আছি,
ভুলে যাই কালাকাল উন্মত্ত সমান।
কে তুমি আকুল কর প্রাণ?

২

কে তুমি আকুল কর প্রাণ?
তোমারি পবিত্র হাসি,
বিকাশে কুসুম রাশি,
গাইছে বিহগকুল মহিমার গান;
নীলাকাশে শশী রবি,
প্রকাশে তোমারি ছবি,
তটিনী গাহিছে সদা তুলি কুলু তান,
কে তুমি আকুল কর প্রাণ?

কে তুমি আকুল কর প্রাণ?
সম্মুখে অনন্ত বিশ্বে,
নিতি নব নব দৃশ্যে,
ফুটিয়া উঠিয়া ক্ষণে অমনি মিলাও,
আশায় উৎফুল্ল প্রাণ,
মুহূর্ত্তেই ম্রিয়মাণ,
কে তুমি গো কাছে এসে দূরে সরে যাও?
কে তুমি আকুল কর প্রাণ?

৪

কে তুমি আকুল কর প্রাণ?
দূরে যায় শত দুঃখ,
দূরে যায় তৃপ্তি সুখ,
তোমার চিন্তায় যবে মগন পরাণ;
ভাবি হৃদে বুঝি পাই,
খুঁজে দেখি সেথা নাই,
কোন আবরণ মাঝে রবে ব্যবধান?
কে তুমি আকুল কর প্রাণ?

৫

কে তুমি আকুল কর প্রাণ?
কত নিশি কত দিন,
আনন্দ আরামহীন,
তোমারি দরশ তরে খুলিয়া নয়ান,
স্তব্ধ ঘন তমসায়
পুলকমাখা জ্যোছনায়
বাসনা-কর্ম্ম-ঝঞ্ঝা মাঝে খুঁজিছে পরশ প্রাণ।

৬

কই কই প্রাণসখা
তুমিত দিলেনা দেখা,
বিরহে জীবণ মোর হবে অবসান?
তোমা বিনা প্রিয় প্রেম,
অতি তুচ্ছ মণি হেম,
কৃপা করি দাও দেখা হে প্রাণের প্রাণ,
ও প্রেম বয়ানে তব
নির্নিমিষে চেয়ে রব,
জীবনের শেষ হবে মরণের অবসান।

শ্রীনগেন্দ্রবালা রায়।

অতীতের স্মৃতি।

সেই কবে কোন দিন, বয়ে গেছে যেন
কত কাল কত যুগ হায়!

এমনি ফুটিয়াছিল মলিন চন্দ্রমা,
মেঘে ঢাকা আকাশের গায়।
ধৌত শ্যাম শোভা লয়ে বিস্তৃত বনানী,
নন্দনের সৌন্দর্য্য লুটিয়া,
তরুলতা আপনার পরিপূর্ণতায়
প্রথম সে উঠিল ফুটিয়া।
থেকে থেকে ছুটে আছে উতলা পবন,
পাগল শিশু সে ধরণীর।
কাঁপাইয়া ফুল্লবন খেলা ছলে যেন
ঝর ঝর ঝরাইয়া নীর।
অমনি চমকি' যেন দু'চারিটী ধারা,
কেঁপে কেঁপে পড়েছিল ঝরে,
কুসুমের পল্লবের যতটুকু ঠাঁই
সযতনে দিতেছিল ভরে।
কূলে কূলে ভরেছিল সেদিনো যমুনা,
সেজেছিল গৈরিক বসনা,
উচ্ছ্বাসি উঠিতেছিল পরিপূর্ণতায়
ফেনদাম বঞ্চিত ভূষণা।
সহসা জাগিয়া যেন সবটুকু শোভা
বহে আনি' অর্ঘ্য ডালা ভরে,
শিহরিয়া ফুটেছিল সে নীপ কানন,
কার যেন অভ্যর্থনা তরে।
সেই সুমঙ্গল ক্ষণে কোথা হতে যেন
স্তব্ধ করি প্রকৃতির হাসি,
প্লাবিয়া সমগ্রধরা আকুল আহ্বানে
কেবা সেই বাজাইল বাঁশী।
ত্যজি গেহ, স্নেহ, মায়া, কুল, মান, ধন
এসেছিল ছুটে নরনারী,
দীন বেশে শত শত তৃষ্ণাতুর প্রাণ
নেত্রপুটে ভরি অশ্রুবারি।

* * * * *

যুগান্তর পরে আজো তেমনি যামিনী
আজো আছে সেই বৃন্দাবন।
মর্ম্মে মর্ম্মে ফুটে' উঠি' সেজে আছে আজো
প্রফুল্ল সে কদম্ব-কানন।
বর্ষাসিক্ত সমীরণ আজিও তেমনি
অশান্ত সে পাগলের পারা,
আজিও যমুনা সেই, সেই থেকে থেকে
চমকিত বাদলের ধারা।
নাই সে তপস্যা আর একাগ্র সাধনা,
কোথা আর সে উদ্বেল প্রেম,
পরশমণির মত, বারেক পরশে
পাষাণো নিমেষ হতো হেম?
কোন্ পাপে কার শাপে রয়েছি কেবলি,
অচেতন জড় পিণ্ড রাশি;
সকলি অশুচি শব, নাই প্রাণ; তাই
বৃন্দাবনে বাজে সেই বাঁশী।

শ্রীচারুহাসিনী দেবী।

তোমার ডাক।

১

মাঝে মাঝে দেব, মনে হয় ওগো
মোর খোঁজ তুমি রাখহে।
নানা কোলাহলে ডুবে যায় তবু
মনে হয় তুমি ডাক' হে।
সংসার ডাকে শুনে ছুটে যাই,
আশাছলে ডাকে, শুনিবারে পাই,
প্রলোভন ডাকে বাঁশরীর তানে,
হৃদি করে' উঠে টলমল।
প্রকৃতি ডাকিছে স্নেহ-আলাপনে,
বাসনা ডাকছে ডঙ্কা বাদনে,
মিছে কাজ ডাকে ভেরী গরজনে,
পশে কাণে সেই কোলাহল।
নানা ঝঞ্ঝনা ডাকের ব্যঞ্জনা
প্রাণ শুধু কেড়ে নিতে চায়।
তুমি কোথা ডাক বীণার তন্ত্রে,
ডুবে যায় তাহে ডুবে যায়।

২

খোঁজ লও যদি ওগো দয়াময়,
চোখে চোখে তবে রাখহে।
কর্ণ পটহ দীর্ণ করিয়া
নাম ধরে' মোরে ডাকহে।
সব ডাক যেন ঠেলিয়া ফেলিয়া,
তব ডাক মোরে দেয় চমকিয়া,
তব ডাক রূঢ়, নিষ্ঠুর দৃঢ়
কাঁপায় পরাণে থর থর।
আন'হে ভ্রূকুটি নয়ন অরুণ,
পরুষকণ্ঠ, বেদনা দারুণ,
বজ্রনিনাদে করহে ঘোষণা
তোমারি বারতা খরতর।

হেলা ক'রে গেছি তব দেবভাষা,
বুঝি নাই আমি চিনি নাই।
দেগে দাও বুকে অনল আঁখরে,
বলিনাক যেন শুনি নাই॥
শ্রীকালিদাস রায়।

সূর্য্যোদয়।

এক দিন অস্তাচলে পশ্চিম গগনে
কবে কোন শতাব্দীর আগে,
হেরি যে করুণ ছবি, মুদেছিলে আঁখি রবি,
সহস্র কিরণদল সম্বরি সঘনে
সন্ধ্যাময় আরক্তিম রাগে;
প্রলয় আঁধার নাশি' প্রাচ্যাকাশে আর
করিবে না তুমি গাত্রোত্থান?
ধরার জাগ্রতি রবে সেওত জেগেছে কবে,
সুপ্তি-শ্রান্ত অপমানে ক্ষত প্রাণে তা'র
উঠিছে ত তোমারি আহ্বান!
তুমিই জাগ্রত ছিলে যবে তোমা ঢাকি
উড়ে হেথা বিজয় কেতন;
দেখনি কি সে সময় করেছে কি অভিনয়,
কত শৌর্য্যবীর্য্যে তার, ন্যায়ধর্ম্মে রাখি
শিরোপরি চির-সচেতন?
অসহায়া সতী, লক্ষ্মী যখন বিশেষ
হইয়াছে নির্দ্দয় লাঞ্ছিত,
"হে সূর্য্য, হইও সাক্ষী" মেলি তার নলিনাক্ষি,
বলিছে উরধে চাহি; শুধু এই দেশ
হয়েছিল তোমায় বিস্মৃত?
লয়ে নব আলো-রেখা আর্য্যাবর্ত্ত ধামে
পুনঃ দেব, হওগো উদয়;
তোমারি আলোক-ধারা বহিতে নারিবে যারা,
এখনো তোমারি বংশে তোমারই নামে
ধরাতলে পরিচিত হয়?
বল দেব, নিরাশার কাণে কাণে তুমি
দাঁড়াইয়া আলোকের তীরে,
বল ছিল হেথা প্রাণ, বল শুনেছিলে গান,
বল ছিল মনুষ্যত্ব, বল আর্য্যভূমি—
পুণ্য-পূত ভাগীরথী নীরে;
তুমি আজ বলে যাও ওগো দিনপতি!
পুরাতন গৌরব-কাহিনী,
প্রাণের নিভৃত দেশে তোমার আলোক পশে
জাগাইয়া দিক্ মোর স্তিমিত ভকতি;
গলিয়া সে হোক্ মন্দাকিনী।
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

কোচবিহার রাজবংশ। (২)

৪। লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫৮৪—১৬২২)—রাজা নর নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৪ খ্রীঃ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ১৫৯৬ খ্রীঃ তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র পাটকুমার বিদ্রোহী হইলে রাজা প্রাণ ভয়ে দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা মানসিংহ তখন মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর সাহের অধীন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা। বিপন্ন লক্ষ্মীনারায়ণ তৎকালে মানসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি অধীন রাজস্বরূপে দিল্লীর সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার ও দিল্লীশ্বরকে করদানে সম্মত হইলে তাঁহাকে সাহায্য দান করা হয়। এই সময় হইতে কোচবিহার দিল্লীর অধীন করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্ত্তা জেহাজ খাঁ কোচবিহার আক্রমণ করেন। সেই সময়ে রাজা দিল্লী গিয়া এক সন্ধি করেন এবং জিত রাজ্যগুলি দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার সময়ে কোচবিহার রাজ্যের অনেক গুলি দেশ সম্রাট জাহাঙ্গীরের হস্তগত হয়। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৬২২ খ্রীঃ ইহসংসার পরিত্যাগ করেন।

৫। বীরনারায়ণ (১৬২২—১৬২৬)—তৎপরে তদীয় পুত্র বীরনারায়ণ ১৬২২ খ্রীঃ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি বর্ত্তমান কোচবিহারের নিকট অথরকোটা নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার সময়েও অনেক গুলি দেশ রাজ্যচ্যুত হয়। ভুটান কর বন্ধ করে। তিনি রাজ্যের নানা স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা-সুবিস্তারের উন্নতি করেন। কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ১৬২৬ খ্রীঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৬। প্রাণনারায়ণ (১৬২৬—১৬৬৫)—তদনন্তর তাঁহার পুত্র প্রাণনারায়ণ ১৬২৬ খ্রীঃ রাজা হন। তিনি জলপেশ্বর, ভবনেশ্বর, কামতেশ্বরীর মন্দির, কামতাপুরের গোসানী-মারী দেবীর মন্দির সংস্কার করেন। কোচ-বিহার সহর হইতে ছয় মাইল উত্তরে জলেশ্ব-রের শিব মন্দির তিনি নির্ম্মাণ করেন। ঐসকল তীর্থ স্থানের রক্ষাকল্পে অনেক সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। নৃত্য গীতেও পটু ছিলেন এবং ঐ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন। ১৬৩৮ খ্রীঃ চট্টগ্রামের মুসলমান-শাসন কর্ত্তা ইস্‌লাম্ খাঁ তাঁহার রাজ্য আক্র-মণ করেন। তিনি দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে ১৬৬১ খ্রীঃ বঙ্গের তাৎকালীন শাসন-কর্ত্তা মীরজুম্লা একদল সৈন্যসহ প্রেরিত হইয়া বিদ্রোহী রাজাকে পর্য্যস্ত করিয়া কোচবিহার আক্রমণ পূর্ব্বক রাজধানী অধিকার করেন। রাজা পলায়ন পূর্ব্বক এক পর্ব্বত-গুহায় লুক্কা-য়িত থাকেন। মীরজুম্লা একজন মুসলমান শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন এবং হিন্দু মন্দির নষ্ট করিয়া তাহার স্থানে মসজিদ্ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর অধিবাসীগণ রাজার সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদিগকে গোহাটী পর্য্যন্ত বিতাড়িত করে। রাজা প্রাণনারায়ণ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করি-লেন; কিন্তু তাহার পর কোচ রাজাদিগের স্বাধীনতা লোপ হয় এবং কোচবিহার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়া যায়। ১৬৬৫ খ্রীঃ রাজা প্রাণনারায়ণ পরলোকগত হন।

৭। মদন-নারায়ণ (১৬৬৫—১৬৮০)—রাজার মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র মদন-নারায়ণ ১৬৬৫ খ্রীঃ পিতৃ সম্পত্তির প্রতিনিধি হন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ১৬৮০ খ্রীঃ জীবন-লীলা সমাপন করেন।

৮। বাসুদেব নারায়ণ (১৬৮০-১৬৮২)—অতঃপর রাজা প্রাণনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বাসুদেব নারায়ণ ১৬৮০ খ্রীঃ রাজা হন। ইহার দুই বৎসর পরে নাজীর মহীনারায়ণের পুত্রগণ ভুটিয়াদিগের সাহায্যে রাজধানী আক্রমণ করেন। মহীনারায়ণের এক পুত্র জগুয়া নারায়ণ রাজার শিরচ্ছেদ করেন। তদনন্তর রাজা প্রাণনারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্র নারায়ণ নামে এক পুত্রকে ১৬৮২ খ্রীঃ রাজ্যা-ভিষিক্ত করা হয়।

৯। মহেন্দ্র নারায়ণ (১৬৮২—১৬৯৩)—তিনি পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালে কোচ-বিহারের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পরে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার নাবালক রাজাকে অসহায় দেখিয়া তাঁহার রাজ্যের অনেকগুলি দেশ আক্রমণ করেন। সেই সময়ে তিনি মহীনারায়ণের পুত্র জগুয়া নারায়ণের সহিত মিত্রতা করিয়া, তাঁহাকে ছত্র নাজীর নিযুক্ত করেন। রাজা মহেন্দ্র নারায়ণের সময়ে অনেক করদ রাজ্য তাঁহাকে

রাজস্ব বন্ধ করিয়া বঙ্গদেশের সুবাদারকে রাজস্ব দিতে স্বীকার করেন। তিনি ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ষোড়শ বৎসর বয়সে কালের কবলে পতিত হন।

১০। রূপনারায়ণ (১৬৯৩—১৭১৫)—তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রূপনারায়ণ ১৬৯৩ খ্রীঃ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি তোরর্শার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী গুরিয়াহাতী নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৫ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১। উপেন্দ্রনারায়ণ (১৭১৫—১৭৬৪)—অতঃপর তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ ১৭১৫ খ্রীঃ রাজা হন। তাঁহার সময়ে রঙ্গপুরের মুসলমান ফৌজদার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করেন। রাজা ভুটিয়াদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদের সাহায্যে ১৭৩৭ খ্রীঃ মুসলমান আক্রমণ রক্ষা করেন। তিনি ১৭৬৪ খ্রীঃ ধলুয়াবাড়ী নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১২। দেবেন্দ্রনারায়ণ (১৭৬৪—১৭৬৫)—তৎপরে তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ ১৭৭৪ খ্রীঃ উত্তরাধিকারী হন। তিনি নাবালক থাকায় তাঁহার প্রধান মন্ত্রী রাজ্য পরিচালনা করিতেন; কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীঃ রাজা জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ দিল্লীশ্বর সম্রাট্ শাহ আলম্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করেন। কোচবিহার চাক্‌লা তদবধি কোম্পানীকে রাজস্ব প্রদান করিতে আরম্ভ করে।

১৩। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ (১৭৬৫—১৭৭০)—রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ নিহত হইলে পর রামনারায়ণের তৃতীয় ভ্রাতা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ১৭৬৫ খ্রীঃ রাজ্য অধিকার; করেন। তিনি রাজা রূপনারায়ণের বংশধর এবং দেবেন্দ্র নারায়ণের খুল্লতাত পুত্র। ইহাতে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হয়।

১৪। রাজেন্দ্রনারায়ণ (১৭৭০—১৭৭২)—অতঃপর অনেক গৃহ বিবাদের পর ১৭৭০ খ্রীঃ ভুটিয়ারা রাজার ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে সমাসীন করে। তিনি দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া ১৭৭২ খ্রীঃ গতায়ুঃ হন। তাঁহার মৃত্যুর পর নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ ধুরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন। কিন্তু ভুটানের দেবরাজা তাহাতে আপত্তি করিয়া কোচবিহারে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভুটিয়াগণ রামনারায়ণের পুত্র বিজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা মনোনীত করেন। ফলে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং নাজীর দেও পরাভূত হইয়া দেশ হইতে বিতাড়িত হন। সেই সময় ধুরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সাহেব তাহা মঞ্জুর করেন। ১৭৭৩ খ্রীঃ একটী সন্ধি স্থাপিত হয়।

১৫। ধুরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৭৩—১৭৮৩)—অতঃপর ১৭৭৩ খ্রীঃ ধুরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন; কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না, তাঁহার পত্নী ও রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামী পরিচালনা করিতেন। এই সময় মহারাণী, সর্ব্বানন্দ গোস্বামী ও নাজীর দেওর মধ্যে মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। রঙ্গপুরের কালেক্টার সাহেব বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ তখন কোচবিহারে উপস্থিত ছিলেন; তিনি তৎকালে রাণীর পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৭৮০ খ্রীঃ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানের প্রস্তাব স্থির হয়। ১৭৮৩ খ্রীঃ রাজার মৃত্যু ঘটে।

১৬। হরেন্দ্রনারায়ণ। (১৭৮৩—১৮৩৯)—তৎপরে রাজার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ ১৭৮৩ খ্রীঃ পিতৃসম্পত্তি লাভ করেন। বয়ঃক্রম তখন দুই বৎসর মাত্র। রাজার উইল অনুসারে রাণী একমাত্র তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু এই সময় নানা প্রকার গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায় রাণী বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে রাজকুমারের নাবালক সময়ে, ১৭৮৮ খ্রীঃ, কোচবিহারে একজন রেসিডেণ্ট রাখিবার প্রস্তাব স্থির হয়। ১৮০১ খ্রীঃ রাজকুমার সাবালক হওয়ায় ইংরাজ রেসিডেণ্ট স্থানান্তরিত হয় এবং রাজ্যভার রাজকুমারের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮০৫ খ্রীঃ ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট পুনরায় কোচবিহারে রেসিডেণ্ট পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮১৩ খ্রীঃ একজন রেসিডেণ্ট-কমিশনার সৃজিত হয়। তদবধি কোচবিহার রাজ্য একটী করদ-মিত্র রাজ্য মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতেছে। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহারে সাহিত্য-চর্চ্চার এলিজাবেথীয়ান্ যুগ। তিনি স্বয়ং একজন কবি ছিলেন, পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত করাইয়াছিলেন। ১৮:৬ খ্রীঃ তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বারাণসীধামে গমন করেন। রাজকুমার শিবেন্দ্রনারায়ণ ও ব্রজেন্দ্রনারায়ণ উভয়কে একত্রে রাজ্যপরিচালনের ভার দিয়া আসেন। তিনি বারাণসীধামে বহু অর্থ দান ধর্ম্মে ব্যয় করিয়া অবশেষে ১৮৩৯ খ্রীঃ পুণ্যভূমি কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৭। শিবেন্দ্রনারায়ণ। (১৮৩৯-১৮৪৭)—রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৮৩৯ খ্রীঃ ২৮শে আগষ্ট বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহা অনুমোদিত হয়। রাজার সন্তানাদি না হওয়ায়, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের চতুর্থ পুত্র চন্দ্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। শিবেন্দ্র নারায়ণ ১৮৪৭ খ্রীঃ বারাণসীধামে শিবত্ব প্রাপ্ত হন।

১৮। নরেন্দ্রনারায়ণ। (১৮৪৭-১৮৬৩)—তৎপরে রাজার নাবালক দত্তক পুত্র চন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি অভিষেকের সময় নরেন্দ্রনারায়ণ নাম গ্রহণ করেন। ভূটিয়াগণ প্রায়ই কোচবিহার রাজ্যে উপদ্রব করিতে আসিত, সেইজন্য ১৮৫১ খ্রীঃ ব্রিটীশগবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে একটী প্রান্তসীমা নির্দ্ধারিত হয়। রাজকুমার বাহাদুর প্রথমে গৃহে সামান্য রূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তৎপরে ১৮৫৩ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের দুই পুত্র তখন তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে রাজকুমারকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয় এবং কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পত্নীর দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। তৎপরে ১৮৪৮ খ্রীঃ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে থাকে। ১৮৫৯ খ্রীঃ অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজকুমার বাহাদুর সাবালক হইলে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৮৬২ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট কোচবিহারাধিপতিকে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধির সনন্দ প্রদান করেন। উক্ত বৎসর ভারতগবর্ণমেণ্ট একখানি সনন্দ প্রদান

করেন যে, মহারাজ কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অপুত্রক হইলে বংশ রক্ষার জন্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ ৬ই আগষ্ট দ্বাবিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে মহারাজ বাহাদুর পরলোকগত হন। মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ কোচবিহারের মসনদে সমাসীন হইয়াছেন।

১৯। নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ।—কোচবিহারের বর্ত্তমান অধিপতি মহারাজ স্যার কর্ণেল নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ১৮৬২ খ্রীঃ, ৪ঠা অক্টোবর, কোচবিহার প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার এক মাত্র পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ গদী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত হয়। কোচবিহারের তৎকালীন কমিসনার Colonel Haughton ইহাঁকে অভিষিক্ত করেন। ইনি যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন, তখন ইহাঁর রাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছিল। মহারাজ-কুমার বাহাদুরের নাবালক সময়, ১৮৬৪ খ্রীঃ ভুটান যুদ্ধে কোচবিহার রাজ্য ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সেইজন্য দুইটী কামান ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মহারাজকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ কমিশনার Haughton সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইনি বারাণসীর ওয়ার্ডস্ ইনিষ্টিটিউটে অধ্যয়ন করেন। তৎকালে St. John Kneller সাহেব মহারাজের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তৎপরে বাঁকিপুরে থাকিয়া পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তথায় পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭২ খ্রীঃ কোচবিহারে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ সকল প্রকার রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লী দরবারে ইনি একটী সুবর্ণ মেডেল ও একখানি তরবারি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ৬ই মার্চ্চ স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতিবালার সহিত মহারাজের পরিণয় হয়। বিবাহের কিছুদিন পরে ইনি প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তথায় Benjamin Simpson এবং John Kneller সাহেবদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তথায় অবস্থান কালে ইনি জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রীয়া এবং বেলজিয়ম্ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। মহারাজ তথায় প্রায় দশমাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ কোচবিহার প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত বৎসর এপ্রেল মাসে কলিকাতায় আসিয়া "পিনেল্‌কোর্ড" অধ্যয়ন করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ কলিকাতায় ইণ্ডিয়া ক্লাব নামক সমিতিটী মহারাজেরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার আংশিক আনুকূল্যে পরিচালিত হইতেছে। ১৮৮৩ খ্রীঃ ৩রা অক্টোবর ইনি সাবালক হন এবং উক্ত বৎসর ৮ই নবেম্বর বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট স্যার রিভাস্ টম্‌সন্ কর্ত্তৃক পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৮৮৩ খ্রীঃ জলপাইগুড়িতে "নৃপেন্দ্রনারায়ণ হল্" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ যখন রুসের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইবার আশঙ্কা হয়, মহারাজ তৎকালে ভুটানের সীমান্তে এক সহস্র সৈন্য সমাবেশ করিবার প্রস্তাব করেন; তাহার ফলে ইনি "অনারারী মেজর" নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রীঃ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জুবিলী উৎসবে

যোগদান করিবার জন্য সন্তানাদি সমভিব্যাহারে মহারাজ বিলাত গমন করেন। তৎকালে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ইহাঁকে "জি·সি·এস্·আই উপাধি দেন এবং মহারাণী সুনীতি দেবীকে "সি·আই" সম্মানের অধিকারিণী করিয়া বিভূষিত করেন। এই সময় মহারাজ তৎকালীন যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের এডিকং এবং ব্রিটীশ সৈন্যের লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ কর্ণেল্‌ নিযুক্ত হন। অতঃপর বিলাত হইতে প্রত্যাগমন কালে Grand Master নিয়োজিত হন। ১৮৮৭ খ্রীঃ মহারাজের প্রদত্ত ভূমির উপর দার্জ্জিলিং লুইস্‌ জুবিলী সেনিটারিয়াম্‌ নামক স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৮৮ খ্রীঃ কোচবিহারে সমাজ স্থাপন এবং ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ কোচবিহারে "আনন্দময়ী ধর্ম্মশালা" নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৮৯০ খ্রীঃ মহারাজ বাহাদুর বঙ্গদেশের Deputy District Grand Master নিযুক্ত হন। ১৮৯১ খ্রীঃ District Grand Mark Master নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ জেনারেল ইয়েট্‌ম্যান-ব্রিগস্‌ সাহেবের সমভিব্যাহারে ইনি তীরাযুদ্ধে সৈনিক কর্ম্মচারীরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে জেনারেল স্যার উইলিয়ম্‌ লকৃহার্ট এবং ভারতসচিব বিশেষ প্রশংসা করেন। তীরাযুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাইয়া ভারত-রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মহারাজকে ১৮৯৮ খ্রীঃ "সি·বি" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯০২ খ্রীঃ ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক মহোৎসবে মহারাজ সপরিবারে বিলাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সম্রাটের এডিকং স্বরূপ ঘোটকে আরোহণ করিয়া উৎসব সময় ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি পর্য্যন্ত গমন করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লীর অভিষেক দরবারে মহারাজ বঙ্গদেশের স্বাধীনরাজের আসন প্রাপ্ত হন। ইনি ষষ্ঠ বেঙ্গল অশ্বারোহী সেনাদলের "অনারারী কর্ণেল"। মহারাজ বাহাদুর ১৩টী তোপধ্বনি দ্বারা সম্মানের অধিকারী। ইনি সুনিপুণ শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং টেনিস্‌ পোলো প্রভৃতি ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী। ইনি একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার এবং কলিকাতার বহু ঘোড়দৌড়ে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান্‌ টার্‌ফের "ভাইস্‌রয় কাপ্‌" উপর্য্যুপরি দুই বৎসর লাভ করেন। মহারাজ প্রতি বৎসর শীতকালে কলিকাতায় একশত স্বর্ণ মুদ্রার কাপ্‌ বাৎসরিক দান করিয়া থাকেন। শিল্প-শিক্ষায় ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। কোচবিহারে মহারাজের সুবৃহৎ প্রাসাদ আছে এবং কলিকাতা, সিমলা ও দার্জ্জিলিং পর্ব্বতেও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে। ইনি ভারতবর্ষের মধ্যে একজন সুশিক্ষিত অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া গণ্য। ইনি বহুবার ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন এবং রাজদরবারে ও লোকসমাজে প্রভূত সম্মান পাইয়া থাকেন। ইনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মানসে মহারাজ সস্ত্রীক সামাজিক সম্মিলনীতে উপস্থিত হন। ইনি ইংরাজী ধরণে চলিলেও ইহাঁর পার্শ্বচর ও উচ্চতন কর্ম্মচারী সকলেই বাঙ্গালী। ইনি একজন বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা। কোচবিহার রাজ্য ইহাঁর সুশাসনে সমধিক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। মহারাজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কলেজ, আদালত, চিকিৎসালয়, কারাগার প্রভৃতির কার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। কোচবিহারের রাজগণ আপনাদিগকে শিববংশীয় বলিয়া থাকেন।

অধুনা মহারাজের চারি পুত্র ও তিন

কন্যা। ১৮৮২ খ্রীঃ ১১ এপ্রিল জ্যৈষ্ঠ রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুরের জন্ম হয়। কোচবিহার রাজের প্রথম জামাতা শ্রীমান জ্যোৎস্না ঘোষাল,—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ওরফে জে, ঘোষাল মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। তিনি বোম্বাই প্রদেশের সিভিলিয়ান্। ঘোষাল মহাশয় স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

লুপ্তোদ্ধার। (২)

গার্ডেন রিচ।

খিদিরপুর হইতে বরাবর পশ্চিম মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত নদীতীরবর্ত্তী ভূভাগকে ইংরাজগণ গার্ডেন-রিচ (Garden Reach) অর্থাৎ উদ্যান-সীমা বলেন। কুতূহলাবিষ্ট জিজ্ঞাসু প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, কেন তাঁহারা এরূপ বলেন? তাঁহারা কি খামখিয়ালী, যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই মুখ হইতে বাহির করেন, কোনও অর্থ নাই, কোনও সমন্বয় নাই? না, তাহা হইতে পারে না। উক্ত ইংরাজী শব্দদ্বয়ের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। গতায়ুঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চকর্ম্মচারিগণ এবং কোম্পানীর অনুগৃহীত ও আশ্রিত স্বাধীন ইংরাজ-বণিক-ব্যবসায়িগণ তখনকার কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু সহ্য করিতে পারিতেন না, প্রায়ই তাঁহাদিগের সাংঘাতিক পীড়া হইত। কচিৎ ২।১ জন কালের কবল হইতে রক্ষা পাইতেন। সেইজন্য এই মহানগরীর এই ভুরপনের দুর্নাম 'শ্বেতাঙ্গের সমাধি-ক্ষেত্র' White Men's Grave হয়। সেইজন্যই তাঁহারা নদী-উপকূলে বিস্তৃত উদ্যান-বাটিকা প্রস্তুত করতঃ স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নন্দন-কানন-নিভ বাসস্থানের নাম গার্ডেন্-রিচ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখানে পূর্ব্বে বহু বড় ইংরাজের বাসস্থান ছিল। সকলের বিষয় আমি অবগত নহি, তবে ২।১টীর স্মরণীয় মহাত্মার নামোল্লেখ করিয়া হৃদয়-বেদনার কথঞ্চিৎ উপশম বোধ করিতেছি। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব যে প্রাসাদে বাস করিতেন, উহাতে তখনকার সুপ্রীম্‌কোর্টের প্রধান বিচারপতি জষ্টিস্ পীল বাস করিতেন। তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণে উহাকে পীল সাহেবের কুঠী বলিত। তিনি বড় সৌখীন ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, তাঁহার ঘরে ১০১ ডালের ঝাড়-লণ্ঠন প্রতি রাত্রে জ্বলিত। ইহাও শুনা যায় যে, তিনি নাকি ১০০০ এক সহস্র বর্ত্তিকা প্রতি নিশিতে জ্বালাইয়া আপনার সুরম্য প্রাসাদ আলোকিত করিতেন এবং দিব্য দিয়া গিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্যূন এক সহস্র বর্ত্তিকা জ্বালাইতে পারিবে, সেই ব্যক্তিই উহাতে বাস করিবে। এখন যে বাটীতে সুতার কল, তাহাতে আপজন সাহেবের কুঠী ছিল। আর এখন যে বাটীতে চটের কল, পূর্ব্বে তাহাতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ডেবিস্ সাহেব বাস করিতেন। ইনি প্রতি বৎসর শীতকালে দীনদুঃখী আতুরদিগকে লুই নামক সুতলী শীতবস্ত্র দান করিতেন। লেখক মহাত্মা ডেবিস-প্রদত্ত সুতলী লুই দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আর্থিক সাহায্যে পরিক্লিষ্ট লোকদিগের দুঃখ অপনোদন করিতেন। তাঁহার যোড়া দীঘির

ধারে ২।৩টী কাল জামের গাছ ছিল। গ্রীষ্মকালে যে পারিত, সেই জাম কুড়াইয়া আনিত ও খাইত। লোকে দয়ার সাগর ডেবিস সাহেবকে "দেবী" সাহেব বলিত। পীল সাহেবের কুঠীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সাবানের কারখানার পশ্চিমে এক মহাপুরুষ বাস করিতেন। বিশুদ্ধ পানীয় জলপূর্ণ পুষ্করিণী ও তাহার ধারে জামরুল গাছ তাঁহার ফটকের নিকট ছিল। গ্রীষ্মকালে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্থ-কলেবর পথিক তাঁহার অবারিত-দ্বারে প্রবেশ করিয়া ফল ভক্ষণ এবং সুশীতল বারি পান করিয়া সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিত। জামরুল তলায় পড়িয়া থাকিত। পঠদ্দশায় লেখক নিজে কত ফল খাইয়াছে ও এই পুষ্করিণীর কত জল পান করিয়াছে। যেরূপ প্রভু,সেইরূপ ভাল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ দ্বারবান। সেও পরিশ্রান্ত আগন্তুককে বাক্য-সুধায় পরিতৃপ্ত করিত। আপজন্ সাহেবের বাড়ীর পূর্ব্বগায়ে বৃদ্ধ সর্ব্বজনপ্রিয় লোকহিতৈষী আর্মনী সাহেব মহাত্মা এমিন বাস করিতেন। তাঁহার প্রশস্ত উদ্যান-সম্বলিত ভবনে পরে মিচেল সাহেব দড়ির কারখানা করেন। এখনও প্রাচীনেরা ঐ কুঠীকে এমিন সাহেবের কুঠী বলেন। এই মহাপুরুষের সৌম্যমূর্ত্তি ও পুণ্যজীবন আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। তিনি শুক্লকেশ স্থূলকায় ছিলেন, পাদরীর মত লম্বা কোট পরিতেন। কাণে দুটী সরু সোণার মাকড়ি ছিল। বাটীর নিম্নতলে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। সরস্বতী পূজার দিন চতুঃপার্শ্বস্থ পল্লীগ্রাম গুলি হইতে শত শত লোক সাহেবের বাগান হইতে পুষ্প, আম্র-মুকুল ও যবের শীষ লইতে আসিত। মেটিয়া-বুরুজের বাজারের নিকট সাহেবের একটী অবৈতনিক বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রাদি ছিল। তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে মুর্গীহাটায় অনেক-দিন দেখিয়াছিলাম।

ইংরাজীতে যাহাকে গার্ডেন্-রিচ্ বলে, বাঙ্গালায় তাহাকে মুচিখোলা বলে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, এই অঞ্চলে আগে ইতর জাতীয় লোকের বাস ছিল। 'মুচি-খোলা' নামই আমার মতের পোষকতা করিতেছে। এখন নবাগত দুই একঘর ভদ্র লোকের বাস হইয়াছে। তবে বহুদিন হইতে সোণাই, সিংহের হাটী ও মুদীয়ালীতেও ভদ্র-লোকের বাস আছে। সোণাই নামের ব্যুৎপত্তি পাই নাই। সিংহ-পদবীবিশিষ্ট কায়স্থ বাবুদিগের হাট ছিল। তাঁহাদিগের নাম হইতে গ্রামের নাম হইয়াছে। ইহা-দিগের বংশধর কেহ আছে কিনা, বলিতে পারি না; তবে সিংহের হাটের মল্লিকেরা পুরাতন ঘর। মুদিয়ালী কোনও এক যোত্র-বান মুদির গ্রাম বা মুদিয়ালী। নিকটে ছোট লোকের বাসস্থান পাহাড়পুর বা পার-পুর। হায়ৎপুর ও আলিফনগর কুম্ভকারের বাসস্থান। নামই ইহার যবনোৎপত্তি দেখা-ইয়া দিতেছে। আলিফনগর আলিগড় ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখানে প্রাচীন সময়ে প্রাদেশিক মুসলমান শাসনকর্ত্তার দুর্গ ছিল। ক্লাইব ১৭৫৬ সালে ইহা অধিকার করেন।* ইহার ভগ্নাবশেষ আমি কোথাও দেখিতে পাই নাই।

মেটিয়াবুরুজ।

বামে বদরতলার চট্‌কল এখন যেখানে, দক্ষিণে পাঁচপাড়া, গাংয়ের এই দুই স্থান কলিকাতা-বন্দরের বর্ত্তমান দক্ষিণ সীমা।

---

* Imperial Gazetteer of India. New Edition p. p. 160—61

ইহার পূর্ব্বে একদিকে মেটিয়াবুরুজের ঘাট, অপরদিকে শিবপুর বোট্যানিকেল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাটীর ঘাট, এই বন্দরের দক্ষিণ সীমা ছিল। পরে আলোচিত হইবে যে, শিবপুরের ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানটীরও ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে, মেটিয়াবুরুজের ঘাটেরও খ্যাতি আছে; তাহা না হইলে, ইহার বিষয় কিছু লিখিবার নিমিত্ত লেখনী ধারণ করিতাম না। 'মেটিয়া' কিনা মাটীর এবং বুরুজ কিনা বৃহৎ ঢিবী। পলাশীর যুদ্ধের সময় এইরূপ মাটীর বুরুজ প্রস্তুত হইয়াছিল। সৈনিক স্থপতিগণ জানেন যে, কোনও স্থান দুর্গবন্দী করণে বা তোপ সংযোজন কার্য্যে এইরূপ স্তূপের একান্ত আবশ্যক। তখন গাংয়ে আরাকাণী, আর্মেনিয়া বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজ ও মগ জলদস্যুর বড় দৌরাত্ম্য ছিল। সেই দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য মেটিয়াবুরুজে তোপ রাখিয়া ও নদীতে শিকল ফেলিয়া বন্দর রক্ষা করা হইত।* মেটিয়াবুরুজের নিকট নিমক মহলের ঘাট। এখন যেমন আফিম গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসা, আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ ব্যবসায় সেইরূপ একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বন্দর হিজিলি-কাঁথিতে গবর্ণমেণ্টের সল্ট বোর্ডের অধীনে লুণ প্রস্তুত হইয়া নিমক মহলের ঘাটের গোলায় বিক্রয়ার্থ আমদানী হইত। মাঝিরা ছাড় বা চালান পাইত। উহা প্রদর্শিত না হইলে লুণ গুপ্তভাবে প্রস্তুত, অবৈধ দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া বাজেয়াপ্ত হইত ও তদন্ত চলিত। বোর্ড উঠিয়া গেলে, অনেক দিন অবধি মেটিয়াবুরুজে লুণের গোলা ছিল। বলা বাহুল্য, ইহা কোম্পানীর সময়ে বড় ব্যবসার স্থান ছিল। নারিকেল, নারিকেল তৈল, কাষ্ঠ, ধান্য, চাউল, খড় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যের বড় বড় গোলা ছিল। বাজার এখনও আছে, তবে পূর্ব্বের মত নাই। ইহা পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মহারাজার, তাহার পর লক্ষ্ণৌ মৃত নবাবের ছিল; এক্ষণে আন্দুলের রাজার। মেটিয়াবুরুজের কিয়দংশ ভূপালের বেগমের।

* W. H. Carey's Good Old days of the Hon'ble John Company. p. 199, vol. II,

বড় সাহেবের হাট।

মাননীয় কোম্পানী বাহাদুরের সরাপের ব্যবসা ছিল।† তাঁহারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন্ প্রভৃতি ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক প্রকার সুরা আমদানী করিয়া এদেশে বিক্রয় করিতেন।

বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এদেশে মদ প্রস্তুত করিতেন। চোলাইয়ের ভাঁটি স্থানে স্থানে ছিল। বড় সাহেবের হাটে ভাঁটি ছিল। ভাঁটিওয়ালা সাহেব হইতে স্থানের নাম হইয়াছে। তাহার পর কায়স্থ কুলোদ্ভব আন্দুলাধিপতি রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর বড় সাহেবের হাট পত্তনী লন। ৺নিতাই চরণ পাল তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজা বাহাদুরের এক অতি মনোরম্য একতল উদ্যান-বাটিকা ছিল। উহা এক্ষণে ইণ্ডিয়া জেনারেল ষ্টীম্ নেভিগেশন্ কোম্পানীর কারখানা। তাঁহা হইতে স্থান রাজাবাগান নাম পাইয়াছে। আবার রাজাবাগান চট্‌কলের গায়ে। আবার রাজাবাগানের পরেই বড় সাহেবের হাট ও তন্নামে-পরিচিত ক্ষুদ্র গ্রাম। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোক এখানে সপ্তাহে দুই দিন—বুধবার ও শনিবার হাট করিয়া থাকে।

† Ibid.

বামণগঞ্জ।

বড় সাহেবের হাটের পর বামণগঞ্জ। মাজু-নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র ঘোষাল এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষালের এখানে ধানের আড়ৎ ছিল। তাহা হইতে বামণগঞ্জ নাম হইয়াছে। গঞ্জের সন্নিকট ৺স্বরূপ পরিয়ালের বড় দোকান ও তামাকের কারবার ও ৺দশরথ গোয়ালার বাড়ী ছিল। এখন সে সব কিছুই নাই। আগেও মুসলমানের বাস, এখনও মুসলমানের বাস।

খন্‌কারের গঞ্জ বা নদীয়াল।

বামণগঞ্জ হইতে রাজগঞ্জের পরপারস্থ বাঘমারী অবধি যদিও বদরতলা ডাকে, কিন্তু প্রকৃত বদরতলা তাহা নহে। প্রকৃত বদরতলার কথা পরে বলা হইবে। এস্থলে খন্‌কারেরগঞ্জ বা নদীয়ালে উপস্থিত হইলাম। জেলা ২৪ পরগণার মাগুরা এলাখা সমস্ত বদরতলা গ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান খন্‌কার সাহেবদিগের জমিদারীভুক্ত ছিল। তাঁহারা নাকি উন্নতমনা প্রজাপ্রিয় ছিলেন। বামণগঞ্জের পরে তাঁহাদিগের যে স্থানে কাছারি-বাড়ী ছিল, সেই গাংয়ের ধারের স্থানের নাম খন্‌কারেরগঞ্জ। উহা নদীর আইল বা বাঁদে অবস্থিত বলিয়া নদীয়াল নামে গ্রাম্য লোকদিগের নিকট পরিচিত। এখানে এখন বদরতলার চটের কল। বড় সাহেবের হাট হইতে বাঘমারী পর্য্যন্ত বদরতলা গ্রামে কুম্ভকার, পোদ ও মুসলমানের বাস। অনেক দিন পূর্ব্বে তিন ঘর মাত্র কায়স্থ এবং তার অনেক পরে এক ঘর দীন দৈবজ্ঞ আচার্য্যের বাস ছিল।

বদরতলা।

প্রকৃত বদরতলা খন্‌কারের গঞ্জের পর। মুসলমান পীরবদর সাহেবের নাম হইতে বদরতলা গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। এখানে গাংয়ের ধারে বদরসাহেবের আস্তানা বা দর্গা। বদর সাহেব হিন্দুদিগের নেপচ্যুন (Neptune) অর্থাৎ নদী-দেবতা। হিন্দু-নাবিকগণ জলপথ নিরাপদে অতিক্রম করিবার মানসে তাঁহার নাম লইয়া থাকে এবং তাঁহার কৃপায় জল-বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলে শিন্নি দিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, গাংয়ে যে সকল হাঙ্গর কুম্ভীর আছে, তাঁহার নাম লইলে তাহারা কোনও অনিষ্ট করে না ও স্ব স্ব দেহের পূর্ণায়তন প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনেক দিন আগে গাংয়ের ধারে দর্গার নিকট একটী বৃহৎ বন ছিল। লোকে উহাকে বদর সাহেবের বন বলিত এবং বিশ্বাস করিত যে, উহাতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু থাকিত, আর রাত্রিকালে উভচর হাঙ্গর ও কুম্ভীর সকল আসিত। কিন্তু কেহই মনুষ্যের কোনও অনিষ্ট বা প্রাণ-হিংসা করিত না। এতদ্ভিন্ন অপর হিন্দু নরনারীগণ বন্ধ্যা ও কাকবন্ধ্যাগণ সন্তান-কামনায় এই জাগ্রত পীরের মানসিক করিয়া দর্গায় ঢিল বাঁধিয়া কিম্বা মাটীর ঘোড়া ও দুধ দিয়া আসেন। বদর সাহেবের বনের ধার হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর পূর্ব্বদিকে গাবতলা অবধি মান্দ্রাজ, নিকোবর ও লাকাদ্বীপপুঞ্জ হইতে আগত ছোট ছোট বাণিজ্য-পোতের* নিমিত্ত অনেক ডক্ ছিল। গ্রীষ্মকালে এই সকল জাহাজ আসিয়া মেরামত হইয়া বর্ষাকালে স্ব স্ব দেশে কলিকাতা হইতে পণ্যদ্রব্যজাত লইয়া প্রত্যাগমন করিত। ডক্‌গুলি ৺গঙ্গানারায়ণ ঘোষের সম্পত্তি ছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বিমুখ হওয়াতে তৎসমুদয় শাখ্‌রাইল-

* ইহাদিগকে ছুরি ও শুলুপ বলে। শেষোক্ত কথাটী ইংরাজী 'shollap' কথার অপভ্রংশ মাত্র।

নিবাসী ৺কালীচরণ ঘোষের হস্তান্তর হয়। কলিকাতা হইতে রেলের পথ হইল। বাণিজ্যের জলপথ বন্ধ হইয়া গেল। বাঘমারী ও বদরতলা একই। সুতরাং পৃথক্ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

মণিখালী।

যেরূপ গেমখালী অর্থাৎ শাংখালী, সেইরূপ মণিখালী। 'খালী' শব্দের অর্থ খাড়ি (harbour) মণিখালী বা মণিখারি অর্থাৎ সুন্দর নিরাপদ খাড়ি। ইহার ইংরাজী আধুনিক প্রতিশব্দ Diamond Harbour। এই নাম হাজিপুরের খাড়িকে দেওয়া হইয়াছে। এখানে বারুদের কারখানা ছিল। ১৭৯০ খ্রীঃ ৩১শে মে তারিখে ঐ কারখানা ও তৎসম্বলিত ভূমি সাধারণ নীলামে বিক্রীত হয়। টাইলার সাহেব ৩০০০, তিন হাজার টাকায় উহা ক্রয় করেন। তিনি উহা ক্রয় করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই; বোধ হয় ভাঁটি বা কলকারখানা করিয়াছিলেন। তখন হইতে ইহার ইংরাজপণ্য-গৌরব উত্তরোত্তর জ্যোতিঃহীন হইয়া শেষে অমানিশায় পরিণত হয়। কিন্তু ইহা অনেক দিন হইতে দেশীয়দিগের ধান্য প্রভৃতির ব্যবসায়ের স্থান ছিল। মণিখালীর দত্তবংশজ কায়স্থ পরিকর বিখ্যাত। এই বংশোদ্ভব অনেকে এখন আর নাই; যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

আকৃরা।

মণিখালীর উপকণ্ঠে। ইংরাজী ১৭৬০ খ্রীঃ এখানে গভর্ণমেণ্টের লবণের গোলা ছিল। এখন যেমন ডায়মণ্ডহারবারে তোপখানা আছে, এক সময়ে আকৃরায় তোপখানা ও বারুদঘর ছিল। সেইজন্য এখনও লোকে ইহাকে আকৃরা বারুদখানা বলে। বারুদখানা উঠিয়া গেলে, ইহা ঘোড়দৌড়ের মাঠ হয়। তাহাও গিয়াছে। কখন গভর্ণমেণ্ট ইটখোলা। আকৃরায় কোনও কালে ভদ্রলোকের বাস ছিল না, এখনও নাই।

বজবজে।

বজবজে অতিপ্রাচীন স্থান। কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল। খিদিরপুর হইতে বজবজে যাইবার বরাবর পাকা রাস্তা আছে। এখন সস্তায় রেল হওয়াতে লোকে ঐ রাস্তা দিয়া কম যাতায়াত করিয়া থাকে। তবে যাহারা পোদ-জাহির মহেশতলার হরিরলুট ও বাঁড়ুয্যের হাটে যায়, তাহাদিগের ঐ রাস্তা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মহেশতলায় অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখানকার বাঁড়ুয্যেরা বিখ্যাত ঘর। ইহাদিগের নামে হাট হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, বজবজেতে ও তন্নিকট শ্যামপুরে অনেক ভদ্রলোকের বাস। এখানে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস আছে। নদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া এস্থানের অধিকাংশ লোক মৎস্যজীবী।* ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটী বিবরণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, মর্গদিগের জলদস্যুবৃত্তি এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা বজবজে অবধি আসিয়া জনসাধারণের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিত। নবাব সিরাজদৌলার এখানে এক দুর্গ ছিল। লর্ড ক্লাইব ১৭৫৩ খ্রীঃ নবাবের সৈন্যসমেত এই দুর্গ অধিকার করেন। বড় বড় জাহাজ কলিকাতায় আসিতে পারে না। হয় সেগুলি ডায়মণ্ডহারবরে, না হয় বজবজেতে থাকিয়া জিনিস রপ্তানি করে। সেইজন্যই ১৭৯৪ সাল পর্য্যন্ত

* Sir W. W. Hunter's "Imperial Gazetteer of India."

ইহা ইংরাজদিগের থাকিবার স্থান ছিল। ডেনাগ্যান কোম্পানীর হোটেল ছিল। এই হোটেলে গাড়ী, ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ আজকাল কলিকাতা বন্দরের নিয়মানুসারে কেরোসিন্ প্রভৃতি দাহ্যমান বস্তুচয়পূর্ণ কোনও জাহাজ কলিকাতায় আসিতে পারে না; বজবজেতে থাকিয়া মাল খালাস করিতে হয়। সেইজন্যই সেখানে রেল হইয়াছে ও কেরোসিনের ডিপো হইয়াছে। এই তেলের ব্যবসায়ে প্রধানতঃ রেল চলে।

ডায়মণ্ডহারবর

কলিকাতা হইতে ৩৯ মাইল। ইহার বাঙ্গালা নাম হাজিপুর। শোভাবাজার-নিবাসী বিখ্যাত ভূম্যধিকারীদিগের জমিদারী। এক মাইল দক্ষিণে চিংড়িখালীতে অদ্যাবধি গভর্ণমেন্টের ম্যাগ্যাজিন্ অর্থাৎ তোপখানা আছে। আগমন ও গমনকালীন বাণিজ্য-পোতসমূহ এই সুন্দর স্বাস্থ্যকরস্থানে দুই একদিন অবস্থিতি করিয়া থাকে। এখানে মহকুমার কাছারী, টেলিগ্রাফ আপিষ ও উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। গাংয়ের অতি নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ইহা প্রায়ই জলমগ্ন হইয়া থাকে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বন্যাতে কাছারী বাড়ীর যতটুকু জলমগ্ন হয়, তাহা উহাতেই নির্দ্দিষ্ট ও পরিমিত আছে। খিদিরপুর হইতে হাজিপুর থাড়ী পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। পূর্ব্বে এই রাস্তা ভিন্ন গমনাগমনের অন্য পথ ছিল না। এক্ষণে রেল খোলাতে যেরূপ বজবজের রাস্তার দশা হইয়াছে, ডায়মণ্ডহারবরের রাস্তারও সেইরূপ দশা হইয়াছে।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

রাজা নবরঙ্গ রায়।

(ভোগবেতাল রাজ্য—বাঙ্গালার পুরাবৃত্তের এক অধ্যায়।)

বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের ছিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠা গুলি কালের কুক্ষিতে কোথায় নিহিত আছে, বাঙ্গালীর অতীত গৌরব কাহিনীর অস্ফুট তান কোথায় কোন্ দূর প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিগন্তে মিশিয়াছে, কেহ কি তাহার সন্ধান লইতেছেন?

ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্মিলনীর চেষ্টায় এই জেলার কতকগুলি ঐতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সম্মিলনীতে (১) রাজা নবরঙ্গ রায়ের দীর্ঘিকা ও (২) ভোগবেতালের ৺ গোপীনাথজী মন্দিরের আলোক-চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই নবরঙ্গ রায়ের ইতিবৃত্ত অতীত কালসাগরে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছিল, কোনকালে উদ্ধার হইত কি না, সন্দেহ।

চারিপাড়া গ্রাম।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজারদি পরগণায় চারিপাড়া নামক একটী সমৃদ্ধ গ্রাম আছে। এই স্থানেই রাজা নবরঙ্গ রায়ের রাজধানী ছিল। এইস্থান ও ইহার চতুর্দ্দিকে রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, দীর্ঘিকা, পুষ্করণী, দেবালয় প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল দর্শন করিলে তাঁহার সমৃদ্ধি, পরা-

ক্রম, ও ধর্ম্মভাবের ছায়া হৃদয়ে কতক প্রতিবিম্বিত হয়।

রাঢ় অঞ্চল হইতে তিনি এপ্রদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার দুই সহোদর ও বহুসংখ্যক অনুচর সৈন্য সামন্ত আগমন করেন। রাজা নবরঙ্গ রায়ের সৈন্য পরিচালনার্থ তাঁহার স্বজাতীয় চারিজন সামন্ত রাজা আসিয়াছিলেন; তাঁহারা ভূঁইয়া * উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ (১) কমলাবাড়ী (২) উলুকান্দি (৩) তোলচারা ও (৪) ভোগপাড়ার ভূঁইয়া বলিয়া বিখ্যাত। এই চারি ভূঁইয়া বসতি চতুষ্টয়ের সংশ্রবে চারিপাড়া নাম হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ বলেন। সাধারণতঃ ঐ স্থানকে লোকে ভোগবেতাল বলিয়াও নির্দ্দেশ করে।

ভোগবেতাল।

এই নবরঙ্গ রায়ের বংশধরগণ ভোগবেতালের রায় ও চৌধুরী বলিয়া পরিচিত এবং রাজা নবরঙ্গ রায়ের প্রতিষ্ঠিত ৺গোপীনাথজী ভোগবেতালের গোপীনাথ বলিয়া অভিহিত।

রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ও সাগর-দীঘি।

চারিপাড়া গ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রাচীন চিহ্ন গুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগরূক হয়; বাঙ্গালীর প্রাচীন সমৃদ্ধি, পরাক্রম ও প্রতাপের কাহিনী এখনও যেন সেই ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারে, সেই ভগ্নাবশিষ্ট রাজধানীর অঙ্গে অঙ্গে, সেই বনাবৃত ভূমিতে নীরবে গীত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। রাজভবনের ভগ্নাবশেষ ও জলাশয়াদির অবস্থানের চিহ্ন প্রভৃতি দেখিয়া রাজা নবরঙ্গ রায়ের রাজধানী ২।৩ মাইল বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার খনিত বহু সংখ্যক জলাশয়ের মধ্যে দুইটী দীর্ঘিকা অতি বৃহৎ। যে দীর্ঘিকার পশ্চিম তীর ব্যাপিয়া রাজার প্রাসাদ ছিল এবং যেখানে তাঁহার বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন, সেই দীর্ঘিকার নাম 'সাগরদীঘি'; উহার দৈর্ঘ্য ১৫৬৩ হাত ও তদনুরূপ বিস্তার বিশিষ্ট। মেওয়ার রাজের রাজধানী উদয়পুর এখনও উদয় সাগরের অতুলনীয় শোভা বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, কিন্তু সাগরদীঘির তীর-শোভিত রাজ-হর্ম্ম্যাবলী কালের অসহ্য আঘাতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সুবৃহৎ

* "বড় বড় রাজগণের অধীনস্থ রাজগণ" ভূঁঞা রাজা নামে আখ্যাত হইতেন; কোন শ্রেষ্ঠ রাজার অভিষেকের সময় ভূঁইয়া রাজগণ তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিতেন।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

"পাঠান রাজত্বের শেষ দিকে বাঙ্গালা দেশে বারজন প্রধান ভৌমিক থাকায় বাঙ্গালা দেশে বারভূঁইয়ার মুলুক বলিয়া খ্যাত হয়। আকবরনামায় ভাটী অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গেই বার ভূঁইয়া ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। আকবর সাহের বঙ্গবিজয়ের প্রাক্‌কালে যশোহরের স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্য স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং ঢাকা অঞ্চলে ঈশাখাঁ প্রভৃতি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন বলিয়া অনেকে এই সময়েই ভৌমিকের আবির্ভাব, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। বাস্তবিক দেশের লোক-প্রবাদে এবং সাহিত্যে গৌড়ের মুসলমান ভূপতির সভায় ভূঁয়াদের অধিষ্ঠান চিরদিন চলিয়া আসিতেছিল, দেখা যায়। ভৌমিকেরা কালক্রমে নিজ অধিকারের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের সৃষ্টি করেন। এইরূপে মোগল অধিকার কালে বাঙ্গালার ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদার অনেক দৃষ্ট হয়। আকবরের বঙ্গ বিজয়ের পরে কয়েক বৎসর অর্দ্ধ স্বাধীন ভূঁইয়াগণ উৎখাত হওয়ায় দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র জমিদারগণ থাকিয়া যায়"। (৪৮৩—৪৮৪ পৃষ্ঠা) বাঙ্গালা ইতিহাস।

সরোবর আজিও জগতের বক্ষে রাজা নবরঙ্গ রায়ের স্মৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তিরাশির অস্ফুট বারতা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। উহার কতক দূরে দলদাম-সমাচ্ছন্ন ও জঙ্গল পরিপূর্ণ অপর একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে। উহার উপরিস্থ জঙ্গলের মধ্য দিয়া গবাদি পশু সকল বিচরণ করিতে সমর্থ। এই সরোবরের এক তীরে বনাবৃত উচ্চভূমি; উহা একটী প্রকাণ্ড দুর্গের বিস্তীর্ণ ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান হয়। এই দুই সরোবর ব্যতীত রাজা নবরঙ্গ রায় কর্তৃক খনিত আরও শতাধিক জলাশয়ের চিহ্ন আছে। তাহার কতকগুলি ব্যবহার্য্য, কতকগুলি অব্যবহার্য্য; কতকগুলি শুষ্ক ও কতকগুলি কেবল চিহ্ন মাত্রে পর্য্যবসিত। এই সমস্ত সরোবর ও জলাশয় দ্বারা রাজধানীর চতুর্দ্দিক সমাকীর্ণ ছিল।

গোপীনাথজীর মন্দির।

যে সরোবরের পশ্চিমতটে রাজভবন বিরাজিত ছিল, উহার উত্তরতট হইতে উত্তরাভিমুখে প্রায় তিনপোয়া মাইল দূরেই সুপ্রসিদ্ধ ভোগবেতালের ৺গোপীনাথের মন্দির। ৺গোপীনাথজী প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত দেবতা এবং রাজা নবরঙ্গ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই সরোবরের দক্ষিণতীর ভেদ করিয়া একটী খাল ৺গোপীনাথজীর মন্দিরের লগ্ন পূর্ব্বক পুষ্করিণীতে প্রবেশ করিয়াছে। রাজা নবরঙ্গ রায় রাজপ্রাসাদ হইতে 'সাগরদীঘি'র ঘাটে নৌকায় উঠিয়া ঐখাল দ্বারা ৺গোপীনাথজীর দর্শনে যাইতেন; এইজন্য ঐ খালের সৃষ্টি। রাজা নবরঙ্গ রায়ের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে ৺গোপীনাথজীর সেবা নির্ব্বাহ হয়। ৺গিরিশ রায়ের কর্তৃত্ব সময় পর্য্যন্ত রাজ-প্রদত্ত তাম্রফলক সেবাইতগণের হস্তে দৃষ্টিগোচর হইত। এখনও দোলযাত্রা উপলক্ষে ৺গোপীনাথজীর মেলা হইয়া থাকে।

ভোগবেতাল রাজ্যের বিস্তৃতি।

ভোগবেতাল রাজ্যের বিস্তৃতি কতদূর ছিল। তাহা এক্ষণে সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রবাদ আছে, রাজা নবরঙ্গ রায়ের রাজকোষে প্রতি বৎসর ৫২লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইত। রাজবাটী হইতে উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে 'বরান্তর' গ্রাম শ্রীহট্ট জেলার শেষ সীমায় পায়ে হাঁটিয়া চলিলে দুই দিবসের পথ। এই বরান্তর গ্রামের ভূঁইয়াদিগের আদিপুরুষ মহামাণিক্য রাজা নবরঙ্গ রায়ের এককন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐসকল স্থান যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অতএব এখানে তাঁহার রাজ্য সীমার একপ্রান্ত এবং আরও প্রবাদ আছে যে, তাঁহার কতিপয় পরাক্রান্ত স্বজন ও অনুচর 'মধুপুরের গড়' নামক স্থানের উচ্চ ভূমিতে পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার রাজ্যের সীমা যতদূর অবধারিত হয়, তাহাতে তাঁহার বাৎসরিক ৫২ লক্ষ টাকা আয় হওয়া বিচিত্র নহে। মুসলমান অধিকার কালে রায় বংশের ও বরান্তর ভূঁইয়াদিগের সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন পরগণা বন্দোবস্তকারী জমিদারগণের হস্তগত হয়।

চারিপাড়া গ্রামের ভগ্নাবশিষ্ট রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে রাজা নবরঙ্গ রায়ের চতুর্দ্দোল বাহক, বৈঠাদার গামুহা বংশ প্রভৃতি রায় বংশের বহুতর ভৃত্যবংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। রাজার বাটীতে নবরঙ্গ রায়ের যে সন্ততি-ধারা বাস করেন, যদিও তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছে,

তথাপি ঐস্থানে তাঁহারা এখনও সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশ বলিয়া গণ্য।

কাল নির্ণয়।

রাজা নবরঙ্গ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণের হস্ত হইতে মুসলমান প্রতাপে ভোগবেতাল রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। কোন সময়ে তাঁহারা রাজত্ব করিতেন, তাহা একরূপ স্থিরীকৃত হইতে পারে। তাঁহার জামাতা বীর মহামাণিক্য হইতে বরান্তরের বর্ত্তমান ভূঁইয়াগণ ১৬।১৭ পুরুষ অধস্তন এবং নবরঙ্গ রায় হইতে তসবংশীয়গণ ২১ পুরুষ মাত্র অধস্তন; কোথাও ১৮।১৯, কোথাও ২১।২২ পুরুষ চলিতেছে। ঐতিহাসিক প্রথানুসারে ৪ পুরুষে একশত পুরুষ ধরিলে বর্ত্তমান সময়ে অন্যূন ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত কোন সময়ে নবরঙ্গ রায় বিদ্যমান ছিলেন, ধরা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তীকালে হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। চারিপুরুষে একশত বৎসর ধরা ঐতিহাসিক প্রথা, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। একশত বৎসরে দুই তিন পুরুষ দেখা যায়।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে নবরঙ্গ।

রাজা লাউ সেনের সহিত গৌড়েশ্বরের প্রবল সংঘর্ষ ধর্ম্মপুরাণ, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে বর্ণিত আছে। মেদিনীপুরের ময়নাগড়ের রাজা লাউ সেনের দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। অজয়নদের তীরে ইচ্ছাই ঘোষের বাড়ীর রাশিকৃত ইষ্টকাবলী এখনও পড়িয়া আছে। এসব চাঁদ সদাগরের নিবাস স্থানের ন্যায় কল্পিত রাজ্য নহে; গৌড়ের প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজগণের সম্বন্ধে বিস্তারিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন ঐতিহাসিক বীরগণকে কল্পনার গাঢ় তুহিনে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যখন গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী পাত্র মহামোদ রাজা লাউ সেনের ময়নাগড় আক্রমণ করিতে যান, তখন তাঁহার সৈন্য মধ্যে নবরঙ্গ রায় বিদ্যমান ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, এই নবরঙ্গ রায়ই পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া ভোগবেতাল অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, ও রাজা নবরঙ্গ রায় নামে প্রখ্যাত হন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত জানিবার কোন উপায় নাই। ময়মনসিংহ জেলায় এখনও প্রবাদ আছে, রাজা নবরঙ্গ রায় দেশ হইতে আসিয়া এই ভোগবেতাল রাজ্য স্থাপন করেন। এই সমস্ত প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস বড়ই দুর্জ্ঞেয়। সম্ভবতঃ ইহা কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল। রাজা নবরঙ্গ রায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

রাজ্যলোপ।

ভোগবেতাল রাজ্য কিরূপে বিনষ্ট হইয়া গেল, সে ইতিবৃত্ত অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এখনও এই অঞ্চলে এই রাজ্যলোপ সম্বন্ধীয় কতিপয় করুণ রসাত্মক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এ প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিবার স্থান নাই। কথিত আছে, ময়মনসিংহ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান বংশের আদি পুরুষ ইশা খাঁ * এই অঞ্চলের ২২ পরগণার সনন্দ লইয়া জঙ্গল বাড়ীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

* "হিজলীর বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৫০৫ খ্রীঃ ইশা খাঁ নামক একজন মুসলমান আক্রমণকারী হিজলীর শেষ হিন্দু নরপতি মাহিষ্য-কুলগৌরব গোবর্দ্ধন দাস রণঝাঁপকে পরাজিত করিয়া হিজলী রাজ্য হস্তগত করেন এবং সমগ্র ভাটী প্রদেশের অধিকারী হন। হিজলী হইতে বঙ্গোপসাগরের তীর দিয়া ময়মন-

দিল্লীর সম্রাটের পক্ষ হইয়া নূতনরাজ্য অধিকার করে, এই সনন্দের মূল প্রয়োজন। এইজন্য ময়মনসিংহ অঞ্চলের তৎকালীন বহু-সংখ্যক হিন্দু ভূঁইয়া রাজগণের সহিত ঈশা খাঁর প্রবল সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। প্রবাদ আছে, রাজা নবরঙ্গ রায়ের বংশধরগণের সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে অপারক হইয়া ঈশা খাঁ কৌশল ক্রমে •ভোগবেতাল রাজ্য অধিকার করেন। ঈশা খাঁর বেগম ভোগবেতালের রাণীর সহিত অন্দরে সাক্ষাৎ করিবেন, এই অছিলায় বহু সংখ্যক শিবিকা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শিবিকায় স্ত্রীবেশধারী সৈনিক পুরুষগণ নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত অনুসারে যথা সময়ে তাহাদের নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করে। রাজ-পুরুষগণ অতর্কিত ভাবে হঠাৎ এইরূপে আক্রান্ত হইয়া হতাহত হইলেন। রাজ পরিবারের কেহ কেহ পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে ভোগবেতা-লের গড় ও রাজধানী ঈশা খাঁর অধিকার-ভুক্ত হয়। কিয়দ্দিন পরে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণের অনুমতি ক্রমে রাজা নবরঙ্গ রায়ের বংশধরগণ, যেস্থানে রাজবাটী অবস্থিত ছিল, তথায় বাস করেন এবং সামান্য জমি-দারী পুনঃপ্রাপ্ত হন। বরাস্তরের ভুঁইয়াগণও এইরূপ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হন। তাঁহাদের বংশধরগণ অধুনা শ্রীহট্ট অঞ্চলে বাস করিতেছেন, রাজা নবরঙ্গ রায়ের অধীন বহুতর ভুঁইয়া সামন্ত রাজগণ বিদ্যমান ছিলেন। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশের মধ্যে তাঁহাদের বহুসংখ্যক গড় ছিল। অদ্যাপি ঐসকল গড়ের ভগ্নাবশেষ এই প্রদেশের বনভূমির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব বলিয়াছেন, যেন কোন এক সময়ে একই-রূপ বিপৎপাতে এই সমস্ত গড় ধ্বংসের পথে পতিত হইয়াছে।

পরাক্রান্ত ঈশা খাঁই ভৌমিকগণকে উৎপা-দিত করিয়া এই অঞ্চলে প্রকৃত পক্ষে মুসলমান আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। হিন্দুর শেষ বীর্য্যস্ফুলিঙ্গ এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হয়। রাজা নবরঙ্গ রায় বাহুবলে যে ভোগবেতাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌর-বের সহিত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন, কালের কঠোর কশাঘাতে সেই রাজ্য তাঁহার বংশধরগণের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। রাজ্য-লক্ষ্মী মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইয়া গেলেও ভোগবেতালের রায়চৌধুরীগণ কিম্বা বরাস্তরের ভৌমিকগণ এ প্রদেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত রাজবংশ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন। এবং এখনও তাঁহাদের বংশধরগণের অবস্থা শোচনীয় হইলেও বিশিষ্ট জমিদার বংশ বলিয়া গণ্য। কি নবরঙ্গ রায় বংশ, কি মহামাণিক্য বংশ, কিম্বা নবরঙ্গ রায়ের অধীনস্থ ভূঞাবর্গের বংশ সমূহ, সক-লেই মাহিষ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বংশীকুণ্ডা ও রবাক্ষিয়ার চৌধুরী বংশধরগণও মাহিষ্য-কুল-গৌরব উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন।

সিংহ শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যে যে স্থান জোয়ার ভাটার অধীন, সেই সকল নিম্নভূমি ভাটী বলিয়া কথিত হইত। প্রবাদ এই, হিজলার রাজা ইশা খাঁ ভাটীরাজ্য শাসন উপ-লক্ষে দিল্লীশ্বরের আদেশে জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলে একটী রাজধানী স্থাপন করতঃ ২২ পরগণা হস্তগত করেন। রাজা নবরঙ্গ রায় ইশা খাঁর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। গোস্বামী জয়নাথ কবিরত্ন কৃত বিবরণে নবরঙ্গ রায়ের পুত্র কি পৌত্র ইশা খাঁর সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন ও নবরঙ্গ রায়ের রাজ্য লোপ হয়, এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, নব রঙ্গ রায় ১৪৬০ খ্রীঃ লোক"—

শিক্ষা-সমাচার, ২৭ বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে এই সমুদয় পূর্ব্বতন রাজবংশধরগণ বাঙ্গালার অতীত গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান আছেন। চন্দ্রদ্বীপ ও বিক্রমপুরের রাজগণের প্রতিপত্তি বিলোপের পর প্রায় চারি শত বৎসর কাল পূর্ব্ববঙ্গে ইঁহারাই পাঠানশক্তিকে প্রবেশ লাভে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, অবশেষে হিজলীয় মসনদ-ই-আলি ও জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খাঁ ভাবী প্রদেশের অধিকার সনন্দ লইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক এই সমস্ত ভৌমিকগণের ও রাজগণের প্রতাপ বিলোপ করেন। রাজা নবরঙ্গ রায়ের ইতিবৃত্ত হইতে এ প্রদেশের ঐতিহাসিক তত্ত্বের এইরূপ আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীসেবানন্দ ভারতী।

টাকের জয়।

(বক্তার টাক ছিল।)

টাক ও চুলের মধ্যে বিবাদ এত ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক ও বদ্ধমূল যে, তাহাদের পরস্পরের মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত নাই। যেখানে চুল ঠিক সেইস্থানে টাক কদাপি দৃষ্ট হয় না, ও ঠিক যেখানে টাক, সেস্থানে চুলের গতিবিধি নাই। তাহাদের বিবাদভঞ্জনই বর্ত্তমান বক্তৃতার উদ্দেশ্য।

টাকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। টাকের সংস্কৃত নাম খালিত্য। এবং শ্মশ্রুতে টাক হইলে তাহার নাম ইন্দ্রলুপ্ত। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে, পুরাকালে ঋষিদের কেশে ও শ্মশ্রুতে টাক প্রচলিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ গভীর গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খ্রীষ্ট জন্মাইবার পূর্ব্বে ১৮১৫ সালের ১২ আশ্বিন শুক্রবারে পিতামহ ব্রহ্মার মস্তকে প্রথমে খালিত্যের জন্ম হয়! ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়া তাহা ফুটাইবার জন্য তাঁহার মস্তিষ্কের উত্তাপেই টাকের সৃষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণের টাক ছিল কিনা ভাগবতকার তাহা লিখেন নাই এবং ভগবদ্গীতায় ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাদেবের যে টাক ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ শঙ্করভাষ্যে ইহার কোন ইঙ্গিত না থাকিলেও ভারতচন্দ্র বলিতেছেন, লটাপট্ট জটাজুট সংঘট্টগঙ্গা।

বিক্রমাদিত্যের টাক সম্ভবতঃ ছিল না। কিন্তু জুলিয়স সীজরের টাক ছিল এবং আইভিপত্র-নির্ম্মিত জয়মাল্য তিনি সেই টাক ঢাকিবার জন্যই শিরে ধারণ করিতেন; তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার এরূপ কুৎসাবাদ করিয়াছেন। পীটার দি গ্রেটের, বিসমার্কের, গ্লাডষ্টোনের, টেনিসনের টাক ছিল। দেখা যায় যে, পৃথিবীতে যাঁহারা বিশেষ কিছু মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা খালিত্য সম্পদের অধিকারী ছিলেন। অতএব টাকের জয় হৌক।

বুদ্ধিমান হইলে মনুষ্য চিন্তাশীল হয়, চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্ক উত্তপ্ত—সেই উত্তাপে কেশরূপ আবরণ তিরোহিত হইয়া টাকের দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হয়। অতএব টাক সাধারণতঃ বুদ্ধির লক্ষণ। ইহা বলা যাইতে পারে বটে যে, কেবল এক চিন্তাতেই মাথা গরম হয় না, রৌদ্রেও মাথা গরম হয় এবং কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই চিন্তাশীল নহে, কারণ নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিও পরের

অনিষ্টচিন্তা করে। টাক হইলেই যে বুদ্ধি থাকিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির টাক হইতেই হইবে। অবশ্য এরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারে জন্মিয়াছেন, অস্বীকার করি না, যাঁহাদের টাক ছিল না। তাঁহারা নিয়মের ব্যতিক্রম।

তৈলমসৃণউজ্জ্বলঘনকৃষ্ণকুঞ্চিত কেশগুচ্ছ দেখিলেই আপাতসিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহার নিম্নে বুদ্ধি নাই। ঘনকেশবান্ ব্যক্তির বুদ্ধির অস্তিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ; এবং প্রমাণের ভার সেই কেশধারীর উপর।

ডারুইনের মতে সমধিক কেশ পশুত্বের লক্ষণ। মানুষের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ হইতে লোমরাশি খসিয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গেই টাক পড়িতেছে। সর্ব্বাঙ্গ হইতে লোম বিদূরিত করিয়া টাক শেষে কেশের দুর্গ মস্তক আক্রমণ করিয়াছে। এ দুর্গও টিঁকিবে না।

যেমন জগতে কেবল এক মনুষ্যজাতিই কথা কহিতে ও হাসিতে পারে, সেইরূপ এক মনুষ্যজাতিই খালিত্যধনের অধিকারী। আবার মনুষ্যজাতির মধ্যে আর্য্যজাতিই এবিষয়ে বিশেষ সৌভাগ্যবান্।—উদাহরণতঃ ইংরাজ, জার্ম্মাণ, পার্শী, হিন্দুজাতিরই মস্তকে টাক হয়। কাফ্রীর মস্তকে টাক কেহ দেখিয়াছেন কি? আবার এই আর্য্যজাতির মধ্যেই যাঁহারা বিশেষ বুদ্ধিমান, তাঁহাদেরই টাক সমধিক পরিমাণে বিকশিত হয়। যথা বিলাতে গ্লাডষ্টোন ইত্যাদি এবং ভারতে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ। অতএব টাকের জয় হোক।

তবে টাক দেখিতে সুন্দর কিনা, তাহা স্বতন্ত্র কথা। কবিতায় খালিত্যের সঙ্গে লালিত্যের সুন্দর মিল হয় বটে, কিন্তু কবিতার বাহিরে খালিত্যের সঙ্গে লালিত্যের কোন সম্বন্ধ হয় না! সিংহের কেশরের ন্যায় মনুষ্যেরও কেশ যে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেশ না থাকিলে মাথাটা বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কেশকে ভ্রূ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য অধিকার করিতে দিতে পারি না। ললাটহীন সুন্দর মুখ কেহ কল্পনা করিতে পারেন কি? অতএব যখন সৌন্দর্য্য হিসাবে ললাট অপরিহার্য্য, তখন সমস্যা এইমাত্র দাঁড়ায় যে—ললাটের রাজ্য কতখানি? সে কি এখন স্বীয় ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিয়া কেশরাশিকে পশ্চাতে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে? আমি বলি যাউক। যতক্ষণ ললাট সোজা হইয়া উঠিতে পারে, ততখানি তাহার ন্যায্য অধিকার, অর্থাৎ, কেশের রাজ্য পশ্চাতে ও পার্শ্বে। সম্মুখে থাকিবার তাহার কোন অধিকার নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, এই দুই রাজ্যের মধ্যে সীমা কি? আমি বলি যে, পণ্ডিতগণ টিকির দ্বারা ললাটরাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং মস্তকের পশ্চাতে যে গোলাকৃতি ক্ষুদ্র কেশশূন্য স্থান (কেশাবর্ত্ত) আছে, তাহাই তাহার সীমান্ত প্রদেশ (Scientific frontier) স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না, কারণ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি নাই। বুদ্ধিহীন টাক পত্রহীন বৃক্ষের মত ও জলহীন জলাশয়ের মত বিশ্রী কদাকার দেখায়;—বিশেষতঃ ঈশ্বর যখন তাঁহাদিগকে গুম্ফদাড়ি বিবর্জ্জিত করিয়া গড়িয়াছেন। মস্তকে কেশ না থাকিলে তাঁহাদের মুখ একান্ত একঘেয়ে ঠেকিবে। নারী ও পুরুষের সৌন্দর্য্যের মানদণ্ড বিভিন্ন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি, উন্নতললাট, দীর্ঘ দেহ, যেরূপ পুরুষত্বের লক্ষণ আয়তনেত্র, দীর্ঘ কেশদাম ও কোমল অবয়ব সেইরূপ নারীত্বের লক্ষণ। বৈষম্যেই পরস্পরের আসক্তি।

পুরুষের টাক দেখিলেই পুরুষের ভক্তি হয়—তা নারীর। যেন তাহার নিম্নে কতখানি চিন্তা, কতখানি গাম্ভীর্য্য, কতখানি বুদ্ধি! 'পুরাবত্র' কেশগুচ্ছ বিরাজ করিত, অধুনা তত্র' মহিমা আসিয়া অধিকার করিয়াছে।

চুলের উপর টাকের বিস্তৃতি অনেকটা অন্ধকারের রাজ্যের উপর আলোকের বিস্তৃতির ন্যায়। সামাজিক বিকাশে আলোক-রাজ্য যত প্রসারিত হইতেছে, অন্ধকারের রাজ্য ততই অপসারিত হইতেছে। পরিশেষে বহু শতাব্দী পরে মস্তকে কেশের রেখামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। যদি কিছু থাকে—ত সে টিকি। (বক্তার টিকি ছিল)। সভ্যতার প্রসারের সহিত টাকের প্রসার অনিবার্য্য। অতএব টাকের জয় হৌক্।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

নেতা নরেন্দ্রনাথ।

কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, রাজনৈতিক ও সামাজিক সভা, ধর্ম্মসভা, সমাজসংস্কার সভা, যেখানেই গিয়াছি, মনে হইত, এক মহাপুরুষ মহাশক্তি রূপে বাঙ্গালী জাতির শীর্ষ স্থানে বিরাজ করিতেছেন। যাঁহাদের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতির নাম শীর্ষ স্থানে উঠিয়াছিল, পদদলিত জাতি ভারতের নেতৃজাতি রূপে উন্নীত হইয়াছিল, যাঁহাদের চিন্তাশক্তি, রচনা-কৌশল, নেতৃত্ব গুণে বাঙ্গালী জাতি উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ পদবী গ্রহণ করিয়াছেন, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর গোপাল ভাঁড় স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র নাথকে নরন্ধ্র নামে একদা অভিহিত করিয়াছিলেন, বাস্তবিক নরেন্দ্রনাথের যশঃ রন্ধ্রহীন। যদিও আমি নরেন্দ্রনাথের বিশেষ নিকটবর্ত্তী ছিলাম না, কিন্তু নরেন্দ্র-চরিত্রের ভিতর বাহির বাঙ্গালী জাতির বিশেষ লক্ষ্য স্থান ছিল, সুতরাং আমি তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে সাহস করিতেছি।

দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার চরিত্রের দুই মূল উল্লেখ করিয়াছেন, পৈতৃক ও আনুষঙ্গিক। দুই দিকেই নরেন্দ্রনাথ আদর্শ। যে পরিবারে মহাত্মা রামকমল সেন বাঙ্গালা জাতির অলঙ্কার রূপে বিরাজ করিতেন, যাহার পুত্র হরিমোহন, প্যারী-মোহন, মুরলীধর কলিকাতায় সুবিখ্যাত। প্যারীমোহনের পুত্র কেশবচন্দ্র অন্য সময় হইলে অবতার রূপে গৃহীত হইতেন, নরেন্দ্র তাঁহারই জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের পুত্র। হরিমোহন সেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। তাহার পুত্রগণ জয়পুর রাজ্যে অতি উচ্চপদে বিরাজ করিতেন, নরেন্দ্রনাথ সেই হরিমোহন সেনের যোগ্য পুত্র। কেশব চন্দ্রের সংসর্গে যিনি আসিতেন, তাহার লৌহময় চরিত্রও স্বর্ণ হইত। নরেন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা ও বাল্য-সহচর ছিলেন। সুতরাং কেশবের প্রভাব তাহার উপরে যে পতিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইলেও দুই নদ যেমন দুই ভিন্ন দিকে গমন করে, কতক দিন নরেন্দ্র কেশবের সহচর থাকিয়া পরে অন্যদিকে গমন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র

ধর্ম্মজগতে পূজ্য হইয়াছিলেন, নরেন্দ্র রাজনীতি ও সমাজনীতি-ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং নরেন্দ্র-চরিত্র অতি পবিত্র ও সকলের অনুধাবন-যোগ্য।

প্রথমে আমরা নরেন্দ্রকে সংবাদপত্রের লেখকরূপে দেখিয়াছিলাম। কেশবচন্দ্রের হস্ত হইতে তিনি ইণ্ডিয়ান মিররের ভার গ্রহণ করেন এবং হাইকোর্টে এটর্ণির কার্য্য করেন। Sunday Mirror কেশবচন্দ্রের যোগ্য-ভ্রাতা কৃষ্ণবেহারী সেন এম্-এ মহাশয়ের হস্তে থাকে, পরে নববিধান প্রচারের পরে Liberal & New Dispensatoin নাম গ্রহণ করে। India Mirror নরেন্দ্রনাথের যত্নে পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিকে, সাপ্তাহিক হইতে দৈনিকে পরিণত হয়। সেই অবধি চিন্তাশীলতায়, যোগ্যতায়, সৌম্যভাবে ও তেজে মিরর বাঙ্গালা কাগজের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছেন। লর্ড মিণ্টো বলিয়াছিলেন যে, সাধারণ লোকের মতের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যের পথে যাঁহারা অচল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা অন্ধ লোকের দ্বারা কাপুরুষ নামে অভিহিত হইলেও বীর। নরেন্দ্রনাথের শেষ জীবন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। কারলাইল বলিয়াছেন, Vox Populi অনেক সময়ে Vox Dei না হইয়া Vox Diaboli. নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একথা ঠিক কিনা, সময় তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিবে।

কিন্তু যত স্থানে নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছি, নরেন্দ্র সর্ব্বত্রই নেতা। চতুর্থ এলাহাবাদ কংগ্রেসে নরেন্দ্রনাথের সহিত লেখক এক গাড়ীতে এলাহাবাদ গিয়াছিলেন, তখন মনে হইল, নরেন্দ্রনাথই যেন সে অভিযানের নেতা। আর. ডি. মেটা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা বাবু, অশ্বিনী বাবু, অনাথবন্ধু বাবু, এ. চৌধুরী, এন. গুপ্ত, আরও কত নেতৃস্থানীয় মহাত্মা উক্ত গাড়ীতে ছিলেন। আমরা নরেন্দ্র বাবুর সহিত এক গাড়ীতে ছিলাম, মিঃ চৌধুরী বলিলেন, মিঃ সেন, আপনার বোধ হয় এ সমস্ত কার্য্যে অভ্যাস নাই, এই বলিয়া সদাশয় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মেটা আসিয়া, Where is Narendra মহাশয় বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া গেলেন। মোকামা ষ্টেসনে দুধ ও ফলমূল লইয়া লোকে নরেন্দ্রনাথকে অনুসন্ধান করিল। আমরা আর কিছু না পাইয়া সাহেবী ডিনার খাইলাম, নরেন্দ্র গাড়ীতে বসিয়া সাত্ত্বিক ফলমূল ও দুগ্ধদ্বারা প্রাতরাশ সম্পাদন করিলেন। আমরা যখন কংগ্রেস ক্ষেত্রে গেলাম, দেখি, যেন কাপড়ের সহরের ন্যায়, সেই বিশাল-ক্ষেত্র শত শত দেশের নেতাগণকে লইয়া দেশের উদীয়মান অভ্যুত্থানের পতাকারূপে বিরাজ করিতেছে। একঘুমের পরে শুনিলাম, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী মহারাষ্ট্রী, মান্দ্রাজী মিলিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের গৃহে রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। এ লোকের সঙ্গে থাকাও যেন জীবনের সৌভাগ্য। আমার বন্ধু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি একসময়ে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে অনেক লোককে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি আমার পোর্টমেণ্ট মধ্যে তাঁহার পোষাক রাখিয়াছিলেন। আমার চাবি হারান অভ্যাস, মন্মথ বাবু নরেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে তাঁহার চাবির তাড়াটা আনিয়া পোর্টমেণ্ট খুলিয়া চাবি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে গেলেন। তিনি বলিলেন, যাহোক, আমার চাবির দ্বারা একজনের উপকার হইল। আমি মন্মথ বাবুকে বলিলাম, আপনি

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন না? তিনি বলিলেন, যাঁহাকে পিতা বলিলেও হয়, গুরু বলিলেও হয়, তাঁহাকে আবার কি ধন্যবাদ দিব? নরেন্দ্রনাথ সাধুলোকের হৃদয়ে কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারাই প্রকাশ হয়। কংগ্রেসে যদিও জর্জ হউল সভাপতি ছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে নেতৃত্ব করিতেন। হায়, সেদিন কোথায়, যেদিন W. C. Bonerjee, মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্র নাথ বোণার্জি, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই সকল মহাত্মার নেতৃত্বে আমরা বাঙ্গালী প্রতিনিধিগণ যেন পর্ব্বতের আড়ালে থাকিয়া অপার গৌরব সম্ভোগ করিতাম! হায়, সেদিন ও সে সমস্ত লোক আজ কোথায়!

একবার শিল্পবিজ্ঞান-উন্নতি সভায় গেলাম, দেখি নরেন্দ্র সেখানেও সভাপতি। তিনি তাঁহার সেই নেতৃত্বের স্বরে ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করিয়া পরে কার্য্য আরম্ভ করেন। সকলের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহার প্রতি অগাধ। কলিকাতা কংগ্রেস সভায়, নরেন্দ্র-বিশপের ঈশ্বরের স্তুতিকারের পরে কার্য্য আরম্ভ হইল। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ কেবল রাজনীতির নেতা নহেন, ধর্ম্ম-রাজ্যেরও নেতা ছিলেন।

কলিকাতা অধিকাংশ সমাজের তিনি নেতা, একবার অম্বষ্ঠ-সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলাম, নরেন্দ্রনাথ সে সভায়ও সভাপতি।

কংগ্রেসের পরে নরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান মিররে অতি সারবান প্রবন্ধ লিখিতেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজাতির সম্মিলন, একত্র আহার, মধ্যে লম্বা টেবিল রাখিয়া দুইদিকে বেঞ্চ কি চেয়ারের বন্দোবস্ত করিয়া সকলের একত্র জলযোগ, প্রভৃতি হিন্দু-আচারের উদারতা বিস্তার করিতেন। সঙ্কীর্ণতা, জাতিভেদ, ক্ষুদ্রতা তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। সকল প্রকার সমাজ-সংস্কারের তিনি পক্ষপাতী। তিনি বিধবা বিবাহের উৎসাহদাতা, শ্রীযুক্ত জষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত একত্র হইয়া তিনি হিন্দুবিবাহের সংস্কারক। স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদাতা, জাতিভেদ সংস্কারের প্রস্তাব-কর্ত্তা। এ সকল নরেন্দ্রনাথের বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নরেন্দ্রনাথের মত।

জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁহার মত অতি উচ্চ, অথচ বৈপ্লবিক নহে। তিনি জানিতেন, সকল জাতির একেবারে ব্রাহ্মণত্বে সমুত্থান একটা ঘোর বিপ্লবের কথা, তিনি সংস্কারের পক্ষে, পূর্ব্বকার ন্যায় চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পক্ষ-পাতী। (১) সর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণ একজাতি। (২) বৈদ্য, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় জাতি। (৩) সকল নবশাখ জাতি তৃতীয় বা বৈশ্যজাতি। (৪) নিম্নজাতিগণ শূদ্রস্থানীয়। কিন্তু তাহাদের প্রতি ঘৃণা বিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। সকল জাতির পংক্তিভোজন ও একত্র জলপান বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষে অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। বিলাত যাত্রা বিষয়ে তিনি কংগ্রেসে প্রস্তাব করেন।

বিবাহ।

যখন বঙ্গবাসীর দল, জাতি গেল, ধর্ম্ম গেল, হিন্দু গেল, বলিয়া হিষ্টিরিয়া-রোগ-গ্রস্তের ন্যায় চীৎকারে আকাশ ফাটাইতে-ছিলেন, সেই সম্মতির আইনের সময় নরেন্দ্রনাথ একাকী সুরুচিসঙ্গতভাবে সে আইনের সমর্থন করেন। সে সময়ে এ দীনের প্রতি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ সম্মার্জ্জনী লইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, এ সকল তাঁহার মতে যুক্তিযুক্ত। সমাজসংস্কার তাঁহার অতিপ্রিয় বস্তু ছিল।

হিন্দু বিবাহ সংস্কার বিষয়ে তিনি ও মিঃ জষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মিলিত হইয়া এক নূতন বিধান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার মতে কন্যার বয়স পঞ্চদশের অন্যূন, ছেলের বয়স চতুর্বিংশ এবং সন্তান ও পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ হওয়া চাই। পঠদ্দশায় বিবাহ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়ে ইণ্ডিয়ান মিরর প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। বাল্যবিবাহের তিনি বিরোধী, তিনি হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারক, অথচ সঙ্কীর্ণতা কাহাকে বলে, জানিতেন না। তাঁহার জাত্যভিমান বা আত্মাভিমান ছিল না। অথচ আত্মমর্য্যাদা কখনও ভুলেন নাই।

তিনি নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতির একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, এবং পদদলিত জাতির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেণীর হিন্দু, শশধর ও কৃষ্ণপ্রসন্নের দলের নহেন। কোন মতবিরুদ্ধ কুসংস্কারের তিনি প্রতিবাদ করিতে ভীত হইতেন না। একবার যজ্ঞ বিষয়ে তাঁহাকে কে বুঝাইয়াছিল, তাই যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন যজ্ঞে নিষ্ঠুর ভাবে ছাগাদি পশু নিধন আবশ্যক, জানিতে পারিলেন, অমনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া পশুবলির বিরুদ্ধে লেখনী তুলিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান-বিবাদ সময়ে লিখিয়াছিলেন, ভাই হিন্দু, তুমি বিবাদ কর কেন? কশ্মীর দল তাহাদেরই হইবে।

সংবাদ পত্র।

আমি যখন বগুড়া পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলাম, তখন সংবাদ পত্রের বিষয়ে দুই মত হইল, সাহেবেরা বলেন, মিরর উঠাইয়া দেও, আমরা বলিলাম, ইংলিশম্যান উঠাইয়া দেও, পরে মিরর থাকিয়া গেল। এই মিররই তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠ করিতেন। মিররের মতগুলি যেমন স্বাধীন, তেমনই সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন। মিররে আমি যেন কেশবচন্দ্রের ভাব অনুভব করিতাম। ভাষাও তাঁহার ন্যায়। মিরর চিরদিন গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয়দিগের অধিকার লইয়া লেখনী-যুদ্ধ করিতেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে আদৌ ভয় করিতেন না। লর্ড ডফরিনের সহিত বিবাদের কথা এক্ষণে সংবাদ-পত্রের পাঠকগণের নিকট অবিদিত নাই। তিনি কংগ্রেসের নেতা, ভারত-সভার সভাপতি, শিল্প-বিজ্ঞান-সভার এবং বড় বড় অনেক সভার সভাপতি। বড় বড় সকল কার্য্যের তিনি নেতা।

স্বদেশী।

তিনি স্বদেশী ছিলেন, এবং সর্ব্ব প্রথমে স্বদেশীর উৎসাহদাতা ছিলেন। কিন্তু যখন বালকগণ ধর্ম্মনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া সাধু-বিগর্হিত নরহত্যা প্রভৃতি পন্থার অনুসরণ করিতে লাগিল, তখন সকল বৃদ্ধগণের ন্যায় তিনি চিন্তা করিবার একটু সময় লইতেছিলেন, তাই লোকে তাহাকে প্রতিক্রিয়াবাদী বলে। আমি শেষ বয়সের মিরর পড়িতে পাই নাই। সুতরাং জানি না, তাঁহার মত কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, একবার মিরর পত্রের একটী উদ্ধৃত অংশ পাঠে মনে করিলাম, গুরু শিষ্যের ন্যায় তাঁহার ও আমার একমত। তিনি এই বিপ্লব সময়ে লিখিয়াছিলেন—

Keshub, thou shouldst have lived more
For India has need of thee.

সত্য কথা, আমিও একদিন সেই কথা

বলিয়াছিলাম। নেতৃহীন হইয়া আমরা একবার পর্ব্বতশৃঙ্গে আবার ভীষণ কূপে উল্লম্ফন করিতেছি। কেশবের ন্যায় নেতা থাকিলে বঙ্গদেশ মস্তক ঠিক রাখিতে পারিতেন।

ধর্ম্মমত।

প্রথমে নরেন্দ্রনাথ কেশবের সহচর ছিলেন, মিরর সম্পাদন কার্য্যে, ভারত-সংস্কারক সভার সম্পাদক কার্য্যে সময়ে সময়ে মনে হইত, তিনি কেশবের সহযোগী। পরে কর্ণেল অলকট তাঁহাকে ভৌতিক ব্যাপার দেখাইয়া মুগ্ধ করিলেন। সেইদিন হইতে তিনি থিওসফির অনুসরণ করিতেন। তথায় গিয়াও তিনি সভাপতি হইলেন। তিনি থিওসফির সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু থিওসফিষ্ট হইয়াও নরেন্দ্রনাথ হাড়ে হাড়ে কেশবের শিক্ষার চিহ্ন দেখাইতেন, যাহা তাঁহার উল্লিখিত কবিতা প্রকাশে অবগত হওয়া যায়।

মিরর পত্রের জুবিলি উপলক্ষে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্শী, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী সকলে আমাদের ভ্রাতা। পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য দেশের সম্মিলন মনুষ্যজাতির সুখবৃদ্ধির উপায়। আমরা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রজা বলিয়া গৌরবান্বিত, এবং ভারতে ইংরাজরাজত্ব ঈশ্বর নিয়োজিত বলিয়া মনে করি। আমাদের বিশ্বাস যে নৈতিক মহত্বই জাতীয় উন্নতির আদর্শ, সংযম ও রাজভক্তি জনসাধারণের প্রধান সম্পত্তি। সামাজিক দোষ পরিহার, নারীজাতির ও পদদলিত সম্প্রদায়ের উন্নতি, আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান। সর্ব্বোপরি রাজা ও প্রজার ন্যায়পরায়ণতা ভারতবর্ষকে সম্পদ ও বিপদে রক্ষা করিতে সমর্থ। শাস্ত্রে বলে, "ধন্য সেই জাতি, ঈশ্বর যাহার প্রভু, ধন্য সেই জনসাধারণ, ঈশ্বর যাহাদিগকে অধিকার দিতে মনোনীত করেন।" লোকের ক্রোধ কি সন্তোষের দিকে না চাহিয়া ইণ্ডিয়ান মিরর এই ব্রত লইয়াছেন। এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমরা এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিব।"

কথা ও কার্য্যে মিলিয়া গিয়াছে। মহাপুরুষ মহান কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিব্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। একথা কেশবের শিষ্যের যোগ্য, কেশব যাহা বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ তাহা জীবনে পরিণত করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত নববিধানের মানুষ—Man of the New Dispensation. এক্ষণে এস নরেন্দ্র, ভারত তোমায় আবার দেখুক। তুমি "অকাল কুসুম, মরুভূমিময় দেশের বারি।" আজি বাঙ্গালী জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শী, কিন্তু চরিত্রবান লোক অতি বিরল। কথায় ও কাজে, মতে ও ব্যবহারে, বিশ্বাসে ও আচরণে সম্মিলন এদেশে দুর্ল্লভ। এক নরেন্দ্রনাথ সেদিকে দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছেন। রাজপুরুষের ভ্রুকুটীর ভয় করে না, তুমি ভিন্ন এমন লোক দেখি না। লোকের নিন্দাপূর্ণ চীৎকারে অবিচলিতমস্তিষ্ক, এমন লোক দেখি না, সত্য জানিয়া তাহা গ্রহণ করিবার সাহস অতি অল্পলোকেরই আছে। নিষ্ঠাবৃত্তি, তপ, সংযম এ শতাব্দীতে তুমি যেমন দেখাইলে, আর কেহ তেমন দেখায় নাই। তুমি প্রকৃতই মহাপুরুষের ভ্রাতা, ও নিজে অদ্বিতীয় মহাত্মা। তুমি প্রকৃতই আমাদের হিমালয়ান ভ্রাতাগণের আদর্শ। তাই বলি, এস নরেন্দ্র, তোমার মত খাঁটী লোক আজি বঙ্গদেশে দুর্ল্লভ। আজি বঙ্গ তোমার জন্য কান্দিতেছে, নারী

নর তোমার জন্য কান্দিতেছে। সভা সমিতি আজি অনাথ, কে তোমার হইয়া ঈশ্বরের নামে সকল সমিতিকে উদ্বুদ্ধ করিবে। আজি এই শোকার্ত্ত জাতিকে বলিয়া যাও,—"তোমরা কথায়, কার্য্যে, ব্যবহারে ন্যায়পরায়ণ হও।" শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন কথা। (১)

জন্ম।

মাদাম ব্লাভিস্কি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃকুল হ্যানবংশ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং বাল্যজীবনের উল্লেখ-কালে তাঁহাকে আমরা কুমারী হ্যান নামে অভিহিত করিব।

১৮৩১ খ্রীঃ রুষিয়া ও সমগ্র ইউরোপের পক্ষে একটী দুর্ব্বৎসর; কারণ ১৮৩০ হইতে ১৮৩২ পর্য্যন্ত তিন বৎসর ইউরোপের প্রত্যেক জনপদ পর্য্যায়ক্রমে ওলাউঠা রোগের লীলা-ভূমি হইয়াছিল। ইউরোপ খণ্ডে ওলাউঠার এই প্রথম প্রাদুর্ভাব। বিস্তর লোক এই মহামারীতে কালের করাল-কবলে পতিত হয়, এমন কি, জন সংখ্যায় ১/২০ অংশ পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। কুমারী হ্যানের পরিবার মধ্যে অনেকগুলি মৃত্যু ঘটে। সুতরাং চারিদিকে মহাকালের উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে তিনি ভূমিষ্ট হন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত হ্যানবংশের পারিবারিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত :—

কুমারী হ্যানের পিতা এই সময়ে সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিতেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের পর যে শান্তির সময়টুকু পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও নূতন যুদ্ধাদির আয়োজনে অতিবাহিত হয়। সেই কালে ৩০ ও ৩১ শে জুলায়ের মধ্যবর্ত্তী রাত্রিতে শিশু প্রসূত হন। সন্তানটীকে নিতান্ত ক্ষীণ ও নির্জ্জীব দেখিয়া আশু মৃত্যুর আশঙ্কায় তাহার বাপ্তিস্মের আয়োজন করা হইল,—পাছে আদি পাপ-ভার স্কন্ধে করিয়া তাঁহার আত্মাকে পরলোক গমন করিতে হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলা-পাদির বাহুল্য হেতু রুষিয়া প্রসিদ্ধ। বাপ্তিস্ম-সংস্কারে অনেকগুলি ধর্ম্ম পিতা এবং ধর্ম্ম-মাতা উপস্থিত থাকেন। তদ্ব্যতীত পুরোহিত দর্শক প্রভৃতি সকলকেই ক্রিয়ার আদ্যো-পান্ত এক একটী প্রজ্জ্বলিত পূত মোমবাতি হাতে করিয়া উপস্থিত থাকিতে হয়। অন্যান্য খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের ন্যায় গ্রীক চার্চ্চ সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ, পূজা আরতি আদি ব্যাপারে কেহ বসিতে পান না, শেষ পর্য্যন্ত সকলকে দণ্ডায়মান থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। বাপ্তিস্ম ক্রিয়ার জন্য যে ঘরটী নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা প্রকাণ্ড হইলেও বহুলোকের সমাগম বশতঃ স্থানের একটু অসঙ্কুলান হইয়াছিল। সেখানে কুমারী হ্যানের অল্প কয়েক বৎসরের বড় আর একটী শিশুকে জনৈক ধর্ম্মমাতার স্থলে নিযুক্ত করা হয়। এই শিশুটী কুমারী হ্যানের সম্পর্কে খুড়িমা। প্রায় একঘণ্টা কাল নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্লান্ত ও অস্থির হইয়া এই বালিকা খুড়িমা বয়োজ্যেষ্ঠগণের অজ্ঞাতে মেজের উপর বসিয়া

* জন্ম—১৮৪৩ খ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারি।
মৃত্যু—১৯১১ " ১লা জুলাই, অপরাহ্ণ।

পড়েন, এবং সেই জুলাই মাসের গরম দিনে জনতাপূর্ণ গৃহ মধ্যে থাকিয়া বোধ হয় একটু তন্দ্রাভিভূত হয়েন। ক্রিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বালিকাটী প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি লইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর পাদ-দেশে খেলিতে খেলিতে সহসা পুরোহিত মহাশয়ের বিলম্বিত বস্ত্রে আগুন লাগাইয়া দিলেন। এই ঘটনা যখন সকলে দেখিলেন, তখন প্রতীকারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফলে এক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। ইহাতে কয়েক ব্যক্তি, সর্ব্বাপেক্ষা সেই বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় গুরুতর রূপে অগ্নিদগ্ধ হইলেন। রুষিয়ার কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকে এই ঘটনাটীকে আরও একটী অশুভ চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিল, এবং স্থির করিল যে, এই ঘটনার মূল কারণ যিনি—অর্থাৎ ভবিষ্যতের মাদাম্‌ব্লাভাস্কি—তাঁহার জীবনে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না।

কুমারী হ্যানের জন্মলগ্নটী রুষদেশের প্রচলিত বিশ্বাসানুসারে একটু অনন্যসাধারণ। সুতরাং সেটীও এখানে উল্লেখযোগ্য। রুষিয়া-বাসীরা এক বাস্তুদেবতায় বিশ্বাস করে। ইঁহার নাম "দামোভাই"। ইনি লোক-নেত্রের অগোচর হইলেও গৃহের কর্ত্তা স্বরূপ। ইনি রাত্রে নিদ্রিত পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সর্ব্বত্র শান্তিরক্ষা করেন, সারা বছর গৃহস্থের হিতার্থে কঠোর পরিশ্রম করেন, প্রতি রাত্রে ঘোড়াগুলির গাত্র মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কৃত করিয়া রাখেন, তাঁহার চিরশত্রু ডাইনের হস্ত হইতে গরু বাছুর গুলিকে সদাই রক্ষা করেন। কিন্তু দামোভাই বৎস-রের মধ্যে একটী দিন, কেবল ৩০শে মার্চ্চ তারিখে—কি জানি কেন—বড়ই দুর্দ্দান্ত ও অনিষ্টপ্রিয় হইয়া উঠেন। ঐদিন তিনি ঘোড়াগুলিকে বিরক্ত করেন, গরুগুলিকে ধরিয়া প্রহার করেন। পশুগুলিকে ভয় দেখাইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করেন, এবং সমস্ত গৃহসামগ্রী ফেলিয়া, ছড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করেন। সারাদিনই জিনিষ পত্রগুলি পড়িতেছে—ভাঙ্গিতেছে—নিবারণের কোন উপায় নাই। কাঁচের গেলাস বাসনগুলি চূর্ণ হইয়া গেল, গৃহে নানা প্রকার অশান্তি কলহ উপস্থিত হইল—এ সকলই "দামোভাই"এর কাণ্ড বলিয়া লোকের ধারণা। ৩০ ও ৩১শে জুলাইএর মধ্যবর্ত্তী রাত্রে যাহাদের জন্ম হয়, কেবল তাহারা দামোভাইএর উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়। আবার ঐ দুইদিন ডাইনদের ক্রিয়া কলাপের জন্য ভারি প্রসিদ্ধ। গৃহের ধাত্রি-গণ এইজন্য কুমারী হ্যানকে একপ্রকার ভয় ও ভক্তির চক্ষে দেখিত। তাহারা উহাঁকে "সেদ-মিচকা" বলিয়া ডাকিত। "সেদমিচকা" অর্থে "সাতের লোক"—অর্থাৎ সপ্ত সংখ্যার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে। বৎসরের সপ্তম মাস জুলাইয়ে কুমারী হ্যানের জন্ম হয় বলিয়া ভৃত্যেরা তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিত। ৩০শে জুলাই ধাত্রিগণ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ, অশ্বশালা ও গোশালার চারি-দিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত, এবং নানা প্রকার দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রপাঠ করিয়া তাঁহার হস্ত দ্বারা গৃহের চারিদিকে জল ছিটাইয়া লইত, বিশ্বাস,তাহা হইলে আর ডাইনের ভয় থাকিবে না। বালিকাও জ্ঞানোন্মেষের প্রারম্ভেই ঐ সকল ক্রিয়ার রহস্য অবগত হইলেন, এবং ডাইন প্রভৃতি উপদেবতার উপর তাঁহার যে কর্তৃত্ব আছে, তাহা স্থির করিলেন।

জর্ম্মাণির প্রাচীন 'ভন্ হ্যান' বংশ ইউ-রোপখণ্ডে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। 'ভন্-হ্যান' বংশীয়গণ 'কাউন্ট' আখ্যায় প্রসিদ্ধ।

পাশ্চাত্য উচ্চ সম্ভ্রান্ত কুলীন-সমাজ যে কয় শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে 'কাউণ্ট' একটী। কুমারী হ্যান জর্ম্মানির এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন কাউণ্ট-বংশ-জাতা। তাঁহার পিতামহ জেনারেল এলেক্সিস হ্যান্ কর্ম্মোপলক্ষে জর্ম্মাণি হইতে উঠিয়া রুসিয়ায় বাস নিরূপণ করেন এবং রুসিয়ার সামরিক বিভাগের উচ্চ সেনাধ্যক্ষ ('জেনারেল') পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্রী আইদা হ্যান্ হ্যান্ জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে ইহাঁর ভগ্নী। কুমারী হ্যানের পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী কাউণ্টেস্ প্রবোস্তিন বিখ্যাত রাজকুমার নিকোলসের ভ্রাতা নিকোলস্ ওয়াসিল্ চিকফের সহিত পুনরায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

কুমারী হ্যানের পিতা যখন সৈন্যবিভাগে 'কর্ণেল' পদে নিযুক্ত তখন তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। কুমারী হ্যান তখন শিশু মাত্র। শৈশবেই তিনি মাতৃহীনা হইলেন। পত্নী-বিয়োগের পর কর্ণেল হ্যান উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই রমণী রুষিয়ার এক-জন বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্রী। ইনিই 'জিনেদা-আর' এই কৃত্রিম নামে সাহিত্য-জগতে পরিচিতা। ইনিই রুষভাষায় উপন্যাস লিখিবার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আয়ু পঁচিশ বৎসরেই পূর্ণ হইয়া গেল। এই তরুণ বয়সেই তিনি ইহসংসার হইতে বিদায় লইয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত দশ বৎসর মাত্র সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ইনি রুষ-ভারতীর কণ্ঠভূষা-স্বরূপ দ্বাদশখানি নবন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই জর্ম্মণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহাঁর প্রকৃত নাম হেলেনি ফেদিফ। রুষীয় উপন্যাসের জননী এই হেলেনী ফেদিফই কুমারী হ্যানের মাতা। জলধিগর্ভেই রত্নের জন্ম। উপন্যাস কল্পনার লীলা, কিন্তু তাহাতে জীবনের অনেক প্রকৃত তত্ত্ব প্রকটিত থাকে। কুমারী হ্যানের জীবন উপন্যাস অপেক্ষা কম বিস্ময়কর নহে, পরন্তু ইহা আগাগোড়াই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মননযোগ্য প্রকৃত তত্ত্বের একটী প্রকট মূর্ত্তি।

কুমারী হ্যানের পিতা কর্ণেল পিটার হ্যান্ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বেরনেস (Baroness) ভন্ লেঙ্গীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যাই অতঃপর 'ছোট লিসা' নামে আখ্যাত হইয়াছে। কুমারী হ্যানের বাল্য-জীবন তাহার অপর ভগ্নীর ন্যায় এই ছোট লিসার সহিতও কতক পরিমাণে জড়িত। ঐ বিবরণ বর্ণনকালে ছোট লিসার পরিচয় পাইব।

কুমারী হ্যান্ রাজপুত্রী হেলেনী দলগোর-কীর দৌহিত্রী। তাঁহার মাতামহ এনড্রু ফেদিফ রাজ্যের একজন প্রিভিকৌন্সিলর ছিলেন। কুমারী হ্যানের মাতৃকুল সম্পর্কীয় পূর্ব্বপুরুষগণ রুষ-সাম্রাজ্যের উচ্চতম প্রাচীন বংশাবলীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারাই রুষিয়ার সর্ব্বপ্রথম নরপতি প্রিন্স রুরিকের সাক্ষাৎ বংশধর। আবার, উক্ত কুলোদ্ভবা অনেক রমণী বিবাহ-সূত্রে রুষিয়ার পাটরাণী (জারিনা) রাজ-প্রাসাদের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। দলগোরকী বংশীয়া মিরিয়া নিকিতিষ্কা নাম্নী রাজকুমারীই ইতিহাস-বিশ্রুত সম্রাট পিটার-দি-গ্রেটের পিতামহ নৃপতি মাইকেল ফেদোরি-ভিচের মহিষী ছিলেন। এই বংশীয় অপর রাজপুত্রী কেথারিন আনেক্সীবনার সহিত

সম্রাট দ্বিতীয় পিটারের পরিণয় সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই সম্রাটের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

কুমারী হ্বানের প্রমাতামহ প্রিন্স পল যখন মাতৃক্রোড়শায়ী ক্ষুদ্র শিশু, তখনই সম্রাট কর্ত্তৃক "কর্ণেল-অব-দি-গার্ডস্" এই উচ্চ সামরিক উপাধিতে ভূষিত হন। প্রিন্স পল পরে ফরাসি জাতীয় সম্ভ্রান্ত হিউগনট-বংশীয়া কাউণ্টেস্ দেউ-প্লেসী নাম্নী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। হিউগনট-পরিবার ফ্রান্স হইতে রুসিয়ায় আসিয়া বসবাস করে। উক্ত মহিলার পিতা সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়া কেথারিনের সভাসদ ছিলেন। মাতাও সম্রাজ্ঞার প্রিয় সহচরী ছিলেন।

আমরা উপরে মাদাম ব্লাভাস্কির যে বংশ-পরিচয় পাইলাম, তাহাতে দেখিতে পাই, যে কুলে তাঁহার জন্ম, উহা ইউরোপের মধ্যে আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ, সামাজিক সম্মানগৌরবে রাজসিংহাসনের অধিকারিগণের সমতুল্য, এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পদেও কম উচ্চ নহে। আর পাই, তাঁহার ধমনীতে তিন জাতির শোণিত প্রবাহিত ছিল। জর্ম্মান, ফরাসী ও রুষ (স্লাভনীয়) এই তিনটী প্রধান জাতির শোণিতবাহী ভাব-নিচয়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন ক্ষেত্র—মাদাম ব্লাভাস্কি। জর্ম্মাণের দার্শনিক মস্তিষ্ক, ফরাসীর আবেগপূর্ণ উচ্চ হৃদয়, রুষের একনিষ্ঠ উত্থমশাল নির্ভীকতা আমরা তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

প্রভাতে

জাগিয়াছে বিশ্বের পরাণ
তাই হাসে প্রকৃতি সুন্দরী,
বিহগের মাতোয়ারা সুরে
ঝরিতেছে অমিয়-লহরী।

বিটপীর শ্যাম অঙ্গ ঘিরে
গলিত সোণার রেখা ভায়,
পরশিয়া মেদুর পবন
কাঁপে ধীরে ব্রততীর কায়।

হেঁসে ফুল সুরভির হাসি
সুষমা বিকাশ করে ধীরে,
নিরখিয়া সৌন্দর্য্য সম্ভার
কাঁটা দেয় তটিনীর নীরে।

কিশলয়ে ভূষিত পল্লব
ফুল হাসে হাসিছে বল্লরী,
বাতাস সুরভি মাখি গায়
ছড়াইছে স্বর্গের মাধুরী।

হেনকালে হৃদয় কি কভু
করিবে না ভক্তি রস পান?
হেনকালে বৈষয়িক চিত
করিবে না বিশ্বেশ ধেয়ান?

রে হৃদয় ত্যজিয়া আলস
পুণ্যরেণু করবে সঞ্চয়,
ধর্ম্মনীতি স্থাপিয়া মরমে
ঠেলে ফেল জগতের ভয়।

দূরে যাবে যত অমঙ্গল
পাপ তাপ থাকিবেনা আর,
পুলকে ধরণী ভরিয়াছে
খুলে গেছে স্বর্গের দুয়ার।

কে ডাকিছে করিয়া ইঙ্গিত
প্রদানিতে দেবপদে চিত,
কে বলিছে নীতি-রস পানে
এ প্রভাতে হ'তে পুলকিত?

শ্রীবনোয়ারীলাল গোস্বামী।

ধর্ম্মের দুই দিক।

ধর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—জ্ঞানের ধর্ম্ম এবং ভক্তির ধর্ম্ম। মানব-বুদ্ধিতে পরমেশ্বরের যে অস্তিত্ব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা জ্ঞানের ধর্ম্ম এবং মানব-হৃদয়ে যে ব্রহ্ম-সত্তা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তাহা প্রেমের ধর্ম্ম। চিন্তাশীল সাধকের নিকটে প্রথমে ধর্ম্মের এই দুইটী দিকের পার্থক্য বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; কিন্তু পরিশেষে সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় দুইটী দিক, দুইটী নদীর ন্যায় একীভূত হইয়া ব্রহ্ম-সাগরে উপনীত হয়।

জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্ম্ম চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত।—(১) সৃষ্টি-কৌশলে স্রষ্টার পরিচয়, (২) কারণবাদ, (৩) নৈতিক জীবনে ঈশ্বর-সত্তা দর্শন, (৪) জ্ঞানবাদ। এই চারিটী তত্ত্বের এক একটী তত্ত্ব, এক একটী ধর্ম্মশাস্ত্র। উন্নত মানব-বুদ্ধি ব্রহ্মতত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সুগভীর চিন্তাযোগে এক এক দিকে এক একটী মীমাংসায় উপনীত হইয়া পরিত্রাণার্থী নরনারীর সুমহৎ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে সেই বিশ্ব-স্রষ্টার পরিচয় লাভ করিয়া মানব-চিত্ত বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড। পৃথিবীর পরিধি ২৫ হাজার মাইল। এই পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য ১২ লক্ষ গুণ বৃহৎ। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ৯ কোটী বিশ লক্ষ মাইল। আমাদের এই সৌর জগতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস, নেপচুন, এই আটটী বড় গ্রহ এবং প্রায় ৪ শত ছোট ছোট গ্রহ আছে। বুধ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে, নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা দূরে। সূর্য্য হইতে নেপচুনের ব্যবধান, পৃথিবীর ব্যবধানের বিশ গুণ। এই প্রকাণ্ড সৌরজগতের কেন্দ্র স্থানে বাস করিয়া সূর্য্য সকলকে নিয়মিত করিতেছে। সূর্য্যের সঙ্গে গ্রহ উপগ্রহগণের কেমন শৃঙ্খলিত যোগ। এই নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং অবধারিত সুপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া জ্ঞানী দার্শনিক বলিলেন, যে শক্তি দ্বারা এসকল নিয়মিত, রক্ষিত হইতেছে এবং যে শক্তি কল্যাণ উৎপাদন করিতেছে, সেই শক্তি অন্ধ শক্তি নহে—এক জ্ঞানময়ী পরমা শক্তি। জগতের ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্যে—জগৎ লীলার মধ্যে পরিণামদর্শী জ্ঞানময়, মঙ্গলময় স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি অনন্ত আকাশ-পটে "সূত্রে মণি সকলের ন্যায়" অনন্ত সৌর-জগৎ সৃষ্টি করিয়া একই বিশ্বজনীন নিয়মে, একই পথে পরিচালিত করিতেছেন; যিনি উত্তপ্ত গ্রহদিগকে জীবন বাসের উপযোগী করিয়া আশ্চার্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন; যিনি জীব জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার জীবন ধারণের আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন; তিনি কি জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, বিধাতা নহেন? এই সৃষ্টি স্বয়ম্ভূ নহে; জড়ের এমন শক্তি নাই যে, আপনাকে প্রকাশ করিতে এবং চৈতন্যকে সৃষ্টি করিতে পারে। এই নিখিল সৃষ্টি রাজ্যে সৃষ্টি কর্ত্তারূপে—শক্তিরূপে স্রষ্টার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মানব-মন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া উঠে :—

"চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্য ময়, পূর্ণ তোমার
ভাণ্ডার"।

দ্বিতীয়, কারণবাদ। এজগতে নিয়তই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময় জগৎ এক মুহূর্ত্তও নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। মেঘ বারি-বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে। প্রকৃতি চিরকর্ম্মপরায়ণা, নিয়ত কর্ম্মে ব্যস্ত।

বিশ্বভুবন অধ্যবসায়শীল পুরুষের ন্যায় কর্ম্ম-পরায়ণ। কর্ম্ম কি? এক একটী ঘটনা বিশেষ। কর্ম্ম বলিতেই ঘটনা বুঝায়। সকল কর্ম্মেরই কারণ আছে। কারণ গুলিও ঘটনা নামে অভিহিত হইতে পারে। একটী ঘটনা হইতে আর একটী ঘটনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। একটী ঘটনা আর একটী ঘটনার জনক-স্বরূপ। নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনারাশিই "কারণ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। চিন্তাশীল জ্ঞানীর নিকটে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয় যে, কারণের আদি কারণরূপে একজন জ্ঞানময়, মঙ্গলময় নিত্য পুরুষ বিরাজিত আছেন। তিনি কারণরূপী। "আদি সত্য তিনি, কারণ কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে"; তিনি অবিনাশী অনাদ্যনন্ত পূর্ণ পুরুষ। তিনি সকলের মূলে দণ্ডায়মান থাকিয়া কর্ম্ম সমূহ উৎপাদন করিতেছেন। ঘটনা সমূহ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ঘটনাময় দেশ ও কাল তাঁহাতে বিধৃত।

তৃতীয়, মানব-জীবনে—ইতিহাসে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, প্রেম ও পুণ্যের জয় বিধান হইতেছে। অধর্ম্ম, অসত্য, অপ্রেম, অপবিত্রতা, দুর্নীতি পরাভূত হইতেছে। সর্ব্বদেশে, সকল সময়ে, সকল নরনারীর জীবনে একই নিয়মে নৈতিকশাসন প্রতিষ্ঠিত। মানব-জীবন-রাজ্যে একজনের কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত। মানব-স্বভাব উন্নতি এবং কল্যাণমুখীন। ইহা একই সূত্রে গ্রথিত, একই ভাবে নিয়মিত ও পরিচালিত। যে প্রেম, পুণ্য, আনন্দ ঋষি-প্রতিম নরনারীর জীবন-শোভা সম্পাদন করিতেছে, সেই প্রেম, আনন্দ এবং পুণ্যের স্রোত অসভ্য কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রির জীবনেও উচ্ছ্বসিত। পাপের শাস্তা, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা রূপে প্রেম ও আনন্দদাতারূপে এক পরম পুরুষ সকলের জীবনের মূলে লাবণ্যময় অধিপতির বেশে দণ্ডায়মান।

"সকলের মূলে, তুমি আছ ব'লে,
মধুময় এসংসার;
তোমার প্রেমের তুলনা, মিলেনা মিলেনা,
তুমিই তুলনা তার।"

"বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়!
তব প্রেম লাগি, দিবানিশি জাগি ব্যাকুল হৃদয়।"

এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের স্বরূপালোকে মানব চরিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। সেই স্বরূপ আলোকে মানব জীবন সুন্দর শোভন মধুময় হইতেছে। একই সূর্য্যের কিরণ সম্পাতে যেমন ধরাতল আলোকিত হয়, তেমনি পরমেশ্বরের প্রেম, পুণ্য ও আনন্দ-কিরণে মানবজীবন কুসুমিতকুঞ্জকাননসদৃশ শোভান্বিত হইতেছে। সুতরাং তিনি কেবল সৃষ্টিকারী-রক্ষাকারী ঈশ্বর নহেন; তিনি পাপ, তাপহারী, কল্যাণময়, ভগবান। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় মানব-সন্তান উন্নতিপথে—অমরধামে গমন করিতেছে।

চতুর্থ, জ্ঞানবাদ। এই জগৎ এক চিরন্তন জ্ঞান সত্তার বিকাশ। এক অখণ্ড অনন্ত জ্ঞান-সত্তা ভিন্ন এ ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় কোন সত্তা নাই। এই যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দময় জড় জগৎ, ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এ সকল অনুভূতি মাত্র। একই জ্ঞান বিষয় ও বিষয়ীরূপী। জীব-চৈতন্য বলিয়াও দ্বিতীয় সত্তা নাই। আমি, তুমি, আমরা সকলেই সেই এক অখণ্ড জ্ঞান। "তুমি প্রকাশিত হ'লে, আমার আত্মজ্ঞান জ্যোতি হারায়।" আত্মজ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান একই বস্তু। দ্বৈতভাব অজ্ঞানতাপ্রসূত। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহাতে চন্দ্র, সূর্য্য, ডুবিয়া গিয়াছে, বিশ্বভুবন বিলীন হইয়াছে, মানবজীবন অস্তিত্ব হারাইয়াছে। সকলের সর্ব্ববিধ স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিয়া এক চৈতন্য-সত্তা প্রকাশিত। এ তত্ত্বের এখানেই যবনিকা-পতন। এক অদ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার ভিন্ন এ তত্ত্বের মধ্যে গ্রহণ করিবার, আস্বাদন করিবার, ভোগ করিবার কিছুই নাই।

যাঁহারা চিন্তাশীল, বিদ্বান, দর্শন-তত্ত্বজ্ঞ সাধক, তাঁহারা সৃষ্টি-কৌশলে—কারণবাদে-নীতিতত্ত্বে—জ্ঞানবাদে ঈশ্বরের পরিচয় পাইয়া মানবজাতির কল্যাণের জন্য শাস্ত্রাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে ঈশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ে মানব-জ্ঞান উজ্জ্বলতর

হইয়া উঠে। কিন্তু এই যে ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণ-প্রণালী, ইহা অবলম্বন করিয়া গমন করিলে সেই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয় না। ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ যোগের আর একটী দিক আছে। সেই যোগ,হৃদয়ের যোগ, প্রেমের যোগ,আধ্যাত্মিক মিলন। সেই অখণ্ড পূর্ণ ব্রহ্ম, ক্ষুদ্র মানব-প্রাণের টানে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্ত দার্শনিক বলিতেছেন:—"ঈশ্বর আত্মপ্রত্যয়লভ্য, সিদ্ধান্ত-সাপেক্ষ নহেন। মানব সহজ জ্ঞানদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করে।" বাস্তবিক এ কথার প্রত্যেক বর্ণ সত্য যে, বিদ্বানগণ পরব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া থাকেন, ভক্তগণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে—"হীরণ্ময়-কোষে" তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া, তাঁহাকে প্রীতি করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। জ্ঞানেতে তিনি অনুভবের বিষয়, ভক্তিতে তিনি উপলব্ধির বিষয়,উপভোগের বিষয়।

মানব-প্রাণ নিয়ত তাঁহার জন্য লালায়িত। কম্পাসের কাটা যেমন নিয়ত উত্তরমুখীন, মানব-প্রাণের গতিও তেমনি ব্রহ্মমুখীন। মানব-প্রাণ সুখ-সম্পদে, দুঃখবিপদে যাঁহার জন্য লালায়িত, তিনিই ব্রহ্মবস্তু। কবি গাহিতেছেন:—

"চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে,
তথাপি তাঁহারে চাই;
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে,
তাঁর পানে সদা ধাই।"

প্রাণ কি যেন চায়, কি যেন পাইলে সুখী হয়। সুখ সম্পদ, সহস্র হস্তে আলিঙ্গন করিয়াও প্রাণের তৃষ্ণা কেহ নিবারণ করিতে পারে না। নদীসমূহ যেমন নিয়ত সাগরের দিকে ছুটিয়াছে, তেমনি জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে মানব-প্রাণের গতি সেই ব্রহ্মসাগর-পানে ছুটিয়াছে। এ গতি সহস্র বাধা বিঘ্নে, দুঃখের শত আঘাতে, আবার রাজ-সম্পদের মহোল্লাসে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। মানব-প্রাণ কি চায়? নিত্য আশ্রয়, নিত্য সম্পদ, নিত্য সাক্ষী, নিত্য শান্তি ও আনন্দের আলয় অন্বেষণ করে। হৃদয়-নদী যখন ব্রহ্ম সাগর-সঙ্গমে উপনীত হয়, তখনই যুগলমিলন, সম্ভোগ, স্বর্গসুখ আরম্ভ হয়।

যাঁহারা কেবল জ্ঞানরাজ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন না। ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে লাভ করিবার স্থান হৃদয়-রাজ্য। হৃদয়েতেই ঈশ্বরের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মানবাত্মা পাপ মোহ আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় প্রতিভাত হইলেই ব্রহ্ম-প্রীতির উৎস উচ্ছ্বসিত হয়। আত্মাকে স্বীয় প্রকৃতিতে অবস্থিত রাখিবার নামই সাধনা। আত্মা স্বীয় রূপে উপনীত হইলেই প্রাণ-দেবতার সাক্ষাৎ লাভ হয়। তখন আত্মা আনন্দময়ী গীতি গাহিয়া উঠে:—"তুমি মম জীবন-স্বামী। চির শান্তি, চির আনন্দ-নিলয় তুমি।"

মানব-প্রাণে যতক্ষণ না ব্যক্তিরূপী ভগবানের পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ জড়-পূজা, মূর্ত্তি-পূজা এবং অবতারগণ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব-প্রাণ সত্যস্বরূপ ভগবানের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে না পাইয়া মূর্ত্তি বা কোন ব্যক্তিকে "তুমিই আমার দেবতা" বলিয়া পূজা করিয়া ক্ষণিক আত্ম-তৃপ্তি লাভ করে। মানব চিত্ত, অবলম্বন ও আশ্রয়দাতারূপে কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া যেন থাকিতে পারে না। এই অবস্থার মধ্যেই মধ্যবর্ত্তীবাদ ও অবতারবাদ দেখা দেয়। এস্থলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের কথা স্মরণ হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়া ভারতে একছত্র রাজত্ব বিস্তার করিল। ভারতবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অতুলনীয় শৌর্য্য বীর্য্য সহকারে প্রতিভা বিস্তার করিয়াছিল। বঙ্গভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—"প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্টবের সময়। সে সকল সম্রাট হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থই এক ছত্র শাসন করিয়াছিলেন। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি—এই কাল মধ্যেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। এই সময়েই তক্ষশীলা হইতে

তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত বহু জনসমাকীর্ণ মহা সমৃদ্ধিশালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমে, পূর্ব্বে চীনে গীত হইয়াছিল।"

"যে বৌদ্ধধর্ম্মদ্বারা ভারতবর্ষ তৎসময়ে উন্নতির উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল কেন? পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের বহু কোটি নর নারী সেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বক্ষের রত্নের ন্যায় রক্ষা করিতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা পরিত্যাগ করিল কেন? "নির্ব্বাণ" ধন প্রাপ্ত হইয়া হারাইল কেন? এ প্রশ্নের অনেক প্রত্যুত্তর আছে; কিন্তু প্রধান প্রত্যুত্তর এই যে, ভারতবাসীর হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় ভক্তির ধারা প্রবাহিত হইতেছে। সেই ধারা ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের দিকেই প্রধাবিত। ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে না পাইলে ভারতবাসীর প্রাণ তৃপ্ত হয় না। সেই জন্যই ভারতবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অবতার ও মূর্ত্তির চরণে প্রণত হইতে লাগিল। বিদেশ গমন করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীয়রূপে অবস্থিত করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সকলেই ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে চাহে। সেই জন্য চীনে, জাপানে, বুদ্ধদেব ব্যক্তিরূপে ঈশ্বরের আসনে উপবিষ্ট হইয়া নর নারীর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতেছেন। বুদ্ধের মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে। একা বুদ্ধদেব ভিন্ন জগতের সকল মহা পুরুষই ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের উপাসক।

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার সহিত যুক্ত থাকিবার জন্য লালায়িত। সেই পিতার আদেশ, তাঁহারই কথা প্রচারে রত। যীশুর জীবনে পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। যীশু কেবল পিতার পরিচয় পাইয়া বিরত নহেন, পিতাকে দর্শন করিয়া—পিতার কথা শ্রবণ করিয়া—পিতৃধর্ম্ম প্রচার করিয়া ধন্য। মহম্মদ তাঁহার প্রভুর সহিত নিত্য যুক্ত থাকিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। বিচ্ছেদ হইলে, ছুটিয়া হেরা পর্ব্বতের নির্জ্জন স্থানে গমন করিতেন এবং ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিতেন। যতক্ষণ প্রাণদেবতা প্রাণের মধ্যে সাড়া না দিতেন, যতক্ষণ না তিনি বলিতেন—"সন্তান এই যে আমি," ততক্ষণ মহম্মদ পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেন। চৈতন্য সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, দ্বিপ্রহর রজনীতে সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি দূরে, নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া তাঁহার প্রাণ-সখার দর্শনের জন্য বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। ব্রাহ্মসাধক সেই জীবনসর্ব্বস্ব দেবতার অদর্শনে ক্রন্দন করিয়া বলেন:—

"আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে,
হারায়ে জীবনশরণে, জীবনে কি কাজ
আমার।
ঐহিকের সুখ যত জানি না তা কাজ নাই,
সে সুখে সে ধনে;
হারায়ে জীবন-শরণে জীবনে কি কাজ
আমার।"

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদমূলক ধর্ম্মের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। অদ্বৈতবাদ ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের, ভক্তির এবং উপাস্য ও উপাসকসম্বন্ধজনিত মধুর ভাবের বিরোধী। বলা বাহুল্য, ভারতের ভূমিতে ভক্তি-বিরোধী কোন ধর্ম্মই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিপথ-যাত্রী ভারতবাসীর হৃদয় হইতে যেন এই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, "আমরা বরং মূর্ত্তি-পূজা, অবতার পূজা করিব, তথাচ নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম এবং অদ্বৈতবাদমূলক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব না।" বাস্তবিক যে ধর্ম্মে উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, প্রাণেশ্বরকে প্রাণের অভ্যন্তরে দর্শন করিয়া হৃদয় মন তৃপ্ত হয় না, যে ধর্ম্মে "যুগল মিলন" অসম্ভব, সে ধর্ম্ম ভক্তি রাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ভারতবাসী প্রতিমূর্ত্তিকে—অবতারকে কোলে জড়াইয়া ধরিল, তথাচ আশাহীন, অদ্বৈতবাদের পথে গমন করিল না। বেদান্ত ধর্ম্ম কেবল মতে, আলোচনায়, শাস্ত্র-বিচারে আবদ্ধ রহিল—মূর্ত্তি-পূজার ধর্ম্ম ভারতময় ব্যাপ্ত হইল।

দুইটী নদীর ন্যায় ভারতে দুইটী ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একটী জ্ঞানের ধর্ম্ম, একটী হৃদয়ের বা প্রেমের ধর্ম্ম। জ্ঞানের ধর্ম্মের মধ্যে অদ্বৈতবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় পতিত রহিল। অপর দিকে প্রেমের ধর্ম্ম সাকারবাদ ও অবতারবাদের আবর্জ্জনাতে পঙ্কিল হইয়া মৃত নদের ন্যায় কেবল নামে মাত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে লাগিল। এই সঙ্কটকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম নব মূর্ত্তিতে অভ্যুদিত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক প্রেমের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিল।

ভারতের ধর্ম্ম ইতিহাসে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, যখনই ধর্ম্ম জঞ্জালময়—আবিলতাময়—পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই নব নব ভাব লইয়া নব নব ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়াছে। ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য—মানব হৃদয়ে উপাস্য উপাসক-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য—ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য বিধাতার কি অপূর্ব্ব আয়োজন। সর্ব্ব ধর্ম্মের সার সত্য গ্রহণ করিয়া, সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ভগবানের দানস্বরূপ উপস্থিত। এধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, অথচ জ্ঞান বিজ্ঞান সকল তত্ত্বের সার তত্ত্ব। এধর্ম্ম মানব-প্রাণের সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ। যেমন একটী মানুষ বলিতে হৃদয়, মন, আত্মা এবং শরীর বুঝায়, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে জ্ঞান, ভক্তি কর্ম্ম এবং শরীর মন হৃদয়ের উন্নতি; পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন—সমঞ্জসীভূত উন্নতি বুঝায়। কোন একটী বিভাগ পরিত্যাগ করিলে, এধর্ম্মের প্রকৃত রূপ প্রস্ফুটিত হয় না। এধর্ম্মে সকলেরই যথাযোগ্য স্থান আছে। এধর্ম্মে জ্ঞান, জ্ঞানের স্থানে; প্রেম, প্রেমের স্থানে এবং কর্ম্ম কর্ম্মের স্থানে উপবেশন করিবে। কেহ কাহারও স্থান অধিকার করিবে না। তুলনাদ্বারা প্রকাশ করিলে এরূপ বলা যাইতে পারে,—জ্ঞান আত্মার কর্ণ, প্রেম আত্মার চক্ষু, কর্ম্ম হস্ত বিশেষ। প্রেম ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিত্য সহবাস লাভে কৃতার্থ হয়। "হৃদে হেরব, আর অভয় চরণ পূজব হে।" এবাক্য ব্যাকুল-হৃদয় প্রেমিকের প্রার্থনা।

নব্যভারতে রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মের আদর্শ, ধর্ম্মের পরিচয়, ঈশ্বরের পরিচয়-সংবাদ ঘোষণা করিলেন। তিনি হিন্দুজাতির নিকট উপনিষদ্-ধর্ম্মের তত্ত্ব, খ্রীষ্টান জাতির নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম-তত্ত্ব এবং মুসলমান জাতির নিকটে কোরাণ-ধর্ম্মের সার-তত্ত্ব লইয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার তত্ত্ব-বিচারে অদ্ভুত কৃতীত্ব দর্শন করিয়া চিন্তাশীল জগৎ স্তম্ভিত হইল। রামমোহনের তিরোধানের পর দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ যোগ উপলব্ধি করিলেন। তিনি "ব্রহ্ম-ধ্যান, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রস-পানে" বিভোর হইয়া স্বীয় আত্মার মূলে ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া জগৎ বাসীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন;—

"ভুবন হইতে ভুবনবাসী এস আপন হৃদয়ে!
হৃদয় মাঝে হৃদয়-নাথ, আছে নিত্য সাথ সাথ,
কোথা ফিরিছ দিবা রাত,হের তাঁহারে অভয়ে।
হেথা চির আনন্দধাম, হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম, নিভৃত অমৃত আলয়ে।"

দেবেন্দ্র নাথের সহিত সাধন-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া কত সাধক স্বীয় জীবনে ভগবানকে ব্যক্তিরূপে—কর্ত্তারূপে—প্রভুরূপে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ব্রহ্মদর্শনেনিমগ্ন দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিয়া দেশবাসিগণ প্রীত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ঋষিপদে বরিত হইলেন। এখন আর দেবেন্দ্রনাথ জমিদার, জ্ঞানী বিষয়-সম্মানিত দেবেন্দ্রনাথ নহেন, তিনি ব্রহ্মদর্শনকারী, ব্রহ্মেস্থিত, ব্রহ্ম-পূজা-রত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

তৎপর কেশবচন্দ্রপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ মহর্ষির সাধন-পথে গমন করিয়া ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অদ্বৈতবাদ—শূন্যবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সহজ জ্ঞানের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনু-

ভূতি লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মসাধকগণ উপাসনায় নিবিষ্ট হইলেন। মধ্যবর্ত্তীবাদ, অবতারবাদ, মূর্ত্তি-পূজা-বিরহিত হইয়া সাধকগণ হৃদয় মধ্যে শিব সুন্দরের মূর্ত্তি ভক্তিচক্ষে দর্শন করিবার জন্য নব সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাধন-রাজ্যে নবযুগ আরম্ভ হইল। জগতের সমুদয় ধর্ম্ম সাধনার অভিব্যক্তির ফলই বর্ত্তমান ব্রহ্মসাধনা। হৃদয়ে চিন্ময়-ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে দর্শন, তাঁহার বাণী শ্রবণ, তাঁহার আজ্ঞা পালনই এই নব ধর্ম্মের বিশেষ ভাব। মানব প্রাণের গূঢ়তম আকাঙ্ক্ষা এই :—

"হৃদয়-নন্দন-বনে নিভৃত এ নিকেতনে,
এসহে আনন্দময়, এস চির সুন্দর !
দেখাও তব প্রেম-মুখ, পাসরি সর্ব্ব দুঃখ,
বিরহ-কাতর-তপ্ত-চিত্ত মাঝে বিহর !
শুভদিন শুভরজনী আন এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নর-জনম, সফল কর প্রিয়তম,
মধুর চির সঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধা-নিঝর।"

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

২৬। উপনিষদ্—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত। পুস্তকের ছাপা, কাগজ এবং বাইণ্ডিং উৎকৃষ্ট। ভাষা সুললিত, প্রাঞ্জল, অর্থবোধক এবং চিত্তাকর্ষক। এমন কোমল মধুর ভাষায় যিনি কঠিন ধর্ম্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনি ধন্য পুরুষ। হীরেন্দ্র বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য, রাজনীতি এবং ধর্ম্ম-জগতে উন্নত হিন্দু-কীর্ত্তি-স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান। এ স্তম্ভের ভিত্তি বন্দনীয় নির্ম্মল চরিত্রের উপরে স্থাপিত।

তাঁহার প্রণীত "গীতায় ঈশ্বরবাদ" ভক্ত ও জ্ঞানী সমাজে আদৃত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ খানিও যে আদৃত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এ গ্রন্থে তিনি উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাধুর্য্য-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। বেদের কাল-নিরূপণ করিতে যাইয়া তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য, সকল বুধমণ্ডলীতেই বৈদিক-কাল-নিরূপণ-তত্ত্ব অন্ধকারে আচ্ছাদিত থাকিবে। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া সুদূরপরাহত। কিন্তু বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটী দার্শনিক স্থূল রেখা-পাত বিষয়ে বিরোধের আশঙ্কা নাই। শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে বৈষ্ণব তত্ত্বে যে প্রণালীতে—যে পথে আগমন করিয়াছেন, সেই প্রণালী—সেই পথ হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসী ভক্তমণ্ডলীর মনঃপূত হইলেও চিন্তাশীল দার্শনিক ভক্তগণের গ্রহণীয় নহে। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মবাদ, সগুণবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দার্শনিক ভিত্তি আছে; কিন্তু প্রত্যেক সৌরজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মূর্ত্তিতে তিন জন কর্ত্তা আছেন, এ তত্ত্ব দর্শন-বিজ্ঞানসম্মত নহে।

উপনিষদ দর্শন-তত্ত্ব-সুধা-সাগর বিশেষ। সেই সুধা-সাগর হইতে পুরাণ ও বৈষ্ণব সাধনার যে অমৃত-নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করাই দার্শনিকের বিশিষ্ট কার্য্য। এ বিষয়ে হীরেন্দ্র বাবু সমাজ-প্রচলিত বিশ্বাসের পথে পদার্পণ না করিয়া তত্ত্ববিদ্যার আলোকে ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রম বিকাশের পথ অবলম্বন করিলে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলতর হইত।

২৭। মেগাস্থেনীসের ভারত-ভ্রমণ-বিবরণ। অধ্যাপক শোয়ানবেক্ কর্ত্তৃক লাটিন-ভাষায় লিখিত ভূমিকা সহ মূল গ্রীক হইতে শ্রীরজনী কান্ত গুহ এম্-এ দ্বারা অনুবাদিত। এ গ্রন্থ খানি মূল্যবান ঐতিহাসিক-তত্ত্বের অনুবাদ।

যখন প্রথিতনামা চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের রাজ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, সেই সময় মেগাস্থেনীস্ গ্রীক দেশ হইতে ভারতে আগমন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার আগমনকাল খ্রীঃ পূঃ ২৯৫ সাল। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাই অধ্যাপক গুহ মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বঙ্গীয় চিন্তাশীল ইতিহাসপ্রিয় সাহিত্যিকগণের ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় রজনী বাবু গভীর গবেষণা ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরল, সুমিষ্ট, সদর্থযুক্ত। ছাপা পরিষ্কার, কাগজ উৎকৃষ্ট। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থ বঙ্গীয় বিদ্বজ্জন-সমাজে বিশেষ আদৃত হইবে।

২৮। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির—শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। যে যুধিষ্ঠিরের নামে হিন্দুহৃদয় পবিত্র ভাব-রসে আপ্লুত হয়, যিনি ক্ষমা, শান্তি, দয়া ও বিনয়ের অবতার-স্বরূপ, যিনি মহাকাব্য মহাভারতের প্রধান নায়ক, যোগেশ্বর বাবু সেই যুধিষ্ঠির-কাহিনী এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সুলেখক, হিন্দু ধর্ম্ম-প্রাণ এবং প্রাচীন কীর্ত্তি-কাহিনী ঘোষণায় উৎসাহান্বিত। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের দেবজীবন-মহিমা বিবৃত করিতে গিয়া "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" সম্বন্ধে তিনি যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, সেই মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না।

২৯। The Twenty-fourth Annual Report of the Lowis Jubilee Sanitarium, Darjeeling, 1910. এই আশ্রম ভারতের গৌরব। কত লোকের যে উপকার হইতেছে, সংখ্যা হয় না। বাঙ্গালীর দ্বারা সুচারুরূপে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, যাঁহাদিগের বিশ্বাস, এই আশ্রমের কার্য্যবিবরণ তাঁহারা পাঠ করুন, বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের ধারণা ভ্রমপূর্ণ। গতবৎসর ৬৩২ জন লোক আশ্রমে স্থান পাইয়াছিল। সুন্দর প্রণালীতে এই কার্য্য-বিবরণ লিখিত। টেবিলগুলি পাঠ করিলে অল্প সময়ের মধ্যে বহুবিষয় অবগত হওয়া যায়। এরূপ সুপ্রণালীবদ্ধ তুলনা-প্রণালী অন্যত্র দেখি নাই। এই কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া যার পর নাই উপকৃত হইলাম।

৩০। শাক্যসিংহ। শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ বিরচিত। মূল্য।৵০। গ্রন্থকার প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন—"আমি নিতান্ত অকিঞ্চন—স্বজাতি-সেবা-রূপ সুমহৎ ও পবিত্র কার্য্যে আমার অধিকার নগণ্য,—সুতরাং একার্য্যে আমার ত্রুটী যে কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।" তিনি যে সুন্দর ভাষায় শাক্যচরিত লিখিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ; এরূপ সুন্দর প্রণালী, এরূপ সুন্দর ভাষা, এরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাঙ্গালা ভাষায় কুত্রাপি দেখি নাই। তাহার ত্রুটী যে কি, আদ্যন্ত পুস্তক খানি পড়িয়াও তাহা বুঝিলাম না। তবে—স্বদেশী কাগজে পুস্তকখানি ছাপাইয়া মলাট খানি বিদেশী কাগজে না ছাপাইলেও তিনি পারিতেন। এই পুস্তক খানি পাঠ্য রূপে সর্ব্বত্র গৃহীত হইলে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইব। শাক্যসিংহ অতি সুন্দর পুস্তক হইয়াছে।

৩১। রাণী জয়মতী। শ্রীশরৎচন্দ্র ধর। মূল্য।৵ আনা। সতী জয়মতীর পুণ্য কথা ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এরূপ আদর্শ সতী-কাহিনী ভারতের একমাত্র সম্বল। যদি কখনও ভারত জাগে, সতীদিগের পুণ্যবলেই জাগিবে। এই অপূর্ব্ব জীবনী লিখিবার সময় গ্রন্থকার নানা কর্কশ মন্তব্য দ্বারা পুস্তক খানি শ্রুতিকঠোর না করিলেই আমরা সুখী হইতাম। তদুপরি পুস্তকখানি বিদেশী কাগজ ও কালীতে ছাপা। এরূপ পুণ্য কাহিনীতে এই কলঙ্ক না থাকিলেই ভাল হইত। জানি, সেকথা ব্যক্ত করা বর্ত্তমানে অরণ্যে রোদন মাত্র। এই আদর্শ জীবন-কাহিনীতে এদেশের ভক্তির অশ্রু নিপতিত হউক।

৩২। ঝরা ফুল। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য ৮০। পুস্তকখানি ভাল, কিন্তু শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভূমিকায় যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার পরি-

চয় পাইলাম না। অনেক কবিতায় বেশ সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে।

৩৩। ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী, মূল্য ২্। ১। ভূমিকা, ২। উদ্বোধন, ৩। বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা, ৪। দর্শনাধিকার নির্ণয়। ৫। উপসংহার। (১—দর্শন সমন্বয়, ২। অবতারতত্ত্ব ও সাকার উপাসনা, ৩। দীক্ষা ও নামসাধন, ৪। নিবেদন।)

পুস্তকখানি সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের সারচুম্বক,—এমন সুন্দর ভাবে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত হইতে বহুদিন দেখি নাই। জটিল মত সকলকে প্রাঞ্জল করিয়া সাজাইয়া তুলিয়াছেন—তাহাতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, ঋষি-জীবনের সহিত তারাকিশোর বাবুর সাত্ত্বিক জীবনের অনিন্দিত একখানি সুন্দর চিত্র। তাঁহার অনেক মতের সহিত মিলিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সাত্ত্বিকতা ও সরল বিশ্বাসের পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইয়াছি। ধর্ম্মজীবনের মতামত লইয়া কি করিব,—চাই বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সরলতা। বাঙ্গালা ভাষা ধন্য যে, এরূপ বিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান সরল সাধু লেখক আজ লেখনী ধারণ করিয়াছেন। গভীর গবেষণা, গভীর চিন্তা, গভীর বিশ্বাস,—মিলিয়া যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমে অপূর্ব্ব শোভা ফুটাইয়াছে। তারা কিশোর বাবুর লেখনীতে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।

৩৪। বিদ্যাসাগর। শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১॥০। বিদ্যাসাগরের জীবন-কথা অমৃত সমান, যে পড়ে, সেই মোহিত হয়। চণ্ডীচরণ ও বিহারিলাল এই পুণ্যময় জীবনের কথা বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বিহারিলালের বাঙ্গালা লেখার অসাধারণ ক্ষমতা—সরল ভাবে ভাব ঢালিয়া গিয়াছেন—ফুটিয়া উঠিয়াছে, এক অনিন্দ্য জীবন—যাহার তুলনা কেবল বঙ্গে নয়, ভারতের কোথাও মিলে নাই। বিদ্যাসাগরের দুরবগাহ প্রেমপূর্ণ জীবনের গভীরতায় ডুবিতে বিহারিলাল বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মত-সংঘর্ষে তাঁহাকে কিছু হাবুডুবু খাইতে হইয়াছে—পাছে জাতি যায়, পাছে কেহ মন্দ বলে! চতুর্দ্দিক বাঁচাইয়া লেখনী ধারণ যাঁহারা করিতে চাহেন, আশু তাঁহারা সম্মানের অধিকারী হইলেও, শেষে তাঁহাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবেই হইবে। বিদ্যাসাগরের সাহস, বীর্য্য, কৃতজ্ঞতা ও দয়া খোলসা করিবার সময় কেন যে বিহারিলাল সঙ্কুচিত হইয়া চলিলেন, বুঝি না। তিনি যাহা ছিলেন, স্বাধীন ভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়া যাও,—যাহা কপালে থাকে, ঘটিবে। এইরূপ উদারতা ও সাহস লইয়া বিহারিলালের ন্যায় কৃতী পুরুষ অগ্রসর হইতে পারিলে অনেকটা সুখী হইতাম। সময়ে সময়ে ভাব, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি যাহা সমর্থন করিতে না পারিলেন, তবে এই জীবনের কথা লিখিতে তিনি অগ্রসর হইলেন কেন? হায়রে, মত-সংঘর্ষ, হায়রে দেশাচার!

যা'ক—অপ্রিয় কথায় আজ আর কাজ নাই। বিহারিলাল যে ভাষায় এই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অনুকরণ-যোগ্য। এরূপ প্রাঞ্জল এবং মধুর বাঙ্গালা যে পড়িতে পড়িতে অবাক্ হইয়া কত সময় ভাবিয়াছি—বিহারিলালের কি অনন্যসাধারণ ক্ষমতা। বিহারিলালের দ্বারা বাঙ্গালা-ভাষা গৌরবান্বিত হউক। আমাদের কৃতজ্ঞতা তিনি গ্রহণ করুন।

আমার কৈফিয়ৎ, অর্থাৎ অধ্যাত্মবিজ্ঞানে কেন বিশ্বাস করি, এই প্রশ্নের উত্তর।

আমাকে মিডিয়ম করিয়া কোন কোন পরলোকবাসী মহাত্মা যাহা লিখিতেছেন, আমি তাহা 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। অনেকেই আমাকে ভ্রান্ত বলিতেছেন। অতি অল্প সংখ্যক লোকের অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস আছে। তাঁহারা অবশ্য বিশ্বাস করিতে পারেন যে, উহা পরলোকবাসীর লেখা। কিন্তু শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকেই যে আমাকে ভ্রান্ত বলিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যাঁহারা আমাকে ভ্রান্ত বলিতেছেন, তাঁহারা আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করিতেছেন। তাহার অতিরিক্ত কিছু যে বলিতেছেন না, ইহাই আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রকাশ করা হইতেছে। যাঁহারা আমাকে কিছুই জানেন না, আমার চরিত্র বিষয়ে যাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কখনই যাঁহাদের সহিত আমি পরিচিত নহি, তাঁহারা যদি আমাকে প্রতারক বলিয়া মনে করেন, তাহাতে আমি আশ্চর্য্য হইব না।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বহুকাল হইতে আমার বিশ্বাস। আমি অল্প বয়সে যখন কৃষ্ণনগরে ছিলাম, তখনই বন্ধুগণের সঙ্গে এবিষয়ের চর্চ্চা আরম্ভ করি। যখন আমি কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র, তখন শুনিলাম যে, যশোর জিলার কোন গ্রামে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে। যাঁহারা চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারা আশ্চর্য্য প্রমাণ পাইতেছেন। এইকথা শুনিয়া আমি পঁচিশ ক্রোশ পথ পদব্রজে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। সে গ্রামের নাম মগুরা। সেখানে অমৃতবাজার পত্রিকার পূর্ব্ব সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিবাস। তাঁহাদের বাটীতেই উপস্থিত হইলাম। সেখানেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছিল। তথায় এক সপ্তাহকাল বাস করিয়া কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিলাম। শিশির বাবুদের বাটীতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই।

কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুগণের সঙ্গে ইহার আলোচনা করিতে লাগিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। কৃষ্ণনগরে কয়েকজন মিডিয়ম হইয়াছিলেন তথায় অনেক দিন পর্য্যন্ত এবিষয়ের চর্চ্চা করিয়াছিলাম। যে কয়জন মিডিয়ম হইয়াছিলেন, তাঁহারা আমার বিশেষ ব... আমার সহধর্ম্মিণীও মিডিয়ম হইয়াছিলেন। এই সকল মিডিয়ম দ্বারা সময়ে সময়ে কিছু কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতাম, তাহাতে আমার অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইত।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিষয়ে আমার কৃষ্ণনগরের অভিজ্ঞতা যাহা কিছু স্মরণ আছে, নব্যভারতের পাঠকবর্গকে বলিতে পারি। এক দিবস আমার সহধর্ম্মিণীর সহিত অধ্যা

বিজ্ঞানের চর্চা করিতে বসিলাম। কিছুক্ষণ বসিয়া তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া গেলেন। একজন আত্মা, তাঁহা দ্বারা নানা কথা লিখিতে লাগিলেন। আমি উক্ত আত্মাকে বলিলাম, মিডিয়ম যাহা জানেন না, এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, উত্তর হইবে কি না? আত্মা বলিলেন, উত্তর হইতে পারে। তখন আমি পার্শ্বের ঘরে গিয়া অতি গোপনে একখানি কাগজে দুতিনটী কথা লিখিলাম। লিখিয়া উহা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া, যে ঘরে মিডিয়ম অচেতন অবস্থায় ছিলেন, সেই ঘরে আসিয়া আত্মাকে বলিলাম, আমি লুকাইয়া কি লিখিয়া রাখিয়াছি, আপনি মিডিয়মের দ্বারা তাহা লিখুন। মিডিয়মের দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ লেখা হইল। সে দুটী শব্দ এই—রামহরি, রামতুলসি। যে দুইটী শব্দ মনে পড়িতেছে, লিখিলাম। এই দুটী শব্দই মিডিয়মের দ্বারা লেখা হইয়াছিল। আর একটী শব্দ লেখা হয় নাই। মিডিয়মের জ্ঞান হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ কি হইল? তিনি বলিলেন, আমি কিছুই জানি না। আমার জ্ঞান ছিল না। ইহাতে [illegible]শ্চর্য্য হইলাম।

[illegible] একদিন আমার বন্ধুগণের সঙ্গে অধ্যাত্ম-[illegible] বসিয়া আছি, কোন আত্মা মিডিয়মের [illegible] লিখিতেছেন। আমি সে দিকে মন না [illegible] আমার মনে মনে ভাবিতেছি যে, আমি [illegible]খন চাকুরি ছাড়িয়া প্রচারক হইব কি না? মিডিয়ম আমার এক বন্ধু। তাঁহার জ্ঞান [illegible]ছল। মিডিয়মের দ্বারা এমন কিছু লেখা [illegible]ইল, যাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চক্রস্থ [illegible]কলে বলিতে লাগিলেন, একি? ইহার অর্থ [illegible]? তাঁহাদের ঐরূপ কথা শুনিয়া যাহা [illegible]খা হইয়াছিল, আমি তাহা দেখিলাম। আমি গোপনে মনে মনে যাহা চিন্তা করিতেছিলাম, তাহার সহিত ঐ লেখার অত্যন্ত মিল। আমি উহা দেখিয়া বুঝিলাম যে, উহা আমার গুপ্ত চিন্তার উত্তর। সে কথা গুলি এই, "You are not now fit for or equal to what you aim at. Better wait till the proper time comes" আমি যাহা চিন্তা করিতেছিলাম, এইকথা গুলি তাহারই উত্তর। আমার মনের চিন্তার কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন।

আর একটী কথা। একদিন আমার সহধর্ম্মিণীর সহিত অধ্যাত্ম চক্রে বসিলাম। তিনি মিডিয়ম হইলেন। আমি আত্মাকে বলিলাম, আপনি মিডিয়ম দ্বারা এমন কিছু লিখিতে পারেন, যাহা মিডিয়ম জানেন না, আমিও জানি না। পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে, উহা সত্য? (সে ঘরে আমরা দুজন ভিন্ন আর কোন মনুষ্য ছিলেন না।) আত্মা সেরূপ কিছু লিখিতে সম্মত হইলেন। তিনি লিখিলেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এখন শান্তিপুরে আছেন। তিনি এখন একখানি নাটক লিখিতেছেন। কিন্তু তিনি যে প্রকার লোক, তাহাতে এরূপ পুস্তক লেখা তাঁহার পক্ষে ভাল হইতেছে না। এই কথা লেখা হইবার পর, আমি গোস্বামী মহাশয়কে এক পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি এখন কোন পুস্তক লিখিতেছেন কি না? যদি এমন হয় যে, লিখিতেছেন, তবে উহা কিরূপ পুস্তক? পত্রোত্তরে গোস্বামী মহাশয় লিখেলেন যে, তিনি একখানি নাটক লিখিতেছেন। ইহাও লিখিলেন যে, আমার পত্র পাইয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কেননা, তিনি উহা অতিশয় গোপনে লিখিতেছেন। কেহ

জানে না যে, তিনি ঐ পুস্তক লিখিতেছেন। আমি কৃষ্ণনগরে থাকিয়া কেমন করিয়া উহা জানিলাম, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। তার-পর, লিখিয়াছিলেন যে, আমার পত্র পাওয়ার পর, সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, কেহ যেন তাঁহাকে বলিতেছে যে, তাঁহার নাটক লেখার কথা আমাদের কৃষ্ণনগরের অধ্যাত্ম চক্রে বলা হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের উত্তর-পত্রে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম।

একদিন আমার কৃষ্ণনগরের বাসা হইতে জলঙ্গী বা খোড়ে নদীতে স্নান করিতে গিয়াছি। নদীতে নামিয়া স্নান করিতেছি, এমন সময় এক বন্ধুও স্নান করি.ত আসি-লেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, অমুক ব্যক্তি হুগলি হইতে আসিয়া বলিল যে, আপনার যে পিতৃব্য মহাশয় হুগলির সব জজ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম যে, আমি বাসায় গিয়া এসংবাদ কাহাকেও দিব না। আমার মাতা ঠাকুরাণীকে কিম্বা আমার স্ত্রীকে, কাহাকেও বলিব না। আমার স্ত্রী যখন মিডিয়ম; দেখিব, তিনি নিজে জানিতে পারেন কি না? বাসায় আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিলাম না। আহারের পর আমার স্ত্রীকে মেস্‌মেরাইজ করিলাম। মেস্‌মে-রাইজ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখন কোথায়? তিনি বলিলেন, আমি এই ঘরে। আমি বলিলাম, তোমার দেহের ভিতরে, কি দেহের বাহিরে? উত্তর, দেহের ভিতরে। তখন বলিলাম, দেহের বাহিরে যাও। তিনি বলিলেন, গেলাম। তখন বলিলাম, তুমি বাঁশবেড়ে যাও। তিনি বলিলেন, গেলাম। তখন আমি বলিলাম, আমাদের বাটীতে যাও। তিনি বলিলেন, বাড়ীতে আসিয়াছি। আমি বলিলাম, কি দেখিতেছ? তিনি বলিলেন, সকলে কাঁদি-তেছে। সকলে শোকার্ত্ত। কেন কাঁদি-তেছে? বলিলেন, জানি না। একটু পরে বলিলেন, শোকার্ত্তদের মাথার উপর উজ্জ্বল আত্মারা বসিয়া আছেন, দেখিতেছি। একটু পরে বলিলেন, একজন শোকার্ত্তের মস্তকের উপর বাবা বসিয়া আছেন; অর্থাৎ আমার পিতা, মিডিয়মের শ্বশুর। আবার একটু পরে বলিলেন, "বাবা একটী কথা বলিলেন, ...স ষো পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ...সঙ্গী? কথা? তিনি বলিলেন, "বাবা ...সে যে, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, জগতের ...হার দ্বারা।" তারপর বলিলেন, সেজো ...হা দেখ' (অর্থাৎ যাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাই-ইরূপে তাঁহার স্ত্রীর) সধবার চিহ্ন দেখিতেছি না। আমার স্ত্রী ইচ্ছ করাতে, এই সময় তাঁহাকে স্বাভাবিক ... স্থায় আনিলাম। দেখিলাম, স্বাভাবিক অবস্থায় আসার পর, তাঁহার সকল কথা স্মরণ আছে।

আর একদিন আমার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চ্চায় বসিলাম। তিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তিনি ইংরেজী ভাষা জানিতেন না। ফার্ষ্ট বুকের দুই এক পাত পড়িয়াছিলেন। তখন বানান পড়িতেছিলেন। বি, এল্, এ, ব্লে—এই পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছিল। তথাচ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, তাঁহার হাত দিয়া দুইটী নাম ইংরেজিতে লেখা হইল। সে দুটী নাম এই,—Ram Mohun Ray. তার-পর, Ram Gopal Ghosh. তারপর ইংরেজী ভাষার একটী বাক্য লেখা হইল। সে বাক্যটী এই;—"Man is the

son of God." অবশ্য আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। তারপর, উপস্থিত আত্মা বাঙ্গালা ভাষায় এই ভাবে কিছু লিখিলেন যে, এই প্রকার কয়েকজন মিডিয়ম হইলে, এ দেশের বিশেষ উপকার হয়। অজ্ঞান অবস্থায় যাহা লেখা হইয়াছিল, মিডিয়মের জ্ঞান হইলে, তাঁহাকে তাহা পড়িতে দিলাম। যাহা তাঁহারই হাত দিয়া, ইংরেজী ভাষায় লেখা হইয়াছিল, অবশ্য তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আমি নিজে পড়িয়া, যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহার অর্থ তাঁহাকে বলিলাম। মিডিয়ম যে ভাষায় সম্[illegible]ভিজ্ঞ, এমন ভাষায় যদি তাঁহার দ্বা[illegible] হয়, অর্থযুক্ত বাক্য লেখা হয়, [illegible] উহা যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এ[illegible] প্রমাণ, ইহা কেনা স্বীকার করিবে[illegible]

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যে সকল প্রমাণ [illegible] হয়, তাহার মধ্যে কোন কোনটী, কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বলিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, উহা আত্মার ক্রিয়া নহে, অন্য মানুষের মন হইতে ঐ সকল ভাব, মিডিয়মের মনে চলিয়া আসে। এই প্রবন্ধের মধ্যে যে, রামহরি ও রামতুলসি, এই কয়টী শব্দ অতি গোপনে গৃহান্তরে লিখিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, অথচ আত্মাকে অনুরোধ করিবামাত্র, ঐ গোপনে লিখিত শব্দ মিডিয়মের দ্বারা লেখা হইল, কেহ বলিতে পারেন যে, উহা কোন গূঢ় মানসিক নিয়মে আমার মন হইতে মিডিয়মের মনে গিয়াছিল। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা ঐ কথা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেক ঘটনা এমন আছে, যাহা আত্মা দ্বারা সংঘটিত, না বলিলে, চলেনা। আমার স্ত্রী যে অজ্ঞাত ভাষায় লিখিলেন, উহার ব্যাখ্যা কেমন করিয়া হয়?

এইরূপ ঘটনা আমি আরও দেখিয়াছি। কৃষ্ণনগরে আমার কোন বন্ধুর গৃহে আমরা কয়েক জন বন্ধু অধ্যাত্মচক্রে বসিলে, আমার এক বিশেষ ঘনিষ্ট বন্ধু মিডিয়ম হইলেন। কথা কহিবার মিডিয়ম হইয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে আমরা উপস্থিত আত্মাকে বলিলাম, অধ্যাত্মবিজ্ঞান যে সত্য, ইহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন? মিডিয়ম দ্বারা তৎক্ষণাৎ কাগজ ও একটা পেনসিল টানিয়া লওয়া হইল। ঐ কাগজে পারসি লেখা আরম্ভ হইল। আমরা দেখিয়া ভাবিলাম "একি! যিনি মিডিয়ম হইয়াছেন, তিনি তো পারসি জানেন না। তবে ইহা কি যথার্থ পারসি? অল্পই লেখা হইল। মিডিয়ম টেবিলের উপরে কাগজ খানি ফেলিয়া রাখিলেন। তার পর দিবস একজন পারসি ভাষায় অভিজ্ঞ মুনসিকে ডাকা হইল। কাগজ টুকু তাঁহার হস্তে দিয়া তাঁহাকে বলা হইল, ইহার অর্থ কি, বলুন দেখি? তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, কোন স্থান হইতে কোন দ্রব্য আসিয়াছিল। সেই সঙ্গে এই কাগজ টুকু আসিয়াছিল। ইহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার অর্থ এই যে, ইহার দ্বারাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আমরা তখন এই বুঝিলাম যে, আমরা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রমাণ চাহিয়াছিলাম, তাই যে ব্যক্তি পারসি ভাষার আলেফ, বে, তে, সে পর্য্যন্ত জানেন না, তাহার দ্বারা পারসী ভাষায় একটী অর্থযুক্ত বাক্যে বলা হইতেছে, ইহার দ্বারাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ইহাকেই আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের, প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পার। যিনি মিডিয়ম হইয়াছিলেন, তিনি আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ট

বন্ধু। আমরা নিশ্চয়রূপে জানিতামযে, তিনি পারসির অক্ষর পর্য্যন্ত জানেন না। তাঁহার দ্বারা অজ্ঞাত ভাষায় লেখা হইল বলিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ নবীন চন্দ্র রায় মহাশয় আমার নিকট বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র পারসি জানে না, সে মিডিয়ম হইয়া অর্থযুক্ত পারসি লিখিয়াছিল, আমি দেখিয়াছি। নবীন বাবুর নিজে পারসি ভাষায় ভাল জ্ঞান ছিল।

কৃষ্ণনগরে একদিন আমার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া অধ্যাত্ম চক্রে বসিলাম। যে আত্মা আসিয়া তাঁহাকে মিডিয়ম করিয়া লিখিতে লাগিলেন, তিনি আপনাকে আমার পরলোক-গত কনিষ্ঠ পিতৃব্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। অন্যান্য অনেক কথা লিখিয়া শেষে লিখিলেন, আমি তোমাকে আমাদের সপ্তম লোকের একটী সঙ্গীত লিখিয়া দি। মুখস্ত থাকিলে যত শীঘ্র লেখা যায়, তত শীঘ্র মিডিয়ম দ্বারা একটী নূতন সঙ্গীত লেখা হইল। সেটী এই ;—

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।
যার অন্বেষণে মন, ভ্রম তুমি অনুক্ষণ।
হৃদয়ে উদয় আজি, তব আকিঞ্চন ধন ॥
যাঁহার কারণে তুমি, গিয়াছিলে হে অবনী,
যথা মহানিদ্রা বশে, হয়েছিলে অচেতন ;
নয়ন ভরিয়া তাঁরে, কর কর দরশন।

মিডিয়ম অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছিল ? তিনি বলিলেন, আমি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম, কিছুই জানি না। তখন তাঁহাকে সঙ্গীতটী দেখাইলাম। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। সঙ্গীতের দুটী কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। 'আকিঞ্চনধন' ও 'মহানিদ্রা।' তিনি অকিঞ্চন শব্দ জানিতেন। 'আকিঞ্চনধন' শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। 'মোহনিদ্রা' শব্দের অর্থ জানিতেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহানিদ্রা' কি ? মহানিদ্রা শব্দের অর্থ [illegible] ইহা তাঁহাকে বলিলাম। আলেয়া নামে যে একটী রাগিণী আছে, তাহা তিনি জানিতেন না। বলিলেন, মাঠে আলেয়া জ্বলে জানি ; আলেয়া নামে কি একটী রাগিণী আছে ? আমি সঙ্গীতটী আলেয়া রাগিণী ও আড়াঠেকা তালে গাহিয়া দেখিলাম, ঠিক্ হইল। তখন মিডিয়মের বয়স ষোল বৎসর হইবে।

সঙ্গীতটী পাঠ করিয়া এই চিন্তা মনে আসে যে, মিডিয়মের অচেতন অবস্থায় কে তাঁহার দ্বারা লিখিলেন ? মিডিয়মের দ্বারা যাহা লেখা বা বলা হয়, তাহা কেহ কেহ এইরূপে ব্যখ্যা করেন যে, অন্য মানুষের মনের চিন্তা মিডিয়মের মনে আসে, মিডিয়ম তাহাই প্রকাশ করেন। এ ব্যাখ্যা যে কোন কার্য্যের নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। সে গৃহে কেবল আমি ছিলাম, অন্য কেহ ছিল না। সঙ্গীতটি আমার মনে ছিল না। আমা ভিন্ন অন্য কোন জীবিত মনুষ্যের চিন্তাও হইতে পারে না। সঙ্গীতটীর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোন পর-লোকবাসী আত্মা বলিতেছেন যে, হে মন ! তুমি যাঁহার অন্বেষণে পৃথিবীতে গিয়াছিলে, যেখানে তোমার মৃত্যু হইয়াছিল, আজ তোমার আকিঞ্চনধন তোমার হৃদয়ে উদয় হইয়াছেন। তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দর্শন কর। এ সঙ্গীত জীবিত মনুষ্যের হইতে পারে না। অচেতন অবস্থায় এসঙ্গীত কে মিডিয়ম দ্বারা লিখাইলেন ? কোন পরলোক-বাসী লিখাইয়াছেন, বলা ভিন্ন অন্য কোন ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না।

এখন, এমন একটী ঘটনার কথা বলিব, যাহা বাস্তবিক অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের প্রমাণের পক্ষে বিশেষ প্রমাণ বলিয়া মনে করি। তাহা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া। কৃষ্ণনগরে অবস্থান কালে কোন কোন মিডিয়ম দ্বারা আমার ভাবীজীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল। তাহা পূর্ণ হইয়াছে। সে ভবিষ্যদ্বাণী এই; আমি কৃষ্ণনগরে চিরদিন থাকিব না কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইব এমন সময় আসিবে, যখন আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হইব। এ দুটী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাহার পরে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা যাথার্থই আশ্চর্য্য। তাহা এই,—কেশব বাবু জীবিত থাকিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দুই দলে বিভক্ত হইয়া একটী নূতন সমাজ সংস্থাপিত হইবে। আমি দ্বিতীয় দলের এক জন প্রধান হইব। আমি দ্বিতীয় সমাজের আচার্য্য হইব। আমার দ্বারা এদেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অনেক প্রচার হইবে। শেষ কথাটী, অর্থাৎ আমার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক প্রচার হওয়া একটা আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া কেহ মনে না করিতে পারেন; কিন্তু কেশব বাবুর জীবদ্দশায় যে সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে, আর একটী সমাজ হইবে, এবং আমি সেই দ্বিতীয় সমাজের একজন প্রধান হইব, এবং দ্বিতীয় সমাজের আচার্য্য হইব, এই সকল কথা সে সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী-রূপে বলিতে পারা একান্ত আশ্চর্য্য। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। কেশব বাবুর জীবদ্দশায় যে সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আর একটী সমাজ হইবে, সে সময়ে কেহ স্বপ্নেও একথা মনে করিতে পারিতেন না।

আর একটী কথা। আমার প্রচারক হওয়ার কত দিন পরে, কেশব বাবুর মৃত্যু হইবে, তাহার যে সময় বলা হইয়াছিল, তাহা ঠিক মিলিয়াছিল।

আমার বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শুনিয়া-ছিলেন যে, আমার স্ত্রী মিডিয়ম হইয়াছেন, ও তাঁহার দ্বারা আশ্চর্য্য ঘটনা সকল হইয়াছে। সেই জন্য তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, তাহাকে লইয়া অধ্যাত্ম চক্রে বসেন। শিবনাথ প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু এবং আমার স্ত্রী ও আমি, আমরা কয়েকজন চক্রে বসিলাম। অল্পক্ষণ বসার পর, আমার স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তখন শিবনাথ তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। "ও ফণুর মা! ও ফণুর মা" বলিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। মিডিয়ম দ্বারা কাগজে লেখা হইল, কোথা তোমার ফণুর মা! তখন শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তবে কে? আপনার নাম লিখুন। মিডিয়ম দ্বারা নাম লেখা হইল, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শাস্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিবাস কোথা ছিল? উত্তর হইল, ভবানীপুর। জীবদ্দশায় কি করিতেন? উত্তর হইল, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের সম্পাদক ছিলাম। তখন শাস্ত্রী বলিলেন, আপনি তো অতি উত্তম ইংরেজী লিখিতে পারিতেন, তবে এই মিডিয়ম দ্বারা কেন ইংরে-জীতে লিখুন না। এই মিডিয়ম ইংরেজী জানে না; ইহার দ্বারা ইংরেজী লেখা হইলে, আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হইব। তখন আত্মা লিখিলেন, মিডিয়ম খুব ভাল হইলে তাহা হইতে পারিত। তখন শাস্ত্রী বলিলেন, আমি যদি ইংরেজীতে প্রশ্ন করি, আপনি বাঙ্গালায় উত্তর দিতে পারেন কি না? বোধ হয়, এই উত্তর হইল, চেষ্টা

করিতে পারি। তখন শাস্ত্রী কঠিন ইংরেজী ভাষায় অনেক গুলি প্রশ্ন করিলেন। মিডিয়ম দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় তাহার প্রত্যেকটীর সন্তোষজনক উত্তর হইল। মিডিয়ম ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। অথচ কে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ইংরেজী বুঝিয়া তাহার সদুত্তর দিলেন? ইহাই বিবেচনার বিষয়।

আমার সহধর্ম্মিণীর দিব্য চক্ষু সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলাম। এক দিবস তাঁহার চক্ষু বন্ধ করিয়া, লুকাইয়া আমার হস্তে যাহা কিছু ধরিয়াছি, তাহাই তিনি ঠিক্ বলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। কেহ বলিতে পারেন, ইহা দিব্য চক্ষুর প্রমাণ বটে, প্রেততত্ত্বের প্রমাণ নহে। কিন্তু এই দিব্য চক্ষু দ্বারা লুক্কায়িত অজ্ঞাত পদার্থের কথা তিনি যেমন বলিয়া দিতেন, সেইরূপ আত্মাদেরও দেখিতে পাইতেন, ও তাঁহাদের কথা শুনিতেন।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৃষ্ণনগরের অভিজ্ঞতা কিছু কিছু বলিলাম। কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করার পর যাহা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহারও কিছু কিছু বলিব। কলিকাতায় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে অধ্যাত্মচক্রে বসিতাম। যে টেবিলের চারি পার্শ্বে আমরা বসিতাম, তাহার একটী পা উঠিয়া মাটীতে আঘাৎ করিত। আমরা ইংরেজী অক্ষর এ, বি, সি, পড়িতে থাকিতাম। যে অক্ষরটী পড়িবা মাত্র টেবিলের পা দ্বারা মাটীতে ঘা হইত, সেই অক্ষরটী লিখিয়া লওয়া হইত। আমাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত বিশ্বাস। আমাদের মধ্যে যে কেহ কৌশল করিয়া টেবিলের পা উঠাইয়া শব্দ করিতেছেন না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। ইহা ভিন্ন পরস্পরের হস্ত এমন ভাবে টেবিলের উপর থাকিত, যাহাতে ঐরূপে টেবিলের পা দ্বারা মাটীতে আঘাৎ হওয়া অসম্ভব। যে অক্ষরটী পড়িবামাত্র মাটীতে ঘা হইত, তাহা লিখিয়া লওয়া হইত, এইরূপে অক্ষরের পর অক্ষর লিখিয়া শেষে দেখা যাইত যে, একটী অর্থযুক্ত বাক্য হইত। আমরা উহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইতাম।

একদিন ঐরূপ করিতে করিতে একটী সাহেবের নাম লেখা হইল। নামটী Thomson. সাহেবের সঙ্গে ঐ প্রণালীতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। শেষে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি তো টেবিলের একটী পা মাত্র তুলিতেছেন। আপনি টেবিলের সকল পাগুলি তুলিয়া টেবিলটীকে সম্পূর্ণ রূপে শূন্যের উপর উঠাইতে পারেন? সাহেবের আত্মা বলিলেন, পারেন। আমাদের হাতের আঙ্গুলগুলি টেবিলের উপরে লাগান রহিল। টেবিল হঠাৎ শূন্যের উপর উঠিল। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আঙ্গুলগুলি সেইরূপ টেবিলের উপরিভাগে লাগান রহিল। প্রত্যেকের হস্ত দেখিলাম, কাহারও হস্ত দ্বারা টেবিল উর্দ্ধে তোলা হয় নাই। তারপর, আমি মাটীতে বসিয়া দেখিলাম, টেবিল শূন্যে ঝুলিতেছে। আশ্চর্য্য হইলাম। তখন দাঁড়াইলাম। দেখি, আমরা সকলেই জাগ্রত, আমাদের মধ্যে একটী বন্ধু অচেতন অবস্থায় কেদেরার উপর শয়ন করিয়া আছেন। একেবারে অজ্ঞান। ডাকিলাম, শুনিতে পাইলেন না। বুঝিলাম, তাঁহাকে মিডিয়ম করিয়া আত্মা এই আশ্চর্য্য কার্য্য করিতেছেন। আমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইলাম। বলা আবশ্যক, সন্ধ্যার পর এই ঘটনা হয়, ঘরে আলো ছিল। যে বন্ধু অচেতন হইয়া গিয়া-

ছিলেন, তিনি বিখ্যাত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। যাঁহাকে সচরাচর D. N. Gangooli বলা হইত। তখন আমি Thomson সাহেবকে বলিলাম, আপনি এখন টেবিলটী মাটীতে নামাইতে পারেন। আমি বলাতে টেবিল আস্তে আস্তে মাটীতে নামিল। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া এই ঘটনা হওয়াতে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য।

আমাদের এই স্থূল দেহে যে আত্মা রহিয়াছে, তাহা যে দেহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে পারে, এবং পুনর্ব্বার দেহে প্রবেশ করিতে পারে, সেবিষয়ে দুটী ঘটনা বলিব। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া আমার বাসায় থাকিতেন। সেই সময়ে অনেকে তাঁহার নিকট যোগে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, দেখ, গোঁসাই যখন লোককে দীক্ষা দেন, তখন তিনি দেহে থাকেন না। দেহের বাহিরে সূক্ষ্মদেহে থাকেন। আমি বলিলাম সে কি? তুমি ইহা কেমন করিয়া জানিলে? তিনি উত্তর করিলেন, আমি দেখিয়াছি। তাঁহার দিব্য চক্ষু ছিল, আমি জানিতাম। তথাচ মনে করিলাম, গোস্বামী মহাশয়কে নির্জ্জনে এ কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত। গোস্বামী মহাশয়কে নির্জ্জনে একথা করাতে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন, আপনি কেমন করিয়াজানিলেন? আমি বলিলাম, আমার স্ত্রী উহা দেখিয়াছেন, তিনি বলিলেন। গোঁসাই বলিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। বোধ হয়, পরমহংসজী ফণুর মাকে ইহা দেখাইয়াছেন। আমার রুগ্ন শরীরের ভিতর থাকিয়া দীক্ষা না দেওয়াই ভাল, সেইজন্য, দেহের বাহিরে থাকিয়া লোককে দীক্ষা দি। দীক্ষা হইলে আবার দেহের মধ্যে প্রবেশ করি।"

দেহ হইতে বাহির হওয়া ও পুনর্ব্বার দেহে প্রবেশ করা সম্বন্ধে আমার নিজের একটী আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা আছে। আমি বৎসর বৎসর হাজারিবাগ যাইতাম। একবার তথায় গিয়া একদিন অপরাহ্ণে আমার স্মরণ হইল যে, দেহ হইতে বাহির হইবার একটী উপায় আমার গুরু আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি কখন উহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। সেদিন, কেন জানি না, উহা পরীক্ষা করিবার জন্য, দেহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা হইল। একটী ঘরের ভিতর গিয়া গুরুর নিকট যে উপায় শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা অবলম্বন করিলাম। ক্রমে দেখি, আমার সমস্ত শরীর সড়্ সড়্ করিতে লাগিল। Electric battery তে হাত দিলে যেমন শরীরে তাড়িত প্রবেশ করিয়া সড়্ সড়্ করিতে থাকে, আমার সমস্ত শরীরে সেইরূপ অনুভূতি হইতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণ মধ্যে, অনুমান ২।৩ মিনিটের মধ্যে দেখি, আমি শরীরের বাহিরে আসিয়াছি। চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখি, বহুসংখ্যক উজ্জ্বল আত্মা দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত। আমার চারি দিকে সূক্ষ্মদেহী আত্মার ভিড় হইয়াছে। তাঁহারা সমস্বরে হরিধ্বনি করিতেছেন। তারপর হঠাৎ আমাকে কে ঊর্দ্ধে, শূন্যে টানিয়া লইল। আমি শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ছোটনাগপুর অঞ্চলের প্রকৃতির যেরূপ শোভা, সেইরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে শূন্যে ভাসিয়া যাইতেছি। দেহ হইতে বাহির হইয়াছি বলিয়া মৃত্যুর আশঙ্কা আমার মনে এক নিমেষের জন্যও আসে নাই। অন্তরে অপূর্ব্ব শান্তি। ক্রমে একটী স্থানে পৌঁছিলাম। দেখি, একটী গলি; দুই দিকে

ইষ্টকালয়। গলিটী নাবাল। এক দিকে উচ্চ, এক দিক্ নিম্নতর। দেখিলাম, এই গলির শেষে নাবাল জমী, জলশূন্য। ইচ্ছা হইল, পার্শ্বের একটী বাটীর ভিতর যাই। ভিতরে গিয়া প্রাঙ্গণে শূন্যের উপর দণ্ডায়মান হইলাম। দেখিলাম, সেই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান। আমার মনে এই প্রশ্ন আসিল যে, ঐ স্ত্রীলোকটী আমাকে দেখিতে পায় কি না? আমি তাহার সম্মুখে মাথার উপর দাঁড়াইলাম। ইচ্ছা করিলাম, সে আমাকে দেখুক। আমি তাহার মন দেখিতে পাইলাম। সে আমাকে দেখিয়া মনে মনে যাহা বলিতেছে, তাহার ভাব এই ;—"ওমা! একি গো! ওমা! একি গো!" ভূত দেখিলে যেরূপ ভাব হয়, স্ত্রীলোকটীর সেইরূপ ভাব হইয়াছে, বুঝিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমাকে কে টানিয়া লইল। আমি হঠাৎ দেখি যে, আমি হাজারিবাগের সেই ঘরে আমার দেহের মধ্যে। বাহির হইবার সময় যেমন দেহ সড়্ সড়্ করিয়াছিল ; প্রবেশ করিয়া দেখি, দেহ সেইরূপ সড়্ সড়্ করিতেছে।

তারপর পনর দিন হাজারিবাগে থাকিলাম। শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, তখন সেখানে ছিলেন। ডাকঘরের ইন্‌স্‌পেক্‌টরের কর্ম্ম করিতেন। তিনি গিরিধি পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মের জন্য আসিবেন, আমাকেও কলিকাতা ফিরিতে হইবে। কথা হইল, আমরা দুইজনে দুইখানা গাড়ীতে একসঙ্গে গিরিধি পর্য্যন্ত আসিব। পথে পরেশনাথ পর্ব্বত দেখিব। হাজারিবাগের যদু বাবু বলিলেন যে, পরেশনাথ পর্ব্বতের নীচে যে আরার মহারাজের মন্দির আছে, তিনি তাহার পুরোহিতকে পত্র লিখিবেন। তিনি আমাদের পর্ব্বত ও মন্দিরাদি দর্শনের সুবিধা করিয়া দিবেন। আমরা দুইজনে হাজারিবাগ ছাড়িয়া পরেশনাথ পর্ব্বতের নিকট চির্‌কি নামক একটী গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানকার ডাকঘরে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সত্যপ্রকাশ তথায় নামিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নামিলাম। সমস্ত রাত্রি সেই ডাকঘরে যাপন করা হইল। পরদিন প্রভাতে আরার মহারাজার মন্দিরের পুরোহিত একখানি গাড়ী লইয়া আমাদিগকে লইতে আসিলেন। আমরা গাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে গমন করিলাম। একটী স্থানে গিয়া আমাদিগকে গাড়ী হইতে নামিতে হইল। পরেশনাথ পর্ব্বতের পদতলে একটী গ্রামে পৌঁছিলাম। ঐ গ্রামটীর নাম মধুবন। পুরোহিত মহাশয় আমাদিগকে একটী গলির মধ্যে লইয়া গেলেন। এস্থানে পূর্ব্বে এজীবনে সশরীরে কখন আসি নাই। কিন্তু পনর দিন পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করিয়া যে আসিয়াছিলাম, এ সেই স্থান। তারপর ঐ গলির পার্শ্বে একটী বাড়ীতে আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল। দেখি উহা সেই বাড়ী, যে বাড়ীর প্রাঙ্গণের উপর শূন্যে দাঁড়াইয়া একটী স্ত্রীলোককে দেখা দিয়াছিলাম। আশ্চর্য্য হইলাম। সত্য প্রকাশকে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম। তিনিও অবশ্য আশ্চর্য্য হইলেন। তখন সত্যপ্রকাশকে বলিলাম সব মিলিয়াছে, কেবল একটী বিষয় মিলিতে অবশিষ্ট আছে। এই নাবাল গলির শেষে, একটী নাবাল জমি আছে। তাহা মিলে কিনা, দেখিতে হইবে। তখন আমরা দুইজনে দৌড়িয়া গিয়া দেখিলাম, সেই নাবাল জমি রহিয়াছে। সব মিলিল ; কেবল একটী বিষয় মিলিল না। পনরদিন পূর্ব্বে দেখিয়া

ছিলাম, ঐ গলি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে নাবাল। সশরীরে দেখিলাম, উহা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে নাবাল inclined, যাহা হউক, যারপর নাই আশ্চর্য্য হইলাম। অনেক বার দেহ হইতে বাহির হইয়া অন্যস্থান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য রূপে কোন স্থান মিলিয়া যায় নাই।

আর একটী কথা। স্বপ্নে ভুইবার ভুটী অজ্ঞাত স্থান দেখিয়াছিলাম। তাহা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়াও গিয়াছিল। কিন্তু হাজারিবাগের এই ঘটনার সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইহাতো স্বপ্ন নহে। আমি সজ্ঞানে ইচ্ছা পূর্ব্বক, গুরু যে প্রণালী বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই প্রণালী অনুসারে, পরীক্ষা করিবার জন্য দেহ হইতে বাহির হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া গেল।

ময়মনসিংহের এক ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিলেন, সেই ঘরের কোণে আলো প্রকাশ হইল। সেই আলোকের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিতেছেন, দাদা! আমার মৃত্যু হইয়াছে। পরিবারগণ রহিল, তুমি দেখিও। তারপর তাঁহাদের পল্লীগ্রামস্থ বাটী হইতে পত্র আসিল যে, তিনি যে সময়ে তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিয়াছিলেন, ও তাহার মুখে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস মহাশয় একজন ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তি।

সাতান্ন সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষাও একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। সিপাহি বিদ্রোহের সময়, একজন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষরূপে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী, ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামী আসিয়া বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষের যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইল, সেই কথা তাঁহাকে বলিতে আসিয়াছেন। তারপর স্ত্রীলোকটী সর্ব্বদাই যুদ্ধ সংক্রান্ত আপিসে গিয়া তাঁহার স্বামীর সংবাদ লইতেন। সংবাদ পাইলেন যে, যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু সংবাদ পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বপ্নে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর যে তারিখ পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত আপিসের তারিখ মিলিল না। তিনি যুদ্ধ-আপিসের কর্ম্মচারীদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করেন। তিনি অন্য প্রকারে অন্য তারিখ জানিয়াছেন। অনুসন্ধান হইল। শেষে স্থির হইল যে, মেম সাহেব স্বপ্নে তাঁহার স্বামীর মুখে যে তারিখ শুনিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত তারিখ, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আপিসে প্রথম সংবাদে যে তারিখ আসিয়াছিল, তাহা ভুল। এইরূপে একটী স্বপ্নের দ্বারা যুদ্ধ আপিসের সংবাদ সংশোধিত হইল। এই ঘটনা ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের লিখিত 'যৎকিঞ্চিৎ' নামক পুস্তকে আত্মার অমর-তত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

পরিশেষে Psychic Research Societyর রিপোর্ট হইতে একটী ঘটনার কথা বলিয়া আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উক্ত রিপোর্ট সকলে এমন কয়েকটী ঘটনা আছে, যাহা আত্মাদের ক্রিয়া বলা ভিন্ন অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। এরূপ কয়েকটী ঘটনা আছে যে, কোন আত্মা

আসিয়া মিডিয়ম দ্বারা বা অন্য প্রকারে আত্ম পরিচয় দিলেন, কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তি-গণ কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি সকলেরই নিকট অপরিচিত। পরে, অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে, সেইরূপ একজন লোক যথার্থই ছিলেন, এবং তিনি আত্মপরিচয়ের জন্য যাহা কিছু বলিয়া-ছিলেন, সকলই সত্য। ১৮৭৪ সালে, ষ্টেনটন মোজেস, (Stainton Moses), ডাক্তার স্পিয়ারের সঙ্গে ওযাইট দীপে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহারা কয়েকবার অধ্যাত্মচক্রে বসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী চক্রে, এব্রাহেম ফ্লারেন্টাইন নামক এক আত্মা আপনার পরিচয় দেন। উক্ত পরি-চয় কোন মানুষ মিডিয়ম দ্বারা দেওয়া হয় নাই। এই প্রবন্ধে পূর্ব্বে, একটী টেবিল সম্পূর্ণরূপে শূন্যে উঠার কথা বলা হইয়াছে। সেই সময়ে, টম্সন নামক এক আত্মার সহিত, যে প্রণালীতে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, এই ফ্লরেন্ টাইন সাহেবও সেই প্রণালীতে টেবিলের একটী পা উঠাইয়া আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ টেবিলটী এত ভারি যে, দুইজন লোক উহা কষ্টে নড়াইতে পারেন। ফ্লারেন্টাইন সাহেব ঐ প্রণা-লীতে বলেন যে, তিনি ১৮১২ সালের যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন; এবং অল্প দিন হইল, ৮৩ বৎসর, এক মাস, ১৭ দিন বয়সে পার-লৌকিক জীবন লাভ করিয়াছেন। এব্রাহেম ফ্লারেন্টাইন নামক জীবিত কোন মনুষ্য ছিলেন কিনা, এবং তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্য কি না, চক্রস্থ ব্যক্তিগণ ইহা অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। এজন্য আমেরিকার কোন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। এব্রাহেম ফ্লারেন্-টাইনের বিষয় কেহ কখন শুনিয়াছেন কি না, এ বিষয়ে অনুসন্ধান হইল। পরে ডাক যোগে উইলসন মিলার নামক এক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি লিখিলেন যে, ১৮১২ সালের যুদ্ধে এব্রাহেম ফ্লারেনটাইন নামক একজন নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইহাও লিখিলেন যে, নিউইয়র্ক ষ্টেটের এসিষ্টাণ্ট জেনারেলের আপিসে, ইহার কর্ম্মের বৃত্তান্ত সকলই পাওয়া যাইবে। পরে এসিষ্টাণ্ট জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি এই এব্রাহেম ফ্লারেন্টাইন সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা বলিয়া পাঠাইলেন। পরে এব্রাহেম ফ্লারেন্টাইনের বিধবা স্ত্রীর সংবাদ পাওয়া গেল। সেই বিধবা স্ত্রীলোক যাহা বলিলেন, তাহাতে আত্মার কথা সকলই মিলিল। একটী সামান্য বিষয়ে অমিল হইল। সে এই যে, আত্মা বলিয়াছেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর, ১ মাস, ১৭ দিন ছিল; তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল, ৮৩ বৎসর, ২৭ দিন।

আমার প্রবন্ধ শেষ হইল। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে কেন বিশ্বাস করি, এই প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিলাম। একটী দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে। আমাকে মিডিয়ম বলিয়া কেন বিশ্বাস করি, এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিব। এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যত শীঘ্র পারি, এই দ্বিতীয় প্রবন্ধ লইয়া নব্যভারতের পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইব। এখন নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

একটী উত্তর।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত চৈত্র মাসের নব্যভারতে "আত্ম-তত্ত্ব" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে কোন সুপ্রসিদ্ধ পরলোকগত ব্যক্তি তাঁহার দ্বারা ঐ প্রবন্ধ লেখাইয়াছেন এবং তিনি শ্রুতলিপির ন্যায় উহা লিখিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় নামক একজন লেখক "একটী জিজ্ঞাসা" নাম দিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধের ও মতের সমালোচনা করিয়াছেন। লেখক এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহা লইয়া পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিমে বহুকাল ধরিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকারের আলোচনা চলিতেছে। এই ক্ষুদ্র লেখকের সে সকল কথা লইয়া আলোচনা করার ইচ্ছা নাই, তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে, অসংখ্য ঘটনা রাজি, স্রোতের ন্যায়, আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, সে সকলের মধ্যে আমরা অতি অল্প সংখ্যকেরই কার্য্য-কারণ নির্ণয় করিতে পারি। ঘটনা অথবা কার্য্যই আগে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, সুতরাং কারণ পাইলাম না বলিয়াই যদি সকল ঘটনাকে উপেক্ষা করা হয়, তবে ত জ্ঞানরাজ্যের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দার্শনিক আলোচনার অবসর নাই। আমি "একটী-জিজ্ঞাসা" লেখকের "একটী উত্তর" দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগত ব্যক্তির কথা শুনিতে পান এবং গান শুনিতে পান এই কথার উপর অতুল বাবু লিখিয়াছেন "—আত্মাগণ (?) তাঁহার দ্বারা (নগেন্দ্র বাবুর দ্বারা দীর্ঘ ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখাইতেছেন এবং তিনি (নগেন্দ্র বাবু) তাহা শ্রুতলিপি লেখার ন্যায় লিখিয়া যাইতেছেন, এরূপ মিডিয়মের কথা কখনও কেহ শুনিয়াছ কি ?" অন্যত্র "আমি কেবল মাত্র ইহাই বলিতে চাই যে Society for Psychical researches ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও যেরূপ মিডিয়মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, নগেন্দ্রবাবু বলেন, তাহাই তিনি বিনা চেষ্টায় হইয়াছেন। ইহা কি বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? সজ্ঞানে ও সচৈতন্যে আত্মাগণের সহিত কথোপকথন করা, তাহাদিগকে দর্শন করা এবং তাহাদের বক্তব্য বিষয় শ্রুতলিপি লেখার মত লিখিতে পারা ইতি পূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।"

লেখক অতুল বাবু বিলাতের সাইকিকেল সোসাইটীর কথা উল্লেখ করিয়াও কিরূপে যে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বুঝিতে পারি না। উক্ত সোসাইটীর রিপোর্টে পরলোকগত ব্যক্তিকে দর্শন করা ও তাহার কথা শুনার দৃষ্টান্ত এতই অধিক পরিমাণ রহিয়াছে যে, যিনি অমনোযোগেও সোসাইটীর রিপোর্ট পড়িবেন, তাঁহার চক্ষুও এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। উক্ত

সোসাইটীর রিপোর্টে চারি প্রকারে পরলোক-বাসীর কথা শুনার দৃষ্টান্ত আছে। মিডিয়মের মধ্য দিয়া দুই প্রকারে এবং সাক্ষাৎ ভাবে দুই প্রকারে। শেষের দুই প্রকারের মধ্যে এক প্রকার মায়া-মূর্ত্তিধারী পরলোক-বাসীর মুখ হইতে শ্রুত। অন্যপ্রকার কেবল বাণী।

অতুল বাবু বিলাতের সোসাইটীর দোহাই দিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার লেখার বিরুদ্ধে সোসাইটীর রিপোর্ট হইতে এতই দৃষ্টান্ত তোলা যায় যে, তাহা দ্বারা একখানি গ্রন্থ হইতে পারে। আমি কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। শ্বশুর জামাই দুইজনই বড়লোক, একজন লর্ড, একজন ব্যারণ। উভয়ের মধ্যে কোন কারণে মনোবাদ ঘটে। শ্বশুরের মৃত্যুর অল্পদিন পরে জামাতা (তাঁহার জাগ্রত অবস্থায়) হঠাৎ তাঁহার ঘরের মধ্যে শ্বশুরকে দেখিতে পান। ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল। শ্বশুর যে পোষাক মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিতেন, সেই পোষাকই পরা। শ্বশুর জামাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার প্রসন্নতা চাহিলেন, ইহার পরে জামাতা ও শ্বশুর করমর্দ্দন করিলেন। শ্বশুরের কথা জামাতা শুনিলেন এবং জামাতার কথা শ্বশুর শুনিলেন। উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইল।*

২। কোন ব্যক্তি তাঁহার নিজের মৃত্যু সংবাদ তাহার দূরস্থ কোন বন্ধুকে দিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।†

৩। মৃত্যুর ১৬ বৎসর পরে পরলোকগত মাতা কন্যাকে প্রথম অদৃশ্য থাকিয়া তিনবার ডাকিলেন, শেষে দেখা দিয়া কন্যাকে একটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন। বলিলেন, অমুক স্থানে (দূরদেশে) তোমার ভ্রাতৃবধূর মৃত্যু হইল। তাহার দুইটী সন্তানের (ইহাদের মধ্যে একটী সদ্য প্রসূত) লালন পালনের ভার তোমাকে লইতে হইবে। কন্যা রাজি হইলেন, মাতা ও কন্যার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কন্যা কয়েকদিন পরে তাঁহার ভ্রাতার পত্রে জানিলেন যে, একটী সন্তান প্রসব করিয়া তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। অন্য সন্তানটীর কথা এই কন্যা জানিতেন কিন্তু সদ্যপ্রসূতের কথা কিছুই জানিতেন না।‡

৪। একব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর ১২ ঘণ্টা পরে তাঁহার দূরদেশস্থ বন্ধুকে আপনার মৃত্যুসংবাদ জানাইলেন। বন্ধু কিছুই জানিতেন না।

উপরোক্ত সকল ঘটনাই দর্শকগণের জাগ্রৎ অবস্থায় ঘটিয়াছে।

১ম ও ২য় দৃষ্টান্তে পরলোকগত ব্যক্তি শরীর ধারণ করিয়া কথা বলিয়াছেন, ৩য় দৃষ্টান্তে মাতা প্রথমতঃ শরীর ধারণ না করিয়া কথা বলিয়াছেন। ৪র্থ দৃষ্টান্তে শরীর ধারণ না করিয়াই কথা বলা হইয়াছে। বিলাতের সোসাইটীর রিপোর্টে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। অতুলবাবু কিন্তু সোসাইটীর দোহাই দিয়া সকলই অস্বীকার করিয়াছেন।

* From the Proceedings S. P. R. Volume X, page 385-86.

† Myer's Human Personality—Appendix IV—F

‡ From Proceedings S. P. R. Volume X, p 380-82.

From Phantasm of the Living Vol I. P. 22, foot note.

অতুলবাবু মনোযোগ পূর্ব্বক সোসাইটীর রিপোর্ট পাঠ করিলে পরলোক-বাসিগণের সঙ্গীতের কথা অনেক স্থানে পাইবেন। আমার কাছে পুস্তক না থাকায় দৃষ্টান্ত দিতে পারিলাম না।

অতুল বাবু লিখিয়াছেন "সজ্ঞানে ও সচৈতন্যে আত্মাগণের সহিত কথোপকথন করা, তাহাদিগকে দর্শন করা এবং তাহাদের বক্তব্য বিষয় শ্রুতলিপির লেখার মত লিখিতে পারা ইতিপূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই," আমরা জিজ্ঞাসা করি "অজ্ঞানে ও অচৈতন্যে" দেখা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি? "সকলেই সজ্ঞানে" ও "সচৈতন্যে" দেখিয়াছেন, অজ্ঞানে ও অচৈতন্যে কেহ কিছু দেখিতে শুনিতে পায় না।

উপসংহার আর একটী কথা বলিব, ষ্টেড্ সাহেব অথবা জুলিয়ার সঙ্গে মিলিলেই নগেন্দ্র বাবু বাঁচিলেন, নতুবা মরিলেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা কি? এ বিষয়ে নগেন্দ্র বাবুকে কেন যে ষ্টেড সাহেব হইতে ছোট হইতে হইবে, তাহাত বুঝিতে পারি না। এ দেশের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা যে কথা বলিবেন, তাহা ঠিক্ কি না, জানিবার জন্য কি বিলাতে আপিল করিতে হইবে? অতুল বাবু নগেন্দ্র বাবুকে বেশী জানেন, না ষ্টেড্ সাহেব ও জুলিয়াকে বেশী জানেন?

আরও একটী কথা বলিব, ২৫ বৎসর চেষ্টা করিলেই কি ভাল মিডিয়ম প্রস্তুত করা যায়? বিলাতে যাঁহারা ভাল ভাল মিডিয়ম হইয়াছেন, তাঁহারা কি চেষ্টার ফলে সেইরূপ হইয়াছেন? যাঁহারা কিছুমাত্র মিডিয়মতত্ত্ব জানেন, তাঁহারা কিছুতেই একথা স্বীকার করিবেন না। অনেক ভাল ভাল মিডিয়মই হঠাৎ মিডিয়ম হয়। ঘসিয়া মাজিয়া যেমন বড় কবি হওয়া যায় না, সেইরূপ ঘসিয়া মাজিয়া উৎকৃষ্ট মিডিয়মও হওয়া যায় না। এই ভারতবর্ষটা এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, এদেশবাসী কোন বিষয়েই উৎকৃষ্ট হইতে পারিবে না?

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সমর্থন করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, অতুল বাবু বিলাতের সাইটিকেল সোসাইটার নাম করিয়া যে প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি তাহারই উত্তর দিলাম। অতুল বাবুর সমগ্র প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হইত।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন
(প্রতিবাদ।)

"নব্যভারতের" আষাঢ় সংখ্যায় বর্ষীয়ান্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক, শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় "লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে রংপুর শাখার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার "মাধাই নগরের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। সমা-

লোচনার ফলে সত্যানুসন্ধানের অনুরোধে কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমেই কৈলাস বাবু বলিয়াছেন, "প্রবন্ধের সহিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে কেবল মাদৃশ বৃদ্ধের পক্ষে অপাঠ্য, এমত নহে, বোধ হয় রাখাল বাবুর ন্যায় বালকেও তাহা পাঠ করিতে পারিবেন না। সুতরাং রাখাল বাবুর উদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে ২।৪টী কথা বলিতে হইল।" মাধাইনগরের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার কার্য্য বস্তুতঃ কষ্টসাধ্য। দশ বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র ৺গঙ্গা মোহন লস্কর ইহার পাঠোদ্ধার কার্য্যে বহুপরিশ্রম করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। ৺লস্কর মহাশয়ের অকালমৃত্যুর পর শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে আমি মাধাইনগরের তাম্রশাসন এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। উক্ত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন "ফলক-পাঠ-সুদক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র লস্কর মহাশয়ও অন্যান্য বহু স্থানের পাঠোদ্ধার কষ্টসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন "তিনিও বহু চেষ্টা করিয়া উহার সম্যক পাঠোদ্ধারে সমর্থ হয়েন নাই।"* আমি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ও ইহার ৩ বৎসর পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশ করিতে সামর্থ হই। প্রাচীন অক্ষর পাঠ করা নিত্য অভ্যাস না থাকিলে এইরূপ জীর্ণ তাম্রশাসন পাঠ করা যায় না। বঙ্গদেশে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদাবহারী বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত নীলমণি চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ দুই চারিজন ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই যে পাঠ করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত কৈলাস বাবু কখনও কোন প্রাচীন তাম্রশাসন বা খোদিতলিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ পৃথিবীর যে সমস্ত পত্রে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার কোনটীতে কখনও কৈলাস বাবুর কোন প্রবন্ধ দেখি নাই। সুতরাং স্থবির ঐতিহাসিক যে মাধাইনগরের তাম্রশাসন পাঠে কষ্টবোধ করিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই।

দ্বিতীয় কথা, সিংহ মহাশয় ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত কলহ করিয়া যে ঐতিহাসিক তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কোন স্থানেই প্রচার হয় নাই। প্রাচ্যবিদ্যা বা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যতগুলি পত্র পৃথিবীতে আছে, তাহার কোন স্থানে কোন সময়ে কৈলাস বাবুর আবিষ্কৃত তথ্যের বিচার বা উল্লেখ দেখিতে পাই নাই, সুতবাং এ সম্বন্ধে কোন্ কালে কোন্ ভাষায় আলোচনা হইয়াছে, তাহা আমি অবগত ছিলাম না। কিন্তু এজন্য কৈলাসবাবু আমাকে দোষী করিতে পারেন না, কারণ যাহারা সার সত্যের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তাহারা নিজ নিজ সমাজের পত্র বা পুস্তক সমূহে সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা দেখিতে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। যদি অপর কোন পত্রে বা পুস্তকে সেইরূপ আলোচনা থাকে, তাহা হইলে কেহই তাহার উদ্দেশ লয় না। বর্ত্তমান সময়ে "Athenæum" বা "Pall Mall Maga-

* বল্লাল মোহমুদ্গর, ৯৭ পৃ।

zine"য়ে রোমকমুদ্রা সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে প্রত্নতত্বানুসন্ধিৎসুগণ সহজে তাহার সন্ধান পান না। সিংহ মহাশয় যে সময়ে ঐতিহাসিক আলোচনা করিতেন, সে সময়ে বঙ্গদেশে ও বঙ্গভাষার প্রচারিত বিশেষজ্ঞগণের জন্য কোন পত্রই ছিল না। সম্প্রতি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও ইহার রঙ্গপুর শাখার পত্রিকা এই রূপ আকার ধারণ করিতেছে। সিংহ মহাশয় যে "সেনরাজগণ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ও তাহার যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, তাহা জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম। এতদ্‌পূর্ব্বে দেশীয় বা বিদেশীয় কোনও ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্বানুসন্ধিৎসুর মুখে উক্ত গ্রন্থের নাম শুনি নাই। প্রত্নতত্বসমাজের পত্রিকা সমূহেও ইহার কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং কৈলাস বাবু "নব্যভারতের" আষাঢ় সংখ্যার ১৭৮ পৃষ্ঠার তৃতীয় পাদটীকায় এতদ্দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তাহা যে আমার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যে C. I. E. তাঁহার প্রতি এইরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি হয়ত পাদটীকায় সিংহ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জন্য এরূপ বর্ণনা উচিত হয় নাই।

আমি "মাধাইনগরের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধে বঙ্গের সেন রাজবংশকে "সম্ভবতঃ অনার্য্যবংশসম্ভূত" বলিয়াছি, তাহা সত্য এবং বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এইরূপ কথা কখনও বলিতাম না। আমি যে কথাটী বলিয়াছি, তাহা মানব তত্ত্বের কথা, জাতিতত্ত্বের নহে। শ্বেতকায়, পিঙ্গলকেশ আর্য্যজাতি যে দক্ষিণাপথে তাঁহাদিগের নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন ও প্রাচীন তামিলজাতির সভ্যতার স্থানে আর্য্য সভ্যতা স্থান লাভ করিয়াছিল, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। মহারাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণাপথে কোন স্থানে যে আর্য্যজাতির উপনিবেশ ছিল না, ইহাও মানবতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং কর্ণাটবাসী ক্ষত্রিয় যে অনার্য্যবংশসম্ভূত,তাহা তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব সত্বেও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আর্য্য জাতির অবনতির মুখে প্রকৃত ক্ষত্রিয়গণ লুপ্তপ্রায় হইলে, অসভ্য অনার্য্য জাতি মাত্রেই রাজত্বের সহিত ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছে। নাসিকাবিহীন হূণ হইতে প্রতীহার, চাহমান, চন্দ্রাত্রেয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি। বর্ত্তমান কালে শাণদেশবাসী গোখাদকগণও বিগত দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছে, উদাহরণ আসামের আহমজাতি ও মণিপুরের রাজবংশ। সিংহ মহাশয়ের "সেনরাজগণ" নামক পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রিত হইলে আরও দুই একটী কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। সেনরাজগণ যে রাজেন্দ্র চোড় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন,ইহা সিংহ মহাশয় অষ্টাবিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি অবগত ছিলাম না, অনবগতির কারণ পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। বিজয়সেন যে রাজেন্দ্র চোড়ের সেনাপতি বা সম্পর্কিত ব্যক্তি ছিলেন একথা সিংহ মহাশয় কি প্রকারে জানিলেন? সেন রাজবংশের আলোচনা কালে সিংহ মহাশয় মন্দারগিরির কোন্‌ খোদিতলিপির কথা উল্লেখ করিতেছেন? মন্দারগিরির কোনও খোদিত লিপিতে সেন বংশের কোন কথা নাই। উত্তরাপথে ও

দক্ষিণাপথে দিগ্বিজয়ী চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল নামে খ্যাত। দক্ষিণাপথে ইহার নাম "গঙ্গাইকোন্ডা চোলবরম"—"গঙ্গাবিজয়ী চোলরাজ," "কুলতুঙ্গা" নাম কাল্পনিক, "কুলোতুঙ্গ" নামের বিশেষ প্রচলন নাই।

সেন রাজগণের বিবাহ সম্বন্ধে কৈলাস বাবু যে সকল কথা বলিয়াছেন, সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। বল্লালসেনের বিবাহ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি,তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কখনই বলিতাম না। কৈলাস বাবু যে সময়ে ঐতিহাসিক আলোচনা করিতেন, তাহার পর শত শত খোদিতলিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৈলাস বাবু কতকগুলি রাজার নাম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বোধ হইতেছে, তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয় কখনও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। ভরসা করি, প্রাচীন সাহিত্যিক আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, কারণ আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছি না। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত ছিল।

(১) জয়াপীড় কাশ্মীররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিলে ও গৌড়রাজের কোন বিশেষ উপকার করিলে, তাঁহার সহিত গৌড় রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

(২) নেপালরাজ লিচ্ছবী দ্বিতীয় জয়দেব কামরূপরাজ হর্ষদেবের দৌহিত্র। হর্ষদেব গৌড়, ওড্র ও কলিঙ্গ জয় করাতে তাঁহার রাজ্য নেপালরাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াছিল।

(৩) মহারাজ গোপাল ১ম ভৃগুরাজের রাজকন্যা বিবাহ করেন, এরূপ কথার অর্থই বা কি এবং ইহার কি প্রমাণ আছে? পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে রাজেন্দ্র লাল মিত্র যে অসত্যগুলি প্রচার করিয়াছেন, তাহারই বলে কি একথা প্রচারিত হইতেছে? গোপাল দেব ভদ্ররাজের দেদ্দাদেবী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভদ্রগণ বৃহদারণ্যকের মতে মধ্যদেশে রাজত্ব করিতেন। গোপাল প্রথমে মগধের রাজা হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে মধ্যদেশের কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নহে।

৪। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট পরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৈলাস বাবু বোধ হয় অবগত নহেন যে, ধর্ম্মপালের সময়ে পাল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত ভোজ, মৎস্য ও অবন্তী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লাট রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কর্করাজের তাড়ণায় মরুবাসী গুর্জ্জর প্রতিহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভটের সহিত ধর্ম্মপালের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপাল ও তদনুগত মহোদয় রাজ চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের শরণাগত হন ও তাঁহার সহায়তায় গুর্জ্জরগণকে কান্যকুব্জ হইতে দূরীভূত করেন।

৫। দেবপাল, বিগ্রহপাল ১ম ও নারায়ণ পালের সময়ে পাল সাম্রাজ্য বিন্ধ্যাটবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং ত্রিপুরীর হৈহয় বংশের অধিকার পালসাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী ছিল। সুতরাং বিগ্রহপাল হৈহয় চেদীরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহুদূরবর্ত্তী রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন নাই।

৬। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূট জগত্তুঙ্গের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, একথা কৈলাস বাবু কোথায় পাইলেন? পালবংশের কোন তাম্রশাসনে বা খোদিত লিপিতে এরূপ কোন কথা নাই। আমগাছীর ও দিনাজ-

পুরের তাম্রশাসনে আছে যে, রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূট রাজবংশীয় তুঙ্গনামক রাজার ভাগ্যদেবীনাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সিংহমহাশয় বোধ হয় অবগত নহেন যে,এই সময়ে তুঙ্গ ধর্ম্মাবলোক নামক জনৈক রাষ্ট্রকূটরাজ তীর্থযাত্রায় মহাবোধিতে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যার তুঙ্গ উপাধিধারী একটী রাজবংশের তিনখানি তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৈলাস বাবু যে জগত্তুঙ্গের নাম করিয়াছেন,সে কোন্ জগত্তুঙ্গ? মাল্যখেটকের রাষ্ট্রকূট সম্রাটগণের মধ্যে তৃতীয় গোবিন্দের "জগত্তুঙ্গ" বিরুদ্ধ ছিল,কিন্তু তিনি ধর্ম্মপালের সমসাময়িক সুতরাং নারায়ণ পালের পৌত্র যে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ কৃষ্ণবল্লভ অকালবর্ষ-শুভতুঙ্গের পুত্র সম্রাট তৃতীয় ইন্দ্ররাজের পিতার নাম জগত্তুঙ্গ বটে, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজের জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সিংহাসনারোহণ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রকূট সম্রাট মাত্রেই "তুঙ্গ" উপাধি ধারণ করিতেন :—

দন্তিদুর্গ,	সাহসতুঙ্গ।
কৃষ্ণরাজ ১ম,	শুভতুঙ্গ।
গোবিন্দ ৩য়,	জগত্তুঙ্গ।
অমোঘবর্ষ ১ম,	নৃপতুঙ্গ।
কৃষ্ণরাজ ২য়,	শুভতুঙ্গ।
ককরাজ ২য়,	নৃপতুঙ্গ।

এইরূপ স্থলে কোনও ব্যক্তি বিশেষের নাম করা উচিত নহে।

লক্ষ্মণ সেন কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন ও কাশীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। সিংহ মহাশয় কি অবগত আছেন যে,সেন রাজগণের সহিত কান্যকুব্জের গাহড বালগণের বন্ধুত্ব ছিল না? পালবংশীয় শেষ সম্রাট মদনপাল দেব কান্যকুব্জের প্রথম গাহড বালরাজ চন্দ্রদেবের সাহায্যে হৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই সময়ে বিজয় সেন স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, দেওপাড়ার খোদিত লিপি তাহার বিশেষ প্রমাণ, কারণ তৎপূর্ব্বে কর্ণাটবাসীগণ বরেন্দ্রমণ্ডলে পাদক্ষেপ করিতে সাহসী হয় নাই। ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় গাহড বালরাজ গোবিন্দচন্দ্র সমগ্র মগধ অধিকার করিয়া মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরেই মগধ সেন রাজগণের অধিকার ভুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং এই যুদ্ধে সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেন বারাণসী ও ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্রের মগধ আক্রমণের পঞ্চদশবর্ষ পরে পালনামধারী শেষ রাজা গোবিন্দ পাল দেবের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, গোবিন্দচন্দ্র পালবংশের কোন রাজার সাহায্যার্থে সেনরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সিংহ মহাশয় দেওপাড়া প্রশস্তী রচয়িতা উমাপতিধরকে অযথা আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রশস্তীতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক সত্য আছে। বিজয়সেন তীরভুক্তিরাজ নান্যদেবকে পরাজিত করিয়াছিলেন, নান্যদেব নামক একজন রাজা ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলায় রাজত্ব করিতেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন হইতে ও সন্ধ্যাকর নন্দীবিরচিত রামচরিত হইতে জানা গিয়াছে যে, পালসাম্রাজ্যের শেষ দশায়ও কামরূপে পাল রাজগণের অধিকার দৃঢ় ছিল। বোধ হয়, এই অধিকার উন্মূলিত করিবার জন্য বিজয়সেনকে ও লক্ষ্মণসেনকে কামরূপ আক্রমণ করিতে হইয়াছিল।

সিংহ মহাশয় সমালোচনা করিতে আসিয়া যে কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার দুই একটী উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক ঃ—

(১) "এই চালুক্যবংশীয় রাজেন্দ্র চোল (কুলোত্তুঙ্গ দেব) দিগ্বিজয় উপলক্ষে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া সমগ্র বাঙ্গালা লণ্ড ভণ্ড করিয়াছিলেন।" চালুক্যবংশীয় রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশে আসেন নাই। যিনি মধুরান্তকী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র ও ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে চোলরাজ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গবিজয়ী চোলরাজ ১১১২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। এসম্বন্ধে কৈলাস বাবু কি লিখিবেন, তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

(২) তিরুমলইর খোদিতলিপিতে "সঙ্গকোট্ট" নামক কোন দেশের উল্লেখ নাই। পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে তিরুমলইর খোদিতলিপির যে পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল, সিংহ মহাশয় অদ্যাপি তাহার অনুসরণ করিতেছেন। এই কথাটী প্রকৃতপক্ষে "চঙ্গুগোট্টন" ইহা কোন দেশের নাম নহে।* রাজেন্দ্র চোল ১ম বাঙ্গালাদেশের গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া মহীপাল প্রথমের সম্মুখীন হন। আল সম্রাটকে পরাজিত করিয়া তিনি উত্তর রাঢ়ে প্রবেশ লাভ করেন ও গঙ্গাতীরে উপনীত হন। এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে "তক্কনলাল" বা "উত্তিরলাল" যে উত্তর রাঢ় বা দক্ষিণ রাঢ়, ইহা কৈলাস বাবুর আবিষ্কার নহে, বহুকাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই কথা বলিয়া আসিতেছেন।†

"নব্যভারতের" আষাঢ় সংখ্যার ১৮১ পৃষ্ঠায় চতুর্দ্দশ পাদটীকায় সিংহ মহাশয় বলিতেছেন যে "দণ্ডভুক্তি-বিহার; দণ্ডপুর নগরে পূর্ব্ববিহারের রাজধানী ছিল। যতদূর স্মরণ হয়, এই উক্তির কোন ভিত্তি নাই। আমাদিগের বিশ্বাস দণ্ডভুক্তি বর্ত্তমান দাঁতন, কিন্তু সিংহ মহাশয় এসম্বন্ধে কি নূতন প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা না জানিয়া কোন কথা বলা উচিত নহে।

সিংহ মহাশয়ের ন্যায় পিতামহ-কল্প প্রাচীন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের নিকটে আমাদিগের ন্যায় বালকবৃন্দ সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ পাইবার আশা করিয়া থাকে। শুভ্রশীর্ষ-ব্যক্তির মুখে "প্রমাণহীন," "কল্পিত নূতন ঐতিহাসিক তথ্য," "যতটুক প্রকৃত সত্য" "যতটুক কল্পনা প্রসূত" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ প্রত্যাশা করি নাই। প্রমাণ আছে কি না আছে, তাহা বলিবার পূর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল। যিনি তর্ক-যুদ্ধে দ্বিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্রলালকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া মাদৃশ বালকের পক্ষে ধৃষ্টতা, কিন্তু বর্ষীয়ান ঐতিহাসিক অনুমতি করিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।

উপসংহারে সিংহ মহাশয় বঙ্গীয় লেখকবৃন্দের মধ্যে যে সংক্রামক রোগ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা যে তাঁহাকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা বলিয়া রাখা উচিত। প্রবন্ধের শেষ পাদটীকায় তিনি বলিয়াছেন, "রণশূর বোধ হয় আদিশূর বংশীয় হইবেন," কিন্তু বস্তুতঃ ইহার কোন প্রমাণ নাই। এই কথা বলিয়া তিনি Kielhorn, Hoernle, Venkaya, প্রভৃতির অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Epi. Ind. Vol IX P 232.

† Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. P. 10.

জন্মাষ্টমী

সেই তিথি সে নক্ষত্র সেই ভাদ্র মাস,
কংসের ধ্বংসের সেই শঙ্কা ভয় ত্রাস!
সে দৈবকী বসুদেব কংস কারাগারে,
চরণে শৃঙ্খলবদ্ধ ভাসে অশ্রুধারে!
অরাজক মথুরায় নানা উপদ্রব,
আতঙ্ক উদ্বেগে ব্যস্ত পৌরজন সব!
ধর্ম্মের বিষম গ্লানি অধর্ম্মের জয়,
সত্য সঙ্কুচিত ভয়ে মিথ্যার প্রশ্রয়;
চৌর্য্য হত্যা দস্যুবৃত্তি নানা অত্যাচার,
ন্যায়ের শাসন-দণ্ড দেশে নাহি আর;
ধনী কিম্বা বণিকের ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
নারীর যৌবন রূপ নহে নিরাপদ!
পুত্র নহে পিতৃভক্ত উন্মার্গগামী,
নারী নহে পতিব্রতা উচ্ছৃঙ্খল স্বামী!
স্বেচ্ছাচার ব্যভিচার কদাচার কত,
একাচারে অত্যাচারে পশ্বাচারে রত;
সুরাপায়ী সর্ব্বগ্রাসী অন্নে অবিচার,
জাতিভ্রষ্ট সর্ব্বনষ্ট দুষ্ট সর্ব্বদার!
দেব দ্বিজে ভক্তিহীন শক্তিহীন সব,
নিত্য বহে চিত্তে সবে ভৃত্য-পরাভব!
নাহিক উৎসাহ কারো অদম্য উদ্যম,
মর্ম্মে কাঁপে কাপুরুষ কর্ম্ম দেখে যম!
আলস্য ঔদাস্য বশ্য নৈরাশ্যে সতত,
পচিয়া হৃদয়-রক্ত পূঁযে পরিণত!
চরণ-অমৃতে তুষ্ট মরণে আহ্লাদ,
শরণে মাগিয়া লয় শত অপরাধ!
অনাসক্ত অবসন্ন অভিশপ্ত জাতি,
মোহগ্রস্ত ছিন্নমস্ত ধ্বস্ত আত্মঘাতী!
অনিবার্য্য পাপ কার্য্যে গেল রসাতল,
কংস রাজ্যে ধ্বংস-কেতু উড়িছে কেবল!

চারিদিক্ অন্ধকার, আশার আলোক
নিবায়ে ফেলিছে যেন দুঃখ রোগ শোক!
বহে অশ্রু বিপ্লবের প্লাবনের মত,
উড়িছে পাপের ঝড়ে জনপদ কত;
কড়মড় গর্জ্জে বজ্র দৈব অসন্তোষ,
বিকাশি জ্বলন্ত দন্ত বিধাতার রোষ।
রুদ্ধকণ্ঠে কৃষ্ণরাজ্য ফোঁপায় বাসুকী,
জ্বলন্ত নিঃশ্বাস ছাড়ে শত জ্বালামুখী!
কি দুর্য্যোগ! কি দুর্য্যোগ! কাঁপিছে মথুরা,
যমুনায় ঢালে অশ্রু পুত্রশোকাতুরা!
বসুদেব দৈবকীর চরণে শৃঙ্খল,
বৈকুণ্ঠে সে শ্রীকণ্ঠের রোধে কণ্ঠতল!
দম্পতীর বুকের সে ভীষণ পাষাণ,
কৌস্তুভে চাপিল বক্ষ গিরি পরিমাণ!
কাঁদিল না কাপুরুষ দেশপুত্রগণ,
কাঁদিল সে বিশ্বপুত্র নিজে নারায়ণ!
বাজিল সে পাঞ্চজন্য মাভৈঃ মাভৈঃ,
বিমল বৈকুণ্ঠ ব্যোম কাঁপাইয়া অই!
খুলিল আলোক নীলে স্বর্গের অর্গল,
হাসিল আলোক নীলে নীল নভতল!
করিয়া বিদীর্ণ জীর্ণ দুঃখ শোকভার,
পাপের সে ঘনকৃষ্ণ ঘোর অন্ধকার,
নীল বিজলীর রূপ সে নীল অশনি,
কংসের ধ্বংসের হেতু, নব নীলমণি
হাসে দৈবকীর কোলে, অন্ধ কারাতল
নবীন বৈকুণ্ঠ হাসে ভূতলে উজ্জ্বল!
চরণে শৃঙ্খল হ'ল কুসুমের হার,
হইল সুখের বোঝা বুকে দুজনার!
দেবতা নন্দনে বর্ষে চন্দন কুসুম,
বৃন্দাবনে নন্দালয়ে আনন্দের ধূম!

বাজে শঙ্খ বাজে ঘণ্টা করতাল খোল,
যমুনায় বহে নীল নবীন হিল্লোল,
সারি সারি ব্রজনারী দেয় হুলুধ্বনি,
কাঁপিছে বাসুকী শিরে আনন্দে অবনী!
নারদ পারদ বেশ শরদ্ বীণায়,
ব্যাপিয়া ভুতল ব্যোম হরি নাম গায়!
পুলকিত ভারতের পুণ্য তপোবন,
ঋষিবর্গ অর্পে অর্ঘ্য 'নমো নারায়ণ'!
জননীর স্তনে আজ ঝরে ক্ষীর ধার,
পুত্রহীনা পুত্র কোলে পাইয়াছে তার!
কংস তার ধ্বংস দেখে নিদ্রা হতে জাগে,
খুলিল কোষের অসি বৃথা রোষে রাগে!
স্বপনে বপন করি শ্মশানে সর্ষপ,
রাণী ডরে জেগে করে ইষ্টমন্ত্র জপ!
আনন্দে ভরিল আজি চতুর্দ্দশ লোক,
কংসের আলয়ে শুধু অশ্রুজল শোক!

গেছে সে দ্বাপর যুগ—বর্ষ শত শত,
ভাদ্রের অষ্টমী কৃষ্ণা তিথি গেছে কত,
আজিও সে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল খোল,
তেমনি শ্রবণে শুনি সেই হরিবোল!
তেমনি আনন্দ আজ উথলে হৃদয়ে,
অতীতের পতিতের কত কথা লয়ে!
আজিও সে ঘরে ঘরে অষ্টমী উৎসব,
জনমিলা জগন্নাথ জয় জয় রব!
কল্পনা আনিয়া সেই দূর গত কাল,
বর্ত্তমানে রচিতেছে চারু ইন্দ্রজাল!
সত্য কি সে দয়াময় জীবে দয়া করি,
জন্মিলা ভারতে পুনঃ ভগবান হরি?
হে গোপাল, হে গোবিন্দ, হে গোপীবল্লভ,
সার্থক করহ তব জন্ম মহোৎসব!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা। (২)

শিক্ষা।

একাতারিনশ্লো নগর রুষিয়ার দক্ষিণ উক্রাইন প্রদেশে অবস্থিত। সুনিল নীপর নদ এই নগর বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত। এই প্রদেশ জলদেবীগণের বাসভূমি বলিয়া চির বিখ্যাত। নীপর নদ উত্তীর্ণ হইতে হইলে অপর লোকের কথা দূরে থাকুক অসীম সাহস-সম্পন্ন 'কসাক' সৈন্যের অন্তরও গুরু গুরু কাঁপিয়া উঠে,—বুঝি মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। চিরপ্রোথিত বিশ্বাস এমনই প্রবল। এই নদের তীরে কুমারী হানের জন্ম, এবং এই খানেই তাঁহার শৈশবের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হয়। বালিকার অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই সেই সকল মোহিনী শ্যাম-চিকুরা অপ্সরার অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। ধাত্রী-গণের ক্রোড়ে থাকিয়া যে সকল ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা-ছড়া ও পৌরাণিক গল্প-উপকথা শুনিতেন, নীপর নদের তীরে আসিয়া যেন সেই সকল কবিতাবদ্ধ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেন। ধাত্রীগণও তাঁহাকে এক অদ্ভুত শক্তির আধার বলিয়া বিশ্বাস করিত,—কেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে শৈশবাবধিই বালিকার মনে এক সর্ব্বশঙ্করী কর্ত্তৃত্ব ভাবের স্ফুরণ হইতে থাকে। খরস্রোত নীপরের বালুকাময় পুলিন 'উইলো' বৃক্ষের কুঞ্জে শোভিত। এই সুন্দর সৈকতভূমি বালিকার প্রিয়তম ভ্রমণ-স্থল। সেখানে গেলেই তিনি দেখিতে পাইতেন, উইলো বৃক্ষাসীনা

জলদেবীগণ হাস্য মুখে অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। ভয় নাই, ভাবনা নাই,—সেই চার বৎসরের বালিকা এমন নিঃশঙ্কভাবে নির্জ্জন নীপর-পুলিনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন যে, তাহা বয়স্ক-দিগের সাহসে কুলাইত না। বালিকার ভরসা—আত্মশক্তি, বল—আত্ম-প্রাধান্যে অসীম বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ধাত্রীগণের সাক্ষ্যে আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়। বালিকার বিশ্বাস, তাঁহার কেহ কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না, তিনি সকলকেই বশীভূত করিতে সমর্থ। এমন কি, ধাত্রী তাঁহার অমতে চলিলে অমনি তাহাকে ভয় দেখাইয়া আদেশ করিতেন,—"আমার যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই তোমাকে মানিয়া চলিতে হইবে,—নয়ত আমি তোমাকে ফেলিয়া পালাইব, আর ঐ দুষ্ট জলদেবতা আসিয়া তোমাকে পায়ে সুড় সুড়ি দিয়া মারিয়া ফেলিবে। জলদেবীরা আমার কাছে ঘেঁসিতে সাহস করে না, আমি না থাকিলে কে তোমায় রক্ষা করিবে?"

কন্যার এইরূপ বিদ্যা হইতেছে, পিতা মাতা তাহার কিছুই জানিতেন না। যখন জানিতে পারিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করিলেন, তখন দেখিলেন, ঐ সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস বালিকার চিত্তে এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উহার উন্মূলন দুঃসাধ্য।

অতঃপর কন্যার রীতিমত শিক্ষার প্রস্তাব হইল। বিদেশ হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া তাঁহার উপর শিক্ষার ভার দেওয়ার কথা হয়। এই সময়ে একটী শোচনীয় ঘটনা ঘটে। কুমারী হ্যানের বাল্য-জীবন-সংসৃষ্ট বলিয়া এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ চরিত্রের গতি-নির্দ্দেশক বলিয়া ঘটনাটী উল্লেখযোগ্য; নতুবা অপর স্থানে ঘটিলে বোধ হয় কেহ উহার খোঁজও করিত না। একদিন চৌদ্দ বৎসরের একটী বালক-ভৃত্য নদী তীরে কুমারী হ্যানের গাড়ী টানিতে নিযুক্ত ছিল। সে একটু অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল, এই জন্য সেই ক্ষুদ্র বালিকা ক্রোধে চীৎকার করিয়া তাহাকে বলিলেন—"আমি জল-দেবীকে বলিয়া দিয়া তোকে গায়ে সুড়-সুড়ি দিয়া মারিয়া ফেলিব জানিস্! ঐ দেখ্—গাছ থেকে কে একজন নামিয়া আসি-তেছে...এই আসিয়া পড়িল—দেখ্ দেখ্!!" বালক কোন জলদেবী দেখিতে পাইয়াছিল কিনা, কেহ জানে না, কিন্তু সে ভয়ে দৌড়িয়া পালাইল। ধাত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও সে ঊর্দ্ধশ্বাসে তীরের বালুকারাশির মধ্য দিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। বৃদ্ধা ধাত্রী অনেক ক্ষণ বকিয়া শেষে একাকী বালিকাকে লইয়া গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইল। মনে মনে সংকল্প করিল, আজ উহাকে শাস্তি দেওয়াইতে হইবে। কিন্তু সেই বালককে আর কেহ জীবিত দেখিতে পাইল না। সে তাহার গ্রামের দিকেই পালাইয়া গেল; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে তাহার মৃত দেহ ধীবরগণের মৎস্য ধরিবার জালে আবদ্ধ হইয়া উঠিল। পুলিসের সিদ্ধান্ত হইল "আকস্মিক জলে ডুবিয়া মৃত্যু"। পরে বুঝা গেল, বন্যাবসানে যে সকল স্বল্প জলপূর্ণ তড়াগের সৃষ্টি হয়, তাহারাই একটা পার হইতে গিয়া ভয়বিহ্বল বালক একটা বালুকার গর্ত্তে নিমগ্ন হয়। এই বালুকা গর্ত্ত গুলি জলপূর্ণ, এবং নীপর নদের প্রবল প্রবাহজনিত সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান। বাটীর ভীত দাস দাসীগণের কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত

হইল, বালকের মৃত্যু কোন আকস্মিক কারণ-জনিত নহে; বালিকা স্বীয় রক্ষণী শক্তি সঙ্কুচিত করিয়া ভৃত্যকে জলদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার এই বিপদ ঘটিল। ঐ মূর্খোচিত জল্পনায় পরিবারবর্গের মহা অসন্তোষ উৎপন্ন হইল। এই অসন্তোষের আরও বৃদ্ধি হইল যখন তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, আসামী নিজেই গম্ভীর ভাবে অভিযোগ স্বীকার করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন,—"আমিই ঐ অবাধ্য ভৃত্যটাকে আমার আজ্ঞাকারিণী দাসীস্বরূপা অপ্সরাগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।"

ঐই ঘটনায় বিদেশ হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ রূপে অনুভূত হইল। বোধ হয়, তিনি রুষিয়ার প্রচলিত কুসংস্কার হইতে মুক্ত এবং বালিকার এই সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিয়া উহাঁকে স্ববশে আনিতে অধিকতর সমর্থ হইবেন—অভিভাবকেরা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। ইহার পরই একজন ইংরাজ মহিলাকে বালিকার শিক্ষার্থ নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। মিস্ অগস্তা সোফিয়া জেফ্রিজ জলদেবী বা দামোভাইয়ে বিশ্বাস করিতেন না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহার দুর্দ্দমনীয় ছাত্রীকে আপন বশে আনিতে কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। কুমারী হ্যান্ একাকী এক স্থানে গিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং সারাদিন ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বকিতে থাকিতেন। নিকটে কেহই নাই, অথচ কাছে যেন নক্ষত্র-লোক ও গ্রহ মণ্ডলের অদ্ভুত অদ্ভুত ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণন করিতেছেন। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ঐ সকল নির্জ্জন কাহিনী "অপবিত্র প্রলাপ" বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বালিকাকে কিছু করিতে আদেশ করিয়াছেন কি অমনি উহঁার অবাধ্যতা বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিত। বালিকা দ্বারা কোন কার্য্য করাইতে হইলে একমাত্র উপায়, কার্য্যটী করিতে একবার নিষেধ করা। নিষেধ করিলে যাহাই ঘটুক না কেন, উহা তিনি করিবেনই। তবে আদর অনুনয়ে অনেক কাজ হইত। নতুবা তাঁহার দুর্দ্দমনীয়, একগুঁয়ে, নির্ভীক প্রকৃতিকে কেহই অবনমিত করিতে পারিত না। শিক্ষয়িত্রী প্রাণান্ত পণ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া কাজ পরিত্যাগ করিলেন। বালিকাকে আবার ধাত্রীর কাছেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটিল। তৎপর কুমারী হ্যান তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত পিতার নিকট প্রেরিত হন।

মিস্ জেফ্রিজ চলিয়া গেলে আর একজন ইংরাজ-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি নিজেই ভীরুস্বভাবা বালিকা মাত্র—ছাত্রীদ্বয় ইহাকে কিছুই মানিতেন না। এই শিক্ষয়িত্রী ব্যতীত একজন সুইস জাতীয় শিক্ষক এবং ফরাসি-দেশীয় আর একজন শিক্ষয়িত্রীও বালিকাদের জন্য নিযুক্ত হন। এই ফরাসী শিক্ষয়িত্রীটী যৌবনে লোকবিদিত অনেক ঘটনায় সংসৃষ্ট ছিলেন। ইহঁার নাম মাদাম হেনরিতি পিগনুর। পিগনুর স্বীয় সৌন্দর্য্যের জন্য এক সময়ে মহানগরী পারীর জনসমাজে বিখ্যাত ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ভীষণ রঙ্গক্ষেত্রে তিনি অনেক অভিনয় করিয়াছিলেন। বিপ্লবের বিজয়োল্লাসে মত্ত ফরাসীজাতি সুন্দরী পিগনুরকে "স্বাধীনতা-দেবী" রূপে সাজাইয়া প্রতিদিন পারির রাজপথে বিরাট জনপ্রবাহের মধ্য দিয়া

লইয়া বেড়াইত। "স্বাধীনতা—দেবীর" মূর্ত্তি দেখিয়া 'সাম্য—মৈত্রী—স্বাধীনতার' মহামন্ত্রে উদ্বেলিত সেই জয়কল্লোল শতমুখে ছুটিয়া যাইত। বালিকাদ্বয়ের নিকট পিগনুর সেই সকল ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেন। পিগনুর এক্ষণে বৃদ্ধা, কিন্তু তাঁহার বাক্যবিন্যাস-শক্তিতে তিনি হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেন। বালিকাদ্বয় সাগ্রহে সেই উদ্দীপনাময়ী বর্ণনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন—সবিশেষ উত্তেজিত হইতেন এই গ্রন্থের যিনি নায়িকা, তিনি। এই সকল কাহিনী শুনিয়া তদ্দণ্ডেই বলিয়া ফেলিলেন—"আমি স্বাধীনতা দেবী হইয়া জীবন কাটাইব।" এই ফরাসিনী শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া জাতীয় স্বভাব প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ চপলভাষিণী হইলেও কঠোর নীতিপরায়ণা ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্বামীও আসিয়াছিলেন। বৃদ্ধ পিগনুর বড়ই প্রিয় দর্শন, পরিহাস-প্রিয়, কোমলহৃদয় ব্যক্তি। তিনি সর্ব্বদাই বালিকা দুটীকে স্ত্রীর তাড়না ও কঠোর শাসন হইতে রক্ষা করিতেন। নানা আমোদজনক গান শিখাইতেন, এবং তাঁহার ভাণ্ডারের ভাল ভাল রঙ্গ-রস কৌতুকপূর্ণ কথা ও গল্প উপন্যাসাদি শুনাইতেন। তাঁহার স্ত্রীর নিকট—পাঠ্য পুস্তকে এসব আমোদ কোথায়?

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে কুমারী হ্যানকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পিতা দেশভ্রমণার্থ স্বীয় কর্ম্মস্থান শরতু নগর হইতে বহির্গত হইয়া পারি ও লণ্ডন নগরে গেলেন। তখন বালিকার বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তিনি অপর লোকাপেক্ষা বরং পিতার একটু বাধ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা পিতার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কর্ণেল হ্যানের লণ্ডনে যাইবার একটী উদ্দেশ্য বালিকাকে সঙ্গীত শাস্ত্রে কিছু শিক্ষা দেওয়া, কারণ পিয়ানো যন্ত্রে বালিকার বেশ একটু স্বাভাবিক অনুরাগ ও দক্ষতা দেখা গিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে কখন কখন হয়ত বহুবর্ষ সঙ্গীতের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব থাকিত না, কিন্তু এ অনুরাগটুকু শেষ পর্য্যন্ত ছিল। তিনি মোসিলেস্ নামক জনৈক সঙ্গীত শিক্ষকের নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন, এবং একদা কোন ঐকতান-বাদ্য সমাজে একজন সঙ্গীতবিশারদ সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পিয়ানো-দারের সঙ্গে বাদ্য চালাইয়াছিলেন।

কর্ণেল হ্যান্ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডের "বাথ" নামক স্থানেও এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। শুনা যায়, এখানে অবস্থিতিকালে এক মাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা অশ্বারোহণ লইয়া পিতা পুত্রীতে একটু বিরোধ। বালিকা যেমন কাহারও কথা না শুনিয়া 'কসাক' সৈন্যের অনুকরণে পুরুষ-ব্যবহার্য্য জিনের উপর ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন, এখানেও সেই রূপ করিতে চাহেন। বিদেশে এরূপ আচরণ নিন্দনীয় মনে করিয়া কর্ণেল মহোদয় কিছুতেই উহা করিতে দিলেন না। সুতরাং মহা গোলযোগ আরম্ভ হইল। বালিকার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার দেহে গুরুতর পীড়ার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইল। পিতা বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, কন্যাকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া আবার এসিয়া মাইনরের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যানীর স্নিগ্ধ মনোরম প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

মাদাম ব্লাভাস্কীর ইংরাজী ভাষার জীবনী-লেখক শ্রীযুক্ত সিনেট মহোদয় * লিখিয়াছেন :—"কুমারী হ্যানের বেশ একটু অহঙ্কার জন্মিয়াছিল যে, তিনি ইংরাজিতে যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার সে জ্ঞানগর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তিনি তাঁহার প্রথমা শিক্ষয়িত্রী মিস্ জেফ্রি-জের নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। মার্জ্জিতরুচি সুদক্ষ ভাষাবিদেরা এক ইংরাজি ভাষাই কত বিভিন্ন ছন্দে ব্যবহার করিয়া থাকেন। দক্ষিণ রুষিয়ার লোকেরা উক্ত ভাষার তত প্রকার ভেদ অবগত নহেন। সেই ইংরাজ-শিক্ষয়িত্রীর বাড়ী ছিল ইংলণ্ডের ইয়র্কসায়ার প্রদেশে। তৎকর্ত্তৃক শিক্ষিতা কুমারী হ্যান্ লণ্ডনের নব-পরিচিত বন্ধুবর্গের সমক্ষে যখনই ইংরাজিতে কথা বলিতে আরম্ভ করিতেন, তখনই হাস্য পরিহাসের একটা উৎস ছুটিয়া যাইত। তাঁহার বাক্য যতই সদর্থপূর্ণ হউক না কেন, সকলই সে পরিহাস-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইত। ইয়র্কসায়ারের ইংরাজি উচ্চারণ-রূপ বৃক্ষের কলম রুষিয়ার ভূমিতে প্রোথিত হইয়া যে এক অপরূপ ফলোৎপাদন করিবে, তাহাতে লোকের হাস্য সম্বরণ করা অসম্ভব, সন্দেহ নাই। কুমারী হ্যান্ সমস্তই বুঝিলেন, বুঝিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, হাস্য পরিহাস যাহা হইবার যথেষ্ট হইয়াছে,—আর নয়। তিনি তাঁহার উচ্চারণ পরিশুদ্ধ করিতে যত্নবতী হইলেন। বৈদিশিক ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলিবার ক্ষমতা রুষবাসীর একটী জাতীয় গুণ। এই জাতীয় গুণের সাহায্যে তিনি পরবার অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রীঃ যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার ইংরাজি বাক্যালাপে হাস্য পরিহাসের পরিবর্ত্তে এক গভীরতর ভাবের অবতারণা করিয়াছিল।"

যাহা হউক, মাদাম ব্লাভাস্কীর শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা আর বেশী কিছু জানিতে পারি নাই। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বোধ হয় না যে, তিনি কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, অথবা উচ্চ-শিক্ষার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার পরিমাণ জানিবার জন্য কখনও বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন,—এমন কি, নিম্ন বা প্রাথমিক শিক্ষাও আধুনিক, প্রথমত তাঁহার উপযুক্ত রূপ হইয়াছিল কিনা, সন্দেহ স্থল। বস্তুতঃ পৃথিবীর মধ্যে কাহারও শাসনাধীনে থাকা যাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কোন প্রকার-নিয়ম-বন্ধনের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে যিনি স্বতঃই অপারক, তাঁহার পক্ষে শিক্ষকের নিকট পাঠলব্ধ বিদ্যার্জ্জন কখনই সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষে, মহাপুরুষদিগের শিক্ষা প্রায়ই পুস্তকগত নহে। তাঁহারা সাধারণ মানবের মুখ-বিগলিত উচ্ছিষ্ট বিদ্যা প্রায়ই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা মানব জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্য আসেন, সাধারণের নিরূপিত পন্থাবলম্বন করিয়া তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কেননা, তাঁহাদের বিকশিত হৃদয়ের সম্মুখে প্রকৃতি স্বয়ং আপনার গুপ্ত তত্ত্ব-ভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখেন। তাঁহারা তথা হইতে অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়া নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করেন, আবার দুই হাতে জগতে বিলাইয়া যান। মাদাম ব্লাভাস্কী এই জাতীয় জ্ঞানদাতা শিক্ষকগণের অন্যতম।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

* এলাহাবাদ 'পাইয়োনিয়র' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ এ, পি, সিনেট। তাঁহার কৃত "Incidents in the life of Madam Blavatsky" গ্রন্থাবলম্বনেই এই জীবনী লিখিত।

ভারতীয় তত্ত্ব-বিদ্যার ইতিহাসে শঙ্করাচার্য্যের স্থান।

শঙ্কর কাশীতে অবস্থান করিয়া গ্রন্থরচনা দ্বারা এবং শিষ্যদিগকে উপদেশ দ্বারা ব্রহ্ম বিদ্যা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তাঁহার শিষ্য সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে শঙ্কর শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। আমরা সংক্ষেপে সেই ইতিহাসে শঙ্করের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

বেদই ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার এক মাত্র ভিত্তিভূমি। সেই বেদের প্রধানতঃ দুই কাণ্ড,—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বৈদিক কর্ম্ম বলিতে মীমাংসকেরা অগ্নিহোত্র এবং যাগ যজ্ঞাদিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বৈদিক কর্ম্ম বা ক্রিয়া কলাপ স্থূল এবং স্থূলবুদ্ধি জনসাধারণেরই উপযোগী। বৈদিক জ্ঞানবিভাগ বা উপনিষদাদি সূক্ষ্ম বিষয়ক, এবং সূক্ষ্মদর্শীদিগের উপযোগী। সূক্ষ্মদর্শী ভিন্ন অপর লোকের তাহাতে প্রবেশ করা সুকঠিন। কালক্রমে যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের অতিবিকাশ হেতু বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদগম্য ব্রহ্মবিদ্যা—বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে যাগ যজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বরই দেশে প্রকৃত ধর্ম্মের আসন গ্রহণ করিয়াছিল। জ্ঞানী এবং জ্ঞানপিপাসুগণ সেই অন্তঃসার-শূন্য ক্রিয়া বিশেষ-বহুল বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, এজন্যই ভগবৎগীতায় বেদের নিন্দাসূচক নানা প্রকার উক্তি দৃষ্ট হয়, যথা :—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম-কর্ম্মফল-প্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রতি" ॥ ৪৩ ॥
"ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ॥"৪৫ ॥
"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ" ॥ ৪৬ ॥

অজ্ঞানী লোকেরা বেদের কথায় অনুরক্ত হইয়া, নানা প্রকার ক্রিয়াবিশেষের প্রশংসাপূর্ণ জন্ম এবং কর্ম্মফলপ্রদ পুষ্পিত-বাক্যের উল্লেখ করে, তাহারা বলে কর্ম্ম ভিন্ন কিছুই নাই, তাহারা বাসনার দাস, স্বর্গ লাভের পিপাসু, সর্ব্বদাই কেবল ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভের প্রয়াসী ॥ ৪৩ ॥ বেদ ত্রিগুণ বিষয়ক (বাসনা বিষয়ক), হে অর্জ্জুন, ত্রিগুণের (বা বাসনার) অতীত হও ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বদিক জলে প্লাবিত হইলে, ক্ষুদ্র উদপান যেমন বৃথা, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ সকলও সেইরূপ ॥৪৬॥ (২য় অঃ ভগবদ্গীতা।) কর্ম্মকাণ্ডের অতিবিকাশ-নিবন্ধন আত্যাভিমান, বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, নানাপ্রকার ধর্ম্মধ্বজা ধারণ,—তপস্যার নামে শরীর-পীড়ন, এবং কুসংস্কার—কালক্রমে এ সকলে দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃত ধর্ম্ম তখন লুপ্তপ্রায়। এমন সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের অভ্যুদয়। ধ্যান এবং সমাধি দ্বারা

আত্মার সাক্ষাৎকার, সর্ব্বাত্মভাব, এবং সর্ব্বজীবে দয়াই বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-প্রচারের ভিত্তি। "নেতি নেত্যাত্মা"—আত্মা ইহা নয়, উহা নয়, যাহা কিছু ধারণা করা যায়, তাহার কিছুই নয়—যদিও উপনিষদেরই এই শিক্ষা—কিন্তু বুদ্ধের পক্ষে ইহা ধ্যান-লব্ধ সাক্ষাৎ জ্ঞান। যাঁহারা ধ্যান এবং সমাধি সাধনায় নিরত, তাহাদের পক্ষে এই "নেতি নেতি" বাদ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ, কিন্তু যাহারা সেই সাধনা-বিহীন, তাহাদের পক্ষে, ইহা এক প্রকার শূন্যবাদ অথবা নাস্তিকতা। বুদ্ধদেব শঙ্করের ন্যায় গ্রন্থরাশি রচনা করিয়া যান নাই। তাঁহার ধর্ম্ম জীবনগত। জীবনে লাভ করা ভিন্ন তাহা জানিবার অন্য উপায় ছিল না। জীবনে ধর্ম্ম লাভ করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। যাঁহারা বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট সাধনার পথ ছাড়িয়া, কেবল মাত্র বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা সেই বাক্য মনের অগোচর পদার্থ ধারণা করিতে প্রয়াসী, তাহারা শূন্য অথবা ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন কিছুই দেখিবে না। এজন্যই বুদ্ধের বহুকাল পরবর্ত্তী 'হেতুবাদী' শিষ্যগণ 'নেতি' সাধনা করিয়া "পরিণামে শূন্যবাদী এবং ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী হইয়া পড়িলেন। যে আত্মসাক্ষাৎকারেই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব, বৌদ্ধগণ আত্মার পরিবর্ত্তে তাহার স্থানে শূন্যমাত্র প্রতিষ্ঠিত করিল। নিরবচ্ছিন্ন হেতুবাদীদিগের সর্ব্বত্রই যেরূপ দশা হয়, বৌদ্ধদিগেরও তাহাই হইল। তাহাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত রহিল না—তন্মধ্যে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকই প্রধান। বুদ্ধ একজন—তবে বৌদ্ধদিগের মধ্যে এত মতভেদের কারণ কি? মাধবাচার্য্য তাঁহার কৃত 'সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন; একজন যদি বলে "সন্ধ্যা হইয়াছে" তখন যে ব্যক্তি চোর, সে মনে করিবে, চুরি করিবার সময় হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সে মনে করিবে, ইন্দ্রিয়-সেবার সময় হইয়াছে। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানী, সে ভাবিবে, ধ্যান ধারণার সময় হইয়াছে। বাক্যাড়ম্বর-বিহীন জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত উপদেশের শেষ পরিণাম এইরূপই হইয়াছে। বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী অথবা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বলিয়াই আধুনিক জগতে পরিচিত হইয়াছে। এই সময়ে চার্ব্বাকেরও পুনরভ্যুদয়। যদিও চার্ব্বাক্ দর্শন বলিয়া কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না, তথাপি মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক্ মতের যে সার-সংগ্রহ পাওয়া যায়, তাহাতেই দেখা যায় যে, চার্ব্বাকের সংক্ষিপ্ত এক একটী সিদ্ধান্ত যেন ধান-মরিচের ঝালের মত মর্ম্মস্পর্শী। "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণং"—যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, তাহা প্রমাণ-যোগ্য হইতে পারে না। আত্মা বা চৈতন্য ভৌতিক সংযোগ-জনিত গুণ বিশেষ মাত্র—পচা ভাতের মাদক শক্তির ন্যায়। এই ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া তিনি সুনীতির মস্তক ছেদন করিলেন, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" ঋণ হয়, তাতে কি? ঘৃত পান করিতে বিরত হইবে না'। এইরূপে যখন দেশ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইল, তখনই আবার আস্তে আস্তে স্রোত বিপরীত দিকে বহিতে লাগিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণই চার্ব্বাকের "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণং" মত খণ্ডন করিয়া অনুমানের প্রামাণ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ক্রমে নৈয়ায়িকগণ সমাজ-ক্ষেত্রে অভ্যুদয় লাভ করিল। তাঁহারা 'অনুমানের' ভিত্তি আরও দৃঢ় করিয়া তদবলম্বনে আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিলেন :—

"প্রবৃত্তাপ্যনুযেয়োঽয়ং রথগত্যেব সারথিঃ"—"রথ চলিতে দেখিলে যেমন সারথির বর্ত্তমানতা প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপেই আত্মার ক্রিয়াকলাপ দর্শনে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।" অতঃপর জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসকগণ আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক বলিয়া প্রতিপন্ন করিল, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মমার্গকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে, ঈশ্বরকে দূরে ফেলিয়া দিয়া, জীবকে স্বর্গাদি বাসনার এবং কর্ম্মফলের দাস বা ক্রীড়া পুত্তলিকা করিয়া ফেলিল।* শূন্যবাদী বৌদ্ধ এবং প্রত্যক্ষবাদ চার্ব্বাক্ যে আত্মাকে বধ করিয়াছিল, নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকের হাতে সে আত্মা নব জীবন লাভ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের মতে ঈশ্বর থাকিলেও "তটস্থ" জীবের কল্যাণ অকল্যাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহাদের জীব নিগড়বদ্ধ সংসার কারাগারের বন্দী। এই সময়ে সাংখ্যের অভ্যুদয়। তাঁহারা একদিকে জ্ঞানমার্গের প্রকাশ দ্বারা জীবের মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিল। সাধনা-পথ অবলম্বন দ্বারা তাঁহারা আত্মার নির্লিপ্ত স্বরূপ প্রতিপন্ন করিল। বিশুদ্ধ স্ফটিকের সম্মুখে জবা পুষ্প থাকিলে যেমন বর্ণহীন স্ফটিকও জবা পুষ্পের বর্ণলাভ করে, আত্মা সেইরূপ স্বয়ং বিশুদ্ধ স্বরূপ হইয়া ও প্রধান বা জড় বস্তুর সন্নিকর্ষতা বশতঃ মলিনরূপে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে আবার চার্ব্বাকের ন্যায় সাঙ্খ্য ও ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলেন মাত্র। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (৯২। অ—১। সাঙ্খ্য প্রবচন) ঈশ্বর অসিদ্ধ, যেহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য। "মুক্তবদ্ধয়োরণ্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" (৯৩) ঈশ্বর যদি থাকেন, হয় তিনি অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশাদি দ্বারা বদ্ধ, না হয় পঞ্চক্লেশাদি-মুক্ত—এই দুয়ের অন্যতর কিছুই নাই—অতএব ঈশ্বর অসিদ্ধ। 'উভয়থাপ্যসৎকরত্বং' (৯৪):—যদি ঈশ্বর মুক্ত হয়েন, তবে তিনি সৃষ্টি করিতে অক্ষম, কারণ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তক অভিমান আসক্তি প্রভৃতির অভাব। যদি ঈশ্বর বদ্ধ হয়েন, তবে মূঢ়ত্ব হেতু তিনি সৃষ্টি করিতে অক্ষম। (শঙ্করের উত্তর দেখ, ব্রহ্মসূত্র অ-২। পা-১।সূ ৩২, ৩৩॥) এইরূপে সাঙ্খ্য, ধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী। কিন্তু তিনি সেই ছিন্নমূল ধর্ম্মতরুর মস্তকে জল সেচন করিলেন; "ঈশ্বর যদি অসিদ্ধই হইল, তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের কি গতি"? "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা।" (৯৫) অ—১। সাঙ্খ্য প্রবচন) মুক্তাত্মার প্রশংসা দ্বারা লোককে মুক্তির দিকে আকর্ষণ করাই শ্রুতি-স্মৃতির উদ্দেশ্য, অথবা অনিত্য বা আপেক্ষিক নিত্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু হরাদির উপাসনার প্রচার ও শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির উদ্দেশ্য হইতে পারে। যাহা হউক, সাঙ্খ্যদিগের মধ্য হইতেই সেশ্বর একশাখা নির্গত হইল। পতঞ্জলি সেশ্বর সাঙ্খ্যবাদীদিগের প্রধান। পাতঞ্জল মতাবলম্বিরা অষ্টাঙ্গ যোগ, এবং ঈশ্বরের উপাস্যত্ব—"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"—প্রতিপাদন দ্বারা মুক্তির পথ সহজ করিয়া দিল। কিন্তু জীব ইহাতেও সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে পারিল না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে অন্ধকার দূর হইল না। সংসার বন্ধনের হেতুভূত অনাদি অচেতন সাংখ্যোক্ত প্রধান জীবের বিভীষিকার কারণ হইয়া রহিল। এই সময়ে গৌড়পাদের অভ্যুদয়। সাঙ্খ্য-

* জগদ্বীজং তু জগৎ কর্ম্মৈব। কর্ম্মণা জায়তে লোকঃ কর্ম্মণৈব হি লীয়তে।' ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে।' শঙ্করবিজয়। জৈমিনির মতে কর্ম্ম বলিতে যাগ-যজ্ঞই বুঝায়।

কারিকাকার গৌড়পাদ পতঞ্জলিরই অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছে তিনি দেখাইলেন যে, সাঙ্খ্য প্রধান আর কিছুই নয়, সত্ত্ব-রজ-স্তম— এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা মাত্র, "সত্ত্ব রজ স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রধানং।" তিনি ৪২ সূত্রে তাঁহার কারিকায় বলিতেছেন: "ত্রিগুণের সাম্য এবং বৈষম্য হইতেই সৃষ্টি এবং প্রলয়, এই দুইরূপ কার্য্য হয়। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রধান, ন্যূনাতিরিক্তভাবে সেই গুণত্রয়ের মিলনের নাম বৈষম্য, এবং তদ্বিপরীত সাম্য। সাম্য এবং বৈষম্য, এই কারণদ্বয় হেতু, একই প্রধান হইতে সৃষ্টি এবং প্রলয়রূপ বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া থাকে" * সাধারণ সাংখ্য মত এই যে, প্রধান বা প্রকৃতি জড় সূক্ষ্ম দ্রব্য বিশেষ, এবং সত্ত্বাদি তাহারই গুণ (attribute) মাত্র। এমন কি, গীতাতেও উক্ত হইয়াছে, "প্রকৃতিজান্ গুণান্" (২১। অ-১৩।), গুণ সকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু গৌড়পাদ বলিতেছেন "সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রধান"— "সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ং প্রধানং।"—অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের অতীত প্রধান বলিয়া কোন জড় দ্রব্য নাই। অথবা তাঁহার মতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই দ্রব্য, (substance), এবং সাঙ্খ্য প্রকৃতি বা প্রধান সেই গুণত্রয়েরই অবস্থা-বিশেষ মাত্র (সাম্যাবস্থা)। ন্যায়ের মতে যাহাকে দ্রব্যের গুণ (attribute) বলা যায়, সাংখ্য মতে গুণ আর তাহা রহিল না। সাংখ্য তত্ত্বকৌমুদী সূত্র করিতেছেন: "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গু-ণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যং।"১২৭। তাহার উপরে টীকাকার বলিতেছেন,—প্রীতি, অপ্রীতি, এবং বিষাদ দ্বারা সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয়ের পরস্পরের বৈধর্ম্ম্য। আবার বলিতেছেন "সত্ত্বাদীনাং দ্রব্যত্বং সিদ্ধং"—সত্ত্বাদির দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইল। এইরূপে সাংখ্যের জড় প্রকৃতি বা প্রধান— অতীন্দ্রিয় মানস প্রত্যক্ষ বা অন্তঃকরণগম্য সুখ দুঃখ এবং মোহাত্মক গুণ-শব্দ-বাচ্য বস্তুবিশেষে পরিণত হইল। বেদান্তের মায়ারই নিকটবর্ত্তী হইল। সাংখ্য-বেদান্তের মিলনের পথ পরিষ্কৃত হইল। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরং॥" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্॥ শ্বেতাশ্বতর ভিন্ন অন্য উপনিষদে মায়া শব্দ অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মায়া শব্দ স্রষ্টার অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিশক্তিই বুঝাইতেছে। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং পরিচক্ষণায় ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে"—১৯। অধ্যায় ২। ব্রাহ্মণ ৫। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন, "পরমেশ্বর নাম রূপাদি প্রকাশ করিবার জন্য সর্ব্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। কেন? তাঁহার নিজেরই স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য। নাম রূপাদি যদি ব্যাকৃত না হয়, তবে তাঁহার নিরুপাধিক (noumenal) স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে। কার্য্যকরণাদি যোগে নাম রূপাদি ব্যাকৃত হইলে, তাঁহার নিজের স্বরূপই প্রকাশিত হইবে।"† (১) জ্ঞেয় রূপে

* "সাম্য-বৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ং॥"৪২॥ "সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ং-প্রধানং, তেষাং চ বৈষম্যং ন্যূনাতিরিক্ত-ভাবেন সংহননং। তদভাবঃ সাম্যং। তাভ্যাং হেতুভ্যাং একস্মাদেব সৃষ্টি-প্রলয়রূপং বিরুদ্ধকার্য্যদ্বয়ং ভবতি।

† (১) কোন বস্তু জানিতে হইলেই সেই বস্তু কি, এবং সেই বস্তু কি নয়, উভয়ই জানিতে হয়। "Every act of knowledge is an act of distinction." দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায় যে, সাদা দেওয়ালের উপরে সাদা চূণের ফোঁটা কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু কাল বোর্ডে (Black-board) চূণের ফোঁটা সকলেই দেখিতে পায়। সাদার মধ্যে সাদা কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু কালর মধ্যে সাদা সকলেই জানিতে পারে।

'সর্ব্ব' বা এই বিশ্বপ্রপঞ্চ না থাকিলে, পরমেশ্বরের ও সর্ব্বজ্ঞত্ব অপ্রকাশিত থাকে। সেইরূপ ঈশিতব্য বা শাসনযোগ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ না থাকিলে, পরমেশ্বরের ও ঈশিতৃত্ব বা ঈশ্বরত্ব অপ্রকাশিত থাকে। এই হেতু উপনিষদ্ বলিতেছে যে, এই বিচিত্র জগৎসৃষ্টি ঈশ্বরের নিজেরই রূপ প্রকাশের জন্য। শক্তিরূপে (potentially) মায়া ঈশ্বরের স্বরূপভূত হইলেও মায়ার কার্য্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহার স্বরূপভূত বলা যায় না, কারণ প্রপঞ্চ অনিত্য এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ঈশ্বর নিত্য এবং অব্যয়। তবে প্রপঞ্চকে ঈশ্বরের উপাধি (accident) বলা যায়। "ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়া দ্বারা—(প্রজ্ঞান দ্বারা বা নামরূপভূত তৎকৃত মিথ্যা অভিমান দ্বারা)—যদিও পারমার্থিকরূপে নয়—বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন। বহুরূপ ধারণ অবিদ্যা-প্রজ্ঞান-জনিত। পরমার্থতঃ তিনি একমাত্র প্রজ্ঞান-ঘনরূপেই আছেন।" *(২)

গৌড়পাদ তাঁহার সাংখ্যকারিকাতে সাংখ্যপ্রধানকে বেদান্তের মায়ার সহিত মিলিত করিয়া শঙ্করের প্রতিপাদ্য উপনিষদ্‌গম্য অদ্বৈত ধর্ম্মেরই পথ পরিষ্কার করিলেন। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদেরও কারিকা রচনা করিয়াছেন। শঙ্কর গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দনাথেরই শিষ্য, এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকারও ভাষ্যকার। গৌরপাদ সাংখ্য এবং বেদান্তের মিলনের বীজ বপন করিয়াছিলেন। শঙ্করের হস্তে সেই বীজ বিকাশ লাভ করিল। তিনি বিবেকচূড়ামণিতে মায়ার এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন,"মায়ার অপর নাম অব্যক্ত (Compare Potentiality) ইহা ত্রিগুণাত্মিকা, অনাদি অবিদ্যা-রূপিণী, (Compare Relativity)। মায়া পরমেশ্বরেরই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি-বিশেষ। মায়া দ্বারাই এই জগতের উৎপত্তি। জ্ঞানী ব্যক্তিকে মায়ার কার্য্য দৃষ্টে মায়ার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। এইরূপে শঙ্কর তাহার অদ্বৈত মতে সেশ্বর সাংখ্য এবং বেদান্ত যেন এক করিয়া ফেলিলেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য প্রকৃতিকে ঈশ্বরের মায়াশক্তির নামান্তর বলিয়াই উল্লেখ করিতেছেন, "অবিদ্যা-কল্পিত নাম-প্রপাত্মক সংসার-প্রপঞ্চের বীজভূত, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তিই প্রকৃতি, ইহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূতের ন্যায়ই, কিন্তু তাহা ঈশ্বরই বলা যায় না, ঈশ্বর হইতে ভিন্নও বলা যায়না।" গীতা ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন: "প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকার কারণং শক্তিঃ গুণাত্মিকা মায়া॥" (১৯-অ-১৩॥) প্রকৃতি ঈশ্বরেরই গুণাত্মিক, মায়া, শক্তি, তাহাই বিকারের কারণ।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

---

* (২) স এবহি পরমেশ্বরো নামরূপে ব্যাকুর্বাণো রূপং রূপং প্রতিরূপোবভুব। কিমর্থং। তদস্যাত্মনো রূপং পরিচক্ষণায় প্রতিখ্যাপনায়। যদি হি নাম নামরূপে স ব্যাক্রিয়তে তদা অস্য আত্মনো নিরুপাধিকং রূপং প্রজ্ঞানঘনাখ্যং ন প্রতিখ্যায়েত। যদা পুনঃ কার্য্যকরণাত্মনা নামরূপে ব্যাকৃতে ভবতঃ তদাস্য রূপং প্রতিখ্যায়েত। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরো মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ নামরূপভূত-তৎকৃত-মিথ্যাভিমানৈঃ বা ন তু পরমার্থতঃ। পুরুরূপো বহুরূপ ঈয়তে গম্যতে একরূপ এবং প্রজ্ঞানঘনঃ সন্নবিদ্যাপ্রজ্ঞাভিঃ॥ ১৯। বৃহদারণ্যক ভাষ্য অ ২। ব্রা-৫।

অর্থশাস্ত্র

(একত্রিংশ অধ্যায়)

হস্ত্যধ্যক্ষ।

হস্ত্যধ্যক্ষ হস্তিবন রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং হস্তী, হস্তিনী ও কলভগণের শিক্ষার পর ক্লান্তি দূরীকরণার্থ হস্তিশালায় তাহাদের দণ্ডায়মান থাকিবার বা শয্যার পরিদর্শন করিবেন। তিনি তাহাদের দৈনিক আহার ও ঘাস, তাহাদের শিক্ষা, অলঙ্কার ও যুদ্ধসজ্জা, এবং হস্তি-চিকিৎসক, শিক্ষক এবং পরিচার্য্যকারকগণের কার্য্য পরিদর্শন করিবেন।

হস্তীর দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ প্রস্থ ও দ্বিগুণ উচ্চতাবিশিষ্ট গৃহে হস্তীশালা নির্ম্মিত হইবে। হস্তিনীগণের জন্য ভিন্ন গৃহ করিতে হইবে; উহার প্রবেশ দ্বার (সপ্রগ্রীবাং) রাখিতে হইবে, অভ্যন্তরে স্তম্ভ (কুমারি) রাখিতে হইবে এবং উত্তর বা পূর্ব্বাভিমুখী দ্বার রাখিতে হইবে।

যে সকল স্তম্ভে হস্তিগণকে বন্ধন করিয়া রাখিতে হইবে, তাহার সম্মুখস্থ চতুষ্কোণ স্থানের এক পার্শ্ব হস্তীর দৈর্ঘ্যের সমান রাখিতে হইবে। এই চতুষ্কোণ স্থান মল-মূত্র অপসৃত হইবার জন্য ছিদ্রবিশিষ্ট মসৃণ তক্তাদ্বারা আবৃত করিতে হইবে।

যে স্থানে হস্তী শয়ন করিবে, সেই স্থানের প্রস্থ হস্তীর দৈর্ঘ্যের সমতুল্য হইবে এবং হস্তীর হেলান দেওয়ার জন্য তাহার উচ্চতার অর্দ্ধাংশ পরিমাণ উচ্চ করিয়া একটী মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

যে সকল হস্তী যুদ্ধোপযোগী বা যাহাদের আরোহণের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহাদিগকে দুর্গ মধ্যে এবং যাহারা শিক্ষা লাভ করিতেছে বা যাহারা ক্রোধী, তাহাদিগকে বহির্দ্দেশে রাখিতে হইবে।

দিনমানের অষ্টমভাগের প্রথম ও সপ্তম ভাগই হস্তীর স্নানের উপযুক্ত সময়; দ্বিতীয় ও অষ্টম আহারের; পূর্ব্বাহ্ন ব্যায়াম; পরাহ্ন পানের; রাত্রির দুইভাগ নিদ্রার এবং রাত্রির এক তৃতীয়াংশ জাগরিত থাকিয়া বিশ্রামের সময়।

গ্রীষ্মকালই হস্তী ধরিবার উপযুক্ত সময়। যে হস্তীর বয়স বিংশতি বৎসর, তাহাকেই ধৃত করিতে হইবে। বিক্ক (অল্পবয়স্ক), মুগ্ধ, দন্তবিহীন, ব্যাধিগ্রস্ত, গর্ভিণী, ধেনুকা (যাহারা শিশু হস্তীকে স্তন্য দিতেছে) এবং হস্তিনীকে ধৃত করিবে না। যে সকল হস্তী ৭ অরত্নি উচ্চ, ৯ অরত্নি দীর্ঘ ও ১০ অরত্নি পরিধি এবং ৪০ বৎসর বয়স্ক, তাহাদিগকেই ধৃত করিতে হইবে। ত্রিশ বৎসর-বয়স্ক হস্তী মধ্যম প্রকারের এবং ২৫ বৎসর বয়স্ক হস্তী নিকৃষ্ট শ্রেণীর। শ্রেণী অনুযায়ী উহাদের আহার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

সাত অরত্নি উচ্চতাবিশিষ্ট হস্তীকে এক দ্রোণ তণ্ডুল, অর্দ্ধ আধক তৈল, ৩ প্রস্থ ঘৃত, ১০ পল লবণ, ৫০ পল মাংস, এক আধক রস, (অথবা দ্বিগুণ পরিমাণ দধি,) দশ পল ক্ষার, ১ আধক মদ্য (অথবা দ্বিগুণ পরিমাণ দুগ্ধ), গাত্রে লেপনের জন্য ১ প্রস্থ তৈল, মস্তকে লেপন ও হস্তী-শালায় প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য

এক প্রস্থের অষ্টমাংশ তৈল, দুই ভার উত্তম ঘাস, ২½ ভার শুষ্ক, শুষ্ক ঘাসের একষষ্ঠাংশ ভার এবং প্রচুর পরিমাণে কতক্কারের বৃন্ত দিতে হইবে।

অষ্ট অরত্নি উচ্চতাবিশিষ্ট হস্তীকে ও সপ্ত অরত্নি উচ্চ হস্তীর ন্যায় আহার প্রদান করিতে হইবে। পাঁচ কি ছয় অরত্নি হস্তীকে তাহাদের আকার অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। ক্রীড়ার্থ ধৃত বিক্ক (অল্পবয়স্ক হস্তীকে); দুগ্ধ ও উত্তম ঘাস প্রদান করিতে হইবে।

যে হস্তী সঞ্জাত লোহিত, যাহার মাংস অধিক, যাহার উভয় পার্শ্ব সমান ভাবে গঠিত, যাহার কটীদেশ সমকক্ষ, যাহার মাংস সমভাবে বিকীর্ণ, যাহার পৃষ্ঠদেশ সমতল এবং যে জাতদ্রোণি—সেই সকল হস্তীকে "শোভা" হস্তী বলে। হস্তিগণের শোভা ও 'ভদ্র' ও মন্দ্রানুযায়ী হস্তিগণকে শিক্ষা দান করিতে হইবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

হস্তীপ্রচার।

হস্তিগণের শিক্ষানুযায়ী তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়, যথা—দম্য, স্যান্নাহ্য, উপবাহ্য, এবং ব্যাল।

'দম্য' হস্তিগণকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যে সকল হস্তী স্কন্ধগত: (অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণ করিতে দেয়), স্তম্ভগত (যাহাদিগকে স্তম্ভে বন্ধন করিয়া রাখা যায়,) বারিগজ, অপপাতগত (যাহারা গর্ত্তে থাকিতে ভালবাসে) এবং যূথরাত (যাহারা যূথভ্রষ্ট হইতে চাহে না।) এই সকল প্রকার হস্তী-কেই বিক্কের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে।

সান্নাহ্য সপ্ত প্রকারের—উপস্থান, সংব-র্ত্তন, সংযান, বধাবধ, হস্তীযুদ্ধ, নাগরায়ণ এবং সাঙ্গ্রামিক। হস্তীকে বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ করা, গলদেশে গ্রীবা বা বন্ধনী প্রদান, এবং অন্যান্য হস্তীর সহিত একত্র কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রথম অঙ্গ।

উপবাহ্য (অর্থাৎ আরোহণের জন্য যে হস্তী ব্যবহার করা হয়) অষ্টম প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা:—যে হস্তী অপর হস্তীর সঙ্গে থাকিয়াও উহার উপর আরোহণ করিতে দেয়, যুদ্ধ হস্তীর সঙ্গে থাকিয়াও যে হস্তী আরোহণ করিতে দেয়, যাহাকে ধোরণ শিক্ষা দেওয়া যায়, যাহাকে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী শিক্ষা দেওয়া যায়, যাহাকে যষ্ঠি প্রহারে চালিত করা যায়, যাহাকে লৌহের অঙ্কুশ দ্বারা চালিত করা যায়, যাহাকে চাবুক ব্যতীত চালিত করা যায় এবং যে হস্তী মৃগয়াকালে সহায়তা করিতে পারে।

দুষ্ট হস্তীকে কেবল মাত্র একপ্রকারে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য একমাত্র উপায় শাস্তি। দুষ্ট হস্তী কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, একগুঁয়ে, বিপথগামী, অস্থির, এবং মদমত্ত হইয়া হতবুদ্ধি হয়।

যে সকল দুষ্ট হস্তীকে শাসনে আনা যায় না, তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য যে সকল শৃঙ্খল আবশ্যক, তাহা হস্তী-বৈদ্যের নিকট হইতে নিরূপণ করিতে হইবে। আলান, গ্রীবার জন্য শৃঙ্খল, বন্ধনী, বলগা, শৃঙ্খল প্রভৃতিই হইতেছে বন্ধনোপযোগী দ্রব্য। অঙ্কুশ, বংশদণ্ড, এবং যন্ত্রও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈজয়ন্তী এবং ক্ষুর প্রমাল প্রভৃতি হস্তীর ভূষণ। বর্ম্ম, তোমর, শরাধার এবং যন্ত্রই হইতেছে হস্তীর যুদ্ধাস্ত্র।

চিকিৎসক, শিক্ষক, যাহারা হস্তীর পরিচর্য্যা করে, যাহারা উহাদের আহার প্রস্তুত করে, যাহারা উহাদের জন্য ঘাস সংগ্রহ করে, যাহারা উহাদের স্তম্ভের সহিত বন্ধন করিয়া রাখে, যাহারা হস্তিশালা সম্মার্জ্জন করে, ও যাহারা রাত্রিকালে হস্তিশালায় প্রহরীর কার্য্য করে, তাহারাই হস্তীর অবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারে।

চিকিৎসক, প্রহরী, সম্মার্জ্জক, পাচক, এবং অন্যান্য সকলে ভাণ্ডার হইতে একপ্রস্থ অন্ন, এক মুষ্টি তৈল এবং ২পল ক্ষার ও লবণ পাইবে। চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্য সকলে ১০ পল মাংস পাইবে।

পথিমধ্যে ব্যাধি বা জরাগ্রস্ত হইলে হস্তি-চিকিৎসক হস্তীকে আবশ্যকীয় ঔষধ প্রদান করিবে। হস্তিশালায় অধিক ধূলি হইলে, উপযুক্ত ঘাস না দিলে, শক্ত ও অনুপযুক্ত স্থানে হস্তীকে শয়ন করিতে দিলে, শরীরের স্থান বিশেষে আঘাত করিলে, অপরিচিত ব্যক্তিকে আরোহণ করিতে দিলে, অসময়ে আরোহণ করিলে, অগম্য স্থান ও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতে দিলে, দণ্ড হইবে। এই সকল দণ্ড অপরাধীর আহার ও বেতন হইতে বাদ দিতে হইবে। "চতুর্ম্মাসে" এবং ঋতুর সন্ধিস্থলে তিনবার আলোক প্রদর্শন করিতে হইবে এবং অমাবস্যায় ও পূর্ণচন্দ্রের দিন হস্তিগণের আপদ শান্তির জন্য সেনাপতিগণ ভূতগণের পূজা করিবেন। নদীজ হস্তীর দন্ত প্রতি ২॥ বৎসরে দন্তের পরিধির দ্বিগুণ অংশ ব্যতীত অন্যাংশ কর্ত্তন করিতে হইবে। পার্ব্বতীয় হস্তীর প্রতি পাঁচবৎসরে ঐরূপ দন্ত ছেদন করিতে হইবে।

---

৩৩ অধ্যায়।

রথাধ্যক্ষ।

রথাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য অশ্বাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য হইতে প্রণিধান করা যাইবে। রথাধ্যক্ষ রথ নির্ম্মাণের কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। উত্তম রথ দশ পুরুষ দীর্ঘ ও দ্বাদশ পুরুষ (এক পুরুষ = দ্বাদশ ইঞ্চি) বিস্তৃতি হইবে। এইরূপ আদর্শানুসারে আরও সাতখানি রথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে; ইহাদের বিস্তৃতি এক এক পুরুষ কম করিয়া শেষের খানি মাত্র ৬ পুরুষ বিস্তৃতি করিতে হইবে। অধ্যক্ষ এতদ্ব্যতীত দেবরথ, পুষ্যরথ, যুদ্ধরথ, ভ্রমণোপযোগী রথ, শত্রুর দুর্গ আক্রমণোপযোগী রথ নির্ম্মাণ করিবেন।

রথাধ্যক্ষ সৈনিকগণের তীর নিক্ষেপণে পারদর্শিতা, গদা ব্যবহার, বর্ম্মপরিধান, সাজসজ্জা, রথচালন, রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধ এবং রথাশ্ব-পরিচালন পরীক্ষা করিবেন। যাহারা স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে রথ ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণে নিযুক্ত, তাহাদের আহার ও বেতনের হিসাব পরীক্ষা করিবেন। তিনি যোগ্যতমকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবেন।

পদাতিকের অধ্যক্ষেরও ঐ নিয়ম বর্ত্তিবে। তিনি মৌল (বংশ পরাক্রমিক যোদ্ধা), ভৃত (বেতনভোগী), শ্রেণী এবং শত্রু, মিত্র ও বন্যজাতির বলাবলের অনুসন্ধান রাখিবেন। তিনি নিম্নভূমিতে যে সকল যুদ্ধ হইবে, বা স্থল, বা নিম্ন বা উচ্চ ভূমিতে থাকিয়া যুদ্ধের, রাত্রি বা দিবা যুদ্ধের সকল বৃত্তান্ত অবগত থাকিবেন এবং এই সকল যুদ্ধোপযোগী ব্যায়ামও অবগত থাকিবেন। আকস্মিক যুদ্ধের জন্য তিনি সৈন্যগণের পারগতা বা অপারগতা অবগত থাকিবেন।

সেনাপতি চতুরঙ্গবলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সৈন্যের অগ্রসর বা পশ্চাদপদ হওয়ার বিষয়ে পারদর্শী থাকিবেন।

নিজ সৈন্যের পক্ষে কোন্ ভূমি, কোন্ সময় প্রশস্ত, শত্রুর বল কিরূপ, শত্রুর মধ্যে কি প্রকারে ভেদ জন্মান যায়, নিজের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্য কি প্রকারে পুনর্ব্বার একত্রিত করা যায়, শ্রেণীবদ্ধ শত্রু কি প্রকারে বিচ্ছিন্ন করা যায়, কি প্রকারে দুর্গ আক্রমণ করা যায় এবং কোন্ সময় যাত্রা করা উচিত, এই সকল বিষয়ও যেন সেনাপতি অবগত থাকেন।

ছাউনিতে থাকাকালীন, যাত্রাকালীন বা যুদ্ধকালীন সৈন্যগণের শাসনের প্রতি মনোযোগী থাকার জন্য, তিনি তূর্য্য, ধ্বজা, পতাকা প্রভৃতি দ্বারা ব্যূহের সংজ্ঞা করিবেন।

---

৩৪ অধ্যায়।

মুদ্রাধ্যক্ষ (Superintendent of Passports.)

মুদ্রাধ্যক্ষ প্রতি মুদ্রায় এক মাষ গ্রহণ করিয়া ছাড়পত্র দিবেন। যিনি ছাড়পত্র পাইবেন, তিনিই কোন দেশে প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। জনপদবাসী ছাড়পত্র ব্যতীত প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণ করিলে দ্বাদশপণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। বৈদেশিক কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। পশুচারণ ভূমির অধ্যক্ষ এই সকল ছাড়পত্র পরীক্ষা করিবেন। উপত্যকা হইতে চোর, হস্তী এবং অন্যান্য পশু দূরীভূত করিতে হইবে। অনুর্ব্বরা ভূমিতে পুষ্করিণী খনন, আশ্রয়ার্থ বাটী ও কূপ এবং পুষ্প ও ফলোদ্যান করিতে হইবে। শিকারীগণ তাহাদের সারমেয় সহ বনভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিবে। চোর বা শত্রুর আগমনে উহারা বৃক্ষ বা পর্ব্বতারোহণ করিয়া চোরের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া শঙ্খ বা দামামা ধ্বনি করিবে। শত্রু বা অসভ্য জাতির গতায়তের সংবাদ তাহারা মুদ্রাবহনকারী রাজকীয় পারাবত দ্বারা বা ক্রমিক ভাবে ধূম ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। বন ও হস্তিবন রক্ষণ, রাজপথ সুসংস্কৃত রক্ষণ, চোর ধৃতকরণ, বণিকগণের রক্ষণাবেক্ষণ, গাভী রক্ষণ এবং অধিবাসিগণের ব্যবহারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

---

৩৫ অধ্যায়।

সমাহর্ত্তৃ প্রচার।

সমাহর্ত্তা জনপদকে ৪ অংশে বিভক্ত করিয়া এবং গ্রাম গুলিকে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনি উহাদিগকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী বিভাগ করিবেন, যথা—পরিহারক (যে সকল গ্রাম রাজকর প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে), আয়ুধীয় (যে সকল গ্রাম হইতে সৈন্য সরবরাহ করা হয়), যে সকল গ্রাম ধান্য, পশু বা হিরণ্য প্রদান করে, যে সকল গ্রাম্য কুপ্য সরবরাহ করে, যে সকল গ্রাম হইতে বিষ্টি সরবরাহ করা হয় এবং যে সকল গ্রাম হইতে করের পরিবর্ত্তে গব্যাগারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়।

সমাহর্ত্তা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গোপ পাঁচটী বা দশটী গ্রামের হিসাব পরিদর্শন করিবেন। গ্রামের সীমা স্থির করিয়া, ভূমি কর্ষিত কি অকর্ষিত, সমভূমি, আর্দ্রভূমি, উদ্যান, শাকসবজীর উদ্যান, বন, বেদী, দেবমন্দির, পয়ঃপ্রণালী, শ্মশান, ছত্র, জলছত্র, পুণ্যস্থান, পশুচারণ ভূমি, রাজপথ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম, ক্ষেত্র, বন, রাজপথের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, তিনি দান, বিক্রয়, এবং যে সকল ক্ষেত্র রাজকর প্রদানে অব্যাহতি পাইবে, তাহা তালিকাভুক্ত করিবেন।

গৃহগুলি কর প্রদান করে কি রাজকর হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তিনি প্রত্যেক গ্রামের চতুর্ব্বণের অধিবাসীর সংখ্যা, প্রত্যেক গ্রামের কর্ষক, গোপালক, বৈদেহক, কারিকর, শ্রামিক, ক্রীতদাস, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যা তালিকাভুক্ত করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গৃহ হইতে কি পরিমাণে স্বর্ণ, বিষ্টি, শুল্ক এবং দণ্ড সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাও নির্দ্ধারণ করিবেন।

এতদ্ব্যতীত, তিনি প্রত্যেক গৃহস্থ যুবা ও বৃদ্ধের সংখ্যা, তাহাদের চরিত্র, জীবিকা, এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। এই প্রকারে স্থানিক (অন্যতম কর্ম্মচারী) জনপদের চতুর্থাংশের বিবরণ তালিকাভুক্ত করিবেন।

সে সকল স্থান গোপ ও স্থানিকের শাসনাধীন, তথায় সমাহর্ত্তৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট প্রদেষ্টার (বিভাগীয় কর্ম্মচারী) ঐ সকল কার্য্য পরিদর্শন ব্যতীত বলি সংগ্রহ করিবেন।

সমাহর্ত্তৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কৃষকের ছদ্মবেশে গুপ্তচরগণ ঐ সকল বিবরণের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবে। তাহারা মনুষ্য ও পশ্বাদির সংখ্যা ও প্রত্যেক পরিবারের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে। তাহারা ভ্রমণশীল ব্যক্তির গমনাগমন, কুচরিত্র স্ত্রীপুরুষের আগমন ও প্রস্থান এবং বৈদেশিক গুপ্তচরগণের গতিবিধির কারণ অনুসন্ধান করিবে। তদ্রূপ গুপ্তচরগণ বণিকের বেশে রাজকীয় পণ্যের (যথা খনিজ দ্রব্য অথবা উদ্যান, বন, ক্ষেত্র-জাত দ্রব্য, পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণ করিবে। বৈদেশিক পণ্য, যাহা স্থলপথে বা জলপথে আসিবে, তাহাদের শুল্ক, বর্ত্তনি, প্রভৃতি নিরূপণ করিবে। এই প্রকারে সন্ন্যাসী বেশী গুপ্তচরগণ সমাহর্ত্তৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সৎ ও অসৎ কৃষক, গোপালক, বণিক এবং অধ্যক্ষগণের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিবে।

যে স্থানে দেবমন্দির আছে, বা যথায় ৪টী রাস্তার মিলন হইয়াছে, যে সকল স্থানে ভগ্নাবশেষ আছে, পুষ্করণী তীরে, স্নানের ঘাটে, পুণ্যস্থানে, মরুভূমিতে, পর্ব্বতে, গভীর বনে, গুপ্তচরগণ নিজ নিজ ছাত্রসহ চোরের বেশ ধারণ করিয়া চোর, শত্রু এবং বীর-পুরুষদিগের আগমন, প্রস্থান এবং স্থিতির কারণ নির্দ্ধারণ করিবে। সমাহর্ত্তৃ এই প্রকারে রাজ্যের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ ও তাহাদের সহযোগী ও ভৃত্যবর্গের সহিত উক্ত প্রকারে নিজ নিজ কার্য্য করিবেন।

---

৩৬ অধ্যায়।

নাগরক প্রণিধি।

সমাহর্ত্তৃর ন্যায় নাগরক নিজ নগরের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিবেন। একজন গোপ দশটী পরিবারের, বিশটী পরিবারের বা চল্লিশটী পরিবারের হিসাব রাখিবেন। ঐ সকল পরিবারের প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের জাতি, গোত্র, নাম এবং ব্যবসায় ব্যতীত তাহাদের আয় ব্যয়ের পরিমাণ অবগত থাকিবেন। স্থানিক রাজধানীর সকল বৃত্তান্তের অনুসন্ধান রাখিবেন।

ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষগণ কোন পাষণ্ড বা ভ্রমণকারী তথায় বাস করিতে আসিলে গোপ বা স্থানিককে সংবাদ প্রেরণ করিবেন। কারিকর এবং অন্যান্য শিল্পিগণ নিজ নিজ দায়িত্বে সমব্যবসায়ীগণকে নিজা-

লয়ে বাশ করিতে দিতে পারিবে। বৈদেহকগণও নিজ নিজ দায়িত্বে অন্য বৈদেহকগণকে নিজালয়ে বাস করিতে দিতে পারিবে। শৌণ্ডিক মাংস এবং অন্নবিক্রেতা ও বেশ্যাগণ যে কোন সুপরিচিত ব্যক্তিকে নিজালয়ে রাখিতে পারিবে। যে সকল ব্যক্তি অপব্যয়ী ও দুঃসাহসিক ব্যক্তি আপদজনক কার্য্যে লিপ্ত হইবে, ইহারা (শৌণ্ডিক প্রভৃতি) তাহাদের সংবাদ গোপ ও স্থানিককে প্রেরণ করিবে। কোন চিকিৎসক যিনি গোপনে ক্ষতাদি রোগের চিকিৎসা করিবেন এবং গৃহস্বামী (যাহার গৃহে এই চিকিৎসা হইবে) কেবল মাত্র যখন স্থানিক বা গোপকে সংবাদ প্রদান করিবেন, তখনই নির্দ্দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। অন্যথা পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় ইহারা উভয়েই দোষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

গৃহস্বামিগণ তাঁহাদের গৃহে আগত বা তাঁহাদের গৃহ পরিত্যাগকারী অপরিচিত ব্যক্তির সংবাদ প্রেরণ করিবেন; অন্যথা রাত্রিতে যে সকল সাধিত হইবে, তজ্জন্য তাঁহারাই দায়ী হইবেন। যে সকল রাত্রিতে এই সকল ঘটিবে না, সে সকল রাত্রিতেও সংবাদ প্রেরণ না করিলে ৩ পণ অর্থ দণ্ড হইবে।

যে সকল ব্যক্তি আঘাত বা ক্ষত রোগগ্রস্ত, যাহাদের সহিত সাংঘাতিক অস্ত্র আছে, যাহারা ভারি বোঝা বহনে ক্লান্ত হইয়াছে, অথবা যাহারা অন্যের সংসর্গ পরিত্যাগে ইচ্ছুক, যাহারা অত্যন্ত নিদ্রাতুর, অথবা পথক্লান্ত, অথবা যাহারা রাজধানী, দেবমন্দির, পুণ্যস্থান বা শ্মশানের অভ্যন্তরে বা বহির্দ্দেশে রহিয়াছে, রাজপথগামী পথিকগণ তাহাদের ধৃত করিবে। গুপ্তচরগণ ও পরিত্যক্ত আবাসের অভ্যন্তরে, কারখানায়, শৌণ্ডিকালয়ে, অন্ন ও মাংস বিক্রেতার গৃহে, দ্যূতক্রীড়ালয়ে এবং অবিশ্বাসীদিগের গৃহে অনুসন্ধান করিবে। গ্রীষ্মকালের দিনমানকে সমান ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্য দুইভাগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা নিষেধ করিতে হইবে। এই সময়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে একপণের অষ্টমাংশ দণ্ড হইবে। গৃহস্বামিগণ গৃহের বহির্ভাগে পাকের কার্য্য করিতে পারিবেন।

যদি কোন গৃহস্বামীর নিকট পাঁচটী জলপাত্র, এক কুম্ভ, এক দ্রোণ, এক অধিরোহিণী, এক পরশু, এক শূর্প, এক অঙ্কুশ, এক সাঁড়াশী এবং একটী চর্ম্মের থলি না থাকে, তবে তাহাকে এক পণের একচতুর্থাংশ দণ্ড স্বরূপ দিতে হইবে। তাহারা তৃণাচ্ছাদিত চাল স্থানান্তরিত করিবে। কর্ম্মকারগণ সকলে একত্রিত হইয়া একই পল্লীতে বাস করিবে। প্রত্যেক গৃহস্বামী রাত্রিতে নিজ গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত থাকিবেন। বৃহৎ রাজপথে, চতুষ্পথদ্বারে (যে স্থানে ৪টী রাজপথ মিলিত হইয়াছে) এবং রাজকীয় গৃহের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র জলপূর্ণ কলসী রক্ষা করিতে হইবে।

যে কোন গৃহস্বামী অপর স্থানে অগ্নিনির্ব্বাণে সহায়তা করিবে না, তাহার দ্বাদশ পণ অর্থ দণ্ড হইবে এবং যে ভাড়াটিয়া অগ্নিনির্ব্বাণে সহায়তা করিবে না, তাহার ৬ পণ অর্থ দণ্ড হইবে। অনবধানতা বশতঃ যে কোন গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে, তাহার ৫৪ দণ্ড হইবে; কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিলে তাহাকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যে রাজপথে পঙ্ক নিক্ষেপ করিবে, তাহার এক পণের একঅষ্টমাংশ

দণ্ড হইবে ; পথে যে কর্দ্দম বা জল একত্রিত করিবে, তাহার একচতুর্থাংশ দণ্ড হইবে ; রাজমার্গে যে উপরোক্ত অপরাধ করিবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যে পুণ্যস্থানে, মন্দিরে, রাজপ্রাসাদে, জলাশয়ে মলমূত্রত্যাগ করিবে, তাহার একপণ অর্থ দণ্ড হইতে অপরাধানুযায়ী গুরুতর অর্থ দণ্ড হইবে। কিন্তু যখন এই সকল মলমূত্রত্যাগ পীড়া বা ঔষধের জন্য হইবে, তখন কোন শাস্তি হইবে না। নগর মধ্যে যে বিড়াল, কুকুর, নকুল অথবা সর্পের মৃত দেহ নিক্ষেপ করিবে, তাহার ৩ পণ, যে গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং পশু নিক্ষেপ করিবে, তাহার ৬ পণ এবং যে মনুষ্যের মৃত দেহ নিক্ষেপ করিবে, তাহার ৫০ পণ অর্থ দণ্ড হইবে।

যখন নির্দ্দিষ্ট দ্বার ব্যতীত অন্যদ্বার দিয়া বা নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত অন্য পথ দিয়া মৃত দেহ নগর বহির্ভাগে আনয়ন করা হইবে, তখন প্রথম প্রকারের অর্থ দণ্ড হইবে এবং ঐ সকল দ্বারের প্রহরিগণের ২০০ পণ অর্থ দণ্ড হইবে। যখন কোন মৃত দেহ শ্মশান ব্যতীত অন্যস্থানে দাহ করা হইবে, তখন দ্বাদশ পণ অর্থ দণ্ড হইবে। সন্ধ্যার পরবর্ত্তী ছয় নালিক ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় নালিকের মধ্যবর্ত্তী কার্য্যে তূর্য্যধ্বনি দ্বারা সকলের যাতায়াত বন্ধ রাখিতে হইবে। তূর্য্যধ্বনি হইলে যে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে ঐ সময়ের প্রথম বা শেষ যামে ভ্রমণ করিবেন, তাহাকে ১¼ পণ অর্থ দণ্ড করিতে হইবে ; মধ্যবর্ত্তী যামে হইলে উহার দ্বিগুণ দণ্ড এবং যে রাজকীয় প্রাসাদ বা দুর্গে ভ্রমণ করিবে, তাহার চতুর্গুণ অর্থ দণ্ড হইবে।

যে সন্দিগ্ধ স্থানে অথবা কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া ধৃত হইবে, তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। যে রাজকীয় প্রাসাদের নিকটে ভ্রমণ করিবে, বা যে রাজধানীর দুর্গে আরোহণ করিবে, তাহার মধ্যম প্রকারের অর্থ দণ্ড হইবে। যাহারা রাত্রিতে চিকিৎসালয় বা সূতিকাগারে গমন করে, যাহারা মৃত দেহ বহন করিয়া লয়, অথবা যাহারা প্রদীপ হস্তে গমনাগমন করে, বা যাহারা নাগরকের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে গমন করে, অথবা যাহারা তূর্য্যধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিতে যায়, অথবা যাহারা অগ্নি নির্ব্বাণ বা ছাড়পত্র সহকারে গমন করে, তাহারা ধৃত হইবে না।

চার রাত্রিতে (আমোদ প্রমোদের রাত্রিতে) যাহারা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করে, যাহারা নিষিদ্ধ হইয়াও বহির্গমন করে এবং যাহারা গদা বা অস্ত্রসহ ভ্রমণ করে, তাহাদের অপরাধানুযায়ী শাস্তি হইবে। যে সকল রক্ষি রাজপথে, যাহাদের বারণ করা উচিত নহে, তাহাদের বারণ করে, অথচ যাহাদের বারণ করা কর্ত্তব্য, তাহা করে না, তাহাদের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। * * * নাগরক প্রত্যহ জলাশয়, রাজপথ, নগর হইতে বহির্গত হইবার গুপ্তপথ, দুর্গ, দুর্গপ্রাচীর ও অন্যান্য রক্ষণোপযোগী স্থান প্রত্যহ পরীক্ষা করিবেন। অপরের পরিত্যক্ত সকল দ্রব্যই তিনি রক্ষা করিবেন। রাজার জন্মতিথিতে, পূর্ণিমায় বালক, বৃদ্ধ, ব্যাধিত, অনাথ বন্দিদিগকে বন্ধনাগার হইতে মুক্তি দিতে হইবে। অথবা যাহারা দয়ালু বা যাহারা বন্দিদিগের সহিত গর্ত্ত কাটিয়াছে, তাহারা উপযুক্ত উদ্ধারের মূল্য দিয়া মুক্ত করিবে।

দৈনিক একবার অথবা পাঁচ রাত্রির মধ্যে একবার অপরাধীদিগের কর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে, অথবা বেত্রাঘাত করা যাইতে পারে বা উপযুক্ত পরিমাণ সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

যখন কোন নূতন দেশ জয় করা হয়, যখন যুবরাজের রাজ্যাভিষেক হয়, অথবা যখন রাজপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তখনই বন্দিদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার।

বঙ্কিমচন্দ্র। * (২)

এই নবজীবনের ক্ষেত্রে—ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য কি, সেই কার্য্যের বিশিষ্টতা কি, ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বাপর আদর্শের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি না অসঙ্গতি কোথায়, সম্যক চিন্তা করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গের একাধিক প্রসঙ্গের আবশ্যক। এই প্রবন্ধ-সূত্রে তদ্বিষয়ে বাহুল্যযোগ্যতা নাই। সুতরাং আমরা অবস্থানুরূপ সঙ্কেত মাত্র করিয়া নিবৃত্ত হইব, সৌভাগ্য ও সুবিধা ঘটিলে তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে সচেষ্ট হওয়া যাইবে।

উপক্রম স্বরূপ এই বলিব যে, যাঁহারা নিবিষ্ট মনে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শনগুলি অধ্যয়ন বা অনুচিন্তন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মধ্যে ধর্ম্মের বা ধর্ম্মসাধন-প্রণালীর দুইটা বিশিষ্ট লক্ষণ, দুইটা বিশিষ্ট পন্থা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এক সেশ্বর; অপর নিরীশ্বর। নিরীশ্বর ধর্ম্ম বলিয়া একটা পদার্থ ভারতীয় ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়াছিল। উহার আলোচনা পরম কুতুকাবহ, সন্দেহ নাই; তদ্বিষয়ে প্রসঙ্গ-সূত্র-সঙ্গতে এই মাত্র নির্দ্দেশ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মধ্যে চিরকাল ধর্ম্ম বিষয়ে এই দুই-দুইটা দল ছিল। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যেমন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ছিল; জ্ঞানকাণ্ডে বা ব্রহ্মবাদেও তেমন একদিকে ভক্ত অন্যদিকে নাস্তিক ছিল। একদিকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বা ঐশীশক্তি উপাসকগণ, অন্যদিকে অবিশ্বাসী, আত্মবুদ্ধিবাদী, যুক্তিবাদী বা সংশয়িগণ! এই অবিশ্বাসীগণকেই প্রাচীন কাল হইতে—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-পূর্ব্ব হইতেই 'বৌদ্ধ' বলিয়া নিন্দা করা হইত। প্রাচীন প্রাকৃতিক শাক্তধর্ম্ম, কি ব্রহ্মবাদ, কি পূজা পৌরোহিত্য, কোনটাই সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার নিদর্শন প্রাচীনতম ঋক্‌বেদ-সংহিতাতেই মিলিতেছে। কর্ম্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞাদি, জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মবাদ বা ব্রাহ্মণ ও পৌরাণিক যুগের শক্তি বৈষ্ণব প্রভৃতি উপাসনা পদ্ধতি এই সমস্তই প্রকারান্তরে জগদীশ্বরে বিশ্বাস, অনুরাগ ও আস্তিক্য বুদ্ধি-প্রণোদিত, এই সমস্তই সেশ্বর উপাসনা। অন্যদিকে কর্ম্মকাণ্ডের অযাজ্ঞিকগণ, উপনিষদের সংশয়ী বা অজিজ্ঞাসাবাদীগণ, উপসাংখ্যের নির্গুণ পুরুষবাদীগণ, পাতঞ্জলের নিরোধবাদীগণ, শাক্যসিংহের পন্থানুসারী বৌদ্ধগণ, নির্ব্বাণবাদী, মায়াবাদী, শূন্যবাদীগণ, ইঁহারা নিরীশ্বর। স্থূলতঃ বলিতে গেলে

* এই প্রবন্ধ চট্টগ্রাম ছাত্র-সমাজে পঠিত।

ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণের উপাস্য ব্রহ্ম বা বিশ্বসবিতা বা সর্ব্বশক্তিমান্ কল্যাণনিলয় ব্রহ্মে বিশ্বাস করেন নাই, অথবা ঈশ্বরে বিশ্বাস মনুষ্যত্বের বা ধর্ম্মের অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই। ইঁহারা আত্মবুদ্ধির একান্ত নির্ভরে জগতের আদিকারণের সন্ধান করিতে, পরিচয় নির্ণয় করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি অনন্তে প্রতিহত হইয়া অতর্কিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাঁহাদের কেহ বা নিজেকেই ঈশ্বর বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন, কেহ বা এই জগৎটাকেই একটা 'ভ্রান্তি' বলিয়া মনে করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কেহবা মনে করিয়াছেন, অনাদি 'বাসনা' বা কর্ম্মনামক পদার্থ হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—অতএব এই বাসনা বা কর্ম্মকে নাশ করিতে পারিলেই কালে কালে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছান যাইবে, যাহার নাম নির্ব্বাণ বা মুক্তি। এখন যেমন force নামক একটা কথাকেই সৃষ্টির আদিকারণ স্থির করিয়া পাশ্চাত্য জগতের একদল লোক বহ্বাড়ম্বরী হইয়া লাফালাফি করিতেছে, ভারতবর্ষও স্মরণাতীত কালে একদা 'অনাদি বাসনা'কেই জগতের আদি কারণ ঠাওরাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; এবং এই সমাজের অধিকাংশ লোক নানা কারণে, বিনা বিচারে, বিপুল অহঙ্কারে তাহাই পরম আবিষ্কার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। উভয়ই প্রচ্ছন্ন জড়বাদ বা নিরীশ্বরবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্তনিরোধকারী যোগিগণ, সৎকর্ম্মকারী বৌদ্ধগণ বা 'অহংবাদী' 'নেতিনেতিবাদী' জ্ঞানীগণ, ইঁহারা কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক বা ঈশ্বরবিশ্বাসী নহেন—ব্রহ্মবাদী নহেন। অনেকে এই জগৎটাকেই অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রকেই প্রপঞ্চ বঞ্চনা বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের এই দুই পন্থা। প্রাচীনকাল হইতে অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকট আবির্ভাবের কাল হইতেই এই দুই পন্থার নামকরণ হইয়াছে—একটা ব্রহ্মে বিশ্বাস বা ভক্তির পন্থা; অন্যটীকে একরূপ রফা মীমাংসার ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে—উহা 'জ্ঞান' পন্থা। ভারতবর্ষের এই জ্ঞানভক্তির বিরোধ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে কোন মতে একটা মধ্যবর্ত্তী রফারফি করার প্রবল ইচ্ছা সমাজহিতাকাঙ্ক্ষীগণের মধ্যে উদ্রিক্ত হওয়া বুদ্ধপরবর্ত্তী শাস্ত্রাদির মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই জ্ঞানমার্গকেও একটা ধর্ম্মপথ বলিয়া ভক্তদার্শনিকগণ স্বীকার করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলই উত্তর কালে ভারতবর্ষের পক্ষে বিষময় হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মমত ও তাঁহার কার্য্যের সম্যক্ বোধসৌকর্য্যার্থে আমরা এই স্থলে ক্ষণকালের জন্য আনিয়া বিষয়টীকে আর একটু বিশদ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বৈদিক অত্যন্ত প্রবল যাগযজ্ঞ কাণ্ডকে নিন্দা করিয়া গৌতম বুদ্ধ অহিংসা ও সৎকর্ম্ম স্থাপন করেন; কর্ম্মকেই জগতের মূল শক্তি জানিয়া ব্রহ্মের 'অজিজ্ঞাসা'বাদ প্রচার করেন; বৈদিক আশ্রম ধর্ম্মের ক্রমাভিব্যক্ত সন্ন্যাসকে পরিহার পূর্ব্বক একান্ত সন্ন্যাসের বা শ্রামণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমণগণ সন্ন্যাসী হইয়াও সৎকর্ম্মবাদী, এই কারণ বৌদ্ধ সন্ন্যাস নিরীশ্বর হইয়াও বিশ্বনীতির অদ্রোহী অনেক পরিমাণে practical ও ফলে লোকস্থিতির পরিপোষক ছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করেন নাই; বা ধর্ম্মজীবনের পক্ষে ঈশ্বর নির্ভর আবশ্যক

মনে করেন নাই। ইহারই ফল পরে পরে ওই ধর্ম্মের পক্ষে মারাত্মক হইয়াছিল—নানা অভাবনীয় অনিষ্ট সংযোগের সুবিধা হইয়াছিল। দলে দলে সর্ব্বপ্রকার নিরীশ্বরবাদীগণ বৌদ্ধপতাকার আশ্রয় লইয়া উহার শুচিতা খর্ব্ব করিয়া দিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বরকে দার্শনিকভাবে উড়াইয়া দিলেও উপাসনার হাত এড়াইতে পারে নাই। 'মুক্ত' পুরুষ, বীতরাগী পুরুষ বুদ্ধকেই আদর্শ ধরিয়া—উপাস্য ধরিয়া মনুষ্যোপাসনার—গুরূপাসনার আশ্রয় লইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে সাংখ্যপাতঞ্জল মতাবলম্বী দার্শনিকগণও প্রকট মূর্ত্তি পূজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—আমরা বুঝিতেছি। এইরূপে ভারতের আপামরসাধারণ এককালে দলে দলে বৈদিক যাগযজ্ঞ তন্ত্র পরিহার বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে পারিয়াছিল।

মানুষের মন একটা কিছু আশ্রয় করিতে—উপাসনা করিতে চায়; মনুষ্য মনের একটা প্রধান ধর্ম্ম এই উপাসনা, ভক্তগণ বলিবেন। ইহা অনন্তের, অব্যক্তের, করুণাময়ের 'টান' ভিন্ন আর কিছুই নহে; মানুষ স্বপ্রকৃতি বলেই উপাসক। অন্যদিকে মানুষের মনে নাস্তিক্য বুদ্ধির প্রভুত্বও বড় কম নহে। ঈশ্বর নাই, জগৎ নাই, আমিই আছি বা আমিই ঈশ্বর, কর্ম্মবাসনাই জগৎ 'সৃষ্টির' বা জগৎ 'ভ্রান্তির' নিদান; এই জগৎ দুঃখময়, সুতরাং দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবার উদ্দেশে নৈষ্কর্ম্ম বা নির্ব্বাসন বৈরাগ্যের আশ্রয় করাই শ্রেয়, এইরূপ একটা মতের সমর্থন ধর্ম্মশাস্ত্রের মোহরাঙ্কিত ভাবে পাইতে পারিলে মানুষ যেন, তাহার অহঙ্কার যেন ভিতরে ভিতরে তৃপ্ত হয়; সে ভিতরে ভিতরে মনুষ্য-সমাজের যাবতীয় জ্ঞান ধর্ম্ম কর্ম্ম নীতি অসার মনে করিয়া সুখী হয়; তাহার আলস্য বুদ্ধিও প্রবল প্ররোচনা প্রাপ্ত হয়। যত বড় সাধু জনই হউন না কেন, কেহই এই নাস্তিক্য বুদ্ধির আক্রমণের দূরে, বা সর্ব্বক্ষণ স্থিরপ্রত্যয়ের পুরে বসবাস করিতে পারেন না; মনুষ্য-জীবনের দ্বৈতভিত্তি চিরকাল তাহাকে এই নাস্তিক্যের সমক্ষে অতর্কিতে উপস্থিত করিতে থাকে। এই যুদ্ধ মনুষ্য জীবনের প্রকৃতিসিদ্ধ, এই কারণ ভক্তগণ চিরকাল ভক্ত-সংসর্গই পরম পুণ্যাবহ মনে করিয়া আসিতেছেন, সেশ্বর ও নিরীশ্বরবাদের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান; উভয় মতাবলম্বীর মধ্যে পরস্পর মারাত্মক বিরোধ। উভয়ের মধ্যে রফারফি করিতে গেলেই চিরকাল অধ্যাত্মক্ষেত্রে হলাহল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাগুক্ত পরিণতি দর্শনে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ বা ব্রহ্মবাদীগণ নিশ্চিন্ত হইলেন না। বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াও বুদ্ধোপাসনা গ্রহণ করিল, মূর্ত্তি পূজা অবলম্বন করিল, ইহা তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন। অতঃপর এই পদ্ধতিকে আত্মস্থ করিতে আর বেগ পাইতে হইল না। বৈদিক ব্রহ্ম শক্তির উপাসনাকে বা শক্তি উপাসনাকে—দেব দেবীগণকে তাঁহারা মহামহিমান্বিত মূর্ত্তিতে, অনেক সময় লোকায়ত মূর্ত্তিতে লোক-লোচনের সমক্ষে স্থাপন করিলেন, বৈরাগ্য-গুরু বুদ্ধ মূর্ত্তির স্থলে তাঁহারা শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, বুদ্ধোপাসনার স্থলে গুরূপাসনা বা অবতারবাদ স্থাপন করিলেন, এইরূপে বুদ্ধ পূজা নিরস্ত, নিষ্প্রভ হইয়া হিন্দুধর্ম্মে মিলাইয়া মিশাইয়া গেল।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ঋষি জাগ্রতভাবে

অথচ ঋষিযোগ্য সরলভাবে ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বর-ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন; কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা সিদ্ধ করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম বা ভগবদুপদিষ্ট কর্ম্মযোগ সাধনার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া সংসার ও সন্যাসের পরম সমন্বয় বিধান করেন। এইরূপে গীতাকার একদিকে পূর্ব্ব-মীমাংসা-মত, অন্যদিকে নিরীশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল মতকে যুগপৎ খণ্ডিত ও সমন্বিত করিয়া বেদোপনিষদুক্ত প্রাচীন ব্রহ্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। * গীতা ভারতীয় ব্রহ্মবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ, জগতের সমস্ত জাতিধর্ম্মের বা ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত উহার সুসঙ্গতি আছে। কিন্তু গীতা পূর্ব্বোক্ত নিরীশ্বর মার্গকে একেবারে পরিহার করেন নাই—নিন্দা করিয়া থাকিলেও একেবারে নিরস্ত করেন নাই। নিরীশ্বর জ্ঞানমার্গও একটা ধর্ম্ম পন্থা, প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন; অন্ততঃ নিরীশ্বরবাদীগণ এইরূপ অর্থ করিতে পারে।

হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ-পূজা-পদ্ধতি অনায়াসে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের নানা পন্থী, নিরীশ্বরবাদ, মায়াবাদ, দুঃখবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি বাকী ছিল। বৌদ্ধ মঠ, বৌদ্ধ শ্রমণ সন্ন্যাসীগণ তখনও অপ্রতিহত প্রভুতায় সমাজশীর্ষে বিরাজ করিতেছিলেন। যে রূপেই হউক, সংসার ভোগত্যাগের প্রতি সাংসারিক লোকের একটা সম্মানের ভাব না হইয়া যায় না। জগতে একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা বা ত্যাগ মাত্রই রহস্যময়। রহস্যের প্রতি—অগম্য আচার ব্যবহারের প্রতি প্রাকৃতান্ধ মনুষ্যের একটা ভয়মিশ্রিত ভক্তিভাবে না হইয়া পারে না। উহাকে কথার দ্বারা নিরস্ত করা মানুষের সাধ্য নাই। নিরীশ্বর বৌদ্ধ সন্ন্যাসকে হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে নিরস্ত করিয়াছে? উত্তর—নিরস্ত করে নাই—করিতে পারে নাই; আয়ত্ত করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে—গ্রাস করিয়াছে ও নানা দিকে নিজেই গ্রস্ত হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন, খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে শ্রীমৎ কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। কতকগুলি সন্ন্যাসী কেবল তর্কযুক্তির দণ্ডবলে একটা প্রবল বিস্তৃত লোকায়ত সম্প্রদায়কে ভারতবর্ষের বাহিরে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন! এখন পর্য্যন্ত, নূন্যাধিক সাড়ে চারিশত উপাসক সম্প্রদায় ত ভারতবর্ষে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছে! আর্য্য বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইয়া কোথায় গেলেন? ভারতবর্ষের বাহিরে এসিয়া ভূখণ্ডে আর্য্য বৌদ্ধগণের উপনিবেশ কেহ দেখিয়াছেন কি? ফল কথা, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয় নাই—এখনও ভারতবর্ষে অক্ষুন্নই রহিয়াছে; আমাদের পরিস্ফুট নেত্র সমক্ষে সামান্য মাত্র ভিন্ন পরিচ্ছদে এখন যাবৎ বিহার করিতেছে। বৌদ্ধ বৈরাগীগণের—ভিক্ষুগণের হরিদ্রা-বসন, গৈরিক বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মস্তক স্থল বিশেষে জটাজালে আবৃত করা হইয়াছে মাত্র। বৌদ্ধ-মঠ এখন পর্য্যন্ত 'মঠ'ই রহিয়াছে; বুদ্ধ মূর্ত্তির স্থলে লিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যতাবৎ বিষয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাস ধর্ম্ম এখনও ভারতবর্ষে অক্ষুন্ন রাজত্ব করিতেছে।

বৌদ্ধ মায়াবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি অষ্টম

* বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের রামানুজ ভাষ্যোদ্দিষ্ট "বিশিষ্টাদ্বৈত"-বাদই প্রাচীন ব্রহ্মবাদীসম্মত।

শতাব্দীর বেদান্তসূত্র ভাষ্যে 'অধ্যাস'বাদে, 'ভ্রান্তি'বাদে বা 'জগৎ-মিথ্যা'বাদে পরিণত হইয়াছে—রূপান্তরিত হইয়াছে। নিরীশ্বর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ অধ্যাত্মতঃ সর্ব্ব প্রকারে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সন্ন্যাসীদলে পরিচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। কেবল একটী লক্ষণ নাই—বৌদ্ধ সন্ন্যাসের নিঃস্বার্থভাবের পরম লোকপাবন মহার্ঘ লক্ষণ নাই; শ্রমণগণের সৎকর্ম্মবাদ, ভূত-দয়া, লোকহিত-ব্রত বর্ত্তমান নাই; পরম প্রীতি-কারুণ্যপূর্ণ জীবন নাই। আমাদের দশনামী সন্ন্যাসী-গণ সকলেই অসঙ্গ, বৈরাগ্যব্রত আত্মরত, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মহিত-রত। কর্ম্ম বা বাসনা হইতে মুক্তি লাভ করাই নাকি আত্মহিত; সুতরাং দ্বিতীয় ব্যক্তির—মধ্যমাধম পুরুষে—জগতের ভাবনা আর কে করিবে?—প্রকৃত প্রস্তাবে অন্ধ বা 'বেকুব' ভিন্ন আর কেহ করিতে পারে না। জগৎ যখন মিথ্যা এবং লোক-ব্যব-হার যখন আদর্শের হিসাবে ঘৃণ্য এবং পরিত্যজ্য সাব্যস্ত হইল, তখন লোক-সমাগমের প্রতি—জগতের প্রতি বিদ্বেষ ঘৃণা (মুখে চক্ষু লজ্জায় প্রকাশ না করিলেও) কার্য্যে, চরিত্রে, চলনে অপরিহার্য্য। তবে লোক-সম্পর্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিহার করিতে পারেন না; কারণ মূঢ় ভ্রান্ত সাং-সারিকগণের গৃহেই অন্নভাণ্ডার রহিয়াছে, জগৎ মিথ্যা হইলেও অন্নটাকে 'মিথ্যা' বলিয়া ব্যবহার করা সমীচীন বিবেচিত হয় নাই; এবং গৃহস্থাশ্রমই অন্যাশ্রমের প্রতিপালক ও শ্রেষ্ঠ (?) বলিয়া প্রচার করা আবশ্যক হইয়াছে।

এইরূপ বৌদ্ধ-সন্ন্যাস বর্ত্তমানে কেবল আত্মস্বার্থরত ও ভিক্ষোপজীবী মাত্র হইয়া, লোক-ঘৃণাপরায়ণ হইয়া, সর্ব্বত্র সমাজের মধ্যে নিরীশ্বর বৈরাগ্য আদর্শের বিষবৃষ্টি করিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীর নামরূপ গ্রহণে ভারত-বর্ষের হৃদয়-রক্ত পানে জীবন ধারণ করি-তেছে; লক্ষ লক্ষ লোক অলসভাবে নির্ব্বিঘ্নে সগৌরবে দিন যাপন করিতেছে। সকল ধর্ম্মকেই ধর্ম্মযাজক ধর্ম্মোপদেশক সদাত্ম ব্যক্তির অন্ন যোগাইতে হয়, সমাজ ও ধর্ম্ম স্থিতির উদ্দেশ্যেই এই ভার বহন করিতে হয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজ এইরূপে ঋষিকর্ম্মকে—বর্ত্তমানের পৌরোহিত্য বা ব্রাহ্মণ্যকে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। অধুনা হিন্দু সমাজকে আপনস্থিতি নীতির প্রচ্ছন্নবিদ্বেষী এই সন্ন্যাসীদলকেও পোষণ করিতে হইতেছে। ইহার ফল জীবিকা-নীতির হিসাবে, অর্থনীতির হিসাবেই যে বিষময়, এমন নহে; ইহার সংসর্গ-ফল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নিদারুণ ভয়াবহ। সমস্ত ভারতবর্ষ, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু উপাসনা, হিন্দুসমাজ নিরীশ্বর কর্ম্ম বৈরাগ্যের ও আলস্যবিলাসের বিষসংক্রমণে আজ নির্জ্জীব মৃতপ্রায়, ইহা জ্ঞানবৃক্ষের বিষফল; ভক্তিহীন, নিরীশ্বর অন্ধবুদ্ধি-যুক্তি-নির্ভর অহঙ্কার বৃক্ষের গুপ্ত ফল। ইহার ঘনফলেই আমরা অষ্টম শতাব্দী হইতে ক্রমাগত, জগতের অন্যজাতি সমক্ষে জীবন-যুদ্ধে হটিয়া যাইতেছি! নিরীশ্বর বৈরাগ্যবাদকে আত্মস্থ করার দরুণ, তাহার সহিত রফা করার দরুণ, অতর্কিতে নাস্তিক-তাকে মস্তকে স্থাপন করার দরুণ আমাদের এই শাস্তি! সংসারে যেমন আমাদের পরা-জয়—অধ্যাত্ম জীবনেও তাহাপেক্ষা অধিক। আমরা অনেকেই প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। আমা-দের ধর্ম্মবিশ্বাসে ও কর্ম্মে কত দূর ব্যবধান! আমরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা কর্ম্ম করিতেছি,

জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ প্রকৃতির প্রেরণায় যাহা করিতেছি—তৎসমস্তের জন্য 'জগৎ মিথ্যা' বাদের অধীন হইয়া প্রত্যহ অনুতপ্ত হইতেছি, কর্ম্মে ও বিশ্বাসে, জীবনে ও আদর্শে এত বিভিন্নতাকে নরক ভিন্ন আর কি নাম দিব? ফলেও তাহাই হইয়াছে, সন্ন্যাসীগণ নিঃশঙ্ক ভাবে বলেন, এই সংসারে নরক। মানুষ যাহা করিতেছে, তৎসমস্ত মিথ্যা ব্যবসায় বলিয়া পরিতাপোক্তি এই দেশে যত্র তত্র 'জ্ঞানী' 'অজ্ঞানীর' মধ্যে শুনা যাইবে। যাহার একটু শিক্ষা লাভ হইয়াছে, একটু 'জ্ঞান' লাভ হইয়াছে, এই দেশে এই 'বুলি' তাহার মুখে লাগিয়া আছে। এই বুলি কে শিখাইল? ইহাত বৈদিক ধর্ম্মের বা ব্রাহ্মণ শাক্ত বৈষ্ণব কাহারও প্রকৃতি অনুগত বুলি নহে! 'জগৎ মিথ্যা' এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, ব্রহ্মবাদ কেন, জ্ঞান মাত্রই, ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনা কিছুই স্থির থাকিতে পারে না: কেবল এই 'মিথ্যা' জ্ঞানটী বাকী থাকে! সমস্তই যে অকার্য্য ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া যায়! এই সহজ কথায় আমাদের দৃষ্টি যাইতেছে না কেন?

কেন যাইতেছে না, কে বলিবে? হয়ত এই জাতির ধ্বংস নিশ্চিত বলিয়াই যাইতেছে না। জাতির হৃদয়ের মধ্যে সহজ বুদ্ধির বিলোপ কখন ঘটে? সেশ্বর বা নিরীশ্বরবাদের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ বা আশ্রয়নীয়, তাহা প্রদর্শন করা এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। আমি ব্রহ্মবাদী বা বিশ্বাস ভক্তিবাদী সেশ্বরগণের উদ্দেশ্যেই প্রসঙ্গ করিতেছি—বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য পর্য্যালোচনা স্থলে আমরা অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয় করিব না। প্রসঙ্গের অবকাশের হিসাবে এই যৎকিঞ্চিৎ মাত্রও বাহুল্য বিবেচিত হইবে। ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং পরস্পরের একাকার সংসর্গ সমাজে কিরূপ ফল প্রসব করিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য কার্য্যের স্থান বা সঙ্গতি-সূত্র কোথায়, তাহার পরিচিন্তন কল্পেই আমরা এই টুকু বাহুল্যের আশ্রয় করিয়া আসিলাম।

নিরীশ্বরবাদের সহিত বা বাসনা মুক্তির কৌশলবাদের সহিত ঈশ্বরবাদের পার্থক্য আমরা দেখিতেছি—যতই চিন্তা করিব, ততই নানা দিক হইতে এই বিজাতীয় পার্থক্য সুস্পষ্ট হইতে থাকিবে। আরও দেখিতেছি যে, বৈদিক শাক্ত ধর্ম্ম উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বা পৌরাণিক পন্থা মূলতঃ এক ও অভিন্ন, ইহারা ঈশ্বরোপাসনার নামান্তর। ঋষিগণ বা পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ফলতঃ এই উপাসনা ভারতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এখন হিন্দু ধর্ম্মে—অনেকের মধ্যেই এই উপাসনা ফলে নাম মাত্রে দাঁড়াইতেছে। সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা কল্পে যুগে যুগে মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক এই দেশে নানা চেষ্টা হইয়াছে। তাহার অনেকটা কালোপযোগী ফল প্রসব করিয়াছে, অনেকটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফলোন্নয়নে দেশে ঈশ্বর ভক্তি বিশ্বাসের মূল শিথিল করিয়া দিয়াছে। এখন ধার্ম্মিকের আদর্শ কেবল জন্মান্তর বন্ধন হইতে মুক্তি বা বাসনা মুক্তিতেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তিবিশ্বাসহীন বৈরাগ্যে বা প্রীতিপবিত্রতাহীন দার্ঢ্যে ও শুষ্কতায় আমাদের অধ্যাত্ম জীবনকে অসার ও প্রচ্ছন্ন নরক করিয়া তুলিয়াছে; আমাদিগকে কর্ম্মের ক্ষেত্রে অলস ও শিথিলমতি, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা-রতিহীন ও কেবল

মুক্তিকৌশলপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে; অন্তরঙ্গের ব্রহ্মযোগ্যতা সাধন বা চরিত্রের পুণ্য পবিত্রতা নিষ্ঠতা বা অমৃত সাধনার দিকে আমাদের দৃষ্টি ঘোলা করিয়া দিয়াছে, উহা একটা কার্য্য বলিয়াও কেহ মনে করিতে চায় না। যদি কোন কৌশলে মুক্তি লাভ হয়, এই দেশে এখন কেবল গুরুগম্য মন্ত্রকৌশল লাভার্থই মানুষকে লালায়িত দেখা যায়। সহজ দৃষ্টি ঘোলা হইয়া না গেলে এইরূপ ঘটিতে পারে না। আমাদের জাতির হৃদয় হইতে এখন প্রকৃত আস্তিক্যের প্রাণ বহুধা অন্তর্হিত হইয়াছে।

অষ্টম শতাব্দীর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতাগণের উদ্দেশ্য সম্যক সফল হয় নাই, আমরা দেখিতেছি। বৈরাগ্যদর্শনের বা সন্ন্যাসীদলের 'আনন্দ' নাম সার্থক হয় নাই, সর্ব্বদা বিপরীত ভাবে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। আমরা জানি, ব্রহ্মবাদের সহচর এই 'আনন্দ' বাদ. ভক্ত ঋষিগণই কহিতেন, আনন্দ হইতে এই জগৎসংসারের সৃষ্টি, আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই বিলয়; ভগবান সচ্চিদানন্দ; তাহারই হেতু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", এই আনন্দের সাধনোপায় অনুরাগ,প্রেম বা ভক্তি। বিশ্বজগতের সেই সর্ব্বভূত,সর্ব্বত্রগত অচল ও ধ্রুব আনন্দকে সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া, প্রত্যক্ষ করিয়া,তাঁহার সহিত যুক্তাত্মা হওয়া. তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই ভারতীয় ব্রহ্মবাদ—বা অদ্বৈতবাদ—য়ুরোপীয়গণ যাহাকে Pantheism বলিতেছেন। এই অদ্বৈতবাদ, জীবন হইতে, জীবনের কর্ম্মাদর্শ হইতে, সংসার হইতে, ভগবানকে পৃথক করিয়া দেখে না। জীবনের সর্ব্ব অবস্থায়, কর্ম্মে ও ধ্যানযোগে, তাঁহাকেই লক্ষ্য রাখিয়া সমস্তের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব তাঁহাতেই যুক্ত করিয়া—সর্ব্বকর্ম্মসূত্র তাঁহাতেই নিবদ্ধ করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মে তন্ময় হওয়ার নামই—'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা' হওয়ার নামই ভারতীয় অদ্বৈত ব্রহ্মসাধনা। এই স্থলেই দ্বৈতবাদ ও আস্তিক অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য। সর্ব্বোপনিষৎসার-ভূত গীতা সেই সামঞ্জস্যই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রাচীনতম কাল হইতে সর্ব্ববিধ উপাসনা পদ্ধতির মধ্য দিয়া ভারতীয় ব্রহ্মবাদীগণ কেবল এই এক তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন। দুঃখবাদ—বাসনা মুক্তিবাদ, জগৎ মিথ্যাবাদ—ভ্রান্তিবাদ, এই সমস্তই ফলতঃ নিরীশ্বর; ভারতীয় নির্ম্মল ব্রহ্মবাদের সহিত অপরিহার্য্য দুর্ঘটনায় উহা মিশ্রিত হইয়া বিপরীত খিচড়ী জাঁকিয়া গিয়াছে।

যে ক্ষেত্রে 'আনন্দ' জ্ঞান, সেই ক্ষেত্রেই অনুরাগ; আবার যে ক্ষেত্রে অনুরাগ, সেই ক্ষেত্রেই আনন্দ। সুতরাং জীবনের সর্ব্ব অবস্থায়, কর্ম্মে ও ধ্যান-পথে ঈশ্বরে প্রেমানুরাগ বা পরানুরক্তিই ব্রহ্মবাদীগণের সাধন প্রণালী। নিরীশ্বরগণ বলেন, কর্ম্ম বা বাসনাই জগতের মূল শক্তি, জন্মমৃত্যু-সূত্রিত সংসারবন্ধনের কারণ—দুঃখই উহার ফল; সুতরাং জগৎ দুঃখময়। সুতরাং এই দুঃখসন্ততি হইতে 'মুক্তি' লাভের জন্য বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্যই তাঁহাদের সাধন প্রণালী। এই স্থান হইতেই সেশ্বর ও নিরীশ্বরগণের যাবতীয় ভেদ উদ্ভূত। এই 'আনন্দ'বাদ ও দুঃখবাদ, এই অনুরাগবাদ ও বৈরাগ্যবাদ, এই নশ্বর ও নিরীশ্বরবাদ ও উভয়ের তাবৎ ভালমন্দ ফল দেশে এখন বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে ব্রহ্মবাদীগণেরই অতিরিক্ত সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যাঁহারা আস্তিক, যাঁহারা জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং ঈশ্বরকে 'সচ্চিদানন্দ' বা প্রেমপুণ্য কল্যাণময় বলিয়া

বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে অনুরাগই একমাত্র সাধন পন্থা—ইহা আমরা দেখিতেছি। একনিষ্ঠ অনুরাগ যে স্থলে প্রবলতম হইয়া জগতের অন্য (?) পদার্থের প্রতিবিরাগ (?) জন্মাইতেছে, তাঁহারা সেই স্থলেই কেবল বৈরাগ্যকে চরম ফল স্বরূপে মানিয়া লইতে পারেন—সাধন প্রণালী স্বরূপে নহে। বৈরাগ্য একটা সাধন প্রণালী হইতে পারে না; উহা বিপরীত বিরুদ্ধভাবী। জগতের দুঃখদৈন্য জরা মরণাদি চিন্তা করিয়া বা শোক-ভয়গ্রস্ত হইয়া যে একটা বিরাগ বিতৃষ্ণার আবির্ভাব সাধন করা হয়, তাহার ফল কদাপি সাধু হইতে পারে না, ভক্তের চক্ষে তাহা বিপরীত কৃপণতা, শুষ্কতা, রুক্ষতা, ভীরুতা, কপটতা ও নাস্তিক্য ভাবক বলিয়া প্রতিভাত। ব্রহ্মবাদী যে স্থলে বৈরাগ্যের নাম করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত একনিষ্ঠ অনুকরণের ফলিতার্থই ব্যবহার করিয়াছেন। দুঃখবাদ—বা বৈরাগ্য-পন্থা নিরীশ্বরপন্থা।

ভক্তগণ বা সেশ্বর অদ্বৈতবাদীগণ এই জগৎকে মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন দেহধারীই পারেন না। এইরূপ নিষ্পত্তি আমাদের জ্ঞানভিত্তিরই বিরোধী। 'ভ্রান্তিবাদী' দার্শনিকের সাহঙ্কার তর্কযুক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে আপনা হইতেই খণ্ডিত হয়—ব্যবহারে প্রতিপদে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া যায়। 'ভ্রান্তি' 'অধ্যাস' 'মায়া' প্রভৃতি শব্দকেও বিশুদ্ধ দার্শনিকের ভাবে কোটির মধ্যে গুটিকেও গ্রহণ করিতে পারে না। অথচ সকলেই এই সমস্ত বুলি মুখস্থ করিয়া ও সুবিধামতে, নিষ্কর্ম্মতার অকাট্য যুক্তি স্বরূপ যত্রতত্র আওড়াইয়া আত্ম-বঞ্চনায় রত রহিয়াছে। সর্ব্বনিষ্ফলতার ও অধঃপাতের সান্ত্বনা সমর্থনে জগৎটাকেই মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিতেছে! জীবনে সর্ব্বত্র এইরূপ বিরুদ্ধ সেবন ও বিরুদ্ধ ভাষণের চরম ঔদ্ধত্য ফল স্বরূপে, বর্ত্তমানে ভারতীয় সমাজের যে হৃদরোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার গতিকেই সে জ্ঞান কর্ম্মে সর্ব্বত্র, জগতের অন্যজাতি সমক্ষে, বর্ব্বরতর জাতি সমক্ষেও হটিয়া যাইতেছে। সে যাহা মুখে কহিতেছে, তাহা করিতেছে না, যাহা করিতেছে, তাহাতেও বিশ্বাস করিতেছে না। চিরকাল অনুতপ্ত হইয়া চলিয়াছে। এই সঙ্কট, জীবনে ও জীবনাদর্শে এই বিরোধ, এই ব্যভিচার, এই প্রচ্ছন্ন ও অতর্কিত নাস্তিক্য, এই ভীরুতা, এই নিষ্কর্ম্মতা, এই কপটতা, এই নরক! ইহাই বর্ত্তমান ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ—সর্ব্বক্ষয়কারী আধ্যাত্মিক কারণ! এই দেশের মনুষ্যত্ব জীর্ণ, বৃদ্ধ, বাতুল হইয়া পিতৃদ্রোহী, আত্মদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী হইয়া গিয়াছে—বিশ্ববিধাতা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে। ভক্তগণ বলিবেন, ভারতবর্ষের এই হৃদ্‌রোগের, এই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের ফল স্বরূপেই তাহার সাংসারিক অধঃপতন। বীরধর্ম্মী ঈশ্বর ভক্তি বলে বলীয়ান স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের সমক্ষে ভারতবর্ষের বিশকোটী দার্শনিক পণ্ডিত সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেও পারে নাই! ইহার প্রধান কারণ চরিত্রের মধ্যে হৃদ্‌রোগ! তৎপরে মুসলমানের অধঃপতনে, বীরব্রতী, ভক্তিমার্গী পাশ্চত্যজাতি এই দেশে প্রবেশ করিয়াছেন। মুসলমানের সংসর্গে নানক, কবির, রামদাস, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির উত্থান হইয়াছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে এই নাস্তিক্যের বিরুদ্ধেই হইয়াছিল; তাহার ফল সম্পূর্ণ ফলে নাই। কিম্বা এখনও ফলিয়া আসে নাই। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংশ্রবে

আসিয়া ভারতে সম্প্রতি দুই প্রবল ভক্তিশক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে ; পঞ্জাবে দয়ানন্দ সম্প্রদায় ও বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়। খ্রীষ্ট ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরাক্রমণশীল militant, তাহার দৃষ্টান্তে এই সম্প্রদায়দ্বয়ও ভারতীয় উপাসনা প্রণালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিতেছে—অর্থাৎ একেশ্বরবাদ প্রকাশ করিতেছে, এখন, একেশ্বরবাদ ভারতবর্ষে অজ্ঞাত পদার্থ নহে। অতি সাধারণ হিন্দুও মনে মনে অনুভব করে যে, সে বহুবাদী নহে, বা মৃৎমূর্ত্তি-পূজক নহে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাহার সমক্ষে কেহ আত্মহত্যা করিয়াও বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না যে, সে উপাসনা প্রণালীতে নিতান্ত ভ্রান্ত, তাই এই ক্ষেত্রে যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের, যেমন মহম্মদীয় ধর্ম্মের, তেমন এই দুই সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন চেষ্টাও হিন্দুর মনোদ্বারে বিফল হইয়া পড়িতেছে। তবে সর্ব্বসাধারণের উপাসনা প্রণালীতে সমুন্নত ভাব-ভক্তিযোগ, সামাজিক ও পারিবারিক অনীতি দুর্নীতি বিষয়ে নানারূপ যুগোপযোগী সংস্কার চেষ্টায় বিশিষ্টতা লাভ করিয়া, এই সম্প্রদায়দ্বয় বলশালী হইয়া অগ্রসর হইতেছে, যাহা প্রকৃত আস্তিক্যপ্রণালী, তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া অন্য ধর্ম্ম বিশেষ ফল দেখাইতে পারে না। প্রত্যুত এই দুই সম্প্রদায়ই অতর্কিতে ভক্তির আদর্শ সাহায্যে এই দেশের বহু বিস্তৃত নিরীশ্বর-বৈরাগ্য, বাসনা-মুক্তিবাদ বা ভ্রান্তিবাদের সঙ্গেই সংগ্রাম করিতেছে মাত্র; এবং এই সমাজের অন্তর্জগতে শক্তিতেজ বিস্তার করিতেছে। অধ্যাত্ম জগতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে কিছুমাত্র বিরোধ নাই; যত বিরোধ নাস্তিকের সঙ্গে। নাস্তিক্য, প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য ধর্ম্মনামের সনন্দপ্রাপ্ত নাস্তিক্য ভয়াবহ—উহার সংসর্গফলই ভারতীয় সমাজ ভোগ করিতেছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন ভক্তিধর্ম্ম ও উপাসনার আদর্শ-সংঘর্ষে প্রপীড়িত হইয়া ভারতীয় হিন্দুসমাজ জাগিতেছে, অন্ততঃ, চিন্তাশীলগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ কি? আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায়? আমরা সর্ব্বত্র হটিয়া যাইতেছি কেন? ইহার একমাত্র উত্তর প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদীর নাস্তিক্য নহে; অত্যন্ত সাংসারিকতা-জনিত অন্ধনাস্তিক্যও নহে, তাহা হইলে অন্ততঃ সাংসারিক ভাবেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতাম। নিরীশ্বর বৈরাগ্য-নাস্তিক্য, নিরীশ্বর ভ্রান্তিবাদ, নিরীশ্বর মায়াবাদ—অহঙ্কারান্ধ জ্ঞানবৃক্ষের নরক ফল!

কেবল ধর্ম্মের জগতে নহে, আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে—কর্ম্মজগতেও নবজীবনে জাগিতেছি। আমাদের সাহিত্যেও এই জাগরণের রশ্মিপাত হইয়াছে। তাহার ফল, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র সমধিক জাগ্রত—প্রকৃত দার্শনিকের ভাবেই জাগ্রত। আমরা প্রাচীন ঋষিদের দিকে—প্রাচীন গ্রন্থাদির দিকে দৃষ্টি করিতেছি—আশ্বাস পাইয়াছি, এই নিরীশ্বর আদর্শও আমাদের ছিল না! ইহা আগন্তুক ও সংসর্গজনিত—আমাদের দুর্ভাগ্য-জনিত। বৌদ্ধবিরোধ যুগে শাস্ত্রগুলি, প্রাচীনতর শাস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত এমন নিশ্চিন্ত নির্ভীকভাবে বিবর্ণিত, বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—নিরীশ্বরতার সহিত এমন ব্যাকুলভাবে, রফা করার চেষ্টা হইয়াছে যে, ভাবিলে দুঃখ হয়; আস্তিক্য ও নাস্তিক্য-

ধারার মধ্যস্থ সরস্বতী রেখা স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। এই সমাজের হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তি এখন এই প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যকে নির্দ্দয় নির্ম্মমভাবে দূরে নিক্ষেপ করায়, উহার কপালে এখন সর্ব্বদৃশ্য মুদ্রা-পরিচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিবার সময় আসিয়াছে। যদি বলিতে হয়, আস্তিক্য ও নাস্তিক্যকে পরস্পরের সাবধান পরিজ্ঞাত ভাবে, নিঃসম্পর্কভাবে বলাই ভাল। এই ক্ষেত্রে রফা-রফিয়ত করিতে গেলেই ধ্বংস! প্রথমটীর ধ্বংস—সমস্ত সমাজের অপরিহার্য্য রাজযক্ষ্মা ও মৃত্যু!

এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কি করিয়াছেন? এই সমাজহিতৈষী নবজীবনপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-তনয়ের কার্য্য কি? ভারতীয় প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যার পৌরাণিক আধার গীতাগ্রন্থের ব্যাখ্যা! এই ব্যাখ্যা করিয়া তিনি কোন ধর্ম্ম উপস্থিত করিয়াছেন—মানব ধর্ম্ম—বিশ্ব মানবের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম—অনুশীলন ধর্ম্ম! এই শেষোক্ত বাক্যটীর অর্থচিন্তা করিবেন—অনুশীলন ধর্ম্ম! চিত্তবৃত্তির অনুশীলন—সামঞ্জস্য সম্পূর্ণতা বিধানই ধর্ম্ম! চিত্তবৃত্তির একান্ত নিরোধ না করিয়া—শূন্যতা বিধান না করিয়া, নির্বীজ সমাধি না করিয়া—কর্ম্ম বাসনার একান্ত ধ্বংস না করিয়া, তাহার অনুশীলনই ধর্ম্ম! এই সম্পূর্ণতা বিধানদ্বারেই আত্মসিদ্ধ হইতে হইবে। সেই অনন্ত পূর্ণ পদার্থের অভিমুখে, সংসার পথে ও অধ্যাত্মপথে ভক্তি-কর্ম্মযোগ সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে! চিন্তা করুন—বিষয়টী কতদূর পৃথক হইয়া গেল—বৈরাগ্য-বাদ হইতে বাসনা মুক্তিবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থিত হইয়া গেল কি না? ইহাই গীতার আদর্শ—প্রকৃত আস্তিক ব্রহ্মবাদীর আদর্শ।

এইরূপে গীতায় সংসার হইতে বৈরাগ্য পলায়ন বা ভীরুতা বৈরাগ্য নিরাকৃত, নিন্দিত হইয়াছে। কর্ম্ম সন্ন্যাসের পন্থাও নিন্দিত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদীর সন্ন্যাসের অর্থ গীতা করিয়াছেন—ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ম্ম-ফলন্যাস; সংসার হইতে কর্ত্তব্য হইতে পলায়ন সন্ন্যাস নহে; ঈশ্বরের আনন্দস্বরূপের সহিত জীবনের সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্বকর্ম্মে ভক্তির দ্বারে যুক্ত থাকাই যোগ। এইরূপে জগতের সর্ব্বত্র স্বসিদ্ধ ঈশ্বরানুভূতিই ব্রহ্মজ্ঞান—পরমার্থ—ইহাই প্রাচীন ঋষির অদ্বৈতবাদ। বেদোপনিষদের ব্রহ্মবাদী ঋষি হইতে বাদরায়ণ প্রভৃতি দার্শনিকগণ, রামানুজ প্রভৃতি সাধকগণ, জগতের সমস্ত আস্তিক্যবাদী সাধু সজ্জনগণ সজ্ঞানে বা অতর্কিতে এই ধর্ম্ম শাস্ত্রই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। ইহার একমাত্র পন্থা—ধর্ম্মসাধনের অন্য পন্থা নাই। কোন Negative process or 'নেতি নেতি' প্রণালী বা বৈরাগ্য প্রণালীর দ্বারা বা দুঃখবাদের দ্বারা এই পন্থায় যাওয়া যায় না। পরমার্থ পথে সর্ব্বপ্রথম আনন্দ সিদ্ধ হওয়া চাই। ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে এই আনন্দ-সিদ্ধি ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। জীবনের সর্ব্ববিধ অবস্থায়, সর্ব্বসুখদুঃখে নিষ্ঠা নির্ভর আনন্দযুক্ত হইবার, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সঙ্গম-মিষ্টতা বোধ করিবার শক্তি সাধনা—বিভু-কৃপা সাধনা চাই—পরম ভক্তি-তন্ময়তায় সিদ্ধি হওয়া চাই। মিষ্টতা বোধ না ঘটিলে যুক্ত হইবে কেমন করিয়া? কেবল কুতূহল বা curiosityর দ্বারা তাহা ঘটে না—ভয় ভীতির বিয়াগের ফলেও ঘটে না। যাহার মিষ্টতা বোধ জন্মে নাই, ব্রহ্মপ্রয়াণ পথে তাহার কিছুমাত্র যোগ্যতা জন্মে নাই—অধিকার জন্মে নাই; আত্ম বঞ্চনা না

করিয়া তাহার এই সত্য বুঝিয়া লওয়াই বরং শ্রেয়। যে জগৎকে বিষাদ জ্ঞানে ত্যাগ করিতেছে—যে পরমার্থের একমাত্র পন্থা হইতেই পলায়ন করিয়া অহঙ্কার পাপ-নিরয়-অন্ধকারেই ডুবিতেছে। বিশ ত্রিশ বৎসর পরিভ্রান্ত হইয়া, ভিক্ষালস্য-ব্রতী হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়াও কেহ মাত্র চিত্ত-স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে নাই, প্রীতি, পবিত্রতা, মধুরতা বা ঔদার্য্য লাভ করিতে পারে নাই—গহন কর্ম্মবিপাকে ঘুরিতেছে, এই দেশের সন্ন্যাসীর দলে এইরূপ ব্যক্তির অভাব নাই। উহা নিরীশ্বরবাদের ফল। আমাদের সন্ন্যাসীগণ অনেকেই নিরীশ্বর। তাঁহাদের আদর্শ-সংসর্গেই আমাদের অধঃ-পতন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন আস্তিক্য পন্থা, ব্রহ্ম-বাদের প্রকৃত হিন্দুপন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতা দেশে প্রচলিত ছিল বটে, শাস্ত্র নির্দ্দেশে অপরিহার্য্য রূপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ কেহ বুঝিত না—বুঝিতে চাহিত না। সমাজ-পরিচালকগণ গীতার মহান্ কর্ম্মভক্তিযোগ প্রচলিত করিতে চাহিলেও তাঁহাদের চেষ্টা বহুধা নিষ্ফল হইয়াছিল, দেশের লোক জটাকোপীনধারী দুর্গম্য অবধূত মূর্ত্তির ও তাহাদের চালচলনের সমক্ষে ভয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গীতার ধর্ম্মা-দর্শকে নিতান্ত "সোজা কথা" মনে করিতে-ছিল—তাহারা একটা জবরদস্ত Mystery খুজিতেছিল। এই দেশের হৃদয় নিরীশ্বর আদর্শে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীর ভেক না হইলে এই দুর্ভাগা দেশে মানুষ কোন কথা শুনিতেও চাহে না। চৈতন্যদেবকে এই কারণে একরূপ বাধ্য হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কোনরূপ বৈঠক পুরক বা কর্ণমন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইতে না পারিলে এই দেশে ভক্তি উচ্চারণ হইত না। এখনও এই আদর্শ সম্যক বাধা পায় নাই। যে পর্য্যন্ত আমাদের দুর্ভাগ্য আছে, সেই পর্য্যন্ত ইহা সম্যক নিরাকৃত হইবে, মনে হয় না। গীতার চরিত্র সাধনা—অধ্যাত্ম যোগ সাধনা এই দেশের মনুষ্যের নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কোন একটা কৌশলে যদি ঈশ্বর লাভ হয়,—শ্রীবিষ্ণু!—মুক্তি হয়! এই 'মুক্তি' 'নির্ব্বাণ' 'বাসনা' বৈরাগ্য 'মায়া' 'ভ্রম' প্রভৃতি শব্দ ইদানীং বিপরীত নিরীশ্বরতার দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া হিন্দুর অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে!

তথাপি সুবাতাস বহিতেছে। বঙ্গদেশে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কার্য্য তাহার প্রমাণ। একান্ত আস্তিক্য-ভক্তি-নিষ্ঠ লোকহিত-পরায়ণ কর্ম্ম-যোগীর আবির্ভাবও দেশে হইতেছে। এইরূপ মহাত্মাগণই চিরকাল আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড; বঙ্কিমবাবুর কার্য্য এই ক্ষেত্রে প্রভূত গৌরবাবহ—সমা-জের মঙ্গলাবহ। এই ব্রাহ্মণ-সন্তান যথার্থই প্রবীণ ঋষিপদ-বাচ্য হইবার উপ-যুক্ত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি—ঋজু দৃষ্টি—সত্যে দৃষ্টি—অকুটিল বাক্য বিন্যাস—এই ব্যক্তির সং-সর্গ সর্ব্বথা বাঙ্গালীর পাঠকের শুভদায়ক হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ঐ চরিত্রকে সর্ব্বথা মনুষ্য জীবনের আদর্শরূপে স্থাপন করিয়াছেন। চিন্তা করুন, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা প্রকারান্তরে ক্ষত্রিয়বিদ্যা—উহা রাজবিদ্যা। যাঁহারা সংসার-রাজত্ব বর্জ্জন করিয়াছিলেন, লোক-গরিষ্ঠ মহোন্নতি শীর্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন,

অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে আত্ম শক্তিরূপে অধিকার করিয়াছিলেন—বিশ্বামিত্র, জনক, দাশরথি রাম ও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি, তাঁহারাই ভারতবর্ষে এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠাপক। সরল ব্রাহ্মণগণ এক বাক্যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বলোক-দৃশ্য আদর্শ ভূমিতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা ঈশ্বরের পার্থিব অবতার বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী এক্ষণ যাবৎ হিন্দু ব্রহ্মবাদী মাত্রেরই আশ্রয়ভূত ও সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষকে সনাতন ব্রহ্মপ্রয়াণ-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও সারস্বত-ক্ষেত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের পন্থানুবর্ত্তী হইয়াছেন মাত্র।

৩

এখন চিন্তা করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঋষি-কার্য্য, এই অধ্যাত্ম কর্ম্মযোগতত্ত্ব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকার্য্যের সহিত সূত্র-সমন্বয়ে চিন্তা করুন। সীতারাম আমাদিগকে বিষম সংশয়ের মধ্যে ফেলিয়া গিয়াছিল। শ্রীর জীবন, সীতারামের প্রতি তাহার ব্যবহার, সীতারামের জীবন ও তাহার শেষ ফল, সর্ব্বোপরি গ্রন্থের ফলশ্রুতি আমাদিগকে বিষম দ্বৈধসমস্যায় রাখিয়া গিয়াছিল। বঙ্কিম চন্দ্র কি বলিতে চাহেন? তিনি নিজেই তখন ঠিক পান নাই, কি বলিবেন? ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের আস্তিক্য ও নাস্তিক্য আদর্শে যে খিচড়ী পাকিয়া গিয়াছিল, তিনি প্রথম প্রথম তাহার প্রভেদ পরিজ্ঞানে নিজেও সমর্থ হন নাই। স্বীয় অধ্যাত্ম জীবনে এই সংশয়-তাড়িত হইয়াই বঙ্কিম প্রাচীন ভারতের ঋষিপদে প্রবেশ করেন; শ্রীমদ্ভগবৎগীতার ও তাহার অর্থের ও প্রতিপাদ্যের সন্ধান করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই অর্থ পরম মহার্ঘ বোধে বাঙ্গালীকে বুঝাইতে গিয়াছিলেন। বঙ্কিম আর সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ঋষিকৃত্যও পরম মহিমাময়, লোকশ্রেয়োনিষ্ঠ ও সার্থক হইয়াছে।

এই বঙ্কিমচন্দ্র কবি; গদ্যের ক্ষেত্রে লেখনী চালনা করিয়া থাকিলেও, তাঁহার রচনায় কবিত্ব শক্তি—কল্পনী, দীপনী ও রসনী শক্তি অসাধারণ। তাঁহার ভাষা ও রচনানীতি সর্ব্বত্র ঋজু, সংযত, সংহত ও ভাবার্থ প্রকাশে ত্বরিতশক্তিমতী। তাঁহার গদ্যপ্রবাহে সময় সময় ভাবোচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের সুর পাওয়া যায়; অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা, এই গদ্য। বৃহৎবিস্তারিত, ভাবার্থ-দীপ্ত ঘটনা ও অবস্থা পরিকল্পনায়, সরল সরলতায় ও সরসতায় এবং সমুজ্জ্বল ব্যঞ্জনা-সঙ্কেতে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় গদ্যক্ষেত্রে অতুলনীয়।

উপন্যাস একটা কপোল-কল্পিত গল্প বা গদ্য জল্পনা মাত্র—অনেকে এইরূপ মনে করেন। য়ুরোপে এখন এই আদর্শ বহুরূপে অনুসৃত হইতেছে। বাক্যজাল বিস্তারে, বা বিস্তারিত বিবরণ প্রকারে কাল হরণ করিতে পারিলেই উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল। অনেকে মনে করেন,সাহিত্য এখন লৌকিক ও নিতান্ত লোকায়তিক হইয়া পড়িয়াছে; তাই সাধারণের বোধগম্য করিয়া বা মনোরম্য করিয়া যাহা-তাহা লিখিলেই চলিয়া যায়। ইংরাজীতে তথা য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই সুযোগে অনেক মসীজীবী ব্যক্তি উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসিয়া আসর জমাইয়াছে। এখন ঐ সাহিত্যে "একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি" বলিলেই লোকে-বুঝে "উপন্যাস লিখিয়াছে"। হাল কোদাল হাতুড়ি কিম্বা বাটখাড়ার ন্যায় সরস্বতীর খাশ লেখনীটীও একটা ব্যবসায় যন্ত্রে পরিণত

হইয়াছে। যাহারা সরস্বতীর অন্তঃপুরে 'উকি দিয়া' দেখিবার সৌভাগ্যও পায় নাই, তাহারাও বিশত্রিশখানি তিন বলুমযুক্ত নবেল লিখিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থ অর্জ্জন করিয়া যাইতেছে—অবশ্য সারস্বতী খ্যাতি বা শিল্প-পরমার্থ নহে। এইরূপ এক একটা নবেল পাঠ শেষ করিয়া চিন্তা করিলেই দেখিবেন—হয়ত ক্ষুধাতৃষ্ণা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া পরম নিবিষ্ট ভাবেই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে হইয়াছিল, উহা যেন আপনাকে কয়েক ঘণ্টাকাল মন্ত্রৌষধিবদ্ধবৎ আবিষ্ট রাখিয়াছিল, কিন্তু উহাতে, এমন একটা শব্দ, একটা পংক্তি, একটা দৃশ্য নাই, যাহা মনে মুদ্রিত হইতে পারিয়াছে! সমস্ত গ্রন্থ একটা ক্ষণদীপ্ত উল্কাশিখার ন্যায় ইন্দ্রিয়-পথে বিস্ফুরিত হইয়া নিবিয়া গিয়াছে! ইহা কোন্ জাতীয় সাহিত্যশিল্প! কারণ চিন্তা করুন—ঐ গ্রন্থের কিছুমাত্র সারস্বত আকর্ষণ নাই, অথচ উহা ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ করিতে পারিয়াছে—উহা মস্তিষ্কের অহিফেন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই জাতীয় অহিফেন-সেবীর নিকট, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমস্ত উপন্যাস কিছুমাত্র মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারিবে না। ত্বরিত পাঠকের বা আমোদেচ্ছুর পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে এক ঘণ্টার অধিক লাগিবে না। উহারা গল্প কথাচ্ছলে কাব্য; কাব্যের রসনিষ্পত্তি সূক্ষ্মদৃষ্টি ভিন্ন উহাদের অন্য মাহাত্ম্য-লক্ষণ নাই। যাঁহারা উপন্যাসকেও একটা সাহিত্যশিল্প বলিয়া মনে করেন, অর্থের গভীরতা, আদর্শের নৈতিক অভ্যুন্নতি, শিল্পের সৌষ্ঠব সামঞ্জস্য, রসের ঘনতা ও আন্তরিকতা, চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা-সংস্থানের নৈপুণ্য হিসাব করিয়া যাঁহারা উপন্যাসের বিচার করেন, তাঁহাদের চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলিয়া পরিদৃষ্ট হইতে বিলম্ব হইবে না। ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও প্রকৃত কবিত্ব শক্তি লইয়া উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণ গল্পকথকের ন্যায় কেবল ভূয়োদর্শন পুঞ্জীকরণ বা আমোদন প্রণালীই তাঁহার শরণ্য ছিল না, অসামান্য কল্পনা শক্তি বলে বহির্জগৎকে হৃদয়ে আনিয়া, জারিত করিয়া, তিনি পুনরায় শিল্প-স্রৈকার্য্য-সঙ্গতে তাহাকে আদর্শাকারে জীবিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রাকৃতের অনুকরণ মাত্র নহে—তদপেক্ষা অনেক বড়—উহারা শিল্পীর উদ্দেশ্যযুক্ত সংস্করণ। রিয়ালিষ্টিক বা প্রাকৃত নবেল লিখিতে প্রধান উপকরণ observation বা সূক্ষ্ম প্রাকৃত দর্শন, সন্দেহ নাই। সেক্ষপীয়র বা স্কট, কেহই ওই প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপে আপন হৃদয় মধ্য হইতেই মানব প্রকৃতির চিরন্তন সত্য লক্ষণযুক্ত মৌলিক সংস্করণই প্রকাশ করিয়াছেন—সৃজন করিয়াছেন। অথচ তদপেক্ষা রিয়ালিষ্টিক স্থল বিশেষে নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতবাদীগণও হইতে পারেন নাই; বিবরণ-বাহুল্য দেখাইতে পারেন, স্বীকার করিব।

চরিত্র সৃষ্টি, শিল্পসাহিত্যের একটা প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। চরিত্র শব্দের মৌলিকার্থ আবরণ। আমরা এই সংজ্ঞাশব্দটীকে সকল দিক হইতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, স্বীকার করিয়া লইব। কাব্যস্থ প্রত্যেক বাক্যের যেমন একটা স্ফুট পরিমাপক আবরণ বা অর্থ থাকা আবশ্যক;

গ্রন্থের প্রত্যেক ঘটনার বা দৃশ্যেরও সেই-রূপ একটা বিশিষ্ট ভাবার্থ যুক্ত আবরণ থাকা আবশ্যক; অধিকন্তু গ্রন্থ সংযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরও সেইরূপ একটা স্থির-পরিচিহ্নিত ও সত্যানুভাবক আবরণ থাকা আবশ্যক; সর্ব্বোপরি সমগ্র গ্রন্থেরই—পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিষয়ের সমঞ্জসিত একটা বিশিষ্ট চরিত্র বা আবরণ থাকা আবশ্যক। শেষোক্ত লক্ষণকে লক্ষ্য করিবেন—সমগ্র গ্রন্থের একটা চরিত্র! গ্রন্থ প্রতিপদে ঘটনার, নায়ক নায়িকার শতভাব যুক্ত চরিত্র প্রকট করিতে পারে—কিন্তু তাহার ঘনফল বা ঐক্যফল এই গ্রন্থ চরিত্র—উহারই অন্য নাম ফল-শ্রুতি। এই চতুরঙ্গ সিদ্ধির নামই গ্রন্থের শিল্পত্ব। উহা শিল্পীজীবনের পরাপ্রাপ্তি—জগদ্দুর্লভ কবিজন্মের পরমা সিদ্ধি। এই বিষয়টী প্রণিধান করা আবশ্যক। বাক্যার্থ, চরিত্র,ঘটনা বা ফলশ্রুতি, এই চতুর্ব্বিধ গুণেই একৈকতঃ বা সামঞ্জস্য বিধানে শিল্পবিশিষ্টতা লাভ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই বিশিষ্টতার মধ্যেই পুনশ্চ সাধারণ ও অসা-ধারণ আছে। প্রকৃত কবির পক্ষে একৈক-গুণে গরিষ্ঠ হওয়া সাধারণ—সামঞ্জস্য সিদ্ধি করাই অসাধারণ। সেই অসাধারণ ব্যক্তি চিরকাল "কোটীকে গুটিক মিলে"।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য গুলির অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রকৃত মাহাত্ম্য কি, তাহা বুঝিতে পারিব। অনেক স্থলে আপাতিক অবিচার, অন্যায় বিচার ও পক্ষপাতিতার হস্ত হইতেও রক্ষা পাইতে পারিব। বিচারের ক্ষেত্রে পাঠক নিজের রুচিবশে নিয়ত আপাতঃভ্রান্ত হইতে পারেন। প্রত্যেক প্রকৃত কবির প্রধান গুণ অপরিহার্য্যতা—তাঁহারা পাঠ মাত্রে তৎকালের জন্য পাঠকের হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্ববিস্মৃত করিয়া তুলিতে পারেন। এই অপরিহার্য্যতা গুণ লাভ না করিতে পারিলে কেহই কবি-সমাজ-ভুক্ত হইতে পারেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রও কবিগুণধর-শিল্পী। কবি-প্রতিভার একটী বিশেষ শক্তি এই যে, উহা মানসিক ভাবের ছন্দকে বাক্যের ছন্দে আয়ত্ত করে—উহা নানামতে অনির্ব্বচনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই গুণ পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলেও, এই ক্ষেত্রে সাহিত্য-জগতের অন্য ঔপন্যাসিক হইতে তাঁহার স্বতন্ত্র—সিদ্ধ লক্ষণ প্রতীয়মান। বঙ্কিমের গদ্য কথায় কাব্যের ছন্দের আভাস পাই। তাঁহার রচনার সর্ব্বত্র কাব্যের বিষয়াভ্যুন্নতি ও গৌরব না থাকিলেও, এই ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য অনন্য-সাধারণ, তদ্ভিন্ন শিল্পীমাত্রেরই প্রধান শক্তি—সৃজন ও দর্শন শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। বঙ্কিম কাব্য লিখিতে যান নাই—গল্প লিখিতে গিয়াছেন এবং এই গল্পেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি আভাসিত হইয়াছে। সমুচিত ছন্দ ও বিষয় সন্নিবেশে রচিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পের এই ভাব, এই সৌন্দর্য্য, এই সত্য ঘটনা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কাব্য পদবী লাভ করিতে পারিত; মনের মৃত্তিকায়, স্মরণ পটে, চিরতরে প্রতিপদে মুদ্রিত হইবার সামর্থ্য লাভ করিত। বলা বাহুল্য, কবিতা বা ছন্দঃ ভিন্ন এই যোগ্যতা গদ্য বাক্যের হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব সামর্থ্য অসাধারণ, ছন্দের সামর্থ্য সর্ব্বরূপে অনুগত ছিল না বলিয়াই এই সমস্ত গল্প কাব্য নাটকা-কারে পরিণত হইয়া যায় নাই।

যাহা পাই নাই, তজ্জন্য আলোচনা

বৃথা। বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তি আমাদের সাহিত্যে অনন্যসাধারণ। সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, সত্যের দর্শন, ও অনুরূপ চরিত্র ঘটনাঙ্ক, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে একক। বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা সূক্ষ্ম বা প্রবল ভাবুক বা সূক্ষ্ম দর্শনশীল কবি আমাদের সাহিত্যে জন্মিয়াছেন, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক ত্বরিতগতি, শাণিত শক্তি এবং শিল্পের স্ফোট বা নিরূপণ গুণে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে, কি গদ্যে কি পদ্যে, এখন যাবৎ অপরাজিত রহিয়াছেন। এই সকল গুণের একত্র সমাবেশ সাহিত্যে মহার্ঘ, এবং পরম সৌভাগ্য কীর্ত্তির আস্পদ; বঙ্কিমচন্দ্র সেই সৌভাগ্যবান্। আত্মার গুণেই সাহিত্যশিল্প গরিষ্ঠতা ও এককতা লাভ করে; বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আত্মা ছিল। উহা বিশ্বসৃষ্টিকারিণী পরমাত্ম শক্তির অংশভূত ও ছায়াবহ। এই আত্মা কেবল পুষ্কল বাক্য শক্তি বা সূক্ষ্ম দর্শন শক্তি, স্মৃতিধৃতি বা বিন্যাসামর্থ্যও নহে; উহাতে সর্ব্বসামঞ্জস্যে একরূপ অতার্কিতভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম আর একটী পদার্থ আছে—; মানবের দর্শন বিজ্ঞান এখনো তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে নাই—জগৎ ব্যাপারে তাহার নাম প্রাণ; শিল্পের ক্ষেত্রে তাহার নাম অণুপ্রাণন শক্তি। উহাকেই সহজন্মা বা সৌভাগ্যজাত বা বিভু-কৃপা-জনিত বলিতেছি। কিরূপে, কি কারণে ব্যক্তিবিশেষে এই সৌভাগ্য সঙ্গম হয়, তাহাও কেহ বলিতে পারে নাই, বাঙ্গালার অন্য কোটী কোটী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া এই আত্মা কেন এই ব্রাহ্মণ-তনয়কে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? কিন্তু অন্তরঙ্গ অধ্যয়নে তাহার পরিচয় পাইবেন :—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষঃ বৃণুতে তেনৈষঃ।

আমরা এই স্থলে, প্রকৃত শিল্প মাত্রেরই মূল শক্তির সঙ্কেত করিয়া আসিলাম। ইহার নাম অনুপ্রাণন—প্রাণ প্রতিষ্ঠার শক্তি—সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিধাতৃ শক্তি। লেখকের রচনা রীতির মধ্যে এই শক্তি প্রকট আকৃতি ধারণ করে। এই কারণ-রীতিকেই শিল্পের প্রধান গ্রহস্বাক্ষর বলিয়া সাহিত্য-দার্শনিকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এমন কি, রীতিই শিল্পীর নিজস্ব ও সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেইরূপ একটা স্বসিদ্ধ রীতি স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। মূল কথা এই, লেখকের স্বপ্রকৃতি সিদ্ধ হওয়া ব্যতীত রচনারীতি প্রাণযুক্ত বা প্রকৃত মনোহারিণী হয় না। ইহা শিল্পবিষয়ক সর্ব্বসম্মত সত্য, পুনশ্চ রীতি প্রকৃতিসিদ্ধি হইলেই যে লেখকের মাহাত্ম্য বিষয়ে যথেষ্ট হইল, এমন নহে। তৎকল্পে লেখকের স্বীয় প্রকৃতিই মহতী হওয়া আবশ্যক, লোকগরিষ্ঠ বা অসাধারণ হওয়া আবশ্যক। এই অসামান্য মনুষ্যত্ব সাধনার উপরেই শিল্পীর মাহাত্ম্য নির্ভর করে। তাই ইহা ইচ্ছাগম্য বা বিদ্যাগম্যও নহে। আত্ম-মাহাত্ম্য সিদ্ধ না হইলে রীতির মাহাত্ম্য, তথা শিল্পের মাহাত্ম্যও সিদ্ধ হয় না। এই তত্ত্ব—'সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ গুলির মধ্যে একটা বিশিষ্ট রীতি, বিশিষ্ট শিল্পাদর্শ—ভারতীয় আদর্শ আছে—মহৎ মনের চিহ্ন আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের বাক্য ব্যঞ্জনা চরিত্র ও ঘটনা প্রভৃতির সমন্বয়ীভূত একটা স্বতন্ত্র শিল্পাদর্শ আছে—তাহা মুখ্যভাবে ভারতীয়। কেবল চরিত্র সৃষ্টি বা স্বভাবানুকৃতিই ভারতীয় মতে কাব্যের একমাত্র

আদর্শ নহে। সমস্ত কাব্য মানব সমাজের নিকট কাব্যের একটা নিজস্ব সমাচার বহন করে, ঐ সমাচারই কাব্যলক্ষ্য—বা ফলশ্রুতি। এই ফলশ্রুতির জাগ্রত আদর্শ ভারতীয়। গ্রন্থের এই ফলশ্রুতি সিদ্ধ না হইলে ভারতীয় আদর্শে উহার শিল্পত্বই সিদ্ধ হয় না। গ্রন্থের সত্যসৌন্দর্য্য ও ভাবের অধিকন্তু, শিল্পীকে এই ফলশ্রুতি সিদ্ধি করিতে হয়। প্রণিধান করিলেই দেখিবেন, শিল্পীর জ্ঞাতসারেই হউক বা অতর্কিতেই হউক, রচনা মাত্রেরই এইরূপ একটা ফলশ্রুতি গ্রাহকের মনে উপজাত না হইয়া যায় না। বলিতে পারেন, এই ফলশ্রুতির গ্রীক আদর্শ fate বা অদৃষ্ট; আধুনিক য়ুরোপীয় আদর্শ জগদ্‌গতি বা naturalism। কিন্তু ভারতীয় মতে এই ফলশ্রুতির আদর্শ জগন্মঙ্গল বা শিব। শিল্পলক্ষণে সত্য ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব অপরিহার্য্য, কিন্তু এই শিবতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অপরিহার্য্য—ভারতীয় আদর্শে অপরিহার্য্য। কাব্যের উদ্দেশ্য, বাকশ্রুতি, জাগ্রত মুখ্যভাবে জগতের শিবকরী বা মঙ্গলাব্যভিচারিণী হওয়া আবশ্যক। কবি জগদ্‌গতির মধ্যে এই শিবসমাচার বা অধ্যাত্ম অশ্বাস স্বয়ং দর্শন করিতে না পারিলে, লেখনীই ধারণ করিবেন না, ইহাই আমাদের সাহিত্য শাস্ত্রের অভিপ্রেত; মনোহর করিয়া যাহা তাহা রচনা করিলেই প্রকৃত শিল্প নামের যোগ্য হইবে না। ভারতীয় শিল্প এই ফলশ্রুতির আদর্শে জাগ্রত। কেবল মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক কাব্য আরম্ভ করিতে হয় ও মঙ্গলাশীষ উচ্চারণেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে হয় বলিয়া নহে। এই মঙ্গলাশীষ কেবল কথায় পরিসমাপ্ত করিলেই চলিবে না; গ্রন্থের গতি ও সমগ্র রসনিষ্পত্তির মধ্যে উহা স্বতঃ অভিব্যক্ত হইয়া পাঠকের হৃদয় অধিকার করা আবশ্যক। এই কেবল দুঃখবাদে বা অদৃষ্ট জন্য অশুভবাদ ভারতীয় শিল্পে পরিশিষ্ট হয় না। ভারতীয় শিল্পীকে optimistic বা শুভবাদী বলিতে পারেন। কবি জগতের শুভানুধ্যায়ী হইয়াই সত্য-সৌন্দর্য্যের শিল্পচ্ছবি প্রকাশ করিবেন।

দুঃখবাদ, অশুভবাদ নিরীশ্বর আদর্শ; এই আদর্শ ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। পালিভাষাতেও উহা কতকগুলি ধর্ম্ম শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, সাহিত্য নির্ম্মাণে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়াছে। পর্ব্বত্র দেখিবেন, দুঃখবাদের, অশুভবাদের উত্তর ফলে, যেমনি ব্যক্তি বিশেষের, তেমনি সমাজের—সাহিত্যের শুষ্কতা ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়া আসিতেছে। কবি বায়রণের অশুভবাদ স্পর্শাক্রামক ও পাঠকের হৃদয় মনের অবসাদক। কবি শেলী যে স্থলে ইহার হাত এড়াইতে পারেন নাই, সেই স্থলেই তিনি নাস্তিক ও শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তির পরিত্যাজ্য হইয়াছেন।

এই ভারতীয় আদর্শে, রামায়ণ মহাভারত বিয়োগান্ত হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে দুঃখবাদী বা fate-বাদী নহে—উভয় গ্রন্থই চিন্ময় মঙ্গলাদর্শে, সাংসারিক সাধারণ সুখ দুঃখের অতীত ভূমিতে পরম উন্নত লক্ষ্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর গ্রহণ করুন—চন্দ্রশেখর বিয়োগান্ত হইয়াও এই ভারতীয় শিবাদর্শেই রচিত। তখন লীয়র বা হেমলেটের ন্যায় নিরুদ্দেশ্য ট্রেজিক বা কেবল বিয়োগ কারুণ্য ঘটনার রসনিষ্পত্তি উহার উদ্দেশ্য নহে। Ajax এর ন্যায় fate বা অপরিহার্য্য দুঃখের আদর্শও

উহার নহে। পরম শিবাদর্শে, মনুষ্যত্বের বিজয় সংবাদ বহন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতাপের মৃত্যু পরিকল্পিত। কবি স্বয়ং তাহার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অমৃতধামে স্থির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে কৃষ্ণকান্তের উইল ও ধর্ম্মলঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত রূপ শুভ ফলশ্রুতি সিদ্ধি করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয়ও য়ুরোপীয় বা গ্রীক ট্রেজিডী নহে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে যাহাকে গ্রন্থের didactive purpose বা মরাল বলে, ইহা তাহাও নহে। কবি জগন্মঙ্গল তত্ত্বের অভ্রান্ত সঙ্কেত করিয়া গ্রন্থের সমগ্রসিত শুভ ফলশ্রুতি সিদ্ধ করিয়াই শেষ করিয়াছেন। জীবনের অপরিহার্য্য দুঃখদৈন্য পাপমৃত্যু প্রদর্শন তাঁহার গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ইহা মরণের কোলেও জীবনের বিজয় গাথা। গ্রীক বা য়ুরোপীয় ট্রেজিডীর সহিত ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব আভাসিত করার উদ্দেশ্যে আমরা এই কথা গুলি বলিতে বাধ্য হইলাম। সাহিত্য-জগতে এই আদর্শকে এখনো আমরা ভারতীয় শিল্পীগণ যথোচিত রূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই, বলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের শিল্পী-জীবনে যাহা করিয়াছেন, তাহাও এখন যাবৎ এই দেশেই যথেষ্ট মতে অধীত হয় নাই—য়ুরোপীয় সাহিত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দূরের কথা। কিন্তু এই আদর্শের বিশেষত্বে আমাদের জাগ্রত হওয়া আবশ্যক—দূর ভবিষ্যতে যদি কোন সৌভাগ্যবান ইহার সমুচিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনি ধন্য হইবেন, আশা করা অযৌক্তিক নহে।

উপসংহারে এই সাহিত্যিক ও মনুষ্যত্ব-সাধক বঙ্কিমচন্দ্রকে চিন্তা করি। এই এক জন মনুষ্যের অন্তর্জীবন আপনাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিলাম। আদ্যন্ত সূত্রানুবন্ধী পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ এই জীবন। কবির কাব্যকে নানাদিক হইতে দর্শন করিতে ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়। কাব্যকে কবির অন্তর্জীবনের সম্পর্কে স্থাপন করিয়া পরম্পরা ক্রমে পরিদর্শন করিব, এই উদ্দেশ্যে স্বদেশীয় পরিচিত সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে এই একজন বিশিষ্ট শিল্পীর দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কিনা বা আপনাদের দুর্ল্ভ জীবনের প্রহর কাল অন্ততঃ সদ্ভাবে ব্যয়িত হইল কিনা—বিধাতাই জানেন।

এই একজন পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণবয়স্ক অথচ ভারতীয় শিল্পী আমাদের সাহিত্য-ভূমিতে আত্মসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিল্প-সাধনা অনবদ্য হইয়াছে কিনা, তাহা বিচার করিলাম। সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা মহার্ঘ ও অসাধারণ গুণ—আমরা তৎসমক্ষেই নতশির হইতেছি :—

নমোনমো—নমো যারা ভাবের সাধনা সূত্রে
বাঁধিয়াছে দ্যুলোক ভূলোকে !
নমো !—যারা জীবনেরে কৃষ্ণান্ধ তামসী হ'তে
আনিয়াছে পুণ্যের আলোকে !

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

সাংখ্যসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২৭। অবস্থার ন্যায় গুণ পরিণামের ভেদ হইতেও নানাত্ব হয়। গুণ পরিণামের ভেদ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সহকারী সত্ত্বাদি গুণ পরিণাম ভেদ হেতু এক অহঙ্কার হইতেই অনেক ইন্দ্রিয় হয়। এক দেহেই বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য দেখা যায়। (অণিঃ)

যেমন একই ব্যক্তি সঙ্গ বশে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়,—কখন কামিনী সঙ্গে কামুক হয়, কখন অন্যরূপ আসক্তি বশে নানাবিধ ভজনা করে—কখন বিরক্ত হইয়া সব ত্যাগ করে, সেইরূপ মন—কখন চক্ষুর সহিত সঙ্গ বশতঃ তাহার সহিত একীভূত হইয়া দর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করে, কখন কর্ণের সঙ্গ বশতঃ শ্রবণ ক্রিয়া সাধন করে;—এইরূপে মন নানারূপ হয়। সত্ত্বঃ, রজঃ, ও তমঃ এই ত্রিগুণের ভেদ হইতেও মনের নানাত্ব বা প্রভেদ হয়। কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না হইলে, সে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান-ক্রিয়া হয় না, সবিকল্প জ্ঞান হয় না। কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। "অন্যত্র মনাভূবং নাশ্রৌষং" অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়া শুনি নাই—ইহা হইতে জানা যায়, কোন ইন্দ্রিয়ে মনঃসংযোগ না হইলে, তাহার ব্যাপার সাধিত হয় না। এজন্য মন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের ব্যাপার সাধন হেতু। (বিঃ ভিঃ)

২৮। রূপ হইতে রসমল পর্য্যন্ত সমুদায় উভয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়।

রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ—বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বিষয়। আর বচন, বিহরণ, গ্রহণ আনন্দ ও মলত্যাগ—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। রসমল =অন্ন-রসাদির মল বা পুরিষাদি।

২৯। আত্মার দ্রষ্টাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগের কারণ সিদ্ধ হয়।

আত্মা দ্রষ্টা ইন্দ্রিয়গণ তাহার কারণ।

বৃত্তিজ্ঞান কালে, প্রথমে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে মনে বিষয়াকার বৃত্তি জন্মে; অনন্তর তাহা চৈতন্য দ্বারা উজ্জ্বলিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ—বৃত্তি জন্মায় বলিয়া করণ, আত্মা তাহা প্রকাশ করে বলিয়া কর্ত্তা। (অণিঃ)

করণ শব্দের অর্থ ক্রিয়ার সাধক। কুঠার যেমন ছেদন ক্রিয়ার সাধক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও তেমনই দর্শনাদি ক্রিয়ার সাধক। চক্ষু দ্বারাই পুরুষের দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইত্যাদি।

পুরুষ দর্শনাদি করে, গমনাদি করে—ইহাতে ইন্দ্রিয়গণ সেই সেই ক্রিয়ার করণ। এই দর্শনাদি জন্য যে সঙ্কল্প, তাহার করণ মন। এই অন্য মন ও ইন্দ্রিয়। পুরুষ এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া ব্যবহার হয়। নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য জন্যই এইরূপ ব্যবহার হয়—

অত আত্মনি কর্তৃত্বমকর্তৃত্বঞ্চ সংস্থিতং।
নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তা সৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥

শাস্ত্রে পুরুষকে ইচ্ছাবিহীন বলিয়া অকর্ত্তা ও সান্নিধ্য জন্য কর্ত্তা বলিয়াছেন। বোধ বিষয়ে বৃত্তি করণ, আর দর্শনাদিতে ইন্দ্রিয়ই করণ।

৩০। তিনের (বা তিন অন্তঃকরণের) স্ব স্ব লক্ষণ আছে।

বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিন অন্তঃকরণ। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র লক্ষণ আছে।

বুদ্ধির লক্ষণ—অধ্যবসায়, অহঙ্কারের লক্ষণ—অভিমান, ও মনের লক্ষণ—সংকল্প বিকল্প।

ত্রিবিধ অন্তঃকরণের স্ব স্ব লক্ষণ বা অসাধারণ বৃত্তি আছে। অধ্যবসায়াদি প্রকৃষ্ট গুণই বুদ্ধিতত্ত্ব। আত্মাতে গুণ নাই, তাহা আত্মাতে আরোপ করাই অহঙ্কারের লক্ষণ। অথবা যে গুণ নাই, তাহা আপনাতে আরোপ করা অহঙ্কারের ধর্ম্ম। আর 'এইরূপ হউক'—এই অঙ্গীকার মনের ধর্ম্ম। ... ... কার্য্য করণের ইচ্ছা—অথবা কর্ম্মে মতি—ইহাই সঙ্কল্প। আর সংশয় বা যোগোক্ত ভ্রম বিশেষই বিকল্প। কোন বিশিষ্ট জ্ঞান—সংকল্প বা বিকল্প নহে—তাহা বুদ্ধির বৃত্তি।

৩১। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু করণের সামান্য (বা সাধারণ) বৃত্তি।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পঞ্চ বায়ু—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিন অন্তঃকরণ দ্বারাই উত্থাপিত, বিধৃত, সঞ্চারিত ও প্রসারিত হয়। ইহারা অন্তঃকরণের সাধারণ ধর্ম্ম।

পঞ্চ বায়ু বুদ্ধি—অহঙ্কার ও মনের পরিণাম বিশেষ। কারিকায় আছে—

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিত্রয়স্য সৈবা ভবত্যসামান্যা।
সামান্য করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা পঞ্চ বায়বঃ॥

কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণাদি বায়ু বিশেষ; ইহারা জীবন যোনি প্রযত্নরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব ইহারা অন্তঃকরণ বৃত্তি হইতে অভিন্ন।

কিন্তু "ন বায়ু ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ"—এই বেদান্তসূত্রে—পঞ্চ বায়ু যে বায়ুর স্বরূপ বা পরিণাম নহে—ইহা দেখান হইয়াছে।

আর, মনের ধর্ম্ম কামাদির দ্বারা প্রাণের ক্ষোভ হয়, অতএব কামাদির সহিত প্রাণের সামানাধিকরণ্য আছে। অতএব প্রাণ ও অন্তঃকরণ অভেদ নহে।

আর বায়ু ও প্রাণ যে পৃথক, তাহা শ্রুতিতে আছে,—

"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনো সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ু র্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্যধারিণী॥"

অতএব (সাংখ্য শাস্ত্রে) লিঙ্গ শরীর মধ্যে প্রাণের গণনা না থাকিলেও তাহার ন্যূনতা হয় না। কারণ ক্রিয়া শক্তি দ্বারা বুদ্ধিই সূত্রাত্মা প্রাণাদি নাম প্রাপ্ত হয়। প্রাণাদি অন্তঃকরণের পরিণাম হইলেও বায়ুর ন্যায় সঙ্কোচিত হয় বলিয়া, বায়ু দেবতা দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া, বায়ু নামে তাহার ব্যবহার হয়।

বেদান্ত মতে প্রাণ মূল তত্ত্ব। প্রাণই ব্রহ্ম, প্রাণই এ সমুদায় প্রাণই হিরণ্যগর্ভ। প্রাণ নিঃসৃত হইয়া কম্পন উৎপন্ন করিয়াছিলেন। প্রাণই মূল শক্তি। কিন্তু সাংখ্য মতে প্রাণ মূল তত্ত্ব নহে। ইহা অন্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি মাত্র। যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে প্রাণ আছে, প্রাণের ক্রিয়া আছে। কিন্তু যেখানে অন্তঃকরণ নাই, সেখানে (যেমন উদ্ভিদে) প্রাণ ক্রিয়া থাকিলে, আর প্রাণকে অন্তঃকরণের সামান্য বৃত্তিমাত্র বলা সঙ্গত হয় না।

৩২। ইন্দ্রিয়গণ কখন ক্রমশঃ ও কখন অক্রমশঃ (বা যুগবৎ) প্রবর্ত্তিত হয়।

দৃষ্টান্তঃ—প্রথমে মন্দালোকে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল; তাহার পর বিচার করিয়া এ চোর, ইহা সংকল্পিত হইল; পরে, এ আমার

ধন অপহরণ করিবে, এই অভিমানে তাহাকে নিবারণেচ্ছা হইল, তাহার পর ইহাকে ধরিতে হইবে, এই অধ্যবসায় হইল। এস্থলে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি ক্রিয়া হইল। বিদ্যুদালোকে রাত্রে হঠাৎ নিকটে ব্যাঘ্র দেখিয়া, তাহাকে পরিহারের জন্য তৎক্ষণাৎ অধ্যবসায় হয়। এস্থানে কার্য্য-যুগপৎ বোধ হয়। অবশ্য সকল বৃত্তির একদা ক্রিয়া অসম্ভব। অবশ্য তাহার ক্রম থাকিবে। শত পত্র একত্র করিয়া তাহাতে সূচীভেদ করিলে, সে ভেদ যুগপৎ বোধ হইলেও, তাহার ক্রম আছে। ইহা ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের অভিমত।

সাংখ্য মতে ইন্দ্রিয়গণ কখন কখন যুগপৎ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সাংখ্যকারিকায় ইন্দ্রিয় বৃত্তির বিভাগ উক্ত হইয়াছে,—

"শব্দাদিষু পঞ্চনামালোচনমাত্র মিষ্যতে
বৃত্তিঃ।
বচনাদানো বিহরনোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্॥"

এই আলোচন জ্ঞান সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং।
পরং পুনস্ত যাবস্ত ধর্ম্মে জাত্যাদিভিস্তথা।"

ঐইরূপে যে সবিকল্প বা বিশেষ জ্ঞান জন্মে, তাহাই আলোচন। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানও আলোচন। পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যেও আছে যে, বিশিষ্ট জ্ঞানই ইন্দ্রিয়জন্য।

কেহ কেহ বলেন যে, এসূত্রে কেবল ইন্দ্রিয়ের কথা আছে। বুদ্ধি ও অহঙ্কারের উল্লেখ নাই। এই সূত্রে মনেরই বিভুত্ব বুঝান হইয়াছে। তাই মন একদা বহু ইন্দ্রিয় যোগে কার্য্য করিতে পারে, একেবারেই বস্তু বিশেষের দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণগ্রহণ প্রভৃতি করিতে পারে।

৩৩। বৃত্তি সকল পাঁচ প্রকার; তাহারা ক্লিষ্ট অথবা অক্লিষ্ট।

বৃত্তি সকল পাঁচ প্রকার যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প নিদ্রা ও স্মৃতি।

যোগ সূত্র ও তাহার ব্যাসভাষ্য হইতে এই সূত্র বুঝিতে হইবে। এই সকল বৃত্তি অবস্থা বিশেষে ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট।

যে বৃত্তি রজস্তমোময় ও অজ্ঞানাদি ক্লেশের জনক—যে বৃত্তি দুঃখপ্রদ ও সাংসারিক তাহা ক্লিষ্ট। যাহা ইহার বিপরীত শুদ্ধ সত্ত্বময় অজ্ঞানাদি ক্লেশের নাশক,—যোগ সাধন কালে যে বৃত্তি হয়, তাহা অক্লিষ্ট।

প্রমাণের বিবরণ পূর্ব্বে সূত্রিত হইয়াছে। বিপর্য্যয় = মিথ্যা জ্ঞান, তাহার বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। বিকল্প = উভয় জ্ঞান (সংশয়), নিদ্রা = অভাব প্রত্যয় যুক্ত তমোদ্ভূত। স্মৃতি ও জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা প্রামাণ্য নহে। তাহা সংস্কার জন্য জ্ঞান। অন্তঃকরণ বৃত্তির দুই অবস্থা—বিরাম বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা, আর সক্রিয় অবস্থা। বিরাম অবস্থা—নিদ্রা। সক্রিয় অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ হয়, অথবা পূর্ব্ব গৃহীত বিষয় স্মরণ হয়। প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ বৃত্তি দ্বারা বিষয় গ্রহণে প্রমা জ্ঞান হয়। আর কখন কখন ভ্রম জ্ঞান হয়। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ বা অধ্যাস—বিকল্প। যথা রজ্জুতে সর্প জ্ঞান। আর বস্তু না থাকিলেও বস্তু জ্ঞান, যথা ভূত দর্শন—ইহা বিপর্য্যয়।

৩৪। এই বৃত্তির নিবৃত্তি হইলে, উপরাগ উপশান্ত হওয়ায়, পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত হয়।

এই বৃত্তি নিবন্ধন পুরুষের রূপান্তর হয়। এই রূপভেদ বৃত্তিমূলক—ঔপাধিক।

যখন পুরুষের সকল প্রকার বৃত্তির নিবৃত্তি হয়, কোন প্রতিবিম্ব পুরুষকে আশ্রয় করে না, পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যার নাশ হয়, তখন এই আত্মস্বরূপে অবস্থান হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে, "যোগই চিত্তবৃত্তির নিরোধ। যোগ অবস্থায় দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান হয়।"

অতএব সকল প্রকার উপাধি বৃত্তির প্রতিবিম্ব নিবৃত্তিই পুরুষের স্বাস্থ্য। যোগ-বাশিষ্টে আছে—

"অনাপ্তাখিল শৈলাদি প্রতিবিম্বে হি যাদৃশী।
স্যাদ্দর্পণে দর্পণতা কেবলাত্মস্বরূপিণী।
অহং ত্বং জগদিত্যাদৌ প্রশান্তে দৃশ্য সম্ভ্রমে।
স্যাৎ তাদৃশী কেবলতা স্থিতে দ্রষ্টর্য্যবীক্ষণে।"

৩৫। যেমন কুসুমের উপরাগ দূর হইলে মণি স্বচ্ছ হয়।

স্বচ্ছ স্ফটিককে যে সন্নিহিত জবাকুসুম রঞ্জিত করে, সেই জবাকুসুম সরাইয়া লইলে স্ফটিকে আর তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না, তখন তাহা স্বীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেইরূপ বৃত্তি সংযোগে পুরুষ উপরঞ্জিত হয়, এবং সেই বৃত্তি অপসারিত হইলে স্বচ্ছ হয়।

"যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলঃ স্ফটিকো জনৈঃ।
রঞ্জকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরম পুরুষঃ॥

৩৬। পুরুষের নিমিত্ত যে করণগণের উদ্ভব হয়, তাহাও অদৃষ্টের উল্লাস হেতু।

ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক অদৃষ্টের বা পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কারের প্রবল প্রেরণা ব্যতীত, ইন্দ্রিয়গণ বৃত্তি প্রসব করিতে পারে না। আর কর্ম্ম-বীজ দগ্ধ হইলে তাহার কোন বৃত্তিক্রিয়া হয় না। উপাধিগত ধর্ম্ম বিশেষ অদৃষ্ট বলেই ইন্দ্রিয়াদি করণ সকল প্রবর্ত্তিত হয়।

পুরুষ উদাসীন, ঈশ্বর অসিদ্ধ; তবে কিরূপে মহৎ অহঙ্কারাদি প্রবর্ত্তিত হয়? ইহার উত্তর এই যে, পুরুষের অদৃষ্ট বলে যেমন প্রকৃতি পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিত হয়, তেমনই মহৎ অহঙ্কার, মনও প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাদের নিজের স্বার্থ নাই।

যখন পুরুষের অদৃষ্ট উল্লাসিত হয়, বা অদৃষ্টবীজ স্ফুটনোন্মুখ হয়, তখন প্রকৃতি হইতে স্বতঃই এই সকল করণের উদ্ভব হয়।

৩৭। যেমন দুগ্ধবতী গাভী বৎসের উদ্দেশ্যেই দুগ্ধ নিস্রাব করে।

এস্থলে দুগ্ধ স্বয়ং নিস্রাবিত হয়, গাভীর কোন যত্নের অপেক্ষা রাখে না। সেইরূপ নিজ পুরুষের নিমিত্ত তাহার অদৃষ্টবশে করণ সকল স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয়। কারিকায় আছে—

"স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণং।"

৩৮। অবান্তর ভেদ হেতু করণ ত্রয়োদশ প্রকার।

তিনি অন্তঃকরণ, যথা বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন। আর দশ বাহ্যকরণ, যথা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই ত্রয়োদশ কারণ। এই সকল করণের প্রত্যেকে অনন্ত ব্যক্তিভেদ আছে। বুদ্ধিই মুখ্য করণ, তাহার অবান্তর-ভেদ অত্যন্ত অধিক।

৩৯। সাধকতমত্ব গুণ আছে বলিয়া, কুঠারের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণের (করণত্ব)।

যেমন ছেদন কার্য্যে কুঠার প্রধান সাধক বলিয়া তাহাকে করণ বলে, সেইরূপ জ্ঞান ক্রিয়ার প্রধান করণ বা সাধন ইন্দ্রিয়দিগকে করণ বলে। (ক্রমশঃ)

পুরুষার্থ সাধনে বুদ্ধিই প্রধান সাধক। ইহাই সাধকতম। অন্ত করণে এই সাধকত্ব পরম্পরারূপে বিদ্যমান। বুদ্ধি ভিন্ন অহঙ্কারাদি সকলেই গৌণ কারণ। তাহারা বুদ্ধির অধীন হইয়া কার্য্য করে। তথাপি করণের একত্ব ও অহঙ্কার অন্তঃকরণের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া তাহাকেও মুখ্য বলা যায়।

ছেদন ক্রিয়ার প্রধান সাধক প্রহার। কুঠার পরম্পরা সম্বন্ধে তাহার সাধক। ইন্দ্রিয়গণ সেইরূপ কুঠারের ন্যায় পরম্পরা সম্বন্ধে সাধক।

৪০। উভয় (ইন্দ্রিয়) মধ্যে মনই প্রধান। যেমন লৌকিক ভৃত্যবর্গ মধ্যে একজন প্রধান।

যেমন লোকে ভৃত্যবর্গ মধ্যে প্রভুই শ্রেষ্ঠ, তেমনই বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই উভয় মধ্যে মনই প্রধান। কারণ মন অন্য ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ও সকল ইন্দ্রিয়ই মনের অধীন। (অণিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার অর্থ করেন—এস্থলে মন অর্থে বুদ্ধি। বাহ্য ও অন্তঃকরণ এ উভয় মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান। তাহাই সাক্ষাৎ করণ। তাহাই পুরুষকে বিষয় অর্পণ করে। তাহাই প্রধান করণ। এস্থলে মন শব্দ কোন তৃতীয় অন্তঃকরণ বাচক নহে। পর সূত্রে মনকে অখিল সংস্কারের আধার বলা হইয়াছে। বুদ্ধির অতিরিক্ত আর কেহ সংস্কারের আধার নহে।

যেমন রাজার বহু ভৃত্য মধ্যে একজন প্রধান থাকে। বুদ্ধিই সেইরূপ প্রধান করণ। মন এই বুদ্ধির অতিরিক্ত নহে। পরবর্ত্তী তিন সূত্রে বুদ্ধির প্রাধান্যের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে।

৪১। ব্যভিচার না থাকায় ইহা সিদ্ধ হয়।

ইহা=মন বা বুদ্ধি। ইহা সকল করণের ব্যাপক সকলের প্রধান। কোন পুরুষার্থ ব্যাপার বুদ্ধি ব্যতিরেকে হয় না—বুদ্ধি বা মনকে ছাড়িয়া কোন ইন্দ্রিয় কার্য্য করিতে পারে না, প্রবর্ত্তিতও হয় না।

৪২। আর তাহা অশেষ সংস্কারের আধার,—এই হেতু ইহা সিদ্ধ হয়।

মনই সংস্কারের আধার ইন্দ্রিয়,বিনাশ হইলেও মনে পূর্ব্বানুভূত সংস্কার থাকে। (অণিঃ)

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, বুদ্ধিই সকল সংস্কারের আধাব। ইন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার ইহারা সংস্কারের আধার নহে। পূর্ব্ব দৃষ্ট বা শ্রুত বিষযে অন্ধ বা বধিরের স্মৃতি বা সংস্কার থাকে। তত্ত্বজ্ঞানে অহঙ্কার ও মনের লয় হইলেও সংস্কার বীজ নষ্ট হয় না। এই জন্য মনের প্রাধান্য।

৪৩। স্মৃতি দ্বারাও ইহা অনুমিত হয়।

ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ব্যতীত মনে স্মৃতির ক্রিয়া দেখিয়া মনের প্রাধান্য অনুমিত হয়। (অণিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, স্মৃতি এস্থলে চিন্তা রূপ বৃত্তি। তাহার নাম ধ্যান, ইহা সকল বৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহার আশ্রয় বুদ্ধি বলিয়া বুদ্ধিকে চিত্ত বলে। এইজন্য তাহা সকল করণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৪৪। স্বতঃ (অর্থাৎ আপনা হইতে) ইহা সম্ভব হয় না।

আত্মা কূটস্থ নির্গুণ নিক্রিয়, এজন্য তাহা স্মৃতির বা সংস্কারের আধার নহে। আত্মাতে স্মৃতির সম্ভাবনা নাই। তাহা মনের ধর্ম্ম।

(বিঃ ভিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, "পুরুষ কূটস্থ—এজন্য তাহার স্বতঃসিদ্ধ শক্তি বা চিন্তাবৃত্তি নাই। তিনি আরও বলেন যে, এই সূত্রের আর এক

অর্থ হয়; অন্ত করণের সহায়তা ব্যতীত বুদ্ধির স্বতঃ কোন কার্য্য করিবার সম্ভাবনা নাই।

৪৫। ক্রিয়া বিশেষ হইতেই আপেক্ষিক গুণ প্রধান ভাব হয়।

এই করণের প্রধান অপ্রধান নির্দ্ধারণ, কেবল আপেক্ষিক রূপে ক্রিয়া বিশেষ অনুসারে হয়। (অনিঃ)

ক্রিয়া বিশেষই করণদের আপেক্ষিক গুণ প্রধান ভাব হয়। যথা, চক্ষুরাদি ব্যাপারে মন প্রধান, মন ব্যাপারে অহঙ্কার প্রধান, অহঙ্কার ব্যাপারে বুদ্ধি প্রধান। বুদ্ধির জন্য অহঙ্কার প্রবর্ত্তিত হয়, অহঙ্কার জন্য মন ও মনের জন্য ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তিত হয়।

৪৬। তাহার কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত বলিয়া তাহারই জন্য চেষ্টা করে, লোকে ইহা দেখা যায়।

বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত, পুরুষ কর্ম্ম উপার্জ্জন করে বলিয়া সেই পুরুষেই সে বুদ্ধির প্রবৃত্তি হয়। লোকেও এইরূপ দেখা যায়।

পুরুষার্থ সেই পুরুষের বুদ্ধিই ক্রিয়াশীল হয়। সেই পুরুষের কার্য্যে বুদ্ধিই করণ হয়। পুরুষ কর্ত্তা না হইলেও সেই কর্ম্ম ভোক্তা, এজন্য সেই কর্ম্মের স্বামী। কর্ম্ম অনাদি। তাহারই ফলে এই স্বামীত্ব।

সাংখ্য মতে পুরুষ অনেক, বুদ্ধিও অনেক। যে বুদ্ধি যে পুরুষের করণ, অন্যের তাহা করণ নহে। কিরূপে এ ব্যবস্থা হয়? ইহার উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, সেই করণ সংগ্রহ করে। সেইরূপ পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্ম বা সংস্কার হইতেই প্রত্যেক পুরুষ তাহার বুদ্ধি প্রভৃতি অর্জ্জন করে—অথবা প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করে।

পুরুষ উদাসীন বটে। কিন্তু বুদ্ধি তাহার ভোগ সাধক। যেমন সেনাপতির জয়ে রাজার জয়, সেইরূপ বুদ্ধিকৃত কর্ম্ম পুরুষে আরোপিত হয়। যে বুদ্ধির কর্ম্ম যে পুরুষে আরোপিত হয়, সেই বুদ্ধিই সেই পুরুষের করণ। (বিঃ ভিঃ)

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত পুরুষের কর্ম্ম স্বীকৃত হয় নাই। কেননা প্রতিবিম্ব অবস্তু।

৪৭। সমান কর্ম্মযোগ হইলেও বুদ্ধিরই প্রাধান্য। লোকেও এইরূপ দেখা যায়।

সকল করণই সমানরূপে পুরুষার্থ সাধন করে, তথাপি বুদ্ধিরই প্রাধান্য। যেমন রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে মন্ত্রীরই প্রাধান্য।

অতএব বুদ্ধিই মহান্।

এই অধ্যায়ের ৩৯ হইতে ৪৭ সূত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিক্ষুর ও অনিরুদ্ধের পৃথক। বিজ্ঞানভিক্ষু মতে এই সকল সূত্রে কেবল বুদ্ধিরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। অনিরুদ্ধ মতে ইন্দ্রিয়গণই প্রধান করণ। (৩৯) তাহাদের মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ (৪০-৪৪) তবে তাহার প্রাধান্য আপেক্ষিক। (৪৫) বুদ্ধিই সর্ব্বপ্রধান কেননা বুদ্ধির জন্য মন প্রবর্ত্তিত হয়। (৪৬)।

গীতায় আছে:—

ইন্দ্রিয়াণি পরণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ যো বুদ্ধিঃ পরতস্তু সঃ॥

শ্রুতিতেও এই কথা আছে—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যার্থা অর্থেভ্যশ্চ পরংমনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥

অন্যত্র আছে—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্ত মুত্তমম্॥

ইতি কঠোপনিষদ্।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারসংগ্রহ।

(ক) সৃষ্টি।

সংক্ষেপ সূচী।

(ক) সৃষ্টি।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বর্ষায়।

(১)

আজ শনিবার—শ্রাবণের তটিনী সমান
তরঙ্গিত, পুলকিত, অবকাশ ধুণী
নৃত্য করি, তালে তালে, মানস নয়নে
দিতেছে ঢালিয়া শান্তি। মেঘ গরজন,
পশিয়া শ্রবণ-পথে, তুলিছে জাগায়ে
সুধাস্রাবী মন্দাক্রান্তা—যক্ষের বেদন।

(২)

শূন্য গৃহ, কাছে নাই ইন্দু, তরু,জ্যোতিঃ,
কাছে নাই, গৃহলক্ষ্মী স্বর্ণকল্প লতা,
প্রাবীণ্যের প্রান্ত-দেশে, আজি উপনীত।
তবু কেন বিরহের, আতপ্ত নিশ্বাসে
হতেছে ব্যথিত চিত্ত, শূন্যতা সম্ভার
ছাড়ি নভঃ এ হৃদয়ে পেতেছে আসন।

একা আমি কেহ নাই—নাই--নাই--নাই
অর্থ নাই, বন্ধু নাই, আধেয় ছাড়িয়া
অতি দূরে প্রীতি-রাণী করেছে পয়ান।

(৩)

সহিয়াছি যৌবনের বিরহ বেদনা,
পুষ্টকায় অদ্রি যথা, লয় বুক পাতি
গর্ব্বসহ বজ্রের কঠিন আঘাত।
কখন প্রদোষ কালে নিবিড় জলদে
উদ্ভিন্ন করিয়া এক অব্যক্ত শকতি
বিনির্ম্মিত সপ্ত বর্ণে, ধনুয়া শরণি।
সেই পথে অন্ধকারে দেহ-গেহ ছাড়ি,
বাহিরিত মন মম বর্ষা অভিসারে,
মিলিতে প্রেমের কুঞ্জে, যৌবন-চঞ্চলা
নিরিভ লাবণ্য ভরা, প্রেয়সীর সনে।

(৪)

প্রেয়সী,প্রেয়সী সে কি! থুড়ি, থুড়ি,থুড়ি
এ তিপ্পান্নে একি কথা! প্রেমালসা ভাষা!
এ ভাষা যে, আশা-যুত যুবকের গাথা,
বিশ্বাস-সম্ভোগ রসে সদা বিলসিত;
কাজ নাই থাক্ থাক্ ব্রাহ্মণি ব্রাহ্মণি,
যথাযোগ্য স্থবিরের মধু সম্বোধন।

(৫)

ব্যবধান থাক থাক। সাহারা হৃদয়ে
হে বরষা, আজি তুমি করুণা করিয়া
বিনির্ম্মিলে নিজ হাতে রম্য উপবন।
নয়ন এসেছে ভিজে, অসাড় হৃদয়ে
আজ এই ব্যথা বোধ, মরি কি মধুর!
আজি আমি ত্রিলোচন,ব্যথার পরশে
ফুটেছে প্রেমের চক্ষু, হৃদয়ের মাঝে।
অতীতের শত কাব্য প্রেমের সঙ্গীত
Romantic ভালবাসা, মান, অভিমান,
শীতল চাঁদনী রাতে নিদ্রিত অধর
চন্দ্র করে নবরাগে হইলে রঞ্জিত
চুরি করে আহরণ, করেছিনু কবে
চুম্বন মন্দার ফুলে। অতৃপ্ত লোচনে,
মুখ চেয়ে কাটায়েছি অনিদ্র যামিনী।
একটু বিরহে যার, নয়ন আসার
গণ্ড বহি বক্ষঃস্থল করিত প্লাবন,
আলিঙ্গনে, সপ্ত স্বর্গ উঠিত কাঁপিয়া;
মধুরিমা কমনীয় ভুরুর বিলাস,
কোমল কাঠিন্য ভরা, ক্রোধের মূরতি
স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যাপি এই প্রেম বিচিত্রতা
দাঁড়াইয়ে দেখাইছে অতীত আলেখ্য।

(৬)

সেই আমি, এই আমি, হা ধিক হা ধিক,
হা বিস্মৃতে! এস এস হৃদয় মন্দিরে।
উপেক্ষা-জনিত পাপে, কলঙ্কিত চিত্ত,
প্রণয় মনিয়া দীপ্ত, মূরতি লইয়া,
ছড়াও মধুর আলো, আঁধার আলয়ে।
বিরহ বেদনা সখী, সহিতে অক্ষম!
চারিদিকে অন্ধকার বর্ষা অবসাদে
জগতের বিষন্নতা, দীন গৃহে মম
বাঁধিয়াছে বাসস্থান। তব মৌন ব্যথা
এ আঁধারে অতি স্নিগ্ধ ছুটি চক্ষু মেলি,
আমা পানে চেয়ে চেয়ে কি যেন যাচিছে,
যাতনা বারণ দল মথিয়া হৃদয়
বপ্র ক্রীড়া করিতেছে বুকের ভিতর।

(৭)

অভাবের হাহাকারে উত্তপ্ত হইয়া
তোমারি মরণ কত, করেছি কামনা।
শান্তিরে চরণে ঠেলে, শান্তি লাভ তরে,
অশান্তিরে যত্ন করে কোলে তুলে লয়ে,
স্বইচ্ছায় বিরহের জ্বেলেছি অনল।
আলো নাই শুধু ছুটি উজ্জ্বল নয়ন,
অব্যক্ত আকুতি এক করিছে প্রকাশ,
অসহ্য বেদনা শত প্রতি শিরা দিয়া
প্রবাহিয়া হত ভাগ্যে করিছে উন্মাদ।
বদ্ধমূল অবিশ্বাস ঘোর নাস্তিকতা।
ব্যঙ্গ এবে করিতেছে হৃদয়ে লইয়া।
জীবনে চিন্ময় ধ্যান করি নাই কভু,
বিজলি চিকুরে ওই কার দ্যুতি হেরি
সংশয়ে বিশ্বাস মূর্ত্তি করি বিলোকন?
সংশয় তো ধূম মালা—ক্ষীণ কুজ্ঝটিকা
এদুর্দ্দিনে ধীরে ধীরে করিছে পয়াঁন।
কোন্ পথে গেলে পাব অক্ষয় স্বরগ?

দারিদ্র্যের ভার বাহি—মস্তকে আমার
বিশ্বাসের শঙ্খধ্বনি হয়নি কখন।
বিদ্রোহী হয়েছে দণ্ড শ্মশ্রু গুম্ফ কেশ
এক হয়ে আত্ম ধর্ম্ম করিয়াছে ত্যাগ।
কখনতো ভাবি নাই হরিরে আমার
কখনতো রাধা কৃষ্ণ, যুগল মূরতি
উজ্জ্বল রসের সার, করি নাই ধ্যান,
মরণতো সন্নিকট প্রচ্ছন্ন প্রয়াগ
আগত বঁধুর তরে হতেছে প্রস্তুত।

(৮)

এস এস ধর্ম্মময়ি! আজি এ বাদলে
দুইজনে এক হয়ে করি হরিধ্বনি,
এ ধরণী যুবকের উপভোগ্য সুধা।
এ ধরণী নির্ধনের জ্বলন্ত নিরয়।
জীবনে মরণে সখি হ'লে বিনিময়
দারিদ্র্য কি সঙ্গে সঙ্গে করিবে গমন?
বহুদিন হ'তে শ্রেয়ঃ হয়েছে মরণ,
কিন্তু এই ভয়; মরণ জীবন হ'তে
দারিদ্র্য সম্পদে যদি হয় ভীমতর।

(৯)

সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাদীপ অঞ্চলে ঢাকিয়া,
তুলসীর মূলে রাখি, কম্পিত, প্রদীপে
ডাকিতে যখন তুমি, অই শুচিস্মিতে!
তোমার আরধ্য দেব, দয়াল অচ্যুতে।
অবিশ্বাসী মন মম উঠিত হাসিয়া,
দেখিয়া নারীর সেই সুলভ বিশ্বাসে।
টুটে গেছে অবিশ্বাস হে সহধর্ম্মিণি!
দুই সূক্ষ্ম দেহ আজ একত্র হইয়া
হরিনামে মাতোয়ারা হই দুই জনে।

(১০)

বন্ধু নাই, কেহ গত, কেহ স্বতঃ রত
সুকঠিন সুবর্ণের অস্থি আহরণে,
আপন ললাটে কেহ করিয়া স্থাপন,
রায় বাহাদুর টীকা—উদরম্ভরিতা
হয়েছেন মহাস্ফীত বরষা দর্দ্দুর।

১১

দরিদ্রতা বিধাতার কীণ কঠিনতা,
করুণায় ভিজাইতে নাহি কোন জন;
বাল্য মিত্রে নিরখিয়া শিহরে শরীর
মনে হয় এর চেয়ে অহি প্রীতিকর।
"জুরু মুরু খুখু" হ'তে নীরস অন্তর
হাস্যহীন মূর্ত্তিমান Evidence Act.
বাঙ্গালীর গরবের একমাত্র ধন
সর্ব্বজ্ঞ ডিপুটী-বন্ধু, হায় ধিক্ ধিক্
ঘৃণা চণ্ডালীরে দিয়া, কুশ মূর্ত্তি গুলি
দগ্ধ করি ভস্মরাশি, রেখেছে পুতিয়া।*

১২

শুধু দাম্ভিকতা নহে—বিরাট ভণ্ডামি
শুধু শুধু গর্ব্ব নহে—প্রভূত উপেক্ষা,
করিছে পুরুষে প্রেত—নারীরে পিশাচী।

১৩

তমালের কুঞ্জবন ওই শোভে দূরে,
ওর শিরে স্নিগ্ধপদ করিয়া স্থাপন,
হে বরষা ঋতুরাণি দাঁড়াও বারেক,
এলাইয়া গাঢ় কৃষ্ণ কুন্তল কলাপ।
মৃদঙ্গ গম্ভীর ভাষে মন্দ্রধ্বনি করি
নীপ সম চিত্তে মম কর কণ্ঠকিত।
অর্জ্জুন কেতকী সর্জ্জ ঢালিয়া সুবাস,
তোমাকে দিতেছি দেবি! প্রীতি-উপহার।
বৃক্ষ হ'তে, লতা হ'তে, লাবণি ঝরিয়া
ধরণীরে সাজাইছে বৈদূর্য্য শোভায়।
এ জগতে দয়ালের এ ভবমণ্ডলে
সবাই সুন্দর দেবি, অসুন্দর নাই।
অসুন্দর নাই,মিথ্যা কথা—আছে—আছে
মানুষের চিত্ত, অহো গর্ব্বীর অন্তর।
নহে নারী এজগতে রূপে অসুন্দর,
রূপে নর নারী হ'তে আরো প্রীতিকর।
কিন্তু, কিন্তু আত্ম সুখ বিলাস-মদিরা,
পান ক'রে নর নারী হ'য়েছে নির্ম্মম।
জানি না স্বাধীন জাতি, কেমন উদার,
কিন্তু এই হেয় জাতি, স্বভাব কুৎসিত।
পরশুভ-খিন্নমান, অলস, বিলাসী।
সোণার ভারতবর্ষে ছিল এক দিন,
অগুরু চন্দন পঙ্ক—পর-ব্যথা-বোধ।
ব্যথীরে বুকেতে টেনে, মার মত ক'রে,
হৃদয় স্পন্দন তার, করি অনুভব
বিষময়ী যাতনায় দিত প্রলেপন।
করুণার নির্ঝরিণী, আছিল রমণী
বটচ্ছায়া, সমচিত্ত, প্রশান্ত শীতল।
তপোবন আদরশে, ছিল বিনির্ম্মিত

* আমার ডিপুটী বন্ধুগণের মধ্যে স্বর্গীয় আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম, এ, আদর্শ পুরুষ ছিলেন—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র, চারুচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ আমার শ্রদ্ধার পাত্র।

মানবের গৃহ ভূমি, শান্তি নিকেতন।
অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, সাবিত্রী, আদর্শে
আপনারে প্রতি নারী করিত নির্ম্মাণ।
এখনো বাঙ্গালী গৃহে, আছে লুক্কায়িত
স্নেহ-রস-পরায়ণা, বেদনা-কাতরা,
মার মত প্রীতিময়ী ব্যথীর জননী,
তাও বুঝি আর নাহি থাকে পাপদেশে।
ভণ্ড—চক্রী নর পশু নারীর শিক্ষক।

১৪

রে ভণ্ড!
কি শিক্ষা দিতেছ আজ মম মাতৃকুলে?
সত্যেরে ফেলেছ দূরে, যত্ন ক'রে সবে?
লইয়াছ অধর্ম্মেরে মাথায় তুলিয়া।
সেই তুমি কুলাঙ্গার জননী নিকরে
শিখাইছ অহর্নিশা ছলনা বিলাস।
ছন্দোময়ী ঋজু ভাষা নাহি রমণীর,
পর দুঃখে আর কেহ ঢালেনা জীবন!
গণিকা—বিলাস মাঝে হোক্ নিমগন!
ভগ্নী যাঁরা মাতা যাঁরা লালসা লীলায়
তাঁরা কেন আমজ্জিত না পাই ভাবিয়া।

১৫

অন্ন তরে ওই কাঁদে চীর-বাসধারী
রোগক্লিষ্ট, ভগ্নদেহ কাঙ্গাল সন্তান,
দান-শুচি-শুভ্র হস্ত হে মাতৃ নিকর,
কেন আজ অবসন্ন? সুবর্ণ কঙ্কন
মণিবন্ধে কেন মাগো করিছ ধারণ?
মা হ'য়ে দাঁড়াও সবে, করুণা মুরতি,
হওনা হওনা দেবি—পিশাচী রাক্ষসী,
ওই দেখ কাঁদে সাধু—কন্যারত্ন লয়ে
জোৎস্না-হৃদয়া-বালা—সরলা নির্ম্মলা
মধুরভাষিণী, স্নিগ্ধা, সত্যপরায়ণা,
অনভিজ্ঞ ছলনায়, শিখেছ যতনে
আত্মসুখ হাস্য মুখে করিতে বর্জ্জন।
কাঙ্গাল সাধুর কন্যা হোক গুণবতী,
গুণের মর্য্যাদা কিগো আছে পাপদেশে?
সুবর্ণ মণ্ডনে তারে পারেনি সাজাতে
তাই আজও পরিণীতা হয়নি "তরলা!"

(১৬)

মেঘভরা চিত্ত হ'তে এদুর্দ্দিনে তবু
ছুটিছে তির্য্যগ গতি, প্রতিভাসুন্দরী
গরিমা রে থাক থাক, এ অস্তিমে আর
বিচ্ছুরিয়া অতিতীক্ষ্ণ লিশুক নিকর
ব্যথিত হৃদয় মাঝে ক'রোনা সন্ধান।
বহেনা সমাজ-শিরে নির্ম্মল রুধির
পাপ-পুষ্ট দেহ ভারে সদা মন্দ গতি।

(১৭)

মর্দ্দিত অঞ্জন কান্তি সরসা বরষা,
কি গম্ভীর গরজনে তুলেছ জাগায়ে
প্রাণের ভিতরে মম বিরহ বেদন।
ওই অঞ্জনের রেখা মানস নয়নে,
নিপতিত হইয়াছে—তাই পয়ঃস্বিনি
বিরাগের হিয়া টুটি নব অনুরাগ
প্রবাহিয়া ওই তব উৎপল বরণে,
মনের অনলে মম করেছে নির্ব্বাণ।

১৮

গুরু গুরু বারে মেঘ করি গরজন,
হরষে সন্ধ্যায় করে প্রিয় অভ্যর্থনা;
দোঁহাকার বর্ণে বর্ণে হ'ল আলিঙ্গন
নিকলে চপলা বালা—বরষা-জীবন।
সন্ধ্যা আজি মেঘ সনে মিলিল যেমন,
সন্ধ্যা হ'তে মলিমস পরাণ আমার
মর্দ্দিত কজ্জল ভাসি শ্যামের চরণে
এখনি মিলিত যদি— এ-খ-নি এ-খ-নি!!
যত গুরু ভার হায় যেতো লঘু হ'য়ে।

১৯

চির নরদ্বেষী আমি, জানিনা চাটুতা,
জ্যোতির্ম্ময় আভিজাত্যে পরিপূর্ণ-চিত।
সহোদর পিশাচের করে অভিনয়
প্রতিবাদী খলতার বিষ পান ক'রে
আশীবিষ মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া।
পিতৃস্নেহে নাহি সুধা, মার মমতায়
মৌন মুগ্ধ হ'য়ে আর নাহি করি ধ্যান।
বন্ধু—অহো বন্ধুতার কর পদাঘাত,
বাঙ্গালীর বন্ধুতায় জ্বলুক অনল,
সারল্যের সুগভীর নাহি নিবিড়তা,
নাহি সান্দ্র ভালবাসা, আত্মবিসর্জ্জন;
আজি তুমি নর্ম্ম সখা, আবশ্যক হ'লে
নিষ্পেষিয়া পদে তোমা তব মিত্রবর
উন্নতির উচ্চশির লইবে আশ্রয়।
আয় মৃত্যু জলদের বরণ ধরিয়ে
তোর বর্ণে শ্যামরূপ করি দরশন
শ্যামের ধিয়ানে সখে লীন হ'য়ে যাই।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

আদিশূরের রাজধানী গৌড় কি বিক্রমপুর ?

মহারাজ আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বিক্রমপুরস্থ রামপালনগরে কি গঙ্গাতীরস্থ গৌড়নগরে আসিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে বিক্রমপুর ও পশ্চিম বঙ্গে নানারূপ মতভেদ লক্ষিত হয়। কোন কোন লোক এত অসহিষ্ণু যে, আদিশূরের রাজধানী মালদহের অন্তর্গত গৌড়নগরে ছিল বলিলে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। আবার কেহ কেহ স্বদেশ-প্রেমের বশীভূত হইয়া কল্পনা বলে বুড়ীগঙ্গা নদীকে রামপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া রামপা[illegible]ই "সুরসরিদ্‌-বিধৌত গৌড়" নগর [illegible]য়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এসম্বন্ধে পক্ষপাতী ও পরস্পর-ক্রোধ-পরবশ না হইয়া উভয় পক্ষে কি কি প্রমাণ আছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। বিক্রমপুরের ন্যায় মালদহেও আদিশূরের রাজধানী ও ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমন সম্বন্ধে নানাবিধ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। সুতরাং কেবল কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর না করিয়া বিশিষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে এ বিষয়ের আলোচনা করিলে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে।

এসম্বন্ধে বিক্রমপুরের পক্ষে যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা এই :—

বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণেরা আগমন করেন, তখন মহারাজ আদিশূর রামপালের রাজধানীতে ছিলেন। লঘুভারত-প্রণেতা ও সম্বন্ধ-নির্ণয়-কর্ত্তাও বলেন যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ বিক্রমপুরের রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত মতেও কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ-বংশোদ্ভূত কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের পূর্ব্বপ[illegible]ণ বিক্রমপুরে বাস করিতেন। [illegible]ছে। [illegible]াইজ সাহেব তদীয় বিক্রমপুরের [illegible]থই ব্য[illegible] বির[illegible] লিখিয়াছেন যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্ম[illegible] এতদ্ব্যতী[illegible] [illegible]পুরেই আসিয়াছিলেন এবং অ[illegible]ানে, দেবীবর[illegible] ও গ্রামাদি এই বিক্রমপুরেই [illegible]াতি মিশ্র [illegible] ও[illegible]হল। এতদ্ব্যতীত বিক্রমপুরের [illegible]াসিয়া[illegible] অন্ত[illegible]ত সর্ব্বত্র এইরূপ জনপ্রবাদ যে, আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ রামপাল নগরে আসিয়াছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণগণ চর্ম্ম পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে রামপালনগরে আসিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের সদাচার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের আগমনের পরেও সমুচিত অভ্যর্থনা না করিয়া কার্য্যান্তর ব্যপদেশে অন্তঃপুরে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ এবম্প্রকার উপেক্ষার লক্ষণ বুঝিতে স্বকীয় প্রভাব প্রদর্শনার্থ গৃহীত অর্ঘ্যবারি সম্মুখস্থ মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। শুষ্ক মল্লকাষ্ঠ তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবিত হইল। রামপালগ্রামে বল্লাল বাটীর বহির্ব্বাটীর পুষ্করিণীর উত্তর-তটে একটী গজারী বৃক্ষ আছে। লোকে এই গজারী বৃক্ষকেই সেই পুন-

অজীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া থাকে। এই সকল প্রমাণ কেবল অনুমান ও কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিতেছে। পক্ষান্তরে বাটীর ও বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থ সমূহে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণগণ গৌড়নগরে আসিয়াছিলেন।

যথা—

আসীদ্গৌড়ে মহারাজঃ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ সর্ব্বানাহূয় দেশ দেশতঃ॥
উত্তর বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

বেদবাণাঙ্কশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃসমাগতাঃ।
বাচস্পতি মিশ্র।

কান্যকুব্জাত্তারদ্বাজ কন্যায়াং, পুরুষে স্ব।
গৌড়ে সমাগত শাকে সবেদাষ্ট শতাব্দীর,
।। জীবন ।লা।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরাঃ সমিতাগ্নি
.হাক্ নিমগন
রাজাদিশূর পুরতঃ জ্বলদাগ্নি ·লালসা লীলায়
·ই ভাবিয়া
শ্বহর পহর কোলাঞ্চতৌজয়ে গৌড়ে .ন এসে—ভটগ্রন্থ।

হয়যানং সমারুহ্য চর্ম্মবোষ্টিত পাদুকাঃ।
সদারশ্চ সপুত্রাশ্চ সগুণাশ্চ সমব্রতাঃ॥
অস্ত্র শস্ত্র ধনুর্যুক্তাঃ বাজিহোম পরায়ণাঃ।
পঞ্চ সূর্য্যোপমাঃ পঞ্চ বিপ্রাঃ গৌড়ে সমাগতাঃ॥
বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন যে, গৌড় অর্থে গৌড়নগর নহে, গৌড়রাজ্য। কিন্তু বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থে স্পষ্টতরভাবেই লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাতীরস্থ গৌড়নগরে আসিয়াছিলেন এবং গঙ্গার অনতিদূরে বাস করিয়াছিলেন, যথা :—

(১) সকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিকাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠা হুতাবহসম ভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ
নিজ পরিচয়বর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং সুর সুরি- দ্বিধৌতং শান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥
(২) গঙ্গায়ানাতিদূরেঽস্মিন্ প্রদেশে বহুধান্যকে।
বসন্ত বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্যসন্নিভাঃ॥
বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

মালদহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বিশ্বকোষ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু ও বারেন্দ্র প্রদেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়গণও বলেন যে, আদিশূরের রাজধানী গৌড়নগরে ছিল এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ গৌড়নগরে সমাগত হইয়াছিলেন। মালদহের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তদীয় গৌড়ের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, "আদিশূরের যজ্ঞ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে হইয়াছিল, বিক্রমপুরে হয় নাই। পাণ্ডুয়ার হোমদীক্ষা ও ধূমদীক্ষা নামে দুইটী পুষ্করিণীর তীরে আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হইয়াছিল।" বাস্তবিক পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়, একই নগর। আমি প্রায় তিন বৎসর কাল মালদহে ছিলাম এবং গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ ও স্থানীয় অবস্থা বিশেষরূপে দর্শন করিয়াছিলাম। তথায় স্থানীয় অধিবাসিগণ অদ্যাপি আদিশূর, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের বাটীর স্থান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিক্রমপুরে যেমন পঞ্চসার ও পঞ্চগ্রাম ব্রাহ্মণদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া প্রদর্শিত হয়, মালদহেও বটগ্রাম বা বড়গ্রাম ও বটগ্রামীয় বিগ্রহকা নামক বাসুদেব মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। বিক্রমপুর অতি প্রাচীন নগর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তথায় আদিশূরের রাজধানী ছিল, কিম্বদন্তী ব্যতীত তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্র বলেন যে, চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠ নামা কায়স্থ জন্ম গ্রহণ করেন। সেই বংশজাত মহারাজ আদিশূর দারদ দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ও গৌড়াধিপ প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কায়স্থ-সংহিতা-

কার বলেন যে, সাহনামা ও মোতাক্ষরীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আদিশূর পারস্য-দেশের রাজা দারদ বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন, তৎপরে গৌড়ের বাদশাহ হন। আর দীপঙ্করের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পালরাজগণের এক শাখা বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। দীপঙ্কর বিক্রমপুর নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে রাজা ও রাজার জ্ঞাতি, এই দুই উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন। আমি শেষোক্ত শ্রেণীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।" দীপঙ্কর ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লাসা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। (১) কোন কোন কুলজী গ্রন্থ মতে এবং বিশ্বকোষ ও সেনরাজগণ প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তাদিগের প্রমাণ ও যুক্তি অনুসারে আদিশূর ও জয়ন্ত একই ব্যক্তি, কিন্তু আদিশূর ও বীরসেন এক ব্যক্তি নহেন। জয়ন্ত গঙ্গাতীরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন ? রাজতরঙ্গিণী তাহার প্রমাণ। তদনুসারে আদিশূর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। বিজয় সেনের সময় পূর্ব্ববঙ্গ গৌড় রাজ্যের অধীন হয় বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার বংশধরগণ কখনও বা গৌড়ে কখনও বা বিক্রমপুরে বাস করিতেন। গৌড়নগরই প্রকৃত রাজধানী ছিল। বিক্রমপুরের রাজধানীকে সেনরাজগণ শিবির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের কোন কোন তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, "বিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" অর্থাৎ বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার বা জয়যুক্ত শিবির হইতে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইল। স্কন্ধাবার শব্দ রাজধানী অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে বটে। কিন্তু এস্থলে সমাবাসিত শব্দ যোগে শিবির অর্থই স্পষ্টতর বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে "ধার্য্যগ্রাম পরিসর সমাবাসিত", কেশব সেনের প্রদত্ত ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে "জম্বুগ্রামপরিসর শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে "স্কন্ধগ্রাম পরিসরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ" লিখিত আছে। ইহাতেও স্কন্ধাবার শব্দ যে শিবির অর্থেই ব্যবহৃত হইত, তাহা সমর্থন করে।

এতদ্ব্যতীত বারেন্দ্র গ্রন্থমতে ব্রাহ্মণেরা হয় যানে, দেবীবর মতে গোযানে এবং বাচস্পতি মিশ্র মতে অশ্বারোহণে গৌড়নগরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বিক্রমপুর যেরূপ জলমগ্ন দেশ এবং তথায় উচ্চ রাজপথের যেরূপ অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণগণের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রচলিত হয় যান বা গো যানে আগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অশ্বারোহণে আগমনও তত সম্ভবপর নহে। তৎকালে বিক্রমপুর সমুদ্রের অধিকতর নিকটবর্ত্তী সুতরাং অধিকতর জলমগ্ন ছিল। অতএব নৌকারোহণে আগমনেরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। গৌড়নগরের অনতিদূরে মহানন্দার অপর পারে বারেন্দ্রভূমি ও পশ্চিমদিকে গঙ্গার অপর পারে রাঢ়দেশ অবস্থিত। ইহাতেও শেষোক্ত মত সমর্থন করে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, গৌড়নগরে ব্রাহ্মণদিগের আগমন হইলে, মালদহে রাঢ়ী ব্রাহ্মণের বিরলতা ও বিক্রমপুরে রাঢ়ী ব্রাহ্মণের এত আধিক্য কিরূপে হইল ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নবদ্বীপ ও গৌড়নগর মুসল-

(১) Journal of the Budbhist Text Society of India., Vol I, Part I.

মানদিগের হস্তগত হইলে রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করেন, সেই সঙ্গে অমাত্য-বর্গ ও ব্রাহ্মণগণ মুসলমানদিগের ভয়ে পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ ও বাসস্থান স্থাপন করেন। এই জন্যই বিক্রমপুরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের এত আধিক্য দৃষ্ট হয়। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে উল্লিখিত প্রমাণও এইরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

গজারী বৃক্ষের প্রমাণ উল্লেখযোগ্য নহে। বর্ত্তমান গজারী বৃক্ষ ১০০০ কি তদূর্দ্ধ বৎসরের হইতে পারে কিনা, তাহা উদ্ভিদ্‌বিৎ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিবেন। শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

মানব সমাজ। (১৮)

উপসংহার।

দেহ গঠন ও বর্ণানুসারে মানবসমাজকে পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন,—শ্বেত, কৃষ্ণ, ও পীত। কটা ও লোহিত বর্ণ মানব ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী। ডারুইন্ বিশ্বাস করিতেন যে, এই সকল মানব মূলে একই। কালক্রমে ইহাদিগের দেহ গঠনের সহিত স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

কোন মানব সমাজকে বুঝিতে হইলে প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, উহা মানব জাতির কোন্ বিভাগ হইতে উৎপন্ন, এক বা একাধিক বিভাগ হইতে জাত। ব্যক্তিকে বুঝিতে হইলে যেমন তাহার বংশ বুঝা চাই, তেমনই, সমাজকে বুঝিতেও তাহার উৎপত্তি বুঝা আবশ্যক। তৎপর, ব্যক্তির সম্বন্ধে যেমন শিক্ষা ও সংসর্গ, সমাজের সম্বন্ধেও তাহাই। অতীত কাল হইতে যে সমাজ যেরূপ শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়া, যেরূপ সংসর্গে পড়িয়া বিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা তদ্রূপই হইয়াছে। সুতরাং সমাজকে চিনিতে হইলে তাহার শিক্ষা ও সংসর্গ বুঝা আবশ্যক। সমাজের উৎপত্তি বুঝিতে লোকতত্ত্ব, এবং তাহার শিক্ষা ও সংসর্গ বুঝিতে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব জানা অত্যাবশ্যক। এসকল শাস্ত্র আলোচিত না হইলে সমাজতত্ত্ব সংখ্যক আলোচিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, সমাজের উৎপত্তি, শিক্ষা ও সংসর্গ অবগত হইলে সমাজকে বুঝিবার আশা করা যায়। তখন দেখা যায় যে, ব্যক্তির জন্মগত, শিক্ষালব্ধ ও সংসর্গগত দোষ-গুণ যেমন অপরিহার্য্য, সমাজেরও তাহাই। সমাজকেও ব্যক্তির ন্যায় ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছামত এদিক ওদিক পরিচালন করা যায় না। তাহার প্রকৃতির অনুরূপ ভাবে তাহাকে না লইলে কোন ঈপ্সিত ফলই আশা করা যায় না।

মানব-সমাজ মানব-সমষ্টি। সুতরাং মানবের দেহ ও মনই সমাজের একমাত্র সম্বল। দেহ ও মন, উভয়ই বংশানুক্রমের নিয়মাধীন। সুতরাং বিবেচনা পূর্ব্বক নর-নারীদিগকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করা আবশ্যক। যাহারা সুস্থ, সবল, কৃতী, চরিত্রবান এবং জীবন-সংগ্রামে অল্লাধিক জয়-যুক্ত ও দীর্ঘায়ুঃ,তাহাদিগের কিম্বা তাহাদিগের বংশধরগণের মধ্যেই যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। ঐসকল গুণ বংশানুগত, সুতরাং অপত্যও সুযোগ্য হওয়া সম্ভব।

তাহা না হইয়া, দুর্ব্বল, রুগ্ন, অসৎ, অল্পায়ু ও অকৃতীগণ মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ অনুষ্ঠিত হইলে পরপর বংশে মানব অধঃপতিত হইয়া যাইবে। ঐসকল গুণবিশিষ্ট নরনারী এক-বর্ণে অথবা বিভিন্ন বর্ণেও থাকিতে পারে।

বিবাহ অন্তর্জাতীয় হইলে কালক্রমে অপত্য শ্রেণীতে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। এ নিমিত্ত সমাজ-দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে সময় সময় বহির্জাতীয় বিবাহও প্রচ-লিত থাকা আবশ্যক। এতদ্দেশেও প্রাচীন কালে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না।

তৎপর, সমাজকে দৈহিক ও মানসিক পীড়া হইতে রক্ষা করা এক প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সিদ্ধ করিতে হয়। দূষিত স্থানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুদ্ধ করি-বার চেষ্টা করা আবশ্যক। পীড়িত দেহ-কেও ঐ উপায়ে রোগমুক্ত করিতে হয়। মানসিক পীড়া নানাবিধ। রোগ, শোক, অত্যাচার, অভাব ও মত্ততা ইত্যাদি নানা-বিধ কারণে মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ইহা-দিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা অত্যা-বশ্যক। কর্ম্ম সহজ বৃত্তি। ইহার অনু-ষ্ঠানও স্বায়ত্ত থাকা প্রয়োজন। কর্ম্ম-পরিবশ হইলে দৈহিক ও মানসিক জড়তা উৎপন্ন হয়।

দাসত্ব ও প্রভুত্ব, উভয়ই দেহ এবং মনের অবসাদক। প্রত্যেক সমাজ স্ব-চালিত থাকিলে সুস্থ থাকিবার আশা করিতে পারে।

মানবে মানব-প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। তাহাদিগের কর্ম্ম প্রবৃত্তিও পৃথক। কর্ম্মানু-সারে সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে। ইহা অনিবার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিলে, কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়; সামাজিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং সমাজ মধ্যে অন্তর্জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীতা কমাইতে হইবে। কিন্তু প্রতি-দ্বন্দ্বীতা যেটুকু অনিবার্য্য, তাহা প্রধানতঃ অপর সমাজের সহিত সীমাবদ্ধ থাকিলেও তাদৃশ দোষাবহ হয় না। কিন্তু কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীতা না থাকিলেও সমাজ অবসন্ন হইয়া পড়ে। নিম্নশ্রেণীস্থ জীবমধ্যে প্রাকৃ-তিক নির্ব্বাচন এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা রক্ষা করে। তন্নিবন্ধন যোগ্যতমের জয় হয়। কিন্তু উন্নত মানব সমাজে তাহা হইতে পারে না। এ নি-মিত্ত মানব সমাজে সামাজিক নির্ব্বাচন ঐ কার্য্য সাধন করে। যে সমাজে তদ্রূপ হয় না, তথায় দ্রুতবেগে অবসাদ আসিয়া উপ-স্থিত হয়। ভাল মন্দ, যোগ্য অযোগ্য বিচার অত্যাবশ্যক। এ বিচার না থাকিলে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা হয় না, সব অবসন্ন হইয়া পড়ে। যোগ্যের যোগ্যত্ব রক্ষা করিতে হইলে নির্ব্বা-চন (যে কোনরূপ) আবশ্যক। কিন্তু প্রাকৃ-তিক নির্ব্বাচন মানব আর স্বীকার করিবে না; সুতরাং সামাজিক নির্ব্বাচনই একমাত্র পন্থা। সমাজের অনুষ্ঠান আচরণ, মঙ্গল-জনক কি অমঙ্গলজনক—ইহার একমাত্র উত্তরই এই যে, উহা সামাজিক নির্ব্বাচনের সহায়ক কি না? যদি উহা দ্বারা দেহে ও মনে যোগ্য ব্যক্তিগণের আহার সংস্থান ও অপত্যোৎপাদনের বেশী সুবিধা হইল, অযোগ্যগণের তাদৃশ সুবিধা হইল না, তবে উহা মঙ্গলজনক হইতে পারে। নচেৎ না হইতে পারে। *

জীবন সংগ্রাম অপরিহার্য্য; নচেৎ জীবের জড়তা হইতে নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু

* Sabeby's Parenthood and Race Culture.

মানবেতর জীব রাজ্যে ঐ সংগ্রাম নখ দন্তাঘাতে অনুষ্ঠিত হয়। মানব সমাজে তদ্রূপ হইতে পারে না। মানবের উন্নত বুদ্ধি, উন্নত চিত্ত বৃত্তি, জীবন সংগ্রামকে মনোরাজ্যে লইয়া গিয়াছে। যে সমাজ মনের গুণে বড়, সে-ই বড় হইতেছে। দেহের আদর কমিয়া আসিতেছে।† তবে মনের উৎকর্ষও দেহানুগত। সেই হিসাবে দেহ তুচ্ছ করিবার নহে। মনই প্রধান। দেহ যদি উন্নতি অবনতির নিয়মাধীন হইত, তবে ক্ষুদ্রকায় দুর্ব্বল মানব জীব রাজ্যের রাজা হইত না।

নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণ মধ্যেও জীবন-সংগ্রামই যে সর্ব্বদা জয়যুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। প্রেম, মৈত্রী ইত্যাদি সদ্‌গুণ সকল জীববিবর্ত্তনের কম সহায়তা করে নাই। ক্রোপট্‌কিন তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থে‡ বিশদরূপে দেখাইয়াছেন যে, যে সকল জীব পরস্পরের সহায়তা করিয়া আহার সংগ্রহের ও বিপদ মোচনের উপায় করিয়াছে, যাহারা পরস্পরের উপকারের নিমিত্ত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা জীবরাজ্যে অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে; তাহারা বংশবৃদ্ধি ও আহার লাভ করিয়াছে, তাহারা বুদ্ধি বৃত্তিতেও হীন হইয়া রহে নাই। তাহারা দল অথবা সমাজ গঠিত করিয়া তাহার সাহায্যে বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছে। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পিপীলিকা। কীট, পক্ষী, পশু, সকলের মধ্যেই এ নিয়মের দেখা যায়। পরস্পরের সহায়তায় জীবের যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা জীবন-সংগ্রাম অপেক্ষা কম জয়যুক্ত নহে। মানব সমাজে জীবন সংগ্রামের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। যদিও যুদ্ধ বিগ্রহ কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না, তথাপি প্রতিদ্বন্দ্বীতা অন্য আকার ধারণ করিবে, এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ন্যায়ের, ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ধীরে ধীরে জীবন-সংগ্রামকে পবিত্রতর আকার দিতেছে। যাহা সমাজের মঙ্গলজনক, তাহা সৎ, তাহা অনুষ্ঠেয়। যে সমাজ এই তত্ত্ব অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, এবং তদ্ধেতু সমাজের মঙ্গলকে প্রধান লক্ষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে, সে সমাজ উন্নতির পথে অধিকতর অগ্রসর হইতেছে। যে সমাজের নরনারী মিলিত হইয়া সুযোগ্য অপত্য অধিকতর সংখ্যায় উৎপন্ন করিতেছে, তাহাই জগতে অগ্রগণ্য হইতেছে। যে সমাজে সমাজদ্রোহীর এবং অযোগ্যগণের সংখ্যা অধিক, তাহা অধঃপতিত হইতেছে। এইরূপে সামাজিক নির্দ্ধারণ অযোগ্য সমাজকে চিরতরে ধরাপৃষ্ঠা হইতে অপসৃত করিতেছে। আর যে সমাজ মঙ্গলজনক কর্ম্মে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহাই জয়যুক্ত হইতেছে। এইরূপে বিধাতা অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

যাহারা যোগ্য হইয়াছে, তাহারা যোগ্য হইবার উপযুক্ত ছিল, ইহা নিশ্চয়। যাহারা বংশ বৃদ্ধি করত, আহার সংগ্রহ করত জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা তদ্রূপ হইবার যোগ্য ছিল। যাহারা প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক নির্দ্ধারণ বশতঃ নীচে

---

† The future struggle for supremacy * * will be contests between minds, and muscles will be at a discount. Nature 9th May, 1902, p 36.

‡ Kropatkin's Mutual Aid as a factor of Evolution.

পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা নীচে রহিবারই যোগ্য। একথা প্রায় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। নিকৃষ্টগণ মধ্যেও কখন কখন উৎকৃষ্ট যোগ সম্বন্ধ বশতঃ উৎকৃষ্ট অপত্য জাত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সুশিক্ষা ও সুসংসর্গ দিলে তাহারাও উন্নত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থল অধিক নহে। তাই চিরাতীত কাল হইতে যাহারা নিকৃষ্ট অথবা অকৃতী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে উন্নত করিবার আশা কম। উন্নতদিগের সহিত তাহাদিগের যৌন সম্বন্ধ ঘটাইলে, তাহারা কিছু উন্নত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে সমাজ ঐ উন্নত ব্যক্তিগণের সংখ্যা অধিক দিন স্থির রাখিতে সক্ষম হইবে না। ইহাতে সমাজ অত্যন্ত ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে পারে। এই নিমিত্তই যোগ্য-গণকে পৃথক রাখাই সাধারণ নিয়ম হওয়া উচিত। তবে কখন কখন নিম্ন শ্রেণী হইতেও উপযুক্ত ব্যক্তি সমাজে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থাও থাকা উচিত। এতদ্দেশে তাহা ছিলও।

শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমাজের স্থায়ী উন্নতি বিধান করিতে পারে না। বংশগত উপকরণ অনুকূল না থাকিলে শিক্ষা দেওয়াও যায় না। সকলে শিক্ষা পাইবার যোগ্যই নহে। বরং সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিলে হিত অপেক্ষা অহিতই হইবার বেশী সম্ভব। কারণ, সাধারণের মধ্যে দেহে ও মনে অবনত ব্যক্তিই অধিক, তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে আহার সংস্থানের ও বংশ বৃদ্ধির অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সমাজকে আরও অধঃপতিত করে *। এস্থলে শিক্ষা বলিতে অধুনা আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, সেই পুস্তকগত বিদ্যা। নতুবা প্রত্যেক সামাজিক ব্যক্তিই স্বাস্থ্য রক্ষার ও জীবন ধারণের উপযোগী যে সকল সদুপায় সমাজের বহু দর্শন হইতে লাভ করে, অথবা পরিবারের ও সমাজের মঙ্গল সাধন নিমিত্ত যে সকল সরল ও সহজ নীতি ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করে, তাহা বুঝিতে হইবে না। তাহা সকলেরই আয়ত্ত হওয়া উচিত। বংশগুণে উন্নত ব্যক্তিরাই উচ্চ শিক্ষার অধিকারী হইবে। অপরের জীবন ধারণ ও বংশ বৃদ্ধির উপযোগী শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক। উচ্চ শিক্ষিতগণ সমাজকে উন্নত করিবার বিধি ব্যবস্থা রচনা করিবেন, অপরে তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্য হইলেই যথেষ্ট হয়।

সমাজ রক্ষা ও সমাজের উন্নতি করিতে হইলে প্রেম, ও ত্যাগ-প্রধান ধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। দেশপ্রীতি না থাকিলেও সমাজ চলে, থাকিলে উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ইহুদী জাতি। কিন্তু সমাজপ্রীতি না থাকিলে সমাজ চলিতেই পারে না। সমাজ-প্রীতির অভাবে ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হয়, প্রেম ও ত্যাগ অসম্ভব হইয়া উঠে। সে সমাজ কখনই আত্মরক্ষা অথবা উন্নতি করিতে সমর্থ হয় না।

অবশেষে, সমাজ তত্ত্বের প্রথম ও শেষ কথা ব্যক্তি। ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। ব্যক্তির উন্নতি হইলেই সমাজ উন্নত হইল;

* The effects of special case given to the weakly or feeble minded may be absolutely harmful to the race, if the improvement so effected leads to more frequent marriage among rich unfortunates than would otherwise be the case.—Doncaster's Heredity th 50—51.

অবনতি হইলেই অবনত হইল। ব্যক্তি পিতৃমাতৃজ এবং বংশানুক্রমের ফল। সুতরাং যোগ্য নরনারী, যাহাদিগের বংশে সচ্চরিত্র, সুস্থ, দীর্ঘায়ু ও কৃতী নর নারীর জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে বিবাহিত করিয়া যোগ্য বংশধরের উৎপাদন, এবং অযোগ্যগণের অপত্যোৎপাদনে বাধা প্রদান—এই দুই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়াই সমাজ পরিচালন করিতে হয়; এই সূত্র হারাইলে সমাজবন্ধন থাকিতেই পারে না। বিবাহ বিষয়ে যথাযোগ্য বিধি নিষেধ প্রণয়ন করা ও সমাজ মধ্যে যে সকল প্রচলন করা অতিশয় কঠিন কার্য্য, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া বোধ হয় অসম্ভব; তথাপিও যে জাতি সর্ব্বাগ্রে এই সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে, সেই মানব সমাজের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। * আর যাহারা যেন-তেন-প্রকারেন বিবাহ ব্যাপার সমাধা করিয়া লইতেছে, অথবা লইবে, কিম্বা এক রক্তই পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত করিতে থাকিবে, তাহাদিগের অধঃপতন নিবারণ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তাহারা শিক্ষা ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন যে ভাবেই করুক না কেন, ও সকলে বিশেষ কোন ফল লাভের আশা করা যায় না। † বংশানুক্রমে জ্ঞান ও কর্ম্মে সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এই কথা প্রণিধান না করিয়া পুরাকালে কত কত উন্নত জাতি অধঃপতিত হইয়াছে; বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা, শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই তাহাদিগকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা মানুষ গড়িতে জানে নাই; তাই সমাজ রক্ষা করিবে কে? বর্ত্তমান যুগে জীবতত্ত্বের আলোচনা যুগপৎ যেরূপ দ্রুতবেগে চলিতেছে, তাহাতে মানব গঠন অনতিবিলম্বেই সাধারণের জ্ঞানগোচর হইবে, এমন আশা করা যায়। অন্যত্র এই বিষয়ে যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, এতদ্দেশে তাহার বিন্দুমাত্রও আরম্ভ হয় নাই, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। আশা করি, মানবতত্ত্ব সুতরাং সমাজতত্ত্ব শাস্ত্র এতদ্দেশে সর্ব্বত্র আদৃত ও আলোচিত হইবে। প্রকৃত সংস্কারের পথ উদ্ঘাটিত ও প্রদর্শিত হইলে মানব যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও কৃতার্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

---

* There is little doubt that the nation which first finds a way, to make them practical will in a very short time be the leader of the world —Ibid p 51.

† How little room is left in the development of the individual for the effects of environment even on the intellect or mind in the broadest sense of the word. Ibid p 50.

উপন্যাসে রমেশচন্দ্র।

ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল"ই বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনীই বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রথম উপন্যাস। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম নিজে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মন প্রাণ সমর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার কৃতি সন্তানদেরও সেই পথ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধেই, যে সময় তাঁহার "চন্দ্রশেখর" "বঙ্গদর্শনে" নিয়মিত রূপে বাহির হইতেছিল,রমেশচন্দ্রের"বঙ্গবিজেতা"ও ঠিক সেই সময়ে অন্য এক মাসিক পত্রিকায় বাহির হইতে থাকে। গুণী, গুণীর গুণ প্রথম দর্শনেই বুঝিতে পারেন। প্রতিভাশালীর নিকট অপরের প্রতিভা গোপন থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের প্রতিভা দর্শনে স্তম্ভিত হন, সেই প্রতিভার প্রথম নিদর্শন পাইয়াই তিনি লিখিয়াছিলেন :—"I am crowding my canvas with characters—it wo'nt do for a veteran like me to be beaten by a youngster."

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রধান ও মূল উদ্দেশ্যই জাতীয় চরিত্র গঠন, এবং সেই চরিত্র ধর্ম্ম ভিত্তির উপর স্থাপিত করা। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহার সে চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। তিনি আধুনিক বঙ্গীয় সমাজ বিশ্লেষণ করিয়া 'সংসার' ও 'সমাজ' লিখিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমি কোন প্রতিভাশালী লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"সংসার" ও "সমাজ" তিনি সামাজিক বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য রচনা করিয়াছেন। খুব উচ্চদরের না হইলেও, উপন্যাস দুইখানা বাঙ্গালা ভাষায় উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—সরল, সতেজ ও উপভোগযোগ্য—পড়িতে মন কখন ক্লান্ত হয় না, এবং কোথাও মনে হয় না—গ্রন্থকার কাহার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন, অথবা মিথ্যা চিত্র আঁকিয়াছেন"।

নৈতিক চরিত্রের বল ও পুরস্কার তিনি হেমচন্দ্র ও বিন্দুর চরিত্রে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। চরিত্র-বলে লোক সংসারে কিরূপ অপূর্ব্ব সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তাহা আমরা হেম ও বিন্দুর চরিত্রে দেখিয়াছি। মত ও উদ্দেশ্য বিষয়ে ভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ চরিত্র যে চিত্তাকর্ষক ও পবিত্র, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

রমেশ বাবুর রমাপ্রসাদ-চরিত্র বড়ই বিস্ময়কর,এরূপ চরিত্র-তেজ অনেকের পক্ষেই অসহনীয়। পেচকের পক্ষে বিমল সূর্য্য-কিরণ অসহনীয়। ঘোর অন্ধকারময়ী পর্ব্বতকন্দর হইতে বাহির হইয়া সুন্দর দীপাবলি-সজ্জিত প্রভাময়ী গৃহে হঠাৎ উপস্থিত হইলে দর্শকের চক্ষু ঝাঁজিয়া যায়, আলো যেন প্রথমতঃ তাহার পক্ষে অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। সেই জন্যই চীনবাসী চিংভ্যাঙ্গ অন্ধকারময়ী কারা কন্দর হইতে বাহির হইয়া আবার সেই কারাগারে অবস্থানই প্রার্থনা

করিয়াছিল। সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তির নিকট অত্যুদার রমাপ্রসাদ-চরিত্রও সেই প্রকার। আমরা বলিব, রমাপ্রসাদের ন্যায় চিত্র অঙ্কিত করার সময় প্রথম দৃশ্যে বোধ হয় যেন এখনও উপস্থিত হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ চিত্র বাঙ্গালীর চরিত্র গঠনে বড়ই আবশ্যক। 'সংসারে' ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের দোষ গুণ তিনি অতি বিশদ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এরূপ ভাবে অঙ্গুলি নিদর্শনে সাধারণলভ্য দোষ গুণ প্রদর্শন করিবার শক্তি আজকাল বড় অল্প লেখকেরই আছে। হিন্দু রমণী বিলাস-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ ভাবে অতুল দাম্পত্য সুখ ভোগ করেন, আবার কষ্টে পড়িলে কিরূপে সেই কষ্ট সহ্য করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা আমরা বিন্দুর মাতার চরিত্রে দেখিতে পাইয়াছি, আর চিন্তা করিয়াছি, বঙ্গনারীর হৃদয় কিরূপ বিচিত্র, মহিমাময়ী ও পবিত্র।

আমরা কন্যার বিবাহ দিবার সময় প্রায় পাত্রের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করি না। পাত্রের অবস্থা ও বংশ-মর্য্যাদার দিকে আমাদের প্রধান দৃষ্টি থাকে; তাহাতে যে কি বিষম ফল ফলে, তাহা কবি উমাতারা ও কালীতারার জীবনে দেখাইয়াছেন। উমাতারা বড় মানুষের পত্নী। পতি বড় মানুষ ও চরিত্রহীন। তিনি উমাতারার সম্মুখেই বিলাসিনী লইয়া অযথা বিলাস-সাগরে নিমগ্ন। উমার কোমল হৃদয়ে তাহা আর সহ্য হইল না। হতভাগিনী অকালে মনোবেদনায় ও হতাশ প্রেমে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হায়! বাঙ্গালী গৃহে এই প্রকার কত লক্ষ্মী-স্বরূপা পতিপরায়ণা রমণীরত্ন যে দিবারাত্রি অশ্রুপাত করিয়া কাল কাটাইতেছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? কালীতারা সমাজের বিধানে বংশমর্য্যাদার কৃত্রিম গৌরব রক্ষার্থ বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির পত্নী। অশিক্ষিত একান্নভুক্ত পরিবারে যত কিছু দোষ থাকার সম্ভব, তাঁহার স্বামী গৃহে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। রমেশ বাবু অতি বিচক্ষণতার সহিত কালীতারার স্বামী গৃহে তাহা দেখাইয়াছেন। কালীতারা শেষে বিধবা ও পার্থিব সুখে বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার পতিভক্তির হ্রস্বতা কখন লক্ষিত হয় নাই। আর্য্যস্ত্রীর পতিভক্তি অদ্বিতীয়া। পতির ভাল মন্দ গুণের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু তাঁহাদের পতি-প্রেম অগাধ বারিধিবৎ সুগভীর। আর্য্যসমাজ ভিন্ন এরূপ অবিচার্য্য প্রতি-প্রেম সুদুর্ল্লভ। আমরা রমেশ বাবুর নিজ উক্তিতেই কালীতারার একটী ভীষণ মধুর দৃশ্য দেখাইতেছি :—

"তখন কালীতারা একবার স্বামীকে দেখিব বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শরচ্চন্দ্র সেটী নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। আলুথালু বেশে, মুক্ত-কেশে শোক-বিহ্বলা কালীতারা স্বামীর ঘরে দৌড়িয়া গেলেন; মৃত স্বামীর চরণ দুটী মস্তকে স্থাপন করিয়া ক্রন্দন ধ্বনিতে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। কালীতারা স্বামীর প্রণয় কখনও জানে নাই, অদ্য সে প্রণয়টী জানিল, শূন্যহৃদয় বিধবা অসহ্য যাতনায় স্বামীপদে বারম্বার লুণ্ঠিতা হইয়া অভাগিনীর কান্না কাঁদিতে লাগিল। একবার করিয়া মৃত স্বামীর মুখমণ্ডল দেখে, আর একবার করিয়া হৃদয় উথলিয়া উঠে, রোদনে তাঁহার শান্তি হয়, ক্ষণেক পর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।"

সংসারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সাত্ত্বিক, রাজসিক

ও তামসিক। পূর্ব্বে আমাদের আর্য্য সমাজ সাত্বিকতার পূর্ণ আদর্শ ছিল। তাঁহারা বিলাস-বাসনা জানিতেন না। জিতেন্দ্রিয়তা ও সংযম তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ ছিল। আবার এখনকার মত তাঁহাদের গৌরীদানের ফল-লাভ করার আশাও তত প্রবল হয় নাই। মনুর মতানুযায়ী তাঁহারা উপযুক্ত পাত্রের অভাবে কন্যাদের যাবজ্জীবন অবিবাহিতা রাখিতেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না, কাজেই তখন বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু এখন সমাজ, রাজ ও তামসিক ভাবে ঘোর উন্মত্ত। বিকট বিলাস-বাসনার ঘোর তাণ্ডব নৃত্য চারিদিকে বিরাজিত। সাত্বিকতা বা সংযম সমাজ হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশৎ বর্ষীয় বৃদ্ধ পিতা মাতাও যুবজনোচিত বিলাসে উন্মত্ত। ভোগবিলাসী ভ্রাতা ভগিনী বিলাস সাগরে নিমগ্ন। আজীবন বিলাসিতার মধ্যে পালিতা বালিকাকে হঠাৎ একদিনে ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চতর শৃঙ্গে স্থাপিত করিতে চাহিলে তো তাঁহার পতন নিতান্ত স্বাভাবিক। সেই জন্য যেন মানব-হৃদয়-দর্শী রমেশ বাবু প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে, তোমরা সংযমী হও, বিলাস বাসনা রূপ জাতি-ধ্বংসকর উদ্দাম প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর—বাল্যকাল হইতে ইন্দ্রিয়জয়ী হও। নিজ সন্তান সন্ততিগণকে সেই ভাবে শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত কর। সর্ব্ব বিষয়ে তোমরা সংযমী ও জিতেন্দ্রিয়তার আদর্শ হও ও "নবমবর্ষে ভবেৎ গৌরী" শ্লোক ভুলিয়া গিয়া মনুর উদার মতের পথিক হও। সাধারণে শাস্ত্র জ্ঞান প্রচার কর। তখন দেখিবে যে "উষা" আর বিবাহ করিতে যাইবে না। হেমচন্দ্র ও বিন্দুর সে বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না। সূক্ষ্মদর্শী কবিরও অসন্তোষ উৎপাদনের কারণ হইতে হইবে না। তাই বলি, তিন্তিড়ী বলিয়া রসালের আশা পরিত্যাগ কর। অন্যথা তিন্তিড়ীর অম্বল পাক করিয়া খাও। রমেশ বাবুর কথাও এই। কবি বৃথা লিখনী ধারণ করেন নাই। কবি হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াই তারিণী বাবুর এক পত্নী সত্বেও ধর্ম্মসঙ্গত বালিকা বিবাহ ও কচি বিধবা উষার পুনঃ স্বামী গ্রহণ চিত্রদ্বয় আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। পাঠক কবির হৃদগত চিত্র দেখিবার জন্য কি ধীরভাবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন? না—একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইবেন?

রমেশ বাবুর অবশিষ্ট উপন্যাস গুলিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা আমরা পরে দেখাইব। "বঙ্গবিজেতায়" বাস্তবিকই মোগল পাঠানের যুদ্ধকালীয় সামাজিক অবস্থা কবি যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইতেছেন। এই উপন্যাসে কবি পাপের ভয়ানক পরিণাম—শকুনী ও সতীশচন্দ্রের চিত্রে প্রদর্শন করাইতেছেন। শকুনী বাস্তবিকই সয়তানের জীবন্ত চিত্র। পাঠক এই চিত্রে শিক্ষার অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের যেরূপ অধঃপতন হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের শিক্ষার্থে চন্দ্রশেখর ও ইন্দ্রনাথের চিত্র সম্মুখে ধরা বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে, এরূপ চিত্র আজ কাল বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই শিক্ষাপ্রদ। কবি চন্দ্রশেখরের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্রনাথের ন্যায় কায়স্থ সন্তানের আকাঙ্ক্ষী। ভগবান! বাঙ্গালার কি এমন দিন হইবে, যখন আমরা চন্দ্রশেখরের ন্যায় পরম সাত্বিক ব্রাহ্মণ

সন্তান ও ইন্দ্রনাথের ন্যায় স্বধর্ম্মপরায়ণ কায়স্থ সন্তান দেখিতে পাইব। যিনি রমেশচন্দ্রের মত ভ্রমপূর্ণ মনে করেন, তিনি রমেশ চন্দ্রের মতের দোষ ধরিবার পূর্ব্বে একবার নির্জ্জনে তাঁহার উদ্দেশ্য কত মহৎ এবং আকাঙ্ক্ষা কত উচ্চ ও পবিত্র, তাহা যেন চিন্তা করিয়া দেখেন।

মহাশ্বেতা কবির আর একটী বৈচিত্র্যময়ী ছবি। কোমলে এমন কাঠিন্য, নিস্পৃহতায় এমন আবেগময়ী আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মত্যাগীর এমন কর্ম্ম-স্পৃহা সংসারে তো বড়ই দুর্লভ। যাঁহার সংসারে এক প্রকার কোন আশা বা স্পৃহা নাই, তাঁহার কোমল হৃদয়ে এমন কঠোর নির্য্যাতন-স্পৃহা কেমন বিচিত্র। তাহার কোমল হৃদয় যেন একমাত্র কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। যেই তাঁহার কর্ম্ম শেষ, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইহলীলার অবসান। *

কবির সতীশ-তনয়া যেন একটী বাসন্তিক ফুটোন্মুখ গোলাপ। হায়, দৈব বিড়ম্বনায় এ গোলাপ ফুটিয়া সম্পূর্ণ আনন্দময়ী সুবাস বিতরণ করিবার অবকাশ পায় নাই। পুরুষকার দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের আবির্ভাব দেখাইয়া ভক্ত হৃদয় বিগলিত করিয়াছেন। আর আমাদের কবি সতীশতনয়াতে স্বর্গীয় গুণরাশির বিকাশ করিয়া পাঠকের হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া রচনা-বৈচিত্র্যের মনোহর চিত্র আঁকিয়াছেন।

"জীবন-প্রভাত" ও "জীবন-সন্ধ্যা" দুই খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের বিষয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমন হৃদয়-উন্মাদকারী উপন্যাস লেখার শক্তি আজ কাল বড় অল্প লেখকেরই আছে। জীবন-প্রভাত বা মহারাষ্ট্র, জাতির প্রথম উত্থান। এইরূপ জাতীয় উন্নতির সময় দেখা যায় যে, লোক দেশের জন্য বিপদ, বিসম্বাদ, হিংসা ও স্বার্থ ভুলিয়া স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত। তাহাই কবি বিশেষ ভাবে আমাদিগকে দেখাইতেছেন। প্রত্যেক চিত্রেই আমরা কি যেন এক হৃদয়-উন্মাদকারী পবিত্র ভাব দেখিতে পাই। আবার "জীবন-সন্ধ্যায়" আমরা সেইরূপ দেশ-ভক্তি, দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ, অতুল বীরত্ব, এ সমস্তই দেখিতে পাই—আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন পরস্পরের মধ্যে বৈরিভাব, চরিত্রহীনতার ভাবও লক্ষিত হয়। সেই জন্য দুর্জ্জয় সিংহ ও তেজ সিংহের মধ্যে বৈরভাব দৃষ্ট হয়। কবি যেন উন্নতির ও পতনের রেখা স্পষ্টতররূপে দেখাইতেছেন। জীবন-প্রভাতের রঘুনাথ রায়ের বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগ ও স্বামী-ধর্ম্ম বাস্তবিকই অনুকরণের যোগ্য। কবির চন্দ্র রায় একটী বিচিত্র চিত্র। এমন জিঘাংসা-পরিপূরিত বা প্রতিহিংসার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি অতি বিরল। এই পাপের যে কি ভয়ানক পরিণাম ও জীবনব্যাপী কি হৃদয়-দগ্ধ-কারী শক্তি, তাহাও কবি সঙ্গে সঙ্গেই প্রদর্শন করাইয়াছেন। লক্ষ্মী-চিত্র বড় মনোমুগ্ধকর। কবি লক্ষ্মীর চিত্রে দেখাইয়াছেন যে, আর্য্য নারীর পতি যতই পাপী হউক, সে কিন্তু আর্য্য পত্নীর পক্ষে দেবতা; জীবনের এক মাত্র ধ্রুবতারা, ও ইহসংসারের এক মাত্র অবলম্বন। আর্য্য নারী ভাল বলিয়া স্বামী অঙ্কশায়িনী হন না। স্বামী-অঙ্কশায়িনী হইয়া কি যেন অপার্থিব পতিপ্রেমে আত্মহারা হন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, আর্য্য-নারী ভিন্ন এমন গভীর অবিচার্য্য প্রেম অন্য কোথাও নাই। স্বামীর কার্য্য সতী নারীর পক্ষে অবিচার্য্য,

তাহা না হইলে কবি চন্দ্র রায়ের ন্যায় স্বামীর চিতার পার্শ্বে কখন লক্ষ্মীর স্থান নির্দ্দেশ করিতেন না।

শাস্ত্রদর্শী উদার রাজনীতিজ্ঞ জয় সিংহের প্রতি উক্তিগুলি সকলের পক্ষে সকল সময়ে স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়ে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত। এখানে তাহার একটু নিদর্শন দিলাম ;—

"সত্য পালনে যদি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনে হইবে ? বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতা-বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে হইবে ?"

ভীল কুমারীর চিত্রে কবি বড়ই কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এমন স্বভাবজাত বন-মল্লিকার এমন সুবাস চারিদিকে বিস্তার করিতে বড় অল্প লোকেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই ভীল কুমারীর প্রত্যেক উক্তিই যেন কেমন সরল ও হৃদয়-উন্মাদকারী। তাহার কথাগুলি যেন হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে। মন যেন তাহাতে কেমন এক অপার্থিব অমিয় রসে অভিষিক্ত হয়। তাহার চরিত্র দেখিয়া যেন স্বতঃই কবিবর Wordsworth সাহেবের Lucy Grey এর কথা মনে পড়ে,—

The sweetest thing that ever grow
Beside the human door.

সেই বনপুষ্প বনে জন্মিয়া বনেই বিশুষ্ক হইল। সেই বনলতা উদ্যানলতা হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সংসারের কুটিলতা দেখিয়া সে আশা পরিত্যাগ করিল। প্রকৃতির দুহিতা প্রকৃতির ক্রোড়েই খেলা করিয়া প্রকৃতি-হৃদয় প্রতিধ্বনিত করত প্রকৃতি-কোলে শায়িত হইল। এই ভীল কন্যার চিত্র বঙ্কিম বাবুর আয়েসার চিত্রের সহিত তুলনীয়া। তবে একটী অযত্ন-লব্ধ বনবল্লরী ও অন্যটী অযত্ন-লব্ধ উদ্যান-লতিকা।

কবির "মাধবী-কঙ্কণ" আর একখানি উচ্চদরের উপন্যাস। এক বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" ছাড়িয়া দিলে এমন উচ্চাঙ্গের ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালায় আর নাই। এই উপন্যাসে অনেকাংশে বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" ও "রজনীর" সমকক্ষ আমরা কয়েকটী চিত্র তুলনা করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা পাইব। এই উপন্যাস খানি ইংরাজ কবি টেনিসন কৃত 'ইনাক্ আর্ডেন' নামক উপন্যাসের ছায়া অবলম্বন করিয়া লিখিত, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ইহাতে পাশ্চাত্য ছায়া কিছুমাত্র পড়ে নাই। সর্ব্বাংশেই হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া লিখিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের দরিয়া আর রমেশচন্দ্রের জেলেখা চিত্রের মধ্যে চমৎকার সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রেমে আত্মহারা ; মন, প্রাণ নিজ নিজ নায়কের প্রতি অর্পণ করিয়াছিল। সেই প্রেম লাভার্থ তাহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছে। একই উদ্দেশ্য, হৃদয়-বল্লভের প্রেমাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু উভয়েই বিড়ম্বিত ও পরিত্যক্ত। শেষে উভয়ের ভালবাসা প্রতিহিংসায় পরিণত। কিন্তু জেলাখার স্বামী-প্রেম দরিয়ার স্বামী-প্রেমের ন্যায় প্রতিহিংসার প্রবল তাড়নে ভাসিয়া যায় নাই। তাই জেলেখার হস্ত হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা কার্য্যকালে স্খলিত, কিন্তু দরিয়ার বন্দুকের গোলায় মবারকের শির বিচূর্ণিত। যে প্রেমিকা হতাশ-প্রেমে প্রেমের পাত্রকে ধ্বংস করে, তাহার

প্রেম অপেক্ষা, যে প্রেমিকা প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ করে, আমরা যেন তাহারই পক্ষপাতী।

এখন আমরা হেমলতা ও শৈবলিনীর চরিত্রের তুলনা করিব। শৈবলিনী আশৈশব প্রতাপের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী, আর হেমলতা শিশুকাল হইতে নগেন্দ্রের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী। ঘটনা-স্রোতে উভয়েই নিজ নিজ প্রেমের পাত্রকে লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া হৃদয় হইতে কেহই নিজ নিজ প্রেমিকের মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হন নাই। হেমলতা বুঝিল, হিন্দুললনার স্বামীই দেবতা, স্বামী ভিন্ন অন্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হওয়া মহাপাপ। শেষে তিনি হৃদয়ের চিরপোষিত প্রেম-স্রোত অন্যপথে ফিরাইতে সমর্থা। কিন্তু শৈবলিনী বাল্যকালের আবেগময়ী প্রেম-স্রোত আর ফিরাইতে পারিলেন না। নিজ চিত্ত বহু কষ্টেও বসে আনিতে পারিলেন না, সেই জন্যই তিনি প্রতাপকে বলিতেছেন :—

প্রতাপ—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবারে সুখী হও?

শৈবলিনী—আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।

প্রতাপ—সে কি শৈবলিনী?

শৈবলিনী—যতদিন তুমি এই পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে, জানি না। এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না?

হেমলতাও বাল্য প্রেম আর ভুলিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দু ললনা, স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্বামী-প্রেমে চিন্তা করা তাঁহার নিকট পাপ। তাই নরেন্দ্রকে যে প্রেমের চক্ষে দেখিতেছিলেন, সেই প্রেমের চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। সেই প্রেম তাঁহার ভ্রাতৃপ্রেমে পরিণত হইল। অবশ্যই প্রেমের এক পথ প্রবাহিত স্রোতকে ভিন্ন পথে চালিত করিতে তাঁহার হৃদয়ের শেষ শোণিত বিন্দু পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়াছিল, তথাপি সতী রমণী অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে সমর্থা হইয়াছেন বলিয়া তিনি রাজসিক প্রেমপূর্ণ শৈবলিনীর ন্যায় বলেন নাই—"এজন্মে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না।" তিনি নরেন্দ্রকে স্বামীর অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়া চির জীবন কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় নরেন্দ্রের চরণ-পূজা করিতে চাহিতেছেন!

"হেম—বিধাতা যদি অন্যরূপ ঘটাইতেন, তবে আমাদের জীবন অন্যরূপ হইত, বাল্যকালের স্বপ্ন সফল হইত। জীবিত থাকিতে তোমাকে বিস্মৃত হইব না, চিরকাল সহোদরের ন্যায় তোমার কথা ভাবিব। কিন্তু এই কঙ্কণ অন্য প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ আমাকে দিয়াছিলে, নরেন্দ্র, আমি সে প্রণয়ের অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, মনে ক্লেশ বোধ করিও না। আমি এই কয়বৎসর এককঙ্কণটী পূজা করিয়াছি, হৃদয়ে রাখিয়াছি, উহা ত্যাগ করিতে আমার যত কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না। কিন্তু উটী উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই, আমি অবিশ্বাসিনী পত্নী নহি"।

শৈবলিনীর সঙ্গে বিদায় কালে বঙ্কিম বাবু কিন্তু এমন হৃদয়-উন্মাদকারী মর্ম্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। এস্থলে রমেশ বাবুর চিত্র অতুলনীয়।

বাস্তবিকই নরেন্দ্র ও হেমলতার বিচ্ছেদ-দৃশ্য বড় চিত্ত-উদ্বেলকারী ও না ভুলিবার জিনিষ :—

"উভয়েরই পূর্ব্ব কথা মনে আসিতে লাগিল, উভয়ের হৃদয় বিষাদ ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল।" কেন তাহাদের হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হইল? তাহা আমরা বঙ্কিম বাবুর কথায় পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।

"স্ত্রী বিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর, মর্ম্মভেদী। যে কেহ স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্য ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন-সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভালবাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু,—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে ত্যাগ করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা, ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে, পত্নী বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা!"

যদিও হেমলতা নরেন্দ্রের বিবাহিত স্ত্রী নহে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে আজীবন স্ত্রীর স্থান পূরণ করিয়াছিল, হেমলতা তাঁহার জীবনের প্রেমের আদর্শের পবিত্র প্রতিমা। এই হৃদয় বিমোহিনী প্রতিমা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবার সময় আজ তাহার হৃদয়গত ভাব কি, তাহা কি আবার বলিতে হইবে?

আবার হেমলতা ভাবিতেছেন,—"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিতে পারে না জানি। সান্তকে পারে। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃদয়-পিঞ্জরে শান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিস্কার রূপে শান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা।" সেই জন্যই হেমলতা আজ হৃদয়ের চিরপোষিত রত্নকে অন্য পথের পথিক করিতেছেন।

নরেন্দ্র-চরিত্রে কবি অনেক উপদেশ দিয়াছেন। অল্পে রাগী ও একগোঁয়ে চরিত্রের যে কি পরিণাম, তাহা তিনি নরেন্দ্রের দ্বারা বিশদ ভাবে দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, মাধবী-কঙ্কণ বিসর্জ্জনের কালেও তাহার রাজসিক ভাবজনিত বাসনার পরিসমাপ্তি হয় নাই, তাই তিনি হেমলতার কথার শেষ উত্তর দেন নাই। ক্রমে রাজসিক আগুনে জলিয়া তাঁহার হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হইল। হৃদয়ের বাসনা সমস্ত ভস্মীভূত হইল। কর্ম্মে আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি রহিল না। তাহার সান্ত প্রেম অনন্ত ভগবানের প্রতি ধাবিত হইল, সে রাজসিক নরেন্দ্রের লয়প্রাপ্তি হইল। সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিক নরেন্দ্রের আবির্ভাব হইল। হৃদয়ে ঐশ্বরিক বিভূতি প্রকাশ পাইল। রাজসিক ইচ্ছা, বাসনা ও আসক্তি দূরে পলায়ন করিল। সেই জন্য সন্ন্যাসী নরেন্দ্র অনায়াসে অক্ষুব্ধ হৃদয়ে হেমলতাকে বলিতে সমর্থ হইয়াছেন—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার দেবতুল্য স্বামীতে যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে, জন্মে মরণে যেন চির পতিব্রতা হইয়া থাক।"

জগতে বাসনা বা আসক্তি ত্যাগের ন্যায় কঠিনতর কার্য্য আর নাই। উহার নিকট দেহত্যাগ নগণ্য। তাই বলি, পাঠক এখন প্রতাপের আত্মত্যাগ ও নরেন্দ্রের আত্মত্যাগ বিষয়ে চিন্তা করুন এবং দেখুন কোন রূপ আত্ম ত্যাগ অধিকতর শোভনীয় ও শ্লাঘনীয়?

আমরা নরেন্দ্রকে হেমলতার হস্ত হইতে সেই বাল্য-প্রেম-বিধৌত মাধবীকঙ্কণ

বিমোচন করিবার দৃশ্য দেখিয়া প্রেম-বিহ্বলিত হৃদয়ে বলিতে পারি:—"বাসনা আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, কর্ম্ম আসিয়া ধর্ম্মকে ধরিয়াছে, প্রতিষ্ঠা আসিয়া বিসর্জ্জনকে ধরিয়াছে। নরেন্দ্র আসিয়া হেমলতাকে ধরিয়াছে। নরেন্দ্র, বাসনা আর হেমলতা বিসর্জ্জন, বাসনা যেন বিসর্জ্জনে বিসর্জ্জিত হইয়া শান্তি-রত্ন লাভ করিল।

উপসংহার।

আমরা দেখাইয়াছি যে, রমেশচন্দ্র বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন শাসনকর্ত্তা ও সুবিচারক এবং অপক্ষপাতী সর্ব্ববাদীসম্মত দেশনায়ক। ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে বঙ্কিম বাবুর নিম্নেই তাঁহার আসন। এখন আমরা দেখাইব, এক উপন্যাস মধ্যেই রমেশচন্দ্র কবি,নীতিবেত্তা,ঐতিহাসিক, দার্শনিক, নাটককার ও শাস্ত্র-প্রচারক।

রমেশচন্দ্রের কবিত্ব:—

"বনফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চায়।
ভালবাসার পুষ্পমালা ভূমিতে লুটায়।
উদ্যানে সুন্দর ফুল দেখে ধায় অলিকুল,
গন্ধশূন্য বন্যফুল ভূমিতে লুটায়!
গন্ধপুষ্প মনোলোভা হৃদয়ে নয়ন শোভা
কিবা গন্ধ কিবা আভা হৃদে স্থান পায়।
নীরবেতে বার বার বন্যফুল চাহে সার,
জীবন বিহনে তার জীবন শুকায়!"

রমেশচন্দ্রের নীতিজ্ঞান।

"চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, বিশেষতঃ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রদের গৌরব বৃদ্ধি অনিবার্য্য, বোধ হয়, তাহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয়, তাহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবে। কিন্তু শিবজী! অদ্য আপনি যে শিক্ষা দিতেছেন, এজাতি সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আমার কথার দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতার দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ কখন শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর ন্যায় ধর্ম্ম শিক্ষা দিন। অদ্য আপনি মন্দ শিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজপুতের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্মুখরণ শিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন। আপনি হিন্দু শ্রেষ্ঠ, আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমি শতবার ধন্যবাদ করিতেছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাষ্ট্র শিক্ষাগুরু, সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্য্যের ফল বহুবর্ষকাল-ব্যাপী ও বহুদেশ-ব্যাপী হইবে।"

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক ধারণা।

"No study has so potent an influence in forming a nation's mind as a critical and careful study of its past history."

দার্শনিক রমেশচন্দ্র।

জেতা ও বিজেতাদিগের মধ্যে কবে কোন দেশে সখ্যতা? বজ্র নখ যখন সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে, মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জ্জরিত শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে। এটা বিদ্রোহাচরণ, না স্বভাবের রীতি? কুকুর যখন খরগসকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগস প্রাণ রক্ষার জন্য কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্যদিকে যায়। এটা

সরস্বতী: ঠাকুর নিজ আবাসের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে কম্বল বিছাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার চারিদিকে তাঁহার কয়েক জন শিষ্য ও বন্ধুগণ বসিয়া শাস্ত্র শুনিতেছেন। প্রথমে ২।১ টী বেদগান গাইলেন, শিষ্যগণ যাহারা গাইতে জানিত, গুরুর সহিত তারস্বরে সেই অনন্তগীত গাইয়া নৈশ আকাশ সঙ্গীতে পূর্ণ করিল। গ্রামের গৃহে গৃহে সে শব্দ প্রবেশ করিল, মাতার ক্রোড়ে সুপ্ত বালক সে সঙ্গীত শুনিয়া নিদ্রাবশে হাসিল।"

রমেশচন্দ্র যে স্বদেশ-ভক্ত, তাহা তাঁহার "জীবন-প্রভাত" ও "জীবন-সন্ধ্যার" প্রতি ছত্রেই প্রকাশ পাইতেছে।

রমেশচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তাঁহার ব্রাহ্মণভক্তি ও ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতা গভীর। তিনি রমাপ্রসাদের মুখে উহা প্রকাশ করিতেছেন।

"তোমরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সন্তান হইয়া নিজ পৈতৃক ধন ভুলিয়াছিলে, সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তোমাদের সেই গচ্ছিত ধন রক্ষা করিয়াছেন। তোমরা যখন সুপ্ত ছিলে, ব্রাহ্মণেরা জাগরিত থাকিয়া সে শাস্ত্রধন রক্ষা করিয়াছেন, তোমরা যখন বেদ বেদান্ত ভুলিলে, ব্রাহ্মণেরা সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সেই বেদ বেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, শোকে, সন্তাপে ব্রাহ্মণেরা সেই অমূল্যধন রক্ষা রবিয়াছেন। জ্ঞান-প্রদীপ যখন ভারতবর্ষে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণহৃদয়ে সে প্রদীপ স্নিগ্ধ অবিনশ্বর তেজে জ্বলিতেছিল, আর্য্য ক্রিয়া, আর্য্য রীতি যখন আর্য্য প্রদেশে বিলুপ্ত, ব্রাহ্মণদিগের আচরণে ও অনুষ্ঠানে সেই রীতি ও ক্রিয়াকলাপ জীবিত ছিল।"

আবার তাঁহার Civilisation in Ancient Indiaতে লিখিয়াছেন:—

"Superficial and impulsive writers often hold the Brahmans of India to blame for monopolizing religious knowldege and observances and creating harmful and permanent disunion on the nation. The charge, however, is unphilosophical and unjust. Priestly supremacy and royal despotism are inevitable, when the people become enervated and feeble, and are incapable of taking care of their conscience or their political right."

রমেশচন্দ্রের হৃদয় যে কত মহান, কত উদার ও কত প্রেমিক ছিল, তাহা আমরা কয়েকটী উৎসর্গ পত্র হইতে দেখাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

তিনি সুরেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্যে লিখিতেছেন:—

"........অদ্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্রতী হইয়াছি, তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই।"

তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের উদ্দেশ্যে তিনি লিখিতেছেন:—

"........ইউরোপ হইতে তুমি নানা বিদ্যা, নানা ভাষা আহরণ করিয়া আসিয়াছ, তাহা যখন চিন্তা করি, তখনই আনন্দিত হই। কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষা অমূল্য রত্নের অধিকারী, সে রত্ন নির্ম্মল উদার চরিত্র, মন-সংযমে অসাধারণ ক্ষমতা, বিজ্ঞান চর্চ্চায় অনিন্দনীয় উৎসাহ ও জীবনব্যাপী চেষ্টা। এই অসাধারণ সদ্গুণ সমূহ দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন কর, ভ্রাতার এই মঙ্গলেচ্ছা।"

আবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের উদ্দেশ্যে লিখিতেছেন:—

"........জগৎ এ সকল কথা জানে না, এ কথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাই, ধন, মান, খ্যাতি ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উদ্যম দেখিতে পাই, এই চেষ্টায় ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া যাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া যাইতেছে। এ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋষিতুল্য অমায়িক লোক অলক্ষিত, অপরিচিত ও অনাদৃত।" শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

নাম-মাধুর্য্য।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে (Proper name) নামের কোন অর্থ নাই বলায় নাম মাধুর্য্য হইতে আমরা বঞ্চিত, কিন্তু প্রাণ আমাদের শব্দময়ী নাম মূর্ত্তি ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না, মাতার অকপট করুণা, ভগিনীর স্নেহ-বিজড়িত হৃদয়-লালিত্য, প্রণয়িনীর সর্ব্ব-গ্রাসিনী ভালবাসা নামকে অন্তর রাজ্যের রাজ্যেশ্বর পদে অভিষিক্ত করিয়াছে। যমুনা-কূলবাসিনী ব্রজাঙ্গনাগণ যখন প্রাণের মাণিক কালাচাঁদকে পাইলেন, তখন প্রথম কার্য্যই নামকরণ। হৃদয়ের আনন্দবারি নামলহরীতে পরিণত হইল। "নন্দ রাখিলেন নাম শ্রীনন্দের নন্দন, যশোদা রাখিলেন নাম যাদু বাছাধন। ননী-চোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী, কেলে সোণা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী।"

ভক্ত নিজের প্রাণের মাদকতায় সচ্চিদা-নন্দ সনাতন পুরুষকে অভিমত নামে আখ্যাত করিয়া কখনও প্রেমে, কখনও ভক্তিতে, কখনও বাৎসল্যে প্লাবিত হন। যদি নাম বাদ দাও, তবে সেই প্রেমোন্মত্ত ভক্তির স্রোত শুষ্ক হইয়া যায়। যে ভগবৎ-ভক্ত হরিনাম-সুধায় জীবনকে অহর্নিশি অমৃত করিয়াছেন, তাঁহার বাক্য বা অন্তর হইতে যদি "হরি" উঠাইয়া লও, তাহা হইলে তাঁহার প্রেমের অপমৃত্যু হয়, ভক্তির প্রস্রবণ শুষ্ক হয়, জীবন-নদীর শুভ্রবারি কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়। তাই কোন গভীর ভক্ত লিখিয়াছেন "ভক্ত আমার পিতামাতা, ভক্ত আমার আশ্রয়দাতা, আমি ভক্তের ভক্ত, আমার ভক্তই আমার নাম রেখেছে।" হরি-ভক্তের হরিনামই সর্ব্বস্ব। ভগবানের বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তির বর্ণনা, তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যের কীর্ত্তিগাথা, তাঁহার বিশা-লতার অপূর্ব্ব কল্পনা, এ নামের কাছে কিছুই নয়। নিজ কল্পিত নাম ব্যতীত ভগবানের অন্যনামে ভক্তের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। সাধকশ্রেষ্ঠ রামদাস বুকের ভিতর কেবল রামসীতাই রাখিয়াছিলেন, ভগবানের অন্য-নামে তাঁহার আস্থা ছিল না। সাহসী ভক্ত রামপ্রসাদ কালী নামের ডঙ্কা ব্যতীত অন্য নামের আশ্রয় চান নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি রামকৃষ্ণ "জয়কালী" নামই সম্বল করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ খ্রীষ্টশিষ্য প্রার্থনার অবসানে যিশুর নাম না করিয়া শেষ করিতে পারেন না। নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম মহাপুরুষ-গণও নাম মাহাত্ম্যে মাতোয়ারা। তাঁহারাও ভক্তিগদ্গদ চিত্তে "শান্তি শান্তি হরি ওঁ" বলিয়া প্রার্থনা শেষ করেন। এই "হরি ওঁ টী" না বলিলে শত সহস্র প্রার্থনার উচ্চ-ভাব হৃদয়ের দূর দূরান্তরে শব্দমাত্রে পর্য্য-বসিত হয়। যখন উচ্চে প্রাণ খুলিয়া নাম ধরিয়া ডাকা যায়, তখন যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিকাশিনী মহামহীয়সী মূর্ত্তি বিরাট আকারে হৃদয়-রাজ্যে প্রতিফলিত হয়। কোন্ সাধু মুসলমান জীবনতরীর কাণ্ডারী মহম্মদের নাম বাদ দিয়া প্রাণকে তৃপ্ত রাখিতে পারেন? পুরাণ বলে ব্রজের গাভীবৃন্দ কৃষ্ণ-নামে নাচিত, শুকশারী পুলকে ক্রীড়া করিত! কৃষ্ণ নাম বাদ দিলে কোথায় বা বৃন্দাবন, কোথায় বা প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা, কোথায় বা তনয়বৎসলা যশোমতী! প্রেম-

স্রোতা যমুনা কৃষ্ণনাম-লহরীতে নীলতোয়া। নাম নিরর্থক, এ শুষ্ক বৈয়াকরণের কষ্ট উক্তি। জগতে সর্ববস্তুর, সর্ব্বভাবের, সর্ব্বচিন্তার, সর্ব্বমর্ম্মের সার বস্তু "নাম"। ইহাই সার্থক, আর সবই নিরর্থক।

প্রতীচ্যের কবিকুলরাজ সেক্ষপীয়র প্রেমোন্মাদিনীর আক্ষেপে বলিয়াছেন "নামে কি আছে, যাহাকে গোলাপ বলা যায়, অন্য-নাম দিলেও তাহার মাধুর্য্য অবিনশ্বর।" নামহীন গোলাপ বোধ হয় কালে কণ্টক বলিয়া উপেক্ষিত হইত। যাহারা আমাদের হৃদয়ের নিভৃতে বা নিকটে, তাহাদিগকে কোন না কোন নামে আমরা বিশেষিত না করিয়া থাকিতে পারি না। জননীকে "মা" না বলিয়া যদি তাঁহাকে অঙ্গুলি সঞ্চালনে দেখাইয়া বাক্যালাপ করি, তাহা হইলে বোধ হয় সংসারের পূত সৃষ্টি মাতৃ-প্রেম লুপ্ত হইয়া যায়। জননীর সহিত যত মধুর কথা হয়, তাহার মধ্যে নামরূপিণী "মা" শব্দই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। জ্যেষ্ঠ যদি কণিষ্ঠকে স্নেহ-কণ্ঠে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া 'তিনি' 'ইনি' বলিয়া সম্ভাষণ করেন, তবে বিরক্তির পরিচয় বা স্নেহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অকস্ফুট প্রণয়ের দুটী হৃদয় একস্থানে থাকিলেও কথার মাত্রায় মাত্রায় নামের ব্যবহার দেখা যায়। সমস্ত বাক্যের, সমস্ত কাব্যের প্রাণ এই নাম, সর্ব্ব মাধুর্য্যের চরম মাধুর্য্য। অপরাপর দেশে কথায় কথায় প্রণয়ী প্রণয়িনী পরস্পরের নাম উচ্চারণ করেন, তাহা না হইলে প্রাণের পিপাসা মিটে না। "জন" John, "আনি" Anni না বলিলে দাম্পত্য প্রণয় শুকাইয়া যায়। লজ্জার আধার বঙ্গ-দম্পতি প্রকাশ্য আলাপে নাম ব্যবহার করিতেন না, কিন্তু ভাবের বিকীরণে আজ-কাল তুচ্ছ লজ্জা-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজকাল অন্ততঃ নিভৃতে বা প্রেম-পত্রে নাম উল্লেখ না করিয়া প্রেমের বেগ থামে না। এমন কি, বহু পূর্ব্বে বাল্যকালেও প্রবীণ বৃদ্ধ কৃষ্ণলাল সরকার বর্ষীয়সী সহধর্ম্মিণীকে প্রকাশ্যভাবে "মোক্ষদা" বলিয়া ডাকিতেন, শুনিয়াছি। যখন শাশুড়ী ননদের সহিত গৃহ-বধূর অসদ্ভাব ছিল, তখন "তিনি" "উনি" বলিয়া কথা চলিত, সেই স্থলে ভালবাসার প্রাবল্যে "মা" "দিদি" নামকরণে আজ বঙ্গ-গৃহে আনন্দ-ছটা। ঐহিক পারত্রিক সমস্ত ভাবেই নাম ব্যতীত প্রাণ নাই। অপরিচিত কোন ভদ্রলোক আসিলে "আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করি, কিন্তু অভিন্নহৃদয় বন্ধু দেখিলে "এস রাখাল, আসুন ব্রজবাবু, এস নাতি, আসুন শশীকাকা, এরে অনুকূল দা যে"—না বলিলে মনের তৃপ্তি হয় না।

যখন কোন ভাবে প্রাণ ব্যথিত, ক্ষুব্ধ বা বাক্‌রহিত হয়, তখন একটী 'নাম' উচ্চারণেই লক্ষ লক্ষ গ্রন্থের ভাব বিকশিত করে। অপরিমিত প্রণয়াধার অবিশ্বাসী ব্রুটাসের তীব্র আঘাতে সিজার মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া "তুমিও ব্রুটাস!" এই একটী কথায় সমগ্র জীবনের উক্তি শেষ করিয়াছিলেন। নামেই মাধুর্য্য, নামেই শান্তি, নামেই বিষ। পিশাচী-তুল্য কন্যার অসীম অকৃতজ্ঞতায় ব্যথিত বৃদ্ধ জিন লিয়র (Lear) নিজের বক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শ্যেনপক্ষী সম কন্যাগণের দারুণ দংশন ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'ও রিগান' (Regan) এই বলিয়া বাক্‌-রুদ্ধ হইলেন। এই নামোচ্চারণই ভাবের মহাসিন্ধু বিচলিত করিল। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়কভ্রষ্টা ঋষি-শাপ-গ্রস্তা শকুন্তলা যখন স্বামী কর্ত্তৃক অনাদৃতা, অজ্ঞাতা, অপরিচিতা, তখন উভয়ের

বাক্যে নামের ব্যবহার নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি-নামমাধুরী হরণ করিয়াছেন। দুষ্মন্ত বলিতেছেন :—

"শান্তং পাপং।
ব্যপদেশ মাবিলয়িতুং
কিমীহসে জনমিমঞ্চ পাতয়িতুং।
কুলঙ্কষেব সিন্ধুঃ
প্রসন্নমস্ত তট তরুঞ্চ"

যখন বিস্মৃতি-মোচিত রাজা পুনরায় শকুন্তলাকে দেখিলেন, অমনি নাম-মাধুর্য্যের বিকাশ হইল, অমনি সকল ভাবের বীজাণু পরমাত্মা স্বরূপ নামের জয় "অয়ে সেয়মত্র ভবতী শকুন্তলা।"

এই নামই নর নারীর ব্যক্তিগত প্রাণ, এই নামই ব্যাপৃতাকারে পরিবার, ইহারই বিস্তারণে সমাজ, ইহারই ব্যাপকতায় জাতি, ইহারই বিকীরণে দেশ, ইহারই ব্যাপ্তিতে মনুষ্য, ইহারই পরিণতিতে বিশ্ব।

সেই বিশ্ব-প্রাণের অনন্ত নামকরণ করিয়া আমাদের প্রাণের তৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষার লয়, আসক্তির শেষ। সেই বিশ্বাত্মিকা শক্তির ঈপ্সিত নাম প্রাণের মদিরা। এই প্রাণারামের অপরিমেয় পীযূষময় নাম হৃদয়-সিন্ধুর আলোড়িত অমৃত।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কপিল ও দেবহূতি সংবাদ

(শ্রীমদ্‌ভাগবত ৩য় স্কন্ধ—২৫শ অধ্যায়।)

যোগ ও ভক্তির লক্ষণ এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব।

কর্দ্দম ঋষির ঔরসে এবং দেবহূতির গর্ভে ভগবান কপিল রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, জন্ম হইবা মাত্রই কর্দ্দম ঋষি সদ্যজাত শিশুরূপী ভগবানের আদেশে সংসার পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করেন। জননী দেবহূতি মুক্তিতত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়া পুত্ররূপী ভগবানের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন।

শৌনক। তত্ত্ব-সংখ্যাতা কপিল অজ ভগবান,
নরগণে আত্মজ্ঞান করিতে প্রদান,
আত্ম যোগ মায়া বলে জন্মিলা আপনি। ১
পুরুষোত্তম সকল যোগিগণের অগ্রণী,
সে দেবের কীর্ত্তি গাথা শুনি বহুবার
পরিতৃপ্ত নাহি হয় ইন্দ্রিয় আমার। ২
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে, শরীর ধারণ
করিয়া মায়ায় যাহা কৈলেন সাধন,
কীর্ত্তনীয় সেই সব করুন বর্ণন
শ্রদ্ধার সহিত তাহা করিব শ্রবণ। ৩
সূত। হে ব্রহ্মণ, যেই কথা বুঝাইলে মোরে,
সেই কথা, ব্যাস সখা মৈত্রেয় ঋষিরে
জিজ্ঞাসা করিল যবে বিদূর ধীমতি
তাঁহাকে যা বলিলেন, ঋষি হৃষ্টমতি,
আত্ম বিদ্যা বিষয়ে—তা করুন শ্রবণ। ৪
মৈত্রেয়। অরণ্যে যখন পিতা করিলা গমন,
কপিল, স্বীয় মাতার মঙ্গল কারণ,
করিলেন অবস্থিতি বিন্দু সরোবরে। ৫
দেবহূতি, ধাতাবাক্য স্মরিয়া অন্তরে
কহিলেন, তত্র উপবিষ্ট স্বীয় সুতে,—
কর্ম্ম বিরজিত যিনি, এই অবনীতে
তত্ত্ব মার্গ প্রবর্ত্তিতে জনম যাঁহার। ৬
দেবহূতি। হে ভূমা, বড়ই শ্রান্তি হয়েছে আমার
অসৎ বিষয় অভিলাষের কারণে;
ওহে প্রভো, সেই সব বাসনা পূরণে
মগ্ন হইয়াছি আমি ঘোর অন্ধকারে। ৭
সে দুস্তর ঘোরতম পার করিবারে
পুত্ররূপে লভিয়াছি সৎ চক্ষু তোমার
জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে—তোমারি কৃপায়। ৮
সর্ব্বলোক অধিপতি পুরুষ পুরাণ
অজ্ঞানান্ধ জন-চক্ষুরূপী ভগবান
দিবাকর সম তুমি হইলে উদিত। ৯
এদেহে তুমিই করিয়াছ সংযোজিত

'আমি' ও 'আমার' এই মোহ, অভিমান
তুমিই করহ দূর সে মম অজ্ঞান। ১০
হে শরণ্য, লইলাম শরণ তোমার,
ভক্তগণের সংসার বৃক্ষের কুঠার
প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব জানিবার তরে;
ধর্ম্মবেত্তা শ্রেষ্ঠতম প্রণমি তোমারে। ১১

মৈত্রেয়। আত্মজ্ঞানী ভকতগণের অধিপতি—
শুনি স্বীয় প্রসূতীর এহেন উকতি,
সাধু অভিপ্রায় পূর্ণ মোক্ষবিবর্দ্ধন—
মনে মনে প্রশংসিয়া কাহলা তখন,
ঈষৎ হাস্য শোভিত প্রফুল্ল বদনে। ১২

কপিল। হে মাতঃ নরগণের কৈবল্য সাধনে
আধ্যাত্মিক যোগ হয় মম অভিমত,
যাতে হয় সুখ দুঃখ সর্ব্ব নিবারিত। ১৩
হে নিষ্পাপে, পূর্ব্বে যাহা করিনু বর্ণন
মুনিগণে—অভিলাষা করিতে শ্রবণ
সর্ব্বাঙ্গ নৈপুন যোগ—তাহাই সম্প্রতি
তোমার নিকটে আমি করিব বিবৃতি।১৪
চিত্তই জীবের মুক্তি, বন্ধন কারণ;
বিষয়ে আসক্ত মম ঘটায় বন্ধন,
মুক্তি দান করে যবে ঈশ্বরে নিরত।১৫
'আমি' ও 'আমার' এই অভিমান জাত
কাম লোভে আদি মলা বর্জ্জিত যখন
সুখে দুঃখে সমদর্শী শুদ্ধ হয় মন। ১৬
তখন জীব, প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন
সূক্ষ্ম, স্বপ্রকাশ, ভেদহীন, অবিচ্ছিন্ন,
সর্ব্বপেক্ষা মুখ্য [illegible] পরম আত্মাকে, ১৭
জ্ঞান, ভক্তি বৈরাগ্য সংযুক্ত চিত্তে দেখে
নিরাসক্ত ভাবে—তেজ-বিহীনা প্রকৃতি।১৮
অখিলাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি
ভক্তি যোগ বিনা, যোগিগণের সংসারে
নাহি আর শুভপন্থা, ব্রহ্মসিদ্ধি তরে। ১৯
হে জননি, এই হয় পণ্ডিত বচন,—
"আসক্তি জীবগণের অখণ্ড বন্ধন"
স্থাপিত তাহাই যবে সাধুতে আবার
সে আসক্তি হয় আচরিত মোক্ষদ্বার। ২০

১১। প্রকৃতি—মায়া; পুরুষ—পরমেশ্বর।
১৩। আধ্যাত্মিক—আত্মনিষ্ঠ।
১৬-১৮ যখন জীবের মন অহংভাব-জাত কামাদি সকল বর্জ্জিত হইয়া সমদর্শী ও শুদ্ধ হয়, তখন জীব, প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পরমাত্মাকে নিরাসক্ত ভাবে ভোগ করে এবং প্রকৃতিকে তেজবিহীন দেখে।

সহিষ্ণু, করুণাশীল, শত্রুহীন, শান্ত,
সুশীলতা অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত,
সকল প্রাণীর বন্ধু হয় সাধুগণ। ২১
তারা ত্যজে সর্ব্বকর্ম্ম আমার কারণ,
অনন্যভাবেতে দৃঢ় ভক্তি করি মোরে
মম হেতু স্বজন বান্ধব ত্যাগ করে; ২২
পবিত্র লীলাদি মম করয় শ্রবণ;
পরস্পরে মম কথা করে আলাপন;
মদ্‌গত চিত্ত যেহ সাধুজনগণ
বিবিধ তাপ বেদনা সহে না কখন। ২৩
হে সাধ্বি, সকলরূপ আসক্তি-বর্জ্জিত
হয় সেই সাধুগণ। তোমার উচিত
করিতে সংসর্গ তাঁহাদের অন্বেষণ
সাধু সংসর্গেতে হয় পাপ বিমোচন। ২৪
তাঁদের সংসর্গে, মম লীলা-গুণযুত
কথা করে মন ও শ্রবণ আনন্দিত;
শুনি তাহা, মোক্ষ পথ-রূপ মমপ্রতি
শীঘ্রই জনমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি। ২৫
পরে মম লীলা গুণ আদির স্মরণে
ভকতি করয় লাভ, যবে সাধু জনে,
সে ভক্তি প্রভাবে চিত্ত হইলে বিরক্ত
ইন্দ্রিয়ের সুখে—যাহা দৃষ্ট কিম্বা শ্রুত—
সুগম যোগমার্গের করিয়া আশ্রয়
সংযমিতে স্বীয় মন যতন করয়। ২৬
হেনরূপে প্রকৃতির গুণ অসেবনে
হে জননি, বৈরাগ্য বর্দ্ধিত তত্ত্বজ্ঞানে
যোগ বলে করি ভক্তি আমাতে অর্পণ
জীব এই সূক্ষ্ম দেহে করয় দর্শন
আমাকে—সকলব্যাপী এক ভগবান। ২৭

দেবহূতি। তোমা প্রতি কোন্‌রূপ ভক্তির বিধান?
কিরূপে বা মম সম রমণীর তরে
সে ভক্তি সম্ভব হয়, যাহাতে সত্বরে
নির্ব্বাণ স্বরূপ তব পদ লাভ হবে? ২৮
যে যোগ হইতে জীব তত্ত্বজ্ঞান লভে,
ভগবদ্‌বাণ যাহা করিলে বর্ণন,
হে কৈবল্যপতি, বল সে যোগ কেমন
কিম্বা অঙ্গ হয় তার কতেক প্রকার? ২৯
রমণী, তাহাতে অতি অজ্ঞান আবার,
কৃপা করি হেন জ্ঞান দান কর হরি,
দুর্ব্বোধ্য এ তত্ত্ব যাতে বুঝিবারে পারি।৩০

২৯। ভগবদ্‌ বাণ—ভগবানের প্রতি লক্ষ্যকৃত বাণ স্বরূপ যে যোগ, যাহা অমোঘ এবং অব্যর্থ।

মৈত্রেয়। কপিল জানিয়া হেন মাতৃ অভিপ্রায়
যাঁহার শরীর হৈতে জন্মিলা ধরায়
তাঁর প্রতি করুণাদ্র হইয়া তখন,
তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ আর ভক্তি বিবর্দ্ধন
যোগ বিবরিলা, যাহা সাংখ্য নামে খ্যাত।
কপিল। "বিষয় ভোগ সকল ইন্দ্রিয়াদি যত।
তাদের বেদবোধিত কার্য্য অনুষ্ঠানে
একাগ্র মন জীবের, ভগবান পানে
অযত্ন সুলভ স্বতঃ যেই বৃত্তি হয়
অনিমিত্তা ভাববতী ভক্তি তারে কয়,
সিদ্ধি হ'তে সেই ভক্তি হয় শ্রেষ্ঠতর। ৩২
অনল যেমন ভাবে জঠর ভিতর
ভুক্তদ্রব্য ক্ষয় করে—ইহাও তেমতি
লিঙ্গদেহ, জীবের নাশায় শীঘ্রগতি। ৩৩
সদা মম পাদপদ্ম সেবায় নিরত
মম অভিলাষী যারা হৈয়া সম্মিলিত
পরস্পর সমাদরে করয় বর্ণন
আমার লীলাদি—সেই সব ভক্তগণ
মম সহ একাত্মতা স্পৃহা নাহি করে। ৩৪
বরঞ্চ জননি, তারা আনন্দ অন্তরে
সুন্দর প্রসন্নানন অরুণ লোচন
বরপ্রদ দিব্যরূপ করয় দর্শন,
তৎসহ করয় সুমধুর আলাপন। ৩৫
ভক্তাভীষ্টপ্রদ সুমধুর সম্ভাষণ,
বিলাস লীলা হাসি দর্শন সমন্বিত
আমার মূরতি হেরি যে সব ভকত
হারাইয়া মনপ্রাণ না যাচে মুকতি,
ভক্তিই করিয়া থাকে তাহাদের গতি। ৩৬
অবিদ্যা নাশের পর এই ভক্তগণ
যদিও তাহারা নাহি করে আকিঞ্চন,
মম মায়া-বিরহিত সত্য লোক ভোগ
অনিমাদি অষ্টরূপ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ,
অথবা বৈকুণ্ঠস্থিত সম্পত্তি নিচয়
তবুও যাইয়া তারা আমার আলয়
নিশ্চিত করিবে লাভ এই সমুদয়। ৩৭
কভু নাহি তাহাদের ভোগকর হয়,
যারা মম পরায়ণ, কিম্বা নাহি পারে
গ্রাসিতে তাদিগে মম ঘোর কাল চক্রে;
আমি হই তাহাদের প্রিয়, সুত, আত্মা,
সখা, গুরু, সুহৃদ্ ও অভীষ্টদেবতা। ৩৮
ইহলোক, পরলোক, উচ্চলোকাগত
সোপাধিক আত্মা আর আত্মা অনুসৃত
পুত্র কলত্রাদি কিম্বা পশু, গৃহ, ধন। ৩৯
অন্যান্য যাহা সকল, করি বিসর্জ্জন
অনন্যা ভক্তির সহ যেই ভক্তগণ
বিশ্বব্যাপী আমাকেই করয় ভজন,
আমি লই তাহাদিগকে মরণের পারে। ৪০
সংসারের তীব্র ভয় নিবারিতে নারে
অন্য কেহ, বিনে আমি পুরুষ প্রধান
সর্ব্বভূত আত্মারূপী এক ভগবান। ৪১
বায়ু বহে মম ভয়ে, রবি তাপ দানে,
দহনে নিরত অগ্নি, ইন্দ্র বরষণে,
আমারি ভয়েতে মৃত্যু করে বিচরণ। ৪২
জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিতে যোগিগণ
মঙ্গল লাভের তরে করেন আশ্রয়
মম পদ, যাতে নিবারিত সর্ব্বভয়। ৪৩
স্থূলকথা, দৃঢ় ভক্তি যোগেতে যখন
আমাতে আপন মনী করি সমর্পণ
জীব যদি তাহা স্থির রাখিবারে পারে,
পরম পুরুষার্থকে লভয় সংসারে। ৪৪

শ্রীবিহারীলাল রায় কবিরত্ন।

৩৪। মম সহ একাত্মতা—সাযুজ্য মুক্তি।

তারা ও মন্দোদরী।

হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চ কন্যার মধ্যে তারা ও মন্দোদরী দুইটী। এ তারা সম্ভবতঃ বৃহস্পতি-পত্নী তারা নহেন, কারণ চন্দ্র কর্ত্তৃক অপহরণ ও তজ্জনিত বিভ্রাট ব্যতীত দেবগুরু-পত্নীর জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্মরণীয়া তারা বালী ও সুগ্রীবের পত্নী—রামায়ণের মতে বানরী। আর মন্দোদরী পাপিষ্ঠ রাক্ষস রাবণের পত্নী—স্বয়ং দানবী।

এই বানরী ও রাক্ষস-পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া কেন? বালীর মৃত্যুর পর তারাকে দেবর সুগ্রীবের অঙ্কলক্ষ্মী রূপে দেখিতে পাই। ইহার পূর্ব্বেও একবার বালীর বিল মধ্যে অবস্থান কালে, তারার তাদৃশ অবস্থার আভাষ পাই। এই দ্বিচারিণী রমণীর প্রতি আর্য্য-শাস্ত্রকারের এত অনুগ্রহ কেন? মন্দোদরীকেও আমাদের ঘরের কবি কৃত্তিবাস রাবণের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার রাজমহিষী রূপে উপস্থিত করিয়াছেন।

তারার চরিত্রে বাস্তবিক বিশেষত্ব আছে। ঐতিহাসিক যুগে যেমন নুরজাহান, রামায়ণে তেমনি তারা। দেশকাল-পাত্রভেদে বুদ্ধিমত্তা, বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে মনোহারিত্ব, রাজার উপর আধিপত্য তাঁহার চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সতেজ মনোবৃত্তিই তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়াছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগ যেমন নুরজাহানময়, সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যার রাজত্বের আমরা যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই, তাহাও তেমনি তারাময়।

রামচন্দ্রের সহিত মৈত্রীর পর সুগ্রীব যখন দ্বিতীয় বার বালীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন, তখন বালীর প্রতি তারার নিষেধ বাক্যে আমরা প্রথম তারার বুদ্ধিমত্তা ও পতিপ্রেমের পরিচয় পাই। তারা বুঝাইলেন, যে ব্যক্তি এত অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার সদর্পে প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিতে আইসে, সে নিশ্চয়ই বিশেষ সহায় সম্পন্ন হইয়াছে, সহসা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখীন হওয়া অকর্ত্তব্য। তারা অঙ্গদের মুখে রাম ও লক্ষ্মণের আগমন ও সুগ্রীবের সহিত মিত্রতার বিবরণ শুনিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিলেন এবং এস্থলে দণ্ডের পরিবর্ত্তে ভ্রাতার সহিত সামনীতি অবলম্বনই যে শ্রেয়ঃ, তাহারও যুক্তি উপস্থিত করিলেন। কিন্তু বালী রাজনীতি অপেক্ষা বীর-নীতিরই অধিক উপাসক ছিলেন। তিনি সুগ্রীবের সদর্প আহ্বান সহ্য করিতে পারিলেন না, ধর্ম্মাত্মা আর্য্যবীর যে স্বার্থ-সাধন জন্য গুপ্ত হত্যা অবলম্বন করিতে পারে, ইহাও তিনি ধারণা করিতে পারিলেন না। ইহার ফল দাঁড়াইল, বালিবধ ও সুগ্রীবের রাজ্য প্রাপ্তি। যখন বালী রামচন্দ্রের বাণে ভূপতিত এবং তাঁহার সৈন্যগণ পলায়নপর, তখন আমরা তেজস্বিনী তারাকে এই সৈন্যগণের প্রতি তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিতে পাই। সৈন্যগণ নগর রক্ষা ও অঙ্গদের রাজ্যাভিষেকের পরামর্শ দিল; কিন্তু তখন নারী-ভাব বীরভাবের উপর প্রাবাল্যলাভ করিয়াছে, তখন পতিশোকেই তারার সকল হৃদয় অধিকৃত।

পুত্রেণ মম কিং কার্য্যং রাজ্যেনাপি কিমাত্মনা।
কপিসিংহে মহা ভাগে তস্মিন্ ভর্ত্তরি নশ্যতি॥
পাদ মূলং গমিষ্যামি তসৈবাহং মহাত্মনঃ।
যোঽসৌ রাম প্রযুক্তেন শরেণ বিনিপাতিতঃ॥

যখন কপিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ ভর্ত্তাই বিনষ্ট, তখন আমার পুত্র রাজ্য ও দেহে কি প্রয়োজন? যিনি রাম-নিক্ষিপ্ত বাণে পতিত, সেই মহাত্মার পাদমূলে গমন করিব। তারা তাহাই করিলেন। হনুমান রোরুদ্যমানা তারার প্রতি সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করতঃ বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অঙ্গদের অভিষেক কার্য্যে মনোযোগী হইতে বলিলেন। তারা উত্তর করিলেন, অঙ্গদের তুল্য শত পুত্র অপেক্ষা মৃত বীর পতির গাত্র-সংশ্লেষই তাঁহার শ্রেয়ঃ। আর রাজ্য? সুগ্রীব বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার সে বিষয়ে বিচারের অধিকার নাই।

বালী মৃত্যু সময়ে সুগ্রীবকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া তারার অভিমতানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিতে উপদেশ দিলেন কারণ—

সুষেণ দুহিতা চেয় মর্থ সূক্ষ্ম বিনিশ্চয়ে।
ঔৎপাতিকে চ বিবিধে সর্ব্বতঃ পরিনিশ্চিতা॥
যদেষা সাধ্বিতি ব্রূয়াৎ কার্য্যং তন্মুক্ত সংশয়ং।
নহি তারা মতং কিঞ্চিদন্যথা পরিবর্ত্ততে॥

"কার্য্যের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম নির্ণয়ে ও বিপৎকালে কর্ত্তব্যাবধারণে তারা সুনিপুণা—তারা যেরূপ বলেন, সেইরূপই ঘটিয়া থাকে।" দীর্ঘকাল একত্র বাসের পর কিষ্কিন্ধ্যা রাজের এই মত জন্মিয়াছিল। স্বভাবতঃ ধীর প্রকৃতি তারা বালীর মৃত্যুতে অধীরা হইলেন, রামচন্দ্রের শরে নিহত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। বালি-বধে তারার যে শোক ও বিলাপ রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মর্ম্মস্পর্শী। যাহা হউক, কালে রামচন্দ্রের ইচ্ছায় সপুত্রক তারা সুগ্রীবের পরিবার মধ্যে গণ্য হইলেন।

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে উপভোগের জন্য বর্ষাকালটা ছাড়িয়া দিলেন, কারণ তখন সীতার অন্বেষণের সময় নহে। বর্ষার পর শরৎ আসিল, কিন্তু সুগ্রীব বিলাসেই মত্ত থাকিলেন। রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণের আয়োজন না দেখিয়া দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, সুগ্রীবের নিকট লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে বানরগণ ভীত হইল। লক্ষ্মণ অঙ্গদের দ্বারা সুগ্রীবের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, এবং প্রত্যুত্তর পাইয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুগ্রীবের অন্তঃপুরে তখন আনন্দ-স্রোত বহিতেছিল, লক্ষ্মণ নৃত্য-পরায়ণ রমণীগণের নুপূর ও কাঞ্চীর শব্দ শুনিতে পাইয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন। ভয়-চকিত সুগ্রীবকে তখন তারার স্মরণাপন্ন হইতে হইল। কৃত্তিবাস "তারা কৃশোদেবীকে" সুগ্রীবের অভিষেক সময়েই তাঁহার বাম পার্শ্বে বসাইয়া দিয়াছেন। মূল রামায়ণে এরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ না থাকিলেও এই সময়ে আমরা তারাকে সুগ্রীবের প্রধান মহিষী ও মন্ত্রণা-দায়িনীরূপে দেখিতে পাই। সুরাদেবীর অনুগ্রহে তারার লজ্জার পরিমাণ তখন খুব অধিক না থাকিলেও, তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন, লক্ষ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তারা বিনয়গর্ভ রাজনীতিপূর্ণ বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণকে বুঝাইলেন, সুগ্রীব বিলাসে লিপ্ত থাকিলেও রামের কার্য্যে একেবারে অমনোযোগী নহেন, তাঁহার আদেশে বিপুল বানর সৈন্য সমবেত হইতেছে। পরে লক্ষ্মণকে বিশুদ্ধ চরিত্রের এক সার্টিফিকেট দিয়া একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে সুগ্রীবের নিকটে লইয়া চলিলেন। লক্ষ্মণ তারার বাক্যে অনেকটা শান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, সুগ্রীব তখনও স্ত্রী সমাজে আনন্দোৎসবে মত্ত, তখন আবার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, সুগ্রীবের প্রতি কৃতঘ্নত্ব ও মিথ্যাবাদিত্বের আরোপ করিয়া তাঁহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করতঃ কহিলেন, যে পথে বালী গিয়াছেন, সে পথ এখনও সঙ্কুচিত হয় নাই। সুগ্রীব সহসা লক্ষ্মণের অন্তঃপুরে আগমন আশা করেন নাই, হতভম্বের মত চুপ করিয়া রহিলেন। তারাকে আবার সুগ্রীবের ওকালতী গ্রহণ করিতে হইল। যুক্তি ও বিনয় পূর্ণ বচনে তারা লক্ষ্মণকে বুঝাইলেন, সুগ্রীবের বিরুদ্ধে কৃতঘ্নত্ব ও মিথ্যাবাদিত্বের অভিযোগ অমূলক—সুগ্রীব সীতার উদ্ধারে নিশ্চেষ্ট নহেন, উপযুক্ত সৈন্যবলের

অপেক্ষায় আছেন এবং আর্য্যাবর্ত্তের মুনি ঋষিরাও যখন সময়ে সময়ে সুন্দরীগণের অপাঙ্গলীলায় পরাজিত হন, তখন সুগ্রীবের প্রতি রমণী সংসর্গের জন্য দোষারোপ করিলে চলিবে কেন? তারার বক্তৃতা সফল হইল, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের মিলন মধুরেণ সমাপিত হইল।

ইহার পর বানর সৈন্যের তুমুল কোলাহল ও রাম রাবণের ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে আমরা তারাকে আর দেখিতে পাই না। রাবণ বধের পর যখন রামচন্দ্র পুষ্পক রথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখন পথি মধ্যে সীতাদেবীর কিষ্কিন্ধ্যা হইতে বানর পত্নীগণে পরিবৃত হইয়া যাইতে ইচ্ছা হওয়ায় আর একবার তারার অন্বেষণ হয়। তারা বানর পত্নীগণকে আহ্বান করতঃ তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সীতার সহিত অযোধ্যায় গমন করেন।

ইহার অধিক তারা সম্বন্ধে রামায়ণে বিশেষ কিছু পাই না। যাহা পাই, তাহাতে বুঝিতে পারি, এই অনার্য্যা রমণীর প্রাতঃস্মরণীয়া হইবার কারণ তাঁহার প্রতিভা। যেখানেই আমরা তারার সাক্ষাৎকার লাভ করি, সেই খানেই তাঁহার উজ্জ্বল চিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এখন কথা হইতেছে, যে আর্য্য সাহিত্যে সতীত্বের এত আদর, সেখানে দ্বিচারিণীর এই প্রতিপত্তি কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সতীত্ব সভ্যতার ফল, তাহার আদর্শ সর্ব্বত্র একরূপ নহে। আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণের আদর্শ দ্বারা কিষ্কিন্ধ্যায় সতীত্বের পরিমাপ চলিতে পারে না। এখনও পৃথিবীতে হিন্দু ছাড়া আর কোন জাতির মধ্যে পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর গ্রহণ সমাজ অসৎ কর্ম্ম বলিয়া মনে করে না। তারা বহু প্রাচীন যুগের অনার্য্য রমণী, তিনি এমন সমাজের নারী যে, আর্য্যাবর্ত্তের কবি তাঁহাকে বানরী বলিয়া বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যে সমাজে বালীর ন্যায় সমৃদ্ধ রাজা কণিষ্ঠ ভ্রাতার জীবদ্দশায় তাঁহার পত্নী উমাকে প্রকাশ্যভাবে উপপত্নী করিতে পারেন, তারা সেই সমাজের রমণী। তাঁহার সমাজের হিসাবে তারা অপূর্ব্ব সতী। যখন তিনি বালীর ধর্ম্মপত্নী, তখন বালীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরক্তি, সামাজিক নিয়মে যখন তিনি সুগ্রীবের পত্নী, তখন কায়মনোবাক্যে সুগ্রীবের শুভানুষ্ঠানে রত,রামায়ণের বর্ণনায় ইহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং তাঁহার নৈতিক জীবন ঘৃণার চক্ষে দেখিবার নহে। রামায়ণে বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীবের তারাগ্রহণ এমন স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া গণ্য হইয়াছে যে, ইহার বর্ণনা বা সমালোচনা কিছুই নাই। কোন্ সময়ে কি ভাবে যে তারার এই অবস্থান্তর ঘটিল, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

মন্দোদরী সম্বন্ধে বাল্মীকির রামায়ণে অধিক কিছু পাওয়া যায় না। প্রবাদ, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা হইতেই সতরঞ্চ খেলার উদ্ভব। তাহা না হইলেও তিনি রাক্ষস-সমাজে ঠিক রাক্ষসী নহেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ রাবণের সহধর্ম্মিণী, কিন্তু রাবণের পাপকার্য্যে তাহার সহায়তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য ও দুর্ভাগ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া। কৃত্তিবাস তাঁহার সম্বন্ধে এমন অনেক কথাই লিখিয়াছেন, যে বিষয়ে সংস্কৃত রামায়ণ নীরব। তবু আমরা যে টুকু পাই, তাহাতে তাঁহাকে দৈত্য গৃহে দেবী বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। মূল রামায়ণে দেখিতে পাই,

রাবণের মৃত্যুর পর পতিবক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে তিনি সরল ভাষায় বলিতেছেন,
ন কুলেন ন রূপেন ন দাক্ষিণ্যেন মৈথিলী
ময়াধিকা বা তুল্যা বা তত্তু মোহান্ন বুধ্যসে।

কুল, রূপ বা দাক্ষিণ্য কিছুতেই জানকী আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা আমার তুল্য নহেন, মোহ বশতঃ বুঝিলে না। কথাটী হয়ত একেবারে ভিত্তিশূন্য নহে। পতির মৃত্যুর পর বিলাপে পাই, তাঁহার প্রধান গর্ব্ব ছিল, তিনি ময়দানবের কন্যা, ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণের পত্নী এবং ইন্দ্রজিতের ন্যায় বীরের মাতা।

বালিবধের পর তারার যে কলঙ্ক, কৃত্তিবাস মন্দোদরীর স্কন্ধেও তাহা চাপাইয়া দিয়াছেন। কৃত্তিবাস কোথা হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন, জানি না। অভিষেক কালেই তিনি মন্দোদরীকে বিভীষণের পাটরাণী করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে রামচন্দ্র এই মিলনের ঘটক। রামচন্দ্রের কৈফিয়ৎ—

রাজস্ত্রী রাজায় লয় আছে ব্যবহার।

ব্যবহারটী অবশ্য রামচন্দ্রের নিজের দেশের নহে। কৃত্তিবাসও হয়ত মনে রাখেন নাই যে, কিষ্কিন্ধ্যায় ও লঙ্কায় বিভিন্ন ব্যবহার হইতে পারে। আর্য্যকবিগণ অনার্য্য জাতির রীতি-নীতির প্রতি এতই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, অনেক স্থলে তাঁহাদের সম্মাননাও অপমানজনক। রাবণ-বধের জন্য রামলক্ষ্মণাদি নারায়ণের অংশে এবং বানরগণ দেবগণের অংশে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু জন্মের প্রক্রিয়াটী কিরূপ? নারায়ণ পুত্ররূপে কৌশল্যাদির উদরে জন্মগ্রহণ করিলেন, আর দেবগণ? তাঁহারা পুত্রোৎপাদক রূপে বানরীদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালী, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতির জন্ম-বিবরণের সহিত রামলক্ষ্মণাদির জন্ম বিবরণ তুলনা করিলেই এই প্রভেদ উপলব্ধি করা যায়। বাল্মীকি প্রভৃতি যে পথের প্রদর্শক, কৃত্তিবাস তাহার বিস্তারক মাত্র। মন্দোদরীর দুর্ভাগ্য যে, কৃত্তিবাস তাঁহার বেলা বাল্মীকির চিত্রের উপর আপন তুলিকা চালাইয়াছেন।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

দৈব ও আসুরিক ধর্ম্ম।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতে অনূদিত)

একদা দেবতা ও অসুরগণ উভয়ে পরম্পরাগত যথা সম্ভব আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরস্পর আলোচনা করিয়াছিলেন যে, যে আত্মার অনুসন্ধান করিয়া লোক সকল, সকল প্রকার সুখভোগ ও সকল লোকের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমরা সেই আত্মার অন্বেষণ করিব। এই প্রকার আলাপ করিয়া দেবগণের পক্ষ হইতে ইন্দ্র ও অসুরগণের পক্ষ হইতে বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, প্রজাপতি তাহাদিগকে কহিলেন "তোমরা কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতেছ?" তাঁহারা কহিলেন, "অজর, অমর, অপাপবিদ্ধ, বিশোক, ক্ষুধা-পিপাসা-বিরহিত, সত্য-কাম, সত্য-সঙ্কল্প আত্মাই অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার বিষয়।

যিনি ঈদৃশ আত্মাকে বিচার পূর্ব্বক জানিতে পারেন, তিনি সকল প্রকার ভোগ ও সকল লোকের অধিকারী হইয়া থাকেন, ইহা ভগবানেরই (আপনার) উপদেশ, সেইজন্ত আমরা (আপনার নিকট) আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। প্রজাপতি কহিলেন,"চক্ষুর মধ্যে পরিদৃশ্যমান পুরুষই আত্মা, ইনিই অমৃত ও ভীতিশূন্য ব্রহ্ম"। তাঁহারা কহিলেন, হে ভগবন! জলমধ্যে ও দর্পণ মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি কে ?

তারপর প্রজাপতি কহিলেন "তোমরা জলপূর্ণ শরাব মধ্যে আত্মাকে দর্শন কর, যদি তাঁহার তত্ত্ব না জানিতে পার, তাহা হইলে আমাকে বলিও"। তাঁহারা জলপূর্ণ শরাব মধ্যে আত্ম দর্শন করিলে প্রজাপতি কহিলেন "তোমরা জলপূর্ণ শরাবে কাহাকে দর্শন করিলে ? তাঁহারা করিলেন"হে ভগবান! আমরা নখ লোমাদি যুক্ত নিজের প্রতিবিম্ব অবলোকন করিলাম।" প্রজাপতি কহিলেন, "তোমরা সুন্দররূপে বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া জলপূর্ণ শরাব মধ্যে আত্মাকে দর্শন কর।" তাহারা তাহা করিলে প্রজাপতি কহিলেন, "তোমরা কি দেখিলে ?" তাঁহারা কহিলেন, "হে ভগবান্! আমরা পরিচ্ছন্ন, ও সুচারু বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত নিজের প্রতিবিম্বকেই দর্শন করিলাম।" প্রজাপতি কহিলেন "ইনিই অমৃত ও অভয় ব্রহ্ম।" প্রজাপতির উপদেশে ইন্দ্র ও বিরোচন শান্ত চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহাদিগকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া প্রজাপতি কহিলেন, "তোমরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আত্মার উপলব্ধি না করিয়াই যাইতেছ, তোমাদের কর্তৃক উপদিষ্ট বিদ্যা, দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে যে কেহ গ্রহণ করিবে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে"। বিরোচন শান্ত চিত্তে অসুরগণের নিকট গমন করিয়া এই (প্রজাপতি-কথিত) জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেন। শরীরই আত্মা, (সুতরাং) শরীরই পূজ্য ও সেবনীয়, যিনি শরীরের পূজা ও সেবা করিয়া থাকেন, তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব অদ্যাপি দানবিহীন, শ্রদ্ধাশূন্য, যজ্ঞ-বিরহিত লোক অসুর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাই আসুরিক জ্ঞান, অসুরেরা মৃত দেহকে অন্নপানাদি দান করিয়া ও বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া বিবেচনা করে, "মৃত ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক জয় করিবে।"

ইন্দ্র দেবগণের নিকট গমন না করিয়া মনে মনে ভয়ের আশঙ্কা করিলেন "প্রজাপতি যে আত্মার উপদেশ প্রদান করিলেন, এই আত্মা, শরীর অলঙ্কৃত হইলে অলঙ্কৃত, বসনে সুসজ্জিত হইলে বসনধারী এবং পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, এবং যদি এই আত্মা শরীর অন্ধ হইলে অন্ধ, কুষ্ঠাদি রোগ-যুক্ত হইলে কুষ্ঠাদি রোগযুক্ত, ছিন্ন হইলে ছিন্ন ও বিনষ্ট হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; তাহা হইলে ঈদৃশ আত্মজ্ঞানে কোনও সুখ নাই।" ইন্দ্র পুনর্ব্বার সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন। প্রজাপতি কহিলেন, "হে মঘবন্! তুমি বিরোচনের সহিত শান্ত-চিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলে, কি অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার আগমন করিলে ?" ইন্দ্র নিজের নিজের মনোগত ভাব জ্ঞাপন করিলে, প্রজাপতি কহিলেন, "তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য, কিন্তু তুমি পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান কর, তৎপরে

তোমার নিকট ব্রহ্ম বিষয়ক ব্যাখ্যা করিব,” ইন্দ্র অপর বত্রিশ বৎসর বাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিলে পর প্রজাপতি কহিলেন—

“স্বপ্নাবস্থায় যিনি পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই—আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয় ব্রহ্ম।” ইহা শুনিয়া শান্ত চিত্তে ইন্দ্র প্রস্থান করিলেন, এবং দেবগণের নিকট যাইবার পূর্ব্বে তিনি এই ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, “এই শরীর দৃষ্টিশক্তি বিহীন হইলে স্বপ্নাত্মার দৃষ্টিলোপ হয় না, শরীর কুষ্ঠাদি রোগযুক্ত হইলে স্বপ্নাত্মা কুষ্ঠাদি রোগযুক্ত হয় না, শরীরের কোনও দোষেই স্বপ্নাত্মা দূষিত হয় না, শরীরের নাশেও স্বপ্নাত্মা নাশ প্রাপ্ত হয় না। শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও স্বপ্নাত্মা নীরোগ থাকে। শরীরের ধ্বংস বিদ্রবনাদি না হইলেও স্বপ্নাত্মার ধ্বংস ও বিদ্রবনাদি সংঘটিত হইয়া স্বপ্নাত্মা অনিষ্ট সংঘটনে রোদনও করিয়া থাকে, আমি এই আত্মজ্ঞানে কোনও সুখ দেখিতেছি না।”

ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতির নিকট গমন করিলে “প্রজাপতি কহিলেন, “হে মঘবন্,তোমার পুনরাগমনের কারণ কি? ইন্দ্র নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে প্রজাপতি কহিলেন “তোমাকে পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে, তৎপরে আমি ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিব।” ইন্দ্র তাহা করিলে প্রজাপতি কহিলেন, “যে সময়ে জীব সুষুপ্ত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে বিরত হয়, যখন জীব পরমানন্দে অবস্থান করে, কোনও প্রকার স্বপ্নাদি দর্শন করে না, সেই সুষুপ্ত জীবই আত্মা, অমৃত ও অভয় ব্রহ্ম।” ইন্দ্র প্রজাপতির বাক্যে শান্ত মনে প্রস্থান করিলেন, এবং দেবগণের নিকট যাইবার পূর্ব্বে আবার তাহার ভয় উপস্থিত হইল, তিনি ভাবিলেন “সুষুপ্ত জীব নিজের বা অপরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না এবং সুষুপ্ত জীবেরও বিনাশ আছে, অতএব সুষুপ্ত আত্মার উপদেশে কোনও সুখ দেখিতেছি না।” ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে, প্রজাপতি কহিলেন, “হে মঘবন্! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য,তুমি পুনর্ব্বার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান কর, আমি আর একবার মাত্র আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব।” ইন্দ্র আরও পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলেন, সর্ব্বসমেত একশত এক বৎসর যাবৎ ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করিলেন, তার পর প্রজাপতি, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শুদ্ধচিত্ত জানিয়া বলিলেন ;—

“হে মঘবন্, এই দেহ মরণধর্ম্মী ও মৃত্যুগ্রাহ্য,এই দেহ অমৃত ও অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র, আত্মা শরীর-সংসর্গী হইয়াই সুখ ও দুঃখ দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, আত্মা যতক্ষণ শরীরাবদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ সুখ ও দুঃখের নাশ হয় না,শরীর সম্বন্ধ-বিহীন আত্মাকে সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ এবং মেঘধ্বনিও অশরীর। ইহারা শরীর-বিহীন হইয়াও আকাশ হইতে পৃথক ভাবে যখন প্রকাশিত হয়, তখন উত্তম জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই প্রকার, আনন্দময়, সুষুপ্ত আত্মাও দেহ হইতে পৃথকরূপে প্রকাশিত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তৎকালে ইনি পুরুষোত্তমঃ; এই পুরুষোত্তম তন্দ্রাবস্থায় এইজন্য শরীর স্মরণ না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ, ভোজন, ক্রীড়া, এবং রমণী ও জ্ঞাতিগণের সহিত রথারোহণে ইতস্ততঃ বিচরণ

করিয়া থাকেন, সংযুক্ত বলীবর্দ্দাদি সদৃশ প্রাণই এই শরীরে নিযুক্ত হইয়া উহার পরিচালনা করে। এই চক্ষু প্রভৃতি যাঁহাদের অধীন থাকিয়া আলোকাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাঁহারাই চক্ষু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি দেবতা, যিনি চক্ষুরাত্মভিমানী, তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, দ্রষ্টা জীবাত্মা। যিনি ইহাদিগকে উদাসীন ভাবে দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মা। চক্ষুরাদি দেহাভিমানী জীব পরমাত্মার অংশ সুতরাং পরস্পর অভিন্ন। এই দেহে যিনি ঘ্রাণকারী, তিনিই আত্মা, নাসিকা গন্ধ গ্রহণের ইন্দ্রিয় মাত্র, যিনি দর্শনকর্ত্তা তিনিই আত্মা, চক্ষু দর্শন ক্রিয়ার সাধন, যিনি শ্রোতা তিনিই আত্মা, শ্রুতি শ্রবণের করণ মাত্র, যিনি মননকর্ত্তা, তিনিই আত্মা, মন মননের ইন্দ্রিয় মাত্র। আত্মাই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, সূর্য্যাদির আনুকূল্যে চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা দর্শন, আঘ্রাণ, শ্রবণ মননাদি করিয়া থাকে; এবং রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির উপভোগ করিয়া থাকে। ব্রহ্মলোকে দেবগণও এই আত্মার উপাসনা করিয়া সকল লোক ও সকল প্রকার ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" প্রজাপতি এই উপদেশ প্রদান করিলেন।

সর্ব্বত্র প্রকাশমান পরমাত্মাই নাম ও রূপের কর্ত্তা, নাম ও রূপ যাঁহার অন্তঃস্থিত, সেই ব্রহ্মই অমৃত আত্মা। (ইন্দ্র বলিলেন) "আমি প্রজাপতির গৃহ ও সভা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যদিগের যশলাভ করিয়া যশস্বী হইলাম, এবং শুভ্র, শুদ্ধ, আনন্দময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলাম।"

এই আত্মজ্ঞান ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে, মনু প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন। আচার্য্যকুলে বেদাধ্যয়ন করিয়া, গুরুসেবা শেষ করিয়া গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিবে। তারপর গৃহবাসী হইয়া বিশুদ্ধস্থানে বেদাদি পাঠ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া এবং যজ্ঞ ভিন্ন প্রাণী হিংসা বিরত থাকিয়া জীবিত কাল অতিবাহিত করিলে, ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং পুনর্ব্বার আবর্ত্তন করিতে হয় না।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮ম অধ্যায়, ৭-১৫ খণ্ড।

উক্ত উপনিষদের উপন্যাস হইতে দৈব ও আসুরিক ধর্ম্মের প্রভেদ সুন্দর রূপে উপলব্ধি হয়। যাহারা অল্পদর্শী ও বিবেকবিহীন, তাহারা দেহাত্মজ্ঞানে নশ্বর দেহের পূজা ও পরিচর্য্যা করিয়া থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধনকে তাহারা যে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু বলিয়া মনে করিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? যাহাদের উদ্যোগ ও অধ্যবসায় শারীরিক সুখ সাধনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিলার্দ্ধও অগ্রসর হইতে পারে না, তাহাদের পদমর্য্যাদা, অতুল বিভব ও পরিচ্ছদের আবরণ ভেদ করিয়া আসুরিক তীব্র গন্ধ উত্থিত হইয়া থাকে, শত শত উপায়েও তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, নৈসর্গিক বৃত্তির উপরে কৃত্রিমতার তরল প্রলেপ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়ায়, অলীক উপায়ে সত্যের অপলাপ করিতে যাওয়া রজ্জু দ্বারা বায়ুকে বাঁধিয়া রাখার প্রয়াস করার ন্যায় নিতান্ত বালকতাসূচক। শারীরিক সুখ বিধানই যাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য, তাঁহারা কখনও দেব-সুলভ মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না, চিরদিন তাহাদিগকে কূপমণ্ডুকের ন্যায় নিতান্ত সঙ্কীর্ণতার মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। দেহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান যাহাদের পরম ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা তাহাদের নৈসর্গিক বৃত্তি। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র অসুরগণ জানে না যে, তাহারা দেহের সুখ বিধান করিতে গিয়া

কি ঘোরতর দুঃখের গ্রাসে নিপতিত হইতেছে, এবং স্বর্গাভিলাষী হইয়া ভীষণ নিরয়ে আত্মা নিক্ষেপ করিতেছে, এবং আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহারা প্রকৃত আত্মজ্ঞানবিহীন, তাহারাই আত্মঘাতী অসুর—তাহারাই দেহাবসানে অন্ধতমসাচ্ছন্ন অসূর্য্য নামক লোকে গমন করিয়া থাকে—উপনিষদে কথিত আছে,—

"অসূর্য্যা নামতে লোকা, অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তেপ্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যেচ আত্ম হনো জনাঃ॥"
(ঈষোপনিষৎ)

এই আসুরিক ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া—দেহাত্মবাদী নাস্তিক চার্ব্বাক এক সময়ে জলদগম্ভীর নাদে বলিয়াছিলেন,—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"

চার্ব্বাকের মত আর্য্য ঋষিগণ যুক্তি তর্ক দ্বারা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করাইয়াছিলেন, এমন কি, দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষ মাত্র বিশ্বাসী চার্ব্বাক সম্প্রদায়কে ধর্ম্মদ্বেষী রাক্ষস নামে অভিহিত হইতে হইয়াছিল। উহারা ভারতবর্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে না পারিলেও, উহাদের প্রবর্ত্তিত মত অধিকাংশ ভারতবাসীর হৃদয়ে—অল্লাধিক পরিমাণে যে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই আসুরিক বৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই আমরা আজ প্রাণপ্রতিম সহোদরকে সাধারণ জ্ঞাতি মাত্র মনে করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া থাকি, এবং সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ বৃদ্ধ পিতামাতাকেও সুখ শান্তির বিষম অন্তরায় ও আপদ বালাই মনে করিয়া নানা প্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা যে কি হইলাম, তাহা একবার স্বপ্নেও চিন্তা করি না, এবং আমাদের প্রকৃত জ্ঞান যে কি ও কতটুকু, এবং প্রকৃত জ্ঞাতব্য কি, তাহা না জানিয়াই জ্ঞান-গরিমায় স্ফীত-বক্ষ হইয়া ধরাকে শরার ন্যায় মনে করিয়া থাকি। ঈদৃশ অন্ধতা বশতঃ আমরা কখন বা সত্যের বিমল জ্যোতি পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছি। কখনও চন্দনতরু ভ্রমে ভয়াবহ বিষতরু আশ্রয় করিতেছি এবং কখনও বা নীলকমলদাম ভ্রমে ভয়ঙ্কর কালভুজঙ্গ কণ্ঠে স্থাপন করিতেছি। পিপাসার প্রবল তাড়নে প্রপীড়িত হইয়া কভু বা স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রচণ্ড মৃগতৃষ্ণিকার আশ্রয় লইতেছি! হায়! কি! ভ্রান্তি! কি মোহ! কি বিড়ম্বনা! গীতায় দৈব ও আসুরিক সম্পদের বিষয় কথিত হইয়াছে,—

"দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীং॥"
"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ"
"ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকং॥"
(গীতা ১৬ অধ্যায়)

"হে অর্জ্জুন, যাহারা অসুর ভাবাপন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা দম্ভ, অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অসুরভাবাপন্ন মনুষ্যগণ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় কিছুই জানে না, শৌচ, আচার, ও সত্যবাদিত্ব তাহাদের আদৌ থাকে না। উহারা, এই জগৎকে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠাবিহীন (স্বভাবজাত) সত্যহীন, ও নিরীশ্বর বলিয়া থাকে, এবং ইহাকে স্ত্রী পুরুষ কামোৎপন্ন ব্যতীত অন্য কিছুই স্বীকার করে না।"

"এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্প বুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥"
"আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥"
"ঈশ্বরোঽহমহংভোগী—সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া॥"

ঐ সকল মূঢ়গণ, এই প্রকার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া মলিন-চিত্ত, উগ্রকর্ম্ম-নিরত, এবং অকল্যাণকর হইয়া জগতের ক্ষয় সাধন করিয়া থাকে,—আসুর-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, শত শত আশা-পাশে আবদ্ধ ও কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাম সম্ভোগের নিমিত্ত অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। উহারা (অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন) হইয়া মনে করে "আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্ ও সুখী এবং আমি বিভবসম্পন্ন ও কুলীন, আমার মত জগতে আর কে আছে?

সঙ্কীর্ণমনা অসুর-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কদাপি ভগবানের কৃপা-পাত্র হইতে পারে না, তাহাদিগকে স্বকীয় নিকৃষ্ট কর্ম্মফলে চিরদিন নিকৃষ্ট জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এবং ভগবানের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া তাহারা নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গীতায় কথিত হইয়াছে,—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ
মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥"
"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥"
"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি,
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়,—ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"
(গীতা ১৬ অধ্যায়)

অসুর-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অহঙ্কার, দর্প, বল, কাম, ও ক্রোধ অবলম্বন করিয়া পর-দেহ ও স্বদেহে অবস্থিত আমার প্রতি দ্বেষ ও অসূয়া করিয়া থাকে। আমি সেই দ্বেষ-পরায়ণ, কুটিলমতি, অকল্যাণকর নরাধম-দিগকে সংসারে সর্ব্বদা অসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কুন্তিপুত্র! এই মূঢ়মতিগণ, অসুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বহু জন্মেও আমাকে প্রাপ্ত হয় না, তারপর তদপেক্ষা নিকৃষ্ট কীটাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

যাহারা, এই নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর অসার দেহ হইতে পরোপকাররূপ সাররত্নের আহরণ করিয়া থাকেন, এবং ক্ষণিক আপাত-মধুর, ও পরিণামে সন্তাপকর বিষয় ভোগের অকিঞ্চিৎকরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অমৃতের অক্ষয় প্রস্রবণ স্বরূপ অবনিশ্বর সর্ব্বসন্তাপের মহৌষধ নির্ম্মল অমৃতাস্বাদে অমরত্ব লাভ করিবার জন্য লালায়িত, তাঁহারাই দৈব ধর্ম্মাবলম্বী। তাদৃশ পূতচেতা মহাত্মাগণ, শতগ্রন্থি-যুক্ত কর্পটধারী, রুক্ষবেশ, উপবাস-বিশীর্ণ, ভিক্ষাজীবী দরিদ্র হইলেও পূজ্য, সমাজের অন্যায্য বিধানে তাঁহাদের স্থান নিতান্ত নিম্নতর হইলেও, সেই পরম সত্যের বিচারে তাঁহাদের স্থান, বৃথাভিমানী, দাম্ভিক, স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণমনা অনুষ্ঠান-বর্জ্জিত অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপরে অবস্থিত। জাতি কিম্বা অবস্থার লঘু আবরণে তাঁহাদের ধর্ম্মের সুবিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি কদাপি প্রচ্ছন্ন থাকে না, নিবিড়-নিকুঞ্জ প্রস্ফুটিত বাসন্তী মল্লিকার মধুর সৌরভের ন্যায় উহা স্বয়ং বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং কালের মসীময়ী যবনিকা ভেদ করিয়া চিরদিন অন্ধগণের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। যাহারা অনন্ত ও অসীম সুখের পিপাসু, ও ভোগ সুখের সঙ্কীর্ণ সীমা পরিত্যাগ করিয়া পিঞ্জর-মুক্ত পারাবতের ন্যায় অনন্তাভিমুখে উড্ডীন হয়,

মনুষ্যাকৃত প্রশংসা বা নিন্দার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া কামনা-পাশ ছেদন করতঃ বিবেক প্রদর্শিত কর্ম্ম পথে অগ্রসর হয়, ভোগ সুখের প্রলোভন বা আকর্ষণ তাঁহাদের নিকট মৃণাল-তন্তু অপেক্ষাও লঘু ও সুকোমল। এবং তাঁহারাই প্রকৃত দৈব সম্পৎ সম্পন্ন ও জগতে পূজ্য। যাঁহারা ঈদৃশ দৈববলে বলিষ্ঠ, তাঁহারাই কেবল মৃত্যুর করাল কুটীল ভ্রুকুটীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আনন্দোৎফুল্লচিত্তে পরোপকারার্থ স্বদেহ পরিত্যাগের সময়ে বলিতে পারেন—

"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি" ॥

অন্তিম পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াও আসন্ন মৃত্যুভয়ে পদাঘাত করতঃ স্বপানার্থ আনীত দুষ্প্রাপ্য অল্প পরিমিত জলের প্রতি সমরাহত মুমূর্ষ সৈনিকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি অবলোকন করিয়া তাদৃশ দয়াবীরগণই উচ্চারণ করিতে পারেন—

"Thy need is greater than mine"

গীতায় দৈব সম্পৎ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপআর্জবং।
অহিংসা সত্য মক্রোধ-স্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেঃ লোলুপ্ত মার্দ্দিবং হ্রীরচাপলং।
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচ মদ্রোহো নাতিমানিতা,
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভি-জাতস্য ভারত!"

(গীতা ১৬ অধ্যায়)

"হে অর্জ্জুন! ভয়হীনতা, চিত্তপ্রসাদ, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বেদাদিপাঠ, তপশ্চরণ, সরলতা, হিংসানিবৃত্তি, সত্যবাদিতা, অক্রোধ, ত্যাগ-স্বীকার, শান্তি, পরনিন্দা-বিরতি, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভহীনতা, কোমলভাব, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ ও অভিমান-শূন্যতা, এই ষড়্‌বিংশতি গুণ দৈবভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

"দৈবী-সম্পদ্বি মোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।"

(গীতা ১৬ অধ্যায়)

"দৈবী সম্পদ মোক্ষের কারণ, এবং আসুরিক সম্পদ বন্ধনের হেতু। যাঁহারা দৈবীভাবাপন্ন ইন্দ্রের ন্যায়, তাহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ও সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয় এবং তাঁহারাই পরমাত্মার পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া দিব্যনেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

শ্রীঅনঙ্গমোহন চৌধুরী।

নবীন যুগের ত্রিবিধ ভাব।

কেহ কেহ বলেন, নবীন যুগে এমন কিছুই নাই, যাহা প্রাচীনে নাই; একথা একদিকে যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে, নবীনে এমন কিছু আছে, যাহা প্রাচীনে নাই। বীজের দিক দিয়া দর্শন করিলে নবীন যুগকে প্রাচীন যুগের উজ্জ্বলতম মূর্ত্তি বলিয়াই অনুভূত হয়, কিন্তু বীজ যে চিরদিনই বীজরূপে থাকিবে, তাহা নহে; বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ জন্মে, সেই বৃক্ষ কি নূতন নহে?

বর্ত্তমান যুগের একটী বিশেষ ভাব এই, জন সমাজের—নরনারীর হীনাবস্থা, পতিত অবস্থা—নানাবিধ দুর্গতি বিদূরিত করিবার জন্য সুমহৎ আয়োজনে প্রবৃত্ত হওয়া, জগ-

তের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্ষমতাশালী মানবগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকে আরো দুর্ব্বল করিয়া, হীনকে আরো হীন করিয়া, অধমকে আরো অধম করিয়া রাখিবার জন্য কত আয়োজন করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন। মানব-সন্তানকে অবনত করিয়া রাখিবার জন্য—"ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণ বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য; কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণ তোমার সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করুক, তুমি ব্রাহ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" * * * "শূদ্র অস্পৃশ্য। শূদ্র-স্পৃষ্ট জল পর্যান্ত অব্যবহার্য্য। এ পৃথিবীর কোন সুখে শূদ্র অধিকারী নহে, কেবল নীচ-বৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রে বদ্ধ, অথচ শাস্ত্র যে কি, তাহা তাহার স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণে যাহা বলিবেন, তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই পরকালে গতি; কিন্তু শূদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই শূদ্রের পরকালে গতি। অথচ শূদ্রও মনুষ্য, ব্রাহ্মণও মনুষ্য।" *

এই মানব-উন্নতির বিরোধী বিধি, এই দুরাচার, অত্যাচার বিদূরিত করিবার জন্য, হীন, অন্ত্যজ বর্ণকে উত্তোলন করিবার জন্য ভারতে এক মহাশক্তি আবির্ভূত হইল। সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ভারতাকাশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকাশিত হইল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের দীপ্তশিখা যতদিন উজ্জ্বলতম ছিল, ততদিন ভারতের সুখ সৌভাগ্যের দিন ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসাদে সমাজের অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকও উচ্চপদে—শ্রমণ-পদে বরিত হইতেন। বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্ব শ্রেণীর সহস্র সহস্র যুবক বিনা ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। পরবর্ত্তী সময়ে ভক্ত চৈতন্য দেব কেবল আচণ্ডালে হরিনাম দিয়াছিলেন; বৌদ্ধগণ আচণ্ডালে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ এবং সম্মান দান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে অবনতকে উন্নত করিবার চেষ্টা বিলুপ্ত হইয়া গেল; কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া সিংহল, জাপান, চীন, তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সেই তত্ত্ব আলোচনার এই স্থল নহে; কিন্তু একথা স্মরণ করা বাঞ্ছনীয় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ে যে সকল স্থানে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সে সকল স্থানে নরনারীকে হীন করিয়া রাখিবার প্রবল আয়োজন নাই।

প্রাচীন ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—"রোমক সাম্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সহস্র সহস্র চিরদাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমুদয় কার্য্য সেই সকল দাসের দ্বারা হইত। ভূমিকর্ষণ, গার্হস্থ ভৃত্যের কার্য্য, শিল্পকার্য্যাদি চিরদাসগণের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। তাহারা গোরু বাছুরের ন্যায় ক্রীত বিক্রীত হইত। গোরু বাছুরের উপর প্রভুর যেরূপ অধিকার, দাসের উপরও সেইরূপ অধিকার ছিল। প্রভু মারিলে মারিতে পারিতেন, কাটিলে কাটিতে পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না।

* বঙ্কিমচন্দ্র-প্রণীত 'সাম্য' হইতে উদ্ধৃত।

প্রভুর আজ্ঞায় দাস রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইত—প্রভু তামাসা দেখিতেন।" * *

* "এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম রোমক সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টের উচ্চারিত মহতী বাণী লোকের মর্ম্ম ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সমক্ষে তুল্য। বরং যে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহা বাক্যে বড় মানুষের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—প্রভুর গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল।" †

ইউরোপ যীশুর কথা শুনিল। নির্যিত-গণের উদ্ধারের আয়োজন হইল। অজ্ঞানান্ধ-কার দূর করিবার জন্য খ্রীষ্ট-শিষ্যগণ জ্ঞানা-লোকহস্তে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে পতিত-উদ্ধারের বার্ত্তা বিঘোষিত হইল। ব্যাধি-গ্রস্ত নরনারী সেবা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ক্ষুধার্ত্তগণ অন্ন পাইতে লাগিল, অজ্ঞানী-গণ শিক্ষালাভ করিতে লাগিল, সকলের মধ্যে নবধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল; কিন্তু এই উন্নতি-স্রোত এক স্থানে বাধা প্রাপ্ত হইল; শ্বেতবর্ণ খ্রীষ্টানগণ স্ববর্ণের প্রতি যেরূপ উদার প্রেম এবং সমযোগিতা ও সাম্য-ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণবর্ণের প্রতি তেমনি উদারতা প্রদর্শনে সমর্থ হইলেন না। কৃষ্ণবর্ণকে শিক্ষালাভে—খ্রীষ্টধর্ম্ম লাভে বঞ্চিত করিলেন না বটে, কিন্তু ভ্রাতারূপে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সমান অধিকার প্রদান করিলেন না। ভারতবাসীর মধ্যে যেমন প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে—"ব্রাহ্মণ শূদ্র তস্মাৎ"; তেমনি শ্বেতবর্ণ জাতি মধ্যে "শ্বেত-কৃষ্ণ-পার্থক্য"—প্রবাদবাক্য মধ্যে পরি-গণিত হইয়াছে। কোথায় খ্রীষ্টধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব—বিশ্বোদর প্রেম—সাম্য? মানুষ কি এক পিতার সন্তান?

বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্ম মানবকে অল্পাধিক পরিমাণে বন্ধন-মুক্ত করিয়া স্বাধীনতার প্রসারিত রম্য ক্ষেত্রে আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা অন্যান্য বন্ধন খুলিয়া দিয়া এক স্থানে মানবকে বাঁধিয়াছিলেন। বৌদ্ধ প্রচারকগণ বলেন, "বুদ্ধের শরণাগত হও;" খ্রীষ্টান ধর্ম্মোপদেষ্টার উক্তি এই,—"খ্রীষ্টকে গ্রহণ কর।" মুসলমানগণ বলিতেছেন,—"শেষ পয়গম্বর মহম্মদকে স্বীকার কর।" ইঁহারা মানুষের চরণে মনুষকে বাঁধিতে চাহেন। মানুষকে ছোট করিয়া রাখিবার ইহাও এক প্রকার উপায় নহে কি? নব যুগের নব আদর্শ এস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অমৃতময় স্বরে বলিতেছেঃ—হে মানব, আমি তোমার চারিদিকের ভেদের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া দিব। তুমি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া—চণ্ডাল, পারিয়া বলিয়া উপেক্ষিত, সমাজের নিকট হীন ও নির্যিত; আমি তোমাকে জ্ঞানে উন্নত করিব, উন্নত সম্ভ্রান্তদিগের সঙ্গে একাসনে বসাইব, ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিব। হে মানব, তুমি অঙ্কুরিত হইতে চাও, তোমার প্রতি-বেশীগণ তোমাকে 'ধামাচাপা' দিয়া রাখিয়াছে, তুমি উঠিতে ও ফুটিতে পারিতেছ না, আমি ঐ মানব-রচিত আবরণ সরাইয়া দিব; তোমার শরীর মন হৃদয় এবং আত্মাকে খর্ব্ব করিয়া, হীন করিয়া রাখিবার যত প্রকার আয়োজন আছে, সমুদয় দূর করিয়া দিব।

নবযুগের এই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া

† "সাম্য" হইতে গৃহীত।

দুর্দ্দশাপন্ন নরনারী আশ্বস্ত হইল—দাসের শৃঙ্খল মোচন হইল। জগতে মহাধ্বনি উত্থিত হইল—মানুষ ছোট নহে, হীন নহে। প্রত্যেক নরনারী মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বরের প্রিয় সন্তান। যাহারা ব্রহ্ম সন্তানকে ছোট করিয়া—হীন করিয়া—দুর্ব্বল করিয়া—অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা নব যুগের ভীষণ শত্রু।

প্রত্যেক মানবের মধ্যে ঐশী-শক্তি বিদ্যমান; প্রত্যেক মানবের উন্নত, কার্য্যক্ষম হইবার যোগ্যতা আছে। জগতে এমন কোন জাতি নাই, যে জাতি সুযোগ, সুবিধা প্রাপ্ত হইলে এবং শিক্ষালাভ করিলে উন্নত হইতে পারে না। বহু স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল আভ্যন্তরিক ও বাহ্য নানা কারণে মানব দুর্ব্বল, তেজহীন, ধর্ম্মহীন হইয়া পশু-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। *

মানুষকে ছোট করিয়া রাখিবার আর একটী ভীষণ উপায় এই যে, তাহাকে বারম্বার শাস্ত্র, প্রবাদবাক্য, এবং ধর্ম্ম-কথা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, তোমরা দুর্ব্বল, তোমরা অজ্ঞান, তোমরা অনধিকারী, তোমরা আত্মরক্ষায়—ধর্ম্ম-রক্ষায় অসমর্থ, সুতরাং তোমরা বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাক; তোমরা যদি বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উঠিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে সমাজ-বিপ্লব—ধর্ম্ম-বিপ্লব হইবে, সুতরাং তোমরা যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায় থাক, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। দেখ, কেঁচো যদি স্বীয় গর্ত্ত হইতে বাহিরে আইসে, তবে লোকের পদতলে দলিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; তেমনি তোমরা অপরের শক্তি দেখিয়া তাহাদের মত হইতে চাহিলে মারা যাইবে। ভারতবর্ষ স্ত্রী জাতিকে—হিন্দুগণ নিম্ন জাতিকে এই রূপ বুঝাইতেছে; শ্বেতবর্ণ জাতি কৃষ্ণবর্ণ জাতিকে এই রূপ বুঝাইতেছে। এই কথার অর্থ এই যে, মনুষ্য—মনুষ্য নহে।

প্রাচীন জাতীয়বিধানে—ধর্ম্ম-বিধানে মানবের মানবত্ব লাভের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, আধুনিক উচ্চ ধর্ম্ম-বিধান কেবল মানবের মানবত্ব লাভের অধিকার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত নহে; কি উপায়ে প্রত্যেক জাতি—প্রত্যেক নরনারী জ্ঞানে—ধর্ম্মে—সভ্যতায় উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে বাধ্য। এখানেই প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ।

প্রাচীনে নবীনে আর একদিক দিয়াও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বিধান এই, ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা সমাজ অথবা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক এবং শাস্ত্রাদি দ্বারা নরনারী যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইবে। এ স্থলে নবধর্ম্ম বলিতেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন—সে পরমেশ্বরের সন্নিধানে স্বাধীন ভাবে—মুক্ত ভাবে প্রস্ফুটিত হইবে। জগৎ-বাসী নরনারী পরস্পর পরস্পরকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া বলবান করিবে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে এবং সামা-

* শিক্ষা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, দুর্ব্বল এবং সাহসহীন বলিয়া বিদেশী কর্ত্তৃক নিন্দিত বাঙ্গালীও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির তুল্য বীরত্ব প্রদর্শন করিতে যে সমর্থ, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছেঃ—বাঙ্গালী যুবক সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস দক্ষিণ আমেরিকার যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্পেন্সার সাহেবের ন্যায় বেলুন হইতে পেরাসুট সাহায্যে অবতরণ করেন। সম্প্রতি ফুটবল খেলায় সুশিক্ষিত একাদশ জন যুবক ভীষণ প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে কয়েক দল ইংরাজ-সৈন্য খেলোয়ারকে পরাভূত করিয়া বিখ্যাত 'সিলড' প্রাপ্ত হইয়াছে। লেখক

জিকতায়, সকল বিষয়ে কেহ কাহাকে দুর্ব্বল করিয়া, স্বীয় অভিসন্ধি সিদ্ধির সহায় করিয়া রাখিবে না। এ ধর্ম্ম কোন মতবিশেষ অথবা শাস্ত্র, মহাজন-বাক্য বিশেষ নহে; সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিয়া নরনারীকে অনন্তের দিকে আকর্ষণ করাই বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রচারকারী ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব। যাহারা ব্রাহ্মণেতর, তাহারা নিকৃষ্ট। ইহুদিগণ বলেন, তাঁহারা মনোনীত জাতি; জগতে আর কোন জাতি মনোনীত নহে। সত্যধর্ম্ম-রক্ষা, পালন এবং সাধন করিবার জন্য পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমেশ্বর ইহুদী জাতির মধ্যে প্রকাশিত; এ জাতিকে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তিনি দুর্বিপাকে, দুর্যোগে, অনাহারে এ জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন; এ জাতির ন্যায় বিশেষত্বসম্পন্ন জাতি জগতে আর নাই। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন, একমাত্র পরমেশ্বরের নিশান ধারণ করিবার জন্য, সত্যধর্ম্ম—ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহারা আদিষ্ট। মহম্মদ-প্রেরিত পুরুষ এবং মুসলমানগণের ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান আর কেহ নাই। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বুদ্ধের শরণাগত, তাঁহারাই বিশেষ শক্তি লাভ করিয়াছেন; নির্ব্বাণেই মানবের বিশেষত্ব। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় এইরূপে স্বীয় দলকে মনোনীত, বিশেষত্বসম্পন্ন এবং অপর অপেক্ষা ক্ষমতাশালী বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। নবযুগের ধর্ম্ম এস্থলে বলিতেছেনঃ—কোন ব্যক্তি, কোন সম্প্রদায়, কোন এক জাতি কেবল ঈশ্বরের মনোনীত নহেন; প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক নরনারী, যুবক—প্রৌঢ়—বৃদ্ধ সকলেই ভগবান্‌কর্ত্তৃক মনোনীত। অন্ধ, আতুর, পঙ্গু, সকলেই মনোনীত এবং বিশেষত্বসম্পন্ন। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—সকল দেশবাসিগণ মনোনীত। জগতে এই মহতী বাণী কি নূতন নহে? মহারাজাধিরাজ, সম্রাট যেমন মনোনীত, অতি দুঃখী, কাঙ্গাল, দীন দরিদ্র তেমনি মনোনীত। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যেমন মনোনীত, অল্প বিশ্বাসী হীন, মলিন মানব তেমনি মনোনীত। তিনি সকল জীবনের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা; সকল জীবনের প্রভু, নিয়ন্তা এবং সকল জীবনের অধিপতি দেবতারূপে অনন্তকাল বিরাজিত।

তৃতীয়, কেন এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্ট হইল, কেন অসীম আকাশে সংখ্যাহীন গ্রহ উপগ্রহ প্রদীপ্ত হইল, কেন মানবের আগমন হইল, মানবের শেষ পরিণতি কি, এ সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রাচীন ধর্ম্মজগৎ যাহা বলেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐশী-স্বরূপের ঐক্য নাই। শেষ পরিণতি সম্বন্ধে কেহ বলেন, নির্ব্বাণ লাভ—অস্তিত্ব-বিহীন হওয়াই জীবনের শেষ অধ্যায়। কোন সম্প্রদায় বলেন, জন্ম হইলেই যখন পাপের সম্ভাবনা আছে, তখন বারম্বার জন্ম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বলেন, যাঁহারা পুণ্যবান, তাঁহারা অনন্ত স্বর্গে এবং যাহারা পাপী, তাহারা অনন্ত নরকে বাস করিবে, ইহাই জীবনের শেষ পরিণতি। এ বিষয়ে নূতন আদর্শ এইঃ—জড়ে চৈতন্যে পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রস্ফুটিত। তাঁহার জ্ঞান, আনন্দ, পুণ্য, এবং মঙ্গলমূর্ত্তি বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানব-প্রকৃতির মধ্যে স্বরূপ-শোভা প্রকাশ করিতেছে। বিশ্বজগতে তাঁহার জ্ঞান, মানব-অন্তরে তাঁহারই জ্ঞান; বিশ্বজ-

গতে তাঁহার মঙ্গলভাব, মানব অন্তরে তাঁহারই মঙ্গলমূর্ত্তি। জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্য, তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করা; মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য আরো ভাল করিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করা। জগতে তিনি প্রকাশিত, মানব-অন্তরে তিনি কেবল প্রকাশিত নহেন, মানবকে অনন্তকালের জন্য প্রেমাস্পদরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ব-জগতে মানবাত্মা ভিন্ন তাঁহার প্রেমাস্পদ হইবার—চির সঙ্গী হইবার অধিকার আর কেহ প্রাপ্ত হয় নাই। এই স্থানেই মানবাত্মার মূল্য। ক্ষুদ্র মানবাত্মার তুলনায়, অনন্ত জড় জগৎ মূল্যহীন।

তিনি প্রেমস্বরূপ। আপনাকে আপনি ভালবাসিলে প্রেম চরিতার্থ হয় না। অপর হৃদয়কে আকর্ষণ করা এবং অপর হৃদয়ে আকৃষ্ট হওয়াই প্রেমের স্বভাব। এই মহা প্রেমের পূর্ণতার জন্যই তিনি মানবকে চির সঙ্গী করিয়াছেন। এই মহাপ্রেমের নবীন ভাব—মানব-সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য—ভক্তির নব দর্শনশাস্ত্র—যুগল মিলনের মহাবেদ কবিবর রবীন্দ্র নাথের একটী সঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়াছেঃ——

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে ;
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছে এই মেলা,
তোমার হিয়ায় চলেছে রসের খেলা ;
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে,
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাইত তুমি রাজার রাজা হয়ে,
আমার হৃদয় লাগি ;
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে ;
প্রভু নিত্য আছ জাগি।
তাই ত প্রভু কোথায় এলে নেমে,
তোমারি প্রেম-ভক্ত-প্রাণের টানে,
হেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

সেই পরম দেবতা প্রত্যেক সন্তানকে অনন্ত কালের জন্য মনোনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে অনন্ত নরক নাই—আছে অনন্ত স্বর্গ। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন, প্রত্যেকে মনোনীত এবং প্রত্যেকে তাঁহার প্রেমাস্পদ। এই মহাতত্ত্ব প্রাচীন ধর্ম্মবিধানে অতি সূক্ষ্ম বীজাকারে থাকিলেও বর্ত্তমান যুগে ইহার নব দিব্য মূর্ত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্ম জগৎ-বাসীকে বলিতেছেঃ— হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা আপনাদিগকে জান। আপনাকে না জানিলে, না চিনিলে, কিছুই জানা যায় না, চেনা হয় না। তোমরা প্রত্যেক নর-নারী স্বাধীন। স্বাধীন ভাবে বিশ্ব-উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইবে। যাহারা এই স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মায়, তাহারা নরকুলের মিত্র নহে। তোমরা প্রত্যেক সন্তান সেই পরম পিতা কর্ত্তৃক মনোনীত—তোমরা অন্যকর্ত্তৃক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই। কেবল মনোনীত নহে—তোমরা সেই প্রেমময়ের প্রেমাস্পদরূপে সৃষ্ট হইয়াছ। এই মহাতত্ত্ব বুঝিয়া, তাঁহার নিশান হস্তে ধারণ করিয়া উন্নতির সোপানে আরোহণ কর।

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

৭ই আগষ্ট।

মায়া-মোহের ঘোরে ডুবিয়াছিলাম,—মহা-কাল-নিদ্রার সুষুপ্তিতে মজিয়া আপন-পর ভুলিয়াছিলাম,—দেহ ঢলিয়া ঢলিয়া, চক্ষু মুদিয়া মুদিয়া পড়িতেছিল,এমন সময়ে কে যেন মধুর বংশী-ধ্বনিতে জাগাইয়া দিল, 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'—কি এক মধুর বাণী! দিশাহারা হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বুঝিলাম—উহা ৭ই আগষ্টের সম্মোহন-বাণী,—উহা মৃত জাতির জাগরণের অমোঘ প্রলেপন। ঐ দিন কি মধুর কথা শুনিয়াছিলাম!! ৭ই আগষ্ট মহা সংযমের দিন—স্থির, ধীর এবং গম্ভীর ভাবে প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের দিন। এমন দিন কি আর আছে?

বাণী শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাও যেন আজ আবার স্বপ্নের ন্যায় হইয়া গিয়াছে! সময়ের উত্থান এবং সময়ের পতন, নিভৃতে বসিয়া গণিতেছেন, নিয়তি-নেমির ত্রিকালজ্ঞ এক মহাপুরুষ,—দুর্জ্জয় যাঁহার বিধান, অতুল যাঁহার শক্তি। বানরের হস্তে খন্তা দিবার ত্রুটী বুঝিয়া, বুঝিবা,এখন তিনি নিভৃতে কি এক নবপঞ্জিকার অভ্যুদয় গণিতেছেন;—এদিকে মোহের স্বপ্নে আবার ভারত সুষুপ্তিতে ডুবিতেছে!

জন্ম মৃত্যু, উত্থান পতন—এ সকল কি ব্যাপার? কেন এই জগতে আসিলাম, কেন অনন্তকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত ছুটিতেছি, কেহ সে প্রহেলিকার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারে না। মৃত্যুর পর কোথায় আবার প্রয়াণ করিব, কে জানে? বিবেকানন্দ, রমাকান্ত, আনন্দমোহন, উমেশচন্দ্র, উপাধ্যায়, কাব্য-বিশারদ, শিশিরকুমার দেশের উন্নতির কথা ভুলিয়া আজ কোথায়? তাঁহারা পুণ্যদেহ ধারণ করিয়া এই পাপ-ধরায় আসিলেন যদি, মৃত জাতি জাগিতে না জাগিতে প্রয়াণ করিলেন কেন? এ মহা সমস্যা কে পূরণ করিবে? অবস্থা-স্মরণে দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু তবুও আমরা ধেই-ধেই করিয়া নৃত্য করি! মহা সংযমের দিনে,—এবারকার ৭ই আগষ্টে যাত্রা বা স্বদেশীপূত (?) বায়স্কোপ তামাসা প্রভৃতিতে কেবল তাণ্ডব নৃত্যেরই পরিচয় পাই! এবারকার ৭ই আগষ্ট কেন সংযম-পূত অশ্রুপাতের জন্য আসিল না? শুধু যদি নিভৃতে বসিয়া এই দিনে সকলে কাঁদিতে পারিত, তবু প্রাণের জ্বালা অনেকটা কমিয়া যাইত! কিন্তু তাহা হইল কই? "রাঙ্গা মা-ই যদি বিসর্জ্জিত হইলেন,ঢাকি রাখিয়া ফল কি?"—গিয়াছেত সব যাক্—জাগিয়া থাক্ কেবল ৭ই আগষ্টের স্মৃতি—সংযম, ধৃতি, পুণ্যপূত কৃতি, নিষ্ঠা, এবং অনাবিল প্রতিজ্ঞা;—উহা স্মরণ করিয়া মৃত জাতির জন্য আমরা কেবল অশ্রুপাত করি! অশ্রুপাতে বাধা দিতে পারে, এমন কেহ ধরায় আছে কি?

আজ অনেকেই পর-পদ-লেহন-বিপণিতে বিক্রীত—কেহ বা টাকার লোভে, কেহ বা উপাধি বা সম্মানের খাতিরে,কেহ বা ভয় ভ্রুকুটিতে,—অনেকেই ত্রি-তন্ত্রীতে(?)আজ বিক্রীত? এসকল কথা সকলেই জানেন। অনশনের ক্লেশ বড় তীব্র;—সহ্য করা সহজ নয়;—উপাধি বা সম্মান-সম্মোহন বড় তীক্ষ্ণ, উপেক্ষা করা কঠিন। আর ভয়? তাহার ক্ষমতাও

চিরকালই অপ্রতিদ্বন্দ্বী! "রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?"--এরূপ তেজের কথা সেকালে প্রমীলা প্রভৃতি ভারতমহিলাগণ বলিতে পারিতেন, আর এযুগে বলিতে পারেন, পুণ্যশ্লোক তিলক, লিয়াকত-হোসেন এবং অশ্বিকাচরণ। আমরা সময়ে সময়ে চিন্তা করি—অনেকেই বিক্রীত হইলেন যদি, তবে এই মহাপুরুষেরা নির্ভয়ের কথা প্রচার করিতে এদেশে রহিলেন কেন? ইংলণ্ড বা পঁদীচারিতে স্থান না থাকিলেও, পরলোকে ত স্থানের অভাব ছিল না! তবে তাঁহারা কেন যন্ত্রণা ভোগ করিতে রহিলেন?

কিন্তু তোমরা বল, ৭ই আগষ্টের উৎসবের জমাট ভাব এবার স্বদেশী-মেলা রক্ষা করিয়াছে, ইহা কি সুখের সংবাদ নয়? যখন কিছু করার আর উপায় নাই, তখন ইহা কি ভাল নয়? আমরা বলি—না, এই মহা সংযমের দিনে "স্বদেশীর" যখন জয় হয় নাই, তখন এরূপ ছেলে-খেলা ভাল নয়। আমরা বলি, কোটী কোটী লোক এই পবিত্র দিনে ঘরে বসিয়া প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কাঁদিলে ভাল হইত। উহা ত স্বদেশী মেলা নয়, বিদেশীর ভেল্কি মাত্র। স্বদেশ-প্রেমিক, অমিততেজা কৃষ্ণকুমারের নাম সদাই আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকি, কিন্তু এবার তাঁহার কাজের পোষকতা করিতে পারিতেছি না। বিদেশী উপকরণে প্রস্তুত তৈল এবং এসেন্স প্রভৃতিকে কিরূপে স্বদেশী-মেলায় স্থান দেওয়া হইল, বুঝি না। মোহন-মেলা দেখিয়া কোন বন্ধুকে, এক সময়ে, জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলাম, ঐ মেলার অর্থ "তৈল ও এসেন্স মাখ, চাটনি খাও ও ছবি দেখ।" বিডন-স্কোয়ারে মহা-সমিতির সেবারকার মেলা দেখিয়া আর একদিন বলিয়াছিলাম—ঐ মেলার অর্থ—"সাবান, তৈল ও এসেন্স মাখ, চাট্নি খাও, কাপড় পর ও ছবি দেখ।" এবারকার মেলারও সার চুম্বক এইরূপই, তবে সিগারেট এবং চায়ের সম্মোহন-মন্ত্রের কথা স্বতন্ত্র। এবার জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের চেষ্টায় মেলার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে। জাতীয় বিদ্যালয় এদেশের অন্ধের যষ্টী, নির্ব্বাপিত আশার একটী ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ মাত্র, কিন্তু তাহাও অবাধ উদাসীনতায়,'বিদেশী'র প্ররোচনায় যায় যায় হইয়াছে! যদিও বৃদ্ধ আত্মত্যাগী তারকনাথ আজও ইহার জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু ঢালিতেছেন বটে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা, জানি না। কেননা, ওপথে আজ কাল বড় কেহ হাটিতে চাহেন না, কি জানি কেন, অনেকে ছেলেদিগকে ঐ কলেজ হইতে তুলিয়া আনিতেছেন, অনেকে সাহায্য বন্ধ করিতেছেন;—ঐ নাম আর না শুনিতে হয়, তাহারও নাকি আয়োজন করিতেছেন!! কেননা, জাতীয় শব্দটাই যে আপত্তিজনক! নির্ব্বাপিত আশার স্ফুলিঙ্গ ছিল,—ইণ্ডিয়ান-ষ্টোরস, বঙ্গলক্ষ্মী-কটন-মিল, হিন্দুস্থান-ব্যাঙ্ক, তাহেরপুরের চিনির কল, কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি, কিন্তু সে সকলেও কতরূপ স্বার্থ-জল নিক্ষিপ্ত হইতেছে, বিশেষজ্ঞগণ সকলেই তাহা জ্ঞাত আছেন। "স্বদেশী"র জয় ঘোষণার সময় আজও উপস্থিত হয় নাই—বরং আমাদের অপদার্থতা ঘোষণার সময় আসিয়াছে। উপরে বিবৃত ত্রিবিধ স্বার্থের কোন্ স্বার্থ কোথায় কি কাজ করিতেছে, আমরা জানি না, কিন্তু শুনিয়া হতজ্ঞান হইতেছি, কাহারও পরিণাম আশাপূর্ণ নয়! ক্রমে ক্রমে বাজার বিদেশীতে পূর্ণগ্রাস করিয়া ফেলি-

তেছে! এইত দেশের অবস্থা, এই অবস্থা স্মরণে ক্রন্দন করা উচিত, না নৃত্য করা কর্ত্তব্য? এই দুঃখের দিনে, ৭ই আগষ্টের মেলায় আমোদের ব্যাপার যাত্রা হইল কেন, কিছুতেই বুঝিতেছি না? বাদ্য বাজিল কেন, তাহাও বুঝিতেছি না! আর চা সিগারেট চলিল কেন, জানি না! আর বায়স্কোপ কোন্ সূত্রে স্বদেশী হইল, বুঝিতেছি না। শিবাজী-উৎসবের পুতুল-নাচ (?) বাদ পড়িল কেন, তাহাও জানি না! তৈল এসেন্স বড় বড় লোকের মার্কা লইয়া স্বদেশী বাজারে চলিতেছে, তাহা জ্ঞাত আছি। অনেক স্বদেশী পাওয়ার পত্রিকায় বিদেশী কাগজ ও কালী চলিতেছে, তাহাও জানি। রসনার খাতিরে এদেশের চিনির ব্যবসা মাটী হইতেছে, তাহাও ভুলি নাই! কিন্তু ৭ই আগষ্ট যে মহা সংযমের পবিত্র দিন, এদিনের পবিত্রতা রক্ষিত হইল না কেন? হায়, গুরুদশাগ্রস্ত মদ্যপের আতপ-তণ্ডুলের মস্ত-প্রত্যাশার ন্যায়, কেন গুরুদশার সংযমের পবিত্রতা রক্ষিত হইল না?

খাটী স্বদেশী ভিন্ন দেশ-রক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। গবর্ণমেণ্টও একথা বুঝেন এবং "স্বদেশী" প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট। কিন্তু আমরা এখন এই মহাগুরু "স্বদেশীর" মহামৃত্যুর কথা শুনিলে হাস্য ও নৃত্য করি! আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে আবার "বিদেশীর" প্রাধান্য সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিতেছে! —৭ই আগষ্ট মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে!! আমরা এমনই হতভাগ্য যে, এই দিনও পুণ্য-ভূমির দুর্গতি স্মরণে এক বিন্দু অশ্রু ফেলিতে পারিলাম না! "স্বদেশীর" মৃত্যুতে আমাদের যে মহাগুরু নিপাতের গুরুদশা উপস্থিত,—তাহা বুঝিয়াও বুঝিলাম না এবং কি জন্য জানি না; আমরা এই গুরুদশাও সংযম-পূত পবিত্র ভাবে প্রতিপালন করিতে পারিলাম না! মহা শোকের দিনে গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ সাজে কি?

বড় বড় লোকের বড় বড় কাজের বিরুদ্ধে কথা বলিলে সকলের বিরক্তি উৎপন্ন হয়; কিন্তু কোন সুফল ফলে না। বরন্তু যাঁহারা "ভণ্ড স্বদেশী", তাঁহাদের আদরই এদেশে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, দেখিতেছি। সুতরাং এমন নির্ব্বাক-নীতিই ভাল। হায়, আমরা যদি খাটী স্বদেশী হইতাম—তবে নিজেরা স্বদেশীর বিরুদ্ধে চলিতে পারিতাম না, আত্মীয় সকলকেও চলিতে দিতাম না,—কিন্তু দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায়, "খাটী স্বদেশী" আজ কাল আর বড় মিলে না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র দেশ "বিদেশী" গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মহাগুরুর মহাপতন হইয়াছে! এহেন দিনে নৃত্য আস্ফালন কিসের? এখন ঘরে ঘরে নিভৃতে বসিয়া শুধু ক্রন্দন করার সময় উপস্থিত!—

"তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি জানিবি তাহা, অন্যে কেহ জানেনা,
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা?"*

কোন শক্তি নাই, জানি; কিন্তু খাটী হওয়ার শক্তিও ছিল নাকি?—পুণ্যের জোরে প্রতারণা না করিবার শক্তি ছিল নাকি!—সংযমের বলে ইন্দ্রিয় ও রিপু জয় করার ক্ষমতা ছিল নাকি?—স্বদেশের সেবা করিবার সময় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবার শক্তি ছিল নাকি? হায় যে স্বার্থ, তুই শেষে কাল হইলি? "কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা" তুই-ই শেষে সর্ব্বনাশ সাধন করিলি! হা ঈশ্বর, শিব গড়িতে বানর হইয়া গেল যে!!

বলা এবং লেখা, সবই বৃথা, ক্রন্দন ও বুঝি বা বৃথা!—এখন শ্রেয়ঃ কেবল মৃত্যুর পথ! ৭ই আগষ্ট মহাযজ্ঞের হোতা আনন্দ-মোহন প্রভৃতি মহারথী দেশের মহাদুঃখ স্মরণ করিয়া যে পথে গিয়াছেন, আমরা এমন সেই পথে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছি! এই মহা গুরুদশার পরিণাম—অবনতি, পতন,—শেষে মৃত্যু! উহাই বুঝি বা নিরুপায়ের এক মাত্র উপায়। হতবুদ্ধি আমরা, আর বলিব কি, বিধাতার বিধানই জয়যুক্ত হউক।

কবি বিহারীলাল

যে সকল মহাপুরুষ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া চরণ-কমলস্পর্শে ধরাধাম পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, পাষাণময় কাল-গয়াসুর-শিরে তাঁহাদের অক্ষয় পদচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। শত সহস্রলোক সেই পুন্যপাদপদ্ম দর্শন ও স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতেছে। কিন্তু যে নর নারায়ণেরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কে? তাঁহাদের নাম, ধাম, জাতি, কুল, স্বভাব চরিত্র কেহ জানে কি? জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজগতে তাঁহারা আপন আপন বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া কেন্দ্র-শক্তি রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের লীলা, তাঁহাদের অভিনয়, তাঁহাদের তাণ্ডব নৃত্য, তাঁহাদের গান, তাঁহাদের উচ্ছ্বাস, তাঁহাদের প্রাণ চুম্বক বলে আকর্ষণ করিয়া অপূর্ব্ব যাদুমন্ত্রে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদিগকে চিনিনা, কিন্তু ভালবাসি; জানি না, কিন্তু প্রাণ ঢালিয়া সেবা করি; দেখি নাই, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরের নিভৃত কক্ষে রত্নসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তাঁহাদের জন্ম মনু বংশে, মনুষ্য জাতিতে, ভূলোক ধামে, মন্বন্তরযুগে। (১) তাঁহাদের নিবাস কল্পকল্পান্তর ব্যাপিয়া ইহলোক ও পরলোক সন্ধিতে। তাঁহারা গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, বশিষ্ঠ, ক্রতু, অত্রি-অঙ্গিরা পুলহ-পুলস্ত, দেবগুরু বৃহস্পতি, দৈত্যগুরু শুক্র। সেই অমর পুরুষপুঙ্গবদিগের ভাষা ব্রহ্মাণ্ডের ভাষা, তাঁহাদের দৃষ্টি অস্থিচর্ম্ম ভেদ করিয়া প্রাণের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে। তাঁহারা আপন ভাবে আপনি বিভোর, আপন উন্মাদনায় আপনি মত্ত। তাঁহাদের চরণ-বিগলিত অমৃত-তোয়া-জাহ্নবী-সলিল পান করিয়া নরলোক কৃতার্থ। মানুষ স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া, তাঁহাদের পতাকার নিম্নে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছা-সৈন্যরূপে দণ্ডায়মান হয়। তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলেও, আমরা বল পূর্ব্বক তাঁহাদের কাষ্ঠপাদুকা শূন্য সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তদুপরি শ্বেতছত্র ধারণ করি। তাঁহারা জননায়ক, লোকপালক, নরসমাজের অনভিষিক্ত সম্রাট। তাঁহাদের যুগল চরণ রাজন্য কিরীট-স্খলিত কুসুমকেশর-ভূষিত। তাঁহাদের অঙ্গুলী হেলনে মানুষ উঠিতেছে ও বসিতেছে, তাঁহাদের তালে তালে জনসমাজ নৃত্য করিতেছে! তাঁহাদের কটাক্ষ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের ভাষা, ভাব ও মত লইয়া আমরা আপন আপন দুর্গ রচনা করি।

(১) মার্ক টোয়েন বলিয়াছিলেন যে—He was born in Aberdeen, County of Cork, England. এ ব্যঙ্গের ভিতরেও কি সত্য রহিয়াছে! Mark Twain's Choice works, P vii, Chatto & Windus.

সেই শক্তির উৎস, বিজলীপুঞ্জ, আকর্ষণ-কেন্দ্র, প্রতিভার অবতার মহাপুরুষদিগের সমাজে কবি ও লেখকদিগের আসন অতি উচ্চে। মানব-সমাজে প্রতিভার প্রকাশ কবির কণ্ঠে। তাঁহাদের মধুর ঝঙ্কারে আমাদের হৃদয়-তন্ত্রী নৃত্য করে। তাঁহাদের কাকলীগান আমাদের 'কাণের ভিতর দিয়া' মরমে প্রবেশ করে। সে মুরলী-ধ্বনি যেন

অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘনে,
মধুর মুরলী গীত। (১)

তাহা যে শুনিবে, সেই চিত্ত-হারা হইয়া কহিবে—

ওই ওই শুন কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণ। (২)

অতএব তাঁহারা ঋষি, তাঁহারা বিভু, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা বিধাতার বরপুত্র—অলৌকিক মহাপুরুষ। কত যুগ যুগান্তর হইল নূতন কবি প্রাচীনদিগের পন্থানুবর্ত্তন করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"পূর্ব্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুতঃ।" (২)

ডেভিডের বীণার ঝঙ্কারে স্থাবর পাষাণ জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। হোমার ও ভার্জ্জিল, দাঁতে ও সেক্‌সপীয়র, মিল্টন ও বার্ণস, বাল্মীকি ও ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি, কবীর ও তুলসীদাস, নামদেব ও তুকারাম, জয়দেব ও বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস, হেমচন্দ্র ও মধুসূদন দৈবশক্তির প্রেরণায়, প্রতিভার উন্মাদনায় যে গান গাহিয়াছেন, তাহা অবিনশ্বর। নশ্বর দেহ বিলুপ্ত হইলেও তাঁহাদের সনাতন স্মৃতি মানব-হৃদয় অধিকার করিয়া যাবচ্চন্দ্রদিবাকর জাগরুক রহিবে।

কবি দেবদূত। তিনি ভগবৎপ্রেরিত দেবযোনি দেববার্ত্তা প্রচার করিতে ভূতলে আবির্ভূত হন। বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষ বিশেষ বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের যুগে যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব সম্ভব নহে। কিন্তু কবির সার্ব্বভৌমিক প্রাণ বার মাস সকল ঋতুতেই কাকলীলহরী ঢালিয়া বিশ্ববাসীর চিত্ত হরণ করিতে পারে। (১) জগতের নাট্য-মন্দিরে কবির দ্বার অবারিত। আচার্য্যপ্রবর কার্লাইল বলিয়াছেন, কবির একাধারে বহু শক্তি বিরাজ করে—তিনি দার্শনিক, তিনি জ্ঞানী, তিনি রাজপুরুষ, তিনি ব্যবস্থাকার। (২) তাঁহার লেখনী যে জ্বালাময়ী অনল শিখা উদ্গীরণ করে, তাহা তাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাস মাত্র। তাঁহার প্রাণস্পর্শী মর্ম্মভেদী অমর সঙ্গীত প্রহেলিকাময়। তাহা যে বুঝিয়াছে, সে-ই মজিয়াছে, যে না বুঝিয়াছে, সেও মজিয়াছে। এহেন কবির জন্ম যে দেশে, সে দেশ ধন্য। আর ধন্য সেই জাতি, যে জাতি কবির ভাষায় মর্ম্মগাথা গাহিতে পারিয়াছে।

ভারতভূমিতে ব্রজভাষা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। কৃষ্ণপ্রেমের তরল লহরী ব্রজভাষার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাধুরী ঢালিতেছে। যে ভাষার বলে গোবিন্দের কমলাননে আধ আধ বুলি ফুটিয়াছিল, যে ভাষায় যশোদা-জননী ননীচোর নীলমণিকে তাড়না করিয়াছিলেন, যে ভাষায় শ্রীদাম সুদাম সুখাসনে রাখাল গোপাল করতালি দিয়া মধুর কণ্ঠে গোষ্ঠ গান করিতেন, যে ভাষায় বাঁশীর নিশ্বাস

(১) চণ্ডীদাস।
(২) ঋক্।

1. The Poet is a heroic prince belonging to all ages. T. Carlyle.

2. I fancy there is in him the Politician, the Thinker, Lagislator, Philosopher;—in one or other degree, he could have been, he is all there. Ibid. Heroes and Hero-worship.

শুনিয়া ললিতা বিশখা সখী-পরিবেষ্টিতা রাজরাজেশ্বরী রাইকিশোরী কাতর প্রাণে কহিয়াছিলেন—

কি কবে রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে॥(১)

আর যমুনার জলে কুলশীল লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া বলিয়াছিলেন—

একে সে কালিন্দীকূল, ত্রিভঙ্গিম তরুমূল।
সজল জলদ শ্যাম তনু। (২)

অতএব—

অপযশ ঘোষণা, থাক দেশে দেশে,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায়, এতনু সঁপেছি।
তিল তুলসীদল দিয়া॥ (৩)

যে ভাষায় গোপবধূগণ 'পহু' মাধব সহ প্রেমালাপ করিয়া তমাল বনের মধুনিকুঞ্জে 'মঞ্জুল কঞ্জুলে নিকুঞ্জ মন্দির' মুখরিত করিয়াছিল, যে ভাষায় মানিনী বৃষভানুদুহিতার গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া অপরাধী শ্যাম নটবর 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' বলিয়া কাতর করুণ নিবেদন করিয়াছিলেন, যে ভাষায় 'গোকুল মাণিক' মাধব ব্রজ ছাড়িয়া মথুরাপুরীতে প্রয়াণ করিলে বিরহ-কাতরা রাধা—"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?" ৪ বলিয়া ব্যাকুল বিলাপ করিয়াছিলেন, যে ভাষায় ললিত মধুর আবেশ ভরা তান ভারতীয় ভাষা-পরিবারে দূর দূরান্তরে প্রতিপ্রাণে অস্থি মজ্জায় মলয়রাজি অমিয় কণিকা সেচন করিয়াছে, সে ভাষার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না।

ধীরগতি যমুনার নীলজল-তটে কোথা কদম্ব-তলে মৃগযূথ-সমাকুল তৃণ-প্রান্তরে প্রকৃতির উত্তেজনায় গোপাঙ্গনা-চিত্ত আকুল হইয়াছিল। সে অনুকূল ক্ষেত্রে আবেগময়ী ভাষায় কবিত্বের বিকাশ স্বাভাবিক। সে অলৌকিক দেবদুর্ল্লভ ভাষায় যে সকল বিহঙ্গ—শ্যামা, পাপিয়া, কোকিল—আত্মহারা হইয়া, আপনারা উদাস হইয়া জগৎকে উদাস করিয়া সুধাকণ্ঠে ব্যোমমার্গ পূর্ণ করিয়া আনন্দ-সঙ্গীত গাহিয়াছিল, তন্মধ্যে ব্রজকবি বিহারীলাল অদ্বিতীয় কলাপতি কবিকুল-সম্রাট্। তাঁহার 'বিহারী সত্‌সই' ব্রজ ভাষার এক অপূর্ব্ব সরস কাব্য।

যখন আমরা হিন্দুস্থানী হইতে স্বতন্ত্র জাতি ছিলাম না, যখন আমাদের স্বতন্ত্র সাহিত্য ছিল না, আমরা হিন্দীকবি বিদ্যাপতির ললিত পদাবলী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতাম, জয়দেব-পাপিয়ার মধুর তানে আত্মহারা হইতাম, তখন আমাদের চণ্ডীদাস, আমাদের ভারতচন্দ্র হিন্দীর রত্ন-ভাণ্ডার হইতে বাক্যের পসরা ভিক্ষা মাঙ্গিয়া আনিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যের হাটে প্রধান দোকানী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী, গুজরাটী, মারাঠা, সকলেই হিন্দীর হাত ধরিয়া সাহিত্যের দরবারে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। হিন্দী ব্রজভাষার চরণ-তলে বসিয়া কত যুগ সাধনার পর এ দুর্ল্লভ সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা কে জানে? মথুরা-প্রাঙ্গণে আর্য্যানার্য্যের সমন্বয় চন্দ্রাতপ-তলে যেদিন গীতা বেদ প্রচারিত হইয়াছিল, যমুনা-তীরে কেলীকদম্ব মূলে নন্দদুলালের

(১) বিদ্যাপতি।
(২) জ্ঞানদাস।
(৩) গোবিন্দদাস।
(৪) বিদ্যাপতি।

মোহন বংশী যে দিন রাধা রাধা রাধা সুর সাধিয়া কালিন্দীর জল উজান বহাইয়াছিল, সেই দিন হইতে ব্রজ ভাষার গৌরব। অবতাররূপী বাসুদেব ভারতে যে প্রেম-মন্ত্রের বোধন করিয়াছিলেন, তাহার বীজমন্ত্র ব্রজভাষায় উচ্চারিত হইয়াছিল। ভারতে এমন ভাষা নাই,যাহার বেলাভূমিতে সে প্রেম-তরঙ্গের উর্ম্মি-ভঙ্গ আঘাত করে নাই। সে রাসলীলা, সে কুঞ্জলীলা, সে হোলি-খেলা ভারতে জ্ঞানশুষ্ক জীর্ণ-দেহে নবযৌবন সঞ্চার করিয়াছিল। সে প্রেম-আহ্বানে মাতোয়ারা হইয়া পুরুষ নারী, বালবৃদ্ধ বিহ্বল-নৃত্য করিয়াছিল। ব্রজাঙ্গনাগন কুলশীল ত্যাগ করিয়া, ভেদাভেদ জ্ঞান ভুলিয়া, সখি-ভাবে, শুদ্ধ মনে, আকুল প্রাণে রাখাল-বালকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মিলন-সঙ্গীত গাহিয়াছিল। সে কৃষ্ণ-প্রেমে পূর্ব্বরাগ ছিল, অনুরাগ ছিল, অভিসার ছিল, আবেগ ছিল, মিলন ছিল, বিরহ ছিল, অভিমান ছিল, মানভঞ্জন ছিল। তাই ব্রজ-ভাষায় আছে কুন্দহাসি, অপাঙ্গদৃষ্টি, নূপুরনিক্কণ, কলভাষণ—স্মরণে যাহার পরশ পাইয়া চৈতন্য চেতনা হারাইয়াছিলেন। এহেন ব্রজ-ভাষার মধুর ছন্দে চারু পদ্যে সাতশত শ্লোকে মহাকবি বিহারীলাল রাধাকৃষ্ণলীলা-কাব্য "সত্‌সই" রচনা করিয়াছিলেন।

বিহারীর বংশ ও সময় লইয়া চিরবিবাদ চলিয়া আসিতেছে। কর্ম্মপ্রাঙ্গণের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া একান্তে বসিয়া লেখনী-মুখে কবি যে প্রতিভা-দীপ্তি প্রকাশ করেন, বাক্‌বিন্যাসের অপূর্ব্ব কৌশলে কবি যে মায়া-মন্ত্র সৃষ্টি করেন, তাহা বুঝিতে পারে কয় জন? বুঝিতে পারিলেও তাহার আদর করে কয় জন? আদর করিলেও তাহার মূল্য প্রদান করিতে অগ্রসর হয় কয় জন? তাই লোকে বুঝিয়াও বুঝে না, মোহিত হইয়াও আত্ম প্রকাশ করে না। সুতরাং কবিকে শীতে কাঁপিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, বাতাসে উড়িয়া, আঁধারে আসিয়া আঁধারেই চলিয়া যাইতে হয়। কে তাহার সন্ধান লয়? কে তাহার ব্যথার ব্যথী হইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দেয়? কে তাহার কষ্টের সময় আর্ত্ত-নাদ শুনিয়া সহানুভূতির নিশ্বাস ত্যাগ করে? কে তাহার দৈন্যে দয়া, ক্ষুধায় অন্ন, শীতে বস্ত্র, পিপাসায় বারি লইয়া কুটীর দ্বারে উপস্থিত হয়? তাহার কাকলীগানে জগৎ মুগ্ধ, তাহার কুসুম-সৌরভে বিশ্ব আমোদিত, অথচ কেহ তাহাকে চেনে না বা জানে না। তাই আমরা দেখি, গ্যারেটে জন্‌সন্, নাট্যমঞ্চে সেক্‌স্‌পিয়র,অন্নচিন্তায় কালিদাস। তাই উত্তর কালে বংশধরগন আঁধার হইতে ঝঙ্কার শুনিয়া দিশেহারা হয়, আর বেকনের স্কন্ধে সেক্‌সপিয়রের ভার চাপাইয়া সিংহলে কালি-দাসের জন্মোৎসব করে।

কেহ বলেন, বিহারী বুন্দেলখণ্ড-নিবাসী কবিপ্রিয়াকার কেশবের আত্মজ। কেহ বলেন, তিনি ভাট ছিলেন। কেহ বলেন, তিনি চৌবে। কবি স্বয়ং বলিয়াছেনঃ—

জনম্ লিয়ো মথুরা নগর সুবস্ বসে ব্রজ আয়
মেরে হরো কলেস সব কেশব কেশব রায়॥(১)

ছাপরা জেলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী-গ্রন্থকার ৺অম্বিকা দত্ত ব্যাস তাঁহার বিহারীবিহার গ্রন্থের ভূমি-কায় লিখিয়াছেন যে, বিহারী কবি মাথুর চৌবে ছিলেন। তিনি আপনাকে শ্রোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি ধৌম্য গোত্রীয় ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার অশ্ব-

১) প্রগট ভয়ে দ্বিজরাজকুল বসে সুবস ব্রজ আয়।

লায়ন শাখা ও কশ্যপ, অত্রি, সারণ্য এই তিনপ্রবর ছিল। মহাবিদ্যা তাঁহার কুলদেবী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কেশব এবং পিতামহের নাম 'রায়' ছিল। ইঁহাদের আদি নিবাস মৈনপুরী, কিন্তু সম্ভবতঃ গোয়ালিয়ার বিহারীর জন্মস্থান। মথুরায় তাহার 'মথুরাপুরী'। তাঁহার শ্বশুর মথুরাবাসী ছিলেন। তিনিও মথুরায়ই বাস করিতেন। (১) তাঁহার পিতা কিছুদিন বুন্দেলখণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। এজন্য বিহারীর ভাষায় সৌ,জৌ, স্থৌ, পোসার, লখিবী, দেখিবী, প্রভৃতি বহু বুন্দেলখণ্ডী কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

বিহারীলালের শিক্ষা দীক্ষাদি সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। তিনি উর্দ্দু ভাষার একটু চর্চ্চা করিয়াছিলেন বলিয়া বিবেচনা হয়। তাঁহার দোহায় জুমান, তাফ্‌তা, কজাকী, জুরাফা, কিবলনুমা, কালবুত প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। স্থানে স্থানে তিনি এরূপ নিপুণতার সহিত ফরাসী শব্দ নিজস্ব করিয়া দোহার চরণে মিশাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহার ফরাসী ভাষায় পাণ্ডিত্য সূচনা করে। বিহারীলাল সংস্কৃত ভাষায়ও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার 'কন্দিগোলক' 'জাতরূপ' 'তপনতুল' 'বৃষাদিত্য' প্রভৃতি শব্দ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

বিহারী কবি আরও কোন কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এক বিহারী সত্‌সই তাঁহার কীর্ত্তি অমর করিয়া রাখিয়াছে। (২)

(১) বিহারী-বিহার ভূমিকা ৬-৭ পৃষ্ঠা ও ফুটনোট।
(২) এ পর্য্যন্ত ২৮ জন প্রসিদ্ধ টীকাকার বিহারী সত্‌সই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই গ্রন্থের গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত টীকা, অনবর চন্দ্রিকা টীকা, রসচন্দ্রিকা, হরিপ্রকাশ টীকা, লাল চন্দ্রিকা টীকা প্রভৃতি।

মহাদেশকল্প সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে অসংখ্য স্বাধীন ও করদ নৃপতিগণের রাজসভায় রাজানুগ্রহ-পুষ্ট হইয়া প্রতিভার বিকাশ হইত। সাহায্য, সহানুভূতি ও উৎসাহ-বারি সিঞ্চনে ভারতমালঞ্চে প্রতিভা কুসুম আপনি ফুটিয়া 'বাস বিলাইত'। আকবরের তানসেন ও বীরবল আগ্রার পুষ্পস্তবকে গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে গ্রাম্যোদ্যানের কোণে বিকশিত হইয়া মালীর চিত্ত আকুল করিয়াছিল। তখন কাব্যামোদী, বিদ্যোৎসাহী, স্বাধীন নৃপতিগণ মুক্তহস্তে সুকবিদিগকে পুরস্কৃত করিতেন। সে পুরস্কারের কথা এখন উপন্যাসের অলীকোক্তি।

কবি ফর্দোশী ও সুলতান মাহমুদের গল্প ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। মহারাজ শিবাজী ভূষণ কবির এক কবিতার জন্য তাঁহাকে ৫২টী হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন (১)। গ্রিয়ার্সন সাহেব বলেন, একবার তিনি একটী মাত্র দোহার জন্য ৫ হস্তী ও ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২)। কবি বিহারীলালের কবিতার আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদা কবি বিহারী আমেরের প্রসিদ্ধ রাজা মির্জা জয় সিংহের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষ করিলেন। রাজা দ্বিতীয় দশরথ হইয়াছিলেন। তিনি এক নবীনা সুন্দরীর প্রেমে অতি মাত্রায় আসক্ত হইয়া কয়েকমাস যাবৎ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেন না। পাত্র মিত্র

(১) বিহারী বিহার,—ভূমিকা ৫পৃঃ

2. "On one occasion he got as much as five elephants and twenty-five thousand rupees for a simple poem." Grierson's Modern literary history of Hindustan.

অমাত্য সকলেই বিমর্ষ। রাজ্যে হাহাকার। কিন্তু কাহার সাধ্য বিলাসমত্ত রাজার নিকট অন্তঃপুরে সংবাদ প্রেরণ করে? বিহারী একবার রাজদর্শনের জন্য সকলকে মিনতি করিলেন, কিন্তু কোনই ফলোদয় হইল না। পরিশেষে তিনি এক অভিসন্ধি স্থির করিলেন (১)। মালিনী চিরদিনই রাজান্তঃপুরের দূতী। তিনি এক কবিতা লিখিয়া 'মালিনী মাসীর' ফুলের সাজিতে রাখিয়া দিলেন। কুসুম-শয্যায় কবিতা পাইয়া রাজার চমক ভাঙ্গিল। রাজা পড়িয়া মোহিত হইলেন :—

নহিঁ পরাগ, নহিঁ মধুর রস,
নহিঁ বিকাশ ইতিঁ কাল।
অলি কলীহী সোঁ রমিয়ো আগে কৌন্‌হবাল।২

মহারাজ কবির সন্ধান লইতে বাহিরে আসিলেন। বহুকাল পর প্রজাগণ রাজ-দর্শনে সুখী হইল। বিহারীলালের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল। তিনি অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিহারীকে রাজধানীতে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার কবিতা অতি মধুর। আপনি রাজসভায় আসিয়া প্রত্যহ দুই একটী কবিতা রচনা করিয়া আমার চিত্ত বিনোদন করুন। বিহারীর ন্যায় কবিদ্বারা রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া জয়সিংহ গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। জর্ম্মান্ সম্রাট্ 'ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট্' আপনার উপাধি সমূহের অন্তে "Possessor of Voltair" (ভল্টেয়ার রত্নের অধিকারী) এই নূতন উপাধি যোগ করিয়া গৌরব ও স্পর্দ্ধা বোধ করিতেন। (১)

(১) বিহারী বিহার—ভূমিকা ৯ পৃঃ
(২) হবাল—হাল—অবস্থা।
1. Vide P. 83 Macaulay's Essays, Popular Edition, Longmans Green & co

বিহারী প্রতিদিন দুই একটী কবিতা রচনা করিয়া মহারাজের তুষ্টি সম্পাদন করিতেন। কয়েক মাস অতীত হইলে কবি স্বগৃহে যাইতে উৎসুক হইলেন। মহারাজ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত বিহারী-রচিত দোহাবলী গণনা করিতে আদেশ দিলেন। দেখা গেল, সাতশত দোহা সঞ্চিত হইয়াছে। শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্। শুনা যায়, নবাব ওয়াজীদ আলী সাহ তাঁহার দরবারের প্রধান কবিকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, "তুমি কি দুই একটী করিয়া 'শের' রচনা কর? আমি পায়খানায় বসিয়া মুখে মুখেই একশত শের (কবিতা) রচনা করিতে পারি। চতুর কবি বিনয়ের সহিত সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিলেন "হুজুর, গান্দা (১) তিত ঐসাহী হৈ।" আজ্ঞে দুর্গন্ধও তেমনি!

রাজা জয়সিংহ বিহারীকে সাতশত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতে আদেশ করিলেন। বিহারী দুঃখিত হইলেন, তাঁহার কবিতার উচিত মর্য্যাদা রাজা বুঝিলেন না। তিনি স্তুতি-ছলে দুই একটী কবিতায় কটাক্ষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।—

চলত্ পাই নিগুণী গুণী ধনমণি মোতী মাল।
ভেট ভয়ে জয়সাহ সোঁ ভাগ চাহিয়ত্ ভাল॥
রহতি ন রন জয়সাহমুখ লখি লাকন্‌কী ফৌজ!
জাঁচি নিরাখর উচলৈ লাখন্‌কী মৌজ॥

যদি ভাগ্য ভাল হয়, গুণীই হও আর নির্গুণই হও, রাজা জয়সাহের সঙ্গে পথে ঘাটে সাক্ষাৎ হইলেও ধন, মণি, মুক্তামালা বহু লাভ করিতে পার।

লক্ষ সৈন্যও জয় সাহের মুখ দেখিলে আর রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারে না। নিরক্ষর ব্যক্তিও লক্ষ লোকের সুখ ভোগের উপযুক্ত

(১) অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য, পক্ষে দুর্গন্ধযুক্ত।

অর্থ রাজার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লইয়া যায় (২)।

এই সময় গুণগ্রাহী পান্নারাজ ছত্রসাল ভূষণ কবিকে যথোচিত সম্মান করিবার সামর্থ্য নাই মনে করিয়া তাঁহাকে পাল্কীতে বসাইয়া স্বয়ং স্কন্ধে করিয়াছিলেন (১)। বিহারী পান্নারাজের সভায় গেলেন এবং তাঁহাকে স্বরচিত দোহা দেখাইয়া মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিহারী সতসইর বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পাঁচখানা গ্রন্থ পারিতোষিক প্রদান করিলেন। বিহারী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ দিয়া নিবেদন করিলেন যে, ধনরত্নের লোভে তিনি পান্নারাজের সভায় আগমন করেন নাই। জয়সিংহের রাজধানীতে তাঁহার কবিতার প্রকৃত মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারে নাই। এজন্য তিনি 'ভারতভূষণ,' কবি-কল্পদ্রুম' পান্নারাজ সকাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিহারী কবির পান্না রাজধানীতে অবস্থান কালে 'সত্‌সই' গ্রন্থ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। ছত্রসালের রাজসভায় প্রাণনাথ কবি ছিলেন। হিংসা তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। বিহারীর অনুকরণে সত্‌সই গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাঁহার পুস্তকই উৎকৃষ্টতর। আসল ও নকলে, প্রতিভা ও বিদ্বেষে চিরদ্বন্দ্ব। এই বিবাদের মীমাংসা হয় না দেখিয়া বিহারী ব্যথিত চিত্তে প্রস্তাব করিলেন যে, উভয় গ্রন্থ শ্রীযুগল কিশোরের মন্দিরে রাখিয়া দেওয়া হউক। প্রভু যে খানা গ্রহণ করিবেন, তাহাই নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। রাত্রিতে উভয় পুস্তক বিগ্রহের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মন্দিরের দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ করা হইল। পরদিন দেখা গেল, বিহারীলালের সত্‌সই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের হস্তাক্ষর রহিয়াছে! বিহারী ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গাহিলেন :—

নিত্‌ প্রতি একত্‌ হী রহত্‌ বৈস্‌ বরন্‌ মন এক।
চহিয়ত্‌ জুগল্‌ কিশোরলখি লোচন্‌ যুগল অনেক ॥ ১

বর্ণ বয়স মন সব একই রূপ। রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন করিতে হইলে বহু যুগল চক্ষুর আবশ্যক।

ভারতে কবি-প্রতিভার সমাদরের জন্য এরূপ কল্পনা সৃষ্টির প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ সত্‌সই কাব্যের এরূপ দৈব-পরীক্ষা হইয়া থাকিলে চাক্ষুষ ঘটনার অন্তরালে কাহারও চতুর হস্ত ক্রীড়া করিয়াছিল।

বিহারী ছত্রসাল-প্রদত্ত পঞ্চ গ্রাম তাচ্ছিল্য করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, রাজা জয়সিংহ বিস্মিত হইলেন। কবির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। জয়সিংহ পুনরায় বিহারীকে অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করিলেন এবং দুইখানা বৃহৎ গ্রাম প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। অনন্তর বিহারী নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া মথুরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই সময় যোধপুরের মহারাজ যশোবন্তসিংহ মথুরায় আসিয়াছিলেন। উভয়ে উভয়ের কীর্ত্তি শুনিয়া মিলনে উৎসুখ হইলেন। পরস্পর পরিচয়ে প্রীত হইয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ

(২) দ্ব্যর্থবোধক শ্লেষ।

1. "Chhattrasal feeling himself quite unable to reward the poet as Shivaji had done, instead of giving him money, helped with his own shoulder to carry him in his palankeen on his way." Grierson.

কথায় কথায় মন্তব্য করিলেন, "থারী কবিতা মেঁ ঘুচেসা লাগ গয়ো।" (তোমার কবিতায় ঘুন ধরিয়াছে, অথবা তোমার কবিতা সজীব) বিহারী দুঃখিত চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার কন্যা পিতাকে বিমর্ষ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হাসিয়া বলিলেন যে, রাজা দ্বার্থবোধক বাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার অর্থ আপনার কবিতা জীবন্ত। বিহারী পুনরায় মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা সেদিন স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার মন্তব্যের তাৎপর্য্য ঐরূপই ছিল (১)।

যখন দিল্লীশ্বর সম্রাট সাজাহান রুগ্ন-শয্যায় এবং দারা ও আরঙ্গজেব পিতৃ সিংহাসনের জন্য তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত, তখন বিহারী নির্ব্বিকার-চিত্তে মধুর তান ধরিয়া সৎসই গান গাহিতেছিলেন। দোহাবলীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণে বুঝিতে পারা যায়, ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিহারী সত্সই কাব্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এ প্রমাণ সকলে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। যেহেতু দোহা অনুসারে ১৭১৯ সংবৎ, চৈত্র, কৃষ্ণপক্ষ, ৬ষ্ঠী, সোমবার গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল।

সংবৎ গ্রহসসি জলধিছিতি ছঠ তিথি বাসরচন্দ।
চৈত্র মাস পছ্ কৃষ্ণ মেঁ পূরণ আনন্দকন্দ॥

ঐ তারিখের অনুযায়ী ইংরাজী সন ১৬৬২ খ্রীঃ ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হয়। এজন্য এই দোহাটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন (১)। অম্বিকাদত্ত দোহাকে অকৃত্রিম বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন (২)। পান্নারাজ ছত্রশাল ১৭১৫ সম্বৎ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। জয়সিংহ ১৭২৪ সম্বৎ পরলোক গমন করেন। অতএব বিহারী সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

বিলাস-কূপে আশীর্ষ নিমগ্ন পতিত হিন্দু-জাতি গভীর নিশীথে দ্বারদেশে আততায়ী চরণের পদাঘাত শুনিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিল। ধনসম্পদ, মান, গৌরব দুরন্ত অরাতি সবই লুটিয়া লইল। প্রাণের নিভৃততম প্রদেশে সযত্ন-রক্ষিত ধর্ম্ম ধনও আক্রান্ত হইলে মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহাদের অস্থিমজ্জা প্রকৃতিগত বিলাস-ভোগ জনিত অবিরল ধর্ম্মোন্মাদের মধুর স্রোত বহাইল। জয়দেব (১), বিদ্যাপতি (২), চণ্ডীদাস (৩), জ্ঞানদাস (৪), গোবিন্দদাস, (৫) বিহারীলাল, কিশোর কিশোরীর মধুর প্রেমের অমৃত লহরী ভাষা তরঙ্গে প্রবাহিত করিলেন। বিহারী ইহাদের শেষ কবি। এই চরম যুগে চৈতন্য নৃত্য করিয়াছিলেন, নানক প্রচার করিয়াছিলেন, কবীর গান করিয়াছিলেন। তুকারাম কথকতা করিয়াছিলেন, তুলসী স্তব করিয়াছিলেন। এই বিপ্লব-যুগে, সমাজ-সমুদ্র মথিত হইয়া প্রতিভা-সুধা উদ্গীরণ করিয়াছিল। পাঁচশত বৎসরের অক্ষুণ্ণ

(১) বিহারী বিহার, ভূমিকা, ৯—১১ পৃঃ।

1· "A doha purporting to be by him states that he completed the Satsai on Monday Chaitbadi sambat 1719, which (in Jeypur) corresponds to the 24th January 1662 A. D. Unfortunately, however, the verse must be a subsequent forgery, for that date fell on a Thursday, not a Monday."

Grierson's Introduction to Satsai P 5.

(১) বিহারী বিহার, ভূমিকা, ১২ পৃঃ।
(২) দ্বাদশ শতাব্দী।
(৩) চতুর্দ্দশ শতাব্দী।
(৪) পঞ্চদশ শতাব্দী।
(৫) ষোড়শ শতাব্দী।

তাড়নায় নিদ্রিত, অবসন্ন, মদমত্ত হিন্দুহস্তীর বিশাল দেহে নব-চেতনা সঞ্চার হইয়াছিল। সে চেতনার অভিব্যক্তি কবির কণ্ঠে। সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দী ভাষায় অন্যূন পঞ্চাশ জন কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিহারীলাল হিমাচল-শিরে দেবগিরির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন (ক)।

বিহারীর সত্‌সই কাব্য ৭২৬ দোহায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। (১) কেহ বলেন, দোহার পরিমাণ ৭৩৪, (২) কেহ ৭৪৪, (৩) কেহ বা ৭৪৫। (৪) সমগ্র গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত। (৫) প্রথম ভাগে ২০৫ শ্লোক। ইহাতে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক নায়কভেদ, নায়িকাভেদ, বিবাহভেদ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। ২য় ভাগে ২৩৪ শ্লোক। তাহাতে মিলন, শৃঙ্গার, রসোদ্‌গার, হাব, ভাব, স্বপ্ন, ধ্যান, মান, বিরহ, স্মৃতি, বিলাপ প্রভৃতি বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়ভাগে ১৫১ শ্লোক। ইহাতে শ্রীরাধার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার মস্তকের কেশ, পায়ের গোড়ালী, নাসাবেধ, কর্ণভূষণ, চিবুকের গোদানি, কঞ্চুকী, ধুকধুকী, সবই সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন ষড় ঋতুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। চতুর্থভাগে ১১৮ শ্লোক। তাহাতে সুজন, দুর্জ্জন, কৃপণ, নীচ, হাস্য, করুণ, বীর ও রৌদ্ররস, বক্রোক্তি, নৃপস্তুতি প্রভৃতি আছে। অন্তে পরিশিষ্ট। অবশিষ্ট শ্লোক পরিশিষ্টভুক্ত।

বর্ণনার খুটিনাটিতে বিহারীর কবিতার চমৎকারিত্ব আছে। ব্রজভাষা-রসজ্ঞ মাত্রেই সে মধুর কবিতা আস্বাদন করিয়াছেন। সে অপূর্ব্ব সুধা যাহার রসনাগ্র স্পর্শ করিবে, তিনিই অমর হইবেন। তাঁহার ভাবপূর্ণ কবিতা অল্পকথায় এমন সুন্দরভাবে গুরু অর্থ প্রকাশ করিতে পারে যে, কাব্যজগতে তাহার তুলনা বিরল। স্বভাব-কবির ভাষায় ভেস্কী খেলে, ছন্দের তালে তালে হৃদয় নৃত্য করে।

মুঁহ ধোবতি এড়ী ঘসতি হঁসতি
অনঙ্গবতি তীর।
ধসতি ন ইন্দীবর নয়নি কালিন্দীকে নীর॥

কামিনী তীরে বসিয়া মুখ ধুইতেছে, পায়ের গোড়ালী ঘসিতেছে, কিন্তু ইন্দিবর-লোচনা কালিন্দীর জলে ডুবিতেছে না।

কহত্‌ নটত্‌ রীঝত্‌ খিঝত্‌ মিলত্‌ খিলত্‌
লজিয়াত্‌।
ভরে ভৌন মেঁ করতহৈঁ নৈননিমেঁ সববাত্‌।

কথা কহিতেছে, হাসিতেছে, মিলিতেছে, খেলিতেছে, রাগও করিতেছে। এ সবই সারা লোকের মধ্যে ভরাঘরে কটাক্ষের ইশারায় চলিতেছে। (১)

পলন প্রগটি বরুনীন বঢ়িছন কপোল ঠহরায়।
অঁসুয়া পরি ছতিয়াঁ ছনক্‌ ছন্‌ ছনায় ছপি যায়॥

চক্ষুর পলক ত্যাগ করিয়া আখিজল ক্ষণমাত্র গণ্ডে থামিয়া ঝর-ঝর ঝরিয়া বক্ষ ভাসাইয়া দেয়।

দৃগ্‌ উরঝত টুটত কুটুম জুরত চতুরসঙ্গ প্রীতি।
পরত্‌ গাঁঠি দুরজন্‌ হিয়ে দই নই য়হ রীতি॥

দৃষ্টিমাত্র আত্মীয় স্বজন বিস্মৃত হইয়া চতুর নায়কের সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হইল এবং

(ক) ভূষণ. তুলসী, শ্রীধর, প্রাণনাথ, কাশী রায়, ছত্রশাল, নীলকণ্ঠ, সদাশিব প্রভৃতি।

(১) লালচন্দ্র।

(২) হরিচন্দ্র সাহা।

(৩) সংস্কৃত টীকা।

(৪) কবিঠাকুর

(৫) লল্লু লাল বা লাল চাঁদ কৃত লালচন্দ্রিকা টীকা অনুসারে।

(১) কর দুহু লোচন দূতক কাজ।
বিদ্যাপতি।

দুর্জ্জনের হৃদয় অর্গলবদ্ধ হইল। এই এক নূতন রীতি।

সেদ সলিল্ রোমাঞ্চ কুস্ গহি দুলহী অরু নাথ।
দিয়ো হিয়ো সঙ্কল্প করি হাত ধরেহী হাথ॥

ধর্ম্মরূপ-সলিলে রোমাঞ্চরূপ কুশ লইয়া হাতে হাত ধরিয়া বরকে কন্যা-হৃদয় সঙ্কল্প করিয়া দেও। কি পবিত্র উপমা! কি সুন্দর প্রয়োগ!

বিহারীলালের স্বাভাবিক বর্ণনা অতি মনোরম। ভাষার লালিত্য, খুটিনাটি ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয়ে সে সকল দোহা অতি উপাদেয়।

সকুচি সরকি পিয় নিকটতেঁ মুলকি
কছুকৃতন তোরি।
কর আঁচর কীওট করি জমুহাঁনী মুখ্‌মোরি॥

সম্স্পর্শে কটাক্ষ করিয়া, শরীর সঙ্কুচিত করিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া আনন বেকাইয়া হাই তুলিয়া প্রণয়ীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

চালকী বাতেঁ চলী সুনত্ সখিন্‌কী টৌল্।
গোয়েহু লোচন হঁসতি বিহঁসতিজাত কপোল॥

সখিগণের বিদ্রূপ ব্যঙ্গ শুনিয়া চাতুরীর কথা চলিল। তখন চক্ষুও হাসিল, গাত্রও হাসিয়া খুন।

একটী দোহা যেন আমাদের পূর্ব্বপরিচিত।

ছুটীন সিসুতা কী ঝলক্ ঝল্‌কয়ো জোবন অঙ্গ।
দীপ্‌তি দেহ দুহূঁন্ মিলি দিপ্‌তি তাফতা রঙ্গ।

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন :—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে ধনী দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥

এবং শৈশব যৌবনে উপজিল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥

বিহারীর সার্ব্বভৌমিক উদার ধর্ম্মমত ও পবিত্র অসাম্প্রদায়িক ভগবৎপ্রেম শিশির-সিক্ত প্রভাতী কুসুমের ন্যায় সরস, সুন্দর ও পবিত্র।

বন্ধু ভয়ে কো দীন্‌কে কো তারো জদুরায়।
তূঠে তূঠে ফিরত্ হো ঝূঠে বিরদ্ কহায়॥

হে যদুরায়, কে দীনের বন্ধু হইতে চায়? কেই বা অধম তরাইতে চায়? তুমি কেবল আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াও। লোকে তোমাকে বৃথা "দরদী" কহে।

অপ্‌নে অপ্‌নে মত্ লগে বাদি মচাবত্
সোর।
জ্যোঁ ত্যোঁ সব্‌কোঁ সেইবো এতৈ নন্দকিশোর॥

সকলেই নিজ নিজ মত লইয়া মিথ্যা গণ্ডগোল করে। এক নন্দকিশোরই সকলকে তাহাদের আপন আপন ভাবানুসারে সিদ্ধি দান করিবেন।

জপ্‌মালা ছাপা তিলক্ সরৈ ন একৌ কাম।
মন্ কাঁচে নাঁচে বৃথা সাঁচে রাচে রাম॥

জপমালা, ছাপা, তিলক, এ সকলই বৃথা। যাহাদের মন কাঁচা তাহাদের বৃথা আস্ফালন। খাটি লোক কেবল রাম নাম রটনা করে।

বুধি অনুমান প্রধান শ্রুতি কিয়ে নীঠি ঠহরাই।
সূছ্‌ম গতি পরব্রহ্মকা অলখ্ লখী নহি জাই॥

বুদ্ধি অনুমান শ্রুতি বেদ অনুসারে নীতি স্থির করা হয়। কিন্তু পরব্রহ্মের সূক্ষ্মগতি অদৃশ্য। তাহা কেহ দেখিতে পারে না।

শেষ শ্লোক কি হৃদয়গ্রাহী!

জগত্ জনায়ো জিন্ সকল সোহরি জানিয়
নাহিঁ।
জ্যোঁ আঁখিন্ সব দেখিয়ত আঁখিন দেখি
জাঁহিঁ।

যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকল জানাইলেন, তাঁহাকে জানিলে না? যে চক্ষু সকল দেখিতেছে, তাঁহাকে তোমার চক্ষু দেখিল না?

যে কবি শৃঙ্গার রসের ভিতর দিয়া, রসো-

দ্গার রাসলীলা বিপরীত বিহারের মধ্য দিয়া স্থির দৃষ্টিতে জগতের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিতে পারেন, তিনি অসাধারণ ভক্ত। তিনি সকলের নমস্য। রাধা ভক্ত, রাধা সাধক, রাধা প্রাণ, রাধা জীবাত্মা। আর নন্দ-দুলাল মোহন নাগর আরাধ্য, সাধ্য, প্রাণেশ পরমাত্মা। • সংসার-ব্রজে প্রেম-যমুনা-তটে এই দুই বিহঙ্গমের উৎকণ্ঠা, আসক্তি, অনুরাগ, মিলন, বিহার, রসোদ্গার, বিরহ, বিলাপ, মান, মানভঞ্জন কি মধুর! কি প্রাণমন হরণকারী!

ধন্য সেই কবিশ্রেষ্ঠ, যিনি তন্ময় হইয়া সেই মধুর ভাব লেখেনী মুখে ব্যক্ত করিতে পারেন।

শ্রীরসিকলাল রায়।

৩০৫

নদী-তটে।

এখন গভীর রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নাই,—বিশ্ব স্তিমিত, ধ্যানস্থ। কি রাজনিকেতন, কি পর্ণকুটীর, সকলই সুষুপ্তির ক্রোড়ে সুখে শায়িত, বিগত-ক্লান্তি, বিগত-শোক। শুধু জাগিয়া আমি, আর আমার ন্যায় হতভাগ্য যাহারা, আর জাগিয়া—বিশ্ব-প্রাণ-বিরাগী, সিংহাসন-ত্যাগী, কৌপীন-ধারী—নিরাশ্রয়, নিরুপায়, সংসার-দীন, চীরবেশ যাঁহাদের কটিদেশাশ্রিত, যাঁহাদের চরণপ্রান্তে নিদ্রাদেবী, কি দিবা কি রাত্রি, অর্ঘ্যকরে দণ্ডায়মান, যাঁহাদের নির্ম্মল জ্ঞানালোকে আঁধার ধরণী আলোকিত, অরুণ-কিরণ পরিম্লান, যাঁহারা এই দুস্তর মহার্ণবে অন্ধ-নয়নের আলো, এবং যাঁহারা অমৃত ও আনন্দের পুত্র, অমৃতানন্দের ক্রোড়ে আনন্দে ভাসমান, অমৃতানন্দ ক্ষুধায় যাঁহাদের অন্ন, তৃষ্ণায় যাঁহাদের পানীয়।

এই মলিনপাপী যাঁহার আরাধনার আয়োজনে কত নদী, কত সাগর, কত গিরি, কত মরু লঙ্ঘন করিয়া পুষ্প চয়ন করিল, কত অর্ণব, কত মহার্ণব মন্থন করিয়া রত্ন সংগ্রহ করিল, কত নর-মেদে নর-রুধিরে যাঁহার অর্চ্চনা করিল, কত নর-কঙ্কালে যাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিল, সেই আরাধ্য দেব কোথায়? তাঁহার দর্শন একদিনের জন্যও কি ভাগ্যে ঘটিয়াছে? আজ আমি গৃহ-তাড়িত! কিন্তু কে আমায় তাড়াইল? ঐত প্রাসাদের শত শত দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, দুগ্ধফেননিভ শয্যা বক্ষ বিস্তার করিয়া আমায় আহ্বান করিতেছে, চরণদ্বয় আমাকে তথায় বহন করিতে উন্মুখ, তবে কেন আমি এই গভীর নিশীথ-সময়ে এই বিজন প্রান্তরে-নিঃসহায় ও নিঃসম্বল! যে ভীষণ বিভীষিকায় দেব দানব ভীত, আমি কেন তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছি, তাহাতেই শান্তির অন্বেষণ করিতেছি?

যাহাদিগকে কত আদরে আপনার ভাবিয়া বক্ষে টানিয়া লইলাম, আজ তাহারা আমার কে? সেই কারুকার্য্য-শোভিত সৌধরাজি, সেই অগণ্য মণি, মুক্তা, কাঞ্চন তাহাদের রূপের ভাণ্ডার লইয়া অনুপম মনোমোহিনী বেশে চিত্রার্পিতবৎ এখানেও আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান—একি আমার অভিবাদনের জন্য, আমার সহিত প্রেমালিঙ্গনের জন্য? তবে কেন অন্তরের বৃশ্চিক দংশন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, গভীর

আঁধার গভীরতর হইয়া উঠিতেছে? হায়, সেই অসাধ্য শব-সাধনার কি এই পরিণাম? যাঁহারা আমায় দেখিয়া নিজেদের দিকে চাহিয়া সজল নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার কমলার এই প্রিয়পুত্রের অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, প্রাণের অনুরোধ একবার দয়া করিয়া দেখুন, তাঁহাদের নিদারুণ মর্ম্ম-বেদনা এখনই প্রশমিত হইবে, হৃদয়ের ভীষণ দাবানল এখনই নির্ব্বাপিত হইবে।

ধরাবক্ষে কলনাদিনী, পূত-প্রবাহিনী প্রবাহিতা;—ঊর্দ্ধে নীল নভ-বক্ষে অনন্ত নক্ষত্ররাজি বিরাজিত—কি অনুপম স্বর্গীয় সম্মিলন, কি অপূর্ব্ব হৃদয়-বিনিময়!—অন্তরের পবিত্র রজতশুভ্র আলোকে নয়ন উদ্ভাসিত, প্রেমোৎফুল্ল জ্যোৎস্নারাশি প্রীতি-পুলকে অবিরাম ফুটিয়া ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। হে বিমানবিহারী চন্দ্রমা! তোমার ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র কিরণ-ভাণ্ডার আজ দানে দানে অনন্ত, অফুরন্ত, পুরিপূর্ণ; তোমার মুখ-মণ্ডল দিব্যালোকে উজ্জ্বল। ওগো ক্ষীণাঙ্গী স্রোতস্বিনি! নিজেকে বিলাইয়া বিলাইয়া আজ তুমি অতলা, আজ তুমি তরঙ্গিণী, প্রেমোন্মাদিনী। আশ্রিত জনে অবিরাম হৃদয়ে বহিয়া লইয়া চলিয়াছ, অকৃতজ্ঞ নির্ম্মম পামর তাহারা তোমার সুকোমল হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, কিন্তু তথাপি তোমার উল্লাসের বা আনন্দের অবধি নাই, প্রেম-ব্রতোদ্‌যাপনে বিরতি নাই। আর আমি চিরদিন আমাকে লইয়াই ব্যস্ত, তাই আমি এত দীন, এত কাঙ্গাল, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার অন্তরে মরু, বাহিরে ঘন ঘটাচ্ছন্ন অমানিশা! সত্য বটে, সমস্ত জগতের ন্যায় তুমিও অদৃষ্ট-চক্র-নেমিতে আবদ্ধ, ইহার আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত—কখন ঐশ্বর্য্যের উচ্চতম শিখরে তোমার সিংহাসন, কখন গভীরতম গহ্বরে তোমার পতন। কিন্তু তুমি চির-নির্ব্বিকার—যখন সৌভাগ্য আপন সর্ব্বস্বের ডালি শিরে লইয়া তোমার দ্বারে করুণাপ্রার্থী, আর যখন দীনতার তাড়নে তুমি শীর্ণ-দেহ, জীর্ণ-বসন। তুমি চিরদিন আশ্রিতের আশ্রয়; প্রেমই তোমার ব্রত। জানি না, কাহার উদ্দেশে তোমার এই একই গতি, একই গীতি। তোমার কণ্ঠে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য—স্বর্গ মর্ত্ত্যে প্রেমালিঙ্গন! স্বর্গের প্রেম-বিগলিত শুভ্র হৃদয় জগৎ প্লাবিত করিয়াছে, যামিনীর কালিমা, ধরণীর কলঙ্ক ধুইয়া গিয়াছে; সুধাংশু আত্ম-বিস্মৃত, প্রেমরাগে রঞ্জিত, সর্ব্বত্যাগী বিরাগী, রাজ-সিংহাসন দূরে ফেলিয়া ধরিত্রী-বক্ষে নৃত্যে প্রমত্ত। আর আমি একাকী—কি জনপূর্ণ নগর, কি বিজন কানন, কি পুত্র-পরিজন-পূর্ণ সংসার, সর্ব্বত্র একাকী। কাহারও সুমধুর প্রেমোৎফুল্ল ললিত মুখ-কান্তি এ মলিন নয়নে প্রতিবিম্বিত হয় না, শুভ্র স্বচ্ছ কোমল হৃদয় এ আবিল হৃদয়ে প্রতি-ফলিত হয় না! কবি ও মহর্ষিগণের আনন্দ-নিকেতন, কি সুকণ্ঠ বিহঙ্গ-বন্দিত সুহাসিনী আরক্তিম ঊষা, কি জ্যোৎস্না-প্লাবিত বিগত-কালিমা যামিনী, কি সুষমার লীলা-ভূমি বাল-কিরণ-চুম্বিত শিশির-সিক্ত সুবাসিত পুষ্পোদ্যান, কি নানা রাগ-রঞ্জিত ফল-ভারাবনত পাদপরাজি, কি অপার অতল-স্পর্শ ঊর্ম্মি-সঙ্কুল বা অবাত-বিক্ষোভিত জলধি, কি বিশাল অভ্রভেদী তুষার-মণ্ডিত স্বর্ণচূড় অদ্রিরাজ হিমাদ্রি, কাহারও জন্য

আমার অন্তরে বিন্দু মাত্র স্থান নাই—আমি একাকী,--একাকী নিবিড় আঁধারে, সদা-কম্পিত মেঘ-মন্দ্রে, সদা-চকিত চপলা-চমকে।

হে ধরিত্রি! এই হতভাগ্য মহাপাপীকেও ধারণ করিতে তুমি অকুণ্ঠিতা, তোমার ধরিত্রী নাম সার্থক, তুমি ধন্যা! তুমি ধন্যা! একদিন আসিবে, যেদিন তোমার বক্ষ হইতে জল-বুদ্বুদের ন্যায় অন্তর্হিত হইব সত্য, কিন্তু তাহাতে অন্তরের এই জ্বলন্ত বহ্নির নির্ব্বাণ কোথায়, এই নিদারুণ অশান্তির শান্তি কোথায়? কি কীটাণু-কীট, কি দেব দানব, কি স্বামি-সোহাগিনী, কি পতি-বিরাগিনী, কি পুত্র-শোকতুরা উন্মাদিনী জননী, সকলেই অনন্ত নির্ব্বাণের কল্পনায় সন্ত্রস্ত! ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, এইরূপ সকল কামনা, সকল বাসনারই পরিতৃপ্তিতে পরিণতি—কিছুই নীরবে উঠিয়া নীরবে বিলীন হইয়া যায় না। অতএব আমি কালে অনন্ত, আমার এ যাত্রা অনন্ত যাত্রা। কোথা হইতে কখন এ যাত্রার আরম্ভ, জানি না, কিন্তু কোন কালে ইহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ইহা সুনিশ্চিত। মন যে সুপরিচিত পথেও সঙ্গী চায়, দুর্দ্দিনের যাত্রায়ও সঙ্গী খুঁজিয়া বেড়ায়! আমি যে অনন্ত পথের যাত্রী—ইহার পশ্চাতে অনন্ত, সম্মুখে অনন্ত, অনন্ত আঁধারে লীন। যে জন পথ চিনে, যাহার হাতে আলো, সেইত শুধু পথ চিনাইয়া, পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে। এ পথ কে চিনে, এ আঁধারের আলো কাহার হাতে?

কোন্ মহান প্রেম এই অপূর্ব্ব বর্ণনাতীত বিশ্ব আমারই জন্ত সৃজন করিয়া আমাকে রাজ-সিংহাসন প্রদান করিয়াছিল, পথের বেদনাও জানিতে দেয় নাই? আমি আপন দোষে সকল সম্ভোগেই বঞ্চিত, রাজা হইয়াও কাঙ্গাল ও দীন হীন। কিন্তু এত দয়া, এত করুণা যাঁহার, তিনি কি মলিন পাপী বলিয়া কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন? হে প্রাণের প্রাণ, আলোর আলো, দীনের গতি! সকল মলিনতা দূর করিয়া দাও, যাহা শুনি নাই, যাহা দেখি নাই, যাহা দেবারাধ্য, তাহা শুনিয়া, তাহা দেখিয়া জীবন সার্থক করি। জননি! দেখিতে দাও তোমার শান্তিময় শান্তির ক্রোড়, যেখানে সন্তান নিরাতঙ্ক, সদানন্দ। বুঝিতে দাও যে, আমার এই যাত্রা—এই অনন্ত যাত্রা তোমারই ক্রোড়ে—মায়েরই ক্রোড়ে!

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র সেন।

শ্রীমৎ সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী।

মহানুভব নাভাজীউ কর্ত্তৃক ব্রজভাষাতে মূল ভক্তমাল গ্রন্থ গ্রথিত হয়। নাভাজীউর আদেশানুসারে মহাত্মা প্রিয়াদাস বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ভক্তমালের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী। কৃষ্ণদাসের কৃপায়ই ভক্তমাল আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকগণ জয়দেব, কবীর, মীরাবাঈ, তুলসীদাস প্রভৃতির চরিতামৃত আস্বাদনে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার বিষয় জানিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক মাত্রেই বিশেষ আগ্রহান্বিত।

এজন্য অদ্য আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই মহাত্মার প্রকৃত নাম লালদাস। সাধন প্রভাবে পরবর্ত্তী সময়ে ইনি "সিদ্ধ-কৃষ্ণদাস" নামে ভাগবতমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এজন্য ভক্তমালের ভণিতা স্থলে কোন কোন সংস্করণে "লালদাস" আর কোন কোন সংস্করণে "কৃষ্ণদাস" নামের উল্লেখ দেখা যায় *। আমরা তাঁহাকে কৃষ্ণদাস নামেই উল্লেখ করিব।

কৃষ্ণদাসের রচিত উপাসনা-চন্দ্রামৃত নামক ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ একখানা গ্রন্থ সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১৬৮৪ শকে রচিত। রচনা কাল সম্বন্ধে গ্রন্থ মধ্যেই লিখিত আছে,—

এবেত শকাব্দ কহি সঙ্কেত বিধানে।
উপাসনাচন্দ্রামৃত প্রকাশ যে সনে॥
চন্দ্রের যতেক কলা আগে অঙ্ক ধর।
তাহার উত্তরে তার অর্দ্ধ অঙ্ক ধর॥
তাহার উত্তরে পুন অর্দ্ধ অঙ্ক তার।
লিখিয়া বুঝহ এবে শকাব্দাঙ্ক সার॥

বড় দুঃখের বিষয় এই যে,—বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কৃষ্ণদাসের জন্মস্থান, পিতামাতার পরিচয় প্রভৃতি গার্হস্থ্য জীবনের কোন কথাই এপর্য্যন্ত আমরা বিশ্বস্ত রূপে অবগত হইতে পারি নাই। ভক্তমাল গ্রন্থে নিজ পরিচয় সম্বন্ধে যাহা একটুকু লিখিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গ ভকত বন্দোঁ অনন্ত অপার।
বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার॥
তাঁর পদদ্বয় বন্দোঁ লোটাঞা ধরণী।
চৈতন্যের আবেশাবতারে যাঁরে গণি॥
যমুনায় জলে-ক্রীড়ায় কুন্তল পড়িলা।
যেই খুঁজি প্যারিজীর কর্ণে পরাইলা॥
অনেক তারিলা তেহোঁ, কহিতে না জানি।
যাঁর পরিবার প্রিয়াদাস গুণখনি॥
বন্দোঁ শ্রীঅগরদাস যাঁর শিষ্য নাভা।
তেহোঁ কৈলা ভক্তমাল সজ্জনের লোভা॥
চারি যুগের ভাগবতগণের চরিত্র।
ভক্তমাল গ্রন্থ কৈলা পরম পবিত্র॥
যাহার শ্রবণে উপজয়ে কৃষ্ণে রতি।
বৈষ্ণব চরণরজে হয় দৃঢ় মতি॥
মহা তমোমতি অতি নিন্দুক বা হয়।
শ্রবণে অবশ্য তার শ্রদ্ধা উপজয়॥
চারি যুগের ভক্তগণের অপূর্ব্ব চরিতে।
প্রিয়াদাসে আজ্ঞা দিল টীকা বিস্তারিতে॥
বৃন্দাবনবাসী প্রিয়াদাস মহামতি।
বিচক্ষণ বুদ্ধি স্তব্ধ ভক্তি-মত রতি॥
অল্লাক্ষরে বহু অর্থ অনুপ্রাস যমক।
ভক্তগণের রীত বর্ণে সন্ধান পূর্ব্বক॥
তাঁহার চরণ বন্দোঁ অভীষ্ট লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা যেঁহো টীকা বিস্তারিয়া॥
গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সবে বুঝে নাহি।
এহেতু গৌড়িয়া বাকে শ্রেণী মত কহি॥

ইহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে,তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য-পরিবারস্থ কাহারও শিষ্য ছিলেন। আর মূল ভক্তমাল বাঙ্গালী পাঠকগণের বোধগম্য হয় না বলিয়া গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

এই অনুবাদের নাম "ভক্তমাল-প্রতিবিম্ব" যথা,—

শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ-চরণ করি আশ।
ভক্তমাল প্রতিবিম্ব কহে কৃষ্ণদাস॥

উপাসনা-চন্দ্রামৃতের মধ্যেও তাঁহার আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে একটুকু বর্ণনা আছে, তাহাও তাঁহার বংশের পরিচয় নহে, গুরু প্রণালীর পরিচয়,—

* বটতলার প্রকাশিত ভক্তমালে "কৃষ্ণদাস" ভণিতা দেখা যায়। শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ গোস্বামীর সম্পাদিত সংস্করণে "লালদাস", শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর সংস্করণে "কৃষ্ণদাস"। ভক্তমালের দুইখানা প্রাচীন হস্তলিপি আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে "লালদাস" ভণিতা। উপাসনা-চন্দ্রামৃতেও "লালদাস" ভণিতা।
প্রবন্ধ-লেখক।

শ্রীগোপাল ভট্ট শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস।
গৌড়ে আনি কৈলা ভক্তি গ্রন্থের প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ করি যোড় কর।
পরম পরমেষ্ঠী গুরু মহাশয় মোর॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।
বরাকুলি গ্রাম পাট যাঁহার বসতি॥
দেখিয়া আচার্য্য প্রভু তাঁর ভাবগত।
থুইলা ভাবুক চক্রবর্ত্তী বলি খ্যাতি॥
পরমেষ্ঠী গুরু মোর করুণার ধাম।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥
গৌরাঙ্গ বল্লভা দেবী ঘরণী তাঁহার।
ঠাকুরাণী মহাশয়া বলি খ্যাতি যাঁর॥
পরাপর গুরু তেঁহ কৃপার আলয়।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ তাঁর পদদ্বয়॥
তাঁহার কণিষ্ঠ পুত্র ঠাকুর কিশোরী।
তাঁহার ঘরণী নাম শ্রীমতী মঞ্জরী॥
অতএব ছোট মাতা বলি তাঁর নাম।
আমার পরম গুরু কৃপার নিধান॥
তাঁহার চরণ পদ্ম করিয়ে বন্দন।
যাহার স্মরণে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন॥
শ্রীগুরু চরণে করি অসংখ্য প্রণতি।
শ্রীযুত ঠাকুর নয়নানন্দ চক্রবর্ত্তী॥
অদোষ দরশি চিত্ত সদাই যাহার।
মো হেন পামরে যে বা কৈল অঙ্গীকার॥
যাঁহার চরণ কৃপা সম্বন্ধাভিমানে।
ক্রমেতে করিল এই গুর্ব্বাদি বন্দনে॥

কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ জন্য কোন স্থানেই নিজ গার্হস্থ্য পরিচয়ের, এমন কি পিতৃ মাতৃ দত্ত নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তবুও উপাসনা-চন্দ্রামৃত ও ভক্তমাল হইতে তাঁহার সম্বন্ধে এ কয়টী বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি।

শকাব্দীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার জন্ম হয়।

সংস্কৃত, হিন্দী, ও বাঙ্গালা ভাষাতে তিনি যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভক্তমাল ও উপাসনা-চন্দ্রামৃতই তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ।

ভক্তমালের বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর প্রতি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

শুধু যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, এমনও নহে, কয়েক জন ভক্তের জীবনী নূতন সন্নিবেশ ও প্রিয়াদাসের টীকার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থের কলেবর প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

এই নূতন সন্নিবিষ্ট ভক্তগণের জীবনী মধ্যে পুটীয়ার রাজা রবীন্দ্র নারায়ণ রায়ের উপাখ্যান ও প্রসঙ্গত মহারাজ নন্দকুমারের বিষয় লিখিত আছে। ইহাতে বাঙ্গালা ভক্তমাল যে একশত হইতে দেড়শত বৎসরের মধ্যে, উপাসনা চন্দ্রামৃত রচনার প্রায় সমকালেই রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর আমরা কৃষ্ণদাসকে যে বাঙ্গালী বলিয়া অনুমান করিয়াছি, ইহা তাহারও একটী পৃষ্ঠপোষক অন্যতর প্রমাণ।

ভক্তমাল ও উপাসনা-চন্দ্রামৃত ব্যতীত তাঁহার রচিত অন্য কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। ফরাসী লেখক গাঁর্সে-ডি-ট্যাসি মহোদয় কৃষ্ণদাসের রচিত "ভ্রমর-গীতি" নামক একখানা কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। "ভাষা চমৎকার-চন্দ্রিকা" নামক কৃষ্ণদাসের অপর আর একখানা গ্রন্থের কথাও কাহার কাহার নিকট অবগত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত এই দুই খানা গ্রন্থের এক খানাও এ পর্য্যন্ত আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

কৃষ্ণদাস দীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রসিদ্ধ ভাগবত লালাবাবু বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাসের শিষ্যত্ব লাভ করেন।

সাধন প্রভাবে কৃষ্ণদাস তাৎকালিক ভাগবতমণ্ডলীর মধ্যে পূজিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু এই প্রকার সম্মান পাইলেও তিনি অণুমাত্র গর্ব্বিত হন নাই। বৈষ্ণবোচিত বিনয় গুণে সর্ব্বদাই ভূষিত থাকিতেন। গ্রন্থ মধ্যে যেরূপ দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের সুকুমারত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক,—

বৈষ্ণব-চরণধূলি মস্তকে ধারণ।
করি মুঞি এই মোর ভজন সাধন॥

• • •

মো পতিতে নিজগুণে সবে কৃপা কর।
জন্মে জন্মে হই তোমা সবার কিঙ্কর॥

• • •

সকল বৈষ্ণব পদে করিয়া প্রণতি।
কৃষ্ণদাস করে পরিহার নতি স্তুতি॥

মহাত্মা কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমাদিগকে এই বলিতে হয় যে,—তিনি যেমনই ভাগবতজ্ঞ ছিলেন, নিজেও তেমনি ভাগবত ছিলেন।*

এই প্রবন্ধ পারসমাপ্তির পূর্ব্বে প্রসঙ্গত এখানে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে কৃষ্ণদাসকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কোন্ প্রমাণ বলে ইহা লিখিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীমান্ মহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক। ভক্তমাল গ্রন্থে মহারাজ নন্দ কুমারের কথা উল্লিখিত আছে। এমতাবস্থায় ভক্তমাল গ্রন্থকার কৃষ্ণদাসকে যে কি প্রকারে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

বোধ হয়, দীনেশ বাবু গ্রন্থের প্রারম্ভে "বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার।" এইটুকু পাঠ করিয়াই উক্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ পাঠ ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই।

ভক্তমালের রাজ-সংস্করণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন—"কেহ কেহ বলেন, গ্রন্থকর্ত্তা মহাত্মা লালদাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। কিন্তু আমাদিগের অনুমান হয়, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থ দর্শিনী টীকার রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য।"

গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহার অনুমানের অনুকূলে কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। অথচ ভক্তমাল কিম্বা উপাসনা-চন্দ্রামৃতে এমন কোন আভাষ নাই, যাহাতে কৃষ্ণদাসকে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

কোন বিষয় একেবারে অনুসন্ধান না করিয়া গম্ভীর ভাষাতে এই প্রকার স্বকপোল-কল্পিত মতামত প্রকাশ করা নিতান্তই অসঙ্গত।

আশা করি,—দীনেশ বাবু ও গোস্বামী মহাশয় পরবর্ত্তী সংস্করণে নিজ নিজ কাল্পনিক মত পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবেন।

সাহিত্য-সংস্কারক পরলোকগত কালী-প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় "ভক্তির জয়" গ্রন্থে ভক্তমালের অনুবাদক এই কৃষ্ণদাসকে শ্রীমৎ

---

* এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত হয় ভক্তিরস-পাত্র।
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

হরিদাস ঠাকুরের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় পুরুষের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ঠাকুর হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কৃষ্ণদাসের জন্ম। অতএব তিনি হরিদাস ঠাকুরের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় পুরুষের সমসাময়িক কি প্রকারে হইতে পারেন?

ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীগণ ভক্তির জয়ের পরবর্ত্তী সংস্করণে উক্ত ভ্রমটী অনায়াসে সংশোধন করিয়া পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ পুরুষের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বিদ্যাসাগর।

(১৫ই শ্রাবণ ওভারটৌন হলে স্বর্গীয় মহাত্মার বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় পঠিত)

১

অতীতে হয়েছে লীন কত শত দিন—
তুমি দেব চ'লে গেছ' হায়!
বারেকের তরে বঙ্গ ভুলে নাই তবু,
বর্ষে বর্ষে তব গান গায়;
মধুর নামটী হায়
কখন কি ভোলা যায়,
ও নামের তুলনা কোথায়?
ধ্বনি যার হৃদি তার আবেগে কাঁপায়!

২

প্রতি কাজে পদে পদে কত নিদর্শন,
তব পুণ্য স্মৃতিটী জাগায়,—
বঙ্গের সাহিত্য-কুঞ্জে "সীতা শকুন্তলা'
শুদ্ধ ভাবে খাসা গান গায়;
দিয়ে 'বর্ণপরিচয়'
শিশুরে করেছ জয়,—
'অ'য়ে 'ক'য়ে তব নাম গাথা;
'সাগর' তরঙ্গে ধৌত বাঙ্গালীর মাথা!

৩

নিঃস্ব হ'য়ে উচ্চ হ'লে নিজ ক্ষমতায়,
দেখাইলে উদ্যমের জয়;
তুমি শুধু ক'রে গেছ' জীবনে তোমার
জ্ঞানে, প্রেমে, শৌর্য্যে সমন্বয়!
ধনরাশি, যশে, মানে
গর্ব্বিত করেনি প্রাণে,
রেখেছিলে নিজত্ব বজায়—
সেই ধূতি, সেই চটী, সেই সমুদায়!

৪

গরীবের বন্ধু ছিলে, দাতাকর্ণ দানে,
অকপট জ্ঞান-বিতরণে,
স্থাপিত্ত কলেজ তব—উচ্চ বিদ্যালয়
ব্যস্ত তাই মহিমা কীর্ত্তনে!
তুমিত চাহনি মান,
তবু লোকে করে দান
মুগ্ধ হ'য়ে উচ্চ মহিমায়,—
গুণ সদা আনে গান বাতাসের প্রায়!

৫

বিধবার দশা দেখি কেঁদে গেছ কত,
ওগো দেব দয়ার সাগর!
অকপট মাতৃভক্ত, পিতৃপরায়ণ,
সদালাপে রসের নাগর।
তোমার আদর্শ পেয়ে
দেখিল না তবু চেয়ে—
হায় দেশ, হায় বঙ্গজাতি,—
মায়ের বাপের বুকে তবু মারে লাথি!

কি বলিব দেবতাগো—তুমি গেলে পর—
হেথা আর আসিল না কেহ,
তব সম জ্ঞানী গুণী,—উন্মুক্ত-হৃদয়
উজলিয়া বাঙ্গালীর গেহ ;
তোমার গুণের কথা,
প্রচলিত যথা তথা,
তবু বঙ্গে রহিয়াছে হায়—
কুটিলতা, স্বার্থ, দ্বেষ,—বিষ সমুদায় !

৭

আমাদের এ দীনতা দূর হ'য়ে যাক্
আজি তব শুভ নাম নিয়ে,
অন্তরে সন্তরে যেন তব পুণ্যপ্রভা
মলিনতা সব মুছে দিয়ে ;
তোমার মধুর স্মৃতি
আনুক নূতন প্রীতি
আজি হতে আমাদের মাঝে,
তোমার আদর্শ যেন রাখি প্রতি কাজে।

৮

যেথা থাক', ধর অর্ঘ্য—হৃদয়ের ভাষা,
হে দয়াল, হে জ্ঞানী উদার,
জাগাও হৃদয়-মাঝে আদর্শ তোমার
নিষ্কলঙ্ক দেবতা আমার !
দেখিনি জীবনে কভু,
জানি না এখন প্রভু
কোথা আছ—কোন্ স্বর্গপুরে,
উদ্দেশে প্রণাম করি দুটী হাত যুড়ে !

শ্রীশৌরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

"মনে রেখো—ভুলনা আমায় !"

১

"মনে রেখো—ভুলনা আমায় !"
যুগল সুধা-ধার
নামিল অনিবার,
যুগল শশীকলা উদিল অমরায় !
যুগল ফুল-কলি
সোহাগে পড়ে ঢলি,
যুগল শৈল-বালা সাগর পানে ধায় !
—"মনে রেখো—ভুলনা আমায় !"

২

"মনে রেখো—ভুলনা আমায় !"
যুগল উষা-রাণী
করে কি কাণাকাণি,
যুগল শুক তারা হাসিয়ে কিবা চায় !
যুগল সুর-পুরে,
যুগল মধু সুরে,
যুগল বন-পাখী আকুল সুখে গায় !
—"মনে রেখো ভুলনা আমায় !"

৩

মনে রেখো—ভুলনা আমায় !"
যুগল শিশু-রবি
ভাতে কি হেম-ছবি,—
যুগল বীচি-বালা নাচিয়ে কিবা যায় !
যুগল মথুরায়,
চতুর শ্যামরায়,
যুগল রেণু-রবে ডাকে কি রাধিকায় !
—"মনে রেখো ভুলনা আমায় !"—

৪

"মনে রেখো—ভুলনা আমায় !"
গোপন হিয়া মাঝে
রাগিণী কি এ বাজে !
কে তুমি পশারিণী আসিলে পশারায় !
পুলকে কাঁপে বুক
হায় সে কত টুক !
চরণ-তলে তব বিকানু আপনায় !
—"মনে রেখো—ভুলনা আমায় !"

৫

"মনে রেখো—ভুলনা আমায় !"

কেমনে তোমা ধনে
রাখিব কহ মনে,
হারায়ে গেছে মন তোমারি সুষমায়!
কেমনে ভুলি তোমা,
কহনা নিরুপমা,
ভুলায়ে তুমি মোরে নিয়েছ ইসারায়!
—"মনে রেখো—ভুলনা আমায়!"

৬

"মনে রেখো—ভুলনা আমায়!"
কেমনে মনোময়ী,
বুঝায়ে তোমা কই—
তোমারি আমি শুধু বিশাল বসুধায়!
জীবন-পূজাগারে,
সকল হৃদি-সারে,
আসন রচি তব রহিনু অপেক্ষায়!
জনম কত ধরি,
সাধনা তব করি,
তোমারি ভালবাসা-ভিখারী আমি হায়!
বৃথা এ অনুরোধ—
নিতেছ বুঝি শোধ!
আরতি বুঝি তব শুনিছ ছলনায়!
—"মনে রেখো—ভুলনা আমায়!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অর্ঘ্য।*

নগরের প্রান্তে গ্রাম্যগেহে,
সাহিত্য-শশাঙ্ক উদিল যে আজি।
ঘুচিল আঁধার নয়ন পরাণে,
আশার আলোকে হৃদয় মজি।

বহুদিন ধরে প্রবাস আলয়ে,
সাধিলে সাধনা একান্ত মনে।
আজিকে ভারতী প্রসন্না হইয়ে,
তুষিলেন তোমা মহাবরদানে।

অভীষ্ট পূরিল সফল শ্রম,
কৃতার্থ হইল স্বদেশ স্বজন।
সুব্রত উদ্‌যাপী পুরুষার্থ লভ,
হে সাধক, তব ভেঙ্গেছে স্বপন।

পণ্ডিত-প্রধান বিদ্যার সাগর,
'নবীন' 'বঙ্কিম' 'হেমচন্দ্র' কবি।
'অক্ষয়' অমর দীনবন্ধু মিত্র
ফুটাল যশের সহস্র রবি।

তেমতি এবঙ্গে লভহে প্রতিষ্ঠা,
উজ্জ্বল প্রতিভা বিমল ছবি।
আরও কত ভক্ত বাণীর চরণে
ধন, মান, সুখ সঁপেছে সবি।

জ্ঞানের পতাকা উড়াইয়া দেশে,
সমাজ, সংসার করহে শোধন।
নরনারী সবে সব স্নেহদানে,
অন্ধকার হতে কর বিমোচন।

ঘুচাও দুর্দ্দশা বিদ্যা বিতরণে,
আছে পথ চেয়ে হইয়ে আতুর।
বঙ্গ জননীর সুপুত্রের বেশে,
পরাহতে কর হৃদি ভরপুর।

হইল পবিত্র এ "শান্তি-কুটীর"
তপোবনে যেন উঠে সামগান।
তোমার মহিমা হৃদয় উচ্ছ্বাসি,
সমস্বরে আজি উঠিল তান।

ধন্য হলো 'বালী' তব আগমনে,
শুষ্ক আশা-তরু মুঞ্জরিল পুন।
ঐ শুন ঐ শুন শাখী পরে পাখী
মধুর মধুর সুরে গাহিতেছে গুণ।

---

* বালী "শান্তি-কুটীর্ লাইব্রেরী ও অক্ষয় দত্ত স্মৃতি-সমিতি র" প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম-আর-এ-এস্ মহোদয়ের অভিনন্দন-সভায় পঠিত।

কৃতজ্ঞ অন্তরে উপহার লয়ে
দাঁড়ায়ে দুয়ারে ভকত তোমার,
"হে রাসবিহারী" পর জয়মালা,
স্বদেশবাসীরে সেনেহ বিতরি।

তব শুভ শক্তি হোক বলীয়ান্
নির্ঝরিণী সব প্লাবিয়া এ ধরা।
মরুভূমি তলে ফুটাক কুসুম,
দেবতা মানব চিত্তমনোহরা।

শ্রী'মনোজবা'-রচয়িত্রী।

ভ্রান্তি-ভিক্ষা।

বিস্মৃতি, চরণে তব এই নিবেদন—
আমার মানস-পদ্মে কর অধিষ্ঠান।
ভুলে যাই পূর্ব্বকথা প্রাণের ক্রন্দন,
অনন্ত আমার দুঃখ হোক অবসান।

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

অবাধ্য।

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারা, উল্কা, ধূমকেতু,
নিয়ত ছুটিছে তারা, ধরি সেই সেতু,
একদিন তুমি যাহা করেছ নির্দ্দেশ;
অবজ্ঞা করেনি কভু তোমার আদেশ!
তোমারি আদেশে সদা অটল পর্ব্বত!
সাগর সঙ্গমে ছুটে নিত্য নদী নদ!
শিশিরে তুরন্ত শীত করে আগমন।
বসন্তে বহিয়া যায় মলয় পবন।
কিন্তু মোরা বিশ্ববাসী—সচেতন প্রাণী
বিশ্বের বিধাতা তুমি, এক বাক্যে জানি,
তবু কেন নিশি দিন ভ্রমি ভিন্ন পথে,
তোমারি আদেশ লঙ্ঘি—তোমারি জগতে?
তোমারি সাক্ষাতে নর যায় অধঃপাতে;
কেন না ফিরাও প্রভু পুণ্য-পদাঘাতে?

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

একা।

নির্জ্জন এ বনমাঝে শুধু আমি আছি,
আর কেহ নাই; আসি চারিদিক হ'তে
শূন্য সুখ আলিঙ্গিছে; নিত্য দুঃখ যাচি'
তবু সারা প্রাণ খানি লুটাইছে পথে।
এই সুখ, এই দুঃখ, এদের উপরে
আছে এক পরিপূর্ণ আনন্দ হরষ,
তারি কাছে সুখ দুঃখ সব যায় ম'রে,
—সে এক জনার স্নেহ স্নিগ্ধ পরশ।
সে আর অভাগা যদি কোন দিন পারি
হইতে সাক্ষাৎ, সেথা মরিলেও কভু
সে আনন্দ সব চেয়ে হয়ে যায় ভারি,
তুচ্ছ স্বর্গ তুচ্ছ সুধা তার কাছে প্রভু।
তাই আজ মনে হয় তোমার বিরহ—
সব দুঃখ চেয়ে বেশী একান্ত অসহ।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

'শারদাগমে'।

(সঙ্গীত)

ফুল্ল কমল দল, সরসে উজলি জল,
সজ্জিত আজি নব সাজে!
শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী, সুমধুর যামিনী,
সুন্দর হাসে ধরা মাঝে!
ফুল্ল সেফালী রাশি, শোভিত কাননে হাসি;
চম্পক, বকদল হাসে!
মত্ত মধুপকুল, গুঞ্জরে চুমি ফুল,
মুগ্ধ মানস ফুলবাসে!
মন্দ মেদুর গতি, স্নিগ্ধ-সলিলা নদী,
তট বিধৌত তরঙ্গে!
(তীরে) পুষ্প ধবল 'কাশ' শুভ্র আননে হাস,
ধীর সমীরে নাচে রঙ্গে?
(এস মা! এস মা! এস মা! এস গো জননী)
বিশ্ব পুলকে হাসে, তব আগমন আশে,
বঞ্চিত করোনা মা! পদে,

(তব) দীপ্ত চরণ তলে,   ভক্তি-কমল দলে,
অঞ্জলী দিব মা! শরতে;
বিশ্ব তামস ঘোর   নাশ গো জননী তুমি,
দিব্য কিরণ ঢালি প্রাণে।
বাঞ্ছিত শ্রীচরণ,   লভিতে আকুল মন,
(তব) অপেক্ষায় চেয়ে পথ পানে॥
শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

বিরোধে।

একদিকে, শ্যামশষ্প, কমনীয় ফুলহাসি,
কিসলয়, শান্ত ঊষা, বালরবি, পৌর্ণমাসী,
বিচিত্র, উদার নভঃ, বিহগের কলস্বন,
মধুর শরৎ আর মধু চিত-বিনোদন। ৪

অন্যদিকে, ক্ষিপ্ত ঝঞ্ঝা, শিলাবৃষ্টি বজ্ররাব,
শীতের তুহিনরাশি, নিদাঘের চণ্ডতাপ,
সান্দ্র-তমোময়ী অমা, অভ্রভেদী মহীধর,
রুদ্র-সিন্ধু হুহুঙ্কার খরস্রোত ভয়ঙ্কর। ৮

দ্বিবিধ বিরুদ্ধধর্ম্মী পদার্থ সকলে, মরি!
সুন্দর, মধুর, পূর্ণ প্রকৃতিরে দেছে করি'!
না যোগালে উপাদান উভয়েই সাধ্যমত,
হত কি প্রকৃতি, আহা! সুন্দর, মধুর এত। ১২

তেমনি বিরুদ্ধধর্ম্মী সুখ দুঃখ—দুইজন
সুন্দর, মধুর, পূর্ণ করিয়াছে এ' জীবন। ১৪
শ্রীবিভূতি ভূষণ মজুমদার।

"প্রার্থনা।"

সখা! নিশি দিন তোমা ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিও।
ভাবি নিশি দিন তোমারে, সখা!
তুমি অবসর মত ভাবিও।
আছি চাহি শুধু তোমারি পানে—
তুমি অবসর মতে চাহিও।
ভালবেসেই, (তোমা) হল অগ্রসার,
ভালবাসিবার হলে বাসিও।
শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

৩৫। হিন্দুবিবাহ-সমালোচনা। অর্থাৎ হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র, যুক্তি, এবং বিজ্ঞানের অননুমোদিত বিধায় তন্নিষেধ বিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কৃত। মূল্য ৸০ বার আনা।

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন "আমি প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু বিধবার পুনরায় বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম।" (মৎপ্রণীত হিন্দু বিবাহ সমালোচনা দেখ।)

"এক্ষণে একপ্রকার নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি যে, হিন্দু বিধবার পুনরায় বিবাহ বেদাদি হিন্দু শাস্ত্রের আদৌ অনুমোদিত অথবা প্রাচীন কালীন শিষ্ট সমাজের অনুষ্ঠিত আচার নহে; ইহা বর্ত্তমান প্রস্তাবে প্রদর্শন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। তজ্জন্য ইহাতে বিধবা বিবাহের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় হেতুবাদই নিরপেক্ষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। তদনন্তর প্রস্তাবের উপসংহারে শিশু, বালক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সহিত শিশু ও বালিকার পরিণয় প্রথা সমাজে আর স্থান না পায় এবং তাহা হইলে অবশ্যই বালিকার বৈধব্য এত বিরল ঘটিবে যে, বাল-বিধবার পুনরুদ্বাহের আবশ্যকতাও সেই সঙ্গে

লোকের মনে আর উদয় না হওয়াই সম্ভব হইবে, ইহাও ব্যক্ত করিয়াছি।”

গ্রন্থকারের শেষ মতানুসারে যতদিন সমাজ না চলে, ততদিন কি তিনি বিধবা বিবাহ সঙ্গত মনে করেন? ভুবনেশ্বর বাবু প্রবীণ ব্যক্তি—তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনে আমরা দুঃখিত। দেশ ব্যাভিচার ও ভ্রূণ-হত্যায় ডুবিয়া যাইতেছে, তিনি, তবুও একাদেশ-দর্শীতা কিরূপে যে সমর্থন করেন, বুঝি না। এসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে—আর আলোচনার প্রয়োজন কি? আজ হউক কাল হউক, সমাজ এ পথে অগ্রসর হইবেই হইবে।

৩৬। কণা। শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমাবেশে এই গ্রন্থ পূর্ণ। সদ্ভাব-শতকের পর এরূপ সরস ও মিষ্ট কবিতা পূর্ণ গ্রন্থ আর পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ছাপা ভাল নয়—কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আজকালকার দিনে এরূপ অনেক বাহ্য-শোভা-বিশিষ্ট পুস্তক এবং পত্রিকা দেখিতেছি, যাহা অসার গল্প এবং প্রবন্ধে পূর্ণ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক, কিন্তু তাহাতে সার অতি অল্প। গিল্টি দ্বারা পাঠকদিগকে ভুলাইবার জন্য এ যুগে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু সকলের স্মরণ রাখা উচিত, চাকচিক্যময় কাচই স্ফটিক নয়, উজ্জ্বল প্রস্তর হীরক নয়, গিল্টি বলে পিত্তল কখনও স্বর্ণ হয় না। এই শ্রেণীর পুস্তক এবং পত্রিকা বাজারকে অসারত্বে পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। এসম্বন্ধে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। কণা যে শ্রেণীর পুস্তক, এরূপ পুস্তক, শত স্তরে ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও, আপন গৌরবে ফুটিয়া বাহির হইবে। পুস্তকখানি আগাগোড়া সদ্ভাব ও সুরুচিপূর্ণ সংযত ভাষায় লিখিত—পড়িবার সময় এই মর্ত্ত্য ছাড়িয়া কোন এক স্বর্গপুরে চলিয়া যাইতে হয়। ধন্য বাঙ্গালা ভাষা যে, এরূপ কবির অভ্যুদয় হইয়াছে। আমরা সাদরে তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছি। সব কবিতাই সুন্দর—কোন্‌টী বাছিয়া কোন্‌টী তুলিব, বুঝি না। তবু কণার একটী কবিতা পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

"কুসুমের কাণে কাণে মলয়া কহিয়া যায়
প্রেমের কাহিনী;
দূর আকাশের গা'য় শশী তারা ভেসে যায়
প্রেমার্ত্ত গুঞ্জন করি' সারাটি যামিনী।

'তর-তর নাদে নদী— কহে কথা নিরবধি
সাগর উদ্দেশে;
তুমি কি কবে না কথা, ঘুচাবে না চির ব্যথা?
র'বে চেয়ে' চিরকাল মৌন-নির্নিমেষে?

অধিক চাহি না আর; বল শুধু একবার—
মোরে ভালবাস;
চাহিয়া আমার পানে, সুধাধারা ঢালি প্রাণে
সজল নয়ন কোণে একবার হাস।

মদির এ জ্যোছনায় ক্রন্দনে ফাটিতে চায়
আকুল পিপাসা!
তবু কি নীরব র'বে? এত আর নাহি স'বে!
মুখর হইতে চাহে মৌন ভালবাসা!

তারপরে প্রেম টুক্ হয়ে' যাক্ চির-মূক
নাহি তাহে ক্ষতি!
কিন্তু আজি, আজি, প্রিয়া, উচ্ছ্বসিয়া উঠে হিয়া
শ্রাবণের পূর্ণ তোয়া যথা স্রোতস্বতী।

শুনিনি' কভু যে কথা জাগে নি' কভু যে ব্যথা
—কৌশলে প্রকৃতি
জাগায়ে তা' তোলে কেন আরো মনে আসে যেন
অজানা কথার কত ভেসে-আসা স্মৃতি।

এমন কি চিরদিন বাসনা জাগায়ে' প্রাণে
নীরবে রহিবে!
এমনি করিয়া হিয়া এ আকুল তৃষা নিয়া
ব্যর্থতার পদে শুধু ঠিকরি' পড়িবে?

এ কল্পিত ব্যবধান অমূলক অন্তরাল
যাক্ গো সরিয়া।
তার পরে চির দিন এস দোঁহে হই লীন,
বিচ্ছেদের পরপারে মিলনে মরিয়া।

হয়ে' দু'টি আলো-কণা, এস জ্যোছনার গায়
দোঁহে মিশে যাই;
এস হয়ে' সুধাবিন্দু, 'কুসুমের বক্ষ মাঝে
শিশিরের সনে মিশি' নীরবে ঘুমাই।

দুইটী তারকা হয়ে' দূর নীলিমার গায়
ফুটিয়া রহিব;
মলয়ার সনে মিশি' দূরান্তরে দিশি দিশি
নন্দন সুবাস মাখি' স্বরগে উড়িব।

কভু সখি এর পরে আজিকার মত করে
সাধিব না আর;
চাহিব না তুচ্ছ কথা ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ব্যথা
মিলনের মাঝে সব হবে একাকার।

"কুলু কুলু" করি' নদী কাঁদে বটে নিরবধি
শুধু ততক্ষণ,
যতক্ষণ পারাবারে না মিশায় আপনারে;
মিশিলে অমনি হয় নীরব তখন!

একদিন বিশ্ব ভরে' শুনিব তোমার কথা
দিবস যামিনী;
তোমারে এ বিশ্ব হ'তে দেখিব না ভিন্ন করে,
ক'ব না তোমার কাছে এ তুচ্ছ কাহিনী।

চাহি এ ধরার পানে তোমার মহিমা ধ্যানে
রহিব নিশ্চল;
কি বসন্তে বরষায়, অমা কিবা পূর্ণিমায়
একটী রজনী হতে দিব না বিফল।

হেরিব না ক্ষুদ্র ভাবে তোমার মহিমা রাশি
আজিকার মত;
আজ বুঝিয়াছি হায়, বিশ্ব হ'তে ভিন্ন করি'
মুগ্ধ হ'য়ে ক্ষুদ্র তোমা' করিয়াছি কত!

সবটুকু দেখি নাই, সবটুকু বুঝি নাই
তাই অভিমানে
রয়েছ নীরব হ'য়ে? কাজ নাই আর ক'য়ে;
আমি চেয়ে র'ব শুধু এই বিশ্ব পানে।"

৩৭। শ্রীশ্রীগুরুর পদ। দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা, মূল্য ॥০। শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কর্ত্তাভজন ধর্ম্মের ইতিহাস সংগ্রহ। মুখবন্ধনে বিবৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। গানগুলি ভাবপূর্ণ, কিন্তু রুচি মার্জ্জিত নয়।

৩৮। ভক্তিযোগ। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত। মূল্য ৴০ এক আনা। ভক্তিযোগ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা সংক্ষেপে বিবৃত। সংক্ষিপ্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধ।

৩৯। আদর্শ শিশুপাঠ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ৴০। এ পুস্তকখানিকে কেন আদর্শ বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিলাম না। চলন-সই পুস্তক।

৪০। সাধনা। শ্রীমানকুমারী বসু প্রণীত, মূল্য ১৲। গদ্য পদ্যময় প্রবন্ধ পুস্তক। বিদেশী কাগজে ছাপা। পুস্তক খানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং সরস। আগাগোড়া সুরুচিপূর্ণ। স্কুল পাঠ্য হইবার যোগ্য পুস্তক। তবে মূল্য বড় বেশী বলিয়া মনে হইল।

৪১। A brief History of the Tegharia Workingman's school. এই বিদ্যালয়টী ঋষিপ্রতিম শশীভূষণ রায়·

চৌধুরীর জীবন্ত কীর্ত্তি। আমরা এই বিদ্যালয়ের প্রস্তুত করা একটী সুন্দর পিত্তলের তালা উপহার পাইয়াছি। তালাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। শশীভূষণের জীবনব্যাপী নীরব তপস্যার ফল এই বিদ্যালয়ে সজ্জনগণের কৃপা-বারি বর্ষিত হউক। পুণ্যশ্লোক দরিদ্র ব্যক্তির বিবিধ সৎকার্য্যের ইহা এক বিভাগ মাত্র। মানব-চরিত্রের মধ্যে তিনি যে কাজ করিতেছেন, তাহা তুলনা রহিত। বিধাতার আশীর্ব্বাদে দেবাবির্ভাব হইয়াছে।

৪২। Second Annual Report of the Workingman's Institution, Session April, 1910—March 1911. সৎ ইচ্ছা থাকিলে, যুবকগণের দ্বারাও মানব জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এই অনুষ্ঠানের কৃতকার্য্যতা তাহার অপূর্ব্ব নিদর্শন। সর্ব্বসাধারণের সাহায্য পাওয়ার একান্ত উপযোগী।

৪৩। মানুষের উপর ঈশ্বরের বিশ্বাস। রেভাঃ জে, এম, বি, ডনক্যান এম-এ, বি-ডি, মূল্য ৵০ আনা। বিশুদ্ধ ভাষায় এই পুস্তকখানি লিখিত। বাঙ্গালা ভাষার গৌরব যে, বিদেশী ব্যক্তিগণ এরূপ সুন্দর ভাষায় পুস্তক লিখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। পুস্তকখানি সুলিখিত।

৪৪। সরল ও সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৸০। বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় মূল রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলিত। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। সর্ব্বত্র এই পুস্তক আদৃত হইলে আমরা আরো আনন্দিত হইব।

৪৫। The Annual Report of the Indian Industrial Association, for the year 1910. আয় ৮৩২।০, ব্যয় ৭০৯।০। অতি সৎকার্য্য।

৪৬। মনোহরা। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ প্রণীত, মূল্য ॥০। বালক বালিকাদিগের জন্য গল্প পুস্তক। সরল ভাষায় পুস্তকখানি লিখিত। গল্পগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। শৈলেন্দ্র বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সাহিত্য-সেবা করিলে সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। তাঁহার লেখনী ধারণ সার্থক হউক।

৪৭। যুথিকা। শ্রীআমোদিনী ঘোষ প্রণীত, মূল্য ১৲। বিদেশী কাগজে সুন্দর ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রকাশিত। এরূপ সুন্দর সুন্দর গল্প যিনি লিখিতে পারেন, তাঁহার লেখনীধারণ সার্থক হইয়াছে। আর যে সব কথা লিখিবার ছিল, মহিলার লেখা বলিয়া তাহা লিখিলাম না।

৪৮। ঠাকুর দয়ানন্দ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে, এম-এ বি-এস-সি প্রণীত, মূল্য ১৲। দেশী এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা। ঠাকুর দয়ানন্দের অপূর্ব্ব কাহিনী। বেশ উপদেশপূর্ণ জীবন-বিবৃতি। কিন্তু এই যুক্তিতর্কময় বৈজ্ঞানিক যুগে সব কথা বিশ্বাস করা যায় কি?

৪৯। সাহা বা শঙ্খ বণিক জাতি ও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ। শ্রীমতিলাল ভৌমিক, মূল্য ॥০। জাতি সমূহের ইতিহাসের এক অধ্যায়। সুলিখিত এবং সুসংযত। বাঙ্গালীর বহু সম্ভ্রান্ত লোক এই বংশোদ্ভূত। এই শ্রেণীর উন্নতিতে দেশের গৌরব বাড়িবে।

৫০। ব্যাকরণ-শিক্ষা। শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসগুপ্ত প্রণীত, মূল্য ॥০। বাঙ্গালা ভাষার নব পর্য্যায়ের সুলিখিত সরল ব্যাকরণ। শিক্ষার্থীগণের বিশেষ উপকার হইবে।

দুইটী কবিতা ও একখানি পত্র।

(১)

সিদ্ধি।*

জাগাও জাগাও আত্মার যত সূক্ষ্ম নিভৃত বল ;
ভুলোনা, ভুলোনা জীবন-লক্ষ্য রাখিও ধ্রুব অটল,
ঘটনার স্রোত যেন না ফিরায় তব ভাগ্যের গতি,—
ঘটনাবলির অধিরাজ তুমি, তুমিই ভাগ্যের পতি,—
পোষ অন্তরে এ মহাসত্য প্রত্যয়ে ভরি প্রাণ,
ভয় সংশয়, ভ্রান্তি ঘুচিবে, সিদ্ধি লভিবে স্থান !
কে তুমি তা জান ? ঐশী শক্তি নিবসে তোমার মাঝে,
তোমার ভূমার বিভূতি মহিমা শ্বেত প্রতিভায় রাজে !
প্রপঞ্চে তবে করি বশানুগ, ঘোষ আত্মার জয়,
শক্তি জ্ঞানেতে মুক্তি লভিয়া শান্তিতে হও লয়।
প্রেমে জড়াবে বিশ্ব শরীর আপন করিয়া রাখ,
দ্বেষ-বিজয়ে দিগ্বিজয়ের তৃপ্তিতে সুখে থাক।
মঙ্গলালয় বিশ্বে যা কিছু তার সনে সুর-বাঁধা,
হউক কার্য্য চিন্তা তোমার, সঙ্গীত সম সাধা ;
মহা নীরবতা হ'তে সেই বাণী মর্ম্মের মাঝে পশে,
থাক জাগ্রত আগ্রহ ভরা শোন তাহার বশে :—
অহো, আনন্দ ! রাজনন্দন বুঝ নিজ অধিকার,
আনন্দ তব নিশ্বাস বায়ু, হৃদে আনন্দ সার ;
আত্মার বলে বলীয়ান হ'য়ে অমৃত সুখেতে রহ,—
ইঙ্গিতে জড় ভূত্যের সম রহিবে আজ্ঞাবহ।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র এম-এ, সি-এস।

* ATTAINMENT·

Use all your hidden forces. Do not miss
The purpose of this life, and do not wait
For circumstance to mould or change your fate.
In your own Self lies Destiny. Let this
Vast truth cast out all fear, all prejudice,
All hesitation. Know that you are great,
Great with divinity. So dominate
Environment, and enter into bliss.
Love largely and hate nothing. Hold no aim
That does not chord with universal good.
Hear what the voices of the Silence say:—
All joys are yours if you put forth your claim ;
Once the spiritual laws are understood,
Material things must answer and obey.

Ella Wheeler Wilcox.

রুচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথ জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

—শিব মহিম্নঃ স্তোত্রম্। †

মোড়ের মাথায় সোণার চূড়া
মহাদেবের মন্দিরেতে
শতেক পথে আস্‌চে লোকে
নানামতে পূজা দিতে ;
তোমার অর্ঘ্য, আমার অর্ঘ্য,
তা'তে কিবা আসে যায়,
তিনি যে, ভাই, আশুতোষ,
সকল ফুলই রাখেন পায়।

† All roads that lead to God are good ;
What matters it your faith or mine ?
Both centre at the goal divine
Of love's eternal Brotherhood.

The kindly life in house or street ;
The life of prayer, and mystic rite ;
The student's search for truth and light ;
These paths at one great junction meet,
Before the oldest book was writ,
Full many a prehistoric Soul
Arrived at this unchanging goal
Thro' changeless love that led to it.

A thousand creeds have come and gone,
But what is that to you or me ?
Creeds are but branches of tree.
The root of love lives on and on.

Ella Wheeler Wilcox.

কাঁটা-ঘেরা গোলাপ, ঘেঁটু,
শতদল, বা রক্তজবার,
লিলি, বেলি, চামেলির বা,
সেথা, ফুলের জনম সফল সবার!

সমান-দাবী ভাইয়ের মতন
পিতার পদে সবাই জুটে,
ঘু'রে ঘু'রে, ঘরের পানে
প্রাণের টানে আসে ছু'টে!

কেহ গৃহী,—অর্ঘ্য তাহার
মমতা, শুশ্রূষা, সেবা;
জীবন-ভরা ভক্তি, পূজা,
মন্ত্র, যোগ, আনে কে বা;

জ্ঞানালোক অন্বেষণে
করিয়াছে প্রাণপণ,
শুদ্ধ, সত্য, শুভ্র বুদ্ধি,
অর্ঘ্য দেয় কোন্ জন!

সেই কেন্দ্রমুখে সবার গতি
বেদ-কোরাণের পূর্ব্ব হ'তে,
পুরাণ-গর্ব্ব সেথায় খর্ব্ব
যুক্ত-বেণীর প্রেমের পথে!

বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, নানা,
দর্শনও ত অগণন,
তা'রা কেবল শাখায় ভিন্ন,—
প্রেম, সবার মূলে সনাতন!

শ্রীবরদা চরণ মিত্র, এম এ, সি-এস।

প্রীতিভাজনেষু,

ভাই, তোমার পত্র ও তৎসহ যে মধুময় মাল পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়াছি। কি মধুর! কি মধুর! আর তুমি যে ভাই অমন জিনিষ পাঠাইয়াছ—তোমার প্রাণটাই বা কত মিষ্ট। ঠাকুর তোমায় "উৎসবাদুৎসবং স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং" দিতে থাকুন, তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। তুমিত টাকার জন্য মরিলে না। কেবল আনন্দে আনন্দেই দিন কাটাইলে।

তুমি যে কবিতা পাঠাইয়াছ, তাহা আমি ত মুখস্থ করিয়াছি। আর বাল্যাশ্রমে সেদিন বলিতে বলিতে এখানকার যুবকদিগকে তাহা মুখস্থ করিয়া তদনুযায়ী জীবন চালাইবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছি। কেহ কেহ মুখস্থ করিয়াছে। অনুবাদটীত মূল কবিতা হইতেও সুন্দরতর হইয়াছে। ধন্য মিত্র মহাশয়! তাঁহার "অন্ধকার" কবিতা আমি জন্ম জন্মান্তরে ভুলিতে পারিব কিনা সন্দেহ। অনুবাদটীও মুখস্থ করিয়াছি ও মিত্র মহাশয়কে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইবে। কি অপূর্ব্ব অনুবাদই হইয়াছে। আর এর নাম অনুবাদই বা বলি কেন? মূলে যাহা নাই, তাহাও ইহাতে পাই, আর সে প্রাণ ভরা পাই। "অহো আনন্দ! রাজ-নন্দন, আনন্দ তব নিশ্বাস—বায়ু ইত্যাদি" বাহবা! বাহবা! বাহবা! অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি।

মাঝে মাঝে এমনি কিছু কিছু পাঠাইও। ইহাতে সঞ্জীবনী রস আছে। তুমি বৈদ্য ভাল। বৈদ্যনাথের তোমার প্রতি কৃপা হইয়াছে।

আছি ভাল। শরীরটা ভাল নাই—তা নাই বা থাকলো। তুমি কেমন আছ, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন দেখি না। তোমার আনন্দ টুটাবে কে? তবে এখন আসি। অনুগত,

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

আমার কৈফিয়ৎ। (২)

আমি মিডিয়ম কিনা? কৃষ্ণনগরে একদিন এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহাতে আমাকে মিডিয়ম বলিয়া কিছু বিশ্বাস হইয়াছিল। সে ঘটনাটী এই ;—একদিন আমার এক বন্ধু ও আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় মনে হইল যে, কোন আত্মা আসিয়া আমাকে অধিকার করিলেন। তিনি আমার মুখ দিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। আমার জ্ঞান ছিল। আমার মুখ দিয়া কি কথা বলা হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম। অন্য কথা বলিতে বলিতে একটী বিশেষ কথা আমার মনে আসিল। সেই কথাটী আমার মুখ দ্বারা বলিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু আমার সন্দেহ হইল। আমার মনে হইল যে, ঐ কথাটী হয়তো আমার নিজের মনের কথা, উহা আত্মার কথা নয়। তখন আমি আত্মার শক্তিকে বাধা দিতে লাগিলাম। যাহাতে কথাটী আমার মুখ দিয়া বাহির না হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দুইটী শক্তিতে যুদ্ধ চলিল। এক শক্তি কথাটী আমার দ্বারা বলাইবেন, আর এক শক্তি, আমার নিজের শক্তি, উহা বলিতে দিবে না। যুদ্ধ চলিল।

তখন আমার দক্ষিণ হস্ত উচ্চ করিয়া তুলিয়া আমিই আমাকে বলিতেছি, "তুমি বলিবে না? তুমি বলিবে না?" যেন আমি দুইজন হইয়া গেলাম, একজন বলাইবে, আর একজন বলিবে না। যখন আমি কিছুতেই বলিলাম না, তখন আমার সেই নিকটস্থ বন্ধুর প্রতি আমার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমারই মুখ দিয়া কে বলিলেন, তুমি বলিবেনা, তবে আমি ঐ কথাটী ইঁহার দ্বারা লিখিব। এই বলিয়া আমি সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলাম। সেই বন্ধুটীর হাত নড়িতে লাগিল। তিনি কাগজ পেনসিল লইয়া যে কথাটী আমার মনে ছিল, যাহা আত্মা আমার মুখ দিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পারেন নাই, ঠিক্ সেই কথাটী লিখিলেন। সে কথাটী এই,—"মহাত্মাদের ইচ্ছা যে তোমাকে speaking মিডিয়ম করিয়া এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করেন।" আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কেননা, যে কথাটী আমি কিছুতেই বলিলাম না, উহা ঠিক্ সেই কথাটী। এই ঘটনায় আমার বিশ্বাস হইল যে, আমার কিছু মিডিয়ম শক্তি আছে।

আর একটী কথা। আমি যখন কোন্নগরে থাকিতাম, তখন একদিন কলিকাতা হইতে কোন্নগরের বাসায় যাইতেছি, ষ্টেশন হইতে বাসার দিকে চলিয়াছি, পথে হঠাৎ অনুভব করিলাম যে, আমার মাথার উপর কোন আত্মা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "নগেন্দ্র! তুমি অতি শীঘ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকরূপে নিযুক্ত হইবে। তোমা দ্বারা এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম অত্যন্ত প্রচার হইবে। আমি ইহাতে চমকিত ও আশ্চর্য্য হইলাম। উহা যে একজন আত্মার কথা, তাহা স্পষ্ট অনুভব করিলাম। আমার শরীর, মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাব, অপূর্ব্ব উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। ইহার পর, দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তাৎকালীন সভাপতি শিবচন্দ্র বাবু

আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার ভবনে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, আমাকে সমাজের প্রচারকরূপে নিযুক্ত করা হইবে। আমি এ কথায় আশ্চর্য্য হইলাম। ভাবিলাম, দুই এক দিন আগে ষ্টেশন হইতে বাসায় আসিবার পথে, যাহা আত্মার নিকট শুনিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ মিলিল।

আমার মিডিয়ম শক্তি যে কিছু আছে, মধ্যে মধ্যে তাহার প্রমাণ পাইতাম। কখন এমন হইয়াছে যে, নির্জ্জন গভীর রজনীতে কে আমাকে ডাকিল "ও নগেন্দ্র বাবু!" এমন স্থলে ঐ শব্দ শুনিলাম, যেখানে মনুষ্যের রব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

একদিন কোন্নগরের বাসায় হঠাৎ শুনিলাম, কোন অদৃশ্য শক্তি বলিল, আজ তোমার এখানে শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় আসিবেন। তাঁহার আসিবার কোন কথা বা কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমি ভাবিলাম, দেখা যাউক, তিনি আসেন কিনা? আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখি, আমার ঘরের দ্বারে শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দাঁড়াইয়া। আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলাম। তিনি কয়েকদিন আমাদের বাসায় থাকিলেন।

এইরূপ ঘটনা মধ্যে মধ্যে হইলেও, আমি আমাকে মিডিয়ম বলিয়া মনে করিতাম না। সামান্য একটু মিডিয়ম শক্তি আছে, মনে করিতাম। এখন রীতিমত মিডিয়মশক্তি বিকাশের বিবরণ বলিব। একদিন, নির্জ্জন গভীর রজনীতে কোন পরলোকগত আত্মার কাতরস্বর শুনিলাম। আমি বুঝিলাম, উহা আমার স্ত্রীর স্বর। স্বপ্ন নহে। জাগ্রত অবস্থায় এরূপ শুনিলাম। মনে বড় কষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ আমার পরলোকগতা স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলেন, ঐ প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয়ে স্থায়ী শান্তির সঞ্চার হইল। ঐদিন হইতেই আমার স্ত্রী আমার নিকট আসিতে, ও কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বেও তিনি আমার নিকট আসিতেন, কথা কহিতেন, কিন্তু আমি শুনিতে পাইতাম না। সেই জন্যই তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট ছিল। আমার সহিত বিচ্ছেদই তাঁহার কষ্টের কারণ। এখন হইতে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইল। দু তিনবার তাঁহাকে দেখিতেও পাইয়াছি। আমি তাঁহার নিকট একটী প্রস্তাব করিলাম যে, তিনি যদি প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমার নিকট আসেন, তাহা হইলে, একত্র উপাসনা হইতে পারে। এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় আসিতে লাগিলেন, ও একত্রে উপাসনা হইতে লাগিল। সে উপাসনা এমন চমৎকার হইত যে, মনে হইত যে, যেন পূর্ব্বে কখন আমার এমন ভাল উপাসনা হয় নাই।

আত্মাদিগকে দেখিবার শক্তি কিছু বিকাশ হইল। রাজা রামমোহন রায়কে দুই তিন বার, আমার স্ত্রীকে দুই তিন বার, কেশব বাবুকে একবার এবং প্রতাপ বাবুকে একবার দেখিয়াছি। অন্যান্য পরিচিত ও অপরিচিত আত্মাকেও সময়ে সময়ে দেখিয়াছি। কিন্তু আত্মাদিগকে দেখা অপেক্ষা তাঁহাদের কথা শুনিবার শক্তি আমার অনেক অধিক।

আত্মাদের কথা শুনিবার শক্তি বিকসিত হওয়ায় মনে করিলাম যে, যদি পরলোকবাসী মহাত্মারা আমাকে কিছু কিছু ভাল কথা বলেন, আমি তাহা লিখিয়া লইতে পারি। তাঁহারা জ্ঞানগর্ভ ও ভক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ আমা-দ্বারা লিখাইতে পারেন। এই কথা আমার স্ত্রীকে বলিলাম। প্রথমে তাঁহাকেই উপাসনা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি প্রতিদিন একটু একটু করিয়া উপাসনা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলেন। প্রবন্ধটী যেরূপ হইল, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। যাঁহারা আমার দ্বারা প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে রাজা রামমোহন রায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি পরলোকগত ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে যখন আত্মাদের সহিত আমার আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল, তখন কখন কখন আমার মনে এমন সন্দেহ হইত যে, উহা বাস্তবিক পরলোকবাসী আত্মা, কি আমারই মনের ভাব? কিন্তু ক্রমে উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়া, এসন্দেহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আমি, নিঃসংশয় হইলাম যে, বাস্তবিকই পরলোকবাসী আত্মা, আমার মনের ভাব নহে। আমি যে মিডিয়ম, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হইলাম।

অনেকেই মনে করিতেছেন যে, আমি মহাভ্রমে পড়িয়াছি। কোন মাসিক পত্রিকায় লেখা হইয়াছে যে, বাস্তবিক আমি নিজে ভাবোচ্ছ্বাসে লিখিয়া থাকি, কিন্তু মনে করি যে,পরলোকবাসী আত্মারা লিখিতেছেন।

বাস্তবিক যে, পরলোকবাসী আত্মা দ্বারা অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, ঐ সকল যে কোন ক্রমেই আমার লেখা হইতে পারে না, তাহা নিশ্চিত ও নিঃসংশয়। তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, আমার লেখা হইলে, আমি অবশ্য কোন বিষয়ে লিখিতে ইচ্ছা করিব ও তদ্বিষয়ে চিন্তা করিব। আমার লেখা হইলে, আমার মনে, অবশ্য লিখিবার পূর্ব্বে চিন্তা আসিবে। আগে ভাবিব, তার পর লিখিব। আমার নিজের লেখা হইলে ইহাইতো হইবে? জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতে হইলে, লেখার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা অবশ্য চিন্তা। কিন্তু আমার মনে কোন চিন্তা আসে না। আমি হাত ফেলিয়া রাখি। অপেক্ষা করি, দেখি, কি লেখা হয়। যখন আমার হাত চলিতে থাকে, তখন বুঝিতে পারি, কি লেখা হইতেছে। যদি একজন লোক কিছু লেখেন এবং আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া দেখি, তিনি কি লিখিতেছেন, তাহা যে প্রকার, আমা-দ্বারা আত্মারা যাহা লেখেন, তাহা ঠিক্ সেই রূপ হয়। আমার হাত দিয়া আর একজন লিখিতেছেন, আমি জানিতেছি, কি লিখিতেছেন। আমার জ্ঞান থাকে বলিয়া এরূপ হয়। যে সকল মিডিয়মের জ্ঞান থাকে না, তাঁহারা জানিতেও পারেন না যে, কি লেখা হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ ইহা অপেক্ষা বহুগুণে আশ্চর্য্য। তাহা এই যে, যদিও আমার দ্বারা লেখা হয়, অথাচ কোন কোন সময়ে আমার মতের বিরুদ্ধমত লেখা হয়। যে মতকে আমি ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি, তাহাই আমার দ্বারা লেখা হয়। একদিন কোন আত্মা আমার দ্বারা কোন বিষয় লিখিতেছিলেন, যাহা লেখা হইতেছিল, তাহা আমার মতের সহিত মিলিতেছিল না। তখন সেই আত্মা

আমাকে বলিলেন, "নগেন্দ্র! আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কি তোমার মতের সহিত মিলিতেছে না?" আমি বলিলাম, আজ্ঞে না। আমার ও প্রকার মত নয়।" তিনি বলিলেন, কেন? আমি তখন আমার সহিত না মিলিবার কারণ বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া আত্মা বলিলেন, যাহা লেখা হইয়াছে, কাটিয়া দেও। আমি কাটিয়া দিলাম। এস্থলে বলা আবশ্যক, আত্মা সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যাণ্টের বিবেক সম্বন্ধীয় মতের বিরুদ্ধে লিখিতেছিলেন, আমার সহিত তাহা মিলিতেছিল না। যে স্থলে লিখিত প্রবন্ধের সহিত আমার মতদ্বৈধ, সে স্থলে কেমন করিয়া বলিব যে, আমারই লেখা?

রামচন্দ্র নামক একজন খ্রীষ্টিয়ান এক দিবস আসিয়া আমাদ্বারা একটী প্রবন্ধ লিখিলেন। প্রবন্ধের বিষয়, প্রভু যীশুখ্রীষ্টই পরিত্রাণ-কর্ত্তা। প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে পরিত্রাণ কর্ত্তা বলিয়া সপ্রমাণ করিয়া আমি প্রবন্ধ লিখিব, ইহাই কি সম্ভব?

আমাকে মিডিয়ম করিয়া রামচন্দ্র যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"পরলোকে আসিয়া আবার খ্রীষ্টের নাম প্রচার করিতে পারিব, এ আশা আমার ছিল না। প্রভুর কৃপা আশ্চর্য্য। যখন পৃথিবীতে ছিলাম, তখন তাঁহার নাম প্রচার করিয়াছিলাম। তারপর এখানে আসিয়াও, তাঁহার নাম প্রচার করিতেছি। আজ রাজা রাম মোহন রায় মহাশয় আমাকে গিয়া বলিলেন যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মিডিয়ম হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে তাঁহা দ্বারা নিজ নিজ মত লিখিতেছেন। যদি আমি ইচ্ছা করি, আমিও তাঁহা দ্বারা যীশু সম্বন্ধে আমার মত লিখিতে পারি। এ কথায় আমার আনন্দ হইল। আনন্দ এইজন্য যে, যীশু আমার ইষ্ট দেবতা। যীশুকে আমার পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করি। তাঁহার কথা যে কোন প্রকারে প্রচার করিতে পারিলেই আমার জীবন ধন্য।

"হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছিলাম। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচারে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন পরলোকে আসিয়াও যীশুর নাম প্রচার করিতেছি। এ সকলই যীশুর কৃপায়। যীশু আমার গুরু, যীশু আমার ইষ্ট দেবতা, যীশু আমার পরিত্রাতা। যীশুর কথা বলিবার আমি উপযুক্ত নহি। তবে এই আশ্চর্য্য সুযোগ পাইয়া, তাহা ছাড়িয়া দেওয়া কখনই উচিত বলিয়া বোধ হইল না। রাজাকে ধন্যবাদ দিই যে, তিনি এমন সুবিধা আনিয়া দিলেন। নগেন্দ্র বাবুকেও ধন্যবাদ দি যে, তিনি যীশু সম্বন্ধে কিছু লিখিতে তাঁহা দ্বারা অনুমতি দিতেছেন।"

"এখন কথা এই যে, যীশুর বিষয় আমি কি লিখিব? আমি যীশুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করি। কেন করি, ইহার অনেক প্রমাণ দিতে পারি। প্রথম প্রমাণ এই যে, যীশুর মত মানুষ আর কোথাও দেখিতে পাই না। জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন, অনেক বড়লোক জন্মিয়াছেন, কিন্তু যীশুর মত আর একটী দেখান দেখি। কেহ বলেন, সক্রেটীস বড় জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু যীশুর সহিত তাঁহার তুলনা হয় কি? মানুষের সঙ্গে যীশুর তুলনা নাই। সক্রেটীস কি বুদ্ধদেব কি আর কোন মহাত্মা, যীশুর সঙ্গে কাহারও তুলনা নাই!"

রামচন্দ্রের প্রবন্ধ হইতে এই পর্য্যন্ত

উদ্ধৃত করিলাম। যীশুর ঈশ্বরত্ব বিষয়ে তিনি অনেক লিখিয়াছেন। যদি কোন খ্রীষ্টীয়ান পত্রিকার সম্পাদক,তাঁহার পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ প্রবন্ধ দিতে পারি। আমি যে মিডিয়ম হইয়া লিখি, উহা যে আমার নিজের লেখা নয়, ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি দিব ?

কেহ কেহ বলেন যে, মিডিয়ম হইয়া যাহা লিখিতেছি, তাহা ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় যাহা আছে, তাহার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। একথায় বড়ই মনের কষ্ট হয়। চৈত্রমাসের নব্যভারতে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে যাহা আছে, তাহার সহিত ধর্ম্মজিজ্ঞাসার শক্তিতত্ত্বের মতের সহিত ঐক্য আছে। ইহাতেই কি প্রমাণ হইল যে, ইহলোকবাসী কি পরলোকবাসী অন্য কাহারও সেরূপ মত হইতে পারে না? ইহলোকবাসীর যে সত্যের জ্ঞান আছে, কোন পরলোকবাসীর সে সত্যের জ্ঞান কি থাকিতে পারে না ? ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় যে শক্তিতত্ত্বের কথা আছে,তাহা আমার আবিষ্কৃত সত্য নহে। অনেক দিনের পুরাতন তত্ত্ব। যে আত্মা উহা লিখিয়াছেন, তিনি পৃথিবী হইতে উহা শিখিয়া গিয়াছেন, অথবা পরলোকে গিয়া তথায় উহা শিখিয়াছেন, ইহা কি হইতে পারে না? যে সত্য পৃথিবীতে আছে, তাহা কি পরলোকে থাকিতে পারে না ?

আর এক কথা। আমি মিডিয়ম হইয়া প্রায় ৪০টী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তাহার কোনটীর কিছুই ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় নাই। কেবল আত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সহিত মিল আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল যে, সকলই আমার লেখা, আত্মার লেখা নয় ? আশ্চর্য্য যুক্তি, যা হোক ! অতি সামান্য এক অংশের সহিত মিল আছে বলিয়া মীমাংসা হইল যে, সকলই আমার লেখা, অন্যের লেখা নয় ? ভাষা সম্বন্ধে উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ষ্টেড সাহেব জুলিয়াকে দেখেন নাই। কিন্তু আমাকে যাঁহারা লেখান, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে আমি দেখিয়াছি। ষ্টেড সাহেব জুলিয়াকে দেখেন নাই বলিয়া, কাহারও মতে প্রমাণ হইতেছে যে, আমার দেখা অমূলক। ষ্টেড সাহেব যথন আত্মা দেখেন নাই, তখন আমি যে আত্মা দেখিয়াছি, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইহা একটী অকাট্য যুক্তি বটে! বাস্তবিক কোন কোন মিডিয়মের আত্মা দেখিবার শক্তি হয়। সেরূপ মিডিয়ম অনেক আছেন। তাঁহাদিগকে Seer বলে। প্রেততত্ত্ব বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, আত্মাদিগকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাদের কথা শুনিতে পান, এমন মিডিয়ম সকল আছেন। সাইকিক্যাল-রিসার্চ-সোসাইটির রিপোর্টে এরূপ মিডিয়মের কথা আছে।

আমার দেখিবার শক্তি অধিক নহে, কিছু আছে। আমার শুনিবার শক্তিই অধিক। ষ্টেড সাহেবের যে শক্তি নাই, তাহা আমার থাকা অসম্ভব, এ যুক্তিকে সদ্‌যুক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি না। গূঢ়শক্তি (occult power) নানা প্রকার। কোন ব্যক্তিতে কোন প্রকার বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

আর একটী কথা। আমি মার্কিন দেশীয় প্রণালীতে মিডিয়ম হই নাই। বহু-

দিন হইতে আমি শাস্ত্রানুযায়ী যোগসাধন করিতেছি। শাস্ত্রে যে অষ্টাঙ্গসাধনের কথা আছে, সেই ঋষিমার্গানুসারে আমি সাধন করিতেছি। যখন আমি পরলোকবাসী আত্মাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলাম, পরলোকবাসী মহাত্মারা আমা দ্বারা লিখিতে লাগিলেন, তখন কোন মহাত্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার ঐ শক্তি যোগসাধন দ্বারাই হইয়াছে।

আমা দ্বারা মহাত্মারা যে সকল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সাধারণের উপকার হইবে মনে করিয়া, তাহা প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি। ঐ সকল নিজের নামে প্রকাশ করিতে পারিতাম। তাহা হইলে কেহ কোন কথা কহিতেন না। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া করি? অন্যের লিখিত প্রবন্ধ নিজের বলিয়া সাধারণের নিকট কেমন করিয়া বলি? কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় থাকিতে এ কার্য্য কেমন করিয়া করি? এরূপ করিলে কি পাপে পতিত হইতাম না? যাঁহারা ঐ সকল প্রবন্ধের রচয়িতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের নামেই কি প্রকাশ করা উচিত নহে? ধর্ম্মবুদ্ধি কি এইকথা বলেনা? আমি জানি, ঐ সকল প্রবন্ধ নিজের নামে প্রকাশ করিলে, কেহ কিছু বলিতেন না; বরং প্রশংসাভাজন হইতাম। ধর্ম্মে পতিত হওয়া অপেক্ষা কি লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়া ভাল নহে? অন্যের লেখা নিজের নামে প্রকাশ করার পাপে পাপী হওয়া অপেক্ষা, লোকের নিকট ভ্রান্ত, পাগল, বা প্রতারক বলিয়া অন্যায়রূপে গণ্য হওয়া কি ভাল নহে? নূতন সত্য প্রকাশের জন্য জগতে চিরকালই লোক ঘৃণিত, নিন্দিত ও উৎপীড়িত হইয়াছেন। ইতিহাস শত কণ্ঠে একথার স্বপক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে। ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হওয়া তো সহজ কথা।

প্রবন্ধের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিব। ঐ ঘটনাটী, পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটী ঘটনার ন্যায়, আমি মিডিয়ম কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। ঘটনাটী এই,—আমি একদিন আমার কলিকাতার বাসায় বসিয়া আছি; এমন সময় আমাকে একজন আত্মা বলিলেন, "আমার নাম রামধন দাস"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নিবাস কোথায় ছিল? উত্তর হইল, কলিকাতায়, এই পাড়ায়। এই গলিতে। জীবদ্দশায় আপনি কি কাজ করিতেন? উত্তর হইল, আমি জাতিতে কাঁশারী ছিলাম। থালা, ঘটী, বাটী ইত্যাদি প্রস্তুত করিতাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কত বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল? উত্তর হইল, বৃদ্ধ বয়সে; ষাটের অধিক বয়সে। আপনার কে এখনও জীবিত আছে? উত্তর হইল, আমার স্ত্রী আজও জীবিত আছে। আমাদের বাটীতেই থাকে। এই পাড়াতেই আমাদের বাড়ী।

আত্মার এই কথাগুলি সুস্পষ্টরূপে শুনিলাম। রাত্রিকালে শুনিয়াছিলাম। অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করিয়া তৎপরে প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় দিনে পাড়ায় বহির্গত হইলাম। আত্মা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সকলই মিলিল। ঐ পাড়ায় রামধন দাস নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ষাটের অধিক বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি জাতিতে কাঁশারী। তিনি জাতীয় ব্যবসায়, অর্থাৎ পিতলের পাত্র, থালা, ঘটি, বাটী ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার স্ত্রী জীবিতা আছেন; সকলই মিলিয়া গেল। শ্যামবাজার

হইতে ঐ পাড়ায় আমি তখন নূতন গিয়াছি। ওপাড়ার কিছুই জানি না।

দুটী প্রবন্ধে দুটী প্রশ্নের উত্তর দিলাম। অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বিশ্বাস করি কেন? এবং আমাকে মিডিয়ম বলিয়া বিশ্বাস করি কেন? এই দুটী প্রশ্নের যথাসাধ্য সংক্ষেপে উত্তর দিলাম। এখন পাঠকবর্গকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করি। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঋষি মেধাতিথি।

(ঋগ্বেদ ১।১।২২—১।১।২৩)

পরিচয়।

ঋষি মেধাতিথি কণ্বের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম প্রস্কন্দ। আমরা সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতায় মেধাতিথির কেবল মাত্র ১২টী সূক্ত দেখিতে পাই; তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অগ্নি সম্বন্ধে, দ্বিতীয় ও নবমটী ঋতুগণ সম্বন্ধে, চতুর্থটী ইন্দ্র সম্বন্ধে, পঞ্চমটী ইন্দ্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ষষ্ঠটী ব্রহ্মণস্পতি সম্বন্ধে, অষ্টমটী অগ্নি ও মরুদ্‌গণ সম্বন্ধে, দশমটী অগ্নি ও ইন্দ্র সম্বন্ধে, একাদশটী অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

'বৈদিক ঋষিগণ অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থের উপাসনা করিতেন কেন', মেধাতিথিকে লইয়া আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা সংক্ষেপে এই প্রশ্নের একটী উত্তর দিতেছি। যেমন দুগ্ধ ব্যাপিয়া নবনীত আছে, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া পরমাত্মা বা ব্রহ্ম আছেন। যেমন একই আলো—লাল, নীল, শ্বেত, পীত প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গের গ্লাসে প্রতিফলিত হইলে সেই গ্লাসের রূপ বা বর্ণানুসারে বিভিন্ন রঙ্গের আলো দান করে ও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, তেমনি এক সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম প্রকৃতির বিভিন্ন পদার্থের আশ্রয়ে বিভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, যদিও গ্লাস ভাঙ্গিয়া গেলে সকল আলোই এক,—প্রকৃতির বিভিন্ন পদার্থ নষ্ট হইয়া গেলে যদিও এক পরমাত্মা পরিদৃষ্ট হন, তবুও মায়া বা প্রকৃতির আচ্ছাদনে আবরিত জীব সেই সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যময় পরমাত্মার 'বিরাটত্ব' বা 'সর্ব্বব্যাপকতা' সহসা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ শুধু জ্ঞানীর জন্য নহে, সর্ব্বসাধারণের জন্য ("ঋষি মধুচ্ছন্দা" ধর্ম্ম-প্রচারক"—ধনু দেখ); ঋষি যদিও আত্ম-দর্শী, তবুও সাধারণের হিতকল্পে সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার পার্থিব বা নৈসর্গিক বিভিন্ন পদার্থে প্রতিফলিত বিভিন্ন প্রকার আভাকে বিভিন্ন নামে অবহিত করিতে লাগিলেন।

মেধাতিথির অগ্নি।

যেমন মধুচ্ছন্দার অগ্নি 'ঈলে' 'দেব-মৃত্বিজং' এবং 'রত্নধাতমম্',তেমনি মেধাতিথির অগ্নিও 'দূতং' 'হোতারং' এবং 'বিশ্ববেদসং'; মধুচ্ছন্দার অগ্নির ন্যায় মেধাতিথির অগ্নিও 'গৃহপাল,' হব্যবাহী, যুবা জুহুমুখ, দেবগণের আহ্বানকারী, দেব-দূত এবং ঋত্বিক শ্রেষ্ঠ। অগ্নি ব্যতীত অন্য কেহ দেবগণকে যজ্ঞে

আনয়ন করিতে পারে না, ঋষিরা এই জন্তই সর্ব্বাগ্রে অগ্নিস্তোত্র গান করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদেশে অগ্নির উপাসনা।

সনাতন ধর্ম্মই জগতের আদিভূত এবং সর্ব্বব্যাপক, হিন্দুর 'বেদ'ই অপৌরুষেয়, অনাদি, অনন্ত, নিত্য এবং সত্য। পৃথিবীতে যত প্রকার 'সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম' বা 'উপাসনা প্রণালী' আছে, তৎসমস্তই বেদ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয় যে, কোন সময়ে এক অপৌরুষেয় বেদ ব্যতীত পৃথিবীতে অপর কোনও ধর্ম্ম পুস্তক ছিল না, সনাতন বা বৈদিক ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্ম ছিল না। সনাতন আর্য্যজাতি ব্যতীত যাবতীয় মানব ধর্ম্মহীন, ক্রিয়াহীন, এবং বিচারহীন ছিল। পরে কোন চির অন্ধকারময় দেশে সূর্য্যোদয় হইলে যেমন তদ্দেশীয় লোকবৃন্দ বিষয়-বিহ্বল চিত্তে একদৃষ্টে তৎপ্রতি তাকাইতে থাকে, তেমনি পৃথিবীর ললাট-প্রদেশরূপ ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-রূপ-সূর্য্যোদয় দেখিয়া চির-অন্ধকারাবৃত মানবগণ বিস্ময়-বিহ্বলিত চিত্তে একদৃষ্টে তৎপ্রতি তাকাইতে লাগিল। শিশুরা যেমন কোন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব মনোহর-দৃশ্য দেখিলে ধরিবার জন্য দলে দলে ছুটিতে থাকে, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় জনগণও আর্য্যজাতির বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম রত্ন-নিচয় গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে ছুটিতে লাগিল।—ভারতের উপাসনা-প্রণালী দেখিয়া জড়ে চৈতন্য সত্ত্বা বুঝিতে পারিলেন!—আত্মার অমরত্ব দেখিয়া জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিয়া প্রণত মস্তকে ভারতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন!—ফলে পাশ্চাত্য দেশময় বৈদিক উপাসনা প্রণালী প্রচলিত হইল।—বৈদিক ঋষিগণের অগ্নি নাম হইতে Latins (লাটিনগণ) Ignis, স্লাভ-(Selavonians) গণ Ogni নাম গ্রহণ করিলেন। অগ্নিদেবের যবিষ্ঠ নাম গ্রীকগণ Hephaistos নাম গ্রহণ করিলেন, পৃথিবীময় অগ্নি পূজার ধূম পড়িয়া গেল! গ্রীকগণ মেধাতিথির অনুকরণে স্বর্গ হইতে দেবগণকে আহ্বান-কারী ভরন্যু (অগ্নি) দেবকে Valcan নামে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন সমগ্র পৃথিবী মেধাতিথির ধর্ম্ম-চ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে অগ্নির উপাসনা করিতেন, কিন্তু কেন করিতেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সায়ণ বলেন—

"দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃ নামক ঋত্বিক আগ্নি-রেব।"

সায়ণ আরও বলেন—

"নহি অগ্নিনা সর্ব্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসা দয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি।"

ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে অগ্নি-স্তোত্র করেন কেন?

বেদেও অনেক স্থলে অগ্নিকে "দেবগণের আহ্বান-কারী" বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি?—অগ্নি কিরূপে দেবগণের আহ্বানক্ষম হইলেন? ইহার উত্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, পাঠককে বুঝিয়া রাখিতে হইবে, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়; ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন, দ্রষ্টা মাত্র।

জীবের কল্যাণার্থে বেদরূপ অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয় সত্য, অনাদিকাল হইতেই আছে। পরমাত্মা যেমন জড় পদার্থ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ না পাইলে আমরা তাঁহার সত্ত্বা বুঝিতে পারি না, তেমনি, এই অপৌরুষেয় সত্য যতদিন কোন জড় পদার্থ অবলম্বন না করিয়াছিলেন, ততদিন উহা জড়-

বন্ধনে বদ্ধ জীবের জ্ঞান-গোচর হয় নাই; যেমন পরমাত্মা আমার পত্নী বা পুত্রের জড়দেহ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার কার্য্য দেখিতে পাই, তেমনি বেদরূপ সত্য যখন জীবন্মুক্ত ঋষিদের জ্ঞানময় পরমাত্মার গোচর হইয়া তাহাদের জড় বা ভৌতিক দেহের আশ্রয়ে উচ্চারিত হইল, অমনি সেই অপৌরুষেয় সত্য,—জীবের পরম কল্যাণকর বিপুল মঙ্গল—সাধারণের অধিগম্য হইল। জ্ঞানময় বেদ গোচর হইবার পূর্ব্বে জড়দেহ নিবদ্ধ-জীব জ্ঞানের আলো পায় নাই—তাহাদের মোহ অন্ধকারও দূর হয় নাই। চারিদিকে অজ্ঞানতা, পৃথিবীময় কেবল অজ্ঞান-ধ্বান্তই ছিল; ঋষি এই অজ্ঞানান্ধকারাবৃত নরলোকে সত্য-প্রচারের নিমিত্ত ভাবিত হইলেন। ভ্রান্ত ও অন্ধজীবের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা নিষ্ফল চিন্তা করিয়া চারিদিকে দৃশ্যমান স্বভাবজ পদার্থগুলি দেখিতে লাগিলেন,—ভ্রান্ত মানব সর্ব্বদা যাহা স্বহস্তে 'নাড়া চাড়া' করিতেছে--কর্ম্ম-বিপাক-ঘূর্ণিত জীবের উদ্ধারার্থ তাহাতেই ঐশী-সত্ত্বা আরোপ করিতে প্রয়াস পাইলেন। জাগতিক পদার্থ সমূহের মধ্যে তেজঃ পদার্থই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর,—ভ্রান্ত মানবকে চমৎকৃত করিবার যন্ত্রস্বরূপ, এজন্যই ঋষি সর্ব্ব প্রথম পার্থিব তেজঃ অগ্নির প্রতি ভ্রান্ত মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। ঋষি যেন স্তোত্রচ্ছলে অবিশ্বাসী অজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—অগ্নি কি? কোথা হইতে দাহিকাশক্তি পাইল? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে অজ্ঞানাস্তিকগণ বিব্রত হইল, ঋষি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন,—অজ্ঞ নাস্তিক সমাজে জ্ঞানের প্রচার হইল। এজন্যই ঋষি সর্ব্বাগ্রে অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন।

মেধাতিথির অগ্নি স্তোত্র।

মধুচ্ছন্দার ন্যায় মেধাতিথিরও যজ্ঞস্থলী প্রজ্জ্বলিত, চারিদিকে আত্মদর্শী মহর্ষিবৃন্দ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রতিভাশালী মহর্ষি মেধাতিথি শ্রেষ্ঠ ঋত্বিকের অর্থাৎ উদ্গাতার আসন গ্রহণ করিলেন—অগ্নিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—

"অগ্নিং দূতং বৃণামহে হোতারং বিশ্ব বেদসং।"

"অগ্নি দেবগণের আহ্বানক্ষম সর্ব্বধন যুক্ত এবং এই যজ্ঞের সম্পাদক।"

"অগ্নে! দেবাং ইহাবহ যজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে
অসৌ হোতা ন ঈড্যঃ।"

"হে কাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নি! তুমি ছিন্ন কুশ যুক্ত এই যজ্ঞস্থলে দেবগণকে আনয়ন কর। তুমি আমাদের স্তুতি পাত্র।"

"ঘৃতাহবন দীদ্বিব প্রতিস্ম রিষতোদহ অগ্নে
রক্ষস্বিনঃ।

"অগ্নি ঘৃত দ্বারা আহুত ও দীপ্তিমান, রাক্ষসের সহিত মিলিত আমাদের বিদ্রোহী-দিগকে দহন কর।"

"কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্য-ধর্ম্মাণ মধ্বরে।
দেব সচীব চাতনম্॥

"যজ্ঞের সময় কবিও সত্যধর্ম্মা অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তুতি কর।"

স নঃ পাবক দীদিবো অগ্নে দেবাং ইহাবহ। উপযজ্ঞং হবিশ্চনঃ॥

"হে দীপ্তিমান্ পাবক অগ্নি। তুমি দেবগণকে এই যজ্ঞস্থলে আনয়ন কর এবং আমাদের যজ্ঞ ও হব্য তাহাদের নিকট লইয়া যাও।"

মেধাতিথি এইরূপে তিনটী সূক্তে—৩৬টী ঋকে অগ্নি-স্তোত্র সমাপ্ত করিয়াছেন। অতপর ঋতুস্তোত্রে—ঋতু অর্থাৎ গ্রীষ্মাদি ষড়

ঋতু। সাধারণতঃ ঋতুর উপাসনার কথা শুনিলে হয়ত অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করিবেন—কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী—যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি জন্মিয়াছে, তাঁহারা ঋতু সমূহেরও ক্রম বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত হন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত,—অনাদিকাল হইতে এই রূপেই ঋতু সমূহের যাওয়া আসা হইতেছে,—একদিনও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না কেন?—যাঁহারা জ্ঞানের সাধক,—ভক্তি যাঁহাদের অলঙ্কার—বিশ্বাস যাঁহাদের শিরোভূষণ,—তাঁহারা এই সব ভাবিয়াই বিভোর হইয়াছেন—যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থে এক একটা চেতন সত্ত্বা অনুভব করিয়াছেন, ঋষিগণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন, চেতন জড়ের অলক্ষ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। ইঞ্জিনের জোরে যেমন রেলগাড়ী চলে, তেমনি এক চেতনের জোরে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। যেমন কার্য্যের মূলে কারণ আছে, তেমনি জড়ের মূলে চেতন আছে।—ঝঞ্জা যেমন তরঙ্গলহরী দ্বারা সিন্ধুকে সংক্ষোভিত করে, তেমনি একমাত্র চেতনই এই বিশ্বসিন্ধুকে জন্ম-মরণ তরঙ্গলেখায় সংক্ষোভিত করিতেছেন। বিপুল জ্ঞানের ভাণ্ডার ঋষিগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে এই সকল চিন্তাই নিয়ত প্রতিভাত হইত, তাই তাঁহারা যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থকে দেব জ্ঞানে পূজা করিয়াছেন। এবং মেধাতিথিও ঋতু সমূহে ক্রমবিকাশ রূপ চেতন সত্ত্বার কার্য্য দেখিয়া ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে গাহিয়াছেন—

মেধাতিথির ঋতুস্তোত্র।

"অগ্নে। দেবাঁ ইহাবহ সাদয়াযোনিষু ত্রিষু।
পরিভূষ পিব ঋতুনা।"

"দ্রাবিণোদা দ্রাবিণসো যাবহস্তা সোঽধ্বরে।
যজ্ঞেষু দেব মীলতে॥"
"দ্রাবিণোদা দদাতু নো বসুনি যাণি শ্রুণ্বিরে।
দেবেষু তা বনামহে॥"
দ্রবিণোদা পিপীষতি জুতহ প্র চ তিষ্ঠ
নেষ্টাদৃতু ভিরিষ্যত
"গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা যজ্ঞ নীরসি।
দেবাং দেবয়তে যজ॥

অর্থাৎ এই কয়টী ঋকে ঋষি দ্রবিণোদা অগ্নি এবং ত্বষ্টাকে ঋতুর সহিত সোমরস পানার্থ আহ্বান করিয়াছেন।

অতঃপর ইন্দ্র-স্তোত্র।

মেধাতিথির ইন্দ্র-স্তোত্র।

বর্ষণার্থক 'ইন্দ্‌' ধাতু হইতে 'ইন্দ্র' শব্দ নিষ্পন্ন, সুতরাং ইন্দ্র অর্থে (১) বৃষ্টিদাতা আকাশ। ঋষি ঋতুগণের পরেই 'ইন্দ্র-স্তোত্র' আরম্ভ করিয়াছেন, ইন্দ্র অভীষ্টবর্ষী, হরি নামক অশ্বে আরোহী ইনি বলের জন্য, হব্যের জন্য, এবং বৃত্র বধের জন্য তৃষিত মৃগের ন্যায় সোমরস পান করেন।

(ঋগ্বেদ—১।১।১৬দেখ)।

ঋষি ইন্দ্র-স্তোত্র গান করিতেছেন—

"আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বৃষণং সোমপীতয়ে।
ইন্দ্র ত্বা সুর চক্ষসঃ॥
"ইন্দ্রং প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রং প্রয়ত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে॥
"উপ নঃ সুত মাগুহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ।
সুতে হি ত্বা হবামহে॥
"বিশ্বামিৎ সবনং সত্যামিন্দ্রো মদায় গচ্ছতি।
বৃত্রহা সোম পীয়তে॥

"হে বৃষণ! অর্থাৎ বর্ষণকারী ইন্দ্র! তোমার অশ্বগণ তোমাকে সোম পানার্থ লইয়া আসুক।"

"প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি,

যজ্ঞ সম্পাদন কালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, এবং সোম পানার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করি।"

"কেশরযুক্ত হরিনামক অশ্বগণসহ অভিষুত সোমরস সমীপে এসো, সোম অভিষুত হইলে তোমাকে আহ্বান করি।"

"বৃত্রহন্তা ইন্দ্র সোম পানার্থ এবং হর্ষ লাভার্থ সকল অভিষুত সবনে গমন করেন।

মেধাতিথির বরুণ-স্তোত্র।

এই গেল মেধাতিথির ইন্দ্রস্তোত্র;—অতঃপর বরুণ-স্তোত্র আরম্ভ। বরুণ কে? আবরণার্থক বৃ ধাতু হইলে বরুণ কথাটার উৎপত্তি হইলে বরুণ-শব্দে আবরণকারী আকাশকে অথবা আকাশস্থিত জলদেবকে বুঝাইবে,—ঋষি বলিতেছেন, বরুণ সম্রাট, মনুষ্যদিগের অধিপতি;—যেমন সহস্র ধন-ধাতাগণের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, তেমনি স্তুতি-পাত্রগণের মধ্যে বরুণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সকলের স্তুত্য। ইন্দ্রের সহিত একত্রে বরুণের স্তব করিতে হয়; ঋষি ইন্দ্রের পরেই বরুণের স্তব করিতেছেন।

"ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আবৃণে। তা নো মৃলাত ঈদৃশে॥"

"আমি সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের নিকট রক্ষণের নিমিত্ত যাচ্ঞা করি, এরূপ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সুখী হন।"

"হে ইন্দ্র ও বরুণরাজ! আমাদিগের ইচ্ছানুসারে ধন দিয়া তৃপ্ত কর, তোমরা সমীপে থাক।"

"আমাদের যজ্ঞ হব্য-মিশ্রিত, স্তোত্র ও উচ্চারিত, অতএব যেন যজ্ঞকারীদের মুখ্য হই।

সহস্র ধনদাতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্তুতিপাত্রদিগের বরুণ সকলের স্তুত্য।

"হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমি স্তুতি বাক্য দ্বারা তোমাদের স্তব করিতেছি, আমাদের যে স্তুতি তোমরা গ্রহণ করিয়াছ, সেই শোভনীয় স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মরুদগণ দ্যুতিমান, হিংসাহীন, অধৃষ্টবল-সম্পন্ন, বৃষ্টিদাতা, শোভমান, উগ্ররূপধারী, এবং দীপ্যমান, স্বর্গবাসকারী, ইঁহারা মেঘরাশিকে সঞ্চালন করেন, সাগর জল উৎক্ষিপ্ত করেন, বাঙ্গালী কবির ভাষায় মরুত-স্তোত্র পাঠ করুন। (১)

মেধাতিথির মরুত-স্তোত্র।

"যে উগ্র মরুদগণ দন্তহীন বলশালী
করিয়াছিলেন যারা বারি বরিষণ,
হে অগ্নি। তাহাদের সহ কর আগমন।
যারা শোভমান যাঁরা অরাতি দমন
সেই উগ্ররূপধারী মরুদ্গণ নিয়ে সাথে
হে অগ্নি! তুমি এ যজ্ঞে তুমি কর আগমন,
আকাশের উর্দ্ধভাগে দীপ্যমান স্বর্গলোকে
আছেন প্রদীপ্ত তেজা মরুদেবগণ,
হে অগ্নি! তাঁদের সহ কর আগমন!
মেঘমালা যাঁহারা করেন সঞ্চালন,—
সমুদ্রের জলরাশি ক্ষোভিত করেন যাঁরা,
হে অগ্নি! তাঁদের সহ কর আগমন!
সূর্য্যের কিরণে যাঁরা ব্যাপিয়া গগন
মিশেন গগনময়, আপনার বলে যারা
করেছিলা সমুদ্রের জল উদ্বেলন।
হে অগ্নি! তাঁদের সহ কর আগমন!

ঋভুগণ কাহারা?—একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া সায়ণ বলেন—"ঋভবোহি মনুষ্যাসন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।" সায়ণ আরও বলেন—"আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যতে।"

(১)। আমার অনুবাদিত "ঋগ্বেদের" পদ্যানুবাদ হইতে উদ্ধৃত। লেখক।

ঋষি, নিজ মুখে বলিতেছেন—ঋভুগণ আপনার মাতাপিতাকে পুনর্ব্বার যৌবন-সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ইঁহারা মনুষ্য হইয়াও দেবতার যজ্ঞভাগ সেবন করেন।—সায়ণ আবার বলেন—"ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য, ইঁহারা ত্বষ্টা-নির্ম্মিত একটী পাত্র চারি খণ্ড করিয়া দেব-সমাজে অনেক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।"

মেধাতিথি মরুদ্‌গণের পরেই ঋভুগণের স্তব করিতেছেন—তাঁহারা অর্থাৎ ঋভুগণ নাসত্যদ্বয়ের জন্য এক সর্ব্বগামী সুখকর রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং একটী দুগ্ধবতী গাভী উৎপাদন করিয়াছিলেন।

ঋজুতাপ্রিয় এবং সর্ব্বকর্ম্ম-ব্যাপ্ত সেই ঋভুগণের মন্ত্র কখনও বিফল হয় না,—তাহারা বিগত-যৌবন পিতামাতাকে পুনরায় যৌবন-সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ত্বষ্টার সেই নবীন চমস উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইলেও ঋভুগণ পুনর্ব্বার চারি খণ্ড করিয়াছিলেন।

যজ্ঞবাহী ঋভুগণ (মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াও অক্ষয় আয়ুঃ) ধারণ করেন, এবং আপনার সুকৃতি বলে দেবগণের যজ্ঞভাগও সেবন করেন।

অতঃপর মেধাতিথি অশ্বিদ্বয় স্তোত্র করিয়াছেন। অশ্বিদ্বয় কাহারা? যাস্ক বলেন—

"তৎ কৌ অশ্বিনৌ, দ্যাবা পৃথিব্যৌ ইতি একে, অহরাত্রৌ ইতি একে, সূর্য্যাচন্দ্রমাসৌ ইতি একে, রাজানৌ পুণ্যাকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃকাল ঊর্দ্ধমূর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশিভাস্য অণুবিষ্টম্ভমমু।"

অতএব অর্দ্ধরাত্রির পর এবং আলোক প্রকাশের পূর্ব্বেই অশ্বিদ্বয়ের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে ঋষি কি বলিতেছেন, শুনুন।

ঋষি বলেন—অশ্বিদ্বয় বিস্তীর্ণ ভুজবিশিষ্ট (১।১।৩ দেখ) বিক্রমশালী ও নেতা (১।১।৩—২ দেখ) রথযুক্ত, শোভনীয় এবং স্বর্গবাসী (১।১।২২—৩ দেখ) ইঁহারা প্রভাত কালে জাগরিত হন (১।১।২২—১ দেখ)।

ঋষি প্রথমেই অধ্বর্য্যুকে বলিতেছেন—

অধ্বর্য্যু! প্রভাতকালে সম্মিলিত অশ্বিদ্বয়ে কর জাগরিত
সোম পান তরে তারা আসুন এ যজ্ঞভূমে সে চির-শোভিত।

ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তব উচ্চারণ করিতেছেন—

"যে দেব অশ্বিদ্বয় সুরথ যুক্ত রথিশ্রেষ্ঠ এবং স্বর্গবাসী তাঁহাদিগকে আহ্বান করি।

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে অশ্ব-স্বেদ-যুক্ত এবং সুধ্বনিযুক্ত কশা আছে, তাহার সহিত (শীঘ্র) আসিয়া এই যজ্ঞ সিদ্ধ কর।

হে অশ্বিদ্বয়! রথে চড়িয়া সোমদাতা যজমানের যে গৃহের দিকে গমন করিতেছে, তাহা (সেই গৃহ) দূরে নহে।

মেধাতিথির সবিতা-স্তব।

অতঃপর সবিতা-স্তব। প্রসবার্থক 'সূ' ধাতু হইতে 'সবিতা' শব্দ উৎপন্ন; সুতরাং 'সবিতা' অর্থে যিনি এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন; বিজ্ঞান মতে সূর্য্য হইতে সৌর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সবিতা অর্থে সূর্য্য, ঋষিও বলেন, সবিতা নিবাসের হেতুভূত? ধনের বিভক্তা এবং মানবের প্রকাশকারী। (১।১।২২—৭ দেখ)। সুতরাং সবিতা অর্থে সূর্য্যই। "সবিতা" নিবাসের হেতুভূত কেন? পৃথিবীর যাবতীয় গুণ বা ধর্ম্ম সূর্য্য কিরণের উপর নির্ভর করিতেছে; যদি কোন কারণে মাধুর্য্য কিরণ পৃথিবীতে পৌঁছিতে না পারে,

তবে এই শস্য শ্যামলা ধরা—এক কালে শ্মশানে পরিণত হইবে, বিজ্ঞানের এই সত্য ঋষির জ্ঞানগোচর ছিল, এজন্যই সূর্য্য বা সবিতাকে নিবাসের হেতুভূত বলিয়াছেন!

ঋষি কিরূপ সবিতা স্তব করিতেছেন শুনুন।

"জলশোষক সবিতাকে রক্ষণার্থ স্তুতি-কর—আমরা তাহার যজ্ঞ কামনা করি!

"নিবাসহেতু, সর্ব্বধন বিভক্তা নরলোক-প্রকাশকারী সূর্য্যকে স্তুতি কর!

"সখাগণ! চারিদিকে উপবিষ্ট হও, সবিতাকে স্তুতি করিতে হইবে, ধনদাতা সবিতা শোভা পাইতেছেন।

বিষ্ণুকে?—যাস্ক বলেন—

মেধাতিথির বিষ্ণু-স্তব।

"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ, ত্রিধা নিবর্ত্তে পদং। ত্রেধা ভাষায় পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে লয় শিরসি ইতি ঊর্ণনাভঃ। নিরুক্তের এই অংশের উপর দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করেন—

বিষ্ণুরাদিত্য। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ ভাবাৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিধি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নিভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধি তিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা দিবিসূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং তমু অক্রিণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কথমিতি। সমারোহণে উদয়গিরি উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণু পদে মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে লয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণনাভো মন্যতে।

ইহা হইতে বুঝা যায়—বিষ্ণু সূর্য্যেরই নামান্তর, ঔর্ণনাভ স্পষ্টই বলিলেন—সূর্য্যের উদয় গিরিতে আরোহণ, মধ্যাকাশে স্থিতি এবং সায়ংকালে অস্ত গমন, এই তিনটী বিষ্ণুর তিন প্রকার পদক্ষেপ! সুতরাং বিষ্ণু সূর্য্যেরই নামান্তর।

বেদও বলিতেছেন—বিষ্ণু সপ্ত কিরণ-শালী (১।১।২২—১৬) তিনি এই জগৎ পরিক্রম করেন এবং তাহার কিরণে জগৎ আবৃত হয় (—১।১।২২—২২—১৭) বিষ্ণু ত্রিপদ বিক্ষেপে এই জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।১৫) বিষ্ণু অসুরগণকে (অন্ধকারকে) বঞ্চিত করিয়া এই জগৎ প্রকাশরূপ দেবগণকে প্রদান করিলেন, অর্থাৎ প্রকাশিত করিলেন। (১।২।৫,—শতপথব্রাহ্মণ) ঋষি এইরূপ বিষ্ণু-স্তব করিতেছেন।

বিষ্ণু, সপ্তকিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন—সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

বিষ্ণু তিন প্রকার পদবিক্ষেপ দ্বারা এই জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলি যুক্ত (কিরণময়) পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।

বিষ্ণুর যে কর্ম্ম প্রভাবে যজমান ব্রত সমূহের অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্ম সকলের প্রতি দৃষ্টি কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

দীপ্তিমান্ আকাশে সর্ব্বত্রবিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বান্ ঋত্বিকগণও সেইরূপ বিষ্ণুর পরম পদ নিরীক্ষণ করেন।

মেধাতিথি এইরূপ জল, বায়ু, মিত্র, বরুণ, সরস্বতী, মহী প্রভৃতি বহুবিধ দেবতার উপাসনা করিয়া ভবিষ্যতে মানবের জন্য পরম কল্যাণকর উপদেশ-সমূহ রাখিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ শুধু জ্ঞানী বা উপাসনা রাজ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নহে, উহা সর্ব্বসাধা-

গণের জন্য। আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবিষ্ট পণ্ডিত, মূর্খ, মেধাবী, অমেধাবী সকলেই বেদ হইতে, বিদ্বান্ হইতে পারিবেন—ইহাতে উপাসনা-জগতের বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, যিনি যদ্রূপ আহার্য্য হজম করিতে পারেন, তিনি তাহাই পাইবেন। আজ কাল যেমন কিণ্ডার গার্ডেন প্রণালী অবলম্বনে প্রকৃত রাস্তা দেখাইয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, অথবা প্রথম হইতেই শিশুর মেধাতিথির প্রকৃত বস্তু জ্ঞান জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে।

মেধাতিথির উপদেশ।

আধ্যাত্মিক জগতের শিক্ষক ঋষিও উপাসনা বিদ্যালয়ের শিশুদিগের জন্য কিণ্ডার গার্ডেন প্রণালী বা প্রকৃত বস্তুজ্ঞান প্রদায়িনী শিক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন।

যাঁহাকে বর্ণমালা শিখাইতে হইবে, তাহার নিকট যেমন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা অনুশীলনী প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা নিরর্থক, তেমনি উপাসনা-বিদ্যালয়ে নবপ্রবিষ্ট শিশুর নিকট "ব্রহ্মতত্ত্ব' বা ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করাও নিরর্থক।—এই জন্যই ঋষি প্রকৃতির প্রত্যেক শক্তিমান পদার্থে এক একজন দেবতা কল্পিত করিয়াছেন—শিশু সর্ব্বদা যাহা নয়নগোচর করিতেছে,—অহর্নিশি যাহা পাইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে; মেধাতিথি প্রথম তাহাদের একতর পদার্থে অগ্নিকে দেখাইয়াই শিশুকে বলিলেন "ওকে" ?—কিসের বলে জ্বলিতেছে? গুরুর প্রশ্ন শুনিয়া শিশু বিস্মিত হইল—তাহার কোমল হৃদয়ে ক্রমে চিন্তার স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল।—শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞানের অঙ্কুর দেখিয়া গুরু বুঝাইয়া দিলেন—ইহার ভিতরে এমন একটী পদার্থ আছে, যাহা না থাকিলে তাহা জ্বলিতে পারে না,—এইরূপে মেধাতিথি প্রথম সূক্তত্রয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকারী শিশুকে বস্তুজ্ঞান দিবার নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন।

অনন্তর ঋষি যখন দেখিলেন—শিশুর কোমল হৃদয়ে জ্ঞানের বীজ ক্রমশঃই অঙ্কুরিত হইতেছে,—অমনি তাহাতে জল সেচন করিতে লাগিলেন, প্রথম যেমন আগুন দেখাইয়া 'জড় পদার্থেও একটা চেতন সত্ত্বা আছে' এই চিন্তা শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করাইলেন; অনন্তর এই চিন্তার সীমারেখা বর্দ্ধিত করিবার জন্যই যেন বলিলেন—জগতে সময়ের সামঞ্জস্য কে রক্ষা করিতেছেন? পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, দিবারাত্রি, শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি যেন এক অন্যের অঞ্চল ধরিয়াই যাওয়া আসা করিতেছে। ইহাদের গমনাগমনের নির্দ্দিষ্ট বিধান কে রক্ষা করিতেছেন? কে উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছেন? নিপুণ ভৃত্যের মত উহারা কাহার আজ্ঞা পালন করিতেছে? ঊষা কাহার আজ্ঞায় মনোমোহন বেশে উদিত হইয়া বিশ্বমানবকে হর্ষোৎফুল্ল করিতেছে? সবিতাদেব কাহার নির্দেশে স্বভাবসুলভ কিরণরেখা সম্পাতে এই শস্যশ্যামলা বাঁচাইয়া রাখিতেছেন?—জলদজাল কাহার আদেশে বর্ষার গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে—স্নিগ্ধ শীতল বারিধারা সম্পাতে প্রতিনিয়ত এই অবনীমণ্ডল শস্যশ্যামলা করিতেছে? যাবতীয় নৈসর্গিক পদার্থেই এক চেতন সত্ত্বা আছেন, তিনিই এই জড় প্রকৃতিতে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন,—এইরূপে মেধাতিথি জড়ে চেতনার বিকাশ আবিষ্কার করিয়া মানবের গুরুপদে বরিত হইলেন,—জ্ঞানপিপাসুগণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন।—জগতে প্রচারিত হইল, এক পরমাত্মা বা ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপক, যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে

সর্পভ্রম হয়, তেমনি এক পরমাত্মাই মায়া বা প্রকৃতির আবরণে বিভিন্ন রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন। বস্তুতঃ এক তিনিই বৃক্ষরূপে ফল দান করিতেছেন,—জলরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন, সূর্য্যরূপে কিরণ দিতেছেন। তিনি মাতৃরূপে স্নেহ করিতেছেন, পত্নীরূপে সেবা করিতেছেন, বন্ধুরূপে অভিভাষণ করিতেছেন! এইরূপে মেধাতিথি, লোক কল্যাণকর ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে প্রচার করিলেন।—মানবের জ্ঞানগোচর হইল—জগৎ মিথ্যা—একমাত্র পরমাত্মাই সত্য।

ভারতে এই স্বর্গের বার্ত্তা—ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারিত হইল। সমস্ত পৃথিবী ঋষিগণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। গ্রীক, স্লাভনীয়, রোমান প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশবাসীগণও ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতির উপাসনা করিতে লাগিলেন।

পৃথিবীর পীঠস্থান জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসবিনী জগদ্‌গুরু ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। ভারতের শীতল সমীরণ—যাহার স্নেহস্পর্শে আমরা পুলকিত হইতেছি, তাহাতে আচার্য্যগণের শেষ নিঃশ্বাস মিশ্রিত আছে বলিয়া আমরা পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত হইব,—এই আকুমারী হিমালয় ভারতে—যিনি জননীর ন্যায় আমাদিগকে বুকে রাখিয়াছেন—যাঁহার অণু সমষ্টিতে আমাদের ভৌতিক দেহ গঠিত হইয়াছে—তাঁহার প্রত্যেক ধূলি-কণিকায় আচার্য্যগণের চরণরেণু মিশ্রিত আছে বলিয়া আমরা পুনর্ব্বার জাগরিত হইব। বন্ধুগণ! এই শস্যশ্যামলা বসুন্ধরাকে কেবল উপভোগের সামগ্রী মনে করিবেন না।—এই শস্যবীথিপূর্ণ ময়দান—জননীর ন্যায় ক্ষীর স্তন্যবাহিনী স্রোতস্বিনী—সুরভি পরিপূরিত স্নিগ্ধ শীতল মলয়ানিল,পিতামহগণের প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ কর। ভ্রান্ত হইও না। 'ঋষিবাক্য' এবং 'বেদবাক্যে' আস্থা স্থাপন কর। ঘরের ছেলে ঘরে এস, আপনার স্বর্ণসৌধ পরিত্যাগ করিয়া পরের পর্ণাবাসে আশ্রয় লইতেছ কেন?

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী।

মৌনীবাবা—দেহান্তে।

ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে মৌনীবাবার জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জন্মস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা আজ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সে তীর্থের পুণ্য স্মৃতিটুকু সান্ত্বনার ন্যায় মনকে ছাইয়া ফেলে, মৌনীবাবার শিশুজীবন এই ধূলায় খেলা করিয়াছিল, তাঁহার যৌবনকাল এইখানে কাটিয়াছিল—এ সেই গ্রাম, সেই পল্লিভবন—সাধনার সুগন্ধে পূর্ণ। পরিবারটী নিত্য শান্তিময়। এখানে কোন আড়ম্বর নাই, প্রদর্শনের কোন বস্তু নাই, শিক্ষা ও সভ্যতার বাহ্যপ্রকাশ কিছু নাই, কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠায় এস্থান পবিত্র, স্নেহে সুকোমল, সন্তোষে শান্তিময়। দেখাইবার মত এখানে কিছু নাই—অনুভব করিবার মত অনেক আছে। কয়েকটী শিশু মৌনীবাবার জননীর চরণ দর্শন করিবার জন্য এই তীর্থ-যাত্রা করিয়াছিল। সেই শিশুযাত্রীদের ক্ষুদ্র হৃদয়গুলিও এস্থানের বিশেষত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তাহাদের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়—আজুদিয়ার মত জায়গা কোথাও নাই।

নূতন কর্ম্মীর দল।—দুই বৎসর হইল, গ্রামে একটী মধ্যইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একদল যুবকের হৃদয়ে উদ্দীপিত মঙ্গলভাবে এই কার্য্যের সূচনা। মৌনীবাবার মাতুল-পুত্র এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং অবৈতনিক শিক্ষক। তিনি বিদ্যালয়ের জন্য একবিঘা জমি দান করিয়াছেন, ভিক্ষা করিতেছেন এবং দেহ মন সমর্পণ করিয়া রাত্রি দিন শ্রম করিতেছেন। আর কয়েকটী যুবক বিনা বেতনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ করিতেছেন। আগে যাঁহারা নাটক অভিনয় ও বৃথা আমোদে অর্থ ও জীবন নষ্ট করিতেন, এখন তাঁহারা আত্মোন্নতি ও দেশের উন্নতিতে মন দিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ, স্বদেশ-প্রেম, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ,সেবানিষ্ঠা দেখিলে মন আশায় আনন্দিত হয়। এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হয়—তাঁহারা মৌনীবাবার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

শুনিতে পাই, স্বদেশী ভাব এখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। সুখপ্রিয় বিলাস-পরায়ণ সমাজে একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই দরিদ্র গ্রামবাসীগণ 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে'ই সন্তুষ্ট। অপরিস্কার লবণ ও গুড় খাইয়া তাঁহারা আনন্দে জীবন কাটাইয়া দিতেছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে জনসাধারণের এক সভা হইয়াছিল। শুনিয়াছি, পল্লিবাসিনী শিক্ষালোকবিহীনা মহিলাগণ সেইদিন যে বিলাতী চূড়ী প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়াছিলেন, ওজন করিয়া তাহা আড়াই মণ হইয়াছিল। হিন্দুমুসলমানের সৌহৃদ্য এখানে অটুট রহিয়াছে।

সাধকদল।—এই সকল মঙ্গল-কর্ম্মের মূলে রহিয়াছেন, পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ সাধক। তাঁহার জীবনের কাহিনী অপূর্ব্ব। প্রথম বয়সে তিনি মৌনীবাবার মাতুল মহাশয়দিগের মহাজনী গদিতে কাজ করিতেন। পরে গৃহে পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মৌনীবাবার উপাসনা দেখিয়া তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়। তখন হইতে নিজে উপাসনা আরম্ভ করেন। কিন্তু উপাসনার সঙ্গে আর প্রাচীন ভাব ও ব্যবসা রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইল না। তখন উপবীত ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কঠিন নির্য্যাতন আরম্ভ হইল, দুঃখ দারিদ্র্যের একশেষ হইল। ধীরভাবে সকলই সহিলেন। প্রায় কুড়ি বৎসর এই-রূপে কাটিয়া গেল।

মৌনীবাবার দেহান্তে তাঁহার হৃদয়ের আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিল। ধর্ম্মরাজের সিংহাসন টলিল। "যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্ব্বনাশ"—এই সাধক সম্বন্ধে তিনি সেই বিধি অবলম্বন করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র যুবক পুত্রকে এবং তাহার একবৎসর পরে পত্নীকে হারাইলেন। পত্নীর শ্রাদ্ধবাসরে ইনি সর্ব্বত্যাগী হইলেন। বাড়ী, বাগান, স্ত্রীর পরিত্যক্ত অলঙ্কারাদি যাহা কিছু ছিল, সমুদয় গ্রামে একটী বিদ্যালয় করিবার জন্য দান করিলেন। প্রাচীন গৃহস্থালীর অনেক উপকরণ ছিল, প্রতিবাসীদিগকে সমস্ত বিলাইয়া দিলেন এবং জগৎ-গুরু যিশুর উপদেশের অনুসরণ করিয়া কল্যকার ভাবনা ত্যাগ করিলেন। ইহা দুই বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

তারপর কি হইল?—"তবু যদি না ছাড়ে আশ, তবে হই তার দাসের দাস"—এই শেষ অঙ্গীকারও প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ণ করিয়াছেন। এখন তিনি জীবন্মুক্ত সিদ্ধ

পুরুষরূপে সমাদৃত। পূর্ব্বে যে কর্ম্মীদিগের কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের পশ্চাতে পরামর্শ-দাতা এই সাধু আচার্য্য মহাশয়। স্থানীয় সকল মঙ্গল কর্ম্মের উৎসাহদাতা এই আচার্য্য মহাশয়। স্বামীস্ত্রীর বিরোধ হইয়াছে, তাহার ভঞ্জনকারী আচার্য্য মহাশয়। উদ্ভ্রান্ত নরনারীকে সুপথে আনিবার কার্য্যে আচার্য্য মহাশয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাঁহাকে 'ঈশ্বর-জানিত' লোক বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। ইতর ভদ্র, যবন ব্রাহ্মণ যিনি ডাকেন, তাঁহার গৃহেই অন্নগ্রহণ করেন। বেশী কথা কহিতে জানেন না। সরবে উপাসনা করিতে কেহ শোনে নাই,—তাঁহার এক মন্ত্র "হরিবোল।" এই হরিনাম মহামন্ত্রেই সকলে বশীভূত। এ দিকে দীনের দীন। একখানি বৈ বস্ত্র রাখেন না। কেহ নূতন বস্ত্র দিলে পুরাতন খানি কাহাকেও দান করিয়া দেন। বাসের নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। কাল কোথায় কি আহার করিবেন, জানা নাই। মৌনীবাবা নির্জ্জন পর্ব্বত গুহায় যে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তিনি লোকালয়ে জাগ্রত সংসার কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া সেই ব্রত পালন করিতেছেন। রাত্রিতে নামমাত্র নিদ্রা যান। সমস্ত রাত্রি কখনও নীরবে, কখনও উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে থাকেন। সে ধ্বনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। সে ধ্বনির কি এক শক্তি আছে—নিদ্রিত হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া স্পন্দিত করিয়া যায়। সে সঙ্গের কি প্রভাব—নিতান্ত সংসারমগ্ন হৃদয়কেও উদাস করে। এক পয়সা নাই, আদেশ হইল "হিমালয় পর্ব্বতে যাও।" ভক্ত বলিলেন—"পথের সম্বল নাই।" উত্তর—"সব হবে।" ভ্রমণে বাহির হইলেন। দার্জ্জিলিং, কার্সিয়াং, জল-পাইগুড়ী, দিনাজপুর, বিষ্ণপুর, মজঃফরপুর, গয়া, পুরী প্রভৃতি ঘুরিয়া গেলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে রিক্তপদে এই সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিলেন। সর্ব্বত্রই সেবা ও সমাদর, কিন্তু সেবাগ্রহণে ইনি নিতান্ত সঙ্কুচিত—সেবা করিতে ব্যগ্র।

তাঁহার দুইজন সহসাধক আছেন। তাঁহা-দের জীবনের ইতিবৃত্ত আরও বিস্ময়কর। তাঁহারা দুইজনেই অক্ষরজ্ঞানবর্জ্জিত। চাষী গৃহস্থের ছেলে, জাতিতে "কুরী পরামাণিক।" একজনের নাম নিতাই। বয়স ত্রিশের নীচে। কুমার বৈরাগী। বাড়ীর একপ্রান্তে এক খানি কুটীর বাঁধিয়া সেইখানে সাধন ভজন করিতেছেন। আবশ্যক হইলে, ভ্রাতৃগণের আদেশে, সংসারকর্ম্মও করেন। তাঁহার প্রতি ভগবানের এইরূপই আদেশ বলিয়া তিনি জানিয়াছেন। মুক্ত বিহঙ্গের মত নিতাই মাঠে ঘাটে গ্রামে গ্রামে হরিনাম করিয়া ফেরেন। সাংসারিক ভাব কাহাকে বলে জানেন না। প্রেমে চিরসজীব ভাব। যেন নদীয়ার নিতাই! সর্ব্বঘটে ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি। জীবন সত্যময়। যে কথা সেই কাজ। আদেশ হইল—"ভেদবুদ্ধি ছাড়িতে হইবে।" মুসলমান পাড়ায় যাইয়া তাঁহাদের অন্নভিক্ষা করিয়া খাইলেন। তাহাতেও মন প্রসন্ন হইল না। পতিতা নারীগণ সর্ব্বজন-ঘৃণিতা। নিতাই তো ঘৃণা জানেন না। তিনি পতিতা নারীদিগকে বলেন—"বাজারে মা।" এক দিন লুকাইয়া, এই বাজারে মা'রা যেখানে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ফেলেন, সেখান হইতে সেই অন্ন তুলিয়া লইয়া খাইয়া তবে তাঁহার মনে প্রতীতি হইল যে প্রভুর আদেশ পালন করা হইয়াছে, তাঁহাতে ভেদজ্ঞান আর নাই। আশ্চর্য্য এই যে, এসব জানিয়া শুনিয়াও সমাজ তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিবার কথা বলে

না। এই প্রত্যাদিষ্ট মহাত্মাকে দেখিলেই নির্ব্বিকার পুরুষ বলিয়া চেনা যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কেদার। লোকে তাঁহাকে বলে "গৌর।" ইহার বয়স ৩০এর উপরে হইবে। গৃহস্থ, স্ত্রীপুত্র আছেন। স্ত্রীলোক মাত্রকেই মাতৃসম্বোধন করেন। স্ত্রীর সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহার। ইনি মাথায় বহিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করেন। হরিধ্বনি করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া যাহার যাহা আবশ্যক, একদরে দেন। সদানন্দ পুরুষ। ইহার গৃহিণীও তাঁহার অনুরূপ। তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী মানুষ বিরল। ইনি মাঠে ঘাস কাটিতে কাটিতে একদিন হাসিতে হাসিতে পাগলের মত হইয়া গেলেন। সেই সময়ে নিতাই উপস্থিত। গৌরনিতাই দুইজনেই হাসিয়া অস্থির। সেই নির্জ্জন ঘাসের বনে তাঁহারা দেখিলেন যে, প্রভু বর্ত্তমান এবং তিনি হাসিতেছেন। তাঁহার হাসিতেই তাঁহাদের হাসি। ইনি প্রত্যাদেশ না হইলে কোন কাজ করেন না। মধ্যে সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া রাত্রিদিন কেবল নামসাধন করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"খাওয়া পরার ভাবনা নাই, এখন এই কাজই করতে হবে।" এখন আবার কাজ করিবার আদেশ হইয়াছে। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, প্রকৃতই তাঁহার সহধর্ম্মিণী।

এই তিন সাধুপুরুষের আবির্ভাবে গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা বর্ণনা না করিলেও বুঝিতে পারা যায়। হিন্দু মুসলমান সকলের মুখেই ধর্ম্মের কথা। রাখাল মাঠে হরিনাম করিতেছে, কৃষক হলচালনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে হরিধ্বনি করিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে হরিনামের ধ্বনি উত্থিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অন্তঃপুরে। ধর্ম্মরক্ষার কাজ চিরদিনই মাতৃজাতির। এই গ্রামের কুললক্ষ্মীগণ ধর্ম্মের শান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করিলেই বোঝা যায় যে, মৌনীবাবার জন্মস্থান ধর্ম্মপ্রভাবে সমুন্নত হইয়াছে এবং মনে হয় যে,ইহা তাঁহারই জন্য হইতেছে।

আচার্য্য মহাশয় সামান্য লেখাপড়া জানেন, নিতাই ও কেদার তো একেবারে নিরক্ষর, কিন্তু তাঁহারা অজ্ঞান নহেন। যে পাঠশালার শিক্ষক স্বয়ং অনন্ত জ্ঞানময়, সেই পাঠশালার ছাত্র তাঁহারা। সেই পরমগুরুর মুখের কথা শুনিয়া তাঁহারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, শুধু মানুষের নিকট হইতে পাওয়া যে শিক্ষা, তাহার সহিত সে জ্ঞানের তুলনা হয় না।

এই সাধকগণ আশ্চর্য্যরূপে মৌনীবাবার ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কোন সম্প্রদায়ের নহেন,কিন্তু সকল সম্প্রদায় তাঁহাদের। হিন্দুর দেবালয়ে, মুসলমানের মসজিদে, খ্রীষ্টানের গির্জ্জায়, ব্রাহ্মের মন্দিরে, যেখানের যে সম্প্রদায়ের ভক্তবিশ্বাসীগণ সম্মিলিত হইয়া ভগবানের নাম করেন, সেখানেই তাঁহাদের ভক্তহৃদয় অবনত হয়—অবলুণ্ঠিত হয়। জলে স্থলে আকাশে স্থাবরজঙ্গমে সর্ব্বত্র তাঁহাদের অন্তরের দেবতাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণত হন। সেইজন্য সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহাদিগকে সমভাবে সমাদর করেন।

১৩১৭ সালের মাঘোৎসব উপলক্ষে নিতাই আচার্য্য মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ভক্ত সমগ্র হৃদয় দিয়া উৎসব সম্ভোগ করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেমন উৎসব হইল? নিতাই বলিলেন—"বাবা," (প্রশ্নকারীকে নিতাই 'বাবা' বলেন) "খুব

ভাল, কিন্তু তিনি ভিন্তর হতে যাহা জানাইয়াছেন, তার চেয়ে বড় কথা তো কিছু শুনিতে পাইলাম না।' মাঘোৎসবের ন্যায় মহা ব্যাপারে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের অন্তর হইতে যাহা প্রকাশিত হইল, এই নিরক্ষর চাষার ছেলে তাহার মধ্যে অপ্রাপ্ত সত্য কিছু পাইল না!' অধ্যাত্মরাজ্যে ইনি কতদূর অগ্রসর, তাহা আন্দাজ করিতে পারি না। মনে হইতে পারে—বড় স্পর্দ্ধার কথা! কিন্তু সেই মেষশিশুকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বলিবেন, ইহা তাঁহার প্রাণের গভীর সত্যকথা।

ওঁকারনাথ পর্ব্বতের নিভৃতগুহাতে যে আত্মা দেহমুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার আশীর্ব্বাদে কল্যাণ জাগিয়া উঠিতেছে, তাঁহার অদৃশ্যহস্তের সেবায় সকল মঙ্গলচেষ্টা কৃতার্থতা লাভ করিতেছে। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"কুল পবিত্র'—আমরা দেখিতেছি, দেশ পবিত্র। মহাজনেরা এইরূপে জীবনে মরণে জগতের কল্যাণ সাধন করেন। মৌনীবাবার জন্মস্থানে একবার গমন করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

তিরোধান।

হরিনাথ দে,	মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ,	মহামহোপাধ্যায় বিজয়-রত্ন,
জন্ম—১২ই আগষ্ট ১৮৭৭	জন্ম—৪ঠা অক্টোবর, ১৮৬২	জন্ম—৭ই অগ্রহায়ণ, ১২৬৫
মৃত্যু—১৪ ভাদ্র,বুধবার,১৩১৮	মৃত্যু—১লা আশ্বিন, সোমবার, ১৩১৮	মৃত্যু—৪ঠা আশ্বিন, রবিবার, ১৩১৮
বয়স—৩৪ বৎসর।	বয়স—৪৯ বৎসর।	বয়স—৫৩ বৎসর।

আকাশে ভীষণ গর্জ্জন, চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন—ভীতিবিহ্বল নরনারী ভয়ে ভয়ে চায়,ভয়ে ভয়ে যায়!—এ হেন দুর্দ্দিনে,অতি অল্প সময়ের মধ্যে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, বাঙ্গালার তিন মহাত্মা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন!—আমাদের প্রাণ আজ মহাশোকে অভিভূত। বাঙ্গালার এমন দুর্দ্দিন শীঘ্র উপস্থিত হয় নাই,—একমাসের মধ্যে এমন সর্ব্বনাশ আর কোন স্থানে বুঝিবা হয় নাই। আজ আসুন, আনন্দ কোলাহল থামাইয়া, প্রাণ ভরিয়া একবার কাঁদি এবং দেশের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করি। তাঁহারা তিনজনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাপুরুষ,—তাঁহাদের শোকোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইতে না হইতে আবার উত্তরপাড়ার কৃতীসন্তান প্যারীমোহনের সুযোগ্য পুত্র স্বদেশ-সেবক রাজেন্দ্রনাথের এবং সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ও দেবী নিবেদিতার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম! বিধাতা এই দুর্দ্দিনে বঙ্গের সহায় হউন।

তিন মহাপুরুষের একজন জ্ঞানে, একজন কর্ম্মে, একজন প্রেমে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এদেশে অনেক জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রামমোহন রায়ের পর, হরিনাথের ন্যায় বহু-ভাষাবিৎ জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি আর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এ দেশের কর্ম্মজগতে অনেকের নাম শ্রুত হইয়াছি বটে, কিন্তু শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধনের জন্য নৃপেন্দ্রনারায়ণ যাহা করিয়াছেন, তাহা তুলনা-রহিত। টম ক্যানন

শারীরিক বলের মহা-গৌরবে স্ফীত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন—নৃপেন্দ্রনারায়ণ করিম বক্সকে আহ্বান করিয়া তাহার দ্বারা ক্যানেনের দর্প চূর্ণ করিয়া ভারতের গৌরব ঘোষণা করিলেন। তাঁরা অভিযানের সময়ে মহারাজের যে অমিত তেজ ও সাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহা কেহই ভুলিতে পারিবে না। বিদ্যাসাগরের পুণ্যভূমিতে প্রেমের পরিচয় ত কত কত কত রূপে নিত্যই পাইতেছি, কিন্তু বিজয়রত্ন আজন্ম দুঃখী গরিবের বন্ধু.—এমন মিষ্টভাষী, সহৃদয়, অহঙ্কার-বর্জ্জিত চিকিৎসক এ দেশে এক ছিলেন দ্বারকানাথ, আর ছিলেন বিজয়রত্ন। দ্বারকনাথের পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-প্রণালী অনন্যসাধারণ বটে, কিন্তু দয়া, সহৃদয়তা, এবং মিষ্টভাষিতায় বিজয়রত্ন, তাঁহার সমসাময়িক হইয়াও, ভারতবর্ষে সমতুল্য সম্মান পাইয়াছিলেন। হরিনাথ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং বিজয়রত্ন, এই তিনজনই অপ্রতিদ্বন্দী মহাপুরুষ ছিলেন।

দেশ বড় হয় কিসে? জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মসাধনার চরমোৎকর্ষে। এই তিনজনকে আমরা পৃথক পৃথক স্থানে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তিনই একক্ষেত্রে সম্মিলিত। হরিনাথ জ্ঞানী, বহু ভাষাবিৎ, কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞান-তৃষ্ণা দয়াতেই মিটিয়াছিল। *

* "হরিনাথ আট বিষয়ে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বারই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা ইউনিভারসিটির ইংরেজি, লাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত, পালি, এই কয় ভাষায় এম-এ পাশ করিয়াছিলেন। কেম্‌ব্রিজের ক্রাইষ্ট চর্চ্চ হইতে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এবং মনস্তত্ত্বে ক্লাসিক্যাল ট্রাইপস পাশ হন; এই পরীক্ষার দুই বিভাগেই তিনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আর ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত ভাষা পরীক্ষায়

দুঃখী দরিদ্রের এমন বন্ধু এ দেশে আর মিলে কি? এমন প্রাণ ভরিয়া অন্যকে ভালবাসিতে আর কেহ পারিয়াছে কি?

তিনি খুব কম হইলেও বারো হাজার টাকা বক্‌শিস্‌ পাইয়াছিলেন। হেব্রু, আরবী, পালীতে তিনি সম্মানের পদক পান। এমন বহুভাষাবিদ, বহুবিদ্যায় বিদ্বান বাঙ্গালী আর নাই—ভারতবর্ষেও ত আর নাই। এমন কি, ইউরোপের সমগ্র সভ্যজগতে তাঁহার সমকক্ষ বহু ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত আর আছে কিনা সন্দেহ।" এহেন হরিনাথের মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল মোট চৌত্রিশ বৎসর। কাজেই বলিতে হয়, নিজাম যাইলে নিজাম হইবে, রাজামহারাজা যাইলে রাজামহারাজা পাওয়া যাইবে, কিন্তু বাঙ্গালী হরিনাথের জোড়া আর মিলিবে না—আর ছিল না। হরিনাথ আমাদের সাত রাজার ধন অমূল্য মাণিক ছিল। আমরা হতভাগা, এমন অমূল্য নিধিকে বুকে করিয়া রাখিতে পারিলাম না।

হরিনাথ কেবল মনীষী, মনস্বী, মেধাবী ও প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন না। তিনি দাতা, দয়ালু, পরদুঃখকাতর মহাত্মা ছিলেন। দানে হরিনাথ মুক্তহস্ত ছিলেন; পরের দুঃখ দেখিলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন—ঋণ করিয়াও দুঃখীকে অর্থ সাহায্য করিতেন। হরিনাথ উদার, উন্নত, প্রসন্নমনা পুরুষ ছিলেন। তিনি কুটিলতা জানিতেন না, চাতুরী বুঝিতেন না, কোন চক্রান্তের ভিতর থাকিতেন না; বন্ধু ও স্বজনবর্গকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই সরলতা, এই ঔদার্য্য, এই অতি বিশ্বাস শেষে তাঁহার পক্ষে কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

নায়ক, ১৪ই ভাদ্র, ১৩১৮।

"জনক জননীর গুণে সন্তান সুশিক্ষিত হইয়া থাকে। হরিনাথের পিতা যেমন বিদ্বান ছিলেন, জননীও তদ্রূপ বিদুষী। জনক জননীর এই গুণই বাল্যাবধি হরিনাথের উন্নতির সহায় হইয়াছিল। হরিনাথ পিতা-মাতার যোগ্যপুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত রায় ভুতনাথ দে এম্‌-এ, বি-এল মধ্যপ্রদেশের একজন উকীল ছিলেন, মাতাও

মানুষ বড় হইলেই দরিদ্রদিগকে ভুলিয়া যায়, অহংজ্ঞানে বিভোর হইয়া দরিদ্র বন্ধুদিগকে বিস্মৃতিতে ভাসাইয়া দেয়, কিন্তু হরিনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হইয়াও অহংজ্ঞান কাহাকে বলে, জানিতেন না। তিনি জ্ঞানের উচ্চশিখরে উঠিয়াও মাটীর মানুষ ছিলেন—প্রেম-

বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজী, মারাঠী, আরবী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিনী। তিনি এখন জীবিতা আছেন।

বাল্যাবধি হরিনাথের প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। শৈশবে ইনি মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন, তৎপরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এফ্-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ডফ্‌স স্কলারশিপ" নামক বৃত্তি পান। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এ, পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্য ও লাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার লইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিনাথ গ্রীক ভাষায় এম্-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরও তাঁহার জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি বাৎসরিক দুই শত পাউণ্ড সরকারী বৃত্তি পাইয়া অধ্যয়নার্থ বিলাত গমন করেন, এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে অতি যোগ্যতার সহিত কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজ হইতে প্রাচীন "ট্রাইপসের" প্রথম পরীক্ষায় এবং পর বৎসর শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষা অত্যন্ত দুরূহ। ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ফরাসী, জর্ম্মান, স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। হরিনাথ এই দুরূহ পরীক্ষায়ও যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া স্মিথের পুরস্কার লাভ করেন। এই শেষোক্ত বর্ষে ইংলণ্ডে গ্রীক ও লাটিন ভাষায় কবিতা রচনার এক-প্রতিযোগী পরীক্ষা হয়। হরিনাথ এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া লর্ড চ্যান্সেলারের মেডেল প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি মিল্টন ও টেনিসন এই গৌরবজনক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া প্রথম ফরাসী দেশের সোর্ব্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরে জর্ম্মনীর মার্ব্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ ভাষা অধ্যয়নের দ্বারা অসাধারণ প্রতিভাশালী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কেম্ব্রিজের ফরাসী অধ্যাপক ইহার দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর-ব্যাপী শিক্ষাদান কালে ফরাসী ভাষায় এরূপ ব্যক্তি ইংলণ্ড দেশে কদাচিৎ দেখিয়াছেন।

অনন্তর হরিনাথ বাবু ইউরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াও অধ্যয়নে বিরত হন নাই। এই সময় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হন এবং তৎপরে কিছুদিন প্রেসিডেন্সী ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর" অধ্যক্ষ হয়েন। এই সময় তাঁহার নানা ভাষা শিক্ষা ও বিবিধ পুস্তক পাঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, এই সুবর্ণ সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। শিক্ষা-বিভাগের কঠোর শ্রমজনক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও হরিনাথের নূতন নূতন ভাষা শিখিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্ববৎ বলবতী থাকে। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি ভারতের অনেকগুলি ভাষায় সুশিক্ষিত হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষায় এম্-এ পরীক্ষায় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় এম্-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উভয় পরীক্ষায়ই স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইহার পর তিনি ভারতীয় ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত ভাষার জন্য ২০০৲ টাকা, আরবী ভাষার জন্য ২০০৲ টাকা এবং উড়িয়া ভাষার জন্য ১০০০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যেকটীতে ৫০০০৲ টাকা করিয়া ১০,০০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

বিহ্বল, পরদুঃখকাতর, কাঙ্গালসখা জ্ঞানী হরিনাথ—প্রেমের সাধনায় আত্মজ্ঞান ভুলিয়া পরজ্ঞানকে সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন। ঋণ করিয়াও দরিদ্রসেবা করিতেন। তিনি জ্ঞানে বিভোর, প্রেমে বিভোর—সুতরাং জ্ঞান-প্রেম-সাধনার পরিণতি কর্ম্মযোগে তিনি নব

হরিনাথ সভ্যজগতের প্রায় যাবতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি—(১) সংস্কৃত, (২) গ্রীক, (৩) লাটিন, (৪) পালি, (৫) হিব্রু, (৬) হিন্দী, (৭) বাঙ্গালা, (৮) উড়িয়া, (৯) আরবী, (১০) পার্শী, (১১) উর্দ্দু, (১২) ইংরাজি (১৩) ফরাসী, (১৪) স্পেনীয়, (১৫) ইটালিয়ান (১৬) জর্ম্মাণ, (১৭) তুর্কী, (১৮) পর্ত্তুগীজ, (১৯) পুস্তু বা কাবুলী, (২০) রুষীয়, (২১) পোলিশ বা পোলণ্ডের ভাষা, (২২) হেব্রেড, (২৩) চীনা, (২৪) জাপানী, (২৫) মগ বা ব্রহ্ম দেশীয়, (২৬) সায়ামী বা শ্যামদেশীয়, (২৭) সিংহলী, (২৮) তিব্বতী এবং (২৯) মারাঠী এই ২৯টী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমূহ ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাতেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়াটা তাঁহার একটা স্বাভাবিক গুণ ছিল। কি ইংরেজী, কি ফরাসী, কি জর্ম্মাণ, সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁহার স্থান অতি উচ্চ ছিল। ভাষার জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। এরূপ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন, অসাধারণ প্রতিভাশালী, বহু ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুপণ্ডিত লোক জগতে প্রকৃতই দুর্ল্লভ।

মনীষী হরিনাথ বলিতেন নিজে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। তাঁহার কার্য্যের সূচনা মাত্র হইয়াছিল। তিনি আরবী ভাষায় লিখিত কয়েকখানি তাম্রফলকের পাঠোদ্ধার করেন, মুসলমান রাজত্বকালীন বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ণয় করেন এবং তাজমহলের নির্ম্মাতাগণ ও কালিদাসের সময় প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক গুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই প্রভাত কাল অতীত হইতে না হইতেই কালের করাল স্পর্শে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাঁহার জীবনের যাবতীয় কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। কত রচনা ও তত্ত্বানুসন্ধান যে অসম্পূর্ণ থাকিল, তাহার সংখ্যা নাই। তিনি চীনদেশীয় ভাষা হইতে নাগার্জ্জুনের মধ্যমণি কারিকা" বৌদ্ধদর্শনের এবং তিব্বতীয় ভাষা হইতে "দিগ্নাগের" ন্যায়-শাস্ত্রের ইংরেজী ও সংস্কৃত অনুবাদ এবং অমৃতলাল বাবুর প্রসিদ্ধ "বাবু" প্রহসনের ইংরেজী অনুবাদ করিতেছিলেন, কিন্তু এই সমূহ গ্রন্থের অনুবাদ অসমাপ্ত রহিয়া গেল। হরিনাথ ৫০০০ টাকা মূল্যে পিকিন নগরের পুস্তকাগার হইতে "তানজুর" নামক একখানি গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তাহার অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও বাসবদত্তার ইংরেজী অনুবাদ এবং চীন দেশীয় মদনাপঞ্জী স্বরূপ শত শত খণ্ড অভিধান হইতে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন, সে সবই অসম্পূর্ণ হইয়া গেল।

হরিনাথ কেবল অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি একজন পরোপকারী বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইত। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-জগতের একটী উজ্জ্বলতম রত্ন অন্তর্হিত হইল।" নীহার, ৯ই আশ্বিন, ১৩১৮

"The following is a list of the published and unpublished works of Hari Nath De, most of them being of a fragmentary character.

I. Decipherment of a number of copper plate inscriptions in Arabic, 2. Treatise on the builders of the Taj, 3. The date of Kalidas, 4. The Travells of Ibu-Batuta, 5. Metrical translation of Sakuntala, 6. Metrical translation of Extracts from the Maithil Poet Vidyapati, 7. Extracts from Basavadatta—translation from Sanskrit,

যোগী। দুঃখের বিষয়, তাঁহার অকাল তিরোধানে কর্ম্মযোগ-স্পৃহা এদেশে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। এ দুঃখ আমাদের কখনও দূর হইবে না। বাঁচিয়া থাকিলে, না জানি, তিনি কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিই না রাখিয়া যাইতেন।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ চিরকাল কর্ম্মের পথে চলিয়াছেন।* তাঁহার পাশ্চাত্য যোগের কারণও এই কর্ম্মযোগ-স্পৃহা। তিনি ক্রীড়াপটু, শীকারপটু, তিনি সুসৈনিক, তিনি সাহসী বীর, তিনি পালোয়ান। উঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া

---

8. Translation in Frence of Bankim Chandra's "Krisrakanta's will (Novel), 9. Shah Alam-Nama, 10. Commentaries with text of "Journal de Monsieur Law" 11. Notes on Macaulay's Essay on Milton, 12. Notes on Palgrave's Golden Treasury, Book IV, 13. Notes on Typical Selection 1005. 14. Readings from Waverly Novels 15. Pischel's Pakrita, 16. Some Published contributions in the Society's Journals, 17. Arabic Grammar, 18. Pali Dictionary, 19. Thibetan Dictionary, 20. Translation of Dignag's Logic from the Thibetan (part published). 21. Nagarjuna's Madhyamica Philosophy from the Chinese, (part published) 22. A Translation of the works of Travel of Various Chinese Pilgrims who visited India about the time of Fu Hian, Hieun Tsang and Itsing, 23. A trilingual Edition of the Upanishads, 24. Several unpublished verses in French, Latin and Sanskrit.

He was further engaged in completing the life works of various scholars and not only did he himself devote all his time and energy to the persuit of learning, but he also in spired other scholars to undertake works which would prove to be valuable contribution to knowledge. The index of the Yatimat-al-Dahr, which is being published for the Bid. Indica by our Society is an instance.

The death of the premier linguist of India, if not of Asia, almost synchronised with that of the premier Ruling chief of india. The Nizam is dead, and a Nizam has succeeded him. The Maharaja may die and a Maharaja may succeed him. But Hari Nath is dead and who is there to succeed him today, tomorrow or a century hence?" Dr. Suhrawardy's

Appreciation.

"Lieu-Colonel His Highness Maharaja Sir Nripendra Narayan Bhup Bahadur, G. C. I, E. C, B. of Cooch Behar was born 4th October 1862, succeeded his father the late Maharaja Narendra Narayan Bhup Bahadur in August 1863. He belonged to a Koch family that has held uninterrupted sovereignty for the last 382 years in this territory since their first settlement in the plains, from which family also descend the Bijni and Darung Houses of Assam, the Raikats of Baikanthapur in Jalpaigury and the Panga family in Rangpur. His highness was educated first in the Wards institute at Benares, secondly under the gnardianship of Mr H.St. J. Kneller. in the Bankipur College, Patna, and next as a Law Student in the Presidency College Calcutta. During his minority the State rendered good service in the Bhutan war 1863—65, for which two

তিনি ভারতে কর্ম্মের পথ ধরিয়া অহেতুকী স্বদেশ-প্রেমকে জাগাইবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা,—সব কর্ম্মময়, বীরত্বের উৎকর্ষ সাধনে পরিসমাপ্ত। দৈহিকবলের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এদেশে আর কোন মহাপুরুষ তাঁহার ন্যায় চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। দৈহিক বলের সাধনা করিলে ইংরাজ বিরক্ত হন, ভয় পান। কিন্তু নৃপেন্দ্রনারায়ণের চাতুর্য্য কেহই সন্দেহের চক্ষে কখনও দেখেন নাই। তীরা অভিযানের সমরক্ষেত্রে তিনি ইংরাজের সাহচর্য্য করিয়া বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। বুয়র যুদ্ধেও যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে

guns were presented to His Highness by the British Government. Was presented with medal and sword in 1877 at the Imperial assemblage at Delhi on the occasion of the Proclamation of her Most Gracious Majesty as Empress of India. Married in March 1878 the eldest daughter of the famous Raformer Keshubchandra Sen, was sent to England the same year to complete his education under the joint guardianship of Surgeon Major (now Sir) Benjamin Simpson and Mr. Kneller. Returned to India in the spring of 1879 and was formally installed on his ancestral gadi on the 8th November 1888 by the Lieutenant-governor of Bengal. The titles of Maharaja Bhup Bahadur were recognised as hereditary by the Government of India in 1885 His Highness was appointed Honorary Major in the British army in the same year. He visited England in the jubilee year 1887 to take part in the rejoicings on the occasion of the jubilee of the reign of Her Most Gracious Majesty, with the Maharani and children and was invested with the Insignia of grand commander of the Most Eminent Order of the Indian Empire by Her Most Gracious Majesty the Queen Empress herself, the Maharanee being invested with the Imperial Order of the Crown of India in the same year. Was made Honorary Aide-de-Camp to His Royal Highness the Prince of Wales, with the rank of Lieutenant Colonel in the British army. The Maharaja in 1888 Established the Brahmo Somaj or the Reformed Church in the State of Coochbehar. He founded the Victoria college for Higher education therein. And granted a long term settlement of revenue to his subjects for thirty years, assessment being made on the most approved principles His Highness established the India Club at Calcutta in 1882, founded Nripendranarayan hall at Jalpaiguri in 1883 and presented houses and lands at Darjiling wherewith the Lowis Jubilee Sanitarium was started at that station in 1887. and established the "Anandamayi Dharmasala' (almshouse) in 1889. The Maharaja's age at the time of his death was 49 years and he leaves 4 sons and 2 daughters. While in England in 1887, he received the distinguished masonic honour of the Past Grand Senior Warden of England at the hands of the Most Worshipful the Grand Master, made District Grand Master of Bengal in 1890, installed District Grand Mark Master of Bengal 1891.

The area of the State is 1307 square miles, its population is 602,624. chiefly Hindus but including 174629 Mahomedans. His Highness maintained a military force of 9 cavalry, 176 infantry and 4 guns and was entitled to a saluate of 13 guns. The ancestral banner of the family displays a sword and a blade of grass (with which according to tradition one of the Maharaja's ancestors cut the head of an enemy as an offering to the goddess Kali]. The supporters are a tiger and an elephant The crest is a 'Honuman' holding a cub in each hand.

The late Maharaja had residences in Cooch Behar, Calcutta and Darjeeling."

THE INDIAN MIRROR.

প্রাণ কিরূপে পাত করিতে হয়, তিনি তাহার সুদৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন!

দৈহিক বলের উৎকর্ষ-সাধন ভিন্ন কোন জাতি বড় হইতে পারে না। এজন্য কত কত পালোয়ানকে তিনি আদর করিতেন, পোষণ করিতেন। সে সকল কথা কেনা জানে? এদেশের লোক দিন দিন স্বাস্থ্য-হীন হইতেছে, এ কথা স্মরণে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল, তিনি লুই-জুবিলি-স্যানি-টেরিয়মের জন্য দার্জ্জিলিং নগরে কত চেষ্টা ও কত স্বার্থত্যাগ করিলেন। নৈতিক-বলের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন দৈহিক বল তুচ্ছ, এজন্য তিনি ইণ্ডিয়া ক্লবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আবার জ্ঞান ভিন্ন দৈহিক বল পাশব বলে পরিণত হয়, এজন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন! ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি দৈহিক কর্ম্মের পথ ধরিয়া নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং শেষে জ্ঞানের রাজ্যে উপনীত হইয়া এক অপরূপ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

তবুও কেহ কেহ বলেন, তিনি রাজ্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন! রাজ্য সম্বন্ধে উদাসীন তিনি কখনও ছিলেন না। তিনি জানিতেন, কালিকাদাস দত্ত, যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রিয়নাথ ঘোষ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে রাজ্যের কর্ণধার, সে রাজ্যসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকাই সঙ্গত। বাঙ্গালীর প্রধান দোষ, বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু তিনি যেমন বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করিয়াছেন, এরূপ এদেশে আর কোন বাঙ্গালী কখনও করিয়াছে কি? তিনি লোক চিনিতেন, তিনি লোকের পূজা করিতে জানিতেন। দলাদলিতে ও অন্তর্বিবাদে এদেশের কত রাজার ঘর, জমীদারের ঘর উচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কুচবেহার অন্তর্বিবাদের অতীতধামে নিত্য বিরাজিত। ইহা যে নৃপেন্দ্রনারায়ণের কর্ম্মময় জীবনের অবিচলিত বিশ্বাসের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত, তাহা ঘোরতর শত্রুও কখনও অস্বীকার করিতে পারিবে না। তিনি বাঙ্গালা ভাষার আদর করেন নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর আদর করিয়াছেন; তিনি রাজনীতিতে উদাসীন ছিলেন বটে, কিন্তু সমাজনীতিতে উন্নীত সংস্কারক, তিনি আহারে বিহারে পাশ্চাত্যানুকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি স্বদেশের ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত। আর একটী কথা। তিনি কর্ম্মী হইয়াও যে জ্ঞানী এবং প্রেমিক;—ভিকটোরিয়া কলেজ ও আনন্দময়ী ধর্ম্মশালা-স্থাপন এবং আত্মীয় পরিপোষণেই তাহা পরিস্ফুট। মহাত্মা কেশবচন্দ্র তদীয় কন্যাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এজন্য কত তিরস্কার বা গঞ্জনা তাঁহাকেও কেশবচন্দ্রকে সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু একার্য্য দ্বারা একটী রাজ্যে নববিধানের জয়পতাকা উড়িয়াছে। আর তদীয় পরিজনবর্গ আশ্রয়-পাদপ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। ইহাতে কেশবচন্দ্রের বংশধরগণের আত্মমর্য্যাদা-হীনতা প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু নৃপেন্দ্রনারায়ণের অকৈতব প্রেম প্রকটিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এরূপ দ্বিধাশূন্য ভাবে রাজ-চালে আত্মীয় স্বজনকে কেহ কখনও প্রতিপালন করিয়া ধন্য হয় নাই। কেবল তাহাই নয়—অনেক দরিদ্র, কাঙ্গালও তাঁহার অযাচিত দানে জীবন ধারণ করিয়াছে। তিনি কর্ম্মময় জীবনে প্রেমের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

আর জ্ঞান? জ্ঞানী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আদরেই তদীয় জ্ঞান-পিপাসার অপ্রকট নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথের ন্যায়

জ্ঞানী, এদেশে, হরিনাথের পর আর আছে কি? তিনি আজীবন-জ্ঞান-তপস্যা-নিরত—এখন তিনি জ্ঞান-সাধনায় ঋষিত্বলাভ করিয়া সকল সাধকের আদর্শ হইয়াছেন, এহেন ব্রজেন্দ্রনাথকে আদর করিলেন কে? এবার তাঁহাকে ইংলণ্ডের ইউনিভার্যাল-রেস-কংগ্রেসে পাঠাইলেন কে? পাঠক অনুসন্ধান কর, সকলই জানিতে পারিবে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রজেন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত,কালিকাদাসে নিমজ্জিত,—এক অপূর্ব্ব সম্মিলিত-জীবন প্রহেলিকা। এ প্রহেলিকা দুরবগাহ—বুঝি, বুঝি, বুঝি না,—দেখি, দেখি, দেখি না। নৃপেন্দ্র-নারায়ণ বামে হরিনাথের উত্তরাধিকারী ব্রজেন্দ্র, এবং দক্ষিণে বিজয়রত্নের সেবক-অনুসেবকের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ধন্য জীবন,ধন্য দেশ।

বিজয়রত্ন আজীবন প্রেমিক *—চিরদিন অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এই প্রেমের আকর্ষণে বেরিবেরি রোগাক্রান্ত হওয়ার পরও, দুর্ব্বল শরীরে, ১টা ২টা, পর্য্যন্ত ভিজিট না লইয়া দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করিতেন। প্রেম সাধনা তদীয় জীবনের মুখ্য কার্য্য হইলেও তিনি জ্ঞান-চর্চ্চা ভুলিতেন না।

*"বিজয়রত্নের পিতা ৺জগচ্চন্দ্র সেন পূর্ব্ববঙ্গের প্রথিতনামা কবিরাজ নীলাম্বর সেনের দ্বিতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। নীলাম্বরের চিকিৎসা-নৈপুণ্য পূর্ব্ববঙ্গে আজিও প্রবাদ বাক্যের মধ্যে পরিগণিত আছে এবং 'নীলাম্বরের বড়ি' পূর্ব্ববঙ্গে অত্যাশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে আগত এই চিকিৎসানৈপুণ্য ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিজয়রত্নে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল।

বিজয়রত্নের মাতা অসামান্যা স্ত্রীলোক ছিলেন। নির্ভীকতায়, ধর্ম্মনিষ্ঠায়, স্বাবলম্বনের দৃঢ়তায় এই রমণী-রত্নের হৃদয় স্বতঃই অলঙ্কৃত ছিল। স্নেহ ও দয়ায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। পুরুষ-জনসুলভ সাহস, দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত স্ত্রীজন-সুলভ কমনীয় কারুণ্যের এরূপ আশ্চর্য্য সমাবেশ সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

দেড় বৎসর বয়সে বিজয়রত্নের পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেন বটে কিন্তু ব্যয়েও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, সুতরাং শিশুর জন্য তিনি কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সময় হইতে কিছু কাল বিজয়রত্নকে দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে হয়। কখন কখন তাঁহাকে এক বস্ত্রে কাটাইতে হইয়াছে। বিজয়রত্নের বাল্যবয়সে তাঁহাদের বাটীতে তাঁহাদের নূতন জামাতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে গুরুজনদিগকে প্রণাম করাইবার ভার বালক বিজয়রত্নের উপর অর্পিত হয়। তখন তিনি গৃহাভ্যন্তরে কাঁথা পরিধান করিয়া বস্ত্র শুকাইতেছিলেন, যাইতে পারিলেন না। কিন্তু মাতা কিম্বা পুত্র কোন দিনই বস্ত্রের অভাব কাহাকেও জ্ঞাপন করেন নাই। এইরূপ যৌবনের প্রারম্ভে তিনি মাতুলের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও কখনও তাঁহার নিজের অভাব জ্ঞাপন করেন নাই। এমন কি, যেদিন বিবাহ করিতে কালকাতা হইতে স্বদেশ যাত্রা করেন, সেদিন বস্ত্রের মধ্যে পরিহিত বস্ত্রখানি মাত্র তাঁহার সম্বল ছিল। তাঁহার মাতুল কোনদিন তাঁহার অভাব জানিতে পারেন নাই।

পিতৃবিয়োগের পর বিজয়রত্নের স্নেহময়ী জননী দারিদ্র্যের মধ্যে নিজের বিশাল স্নেহের পক্ষের দ্বারা শিশুটীকে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যথাকালে নিজ বাটীস্থিত বিদ্যালয়ে বিজয়রত্নের বিদ্যারম্ভ হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, পাঠাভ্যাসে মনোযোগ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং অনেকেই এই বালকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলির এত যত্ন করিতেন

তিনি উপযুক্ত চিকিৎসক হইলে অনেক লোকের উপকার করিতে পারিবেন, মনে করিয়া, কেবল আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছিল। বোধ হয়, তাঁহার পূর্ব্বে এদেশের কোন কবিরাজ পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই রোগ-নির্ণয়ে এক অসাধারণ ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বড় বড় ডাক্তারগণ যেস্থানে রোগ নির্ণয়ে অক্ষম হইতেন, তিনি সে স্থলে অনায়াস-লব্ধ জ্ঞানে প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া সকলের প্রশংসা পাইতেন। বাল্যে এক সময়ে যাহাকে এক বস্ত্রে দিন কাটাইতে হইত, কালে তিনিই, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন—কিন্তু তবুও তিনি

যে, তাঁহার "বর্ণপরিচয়"খানি আজিও তাঁহার পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে।

পাঠ্যাবস্থায় ১৮ বৎসর বয়সে বিক্রমপুরস্থ বাড়াইল গ্রামের ৺গুরুনাথ দাস গুপ্তের কন্যার সহিত বিজয়রত্নের বিবাহ হয়। আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন কালে বিজয়রত্নের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিবার আগ্রহ জন্মে এবং কলিকাতাস্থ মেডিকেল কলেজের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার বন্ধুদিগের সাহায্যে শবব্যবচ্ছেদ, এবং ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা প্রণালী প্রভৃতি আয়ত্ত করেন। ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা বিষয়ে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের তিনি কিরূপ সমকক্ষ হইয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

মাতুলালয়ে অবস্থান কালে তিনিই "অষ্টাঙ্গহৃদয়" নামক গ্রন্থ সম্পাদন ও অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। মোক্ষমূলার প্রভৃতি বৈদেশিক পণ্ডিতগণ এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার এই সম্পাদন কার্য্যের ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন।

গত বৎসর তিনি দুরন্ত বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার ভগ্ন শরীরে এ দুরন্ত আক্রমণ সহিল না। তাঁহার চক্ষু দুইটী নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, চিকিৎসা-নৈপুণ্যে চক্ষু দুইটী আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই অসাধারণ চিকিৎসা-গুণে ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপর দুরন্ত পরিশ্রম। তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের ও চিকিৎসকগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দয়া বশতঃ তিনি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে কখনও এক ঘটিকা, কখনও দুই ঘটিকার সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তাঁহার অধিকাংশ রোগীর নিকট হইতেই তিনি কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়াও শারীরিক ক্লেশে পশ্চাদপদ হইতেন না এবং আত্মীয় স্বজনগণের অনুরোধ গ্রাহ্য করিতেন না। কিছু পূর্ব্বে এলবুমেনেরিয়া তাঁহার শরীর প্রবেশ করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রবল হইয়া পড়িল। তিনি বিশ্রামলাভের জন্য দেওঘর চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসানৈপুণ্যে রোগে আশু কিছু প্রতীকার হইল বটে, কিন্তু আবার তাহা বাড়িয়া উঠিল। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। গত পূর্ব্ব বুধবার তাহার রোগের অতিশয় বৃদ্ধি হইল। চিকিৎসকগণের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল এবং পরদিন বৃহস্পতিবার ১০টা ৫০ মিনিটের সময় পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, সহস্র সহস্র অনাথ নরনারীর শোকাশ্রুর মধ্যে তাঁহার অমর আত্মা দিব্যধামে চলিয়া গেল।"

সঞ্জীবনী—১১ই আশ্বিন, ১৩১৮।

অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনার গণ্ডীর বাহিরে যাইতেন না। প্রেমের স্বভাব নম্রতা, বিনয়, দীনতা, অকিঞ্চিৎকারিতা। অনেক জানিলেও সদা তিনি মনে করিতেন, তিনি যেন কিছুই জানেন না। অন্য চিকিৎসককে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বদা তিনি সংযত ভাবে নত থাকিতেন। আমরা অনেক পণ্ডিত দেখিয়াছি, অনেক ধনী দেখিয়াছি, অনেক প্রতিভাশালী লোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সংযত, বিনয়ী-জ্ঞানী-ধনী-গুণী-মানী লোক অধিক দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি সদা মিষ্টভাষী, সদা প্রফুল্ল, সদা বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রেম-বিহ্বলতা তাঁহাকে এমন জ্ঞানময় কর্ম্ম-যোগের অনিন্দিত মিলন-গাম্ভীর্য্যে উপনীত করিয়াছিল যে, তাঁহার জ্ঞান, কর্ম্ম, সব পর-সেবার পথ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে অন্যের পদরেণুর ন্যায় করিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা অনেকের আদর আপ্যায়ন পাইতেন, কিন্তু কখনও কোন দরিদ্র বন্ধুকে উপেক্ষা করিতেন না। অতি সামান্য লোক তাঁহার দ্বারস্থ হইলেও তিনি তদীয় চরিত্র-সুলভ যত্ন সহকারে সেবা পরিচর্য্যা করিতেন। এরূপ নিষ্কাম জীবন যে কোন দেশের গৌরব। বিজয়রত্ন -আদর্শ প্রেমিক—জ্ঞানী ও কর্ম্মী।

তিনে এক—একে তিন। এক সময়ে তিন বিভাগে তিন মহাপুরুষ অবতরণ করিয়া বঙ্গকে মস্তকে করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। জ্ঞানে হরিনাথ প্রেম পাইলেন, কর্ম্মের পথে ছুটিলেন। কর্ম্মে নৃপেন্দ্রনারায়ণ জ্ঞান ও প্রেম পাইলেন এবং প্রেমে বিজয়রত্ন জ্ঞান ও কর্ম্ম পাইয়া ধন্য হইলেন। তিনের অভ্যুদয়ে বঙ্গ ধন্য হইল। তারপর আকাশে যখন মহাদুর্যোগ—আপন-পর-বিভেদে যখন বঙ্গ পরিপুরিত,—পরনিন্দা, পর-কুৎসা-মেঘ যখন বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—স্বদেশ-প্রেম যখন দেশ ভুলিয়া যাইতেছে, তখন, একই দুর্দ্দিনে, নিমেষের মধ্যে তিন মহারথী প্রস্থান করিলেন! অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা দীর্ঘকাল কেহ ভুলিতে পারিবে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ দেশের যে অভাব হইয়াছে, তাহা শীঘ্র আর পরিপুরিত হইবে না। মহা দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে! মহাচক্রীর মহালীলা। বলিব কি, আমরা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। সান্ত্বনার ভাষা নাই, অভাব-প্রকাশের কথা নাই। এই মহাশোকে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

পুণে।

যখন পুণায় পৌঁছিলাম, তখন মধ্যাহ্ন। পৌঁছিয়াই বুঝিলাম, বেশ ঠাণ্ডা। শুনিয়াছিলাম আগষ্ট মাসে পুণার আবহাওয়া বিলাতী বসন্তের অনুরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম। দিল্লীতে যখন সকলে দারুণ গ্রীষ্মে কষ্ট পাইতেছে, আমরা শীতের দেশে আসিলাম, অথচ দার্জ্জিলিং বা সিমলায় আসি নাই। এমনই বিধির বিধান! বম্বে প্রদেশটা নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া শীত ও গ্রীষ্ম কর্ত্তৃক সমান উৎপীড়িত মাদৃশ ব্যক্তি সকলের পক্ষে নিতান্তই আরামপ্রদ। আমাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য পুণাস্থ এক বন্ধু ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাহার সঙ্গে তাঁহার গৃহে যাইয়া সাত দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ

করিলাম। আতিথ্য কথাটা বোধ হয় খাটে না। ন তিথি বিস্ততে যস্ত! আমাদের সাত তিথি কাটিয়া গেল। এই বন্ধুটীর পারিবারিক ইতিহাসে শিক্ষিতব্য অনেক আছে। তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগের জন্য পিতা কর্ত্তৃক গৃহ-বহিষ্কৃত হন। এত অল্প বয়সেই পিতা বিবাহ দিবার আয়োজন করায় তিনি পলাইয়া যাইয়া খুল্লতাতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে যখন স্বপদে দণ্ডায়মান হইয়া বিবাহ করিলেন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে বেশ পরীক্ষা করিয়া লইলেন, খাঁটি কি মেকি। বিবাহের অল্পদিন পরে শ্বশুরের মৃত্যু হইল এবং শাশুড়ীর 'স্বজনবর্গ' তাঁহার সর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া ছয়টী অবিবাহিতা কন্যা ও নিরাশ্রয় বৃদ্ধা মাসীসহ তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল। বন্ধুটীর বয়স তখন সবে বিশ বৎসর। আয় অতি সামান্য। কিন্তু সে কথা ভাবিবার সময় কোথায়। বন্ধুটী বলিলেন যে, বিচার করিতে বসিলে এতগুলি প্রাণীর ভার গ্রহণ করিতে পারিতাম না। ভগবানের নামে ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যাহারা কেবলই টাকা আনা পাই গণনা করিয়া সংসারে অগ্রসর হয়, তাহাদিগের দ্বারা যে কোনই কার্য্য হয় নাই, তাহা নিশ্চিত। মানুষকে যে কর্ত্তব্যের প্রেরণায় ভগবানের হাতে জীবন পরিচালনার ভার অনেক পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা যেমন সত্য, এমন আর কিছুই নয়। তিনি যে আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় গোষ্ঠীর ভার গ্রহণ করেন, তাহার "ডা'নে বাঁয়ে" মিলাইবার সাধ্য কোন মানুষ 'একাউণ্টেণ্টের' নাই। কিন্তু এই বিশ্বসংসারের অন্তরালে একজন হিসাব করিবার আছেন, যাঁহাকে ভুলিয়াই মানুষের সকল হিসাবেই গোজামিল পড়িয়া যায়। বন্ধুটী কিন্তু এই মহা হিসাব পরীক্ষায় তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং একটী অতি সুন্দর পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে। সুখী পরিবার? সংসারের দিক্ হইতে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া যে মানুষ গড়িয়া উঠে, তাহা ধরিলে এ পরিবারের প্রত্যেকটী প্রাণীই মানুষ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত বসিয়া নানারকম কথাবার্ত্তা হইয়াছে, আমরা প্রথম হইতেই অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলাম, কিন্তু একটী বারও কাহারও মুখে, কি মানুষের বিরুদ্ধে, কি বিধাতার বিরুদ্ধে, একটী অভিযোগ শুনি নাই। সকলে নীরবে আপন আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন। প্রথম দিন আমরা আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন জানাইয়াছিলাম, এই সাত দিন সে সমস্ত জিনিষই সময় মত হাজির পাইয়াছি, চাহিতে হয় নাই। বাড়ীতে কিন্তু চাকর বাকর নাই। যাঁহারা সংসারে প্রতারিত ও অন্য কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বাপহৃত, মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার তাঁহাদের যথেষ্টই ছিল। অন্যদিকে মৃত্যুতো ইঁহাদের গৃহের নিত্য অতিথি। শাশুড়ীর ছয় কন্যা দুই পুত্রের মধ্যে পুত্র দুইটী বহুদিন মাতৃ ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, বন্ধুটীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে, ইনি এখন বিধবা। ইঁহাকে দেখিলে বিষাদের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নীরবে স্বীয় কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়াছেন, আর প্রাণপণে আত্মোন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, যাহাতে সংসারে কাজের উপযুক্ত হইতে পারেন।

একটী কন্যা বি-এ পড়িতে পড়িতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, সর্ব্ব কনিষ্ঠটী ম্যাট্রিক পাশ, ভগিনীর শোকে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। বন্ধুটীর ৫।৬টী সন্তান হইয়াছিল, এক দশ বার বৎসরের পুত্র ছাড়া আর কেহ নাই। পুত্রটী যেন আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি, দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। এত বড় পরিবারের যিনি কর্ত্তী, তাঁহাকে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত না হইলে চলিবে কেন? তিনি সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু বেশ বুঝা যায়, তাঁহার চক্ষু দুইটী অন্যত্র স্থাপিত রহিয়াছে—পুত্রের অনুসরণ করিতেছে—তাহা সে ঘরেই থাকুক, আর বাহিরেই থাকুক। বন্ধুটী বলিলেন যে ভগবান্ পিটিয়া পিটিয়া এমন শক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার কাছে পরীক্ষার পরীক্ষাত্বই চলিয়া গিয়াছে—পাইবারও কিছু নাই, হারাইবারও কিছু নাই। এই পরিবারটী দেখিয়া বেশ বুঝা যায়, যদি মনুষ্যত্ব লাভই জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সুখ দুঃখ, ধন দারিদ্র্য, এ সকলের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই, একই উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র। দুঃখও যাঁহার দান, সুখও তাঁহারই আশীর্ব্বাদ। গৃহে একজন অশীতিপর বৃদ্ধা আছেন, এখনও বেশ কার্য্যক্ষম—তিনি অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত—অনেক দেখিতেছেন, অনেক শুনিতেছেন, অনেক সহিয়াছেন। যখন বিদায় লইতে গেলাম, তিনি বলিলেন "বাবা, আবার আসিও।" আমরা বলিলাম, আপনাদিগকে একেবারেই যথেষ্ট কষ্ট দিলাম। তিনি আর্দ্র নেত্রে বলিলেন, "বাবা, কষ্ট বলিলেই কষ্ট, তাতে কি, আবার আসিও। এ সংসারে সব জিনিষ মিলে, মানুষ মিলে না"। আমরাও সিক্ত লোচনে বিদায় লইলাম। রাস্তায় কেবলই ভাবিয়াছি, দেড় শত কোটী মানব সন্তানের আবাসস্থল এই পৃথিবীতে বাস্তবিকই কি মানুষ নাই? এই তো এত গুলি মানুষ দেখিয়া আসিলাম!

পুণায় দুইটী কলেজ। ফার্গুসন কলেজের নাম সকলেই অবগত আছেন। পেরাঞ্জপে মহাশয় এই কলেজ হইতে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিলাত প্রেরিত হন। তিনি যখন সিনিয়ার র‍্যাংলার হইলেন, তখন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ গবর্ণমেণ্টের চাকরী লইবার জন্য তাঁহাকে দায় হইতে মুক্তি দিতে রাজী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মুক্তি চাহিলেন না। স্বীয় পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ঐ কলেজেই চাকুরী গ্রহণ করিলেন। এখন পেরাঞ্জপে মহাশয়ই কলেজের অধ্যক্ষ। মহানুভব গোখলেও এই কলেজে কার্য্য করিতেন। ডেকান কলেজ সরকারী, ইহার বিশেষত্ব এই যে, পেশবাদিগের ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণার জন্য এক মস্ত তহবিল ছিল, তাহার উপসত্ব এখন শিক্ষাকার্য্যে ব্যয়িত হয়। সেই জন্য প্রিন্সিপালকে ১৮০০ শত টাকা বেতন দিতে কিছু গায় লাগে না। পরের টাকা খরচ করিতে কি আরাম! গোখলে মহোদয়ের ভারতবর্ষ-সমিতির নাম সকলেই শুনিয়াছেন। লোক-সেবার পরম উৎসাহী মিষ্টার দেবধর সমিতি প্রতিষ্ঠাতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। ইনিই স্বর্গীয় রাণাড়ে মহাশয়ের পত্নীকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেবা সদনের সমস্ত কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। ইনি সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত, কোন না কোন কাজ লইয়াই আছেন এবং বম্বে ও পুনা ছুটাছুটী করিতেছেন। ইনি সদনের এক মহাশক্তি। বোম্বে প্রদেশে অনেক সেবা-সদন আছে। অর্থদক্ষ পরি-

বারের মহিলারা, বিশেষতঃ যাহারা স্কুল কলেজে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে নারাজ, আপনাদিগের শক্তি ও রুচি অনুসারে এখানে লেখা, পড়া, সূচীকর্ম্ম, সঙ্গীতাদী শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। বিধবা আশ্রমটী পাঁচ ছয় মাইল দূরে। ইহাও পুণার একটী দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় বস্তু, নিরাশ্রিত সহায়কমণ্ডলী-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় (Depressed classes Mission School,) Mr. A. K. Mudliar ইহার প্রাণস্বরূপ। ইনি একজন মান্দ্রাজী যুবক, ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিবাহ করিয়া পুণাতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পতিতের উদ্ধার-ব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তিনি সকালে ও বৈকালে Private tuition করেন, আর সমস্ত দিনরাত যাহাদিগকে কেহ ছোঁয় না, তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিলে পুণ্য হয়। আমরা পৌঁছিবা মাত্র তিনি আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিলেন এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। আমরা পরদিন বিদ্যালয় দেখিয়া যে আনন্দ অনুভব করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। যাহাদিগকে কেহ স্পর্শ করে না, যাহারা নিজদিগকে অস্পৃশ্যই মনে করে, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া ধুইয়া মুছিয়া শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে মানুষ রূপে গড়িয়া তোলা যে অনুষ্ঠানের কার্য্য, তাহা অপেক্ষা পুণ্যের কাজ আর কি হইতে পারে? হায়, মানুষ মানুষের উপর কি অত্যাচারই না করিতেছে! মানুষকে পশু করিয়া দিয়াছে। আমরা বিদ্যালয় ঘুরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব দেখিলাম, ছাত্র ছাত্রীগণকে কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। চেহারাতেও তাহাদিগকে অন্য জাতি সকল হইতে হীন মনে হইল না। প্রশ্নাদির উত্তর শুনিয়া তাহাদিগকে অন্য মানুষ হইতে তো কিছুতেই হীন মনে করিতে পারিলাম না। অল্পদিনে ইহারা শিক্ষার বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। তবে কেন মানুষ ইহাদিগকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না? মানুষের ন্যায্য অধিকার ইহাদিগকে দিতে চায় না? হায়! মানুষের আচার, মানুষকে এমনি ভাবে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে!

আমরা সেখান হইতে বাঁধ-উদ্যান দেখিতে গেলাম। এই উদ্যানটী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অতি সুন্দর। নানা পত্র পুষ্প সুশোভিত হইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করিতেছে। মাঝখানে একটী Band-stand, বৃষ্টির সময়ে আমরা সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। নদীর জল গভীর গর্জ্জনে উচ্চ হইতে নীচে পতিত হইতেছে। এইস্থানে নদীটীকে উচ্চ বাঁধের দ্বারা এপাশ হইতে ওপাশ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে সহরে যাহাতে জলাভাব না হয়, সে জন্য এ বাঁধের সৃষ্টি। জলপ্রপাতের ন্যায় উচ্চ হইয়া জল পড়িতেছে। বর্ষাকালে এই জলপতন একটী দর্শনীয় জিনিষ। পুণার এই দিকের পত্র-পুষ্প-শোভিত উদ্যান-বেষ্টিত গৃহগুলি দেখিতে অতি মনোরম। ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত সহরে সহর অপেক্ষা Cantonment অধিকতর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য। এখানে আর একটী বাগান আছে, ইহাকে বলে Empress garden। সহর হইতে বহুদূরে, ঘোড় দৌড়ের মাঠে। কলিকাতার Zoological garden-এর pocket edition, আছে সবই।

পুণা সহর নানা পেঠে (ward) বিভক্ত।

পেঠগুলির নামে নূতনত্ব আছে। রবিবার পেঠ, বুধবার-পেঠ, ও শুক্রবার-পেঠ। তিলক মহাশয়ের বাড়ী নারায়ণ-পেঠে। প্রার্থনাসমাজ বুধবার পেঠে। এই বুধবার-পেঠেই নানা-ফর্ণাবীশের বাড়ী। এই বাড়ীর পশ্চাৎদিক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সরকারী High School এর জন্য প্রকাণ্ড অট্টালিকায় পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু সম্মুখ ভাগ ভাঙ্গিতে দেওয়া হয় নাই। ফর্ণাবীশের সময়ে যে রকম ছিল, মেরামত করিয়া সেইরূপেই রাখা হইয়াছে। এই সর্ত্তেই স্কুলের জন্য এ বাড়ী প্রদত্ত হইয়াছে। এইটী তাঁহার বৈঠকখানা, দেয়ালে নানারূপ পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র। এগুলি নাকি নানার স্বহস্তাঙ্কিত। সম্মুখেই তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত জলের কল। ইহারই পাশে এক পেশবাওয়াড়া—সেই গড়,—গড় শিবাজী পঞ্চদশ সঙ্গীসহ বিবাহের দলে মিশিয়া রাত্রির অন্ধকারের সুযোগে সায়েস্তা খাঁর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এখন এখানে সরকারী আপিস আদালত বসিয়াছে। কালস্য কুটিলাগতিঃ।

পুণায় খাদ্যসম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব দেখিলাম—অবশ্য প্রার্থনাসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে। কেন না, কোনও খাঁটি হিন্দুর বাড়ী খাই নাই। ইহারা মৎস্য মাংস সম্বন্ধে দেখিলাম, কিঞ্চিৎ উদার। যে বন্ধুর বাড়ীতে উঠিয়াছি, তিনি কেবল মৎস্যাশী নহেন, মৎস্য ভক্ষণের একজন প্রচারক বলিলেই হয়। যাঁহার বাড়ীতে প্রথম নিমন্ত্রণ খাইতে গেলাম, তিনি মৎস্য, মাংস, উভাশী। "The Wisest of the Hindus"এর (ডাঃ ভাণ্ডারকার এ প্রদেশে এই নামে পরিচিত) বাড়ীতে, যেখানে সার নারায়ণ চন্দ্রভার্কার উপস্থিত ছিলেন, সেখানে মৎস্য মাংস দুইই। লেডি চন্দ্রভার্কার মৎস্য খাইলেন না। গৃহিণী বলিলেন, লোকেরা বোম্বাই যাইয়া সব বৈরাগী হয় না কি? এ পর্য্যন্ত যত বাড়ীতে (বোম্বাই) নিমন্ত্রণ খাইয়াছি, কোথায়ও মাছ ত দূরের কথা, মাছের আঁইশও দেখি নাই। তাঁহাদের মাছের প্রতি নিতান্ত বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাবই দেখিয়াছি। এখানে দেখিলাম, সকলেই কিন্তু মৎস্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অথচ পুণায় মাছ বড় পাওয়া যায় না, বোম্বাই হইতেই আমদানী হয়। যাহারা মাছ খায় না, তাহাদের মাছের প্রতি ঘৃণার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়িল। একজন বাঙ্গালী বাবু তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, বন্ধুর বাড়ীতে এমন সময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে, পুকুরে একটা মাছ ভাসিয়া উঠিয়াছে। বন্ধুটী অতি ঘৃণার ভাব দেখাইয়া চাকরকে বলিলেন, চামারকে খবর দে, সে উহা তুলিয়া লইয়া যাইবে। এমন সময় বাঙ্গালী বাবু বন্ধুকে বলিলেন যে, তিনিই ওটা লইয়া যাইতে পারেন। তখন বন্ধুটী হাসিয়া চাকরকে বলিলেন, আর চামার ডাকিতে হইবে না, এখানেই মিলিয়া গিয়াছে। যদিও তিনি হাসিয়াই কথাটা বলিলেন, তবুও যাহারা মাছ খায় না, তাহাদের মৎস্যাশীদের প্রতি মনের আসল ভাবটাই ঐ। অবশ্য বঙ্গের কথা স্বতন্ত্র। "ন দোষো বিহারে মন্তে বঙ্গে মৎস্যস্য ভোজনে।" শাস্ত্রে ব্যবস্থার কোনই অভাব নাই। যাহা হউক, বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের ঝোঁক মৎস্য মাংস ছাড়ার দিকে, এদেশের লোকে দেখিতেছি, ব্রাহ্ম হইয়া আমিষ ধরিতেছেন। তাতো হবেই!—

"নূতন কিছু কর, দাদা, নূতন কিছু কর,
(আর কিছু না পারতো)
কোর্মা কাবাব ছাড়, না হয় ধর।"

পুণার সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষ পার্ব্বতী পাহাড়। এই খানে পার্ব্বতী দেবীর মন্দির আছে। দেবীর নামে পাহাড়ের নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার কি নাম ছিল, জানি না। কেন না, এ নাম তৃতীয় পেশবা বাজিরাও হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইনি এই পর্ব্বতে পার্ব্বতীকে আবিষ্কার করেন। এই প্রাচীন পার্ব্বতী এক খানা অতি কদাকার শিলাখণ্ড, সিন্দুর-মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। যেরূপ শিলা সর্ব্বদাই কলিকাতার রাস্তায় 'শীতলা' নামে দৃষ্টিগোচর হয়। সেই জন্য এই শিলা খণ্ডকে এক কোণে এক ক্ষুদ্র কুঠুরীতে বদ্ধ করিয়া অন্য এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার শীর্ষদেশ স্বর্ণমণ্ডিত বলিয়া প্রকটিত। সোণা কি পিতল, তাহা দূর হইতে নির্ণয় করা দুরূহ। এই মন্দিরে স্বর্ণনির্ম্মিত পার্ব্বতী ও গণপতি রহিয়াছে, অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রজতনির্ম্মিত এক মহাদেবও এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। এক জন লোক তাম্বুরা লইয়া ভোলানাথের স্তব করিতেছে। পাণ্ডারা পার্ব্বতী ও গণপতি বাহিরে আনিয়া আমাদিগকে দেখাইল। মহাদেব বাহির হইতেই দেখা যায়। পার্শ্বে একটী ছোট মন্দিরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছে—মূর্ত্তিটী শ্বেতপ্রস্তরের।

এই পাহাড়ে উঠিবার জন্য নীচ হইতে পার্ব্বতীর মন্দির পর্য্যন্ত অতি বিস্তৃত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলি নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এই সকল সোপানের উপর আরোহীগণের বিশ্রামের নিমিত্ত লোহার বেঞ্চ রাখা হইয়াছে। আমরা ধন্যবাদের সহিত এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম, কেন না, পাহাড়টী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। পাহাড়ের উপর হইতে পুণার দৃশ্য অতি মনোহর। সহজেই বুঝা যায়, একটী গ্রামকে সহরে পরিণত করিয়া লওয়া হইয়াছে। শিবাজির বাল্যকালে ইহা একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল। তাঁহার বাল্য-শিক্ষা এই পুণা গ্রামেই হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে লইয়া তিনি আপনার অসীম-সাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই "মালোয়া"গণকে দেখিলাম। তাহাদিগকে দেখিয়াতো মনে হয় না যে ইহাদিগের মধ্যে সৈন্য হইবার যোগ্যতা আছে। আসল কথা এই যে, যখন কোনও শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হয়, তিনি ফুৎকারে ধূলিমুষ্টির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। সুতরাং মহাপুরুষকে বাদ দিয়া তাঁহার মালমসলার বিচার চলে না। পেশবাগণ পুণাকে সহরে পরিণত করেন। যদিও তাঁহাদের প্রধান স্থান সেতারা আরও দক্ষিণে। কিন্তু সে সময়ে ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আর সেদিকে যাওয়া হয় নাই। এই পাহাড়ের উপরে চারিদিকে এক সময়ে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল; দেখিলে বেশ বুঝা যায়,ইহা একটী গড়রূপে ব্যবহৃত হইত। এই প্রাচীরের উপর যে দাঁড়াইবার স্থান দেখিলাম, সেখান হইতে সহ্যাদ্রি গিরিমালার দৃশ্য অতি চমৎকার। এইখানে দাঁড়াইয়াই নাকি শেষ পেশবা দূর হইতে ইংরাজের সঙ্গে নিজসৈন্যের শেষযুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন এবং যখন দেখিলেন, তাহার সৈন্যেরা হারিয়া যাইতেছে, তখন এইখান হইতে অবতরণ করিয়া নাকি পালাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পুত্রে জরা ভার বটে দিলা নরপতি।
কেমনে সমন হাতে পেলা অব্যাহতি॥
পুরুষে পৌরুষহীন এ কথা কেমন?
একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ।

সেই কোপে বুঝি দেবতারা এসব ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, কেবল চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট। এই

খানে আরও দুইটী মন্দির আছে। একটী বিষ্ণুমন্দির। দেবতা কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত। সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র কুঠুরীতে শ্বেতমর্ম্মরে নির্ম্মিত ও সর্পজড়িত গরুড়মূর্ত্তি—হাত জোড় করিয়া আসীন। সর্প বৈমাত্রেয় ভাইও বটে, আবার খাদ্যও বটে। উহারা এখানে কোন্ সম্বন্ধে আসিয়া জুটিয়াছে, তাহা আজ নির্ণয় করিতে পারি নাই। আর একটী মন্দির কার্ত্তিকের—নাম কার্ত্তিকস্বামী। মূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তরের—চতুর্হস্ত ও ষড়ানন—ময়ূরের উপর প্রতিষ্ঠিত। আদিম মূর্ত্তিটী ছিল মার্ব্বেলের। কিন্তু মস্তকে যে রৌপ্য-নির্ম্মিত মুকুট আছে, তাহা পতিত হইয়া বামহস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, তাই সেস্থানে এই বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্ত্তিক স্বামীর মন্দিরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ। যদি নিষেধ অমান্য করিয়া কেহ সেখানে যায় তো কার্ত্তিকের শাপ আছে, সে রমণী সাতজন্ম বিধবা থাকিবে। শাপটার মধ্যে অনেক গল্‌তি। সাতজন্ম কি করিয়া বিধবা থাকা যায়, কুমারী থাকা সম্ভব। আর পুত্র কন্যা লইয়া তো অনেক নারীই বিধবা হয়? এরূপ সাপে তো নিতান্তই ধোঁরা শাপ। কিন্তু হায় দেবসেনা! যার মুখ একবার দেখিলে সাতজন্ম বিধবা থাকিতে হয়, তুই সেই মহাপুরুষের পত্নী, তোর তো জন্মের পূর্ব্ব হইতেই বৈধব্য লেখে! অন্ততঃ তোমার বৈধব্য আর কোন জন্মেই ঘুচিবে না। কিন্তু, স্বামীজীর কৃষ্ণপ্রাপ্তি না ঘটিলে তোমার পক্ষে শাপ ফলে কি করিয়া? তোমাকে বিধবা হইতে হইলে যে ঠাকুরের ছয় মাথাই ভূলুণ্ঠিত হইতে হয়? সুতরাং ঐ শাপ রক্ষার জন্য তোমার প্রতি ব্যবস্থা হইল, তুমি কার্ত্তিকের বিধবা পত্নী হইয়া চিরদিন সুখে ঘরকন্না করহ। অথবা, বিলকুল ঝুটবাৎ হ্যায়। তা যাই হোক, কার্ত্তিক ঠাকুর এই পুণার নারীজাতির প্রতি বৈধব্যের ব্যবস্থা করিয়া খড়্গহস্তে চোখ গরম করিয়া বসিয়া আছেন বটে, কিন্তু কলিকাতায় বৎসরান্তে তিনি যাহাদের গৃহে অতিথি হন, তাহাদিগকে বিধবা করিবার সাধ্য, অন্য পরে কা কথা, কার্ত্তিকের বাবারও নাই। তাহারা বাল্য যৌবন জরা কোন কালেই বিধবা হয় না। যদি তাহাদিগকে বিধবা করিবার সাধ্য থাকিত,তাহা হইলে মানব-সমাজের এক মহাকলঙ্ক দূরীভূত হইত।

কার্ত্তিকের কথা বলিতে বলিতে ভ্রাতা গণেষের কথাও মনে পড়িয়া গেল। গণপতি মহোৎসব সম্মুখে। কেবল উৎসবের জন্য নহে, তিনি তো সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। ঐ তো কার্ত্তিকের মন্দিরের সদর দরজায় গণেশ ঠাকুর গোঁফে, থুড়ি, শুড়ে চাড়া দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। উৎসবের সাজ পড়িয়াছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারে তিনি বাজারে উপস্থিত। কোন গণেশ চড়িয়াছেন সিংহে, কেহ ময়ূরে, কেহ হস্তীতে, কেহ সর্পে, কেহ বা তাকিয়া ঠেশান দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এক জনকে দেখিলাম, তিনি চড়িয়াছেন কচ্ছপের উপর,বেচারী তো ভূরির ভারে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত গলা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কথাটা এই, সিংহ না হয় মায়ের, চড়িয়া বসিলেই হইল; ময়ূর না হয় ভাইয়ের, ধারে পাওয়া গেল; সর্প বাপের গলা হইতে টানিয়া লইলেই হইল, একটা সর্প দেখিয়াছি, সে গণেশের মাথায় ফণা বিস্তার করিয়া ছাতার কাজ করিতেছে; হস্তীর সঙ্গে তো গণেশের চিরদিনের মাখামাখি সম্বন্ধ,আবার হাতে আছে অঙ্কুশ, একি নিজের মাথায় মারিবার, না কোন কালে গণেশ

হাতীর মাহুত ছিলেন; ইঁদুরের তো মৌরুসী পাট্টাই আছে; এবং না হয় আর আর জন্তু জানোয়ার শিকার করিয়া জল জঙ্গল হইতে ধরিয়াই আনিলেন, কিন্তু ঐ যে গণেশ বাইসিকেলে চড়িয়া বসিয়াছেন, ওটা তিনি পাইলেন কোথায়? কালাপাণি পার না হইলে তো এটী মিলিবে না! সরকার মহাশয় কি বলেন? * পাশ্চাত্য সভ্যতার বেগ সামাল দেওয়া যে কেবল ত্রিশ কোটী মানবের অসাধ্য হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু সে স্রোতে পড়িয়া তেত্রিশ কোটী দেবতাও হাবুডুবু খাইতেছেন, কূল কিনারা পাইতেছেন না। তাই, বেশ ভূষা আসন বাহন দিনকে দিন সব বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। মস্তকাবরণের তো অন্তই নাই, মাঝে মাঝে হ্যাট্ কোটও আছে। ভক্তগণ গণেশকে লইয়া এক হাত বেশ রগড় করিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ ঠাকুরকে দুই একজন পরিচারিকাও দিয়াছে. সে নাকি বেশ ভাবের সঙ্গে গণেশের শরীর সম্বাহন করিতেছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, আমোদের জন্য যত, এই সব উৎসব 'পূজার' জন্য তত নহে। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক আমোদপ্রিয়তা রহিয়াছে। সুতরাং পূজা উঠিয়া গেলেও আমোদ উঠিবে না, এবং আমোদের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পূজাও কখনও উঠিবে না, উঠানও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কেন না, পূজা উপলক্ষে যে আমোদ, তাহা স্থানে স্থানে সীমা অতিক্রম করিলেও সাধারণতঃ পূজার আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা সংযত। পূজা উঠিয়া গেলে আমোদ অযথা অসংযত হইবার কথা। যে হেতু মানুষ কখনও আমোদ ছাড়িবে না, মানুষের যতগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি, আর আমোদ-স্পৃহা আছে, তাহার মধ্যে একটী প্রধান। মনে রাখিতে হইবে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং যাঁহারা পূজা সংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যদি আমোদের ব্যবস্থা করিতে অপারক হয়েন বা তাহাতে মনোযোগ না দেন, কিম্বা যদি অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্যে অনাবশ্যক মনে করেন, তবে হিতে বিপরীত হইবে। তাহার চাইতে অসংস্কৃত পূজাই বরং ভাল।

গণপতি উৎসবের সূচনা দেখিয়াছিলাম পুনায়, পূজা দেখিয়াছি বোম্বাই। পূজা দেখিয়াছি বলিতে পারি না, ভাসান দেখিয়াছি। ভাসান এক দিনে হয় না। যার যেমন ইচ্ছা, পাঁচ দিনে, সাত দিনে, দশদিনে ইত্যাদি। সমুদ্রের কোনও বিশেষ ঘাটে বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং সকলকে সবদিন হইতে এক রাস্তা দিয়া মূর্ত্তিগুলি লইয়া আসিতে হইবে। একদিন দেখিলাম, বহুলোক এক রাস্তার দিকে যাইতেছে, এবং সকল দলের মধ্যেই কয়েকখানা অতি কুৎসিৎ সোলার মূর্ত্তি দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ওগুলি গণেশের মা গৌরী। গৌরীনন্দন কি না? উড়িষ্যাতেও গৌরীনন্দনের পূজা দেখিয়াছি, মহারাষ্ট্র হইতে নীত কি না, জানি না। অবশ্য গৌরীর দু একটী অতি সুন্দর মূর্ত্তিও দেখিয়াছি, দুহাত দু পা এক মাথা বলিয়াই সুন্দর। নানাবিধ বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা—(ভাসাইবার সময় খুলিয়া রাখা হইবে) এবং চেয়ারে বেশ করিয়া বসাইয়া ভাসানের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। সকল গনেশই পীঁড়ির উপর বসিয়া অতি দরিদ্রভাবে একজন মানুষের মাথায় চড়িয়া যাইতেছেন। কিন্তু দুএক খানা সৌভাগ্যবান্ গণপতি চতুর্দ্দোলে বেশ ঘটা করিয়া নীত হইতেছে। কাহারও আবার এমন

* শ্রীযুক্ত বিহারী লাল সরকার প্রণীত 'সনাতনী'র সমালোচনা বিগত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে দ্রষ্টব্য।

দুর্দ্দশা যে ঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গলা আল্গা হইয়া গিয়াছে। এ বিভিন্নতা কেন? গণেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার বাবার কথার একটা মীমাংসা শুনিয়াছি। কাশীতে যে মরে, সে-ই শিব হয়, তাহাতে পাপী সাধুর বিচার নাই। ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা—এই বলিয়া তর্ক তুলিলে স্বর্গীয়া জননী দেবীর কাছে যে উত্তর পাইয়াছিলাম, তাহা শৈবগণ স্বীকার করিবেন কি? তিনি বলিলেন, "কাশীতে মরিলে শিব হয়, উহা শাস্ত্রবাক্য—অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু তাহাতে পাপী সাধুর পার্থক্য লোপ পায় না। শিবে শিবে কি বিভিন্নতা নাই? সব শিবই কি সমান? যাহার যা কর্ম্ম, তাহা ভোগ করিতেই হয়। কাশীতে দেখে আয়, কোন শিবের বা ষোড়শোপচারে দু বেলা পূজা হয়; আবার হাটে ঘাটে কত শিব রহিয়াছে, তাহাদের উপরে পশুপক্ষিগণ মলমূত্র ত্যাগ করে।" জানি না, গণেশদিগের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য এইরূপ কোন যুক্তি আছে কিনা? গণেশ কিন্তু এই সমুদ্রের ধারে আসিয়া বড়ই নারিকেল-ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পুরোহিতগণ নারিকেল ভাঙ্গিয়া জল তাহার মাথায় ঢালিয়া দিতেছে এবং পরক্ষণে গণেশ নিজেই সমুদ্রজলে এক বছরের মত গণেশলীলা সাঙ্গ করিতেছেন।

ডাক্তার ভাণ্ডারকারের কথা না বলিলে পুণার কথা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বৈদ্যনাথে ছিলেন যেমন ঋষি রাজনারায়ণ, পুনায় তেমনি ঋষি রামচন্দ্র গোপাল ভাণ্ডারকার। পুণায় দুই নদী—মুলা ও মুথা। ইহারা যে স্থানে মিলিয়াছে, তাহার নাম সঙ্গম। এই স্থানে ডাক্তারের বাড়ী। বাড়ীর নাম সঙ্গমাশ্রম। সাধারণ সহর হইতে একটু বাহিরে। পুণা পৌঁছিয়াই একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। ভয় ছিল, এমনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। যাঁহাকে শুধু দেখিবার জন্যই পুণা আসার শ্রম স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তাঁহার সঙ্গে এমনই দেখা হইবে, তাহা হইতে দিব না। সেইজন্য বৈকালে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবেই, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়াই সকলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি তখন পাঠাগারে ছিলেন। চোখে দেখিতে পান না, একজন তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। আমাদের খবর পাইয়া ড্রয়িং রুমে আসিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অল্প খানিকক্ষণ কথা বার্ত্তা বলিয়াই বুঝিলাম, জ্ঞানের গভীরতা তাঁহার হৃদয়ের বিশালতাকে অপহরণ করে নাই। অসীম পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও হৃদয়টী অত্যন্ত কোমল রহিয়াছে। এই বড়লাটের বড় সভার সদস্যটী ক্ষুদ্র বালক বালিকাদিগের সঙ্গে সমান ভাবে মিশিতে সমর্থ। ইঁহার বয়স প্রায় পচাত্তর। ডাক্তার মহাশয় বিপত্নীক। পুত্রবধূকে দেখাইয়া বলিলেন যে, ইনিই গৃহকর্ত্রী। ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী। পূর্ব্বোল্লিখিত সেবাসদনের ইনি একজন সম্পাদিকা। ডাক্তার ভাণ্ডারকার অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। তানলয়যুক্ত বহু সঙ্গীত ইনি নিজে রচনা করিয়াছেন, এবং নিজে একজন সুগায়ক। সুতরাং গৃহিণীর প্রতি সঙ্গীতের আদেশ হইল। ভাণ্ডারকার ইতিপূর্ব্বে কিছুদিন বাঙ্গালার আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার লিখিত বাঙ্গালারই আলোচনা আছে, কথিত বাঙ্গালার নহে। কেননা, বাঙ্গালার উচ্চারণ বাঙ্গালার নিজস্ব, আর কাহারো সঙ্গে মিল

নাই। গান শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। ছোট ছোট নাতিনীদিগের গান শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা এখন জীবিত। এক কন্যা বাল্য বিধবা হইয়াছিলেন, তাঁহাকে পুনরায় পাত্রস্থ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তা ও কোমলতা, উভয়ই পাশাপাশি বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি যতবার তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছি, ততবারই তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততা ও কোমলতায় মুগ্ধ হইয়াছি। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিবার সময় এমন ভাবে আমার কথা বলিলেন যে, যাহাতে বুঝা যায় যে, আমার বক্তৃতা ও উপাসনায় উপস্থিত না থাকাটা তাঁহার পক্ষে একটা মস্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছে। আমিতো লজ্জায় জড়সড় হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইয়া কেবলই ভাবিতেছিলাম—"অমনিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

একদিন রাত্রিকালে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। সর নারায়ণ ও লেডি চন্দ্রভার্কার সে দিন পুণাতে ভাণ্ডারকারের গৃহে উপস্থিত ছিলেন। জজ সাহেব ৪৫ দিনের ছুটিতে বিশ্রামার্থ আসিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষ সকলে একসঙ্গেই আহারে বসিলেন। এ দেশের এই প্রথা। খাইতে খাইতে অনেক কথা হইতে লাগিল। চন্দ্রভার্কার বলিলেন যে, বাঙ্গালী শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অন্যের মত সম্বন্ধে উদারতা বড়ই কম। অনেকেই বড় সঙ্কীর্ণমনা। একজন লোক কেবল তিনি দেখিয়াছেন, যিনি এই দোষের অতীত। নিজের মত সম্বন্ধে যেমন দৃঢ়, অন্যের মত সম্বন্ধেও তেমনি উদার। তিনি নাম ভুলিয়া যাইতেছিলেন। আমার সর্ব্বজনপ্রিয় সর্ গুরুদাসের কথা মনে পড়িতেছিল। চন্দ্রভার্কার তাঁহারই কথা বলিতেছিলেন। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ক কথাই বেশী হইল। আহারান্তে সকলে আবার আসিয়া ড্রয়িং রুমে জমা হইলেন। ভাণ্ডারকার আসিয়াই হাসিয়া বলিলেন,"আমি কলিকাতার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম। খাওয়ার পর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কে কোথা দিয়া সড়িয়া পড়িলেন, টের পাইলাম না। কেহ কাহারও কাছে বিদায়ও লইলেন না। আমিতো অবাক হইলাম।" এ দেশে সর্ব্বত্রই এ নিয়ম দেখিয়াছি, আহারান্তে কিছু কাল কথাবার্ত্তা গান বাজনা চলে, তবে বিদায়। বাঙ্গালীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিতগণ রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু আহার ৮।৯ টার মধ্যে শেষ হইলেও আর কেহ অপেক্ষা করেন না। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, আহারটাই মূল, সামাজিকতাটা গণনার মধ্যে নহে। এ দেশে এ দিকটা বেশ ফুটিয়াছে। যাহা হউক, মহিলারা সমবেত হইলে, বৃদ্ধ বলিলেন, "বাই সাহেব, আমি তোমায় ১৫ মিনিট বিশ্রামের সময় দিতেছি, ইহার পর আমাকে দশটী গান শুনাইতে হইবে, ছাড়াছাড়ি নাই।" ইতিমধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ মেয়েদিগকে যে গান শিখাইয়াছেন, ইহা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ পর্দ্দা ভাঙ্গিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী হিন্দুরা এত পর্দ্দার পক্ষপাতী কেন? আমি বলিলাম, উহা হিন্দুয়ানীর এক প্রধান অঙ্গ। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি? বাঙ্গালী কি কখনও

আমাদের দেশে আসে না ?" আমি বলিলাম, আসা যাওয়া খুবই কম। তারপর, এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে বিশেষভাবে না মিশিলে এ প্রদেশের পর্দ্দাহীনতার পরিমাণটা আমাদের পক্ষে ধারণা করাই অসম্ভব। আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু কি প্রকার কি পরিমাণ, উভয় বিষয়েই দেখিতেছি, আমার ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, মারাঠা ব্রাহ্মণরমণীর মধ্যেই কেবল পূর্ণ স্বাধীনতা বর্ত্তমান।* দেখিয়া বুঝিলাম, আমার ধারণা নিতান্তই ভিত্তিহীন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই পূর্ণ সঙ্কোচ-হীন স্বাধীনতা বর্ত্তমান। তিনি বলিলেন, ইহা বাঙ্গালীর কূপমণ্ডুকত্বের পরিচায়ক। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ এক প্রশ্ন করিলেন, যাহার উত্তর দেওয়া বড়ই মুস্কিলজনক। চুপ করিয়া রহিলাম। আবার প্রশ্ন করিলেন, ব্রাহ্মমহিলাদিগকে সাধারণে নিন্দা করে কেন? কি উত্তর দিব? পুরুষের সভা হইলেও কোন কথা ছিল না। কিন্তু উপস্থিত আছেন, লেডি চন্দ্রভার্কার, ছোট ভাণ্ডারকারের পত্নী ও বড় ভাণ্ডারকারের এক নাতিনী। অথচ দুইবার প্রশ্নের পর উত্তর না দিলেও ব্রাহ্মমহিলাদিগের প্রতি অবিচার করা হয়। তাই নাক, চোক্ বুজিয়া বলিলাম যে, বঙ্গের সাধারণ লোকের নিকট পর্দ্দা ও পবিত্রতা একার্থবোধক, ব্রাহ্মসমাজ সেই পর্দ্দা তুলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং deductively উঁহারা একটা খারাপ ধারণা পোষণ করে, উহা অভিজ্ঞতা-লব্ধ নহে। জজ সাহেব মুখ মুছিবার ব্যপদেশে বৃহৎ টার্কিশ তোয়ালের দ্বারা আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ চোখে দেখেন না, সুতরাং চক্ষুলজ্জা নাই। অবজ্ঞার ভাবটা চাপিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 'হুঁ' করিয়া একটা শব্দ হইয়া সে বাহির হইল। মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম— "ঘৃণ্য" (comtemptible) শব্দটা যেন তাঁহার মুখের উপর রহিয়াছে। মহিলারা যে মুখ বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন, তাহা যেন লুকাইবার জন্য ভগবতী বসুধার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছিলেন! ক্ষণকাল সব নিস্তব্ধ। দেবদত্ত এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, মিঃ চৌধুরী, আমি কলিকাতায় ছিলাম, কৈ কোন ব্রাহ্মমহিলাকে তো রাস্তায় বাহির হইতে দেখি নাই। তবে কোথায় ব্রাহ্মসমাজ পর্দ্দা ভাঙ্গিয়াছে? আমি বলিলাম, আপনারা পর্দ্দাহীনতা বলিলে যাহা বুঝেন, আমরা তাহার শতাংশও বুঝি না। মানুষের আবেষ্টনের হস্ত হইতে নিস্তার নাই, আমি পর্দ্দা সম্বন্ধে নিজকে অতি অগ্রসরই মনে করিতাম, কিন্তু মারাঠা দেশে আসিয়া মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া বুঝিলাম, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসমাজের অনবরোধের একটা হুজুগ থাকিলেও আপনাদের সাধারণ মেয়েদের মত মুক্ত স্বাধীন ভাব পাইতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মমহিলাগণেরও বহুযুগ লাগিবে। আমাদের আবেষ্টনের বোঝা ঐ সামুদ্রিক বৃদ্ধের ন্যায় (Like the "Old man of the sea") আমাদের ঘাড়ে এমনি শক্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমরা

* আমার এই ধারণার জন্য কটকের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও মহাশয় দায়ী। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ মহারাষ্ট্র হইতে আসিয়াছেন। মারাঠা হইয়াও তিনি অত্যন্ত পর্দ্দাপ্রিয়, তাঁহাকে সে জন্য দোষ দিলে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, মারাঠা ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে পর্দ্দা প্রচলিত। কিন্তু সেটা তাঁহার ভুল। মারাঠা রাজবংশীয়দিগের মধ্যে পর্দ্দা আছে বটে, তাহাও বরোদার মহারাণী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতেছেন।

যেখানে দাঁড়াইয়া মনে করি, পর্দ্দার বাহিরে আসিয়াছি, সে স্থানটাও যেন পর্দ্দার আড়াল। ইহা নির্দ্ধারণ করিতেই আমাদের অনেক সময় লাগিয়া যাইতেছে। আপনাদের এখানে আসিয়া সে বিষয় অনেক জানিলাম ও বুঝিলাম। অনেক অহঙ্কার খর্ব্ব হইল।

বঙ্গও হিন্দুদেশ, মহারাষ্ট্রও হিন্দুদেশ। অথচ যে পর্দ্দা বিনাশের জন্য বঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের নানা কুৎসা, সেই পর্দ্দা বিনাশ একজন মারাঠীর পক্ষে নামে মাত্র, কার্য্যে নহে। অথচ বাঙ্গালীও হিন্দু, মারাঠীও হিন্দু। সমগ্র ভারতের কথা দূরে থাকুক, এই ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দুকে প্রকৃত অর্থে একজাতিতে পরিণত করিতে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কি প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এইখানে যেমন হৃদ্গত ভাবে উপলব্ধি করিলাম, এমন আর ইতিপূর্ব্বে করি নাই। যাহা হউক, ইতিমধ্যে দুইটী গান হইল। বৃদ্ধ বলিলেন, আর কষ্ট দিতে চাই না, যদিও সমস্ত রাত্রি শুনিলেও আশা মিটিবে না। মেয়েদের অনুরোধে "বন্দেমাতরম্" হইল। তখন বিদায়ের সময়। বৃদ্ধ যখন আমাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গদ্ গদ্ ভাবে বলিলেন, God bless you both, তখন আমাদের নেত্র অশ্রুসিক্ত না হইয়া পারে নাই। আমরা গাড়ীতে উঠিলাম, তিনি গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া বলিলেন, Good night, আমরাও জীবনের এক পুণ্য-স্মৃতি সংগ্রহ করিয়া আবাসে ফিরিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী।

প্রাচীনকালে হিন্দু রমণীগণের প্রকৃতাবস্থা।

পলকে পলকে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। এইরূপ দিনে দিনে কত শত শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র, আর্য্যজাতির আবাসভূমি—ভারতবর্ষের কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কালের অপ্রতিহত স্রোতে ভাসমান হইয়া কত শত মধুময় দিন, কত যে সুখের বিষয় অতীতের অন্ধতামস-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহা বৎসামান্ত দিন-সমষ্টি-সম্বলিত জীবের জীবন কি ইয়ত্তা করিবে? কিন্তু, হায়! সে সকল সুখের দিন কি জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায়? হায়, একদিন যে ভারত-মাতার মুখ প্রভাত-কমলের ন্যায় বিকসিত—মুক্তপ্রাণের অনুরাগের ন্যায় সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত, ষড়্ঋতুর ক্রমপরিবর্ত্তন-জনিত প্রকৃতির মোহনভাবে যে ভারতভূমি চির সৌন্দর্য্যময়ী ছিল—অসংখ্য ধন-জন-রত্ন-রাজী-প্রসবিনী যে ভারত-জননী আপন ঐশ্বর্য্যে চির-গৌরবান্বিতা থাকিয়া মেদিনীমণ্ডলে মানদণ্ডের ন্যায় উন্নতা ছিল, যে আনন্দ-প্রবাহ ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রবাহিত হইত, আজ কালের তাড়নে সে প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তুহিন প্রপাতে সে সুখ-কমল মলিন হইয়া গিয়াছে। কি পাপে আমরা সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, কে ইহার উত্তর দিবে!

পূর্ব্বকালে আর্য্য-হিন্দু-রমণীগণের প্রকৃত

অবস্থা, তাহাদিগের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার যে কি প্রকার ছিল, সে সকল যখনই আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তখন হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে, আর মনে হয়, এই ভারতে মহাশক্তির অংশসম্ভূতা রমণীগণ কি ছিল, আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনে পড়ে, একদিন আর্য্য-রমণীগণ সকল মহদ্‌গুণে বিভূষিতা হইয়া জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; কি আধ্যাত্মিক, কি মানসিক, কি সাংসারিক, সকল বিষয়েই তাহারা পুরুষের সমকক্ষা ছিল। এখনকার মত তাহারা অন্তঃপুরে আবদ্ধা ছিল না, অথবা শিক্ষিত সমাজে তাহারা তাহাদিগের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিতা থাকিত না। যাঁহারা ঋষি পদবাচ্যা হইতেন, তাঁহারা অনেকস্থলে পুরুষ অপেক্ষা অধিক উন্নতশীলা ছিলেন,—এমন কি, তাঁহারা নিজেই ঋক্‌মন্ত্র ও স্তোত্র সমূহ প্রণয়ন করিতেন; এবং ঋষিবৃন্দের ন্যায় হোমক্রিয়া ও যজ্ঞাদি সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দেহ-মনো-বাক্‌-সংযতা হইয়া জীবন যাপন করিতেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ সপতি বাস করতঃ ঐহিক ও পারত্রিক ক্রিয়া কলাপে নিরত থাকিয়া সুখে দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করিতেন। বিদুষী ঋষি, বিশ্ববারা, গার্গী বাচক্লবী, মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী প্রভৃতি ঋষি-রমণীগণ আপনাপন মহিমা বিস্তার করতঃ ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে বিদুষী ঋষি বিশ্ববারা ঋক্‌মন্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া জগতে সর্ব্বজন-সমাদৃতা ও চিরস্মরণীয়া হইয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদে ৫।২৮।৩ মণ্ডলে এবং উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপ অনেক ঋষি-রমণীর উল্লেখ ও প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।

সিমন্তিনীগণ, যাঁহারা গৃহী, তাঁহারা অনেকেই বিদুষী, যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহারা স্বামীর সহায়তা করিতেন, একত্রে যজ্ঞ সম্পাদন, হব্যপ্রদান ও উপাসনা কার্য্য করিতেন। গার্হস্থ্যের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন, ক্ষেত্রজাত শস্যাদি সংগ্রহ ও উদুখলে পেষণ, রেশম ও পশমের বস্ত্র সকলের বয়ন এবং সোমরস প্রস্তুতকরণও তাঁহাদিগের নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে পরিগণিত হইত। ঐ সকল গৃহাঙ্গনাগণ গৃহী হইলেও একপ্রকার ঋষি বলিয়া গণ্যা হইতেন। উষোদয় যেমন বিশ্বজনগণকে জাগরিত করে, তদ্রূপ ঐ সকল গৃহের গৃহিণীগণ প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া অপরাপর রমণীগণকে, স্নুষা, দুহিতাদিগকে জাগ্রত করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করতঃ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের ও গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিতেন।

এস্থলে দুই একটা পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমতঃ, তপশ্চরণ-সংকল্পা পার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি। সযত্ন-পালিতা রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা, চম্পক-দাম সদৃশা পার্ব্বতী, ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া "বিমুচ্য সা হারমহার্য্য নিশ্চয়া। * * * ববন্ধ বালারুণ বভ্রু বল্কলং॥" আপনার কুসুম-পেলব সুকুমার তনুকে কৃশ করিয়া, কখন বা চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তপঃনিরতা ছিলেন। এইরূপে তিনি পূর্ণতাপসীর বেশে আমাদের সমক্ষে সমুপস্থিতা। অপরপক্ষে বাল্মীকির তপঃবনে রামময়-জীবিতা সীতার কাষায়-বসনধারিণী তপস্বিনী মূর্ত্তি। এ মোহিনী মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় না যে, কবি বর্ণিত এই সীতা পার্থিব প্রণয়বিহ্বলা রামের সোহাগ-বিবশা সীতা। ইনি যেন মরজগতের নহেন, যেন সর্ব্বপবি-

ব্রতাময়ী দেবীমূর্ত্তি। আবার সেই তপোবনাশ্রমবাসী মুনিজন-প্রতিপালিতা—জটাবল্কলধারিণী, স্বধর্ম্মানুরতা শকুন্তলা। তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, মনে হয়, ইঁহারা যেন ইহ-জগতের নন্। কল্পনায় যখন এই সকল অলোকসামান্যা রমণীগণের চিত্রাবলী মানস-পটে প্রতিফলিত হয়, বর্ত্তমানের তুলনায় অতীতের স্মৃতি যখন মানস নেত্রে প্রতিভাত হইতে থাকে, তখনই হৃদয় নৈরাশ্যে ভরিয়া যায়, আর ভাবি, একদিন আমাদের কি ছিল, আর এখন কি হইয়াছে! হায়! সে সুখের দিন কি আর আসিবে না?

এই সকল সু-প্রাচীন পুরাবৃত্তের বৃত্তান্ত ছাড়িয়া দিলেও, প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ যে সময় বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোতঃ ভারতবর্ষে প্রবলভাবে প্রবাহিত, তৎকালে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী রমণীবৃন্দের যে কিরূপ সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি অবস্থা ছিল, তাহা পালি অথবা সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ বুধবৃন্দ বিশেষ অবগত আছেন। 'মৃচ্ছকটিক', 'মালতী-মাধব', 'ললিত-বিস্তার,' প্রভৃতি গ্রন্থে এতদ্‌সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে, এজন্য কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল। বৌদ্ধ অথবা জৈনধর্ম্মাবলম্বিনী যে সকল রমণী গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভে প্রয়াসী, তাঁহারা তপস্বিনীবেশে পর্ব্বতে বা বনে বাস করিতেন; তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিতা এবং অধ্যাত্ম বিষয়েও জৈন বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর (তপস্বী) সমকক্ষ, কভুবা উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জীবের মুক্তির জন্য এই সকল ভিক্ষুণী পরিব্রাজকরূপে ধর্ম্ম তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া বেড়াইতেন, এরূপ অবগত হওয়া যায়; এতদ্ব্যতীত ঐ সকল রমণী যে সময়ে সময়ে গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি ধর্ম্ম শিক্ষা, অপরাপর রমণীগণকে প্রদান করিতেন, তদ্বিষয়ের প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।* গৃহস্থগণ, এমন কি নৃপতিবৃন্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের কন্যারত্নগণকে সুশিক্ষার্থ, ঐ সকল ভিক্ষুণীদিগের হস্তে অর্পণ করিতেন। কন্যাগণ তাঁহাদিগের আশ্রমে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া আসিত। পরিব্রাজকগণ প্রায়শঃই গৃহস্থের গৃহে গৃহে শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেন। এখন, সময়ে সময়ে ব্রহ্মদেশে দু একটী তাপস রমণী দৃষ্ট হয়; পরন্তু সার্দ্ধ একশতাব্দী পূর্ব্বে, অর্থাৎ যাবত না মার্কিন ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাবত ঐ সকল ঋষিতুল্যা রমণীগণ, ব্রহ্মদেশে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে গতায়াত করিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেন।

গৃহস্থ রমণী ও কন্যাগণকে সামাজিক পদ্ধতি অনুসারে বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা প্রদান করা পিতামাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। গৃহকার্য্যে সুনিপুণতা, রন্ধন, বস্ত্রাদি বয়ন, সুচারু শিল্পকার্য্য, অঙ্ক ও দর্শন শাস্ত্রাভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে যথারীতি শিক্ষাপ্রদান করা হইত। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাগণকে উক্ত বিষয় সমূহে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। স্বাধীনতা তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মনোমত স্বামী নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন; এবং কোন কোন স্থলে পিতামাতাও উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতেন। পরন্তু, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে পিতামাতার অনুমোদন ব্যতীত উদ্বাহ ক্রিয়া সমাধা হইত না। ইহা বলা বাহুল্য যে, তৎকালে পর্দ্দা প্রথা বা জেনানা শব্দার্থ অপ্রচলিত ছিল; অনেকেই সুশিক্ষিতা এবং ধর্ম্মভাব, অতি

* H. H. Wilson. &c Indian Women in the days of Buddha.

শৈশব হইতেই, তাহাদের অন্তরে অ
থাকায়,কৈশোর বা যৌবনে তাহা দাঢ্য পরি-
ণত হইত না; সুতরাং সামাজিক ব্যভিচারের
কোন সম্ভাবনা ছিল না। রমণীগণ পারমা-
র্থিক বিষয়ে উন্নতির জন্য বিজন বিপিনে
বা পর্ব্বত কন্দরে ব্রহ্মবাদিনী রূপে বাস
করিতে পারিত, ইহাতে কোন বিশিষ্ট শ্রেণী
বা বয়ঃক্রমের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না।
পরন্তু বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের এরূপ অভিপ্রায় নহে
যে,রমণীগণ এরূপ পন্থা অবলম্বন করে। তাঁহারা
বলেন, কঠোর তপস্যা ও উক্তভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম
প্রতিপালন রমণীগণের উপযোগী নহে,
গৃহস্থাশ্রমই তাহাদিগের প্রকৃত স্থান, গার্হস্থ্য
ধর্ম্ম ও অনুশাসন প্রতিপালন করাই রমণী
গণের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু কাহার কাহার
এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এ
বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এই পুণ্যময় ভারতভূমে হিন্দুরমণীগণ
গার্হস্থ্য আশ্রমের কেন্দ্রস্বরূপা; সমগ্র পরি-
জনকে একতা ও সমতা সূত্রে আবদ্ধ করিয়া
রাখিতে, পতি, পুত্র প্রভৃতিকে সংসারাশ্রমে
আবদ্ধ করিতে রমণীই মাধ্যাকর্ষিণী শক্তি
স্বরূপিণী। সংসার আশ্রমে রমণীই গৃহের
শোভা, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—"স্ত্রীয়-শ্রীয়শ্চ
গেহেষু"; স্নেহ, মমতা, দয়ার আধার। রমণী-
শূন্য গৃহ অরণ্য সমান। "ন গৃহং গৃহমিত্যা-
হুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" যেহেতু "তয়াহি সহিতঃ
পুরুষ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান সমশ্নুতে"; গৃহে পুরুষের
সকল কার্য্যে ধর্ম্মকর্ম্মে রমণীই একমাত্র
সহায়। সংসারে অপরের অস্তিত্বের সহিত
আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়া নিঃস্বার্থ
ভাবে চলিতে রমণীর তুল্য কেহ নাই। তাঁহারা
আপনার সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসিনী। সংসারে
রমণী সুখে দুঃখে অদ্বৈত ভাব-সম্পন্না সকল
অবস্থায় স্বামীর অনুগুণা, বিপদে, শোকে,
বার্দ্ধক্যে আশ্রয় ও বিরাম স্থল; ইহাই
হিন্দু রমণীর রমণীত্ব। * ভগবান্ রামচন্দ্র
রামময় জীবিতেষু জনকনন্দিনী—প্রেমময়ী
বনিতার অদ্ভুত, অতুলনীয় গুণগ্রামে মুগ্ধ
হইয়া, তাঁহার পবিত্রতা-পূর্ণ রমণীত্ব দর্শনে
বলিয়াছিলেন,—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ
অসাবস্যাস্পর্শো বপুষি বিপুলশ্চন্দন রসঃ।"

এই জন্যই এই সকল মহৎ গুণে বিভূষিতা
থাকায় হিন্দু ললনাগণ চিরদিনই জগতে
পূজনীয়া, আদরণীয়া হইয়া আসিয়াছে।
আর যে গৃহে রমণীগণ এইরূপে আদৃতা হইয়া
অধিষ্ঠিতা, সকল দেবতাই তথায় বিরাজমান। †

এক্ষণে দেখা যাউক যে,জীবজগতে রমণী-
গণের প্রকৃত অবস্থা বা সম্বন্ধ কিরূপ। জীব-
জগতের রমণীই আদ্যাশক্তি। সৃষ্টিকার্য্যে—
জীবোৎপত্তি-কল্পে রমণীই প্রধানা। জীব-
স্রোতঃ রক্ষা করিতে, একমাত্র রমণীই
সমর্থা। রমণীই জীবের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির
আধার স্থল। উৎপত্তির মূল চারি প্রকার;
স্বেদজ, উদ্ভিজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। এই
জরায়ু একমাত্র স্ত্রীজাতিরই সম্পত্তি; মানব
সেই জরায়ুজ জীব। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত
হইয়াছে যে, রমণীই জননী—রমণীই জায়া;
এবং সেই রমণীই আদ্যাশক্তি বা আদ্যা-প্রকৃ-
তির অনুকৃতি। ‡ কিন্তু পরিতাপের বিষয়,

* অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ।
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যোরসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং।
(উ, রা, চ।)

† "যত্র নার্য্য প্রপূজ্যন্তে বসন্তি তত্র দেবতা।"

‡ "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

এ সম্বন্ধে বহুল আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধে বৎসামান্য আভাষ মাত্র দেওয়া গেল। (লেখক।)

আমরা অধুনা রমণীগণকে সে ভাবে দেখি না বা গ্রহণ করিতে জানি না, সুতরাং বর্ত্তমান শতাব্দীর রমণীগণ তাহাদের ঊর্দ্ধতন মাতৃ-মাতামহী প্রভৃতি রমণীগণের সেই সকল সদ্‌গুণ হইতে পরিভ্রষ্টা হইয়া পড়িয়াছে। স্বার্থপরতা, সোদরম্ভরিতা, বিলাসিতা এক্ষণে তাহাদিগের জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছে। পূর্ব্বকালের সে শিক্ষা, দীক্ষা, মনের উদারতা প্রভৃতি অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; এখন রমণী—'রমণী' মাত্র,—গৃহের বিলাস-সামগ্রী। যাঁহারা একদিন গার্হস্থ্য আশ্রমের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিল, এক্ষণে তাঁহারা গৃহের চিত্রস্বরূপা; যাঁহারা একদিন গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করিতেন, স্নেহময়ী, কল্যাণী, পরার্থপ্রাণা, ধর্ম্মৈকশরণা জগদ্ধাত্রীরূপিণী ছিলেন, এখন তাঁহারা আত্মনিরতা, রঙ্গপরায়ণা, বিলাসিনী হইয়া পড়িয়াছেন। হায়! কি দোষে আজ ভারতের সে পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত হইল, এই দশা-বিপর্য্যয় ঘটিল?

এই সকলের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক আলোচনা করিতে হইবে। রমণীগণের এতাধিক অবনতির কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ, কন্যাগণের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা; অর্থাৎ কন্যাদিগকে উপযুক্তভাবে সু-শিক্ষা প্রদান না করা। পূর্ব্বকালে সকল পিতামাতা, পুত্রগণের ন্যায়—আপনাপন কন্যাগণকেও শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং এইরূপ শিক্ষা, অর্থাৎ সকল বিষয়ে সদ্‌গুণশালিনী করিবার জন্য সু-শিক্ষা প্রদান করা, পিতামাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইত। পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে, কন্যাগণের বিবাহের পূর্ব্বে (বরের ন্যায়) বরপক্ষ, কন্যার গুণগ্রাম দেখিতেন; কন্যা সৎকুলসম্ভবা, সর্ব্বসুলক্ষণা, সুশীলা, ধর্ম্মচারিণী, রূপবতী, এই সকল সম্যক দেখিয়া সেই কন্যাকে গৃহে আনিতেন। ফলতঃ কন্যাগণকে উত্তমরূপে গঠিত করিবার জন্য তদুপযোগী শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করা পিতামাতার অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত।

তৎকালে, অনেকস্থলে কন্যাদের স্বাধীনতা ছিল, এমন কি, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা আপনাদের উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইত; পরন্তু, পিতা মাতা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কন্যাকে রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া এবং উপযুক্ত দান ও যৌতুক দিয়া সম্প্রদান করিতেন। কিন্তু কালধর্ম্মের প্রভাবে সেদিন গত হইয়াছে; অধুনা সমাজে যুগ পরিবর্ত্তনবশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথা প্রচলনে, সমাজের যে কোন বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে বা হইতে পারে, এরূপ বোধ হয় না; বরং আজকালকার সমাজের হিসাবে, এ প্রথা মঙ্গলজনক বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এখন আর আমাদের সে সমাজ নাই, সেরূপ শিক্ষা, দীক্ষা নাই, নরনারীগণের সে সংযত ভাব নাই; সু-শিক্ষা অভাবে নরনারীগণ এক্ষণে যাদৃচ্ছাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ সেই সকল রমণীগণ প্রসবিত অধঃস্তন সন্ততিগণের যে অধিকতর অধঃপতন হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

এই সকলের অপর কারণ আমাদিগের ঔদাস্য। আমরা নিজেই বিলাস বিভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া, রমণীগণকে বিলাসের সামগ্রী

করিয়া তুলিয়াছি; আত্ম-চিত্ত-রঞ্জনের জন্য রমণীগণকে কুসুম-রূপিণী বিনোদিনী ভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছি। সুশিক্ষা প্রদান করি না বা প্রদান করিবার প্রয়াস পাই না; আর সুশিক্ষা যখন আমরা নিজেই অবহেলা করিয়াছি, তখন কেমন করিয়া আমরা আমাদের কন্যাগণকে সুশিক্ষা প্রদান করিব? সুতরাং আমাদের পরবর্ত্তী সন্তান সন্ততীগণ যে আরো হীনমতি, স্বার্থনিরত ও অধঃপতিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? এক্ষণে আমাদের সমাজের দিন দিন যেমন অধঃপতন হইতেছে—রমণীকুলের যেরূপ চিত্ত ও মতির পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে,যদ্যপি আমরা এখন হইতে প্রতিকার সাধনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আমাদের সমাজের কি শোচনীয় পরিণাম হইবে, তাহা চিন্তাশীল মানব মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম।

চিন্তাশীল মানবগণ, যাঁহারা প্রাচীনতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ প্রাচীনের পক্ষপাতী। কারণ প্রাচীনের গৌরব চির আদরণীয়। আর প্রাচীনের স্মৃতি ব্যতীত বর্ত্তমানের অবনতি নিবারণের অন্য কোন সুলভ পন্থা নাই। যে সমাজ প্রাচীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে, সে সমাজই উন্নত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমাজ উন্নতির অন্যতম উপায় ধর্ম্ম। যে সমাজ—যে জাতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত বলীয়ান, সে সমাজ—সে জাতি ততই উন্নত। পূর্ব্বে সমাজ সর্ব্ব বিষয়ে সু-দৃঢ় ছিল, সুতরাং তৎকালে রমণীগণও ধর্ম্ম কর্ম্মে নিষ্ঠাবতী, গার্হস্থ্য বিষয়ে লক্ষ্মীস্বরূপিণী—সকল শ্রেষ্ঠ গুণের আধার-ভূতা ছিল। আজকাল আর তদ্রূপ রমণী প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেকেই ধর্ম্ম ও আচার-বিহীনা—সত্ত্বগুণ-বিবর্জ্জিতা। সুতরাং ধর্ম্মাচার-ভ্রষ্টা রমণীগণের দ্বারা গার্হস্থ্য বা সামাজিক উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকেই সু-শিক্ষিত, প্রত্নতত্ত্ব অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন; এবং দিন দিন আমাদের সমাজের কিরূপ অধঃপতন হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা তাঁহারা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ,সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে আর্য্য ছাঁচে গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বাল্যকাল হইতে রীতি, নীতি, সাংসারিক ব্যবহার ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে সুশিক্ষা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপে সু-শিক্ষা ও ধর্ম্মের বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে, কালে যে তাহা হইতে সুফল প্রসব করিবে, এরূপ আশা করা যায়, এবং তদ্দ্বারা যে ভারতের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে এবং ভারতের হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে, সীতা, সতী, সাবিত্রীর ন্যায় আদর্শ রমণী বিরাজ করিয়া ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত?

শ্রীআনন্দ-গোপাল ঘোষ।

রবি-কীর্ত্তি

আমি রবিকীর্ত্তি নামক প্রাচীন কবির কথা বলিতে বসি নাই; এ কালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের একটা কীর্ত্তির কথাই বর্ণনা করিব। গোপিনীরা সে কালে কৃষ্ণ-কলঙ্ক যমুনার জলে ধৌত করিয়াছিলেন; আমরা উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী বাঙ্গালী, পঞ্জাবের পূর্ব্ব সীমান্তে আসিয়া পড়িয়া, বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানের কলঙ্কটুকু ঐ যমুনার জলে প্রায় ধুইয়া বসিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের একদিনকার প্রতিবেশী "প্রবাসী" কবি রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া সে কলঙ্ক ঘুচাইতে দিতেছেন না। যখন কবির ক্ষুদ্রায়তন "শব্দতত্ত্ব" গ্রন্থ বেঙাচির মত সাহিত্য-সরস্বতীতে সাঁতার দিল, তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, অচিরাৎ লেজ পরিহার করিয়া উহা লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিবে।

কিন্তু এযে বেজায় লম্ফ! ভাষার phonology প্রভৃতির সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিরঙ্কুশ কবির ব্যাকরণ অতি দীর্ঘ লম্ফ দিতেছে। 'গোটা' শব্দের 'গো' বধ করিয়া একটা নির্দ্দেশক 'টা' জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যদিও উহার জ্ঞাতি 'ঠো' উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কোন 'গো'-বংশজাত নহে। একালের গোরক্ষিণী সভার প্রযত্নে ঐ বিচ্ছিন্ন 'টা' আবার গোটা হইয়া উঠিতে পারিবে কি?

কোন্ স্বর-বিজ্ঞানের নিয়মে 'গোটা' শব্দটী বহুবচনে 'গুলা' হইয়া উঠিল, রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে তাহার একমাত্র নির্দ্দেশ এই দেখিলাম যে, যিনি লিখিতেছেন, তিনি রবীন্দ্র নাথ। এ প্রমাণ আজি কালির দিনে অকাট্য হইলেও, আমরা পাঠকদিগকে কবির মতের সমর্থনে দু'চারিটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। "গোটা" শব্দের বহুবচনে যেমন "গুলা", তেমনি কোটা (ভানা) শব্দের বহুবচনে হইয়াছে কুলা, কেন না অনেক ধান ভানিলে কুলার প্রয়োজন হয়, মোটা শব্দের বহুবচনে হয় মূলা; কেননা একালের সটনের বীজে মূলা বৃদ্ধি হইলেই মোটা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আদর অর্থ বুঝাইলে "খানা" প্রয়োগ হয় বলিয়া কবি নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়া "প্রদীপখানা" লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অতি আদরের নাকখানা, কাণখানা বজায় রাখিতে গেলে উহার অনুকরণ করা চলে না। কবি সর্ব্বদাই আপনার ইচ্ছামত ভাষা গড়িয়া আসিয়াছেন; তাঁহার "খেয়া" গ্রন্থের উৎসর্গে "লজ্জাবতী লতার" সহিত মিলাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন—"ফুলগুলি সব নীলনয়নে কোন্ খেয়ানে রত।" কবির চক্ষে ফুলগুলির সৌন্দর্য্য রমণীরূপ সূচিত করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে খাঁটি স্ত্রী করিয়া তোলা কেবল রবীন্দ্রবাবুর সাহসেই কুলায়। তিনি সিন্ধুকেও রমণী সাজাইয়াছিলেন। হয়ত বা একদিন আকাশটীকে আকাশিকা করিয়া লইবেন। এ সংসারে স্ত্রী না হইলে চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া সকল পুরুষকেই দীর্ঘকেশে ভূষিত করিয়া স্ত্রী করিলে চলিবে কেন?

ভাষার এই অবধি নিরঙ্কুশ প্রলম্ফ, পূর্ব্বে

পূর্ব্বে "সাহিত্য"-সম্পাদক একটু দমন করিতে চেষ্টা করিতেন; তিনি হয়ত এখন "মৌনং হি শোভনং" বলিয়া গা-ঢাকা দিয়াছেন। তিনি চুপ করিয়া আছেন, কিন্তু আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি যে, রবীন্দ্রবাবুর কোন কোন ভক্ত আমার এ প্রবন্ধ পড়িয়া অস্ত্র শাণাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে একবার একজন কৃতী লেখক যখন রবীন্দ্র বাবুর রচনাবিশেষের সমালোচনা করিয়াছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে আসরে না নামিয়া কয়েকজন ভক্তকে রণসাজে সজ্জিত করিয়াছিলেন। মকরাক্ষ যখন যুদ্ধে নামিয়াছিল, তখন—"রথেতে আনিয়া গোরু বাঁধিল বিস্তর"। গো-বধ ভয়ে কেহ অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে পারিল না বলিয়া মকরাক্ষের ক্ষণিক জয় হইয়াছিল; একথা কৃত্তিবাস লেখেন। যত যুক্তিযুক্ত হইলেও রবীন্দ্রবাবু কাহারও এঁটো কথা শুনিবার লোক নহেন; ভক্তেরাও তাঁহার পন্থা ছাড়িবেন না। তবে সাধারণ পাঠকেরা এই অদ্ভুত ব্যাকরণ পড়িয়া যাহাতে ভ্রমে না পড়েন, সেইজন্য প্রবন্ধটী লিখিলাম।

ভাগ্যক্রমে প্রবন্ধগুলি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইতেছে। অন্য পত্রিকায় যদি প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে 'প্রবাসী'র কর্তারের স্পর্শে ঐ অসার ধাতু সোণা বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার সে যশ বঙ্গভাষায় অক্ষুণ্ণ রহিবে, মনে করি। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন অনধিকার চর্চ্চায় ব্যাপৃত হইয়া অদ্ভুত সাহিত্যের সৃষ্টি না করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য।

বল্লাল সেনের তাম্রশাসন।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বেণোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত বল্লাল সেন-প্রদত্ত একখানা তাম্রশাসনের অনুলিপি ও তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তাহার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সেনবংশের যে সকল তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু ইহাতে ঐতিহাসিকতত্ত্ব অতি অল্পই আছে। ইহা হইতে এইমাত্র জানা যায় যে, বল্লাল সেনের পূর্ব্বপুরুষ রাজপুত্রগণ রাঢ়া নগরীতে বাস করিয়া সদাচারচর্য্যার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতার নাম বিলাস দেবী ছিল। এই রাঢ়া নগরী কোথায় ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়া নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"গৌড়ং রাষ্ট্রং অনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।" ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাঢ়াপুরী গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। বোধ হয়, এই নগরী রাঢ়-দেশের রাজধানী ছিল। পরে বিজয় সেন গৌড় অধিকার করিলে ইহা গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত হয়। উমাপতি ধর-বিরচিত বিজয় সেনের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, সেন বংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেন দাক্ষিণাত্যের রাজা ছিলেন এবং তৎপুত্র সামন্ত সেন কর্ণাট-লুণ্ঠনকারীদিগকে মর্দ্দন করেন ও শেষবয়সে গঙ্গা পুলিনে বাস করেন। মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনেও আভাস পাওয়া

যায় যে, সামন্ত সেন শেষবয়সে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া শোণিতসিক্ত তরবারি গঙ্গাজলে ধৌতকরতঃ গঙ্গাতীরে বাস করেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, বীর সেন ও সামন্ত সেন কর্ণাটরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। সামন্ত সেন শেষবয়সে কোন কারণে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। সম্ভবতঃ এই রাঢ়ানগরীতেই তিনি ও তাঁহার বংশধর হেমন্ত সেন ও বিজয় সেন বাস করেন ও সদাচারচর্য্যার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এই নগরী গঙ্গাতীরে অবস্থিতা ছিল।

এই তাম্রশাসনের সময় সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তিনি লিখিয়াছেন যে, ৫১৪ সন হইতে লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। "রাজ্যারম্ভ হইতেই যে অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছে, ইহা নিশ্চিতই ধরা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ৫১৪ সনে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব আরম্ভ এবং কাজেই ঐ সনেই তৎপিতা বল্লাল সেনের রাজত্বের শেষ।" স্থূলতঃ বল্লাল সেনের রাজত্ব ৫০ বৎসর অনুমান করিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে, ৪৬৪ সনে বল্লাল সেনের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং তাম্রশাসন তাঁহার রাজত্বের একাদশ বর্ষে অর্থাৎ ৪৭৫ সনে (১০৬৮ খ্রীঃ অব্দে) প্রদত্ত হয়।

উল্লিখিত নির্দ্ধারণ অনুসারে ১০৫৭ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকৃত দানসাগর ১০৯১ শকে (১১৬৯ খ্রীঃ) রচিত হয় (১) ইহাতে বোধ হয় তিনি অন্ততঃ ১১৬৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তদনুসারে তাঁহার রাজত্বকালই ১১২ বৎসর হয়। আর ১২০৩ খ্রীঃ মুসলমানদিগের দ্বারা নবদ্বীপ অধিকৃত হয় ও লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করেন। অতএব লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব ১১০৬ খ্রীঃ হইতে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরিলে প্রায় ৯৮ বৎসর হয়। উভয়ের এত দীর্ঘকাল রাজত্ব সম্ভবপর নহে, আর ৫১৪ সনে অর্থাৎ ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল সেনের রাজত্ব শেষ হইলে ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দানসাগরের রচনা কিরূপে হইতে পারে? লক্ষ্মণাব্দ ১১০৬ খ্রীঃ হইতে আরম্ভ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর বল্লাল সেনও যে ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহাও নিশ্চিত। এজন্য ঐতিহাসিকগণ উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বল্লাল সেন ১১০৬ খ্রীঃ মিথিলা দেশ জয় করেন এবং সম্ভবতঃ সেই সময়ে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার নামানুসারে লসং বা লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত করেন। বল্লাল সেনের রাজত্বকাল ৫০ বৎসর ও তাহার শেষ ১১৬৯ খ্রীঃ ধরিলে, ১১১৯ খ্রীঃ তাহার রাজত্ব আরম্ভ হয়, তদনুসারে ১১৩০ খ্রীঃ এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

(১) পূর্ণে শশিনবদশমীতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ।

শোকোচ্ছ্বাস।

ভারতের আদর্শ-নৃপতি, কুচবিহারাধিপতি মহামান্য হিজ হাইনেস্ দি মহারাজা বাহাদুর জি-সি, আই-ইর মৃত্যুপলক্ষে।

ক'য়ে গিয়েছিল কে যেন আগেই নিঠুর সম কাণে,
"জ্বেলেছিস্ যেই আশার বহ্নি নিভিবেরে অবসানে।"
তাও আমি ওরে অন্ধ প্রেমেতে করি সে বাক্যে হেলা,
বিশ্বাস দিয়ে প্রাণের আবেগে রচেছিনু এক ভেলা।
বিশ্বাস-ভেলা, আশার-সাগরে ডুবে গেল মোর আজ;
তারি কথা হায় সত্য হইল নির্দ্দয় যেন বাজ!
বেদনা-বিদ্ধ বিকল পরাণ, পদ-লাঞ্ছিত ক্ষীণ হিয়াখান,
বজ্রের সম হুতাশে মর্ম্ম গেলরে ফাটিয়া তার,
বুঝিলাম খাঁটি, অভাগার শুধু সম্বল আঁখিধার!
অমনি হানিয়া বাজ,
কে যেন কহিল "নাহি নৃপেন্দ্র, নাহি হায় মহারাজ!"

ভাষায় ফুটিতে কেঁপে উঠে যাহা,মনে চলে কাণাকাণি,
আজি, সত্য কি সেই বজ্র-বারতা এনেছিস যারে টানি।
অযুত লক্ষ পরাণ জুড়িয়া যাহার পূজার ঠাঁই,
জনক মোদের নর-সত্তম মহারাজ আজি নাই?
সত্যইতো রে চারিদিকে ওই উঠিয়াছে ক্রন্দন,
শঙ্কিত হ'য়ে কম্পিয়া যেন সরে গেছে হরষণ!
সে মহা শোকের নিশ্বাস ধরি.উদ্দাম বায়ু শন্ শন্ করি,
সাগর-প্রান্ত হ'তে এসেছে লয়ে সে ভীষণ কথা;
তরুরাজি মাঝে মর্ম্মর রবে 'শিহরি' উঠিছে ব্যথা।
কাঁদিছে সাগর-জল
আশ্রয়হীন অনাথের আজি আঁখি দুটী ছল ছল!

ওগো!
জনক মোদের, ভরসা মোদের,কোথা যাও,কোথা যাও;
আশ্রয়হীন সন্তান পানে বারেক ফিরিয়া চাও।
তুমি যাবে চলি' প্রবাসের দেশে পুণ্য-শরণী দিয়া,
মোরা যে ভ্রান্ত বুঝিনাকো তাহা, আঁখি যায় বরষিয়া!
মোরা যে মূর্খ, মোরা যে বালক, মোদের আছে কি জ্ঞান?
অশ্রু ফেলিলে মরণের মাঝে হয় যে অকল্যাণ!
দার্শনিকের তত্ত্ব বচনে,কাজনাই সে মোর কঠোর জ্ঞানে,
অজ্ঞতা ভালো তার চেয়ে যদি অশ্রু থাকেরে তায়;
শুধু একফোঁটা অশ্রু পরশে পাষাণ গলিয়া যায়।
মোরা, ক্ষীণ দুর্ব্বল প্রাণ;
অশ্রুই যেগো দুর্ব্বল পাশে পরম মূল্যবান।
তবে,
তোমার বাসনা হউক পূর্ণ,তাই হোক তাই হোক,
তুমি যাও চলি, চিরক্রন্দন মোদের মাঝারে রোক্।
ক্রন্দন শুনি যেন চিরদিন লইয়া অশ্রুধার,
তোমার চরণে পারে ঢালিবারে প্রেমের অর্ঘ্যভার!
মোদের দুঃখে ব্যথা জ্বালা তব হোক সব অবসান,
অশ্রুর সনে ধন্য হউক মোদের দীর্ণপ্রাণ।
যাও তুমি তবে সাধকের মত, এদীনের শির হোক অবনত,
ভারত-জোড়া সে সম্ভ্রম-তলে, নীরবে গোপন সম,
জানিবে না আজি কেহ মোর পূজা হে নর শ্রেষ্ঠতম;
ওহে নৃপসত্তম মোর!
তুমিই জানিবে মোর এ পূজন নীরব অশ্রুলোর!

ওগো,
গর্ব্ব মোদের, সাধনা মোদের, যাও তবে যাও চলি;
ছলিবারে শুধু এসেছিলে তুমি, আজিও যাইছ ছলি।
মৃত্যুর আগে সহিয়াছ বটে ব্যাধি-যন্ত্রণা-ক্লেশ,
তবু সান্ত্বনা, বীরের মতন মরেছ বীরের দেশ!
বীরের নিকটে ওর চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ কি ধন আছে,
এ মরণ মাঝে সে মহামন্ত্র সফলতা লভিয়াছে।
মোরা যে মূর্খমতি চঞ্চল, মহা অজ্ঞান বালকের দল,
হে মহামহান! মোরা কি তবে বুঝিব অর্থ তার;
তাই,
বুকফাটে আজি স্মরি তোমা সেই সুদূর সাগর পার!
তবু, গর্ব্ব, এ শোক-শেষে;
তুমি, বীরের মতন গৌরব রাখি মরেছ বীরের দেশে!

শ্রীগৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রামচন্দ্রের মিত্র।

রামচন্দ্রের বিচার-ব্যাপারে যেরূপ অদ্ভুত ব্রাহ্মণ-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, সুখের বিষয়, তাঁহার মিত্রতার মধ্যে সেরূপ কিছু নাই। রাবণ-বধ ঐতিহাসিকই হউক আর কাল্পনিকই হউক, একটী বিচিত্র ব্যাপার। ইহার মূলে যদি কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকে, নির্ব্বাসিত ক্ষত্রিয়—রাজপুত্র যদি সত্যই বর্ব্বর জাতির সহিত মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হইয়া প্রচুর সৈন্যবল সংগ্রহ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় বর্ব্বর-রাজের দুর্বৃত্ততার প্রতিশোধ দিয়া থাকেন, তবে বলিতে হইবে, ইতিহাস তাহার সমতুল্য অপর কিছু উপস্থিত করিতে অক্ষম—সত্যই রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব। আর যদি উপাখ্যানটী কাল্পনিক হয়, তাহা হইলেও ইহা বিচিত্র কল্পনা, কাব্যজগতে ইহার সমকক্ষ কল্পনা আর কোথাও মিলিবে না।

ঐতিহাসিকই হউক, আর কাল্পনিকই হউক, রামচন্দ্রের এই বিজয় কাহিনী পাঠকের নিকট এমন একটী আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে, যাহা হইতে ভারতে আর্য্য-প্রভাব-বিস্তারের একটী প্রণালী সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতে পারে।

রামচন্দ্র বনভ্রমণ কালে যেখানে যে আর্য্য ঋষির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই পাদবন্দনা দ্বারা সম্মাননা করিয়াছেন, তাঁহারই উপদেশ গ্রহণ করতঃ নিজের গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইয়াছেন। বয়োবৃদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বীরাই তাঁহার উপদেষ্টা; কিন্তু কর্ম্ম-জগতে তাঁহার মিত্র—গুহ, সুগ্রীব ও বিভীষণ, নিষাদ, বানর ও রাক্ষস। বলা বাহুল্য, রামায়ণে বর্ণিত নিষাদ, বানর, ভল্লুক ও রাক্ষস, বিবিধ সামাজিক স্তরের অনার্য্য জাতি। ইহা স্থির যে প্রথমতঃ আর্য্য অনার্য্য, শুক্ল ও কৃষ্ণ, সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু বিশাল অনার্য্য দেশে কেবল খাদ্য খাদক সম্বন্ধ ও ধনুর্ব্বাণ মাত্র সম্বল থাকিলে ক্ষুদ্র আর্য্য উপনিবেশ টিকিতে পারিত না। আর্য্যনেতৃগণ নানা প্রকারে অপেক্ষাকৃত নম্র বা সভ্য অনার্য্যগণকে স্বীয় সামাজিক অবয়বের অংশীভূত করিতেছিলেন, আর্য্যরাজগণ সময়ানুযায়ী সাম ও ভেদ নীতির প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় সামরিক বল বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এইরূপ নীতিরই পরাকাষ্ঠা আমরা রামচন্দ্রে দেখিতে পাই। রূপ, গুণ, কুল ও শীলে যেমন তিনি অদ্বিতীয়, অনার্য্য অসভ্য জাতিকে আর্য্যের কার্য্যে নিয়োগ করিতে, আজীবন তাহাদের সহিত সখ্যভাব রাখিতেও তদ্রূপ। এরূপ সখ্য অনেক সময়ে স্বার্থ-প্রণোদিত হইতে পারে, কিন্তু নৈতিক উদারতা ব্যতীত ইহা অসম্ভব। নিষদকে অস্পৃশ্য মনে করিলে গুহ কখন রামচন্দ্রের "আত্মসমঃ সখা" হইতে পারিতেন না; তাঁহার সহিত আলিঙ্গন স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে পরিচালিত হইলে হয়ত জগৎ তাহার কথা কখনও কর্ণগোচর করিত না; সুরতরঙ্গিণী পার হইতে হয়ত রামচন্দ্রকে বৃক্ষ-বল্কল লইয়া অনেকদিন স্থাপত্য বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইত, ভরতও স্থানান্তরে বিপুল নাওরা মহলের বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য

হইতেন; চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ের পরিবর্ত্তে ভীমপরাক্রম কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য সৈন্য আর্য্যরাজকুমারের গতি প্রতিরোধ করিতে আসিত।

ইহার স্থলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, নিষাদরাজ গুহ উচ্চতর সামাজিক জগতের আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্রের সহিত আলিঙ্গন সুখে রোমাঞ্চিত, রামচন্দ্রের সেবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল, রামচন্দ্রের চরণে তাঁহার মস্তক আপনা হইতেই অবনত। দেখিতে পাই, রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য যখন ভরত বিশাল রাজপরিবার ও চতুরঙ্গদলের সহিত গঙ্গাতীরে উপনীত, তখন গুহের বিপুল নৌবল সেই বিপুল জনসঙ্ঘের পরপারে উত্তরণের পরিচালক। উচ্চশ্রেণীর মানব যখন দেশকাল পাত্র বিবেচনা করতঃ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক নিম্নশ্রেণীর মানবকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করে, তখন এইরূপই ঘটিয়া থাকে—অনিষ্টচিন্তা উপচিকীর্ষায়, নৃশংসতা কৃতজ্ঞতায় পরিণত হয়। কোশল-রাজ্যের প্রান্তদেশে এইরূপ একটী অনার্য্য মিত্র রাজের অবস্থিতি যে রাজনৈতিক হিসাবে কতদূর বাঞ্ছনীয় ছিল, তাহা বর্ত্তমান শিক্ষা ও বিজ্ঞানের যুগেও অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতেই রামচরিত্রের বিশেষত্ব বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অসহায়, কানন-প্রবাসী, হৃতদার রামচন্দ্র বনচারী হনুমানের নিকট সুগ্রীবের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বুঝিলেন, তাঁহার ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সুগ্রীবই উপযুক্ত মিত্র। সুগ্রীব ও হনুমান বানরাকৃতি অনার্য্যবংশসম্ভূত হইলেও নানা দেশ পর্যটন করতঃ অনেকটা আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারাও বুঝিলেন, রাম ও লক্ষ্মণের ন্যায় বিক্রান্ত আর্য্যবীরের সহায়তায় অনেক কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। উভয়পক্ষের স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে সামাজিক বৈষম্য বিদূরিত হইল। রামচন্দ্র সস্নেহে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন, অগ্নি প্রদক্ষিণ করতঃ বানর-প্রতিম অনার্য্যজাতির অন্যতর নেতা সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইলেন। কূট যুদ্ধে বালী পরাজিত হইল, কারণ তখনও সুগ্রীব নির্ব্বাসিত, তাঁহার সৈন্যবল বালীর আয়ত্ত। সুগ্রীবই কিষ্কিন্ধ্যার রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন; অনার্য্যের বিপুল সংখ্যা ও ভুজবল আর্য্যের মস্তিষ্কবল ও ধনুর্ব্বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া অনার্য্য রাক্ষসরাজের বধকার্য্যে নিয়োজিত হইল। কিষ্কিন্ধ্যাপতির সহিত অযোধ্যা-রাজকুমারের ব্যবহারে যেন আমরা তাৎকালিক আর্য্য-জগতের মিত্রের অনার্য্যরাজের সহিত ব্যবহারের একটী উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। কখনও সম্পূর্ণ সখ্যভাব, কখন গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত—উন্নতভাব, কখন মধুরবাক্যে মনস্তুষ্টি, কখন কর্ত্তব্য-জ্ঞানোদ্রেকের জন্য কঠোর বাক্যপ্রয়োগ বা ভীতিপ্রদর্শন—কিন্তু সর্ব্বত্রই উপদেশ, স্নেহ ও উদারতা। অনার্য্য সমাজের আভ্যন্তরিক রীতিনীতিতে সহসা হস্তক্ষেপ আর্য্যসমাজ সঙ্গত মনে করে নাই, সীতাদেবীর পতি হইয়াও রামচন্দ্র সুগ্রীবের তারা গ্রহণে কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই।

সুগ্রীব কায়মনোবাক্যে রামচন্দ্রের কার্য্যোদ্ধারে মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের প্রভু ও সখা—সুগ্রীবের সেনাপতি ও অনুচরবর্গ রামচন্দ্রের সেবাপরায়ণ, সাম্য, উদারতা ও সস্নেহ ব্যবহার, অপেক্ষাকৃত নিরীহ অনার্য্য বীরগণ আর্য্যের সাহায্যে

বদ্ধপরিকর। কিন্তু এখানেই মিত্রতার শেষ সীমা পৌঁছিল না। লঙ্কার অপরপারে অবস্থান কালে রাক্ষসরাজ রাবণের কণিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আবার অনার্য্যে অনার্য্যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ, আবার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পক্ষ আর্য্যবীরের সাহায্যাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু এবার ফলমূলভোজী বানরপ্রতিম অনার্য্য নহে, মদ্যমাংসপ্রিয় নৃশংস রাক্ষস, রাজভ্রাতা আর্য্যের দ্বারে আশ্রয়-প্রার্থী। রাজনীতিজ্ঞ রামচন্দ্র কি গৃহচ্ছিদ্র অবগত হইবার এ সুযোগ ছাড়িয়া দিবেন, রাক্ষসরাজের ভ্রাতা বলিয়া কি বিভীষণকে অবিশ্বাসের অতলজলে বিসর্জ্জন দিবেন? মন্ত্রণা-সভা বসিল। সুগ্রীব বিভীষণকে অবিশ্বাস করিলেন, তাঁহাকে শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচর জ্ঞান করতঃ বধের পরামর্শ দিলেন। অঙ্গদ বিভীষণের দোষ গুণ বিচার করতঃ অবস্থানুসারে তাহাকে পরিত্যাগ বা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। শরভ-চরিত্র পরীক্ষার জন্য বিভীষণের নিকট দূত প্রেরণের ব্যবস্থা দিলেন। জাম্বুবান্ জানাইলেন, তাঁহার বিবেচনায় বিভীষণ রাবণ-প্রেরিত, সুতরাং তাঁহার সহিত মিলন বিপজ্জনক। মৈন্দ-গুপ্তচর দ্বারা বিভীষণের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। হনুমান্ বলিলেন, এই সময় মধ্যে চরদ্বারা বিভীষণের চরিত্র অবগত হওয়া অসম্ভব, কোন অজ্ঞাত দূত নিকটে উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ বিভীষণ তাহাকে সন্দেহ করিলেন, মনোভাব জানিতে দিবেন না, বিভীষণ সম্ভবতঃ রাবণের দুশ্চরিত্রে বিরক্ত এবং বালি-বধ ও সুগ্রীবের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বয়ং সেইরূপ রাজ্য প্রাপ্তির আশায় আসিতেছেন, তাঁহাকে গ্রহণ করাই উচিত, কিছুদিন ব্যবহার করিলেই তাঁহাকে চিনিতে পারা যাইবে। রামচন্দ্র ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, বিভাষণ যখন মিত্রতা করিতে আসিয়াছে, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য।' সুগ্রীব উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি বিপৎকালে ভ্রাতাকে এইরূপে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারে, তাহার পৃথিবীতে এমন কে আত্মীয় হইতে পারে, যাহাকে সে বিপৎকালে আবার পরিত্যাগ করিবে না? রামচন্দ্র লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে বুঝাইলেন, রাবণ বিভীষণের ভ্রাতা ও লঙ্কার রাজা, রাবণের বিনাশ ও রাজ্যক্ষয়ে বিভীষণের লাভ, রামচন্দ্র বা সুগ্রীবের রাজ্য কদাচ তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না, লক্ষ্মণ বা ভরতের ন্যায় ভ্রাতা জগতে অধিক মেলে না। সুগ্রীবের অবিশ্বাস ইহাতে বিদূরিত হইল না, তিনি আবার বলিলেন, বিভীষণের নিগ্রহই শ্রেয়ঃ। রামচন্দ্র আবার বুঝাইলেন, তাহার অনিষ্ট সাধন বিভীষণের ক্ষমতার আয়ত্ত নহে, অথচ বিভীষণ শরণাগত, শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করা ধর্ম্মসঙ্গত। সুগ্রীবের মত পরিবর্ত্তিত হইল, বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকট আনীত হইলেন। রামচন্দ্র বিভীষণের নিকট লঙ্কার বলাবলের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যপ্রদান অঙ্গীকার করিলেন এবং তখনই সমুদ্রজলে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। বিভীষণের রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এইরূপ ইন্ধন সংযোগে প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি রামচন্দ্রের পরম মিত্র ও স্বজাতির পরম শত্রুরূপে সুগ্রীবের ন্যায় আক্রমণকারীদলের শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত গুপ্তচরে যে কার্য্য সাধিত না হইত, বিভীষণ দ্বারা তাহা হইল। যুদ্ধান্তে কিষ্কিন্ধ্যার ন্যায় লঙ্কাও আর্য্যের মিত্ররাজ্য পরিণত হইল।

ইউরোপে বিবিধ প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির ন্যায় ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্য কখন একেবারে মিশিয়া যায় নাই, সময়ে সময়ে হয়ত অনার্য্য আর্য্যে পরিণত হইয়াছে, যৌনসম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এরূপভাবে যে, কালে সাধারণের অলক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণতঃ বিশাল অনার্য্যসমাজ আর্য্যসমাজের শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়াও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছে, আর্য্যসমাজের অঙ্গীভূত হইয়াও তাহার সহিত একীভূত হয় নাই। এই অবস্থা কেবল সামাজিক ব্যবস্থায় ঘটে নাই। যে সময় হইতে মৈত্রীর সূত্রপাত, সে সময়ে সামাজিক বৈষম্য এতই প্রবল যে, তাহার সম্পূর্ণ তিরোভাব সম্ভব ছিল না। উদার আর্য্য-নেতৃগণ যতদূর সম্ভব, সেই বৈষম্য দূর করতঃ বিশাল সমাজতরু শাখাপল্লবে শোভিত করিয়া তুলিতেছিলেন। যে প্রক্রিয়া দ্বারা নিষাদ, বানর ও রাক্ষস মানব যা আর্য্যের সেবায় নিয়োজিত, সে প্রক্রিয়া যে কেবল রামচন্দ্রে আবদ্ধ ছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই, তবে তাঁহার চরিত্রে ইহার আদর্শ পরিস্ফুট।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

দিবসে ও নিশায়।

সারাদিন, হে প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য তোমার
ধরিতে খুলিয়া রাখি হৃদয়-দর্পণ;
সারারাত্রি অতন্দ্রিতে রেখাগুলি তার
অতলে ডুবিয়া সদা করি অন্বেষণ!

হে রূপসি, যেই দেখা নয়ন মুদিয়া
মর্ম্মমাঝে, তাই যেন বুঝেছি দর্শন;
পরাঙ্মুখ ইন্দ্রিয়েরা মজে যা লইয়া
পরম বঞ্চনা যেন মোহের কারণ!

নীরব নিঝুম নিশা, ঝিল্লী গুঞ্জ ব্যথা—
মনের গভীরে শুনি তব মৃদু কথা;
সংসারের কোলাহল হইলে বিদূর
তব সুধারস পাই মরমে মধুর!

বুঝিয়াছি সাকারেই তুমি নিরাকারা;
তিলে তিলে স্পর্শ তব হৃদয়-সাগরে
ভাবেতে জমিয়া আসে, ভারতীর ক্রোড়ে
ফুটে যেন শুক্তি বক্ষে মুকুতার ধারা!

মহাগাথা জন্মে ওই বক্ষে গুরুভার
জাগ্রত হৃদয়ে শান্ত নিশীথিনি তীরে,
গভীর হইতে আসে প্রাণের গভীরে
অজ্ঞাতে গুপ্তের হতে বেদনা উদার।

অয়ি নিশা! রিম্ ঝিম্ নূপুর নিক্বণা
এস অয়ি! মধুমতী মতি বিকাশিনী,
এস অয়ি চিরবৃদ্ধা, অনন্ত-যৌবনা
অয়ি বিশ্ব প্রকৃতির আদিম জননী!

কতকাল ছিলে তুমি তোমাতে মজিয়া
স্থিতিহীন, ধৃতিহীন, অগম্য নিলয়
তোমার নিস্তব্ধপুরে শব্দ জনমিয়া
শক্তিতে জমিল কবে, দিক্ দিক্‌ময়!

জগতে জমিল কবে, শূন্য গর্ভোদরে
দেবতার শুক্রজ্যোতি হইল সঞ্চার?
জমিল বুদ্বুদ সম অনল সাগরে
এই সূর্য্য গ্রহ তারা জ্যোতিঃ পরিবার

জমিল সলিল বহ্নি পবন ও ক্ষিতি
জ্যোতির সপ্তর্চ্চিলীলা, জ্যোতির সন্তান,
ফুল ফল কিশলয়ে লতা বনস্পতি
চরাচর ভূতধাত্রী জ্যোতির বিধান!

আজি এই সুবিপুল বিশ্ববক্ষে ধরি
বিপুল ব্যোমন ব্যাপ্ত কেশ এলাইয়া
তনয়ারে লয়ে কোলে হে বিশ্বসুন্দরী
কি ধ্যানে নিরত তুমি নিস্তব্ধ হইয়া!

নরের প্রধান দীক্ষা সাথে স্তব্ধতার
পরিচয়, হে জননি আজন্ম শিক্ষক,
আজন্ম দীক্ষায় তব হৃদয় আমার
তোমার আঁধারপুরে অগ্নি-উপাসক!

লহ মোরে, লহ মোরে ডুবাও নিঃসার
তোমার অগাধ বক্ষে ওই স্তব্ধতায়;
শিশু যথা মাতৃবক্ষ উল্লাসী উদার
চাহিছে হৃদয় মম ঝাঁপিতে যাহায়!

যে জগতে বস্তু হতে বড় অনুভূতি,
সম্ভোগ হইতে বড় চিরকাল ধৃতি,
জনতার মর্ম্মপুরে গীতা স্তব্ধতার—
হে নিশা! তাহারে লভি বিজনে তোমার।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

শঙ্করাচার্য্যের মত।

(১) ঈশ্বরই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ—কার্য্যকারণের অনন্যত্ব।

'কারণ' কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আর্য্য এবং অনার্য্য, আধুনিক এবং প্রাচীন সকল শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মধ্যেই অত্যন্ত মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে কার্য্যের উৎপাদক শক্তি বিশেষের নামই কারণ। তাহাদের মতে আমাদের পুরুষকার ভিন্ন অন্য কোনরূপ শক্তিরই ধারণা আমাদের হয় না। এ জন্যই তাঁহারা বলেন, বিশ্বাত্মার পুরুষকারই জগতের সর্ব্বপ্রকার কারণ বা কার্য্যোৎপাদিকা শক্তিরূপে প্রকাশিত।* অনেকে আবার শক্তিই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত এবং নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বা ব্যাপার সমষ্টির নামই কারণ। এবং তাঁহাদের মতে কোন একটী অবস্থা বা ব্যাপার বিশেষকে পৃথক্ ভাবে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই ভ্রম। প্রাচীন যবন দার্শনিক আরিষ্টটেল (Aristotle) চারি প্রকার কারণ বিভাগ করেন; যথা—উপাদান (Material cause) (২) অবয়ব বা আকৃতি (Formal cause), (৩) নিমিত্ত (Efficient cause) এবং (৪) উদ্দেশ্য (Final cause) আধুনিক দার্শনিকগণ নিমিত্ত কারণকেই বিশেষভাবে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমাদের ন্যায় মতে "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যত্বে সতি নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্বং কারণত্বং।" কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তথাপি কার্য্যের অনুৎপাদক—এইরূপ ব্যাপারের নাম অন্যথা-সিদ্ধি—যথা ঘটরূপ কার্য্যসম্বন্ধে দণ্ডচক্রাদি অথবা কুলালের পিতা। এরূপ 'অন্যথাসিদ্ধি' নয়, অথচ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারকেই কার্য্যের কারণ বলা যায়। অর্থাৎ যে ব্যাপার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলেই কার্য্য হয়, (অন্বয়) এবং না থাকিলে হয় না (ব্যতিরেক) এরূপ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারকে সেই কার্য্যের কারণ বলা যায়। ন্যায়মতে কারণ

* পাঠক মার্কণ্ডের চণ্ড্যুক্তঃ "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা" ইত্যাদির তুলনা করুন।

তিন প্রকার, সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত। সমবায়ী কারণ,—ঘট সম্বন্ধে যেমন মৃত্তিকা, অসমবায়ী কারণ বলিতে সমবায়ী কারণের প্রত্যাসন্ন কারণ:—যথা, ঘটসম্বন্ধে, ঘটকপাল দ্বয়ের সংযোগকে বুঝায়। নিমিত্ত কারণ সমবায়ী কারণ হইতে ভিন্ন, যেমন ঘট সম্বন্ধে কুম্ভকার এবং তাহার দণ্ডচক্রাদি। বেদান্ত মতে কারণ দুই প্রকার:—উপাদান এবং নিমিত্ত:—যথা ঘট সম্বন্ধে তাহার উপাদান কারণ মৃত্তিকা, এবং নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার (কুলাল)।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে 'কারণ' শব্দে অনেকস্থলেই উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, যথা "কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য"—(ঘটাদি) কার্য্য তাহাদের (উপাদান) কারণ (মৃত্তিকাদি) হইতে অভিন্ন। নিমিত্ত কারণকে তিনি 'কারক' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, যথা ঘট সম্বন্ধে কুলাল বা কুম্ভকার। জগৎরূপ কার্য্য সম্বন্ধে শঙ্করের মত যে ঈশ্বরই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। তিনি বলিতেছেন, সূত্রভাষ্য—অ—১। পা—৪। সূ—২৩ হইতে ২৭)—

"ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মুক্তির কারণ। শ্রুতি ব্রহ্মের লক্ষণ করিতেছেন;—"যস্মাদস্য যতো"—'যাহা হইতে এ সকলের জন্ম।' ঘট এবং রুচক (স্বর্ণহার) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে, উক্ত লক্ষণ দ্বারাই দেখা যায়, ঘট এবং রুচকাদির সম্বন্ধে মৃত্তিকা এবং সুবর্ণাদির ন্যায় প্রকৃতিত্ব (উপাদান কারণত্ব) এবং কুম্ভকার (কুলাল) ও সুবর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্ত কারণত্ব, ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই উভয়বিধ কারণত্বকেই লক্ষ্য করিতেছে। তবে ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব কিমাত্মক,—এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। ব্রহ্ম কি জগতের উপাদান অথবা নিমিত্ত কারণ? ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্রই বলা যাউক, কারণ তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। কিসের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে? শ্রুতিই ঈশ্বরের জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বের উল্লেখ করিতেছে। ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ঈক্ষা বা জ্ঞানপূর্ব্বক। 'স ঈক্ষাঞ্চক্রে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা দেখা যায়। ঘটাদি সম্বন্ধেও ঈক্ষা বা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব কুম্ভকারাদি নিমিত্ত কারণেই দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব (কর্ত্তৃত্ব) সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। রাজা প্রভৃতি ঈশ্বর বা কর্ত্তৃস্থানীয়দিগের কেবল নিমিত্ত কারণত্বই দৃষ্ট হয়। অতএব পরমেশ্বরেরও নিমিত্ত কারণত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত।

"আবার পরমেশ্বরের কার্য্য—এই জগৎ—সাবয়ব—অচেতন এবং অশুদ্ধ। ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। তাহার (উপাদান) কারণও ঐরূপই হওয়া সঙ্গত, যে হেতু কার্য্য এবং তাহার (উপাদান) কারণের সারূপ্য (সমানরূপতা)ই দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম এই জগৎকার্য্যের ন্যায় সাবয়বত্ব—অচেতনত্ব এবং অশুদ্ধত্বাদি লক্ষণ যুক্ত নহেন—কারণ শ্রুতি বলিতেছেন ব্রহ্ম "নিষ্কলং, নিষ্ক্রিয়ং, শান্তং, নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।" অতএব শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মকারণত্ব নিমিত্তত্ব মাত্রেই পর্য্যবসিত হইতেছে। অচেতনত্ব—অশুদ্ধত্বাদি গুণযুক্ত জগতের অন্য (উপাদান) কারণ—(যেমন সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি) স্বীকার করিতে হইতেছে। এই কথার উত্তরে আমরা বলিতেছি—ব্রহ্মকেই জগতের কারণ উপাদান বা প্রকৃতি, এবং নিমিত্ত কারণ স্বীকার করিতে হয়। তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন। কেন? তাহা হইলেই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত বাধিত হয় না। প্রতিজ্ঞা—"যেনা শ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম্ বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমি-

ত্যাদি—যাহার শ্রবণ, মনন এবং বিজ্ঞান দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অচিন্তিত বস্তু চিন্তিত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা দেখা যায় যে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে, অপর সকল অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ হয়। এ কথা একমাত্র উপাদান কারণ সম্বন্ধেই সত্য। একমাত্র (মৃদাদি) উপাদান কারণ বিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই (সেই উপাদান গঠিত) অজ্ঞাত বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান লাভ হয়,—যেহেতু কার্য্য মাত্রেই তাহার উপাদান কারণ হইতে অভিন্ন। নিমিত্ত কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন বলা যায় না, যেহেতু, শিল্পী তাহার নির্ম্মিত প্রাসাদাদি হইতে ভিন্ন রূপেই সংসারে দৃষ্ট হয়। •

জগতের ব্রহ্ম-কারণত্ব বিষয়ক শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে শঙ্কর পুনরায় বলিতেছেনঃ—"হে সৌম্য, একখণ্ড মৃত্তিকা দৃষ্টে যেমন ঘটাদি সমস্ত মৃণ্ময় বিকার-জাত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয়, কারণ বিকার মাত্রেই শব্দ-(স্ফোট Logos) জনিত নামরূপ—ভেদমাত্র 'মৃত্তিকা, ইহাই সত্য। এই শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত উপাদান সম্বন্ধী। সেইরূপই একখণ্ড সুবর্ণ দৃষ্টে, মুকুট বলয়াদি স্বর্ণময় সমস্ত বিকার-জাত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, অথবা একটী মাত্র নখ-নিকৃন্তন (নরুণ) দৃষ্টে লৌহ-ময় সমস্ত বিকার-জাত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হয়"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মৃৎপিণ্ড, স্বর্ণখণ্ড এবং নখ নিকৃন্তন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সকলই ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব বিষয়ক। এইরূপে সর্ব্ববেদান্তোক্ত প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত,উভয়ই যথাসম্ভব ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব বা উপাদানত্বই প্রতিপন্ন করিতেছে। আবার "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—'যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মে' এই শ্রুতি বাক্যে 'যতো' 'যাহা হইতে' এই অপাদান কারকের প্রয়োগ দ্বারাও ব্রহ্মের প্রকৃতিত্বই বুঝাইতেছে। অন্য স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাতার অভাব হেতু ব্রহ্মের নিমিত্ত কারণত্বও জানা যাইতেছে। সংসারে ঘট বা স্বর্ণহার কার্য্য বা উৎপন্ন বস্তু সম্বন্ধে মৃত্তিকা বা সুবর্ণাদির উপাদান কারণত্ব যেমন তাহা হইতে স্বতন্ত্র, কুম্ভকার বা স্বর্ণকার প্রভৃতি অধিষ্ঠাত্রী সাপেক্ষ, জগৎ কার্য্য সম্বন্ধে ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব সেরূপ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অধিষ্ঠাতা (কুম্ভকারাদি স্থানীয়), জগৎ সৃষ্টি কার্য্য যাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বের অপেক্ষা করিতে পারে,—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র সেরূপ অধিষ্ঠাতা কেহ নাই। শ্রুতি প্রকাশ করিতেছে, জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন।

শঙ্কর আবার বলিতেছেন—"এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি বা উপাদান, যেহেতু শ্রুতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মকেই কারণরূপে উল্লেখ করিয়া প্রলয় এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেঃ—"এই সমস্ত ভূত-গ্রাম. আকাশ (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন, এবং আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়।" যাহা হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে যে বস্তু লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা ব্রীহি, যবাদি সম্বন্ধে এই পৃথিবী।"

আবার "এতদ্দ্বারা ও ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব বা জগতের উপাদানত্ব প্রতিপন্ন হয়, কারণ ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেঃ—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—তিনি আপনাকে স্বয়ংই করিলেন। এতদ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব,উভয়ই প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্ম, যিনি কর্ত্তারূপে পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ক্রিয়মানত্ব বা কর্ম্মরূপত্ব কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতেছিঃ—বিকাররূপে পরিণতি দ্বারা। সেই আত্মা পূর্ব্বসিদ্ধ হইয়াও স্বয়ংই আপনাকে বিকার বিশেষরূপে পরিণমিত করিয়াছেন। বিকাররূপে পরিণামপ্রাপ্তি মৃদাদি প্রকৃতি বা উপাদানের সম্বন্ধেই দৃষ্ট হয়। 'স্বয়ং' এই বিশেষণ শব্দদ্বারা ব্রহ্মের নিমিত্তান্তরানপেক্ষিত্ব প্রকাশিত হইতেছে।"

'এইরূপে ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব বা জগতের উপাদানত্ব প্রমাণিত হইল। তবে যে আপত্তি করা হয়ঃ—ঈক্ষা বা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব সংসারে কুম্ভকারাদি নিমিত্ত কারণেই দৃষ্ট হয়, মৃদাদি উপাদান কারণে তাহা দৃষ্ট হয় না,—ইহার উত্তর এইঃ—সৃষ্টি সম্বন্ধে লৌকিক দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ রূপে গৃহীত হইতে পারে না, যেহেতু সৃষ্টি ব্যাপার অনুমানগম্য নয়, তাহা শব্দ বা

শ্রুতি প্রমাণেরই গম্য। শ্রুতি অনুসারেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি ঈক্ষিতা বা জ্ঞানময় ঈশ্বরের প্রকৃতিত্ব বা উপাদানত্বও প্রমাণ করিতেছে।

শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া শঙ্করাচার্য্য নিরস্ত হইতেছেন না। তিনি তর্কদ্বারাও ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। "কারণ হইতে কার্য্য অনন্য" এই মূল সূত্রের উপরে তিনি তাঁহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ভাবিলে দুঃখ হয় যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—যথা ক্রিয়া (Work or kinetic energy), শক্তি (Potential energy), শক্তির এবং দ্রব্যের রূপ ব্যত্যয়, এবং অনশ্বরত্ব (Conservation and trasformation of energy, conservation and transformation of matter) ইত্যাদি, যাহা আজকাল অনেকেই অবগত আছেন, শঙ্কর তাহা অবগত ছিলেন না। যদি শঙ্করের তাহা জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার তর্কের মূল তত্ত্ব—"কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব" প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে এত আয়াস স্বীকার করিতে হইত না।

শঙ্কর বলিতেছেন :—"ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব প্রতিপন্ন হয়, যে কারণ থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি, না থাকিলে নয়,—যেমন মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের, এবং তন্তু থাকিলেই পটের উপলব্ধি, না থাকিলে নয়। এইত নিয়ম যে এক বস্তু থাকিলে, তাহা হইতে ভিন্ন বস্তুর উপলব্ধি দেখা যায় না; যথা—অশ্ব, গো হইতে ভিন্ন, সেজন্য অশ্ব থাকিলে গো-সত্তার উপলব্ধি হয় না। কুলালের সহিত ঘটের যদিও নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব আছে, কিন্তু ভিন্নত্ব হেতু কুলাল থাকিলেও ঘটের উপলব্ধি হয় না। (আপত্তি) কিন্তু একের সদ্ভাবেও ত অন্যের উপলব্ধি সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, যথা অগ্নির সদ্ভাবে ধূমের। (উত্তর) তাহা নয়, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও গো-গৃহ প্রভৃতির মধ্যে আবদ্ধ ধূম দৃষ্ট হয়।

কার্য্য কারণের অনন্যত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও হয়। যথা তন্তু সংস্থান সম্বন্ধে, তন্তু পরিত্যাগ করিলে পট নামক কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। পটরূপ কার্য্যে আতান, বিতান যুক্ত (টানা, পৈরান—warp and woof) তন্তু মাত্রেরই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। সেইরূপ আবার তন্তুর মধ্যে অংশু (আঁশ)। অংশুর মধ্যে তাহার অবয়ব সকল। এই প্রকারে—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারাই লোহিত, শুক্ল এবং কৃষ্ণ, তিন প্রকার রূপ। তৎপর বায়ু মাত্র, এবং তৎপর আকাশ মাত্রও অনুমান করা যায়। তৎপর একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম। আমাদের কথা এই যে, তাঁহাতেই সকল প্রমাণের শেষ। ২—১—১৫)

আবার বলিতেছেন :—"ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়, যে উৎপত্তির পূর্ব্বে পরকালীন-জাত কার্য্যের কারণরূপে কারণেতে সত্তা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—"হে সৌম, পূর্ব্বে এ সমস্ত সৎ রূপেই ছিল", "পূর্ব্বে এই সমস্ত এক আত্মারূপেই ছিল"—ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা "ইদং" বা 'এই' শব্দ গৃহীত কার্য্যজাতের কারণের সহিত সমানাধিকরণ্য বুঝায়। যে বস্তু যে রূপে যাহাতে না থাকে, সেই বস্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না,—যথা বালি হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যখন তাহার কারণ হইতে অনন্য, উৎপত্তির পরেও কার্য্য তাহার কারণ হইতে অনন্য জানা যায়।" ২—১—১৬॥

আবার :—"শব্দ বা শ্রুতি প্রমাণ ভিন্নও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা এবং তাহার কারণ হইতে অভিন্নত্ব যুক্তিসঙ্গত জানা যায়। যুক্তি বর্ণনা করা যাইতেছে :—সংসারে দধি, ঘট বা স্বর্ণহারাদি যাহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ক্ষীর, মৃত্তিকা, অথবা সুবর্ণাদি সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। যে দধি ইচ্ছা করে, সে মৃত্তিকা অথবা যে ঘট ইচ্ছা করে, সে ক্ষীর কখনও সংগ্রহ করে না। যাহারা অসৎকার্য্যবাদ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, এই মত সমর্থন করে, তাহাদের কথা সত্য হইলে, তদ্রূপ করা সঙ্গত হইত। উৎপত্তির পূর্ব্বে সকলের মধ্যেই সকলের অভাব যদি সমান

বা বিশেষত্ব রহিত হয়, তবে ক্ষীর হইতেই বা কেন দধি হইবে, মৃত্তিকা হইতে কেন হইবে না? অথবা মৃত্তিকা হইতে কেন ঘট হইবে, ক্ষীর হইতে হইবে না? প্রাগসত্ত্ব সমান বা বিশেষত্ব-রহিত হইলেও ক্ষীরের মধ্যেই দধি বিষয়ে, এবং মৃত্তিকাতেই ঘট বিষয়ে কোনরূপ উৎকর্ষ বা 'অতিশয়' আছে, যাহা দধি বিষয়ে মৃত্তিকাতে অথবা ঘট বিষয়ে ক্ষীরেতে নাহঃ—তুমি হয়ত এরূপ বলিবে। তাহা যদি হয়, তবে এই অতিশয় বা উৎকর্ষত্ব হেতুই উৎপত্তির প্রাগবস্থাতে অসৎ কার্য্যবাদ অসিদ্ধ এবং সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। 'অতিশয়' শব্দদ্বারা কারণের কার্য্যোৎপাদক শক্তি বিশেষই কল্পিত হইতেছে। (Compare energy, kinetic and potential) তাহা না হইলে যে কোন শক্ত্যন্তর অথবা শক্তির অভাবও সেই কার্য্য উৎপাদন করিতে পারিত—কারণ অন্যত্ব এবং অসত্ত্ব সর্ব্বত্রই সমান। অতএব কারণের আত্মভূত সেই শক্তি-বিশেষ, এবং সেই শক্তি-বিশেষের আত্মভূত কার্য্য।" আবার বলিতেছেন:—"অশ্ব হইতে মহিষ যেমন ভিন্ন, কারণ হইতে তাহার কার্য্য, অথবা দ্রব্য হইতে তাহার গুণ সম্বন্ধে সেরূপ ভেদ-বুদ্ধির অভাব হেতু তাহাদের তাদাত্ম্য স্বীকার করিতে হয়।" আবার বলিতেছেন:—"উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অভাব বলিলে উৎপত্তি অকর্ত্তৃকা বস্তু রহিত হয়। যেহেতু উৎপত্তি একটী ক্রিয়া, অতএব গত্যাদি ক্রিয়ার ন্যায় তাহা সকর্ত্তৃকা হইবে। ক্রিয়া অথচ অকর্ত্তৃকা কথাই বিরুদ্ধ। ঘটেরই উৎপত্তি, তথাপি যদি বল ঘট কর্ত্তা নয়, তবে কি ঘটোৎপত্তি-ক্রিয়া অন্য কর্ত্তৃকা কল্পনা করিতে হইবে? এরূপ হইলে ঘট-কপালাদির উৎপত্তিও অন্য কর্ত্তৃকাই কল্পিত করিতে হইবে? তাহা যদি হয়, তবে 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে' বলিলে কি কুলালাদি কারণ সকল উৎপন্ন হইতেছে, বুঝিতে হইবে? কিন্তু লোকে ঘটের উৎপত্তি হইতেছে বলিলে কুলালাদি কারণ সকল উৎপন্ন হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করে না। বরং কুলাল পূর্ব্বোৎপন্ন বলিয়াই প্রতীতি থাকে। যদি বলা যায়, 'কার্য্যের উৎপত্তি এবং আত্মলাভ' বলিলে স্বীয় কারণের সত্তার সহিত তাহার সম্বন্ধ লাভ বুঝায়, তবে অলব্ধাত্মক বা অবস্তু কিরূপে সম্বন্ধ লাভ করিবে? দুইটী সৎবস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর, সৎবস্তুর সহিত অসতের অথবা অসৎ বস্তু-দ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হয় না।"

পুনরায় প্রতিপক্ষের অন্য আপত্তির উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতেছেন। আপত্তি, যথা:—"উৎপত্তির পূর্ব্বেই যদি (ঘটাদি) কার্য্যের সত্তা থাকে, তবে (কুলালাদি) কারকের ক্রিয়া নিরর্থক হয়। (মৃত্তিকাদি) কারণ যেমন পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া তাহার স্বরূপ সিদ্ধির জন্য কোন-কারক ব্যাপার নিরর্থক, সেইরূপ প্রাক্‌সিদ্ধত্ব এবং কারণ হইতে অনন্যত্ব হেতু, কার্য্যের ও স্বরূপসিদ্ধির জন্য (কুলালাদি) কারক-ব্যাপার নিরর্থক। অথচ দেখা যায় (কুলালাদি কারক ব্যাপার) নিরর্থক হয়। অতএব কুলালাদি কারক ব্যাপারের অর্থবত্ব সিদ্ধির জন্যই আমাদের মত যে উৎপত্তির পূর্ব্বে (ঘটাদি) কার্য্যের অভাব।" শঙ্কর এই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন:—"সেরূপ দোষ হয় না, যে হেতু কারণকে কার্য্যাকারে ব্যবস্থিত করাতেই কারক ব্যাপারের অর্থবত্ব সিদ্ধ হয়। কার্য্যাকারও কারণেরই আত্মভূত, যে হেতু কারণের আত্মভূত না হইলে তাহার আরম্ভই হইতে পারে না—এই আমাদের বক্তব্য। আর 'বিশেষ' বা ভিন্ন প্রকারত্ব দর্শন হইলেই বস্তুর অন্যত্ব সিদ্ধ হয় না। দেবদত্ত যখন আপনার হস্ত-পদ সঙ্কোচ করে, আর যখন সে তাহার হস্ত-পদ প্রসারণ করে, তখন সে বিশেষত্ব বা ভিন্নরূপত্ব যুক্ত দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বস্তুর ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ আমরা জানি সে একই। সেইরূপ প্রতিদিনই লোকের পিত্রাদির নানা-প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের ভিন্ন-বস্তুত্ব সিদ্ধ হয় না, যেহেতু আমার পিতা, আমার মাতা প্রভৃতি আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। যদি বল যে এই সকল স্থলে জন্ম এবং মৃত্যু দ্বারা অন্তরিত না হওয়াতে এরূপ করা সঙ্গত, কিন্তু অপরাপর স্থলে সঙ্গত নয়। তাহা বলা সঙ্গত নয়, যেহেতু ক্ষীরাদির ও দধি প্রভৃতি আকার এবং

অবস্থাভেদ আমাদের প্রত্যক্ষ। অদৃশ্য (অতি ক্ষুদ্র) বটবীজ প্রভৃতিরও সমানজাতীয় অবয়বান্তর-যোগে বর্দ্ধিত অঙ্কুরাদি রূপ যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকেও আমরা জন্ম বলিয়া থাকি, আবার সে সকল অবয়বের ক্ষয় হেতু তাহার অদর্শন প্রাপ্তি হইলে আমরা উচ্ছেদ বা মৃত্যু বলিয়া থাকি। এইরূপে জন্ম এবং মৃত্যুদ্বারা অন্তরিত হইলে যদি বস্তুর ভিন্নত্ব হয়, তাহা হইলে অসতের সত্তালাভ এবং সতের অসত্তালাভ প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে শিশু যখন গর্ভস্থ থাকে এবং সেই শিশু যখন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে শয়ান থাকে, দুই ভিন্ন বস্তু। তাহা হইলে মানুষও বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য অনুসারে ভিন্ন ব্যক্তি। এরূপ হইলে পিত্রাদি শব্দ ব্যবহার লোপ করিতে হয়। এইরূপে ক্ষণ-ভঙ্গবাদের উত্তর প্রদত্ত হয়।" আবার বলিতেছেন :—"যে মনে করে যে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, তাহার মতে কারকব্যাপার বিষয়রহিত হইয়া পড়ে,—কারণ অভাবের বিষয়ত্ব অসম্ভব—আকাশের বধের জন্য খড়্গাদি অনেক অস্ত্র ব্যবহারের ন্যায়। যদি বল যে কারক-ব্যাপারের বিষয় সেই সেই কার্য্যেরই সমবায়ী কারণ (উপাদান), তাহা বলিতে পার না; কারণ তোমাদের মতে কার্য্য তাহার সমবায়ী কারণ বা উপাদান হইতে ভিন্ন। কারক-ব্যাপারের বিষয় যদি কার্য্য হইতে ভিন্ন হইল, তখন তদ্দ্বারা ভিন্ন বস্তু নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব। যদি বল যে কার্য্য তাহার সমবায়ী বা উপাদান কারণের নিজেরই অতিশয় বা অবস্থা বিশেষ মাত্র, তাহাও তুমি বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করিতে হইল।" এইরূপে আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—"অতএব ক্ষীরাদি দ্রব্যই যখন দধি প্রভৃতি রূপে অবস্থান করে, তাহাই তখন 'কার্য্য' নামে অভিহিত হয়। শত বৎসর পরিশ্রম করিলেও কারণ হইতে কার্য্যের ভিন্নত্ব দেখান যায় না। মূলকারণও সেইরূপ কার্য্যের পর কার্য্যের আকার ধারণ করিয়া নটের ন্যায় শেষ কার্য্য পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হইয়া সর্ব্বব্যবহারের পাত্রত্ব লাভ করে।" ২—১—১৮॥

পরের সূত্রে আবার শঙ্কর বলিতেছেন :—"পট যখন সম্যক্ বেষ্টিত থাকে, তখন তাহা পট কি অপর কোন দ্রব্য স্পষ্ট বুঝা যায় না। যখন প্রসারিত করা যায়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সম্বেষ্টিত দ্রব্যই পট। প্রসারণ দ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায়। সম্বেষ্টিত অবস্থায় তাহা পটই, এরূপ জানা গেলেও, তাহা কত বড়, তাহা বিশেষভাবে জানা যায় না। আবার প্রসারিতাবস্থায় তাহা কত বড়, তাহা বিশেষভাবে জানা যায়। সম্বেষ্টিত পট হইতে প্রসারিত পট ভিন্ন নয়। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তন্তু প্রভৃতি কারণাবস্থায় অবস্থিত পটাদি কার্য্য অস্পষ্ট থাকিয়া, তাত (তুরী), মাকু (বেম), তাতি (কুবিন্দ) প্রভৃতি কারক ব্যাপারদ্বারা অভিব্যক্ত হইলে পটরূপে স্পষ্টতঃ গৃহীত হয়। সম্বেষ্টিত এবং প্রসারিত পটের দৃষ্টান্ত অনুসারেও কার্য্য তাহার কারণ হইতে অভিন্ন।" ২—১—১৯॥

পুনরায় শঙ্কর বলিতেছেন :—"আবার সংসারে দেখা যায়, প্রাণ অপাণ প্রভৃতি প্রাণ-বিকার প্রাণায়ামদ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া যখন কারণরূপে অবস্থিত থাকে, তখন কেবলমাত্র জীবনরক্ষা কার্য্য নিষ্পন্ন করে, কিন্তু আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য্যান্তর নিষ্পন্ন করে না। আবার সেই সকল প্রাণবিকার পুনঃপ্রবৃত্ত হইলে জীবন রক্ষা ভিন্ন আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য্যান্তরও নিষ্পন্ন করে। অথচ প্রাণাপানাদ প্রাণ-বিকার প্রাণেরই রূপান্তর ভিন্ন অন্য কিছু নয়—যেহেতু সমীরণ-স্বভাব বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্বও এইরূপ। অতএব সমস্ত জগৎ যখন ব্রহ্মকার্য্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তখন এই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতংমতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" সিদ্ধ হইল। ২—১—২০॥

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

বজ্র পেলে কই ?

(১)

ক

বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?
তোম্‌রা যে গো এক এক জনা,
অতি ক্ষুদ্র জলের কণা,
লৌহ শিলা নও ত কেহ কোমল বাষ্প বই !
বজ্র পেলে কই গো তোম্‌রা বজ্র পেলে কই ?

খ

বজ্র পেলে কই গো তোম্‌রা বজ্র পেলে কই ?
গাছ বিরিঞ্চি গিরিচূড়া,
ভেঙ্গে কর গুড়া গুড়া,
ভয়ে ডরে যাই যে সরে' অবাক্ হয়ে রই !
বজ্র পেলে কই গো তোম্‌রা বজ্র পেলে কই ?

গ

বজ্র পেলে কই গো তোম্‌রা বজ্র পেলে কই ?
ওর যে বিষম তেজের চোটে,
আকাশ ফেটে আগুন ওঠে,
হাত পা গিয়ে পেটে সাঁধে শব্দ শুনে অই !
বজ্র পেলে কই গো তোম্‌রা বজ্র পেলে কই ?

ঘ

বজ্র পেলে কই গো তোম্‌রা বজ্র পেলে কই ?
জগতে তোমাদের কাছে,
দাঁড়ায় যে কার শক্তি আছে ?
ক্ষুদ্র হয়ে তোম্‌রা বড় তোম্‌রা সর্ব্বজয়ী !
বজ্র পেলে কই গো তোম্‌রা বজ্র পেলে কই ?

(২)

ক

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !
আমরা যখন পরস্পরে,
হিংসা ভুলে' একত্তরে,
ঐক্যে সখ্যে লক্ষ্যে বাক্যে সকলে এক হই,
তখন মোদের বীরদাপে,
পায়ের তলে পাহাড় কাঁপে,
হাতের উপর আপনি বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !
বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !

খ

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !
ভাই বলিয়া পরস্পরে,
ডাকি যখন স্নেহের ভরে,
কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠে বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !
পরস্পরে ভালবাসি,
আম্‌রা যখন অট্টহাসি,
আকাশ পাতাল জ্বলে উঠে আঁধার থাকে কই ?
কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠে বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !

গ

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !
আম্‌রা যখন একই জ্ঞানে,
এক বেদনা একই প্রাণে,
পরস্পরে সুখে দুখে ভাইকে বুকে লই,
লোহার চেয়ে তখন দড়,
শিলার চেয়ে শক্ত বড়,
কঠিন হ'তে কঠিন তখন জমাট যখন হই !
বক্ষে বক্ষে লক্ষ বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !

ঘ

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই,
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন মোদের বজ্র যে গো অই !
বজ্র মোদের হৃদয়মর্ম্ম,
বজ্র মোদের অস্থি চর্ম্ম,
অন্যকর্ম্মা নই গো মোরা বজ্রকর্ম্মা বই !
বজ্র মোদের শিক্ষা দীক্ষা,
বজ্র মোদের পণ—পরীক্ষা,
বজ্র জাতি বজ্র ধর্ম্ম বজ্র সমস্তই !
বজ্র মোরা পুরুষ নারী,
বজ্রব্রতী বজ্রাচারী,
বজ্র পূজি বজ্র ভজি বজ্র ছাড়া নই !
বজ্র মোদের হিংসা ক্রোধ,
বজ্র মোদের প্রতিশোধ,
বজ্র আশা বজ্র ভাষা বজ্রে সর্ব্বজয়ী !
আম্‌রা বজ্র মন্ত্রজপা,
সে দধীচি মহাতপা,
তারি অংশ তারি বংশ গোষ্ঠি তারি হই,
বৃত্র-বধে জীবন দিতে,
আম্‌রা বেড়াই পৃথিবীতে,
বক্ষে বক্ষে লক্ষ বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !
আমাদের এ রক্ত বসা,
বজ্রে মাজা বজ্রে ঘষা,
বজ্র মোদের পণ প্রতিজ্ঞা—বজ্র সমস্তই !
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন মোদের বজ্র যেগো অই !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৫১। বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ১৯১১।

পূর্ব্বে পুণ্যশ্লোক বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, স্থানীয় S. D.O শ্রীযুক্ত সণ্ডার সাহেব ১৫ মাস সম্পাদক ছিলেন এবং খুব উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। তিনি পেনসন লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তারপর গত জুলাই মাস হইতে শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন মহাশয় সম্পাদক হইয়াছেন। এখন কুষ্ঠাশ্রমের কাজ যেরূপ গুরুতর হইয়াছে, তাহাতে একজন খুব সুদক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ম্মঠ লোকের সম্পাদক হওয়ার দরকার ছিল। হরিচরণ বাবু সেই শ্রেণীর লোক। আশ্রমে ৫০টী রোগী আছে। হিন্দু মুসলমান রোগী এক সঙ্গে থাকে। গত বৎসর কোন মুসলমান রোগী আসে নাই।

কুষ্ঠাশ্রমের জন্য একটা পৃথক স্ত্রী-ওয়ার্ড একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এখন যে ফিমেল ওয়ার্ড আছে, তাতে মাত্র ৪টীর স্থান আছে। বারেন্দা ঘিরিয়া আর দুটীর স্থান হইয়াছে। আর বর্ত্তমান সময়ে ১০টী স্ত্রী-রোগী আছে। এত অল্প স্থানে এবং বারেন্দা-ঘেরা ঘরে ১০টী রোগী থাকা যুক্তিসঙ্গত নয় জানিয়াও রাখিতে হইয়াছে। তারপর সকল বয়সের স্ত্রীরোগী থাকে। ইতিপূর্ব্বে দুই একবার একটু গোলমালও হইয়াছিল। ফিমেল ওয়ার্ড পৃথক হইলেও, পুরুষের ঘরের খুব নিকট এবং এক কম্পাউণ্ডে অবস্থিত। পৃথক ভাবে বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ২০টী রোগী থাকার ঘর চাই, পৃথক রান্নাঘর, পৃথক পায়খানা, সম্ভব হইলে পৃথক ইন্দারা ও পৃথক কম্পাউণ্ড একান্ত দরকার। সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা হইলে এ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে, আশা করা যায়। কিন্তু কে দেয়? যদি একজন বা ততোধিক হৃদয়বান লোক প্রত্যেক নগরে যাইয়া কুষ্ঠাশ্রমের জন্য ভিক্ষা করিতে পারিতেন, তবে সম্ভব হইত। দেশের ধনী লোকেরা সাধারণ লোকের লেখায় টাকা দিতে প্রস্তুত হন না। অন্ততঃ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সই-ওয়ালা চিঠী হইলে পাইবার আশা করা যায়। কয়েক সপ্তাহ পরে সম্রাট বাহাদুর ও সম্রাজ্ঞী এদেশে আসিবেন, অনেক আনন্দ তামাসা ও কিছু কিছু সৎকর্ম্ম হইবে, সন্দেহ নাই। এই সুসময়ে যদি কোন সহৃদয় ধনী ব্যক্তি এই কুষ্ঠাশ্রমের স্ত্রী-ওয়ার্ডটা করিয়া দেন, তবে দেশের একটা প্রকৃত অভাব দূর হয়, অথচ সম্রাটের শুভাগমনের এক স্থায়ী চিহ্ন থাকে।

টাকার অভাবে যদি এই পুণ্যময় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হয়, বড়ই দুঃখের কথা হইবে। আমরা সহৃদয় ব্যক্তিগণের চরণে বিনীত ভাবে নিবেদন করি, এই আশ্রমের অভাব দূর করিতে তাঁহারা চেষ্টিত হউন। বিধাতার কৃপা বর্ষিত হউক।

৫২। পাট বা নালিতা। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব কৃষি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্‌ এ, এ-আর-এ-সি প্রণীত। ইহাতে পাটের জমি পরীক্ষা, সার প্রস্তুত, বীজ পরীক্ষা, পাট বপন, পাট কাটা,

পাট কাচা, কিরূপে পাটের রং পরিষ্কার করিতে এবং কীটাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে হয়, কি উপায়ে পাটের চাষে অধিক লাভবান হওয়া যায়, প্রভৃতি পাটের কৃষক এবং পাটের ব্যবসায়ীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য সকল কথাই বিশদ্‌ভাবে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, ২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এবং কুমিল্লা কান্দিরপাড় গ্রন্থকারের নিকট। এই পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল। গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ। সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব। স্বদেশী কাগজে সুন্দররূপ মুদ্রিত।

৫৩। সেটেলমেণ্ট পরিচয়। শ্রীনিরঞ্জনচন্দ্র বি-এল প্রণীত, মূল্য ৵০। সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুলিখিত পুস্তক, ছাপা পরিষ্কার। বিদেশী কাগজ।

৫৪। শিবরাত্রি ব্রত-কথা। শ্রীখগেন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৴০। নামেই বিষয় বিবৃত। লেখা মন্দ নয়। বিলাতী কাগজ।

৫৫। চিত্র কাব্যম্। ৺শ্রীপতিসুন্দর ঠাকুর বিরচিতম, সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর। মূল্য ॥০। শ্লোকগুলি বেশ। বাঙ্গালা অনুবাদ থাকিলে ভাল হইত। দেশী কাগজ।

৫৬। সতীর পতিভক্তি। সিরাজগঞ্জ হোসেনপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী মরহুমা আয়রণ নেছা খাতুন প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ।০। মুসলমান সমাজের মহিলা এমন সুন্দর প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে পারেন, পূর্ব্ব ধারণা ছিল না। যেরূপ পতিভক্তি বিবৃত হইয়াছে, তাহা যে কোন সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে। আদর্শ মহিলার আদর্শ চিত্র। ঘরে ঘরে, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হউক। স্বদেশী কাগজ।

৫৭। ঘরের কথা। শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত মূল্য ৷৹০। পাকা হাতের লেখা, কিন্তু গল্পটী তেমন জমে নাই। তবে গার্হস্থ্য চিত্র পড়িতে কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য্য। স্বদেশী কাগজ।

৫৮। আত্মোৎকর্ষ। শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য ॥৵০। ব্লাকী প্রণীত Self-culture পুস্তকের অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। উপদেশপূর্ণ সুন্দর পুস্তক। সর্ব্বত্র আদৃত হইবার যোগ্য। বিলাতী কাগজে ছাপা।

৫৯। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী। শ্রীশশিভূষণ বসু। মূল্য ৵০। সংক্ষেপে সরল ভাষায় রাজার জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের এই সুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়িয়া বড়ই সুখী হইলাম। স্কুলের পাঠ্য হওয়ার যোগ্য পুস্তক। স্বদেশী কাগজ।

৬০। পদরাগ। শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৷৹০। স্বদেশী কাগজে সুন্দর ছাপা। পদগুলি বড়ই সুন্দর। রুচি যেমন মার্জ্জিত, ভাব তেমনই বিশুদ্ধ। অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করে। নীতি ও ভক্তি-জমাট হইয়া পদরাগে ফুটিয়াছে। গ্রন্থকারের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। এই পুস্তক মহর্ষি ঠাকুর-পরিবারের অক্ষয় গৌরব ঘোষণা করিবে।

৬১। ৬২। ৬৩। দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা। প্রথম খণ্ড, বৈশেষিক দর্শন, ন্যায়দর্শন, পূর্ব্ব-

মীমাংসা-দর্শন, সাংখ্য প্রবচন-সূত্র, তত্ত্বসমাস ও সাংখ্যকারিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড—পাতঞ্জল-দর্শন।

তৃতীয় খণ্ড—বেদান্তদর্শন।

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী প্রকাশিত। মূল্য ২, ১৸০ ও ৩্। উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত। বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

দার্শনিক তত্ত্ব বিচার করিয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য কালীবর বেদান্তবাগীশ ও চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তুলনা-রহিত। ইদানীং অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ মৌলিকতত্ত্ব-সামঞ্জস্য-প্রচারে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। উপনিষদ্-তত্ত্ব প্রচারে পণ্ডিতবর কোকিলেশ্বরের কৃতীত্ব কখনও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই মহাত্মা-সকলের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন এবং সুধী সমাজকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিতেছেন। আর নাম করিব কাহার? তারা কিশোর কঠোর তপস্যা-নিরত জীবনের শেষাংশে যে কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রের চরিতার্থ-সাধক। তিনি ডুবিয়াছিলেন গভীর সাধনায়—প্রকট করিয়াছেন এমন জিনিস, যাহা এদেশে থাকিলেও দুষ্প্রাপ্য ছিল,—যাহা দেখি দেখি, দেখি নাই; পাই, পাই, পাই নাই। আমাদিগের বহুদিনের বাসনা তিনি পূর্ণ করিয়াছেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনের গবেষণার জিনিষ উপহার দিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এই সুবিস্তৃত গ্রন্থের পরিচয় দিতে পারি, আমাদের এমন শক্তি নাই। এজন্য, তিনি যে প্রভূত অর্থ ও পরিশ্রম ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার সম্যক ব্যাখ্যা করিতে পারি, সে ক্ষমতাও নাই। তবে এই মাত্র লিখিতে পারি, তাঁহার এই গ্রন্থ প্রচারে এদেশ ধন্য হইয়াছে, তাঁহার কুল পবিত্র এবং তাঁহার জীবন ধারণ সার্থক হইয়াছে। তাঁহার এ মহৎ কার্য্যের পুরস্কার অক্ষয় কৈবল্য লাভ। তাহাই তাঁহার হউক। আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা তিনি গ্রহণ করুন।

মায়া-দেবী।

১

হেথাকার নীপ-কুঞ্জ চঞ্চল, ভঙ্গুর,
কুসুম-আস্তীর্ণ পথ মরণ-বন্ধুর!
বেদনা-জড়িত প্রাণ ফেলি উষ্ণশ্বাস,
আকুলি ব্যাকুলি সদা করে হা হুতাশ।—
কুহেলী-বেষ্টিত এই ক্ষণিক বাসরে,
কাহার মাধুরী-লীলা শোভে থরে থরে?

২

কার আঁখি হ'তে ঝরে লাবণ্য তরল,
জুড়ায় পরাণ অশ্রু-সলিল-বিকল;
কাহার ললিত কণ্ঠে বীণার নিক্কণ
পঞ্চমে গুঞ্জরি উঠে বিশ্ব-বিমোহন;
মধুর পরশ দানে কে করে লেপন
ত্রিতাপ-তাপিত বুকে শীতল চন্দন?

৩

সোহাগ, আনন্দ, অশ্রু, প্রেম-সম্ভাষণ,
কাহার অঞ্চল ঘেরি করে গুঞ্জরণ;
প্রাণের অগস্ত্য-তৃষ্ণা পাদ-পীঠে কার,
সাগর শুষিতে যেয়ে করে হাহাকার;
'জীয়ন-মরণ-কাঠী' লয়ে নিত্যকাল
কে বিশ্বের নাট্যশালে খেলে ইন্দ্রজাল?

৪

হে নারি, তুমি না সেই ভীম-মনোহর,—
রচিছ জীবন-কুঞ্জে অমা-কোজাগর?
তোমারি নয়ন-পাতে নেহারে ভুবন—
প্রলয় কাঁপিয়া উঠে, ফুটে বৃন্দাবন!
বৃদ্ধা হও, প্রৌঢ়া, কিম্বা যুবতী, বালিকা,
মেয়ে নও, মায়া তুমি!—নারী প্রহেলিকা!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

বঙ্গসাহিত্যের জাগরণ।

বঙ্গভাষার প্রাচীনত্ব।

বঙ্গভাষা অর্ব্বাচীন পদার্থ নহে। আধুনিক য়ুরোপের কোন ভাষা হইতেই বঙ্গভাষা নবীন বা অল্পজীবী নহে; উহা বঙ্গদেশজাত এবং নানা ভাষার সঙ্গতি-সংসর্গে পরিপুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিয়া আসিতেছে। বঙ্গবাসী আদিম অসভ্যগণের কথিত দেশজ ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া, উপনিবিষ্ট আর্য্যগণের ভাষা-প্রকৃতিই অক্ষুণ্ণভাবে ও ক্রমপরিণতি লাভে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। খ্রীষ্টজন্মের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বেও বালক বুদ্ধদেবকে বঙ্গলিপি শিক্ষা করিতেছেন, দেখিতে পাই। তৎকালে, পশ্চিমদেশ হইতে প্রত্যাগত আর্য্যগণের ভাষা এতদ্দেশীয় প্রকৃতিসংসর্গে নানারূপ কথিত ভাষার—প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়া সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের এই কথিত ভাষাই তখন গৌড়প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত, ওই গৌড়-প্রাকৃতই বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে।

এই বঙ্গভাষা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্রের ও দণ্ডাচার্য্যের ব্যাকরণ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ওই সময়ে বঙ্গদেশে সংস্কৃতই সাধুভাষা, পুঁথির ভাষা, পণ্ডিত পুরোহিত ও সমাজোপরিস্থগণের প্রশংশিত ভাষা ছিল। সুতরাং বাঙ্গালী মনের যাহা বিশিষ্ট অর্জ্জন, জীবনপথে এই জাতির প্রশংশিত হৃদয়ভাব ও চিন্তা, তৎসমস্ত সংস্কৃত দ্বারেই প্রকটিত হইতেছিল।

ভাষা ও সাহিত্যোন্নতির মূল।

আমরা জানি, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি চিরকাল সমাজস্থ জনসাধারণের উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। যে জাতির জনসাধারণ জাগে নাই, কিম্বা যে জাতির হৃদয় কোন বিশেষ দিকে জ্ঞানভাবের প্ররোচনা প্রাপ্ত হয় নাই, এবং ঐ প্ররোচনা যাহাকে আত্মপ্রকাশে প্রয়াসী করিয়া তোলে নাই, সেই জাতিমধ্যে কষ্টশিক্ষিত ভাষার বাক্যপ্রকারে ধর্ম্মদর্শন বা পৌরোহিত্য প্রভৃতির গ্রন্থ সুবহু রচিত হইতে পারে, কিন্তু উহার প্রকৃত সাহিত্য হয় না। প্রকৃত সাহিত্য চিরকাল মাতৃভাষার সম্পত্তি। মনুষ্যমধ্যে সাহিত্যোন্নতির মূল কারণ, তাহার সাধারণের জাগরণ; ও উক্ত সাধারণের মধ্যে জীবনে ও জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—অর্থাৎ জাতীয় হৃদয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা।

জাতিপ্রীতি ও দেশপ্রীতি।

অন্যদিকে, জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ জাতিপ্রীতি বা দেশপ্রীতি, এই জাতিপ্রীতি বিশ্বজনীনতার হিসাবে সঙ্কীর্ণ হইতে পারে; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, উহাই জগতে জাতিপ্রতিষ্ঠার মূল সহায়। আবার, স্বদেশ বা মাতৃভূমি বলিতে ভিতরে ভিতরে মাতৃভাষা এবং সাহিত্যকেই বুঝায়। জাতীয় সাহিত্যের

* বিগত ভাদ্র মাসে, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে শাখা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ শাখা-পরিষদের সভ্যসমক্ষে বঙ্গসাহিত্যের অতীত পরিচয় প্রসঙ্গে পঠিত।

মধ্যে যে জ্ঞানভাব চিন্তা পরিদৃষ্ট, প্রকাশিত ও নির্ব্বনিত হইয়া গিয়াছে, মাতৃভাষী প্রাচীন ও আধুনিক মনুষ্যপ্রবাহ হইতে বাণীভাণ্ডার-ধৃত সেই সঞ্চিত সম্পত্তিই দেশপ্রীতির প্রধান ভিত্তি। যে দেশে মননজীবী বা নিঃস্বার্থ জ্ঞানকর্ম্ম ভাবজীবী কবি, পণ্ডিত, দার্শনিকের বা কর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হয় নাই, যাহার ভাষা ঐরূপ মহাজন-সংসর্গের প্রভাব গ্রহণ করে নাই, সে দেশের মনুষ্যের দেশপ্রীতি, জাতি-প্রীতি বা জাতীয়তার কিম্বা মনুষ্যত্ব সাধনার কিছুমাত্র অবলম্বন বা মূলধন (nucleus) নাই। যে দেশের মনুষ্য পূর্ব্বরিক্থ ভোগে বা পৈত্রিক সম্পর্কে বলশালী হইতে পারে না, যাহার মাতৃভাষার সাহিত্যস্তম্ভে কিছুমাত্র সার নাই, সেই দেশের মনুষ্য চিরকাল শৈশব অবস্থায় ও জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য। জগতের অন্য জাতি তাহাকে ন্যায্যমতেই উপেক্ষিত, নির্যিত ও পদদলিত করিয়া এই বসুন্ধরা ভোগ করে, ইহপরকালের মাহাত্ম্য অর্জ্জন করে। ভাষা ও সাহিত্যের সহিত মনুষ্যত্বের ও দেশপ্রীতির এক অপরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সাহিত্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য।

প্রাচীন সংস্কৃত তন্ত্র পুরাণাদিতে ভিষক্ ও সাহিত্য-শাস্ত্রে স্থানে স্থানে বাঙ্গালীর হাত দেখিতে পাইতেছি—বঙ্গদেশজাত মনুষ্যের গন্ধ পাইতেছি; কিন্তু তাহার কোন নাম-ধাম ঠিকানা নাই। সে সমস্তই কোন না কোন নামস্থ ঋষির, বা দেব দেবতার নাম কর্ত্তৃকতায় প্রচলিত। তাহার প্রধান হেতু, সাম্প্রদায়িকতা। সাধারণ যতকাল জাগে না, আপনার ভাবে জগৎকে বুঝিয়া প্রকাশ করা, কিম্বা জগতের চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করা তাহার চক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে না, ততকাল মানুষ ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকতার ও মৃতভাষার শ্মশানভস্মে দেহ পবিত্রপঙ্কাপ্লুত করিয়া নিস্তব্ধ ও নিদ্রিত থাকে। সাধারণের অভ্যুত্থান ও ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থমাহাত্ম্য ও স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষেই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যও ঐ নিয়মবশেই জাগিয়া প্রাণধারণ করিয়া ও উন্নতিলাভ করিয়া আসিয়াছে।

বুদ্ধদেব ও মানব সভ্যতা।

জগতের ইতিহাসে—মনুষ্যের উন্নর্তির ইতিহাসে বুদ্ধদেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। বুদ্ধদেব একভাবে মানব সভ্যতার আদি পুরোহিত ও সাধারণ-তন্ত্রের আদি দ্রষ্টা; মানুষের পরমস্বত্বের ও মনুষ্যত্বের আদি উপদেষ্টা; শঙ্কিত, ভীত, মুগ্ধ, অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যের নেত্রে প্রথম বিজ্ঞানের সূর্য্যালোক। ভারতবর্ষীয় যজ্ঞতন্ত্র-পীড়িত ও দেবভীতিক্লিষ্ট মনুষ্যমন সর্ব্বপ্রথম এই সূর্য্যালোক প্রভাবেই জাগিয়াছিল। ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব, বুদ্ধাবতারের পূর্ব্বে মানব-জগৎ যেন এক তাপরূপ আতঙ্কে জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছিল; পূজাবলি ভিন্ন দেব-প্রীতি সাধিত হয় না এবং দেবপ্রীতি ব্যতি-রিক্ত জীবনে ধর্ম্মার্থ সিদ্ধি হয় না; পৃথিবীতে সর্ব্বত্র মনুষ্যাত্মা এই বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া, জড়িত, বিজড়িত হইয়া চলিতেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী জগতের ইতিহাসে নানা বিষয়ে অপূর্ব্ব পদার্থ, উহা মানবাত্মার প্রধান জাগরণ—মনুষ্যমনের প্রথম বিপ্লব—মানুষের ধর্ম্মে ও কর্ম্মের আদর্শে নবজীবনের সূত্রপাত—ভারতীয় ইতিহাসে উপনিষদযুগের শেষ অধ্যায়—বুদ্ধাত্মা এই উপনিষদযুগেরই সৃষ্টি। জগতের ইতিহাসে এই সময়ে বুদ্ধাত্মারই প্রকট কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্ব

দেশের কংফুশী ও পশ্চিমের হিব্রু প্রফেটগণ একদিকে এই বুদ্ধাত্মারই প্রকাশ। মানুষের আত্মাই বিশ্বপ্রভু, ও মনুষ্যত্বই সকল ধর্ম্ম-সাধনের মূল লক্ষ্য, জগতে বুদ্ধাত্মার ইহাই প্রধান শিক্ষা। এই আবির্ভাবের পর হইতে মানবজগতে যে ধর্ম্মতন্ত্র আরব্ধ হইয়াছে, তাহাই নানাদিকে, সেশ্বর ও নিরীশ্বর পন্থার, এখন যাবৎ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতেছিল। সভ্যতার ইতিহাসে বুদ্ধাত্মার ও শাক্যসিংহের শীর্ষস্থান।

বঙ্গদেশে বুদ্ধের প্রভাব।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষ এক সময়ে বৌদ্ধ-পতাকার আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার প্রভাবেই প্রাচীনকালে বেদ ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়া কর্ম্মের স্থিতি এই দেশে এত বিচলিত হইয়া গিয়াছিল যে, পরিশেষে বেদপন্থী ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগে, নবম শতাব্দীতে, কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমদানী করার আবশ্যক হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে বৈদিক ঋষির বা পৌরোহিত্যের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু সাধারণের হৃদয় মধ্য হইতে আর একটী যুগোপযোগিনী মহাশক্তির আবির্ভাব হইতেছিল, তাহা—বঙ্গভাষা।

বুদ্ধদেবই সর্ব্ব প্রথম সাধারণের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনে, ও সংস্কৃতের প্রাধান্য অস্বীকারে, তৎকালের দেশ-বিস্তৃত ভাষার মধ্যেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি লিপিবদ্ধ করার আদেশ করেন। বুদ্ধদেবের এই আদেশ গভীর অন্তর্দৃষ্টির ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। উহার গৌণ মুখ্য ফলেই, যেমন একদিকে কণ্ঠস্থ ও শ্রুতিগত বিদ্যাকে অতিক্রম করিয়া ভারতে সর্ব্বত্র সাহিত্যের লিপিরীতি বহু প্রচলিত হইয়াছিল; তেমনই অন্যদিকে, সাধারণের হৃদয়ঙ্গম মাতৃভাষা উন্নতিপথে প্রবল প্ররোচনা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহার ফলেই দেশজ, পৈশাচী বা পালী প্রকৃতি হইতে বঙ্গভাষা সমুদিত হইয়া দেশের হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্মের যুগোচিত মুখ্য কার্য্য জীবনে জগতে দেবদেবতার পূজা প্রস্তাবের অস্বীকার, ব্যক্তিগত চরিত্র-মাহাত্ম্যের আদর্শ স্থাপন ও জনসাধারণের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা। উহার ফলেই বঙ্গের জন-মন জাগিয়া উঠিয়া, স্বাধীনতা লাভ করিয়া, বঙ্গভাষাকে স্বতন্ত্র ঐশ্বর্য্যময়ী করিয়া তুলিতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, ও সংস্কৃত বশ্যতা পরিহার করিয়া, তাহাকে দেশবাসীর হৃদয়াবেগময়ী লিখিত ভাষায় পরিণত করিতে পারিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতেই ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব ব্রাহ্মণ্যের দ্বারা নির্ঘিত হইতে থাকে; এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কার্য্যে উৎসর্গলিপি প্রভৃতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, ভারতের সর্ব্বত্র বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রবাহ মধ্যেও পৌরাণিকতার প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সময়ে ভারতীয় আর্য্যমন সর্ব্বদা দেশপ্রচলিত বুদ্ধপূজা ও বৌদ্ধতন্ত্র পদ্ধতিকে হিন্দুতন্ত্রে ও পৌরাণিকতায় আত্মস্থ করিতে নিযুক্ত ছিল, প্রাচীন তন্ত্র ও পুরাণের অনেক গ্রন্থ এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যের প্রায় সমস্ত শাস্ত্রই, এই তৃতীয় শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী মধ্যে পরিবর্ত্তিত, পরিণমিত ও নূতন সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব পূজা পদ্ধতি নানাদিকে বৌদ্ধপূজা পদ্ধতিকে নির্ঘিত ও কবলিত করিতেছিল।

পরিশেষে বৌদ্ধপাল রাজগণের রাজত্ব লোপ, ও সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ আশা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

লিঙ্গমূর্ত্তি বা শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতি যে এই দেশে আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্ব হইতেই দ্রাবিড় ও কোলেরীয় জাতি মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ হয় না। বিজয়ী আর্য্যগণ ক্রমে রফারফিয়ত করিয়া বেদোপনিষৎ দর্শনের সমুচ্চভাব সঙ্গত করিয়া এই সমস্তকে মহেশ্বর ও বিষ্ণু প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই দেশে পূর্ব্বকালের দানব দস্যু, নাগ ও রাক্ষসগণ সকলেই শিলালিঙ্গ-পূজক ছিলেন। পুরাণাদিতে এই আগন্তুক আর্য্য ও দেশস্থ উপাসনার দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও মিলন-পদ্ধতি সুপ্রকট হইয়াছে, বৈদিক ব্রহ্মশক্তি ও উপনিষদের মায়া অবিদ্যা বা 'উমা হৈমবতী' যে সাংখ্য পাতঞ্জলের ছায়ায় কালী দুর্গা প্রভৃতি উপাস্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষীয় আর্য্য দ্বিজগণ অত্যুন্নত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মদর্শন হইতেই ক্রমে কল্পিত মূর্ত্তি পূজার অবতরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের এই অবতরণ বিশেষভাবে অনুধাবন করার যোগ্য। জগতের অন্য প্রবীণ ধর্ম্মে মানুষ মূর্ত্তি পূজা ও বহু পূজা হইতেই নিরাকারবাদে ও একেশ্বরবাদে উপনীত হইয়াছে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মূর্ত্তি উপাসনা বা প্রতীক উপাসনা সমুন্নত ব্রহ্মবিজ্ঞানের সমক্ষেই এবং উহার সাহায্য-ছায়াতেই সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। এই উপাসনা-পদ্ধতি বেদোপনিষদের ও ষড়দর্শনের পরবর্ত্তী-কালে ব্রহ্মবাদিগণের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহার দোষ গুণ এই স্থলে বিচার্য্য নহে; কিন্তু ইহা সত্য ঘটনা। যে রূপেই হউক, ইহা ঐতিহাসিকের বক্ষে সাধারণের জয় ঘোষণা—বিজয়ীর উপরে বিজিতের জয় ঘোষণা। দেশস্থ ঘৃণ্য, নিপীড়িত জনসাধারণের জয়ধ্বজা এই ক্ষেত্রে এই স্মরণাতীত যুগেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। অনার্য্যগণ বাহুবলে বিজিত হইয়া থাকিলেও, আর্য্যগণকে পুনর্ব্বার হৃদয়-বলে তাহাদিগকে আপনার করিতে হইয়াছিল—ইহাই আমরা দেখিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্মের প্রভাব।

ন্যূনাধিক সকল প্রবীণ সাহিত্যের ন্যায় এই ধর্ম্মের তথা পূজা পদ্ধতির প্রভাবেই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বঙ্গদেশের হৃদয় মুদ্রিত করিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সাহিত্যের ইতিবৃত্ত চিন্তা করিতে হয়। পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে প্রবল হইয়া দেশের সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল; সর্ব্বদিকে সাধারণ জাগিতেছিল। এই ধর্ম্মভাবের প্রেরণা হইতেই সাহিত্যশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল; ইহাই আমরা এই প্রসঙ্গে স্থূলতঃ পরিদর্শন করিব।

বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাব।

বঙ্গভাষার সর্ব্ব প্রাচীন সাহিত্য-রেখা আমরা পাইতেছি—একাদশ শতাব্দীর মাণিকচাঁদের গানে ও রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে। এই দুই নিবন্ধই এই সাহিত্যে সর্ব্ব প্রাচীন ও বৌদ্ধযুগের নিদর্শন। এই বৌদ্ধভাব-ধারাই বঙ্গসাহিত্যে পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির সৃষ্টি করিয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ময়ুর ভট্ট; তাঁহার পন্থায় ষোড়শ শতাব্দীতে মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, সীতারামের গৌড়মঙ্গল, সপ্তদশ

শতাব্দীতে রামদাসের অনাদিমঙ্গল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে, বৌদ্ধভাবধারা ক্রমে ম্রিয়মাণ হইয়া হিন্দুত্ব-স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে; বঙ্গদেশে স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এখন আর বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম নাই; সাধারণের মুখে 'ধর্ম্মের দোহাই' রহিয়া গিয়াছে, এবং কিংবদন্তীগত বৌদ্ধধর্ম্মই সংস্কৃতের স্রোত হইতে বঙ্গ ভাষাকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ্য ও জাতি-জন্মগত মাহাত্ম্যের প্রভাব হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার মনুষ্যত্ব আদর্শকে স্বাধীন চরিত্রমাহাত্ম্যের আকাশতলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই সমস্ত বৌদ্ধ কাব্যের নায়ক উপনায়ক কে? "প্রখ্যাত বংশের রাজর্ষি ধীরোদাত্ত প্রতাপবান" নহেন! লাউসেন, গোপীচন্দ্র, হরিচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, কুপদত্ত, হাড়িপা, কাণিপা প্রভৃতি। ইঁহারা ভক্তবীর, চরিত্রবীর; এবং দেখা যায়, অসংস্কৃত নামরূপ জাতি ধারণ করিয়াও ঐ গুণেই, পঞ্চগৌড়েশ্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও নমস্য হইয়া গিয়াছেন। কত বড় 'বুকের পাটা' এইসমস্ত বাঙ্গালী কবির! মহিমান্বিত বেদ পুরাণাদির সমক্ষে, রামায়ণ মহাভারতের হিমাদ্রি পাদদেশে, ক্ষীণ জঘন্য 'পৈশাচী ভাষার' বল্মীকস্তূপ নির্ম্মাণ করিবার কত বড় সাহস, ঐকান্তিকতা ও আত্মনিষ্ঠা! এখন দেখিতেছি, ঐ সাহস দুঃসাহস হয় নাই। হিমালয় নিঃসৃত প্রবল ভাবজাহ্নবী ধারাও তাহাকে ভাসাইয়া নিতে—গলাইয়া ফেলিতে পারে নাই। কারণ বঙ্গদেশের হৃদয়ের উপরেই যে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল! উহার অবলম্বনেই দেশদেশান্তর হইতে কোন ভাবের পলিমৃত্তিকা পড়িয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-নবদ্বীপ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে শৈব প্রভাব।

বঙ্গদেশে এই বৌদ্ধ প্রভাবকে নিরস্ত, নিয়মস্থ করিয়াছে, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব। প্রাচীন বেদ পুরাণ হইতে এই ত্রিধারা দেশ-প্রকৃতি-সঙ্গতে পুনঃ প্রবাহিত হইয়াই বৌদ্ধ-সৌভাগ্য হরণ করিয়াছে; এবং এইদেশকে আচ্ছন্ন ও অধিকার করিয়া লইয়াছে। প্রাচীন বা মনুপ্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ভেদ সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে পারে নাই, সত্য; কিন্তু বঙ্গদেশের, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দুত্ব সিদ্ধ করিয়াছে।

শৈব সেনরাজগণ বৌদ্ধ পালরাজগণকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গ অধিকার করেন। সেই সঙ্গে শৈবধর্ম্মই বঙ্গদেশে বৌদ্ধপ্রভাবকে পরাজিত, নিরস্ত ও আত্মস্থ করার সুবিধা লাভ করে। ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক সর্ব্বত্র এই শৈব সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই বৌদ্ধসম্প্রদায় পরাজিত ও কবলিত হইয়াছে।

শৈবধর্ম্ম নানাদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের আত্মীয় ও সহোদর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সমধর্ম্মা বলিয়াই শৈব আদর্শ সহজে বৌদ্ধ শ্রামণ্যকে পরাজিত ও কবলিত করিতে পারিয়াছিল। বৈরাগ্যগুরু বুদ্ধচরিত্রের স্থলে পরম সন্ন্যাসী শিবচরিত্রের প্রতিষ্ঠা করা কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য হয় নাই, মহাশূন্য নিরঞ্জন ধর্ম্মমূর্ত্তির স্থলে লিঙ্গোপাধিক নির্গুণ শিবসংজ্ঞা অনায়াসে জুড়িয়া বসিয়াছে। শ্রমণগণের হরিদ্রা বর্ণ সামান্য প্রলেপেই গৈরিকবর্ণে পরিণত হইয়াছে। মুণ্ডিত-শির পরমহংসাবস্থায় রক্ষিত হইতে বা ইচ্ছামাত্রেই জটাজালে আবৃত

হইতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষের ৭ম হইতে ১২শ শতাব্দীর ধর্ম্মেতিহাস এই শৈবকর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রাসের ইতিহাস মাত্র। মুসলমানের আক্রমণ অবশিষ্টটুকু হিন্দুসাপক্ষে তথা নিজের সাপক্ষেও সম্পাদন করিতে পারিয়াছিল। সহৃদয়-সংসর্গী মুসলমান, হিন্দুগণের অগ্রগামী হইয়া সহজেই নিরীশ্বর বৌদ্ধকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন; ভারতের সর্ব্বত্র মুসলমান সংখ্যা এই ত্রিশঙ্কুদশায় অবস্থিত বৌদ্ধগণের দ্বারাই বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে শৈবপ্রভাবের স্বল্পতা।

কিন্তু শৈবধর্ম্ম বৈরাগ্যপ্রিয়। নির্ব্বাণ মুক্তিবাদীর চক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্যের বা লোকস্থিতির কিছুমাত্র গৌরব বা আ[illegible] নাই। এই নির্ব্বাণবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ায় ভারতবর্ষের প্রকৃত সাহিত্য কিছুমাত্র পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। বঙ্গসাহিত্য-ভূমেও ইহারই প্রমাণ পাই। এই দেশেও পরম দার্শনিক শৈবধর্ম্ম কেবল বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরস্ত করিয়াই বিরত হইয়াছে; ইহার সাহিত্যে কোন বিশেষ রেখাচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। শিবমহেশ্বর বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণকে পরমা মুক্তি পুরস্কার করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের ভবজীবনের বা হৃদয়গতির কোন নিদর্শন পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে অনুমতি বা অবসর দেন নাই। শৈবগণের উদ্দেশে বঙ্গসাহিত্যের স্মৃতিঋণ সামান্য—অবশ্য তাঁহারাও তাদৃশ লৌকিকতার প্রত্যাশা রাখেন নাই।

বঙ্গসাহিত্যে শৈবগণের কার্য্যরেখা দেশস্থ বর্ত্তমান শৈবপ্রভাবের অনুপাতেও পর্য্যাপ্ত নহে। যে কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহারাও রসবৈচিত্র্যহীন ও পূর্ব্ব কবিকৃতিকে পাদপীঠ করিয়া আচ্ছন্ন করিয়াই দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে রামকৃষ্ণ দাসের শিবায়ন, রামরায়ের মৃগব্যাধ-সংবাদ, রতিদেবের মৃগলুব্ধ, হরিহরের বৈদ্যনাথ-মঙ্গল (১৭শ শতাব্দী) ও রামেশ্বরকৃত আধুনিক শিবায়নমাত্র উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালীর হৃদয় ও শৈব-বৈরাগ্য।

বঙ্গসাহিত্যে শৈবপ্রভাব-হীনতার প্রধান কারণ কি? শৈবগণের অসামাজিকতা ও অসাংসারিকতা। তদ্ভিন্ন শিবঠাকুর যে স্থলেই শক্তিসহযোগে উপস্থিত হইয়াছেন, সর্ব্বত্র তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে; বাঙ্গালী তাঁহার রজতগিরি-গাত্রে কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করিতেও ছাড়ে নাই; তাঁহার মাহাত্ম্য যে বা[illegible] কবির আন্তরিকী প্রীতিভক্তি ও [illegible] কর্ষণ করে নাই, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। "ধান ভানতে শিবের গীত" যেমন নিষিদ্ধ, 'বাসর ঘরেও শিবের গীত' নিষিদ্ধ হইয়াছে, সংসারের গৃহচ্ছায়াতেও শিবের গীত নিষিদ্ধ হইয়াছে। শিবের গীত কেবল সন্ন্যাসীর গাজনতলায় নতুবা শ্মশানে। পূর্ব্ব দেশে আগত হইয়া বৈদিক রুদ্রদেব ভোলানাথও ভাঙ্গড় হইয়া, শ্মশানমশান-বাসী হইয়াই ঘুরিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালী এই শিবনিগ্রহের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে শক্তির চরণে—চণ্ডীর, অন্নপূর্ণার, উমার চরণে। ভাগীরথীর অমৃতস্তন্য-পরিপুষ্ট বাঙ্গালী জগতে একটী কথা বিশেষভাবে চিনিয়াছে—'মা'! ভারতের কোন জাতি চিনিয়াছে 'জয় সীতারাম', কোন জাতি চিনিয়াছে 'জয় হর হর শম্ভো!', বাঙ্গালী চিনিয়াছে 'মা'! মাতৃভাবের উপাসনায়, উদ্দীপনায় এত কাব্য কবিতা হৃদয়গাথা অন্য কোন ভাষায় রচিত হইয়াছে কিনা, জানি না। রোমান কেথলিক যুগে য়ুরোপে—বিশেষতঃ ইটালীতে মাতৃভাবের অবলম্বনে র‍্যাফেল প্রভৃতি কয়েকখানি জগৎ-

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন; ম্যারী মাতাকে অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের মধ্যযুগে কিছু ভক্তিসাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার তুলনায় তাহা সামান্য।

বঙ্গসাহিত্যে শাক্তপ্রভাব।

জগৎপ্রকটিতা ঐশীশক্তিকে জগদীশ্বর হইতে অভিন্ন বিশ্বাস করিয়া, মাতৃভাবে উপাসনা করাই শাক্ত উপাসনার প্রধান লক্ষণ। এই শক্তি এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক; শক্তি বিশ্বমাতা। বাঙ্গালীর ভক্তি রতি ও সারস্বতী প্রতিভা এই মাতৃভাবে বিশেষ খেলিয়াছে, বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর জাতীয়ধর্ম্ম শাক্তধর্ম্ম বলিলে অযুক্ত হইবে না। আবার, বেদের আর্য্যগণ বিশ্বজগৎ পুংদেবে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন; উপনিষদের দার্শনিকগণ উহাকে "ন সৎজানৎ" নির্দ্দেশে, "অশেষো মহাত্ম" ইত্যাদি মতে ক্লীবযোনিত্বে ও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালী তাহাকে "অনন্ত জগদাধারা শক্তিভূতা সনাতনী"—জগদ্রূপিনী চিন্ময়ী ও মৃণ্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সমগ্র জাতিটীর অধ্যাত্মচরিত্রের পরিচয় প্রকট হইয়াছে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"কে জ্ঞাতসারে বহুভাবে দর্শন ও আরাধনা সমগ্র হিন্দুজাতির বিশেষত্ব; পুনশ্চ উহাকে মাতৃভাবে তথা তনয়ার ভাবে দর্শন ও উপাসনা বিশ্বধর্ম্মের মধ্যে বাঙ্গালীরই বিশেষত্ব। 'মা' নাম অপেক্ষা বৃহৎ, মহৎ ও মধুময় শব্দপদ বঙ্গভাষায় নাই। জগতের অন্য ভাষায় আছে বলিলে বাঙ্গালী তাহা বিশ্বাস করিবে না। তাহার ধর্ম্মে, সমাজে, পরিবারে ও দেশে—ইহকালে ও পরকালে এই মাতৃভাবের অক্ষুণ্ণ রাজত্ব; সর্ব্ব দেবতার মধ্যে এই মাতৃমূর্ত্তিই একেশ্বরী। শাক্তগণ বলিবেন, যেমন বেদের উষা নিশা দ্যাবা পৃথিবী ও অদিতি, সূর্য্য, সোম, ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি, তেমন কালী দুর্গা, দশমহাবিদ্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি সেই একই আদ্যাশক্তির নাম রূপান্তর; ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের উপাস্যা। এই ক্ষেত্রেই বৈদিক শাক্তবাদের সঙ্গে পৌরাণিক তথা আধুনিক শাক্তবাদের সামঞ্জস্য। এই শক্তিমাতার উদ্দেশে বঙ্গে শত শত কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে—অনেক গ্রন্থ ভাষা ও ভাবমাহাত্ম্যে এই দেশে এখন যাবৎ সমাদৃত ও পঠিত হইতেছে।

বঙ্গসাহিত্যে এই পর্য্যন্ত ৫ খানি শীতলা-মঙ্গলের উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে দৈবকী নন্দনের শীতলামঙ্গলই সর্ব্ব প্রাচীন। সাকার শীতলা পূজা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের সৃষ্টি, এবং এই পূজা এখন যাবৎ পূর্ব্ব বৌদ্ধ ডোম পণ্ডিতগণেরই নিজস্ব। বঙ্গসমাজে ধর্ম্ম-দেবতার মাহাত্ম্য ক্রমে ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে; শীতলা-মাহাত্ম্য এখনও বর্ত্তমান আছে। বৌদ্ধ পূজা অপ্রতিষ্ঠ হইলে, শীতলা দেবীকে আত্ম মাহাত্ম্য রক্ষণে ও প্রচারে বিশেষ চিন্তিতা হইতে দেখা যায়। ক্রমে ব্রাহ্মণ যাজকেরাও শীতলা পূজা অধিকার করিয়া পৌরোহিত্য করিয়া লইয়াছেন।

বিষধর সর্প-সঙ্কুল বঙ্গভূমির দেবী বিষহরী, শীতলার ন্যায় তিনিও শিবদুহিতা। এইস্থলেও আর্য্য দ্রাবিড়ের সম্মিলন; দেশস্থ জনসাধারণের ভাবের সহিত বিজয়ী আর্য্যগণের অকপট সন্ধি। এইসন্ধিগতিকে আর্য্যমহিমা কথঞ্চিত খর্ব্ব হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্য নির্ব্বিশেষে মিলিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে; জাতীয় জীবনের ও দেশভাষার সূত্রপাত হই-

আছে। মনসামঙ্গলে সর্ব্বত্র শিবভক্তের সঙ্গে মনসা দেবীর সংগ্রাম, তৎপর সন্ধি। চাঁদ-সদাগর শৈব ও বঙ্গভাষার নিজস্ব সৃষ্টি। শিব নিজের ভক্তকে নিগৃহীত করিয়াও, নিজের আধিপত্য খর্ব্ব করিয়াও দুহিতার আব্দার রক্ষা করিয়াছেন—মর্ত্তলোকে মনসার পূজা প্রচলনে সাহায্য করিয়াছেন; ইহাই মনসামঙ্গলের বক্তব্য। মনসামঙ্গলের আদি কবি কায়স্থ 'কাণা হরি দত্ত' (১৪শ শতাব্দী) তাঁহার পন্থায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব পদ্মপুরাণ রচনা করিয়াছেন। মনসার মাহাত্ম্য ঘোষণা ও পূজা প্রচার করিয়া শতাধিক কবি (প্রায় বঙ্গের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে) কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দেবতার প্রতি অহেতুকী প্রীতি, ভক্তি বা নির্ব্বাণ মুক্তি উদ্দেশ্যে উদ্দীপ্ত হইয়াই এই কবিসংঘ এই কাব্য-কোলাহল উত্থাপিত করেন নাই। উহার প্রধান উদ্দীপক কারণ,মাতা বিষহরীর অনুরক্তগণের ভয়—এবং এই ধর্ম্ম-ভীরুতার উদ্রেকই এই সমস্ত কাব্যের মুখ্য অবলম্বন। জীবনটা নিতান্ত তুচ্ছ নহে, সুতরাং ভক্তি-মুক্তি-প্রদাতা হরিহর দেবতাগণকে একপার্শ্বে রাখিয়া আপাততঃ পুত্রপৌত্র-আত্মরক্ষা কল্পে এই দেবীর শরণাপন্ন হওয়া বাঞ্ছিত; বাঙ্গালী কবি অম্লান মুখে এই হিতবাদের আশ্রয় করিয়াছেন, এবং আসরে নামিবার পর অনাবিল ভাবাবিষ্ট হইয়া তদ্গতিবশে সময় সময় প্রকৃত কবিত্বের ডিগ্রি-সীমাও স্পর্শ করিয়াছেন। বঙ্গে বৌদ্ধগয়া ও জ্ঞান-বৈরাগ্যবাদী শৈব-ধর্ম্মের সঙ্গেই মনসার পূজারীগণকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল—তাঁহারা এই ক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়াছেন।

বাঙ্গালী ও শাক্ততন্ত্র।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের শাক্ততন্ত্রগুলিতে বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালীর—প্রায় সর্ব্বত্র বঙ্গদেশবাসীর কররেখা পরিদৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালী প্রাচীন শাক্ত ও বৈষ্ণব পন্থাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া—বিশেষ ভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে, মনসা-কাব্য তাহার নিজস্ব—চণ্ডীকাব্যও তাহার নিজস্ব। চণ্ডীপূজা প্রাচীন সুবচনী ও মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রত কথার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচালী কথায় প্রচলিত ছিল, বঙ্গবাসী কবি উহাকেই সুবৃহৎ চণ্ডীকাব্যে ও জাগরণে পরিণত করিয়াছেন। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এই জাগরণ বঙ্গ-সমাজে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাগরণের আদি কবি বলরাম। তৎপর ষোড়শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য ও ভবানী-শঙ্কর পূর্ব্ব গুরুপন্থায় নূতন জাগরণ রচনা করেন। উভয়ের ছায়ায় বসিয়া মুকুন্দরাম বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গ্রাম্যকবি মুকুন্দরাম।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল বাঙ্গালীর নিজস্ব, বলিয়াছি। উহারা সর্ব্বতোভাবে বঙ্গদেশ-জাত ও উহাদের সংস্কৃত সম্পর্কও সামান্য। প্রাচীন বঙ্গদেশের সমাজের ও পরিবারের রীতি নীতি এই সকল কাব্যে নানাদিকে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আবার এই সকল কাব্য নাগরিক জীবনের বা রাজ সভার সৃষ্টিও নহে। গ্রামদেশে প্রাত্যহিক জীবনের ছায়ায় বসিয়া, মানবজীবনের সুখ দুঃখ রসে গভীর গাহী, সবল সুস্থদেহ বাঙ্গালী কবি আপন হৃদয় মধ্য হইতে এই স্বভাব সঙ্গীত উৎসারিত করিয়াছেন। নারায়ণ দেব বিশেষতঃ মুকুন্দরাম প্রাচীন বঙ্গভূমির অমূল্য সম্পত্তি। কালকেতু ও চাঁদসদাগর বেহুলা ও খুলনা প্রস্তর-খোদিত জীবন্ত ভাস্কর্য্য-মূর্ত্তি। বিশেষতঃ কালকেতু! ভাবিয়া দেখুন, ঐ চরিত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু-মাত্র প্রভাব নাই; বঙ্গসমাজের অত্যন্ত রাগী অস্পৃশ্য ব্যাধযুবকের প্রতি কোন্

ব্রাহ্মণ সদয় দৃষ্টি করিবে? তবু দেখুনঃ—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি,
সবার লোচন সুখ হেতু।
নাক, মুখ, চক্ষু, কাণ, কুন্দে যেন নিরমান
দুই বাহু লোহার শাবল।
রূপ, গুণ, শীলপড়া বাড়ে যেন হাতী কড়া
যেন শ্যাম চামর কুণ্ডল।
দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে ডাণ্ডা গুলি ভাঁটা
কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধানে রাঙ্গা ধড়া, মস্তকে জালের দড়া
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল।"

এই অপরূপ বর্ণনার রসে ও ছন্দে যেন একটা অপূর্ব্ব সঙ্গীতের—সৌরভের আভাস পাইতেছি; উহা কাহার?—কবি হৃদয়ের। মনুষ্য জীবনের প্রতি, এই সুখ দুঃখের, পরম প্রাণানন্দময় মানব জন্মের অতি পরম সহানুভূতি না থাকিলে, কবি হৃদয় অকপট ভাবে ব্যক্ত হইতে না পারিলে এই সৌরভ, এই সঙ্গীত উঠিত না। বিশ্বজগৎ জীবনানন্দে পরিপূর্ণ; জীবনের এই ভূত রঙ্গভূমে উপনীত হইয়া মানবাত্মা শিশুভাবেই ক্রীড়া করিতেছে। ব্যাধেই হউক আর ব্রাহ্মণেই হউক, জীবজগতের অধ্যাত্মবাসী এই পরম শিশু মূর্ত্তির সহিত সহানুভূতি না থাকিলে প্রকৃত কবিত্ব শক্তির জন্ম হয় না। চিন্তা করুন, বঙ্গসাহিত্যের সেই অর্দ্ধজাগরণের উষাযুগে, এই মুকুন্দরাম বাঙ্গালার পল্লীপথে আনন্দোম্মিলিতনেত্রে চারিদিক পরিদর্শন করিয়া, আচণ্ডাল মনুষ্যহৃদয় সঙ্গে নিজের হৃদয়কে সহানুভাবক করিয়া চলিয়াছেন; চারিদিক অন্যকে দেখাইয়া বলিবার শক্তিও তাহার জন্মিয়াছে। ভাষার বস্তুব্যঞ্জনাশক্তি—পরিস্ফোটনী শক্তি, কবিত্বের আদিম ও প্রধান লক্ষণ এই কবির হৃদয়ে অকৃপণ ও অকপট প্রকাশ দেখিতেছি!

দীনহীন ব্যাধের জীর্ণকুটীরে পরম ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তিতে ভগবতীর আবির্ভাব ও ফুল্লরার চরিত্র—বঙ্গসাহিত্যে এখনও অতুলনীয়। এই অদ্ভুত কল্পনা রসানন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে কাহার? কবির নেত্রে এই চিত্র কিসে এই অপরূপ প্রগল্‌ভতা ও মহিমা লাভ করিতে পারিয়াছে? এই প্রগল্‌ভতাও স্বয়ং কবিহৃদয়ের নহে কি? দারিদ্র্য দৈন্যপূর্ণ জীর্ণ কুটীরবাসী গ্রাম্যকবি হৃদ্‌পদ্ম-বিলাসিনী মহাশক্তির অধিষ্ঠানে সুপ্রশস্ত ও বিশ্ববিস্তৃত হইতে না পারিলে এই অপূর্ব্বতা সম্ভব হইত না। এই কবির নিসর্গ সহানুভূতিও অসাধারণ; আর একটী দৃশ্য দেখুন—বিরহিণী খুল্লনার দৃশ্যঃ—

মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন
অশোক কিংশোকে রামা করে আলিঙ্গন।
কেতকী ধাতকী ফোটে চম্পক কানন
কুসুম পরাগে প্রথ হৈল অলিগণ।

দুঃখান্ধকার-নিমগ্না হতভাগিনী যুবতীর হৃদয় এই নির্জ্জীব অশোক কিংশুক পদার্থকে কেন আলিঙ্গন করিতেছে! এই কোমল মধুর উজ্জ্বল রক্তরাগ ভাস্বর বস্তুবিষয়ে বিরহিণীর এই সৌহার্দ্দভাব কেন? বিরহিণীর এই মতিরতি ও কবিহৃদয়ের এই গহন মর্ম্মগতি কে হৃদয়ঙ্গম করিবে? আবার, মনুষ্যের দুঃখের মধ্যে বিশেষতঃ প্রেমের বিরহ দুঃখের মধ্যেই একটা গুপ্ত ও অতর্কিত আনন্দ আছে কি? এই আনন্দ দুঃখিনীর, না কবির? উভয়ের নহে কি?

মুকুন্দরাম দুঃখের কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি জীবনে অনেক দুঃখদৈন্য ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

কিন্তু তাই বলিয়া কি হইবে? তিনি যে আপন তত্ত্বের নিগূঢ়তম আনন্দ-মন্দিরে অবস্থিত থাকিয়া নিজের জীবনের, তথা জগতের সকল সুখদুঃখ দৃশ্যের দর্শকমাত্র ছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে না। নিজের তথা জীবরঙ্গভূমির সুখ দুঃখকে ভিতর হইতে আনন্দাভিনিবেশে—ন্যূনাধিক নির্লিপ্তভাবে—তামাসার ভাবে দেখিতে না জানিলে কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে কবি হইতে পারেন না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুঃখের নামও আনন্দ। কবির হৃদয় মধ্যে সাংসারিক সুখ দুঃখ আনন্দ মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইতে না পারিলে সাহিত্য জন্মলাভ করিত না। কবিত্বের প্রধান উপাদান জীবনপথে আনন্দসিদ্ধি। এই গ্রাম্য কবি জীবনের পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্য কি ভাবে জাগিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই কবি সম্পর্কে এইমাত্র বলিয়া বিরত হইব, সাহিত্য শক্তির প্রধান উপাদান কবির আনন্দসিদ্ধি ও সত্যদৃষ্টি বা সহানুভূতি; সর্ব্বোপরি, হৃদয়মর্ম্মের নামরূপ-প্রদায়িনী সৃষ্টিশক্তি। প্রাচীন বঙ্গের ক্ষেত্রে দুই একস্থলে ভারতচন্দ্র ব্যতীত, সর্ব্বদিকে এই কবিকঙ্কণের সমজাতীয় সমকক্ষ ব্যক্তি আর নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিশ্বনাথ বা লোচনদাস হয়ত আনন্দোচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতায় ইঁহাকে স্থল বিশেষে অতিক্রম করিয়াছেন; কৃত্তিবাস ও কাশীদাস সমুন্নত সংস্কৃত আদর্শের সহানুভূতি ক্ষেত্রেও ইঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন, স্বীকার করিব। কিন্তু মানব জীবনের—প্রকৃত বাঙ্গালী জীবনের মধ্যক্ষেত্রে 'আসর গাড়িয়া' সাধারণের মধ্য হইতেই অসাধারণতার ভাব উজ্জ্বলিত করিয়া, জাতীয় সাহিত্য নির্ম্মাণের সুদৃঢ় ভিত্তি পত্তন করিতে কবিকঙ্কণের এই ভাষা, এই হৃদ্‌গতি, এই দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি পরম মহার্ঘ বিবেচিত হইবে।

নাগরিক কবি ভারতচন্দ্র।

শীতলা, মনসা, সুবচনী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বহু পরিমাণে সংস্কৃত সম্পর্কহীন, ও বঙ্গদেশের নিজস্ব, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এই সমস্ত ভাবমূর্ত্তি ও কাব্যাদর্শ বঙ্গীয় সাধারণের জাগরণ ও জয় ঘোষণা করিতেছে। এতদ্ভিন্ন কালী বা দুর্গা বিষয়ে স্বতন্ত্র সাহিত্যও সংস্কৃত প্রভাবে উৎপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কালী দুর্গা পৌরাণিক দেবতা। প্রাচীন দ্বৈতবাদী ঋষির 'প্রকৃতি পুরুষের' একতমা, প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন দেশজ বা দ্রাবিড়ভাব-সামঞ্জস্যে আর্য্য পৌরাণিকগণ জগদ্ব্যাপার মধ্যে কালী ও দুর্গা মূর্ত্তির দর্শন করিয়াছিলেন। সংস্কৃতমার্কণ্ডেয় পুরাণ কালিকা পুরাণ প্রভৃতির ছায়ায় বহু বাঙ্গালী কবি কালী ও দুর্গাবিষয়ক 'মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে গোবিন্দ দাস (১৬শ শতাব্দী) মধুসূদন কবীন্দ্র (১৭শ) রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্রই (১৮শ) শ্রেষ্ঠ। রাজকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সুমার্জ্জিত শব্দমন্ত্রে ও ছন্দোবন্দে বঙ্গীয় কবি সমাজে চিরকালের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এই কালেও তাঁহার কাব্য পাঠক ও রসানুভাবক ব্যক্তির অভাব নাই। প্রাচীন বঙ্গের রাজসভায় উপস্থিত হইতে, বঙ্গসরস্বতীকে আপন ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া যতদূর সালঙ্কার, সংযত, সংবৃত ও সংস্কৃত হওয়া সম্ভব ছিল, এই কবির গ্রন্থে তাহারই পরিচয় পাই। ভারতচন্দ্রের বাক্য-কৌশল অসাধারণ, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

এই সকল ব্যতিরিক্ত, মাতৃভাবুক ও মাতৃ

পূজক বাঙ্গালীর হৃদয়ে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি অনেক শক্তি-দেবতা পূজালাভ করিয়াছেন। ষষ্ঠী গৃহস্থ রমণীর সন্তানরক্ষণী দেবতা; লক্ষ্মী ধনধান্যের দেবতা; সরস্বতী বাক্‌দেবতা। শতাধিক কবি ইঁহাদের স্তুতি পূজা করিয়াছেন; কিন্তু এই সমস্ত পন্থায় বাঙ্গালী কবির শক্তি যেন বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই, উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বস্তুরূপে প্রকটিত হয় নাই।

পৌরাণিক ঋষি হৃদয়পদ্মাসনে বিশ্বজগতের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মীর, বিশ্ববাণীর অবিশ্ব ভাবিনী মহাশক্তির যে কমনীয় অতুলনীয় মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় কবিহৃদয় চিরকাল তাহাদের চরণে ভক্তি প্রীতিমমতায় নত হইয়া আসিতেছে। বৈদিক দেবদেবীগণের মধ্যে যেমন উষা কবিহৃদয়ের চিরানন্দভাগিনী, পৌরাণিক দেবদেবীগণের মধ্যে তেমন এই শ্রীঃ, সরস্বতী ও চণ্ডী, এই তিনটীই ক্রমে পৌরাণিক-দৃষ্ট 'কার্য্যব্রহ্মের' —বিষ্ণু ব্রহ্মা মহেশ্বরের শক্তি। এই ক্ষেত্রে ভাবতত্ত্বের প্রকট নিরূপণে ও নির্দ্ধারণে (idealization, symbolization) পৌরাণিক ঋষি-কবির হৃদয় অপরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু এই লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রাচীন বঙ্গকবির হৃদয়ে অনুরূপ পূজা লাভ করিতে পারেন নাই, স্বীকার করিতে হইবে। এই শ্রী ও বাণীর ভক্ত হইতে হইলে হৃদয়-জীবনের যে পরিমাণ নিষ্কাম মাহাত্ম্য ও ভাবতন্ময়তা সিদ্ধি করিতে হয়, উহা তৎকালের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ছায়ায় অসম্ভব ছিল, বলিতে হইবে।

গায়ক কবি রামপ্রসাদ।

যা'হোক, এই শাক্তভাবের ছায়ায়—কালী ও দুর্গাভক্তির পন্থায় এক অপূর্ব্বরসাল সঙ্গীত কবিতার উদ্ভব হইয়াছে, প্রাচীন বঙ্গীয় গীতি কবিতা-ক্ষেত্রে মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাস-ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ সেনের ও দাশরথি রায় প্রভৃতির সঙ্গীত পরম বিশিষ্ট-তত্ত্বরসে উজ্জ্বল। রামপ্রসাদকে কেবল প্রভৃতির মধ্যে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। রামপ্রসাদ বঙ্গদেশীয় শাক্তহৃদয়ের, সমগ্র বাঙ্গালী মাতৃপূজকের অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাস। তাঁহার সঙ্গীত হয়ত আধুনিক সাহিত্যাদর্শকে সর্ব্বদিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না; কিন্তু যাঁহারা হৃদয় লইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা দেখিবেন, পৃথিবীর সাহিত্যেও বুঝি এইরূপ নির্ম্মল মাতৃভাব মুগ্ধ-স্বভাব শিশু আর দ্বিতীয়টী জন্মগ্রহণ করে নাই। রামপ্রসাদের আন্তরিকতাও অসাধারণ। অভিনিবেশ করিলেই বুঝিবেন, এই লোকটী কেবল সাধারণভাবের প্রচলিত সাহিত্যাধিকারের কবি নহেন; তাঁহার কথার মধ্যে সাধারণ সাহিত্য-রসের বহিঃক্ষেত্রীর আর একটা কিছু আছে, কেবল বাক্যশক্তি যাহাকে আয়ত্ব করিতে বা সঙ্কেত করিতেও পারে না।

বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব।

বঙ্গসাহিত্যে শাক্তপ্রভাবের পর প্রধানতঃ বৈষ্ণব প্রভাবই চিন্তনীয়। আমরা জানি, বেদের সহস্র-শীর্ষা বিরাট বা উপনিষদ বেদান্তের কার্য্যব্রহ্মই পুরাণাদিতে বিষ্ণুনামে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মকে প্রেমপবিত্রতা, কল্যাণ করুণাময় জানিয়া ভক্তগণ ধ্যানসম্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার বাহ্যপূজার আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন; অবতারবাদ বা নরনারায়ণবাদও অবলম্বন করিয়াছেন; শাক্তের সকামপূজা বা শৈবের বৈরাগ্য সন্ন্যাস পরিহার পূর্ব্বক ভগবানের পরম প্রীতিরসৈকনিষ্ঠ উপাসনা-প্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন, বিষ্ণূপাসনাকে প্রচার প্রচলনের আবশ্যক করে নাই; প্রথম হইতেই বিশেষতঃ

রামানুজ প্রভৃতির কার্য্যফলে সমগ্র হিন্দুসমাজ বিষ্ণুপূজা অপরিহার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। আপন হৃদয়তন্ত্রতার ফলে, বাঙ্গালী সংস্কৃত বা আর্য্য-প্রভাব হইতে নিজকে ন্যূনাধিক স্বাধীন করিয়া বঙ্গদেশে এক স্বতন্ত্র ভাব সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে; মানুষের মধ্যেই দেবত্বের উদ্দেশ ও উপলব্ধি করিয়া তাহাকে পরম ভক্তিভরে পূজা করিয়া ফেলিয়াছে. সর্ব্ববিস্মৃত হৃদয়রসে চালিত হইয়া বৈষ্ণবগণ শান্তদাস্যসখ্য-বাৎসল্য ও মধুরভাবে ভগবানকে আপনার প্রিয়তম-নিকটতম করিয়া উপাসনা করিয়াছেন। উপাস্যের আদর্শসংসর্গে বৈষ্ণব উপাসকের প্রকৃতি যেরূপ সরল, কোমল, মধুর ও উজ্জ্বল হয়, জগতের অন্য কোন উপাসনা প্রণালীতে তাহার তুলনা নাই। কেবল ভগবানের সম্বন্ধেই যে বৈষ্ণবের এই কোমলতা, তাহাও নহে। বৈষ্ণব বিশ্বজগতের সম্পর্কেও এই কোমলতার ও মধুরতার সাধনা করেন। শৈবধর্ম্ম দার্শনিকের, শাক্তধর্ম্ম বীর ও কর্ম্মীর, বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষভাবে কবির। কবিত্বের প্রধান কারণ বুদ্ধির দ্রুতি ও প্রকাশ শক্তি, হৃদয়ের সলিলগতি ও নমনীয়তা। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, মহামতি রাস্কিন যাহাকে infinite tendency বলিয়া ছেন; জুবেয়ার যাহাকে delicacy ও সেক্ষপীয়র যাহাকে fine frenzy বলিয়াছেন। অন্তস্তত্ত্বে বৈষ্ণবী প্রথার এই মধুর সরলতা ও সর্ব্ব সত্যরসভাবগ্রাহী কোমল কঠোর নমনীয়তা, উজ্জ্বলতা ও গম্ভীরতা সিদ্ধি ভিন্ন কেহই কবিত্ব লাভ করিতে পারেন না। প্রাচীন আলঙ্কারিকের মতে কবিবাক্যের, তথা কবিহৃদয়ের এই গুণসমবায়ের নাম দ্রুতি, দীপ্তি ও প্রসাদ। সুতরাং কবিহৃদয় মানব আত্মার জ্ঞানকর্ম্মভাবের সমঞ্জসিত প্রকাশরূপে পরম মহার্ঘ ও গরিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সকল কবিই অধ্যাত্মতঃ বৈষ্ণব। এই দেশে যেমন নিরাকার উপাসক ভানুসিংহকে, তেমন শৈবদীক্ষা-প্রাপ্ত নবীনচন্দ্রকেও, আপন তত্ত্বের প্রেরণায় বাধ্য হইয়া বৈষ্ণব হইতে হইয়াছিল। বৈষ্ণবী প্রথা যে কবির পক্ষে অপরিহার্য্য, এই দৃষ্টান্ত তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক হিন্দুই স্বীকারতঃ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব; প্রত্যেক বাঙ্গালীকে—সাধকমাত্রকেই অন্তঃকরণে এই শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবের সামঞ্জস্য সিদ্ধি করিতে হয়। এই সামঞ্জস্যই তাহার চক্ষে মনুষ্যত্বের আদর্শ। জাতির মধ্যে এই ত্রিসাধকের অভ্যুদয় সমধিক বা যথেষ্ট না হইলে, কোন জাতিই জগতে মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে না। বাঙ্গালী তাহা যে পরিমাণে পারে নাই, সেই পরিমাণেই নীচে পড়িয়া আছে।

বাঙ্গালীর জাতীয়তায় বৈষ্ণব পন্থা।

বাঙ্গালীর জাতীয়তার—উহার জন সাধারণের প্রথম জাগরণের যুগে, এই ত্রিপন্থা তাহার নেত্রপথে প্রমূর্ত্ত হইয়াছিল, আমরা দেখিতেছি। বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গালীজাতির সেই প্রাথমিক হৃদয়স্পন্দন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। আমরা শৈব ও শাক্ত ভাবের সাহিত্য দেখিয়া আসিয়াছি, এখন বৈষ্ণব সাহিত্য চিন্তা করিব। এই বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রাচীন বঙ্গের অমূল্য-সম্পত্তি; পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ পথে গিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিতেছি।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাগবতাদিতে বৈষ্ণবপন্থা পরিস্ফুট হইয়াছিল; বাঙ্গালী সেই পন্থায় চলিয়া তাহার নিজের ভাবে নিজের ভাষায় পরমরসাল কাব্যকথার ও গীতিসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সাহিত্যের রাধা ও

কৃষ্ণ বাঙ্গালীর নিজস্ব। প্রাচীন আর্য্যদার্শনিকের পুরুষ ও প্রকৃতি মানবতত্ত্বের চিরকালের পুরুষ ও স্ত্রী, এই বৈষ্ণব সাহিত্যে পরস্পর মধুররসে—রাসরসে বিহার করিয়াছে, উভয়ের পূর্ব্বরাগ মিলনবিরহ মান অভিসার, রাসলীলা ও সম্ভোগ বৈষ্ণব-কবি অতুলনীয়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং এই কবিতা মনুষ্যহৃদয়ের চিরকালের কবিতা। এই ক্ষেত্রে ধর্ম্মও কবিতা, কবি ও ভক্ত পরস্পর তত্ত্বে ওতঃপ্রোত আত্মবিস্মৃত হইয়া অপরূপ রসানন্দে বিলসিত হইয়াছে। আদর্শের ভাবে এই বৈষ্ণবগণ প্রত্যেকেই রাধা; বিশেষতঃ তাঁহারা পূজা প্রচার প্রভৃতি লৌকিক বা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াই গান করিয়াছেন; সুতরাং এই সঙ্গীতে ধর্ম্মশাস্ত্র বা নীতি নির্দ্দেশের লক্ষণ মুখ্য হইতে পারে নাই ও উহা সাহিত্য হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব গীতি কবিতার মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম নীতিধর্ম্মশাস্ত্রের কবল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ম্মল সাহিত্যালোকে উপনীত হইতে পারিয়াছিল; বৈষ্ণব পদাবলী তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালী প্রেমতত্ত্বের প্রিয়তম তত্ত্বের উপনিষদ গাহিয়াছিল; তাহার হৃদয়মধ্য হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া বঙ্গভাষার অনাবিলভাবে এই উচ্ছ্বাস বহিয়াছিল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির বৈষ্ণবসঙ্গীত ও রামপ্রসাদ প্রভৃতির শাক্তসঙ্গীত ইহার প্রমাণ।

বঙ্গে গীতি-কবিতা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বৈষ্ণবসঙ্গীতের আদি কবি—বলিতে গেলে তাঁহারাই বঙ্গভাষার আদি কবি ও প্রেমতত্ত্বের আদিম, প্রধান ও শেষ কবি। বাঙ্গালীহৃদয় মধুরভাবের যতরকম উচ্ছ্বাস গ্রহণ ও বহন করিতে পারে, সংসারসমাজ বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা উহাই উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; হৃদয়ের শোণিতরক্ত সম্পর্কে তপ্ত দীপ্ত মধুর ও সর্ব্বথা অতুলনীয় এই প্রকাশ! বিগত ৫০০ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার সঙ্গীত কাব্যকারগণ ইঁহাদের পন্থাতেই চলিয়াছেন ও ইঁহাদের কথা লইয়াই 'নাড়াচাড়া' করিয়াছেন। কালধর্ম্মে আমাদের মধ্যে, এই ক্ষেত্রে কেবল বাক্য ও ছন্দোবৈচিত্র্য ও তাত্ত্বিকতা ফুটিয়া উঠিতেছে—অতিরিক্ত হইতেছে বই নহে। এই ক্ষেত্রে সরলতা, আন্তরিকতা বা স্বাধীনতা বা উচ্ছ্বাস বিষয়ে আমরা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই। ইহার কারণ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই প্রকৃত কবি, প্রকৃত কবিকে তাহার স্বীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে কেহ অতিক্রম করা সহজ নহে। কাব্যের রীতি, গাত বা স্ফোটমূর্ত্তি বিষয়েই এই ক্ষেত্রে, স্থায়ীভাবের ক্ষেত্রে, কবিতে কবিতে চিরকালের পার্থক্য। গীতি কবিতা অনেক অংশে নামরূপ-হীন—সাহিত্যশিল্পের প্রধান লক্ষণ নামরূপ। এই নামরূপ হীন বলিয়া গীতিকবিতা অনেক সময় অল্পেই সাহিত্যসংজ্ঞার বহির্ভূত হইয়া পড়ে—উহা সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ; অথচ গীতি কবিতার যাহা প্রাণ, তাহা গৌণমুখ্য ভাবে সাহিত্য মাত্রেরই প্রাণ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গীতি কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অতুল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মধ্যে পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীজাতির সাহিত্যাত্মা প্রথম ও অনাবিল জাগ্রতভাব লাভ করিয়াছিল। উভয়ের কাব্য যাহা আমরা পাইয়াছি, জীবনী-কিম্বদন্তী যাহা পাইয়াছি, তাহা চিন্তা করুন—

কত বড় সরলমধুর উজ্জ্বল ও স্বাধীন প্রকৃতি এই চন্দীদাস! হৃদয়ে ও জীবনে প্রকৃত কবি! বঙ্গসমাজের সেই যুগে, ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের জন্মজাতিগত প্রাধান্যের যুগে, মানবাত্মা তীব্র উচ্চ উচ্ছ্বসিত ঋজুকণ্ঠে আপনার মাহাত্ম্য বিশ্বমানবের একত্ব ঘোষণা করিয়াছে! প্রেমকে পরমার্থ হইতে অভিন্ন ঘোষণা করিয়াছে, কথায় কর্ম্মজীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছে—প্রেমিকের পাদচারণ-ক্ষেত্রকে, আপনার ও প্রিয়তমার সমাধিশ্মশানকে বিশ্ব-বৈষ্ণবের চিরকালের ভক্তি-পবিত্র হৃদয়তীর্থ রূপে রাখিয়া গিয়াছে! এই কবি, এই কাব্য ও জীবনের সমক্ষে কি আমাদের বর্ত্তমান কালের বোধবুদ্ধি, ভাক্তভাব ও কপট কল্পনা পূর্ণচন্দ্রোদয়ে খদ্যোতিকার ন্যায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না! যে জাতির হৃদয় এইরূপে আত্মপ্রচার করিয়াছে, তাহার সাহিত্যগঠিত না হইয়া পারে না। তারপর বিদ্যাপতি! কত আনন্দময়, সুখী, সরল ও ঐশ্বর্য্যময় এই বিদ্যাপতি! তাঁহার প্রাণের কি অপূর্ব্ব বেদনা, অপূর্ব্বললিত মুখর বাক্যচ্ছন্দে, ঝঙ্কারে, ঝনৎকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! ইঁহাদের অব্যবহিত পরে বাঙ্গালায় যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি বৈষ্ণব আত্মার শরীরী মূর্ত্তি, এই উভয় কবিহৃদয়ের সংযুক্ত মহাত্ম সংস্করণমাত্র—ইহাদের পদাবলীই তাঁহার প্রধান সাধনোপায় ছিল; তিনি এই উভয় কবির ভাবকম্পনে নিজের জীবনের বিকাশসাধন করিয়া তাঁহাকে বিশ্বপূজ্যরূপে দেদীপ্যমান করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে ধরিয়াছেন। আগে আলোকদর্শী, আলোকস্বপ্নী কবি; পরে দার্শনিক, ভক্ত, ধর্ম্মপ্রচারক! জগদ্ব্যাপার মধ্যে কবি ও ধর্ম্ম প্রচারকের বা সাধকের কার্য্যকে পৃথক করিয়া—পরখ করিয়া দেখিতে হইলে ইহাই পরম্পরা-সূত্র। সকল ধর্ম্মে কবিগণের আত্মাই ভাবসত্যের আদিদ্রষ্টা ও সাধক; কবির আত্মাই মনুষ্যত্ব সাধনে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া মানব সমাজকে বাস্তবিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছেন। বঙ্গদেশে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী—বৈষ্ণবী মাধুর পদ্ধতির ইসায়া ও ইজিকিয়েল, এই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি! আশ্চর্য্যের কথা এই, যেমন যীশু অবতারের পূর্ব্বেই হীব্রু ঋষিগণ আপন হৃদয়ে তাঁহার পূর্ব্বাভাস লাভ করিয়াছিলেন, তেমন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব পূর্ব্বেই যেন তাঁহার রসমধুর গৌরমূর্ত্তি ভাবোন্মত্ত চণ্ডীদাসের মনোনেত্রে প্রাক্‌ভাসিত হইয়াছিল।

বঙ্গে শ্রীচৈতন্য।

এই চৈতন্য বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইলেন—দেশের বৈষ্ণবগণ যেন তাঁহাকে দৃষ্টিমাত্রেই চিনিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালী জাতির সেই আনন্দ, সেই উচ্ছ্বাস, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম্মকে পরিপ্লাবিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে বিশ্বপতির সিংহাসন পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই দেশের মানুষগুলি আপনাদের মধ্যে এই একটী মানুষ পাইয়া কতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকেই পরম প্রেমময়ের অনন্তের শরীরীমূর্ত্তি ধরিয়া সরল স্থির বিশ্বাসে, উন্মত্ত ভাবে স্তুতি নতি আরতি আলিঙ্গন বন্দন করিয়া, আস্ফালন করিয়াছিল। একসঙ্গে একই ভাবে কত শত শত কবি হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছিল। উহার নাম জাগরণ নহে ত আর কি বলিব? কতবড়

বিনয়ী মধুর সরল অমৃতাত্মা এই সব কবি। —যাঁহারা আত্মভোলা, বিশ্বভোলা প্রীতিভক্তির উচ্ছ্বাসে বলিতে পারিয়াছিলঃ—

'চৈতন্তের হাটে মিত্য ঝাড়ুগিরি করি, !!'

এমন বিশ্বপ্লাবী আনন্দপ্রবাহের লক্ষ্যস্বরূপ সেই প্রেমসাগর চৈতন্যই বা কেমন ছিলেন? যাঁহার পদস্পর্শে এই বঙ্গদেশ নিজকে পবিত্র মনে করিয়াছে—বাঙ্গালী যাঁহাকে সগৌরবে ঋষিভারতের রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধের সমান আসনে স্থাপন করিয়াছে, সেই বাঙ্গালীই বা কেমন ছিলেন? এই উচ্ছ্বাসের নিকট আমাদের এই আধুনিকতার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জীবন ভিত্তিহীন ভাক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের কবিতা বর্ষাকালের গঙ্গা প্রবাহ সমক্ষে সহরের দবত্নগুপ্ত পয়োনালার কাপট্য কুলুকুলুর ন্যায় প্রতীত হইতে থাকে। দোষ গুণে এই বৈষ্ণব কবিতা ও রচিত কাব্য বাঙ্গালীর নিজস্ব ও তাহার জাতীয় হৃদয়ের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতেছে, ও ভবিষ্যৎ পন্থা এবং তাহার সঙ্কট সমস্যাও সূচিত করিতেছে!

বৈষ্ণব প্রভাব।

শত শত কবি এই রাধাকৃষ্ণ লীলা ও বৈরাগ্য চরিত্র বিষয়ক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস প্রবৃত্তি বশে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ করাও একরূপ দুঃসাধ্য। এই সমস্ত কাব্য বেদবেদাঙ্গ পুরাণাদির ন্যায় বা রামায়ণ মহাভারতাদির ন্যায় জ্ঞানবৈরাগ্য দেবার্চ্চনা ভাবক নহে—আত্মবীর্য্য,গাম্ভীর্য্য ভাবকও নহে। উহাদের 'গোঁড়ামী'ও অন্য জাতীয়। উহাদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাণ বাঙ্গালী জাতির হৃদয় মধ্যে নিহিত। বৈষ্ণবের নিকট বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস বা কৃষ্ণদাস, নরোত্তম, মুরারী গুপ্ত কিম্বা গোবিন্দ দাস, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বা ব্যাস বাল্মীকি হইতে কম পূজাপাত্র নহেন। ইঁহাদের গ্রন্থ ও বেদ পুরাণাদির ন্যায় মাহাত্ম্য পূজা লাভ করিয়াছে; অনেকস্থলে উহাদের স্থানই অধিকার করিয়াছে।

আমরা এই মাত্র বলিয়া এই বৈষ্ণব কবিতা রাখিয়া যাইব। আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালীর—প্রকৃত বঙ্গসাহিত্যের জাগরণ হইয়াছিল এই বৈষ্ণব কবিতায়; তাহার সাহিত্য-কর্ত্তা বিরাট সহস্রশীর্ষা পুরুষ জাগিয়াছিলেন এই বৈষ্ণবী তন্ত্রীর প্রভাতী গানে। এই জাতিভেদ-নিপীড়িত—প্রাচীনাদর্শ-নিগৃহীত মনুষ্যভূমে সর্ব্বপ্রথম যেই ব্রাহ্মণ উন্নতশির আকাশে তুলিয়া যেন পদাঘাতে বঙ্গদেশ কম্পিত করিয়া উদার উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া কহিয়াছিলেনঃ—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।"

দেশের ধূল্যবলুণ্ঠিত জনহৃদয় তাহাতেই কাঁপিয়া, জাগিয়া এবং অনুরাগিত হইয়া হৃদয়গতির শত পন্থায় ছুটিয়া, বঙ্গীয় মনুষ্যত্বকে—বঙ্গ সাহিত্যকে সৃষ্টি করিয়া 'খাড়া' করিয়া তুলিয়াছে।

সাহিত্যের বিশ্বমুখ আদর্শ।

এই পর্য্যন্ত আমরা কেবল বঙ্গভূমি-প্ররূঢ় সাহিত্য মহারাজকেই চিন্তা করিয়া আসিয়াছি। এই সাহিত্যের শীকরশিফা দেশের গভীর হৃদয়তলে নিখাত ও উহা হইতেই সে মুখ্যতঃ রস সঞ্চয় করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোন বৃক্ষের ধারণ, পোষণ ও বর্দ্ধন বিষয়ে কেবল দেশরসই পর্য্যাপ্ত নহে; বীজের প্রাণশক্তি জাগরণ বা অঙ্কুরপ্রবাহ মাত্রও বৃক্ষত্বের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

তাহার পক্ষে ঊর্দ্ধাকাশের আলোক ও বিশ্ব বহির্জগতের বর্ষাতপবায়ুও অপরিহার্য্য। এই বৃক্ষকে স্বয়ং আলোকপ্রয়াণে ঊর্দ্ধশির হইয়া আকাশে উত্তমাঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; তাহাকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও পোষণকল্পে জীবধাত্রীর গভীর গভীরতলে মূল শিকড় নিহিত, নিমজ্জিত করিতে হইবে; তাহার মূলকাণ্ড শাখা প্রশাখা ফুল-পল্লব ফল, সকলকেই পরম স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সর্ব্বোদ্দিষ্ট হইয়া, চঞ্চলতার মধ্যে স্থির সন্নিবিষ্ট হইয়া, সমস্ত শব্দাড়ম্বরের মধ্যে নিঃশব্দতা, কাঠিন্যের মধ্যে নমনীয়তা ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে একোদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হইবে, ঊষাসন্ধ্যা দিনরাত্রি পক্ষমাস অয়ন বর্ষসংক্রমণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার আদান প্রদানে আঘাত প্রতিঘাতে তাহাকে স্থির থাকিয়া বাড়িয়া উঠিতে হইবে, তাহার অন্তস্তত্বে আকাশের গভীরতা ও নিস্তব্ধতা, তাহার শিরা কৈশিকীসমূহে ও হৃদয়ের প্রবাহে সমুদ্রের কলকল্লোল ও স্পন্দন, তাহার অন্তঃসারে শৈলসমুচ্চয়ের কঠিন বাস্তবিকতা ও ঋজুতা, তাহার ফুলের মধ্যে দূর দূরান্তলীন নক্ষত্র-তারকার স্নিগ্ধোজ্জ্বল সাম্যকান্তি, তাহার পল্লবপত্রের মর্ম্মরে বিশ্বজগৎ-ব্যাপারের ভ্রমরগীতি ও তাহার ফলের মধ্যে রসালতা ও চিরন্তন সত্যশিব-সৌন্দর্য্য বীজসিদ্ধি করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ইহা একটা সুদূর ও অস্পষ্ট বজ্ঞাত আদর্শমাত্র; জগতের সকল সাহিত্যই ন্যূনাধিক অসীমকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতেছে; এই আদর্শের নামরূপ কি, তাহা নিশ্চয়নির্ব্বন্ধে জানিতে পারিলে জগতের সাহিত্যগতি স্থগিত হইয়া যাইত। এই অপ্রাপ্তি বা অভাবই অধ্যাত্মতঃ জগদ্গতির হেতু। এখনও দেখা যায় যে, সাহিত্যবিশেষ, ভাষাবিশেষ আপনার আদর্শের বহুশীর্ষতাকে লাভ করিতে পায় নাই; অন্যদিকে, কেবল নিজের শক্তির সীমাকেই পাইয়াছে। সেই স্থলে সাহিত্য নির্জীব হইয়া যায়, ভাষাও ক্রমে মৃতভাষায় পরিণত হয়। এইরূপে অনেক বিশিষ্ট ভাষা-সাহিত্যও মৃত হইয়া পড়িয়াছে; অনেক দিকে অনুপম শক্তি প্রদর্শন করিয়াও এইরূপে, জগৎগতির সহিত নিজের সুর মিলাইতে না পারিয়া ক্রমে সরলতা, সবলতা, স্বচ্ছন্দতা ও সজীবতা হারাইয়া অতীতের শ্মশানমন্দিরের 'মমী'স্বরূপে পরিণত হইয়াছে; দেশে দেশে নূতনযুগের নূতন ফসলের সার যোগাইতেছে। বঙ্গভাষা যৌবনাবস্থাতেই অগ্রসর হইতেছে; এখনও তাহার স্থবির দশার, স্ফীতোদরতার কিম্বা অন্তিম নিশ্চলতার অনেক বিলম্ব আছে। ইহাও আমরা এই সূত্রে দেখিতে পাইব। ক্রমশঃ

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

বরোদায় একদিন।

বরোদায় পৌঁছিলাম যখন সকাল ৭টা। সোদরোপম ভ্রাতা দলপতরাম ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং কিছুই ভাবিতে হইল না। বিদেশ বিভূম হঠাৎ চিরপরিচিতের আকার ধারণ করিল। আবার যাঁহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, তিনি যে কখনও কাহারাও অপরিচিত থাকিতে পারেন, তাহা একবারও মনে হইল না। দু'এক

কথা বলিতে না বলিতেই তিনি আপনার পরিচয় দিয়া ফেলিলেন। তিনি আর নূতন লোক রহিলেন না। কোন কোন প্রকৃতিতে এমন মিষ্টত্ব আছে যে, চেষ্টা করিয়াও তাহা হইতে তফাতে আসা যায় না। ইঁহারা আপনাদের স্বাভাবিক আকর্ষণে টানিয়া লইয়া নূতনত্বের যে বাধা, তাহা দূরীভূত করিয়া দেন। তাঁহারা কিছুই নূতন থাকিতে দেন না। এরূপ কথিত আছে, মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় কেহ কখনও নূতন শ্লোক আওড়াইতে পারিত না—সভায় অনেক শ্রুতিধর ছিলেন—এক-শ্রুতিধর, দ্বিশ্রুতিধর প্রভৃতি অর্থাৎ কেহবা একবার শুনিয়া, কেহবা দুই বার শুনিয়া শ্লোক মুখস্থ বলিতে পারিতেন। সুতরাং শ্লোকের নূতনত্ব আর থাকিত না। বন্ধুটীও তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতে না করিতেই আমাদের নূতনত্বের সকল দাবী হরণ করিয়া ফেলিলেন। আমাদের আর অপরিচিতের মত ব্যবহার করিবার অবসর রহিল না। তিনি যেন কতদিনের চেনা! ইঁহারা তিন চার পুরুষ বরোদার রাজসংসারে চাকুরী করিতেছেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়াছিলেন। ইনি মহারাষ্ট্রে স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া মহারাষ্ট্র মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বম্বে প্রার্থনা সমাজে ইঁহাদের বিবাহ হয়। কাপ্তান পাঠক বরোদার সৈন্যদলের মেজর ছিলেন, এখন শরীররক্ষক সৈন্যসমূহের অধিনায়কত্ব করিতেছেন। শিশু কন্যা কাঁদিবার উপক্রম করিতেই পাঠক মহাশয় তাহাকে ধমক্ দিলেন, 'সেপাইকা লেড়কী হোকর রোণে মাঙ্গতী', কন্যার সেবারের মত কান্না থামিয়া গেল। সিপাহীত্বের চিহ্ন তাঁহার সমস্ত শরীরে বর্ত্তমান। পুলো খেলিতে হাত পা পিঠ নাক্ সকল অঙ্গই ক্ষত হইয়া রহিয়াছে। হাত দিয়া দেখিলাম, নাকের হাড়খানা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই শিষ্ট শান্ত মানুষটী ভগবদ্বিশ্বাসী। দেখিলাম, পুত্রগণের উপর উপাসনা করিবার নিয়মিত আদেশ রহিয়াছে। একটী শিশুপুত্র নিদ্রায় কাতর হইয়া বিছানায় যাইবার অনুমতি চাহিলে প্রার্থনা করিয়া শয্যাগ্রহণের আদেশ হইল। বালকটী সে আদেশ এমনভাবে পালন করিল, যাহাতে বুঝিলাম, ইহা নূতন আদেশ নহে। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। বলা বাহুল্য, 'মা ষষ্ঠী' এই পাঠক পরিবারের উপর অজস্র কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন। পাঠকমহাশয় সর্ব্বভুক্, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিরামিষাশী। বাড়ীতে চাকরবাকর রহিয়াছে, তবুও দেখিলাম, অতিথিদিগকে পরিবেশন করিবার ভার পুত্রকন্যাদিগের উপর। ইহা অতি সুব্যবস্থা। নিরামিষাশী পুত্রের আমিষ রন্ধন বা পরিবেশনে কোনই আপত্তি নাই। ইনি 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজন'এর ন্যায় অতিক্রম করিয়াছেন।

যাহা হউক, চা পানান্তে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। বরোদা সহরে 'Improvement trust' আছে। চারিদিকে তাহার নিদর্শন অনেক মিলিল। ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া রাস্তা বড় করা হইতেছে। বিবাহ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া বোধ হয় কাজ একটু দ্রুত চলিয়াছে। লোকের অসন্তোষ আছে কিনা, জানিতে পারি নাই। আমরা সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্মীবিলাস রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। সাধারণতঃ ঐ প্রাসাদেই রাজপরিবার বাস করিয়া থাকেন। প্রাসাদের প্রাঙ্গণ কত বড়, তাহা সহজেই বোধগম্য হইল যখন শুনিলাম যে, এই অঙ্গনে প্রায় সাত মাইল পাকা রাস্তা আছে। প্রধান রাস্তার নাম কন্যার নামা-

নুসারে 'Indira Raja Avenue'রাখা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র অঙ্গনটী সুদৃশ্য বাগানে পরিণত করিবার জন্য নাকি জার্ম্মানি হইতে এক উদ্যান-পালের আমদানি হইয়াছে। রাজা, রাণী ও রাজকন্যা কেহই দেশে নাই। বিশেষতঃ কন্যার বিবাহ সন্নিকট। সুতরাং প্রাসাদ মেরামত হইতেছে। আস্‌বাব অধিকাংশই স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই রাজপ্রাসাদে রক্ষিত অনেক আস্‌বাবেরই বিশেষত্ব এই যে, উহা বরোদায় উৎপন্ন জিনিসের দ্বারা বরোদার কারিকর-হস্তে নির্ম্মিত। অবশ্য, বিলাতী জিনিসের যে কিছু অভাব আছে, তাহা নহে। রাণীমহল ও রাজমহল স্বতন্ত্র। রাজ কন্যারও স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দিষ্ট আছে। স্বর্গীয় রাজকুমার ফতে সিংহের শয়ন কক্ষ সজ্জিত রহিয়াছে। শয্যার পার্শ্বে কুমারের স্বহস্ত-নিহত একটী ব্যাঘ্রের চর্ম্ম রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্থান হইতে প্রাসাদ উদ্যানের দৃশ্য অতি সুন্দর। কুমারের গৃহে ঢুকিয়া মনটা যেন কেমন বিষাদ-মাখা হইয়া গেল। ইনি একজন চিত্রকর ছিলেন। পিতা মাতার ও ভগিনীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রাজকুমার অত্যন্ত 'খরচে' লোক ছিলেন। একদিন গাইকোবার কোনও বিষয়ে বাধা দিলে কুমার বলিয়াছিলেন, "আমি রাজপুত্র, মা আমার মহারাণী, আমার খরচের standard আপনার নিকট হইতে লইতে রাজী নহি।" বর্ত্তমান গাইকোবার মহারাজা শীবাজী রাও পোষ্যপুত্র। তিনি মহানুভব ব্যক্তি। স্বীয় পুত্রের এ শ্লেষ তিনি অবশ্য উপভোগ করিয়াছিলেন। রাজসরকারের কর্ম্মচারীবর্গ রাজকুমারকে বড়ই ভালবাসিতেন। এখনও তাঁহারা কুমারের জন্য অত্যন্ত আপ্‌শোষ করিয়া থাকেন। ইঁহার এক পুত্র বর্ত্তমান। বর্ত্তমান মহারাজার অভাবে কে উত্তরাধিকারী হইবেন, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। রাজ রাজড়ার বহুপুত্র হওয়া বড় সুবিধাজনক ব্যাপার নহে। মহারাজা সিন্ধিয়া যদি পুত্র কামনায় বরোদার রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী না হইয়া একটী পুত্রকে পোষ্যপুত্র রূপে প্রার্থনা করিতেন, তবে দুইকুল বজায় থাকিত; আর উভয় মহারাজাকে এত লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে হইত না। রাজকর্ম্মচারীরাও এ বিবাহের পক্ষপাতী নহেন। অনেকেই প্রকাশ্যে ইহার নিন্দাবাদ করেন। তবে তাঁহারা এ জন্য মহারাজকে দোষ দেন না। এই নিন্দনীয় বিবাহ সম্বন্ধের জন্য মহারাণীই সম্পূর্ণ দায়ী। সর্ব্বসাধারণে রাজকুমারীরই রুচির নিন্দা করিতেছেন। এই লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

মহারাণী একজন সুদক্ষা শিকারী। তাঁহার প্রকোষ্ঠে তাহার নিজের বিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একখানা ব্যাঘ্র চর্ম্ম খড় পুরিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহার বেশ-বিন্যাস-গৃহে একটী আলমারীতে প্রায় সহস্র বোতল তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য রহিয়াছে! সুনিপুণা বীণাবাদয়িত্রী বলিয়া বারোদায় মহারাণীর বেশ সুনাম আছে, মহারাণী সুশিক্ষিতা। মহারাষ্ট্র রাজবংশে পর্দ্দা বড়ই কঠিন। তিনি ভাঙ্গিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কন্যার বিবাহে পাত্র-নির্ব্বাচনে তিনি যে ভ্রান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যশে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। এই প্রাসাদে মহারাজার একটী পাঠাগার আছে। বেলা ৯ টা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত তিনি এই স্থানে কাটান। কেবল একজন অধ্যাপক এই সময়ে তাঁহার নিকটে থাকিতে

পান। নিতান্ত অনিবার্য্য না হইলে এ সময়ে মহারাজার নিকট কোন রাজকার্য্যের ব্যপদেশে উপস্থিত হওয়া নিষেধ। অধ্যয়নে ব্যাঘাত হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। গৃহখানি অতি সাধারণ ভাবে সজ্জিত, জাক্‌জমক হীন—অধ্যয়ন-গৃহেরই উপযুক্ত।

এই প্রাসাদে বাঙ্গালীর একটী মহতী কীর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিলাম। ইতিপূর্ব্বে মহারাজার খাস কামড়ায় জুতা পায়ে দেশীয়দিগের পক্ষে প্রবেশ নিষেধ ছিল। এ ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীকে যখন মহারাষ্ট্রীয়গণ জুতা খুলিতে বলিল, তিনি মহারাজাকে জানাইলেন, "মহারাজ! একি আমার ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ ও মহারাজের স্বজাতীয়ত্ব রূপ মহাপাতকের শাস্তি?" মহানুভব মহারাজা শিবাজীরাও গাইকোবার তৎক্ষণাৎ এই অসঙ্গত নিয়ম রহিত করিয়া দিলেন। এই বিবরণটী শ্রবণ করিয়া উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর চরণে প্রণাম করিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিলাম। বর্ত্তমান গাইকোবার অনেক কুপ্রথা রহিত করিয়াছেন এবং নূতন সুপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন,—কেবল রাষ্ট্রক্ষেত্রে, তাহা নয়, কিন্তু সমাজক্ষেত্রেও। অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির জন্য বরোদায় রাজব্যয়ে অনেক Depressed classes mission school স্থাপিত হইয়াছে। কেবল স্কুল স্থাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অনেক অনুন্নত শ্রেণীর লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। বরোদায় State Dinner প্রচলিত আছে, সকলকে একসঙ্গে আহার করিতে হয়। এইসব ভোজে আমিষ আছে; এই ওজুহাতে অনেকে ভোজে যোগ দিতেন না। আসল কথা এই যে, অনুন্নত শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আহার করিতে ইঁহারা নারাজ। সুতরাং নিরামিষ ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সকলকে ভোজে যোগ দিতেই হইবে। মহারাজা নিজেও প্রত্যহ দিনের বেলা কর্ম্মচারীগণের সহিত আহার করেন, রাত্রিকালের ভোজন পরিবারবর্গের সহিত সম্পন্ন হয়। রাজাও যে অপর সাধারণের মত একজন মানুষ, নিতান্ত কিম্ভূত কিমাকার একটা পদার্থ নহেন, এই সংস্কার জন্মাইবার জন্য এই ভোজের ব্যবস্থা। সকল কর্ম্মচারীই ক্রমে ক্রমে এই ভোজনে আহূত হইয়া থাকেন। যাঁহারা মনে করেন, 'সমাজ-সংস্কার বস্তুটীকে বক্তৃতাতেই আবদ্ধ কর, কাজের কথাটা এখনকার মত শিকায় তুলিয়া রাখ, আমাদের পুত্র পৌত্রেরা না হয় ঐ অসুবিধা জনক বস্তুটীকে' শিকা হইতে নামাইয়া লইবে—তাহাদের মহারাজা গাইকোবারের কাছে অনেক শিখিবার আছে। বরোদা রাজ্যে বাক্যে নয়, কার্য্যে অনেক সংস্কার চলিতেছে।

আমরা এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করতঃ বিশ্বামিত্র নদীর ওপারে যাদুঘর দেখিতে গেলাম। নদী সহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া চলিয়াছে। বিশ্বামিত্র নাম শুনিয়া কেহ কোন বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার মনে করিবেন না। নদীটী নিতান্ত ক্ষুদ্র—একটী খালের মত। পাকা সেতুর দ্বারা এ পারের সঙ্গে ওপার সংলগ্ন। শুনিলাম, লর্ড এলগিনের শুভাগমনে যে শোভাযাত্রা হয়, সেই সময়ে "হাতী ছুটিয়াছে" এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইলে বহুলোক এই পোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কিন্তু নদী দেখিয়াতো মনে হইল না যে, ইহাতে ডুবিয়া মানুষ মরিতে পারে। যাহা

হউক, আমরা যাদুঘরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ পথেই কুমার ফতেসিংহের সামরিক বেশ কাচের বৃহৎ পাত্রে দণ্ডায়মান ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। মিউজিয়মে সর্ব্বত্র যাহা দেখা যায়, এখানেও তাই। কয়েকটী জন্তু দেখিলাম, জমজ এবং সংযুক্ত গাত্র। একটী গো বৎসের দুটী মস্তক। দুইটী ছাগবাচ্ছা পেটে পেটে যুক্ত। কোথায়ও বা দুটী মাথা, সম্মুখে দুটী করিয়া পা কিন্তু পশ্চাদ্দেশ এক। বিধাতার আর খাইয়া কাজ নাই, বসিয়া বসিয়া যা খুসি গড়িতেছেন। রাজভ্রাতা সম্পদ্ রাও গাইকোবার একটী হাতী শিকার করিয়াছিলেন, তাহার একখানি পা রূপা দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। সম্পদ্রাও মহারাজার সহোদর। উভয় ভ্রাতায় বিশেষ সৌহৃদ্য। ইনি মহারাণীর এক কনিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন। উভয় ভগিনীর একত্র ফটোগ্রাফ আছে—চেহারায় বেশ সৌসাদৃশ্য। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ক্রীত মিসরীয় মামির (Mummy) সম্মুখীন হইলাম,—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মৃত মানুষ—যাহারা সর্ব্বপ্রথম জগৎকে সভ্যতা প্রদান করিয়াছিল, তাহাদেরই কাহারও দেহ! শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত আধারে দেহটী লুক্কায়িত ছিল। আধার হইতে খুলিয়া শরীর স্বতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কখনও 'মামি' দেখি নাই। পরে জয়পুরে দেখিয়াছি। দেখিয়াই ইংরেজ কবির কয়েকটী কথা মনে পড়িয়া গেল।—

"Where the mummied kings of Egypt,
wrapped in linen fold in fold,
Couched for ages in thin coffins, crowned with crowns of dusky gold."
'Mured in mighty mausoleums, walled
in from the night and day.
To mortal kings of Egypt hold immortal death at bay."
"Swathed in fine Sidonion linen, crossed
hands folded on the breast,
There the mummied kings of Egypt lie
within each painted chest."
"Seated up in their mausoleums in the,
bowels of the hills,
There they hide from dissolution and
deaths swiftly grinding mills."

Mathilde Blind in Birds of Passage.

বেলা ক্রমেই অধিক হইয়া উঠিল, সেতো আর কাহারও চাকর নহে যে, অপেক্ষা করিবে? আর আমরাও জরৎকার নহি যে সন্ধ্যা না বলিয়া চলিয়া যাইবে না। সুতরাং উদরদেব বিশেষ তাড়না আরম্ভ করিলেন। মৃত্যুদেবতাকে মানুষ যে অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাতো প্রত্যক্ষই দেখিলাম; কিন্তু উদরদেবতাকে কি কেহ কখনও অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে? আমি তো সে কথা ভাবিতেই চোখে আঁধার দেখি। তাই তাড়াতাড়ি Picture Gallery (এখানে বহুমূল্য অনেক ছবি ও গ্রীক প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, কিন্তু সব চাইতে সুদৃশ্য নায়েগারার জলপ্রপাত) শেষ করিয়া আবাসে ফিরিলাম—শ্রান্তক্লান্ত দেহে। স্নানটী বেশ ঠাণ্ডা—স্নান করিব কি না? ভাবনা কি? এদেশে লোকেরা বারমাস গরম জলে স্নান করে। সকল স্নানের ঘরেই জল গরমের ব্যবস্থা রহিয়াছে। গরমঠাণ্ডা মিশাইয়া শরীর শীতল হইল। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াই আবার—ছুট! কি যে হবে ছাই ভস্ম সব দেখিয়া, তাহাও তো বুঝি না! বুঝি না বলিয়াই তো আরও

দেখিতে হয়। খাসা দিল্লীকা লাড্ডু * এই শুনিয়া!

এবার আমরা নজরবাগ প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। এইখান হইতে বরযাত্র বাহির হইবে। এটী সহরের মধ্যখানে অবস্থিত। ইহার উপর হইতে সহরের একটা "বিহঙ্গ-নেত্র-দৃশ্য" গ্রহণ করা গেল। ১৭ মাইল দূরে একটী পর্ব্বত দেখিতে অতি সুন্দর। উহার পাদদেশে একটী হ্রদ। শুনিয়া বুঝিলাম, আমাদের দৃষ্টিভ্রম। হ্রদটী পাদদেশে নহে। উহার দূরত্ব ১৩ মাইল। হ্রদের পরিধি ১০ মাইল। ঐখান হইতেই সহরের পানীয় জল সরবরাহ হয়। জলের কল আছে। সহরের নিকটে একটা নদী—নাম "মাইসাগর।" মাতৃস্তনের ন্যায় সুমিষ্ট পানীয় জলদান করে বলিয়া কৃতজ্ঞ বরোদাবাসী কি নদীকে 'মাই' নামে অভিহিত করিয়াছে? এই প্রাসাদেই রাজবাড়ীর জহরৎখানা প্রতিষ্ঠিত। ঢুকিয়াই দেখি, চারিদিকে মণিমুক্তা হীরার ছড়াছড়ি। চারিদিকে ভাঙ্গা গড়ার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। রাজকুমারীর বিবাহ সন্নিকট কি না? সঙ্গীন ব্যাপার। এ কথা শুনিয়া পাঠকপাঠিকার বুঝি লোভ হইতেছে। অবশ্য পাইবার কাহারও লোভ হইবে, সে আশা আমার নাই। তবে, শুনিবার লোভ হওয়া স্বাভাবিক। তাই একটী ক্ষুদ্র তালিকা তাঁহাদিগকে উপহার দিতেছি—

১। গাইকোবার মুক্তামালা—যে মালা সকলেই বর্ত্তমান মহারাজের ফটোর মধ্যে দেখিতে পান। এতগুলি সুদৃশ্য, একরং ও এক আকারের মুক্তা প্রায় দেখা যায় না। মূল্য এক ক্রোড়ের উপর।

ছোট ছোট মুক্তার মালা ঝুরি ঝুরি। তিনটী তিনটী ছয়টী খুব বড় মুক্তা আছে। ইহার মধ্যে তিনটী ঔজ্জ্বল্যে অতুলনীয়। গোলাকার নহে—আতরের শিশির আকার। একজন মার্কীন-মহিলা তিন লক্ষ টাকা দাম দিতে রাজী হইয়াছিলেন, গাইকোবার 'মতি-মালা'-বিচ্যুত হইতে রাজী হন নাই। তবে শুনিলাম, এমন দিন আসিতে পারে, যেদিন বর্ত্তমান মহারাজাই এগুলি দোকানে পাঠাইয়া দিবেন। ভগবান সেদিন যত দূরবর্ত্তী করেন, ততই মঙ্গল।

২। হীরার মালায় মরকতের ঝিলমিল—দাম দশ লক্ষ।

৩। দক্ষিণ-নক্ষত্র হীরার মালা। দাম ৩৫ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে একখণ্ড চতুষ্কোণ হীরক আছে—নাম "The Star of the South" এখানা পৃথিবীর মধ্যে হীরক-সমাজে সপ্তম স্থান অধিকার করে। পূর্ব্বে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহার মালিক ছিলেন। ওজন ১২৫ ক্যারাট। ইহার মধ্যে আর একটী হীরক পান-পত্রাকৃতি। নাম তার 'আকবর সা'। এই হীরকখণ্ড একদিন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"র অধিকারে ছিল। কার হাত হইতে কোথায় আসিয়াছে! "হীরক, তুমি কার, "যে মারতে পারে পাঁচ জুতি, তার।" আরাঞ্জীব এই হীরকখণ্ডের উপর কোরাণের কয়েকটী অক্ষর খোদাই করিয়া লইয়াছিলেন। পরে উহার বর্ত্তমান মালীকগণ যখন ইহাকে নূতন আকার দেন,তখন আরবী অক্ষরগুলি মুছিয়া গিয়াছে।

* দিল্লীর লোকে 'দিল্লীকা লাড্ডু' কি, তাহা বুঝে না। অনেক অনুসন্ধানে জানিলাম, ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে লোককে ঠকাইবার জন্য (বঙ্গের জামাই ঠকানের মত) খরকুটার লাড্ডু প্রস্তুত করিয়া চিনির পোটীং দেওয়া হইত। কোন বাঙ্গালী বাবু বোধ হয় ইহার নাম দিয়াছেন। দিল্লীর লোকে এ নাম জানেনা।

৪। হীরকখচিত পকেট-ঘড়ী—দাম শুনিলাম ২৬ হাজার। ২৬ লক্ষ বলিলেও আমাদের কোন আপত্তি নাই।

৫। আরও কত কি মণি, সোণা, দানা, সে সব কথা এবারে বলা হ'ল না।

পার্শ্বের ঘরে দুখানি গালিচা আছে—এক খানি চৌ-কোণ। ৪ ফুট প্রস্থে ও ৬ ফুট লম্বায়। অন্যটী গোলাকার। বিশেষত্ব এই যে, গালিচাদ্বয় হীরামুক্তা-মরকতে প্রস্তুত। যেখানে যেরূপ মণিমুক্তা প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে তাহা দ্বারাই রং ফলান হইয়াছে। উপরে একচুল জমিও মণিমুক্তা ছাড়া আর কিছুই নাই। পশ্চাদ্দেশ দেখিতে পাওয়া গেল না। বরোদার রান্নাঘর দেখি নাই। স্বপ্নে দেখিলাম, সে দেশের লোকেরা মরকতের আসনে বসিয়া হীরার চচ্চড়ি দিয়া মুক্তার ভাত চিবাইতেছে—সম্মুখে অজানিত ধাতু-পাত্রে পান্নার সরবৎ, যত পান করে তৃষ্ণা ততই বাড়িয়া উঠে। কি দুর্দ্দৈব !!

এখান হইতে আমরা সোণারূপার কামান দেখিতে গেলাম। এগুলি পাঠক মহাশয়ের জিম্মা। পূর্ব্বে দুটী সোণার ও একটী রূপার কামান ছিল। সোণার কামান রূপার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রজতনির্ম্মিত বাক্সে গোলা বারুদ থাকে। গোলাবারুদ কি ধাতুতে নির্ম্মিত, তাহা দেখিতে পাই নাই। হায় লোহা! তোমার কিস্মত ভুলিয়া মানুষ সব কাঠের পুতুল হইয়া গিয়াছে। এই কুপোষ্যগুলি পুষিবার জন্য কতই না অর্থব্যয় করিতে হইতেছে? বর্ত্তমান মহারাজা একটী পৈতৃক কুপোষ্যের মুখানল সম্পাদন করিয়াছেন। অবশ্য সবগুলির প্রতি ঐ ব্যবস্থা করিতে 'তাঁহার কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু এগুলি পরিবারের সম্পত্তি, তাহাতে রাজা নিজে পোষ্যপুত্র। সুতরাং পারিবারিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। স্বর্ণনির্ম্মিত যে কুপোষ্যটী এখন বর্ত্তমান, তাহার ওজন লেখা রহিয়াছে ৫৫০ পাউণ্ড ও দাম সওয়া দুই লক্ষ টাকা। এখন কিন্তু সোণার দাম বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং "কঁহহ সুবোধ শিশু কামানের দাম।" ধর পোনের টাকা তোলা।

এখন কি করা যায়? আরও একটী প্রাসাদ বাকী। মকবপুরা প্রাসাদ সহর হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী। যাইতে আসিতে অন্ততঃ একঘণ্টা লাগিবে। আমাদের হাতে মাত্র একঘণ্টা বিশ মিনিট আছে। ইতিমধ্যে যদি কিছু কোন কাজে দেরী হয় তো ঐ প্রাসাদ দেখিবার বিশ মিনিট হইতেই কাটা যাইবে। অর্থাৎ যে জন্য এত রাস্তা যাইব, যাওয়ার খাতিরে সেই কাজেরই লোক্সান করিতে হইবে। আমাদের যখন সংসার কমাইবার প্রয়োজন হয়, তখন যেমন আমরা কমাই খাওয়া খরচ—রান্নাবাড়া খাওয়ারই জন্য, কিন্তু সেদিকে তো আর কমান চলে না! খরচ কমাইতে হইলেই উদরদেবের ফণ্ডে হাত পড়ে! মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করে সুখের জন্য। কিন্তু এমন বেকুপ্ এই সংসারে অনেক আছে, যাহারা সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কেবল অর্থই উপার্জ্জন করে, খরচ করিবার আর সময় হয় না! আমরাও তেমনি, একটা সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী তীর্থে যাইবার সময় সর্ব্বাগ্রে একটী পুঁটুলী বাঁধিতেন, সেটী তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে দান করিবার জন্য। তিনি বলিতেন যে, যাতায়াতের খরচ তো কমান যায় না, খাওয়া খরচও কমে না। সুতরাং

অন্যদিকে যদি কিছু খরচ বেশী হইয়া যায়, তবে যে দান ধ্যান কমাইতে বলিবে, সে চলিবে। যে জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমার ষোলআনা চাই। তোমাদের যাতায়াত খাওয়া দাওয়ার স্বতন্ত্র তহবিল রাখ। সব একত্র করিয়া আসল কাজের ব্যাঘাত করিলে চলিবে না। আমরা কিন্তু তোমাদের 'দানধ্যানের' পুটুলী ঐ বিশ মিনিটকে সম্বল করিয়াই যাত্রা করিলাম। কেননা, ওদিকে বাড়াইবার আর আমাদের উপায় নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিতেই হইবে। Public engagement বড় শক্ত প্যায়দা! কিন্তু তাহাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। যাতায়াতের তহবিলে আমাদের কিঞ্চিৎ উদ্বর্ত্ত হইয়াছিল, নাজুত পড়ে নাই। দেখিবারও বিশেষ কিছু ছিল না। দিল্লীতে যেমন ভগ্নাবশেষ দেখিতে দেখিতে বিরক্তি ধরিয়া যায়—ঐ একঘেয়ে কবর আর মস্‌জিদ্‌ এবং মস্‌জিদ্‌ আর কবর! আমাদেরও একদিনে তিন প্রাসাদ দেখিয়া যাহা দেখা হইল না, কিম্বা যাহা দেখিলাম, তাহাও 'পক্ষী চক্ষুতে' দেখিলাম বলিয়া বড় কিছু আপ্‌শোস রহিল না। এ প্রাসাদে রাণীমহল রাজমহল হইতে বড়। কামড়া গুলিতে যে রং দেওয়া হইয়াছে, আস্‌বাব গুলি সব সেই রঙ্গের। এ প্রাসাদটী যে খুব প্রাচীন, তাহার চিহ্ন ইহার গাত্রেই রহিয়াছে। দুটী কামড়ার মেজে পাকা নহে, গোবর ও মাটী দিয়া গড়া হইয়াছে, সিমেণ্ট করা হয় নাই। প্রাচীনাদিগের এখনও বিশ্বাস, এরূপ মেজে গরম, সিমেণ্টের মেজে ঠাণ্ডা। আরও কোন কোন ভদ্রলোকের বাড়ী মেয়েদের কামড়ায় এরূপ ব্যবস্থা দেখিয়াছি। এই বাড়ীতে সিন্ধিয়ার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিবাহার্থী বরকে এমন করিয়া প্রাচীনাদের দলে ঠেলিয়া দেওয়া সঙ্গত কাজ হইয়াছে কি? বহু বিবাহকারী গোয়ালিয়রের প্রতি সুসংস্কৃত বরোদার ইহা কার্য্যগত বিদ্রূপ নহে তো?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

তত্ত্ব-সভা।

বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্য, দেব, রাধাস্বামী, রামকৃষ্ণ ও তান্ত্রিক মত হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। ইদানীং তত্ত্বসভার আরও সপ্তদশ বর্ষগ্রন্থি বর্দ্ধিত হইয়াছে। তত্ত্ববিদ্যা সার্থক। ইহার সাহায্যে, লোকে আপন মত পরিস্ফুট ভাবে বোধগম্য করিতেছে।

ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষের দোষোদ্ঘাটন অনিবার্য্য। এই অপ্রীতিকর বিষয়ের জন্য, সমালোচক ক্ষুব্ধ থাকেন। নিন্দাবাদ, উদ্দেশ্য নহে। সকলেই ভাবেন, আমার বিশ্বাস ঠিক। কেহ দোষোদ্ঘাটন করিলে, তাহা অটল থাকে। অথচ বিমর্ষ থাকিতে হয়। এমন সময় কোন পোষকতাকারীকে পাইলে আনন্দের সীমা থাকে না। তত্ত্ববিদ্যা, জগতে সেই আনন্দ-বর্দ্ধক কার্য্যে ব্রতী।

মনুষ্য মাত্রেই এক প্রকার দার্শনিক, অদ্বৈতবাদী। ব্যাপ্তিমূলক ও নিগমনমূলক, উভয় প্রকারের ন্যায়াবয়বের হেতু আপন বুদ্ধিমত আমরা গ্রহণ করি। হেত্বাভাষ বা

ভ্রান্তি-সংশ্লিষ্ট হেতুর বিচার, তৎ অনুমানোপরি সংশয় করিতে অপারগ। প্রচলিত ব্যবহার রক্ষা করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার কার্য্যকে ভয়ানক বোধ হয়। আমিত্ব সমগ্র জগদ্ব্যাপী। বিশেষতঃ আমরা ভাবপ্রবণ, সিদ্ধান্ত করিয়া পরে কার্য্য করি, কার্য্য দেখিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হই না।

মেডাম ব্লাভস্কি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শনে অকুতোভয়, মনানুভব ক্ষমতায় অদ্বিতীয়। শ্রীমতী কোলম্ব, মায়াবিনীর কুণহমি-রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন বলবদাক্কির রুধিরে মারাত্মক বিষ প্রবেশ লাভ করিল। রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি ভারতে প্রত্যাগতা হইলেন না। বিশ্বাসীদের পক্ষে যাহা সম্ভব, তদনুরূপ সিদ্ধান্ত হইল। কোলম্ব মিথ্যাবাদিনী। ভক্তির প্রামাণিকতা অধিক গ্রাহ্য।

দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিমা পূজা খণ্ডন করিলে পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত সুধীসমাজ ঈপ্সিতনেতা প্রাপ্ত হইলেন। গতানুগতিক নিয়মে, আর্য্যসমাজ প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য কর্ণেল অল্‌কট ও তদীয় বান্ধবীকে বৌদ্ধ হইতে হইল। শিষ্য হইবেন না; অতএব গুরু বৌদ্ধ। শাক্যমুনি গুপ্তমতকে ঘৃণা করিতেন। ত্রিপিটকের বিরুদ্ধ কাহিনী প্রচার করিলে আর প্রতিবাদের আশঙ্কা নাই। মর্ত্ত্যে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম, সেই ভোট প্রদেশে, মহাত্মাদিগকে স্থাপন করা হইল। মহর্ষি ঈসা তিব্বতীয় কোন বিহারে বাস করতঃ আপন মতের পরিপুষ্টি করিয়াছিলেন। বলবদাক্কির কর্ম্ম, অনুর্ব্বর (নিষ্কাম) নহে। তাহা উর্ব্বর, বা সকাম। যেমন মোহরের কর্ম্মফলে, মোহরের ছাপ্। মনুষ্য কয়েকটী স্কন্ধ বা ধর্ম্মের সমষ্টি। কোন স্কন্ধের স্থায়িত্ব বা সত্তা নাই। সকলেই ক্ষণবিধ্বংসী, সুতরাং তাহার পুনর্জ্জন্ম হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, কেন জানি না, লোভ, ঘৃণা ও মোহজনিত কর্ম্ম, জন্মান্তরের জনয়িতা হয়। জীবের চরিত্রের পুনর্জ্জন্ম হয়। কর্ম্মের জন্মান্তর লাভ হয়। বিবি বিলাতে দেহত্যাগ করিয়া তত্ত্ববিশ্বাসীদের মতে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অলকট মহোদয় পরিষদের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কহিলেন, "এখানকার অধিবাসী বৃন্দের অমনোযোগিতায়, এই সামাজিক ব্যাপারে, এত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখিতেছি। লণ্ডন হইতে আগত যুবা ওলড, সিংহলী বৌদ্ধ বুলট জেন্‌স্, আমেরিক ইলিস, পুনার খণ্ডেয়ালা, অনুষ্ঠিত কার্য্যের ব্যাখ্যান দিলেন। তদনন্তর, সংস্থাপকের অভিভাষণ আরম্ভ হইল। যথা—লোকে নিন্দা করুক ক্ষতি নাই। আমরা প্রতি বৎসর দেখাইব, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ,—একে একে কি বলিতেছেন। পার্শী বিচারক কহিয়াছেন, "তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে, আমাদের মত অধিক বুঝিতেছি।" আমি ভারতে আসিয়াই আর্য্যসমাজের সভাপতির সহিত পত্র ব্যবহার করি। তাঁহার মূলসূত্র, আমাদের মত নহে। তিনি চাহেন, আমরা শিষ্য হইব, এবং পার্শী ও বৌদ্ধের দোষ উদ্‌ঘাটন করিব। আমরা অসাম্প্রদায়িক। বৌদ্ধগণ ইউরোপে প্রচারক প্রেরণ করুন। হিন্দুরা পারিবেন না। কারণ, হিন্দুত্ব জাতিগত। কিন্তু উভয় মতই, একসূত্রে আবদ্ধ। একের প্রচার হইলে, অপরটীর হইবে। খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের হস্ত হইতে, ত্রাণ পাইবার উপায় করা উচিত। ত্রিপতি ও গয়ার বুদ্ধ

মন্দির ৭৫০ বৎসর অবধি হিন্দুর কর্ত্তৃত্বাধীন রহিয়াছে। তৎ উদ্ধারের উপায় কি? ইত্যাদি।

কর্ণেল যখন জানেন, হিন্দু ও বৌদ্ধমত একসূত্রে আবদ্ধ, বিচারকের প্রচলিত অধিকার লোপ করিবার ক্ষমতা নাই; তখন ধর্ম্মপালকে গয়ায় মোহন্তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কেন করেন? বৌদ্ধ-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ ইচ্ছা, তাহার হেতু। হিন্দু বোধিকা গয়ায় পিণ্ডদানান্তে মূর্ত্তি বিশেষের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে যেন না, পারে, এমন ব্যবস্থা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তত্ত্বসভা, ধর্ম্মসম্বন্ধে অসাম্প্রদায়িক। বহিরঙ্গভাবে, ইহা সত্য। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, প্রাচীন-সাহিত্যের উদ্ধার, গুপ্ত বিদ্যার অনুশীলন, সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যখন কুংহুমি লাল সিং প্রভৃতি মহাত্মা, বা তাঁহার অনুচরবর্গের বাক্যে আস্থাই অন্তরঙ্গভাব, সম্প্রদায় হইতে অবশিষ্ট রহে নাই।

মুম্বই নগরের "স্লেফড়া" এখানে "ঝট্‌কা" নামে প্রথিত। তৎ আরোহণে, আমি "অল্‌কাট বাঙ্গালা" অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যানে আর একটী ভদ্রলোক উঠিলেন। তিনি সে পর্য্যন্ত যাইবেন না। আমার উদ্দেশ্য শুনিয়া কহিলেন, এখন মহাত্মাদের প্রতিপত্তি গিয়াছে। বাবু শরচ্চন্দ্র দাস বলেন, ভোটে মহাত্মা নাই, পলাইয়াছেন। ক্রমে সর্পাকার "কোয়েম" নদীর ফর্ণার উপর দিয়া, যথায় "আদের" তটিনী সমুদ্রে সঙ্গতা হইয়াছে, সেই দ্বীপে উপনীত হইলাম। স্থান নির্ব্বাচন সুন্দর হইয়াছে। ফেনিলবারি, সমুদ্র হইতে নদীমুখে প্রবিষ্ট হইতেছে। উপবনে, বৃক্ষের আশ্রয় হইতে অন্ধকার সরিয়া যায় না। অন্ধকারের আশ্রয় ব্যতীত, গুপ্তবিদ্যার প্রচার বৃদ্ধি অসম্ভব। মুম্বই অপেক্ষা, সে বিষয়ে মান্দ্রাজ অধিক উপযোগী। "নাস্তি সত্যাৎ পরোবলঃ" শীর্ষক মণ্ডপাভ্যন্তরে যাইয়া, আমি দণ্ডায়মান হইলাম। আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের কর্ণেল, এক্ষণে অখিল ভূমণ্ডল জয় করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে তত্ত্বসভার শাখাগুলির নাম ও সংস্থাপন কাল-নির্দ্দেশক পতাকানিচয় আলম্বিত। ভিত্তির অলঙ্কারস্বরূপ সৌরচিত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক সম্মিলনের বিবিধ জাতীয় সাধক নয়ন-পথগামী হইলেন। পুস্তকালয়ে সিংহলীয় ও ভারতীয় হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছে। বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা দেখিলাম।

গুপ্তবিদ্যার পুস্তক,—যাহা পাঠ করিলেও গুহ্য থাকে—আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ, হিন্দু, জোরোষ্ট্রীয়, কব্বাল, খ্রীষ্টীয়, এবং ইন্দ্রজাল, মইস্মর ও প্রেততত্ত্ব, চরিত্রানুমান, সামুদ্রিক ফলিত প্রভৃতি প্রকৃত ও ভাক্ত, তাবং বেদিতব্য গ্রন্থের নাম ইহাতে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। যাহার যেমন প্রয়োজন, নির্ব্বাচন করিতে পারেন।

অন্তরঙ্গ সভার সদস্য ব্যতীত, গুপ্তগৃহে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। তথায় দুই জন মহাত্মার চিত্র আছে। এই স্থানে ভোট হইতে মহাত্মার পত্র একটী কপালে আসিয়া পড়িত। পারিসের ভোজনালয়ে অবস্থান কালে বলবদাস্কী যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার কয়েক অধ্যায় উক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে শ্রীমতীর ভারতীয় প্রাচীন বা নব্য কোন ভাষা জানিবার প্রয়োজন ছিল না। গুরুদেবের চিন্তা মনঃ প্রেরণাদ্বারা শিষ্যার মস্তিষ্কে প্রক্ষিপ্ত হইত। কায়া না থাকিলে, ছায়া হইতে পারে, এ অধ্যাস অনেকের আছে। ভক্ত আপন হৃদয়ে দেব-

তার প্রত্যাদেশ অনুভব করে। অথচ প্রত্যক্ষ ভাবে শুনিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। ভাব সঞ্চার প্রভৃতি অতি প্রাকৃত কার্য্যে চাতুরী ও সত্যের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। তদ্ভিন্ন ভ্রান্ত জ্ঞান, প্রবঞ্চক হইয়া পড়ে। বিশ্বাসের চক্ষে উহা উন্নত অবস্থা।

শ্রীমতী বেসেণ্ট কর্ত্তৃক শান্তিকুঞ্জে, উপেন্দ্র বাবু দ্বারা শিব প্রতিষ্ঠান্তে কাশীস্থ ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে ভূরি দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। কথিত আছে, তিনি মিত্র গোষ্ঠীর গৃহে দুর্গোৎসব কালে, মণ্ডপের একপার্শ্বে কুশাসনোপরি ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া উপবেশনান্তে ত্র্যক্ষরী মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। কর্ণেল শেষাবস্থায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। বেসেণ্ট প্রথমে কোন দিকে ভর দিবেন স্থির করিতে না পারায়, লঙ্কায় বৌদ্ধ ভারতে তাঁহার দ্বারা হিন্দুমত ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল।

বাসন্তী কেন ব্রহ্মবাদিনী হইলেন, তদ্বিষয়ে বলিয়াছিলেন। বিজ্ঞান যে স্থলে নিরুত্তর, তিনি তত্ত্ববিদ্যায় তাহার সদুত্তর পাইয়াছেন। সূক্ষ্ম (Astral) শরীর, কারণ (Mental) শরীর প্রেতলোকে, দেবলোক, নির্ব্বাণ, কর্ম্ম, পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদি সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বগুলি ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। অনেকে জানেন, বিশ্বাসকে সহচর না করিলে তত্ত্ববিদ্যা বুঝা অসম্ভব। সূক্ষ্ম শরীরকে চৈতন্ত পরমাণু বলা হয়। লোকে ভাবিল, বুঝিলাম। চৈতন্তের আবার পরমাণু কেমন, কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না। বেদান্তের ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ। তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না, ভেবে কথা ফুরাইল; বিজ্ঞান চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবে। বিশ্বাসই কেবল সকল কথার উত্তর দিতে পারে। দ্রোণাশ্রমে অদৃশ্য কিরণ প্রভাবে অদৃশ্য বস্তুর ছায়াপাত দ্বারা চিত্র অঙ্কন হইতেছে। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় আলোক মাংস ভেদ করতঃ বহির্গত হইতে পারে। কিন্তু অস্থিতে আবদ্ধ হয়। চিকিৎসক তৎ সাহায্যে নিদান স্থির করিতে পারিতেছেন। তাই বলিয়া তাবৎ অদৃশ্য বিষয় বিজ্ঞান গ্রহণ করিবে না। যেখানে কথা ফুরায়, সিদ্ধান্ত তাহার সীমার বহির্ভূত।

ম্যাডাম ও কর্ণেল ভাবিয়াছিলেন, নিরীশ্বরভাব পরিত্যাগ করিলে, সুধিসমাজে হেয় হইতে হইবে। নাস্তিকতার প্রকার ভেদ-বিস্তর। ক্ষপণকগণ কি না বিশ্বাস করেন। কিন্তু জগৎ-সৃষ্টির কারণ ঈশ্বর নহেন। এনিও চারলস্ যৎকালে অভিন্ন-মত ছিলেন, ব্রাডল লিখিয়াছেন, আমি নিরীশ্বরভাবে একটী সত্তা স্বীকার করি। এই সত্তা অর্থে, জাগতিক ব্যাপার বুঝিতে হইবে। ইহা, কেবল তাহার গুণের দ্বারা জ্ঞাতব্য। যতদূর বোধগম্য হইবে, সেই পর্য্যন্ত বিশ্বাস্য। ঈশ্বরের যে প্রকার লক্ষণ দেওয়া হয়, আমি স্বীকার করি না; এইজন্যই নাস্তিক। যাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণদ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব দেখিয়া, তিনি আত্মহারা নন। বিশ্ববিধাতার মাহাত্ম্য গান করিয়া, আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারেন না। নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। নিয়ম অবশ্যই আছে, কিন্তু কিরূপে হইবে, কেহ জানেন না। তাহার কারণ নিষ্কাষণ করা নিষ্ফল। ব্রাডল, প্রাকৃতিক নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। উহাতে তিনি নির্ভরশীল। সেশ্বরবাদ ভগবানে নির্ভর করে। আস্তিক ও নাস্তিকে প্রভেদ গেল। তিনি নির্ভরাস্পদ।

পার্থিব ধর্ম্মবীজে ব্রাডলার মতভেদ নাই। জগৎ-প্রণালী জড়পদার্থ, পশু ও মানব-সমাজে এক অনির্দ্দেশ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতেছে। উহাই নিয়ম বা নিয়তি। ধর্ম্ম তাহার একাংশ। নিয়তির প্রভাব কেহ অতিক্রমণ করিতে পারে না। একস্থলে যাহা ধর্ম্ম, স্থানান্তরে তাহা অধর্ম্ম। ইহা সাপেক্ষ বিষয়। আমি সামাজিক জীব। সর্ব্বভূতে ব্যাপিয়া আছি। ভূতের উপকার করিলে, আমারি উপকার। পীড়া দিলে নিজেকেই ক্লেশ দিব। ধর্ম্মের মূল, সাধারণতঃ উক্ত ভাবের উপর নিহিত। পাপে বিরতি বা পুণ্যে অনুরাগ বৃদ্ধার্থ, অভ্যাসশীল করাইবার জন্য, সামান্য লোককেও অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী করাইবার চেষ্টা করিতে নাই। কুসংস্কার দ্বারা বিড়ম্বিত হইলে মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি হইবে না। ধর্ম্মে, প্রীতি উৎপাদন করাইলে উপকার আছে। যে ধর্ম্ম থাকাতে মানুষের বিশেষত্ব, ব্রাডল তাহার অধিকারী ছিলেন। সত্যনিষ্ঠার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। স্বদেশ ও ভারতের হিতকল্পে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ভারতের ন্যায় পরাধীন দেশ যাহা আছে, তাহাই রক্ষা করিতে ব্যস্ত। এখন, স্বাধীনমতের বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ। মান্দ্রাজে, মুরুগেস মুদেলি "দার্শনিক জিজ্ঞাসু" নামক ইংরাজি সাপ্তাহিকে ব্রাডল্ প্রভৃতির মত প্রচার করিতেন। বঙ্গে কেদারনাথ বসু এই বিষয়ে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। নূতন পৃথিবীতে, খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া, ঈশ্বরনিন্দার অপরাধ হইয়াছিল। তজ্জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া, কয়েকজন প্রচারক অমর হইয়াছিলেন। জড় ও অদ্বৈতবাদ কেবল ঔপপত্তিক, সুতরাং লোকের অপ্রিয় নয়। স্বাধীনচিন্তাকারী সমাজ, তাঁহাদের মত ক্রিয়া সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী, তজ্জন্য নিন্দাভাজন।

জগতে অধিকাংশ লোকে যাহা চায়, বেসেন্ট সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। অসাম্প্রদায়িকতার উপর আস্তিক্যের অলঙ্কার সর্ব্বগ্রাসী হইল। ব্রাডল পরলোকে কি অবস্থায় আছেন, লেখা অন্যায় বোধ করেন না। মহাত্মারা, পার্থিব বিষয়ে মতামত দিতে প্রস্তুত নহেন। অলকট দেহত্যাগ করিলে, বাসন্তী তাঁহাদের আদেশ ক্রমে, পৃথিবীব্যাপী সংসদের সভাপতি হইলেন। "প্রবন্ধ"-কারিগণের অমতে সুহৃদকে পরিষদে স্থান দিলেন। তিনি বিদুষী, মানসিক ভূগোলবিদ। কোন্ স্থান হইতে কি ভাবে আইসে, বিলক্ষণ বুঝেন। আপনাকে ছাড়িলে, কিছু থাকে না। স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ পদার্থের বিদ্যমানতার প্রমাণ নাই। যেমন করিয়া হউক, আপনার প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত। ব্রহ্মাণ্ডে শব্দ স্পর্শ গন্ধাদির সমবায় ও পরম্পরামাত্র। সেই অস্তিত্ব—এবং দুঃখ সুখ নিজের মধ্যে, বহিঃস্থ নহে। আমি,—এই জগতের সমগ্র ব্যাপী। ইহাতে সিনেট ও কুমারী এড্গার প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, ত্যাগ করিবার নয় ভাবিয়া, স্বাধীন তাত্ত্বিক সমিতির সৃষ্টি করিলেন। রায় ঈশ্বরীপ্রসাদ, তজ্জন্য প্রধান কার্য্যালয়ের সন্নিকটে, কাশীতে সহযোগী সভার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

তত্ত্বসভা আমাদের বংশধরগণের জাতীয়তার মমত্ত্ব বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। বাসন্তী দেবী, সুলভে শিক্ষার জন্য বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়া প্রভূত উপকার করিতেছেন। এই সকল কারণে, তাঁহারা কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমাদের নমস্য। ধর্ম্মনীতি অনেক স্থানে

সকলেরই এক। বিরোধে কেবল অনিষ্ট হইবে। "থিওসফি", সকল সম্প্রদায়কে সমর্থন করিয়া, এপক্ষে উপকার করিতেছে।

ব্রহ্মবাদিনীর মতে, ছাত্রজীবনে রাজনীতিক চর্চ্চা অবিধেয়। পাঠ্যাবস্থায় বিচারকের পদ গ্রহণ করা অসঙ্গত। ধর্ম্মনীতির ন্যায় রাজনীতি শিক্ষা-সাপেক্ষ। গুরুজনের পদানুসরণ করিতে বাধা নাই। উচ্ছৃঙ্খলতা মন্দ। মুসলমান বা হিন্দু, যে যেমন স্থানে লালিত হয়, তাহার সেইরূপ বিশ্বাস হইয়া যাইবে। এদেশে কাব্যকে ইতিহাস বোধ করে। বাল্যে ক্রিয়াসিদ্ধ ধর্ম্মনীতি শিক্ষা অবশ্য আবশ্যক।

তত্ত্ববিদ্যা কাহারও শত্রু নহে, সকলের মিত্র। তবে, নেতৃগণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন কেন? ইহা না হইলে, লোকের সহানুভূতি হইত না। বেসেণ্ট, মাসিক দুই হাজার টাকার পুস্তক বিক্রয় করিতে পারিতেন না। মানুষের চিত্তদৌর্ব্বল্য আসিতেই পারে। লোকৈষণা দুস্ত্যজ্য।

বিষয় বিশেষ, তত্ত্ববিদ্যার আলোক দ্বারা সুন্দর বুঝা যায়, ইহা নিশ্চিত। 'ইথর' বা আকাশ সর্ব্বব্যাপী। দূরস্থ মনুষ্য, তাহার অন্তর্গত হইয়া একত্ব লাভ করিয়াছে। কম্পন উৎপন্ন হইলে, এক মস্তিষ্ক হইতে অন্য মস্তিষ্কে চিন্তা পরিচালিত হইতে পারে! অন্যের অনুভব জানিবার ক্ষমতা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? আমি তাহার ব্যাখ্যা ইহাতে পাইয়াছি। বাসন্তী বুঝাইয়াছেন, ইহা তন্তু-বিহীন তাড়িৎবার্ত্তা পরিচালন সদৃশ।

আর্য্য সমাজের দ্বারা, তত্ত্ব-সভা অপেক্ষা অধিকতর উপকার হইবে। তাঁহারা সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে, শুদ্ধ করিতেছেন। দয়ানন্দ কহিতেন, হিংসা অর্থে, অসূয়া, পশুবধ নহে। আমিষভোজী "মাসিগণ" সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। নিরামিষাশীদল 'ঘাসী' থাকিলেন। গুরুকুলে প্রবেশ কালে, বটু যে জাতিরই হউক না কেন, উপনীত হইবে। কায়স্থ ব্রাহ্মণ হইয়াছে। সরস্বতী মহাশয়কে, একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনারা কাহার স্বামী? তিনি কহিলেন—ইন্দ্রিয়ের। আমি ভাবিলাম, মাৎসর্য্যের কথা হইল। বস্তুতঃ, তাহা নহে। অন্য সময়, স্বামীজির মুখে শুনিয়াছি, চিত্তবিকার অবশ্য হয়, কিন্তু সংযম করি।

সংস্কার বশতঃ হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বাস যায় না। অথচ বিজাতীয় সংস্রবে নিষিদ্ধ আহারে অপ্রবৃত্তি তিরোহিত। এ অবস্থায় রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পরমহংসদেব নিরক্ষর ছিলেন, শ্রীমুখ হইতে, পারমার্থিক বিষয়ে চারু চটুল বাণী বহির্গত হইত। ভক্তিযোগের সহিত একত্রিত থাকায়, সাধারণে উহাকে সমাধির অবস্থা জ্ঞান করিয়াছে। "ক্যাটালেপ্সি" নামক মস্তিষ্ক পীড়ার লক্ষণ এই:—রোগাক্রমণ কালে, দেহের সংস্থান পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই মত রহে। আত্মবোধের অভাব ঘটে। নাড়ীর গতি, এবং শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয় না। নিমেষ বা চতুর্দ্দিন পর্য্যন্ত, আক্রান্ত ব্যক্তিকে উক্ত অবস্থায় থাকিতে দৃষ্ট হইয়াছে। এ ব্যাধি সচরাচর হানিজনক নহে। আত্যন্তিক উদ্বেগ, উদ্দীপক কারক বলিয়া গণ্য। ভক্তির উদ্বেগ হইলেই, রামকৃষ্ণ উক্ত দশা প্রাপ্ত হইতেন। দণ্ডায়মান অবস্থায়, উর্দ্ধবাহু হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, সেইভাবে রহিয়া গেলেন।

সংজ্ঞা লোপ হইল। পতিত হইলেন না। দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়া রহিল। তাঁহার জীবনে এই বৈচিত্র্য মহত্ত্বের কারণ হইয়াছে।

বিবেকানন্দ আমেরিকায় কহিয়াছিলেন, মনুষ্য ঈশ্বরের অবতার। নবভূমণ্ডল চমকিয়া উঠিল। যত অবতার পশ্চিমে। চৈতন্য ভিন্ন আর একজনকে পাইলে গৌরবের বিষয় হইবে। রামকৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলে উপকার আছে। এই মাঠের সন্ন্যাসিগণ স্বামীজির দ্বারা কর্ম্মী হইয়াছেন। পাপীকে উপেক্ষা না করিয়া, প্রীতিকরা উচিত। তবে, সে সংশোধিত হইতে পারে। সকলই ব্রহ্ম, কেহ পর নহে। অন্যের কষ্ট নিবারণ করিলে ব্রহ্মের সেবা হয়। আত্মতত্ত্বের এইস্থলে সম্যক মীমাংসা হইল। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিকে একযোগে লইয়া যাইবার চেষ্টা প্রসংশনীয়। পরের জন্য কার্য্য করিতে অভ্যাস করা, নিবৃত্তি মার্গের সোপান, সন্দেহ নাই।*

রাধাস্বামী, শালগ্রাম সিংহ বাহাদুরের গুরু। "সৎ সঙ্গে"র মতে বেদ না মানিলে ক্ষতি নাই। গুরুবাদ শিরোধার্য্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ বা রক্ষা, উভয়ই দুরূহ; ইহা তাঁহারা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মের উপকার ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। নির্ম্মল বাবুর পৌত্রীর সহিত ব্রহ্মশঙ্করের পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালী, অন্য হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিতজীর পরে, সর্ব্ববাদীসম্মত না হওয়ায়, আর কেহ গুরু হইতে পারিতেছেন না।

এই সম্প্রদায় নাদোপাসক। মুক্তাসনে স্থিত হইয়া, শাম্ভবী মুদ্রা গ্রহণ করতঃ অন্তঃস্থনাদ দক্ষিণ কর্ণে শ্রোতব্য। শ্রবণপুট, নয়নযুগল, ঘ্রাণও মুখের নিরোধ করিতে হয়। কর্ণে হস্তার্পণ করিলে, যে শব্দ শ্রুত হয়, কল্পনার সাহায্যে সমুদ্র গর্জ্জন, মেঘধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা, বংশী বা স্ফুটাত্মক রাধাস্বামী, কোন একটীর মত হইয়া দাঁড়ায়। সেই নাদ লক্ষ্য করিয়া তাহাতেই চিত্ত স্থির করিবে। চিত্তনাদাসক্ত হইলেই আর বিষয়মদে মুগ্ধ হইবে না। নাদে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়; পরে নাদেই লীন হয়। তখন আর কোন শব্দ শুনা যায় না। সেই নিঃশব্দ ভাবই পরব্রহ্ম। ক্রমে, উক্ত হঠযোগীর দেহ মৃতবৎ অবস্থান করিতে থাকে। এই অবস্থা হইলে, সাধক মুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। যোগপ্রবণতার দিনে এবম্বিধ প্রলোভন ত্যাগ না করিয়া অব্রাহ্মণ গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়; "থুকপন্থি" বলিয়া আখ্যাত হইতে অনেকে প্রস্তুত। ইঁহারা যোগী, অতএব নিরামিষাশী। চরম অবস্থায় কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন কিনা, জ্ঞাত নহি।

তত্ত্ববিদ্যা হঠযোগ অভ্যাস করিতে বলেন না। ত্রাটক (দৃষ্টিসাধন) প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা নানা অনিষ্টপাতের আশঙ্কা। রাজযোগে হঠের ন্যায় প্রাণায়াম এবং চিত্তসংযম করিতে হয়। কেহ বলেন, হঠ না হইলে, রাজে ফল নাই। যোগ দুই ভাগে বিভক্ত; অভাব ও মহাযোগ। যখন আপনাকে শূন্য ও সর্ব্বপ্রকার গুণ-রহিত রূপে চিন্তা করা যায়, তাহাকে অভাব যোগ বলে। যদ্দ্বারা আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞান করা যায়, তাহা মহাযোগ। ইহাতে শারিরীক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনাভাব। পরন্তু সে সকল থাকিলে শ্রেয়স্কর।

"থিয়োসফি"র মতে ইহ শরীরে যোগারূঢ়

* ইহারা তত্ত্বসভার পক্ষপাতী নহেন।

ব্যক্তি, সূক্ষ্ম শরীর, কারণশরীর ও "বুদ্ধিক" শরীর লাভ করিয়া যে লোকে বিচরণ করিতে পারা যায়, তথাকার বিষয়ে জ্ঞাত হইতে পারেন। সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের অবস্থা স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালের ন্যায়। তৎকালে, আত্মা প্রাণময় ও মনোময়-কোষে অবস্থিতি করে। তুরীয় অবস্থা, "বুদ্ধিক"লোকের সদৃশ। ইহাতে, মস্তিষ্কের সম্বন্ধ এত দূরবর্ত্তী হয় যে, বাহ্য কোনকার্য্যে যোগী আকৃষ্ট হইতে পারে না। সুষুপ্তিতে মস্তিষ্ক কোন জ্ঞান উৎপাদন করিতে অক্ষম। তখনি, মন আপনার কারণ শরীরের মধ্যে কার্য্য করিতে থাকে। যোগের স্বপ্নাবস্থা তাত্ত্বিকের নিকট জাগ্রত অপেক্ষা অধিক সত্য। জ্ঞান তৎকালে সূক্ষ্মশরীরে কার্য্য করে। জাগ্রতাবস্থা, স্থূলশরীর বা অন্নময়-কোষের কার্য্য। অন্তরঙ্গ বিভাগের শেষ শ্রেণীর সদস্যগণ অবশ্য উপরি-উক্ত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। উক্ত বিভাগের জনৈক বিশিষ্টব্যক্তি আমাকে কহিয়াছেন, সেই লোকে গমন না করিলে বুঝিবার উপায় নাই। মধ্যশ্রেণীর সদস্যকে, দেবী বাসন্তী পত্র দ্বারা উপদেশ দেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি ধ্যানে বসিলে হিংস্র জন্তু দেখি, প্রতীকারের উকায় কি? আর্য্য-শ্রেণীতে, কেবল তত্ত্বসাহিত্যের অধ্যাপনা হয়।

ব্রাহ্মমতকে, আমরা ঘূর্ণা বায়ুর ন্যায় জ্ঞান করি। পরস্পর-বিপরীতগামী ঝটিকা প্রবাহ মিশ্রিত হইলে, ঘূর্ণাবায়ু উৎপন্ন হয়। উহা জলে পতিত হইলে, জলস্তম্ভ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যের সহিত "সেমেটিক" ভাব মিশ্রিত করিয়া আমাদের মধ্যে জলস্তম্ভ উৎপাদন করিয়াছেন। অল্প-সংখ্যাগত হইয়া রহিলেন। প্রবল ব্রাত্যাদ্বারা দেশের দূষিত বাতাবরণ বিশুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট হিন্দুগণ ঋণী। সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহসের জন্য ইঁহারা প্রসিদ্ধ। স্বর্গ যদি চূর্ণ হইয়া যায়, ন্যায়কে রাজ্য করিতে দিবেন। সনাতনমতাবলম্বিগণ যেন ব্রাহ্মগণের নিকট এই বিষয় শিক্ষা করেন। স্থলভেদে ব্রাহ্মসমাজ ভঙ্গ করিয়া তত্ত্বসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের নূতন সংস্করণ,—তান্ত্রিক, আর্য্যসমাজি, রামকৃষ্ণ, রাধাস্বামী, সমস্তই সময়োপযোগী হইয়াছে। নব্যভারতের উপকারার্থ, বৈদিকধর্ম্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবে। যে মত যখন মনুষ্যের হিতকর, তৎকালে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ইহাই হিন্দুত্বের নির্দ্দিষ্ট সীমা।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

শমী গাছে।

১

ও কবিতা লিখ্‌ব না আর
আমার, কলম থুয়েছি শমী গাছে;
যাযাবর বেদিয়ার মত,
যুগ যুগান্ত হ'ল গত,
এখনও সে কর্ম্মভোগের
অজ্ঞাতবাস বাকী আছে!
আমার, কলম থুয়েছি শমী গাছে!

২

আমার এখন ছদ্মবেশ,
ছদ্ম সুখ দুঃখ ক্লেশ,
ছদ্ম আমার যোগ তপস্যা

ছদ্ম সাধন রহিয়াছে!
ছদ্ম আমার ইচ্ছা আশা,
ছদ্ম ভক্তি ভালবাসা,
বদ্ধ কণ্ঠে ছদ্ম ভাষা
, দ্বন্দ্ব তৃষ্ণা লেগে আছে!
আমার, কলম থুয়েছি শমী গাছে!

৩

জগতের জঘন্য জীব,
হয়েছি নপুংসক - ক্লীব,
মানুষের আর অধঃপতন
ইহার চেয়ে আর কি আছে?
মেথর মুচি সেলাই-বুরুষ
আর কি আছে অধম পুরুষ?
বীরের জায়া আজ সে আয়া
দাস্য কর্ম্মে জীবন বাঁচে!
আমার, কলম থুয়েছি শমী গাছে!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ম্যালেরিয়া রোগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

ম্যালেরিয়ার সাধারণ কারণ সম্বন্ধে অন্যান্য পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে। বাত, পিত্ত, কফাদি ধাতুত্রয়ের বিকৃতি হেতু জীবের দেহাভ্যন্তরে অবস্থা বিশেষে রোগ-বীজ উপ্ত হইয়া থাকে, এ বিষয় আমরা বিগত প্রবন্ধে সম্যকরূপে প্রমাণ করিয়াছি। এখন দেখা যাউক, সূক্ষ্মের সহিত স্থূলের এবং জরার সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ কি? এবং মানব দেহের সহিত বায়ুস্থিত জীবকণার বিশেষ কোন আনুগত্য আছে কিনা?

হে স্থূল তত্ত্ববিদ জড়বাদী পুরাতন চিকিৎসক সম্প্রদায়,তোমরা (Allopathic School) স্থূলতত্ত্বের মহিমা প্রচার কল্পে তাহার কার্য্যকরী শক্তি সপ্রমাণ করিতে, যথাসাধ্য চেষ্টা এবং অর্থব্যয় করিতেছ। তোমরা স্থূলতত্ত্বের পসরা মাথায় করিয়া পৃথিবীর হাটে ও বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ। তোমরাই আবার অজানিত ভাবে ধীরে ধীরে সেই স্থূলগতির মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছ,কিন্তু সূক্ষ্মের জটীল সমস্যা সম্যকরূপে মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া পরক্ষণেই আবার সেই চির পরিচিত স্থূলশক্তির চরণ তলে আত্মবিক্রয় করিতেছ। আবার সেই স্থূলতত্ত্বের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আস্ফালন করিতেছ, এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বের কর্ত্তা কর্ণগোচর হইলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছ। হে দাম্ভিক জড়বাদী,তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের এই স্থূলদেহ, যাহার এত দম্ভ কর, যাহার শক্তিবলে স্ফীতবুকে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছ, যাহার কৌশলে ছুরিকার দ্বারা শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া মানব দেহের কত শত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা স্নায়ু ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছ, যাহার কার্য্যনৈপুণ্যে শব ব্যবচ্ছেদ গৃহে মৃতদেহ ছেদন করিয়া যন্ত্রাদির রোগজনিত বিকৃতি পরীক্ষা করিতেছ, যাহার সাহায্যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ধৈর্য্য স্বীকার করিয়া নানাবিধ স্বাপ্নিক রোগাণু আবিষ্কার করতঃ জন-সমক্ষে বাহবা লইতেছ—জান কি, সেই দেহ কত হীন, কত হেয়, কত অকিঞ্চিৎকর! কিন্তু এই স্থূলদেহের মধ্যে যে সূক্ষ্মদেহ বিরাজিত,তাহার

কত অমোঘ শক্তি, জান কি? এই তেজ-পুঞ্জকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহার মধ্যে কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্ত্তন-জনিত বিকৃতি আবিষ্কার করিতে পারে না। ইহা সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত। এই সূক্ষ্ম দেহ-মন-যাহার ইঙ্গিতে, যাহার অঙ্গুলী হেলনে তোমার সমগ্র স্থূলদেহ চালিত—যাহার অনভিপ্রায়ে তোমার একপদও চলিবার ক্ষমতা থাকে না—যাহার শক্তিবলে তোমার স্থূলদেহের সমস্ত দাম্ভিকতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, একবার ভাবিয়া দেখ, সূক্ষ্ম দেহের তুলনায় স্থূলদেহ কি তুচ্ছ! এই সূক্ষ্মই দেহের রাজা, ইহার আধিপত্য প্রতি-নিয়ত স্থূলদেহের প্রত্যেক অণুতে প্রতিফলিত হইতেছে। যে সূক্ষ্ম শক্তির স্পন্দন প্রতি শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে এবং প্রত্যেক স্নায়ু-কেন্দ্রে প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছ, সেই সূক্ষ্মের উপর এত তাচ্ছিল্য, এত ঘৃণা—ইহা মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে জড়বাদী, তবুও সেই স্থূলের পশ্চাত পশ্চাত প্রধাবিত হইতেছ, ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, দ্বিধা নাই!

হে পুরাতন সম্প্রদায়ভুক্ত বিজ্ঞানবিৎ, একটী অন্তঃসারশূন্য ও পরিবর্ত্তনশীল তথ্যের, অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর দুই একটী যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া, চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই চারিটী গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ যোজনা করিয়া এবং অর্থশূন্য থিওরির (Theory) সমাবেশ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছ এবং জনসমাজে ভূরি ভূরি করতালি পাইয়া ধরাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ। তোমরা একবার সেই বিশ্বনিয়ন্তার এই বিশ্বসৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, দেখিবে, তাঁহার এই বৈচিত্র্যময় পদার্থ—জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, জীব, উদ্ভিদ, গ্রহ, তারা, সকলই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের শক্তিতে অনুপ্রাণিত—তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, দেখিবে, কি মহাশক্তি-কৌশলে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সংশ্লিষ্ট ভাবে অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে। এই শক্তির নামকরণ করিতে পার বটে, কিন্তু ইহা কি উপাদানে গঠিত, তাহা বলিতে পার কি? হে জড়োপাসক, এস, তোমাদের সেই চিরপরিচিত স্থূল গণ্ডীর মধ্য হইতে বহির্গত হয়ে এস—সূক্ষ্মের মহিমান্বিত রাজ্যে বিচরণ কর, দেখিবে, সত্যের সন্ধান কত সহজে হইয়া থাকে। হে দাম্ভিক, তোমরা চক্ষুষ্মাণ হইয়াও অন্ধ কেন, কর্ণ থাকিতে বধির কেন, নাসিকা থাকিতেও ঘ্রাণ-শক্তি হীন কেন, জিহ্বা থাকিতেও রস উপভোগ করিতে অসমর্থ কেন, ত্বক থাকিতেও সুখানুভূতি হয় না কেন? তোমাদের সকলই আছে, কিন্তু কিছুই নাই। স্থূল অনুভূতি পশ্বাদিরও আছে, কিন্তু সূক্ষ্মানুভূতি মানব-জাতির নিজস্ব সম্পত্তি। এই শক্তি মানবজীবনের উৎকর্ষ-সাধনের এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের মূলীভূত কারণ। অনুভূতি দুই প্রকার, বাহ্য বা স্থূল এবং সূক্ষ্ম বা আন্তর। যেমন মোটা সুর তুলিতে হইলে সেতারের মোটা তারে ঝঙ্কার দিতে হয়, তেমনি বাহ্য-জগতের সাধারণ উত্তেজনা রূপ স্পন্দন যেমন আলো শব্দ ইত্যাদি মস্তিষ্কস্থিত সাধারণ স্নায়ু-মণ্ডলীকে আঘাত করিয়া স্থূলানুভূতির বিকাশ করে—যেমন চিক্কণ সুর তুলিতে হইলে, সেতারের চিকণ তারে ঝঙ্কার দিতে হয়, তেমনি, সেই ঐশীবাণীতে শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিতে হইলে, সেই ঐশী-স্পর্শানুভূতি উপভোগ করিতে হইলে, সেই স্বর্গীয় বিমল আলোকে দর্শন পুলকিত করিতে হইলে, সেই

স্বর্গীয় মধুর ঘ্রাণ-সুখ উপভোগ করিতে হইলে, সেই স্বর্গীয় বিভূতি অঙ্গে লেপন করিতে হইলে, চিন্তারূপ উত্তেজনার স্পন্দন মস্তিষ্ক-স্থিত সূক্ষ্মতমসূক্ষ্ম এবং জটিল স্নায়ুমণ্ডলীকে আন্দোলিত করিতে হইবে এবং এই আঘাতের প্রতিধ্বনি মনোরাজ্যে প্রকাশিত করিয়া সূক্ষ্ম দর্শনের উদ্ভব করিবে। হে জড়বাদী, হৃদয়-বীণার সূক্ষ্মতম তারে একবার ঝঙ্কার দাও, দেখিবে, কি সুন্দর, কি মধুর, কি চিত্ত-বিমোহনকারী সূক্ষ্মতত্ত্বের সারে—গা—মা বাজিয়া উঠিবে।

কালের আবর্ত্তন বিবর্ত্তন মধ্যে যাহা অপরিবর্ত্তনশীল, যাহা অস্থায়ীর মধ্যে স্থায়ী, যাহা বিনশ্বরের মধ্যে অবিনশ্বর, যাহার আদি অন্তঃ মধ্য এক, তাহাই নিত্য সত্য। রাত্রের পর দিন, দিনের পর রাত্রি, এক ঋতুর পর অন্য ঋতু, সূর্য্য বা চন্দ্র পূর্ব্বে উদিত হয় এবং পশ্চিমে ডুবিয়া যায় ইত্যাদি নিত্য এবং ধ্রুব সত্য। ইহাদিগের কোন কালে কোন বিকার নাই। যাহা ধর্ম্ম, তাহা চিরকালই ধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম, তাহা চিরকালই অধর্ম্ম, যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ, যাহা অসৎ, তাহা চিরকালই অসৎ। ইহাদিগের বিকার নাই, পরিবর্ত্তন নাই, চিরকাল একভাবে চলিয়া আসিতেছে। অতএব যাহা প্রতিক্ষণে প্রতি-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, যাহার স্থায়িত্ব হাওয়ার মত চঞ্চল, যাহার স্থায়িত্বের কোন নির্দ্দেশ নাই, তাহা কাল্পনিক সত্য বা সত্যের ভাব-মাত্র। হে পুরাতন চিকিৎসক-সম্প্রদায়! আজ যে তত্ত্বকে নিত্য সত্য বলিয়া আদর করিতেছ, সদর্পে, সমস্বরে, সহরে এবং পল্লীতে প্রচার করিতেছ, অলৌকিক বাক্য-বিন্যাসে জন-সমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছ, কাল আবার পূর্ব্বমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত আবিষ্কার করিয়া পূর্ব্বমতের মস্তকে বজ্রাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছ না! নূতন উৎসাহে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার দুন্দুভি-নিনাদে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিতেছ। এই নব-আবিষ্কৃত-তত্ত্বের বার্ত্তা তোমরা তোমাদের বাক্য-বিন্যাশের ছটায় এবং কাল্পনিক যুক্তির এবং তর্কের বলে, সাময়িক উত্তেজনা-প্রিয় এবং চঞ্চল জন-সংঘে ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। এইরূপে ধ্রুব মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসাইয়া নিত্য পূজা করিতেছ। অন্ধকার গৃহমধ্যে কোন এক ব্যক্তি তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর আশায় একস্থান হইতে অন্য স্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই ঈপ্সিত বস্তুর ন্যায় কোন বস্তু যদি তাহার হস্ত স্পর্শ করে, সে যেমন তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার মন বুঝিতে পারিয়া বস্তুটীকে পরিত্যাগ করে এবং পুনরায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, তোমরাও ঠিক সেইরূপ, চিকিৎসারূপ অন্ধকার রাজ্যে সত্যের অনুসন্ধানে ফিরিতেছ, —কাল্পনিক সত্যের স্পর্শ অনুভব করিতেছ, কিন্তু নিত্য সত্য দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কলেরা-চিকিৎসা ইহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—এই ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে কলেরা চিকিৎসার কত না পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। প্রথমে ক্লোরোডিন ও সাধারণ উত্তেজক, দ্বিতীয়তঃ কেলমেল ও সাধারণ উত্তেজক, তৃতীয়তঃ শুধু কেলমেল এবং সাধারণ উত্তেজক কলেরা চিকিৎসার পক্ষে অহিতকর বলিয়া ঘোষিত হইল এবং সর্ব্বশেষে অধুনা Saline injection অর্থাৎ ঈষৎ গরম লবণমিশ্রিত জলের পিচকারী কলেরা-চিকিৎসায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রশংসিত হইতেছে। আর কিছুদিন পরে হয়ত অন্য একপ্রকার চিকিৎসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইবে। কিন্তু যখনই

যে চিকিৎসা আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্।

যাহা বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই তোমরা বিশ্বাস কর। যাহা সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে, তাহা তোমাদের বিশ্বাসযোগ্য নহে। জল জমিয়া বরফ হয়। সেই বরফ জলে পরিণত হয় এবং সেই জল অগ্নির সংস্পর্শে বাষ্প হয়। সেই বাষ্পের শক্তি অসীম, তাহাও তোমরা স্বীকার কর, কিন্তু অগ্নি সংস্পর্শে জলকণার যে অভাবনীয় শক্তির বৃদ্ধি হয় কেন, সে তত্ত্ব তোমরা জান কি? বিদ্যুৎ হইতে যে শক্তির উচ্ছ্বাস হয়, সে শক্তির সমাবেশে, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, গ্রহ, উপগ্রহমণ্ডল শূন্যে উড্ডীয়মান অবস্থায় রহিয়াছে—স্থানচ্যুত হয় না। যে শক্তির আকর্ষণে বৃক্ষস্থিত ফল মৃত্তিকায় পতিত হয়, মেগনেট লৌহকে আকর্ষণ করে, তাহা বলিতে পার কি? এ সকল কি উপাদানে গঠিত? মাধ্যাকর্ষণাদি শব্দ আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র পরিপূর্ণ করিতেছ, কিন্তু সঠিকতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছ কি? এই সকল তত্ত্ব এমন অভূতপূর্ব্ব, এমন অলৌকিক রহস্য-জালে আবৃত যে, ইহা ভেদ করিয়া নিত্যতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে দৈবি অন্তর-দর্শনের আবশ্যক। সমাহিতচিত্তে এই সকল তথ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিবে যে, সমগ্র স্থূল পদার্থের মূলে সূক্ষ্মশক্তি বিরাজ করিতেছে। এই শক্তিবলে পরিদৃশ্যমান এবং অপরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জীব জন্মিতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আবার মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। সমস্ত জাগতিকক্রিয়া এই শক্তির প্রভাবে উঠিতেছে, বাড়িতেছে, এবং আবার পড়িতেছে। সূর্য্য আপন আপন আলোকপুঞ্জ,চন্দ্রমা যেমন তাহার আলোকে আলোকিত, সেইরূপ, সূক্ষ্ম শক্তি তাহার তেজোরাশির প্রভাবে স্থূল শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিতেছে। এই সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের বিকাশ এবং স্থূল সূক্ষ্মের সমষ্টিমাত্র। জীবই হউক বা উদ্ভিদই হউক, ইহাদিগের স্বস্ব স্থূল আকার মূল বীজের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করে। এই সূক্ষ্ম অবস্থা হইতেই অঙ্কুর—তৎপরে তাহার বৃদ্ধি এবং পরিণাম তাহার মৃত্যু।

এ জগতে প্রাণী মাত্রেরই মৃত্যু, রোগ এবং জরা হইতে হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, স্থূল এবং সূক্ষ্মভাবে রোগের সহিত জরার কি সম্বন্ধ? রোগ ক্রিয় (active) এবং জরা নিষ্ক্রিয় (passive)। রোগ মাত্রেই কতকগুলি লক্ষণের বিকাশ করে কিন্তু জরায় সেইগুলি বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় না। রোগ হইতে যে ক্রিয়ার উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমাদিগের বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, কিন্তু জরার ক্রিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত মানব দেহের মধ্যে দিয়া বহিতে থাকে, বহির্জগতে আদৌ পরিপুষ্ট হয় না। ক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ক্রিয়ার এখানে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম। যোগের ফল তন্ময়ত্বলাভ বা নির্ব্বাণ। যোগ শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ কতকগুলি বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপ, যেমন কুম্ভক, শ্বাস ইত্যাদি অভ্যাস করিতে হয়। সাধক যতই সাধনা-রাজ্যে অগ্রসর হয়, ততই তাহার বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপাদি প্রাপ্ত হইতে থাকে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল ক্রমশঃ অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াতে পরিণত হয়। তখন সাধক নিশ্চল, নিষ্কাম, তন্ময়। সাধকের হৃদয় তখন ভগবৎভক্তি এবং প্রেমে যুগপৎ উচ্ছ্বসিত,সাধকের অন্তঃস্থল হইতে যে

পবিত্র নির্ঝরিণী নিক্রান্ত হয়, তাহা সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কলাপাদি লইয়া স্থির, ধীর, সৌম্য সাগর-নীলিমায় নিমজ্জিত করে। সাধকের হৃদয়ের ক্রিয়া হৃদয়ে উঠিয়া অন্তঃ-সলিলা ফল্গুর৹মত হৃদয়েই বহিতে থাকে এবং চিত্তের মোক্ষ লাভের উপযোগী গুণ সকলকে বিকশিত করিয়া দেয়। তাই বলিতেছিলাম, যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ক্রিয়া, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই নিষ্ক্রিয়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই ক্রিয়া ব্যতীত ফলের আশা মূর্খতা মাত্র। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, রোগের সহিত জরার বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে মৃত্যুশক্তি জীব-জগৎকে কঠিন আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করিতেছে, যে মৃত্যু-শক্তি অলক্ষিতে, প্রতিক্ষণে, প্রতি পলে, প্রতি দণ্ডে আজীবন ধরিয়া সূক্ষ্ম দেহের ধ্বংস সাধন করিতেছে, সেই মৃত্যুশক্তি জন্মমাত্র হইতে জীবদেহ মধ্যে উপ্ত হইয়া অবশেষে স্থূলদেহের নিপাত সাধন করিতেছে। এই মৃত্যুশক্তির প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে জীব-জগতের মধ্য দিয়া সৃষ্টির আদি হইতে অন্তঃ পর্য্যন্ত প্রবাহিত। এই মৃত্যু-বীজ জীবের সৃষ্টির সহিত উৎপন্ন হইয়াছে। এই শক্তির প্রভাবে জীব সকল জন্মিয়া আবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই মৃত্যুর প্রভাব না থাকিলে, জরা কিম্বা রোগ জীবদেহে স্ব স্ব বীজ উপ্ত করিতে সমর্থ হইত না। তাহা হইলে ভগবানের বিশ্বরাজ্যে জীব অমর হইয়া থাকিত এবং জরা ও রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত। জীব মৃত্যুর অধীন, কোন কালেই অমর নহে। মৃত্যুই সমস্ত জীবের পরিণাম। ইহার শক্তি রোধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবদেহ মধ্যে মৃত্যুর অক্ষুণ্ণতা মানিয়া লইতে হইবে। অতএব জরাই হউক বা রোগই হউক, দুই মৃত্যুশক্তি হইতে উদ্ভূত। যেমন সহোদরের সহিত সহোদরের ধাতুগত সৌহৃদ্য এবং সাদৃশ্য, মৃত্যুশক্তি হইতে উদ্ভূত জরা এবং রোগ তাহা-দিগের মধ্যেও সেইরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানুষের বীজ যেমন মানুষ, পশুর বীজ যেমন পশু, ফলাদির বীজ যেমন ফল প্রসব করে, তেমনি, মৃত্যুশক্তি জীবদেহে জরা এবং রোগ-বীজ উপ্ত করিয়া থাকে। অথচ মৃত্যুকে রোগ বা জরার ফল মাত্র ধরিলেও পূর্ব্বোক্ত সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। কারণ আমের গাছে আমই ফলিয়া থাকে, কখনই কাঁঠাল ফলিতে দেখা যায় না। যে যে জাতীয় বৃক্ষ,সে সে জাতীয় ফল প্রসব করিয়া থাকে, অন্য ফল প্রসব করিতে পারে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, জরা এবং রোগ যাহার ফল, এক মৃত্যু তাহার এক ধাতুতে নির্ম্মিত এবং তাহাদিগের ভিতর বিশেষ কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। এখন দেখা যাউক যে, স্থূলভাবে জরা ও রোগের মধ্যে কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় কিনা? যে জরা হইতে শারীরিক কোষ সকল পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মরিতেছে, যে জরা হইতে ধমনী সমূহের কোষ সকল তন্তুবৎ কঠিন পদার্থে পরিণত হইতেছে, যে জরা হইতে চক্ষুর কৃষ্ণ গোল-কের চতুর্দ্দিকে তন্তুবৎ পদার্থের শ্বেত গোলা-কার রেখা সমুদ্ভূত হইতেছে, যে জরার প্রভাবে চক্ষুর মণিতে কঠিন মতিয়া বিন্দু জন্মাইতেছে, যে জরার প্রভাবে মস্তিষ্ক পদার্থ নরম হইয়া মস্তিষ্ক-বিকৃতি আনয়ন করিতেছে, যে জরার প্রভাবে হস্ত পদাদির কম্পন আনিতেছে, যে জরার প্রভাবে শরীরের মধ্যে

পাথর জাতীয় কঠিন পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে, যে জরার প্রভাবে শরীরের আভ্যন্তরীণ কোষ সকল মরিয়া যন্ত্রাদি সঙ্কোচিত হইতেছে, যে জরার প্রভাবে শারীরিক বস্তু কোষের রোগাদির ন্যায় স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, তাহা রোগ শক্তি হইতে কোন প্রকারের ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হইতে পারে না। রোগাদির ক্রিয়া—জীব দেহে উগ্রভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জরার ক্রিয়ায় বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আমরা দেখাইলাম যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভাবে জরার সহিত রোগের বিশেষ রূপ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এখন দেখা যাউক, রোগাণুর সহিত মানব দেহের সম্বন্ধ কি? বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত মহিমাময় বিশ্বসৃষ্টির রহস্য-জাল উদ্ঘাটিত হইলে, আমরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে, সাম্যের শান্তিময় আসন বিশ্বরাজের বক্ষোপরি অধিষ্ঠিত। কখনও কখনও বৈষম্যের গভীর গর্জ্জন সাম্যের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সাম্যের আসন কম্পিত করিতেছে। যুগ ধর্ম্ম আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে,সাম্যের প্রাধান্য অবিচলিত ভাবে জগতের হিতসাধন করিতেছে, বৈষম্য চির সহচর হইলে এই জীব জগতের অস্তিত্ব কোন্ দিন মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইত। এই সাম্যের শান্তিরূপ সুধা বর্ষণে জীবজগৎ জীবিত এবং আপ্লুত। বন্ধুত্ব, প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি বন্ধন অন্তর্হিত হইবা মাত্র এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অচিরাৎ খান খান হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সাম্যের স্রোতই প্রবল এবং কখনও বৈষম্য আসিয়া সাম্যকে ক্ষণকালের জন্য বিচলিত করিয়া তুলে। এই সাম্যই জগতের চালক এবং রক্ষক। কুরুক্ষেত্র রূপ বৈষম্যের খেলা অতি বিরল। চৈতন্যের ন্যায় কত শত অবতার অবতীর্ণ হইয়া সাম্যের মহান্‌মন্ত্র প্রচারে এই ধরাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। এই সাম্যের প্রবলতম ধ্বনি জীবজগতের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং বৈষম্যের ক্ষীণ কণ্ঠ অচিরাৎ শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। সেই মহাপ্রাণ ঋষি-আশ্রমে সাম্যের কি মোহিনী শক্তি বিরাজ করিত। তপোবনাশ্রিত কত হিংস্র জন্তু আপনাদিগের খাদ্য খাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিত। এই সকল পুণ্যতীর্থ সাম্যের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অতএব আমরা বুঝিলাম, যে সাম্যই জগতের মূল এবং তাহার বৈচিত্র্যময় শক্তির প্রভাবে জগৎ অধিষ্ঠিত। কি উচ্চ, কি ক্ষুদ্র, কি সূক্ষ্ম, সমস্ত জীবজগৎ সাম্যের উৎসে পরিপুষ্ট হইতেছে—এক শ্রেণীর জীব হইতে অন্য শ্রেণীর জীবে সূক্ষ্মভাবে আদান প্রদান চলিতেছে। সাম্যই জীবের প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হইলে জীবজগতের ধ্বংস অনিবার্য্য।

মানবজাতি উচ্চশ্রেণীর জীব। তাহার শরীর পোষণের পক্ষে যতটা জীব-হিংসা আবশ্যক মনে করে—তাহাই করিয়া থাকে। শুধু জীব হিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কখনই জীব হিংসা করে না। মানব জাতির মধ্যে এমন সম্প্রদায় আছে, যাহারা জীবহত্যা মহাপাপ বলিয়া,অহিংসা পরম ধর্ম্ম,এই মতের প্রচার করিতেছে। জীবহত্যা মানবজাতির প্রকৃতিগত বুদ্ধি নহে; প্রাণী হত্যায় প্রণোদিত করিতে মানব-হৃদয়ে বিশেষ কোন আকর্ষণী শক্তি বা ঐকান্তিক আগ্রহ নাই। বিশেষ কোন প্রয়োজন না হইলে মানুষ জীব

হত্যা হইতে বিরত থাকে। হিংস্র জন্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিলে—আমরা পূর্ব্বোক্ত রূপ মীমাংসায় উপনীত হই। কীট ও পতঙ্গের সহিত দীপালোকের এবং মেগ্‌নেটের সহিত লৌহ-ফলকের কি বৈদ্যুতিক আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে কীট পতঙ্গ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে, মরিবে জানিয়াও, আপনাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিতেছে, যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে ম্যাগনেট লৌহকে আকর্ষণ করিয়া আপনার সহিত সংযোগ করিতেছে, সেই বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তির ন্যায় বিনাশের আকাঙ্ক্ষা মানব জাতির বায়ুস্থ জীবাণুর উপর আছে কিনা, তাহাই অধুনা বিবেচ্য।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এইরূপ আকর্ষণী শক্তি, পশ্বাদির সহিত মানবজাতির বর্ত্তমান নাই। মানব জাতির সহিত হিংস্র জন্তুদিগের এমন কোন বিরুদ্ধ আকর্ষণী শক্তি নাই, যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া শত সহস্র ব্যাঘ্র, সিংহ ভল্লুকাদি পিপীলিকা স্রোতের ন্যায় বনাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মানব জাতির বিনাশের জন্য ছুটিতেছে। কোন হিংস্র জন্তুর সহিত কোন দুর্ভাগ্যের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইলে বা কোন হিংস্র জন্তু হঠাৎ বনাভ্যন্তর হইতে মানব জাতির মধ্যে আসিয়া পড়িলে এরূপ হিংসাবৃত্তি চরিতার্থের অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। হত্যা কার্য্যটা প্রাণী মাত্রেরই স্বাভাবিক, হিংস্র জন্তুর মধ্যে ততোধিক। আকস্মিক হত্যার আবেগ সাময়িক, কোন মানসিক উত্তেজনা, ক্ষুধা নিবৃত্তি ইচ্ছা বা ভয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, —ইহা কখনই জীবজগতের প্রকৃতিগত বৃত্তি বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, হিংস্র জন্তুর জীব-হত্যাকারী বৃত্তির চরিতার্থে তাহাদিগের মনোমধ্যে বিশেষ কোন অপ্রতিহত কিম্বা প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম বা আকর্ষণী শক্তির উদ্রেগ হয় না। মাইক্রোব জাতীয় জীবাণু সমগ্র জীবজগতের সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত। ইহার সহিতও মানব জাতির ভিন্ন জাতির বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিতে পারে না। যে কোন গুণ বা ধর্ম্ম জীবজগতে আদৌ বর্ত্তমান নাই, তাহার আরোপ মূর্খতা মাত্র এবং সম্যক দূর দৃষ্টির অভাব। এই বিরুদ্ধগুণ-বিশিষ্ট আকর্ষণী শক্তির অভাবে কোন রস-লোলুপ জীবাণু আগাছার মত মানব জাতির সহিত আকৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশাধিকার না পাইয়া রক্তরূপ জীবনী শক্তির বিকৃতি সাধন বা তাহার আমূল শোষণ করতঃ কোন স্থায়ী বিষাক্ত রোগের সৃষ্টি করিতে পারে না।

পূর্ব্বকথিত রূপ যুক্তি অনুসারে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানব জাতির সহিত বায়ুস্থ জীবাণু সমূহের বিশেষ কোন প্রকৃতিগত বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট আকর্ষণী শক্তি (Specific affinity) বিদ্যমান থাকিতে পারে না। (ক্রমশঃ) শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার।

অনুতাপ।

সিক্ত কর উপাধান, নিত্য যদি তিক্ত অশ্রুজলে,
হাহাকারে দীর্ণ কর নীলাকাশ—শীর্ণ অনুতাপে,
হয় না পাপের প্রায়শ্চিত্ত—শুদ্ধ তুমি বাড়াও কৃতপাপে
বাড়ে না ক পুণ্য শুধু ক্ষুণ্ণ কর কৃত পুণ্যবলে।
অনুতাপ ত শিশুর রোদন,পাপের ফল ত আপনিই ফলে;
স্পর্শ কর অগ্নি যদি, অগ্নি সে ত আপনিই দহে;
নিজে হতেই শিশু আবার স্পর্শে না সে প্রদীপ্ত অনলে;
পূর্ব্বকৃত পাপরাশি পূর্ব্ববৎই পুঞ্জীভূত রহে।
কর পরের উপকার—যদি সত্য চাহ পাপক্ষয়।
কর কর্ম্ম—ধর্ম্মে শুধু প্রায়শ্চিত্ত—অনুতাপে নয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

শঙ্করাচার্য্যের মত।

১। বেদান্তের পারিভাষিক শব্দ।

ভাষা কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে ফরাসি পণ্ডিত বল্‌টেয়ার বলিয়াছিলেন :—"যে বিদ্যা বা কৌশল দ্বারা মনের প্রকৃত ভাব গোপন করা যায়, তাহারই নাম ভাষা।" বেদান্তের প্রচলিত কতিপয় পারিভাষিক শব্দের আলোচনা করিলেও যেন তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। শব্দের ব্যূহে পড়িয়া যেন মাথা ঘুরিয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, আদিতে পৃথিবী তরল অবস্থায় ছিল। বেদ কি বাই-বেলও তাহাই বলে। বেদান্তের প্রচলিত কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইতিবৃত্তের আলোচনা করিতে গেলেও দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালে ভাষা অতি তরল অবস্থায় ছিল। রূঢ় শব্দ মাত্রেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঋগ্বেদে দেখা যায়, একই শব্দ কখনও ঈশ্বরের প্রতি, কখনও বা প্রকৃতির শক্তি বা ব্যাপার বা দেব-বিশেষের প্রতি, কখনও বা ঋষি-বিশেষের প্রতি, কখনও বা পুরোহিতাদির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদান্তবাদ শ্রুতিমূলক। এজন্যই অস্ফুটার্থক বা দ্ব্যর্থক বহু বৈদিক প্রাচীন শব্দ বেদান্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দের পরিষ্কার সংজ্ঞা না থাকিলে দার্শনিক আলোচনার সুবিধা হয় না। সচরাচর শব্দ ব্যবহৃত হয় আগে, শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হয় পরে। বেদান্ত মতে আমরা দেখিয়াছি, বেদ অপৌরুষেয়। এরূপ অবস্থায় বৈদিক শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ব্যবহারের সীমা খর্ব্ব করিবে কে? এজন্যই বেদ-বেদান্তে হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, মায়া, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অনেক জঙ্গল কাটিয়া, অনেক হাতড়াইয়া ভিন্ন, এ সকল শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। আবার একজনে যাহা প্রকৃত অর্থ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবে, অন্যেরা তাহা গ্রহণ নাও করিতে পারে। এজন্য বিবাদ অবশ্যম্ভাবী।

২। মায়া, অব্যক্ত, অবিদ্যা, বা প্রকৃতি।

আমরা এস্থলে বেদান্তের প্রচলিত মায়া

শব্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে,বৃহদারণ্যক উপনিষদে, এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই আপনার ভিতরে লূতাকীটের সূত্রের ন্যায়, জাগতিক নানাত্ব রচনারূপ অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি শক্তিকেই মায়া-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ উপনিষদেই আবার ব্রহ্মের সৃষ্টি-শক্তিকে জীবের স্বপ্ন-সৃষ্টির সহিতও তুলনা করা হইয়াছে। ব্যাস তাঁহার কৃত ব্রহ্মসূত্রেও সৃষ্টিকে স্বপ্নের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্য-কারিকায় স্বপ্নের সহিত সৃষ্টির সাদৃশ্য অতি বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি নিজে ব্রহ্মের সৃষ্টিব্যাপারকে যাদুকরের ইন্দ্রজালের সহিতও তুলনা করিয়াছেন। কালক্রমে কবিত্বের ভাবেই হউক, আর যে ভাবেই হউক, "মায়া" শব্দের মধ্যে, ছলনা বা প্রতারণার ভাবও আরোপিত হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি ছলনার ভাব আরোপ করা লোকের নৈতিক জীবনের পক্ষে অনুকূল কিনা, পাঠকই চিন্তা করিবেন। সে যাহা হউক, 'মায়া' শব্দের মুখ্য এবং সর্ব্ববাদিসম্মত অর্থ 'ঈশ্বরের জগচ্চ-রচনা শক্তি।' 'অবিদ্যা,' 'অব্যক্ত' এবং 'প্রকৃতি' এই সকল সেই মায়া নাম্নী বিশ্বরচনা শক্তিরই নামান্তর।

মায়া বা অব্যক্ত সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সূত্র ভাষ্যে বলিতেছেন:—"ব্যাকৃত নামরূপ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন, এই জগৎ যখন সৃষ্টির প্রাগবস্থাতে ব্যাকৃত নামরূপ-রহিত হইয়া, বীজশক্তির অবস্থায় ছিল,তখনই তাহা অব্যক্ত নামের যোগ্য ছিল।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, শঙ্কর এস্থলে সৃষ্টির একটা প্রাগবস্থা স্বীকার করিতেছেন,—অথচ তাঁহার মতে সৃষ্টি অনাদি। শঙ্কর আবার বলিতেছেন—"এই জগৎ যখন প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তখনও শক্তি অবশিষ্ট থাকে। সেই শক্তিরূপ মূল হইতে আবার উৎপন্ন হয়, নতুবা আকস্মিকত্ব দোষ ঘটে।" ১—৩—৩০। পরমেশ্বরের প্রতি বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষারোপ খণ্ডন করিবার জন্য শঙ্কর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, জীবের কর্ম্মবীজ হইতে জীব-বৈষম্যের উৎপত্তি। এখন তিনি বলিতেছেন "পরমাত্মার শক্তিরূপ মূল হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়।" এই দুই বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য কোথায়? বোধ হয় কর্ম্মমীমাংসকদিগের কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ—মতের অনুসরণ করিয়া, তিনি কর্ম্মবীজের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি পুনরায় বলিতেছেনঃ—"মায়াই অব্যক্ত, কারণ মায়া ব্রহ্মই, অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই, তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য।" ১—৪—৩। গুণ গুণী (abstract and concrete) সম্বন্ধে একথা সর্ব্বত্রই সত্য। গোলাপের সৌন্দর্য্য গোলাপই অথবা গোলাপ হইতে ভিন্নই—তাহাও নিরূপণ করা অসাধ্য। আবার সাঙ্খ্য 'প্রধান'-বাদ খণ্ডন করিয়া মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন,—"কেহ বলেন, নামরূপ দ্বারা অনভিব্যক্ত অব্যক্ত-শব্দার্হ জগতের বীজাত্মক প্রাগবস্থা যদি স্বীকার করা যায় এবং তৎসঙ্গে যদি (লিঙ্গ) শরীরেরও তদাত্মকত্ব হেতু অব্যক্ত শব্দার্হত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাঙ্খ্যোক্ত প্রধান-বাদই স্বীকার করা হয়। কারণ 'প্রধান' শব্দদ্বারাও এই জগতের প্রাগবস্থাই গৃহীত হয়। এই কথার উত্তরে বলা যাইতেছে—যদি আমরা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কারণরূপে, জগতের কোন প্রাগবস্থা স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে প্রধান-কারণ- স্বীকার করা হইত। কিন্তু আমরা জগতের যে প্রাগ-

বস্থা স্বীকার করি, তাহা ঈশ্বরেরই অধীন, স্বতন্ত্র নয়। তাহা স্বীকার করার বিশেষ অর্থ থাকাতে, অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা ভিন্ন পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধি হয় না। শক্তি রহিত হইলে ঈশ্বরের পক্ষে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি অসম্ভব। অব্যক্ত শব্দবাচ্য্য সেই বীজশক্তি অবিদ্যাত্মিকা। তাহা পরমেশ্বরের আশ্রিতা মায়াময়ী, মহা সুষুপ্তিরূপা। সংসারী জীবগণ স্বরূপ-প্রতিবোধ-রহিত হইয়া, তাহারই মধ্যে নিদ্রিত রহিয়াছে। সেই অব্যক্তই শ্রুতিতে কোথাও আকাশশব্দে, কোথাও অক্ষরশব্দে, কোথাওবা মায়া শব্দে বর্ণিত হইয়াছে।" আবার বলিতেছেন:—"অবিদ্যাকল্পিত নাম-রূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূতেরই ন্যায়। তাহা ঈশ্বরই (তত্ত্ব) বলা যায় না (কারণ তাহা জড়। ঈশ্বর হইতে তাহা ভিন্নই, এরূপ বলা যায় না (কারণ কল্পিত পদার্থের পৃথক্ সত্তার অভাব)। তাহাই সংসার-প্রপঞ্চের বীজস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি, বা প্রকৃতি।" "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" শ্বেতা-শ্বতর। শঙ্কর 'মায়াকে ঈশ্বরই, অথবা ঈশ্বর হইতে ভিন্নই (তত্ত্বান্তর) বলিতেছেন না। কেবলমাত্র বলিতেছেন 'মায়া' জগতের বীজ-রূপ প্রাগবস্থা, ঈশ্বরের অধীন, স্বতন্ত্র নয়, "মহা সুষুপ্তিরূপা," "অবিদ্যাত্মিকা" "মায়াময়ী" বীজশক্তি।" যখন মায়াকে সৃষ্টি-বীজস্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি বলা হইতেছে, তখনই মায়ার সহিত ব্রহ্মের গুণ-গুণী সম্বন্ধ স্বীকৃত হই-তেছে। "গুণ-গুণিনোরভেদাৎ"—শঙ্করের এই সূত্র অনুসারে ব্রহ্ম হইতে মায়া অভিন্ন,—পৃথকত্ব আমাদের মনের কল্পনা মাত্র।

স্বপ্নের সহিত মায়ার তুলনা।

আবার তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্রে "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহহি।" এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:—'সন্ধ্য' বলিতে স্বপ্নস্থানকে লক্ষ্য করে। দুইলোক-স্থানের—অর্থাৎ জাগরণ এবং সুষুপ্তি, এই উভয়ের সন্ধি-স্থলে থাকে, এজন্য স্বপ্নস্থানকে 'সন্ধ্য' বলা হয়। সংশয় হইতেছে, জাগরিতাবস্থার ন্যায় স্বপ্নেও কি সৃষ্টি পারমার্থিকী অথবা মায়াময়ী। সন্ধি-স্থানের অর্থাৎ স্বপ্নকালের সৃষ্টিও তথ্যরূপা (পারমার্থিক) হওয়াই সম্ভব। তৃতীয় সূত্র—'মায়া মাত্রন্তু' ইত্যাদি। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—"সন্ধ্য সৃষ্টি পারমার্থিকী নয়। সন্ধ্য-সৃষ্টি মায়াময়ী, তাহাতে পরমার্থ গন্ধও নাই, কারণ স্বপ্ন সম্পূর্ণই যথাভূত-বস্তু-ধর্ম্মদ্বারা অনভিব্যক্ত, অর্থাৎ স্বপ্নে যথার্থ-বস্তু সম্বন্ধী দেশ, কাল এবং নিমিত্তের অভাব দৃষ্ট হয়। স্বপ্ন-জ্ঞান দ্বারা জাগ্রদ্‌বস্তু বিষয়ক জ্ঞান বাধিত হয় না। স্বপ্নে যে রথাদি দৃষ্ট হয়, তাহার উপযুক্ত স্থান নাই, কারণ সঙ্কীর্ণ দেহ মধ্যে রথাদির স্থান হয় না। ক্ষণকাল মধ্যে শত যোজন দূরদেশে যাইয়া বিচরণ করিবার সামর্থ্য সুপ্ত ব্যক্তির নাই। যদি যথার্থই দেহ হইতে বাহিরে যাইবে, তবে যেখানে যাইবে, সেখানেই প্রতিবুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। যেখানে শয্যায় নিদ্রিত হয়, সেখানেই প্রতিবুদ্ধ হয়। আর যে দেহে থাকিয়া সে মনে করে, স্বপ্নে দেশান্তরে গমন করিয়াছিল, পার্শ্বস্থ লোকেরা শয়ন দেশেই সেই দেহ দেখিতে পায়। আর ঐ সকল দেশান্তর ও স্বপ্নে যেরূপ সে দর্শন করে, সেইরূপ হয় না। কাল-বিরোধ ও স্বপ্নে দেখা যায়,—রজনীতে শয়ন করিয়া স্বপ্নে দিবা দেখা যায়, অথবা মুহূর্ত্ত মাত্র কালকে স্বপ্নে বহুবর্ষ মনে করে। চক্ষুরাদি করণের অভাব হেতু স্বপ্নে রথাদি দর্শনের নিমিত্তেরও অভাব। অতএব স্বপ্ন দর্শন মায়া-মাত্র।"

চতুর্থ সূত্র "সূচকশ্চ" ইত্যাদি। শঙ্কর তাহার ভাষ্যে বলিতেছেন;—যেহেতু স্বপ্ন মায়া-মাত্র, অতএব তাহাতে পরমার্থ গন্ধও নাই।" আপত্তিঃ—"তাহা নয়, কারণ স্বপ্নদর্শন ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের সূচক হয়, যথা স্বপ্নে স্ত্রী দর্শন হইলে সমৃদ্ধি জানিবে। 'কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্ত পুরুষ যেন তাহাকে বধ করিতেছে' এরূপ দেখিলে অচিরজীবিত্ব প্রকাশ করে।' ইত্যাদি। কিন্তু যদিও ইহাদ্বারা সূচ্যমান বস্তু সত্য হয়, সূচক স্বপ্নগত স্ত্রী দর্শনাদি মিথ্যাই, কারণ তাহা বাধিত হয়। তবে আমরা স্বপ্ন সম্বন্ধে ও প্রাজ্ঞের বা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতেছি না,—কারণ যিনি সকলের ঈশ্বর, সকল অবস্থাতেই তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকা সঙ্গত। তবে এইমাত্রই দেখান যাইতেছে যে, সন্ধ্যা বা স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় সত্য (পারমার্থিক) নয়। আবার আকাশাদিরও আত্যন্তিক সত্যত্ব নাই। সমস্ত প্রপঞ্চই মায়া-মাত্র। সন্ধ্যা বা স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টির মায়ামাত্রত্ব বলাতে এইমাত্রই বিশেষ যে, তাহা প্রতিদিনই বাধিত হয়, আর আকাশাদি প্রপঞ্চের স্বরূপ ব্রহ্মাত্ম দর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যবস্থিত থাকে।* ৩-২-৪।

আমরা দেখিতেছি, শঙ্করের মতে মায়া 'অবিদ্যাত্মক,' পরমেশ্বরের আশ্রিতা 'মহা সুষুপ্তি রূপা' 'সৃষ্টির বীজশক্তি।' শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী বেদান্তবাদীগণ মায়ার এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে ভারতীতীর্থ-কৃত পঞ্চদশী মায়া সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ভারতীতীর্থ কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করানন্দের শিষ্য। শঙ্করানন্দ বোধ হয় শঙ্করেরই অল্পপরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শঙ্করাচার্য্যেরই মতাবলম্বী। পঞ্চদশী মায়া সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"অধ্যেতৃবর্গ-মধ্যস্থ পুত্রের অধ্যয়ন-শব্দ শোনা যায় বটে, কিন্তু অনেকে একত্র শব্দ করাতে বিশেষ ভাবে তাহার প্রতীতি হয় না, সেইরূপ পরমাত্মার প্রকাশ সম্বন্ধেও অনাদি অবিদ্যাই অজ্ঞানতার একমাত্র কারণ।" সেই অবিদ্যা কিমাত্মক?

"অবিদ্যার অপর নাম প্রকৃতি। তাহা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মিকা, চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-যুক্ত। সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধি এবং অবিশুদ্ধি অনুসারে, সেই প্রকৃতি দ্বিবিধ:— মায়া এবং অবিদ্যা। মায়াতে প্রতিফলিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, সেই মায়াকে নিজের অধীন রাখাতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইয়াছেন। আর অবিদ্যাতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের যে অন্য প্রতিবিম্ব, তাহা সেই অবিদ্যার অধীন হওয়াতে জীব হইয়াছে, এবং সেই অবিদ্যার অশুদ্ধিতার বিচিত্র তারতম্য অনুসারে তাহা দেব-তির্য্যগ-নরাদি নানারূপ হইয়াছে। ১—১৪ হইতে ১৭। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা ছায়া কথার অর্থ কি? সেই ছায়া বিশুদ্ধ সত্ত্বযুক্ত মায়াতে পতিত হওয়াতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রকাশ, এবং মলিন সত্ত্বযুক্ত অবিদ্যাতে পতিত হওয়াতে, দেব তির্য্যক্ নরাদি জীবের প্রকাশ। কথা শুনিতে সুন্দর এবং কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রতিবিম্ব বা ছায়ার উপমাতে যেন মূল বিষয়টাকে ঢাকিয়া ফেলে, অথবা আরও জটিল করিয়া তোলে। শঙ্করের হস্তামলক কবিতায় "শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ—"শরার জলে যেমন সূর্য্য প্রতিবিম্ব"—ছায়ার উপমাও দৃষ্ট হয়। কবি-

* Compare Sir W. Hamilton's lecture on the relativity of all knowledge.

তাতেই তাহা শোভা পায়। সূত্র ভাষ্যের মত দার্শনিক গ্রন্থে কোথাও শঙ্কর এই প্রতিবিম্বের উপমা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না। সত্ত্ব-রজস্তমঃ যখন গুণমাত্র, তখন সে গুণ কাহার? অথবা সত্ত্বাদির গুণী বা আশ্রয় বস্তু কে? অবশ্য বলিতে হইবে, ব্রহ্মই তাহার গুণী বা আশ্রয়-বস্তু। আবার তোমার ফটো যেমন তুমি নও, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও সূর্য্য নয়, কথঞ্চিৎ সদৃশ, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এই উপমা গ্রহণ করিলে ঈশ্বর এবং জীব উভয়ই ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুই দাঁড়ায়, কিন্তু পঞ্চদশীর এরূপ মত হইতে পারে না। পঞ্চদশী মায়ার লক্ষণ বর্ণন করিতেছেনঃ—"মায়া তত্ত্ব রহিত, অর্থাৎ জগৎ-কারণভূত সদ্বস্তু হইতে পৃথক্, তাহার কোন সত্তা নাই, আকাশাদি কার্য্যরূপ লিঙ্গ দ্বারাই মায়ার সত্তার অনুমান হয়। মায়া সেই সৎস্বরূপের আকাশাদি —উৎপাদিকা শক্তি বিশেষ মাত্র, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি। শক্তিমাত্রেই কার্য্য মাত্র গম্য,*—কার্য্যের পূর্ব্বে কেহ কখনও শক্তি জানিতে পারে না। ২—৪২। আবার মায়ার মোহিনী শক্তির বর্ণন করিতেছেন। "নির্ম্মাণ শক্তির ন্যায় সেই মাহেশ্বরী মায়ার মোহ শক্তিও রহিয়াছে,—যদ্দ্বারা সেই মায়া জীবকে মোহিত করে।" ৪—১১। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেও আবার মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন :—শ্রুতি বলিতেছে "না সদাসীৎ"—মায়া অসৎ ছিল না, কারণ তাহার উপলব্ধি হয়। মায়া 'সৎ'ও ছিল না। কারণ "নেহনানাস্তি কিঞ্চন" বলাতে মায়ার সত্ত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।" ১২৯। লোকে যতক্ষণ না মায়ীকে জ্ঞাত হয়, ততক্ষণই মায়ার খেলা দেখিয়া তাহাদের মন চমৎকৃত হয়, কিন্তু মায়ীকে জানিলে পর 'ইহা তাহারই মায়া' এই ভাবিয়া বিস্ময় ছেদন হয়।" ১৩৬। "অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ"—"এ সমস্ত ঈশ্বরেরই মহিমা—ইহা জানিয়া শোক মুক্ত হয়" (মুণ্ডক)। "এই অত্যদ্ভুত মায়ার বিস্ময়ই একমাত্র দেহ, বুদ্ধিমান লোকেরা যত্নের সহিত তাহাকে পরিহার করিতে চেষ্টা করিবে। ১৩৯। "মায়ার সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে তোমার শেষ উত্তর "ইহা কি জানি না।" এজন্যই মহাপুরুষগণ মায়াকে ইন্দ্রজালরূপে বর্ণন করেন। ১৪৬। অচিন্ত্য জগৎ-রচনা-শক্তির বীজকেই মায়া বলিয়া জান। সেই একই মায়া-বীজ সুষুপ্তিতেও অনুভূত হয়।" ১৫১। জীব এবং ঈশ্বর মায়া নামক কামধেনুরই বৎস-দ্বয়। ইচ্ছামত দ্বৈতভাব সম্ভোগ কর। কিন্তু অদ্বৈতই পারমার্থিক তত্ত্ব। ২৩৬। অচিন্ত্য রচনা স্বরূপ এই জগৎ সমস্তই মায়া বলিয়া জানিবে, কিন্তু বস্তুতত্ত্বের (পারমার্থিক তত্ত্বের) শেষ অদ্বৈত বলিয়া জান।" ২৪৬। পাঠক দেখিতেছেন, মায়ার সম্বন্ধে পঞ্চদশীর শেষ কথা 'ইহা কি জানি না।' আধুনিক অজ্ঞেয়ভাবাদীদিগের মতের (Mystery) সহিত তুলনা করুন। শঙ্কর মায়ার সহিত অবিদ্যার কোন পার্থক্যের উল্লেখ করিতেছেন না। কিন্তু পঞ্চদশী মায়ার শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি ভেদ করিয়া জীব এবং ঈশ্বরকে মায়ারূপ গাভীরই দুইটী বৎসের ন্যায় কল্পনা করিতেছেন। এতদ্বারা পঞ্চদশী এক প্রকার ত্রিত্ববাদ (Trinity) স্থাপন করিতেছেন :—ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং জীব। কিন্তু এ সকলই তাঁহার কবিত্ব মাত্র, কারণ "মায়া কি?" "জানি না," "মায়ার বৎসদ্বয় কিরূপ?" "জানি না।" "ব্রহ্মজীব এবং ঈশ্বরের ভেদ কিরূপ!" "জানি না।"

* Cf. Potential and Kinetic energy,

পাঠক এস্থলেও দেখিবেন, ব্যবহারিক রাজ্যে দ্বৈতবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের কোন বিরোধ নাই:—"ইচ্ছামত দ্বৈত সম্ভোগ কর, কিন্তু অদ্বৈতকেই পারমার্থিক তত্ত্ব বলিয়া জানিবে।" "যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং, তত্ত্বন্তদ্বৈতমেবহি।"

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

যীশু।*

"একই জীবন-আলেখ্য বিভিন্নস্থান হইতে দেখিলে বিভিন্নরূপ দেখায়। বিশেষতঃ যে মহাজীবনের বিশেষত্ব নানাদিক-গামী, তাহার বিভিন্ন চরিত্রচিত্রের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধতার সম্ভাবনা বেশী। খ্রীষ্টান মিশনরিগণ খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষাকে ইউরোপীয় আদর্শ ও ধর্ম্মতত্ত্বের রঙ্গীন আলোকের মধ্য দিয়া এদেশবাসীর নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং হিন্দুর আধ্যাত্মিকবৃত্তি ও জাতীয়সহানুভূতি আকৃষ্ট হয় নাই। প্রাচ্যের বিশ্বাস ও ভক্তির আলোকে যখন Nazareth এর প্রফেটের স্বর্গীয় মধুর মূর্ত্তিখানিকে মণ্ডিত করা হয়, তখন তাহা আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্ম্মগুলির প্রত্যেকটীই এসিয়া হইতে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং এশিয়াবাসীকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ক্ষমতা যে শুধু এশিয়াবাসীরই আছে—একথার মধ্যে সত্য আছে। ইউরোপীয়ের এখানে কোনই প্রয়োজন নাই, এমন নহে। পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী, খ্রীষ্টান মিশনরি এবং সর্ব্বোপরি খ্রীষ্টীয়-সাহিত্য প্রাচ্যজাতির, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষীয়ের নিদ্রিত প্রকৃতি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধানপ্রবৃত্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, চিন্তাশক্তিকে সচেতন করিয়াছেন।... এ সকল উপকারসত্ত্বেও ইউরোপীয় চেষ্টা এ জাতির হৃদয়ের বহুদূর পর্য্যন্ত বেশী গভীর স্থানে আসিয়া পৌছায় নাই, তাহা শুধু উপরে উপরে ভাসিতেছে, তাহার যাহা কিছু কাজ, তাহা মানবজীবনের সম্পূর্ণ বহিরাংশের উপরেই হইয়াছে। কেবলমাত্র জাতীয়ভাবই জাতির বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার অন্তরতম প্রবাহকে স্পর্শ করিতে পারে।... অন্ততঃ ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুর শক্তিশালী জাতীয় জীবন জীবিত রহিয়াছে, বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারের প্রভাবে তাহা সম্পূর্ণ অনাহত।......এ কথায় বিরোধ উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক।... কিন্তু সকল বিশ্বাসী খ্রীষ্টানেরই সন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক যে, এই বিরোধের মধ্যে কোন্ সত্য রহিয়াছে। শুধু খ্রীষ্টান নহে, অ-খ্রীষ্টানের নিকটেও এ বিষয়ের প্রকৃত গুরুত্ব আছে। কারণ স্বাধীন আলোকে মানুষ যতই খ্রীষ্টজীবনের মূল্য বিচার করিয়া দেখিবে, যতই সে জীবনকে গ্রহণ করিতে শিখিবে, মানবজাতির ততই লাভ। বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারকগণের অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলি যদি ভুল বলিয়া জগৎসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহা হইলে যীশু মানবসন্তান দ্বারা গৃহীত হইবেন না—ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের আপন ভুল নত হইয়া স্বীকার করাই কি শ্রেয়ঃ নহে? হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, যিনিই খ্রীষ্টের জীবন ও কার্য্যের উচ্চতর সংশোধিত চিত্র উপস্থিত করিতে

* খ্রীষ্টোৎসব উপলক্ষে।

চাহিবেন, আমাদিগকে শুধু দেখিতে হইবে যে, সে চিত্র সত্যই উচ্চ ও নির্ভুল কিনা; যদি তাহা হয়, আমরা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। খ্রীষ্টের রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রসারিত হউক, সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারুক, গ্রহণ করুক। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাইয়া তাঁহার ভৃত্যের বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি যদি হ্রাস হয়, তাহা হইলে সেই হীনতাই যে গৌরব, সেই অপমানই যে মান।

খ্রীষ্টানগণ আপন মত সমর্থন করিবার জন্য সাধারণতঃ এই যুক্তি উত্থাপন করেন যে— খ্রীষ্ট বিশ্বলৌকিক। এ যুক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবার অপেক্ষা রাখে। নিঃসন্দেহ, প্রত্যেক বৃহৎ ধর্ম্মগুরুই বিশ্বজনীন। মানবের যে প্রকৃতি, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই রূপ এবং মানবসমাজের মহত্তম প্রতিনিধিগণ, যে দেশেই তাঁহাদের জন্ম হোক্, সমস্ত বিশ্ব তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন নিশ্চয়। আর একটা খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যেমন খাটে, এমন আর কাহারও সম্বন্ধেই নহে। তথাপি প্রত্যেক মহাজীবনই ব্যক্তিগতভাবে একটা বিশেষ আবেষ্টনের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহার সময় ও অবস্থার একটা বিশেষত্ব আছে—তাহা তাঁহার জীবন ও কার্য্যকে একটা বিশেষ অভিপ্রায় প্রদান করিয়াছে। তিনি যেমন বিশ্বগত, তেমনি স্থানীয় ব্যক্তিগত, ঐতিহাসিক। তাঁহার জন্ম, দেশ, জাতীয়তা, শিক্ষা ও যুগের সহস্র বিশেষত্ব আছে। আদর্শ পুরুষের জীবন আলোচনা করিতে যাইয়া এ সকল যদি বিবেচনার মধ্যে আনা না যায়, তাহা না হইলে তাঁহার প্রকৃত চরিত্র কখনও বোঝা যাইবে না। মানুষ এ সত্য অনেক সময়েই ভুলিয়া যায়। ... ...

খ্রীষ্ট সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য ধারণার মধ্যে যে ভিন্নতা রহিয়াছে, তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য দুইখানি চিত্র পাশাপাশি রাখা যাক্। তাঁহাদের মধ্যে একজন মহাপণ্ডিত, ব্রহ্মবিদ্যার সকল তত্ত্ব তাঁহার আয়ত্ত। তিনি বহিষ্করণপ্রিয়, তাঁহার মত স্বেচ্ছাচারী, মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি ও বুদ্ধির বিরোধী। বাহিরের বিধি ও নিষেধ পালন বিষয়ে তিনি কঠোর, নিয়ত অলৌকিক কার্য্যতৎপর। এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী অপরিচিত কতকগুলি প্রতিষ্ঠান তিনি লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মত যে মানিয়া না চলে, তাহার জন্য তিনি চিরমৃত্যু অনন্ত অন্ধকারের ব্যবস্থা দিতেছেন। জিহ্বায় তাঁহার নিয়ত শোণিত, অগ্নি ও নরকের কথা, নির্ম্মল শিশু তাঁহার নিকটে বিষম পাপের ফল। অপরের ধর্ম্মের তিনি নিন্দা করেন, যে জাতি তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিল না, তাঁহার নিকটে তাহা অপবিত্র, যে আত্মত্যাগ তাঁহার নিকটে অর্থহীন, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। তাঁহার বিধান, দেশ ও জাতির বাহিরে যে সকল শাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা মিথ্যা। তিনি বিপ্লব করিতে আসিয়াছেন, মানবের জাতীয়তায় তিনি আঘাত করিতেছেন, মানুষকে তিনি আপন ঘরে পর করিয়া তুলিতেছেন। ...... হিন্দুর নিকট তিনি ম্লেচ্ছ, মুসলমানের নিকটে তিনি কাফের, সকলের নিকটেই মহা বিরক্তিকর। জেতাদিগের রাজসম্মান তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, শুধু এই জন্যই তাঁহাকে মানুষ সহ্য করে, এই খ্রীষ্টের নিকট হইতেই কি ভারত মুক্তির বার্ত্তা লাভ করিবে?

তাঁহার পার্শ্বে আর একটী চিত্র স্থাপন কর। ইনি আড়ম্বরহীন স্বাভাবিক মানুষ। পুস্তকের বিদ্যা তাঁহার নিকটে অপরিচিত।

তাঁহার মহান আত্মার গভীর অশিক্ষা-লব্ধ ভাবাবেগ হইতে তিনি কথা কহেন, আর যখন তিনি কথা কহেন, জাতি সকলের মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। মহান্ সঙ্গীতের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্বর, তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাসগুলি স্বর্গের দৃশ্যের ন্যায়—সে স্বর্গে সকল মানব প্রেমে সম্মিলিত। তিনি যে মত প্রচার করেন, তাহা সহজ—ঈশ্বর সকলের পিতা এবং এই বিশাল-বিশ্ব এক মহাপরিবার, সকলেই এখানে সকলের ভাই। পাপী, আর্ত্ত, মূর্খ, জ্ঞানহীন, পতিতা নারী, সমাজের পরিত্যক্ত যত আবর্জ্জনা, সকলকে তিনি নিকটে টানিয়া লন। যাহা তিনি স্পর্শ করেন, তাহাই পবিত্র হইয়া উঠে, কিন্তু এমন কোন মলিনতা নাই, যাহা সেই পুণ্যের আলোকে কলঙ্কের একটী রেখাপাত করিতে পারে। স্বর্গ হইতে প্রবাহিত—পুণ্য-নির্ঝরের বারিধারা তিনি পান করেন, সুগভীর জ্ঞান ও পবিত্রতা তাঁহার নিকটে নিশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক। তৃষিত ধরিত্রীর বক্ষে বারিধারা যেমন করিয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসে, সেইরূপ উপর হইতে ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শান্তি তাঁহার অন্তরে বর্ষিত হয়। আমরা যাহা দেখিতে পাইতেছি না, তাহা দিবালোকের ন্যায় তাঁহার নিকটে স্পষ্ট; যে গান কাণে শোনা যায় না, আত্মায় আত্মায় মিলনের সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত তিনি সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি হইতে শুনিতে পান। ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সত্য তিনি লাভ করেন, বাক্যে তাহাই উচ্চারণ করেন এবং সকল জাতি সকল ধর্ম্মের মধ্যে তিনি সত্যকে আবির্ভূত দেখেন। শ্রান্তকে বিশ্রাম ও পুরস্কার দান করিবার জন্য তিনি ডাকিয়া লন; যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু সুন্দর, সকলই তাঁহাতে বর্ত্তমান। একটী শুভ্র কল্যাণের ন্যায় তাঁহার স্মৃতি মানবের হৃদয়ে জাগিয়া থাকে। শিশু এবং বালকবালিকাদিগকে তিনি নিকটে ডাকিয়া আনেন, কিন্তু বিজ্ঞতা ও পুণ্যগর্ব্বিতের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে রহেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠানগুলি নিতান্ত সাধারণ, স্বাভাবিক ভালবাসা হইতে তাহার উৎপত্তি। বিশ্বাস ও প্রীতির সেবায় তাঁহার জীবনখানি নিবেদিত। দেশ দেশান্তর হইতে তাঁহার উপদেশ-বাণীর প্রতিধ্বনি আসিতেছে, স্বর্গমর্ত্ত্য সম্বন্ধে গূঢ় রহস্যময় তাঁহার বাক্যে সকল জাতিই সাড়া দিতেছে। চরণপাতে তাঁহার পদতলে পুষ্প ফুটিয়া উঠে, যেখানে তিনি দাঁড়ান, সকল দুঃখ, সকল অনুযোগ স্তব্ধ হইয়া যায়, দীর্ঘ তাঁহার কেশেরগুচ্ছ, পর্ব্বতের নির্ম্মল বায়ু তাহার সহিত খেলা করিয়া যায়; তাঁহার শুভ্র অবলুণ্ঠিত উত্তরীয়—পীড়িত ও পতিতের আগ্রহ তাহার স্পর্শলাভের জন্য উন্মুখ; সুন্দর তাঁহার চরণ দুখানি—মূল্যবান তৈলে তাহা সিক্ত, রমণীর কেশে তাহা মার্জ্জিত; তাঁহার মগ্নভাব, আত্মবিস্মৃত চক্ষের চাহনি, কোন্ অজ্ঞাত আলোকের কিরণ তাঁহার ললাটে আসিয়া লাগিয়াছে—দেখিলে মনে হয় কোন্ দূরে—সুদূরে তাঁহার আত্মা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে; আমরা যাঁহাদিগকে দেখিতেছি না, তিনি তাঁহাদেরই সহিত যোগযুক্ত। ইনিই আমাদের পূর্ব্বদেশের প্রফেট গ্যালিলিয়ান হ্রদের মধুরপ্রকৃতি যীশু—আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা তাঁহাকে এখনও দেখিতে পাই। আপনার জীবন ও মৃত্যুর সাক্ষ্যদান করিয়া তিনি স্বর্গীয় সত্যকে আমাদিগের নিকটে দশগুণ বেশী সত্য করিয়া দিয়াছেন। দুঃখের দিনে তাঁহার ধৈর্য্য ও নম্রতা জীবনসমুদ্রে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আমাদের নিকটে এক চির-অটল পর্ব্বতের ন্যায়। তাঁহার দারিদ্র্য দীনের

কুটীরকে নির্ম্মল করিয়া দিয়াছে, পীড়িতের প্রতি তাঁহার সমবেদনা পৃথিবীকে সেবা ও সমবেদনার অসংখ্য কার্য্যে পূর্ণ করিয়াছে। পীড়িত ও মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্ব সে সমবেদনার আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মৃত্যু ও অমরজীবন আমাদিগকে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিয়া লইতেছে। সেখানে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সমস্ত পূর্ব্বমহাদেশ ব্যাপিয়া তাঁহার বিশ্বাস ও সাধনার সুগন্ধ বিস্তৃত। আরবের বালুকা-রাশির মধ্যে মহম্মদের পাগল মন তাঁহাকে চিনিয়াছিল ও হৃদয়ের পূজা দান করিয়াছিল। পারস্যের গোলাপকলি ও নাইটিঙ্গেলের মধ্যে হাফেজের প্রেমমত্ত সুকুমার হৃদয় যীশুর ধর্ম্মানুরাগের মধুপান করিয়াছিল। আর যদিও সর্ব্বশেষে সকলের পশ্চাতে—তথাপি এখানেও এই ভারতভূমিতে আমরা হিন্দু আর্য্যজাতি আমাদের দর্শনের মধ্যে আমাদের হৃদয়ের ভালবাসার মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি।

এই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহার পর ঐ চিত্রও দেখ। ইনি আমাদের পূর্ব্ব দেশের যীশু, উনি পশ্চিমের। এই চিত্র অতিরঞ্জিত, সন্দেহ নাই, আর পশ্চিমেও প্রাচ্য-কল্পনা-শক্তি-বিশিষ্ট মানুষ আছেন এবং পূর্ব্বেও এমন মানুষ আছেন, যাঁহারা ইউ-রোপের উদাসীনতা ও কাঠিন্য লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচ্য খ্রীষ্টের কথা যখন বলি, তখন মনের মধ্যে প্রেম ও দয়ার একখানি প্রতিমূর্ত্তিই আসিয়া দাঁড়ায়; যখন প্রতীচ্য খ্রীষ্টের কথা বলি, তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বিদ্যা, বাহ্যনিয়মের অনুবর্ত্তিতা, নৈতিক ও দৈহিক শক্তির অবতাররূপে দেখি। জানি, খ্রীষ্ট পূর্ব্বেরও নহেন, পশ্চিমেরও নহেন। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে সমস্ত বিশ্বের করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ তাঁহাকে স্থানবদ্ধ করিয়া ফেলে।"

খ্রীষ্টের যোগ্য শিষ্য আচার্য্য প্রতাপচন্দ্রের Oriental Christ হইতে উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা করিলাম। তথাকথিত "খ্রীষ্ট-শিষ্যগণ ভগবান যীশুকে গ্রহণ করেন নাই। ত্রিপলির প্রতি ইটালীর আচরণ, পারস্যের প্রতি ইংলণ্ড ও রুশিয়ার আচরণ ও খ্রীষ্টান জাতিসমূহের আরও শত হৃদয়হীন আচরণ দেখিয়া যীশু আজ ওপার হইতে কি ভাবিতেছেন, জানি না। কিন্তু আমাদেরও গর্ব্ব করিবার কিছু নাই—ভারত-সন্তান হিন্দুমুসলমান—আমরাই কি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছি? তাহা তো পারি নাই! হয়তো গ্রহণ করিবার বাধা অনেক ছিল, হয়তো তাঁহার শিষ্যনামধারী-গণের আচরণ আমাদিগকে তাঁহা হইতে দূরেই ঠেলিয়াছে, কিন্তু এ বাধার তুচ্ছতা আমরা এখন বুঝিতে শিখি। খ্রীষ্টানের চরিত্র দিয়া যেন আর খ্রীষ্টের বিচার না করি। খ্রীষ্টানের ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টের ধর্ম্ম তো এক নহে! খ্রীষ্টকে গ্রহণ না করিলে যে হিন্দুমুসলমানের ধর্ম্ম, মানবের ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া যে কত বড় লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা এখনও ঠিকমত বুঝিতে পারিতেছি না। অভাববোধ জাগিয়া উঠুক—আর যেন আপনাকে বঞ্চিত না রাখি। আমাদের অধিকার আমরা বুঝিয়া লই—আমাদের যীশু আমাদের বাধাহীন সঙ্কোচমুক্ত হৃদয়ে প্রবেশলাভ করুন।

শান্তির সম্রাট যেদিন পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন, সেদিন আসিতেছে। পৃথি-বীতে আজ কি আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! কে নিভাইবে এ অগ্নি? দেব-আত্মা

যীশু আজ কোথায়? দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সে দেহ ধূলি-লীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্ট-আত্মা আজ কোথায়? দগ্ধ তৃষিত এ পৃথিবী, দেব! অযোগ্য হইলেও—অযোগ্য বলিয়াই—একবার আবির্ভূত হও—তপ্ত বক্ষ পাতিয়া দিয়া আমরা তোমাকে গ্রহণ করিয়া লইব। আজ আমরা উন্মুখ—উচ্চারণ কর আর একবার তোমার বাণী—ভারতবর্ষ শুনিবে—সে বাণীর আলোকে হৃদয় ভরিয়া লইবে।

দুর্ব্বল অত্যাচারপীড়িত অভয়প্রাপ্ত হোক্, তদপেক্ষা দুর্ব্বল অত্যাচারীর শান্তিহীন হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করুক। ভারাক্রান্ত দুর্ব্বল আমরা সকলে স্তব্ধ হইয়া একবার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করি—শুনিতে পাইব, সেখানে যীশুর করুণকণ্ঠ ধ্বনিত হইতেছে:—

"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are they that mourn, for they shall be comforted,

Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.

Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled.

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

Blessed are the pure in heart, for they shall see God.

Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God.

Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you and pray for them which despitefully use you and persecute you.

Resist not evils, but whosever shall smite thee on they right cheek, turn to him the other also."

—বাহিরের কোলাহলে এ বাণীকে নীরব করিতে পারিব না—কিছুতেই পারিব না।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

ব্রহ্মজ্ঞানী যাদবলাল রায়।

"Ah, who can tell how many a soul sublime
Has felt the influence of malignant star,
And waged with fortune an eternal war.
Checked by the scoff of pride and envy's form,
And povertie's unconquerable bar,
In life's low vale remote has pined alone,
Unlamented, unpitied and unknown."

অনেক লোক আছেন, লোকে যাঁহাদিগকে চিনে না, যাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নাই, কিম্বা যাঁহারা কোন উচ্চপদস্থ নহেন, কিন্তু জ্ঞানে বিদ্যা বুদ্ধিতে যাঁহারা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। জগৎ তাঁহাদিগকে চিনিল না, তাঁহাদিগকে যশের মুকুট পরাইয়া কেহ আদর করিল না, এমন কি, তাঁহারা নিজের খ্যাতি বিস্তারের জন্যও কোন চেষ্টা করিল না। কিন্তু যে সমস্ত গুণে লোক ধরা মাঝে ধন্য হয়, যে মহান্ উদ্দেশ্য লাভের জন্য লোক জগতে আগমন করে, ইঁহাদের জীবনে তাহা প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছিল। লোকের

প্রশংসা তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ, পৃথিবীর ধনমানকে তাঁহারা তৃণ জ্ঞান করেন, তাই অজ্ঞাত,অনাহত ও চির দারিদ্র্য মধ্যে তাঁহাদের মহত্ত্ব অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়।

আজি যাঁহার পরলোক গমনে অনেক সাধু-হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, বগুড়ার শেষ রত্ন বলিয়া যাঁহাকে অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি হয় না, আজি আমাদের সেই পরম বন্ধু বাবু যাদবলাল রায়ের কথা কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

খ্রীষ্টীয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন প্রথমে বগুড়া আগমন করি, আমার আগমনের অব্যবহিত পরেই আমি একটী রোগী দেখিতে গিয়া এই বন্ধু-রত্নকে প্রাপ্ত হই। আমার সহিত প্রথম আলাপেই শিক্ষা কি প্রকারে আমাদের প্রকৃত জীবনকে বিকাশ করে না, যাহাকে লোকে শিক্ষা বলে, তাহা প্রকৃত শিক্ষাই নহে, এই বিষয়ে তিনি আমার সহিত প্রথমে আলাপ করিলেন। আমার সহিত তাঁহার মতের মিলন হইল। পরে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যখন ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন, তাঁহার সহিত আলাপ ঘনীভূত বন্ধুত্বে পরিণত হইল। পরে যখন বগুড়া-সঙ্কীর্ত্তন-মোকদ্দমায় উভয়ে নানারূপে একত্র ভাবে কার্য্য করিলাম, পরে যখন দেশের কার্য্যে কংগ্রেসে ও সভাসমিতিতে উভয়ে, যাহাতে দেশের কল্যাণ হয়, এ বিষয়ে চেষ্টা করিতাম, উভয়ে একপরামর্শী ও একত্র কার্য্যক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতাম, তখন লোকে আমাদিগকে অভেদাত্মা বলিয়া জানিত। ৩০ বৎসর আমরা জাতীয় মহাসমিতি, স্থানীয় রাজনৈতিক সভা ও ব্রাহ্মসমাজে একত্রিত হইয়া কার্য্য করিয়াছি। যদিও বিশেষ মতভেদ ছিল না,তথাপিও ভিন্নমত কোন বিষয়ে থাকিলেও আমরা একত্র কার্য্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হই নাই। আজি জীবনের শেষ-অবস্থায় সেই বন্ধু আমাকে একাকী ফেলিয়া গমন করিলেন!

১২৫৬ সালের শ্রাবণ মাসে বগুড়ার খ্যাতনামা মুসলমান-জমিদারগণের শেলবর্ষ পরগণার প্রধান কর্ম্মচারী ৺কৃষ্ণলাল রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র যাদবলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা ৺ কিশোরী লাল রায়, সুবিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থপ্রণেতা ও ভক্ত, মহোদয়ের জীবনচরিত অনেক দিন হইল নব্যভারতে লিখিয়াছিলাম। এই পরিবারটী চিরদিন ধার্ম্মিক ও সাধু বলিয়া সুবিখ্যাত। তাঁহারা তিন ভ্রাতাই আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কিশোরী বাবুর ন্যায় যাদব বাবু কোন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন না। কিন্তু বঙ্গভাষায় তিনি একজন অতিশ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন। যখন সুরেন্দ্র বাবু ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহোদয়গণ Local Self-Government আইনের জন্য আবেদন করিতে আসিয়াছিলেন,তখন যাদব বাবুর বক্তৃতায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তিনি সকল স্থানে বক্তৃতা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজেও তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ অতি উপাদেয় ছিল। যদিও চিরকাল তিনি হাঁপানি রোগে কষ্ট পাইতেন, কিন্তু বক্তৃতার সময় তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। এই বক্তৃতা শক্তিই তাঁহাকে বগুড়ার মধ্যে বিশিষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণকার দিনে একটু বক্তৃতা সকলেই করিয়া থাকে এবং যাহারা প্রকৃত পক্ষে হৃদয়হীন, তাহারাও বক্তৃতা দ্বারা লোককে মাতাইয়া থাকে! কিন্তু বাবু যাদব লাল রায় প্রকৃত হৃদয়বান লোক ছিলেন। কলিকাতায় যখন তিনি ডাক্তারী পড়িতেন, তখন ব্রাহ্ম-

নিকেতনে ব্রাহ্মগণের সহিত একত্র বাস করিতেন এবং মহাত্মা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার উপরে পতিত হইয়া তাঁহার চরিত্র-গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রভাব তাঁহাকে সাধু ভক্তরূপে শোভমান করিয়াছিল। শৈশবেই পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তি হয়, এবং নানা কারণে তাঁহার শিক্ষা তত হয় নাই, কিন্তু ইংরাজী বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। ভ্রাতার নিকট এবং আচার্য্য কেশবের নিকট হইতে তিনি দার্শনিক তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তৎসহ বৈষ্ণব-শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য থাকাতে তিনি ব্রাহ্মসমাজে একজন অতি চিন্তাশীল ভক্ত বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। যখন তাঁহার নিকট আমরা গমন করিতাম, ভক্তি বিশ্বাস সম্বন্ধে এমন নিগূঢ়তত্ত্ব সকল তিনি বিবৃত করিতেন যে, লোকে মোহিত হইত। চিরদিন বৈরাগ্য ভাবে অবস্থান করাতে তাঁহার হৃদয়ে কোন ক্লেশ বিদ্ধ হইত না। তাঁহার জীবন অশেষ পরীক্ষাময়।

তিনি শৈশবে বানাইনের নায়েব ৺নিত্যানন্দ সরকারের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সাহায্যে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই পত্নীর একটী সন্তান প্রসবের পরে অকালমৃত্যু হইলে তাঁহার পঠদ্দশা শেষ হয়। সন্তানটীও অচিরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। সেই সময় হইতে তিনি উদাসীনবৎ বিচরণ করিতেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক দ্বিতীয় বার্ষিক-শ্রেণীর ক্যাম্বেলের ছাত্র ডাক্তার বলিয়া নাম করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু মনুষ্যজীবন লইয়া খেলা করা যাদব বাবুর ন্যায় বিবেকসম্পন্ন লোকের প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কখনও চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। যৌবনেই তিনি হাঁপী কাশী (Asthma) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন এবং বিবাহ না করাই সঙ্কল্প করেন। যখন আমার সহিত তিনি পরিচিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স ৩২ হইবে, তখন তিনি পুনঃ বিবাহ করিবেন কিনা, স্থির করেন নাই। আমি তাঁহার নিকট দুইটী পন্থার উল্লেখ করিলাম। কেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকে, আমি ইহা কখনই পছন্দ করিতাম না। বলিলাম, ভাই, হয় বিবাহ করিয়া সংসারী হউন, না হয় সংসার পরিত্যাগ করিয়া প্রচার-ব্রতে দীক্ষিত হউন। তাঁহার পরে প্রথমোক্তটী তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন। ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তখন তাঁহার শরীরও ভাল হইল। তখন হইতে আবার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং কাকিনিয়ার সুবিখ্যাত জমিদারের অধীনে শিবগঞ্জের নায়েবীপদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার জীবনের এই সময়টা শারীরিক ও মানসিক সুখে অতিবাহিত করেন। পরে নানা চক্রান্তজালে পতিত হইয়া তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। শুনিয়াছি, প্রাতঃস্মরণীয় রাজা মহিমারঞ্জন অবশেষে তজ্জন্য আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার জীবন বগুড়ায়ই কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রধান আকর্ষণ ছিল, এবং নিয়মিত রূপে, যখন শরীর সুস্থ থাকিত, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেন এবং নিজের বিষয় রক্ষা করিতেন। তাঁহার যাহা সম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারা অনায়াসেই সংসার চলিতে পারিত। কিন্তু সংসারে

মনোযোগ না থাকাতে তিনি ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত হইয়া একটী একটী করিয়া সম্পত্তি-ভ্রষ্ট হয়েন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মুখ মলিন হয় নাই। অবশেষে তিনি বগুড়ার অন্যতম মুসলমান জমিদার রাজা সাহেবের জমিদারীর নায়েব হয়েন। এই অবস্থায় তাঁহার হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অতিশয় কষ্ট পান। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তিনি রোগমুক্ত হয়েন। উক্ত জমিদার সাহেবের যথেষ্ট করুণার জন্য তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। পরে কোন কথায় মতভেদ হওয়াতে তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে এবং গবর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে শেষ জীবন ব্যয়িত করেন। গত ৮ই জানুয়ারী, ১৯১০ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার শেষ আগমন। তৎপরে তিনি আর সমাজে আগমন করিতে সমর্থ হন নাই। ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার শেষ গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নীরব হইয়াছে; সে রসনা জন্মের মত গত ২৭শে নবেম্বরে (১৯১১) চির নীরব হইয়াছে, সেই হাঁপানি রোগ নানা উপসর্গে যুক্ত হইয়া তাঁহার জীবনান্ত করিয়াছে। তিনি যে পরম পিতার উপাসনা প্রার্থনায় চিরদিন জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে আহৃত হইয়া জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শত শত জীবন এই ধরাধাম হইতে অনন্তে নীত হইতেছে, তবে তাঁহার জন্য আমরা কাঁদি কেন? তিনি রাজা নহেন, ধনী নহেন, কি উপাধি-বিশিষ্ট নহেন। তথাপিও যে গুণ থাকিলে মানুষ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হয়, সকলি তাঁহার ছিল।

তিনি বাঙ্গালা ভাষার সুলেখক ও সুবক্তা। আমরা তাঁহার লিখিত অধিক জিনিস পাই নাই, তিনি একবার সোমপ্রকাশে বাবু প্রভাতচন্দ্র সেনের মানব-প্রকৃতির সমালোচনা করেন, তাহা অতি প্রশংসনীয় হইয়াছিল।

তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। বৃদ্ধবয়সেও, সকল সভায়, প্রাইজ-ডিষ্ট্রীবিউসন ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার সেই বজ্রগম্ভীর স্বর ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা বিরত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার সুন্দর ভাবপূর্ণ ওজস্বী উপদেশ ও প্রার্থনা অনেকে ভুলেন নাই। এমন কি, তাঁহার ন্যায় বক্তা ও ভক্ত বগুড়া ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ গৌরবান্বিত। আমাদের অনেকে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না, এইজন্য আমিও তাঁহাকে ব্রাহ্ম না বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী নাম দিলাম। ভক্ত যাদবলালের ঈশ্বরে নির্ভর অতুলনীয় ছিল। তিনি চিরজীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা কখনও তাঁহার মুখ মলিন দেখি নাই। ঘোর রোগের শক্তিতে যে অবস্থায় সাধারণ লোক হা হুতাশ করে, সেই অবস্থায় আমি যখনই গিয়াছি, তাঁহার প্রসন্নমুখ দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। যেন তাঁহার রোগগ্লানি কিছুই নাই, হাসিতে হাসিতে আলাপ করিতেছেন। ভক্তের মুখ দেখিলে ঈশ্বরের কথা মনে হয়, তাঁহাকে দেখিলে এই কথা অনুভব হইত। শেষজীবনে এত রোগ-গ্লানির মধ্যেও তিনি সেই দয়াময়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। যখন বন্ধুগণ তাঁহার নিকট গমন করিতেন, ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে নিগূঢ় কথা সকল তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত। কত লোকে সেই পবিত্র কাহিনী শুনিবার জন্য তাঁহার নিকট যাইতেন। কোন তর্ক উপস্থিত হইলে অতি জ্ঞানগর্ভ সার কথায় তাঁহার উত্তর দিতেন। এ অবস্থায়ও সে শক্তি অন্তর্হিত হয় নাই।

আজি সেই রসনা নীরব হইয়াছে। সে মধুর উপাসনা, মনোহরশাহী সঙ্গীত ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আর এ জীবনে শুনিব না, সে সরল নির্ম্মল সংসার-কৌটিল্য-বিহীন মধুর কান্তি আর এ জীবনে দেখিব না। তবে ভরসা আছে, আমরাও সেই ইহপরকালের সংযোগের দিনের নিকট অতিথি, অচিরে সেই পুণ্যধামে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ইহ-পরকালের ব্যবধান ঘুচাইব। দয়াময় তাঁহার আত্মাকে অপার শান্তি প্রদান করুন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের শুভাগমন উপলক্ষে।

মিশ্র ইমন—জলদ একতালা।

শান্ত করুণ　　কান্ত অরুণ
" দীপ্ত কিরণ ঢালিছে!
লয়ে আনন্দ　　দিগদিগন্ত,
সুন্দর সাজে সাজিছে!
ভাসে কুঞ্জ কুসুম গন্ধে,
গাহে বিহঙ্গ ললিত ছন্দে,
বিশ্ব পূরিত　　বিপুলানন্দে,
বিশ্ব-রাজ আসিছে!
হিংসা, বিদ্বেষ করি দূর
রাজ-মঙ্গল-মন্ত্রে,
গাহ রাজগুণ গান—!
সকল কণ্ঠে মঙ্গল ছন্দে,
সতত যাঁহার করুণ হস্ত,
ভারত যাঁহার করেতে ন্যস্ত,
"ভারত সন্তান তাঁহার ভক্ত"
চিরদিন হৃদে রাজিছে!
শান্ত করুণ　　কান্ত অরুণ
দীপ্তি কিরণ ঢালিছে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

বিনিময়।

"Lord Curzon's ends have been attained by slightly different means."
"The Daily Mail."

"Times" says that the chief objects towards which Lord Curzon's Partition of Bengal was directed have been fully safeguarded."

পার্টিসন রদ নহে, নূতন পার্টিসন—বঙ্গে গবর্ণর, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও বিহারে লেপ্-গবর্ণর ও আসামে চিফ কমিসনার এবং দিল্লিতে রাজধানী।

সম্রাট দয়া করিয়া যাহা আমাদিগকে দিলেন, তাহা মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ দান আনন্দের নহে, ইহাতে যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হইবে না। বাঙ্গালাকে খর্ব্ব করার অস্ত্র প্রণালী এবং ভবিষ্যতের অমঙ্গলের কথা

ভাবিয়া আমরা চিন্তিত হইয়াছি। সংক্ষেপে সব কথা লেখা অসম্ভব, এই আনন্দের দিনে তাহা করা উচিতও নয়। তবু সংক্ষেপে কিছু কিছু লিখিতেছি।

১। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে বেঙ্গল, বেহার এবং উড়িষ্যা এক গবর্ণমেণ্টের অধীন। এতদিন পর তাহা বিভক্ত হইল। ভাষা-ভেদ, জাতিভেদ-স্পৃহা, আবার পূর্ণ মাত্রায় জাগিয়া উঠিবে।

২। অসামীয়া ও বাঙ্গালা ভাষা এবং আসামী ও বাঙ্গালী পৃথক হইয়া যাইবে।

৩। এই সংশোধিত পার্টিসনে খরচ আরো বাড়িয়া যাইবে, অথচ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধিকার-ভুক্তস্থান সঙ্কীর্ণ হইল।

৪। ঢাকা পৃথক থাকিলেও ভাষা পৃথক হইত না, এখন উৎকল, আসাম ও বাঙ্গালার ভাষাভেদ হওয়া অপরিহার্য্য।

৫। বাঙ্গালীর সংস্পর্শ ইহাতে খুব খর্ব্ব হইবে—আসাম, উৎকল ও বেহারের সংস্পর্শ যাইবে। এক ভাষাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড়, পুরুলিয়া প্রভৃতিরও সংস্পর্শ যাইবে। তাহাতে ঐ সকল স্থানের উন্নতির স্রোত বদ্ধ হইয়া যাইবে।

৬। রাজধানী দিল্লী গেলে, কলিকাতা সামান্য পঞ্চম নগরে পরিণত হইবে এবং বড় লাট-সাহেবের সংস্পর্শের জন্য যে বাঙ্গালীর উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছিল—ক্রমে ক্রমে তাহা হ্রাস হইয়া যাইবে। কত বাঙ্গালীর যে অন্ন যাইবে, তাহার সংখ্যা হয় না। ২০।৩০ বৎসর পরে লাট-আফিসে বাঙ্গালীর প্রাধান্য একেবারে চলিয়া যাইবে। বাঙ্গালীর প্রাধান্য ভারতে কিছুই থাকিবে না।

৭। কলিকাতা ভারতের রাজধানী থাকায় ভারতে একতার নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইবে। বড় বড় ইংরাজি সংবাদ পত্র সকল দিল্লি চলিয়া যাইবে, বাণিজ্য-কেন্দ্র বম্বে হইবে।

৮। তোষামোদ সকল উন্নতির প্রতিরোধক—আত্মমর্য্যাদা-বোধ সকল উন্নতির সোপান। ক্রমে ক্রমে একের বৃদ্ধিতে অপর খর্ব্ব হইয়া যাইবে। বাঙ্গালীর সংস্পর্শ-হীনতায় তোষামোদ সর্ব্বত্র বদ্ধমূল হইবে।

৯। দিল্লী রাজনীতি-রাজ্যের মহাশ্মশান—উন্নতি ও পতনের ইতিহাস বিজড়িত। আমরা রাজভক্ত বাঙ্গালী, এই মহাশ্মশানে রাজধানী স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া ভাবী চিন্তায় অবসন্ন। ইহাতে বঙ্গের উত্থান এবং কলিকাতার পতন অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় নগর কলিকাতা পঞ্চম নগরে পরিণত হইবে। অভঙ্গ-বঙ্গ আমরা চাহিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম পূর্ব্বে যেমন ছিল, আবার তেমনি হইবে। সম্রাট যাহা দিলেন, তজ্জন্য বঙ্গ কৃতজ্ঞ, কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না, ছেলে ভুলাইয়া গবর্ণমেণ্ট দিল্লী চলিয়া যাইতেছেন! বড়ই পরিতাপের বিষয়, ইহাতেই নেতারা আনন্দে বিভোর! হায় রে বুদ্ধি! রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় বাঙ্গালার যে সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসিল, তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। সে কথা বুঝিতে চাও যদি, তবে মুর্শিদাবাদ, রামপাল ও নালন্দা দেখিয়া এস। কিন্তু এখন আর মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার রহিল না। সে সব "কাল-পঞ্চবটীবনের কালকূটে ভরা ভুজগে"র কাহিনী! সে সব দুঃখের কথা আজ বলিবই বা কাহাকে? হায় ১৫০০ বৎসরের কলিকাতা, তোর যে অনিষ্ট হইতে চলিল, শত প্রবন্ধেও তাহা কীর্ত্তিত হইবার নয়। বিধিলিপি, কে খণ্ডাইবে!

বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের দিনে।

সকল দেশেই এক একটা বিশেষ যুগ উপস্থিত হয়, যখন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হন। গ্রিক, লাটিন, সংস্কৃত, আরবী, পার্সী, ফরাসী, ও ইংলিশ, সকল ভাষারই গৌরবের দিন ছিল। তাহা চিন্তনে, মননে বিমল আনন্দ পাওয়া যায়। মানুষ তন্ময় হইয়া সে সব প্রতিষ্ঠান-যুগের গৌরব-কাহিনী স্মরণ করে এবং চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে প্রকাশ করে, হায়, সে দিন আজ কোথায়? অতীতের পুণ্যময় কাহিনী শ্রোতব্য এবং মনন-যোগ্য নহে কি?

অতীত কাহিনী স্মরণ করিবার সময় বাঙ্গালার সাহিত্য-গৌরবের দিন স্বতঃই মনে জাগরিত হয়। কোন্ ক্ষীণ স্রোত বহিয়া বঙ্গে আজ সাহিত্যের মহিমান্বিত নবযুগ অভ্যুদিত হইয়াছে, ভাবিলে চক্ষের জল সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কাঁদিয়া গেলেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ—আর আজ কি দেখিতেছি? সে দিনও রমেশচন্দ্র ষ্টিমারে কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া কত দুঃখ করিয়াছিলেন! আজ দেখিতেছি—ঘরে ঘরে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিষ্ঠা—বঙ্কিম-যুগ অপূর্ব্ব গৌরবে বাঙ্গালাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ভাল মন্দ বিচার করিবার এ সময় নহে। বাঙ্গালা সাহিত্য-জঙ্গলে আগাছা জন্মিয়া থাকে, তাহা আপনিই কালের কষাঘাতে বিলীন হইয়া যাইবে, সে জন্য কোন বালক বা কোন যুবকের কষা বা কারেন্সির কাঁচির প্রয়োজন হইবে না। কোন জঙ্গলেই বর্ষার আগাছা শীতের দিনে টিকে না—আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা বঙ্কিম-যুগের অভ্যুদয় ও পরিণতি স্মরণে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের মনে হয়, এরূপ যুগ বঙ্গে আর কখনও অভ্যুদিত হয় নাই। এত সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ-পত্র, এত ত্রৈমাসিক ও মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকা এ দেশে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। এখন বাঙ্গালা লিখিতে বা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারাকে অল্পাধিক পরিমাণে অনেকেই গৌরবের বিষয় মনে করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষায় কত ত্রৈমাসিক, মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, শুনিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন। আমরা এ স্থলে একটী তালিকা তুলিয়া দিলাম। ইহা বাদে আরও মাসিক পত্রিকা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নাম আমরা জ্ঞাত নহি। এই সকলের মধ্যে কোন পত্রিকা উঠিয়া যাইয়া থাকিলেও তাহা জ্ঞাত নহি। তবে ইহা ঠিক যে অনেক পত্রিকাই চলিতেছে। এবং কাগজগুলির অধিকাংশই গবেষণা-পূর্ণ সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধে পূর্ণ। তালিকা এই—

১। ভীষকদর্পণ, ২। প্রতিবাসী। ৩। ভক্তি, ৪। মৃণ্ময়ী, ৫। আলোচনা, ৬। তত্ত্বমঞ্জরী, ৭। ব্রাহ্মণ, ৮। খ্রীষ্টীয়-বান্ধব, ৯। কণিকা, ১০। শান্তিকণা,

১১। পল্লিচিত্র, ১২। প্রতিভা, ১৩। ঊষা, ১৪। তাম্বুলি সমাজ, ১৫। বৈশ্যপত্রিকা ১৬। বিজয়া, ১৭। সাহিত্য সংহিতা, ১৮। উপাসনা, ১৯। শিল্প ও সাহিত্য, ২০। ধর্ম্মপ্রচারক, ২১। তত্ত্ববোধিনী, ২২। সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ২৩। তিলি-বান্ধব, ২৪। কায়স্থ পত্রিকা, ২৫। সেবক, ২৬। ব্রহ্মবাদী, ২৭। হিন্দু পত্রিকা, ২৮। বসুধা, ২৯। ঢাকা রিভিউ, ৩০। বীরভূমি, ৩১। কোহিনুর, ৩২। গৃহস্থ, ৩৩। দেবালয়, ৩৪। মহিলা, ৩৫। বামাবোধিনী, ৩৬। বাণী, ৩৭। প্রবাসী, ৩৮। সাহিত্য ৩৯। মানসী, ৪০। সমাজ, ৪১। ঐতিহাসিক চিত্র, ৪২। উদ্বোধন, ৪৩। বঙ্গ দর্শন, ৪৪। অর্চ্চনা, ৪৫। প্রকৃতি, ৪৬। কৃষক, ৪৭। কৃষি-সম্পদ, ৪৮। তারা, ৪৯। জন্মভূমি, ৫০। সাহিত্য-সমাজ, ৫১। যোগি-সখা, ৫২। কৃষি সমাচার, ৫৩। জগজ্জ্যোতি, ৫৪। মহাজন-বন্ধু ৫৫। প্রজাপতি, ৫৬। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৫৭। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, ৫৮। অর্ঘ্য, ৫৯। ভারত-মহিলা, ৬০। তত্ত্বকৌমুদী, ৬১। ভারতী, ৬২। সাহিত্য-সংবাদ, ৬৩। কুশদহ, ৬৪। সুপ্রভাত, ৬৫। রংপুর-সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা ৬৬। মন্দাকিনী, ৬৭। জাহ্নবী, ৬৮। পাক্ষিক, ৬৯। নির্ম্মাল্য, ৭০। প্রীতি, ৭১। শিক্ষা সমাচার, ৭২। আর্য্য প্রভা, ৭৩। ধর্ম্ম, ৭৪। অলৌকিক রহস্য, ৭৫। পল্লী, ৭৬। যমুনা, ৭৭। ভারত-ধর্ম্মপ্রচারক, ৭৮। মন্দির, ৭৯। সনাতনী, ৮০। ছাত্রসুহৃদ, ৮১। যুবক, ৮২। সুরভী, ৮৩। মুকুল, ৮৪। আর্য্যাবর্ত্ত, ৮৫। পুণ্য, ৮৬। বাসনা, ৮৭। কায়স্থ-তত্ত্ব, ৮৮। আর্য্যভূমি ৮৯। শিক্ষাকোষ, ৯০। বিশ্বকোষ, ৯১। প্রচার, ৯২। ইন্দিরা, ৯৩। নবনুর, ৯৪। কাজের লোক, ৯৫। পুরোহিত, ৯৬। ঋষি, ৯৭। বিশ্বজীবন, ৯৮। বৌদ্ধপত্রিকা ৯৯। প্রয়াস, ১০০। আর্য্য বিভূতি, ১০১। ইসলাম রবি, ১০২। আরতি, ১০৩। বীণা-পাণি, ১০৪। উৎসাহ, ১০৫। গন্ধবণিক, ১০৬। আর্য্য-প্রভা।

এখন বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য—সকল বিষয়েরই অনুশীলন হইতেছে। নানা পত্রিকার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ সমূহ পড়িলে প্রাণ অপার আশায় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এহেন যুগেও, অধিকাংশ কাগজেই ২।৩টী করিয়া উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে। কোন দেশেই এত উপন্যাস এক সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। এই উপন্যাস সকলের অধিকাংশই অসার, কিন্তু তবুও বিশিষ্ট পত্রিকা সকল এইরূপ অসার গল্পের প্রশ্রয় দিতেছেন। আমরা ইচ্ছা করিলে অনেক মাসিক পত্রিকার অনেক অসার উপন্যাসের নাম করিতে পারি; কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই, কেন না, বাঙ্গালার পাঠকগণ অল্পাধিক পরিমাণে তাহা অবগত আছেন। কোন কোন পত্রিকা কাল্পনিক অলীক ছবির সাহায্যে সর্ব্বত্র আদৃত হইবার জন্য লালায়িত; তাহারও অপকারিতা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তবুও স্বীকার করিতেই হইবে, বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য এযুগের কৃতবিদ্য মাত্রেই বিশেষ লালায়িত। এরূপ সাহিত্যের মহাযুগ এই বাঙ্গালায় আর কখনও উপস্থিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় এ যুগের প্রধান সাহিত্য-পরিপোষক। তিনি যদি স্বীয় অনন্য-সাধারণ প্রতিভা-

বলে বাঙ্গালা-ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাইতে চেষ্টা না করিতেন, এ ভাষার এত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত না। অপিচ তিনি যদি পল্লী-চিত্রের সিভিসন-মকর্দ্দমায় স্বীয় গভীর গবেষণাপূর্ণ অভিমত (রায়) দ্বারা ঐ প্রেস-বাজেয়াপ্ত রদ না করিতেন, বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইত। মাসিক সাহিত্যকে সংবাদ-পত্র শ্রেণীতে পরিগণিত করিবার একটা ইচ্ছা বহুদিন হইতে তথা-কথিত গবর্ণমেণ্টের চেলা বৃন্দের মনের সাধ। মাসিক পত্রিকাগুলি যদি সংবাদ-পত্র শ্রেণীতে পরিগণিত হয়, তবে আর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ মাসিক পত্রে লিখিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী শ্রেণীতে এদেশের অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংযোগ। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, হরপ্রসাদ প্রভৃতি বহু প্রাচীন সাহিত্যিক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। মাসিক পত্রিকার বর্ত্তমান লেখকগণেরও অনেকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, বঙ্গের অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ঐ সরস্বতী মহাশয়। তিনি এদেশের আর যে সকল মহাকার্য্য করিয়াছেন, উল্লেখের এ স্থান নহে। সময় ও অবসর অনুসারে তাহা অনুশীলিত হইবে। পল্লীচিত্রের সিডিসন মকর্দ্দমার "রায়" দ্বারা এ দেশের সাহিত্যকে তিনি রক্ষা করিয়া যে উপকার করিয়াছেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তদীয় জীবনে ভুল ভ্রান্তি নাই, একথা তাঁহার কোন অনুরক্ত ব্যক্তিও বলিবেন না। ভুল-ভ্রান্তি কোথায় নাই? আনুগত্যের পরি-পোষণে তদীয় প্রতিভা-মাধুর্য্য কোন কোন স্থলে পরিম্লান হইয়াছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহা সত্বেও একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিব, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছেন, এরূপ বুঝিবা আর কেহই করেন নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির যুগে তাঁহার নাম সসম্মানে সকলের স্মরণের বিষয়। তাঁহার নাম এদেশে অক্ষয় হউক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান গৌরব—বাঙ্গালা সাহিত্য এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরস্বতী মহাশয়ই সকলের প্রধান ধন্যবাদের পাত্র। দ্বিতীয় গৌরব—সভা, সাহিত্য-পরিষদ এবং সাহিত্য-সম্মিলন সমূহ। তৃতীয় গৌরব—পূর্ণিমা মিলন। চতুর্থ গৌরব—সাপ্তাহিক, মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা সমূহ। এ দেশে আর কখনও এত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। সহস্র সহস্র লোক সাপ্তাহিক ও মাসিক সাহিত্যের লেখক এবং পাঠক। লেখকগণের মধ্যে কিছু কিছু বিদ্বেষ ভাব এবং দলাদলি চলিতেছে, তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অন্য সাহিত্যিকের মুখ দেখেন না, নাম শুনিতে পারেন না, ছায়া মাড়ান না। সাহিত্যের পবিত্র-ক্ষেত্রে কে বড়, কে ছোট, কে গণ্য, কে নগণ্য?—এ বিচার চলে না, ছোট বড় সকল লইয়াই সাহিত্য-সমাজ গঠিত। শত ছাড়িয়া সহস্র, সহস্র ছাড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক সাহিত্যের পরিপোষক ও পরিচালক না হইলে কোন দেশের সাহিত্য কখনও দাঁড়াইতে পারে নাই। বিশেষত্বময় এ জগতে—সকলেরই প্রয়োজন। যাঁহারা সাহিত্যসেবী, তাঁহারা অন্য সাহিত্য-সেবীকে, আপনারই পবিত্র কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী মনে করিয়া, অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে কেন গ্রহণ করিবেন না? দলাদলি এবং

অসূয়া-পরতন্ত্রতা সর্ব্ব প্রযত্নে এ ক্ষেত্রে বর্জ্জনীয়। সকল সাহিত্য-সেবী ভাই-ভাই —একাত্মক ও এক-লক্ষ্যক। সকলের পরিণতি, পরিপক্কতা, সকলের উৎকর্ষ, সকলের কৃতীত্ব—সকলেরই প্রার্থনা এবং কামনার বিষয় হওয়া উচিত। বড় ছোট সব ভাই আমরা এক হইতে পারিব না কেন? আমাদের সকলের এক-গতি, এক-নীতি, এক-লক্ষ্য নয় কি?

আমরা বাঙ্গালা-সাহিত্যের গৌরব ঘোষণা করিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, আমরা বাঙ্গালা ভাষার অভাব, অসুবিধা ও অসমীচীনতা জ্ঞাত নহি। যাহা হইয়াছে, তাহা কিছুই নয়, তাহা বাকী আছে, তাহা অসাধারণ। কৃতকার্য্যতার রাজ্যে বাঙ্গালা সাহিত্য তুচ্ছ, তাহা স্মরণে আমরা নিত্য ব্যথিত। বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকের অসূয়া-পরতন্ত্রতা যখন স্মরণ হয়, তখন লজ্জায় মরিয়া যাই। যে দেশের সাহিত্য এখনও দাঁড়াইতে পারে নাই, সে দেশে এত অসূয়া-কীট কেন জয়লাভ করিতেছে? বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এরূপ হইতেছে। কত সাহিত্য সেবী নিরন্ন, অতি কষ্টেও তাঁহাদের দিনপাত হয় না, তবু সহানুভূতি জাগিতেছে না, বিদ্বেষ ও পরনিন্দা অবাধে আশ্রয় পাইতেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, অচিরাৎ সকল কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যাইবে। এই পবিত্র কার্য্যে সাহিত্য-সম্মিলনকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের কৃতীত্বের উপর সাহিত্য-ক্ষেত্রের দলাদলির তিরোধান সাধন ও সমস্ত উন্নতি নির্ভর করিতেছে। গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য মস্তকে লইয়া সমস্যা-পূরণে সম্মিলন বদ্ধপরিকর হইলে অচিরাৎ কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যাইবে। কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলন যদি দলাদলির পোষকতা করেন, সাহিত্যের সকল গৌরব অচিরে পরিম্লান হইয়া যাইবে। গুরুতর সমস্যা উপস্থিত। এদেশের সম্পাদকবর্গের চরণে আমাদের এই নিবেদন, সকলে দলাদলি-অসুরকে বিলোপ করিতে বদ্ধ পরিকর হউন। সাহিত্যের প্রধান এবং শেষ বিশিষ্ট গৌরব তাঁহারা। তাঁহারা একাত্মক হইয়া দাঁড়াইলে কি যে অসম্ভব থাকিবে, আমরা বুঝি না। তাঁহাদের লেখনী নিত্য অমৃত বর্ষণ করুক, তাঁহাদের বাণী অক্ষয় সত্য প্রচার করুক, তাঁহাদের জীবনী পুণ্য-পূত হইয়া দেশের কল্যাণ-কামনায় নিরত থাকুক। দেশ তাঁহাদের আদর্শে মাতিয়া উঠিবে।—বাঙ্গালা ভাষা কেবল বাঙ্গালীর নয়, ভারতের গৌরবের পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে। আজ যাহা বাঙ্গালীর গৌরব, তাহাকে ভারতের গৌরবে পরিণত করিবার প্রধান সহায় তাঁহারা। একথা সর্ব্বসময় স্মরণ রাখিয়া তাঁহারা পবিত্র ব্রত উদ্যাপনে সদা রত থাকুন।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস-প্রমুখ সাহিত্যিকগণের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। তাঁহাদের রোগের ঔষধ নাই, ক্ষুধার অন্ন নাই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, শিশুর মুখের দুগ্ধ নাই, মাথা রাখিবার ঠাঁই যায় যায়। আমরা যতটুকু পারি, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। যে দেশের মহাকবি মাইকেল ও হেমচন্দ্র দারিদ্র্য-কষ্টে জীবনপাত করিয়া কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া গিয়াছেন, আবারও যদি সেই দেশে সেই দৃশ্যের অভিনয় হয়, কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। তাই বিনীতভাবে লিখিতেছি, সকল সাহিত্য-পরিষদ,

সাহিত্য-সম্মিলন এবং সকল সাহিত্য-সেবী দুঃস্থ ও বিপন্ন সাহিত্যিকদিগকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হউন। এইরূপ করিতে থাকিলে, সত্য-পথ ধরিয়া একতা আসিবে এবং দলাদলি চলিয়া যাইবে। সেই পুণ্যময় দৃশ্য দেখিবার জন্যই আমরা জীবনধারণ করিতেছি। বিধাতার অযাচিত কৃপা অজস্রধারে বর্ষিত হউক।

সান্ধ্য-সমিতির জন্ম-তত্ত্ব।

যখন নিজ হাতে কাপড় পরিবার বিদ্যাটা আমারও আয়ত্ত হয় নাই, গোবর্দ্ধনেরও আয়ত্ত হয় নাই, তখন গোবর্দ্ধন আমার খেলার সাথী ছিল। তবুও সন্দেহ হয় যে, গোবর্দ্ধন বয়স ভাঁড়াইয়া শিশু সাজিয়া আমার সঙ্গে খেলা করিত কি না। কারণ আমার বয়স বেশী হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না; অন্যদিকে আবার গোবর্দ্ধনের পৌত্রটী একজোড়া গোঁফ, দেড় জোড়া শিশুসন্তান এবং দুই জোড়া পরীক্ষার উপাধির অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোবর্দ্ধনের পৌত্রকে আমি বড় ভালবাসি; তবে সে আমাকে দাদামশায় না বলিয়া শুধু দাদা বলিলে অধিকতর সুখী হইতাম। গোবর্দ্ধনের পৌত্র প্রফুল্ল আমাকে যেমন ভালবাসে, প্রফুল্লের পিতাও আমাকে তেমনি ভালবাসিয়া থাকে। কিন্তু প্রফুল্লের পিতা পলিতকেশ এবং গলিত-দন্ত লইয়া আমাকে জেঠামশায় বলে কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। গোবর্দ্ধন ইহলোকে নাই, নহিলে প্রমাণ করিয়া দিতাম যে, আমি গোবর্দ্ধনের বয়োজ্যেষ্ঠ নহি। সেদিন রাগ করিয়া প্রফুল্লের পিতাকে তিরস্কার করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু প্রফুল্লের লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রী তাহার শিশু পুত্রটীকে আমার কোলে দিয়া বলিল—দাদামশায়, এটা তোমার ছেলে। তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে গৃহে ফিরিলাম। নিশ্চয়ই আমি আজন্ম জেঠা বলিয়া গোবর্দ্ধনের পুত্র বাল্যকাল হইতে আমাকে জেঠা বলিতে শিখিয়াছিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার বয়স বেশী হয় নাই।

একদিন যখন গুড়গুড়ির নলটা হাতে করিয়া বঙ্গসমাজ-সংস্কারের উপায় চিন্তা করিতেছি, প্রফুল্ল তখন তাহার প্রফুল্লতা বিস্তার করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। আমি অন্যমনস্কভাবে তাহাকে হুঁকার নলটী বাড়াইয়া দিয়া তামাক খাইতে বলিলাম। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একি অবিচার? বালকেরা যদি তামাক খায়, তবে আমার সামনে খাইবে না কেন? তাহারা যদি নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিবার সময়েও আমাদের সঙ্গে উঠিতে বসিতে না পারে, অতি প্রয়োজনের তাম্রকটুকু সেবন করিতে হইলেও আড়াল খুঁজিয়া বেড়ায়, তবে কদাচ উহাদিগকে আমরা সঙ্গের সঙ্গী করিতে পারিব না। বৃদ্ধেরা যদি প্রফুল্লমুখ দেখিতে না পায়, যৌবনসুলভ উৎসাহের অভিনয়ে আনন্দলাভ করিতে না পারে, নব-জীবনের ফুটন্ত-সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ না পায়, তবে যে বৃদ্ধত্বের ভার অসহ্য হইয়া উঠিবে।

অতি প্রাচীন-যুগে একটী বিষয়ে বৃদ্ধত্বের যে বিশেষ গৌরব ছিল, যাহার জন্য তরুণ-বয়স্কেরা বৃদ্ধের সঙ্গলাভ করিতে চেষ্টা করিত, এযুগে সে বিশেষত্ব চলিয়া গিয়াছে। বুড়া অতীতকালের কথা কহিত, গ্রামের ও নগরের ইতিহাস বলিত, নিজের অভিজ্ঞতায় দেশ বিদেশের রীতি-নীতির বিবরণ শুনাইত, কাজেই যুবক এবং বালকের দল বুড়াকে ঘিরিয়া বসিয়া আনন্দলাভ করিত। এযুগে প্রত্নতত্ত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে, সংবাদপত্র আছে; এখন আর কেহ কিছু বুড়ার মুখে শুনিবার অপেক্ষা করে না। এ বিষয়ে বুড়'র গৌরব শেষ হইয়াছে।

এদেশে শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মেশা অগৌরবের কথা। সকল বিষয়ে যদি বিলাতী অনুকরণ হইতেছে, এমন ভাল বিষয়ে হইবে

না কেন? বুড়ারাই যদি জোট বাঁধিয়া একঘরে হইয়া শুকাইয়া মরিতে চায়, তবে যুবকের দল আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলে নালিস করিবার উপায় দেখি না। যুবকদিগের দৌড়ধাপেও আমরা তাহাদিগের সঙ্গী হইতে পারি। সকল যুবাই দৌড়ায় না; দুই একজন বসিয়া থাকে। আমরা সেই বসিয়া থাকিবার দলে থাকিয়া দৌড়ধাপকে উৎসাহিত করিতে পারি। অবিবাহিতেরা যখন প্রেম খুঁজিয়া বেড়ায়, তখনও আমরা তাহাদিগের সহায় হইতে পারি। কেননা যুবকযুবতীদের চুম্বনের উপর পৃথিবীকে অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়; মানব-সমাজ আপন পুষ্টিলাভের জন্য ঐ চুম্বন-লীলার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদের শুভ্র আশীর্ব্বাদে যৌবনের রক্তাধর পুণ্যগৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, প্রীতি-আলিঙ্গনে স্বর্গের করুণাধারার বৃষ্টি হউক।

আমি প্রফুল্লকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। বালকের অভিমান দূর করিবার জন্য মাতার মুখে যে উৎসাহিত করুণার হাসি ফুটিয়া উঠে, প্রফুল্ল তেমনি করিয়া হাসিয়া স্নেহার্দ্র মধুর স্বরে কহিল—"যে সমাজে বৃদ্ধেরা আশীর্ব্বাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত নহেন, সে সমাজ কি টিকিতে পারে?" প্রফুল্লের তেড়িটী না ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলাম যে, জীবন-বিজ্ঞানের (Biology) হিসাবে, সমাজ-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ কথা সত্য যে, যে সমাজে শিশুর মৃত্যু অধিক, যে সমাজে অনেক বুড়া জীবিত থাকে না, সে সমাজ ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে, স্বয়ং যম সে সমাজের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু উহাতে প্রমাণিত হয় না যে, যুবকেরা বৃদ্ধদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ উৎসব না করিলে সমাজের বেশী ক্ষতি হয়। এ সিদ্ধান্তও জীবন-বিজ্ঞান এবং সমাজ-তত্ত্ব-সম্মত যে জ্ঞানহীন শিশুও শিশুটীকে বাছিয়া লইতে চায়, শিশু দেখিলে তাহার সঙ্গে খেলা করিতে ছুটে; যুবক যুবককে খুঁজে,—যুবতীকেও বটে; যে যাহার আপনার অনুরূপ দলে মিশিতে চায়। গুণগ্রাহী মানুষ গুণের মুখ চাহিয়া সামাজিকতা করিলেও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রফুল্ল তাহার জিজ্ঞাসাময় উজ্জ্বল চক্ষু দুটী উজ্জ্বলতর করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিতে লাগিলাম:—

ঐ দেখ আমার টবের ক্রোটন গাছের পাতার মধ্যে পতঙ্গের যে কীটরূপী অর্ভকটী সুপ্তবৎ পড়িয়াছিল, সে পতঙ্গ দেহ ধারণ করিয়া উড়িতেছে। কখনও ঐ পতঙ্গ-শিশু জলে বা দর্পণে আপনার মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখে নাই, কখনও আপনার জাতিকে চিনিয়া লইবার সুবিধা পায় নাই। তবুও চারি পাঁচটী ভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতির মধ্য হইতে আপনার নিজের শ্রেণীর একটী প্রজাপতিকে বাছিয়া আপনার সঙ্গী করিতে যাইতেছে। ঐ দেখ, আপনার শ্রেণীর আর একটী প্রজাপতিকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করিয়া উড়িতেছে; এক সঙ্গে, এক পাতায় এবং এক ফুলে বসিয়া পরস্পরে প্রেম-সম্ভাষণা করিতেছে। এত প্রজাপতির মধ্যে চিহ্নিত প্রজাপতিটী জন্মমাত্রেই আপনার সঙ্গিনী খুঁজিয়া পাইয়াছে। জীবন-বিজ্ঞানে এবং সমাজতত্ত্বে এটী বিশেষ সত্য যে উচ্চ হউক, নীচ হউক, সকল শ্রেণী জীবের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটী জীব আপনার স্বশ্রেণীর অন্য জীবটীকে আপনার বলিয়া চিনিয়া লয়। এই সত্যটী উপলক্ষ করিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিতেছেন—"The consciousness of kind marks off the animate from the inanimate." কেবল যে এক শ্রেণীর জীব আপনার শ্রেণীর অন্য জীবটীকে চিনিয়া লয়, তাহাই নহে। এক শ্রেণীর মধ্যে আবার এক-জাতি, এক গোত্র, এক বংশ খুঁজিয়া বাহির করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন দল এই অন্তর্নিহিত জ্ঞানের বলে সৃষ্ট হয়। এই আইনেই বালকে যুবায় কিম্বা যুবায় বুড়ায় মিলন হয় না। জীবের এই প্রকৃতি-সিদ্ধ জ্ঞানের কথায় একজন সমাজতত্ত্ব পণ্ডিত বলিয়াছেন—"It is therefore the psychological ground of social

groupings and distinctions." তাই বলিয়া মনে করিও না যে "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" অসম্ভব। তোমার স্ত্রী আমাকে তাহার শিশু সন্তানটীর পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রফুল্ল খুসী হইয়া আমার তামাকের কল্কেটীতে ভাল করিয়া ফুঁ দিয়া দিল। প্রফুল্ল এবারে উৎসাহের সঙ্গে বলিল—"দাদা মশায়, আমরা দশ বারজন আপনার বৈঠকখানায় সমাজতত্ত্ব আলোচনার জন্য একটী দৈনিক সান্ধ্য-সমিতি করিব। আপনি সে সভার সভাপতি এবং মধ্যস্থ হইবেন।" যুবকেরা যখন প্রাণখোলা খোস গল্পের জন্য অথবা হাসি ভরা খাঁটি ইয়ারকির জন্য বৃদ্ধের সঙ্গ খুঁজিবে না, তখন নির্জ্জনতার নরক এড়াইবার উপায় রূপে এই সান্ধ্য-সমিতির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম।

সে দিন আকাশ বড় মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া আমাদের সান্ধ্য-সমিতির প্রথম দিনের সভার আয়োজনে সমস্ত ভাবী সভাদিগকে প্রফুল্লের মারফত রাত্রে খিঁচুড়ী খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া প্রফুল্লকে বিদায় দিলাম। বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই মেঘ কাটিয়া গিয়া আবার কি নব প্রফুল্লতা লাভ করিতে পারিব? মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলাম।

কাদা-মাখা ঘোলা জলের মেঘে আছে আকাশ ছেয়ে;
ম্লান-মুখে ধরাখানি আছে তার পানে চেয়ে;
বাতাস আছে হেলিয়ে মাথা
নড়ছে না ক' গাছের পাতা;
ক্বচিৎ কাকের রুক্ষ ধ্বনি বট-পাকুড়ের ঘন ছায়ে।
বিষাদ এসে বাঁধে বাসা নিরিবিলি প্রাণের গায়ে।

জমাট বাঁধা মেঘগুলি ঐ কেঁদে যদি পড়ত ঝরে,
বয়ে যেত বাতাস যদি গভীর দুঃখে হুহু করে,
ভিজে পাখা দিয়ে ঝাড়া,
গাছের পাতা দিয়ে নাড়া,
কলরবে কাকেরা সব উড়ত এবং পড়ত ভুঁয়ে,
ঘোলা মেঘের ধারা দিয়ে হুতাশ টুকু নিতাম ধুয়ে।

স্তব্ধ আছে আকাশ খানা রুদ্ধ পচা জল'র মত
ক্রিমির মত নড়ে চড়ে, কাদা ভেঙ্গে পথিক যত।
সে'তা বায়ুর পুরু শ্বাসে
দম টুক্ যে আট্‌কে আসে,
ভিজে হাড়ে শেওলা গজায়, শিরা-স্নায়ু নোনা ধরা,
গরল পোরা বেঙ্গের ছাতার দেহ-গেহের কোণা ভরা।

আর আকাশের দিকে চাইতে পারিলাম না। কক্ষে প্রবেশ করিয়া সান্ধ্য-সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

অন্বেষণ।

১

অজ্ঞাত পিপাসা এক জীবন-উষায়,
শৈশবে, কৈশোরে, পরে মুকুল-যৌবনে,
জেগেছিল, হে সুন্দর, খুঁজিনু তোমায়,
আকুল, পাগল-পারা, মত্ত অন্বেষণে।

২

সন্ধানিনু ফুলে ফুলে, কুঞ্জ-লতিকায়,
ভ্রমিনু ব্যাকুল হ'য়ে সংসার মাঝারে;
কত না চরণ-তলে লুটাইনু হায়,
বিলাইনু আপনারে ফিরি দ্বারে দ্বারে।

৩

কিন্তু কই, পাইনি তো তোমার সন্ধান,
কেহ না মুছিল কোথা গলদশ্রুধার,
সবাই দাঁড়ালো সরে' করি প্রত্যাখ্যান,
কাঁদিল হৃদয় মাঝে ক্ষুব্ধ হাহাকার।

৪

প্রণয়-আহ্বান কত চারিদিক হ'তে
করেছিল আমন্ত্রণ,—কি ভীষণ হায়,
অন্তরেতে লুক্কায়িত পরতে পরতে,
চাতুরী, বঞ্চনা,—বাজ আঁখি-তারকায়!

কুসুম-বিছানো পথ প্রভাতে সম্মুখে
আছিল বিস্তৃত মম, আমি ফুল্ল মনে
বাহিরিনু ভ্রমিবারে, কিন্তু ম্লানমুখে
ফিরিনু কণ্টকবিদ্ধ "বিদীর্ণ" চরণে!

৬

মোহিনী মূরতি কত আলিঙ্গন-আশে
করিনু আবেগ-ভরে বাহু-প্রসারণ,
দৃঢ় বাঁধা পড়িলাম মোহ-নাগপাশে,
ভুজঙ্গ দংশনে করে বক্ষ বিদারণ!

৭

মথিনু অমৃত-লোভে সংসার-পাথার,
মম ভাগ্যে উদ্গীরিত হ'লো হলাহল;
চিহ্ন তার আছে লেগে কণ্ঠেতে আমার,
কর্ণ মূলে জরা-মৃত্যু কার কোলাহল!

৮

সেই হ'তে 'নীলকণ্ঠ' মুদিল নয়ন,
আর না চাহিল ফিরে সংসারের পানে;
অন্তরে হে'রিল তব দীপ্ত সিংহাসন,
বাহিরে বি'চিত্র লীলা বিশ্ব-দরপণে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

সন্ধ্যা-সতী।

বিচিত্র বিশ্বের মাঝে নিরালা একলা,
দেখেছিনু সেই দিন সেই সন্ধ্যাবেলা।
আঁধার আসিল নেমে,
পাখীরা গেছিল থেমে,
নীরব নিঝুম ছিল নদী-বালু-বেলা।
অদূর শ্মশান স্তূপে,
চেয়েছিল চুপে চুপে,
দিক-বধূ পড়েছিল রজতের বালা,
আঁচলে আঁধার ভরি,
এসেছিল তাড়াতাড়ি,
পেছনে রাখিয়া তার প্রদীপ-মেখলা।
মৌন-মাখা বিশ্ব-কুঞ্জ,
নীলাকাশে তারাপুঞ্জ
ঘোষিল বিশ্বের দ্বারে 'ফুরাইল বেলা।'
বাজিল আরতি শঙ্খ,
আঁধারে ডুবিল বঙ্গ,
একা আসি সন্ধ্যাসতী একা চ'লি গেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে নিরালা একলা।

শ্রীরেবতীমোহন মুখোপাধ্যায়।

তোমাতে।

তোমার মাঝারে করিয়াছি পাঠ
বিশ্ব-কাব্য খানি;
তোমাতে মজিয়া চিনেছি স্বর্গ
হে মোর হৃদয়-রাণি!
তোমারি দিব্য অমৃত-পরশে
বুঝিতে পারি গো মনে—
কেন কাঁপি উঠে মাধবী-বল্লী
মলয়ার পরশনে।
তোমারি নয়নে মিলালে নয়ন
সেই কথা প্রাণে জাগে—
কেন যে কুসুম বিকশিয়া উঠে
উষার অরুণ-রাগে।
তোমারে করিয়া হৃদয়ের দেবী
বুঝিয়াছি আমি আজি—
কেন দেয় লোকে প্রতিমার পায়ে
ভক্তি-অর্ঘ্য-রাজি।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দুঃখে।

যাহা পরাণ আমার চাহে না
তাই যদি তব দান,
যা'র তরে বহি মরমে বেদনা
তাহে যদি হও বাম,
যেন রসনা আমার ছাড়ে না
অমৃত, তোমার নাম,
আকুল হৃদয় যেন গো গাহে না
কখনো বিষাদ-গান;
এই কর' ভগবান্!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিলন।

এরা সব জড়সেবী করে শুধু জড় উপাসনা,
চাহে রূপ চাহে গন্ধ তবে হয় দেবতা সাধনা!
হে মিলন! তুমি কিগো শুধু বদ্ধ ক্ষুদ্র বাহু-পাশে?
শুধু কি রহিবে, দেব, এই ক্ষীণ দৃষ্টিতল বাসে?
তোমার পরশ পাবে শুধু এই কর ধূলিময়,
জীবনের এ মিলন, এ জীবন সাথে হবে লয়?

আমি তা'ত চাহিনাক' চাহি না ও বাহু আবরণ
অন্তরের সার ফেলি, আবরণে কেন আকিঞ্চন?

হে মিলন, এস তুমি বিশ্বব্যাপী বাহু প্রসারিয়া
তুমি মোরে ঘিরে ফেল, আমি তোমা ধরিব
কি দিয়া ?

প্রাণ মন চিন্তা বাক্ ধীরে তোমাতে মিলায়ে যাক্,
'আমি' বলে ভিন্ন কিছু নাহি যেন থাকে এই
তীরে।
জীবন মরণ তুমি বাঁধ অটুট অসীম ডোরে,
হে মিলন, এস তুমি, এমনি করিয়া বাঁধ মোরে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রসার।

ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী
সিন্ধুপানে যত ধায়,
ততই সে ধীরে ধীরে লভে পরিসর ;
মানব হৃদের প্রেম
ততই বিস্তৃতি লভে
যত সে জীবন-পথে হয় অগ্রসর।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মিশরের অজিমিশ।

(শেলীর অনুসরণ)

প্রাচীন মিশর দেশ করি পর্য্যটন
পান্থ এল গৃহে মম। কহিলেন মোরে,
"দুইটী প্রকাণ্ড পদ নির্ম্মিত পাষাণে
দেহহীন মরুভূমে আছে দাঁড়াইয়া।
গভীর সিকতা রাশি ; অস্তিকে তাহার
অর্দ্ধমগ্ন কদাকার নরমুণ্ড এক
বিষম ভ্রূকুটি করি রয়েছে চাহিয়া।
ছিন্ন মুণ্ড দেহ হ'তে, তবু কি ভীষণ
সে চাহনি, সে ভ্রূকুটি, দশনের ছটা !
প্রস্তর ফলকে লেখা, জলন্ত অক্ষরে ;
"নাম মম অজিমিশ—রাজেশ্বর রাজা ;
নেহার আমার দশা, হওরে নিরাশ !"
কিছুই রবে না ভবে। ঘিরি ভগ্নস্তূপ
দৃষ্টিহীন, প্রান্তহীন, সাগরের প্রায়
অনন্ত বালুকা রাশি আছে বিস্তারিয়া।"

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

বলা হ'ল না।

তা'রে আর কিছু বলা হ'বে না।
তা'রে বুঝা'লে সে কিছু বুঝে না।
উদাস নয়নে চায়,
তা'রে যে বুঝান দায়,
শুনেও শুনে না সে যে কথা কহে না।
তা'রে আর কিছু বলা হ'বে না।

সে যে সংসারের কিছু জানে না।
সে যে শৃঙ্খলের মানা মানে না।
ভাবে সে আপন-হারা,
ভাবে সে পাগল পারা,
নিজ পর কিছু সে যে কভু ভাবে না।
সে যে সংসারের কিছু জানে না॥

হায়, বাসে তা'র মন বসে না।
তা'রে বাধা দিলে বাধা বাধে না।
সংসার-মরুতে তা'র
তরু অতি আপনার,
সে পেলে আকাশতল কিছু চাহে না।
হায়, বাসে তা'র মন বসে না॥

সে যে গীত গান কিছু শুনে না।
সে যে রাগিণীর ধারো ধারে না।
তটিনীর কুলুতান,
পাখীর মধুর গান,
প্রতিধ্বনি শুনিলে সে নড়ে চড়ে না।
সে যে গীত গান কিছু শুনে না॥

সে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্বালা মানে না।
সে যে বেদনা ও ব্যথা ভাবে না।
সুধা পিয়ে চন্দ্রমার,
খেলে সাথে মলয়ার,
জীবন যে গুরুভার সে তা' বলে না।
সে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্বালা মানে না॥

তা'রে আর কিছু বলা হ'ল না।
আমি কি করে বা বলি বল না।
ভাব-হারা, চিন্তা-হারা—
ধরা তা'র নহে কারা—
সৌন্দর্য্যেতে উন্মত্ততা তা'র গেল না।
তা'রে আর কিছু বলা হ'ল না॥

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

গান।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

ভালবাসা মায়া দয়া ভুয়া কথায় ভুলনারে,
আদান প্রদান সমান সমান চিরবিধান এ
সংসারে।

কেউ বুঝে না কারো ব্যথা বৃথা কাঁদা
হাহাকার,
আপন সুখে সবাই মত্ত তত্ত্ব কেবা লয় কাহার
মুখে কেবল সমবেদন লৌকিকতারি তরে।

তুমি করিওনা কারো বল, মরীচিকা সে কেবল,
প্রবল করি সম্বল সাজ সমরে!
কর যুদ্ধ প্রাণপণে মরণে ভয় ক'রনা
সগৌরবে মৃত্যু শ্রেয় সম্মুখ সমরে॥

শ্রীকৃষ্ণবন্ধু সান্ন্যাল।

"তরঙ্গ।"

স্ফীতবক্ষে ঊর্ম্মিমালা গভীর নির্ঘোষে
মাখিয়া শুধাংশু অংশু বারিধির গায়,
হুহুঙ্কারে চলে যায় চ'ক্ষের নিমেষে,
রাখে না দেখাতে চিহ্ন সে হিল্লোল কায়;

তেমতি মানব প্রাণ সুখ-দুখ সার,
ভেসে উঠি স্ফীতবক্ষে কালের অর্ণবে,
মুহূর্ত্তেকে মিশে যায় অনন্তে অপার;
থাকে না অস্তিত্ব কোন এ বিপুল ভবে।

শ্রীআশুতোষ দাস।

মৌনীবাবার গুরুগ্রহণ।

৺প্যারীলাল ঘোষ বনামে মৌনীবাবা কয়েক বৎসর হইল দেহ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও তপস্যার কথা একাধিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকল পুণ্যকাহিনীর পুনরাবৃত্তি করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহার ন্যায় ব্যাকুলাত্মা, তাঁহার ন্যায় কঠোর তপস্বী এই যুগে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিরল।

তাঁহার এক প্রধান প্রতিজ্ঞা এই ছিল যে, তিনি কিছুতেই গুরু গ্রহণ করিবেন না। যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, ভগবান্ পক্ষীশাবকের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পান, যিনি মল-কীটের মর্ম্মবেদনা জানিতে পান, তাঁহার কৃপা লাভ করিতে আবার মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন কি? তিনি কি আমার প্রার্থনা শুনিতে পান না? তিনি কি আমার মর্ম্ম-কথা জানিতে পারেন না? এরূপ চিন্তা করাও বিশ্বাসীর পক্ষে মহাপাপ; মৌনীবাবার ধর্ম্মমত প্রথমে এই-রূপই ছিল।

যে বৎসর আমি শ্রীশ্রীগুরুদেব ৺ প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে কাকিনীয়ার ব্রহ্মোৎসবে যাই, সেই বৎসর (বোধ হয় সেই উৎসবে যোগদান করার পরেই) প্যারীবাবু দৈদপুর এণ্ট্রান্স স্কুলের মাষ্টারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি চিত্রকুটে এবং ওঙ্কারনাথে বহুকাল তপস্যা করেন, এই সময় মৌনী অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করায় তাঁহাকে লোকেরা "মৌনীবাবা" বলিত। আমরাও এখন হইতে তাঁহাকে "মৌনী-বাবাই" বলিব।

মৌনীবাবা ধর্ম্মলাভার্থ যাহা করিয়াছেন, এ জগতে অতি অল্প লোকই নিষ্ঠার সহিত সে রূপ তপস্যা করিতে পারেন। এই তপস্যা-কালে তাহার দেবদর্শন হইত। বলা বাহুল্য যে, তিনি অতিশয় গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন, দেবদেবীর অস্তিত্ব-কল্পনা তাঁহার মনে আসার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তিনি চক্ষু চাহিয়া কোণে হিন্দু দেবতাকে দেখিতেন এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। কিন্তু এসকল আমার প্রবন্ধের পক্ষে অবান্তর কথা, এ জন্য আমি এ সকলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে চাহি না, আমি যেকথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, এক্ষণ সংক্ষেপে তাহাই বলিতেছি।

বাঙ্গালা ১৩০০ (তেরশত) সনে প্রয়াগ ধামে পূর্ণকুম্ভের যোগ হইয়াছিল। তখন শ্রীশ্রীগুরুদেব (প্রভুপাদ ৺ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী) সেই মেলাস্থানে গঙ্গার তীরে একমাস কাল বাস করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য আমার

অত্যন্ত আগ্রহ হইল, ডন্ (Dawn) পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আমি শীঘ্রই এলাহাবাদ যাইব স্থির করিলাম। এমন সময় একদিন মৌনীবাবার কনিষ্ঠ সহোদর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জামাতা, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয় ভবানীপুর চাউলপট্টি রোডে আমার বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং আমি কুম্ভমেলায় যাইব কিনা, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, সম্ভবত ২।৩ দিনের মধ্যেই সেখানে যাইব। তিনি একখানা খামের মধ্য হইতে কতকগুলি কাগজের টুকরা বাহির করিলেন, টুকরাগুলি কোনখানা ত্রিকোণ, কোনখানা চতুষ্কোণ এবং কোনখানা বা অন্য আকার বিশিষ্ট। সেগুলিতে কাঠপেন্সিলের লেখা, ১।২।৩ ইত্যাদি নম্বর দেওয়া ছিল এবং একখানা পেন্সিলের লিখিত পত্র ছিল। আমি পত্রখানা পড়িলাম, ওঙ্কারনাথ হইতে মৌনীবাবা এই পত্রখানা তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কুঞ্জবাবুকে লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, —মানুষের শক্তিতে যতদূর করা যায়, তাহা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু গুরু ভিন্ন আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, সাধু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে আমি কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না, তাই ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে গুরুত্বে বরণ করিয়াছি, আমার শরীরের অবস্থা এরূপ নয় যে, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। (একাসনে ধ্যানে বসিয়া বসিয়া মৌনীবাবার পদ-দ্বয় অসাড় হইয়া গিয়াছিল) তুমি সংসার সম্পর্কে আমার সহোদর, তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমার এই সংবাদ (গুরুত্বে বরণের সংবাদ) গোস্বামী মহাশয়কে জানাইবে।

কুঞ্জবাবু আমার হাতে পত্রখানা দিলেন, সতীশবাবু ও আমি এই পত্র লইয়া এলাহাবাদ কুম্ভ-মেলায় গেলাম এবং সেখানে পৌঁছাইয়া গোঁসাইজীকে পত্রখানা দিলাম। পত্র পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তা হবে।" আমরা ভাবিলাম, তিনি হয়ত ওঙ্কার-নাথ যাইয়া মৌনীবাবাকে দীক্ষা প্রদান করিবেন এবং আমরাও তাঁহার সঙ্গে সেখানে যাইব। কিন্তু কয়েক দিন পরে শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "সেখানে যাইতে হইবে না।" আমরা বুঝিলাম, যেরূপেই হউক, তিনি মৌনীবাবাকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ইহার পরে মৌনীবাবা বোধ হয় দীর্ঘ দিন জড়দেহে বাস করেন নাই।

আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় অনেকের জীবন-চরিত লিখিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাম্প্রদায়িকতা বশতঃ অনেক লেখক প্রকৃত সত্য প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, তাই কুঞ্জবাবু ও সতীশ বাবুর জানিত অবস্থায়ই আমি এই সত্যটী প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিলাম। এই ঘটনাটী পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা মৌনীবাবার জীবন-চরিত লিখিতেছেন বা লিখিবেন, তাঁহাদের লিখিত জীবন-চরিত একান্তই অসম্পূর্ণ থাকিবে। সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে অনেকে গণ্ডীবদ্ধ, নব্যভারত এবিষয় সর্ব্বাপেক্ষা উদার। এইজন্যই নব্যভারতে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠাইলাম।

কথা প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, ১৩০৫ সনের বৈশাখ সংখ্যায় নব্যভারতে আমি "দেবগৃহে কথোপকথন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি, শ্রদ্ধাভাজন ৺ রাজনারায়ণ বাবু মহাশয়ের সহিত দেবগৃহে (দেওঘরে) আমার যে কথাবর্ত্তা হইয়াছিল, তাহারই কিয়দংশ উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধ নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয় ৺রাজনারায়ণ বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত বসু মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার এবং আমার, আমাদের উভয়ের নাম স্বাক্ষরিত হইয়া বসু মহাশয়ের জীবিতকালে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে এমন সকল কথা আছে, যাহা উপেক্ষা করিয়া উক্ত বসু মহাশয়ের জীবন চরিত লিখিলে সে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিবে, এমন কি, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হওয়াও কঠিন হইয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িকতা সত্য প্রচারের পথে একটা বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছে, আশা করি, জীবন চরিত-লেখকগণ তাঁহা-

দের সকলকে আপনাপন মনের মতন করিয়া গঠিত না করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইবেন। জীবন-চরিত লেখকের দায়িত্ব অতিশয় কঠিন অথচ সাহিত্য মন্দিরে তাঁহাদের আসন অতিশয় উচ্চাসন। শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৬৩। জাতীয়-মঙ্গল। মহম্মদ মোজাম্মেল হক প্রণীত। মূল্য ।৵৹। দ্বিতীয় সংস্করণ। সুলিখিত এবং সুচিন্তিত। প্রথম সংস্করণে যে প্রশংসা করিয়াছিলাম, তাহা অক্ষুণ্ণ।

৬৫। শৈব্যা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। মূল্য ।৵৹। সুন্দর বিষয়, সুন্দর ছাপা, এবং সুন্দর লেখা। ছবিগুলি যেন বাঙ্গালীর ছবি; অপ্রকৃত নয় কি?

৬৫। নারী। শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত, মূল্য ||০। রাজপুত জাতির ইতিহাস লইয়া এই কাব্যখানি রচিত। ভাষা ভাল। কাগজ বিলাতী।

৬৭। সাধনা বা ঈশ্বরদর্শনোপায়। শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর সংযোগী ব্রহ্মচারী প্রণীত, মূল্য ৷৹। সুচিন্তিত ধর্ম্মভাবপূর্ণ পুস্তক। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৬৮। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵৹। তিনি মিডিয়ম হইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। প্রণিধানের যোগ্য।

৬৯। তর্ক-বিজ্ঞান। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ ন্যায়বাগীশ বি-এ প্রণীত, মূল্য ১||০। অতি প্রাঞ্জল এবং মধুর ভাষায় জটিল বিষয় বিবৃত। পুস্তকখানি পাকা হাতের লেখা, অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহা দ্বারা ছাত্রগণের বিশেষ উপকার হইবে।

৭০। কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ। শ্রীসূর্য্য কুমার ঘোষাল সম্পাদিত, মূল্য ১।০। এদেশে যদি কোন জীবিত লোকের জীবনী লিখিতে হয়, তবে সুরেন্দ্র বাবুই তাহার একমাত্র আদর্শ। কিন্তু আমরা এইরূপ জীবনীর পক্ষপাতী নহি। তদীয় জীবনের অনেক নিগূঢ় কথা এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু এবার ফরিদপুর প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে বলিয়াছিলেন, —"His Grand father was resident of Faridpur and had gone out of Faridpur in quest of marriage and therefore he claimed heritage." এরূপ সরল উক্তি তাঁহার জীবনেই শোভা পায়। তিনি কর্ম্মবীর, তিনি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। এই পুস্তকে এই সকল কথার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানির সর্ব্বত্র আদর হউক।

৭১। লয়। শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ।৵৹। নূতন হাতের লেখা হইলেও কৃতীত্ব আছে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

৭১। কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ। সামাজিক চিত্র। শ্রীঅন্নদা প্রসাদ মজুমদার দেববর্ম্মা বি-এল প্রণীত, মূল্য ।/০। নাট্যাকারে লিখিত। পাকা হাতের লেখা—কিন্তু এরূপ বিষয়ের বিবৃতি সমীচীন কি?

৭৩। শ্রীজগন্নাথ-মন্দির। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীসদাশিব কাব্যকণ্ঠ-বিরচিত ও প্রকাশিত। নব্যভারতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার অনুমতি না লইয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অবৈধ কাজ। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবৃতি।

৭৪। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন। তৃতীয় অধিবেশন। কার্য্য-বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগ। উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য নীরবে অতি সুন্দর রূপ চলিতেছে। উহা এ দেশের গৌরব-স্তম্ভ। এই পুস্তক পড়িয়া বড়ই সুখী হইলাম।

শঙ্করাচার্য্যের মত।

৩। গুণ।

গুণ কাহাকে বলে? বৈশেষিক মতে সাত প্রকার পদার্থের (Categories) উল্লেখ আছে, যথা—দ্রব্য, (substance) গুণ, (quality) কর্ম্ম, (action) সামান্য (class), বিশেষ (Individuality), সমবায় (Relation), অভাব (non-existence)। গুণ তাহারই তন্যতম। এই পদার্থ সপ্তক নৈয়ায়িকদিগের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। তবে গুণ কাহাকে বলে? ন্যায় মতে গুণ 'দ্রব্যাশ্রিত বস্তু ধর্ম্ম', যদ্দ্বারা বস্তুবিশেষের বিশেষত্ব সিদ্ধি হয়। ন্যায় মতে গুণ চব্বিশ প্রকার:—রূপরসাদি, সংখ্যা-পরিমাণ, সংযোগ-বিভাগ, সুখ-দুঃখ, বুদ্ধি-ইচ্ছা, দ্বেষ-যত্ন, গুরুত্ব-লঘুত্ব, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং সংস্কার (মূর্ত্তপদার্থ সম্বন্ধী সংস্কার যথা—বেগ-স্পন্দনাদি এবং আত্মার সম্বন্ধী সংস্কার যথা স্মৃতি এবং অদৃষ্ট-বিশেষ-জনক কর্ম্ম ইত্যাদি। বেদান্তে গুণ শব্দে প্রধানতঃ 'সত্ত্ব-রজ তমঃ' এই ত্রিগুণকেই বুঝায়;—১। প্রকাশ এবং আনন্দাত্মক সত্ত্ব, ২। বিক্ষেপ এবং রাগ-দ্বেষাত্মক রজঃ, এবং ৩। অজ্ঞান এবং মোহাত্মক তমঃ। কিন্তু অনেক স্থলে 'বস্তু ধর্ম্ম' অর্থেও ব্যবহৃত দেখা যায়। আবার গুণ শব্দে রজ্জুকেও বুঝায়, যথা—"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" এই অর্থে নির্গুণ শব্দে বন্ধন-শূন্য বা নিত্যমুক্ত বুঝায়।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ভৌতিক পদার্থের আলোচনা করিতে গিয়া ভৌতিক গুণকে সচরাচর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন, (১) মুখ্য (Primary) যথা,—বিস্তৃতি, বিভাজ্যত্ব, গুরুত্ব, দেশকাল পরিচ্ছিন্নত্ব, অভেদ্যত্ব (Impenetrability) ইত্যাদি এবং (২) গৌণ (Secondary) যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বেদান্তদর্শনেও দুই শ্রেণীর গুণের উল্লেখ আছে, (১) স্বরূপ ভূত গুণ বা ধর্ম্ম, যথা,—অগ্নির উষ্ণত্ব, সূর্য্যের প্রকাশকত্ব ইত্যাদি। (২) পরিবর্ত্তন-শীল গুণ বা উপাধি, যথা—তাম্রযোগে অগ্নির হরিদ্বর্ণ, বা সোডা যোগে স্বর্ণবর্ণ, অথবা সূর্য্য সম্বন্ধে মেঘাচ্ছন্নত্বাদি। গুণকে তাহার আশ্রয়ভূত গুণী বা বস্তু হইতে পৃথক করা যায় না। গুণ, যথা,—সৌন্দর্য্যাদি, তাহার আশ্রয়ভূত গুণী,— যথা, গোলাপাদি সুন্দর বস্তু, ইহাতে পৃথক ভাবে তিষ্ঠিতে পারে না,—অথবা পৃথক ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। কিন্তু আমরা সৌন্দর্য্যাদি নানাপ্রকার গুণবাচক শব্দ সচরাচরই ব্যবহার করিয়া থাকি, তখন কোন গুণী বা সৌন্দর্য্যাদি গুণযুক্ত বস্তু-বিশেষের স্মরণ করি না। বস্তুতঃ এরূপ স্থলে আমরা সৌন্দর্য্যাদি গুণবাচক শব্দ দ্বারা নিজের এবং পরের মনের ধারণা (ideas) বা প্রত্যয়-কেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। আলোচনার সুবিধার জন্যই আমরা এই সকল প্রত্যয়ের ব্যবহার করিয়া থাকি। এই সকল প্রত্যয়ের কোন বাহ্য সত্তা নাই। শঙ্করের ভাষায় বলিতে গেলে,সুন্দর বস্তু (Concrete thing) হইতে সৌন্দর্য্যের (abstract quality)

পৃথক করণ পুরুষ ব্যাপার-তন্ত্র (subjective), বস্তু-তন্ত্র (Objective) নয়। এজন্তই শঙ্কর পুনঃ পুনঃ তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন, "গুণ-গুণিনোরভেদাৎ"—'গুণ-গুণীর অভেদ'। যদি গুণ-গুণীর পরস্পর বস্তুতন্ত্র ভেদ সম্ভব হইত, তবে নির্গুণ শব্দের অর্থ কি দাঁড়াইত? সত্তা চৈতন্যাদি সৎ এবং চিৎ বস্তুর গুণ। ব্রহ্ম নির্গুণ শব্দের অর্থ কি হইত? সত্তা এবং চৈতন্য-রহিত ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, বা ব্রহ্ম জড়। এক দিকে ঘোর শূন্যবাদ, অপরদিকে ঘোর জড়বাদ। বেদান্ত হয় বৌদ্ধ শূন্যবাদে, অথবা চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদে পরিণত হইত। নিশ্চয়ই 'ব্রহ্ম নির্গুণ' শব্দের এরূপ সাংঘাতিক অর্থ শঙ্করের অভিপ্রেত নয়। 'ব্রহ্ম নির্গুণ' বলাতে নিশ্চয়ই ব্রহ্মের স্বরূপভূত ধর্ম্ম সত্ত, চিত্ত, আনন্দ এবং জগৎ রচনা শক্তিমত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না। কেবল মাত্র জগৎ সম্বন্ধী নিয়ন্তৃত্ব বা ঈশ্বরত্ব, অথবা সর্ব্বজ্ঞত্ব,—ঈশিতব্যের অথবা জ্ঞেয়ের অভাবে, প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। অপর দিকে আবার 'ব্রহ্ম সগুণ' বলাতে ব্রহ্মের স্বরূপভূত সত্ত-চিত্তাদির সহিত জাগতিক উপাধি সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং ঈশ্বরত্বের যোগই বুঝায়। ব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্ব বুঝায় না।

আমরা দেখাইয়াছি যে, ন্যায়মতে রূপ-রস, ইচ্ছা-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ বুদ্ধি-যত্ন ইত্যাদি চব্বিশ প্রকার পদার্থের নাম গুণ। বস্তুর সহিত এই সকল গুণের সম্বন্ধের নাম 'সমবায়'। গুণ গুণী পরস্পর সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আবার অবয়ব এবং অবয়বী, ক্রিয়া এবং ক্রিয়াবান্, জাতি এবং ব্যক্তি, নিত্যদ্রব্য এবং তাহার বিশেষ (Individuality)* এই সকল ও পরস্পর সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। গুণী হইতে তাহার গুণকে, অবয়বী হইতে তাহার অবয়বকে, ক্রিয়াবান্ হইতে তাহার ক্রিয়াকে, ব্যক্তি হইতে জাতিকে, ভিন্নও বলা যায় না, অভিন্নও বলা যায় না। এই জন্যই ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধকে ভেদাভেদের দৃষ্টান্তরূপে বেদান্তে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বস্তুই প্রকৃত সৎ, গুণাদি তাহারই আশ্রিত। বস্তু হইতে গুণাদির পার্থক্য আমাদের মানস প্রত্যয় (Idea) মাত্র। মায়া গুণাত্মক। 'গুণ' সত্ত্বাদি ত্রিগুণ অর্থেই গ্রহণ কর, আর ন্যায়োক্ত চব্বিশ প্রকার বস্তু ধর্ম্ম অর্থেই গ্রহণ কর,—মায়া ব্রহ্মেরই গুণ বা শক্তি মাত্র, ব্রহ্ম হইতে মায়ার পৃথকত্ব আমাদের কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই কল্পনা প্রকৃত পক্ষে আছে বা 'সৎ' বলা যায় না। আবার আমাদের কল্পনাতে যখন আছে, তখন তাহা একেবারে নাই বা 'অসৎ' বলা যায় না। শঙ্করের বিবেক-চূড়ামণিতে মায়ার যে বর্ণনাঃ--"সন্ন্যাপ্য সন্নাপ্যু ভয়াত্মিকা নো, ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো,"—(১১১)—তাহার ইহাই অর্থ। মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়, ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়— উভয়াত্মিকা অর্থাৎ সদসৎ বা ভিন্নাভিন্ন নয়—কারণ তাহা স্পষ্টই বিরুদ্ধ"—(self-contradictory)

৪। ব্রহ্মের পক্ষে এই জগৎ রচনা কিরূপে সম্ভবে?

ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বলা হয়। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, যথা কুলাল স্বর্ণকারাদি, মৃত্তিকা-স্বর্ণাদি উপকরণ বিনা, অথবা নির্ম্মাণোপযোগী যন্ত্রাদি বিনা, কখনও কোন

* বিশেষঃ—"অন্ত্যো নিত্যদ্রব্য বৃত্তি বিশেষঃ" s. e. The ultimate and individual form of the permanent substance.

নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ব্রহ্মের জগৎ রচনার উপযোগী উপাদান অথবা যন্ত্রাদি ছিল না। শুধু তাহা নয়। ব্রহ্মের 'অপানিপাদ' 'অচক্ষুণঃ শ্রোত্র'। কুলালাদি পক্ষে নির্ম্মাণ কার্য্যের উপযোগী হস্তপদ এবং চক্ষু কর্ণ রহিয়াছে। ব্রহ্মের তাহাও নাই। আবার শ্রুতিতে পরমাত্মাকে 'আপ্তকাম' বা 'পূর্ণকাম' বলা হইয়াছে। অতএব প্রয়োজনের অভাব হেতু সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই ব্রহ্মের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শঙ্কর এই সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তাহার যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিতেছেনঃ—

"কুলালাদি চেতন পুরুষ মৃর্ত্তিকাদি সাধন সামগ্রী থাকিলেই তদনুসারে সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। চেতন পুরুষ হইয়া অথচ সাধন বা সহায়-শূন্য হইয়া, ব্রহ্ম কিরূপে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন?" উত্তর, "দেবাদির ন্যায়। মহা প্রভাবশালী চেতন দেবাদি স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিশেষ-যোগে কোনরূপ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই সঙ্কল্পমাত্র আপনাপন শক্তিবলে নানা প্রকার অবয়ব যুক্ত শরীর, প্রাসাদ বা রথাদি নির্ম্মাণ করেন, এরূপ দেখা যায়।" ২-১-২৫॥ কোথায়, কবে, কে দেবাদিকে এইরূপ প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছেন, শঙ্কর তাহা বলিতেছেন না। বোধ হয়, তাঁহার উদ্দেশ্য যে পুরাণাদিতে এরূপ উল্লেখ আছে। শঙ্কর আবার বলিতেছেনঃ—"ব্রহ্ম এক হইলেও বিচিত্র শক্তি যোগ হেতু তাঁহার পক্ষে এই বিচিত্র বিকার-প্রপঞ্চ রচনা করা সম্ভব। সেই পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিযুক্ত।"২-১-৩০॥

শঙ্কর আবার প্রতিপক্ষের আপত্তির উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতেছেন। আপত্তিঃ—"তাহা সম্ভব হইত, কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছে, সেই দেবতা করণ রহিত, চক্ষুঃ শ্রোত্র, এবং বাক্য মন রহিত। সর্ব্বশক্তি-যুক্ত হইলেও তাঁহার পক্ষে কার্য্যক্ষম হওয়া কিরূপে সম্ভব? দেবাদি চেতন পুরুষ সর্ব্বশক্তি-যুক্ত হইলেও, আত্মিক কার্য্যকরণ-সম্পন্ন হইয়াই তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু "নেতি-নেতি' বা সর্ব্ব-বিশেষ রহিত ব্রহ্ম দেবতার পক্ষে কার্য্যক্ষম সর্ব্বশক্তি যোগ কিরূপে সম্ভব? উত্তরঃ—"পরব্রহ্ম অতি গম্ভীর, শ্রুতি বাক্যেরই গম্য, তর্কগম্য নয়। সে যাহা হউক, একজনের যেমন সামর্থ্য দৃষ্ট হয়, অন্যজনের সামর্থ্যও ঠিক সেরূপই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। অতএব সর্ব্ব-বিশেষ-রহিত হইলেও ব্রহ্মের পক্ষে কার্য্যক্ষম সর্ব্বশক্তি যোগ সম্ভব। 'নামরূপ ভেদ অবিদ্যা কল্পিত'—একথাতেই উত্তর বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম করণ রহিত হইলেও "অপাণিপাদো জবনো গ্রহিতা"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে তাঁহার সর্ব্ব সামর্থ্য প্রকাশ করিতেছে।

২-১-৩১॥

প্রতিপক্ষের অন্য আপত্তির উল্লেখ করিয়া শঙ্কর তাহা খণ্ডন করিতেছেন। আপত্তিঃ—"নিশ্চয়ই চেতন পরমাত্মার পক্ষে এই জগদ্বিম্ব রচনা করা সম্ভব হয় না, যেহেতু কার্য্যে প্রবৃত্তি মাত্রেই প্রয়োজন সাপেক্ষ। বুদ্ধিপূর্ব্বকারী চেতন পুরুষ সংসারে যখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সামান্য চেষ্টাসাধ্য ব্যাপারেও স্বীয় প্রয়োজনের অনুপযোগী কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত হয় না,—গুরুতর চেষ্টাসাধ্য ব্যাপার সম্বন্ধে কি আর বলা যাইবে। এই উচ্চাবচ প্রপঞ্চ-জগদ্বিম্ব রচনার ব্যাপার

গুরুতর চেষ্টাসাধ্য। চেতন বা বুদ্ধি পূর্ব্বকারী পরমাত্মার পক্ষে এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কোনমতেই তাঁহার আত্ম প্রয়োজনের উপযোগী কল্পনা করা যায় না, কারণ তাহা হইলে শ্রুতিতে যে পরমাত্মার 'আপ্ত কামত্ব' বা পূর্ণকামত্বের উল্লেখ আছে, তাহা বাধিত হয়। পরমাত্মার পক্ষে প্রয়োজনের অভাব স্বীকার করিলে তাঁহার পক্ষে প্রবৃত্তির অভাবও স্বীকার করিতে হইবে। চেতন উন্মত্ত ব্যক্তিকে তাহার বুদ্ধিদোষে বিনা প্রয়োজনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু পরমাত্মার পক্ষে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তিও সেইরূপ বলিলে শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাধিত হয়। অতএব চেতন পরমাত্মা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, এরূপ বলা অসঙ্গত।" ২—১—৩২। প্রতিপক্ষের আপত্তির এরূপ নিরপেক্ষ এবং বিষদ বর্ণনা আমরা শঙ্করাচার্য্যের লেখাতে যেরূপ দেখিতে পাই, সেরূপ আর অন্য কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না।

শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। ব্যাস সূত্র করিয়াছেন :—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" "লীলামাত্র,যেমন লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয়।" এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন :—"লোকে আপ্তকাম রাজা বা রাজ-অমাত্য যেমন পৃথক্ কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই লীলারূপে ক্রীড়া-বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ঈশ্বরের পক্ষেও সেইরূপ অন্য কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই কেবল লীলারূপে এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব।" কিন্তু সৃষ্ট জীবরূপ জীর্ণতরণী সকল এই পাপ দুঃখসঙ্কুল সংসার-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া ঈশ্বরের পক্ষে লীলা বা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়া কি বালকদিগের পক্ষীর পায়ে সুতা বান্ধিয়া তাহাকে লইয়া পথে ছুটাছুটী করা এবং সময়ে সময়ে সাদরে তাহার মুখচুম্বন করার ন্যায় দেখায় না? এজন্য ব্যাসকৃত সূত্রও যেন শঙ্করের মনঃপূত হয় নাই। 'লীলা' শব্দের ব্যবহার শঙ্কর মনের সহিত অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। শঙ্কর বলিতেছেন :—"লোকের লীলা বলিলে সেই লীলার ভিতরেও কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম প্রয়োজন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এস্থলে পরমাত্মার নিজের সম্বন্ধে কোনরূপ প্রয়োজনই লক্ষ্য করা যায় না। কারণ শ্রুতি বলিতেছে, তিনি 'আপ্তকাম'। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি যেমন কোন বাহ্য-প্রয়োজনকে লক্ষ্য না করিয়া স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হয়, পরমাত্মার পক্ষে সৃষ্টিও সেইরূপ। ন্যায় অথবা শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনান্তর নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। স্বভাবের ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করা যায় না,—"নহি স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে।" শঙ্করের মতে পরমাত্মার স্বভাবই সৃষ্টি করা। পরমাত্মত্ব এবং স্রষ্টৃত্ব একই কথা। তিনি আবার বলিতেছেন :—"সৃষ্টি বিষয়ে পরমাত্মার অপ্রবৃত্তি বা উন্মত্তবৎ প্রবৃত্তি কল্পনা করিবার স্থান নাই, কারণ সৃষ্টি এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সৃষ্টি-শ্রুতি পারমার্থিক (noumenal) নয়, কারণ তাহা অবিদ্যা-কল্পিত নামরূপ ব্যবহারেরই গোচর"(Phenomenal)। ব্রহ্মসূত্র, ২—১—৩৩॥ এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যদি 'সৃষ্টিই পরমাত্মার স্বভাব' হয় এবং সৃষ্টি ব্যাপারে পরমাত্মার 'অপ্রবৃত্তি' যদি কল্পনারও অযোগ্য হয়, তবে পুরাণোক্ত কল্পাবসানে যে মহাপ্রলয় শঙ্করও স্বীকার করিতেছেন, শঙ্করের নিজের মতানুসারেই তাহারও কোন স্থান থাকে না।

ইহাও বলা আবশ্যক যে,সৃষ্টি পরমাত্মার লীলাই হউক, আর পরমাত্মার স্বভাবই হউক, যদি জীব-ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করা যায়,—"তৎ-সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয়ের অভাব হেতু ("ন তদ্দ্বিতীয়মস্তি) ব্রহ্মের বিরুদ্ধে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের অভিযোগের কোন ভিত্তি থাকে না।　　শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

নৃপতি-বন্দনা।

জয়জয় নব নৃপতি, হে ভারত-পতি,
লক্ষ কণ্ঠে আজি, প্রভু, ডাকিতেছে তোমা,
কি মহা প্রভেদ! বুঝ, শুন কর্ণ পাতি।
শুনিয়াছ কত স্তব।কিন্তু কর ক্ষমা—
বুঝিয়াছ কি প্রভেদ? কি মহা প্রভেদ?
নরপতি, ভূমিপতি,—কতই বিচ্ছেদ!

ভূমিপতি চিরদিন হয় বাহুবল,
কভু ভূমিপতি হয় চতুর কৌশল।
সে ত তুচ্ছ কথা, নাথ, দেখ গণি মনে;
ভূমি সেবে আমা, তোমা, কভু অন্য জনে।
নরের হৃদয়-রাজ্যে সিংহাসন পাতি
নামেরে সার্থক করে, সেই ত নৃপতি।

কভু না বিস্মৃত হও এই সার কথা।
দূর কর নরের যে হৃদয়ের ব্যথা।
লও প্রীতি, হে নৃপতি, তুমি ভাগ্যধর,
হেলায় হারা'য়ো নাকো বিধাতার বর।
প্রেম তব রাজ্য হ'ক, হৃদি সিংহাসন,
উজ্জ্বল মুকুট জ্ঞান, ভক্তি-সুচন্দন,
দয়া সু-চামর তোমা' ব্যজন করুক,
আশীষের ঊর্দ্ধ হস্ত সু-ছত্র হউক।
তবে, হে নৃপতি, তব নরপতি নাম
হবে অর্থযুক্ত, হবে পূর্ণ মনস্কাম।
নতুবা ও পূত নামে অধিকারী নও;
যে হও, রাজন্, তুমি যে হও সে হও।

ধূলি তব রাজ্য নহে, নহেক পাথর,
জঙ্গল অরণ্য নহে, নহেক সাগর।
নর-রাজ্য তব, নাথ! সে রাজ্য তোমার,
এখন কেমন আছে? কর গো বিচার।
নরদেহ; নরমন; দুই ভিন্ন তিন
নরের নাহিক কিছু, নাহি কোন দিন।
কেমন সে দেহ আজি? কেমন সে মন?
সেই রাজ্য, হে রাজন্, করেছ দর্শন?

তোমার প্রসাদে, প্রভু, দেহ কি এদেশে
বলিষ্ঠ, নীরোগ, সুস্থ হয়েছে ক্রমে সে?
ন্যায়-নীতি-ধর্ম্ম-বলে, উদ্যমে, সাহসে,
তেজে বলীয়ান মন হ'য়েছে এ দেশে?

যদি না হইয়া থাকে, তা'ই কর আজি;
প্রকৃত নৃপতি হও, ভূপতিরে ত্যজি।
দেখিলাম,পারিবে তা', তুমিই পারিবে;
কাল নিরবধি তব মহিমা গাহিবে।

রাজা আত্মা, প্রজা দেহ। আত্মা যথা দেহে,
সজীব করিয়া প্রজা সুখে যাও গেহে।
দশের আশীষে উভে হও দীর্ঘজীবী;—
এ হ'তে অধিক আর কি কহিবে কবি।

শ্রীশশধর রায়।

জননী

স্বর্গীয়া সোণামণি দেবী

(জন্ম শকাব্দ ১৭৪৩—স্বর্গারোহণ ১৮৩৩ শকাব্দের ১৬ই ফাল্গুন।)

যাঁহার কৃপায় জন্ম এবং জীবনধারণ, তাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণেই অধিক সুখ, লিখিতে গিয়া কিছুই প্রকাশ করা যায় না, কেবল লেখনীর অক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু মা আদ্যাশক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে পারে? তথাপি একটী দীনও তাঁহার স্তুতিবাদদ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ পরিত্যাগ করে না। যে সকল দেবপ্রকৃতি জননী এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমার মাতা তাঁহাদের অন্যতমা। স্বর্গীয়া জননীর কতকগুলি বিশেষ গুণ বিদ্যমান ছিল, তাহারই কয়েকটীর কথা বলিবার নিমিত্ত আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। যদিও এ সকল গুণ অনেক জননীরই আছে, তথাপি আমার নিকট উহা পরম পবিত্র এবং হৃদয়মন্দিরে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা করিবার যোগ্য।

জননীর মাহাত্ম্যের উল্লেখের পূর্ব্বে আমি আমাদের একটু পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করিব। ঐ সকল কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। আমাদের সাম্প্রদায়িক কুলজী আলোচনা করিয়া জানা যায়, রাজা শশাঙ্ক যখন গৌড়দেশ শাসন করেন, তখন তাঁহারই আহ্বানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিহার-প্রদেশের সরযূতীর হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন (১)। রাজা শশাঙ্ক ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের পরও বর্ত্তমান ছিলেন, অতএব অন্যূন একাদশ শতবর্ষ পূর্ব্ব হইতে আমরা বাঙ্গালার অধিবাসী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণগণের আগমনের ন্যূনাতিরিক্ত এক শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশে স্থায়ী আবাস প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের গ্রহযজ্ঞে যে দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ব্রতী হন, তন্মধ্যে প্রজাপতির অধঃস্তন বংশ কমলাকর মিশ্র আমাদের আদিপুরুষ। কমলাকর, বিদ্বৎসমাজে জ্যোতিষী নামে পরিচিত। শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থের টীকা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই কমলাকর পশ্চিমরাঢ় হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

কমলাকরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র সুবিখ্যাত রাজিবলোচনের অতি বৃহৎ এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। ঐ চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই অধ্যাপিত

(১) সুরম্যে সরযূতীরে নানাবৃক্ষ-সমাকুলে। সুরশালকলৈঃ পুষ্পৈরাকীর্ণে চ মনোহরে॥ বসন্তি বিপ্রশার্দ্দূলা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। নানাশাস্ত্রেষু কুশলা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ॥ কদাচিন্নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ। পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশংপ্রাপ স ধার্ম্মিকঃ॥ বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতঃ সম্যঙ্ ন মুক্তো রোগসঙ্কটাৎ। ততঃ স্বস্ত্যয়নং কর্ত্তুমিয়েষ নরপুঙ্গবঃ॥ মন্ত্রিণা প্রেরিতৈ দূতৈরানীতা দ্বিজপুঙ্গবাঃ। আহূর সরযূতীরাৎ নৃপস্তাদেশতস্ততঃ। * * *
সম্পাদ্য বিধিবদ্রাজ্ঞো গ্রহযজ্ঞং দ্বিজাতয়ঃ। সদারা নিবসন্তি স্ম গৌড়দেশে নৃপাজ্ঞয়া॥

(উমেশচন্দ্রশর্ম্মা ধৃত মহাদেবকারিকা)

হইত। কমলাকরের সহিত তাঁহার অপর আত্মীয় পঞ্চকোট রাজধানীর সভাপণ্ডিত হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। হৃদয়ানন্দের কৃত "জ্যোতিঃসার-সংগ্রহ" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ অদ্যাপি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রপৌত্র রামরুদ্র বিদ্যানিধি নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ও পঞ্জিকাকার ছিলেন। হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণবের বংশ হইতেই বর্ত্তমান আকারের বঙ্গীয় পঞ্জিকার সৃষ্টি হয়। আমাদের আর যে সকল আত্মীয় পূর্ব্বে পশ্চিম রাঢ় হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, বংশধরগণের তাঁহাদের মধ্যে সত্যদেব সরস্বতী যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যোতির্ব্বিদ্ সভা-পণ্ডিত ছিলেন।

উল্লিখিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজীবলোচন বিদ্যাসগর মহাশয়ের প্রপৌত্র শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার প্রবীণ বয়সে যশোর জেলার অধীন (এখন উহা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত) ধর্ম্মহাটী গ্রামে আসিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন। স্থানটী তখন মধুমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ঐ স্থানে তাঁহার বিলক্ষণ বৈষয়িক উন্নতি হইয়াছিল। শাস্ত্রীয় ব্যবসায় ব্যতীত চারি পাঁচ খানি গ্রামের তহশীলদারীর কার্য্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় আর নবদ্বীপে ফিরিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতৃগণ নবদ্বীপেই বাস করিতে থাকেন। এখন আমাদের বংশের শাখা প্রশাখা নদীয়া, বর্দ্ধমান, যশোর ও ফরিদপুরের অনেকস্থলে রহিয়াছেন।

শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে আমাদের পিতামহ দেব উমাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় জ্যেষ্ঠ। তিনি সুপণ্ডিত ও অতিশয় পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। যথাশক্তি পরোপকার ও অতিথিসেবা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। একসময়ে জমিদারে জমিদারে বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয় জমিদারই প্রবল, উভয়ের সহিতই তাঁহার বৈষয়িক সম্পর্ক ছিল। প্রথমে তিনি নিরপেক্ষভাবে থাকিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন একপক্ষ অবলম্বন ব্যতীত গ্রামে বাস করা নিরাপদ নহে। সুতরাং ভূসম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অপেক্ষাকৃত পশ্চিম ভাগে স্রোতস্বতী চন্দনার তীরবর্ত্তী খালকুলা নামক একটী অভিনব পল্লীতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার স্থান নির্ব্বাচনের শক্তির প্রশংসা করিতে হয়। তখনকার দিনে ঐরূপ স্থানে বাস করা বিলক্ষণ সুখকর ছিল। গ্রামটী তত বৃহৎ না হইলেও উহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিমনোহর। প্রসন্নসলিলা চন্দনা কঙ্কণের ন্যায় গ্রামটী বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। হরিদ্বর্ণ তরুলতায় অধিবাসীদের নাতিঘন-সন্নিবিষ্ট গৃহ সকল সুশোভিত। চন্দনার গতি পরিবর্ত্তনে গ্রামের উত্তরভাগে একটী প্রশস্ত বিলের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাধারণ লোকে উহাকে বাঁওর বলে। বাঁওরটী রত্নাকরবিশেষ। উহার স্বচ্ছ জল অতি সুপেয় এবং মৎস্যও অত্যন্ত সুস্বাদু। গ্রামে বাজার হাট নাই অথচ বাঙ্গালীর খাদ্য সমুদয়ই পাওয়া যায়। ঢেঁকিতে ভানা উত্তম তণ্ডুল, গৃহস্থ-মহিলাদের প্রস্তুত ডাউল, সৌরভযুক্ত গব্যঘৃত, নানাবিধ তরকারী ফলমূল প্রচুর জন্মে। খালকুলার তরমুজের প্রশংসা দেশময় ব্যাপ্ত। এক একটী তরমুজ যেন এক একটী বৃহৎ শিলাখণ্ড, কাটিলে ভিতরে হিঙ্গুলের বর্ণ, ভোজন করিবার সময় উহাতে

মিছরির আস্বাদ পাওয়া যায়। কাজলা এবং ধলসুঁদর আখের জন্য গ্রামটী চিরপ্রসিদ্ধ। মিষ্টান্ন ফেলিয়া ঐ স্থানের সরের গুড় খাইতে ইচ্ছা হয়। গ্রামে ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যা অধিক হওয়ায় দুগ্ধ অতি সুলভ। ক্রেতার অগোচরে জলসংযোগ করিয়া যে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়, আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় এ সংবাদ সেথানকার কৃষককুলের কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

পিতামহদেব যেখানে আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার নিম্নভাগ দিয়াই স্রোতস্বতী চন্দনা প্রবাহিতা হইতেন, এখন একটী চর পড়ায় নদী কিছুদূরে গিয়া পড়িয়াছেন। গ্রামের মধ্যে আমাদের এবং আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠিদের বাটীতেই অধিক পরিমাণে সুপারি নারিকেলের গাছ ছিল। শ্রেণীবদ্ধ সুপারি নারিকেল বৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী আমাদের নদীতীরস্থ ভবনটী সে সময়ে বড় সুন্দর দেখাইত। মাতামহীর মুখে শুনিয়াছি, পিতৃদেবের (স্বর্গীয় পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের) বয়স যখন অষ্টাদশ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। মাতৃদেবী তখন দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন মাত্র। জননী মাতামহীর একমাত্র সন্ততি। তাঁহার বয়স যখন তিন মাস মাত্র, সেই সময়ে মাতামহদেব স্বর্গারোহণ করেন। মাতামহী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও সংসারকার্য্যে-নিপুণা ছিলেন। তজ্জন্য ভাসুর ও দেবরের সংসারে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত ছিল। জননীর দেহের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল বলিয়া মাতামহী কন্যার নাম সোণামণি রাখিয়াছিলেন এবং শৈশবাবধি অনন্যমনে কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই শিক্ষার ফলে তিনি আজীবন প্রশংসা ব্যতীত কখনও কোন কার্য্যে নিন্দাভাজন হন নাই। মাতামহী শৈশবেই জননীকে নীতিপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক এবং সর্ব্বপ্রকার পূজা অর্চ্চনার মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন। তাহার পর, রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের যাবতীয় ঘটনা গল্পচ্ছলে মাতার নিকট বলিয়াছিলেন। জননীর স্মরণশক্তি এত প্রবল ছিল যে, আমরণ তাহার একবর্ণও বিস্মৃত হন নাই। আমরা যখন যে পৌরাণিক ঘটনা মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখনি তাহা বলিয়া দিয়াছেন। মাতামহী বলিতেন, —"একসময়ে এক বৎসর কাল তাঁহাদের গৃহে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের পারায়ণ ও কথকতা হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি সমস্ত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাই জননীকে শিখাইয়াছিলেন।" জননী দশম বর্ষ বয়সে শ্বশুরালয়ে আসিয়া যে গৃহস্থলীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, নবতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ অশীতি বর্ষকাল সেই গৃহস্থলীর কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে নির্ব্বাহ করিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন। তিনি জীবনে কখন বিশ্রাম লয়েন নাই, আলস্য কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। জননী, ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে যে হাতাবেড়ি হস্তে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় কয়েক দিন মাত্র অপর বিধবার পক্ব অন্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধাদের মুখে গল্প শুনিয়াছি—'মা যখন পরিণীতা হইয়া আসেন, তখন পিতামহদেবের সংসারে অনেক লোক, চারি পুত্র দুই কন্যা, তাঁহাদের পুত্র কন্যা, অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব-স্বজন পরিচারিকা রাখাল প্রভৃতিতে

প্রতিবেলায় পঞ্চাশ খানি পাতা পড়িত। মা, এত লোকের রন্ধন কার্য্য একাকিনীই নির্ব্বাহ করিতেন। পিতামহী অত্যন্ত তেজস্বিনী রমণী ছিলেন, পুত্রবধূরা নতমুখে ব্যতীত সমদৃষ্টিতে তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিতেন না। শুনিয়াছি 'পিতামহ দেবের প্রথমা পত্নী বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই অপস্মার রোগে গ্রস্তা হন, আত্মীয়স্বজনের নির্ব্বন্ধসত্বেও তিনি একপত্নী থাকিতে পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত হন না। ঐ পত্নীর সেবা শুশ্রূষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দেন। যখন পিতামহ দেবের বয়স আটত্রিশ বৎসর, সেই সময় তাঁহার অপস্মার-রোগ-গ্রস্তা পত্নী কালগ্রাসে পতিত হন। প্রস্তাব করিবামাত্র বাগাট-গ্রাম-নিবাসী মহাদেব ঠাকুর তাঁহার একমাত্র কন্যা সুলোচনা দেবীকে পিতামহ দেবের করে অর্পণ করিতে সম্মত হন। মহাদেব ঠাকুর সুপণ্ডিত ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা প্রবীণবয়স্ক পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে নিষেধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "উমাকান্ত সুপণ্ডিত জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক এবং সুস্থদেহ। শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার জামাতা দীর্ঘজীবী হইবে।" তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল, পিতামহদেব ১০৩ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মহাদেব ঠাকুরের বাটীতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি ব্যাকরণ অভিধান কাব্য এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। লোকপরম্পরায় শুনা যায়, তাঁহার বাটীস্থ শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রতিদিন শাস্ত্রকথা-শ্রবণার্থী বহু বৃদ্ধের সমাগম হইত। (১) পিতামহী মহাদেব ঠাকুরের একমাত্র আদরের কন্যা, তাঁহার শরীরের বর্ণ পাকা আমের মত টুকটুকে ছিল এবং তিনি অপেক্ষাকৃত কৃশাঙ্গী ছিলেন। শৈশবে মহাদেবঠাকুর কন্যাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ, বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারত পড়াইয়াছিলেন। তিনি শুধু লেখাপড়া জানিতেন, এমন নহে, অসাধারণ বুদ্ধিমতীও ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মে, ইঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী। এই বিদুষী শ্বশ্রূর নিকটেও আমার জননী সাংসারিক জীবনের অনেক কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতামহী যেমন ঝাঁঝালো মেয়েমানুষ ছিলেন, তেমনি লোক হাঁসাইতে পারিতেন। গৃহাগত প্রতিবেশিনী ভদ্রমহিলারা যে কথাটী বলিতেন, তাহারই অর্থান্তর করিয়া তিনি হাসির সৃষ্টি করিতেন; তজ্জন্য প্রতিদিনই আমাদের গৃহে গ্রাম্যমহিলাদের মজলিস্ বসিত। কিন্তু পুত্রবধূদের সঙ্গে তিনি কখনও কোন কৌতুককর কথা বলিতেন না, সর্ব্বদা গম্ভীরভাবে থাকিয়া তাঁহাদের দ্বারা সাংসারিক কার্য্য করাইতেন। ত্রুটী হইলে কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা প্রবচন আবৃত্তি করিয়া উহা সংশোধন করিয়া দিতেন। পিতামহী জানিতেন কেমন করিয়া সংসারের লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়। তিনি সকল পুত্রবধূর প্রতিই তুল্য ব্যবহার করিতেন এবং প্রত্যেকের জন্য সাংসারিক কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। রন্ধন কার্য্যের ও পালা ছিল। পুত্রেরা উপার্জ্জনক্ষম হইলেই পিতামহদেব সাংসারিক কার্য্য ছাড়িয়া ইষ্ট চিন্তায় নিরত হইয়াছিলেন। কেবল তাঁহার

(১) বাগাট-গ্রামের প্রায় অংশ চন্দনা গ্রাস করিয়াছেন, সেই সঙ্গে প্রাচীন শিবমন্দির বাটী ও বাগান প্রভৃতি নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। মহাদেব ঠাকুরের জ্ঞাতি ও অধঃস্তন বংশীয়েরা এখন পাবনা জেলার প্রতাপপুর ও পাংশা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

একটী বিষয়ে অনুরাগ ছিল,তাহা তিনি কাশী-যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই অনুরাগ আর কিছুই নহে, ফুলের গাছ ও সুপারি নারিকেলের বৃক্ষ রোপণ। পিতামহদেবের ন্যায় পিতামহী দেবীরও শাক শব্জী এবং শশা কুমড়া লঙ্কা প্রভৃতির বীজ বপন করা একটা প্রধান আসক্তির বিষয় ছিল। তজ্জন্য দশবিঘা পরিমিত স্থানব্যাপি বাটীটির সর্ব্বত্রই উক্ত পূজনীয় দম্পতির স্বহস্তার্জ্জিত ফুল ফল শাক শব্জীতে সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত। বাটীতে প্রায় বিশ পঁচিশটি গাভী ছিল। সাত আটটি গাভী নিয়তই দুগ্ধ দিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,পিতামহী দেবী পাকা গৃহিণী। তিনি ঐ প্রচুর দুগ্ধ জ্বাল দিয়া নাতিদের জন্য যে অংশ রাখিতেন,তাহা হইতে সর তোলা হইত না, অপর অংশের সর তুলিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিতেন। পুত্রদের দুগ্ধ এবং পুত্রবধূদের জন্য ঘোল তয়েরি করিয়া দিতেন। তাঁহার সময়ে পুত্রবধূরা কদাচিৎ দুগ্ধ পাইতেন। পিতামহীর গৃহিণীপনার গুণে রাত্রি ১টার সময় ও কোন কুটুম্ব স্বজন কিংবা অতিথি অভ্যাগত আসিলে তাঁহাদের আহারের কষ্ট হইত না।

জননী শৈশবেই পিতৃহীনা, তজ্জন্য অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিত। তিনি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সরল-প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার বিনম্র ব্যবহারে শৈশব হইতেই লোকে তাঁহার প্রশংসা করিত। শ্বশুরালয়ে যদিও পাকের পালা মাসিক সাত আট দিনের অধিক ছিল না, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাকে বিশ পঁচিশ দিন পাক করিতে হইত। সে সময় বঙ্গদেশে বর্ত্তমান প্রণালীর স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু গৃহস্থের সংসারে যে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট মেধাগুণে সে সমস্তই উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। জননী অতি উত্তম রন্ধন করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে সামান্য শাকসব্জী তরকারীর এক অপূর্ব্ব আস্বাদ হইত। তিনি পাক করিতে গেলে বাটীর ছেলেরা মহা আনন্দিত হইত এবং পাকশেষ হইবার পূর্ব্বেই পাত করিয়া বসিয়া যাইত। অনেকেই তাঁহার পাকের প্রশংসা করিতেন। পিতামহদেব যে দিবস প্রত্যূষে কাশী যাত্রা করেন, সে দিবসও তিনি নওয়া বধূমাতা নৌকায় গিয়া পাক করুন বলিয়া আজ্ঞা প্রদান করেন। জননীর হস্তের পক্ক অন্ন ও নানাবিধ ব্যঞ্জন আহার করিয়া বলেন "মা আমার জন্য চারিটী ছোলা মটর ভাজিয়া দাও"। তখন পিতামহ দেবের বয়স একশত তিন বৎসর। ঐ বয়সেও তাঁহার এরূপ পরিপাক শক্তি ছিল যে, আহারের একঘণ্টা পরে তিনি ছোলা মটর খাইয়া হজম করিতে পারিতেন। সে সময়ে তাঁহার একটী দন্তও নষ্ট হয় নাই।

জননীর দেবভক্তি অসাধারণ ছিল। পিতামহদেব প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ পুত্র, পত্নী ও দুইকন্যা সহ ফাল্গুন মাসে তীর্থযাত্রা করেন। কয়েকদিন পরেই দোলযাত্রা ও চৈত্রমাসে বাসন্তী দুর্গাপূজা। মেঝো জেঠা সংসারে কিছু উদাসীন থাকিতেন, কোন কার্য্যেরই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন না,কিন্তু মাতা আত্মীয় স্বজনদিগকে আহ্বান করিয়া সে বৎসর ঐ দুইটী বার্ষিক ক্রিয়া অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিল। জননীর ঝগড়া কলহের প্রতি অত্যন্ত বিরাগ ছিল। তিনি নিত্যে ত-

প্রাণান্তেও কাহারও সহিত কলহ করিতেন না এবং যথাশক্তি অন্য লোকের কলহ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। কোন রমণী কাহারও ছেলের নাম করিয়া গালি দিলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। সর্ব্বদাই বলিতেন —"তোমরা ঝগড়া করিতেছ, ছেলেদের তাহার মধ্যে টানিয়া আন কেন? পরের বাছার কি গালি দিতে আছে? নিজের ছেলের যদি মঙ্গল চাও, তবে পরের ছেলের গালি দিও না"। কোন শিশুকে কাঁদিতে দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, তখনই তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া শান্ত করিতেন। কাহারও কষ্টের কথা বিশেষতঃ অন্নাভাবের কথা শুনিলে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। পিতৃদেব বিলক্ষণ উপার্জ্জনশীল ছিলেন, শাস্ত্রীয় ব্যবসায়ে অতি অল্প লোকই তাঁহার ন্যায় আয় করিতে পারিতেন। অনেক জমিদার ও ধনীর বাটীতে তিনি গ্রহযাগ করিয়া প্রভূত বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তামা পিত্তলের দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী এবং দক্ষিণা পাইতেন। তিনচারি বস্তা কাপড় প্রায়ই ঘরে মজুত থাকিত। কোন রমণী দু আনা কি চারি আনা লইয়া আসিয়া বলিতেন, এই সিকিটী লইয়া যদি একখানি কাপড় দিতেন ত পরিয়া বাঁচিতাম"। জননী প্রায়ই পয়সা লইতেন না, অমনিই দিতে চেষ্টা করিতেন। কোন ভদ্রঘরের রমণী নিতান্ত বিনা পয়সায় লইতে অস্বীকার করিলে যাহা দিতেন, তাহাই লইতেন। চন্দন, আতপ তণ্ডুল, পিত্তলের ঘটী, থালা প্রায়ই লোককে দান করিতেন। পিতৃদেবও অত্যন্ত দয়ালু এবং পরোপকারী ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে কাপড়ের বস্তা এবং তামা পিত্তল ফুরাইয়া গিয়াছে দেখিয়াও কিছু বলিতেন না। একবার দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখিয়া পিতৃদেব বাটী হইতে তিন ক্রোশ দূরস্থ কোন বন্দর হইতে বহু পরিমাণে ধান্য এবং চাউল কিনিয়া বাটী ফিরিতেছিলেন। প্রায় ত্রিশটী বলদ বোঝাই ধান, চা'ল সঙ্গে দেখিয়া একটী দুঃখিনী রমণী তিনটী শিশু লইয়া পিতার অনুসরণ করিতে লাগিল। এক প্রান্তর মধ্যে সে তিনটী শিশুকে পিতৃদেবের পায়ের নিকটে ফেলিয়া দৌড়িয়া প্রস্থান করিল। পিতৃদেব ঐ ঘটনায় অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। বলীবর্দ্দবাহীরা রমণীকে ডাকিয়া আনিলে সে বলিল, "আমার চক্ষের উপর ইহারা না খাইয়া মরিয়া যাইবে। ঠাকুর! তুমি ইহাদের লইয়া যাও, তোমাদের পাতা কুড়াইয়া খাইলেও বাঁচিবে।" পিতৃদেব তৎক্ষণাৎ পাঁচ সের চাউল সহ এক বলদ ধান্য রমণীকে দিলেন। রমণী শিশু কয়টী কুড়াইয়া লইয়া বলদ সঙ্গে সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরিল। জননী ঐ ঘটনা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। একবার দুর্ভিক্ষের সময় আষাঢ় মাসে গ্রামস্থ তিনটী গরিব কৃষক পিতৃদেবের নিকট টাকা ধার করিতে আসিল। পিতৃদেবের হাতে তখন টাকা ছিল না, সুতরাং তিনি অসমর্থতা জানাইলেও তাহারা দুপুর বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল। পাক হইলে পিতৃদেব তাহাদিগকে চারিটী আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা বলিল, "আমরা আহার করিয়া কি করিব? ছেলেপেলে দুই দিন উপবাসী আছে। তাহারা আরও বলিল, ক্ষেতে বেশ ধান হইয়াছে, ১৫।২০ দিনের পরই আমরা ধান কাটিতে পারিব।" অনাহারে আছে শুনিয়া জননীর মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইল, তিনি অলঙ্কার বন্ধক দিয়া পাড়ার এক বিধ-

বার নিকট হইতে ১৫টী টাকা আনিয়া দিলেন। পিতৃদেব প্রত্যেককে পাঁচটী করিয়া টাকা দিলেন। তাহারা প্রত্যেক টাকায় অর্দ্ধ আনা মাসিক সুদ স্বীকার করিয়া অমুক জমি তিন বৎসরের জন্য বন্ধক রাখিলাম বলিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর, এক কপর্দ্দকও দিল না, লোকে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইতে বলিল। মা তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি বলিলেন "দুর্ভিক্ষের সময় দিয়াছি, ঐ টাকায় উহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, উহা আর চাহিব না।

জননীর দেবভক্তি ও পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর কিছুকাল পরে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অধিষ্ঠিত নবদ্বীপে আসিয়া পুনরায় বাটী নির্ম্মাণ করি। জননী পূর্ব্ব হইতেই পূজা, অর্চ্চনা, ব্রত, নিয়মে অনেক সময় কাটাইতেন, ক্রমে উহা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পিতৃদেবের জীবৎকালে তিনি সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, অনন্ত চতুর্দ্দশী, পিপীতকী দ্বাদশী, অক্ষয়তৃতীয়া, চম্পক চতুর্দ্দশী, জলঘট সংক্রান্তি, অমাবস্যা ব্রত প্রভৃতি উদ্‌যাপন করেন। ইদানীং নিত্যব্রত রামনবমী, জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দ্দশী, কার্ত্তিকেয় ব্রত ও সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া ভবিষ্য পুরাণোক্ত নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রত করিতেন। এতদ্ভিন্ন ইথুঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া মঙ্গলচণ্ডী, পাষাণচতুর্দ্দশী, কুলচণ্ডী, শুভসূচনী, ষষ্ঠী, মনসা, লক্ষ্মী, প্রভৃতি সকল দেবতারই তিনি অতিনিষ্ঠার সহিত অর্চ্চনা করিতেন। আধুনিক শিক্ষা ত দূরের কথা, তাঁহার পূর্ব্বে অক্ষর পরিচয়ও ছিল না, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাতিবধূদের নিকটে বসিয়া বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সামান্য বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে পারিতেন মাত্র। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণরূপ প্রাচীন প্রথা অনুসারে জীবন যাপন করিতেন। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না, যে কোন ধর্ম্মের নামে তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। আমার তৃতীয় সহোদর শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যখন কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, সে সময়ে জননী কৃষ্ণনগরের বাসায় থাকিতেন। একদিন মধ্যাহ্নে বাসার পুরুষেরা স্কুল্ কলেজে চলিয়া গিয়াছে, মা একটী বিশেষ পূজা শেষ করিয়া হরিনামের মালা লইয়া বসিয়াছেন। এমন সময়ে দুইটী খ্রীষ্টানমহিলা বাসায় আগমন করিলেন। মা আদর পূর্ব্বক তাঁহাদের বসিবার জন্য দর্‌দালানে একটী নূতন মাদুর পাতিয়া দিলেন। মহিলাদ্বয় প্রথমে দালানের একপাশে রক্ষিত কচি বেগুন মূলা আলু পটোলের প্রশংসা করিলেন। তাহার পর, তাঁহাদের ইষ্টদেবতা যীশুখ্রীষ্টের মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। মা মালা হাতে করিয়া নিবিষ্টচিত্তে সমুদয় শুনিতে লাগিলেন। তাহার পর, যখন তাঁহারা যাইবার জন্য বিদায় চাহিলেন, তখন মা তাঁহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি আজন্ম পল্লিবাসিনী, খ্রীষ্টমহিলাদের স্বাধীনভাব (spirit) কিছুমাত্র অবগত নহেন। সুতরাং ফলফুল নৈবেদ্য সাজান মঙ্গলচণ্ডী পূজার একটী ডালা, গুটীচারি সন্দেশ ও একটী তরকারীর পুঁটলী লইয়া তাঁহাদিগকে দিতে আসিলেন। মহিলারা দেখিয়া অবাক্। পাশের বাড়ীর মেয়েরা মার ঐরূপ সরল ব্যবহার দেখিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টোপাসিকাদ্বয় প্রথমে উহা লইতে অস্বীকার করিলেন, শেষে বলিলেন, "মা আপনি বড়

সদাশয় লোক, আপনার মনে ব্যথা দিব না, সন্দেশ আর তরকারী কয়টী দিউন, নৈবেদ্য আমরা লইতে পারিব না, আমরা কোন দেবতা মানি না।" খ্রীষ্টান মহিলারা চলিয়া গেলে ঝী বলিল "মা উহাদের অত আদর করিলেন কেন? উহারা খ্রীষ্টান, যীশু ভজে।" মা বলিলেন—"তাহাতে ক্ষতি কি? যে যে নামে ঈশ্বরকে ডাকে তাহাতেই মুক্তি পায়। উহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে পরমেশ্বরের নাম করিয়া বেড়াইতেছে, উহারা কি মন্দলোক?"

আমরা কলিকাতায় আসিলে মাও নবদ্বীপে না থাকিয়া আমাদের সহিত কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার সন্তানস্নেহ এত প্রবল ছিল যে, আমাদিগকে স্বহস্তে আহার না করাইয়া তাঁহার সোয়াস্তি বোধ হইত না। আমাদেরও মায়ের হাতের পাক ব্যতীত তৃপ্তি হইত না। প্রতিদিন গৃহদেবতা নারায়ণের যে ভোগ হইত, তাহাই আহার করিয়া আমরা স্কুল্ কলেজে বাহির হইতাম। তজ্জন্য প্রতিদিন দশটার মধ্যে আতপান্ন ও নানাবিধ ভাজী ব্যঞ্জন পাক করিতে হইত, ইহাতে তিনি অণুমাত্রও কষ্ট বোধ করিতেন না, বরং অত প্রত্যূষে স্নান করিতে নিষেধ করিলে বিরক্ত হইতেন।

লোকের আহার করান যথাশক্তি দান কার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি অন্নদানের ব্রত ও অন্য কয়টি বৈধ কার্য্য করেন, ইহাতে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আহার ও দান করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। ক্রিয়াকাণ্ডের দিন বাটীর লোকেরা কি আহার করিল না করিল দেখিতে পারিতেন না, তজ্জন্য তিনি ক্রিয়ার ৪৫ দিন পরে আবার উত্তম দধি ক্ষীর মিষ্টান্ন আনাইয়া নাতি নাতিবউ ও অন্যান্য পরিবারস্থ সকলের স্বহস্তে আহার করাইতেন, এমন কি, উপনীত নাতিদের দক্ষিণা পর্য্যন্ত দিতেন। বালিকা নাতিবউরা কৌতুক করিয়া বলিতেন "আমাদের গলায় পৈতা থাকিলে আমরাও ঠাকুর মার কাছে দক্ষিণা আদায় করিতে পারিতাম"। সন্ন্যাসী ও অন্য ভিক্ষুকেরা আসিয়া ঘটী কিংবা কাপড়ের জন্য ধন্না দিত, তিনি জানিতে পারিলে কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, অনেক সময় নিজের জল পানের ঘটীটি কিংবা পরিধেয় বস্ত্র খানি দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। একবার আত্মীয়দের সহিত গয়া-কাশী প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করেন। ঐ কয়টি তীর্থ ভ্রমণে মধ্যবিত্ত লোকের যাহা লাগিতে পারে, তদপেক্ষা একশত টাকা অতিরিক্ত লইয়া যান, তথাপি বৃন্দাবনে অনেক টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। কোন তীর্থেই তিনি কোন যাচককে বিমুখ করেন নাই। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া তিনি প্রতিদিন দেবদর্শন করিতে যাইবার সময় টাকা ভাঙ্গাইয়া লইয়া যাইতেন, বাসায় আসিতে অর্দ্ধপথেই পয়সা ফুরাইয়া যাইত, পয়সা নাই দেখিয়া ভিক্ষুকেরা যখন ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইত, তখন তিনি তাহাদিগকে বাসায় ডাকিয়া আনিয়া টাকা ভাঙ্গাইয়া পয়সা দিতেন। যে কয়দিন তিনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলেন, প্রতিদিনই ঐরূপ করিতেন। যথার্থ সত্যসঙ্কল্প যাহাকে বলে জননী তাহাই ছিলেন। তিনি কোন সঙ্কট সময়ে কিংবা কোন অভীপ্সিত বিষয়ে সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত গৃহদেবতা নারায়ণের নিকট মানস করিয়া দৃঢ়চিত্তে বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার এমনই

ভক্তি ও সৌভাগ্য ছিল যে, কখনও তাঁহার কোন মানসিক সঙ্কল্প বিফল হয় নাই।

সকলেই তাঁহাকে ভাগ্যবতী বলিতেন, প্রকৃত পক্ষে শান্তি ও সফলতা দেখিয়া মনে হইত, যথার্থই শুভ অদৃষ্ট লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়সের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমে ক্রমে সংসারের মমতা কমাইয়া আনিতেছিলেন। স্বর্গারোহণের চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন, তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে সংসারের বাসনা হ্রাস করিয়া ইষ্ট দেবতার চিন্তায় নিরত হইয়াছিলেন। ঐ বার জ্বরের সময়ে আমরা তাঁহার প্রতিকৃতি রক্ষার জন্য একটি ফটো তুলিয়াছিলাম, তিনি সুস্থ হইয়াই ঐ ফটোটি ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। আমরা আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন ;—"আমি মরিয়া গেলে তোমরা আমার স্মৃতি রাখিও না, তোমরা ত শাস্ত্র পড়িয়াছ, জান ত মৃতের জন্য তাহার আত্মীয়েরা যত শোক করে, পরলোকগত ব্যক্তির বন্ধন তত দৃঢ় হয়, তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হয়।" তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে আর আমরা কোন কথা বলিতে পারিলাম না, ফটোটি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইল।

শাস্ত্রানুসারে উত্তরায়ণে দেহ ত্যাগই শ্রেষ্ঠকল্প ও মোক্ষের কারণ। উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইলেই ক্রমে জননীর শরীর অসুস্থ হইতে লাগিল। জননীর শুশ্রূষার জন্য আমাদের বড় কিছু করিতে হইল না, তাঁহার পুত্রবধূবর্গ ও পৌত্রেরা এত তাঁহার প্রতি অনুরক্ত যে, তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও জননীর কাছ ছাড়া হইতেন না। দেহ ত্যাগের একঘণ্টা পূর্ব্বে ভগবদ্গীতা শুনিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সম্পূর্ণরূপ জ্ঞান আছে। যখন গীতার একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন পঠিত হইতে লাগিল, তখন অতি আগ্রহ সহকারে উহা শুনিতে লাগিলেন। চিরকাল সংস্কৃতজ্ঞ-পণ্ডিতের গৃহে প্রতিপালিত, ভগবদ্গীতার কোন্ অধ্যায়ের কি মর্ম্ম, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, যখনই "নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ" পঠিত হইতে লাগিল, অমনি করযোড়ে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। একাদশ অধ্যায় পাঠ শেষ হইলেই ক্রমে ক্রমে নয়ন অবসন্ন হইতে লাগিল, দশ মিনিটের মধ্যে ভগবন্নাম কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিলেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার যোগ দান করিবেন, কিন্তু রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় লোকের কষ্ট হইবে বলিয়া আমরা কাহাকেও সংবাদ দিলাম না, তথাপি নিকটবর্ত্তী যাঁহারা আসিয়া সমবেত হইলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অপ্রচুর নহে। নাতিশীতোষ্ণ রজনী, নক্ষত্র-শোভিত নির্ম্মল আকাশ, কাহারও কোন কষ্ট হইল না। অরুণোদয় কালে আমরা জ্ঞান বুদ্ধি ও দয়া ধর্ম্মের আধার জননীর দেহাবশেষ ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে বিসর্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিলাম। ভাগ্যবলে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া শ্রাদ্ধাদি যথাবিধি সুসম্পন্ন হইল। শ্রাদ্ধসভা নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, পূর্ব্বস্থলী, বিল্বপুষ্করিণী, বর্দ্ধমান, বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকবর্গের কৃপায় ও বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায়

৺নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুলদা কিঙ্কর রায়, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত অধর নাথ মুখোপাধ্যায়, Honourable শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের শুভাগমনে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্রসার্ব্বভৌম মহাশয় প্রতিগ্রহত্যাগী নিষ্ঠাবান্ অধ্যাপক। তিনি স্নেহবশতঃ শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ দিন নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় মুখে মুখে একটী কবিতা রচনা করিয়া উহার ব্যাখ্যা করেন। কবিতাটী এই ;—

চিত্রং নাস্ত সরস্বতী-সমুদয়ো ভক্তানুরক্তা যতঃ,
নাশ্চর্য্যং বিনয়াগমঃ স হি চিরং বিদ্বৎসু সংতিষ্ঠতে।
অত্যৎ কিং কথয়ামি সংসদি পুনশ্চিত্রং তদেবস্ফুটং
বিদ্যাভূষণ-ভূসুরস্য ভবনে যৎ সার্ব্বভৌমোদয়ঃ॥

অনুবাদ। এই সভায় সরস্বতীর (১) উদয় হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, যে হেতু তিনি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদের প্রতি অনুরক্ত, বিনয়ের (২) আগমে ও আশ্চর্য্যের কারণ নাই, যে হেতু বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মধ্যেই বিনয় প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে যে বিদ্যাভূষণ উপাধি-বিশিষ্ট (৩) দরিদ্র-ব্রাহ্মণের গৃহে সার্ব্বভৌমের (৪) উদয় হইয়াছে।

জননীর সৌভাগ্য ক্রমে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান্ অধ্যাপকবর্গ পৌরোহিত্যে ব্রতী হন। এদেশে অধিকাংশ স্থলে বৃষোৎসর্গ কালে যজুর্ব্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। আমরা সামবেদী সুতরাং সামবেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের নিকট সামবেদীয় রুদ্রাধ্যায় না থাকায় সুপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়কে জানাই। সামশ্রমী মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থতা নিবন্ধন স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহার বেদবিৎ পুত্রদ্বয়কে সামবেদোক্ত রুদ্রাধ্যায় সহ প্রেরণ করেন। বৃষোৎসর্গ কালে সামকণ্ঠদ্বয় অতিমধুরস্বরে রুদ্রাধ্যায় ও হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণ সামবেদ গান করেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ শিরোমণি মহাশয়,সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সংকারের ভার গ্রহণ করেন। অন্যান্য কয়েকটি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও একজন মহামহোপাধ্যায় রাত্রি একটা পর্যন্ত অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আদর আপ্যায়ন করিয়া ছিলেন। উল্লিখিত ভক্তিভাজন মহাত্মাদের কৃত উপকারের জন্য আমরা ভ্রাতৃ চতুষ্টয় চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী।

(১) ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী।

(২) শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর।

(৩) শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ।

(৪) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম। এখানে 'সার্ব্বভৌম' শব্দটি দুই প্রকার অর্থ-বোধক, এক অর্থ সার্ব্বভৌম সম্রাট্ দ্বিতীয় অর্থ অধ্যাপক। 'দরিদ্রের গৃহে সম্রাটের উদয় ইহাই আশ্চর্য্য, ইহাই অলঙ্কারের তাৎপর্য্য।

বঙ্গসাহিত্যের জাগরণ। (২)

বঙ্গসাহিত্যে আর্য্য আদর্শের প্রভাব ও রামায়ণ মহাভারত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, এতদ্দেশীয় ধর্ম্মের প্রভাবে, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবীয় মতিরতির বশ্যতায় কিরূপে পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে, তাহা আমরা দেখিলাম। বঙ্গদেশে তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, মুদ্রাযন্ত্রই জাতীয় জ্ঞান, ভাব, সম্পত্তির প্রধান রক্ষক ও পরিবেষক রূপে মনুষ্য সভ্যতার স্থিতি স্থাপকতা সম্পাদন করিয়া, বর্ত্তমান যুগে অভাবনীয় ভাবে কার্য্যকর হইয়াছে। সভ্যতার ইতিহাসে এই আবিষ্কার অপেক্ষা বৃহৎ বা মহৎ ঘটনা আর নাই। মুদ্রাযন্ত্র মনুষ্য সমাজে উপস্থিত হইয়া, বিশ্বমনুষ্যের সভ্যতা এবং সাহিত্যকে, তাহার পূর্ব্বাপর ইতিহাসকে সুস্পষ্টরেখায় দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। এই মুদ্রাযন্ত্রের অভাব গতিকেই, গ্রন্থরচনা কিম্বা গ্রন্থে প্রচলন বিষয়ক কালক্রম বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ প্রভাবশালী নহে। সুতরাং আমরা, কোন ইতিবৃত্ত-মূলক কালপর্য্যায় অনুসরণ না করিয়া, কেবল এক একটা ভাব-ধারার বিকাশকেই বিচার করিয়া চলিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যের শিরোভাগে বিষ্ণুপদ-চুম্বী হিমাগিরি; এ হিমালয় হইতেই পরমপাবনী গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রধারা দেশ দেশান্তরের জীবনরসে পরিপুষ্ট হইয়া বিপুল প্রবাহে তাহার মর্ম্মতল প্রমথিত ও প্লাবিত করিয়া বহিতেছে; তাহার দক্ষিণ সান্নিধ্যে বিশ্বধরিত্রীর হৃদয়াধার মহাসমুদ্র; এই শৈল সমুদ্রের সুদূর অথচ আন্তরিক সম্মান-জনিত মহতী অন্তর্ব্বাষ্পধারা মন্দাকিনী রূপে তাহার আকাশে ও বাতাসে প্রবাহিত হইয়া তাহার শীতাতপের প্রকৃতি এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই ত্রিধারাই বঙ্গদেশীয় নৈসর্গিক প্রকৃতির প্রাণ। তাহার সাহিত্যেও, বিশ্বোন্নত অন্য সংস্কৃতের ধবলগিরি-নিঃসৃত-ভোগ কর্ম্মভক্তি-ধারা, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। বঙ্গদেশের হৃদয়ে এই আর্য্য-হিমগিরির আদর্শ ছায়া উহার দ্বিতীয় সংসর্গ ফলরূপে প্রসারিত হইয়া কোন্‌দিকে কার্য্যকরী হইয়াছে, অতঃপর তাহাই দেখিব। রামায়ণ, মহাভারত প্রাচীন ভারতজাতির হৃদয়ের ইতিহাস। এই দুই গ্রন্থের প্রতিপত্রে, এই পরম গরিষ্ঠ জাতির চরিত্রছায়া এবং তাহার ভবজীবনের আশা, আদর্শ ও উদ্যম প্রতিফলিত হইয়াছে। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, কিম্বা ভীমার্জ্জুন তাহার মানব আদর্শ—তাহার দেবাদর্শ বা পূজার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র; অথচ ইঁহারাই দেবভাবে, অবতারের ভাবে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবযোনির প্রতি ভয়-ভীতি-জনিত পূজা নহে, পরম প্রেম-ভক্তি ও সহানুভূতি-জনিত এই পূজা! এই কারণে, এই দুই গ্রন্থই প্রাচীন আর্য্য জাতির অকৃত্রিম সাহিত্য; তাহার মনুষ্য হৃদয়ের অকৃত্রিম রসাধার! আর্য্য দ্রাবিড়ের সম্মিলন-জনিতা বঙ্গসরস্বতী তাঁহার শৈশব হইতেই এই মহতী সাহিত্যচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। শতাধিক কবি অনুকরণ-

পথে, ন্যূনাধিক স্বদেশীয় বিশেষত্ব-পথে এই রামায়ণ এবং মহাভারতকে বঙ্গদেশের নিজস্ব করিতে চাহিয়াছেন। হিন্দু-রাজত্ব-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান রাজত্বের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই ফটোগ্রাফীর বা অনুবাদ, কথকতার এবং গ্রাহকতার ব্যাপার চলিয়া আসিয়াছে। তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এখন রামায়ণ মহাভারতের অপরিহার্য্য স্থান। এখন হিন্দুগৃহ নাই, যেখানে একজনমাত্রও সাক্ষর মনুষ্য আছে, অথচ হস্তলিখিত জীর্ণ পুঁথি অন্ততঃপক্ষে বটতলার রামায়ণ মহাভারত নাই। এই অনুবাদ এখন বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে একান্ত ও অপরিহার্য্য হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থের স্থান লাভ করিয়াছে। যদি এমন ঘটে যে, বঙ্গদেশ হইতে আর্য্যভারতের বেদপুরাণ, স্মৃতি সংহিতা কিম্বা দর্শনাদি এককালে বিদূরিত হইয়া যায়, বাঙ্গালী গৃহস্থের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। এই দুই পুঁথিই এই দেশে প্রাচীন হিন্দুজীবন ও আদর্শ বজায় রাখিতে এবং তাহার 'আর্য্যত্ব' অপ্রতিহত রাখিতে পারিবে। ফলতঃ, এই সমাজে এখন আমরা সাধারণ জীবনে কিম্বা প্রাত্যহিক জীবনে আর্য্যদর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছি; উপরে উপরে, এই সমাজের শীর্ষে বসিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি-স্মৃতির অনুদেশ বা dictum মাত্র রক্ষা করিতেছেন। এই দুই গ্রন্থই আমাদের জীবনে সর্ব্বভাবে ওতপ্রোত হইয়া, সূতিকাগৃহ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত পথপ্রদর্শন করিয়া চলিতেছে; এই দুই পুঁথি বাঙ্গালীর যুগপৎ কাব্যরসানন্দের ও শাসনশাস্ত্রের একাধার। যে কেহ বাঙ্গালীর সহিত কথা কহিতে বা বঙ্গভাষার পংক্তি রচনা করিতে চাহিবেন—কবি, লেখক, ভাবুক, দার্শনিক, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই এই দুই গ্রন্থ সর্ব্বতোভাবে অপরিহার্য্য হইয়া গিয়াছে। এই দুই গ্রন্থ ভারতবর্ষীয় মনুষ্য-হৃদয়ের রসভাবের সমুদ্র; এই জাতির ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের, সত্য-মঙ্গল-সৌন্দর্য্য সাধনার প্রাচীন ও পরম পূজ্য আধার। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান ভারতের সকল জাতিই এই দুই গ্রন্থের আত্মাকে কোন না কোনরূপে আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের হিন্দুত্ব ও পরস্পরের ভ্রাতৃসম্বন্ধ সিদ্ধ করিয়াছে।

বঙ্গদেশে প্রায় ২২ জন কবি রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃত্তিবাসই অগ্রণী। তৎপর, ষোড়শ শতাব্দীতে কবিচন্দ্র ও অদ্ভুতাচার্য্য ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফকিররাম ও রঘুনন্দনই শ্রেষ্ঠ।

৩৫ জন বাঙ্গালী কবি মহাভারত গাইয়াছেন। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সঞ্জয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয় পণ্ডিত, ষোড়শ শতাব্দীর কবীন্দ্র, পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কাশীরাম দাসই শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন প্রায় ৩০ জন কবি শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি কৃষ্ণবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মালাধর বসুই শ্রেষ্ঠ।

এই সকল কবির এই বৃহৎ-বিপুল কাব্যচেষ্টার উদ্দেশ্য কি ছিল? সমস্ত বঙ্গসমাজে প্রাচীন আর্য্য আদর্শের ভাবধারা প্রবাহিত করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রে মুসলমান রাজার নিরাবিল জনহিতৈষণাও সহানুভাবক হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, দেখিতে পাই। পরমেশ্বর ও তৎপুত্র শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, পরাগল খাঁ ও ছুটিখাঁর আদেশে ও সাহায্যে চট্টগ্রামে বিরচিত এবং 'পরাগলী

মহাভারত’ নামে বিখ্যাত। মুসলমান রাজা অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই সাহায্য করেন নাই; দেশে সর্ব্বত্র আর্য্যমনুষ্যত্বের আদর্শ যাহাতে কার্য্যকর হয়, সেই বিনির্ম্মল উদ্দেশ্যেই তাঁহারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ স্বদেশে (পারস্যে) স্বতন্ত্র উন্নত-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর পারস্য কবি ওমারখায়নের নামে বর্ত্তমানের য়ুরোপেও জয়ধ্বনি পড়িতেছে; তদ্ভিন্ন মুসলমানের সাদী, হাফেজ,ফারদৌশী ও নেজামীর নামও জগৎপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান-প্রভাব।

বঙ্গদেশে মুসলমানের অধিকার ও মুসলমান প্রভাবের ফলে সমুন্নত পারস্য-সাহিত্যের ভাবপ্রবাহও নানামুখে বঙ্গসাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্ম স্বয়ং ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় অধ্যাত্মযোগতত্ত্বের সম্মিলনে সমুন্নতি লাভ করিয়াছে, এই কথা অনেক শিক্ষিত মুসলমানকে স্বীকার করিতে শুনিয়াছি। অন্যদিকে, মুসলমানের ভক্তি-আদর্শ ও পরমঋজু উপাসনা-প্রণালীর সম্বন্ধে আসিয়া ভারতবর্ষও প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের নানক কবীর প্রভৃতির মধ্যে মুসলমান-প্রভাব সুস্পষ্ট; শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও কোরাণের উপাসনা-প্রণালীর নিরাবিল সরলতা, ও সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাব এবং অভেদবাদ যে বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবগণ এক সময় সকল জাতিকেই,আচণ্ডাল নির্ব্বিশেষে, আপন বক্ষঃতটে আহ্বান করিয়াছিল ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকেই এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের প্রাণ-স্পন্দনে জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালায় অসংখ্য মুসলমান বৈষ্ণব কবির রচনা ও পদাবলী গ্রন্থ মিলিতেছে। বাঙ্গালার মুসলমান ফকির ও হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে এখনও প্রচ্ছন্ন-ভ্রাতৃভাব রহিয়াছে। মুসলমান-ফকিরের হিন্দু-যোগী-গুরু অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্র মিলিবে। সাধনতত্ত্ব বিষয়ে হিন্দুযোগী ও মুসলমান-ফকির সাধারণ সামাজিক ভেদ-বন্ধনের অজ্ঞাতে এক গুপ্ত-মিলন-প্রথা এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছে।

মুসলমানের আগমন এবং প্রভাবের পর হইতে এখন আর বাঙ্গালী বলিতে কেবল হিন্দুকে বুঝাইতেছে না, মুসলমানকে বুঝাইতেছে। বঙ্গদেশে মৌলিক মোগল পাঠানের সংখ্যা পরিমিত; ক্রমে তাঁহাদের পরিচিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী মুসলমান অধিকাংশই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নানা কারণে (বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের অনুদারতার পীড়ন-প্রাবল্যে) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা, হিন্দুমুসলমান, উভয়ের। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও মুসলমানের প্রাণস্পন্দন বিশেষভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। কাব্য,ধর্ম্ম-তত্ত্ব, সঙ্গীত, ইতিহাস, উপাখ্যান ও পীরপূজা বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুসলমান বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। বঙ্গভাষা ও অভিধান, বাঙ্গালীর ব্যবহার-বিধি, বাঙ্গালীর রীতি নীতি ভদ্রতা ও শিষ্টাচার নানাদিকে মুসলমানের নিকট ঋণী। মুসলমান কবিগণের মধ্যে করিমালি, আলিরাজা ও দৌলতকাজি,সর্ব্ব শেষে আলাওলের নাম প্রসিদ্ধ। উপাখ্যান, কাব্য, পারস্য সাহিত্যেরই সৃষ্টি, এই ক্ষেত্রেই বঙ্গসাহিত্য মুসলমানের প্রভাবে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল-প্রণীত পদ্মাবতী কাব্য এই জাতীয় কাব্যের পথ-প্রদর্শক; উহার প্রভাবেই পরবর্ত্তী রাম-

প্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতির বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে, কবি জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ীর হরিলীলা ও চণ্ডীকাব্যে সুপ্রকট হইয়াছে। সেইদিন পর্য্যন্ত রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতকে এই পারস্য প্রভাবই প্রবল ছিল, দেখিতে পাইতেছি। মুসলমানের এই উপাখ্যান কাব্যে ধর্ম্মের বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নাই, সাহিত্য-রসই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উপাখ্যান বাহ্যতঃ আদিরসাক্রান্ত হইলেও পারস্য সাহিত্যে নেজামী প্রভৃতি কবি উহার মধ্যে গভীর আন্তরিকতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। কবি আলাওলের ৭ খানি কাব্য চট্টগ্রামে রক্ষিত হইয়াছে, এই সমস্ত কাব্যে স্থানে স্থানে ভাবভাষা ও সত্যদৃষ্টির পরম সম্মিলনে যে গভীরতা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা আধুনিক কাব্য-রসিকেরও বিস্ময়াবহ হইবে। এই উপাখ্যান-কাব্যের প্রথাই বঙ্গসাহিত্যে, তাহার ধর্ম্মপ্রভাব হইতে দূর ক্ষেত্রে, এক অভিনব এবং সম্পূর্ণ আধুনিক লক্ষণযুক্ত কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে ইংরাজের প্রভাব।

ইহার পর বঙ্গদেশে ইংরাজের আগমন ও বঙ্গসাহিত্যে ইংরেজী ভাষার প্রভাব। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বাঙ্গালার পলাশীক্ষেত্রে, একরূপ হেলায় খেলায় যেই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার গৌণ মুখ্যফল সমস্ত ভারতবর্ষে, তাহার সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্ম্মে এখনও থাকিতেছে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব যে বঙ্গদেশে ও সাহিত্যে সর্ব্বত্র নবজীবনের ও পরম পরিত্রাণের আকারে উপস্থিত হইয়াছে, কেবল এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না; এই বিষয়ে নির্ব্বাক নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ হইবে না। কোন আধুনিক আলোচনা এইক্ষেত্রে চরম-কথা বলিবার আশা করিতে পারে না সত্য, কিন্তু আত্মজ্ঞান ও আত্মচৈতন্যই মনুষ্যের সর্ব্ব উন্নতির নিদান, তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য-কল্পেই আমরা প্রয়াসী হইতেছি।

জগতের বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-সমাজ কিম্বা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে, একটী তত্ত্ব সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হয়। জগৎ কোন মঙ্গলনিয়ন্তৃ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই হউক, কিম্বা স্বভাবেই হউক, একটা নীতির আশ্রয়ে সুদূর উদ্দেশ্যে চলিয়াছে; উদ্দেশ্যটী যেন সম্প্রসারণ ও সামঞ্জস্য। এই জগতে কোন ব্যক্তি, কোন জাতি, কোন সমাজ কিম্বা সাহিত্য কেবল নিজকে লইয়া কূপমণ্ডুকবৎ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। বিশ্বের ব্রহ্ম—তাঁহার 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্'—পদার্থ জগতের প্রত্যেক পদার্থকে আপনার অভিমুখে টানিতেছেন। এই আকর্ষণের গৌণমুখ্য ফলেই জগতের যাবতীয় পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন; সংপ্রসারণ ও সামঞ্জস্যই জগতের মঙ্গল-লক্ষ্য; জগতের সমস্ত আপাতিক অমঙ্গলভাব, মানুষের স্বার্থজ্ঞান ও ভ্রান্তি-কল্পিত বলিয়াই ভক্তগণ বিশ্বাস করেন। জগন্ময় আলোকের নির্দ্দয়-নির্ম্মম, সব্যসাচী সেনাপতি বাহির হইয়াছেন, বিশ্বভুবনে ঘুরিতেছেন! তাঁহার একহস্তে অসি, অন্য হস্তে আপন প্রভুর—নিরঞ্জনের—অনন্তের নাম! অবাধ্যগণের নিস্তার নাই। এই বীরভদ্রের অসিসমক্ষে, জগতে মনুষ্যের সমস্ত দক্ষচাতুর্য্য ও কূট-কৌটীল্য খণ্ডবিখণ্ড ও পণ্ড হইয়া যাইতেছে! জগতে এই হেতু, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির, একজাতি অন্যজাতির জারক, মারক বা রসায়নরূপে পরিণত হইতেও কার্য্যকর হইতে দেখা যায়। বিশ্বব্যাপারে প্রণিধান

করিতে পারিলে, পরস্পর-সম্বন্ধের এই তত্ত্ব ন্যূনাধিক সর্ব্বত্রই দর্শন করিতে পারিবেন। ইংরাজের মধ্য দিয়া বিশ্বভগবান্ যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ভেষজ প্রয়োগ করিয়াছেন, সন্দেহ হয় না। যেই রোগ-বশতঃ ভারতজাতি ঐক্যতন্ত্রী হইতে পারে নাই, এখনও পারিতেছে না, সাম্যমৈত্রী-মন্ত্রী মুসলমান-বীর তাহাই ভারতবর্ষকে শিখাইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন—নানাদিক্ হইতে এই দেশে তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। ইংরাজের প্রভাবই পুনশ্চ নানাদিক্ হইতে জ্ঞাতসারে বা অতর্কিতে ভারতের হিতার্থেই কার্য্য করিতেছে। তাহার ফল এখনো সুস্পষ্ট হইতেছে বলিতে পারি না, তবে জাতীয় ইতিহাসে, বিশেষতঃ এই পরম পুরাতন জীর্ণ জাতির ইতিহাসে শতবর্ষও পলকনিমেষ বই নহে।

বঙ্গসাহিত্যে বিশ্ব-সাহিত্যাদর্শ।

আমরা এখন এই দেশের সাহিত্যে বা সারস্বত হৃদয়ে ইংরাজের প্রভাব—বিশ্বভুবনের প্রভাব প্রাপ্ত হইতেছি। ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বগ্রাহিণী শক্তিমত্তা, আন্তরিকতা, ঋজুতা ও বিষয়বস্তুনিষ্ঠা বিশ্বসাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই পরম গরীয়সী সরস্বতীর অনুগ্রহে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীহৃদয় কিরূপে এবং কতদূর উপকৃত হইতেছে, তাহার রেখামাত্র অনুসরণ করা ভিন্ন, বর্ত্তমানে আমাদের অন্য সাধ্য নাই। আমরা যাহা সাধন করিতেছি, যাহা লাভ করিতেছি, জাগ্রতভাবে তাহার লাভসন্ধি করিতে পারিলেই উহা প্রকৃত লাভ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ইংরেজ জাতির সহিত পরিচয়ে বাঙ্গালী প্রথম প্রথম বিব্রত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে প্রকৃতিস্থ হইতেও বহু সময় লাগিয়াছে। সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম, বা আচার, ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অসন বসনে, চালচলনে বিপরীত ব্যবস্থিত, একটী প্রবল জাতির সম্পর্কে আসিলে বিজিত জাতি মাত্রেরই ঐরূপ আত্মবিস্মৃতি হওয়া স্বাভাবিক। বাঙ্গালীকে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতেও ৫০ বৎসর লাগিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইংলণ্ড স্বয়ং ফরাশী বিপ্লবের আন্দোলন বশে ইয়োরোপের নব সাহিত্য প্রথায় উদ্বুদ্ধ হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালী এই বিজাতীয় সংসর্গের আঘাতই সামলাইতেছিল। তাহার পঞ্চাশ বৎসর পরে বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষার প্রাচীন তন্ত্রীয় মাহাত্ম্যে—অষ্টাদশ শতাব্দীর চরিত্রে মাত্র জানিতে পারিয়াছে। স্বয়ং ইংরাজী সাহিত্যে তিনটী বৃহৎ ভাবযুগ পরিদৃষ্ট হইবে। প্রথমটী রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকাল হইতে প্রথম চার্লসের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত, উহার নাম সেক্সপীয়র যুগ দিতে পারি; দ্বিতীয়টী ঐ সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; উহা ইংরেজী সাহিত্যের Augustum age বা ফরাশীর দীক্ষাপ্রাপ্ত ভব্যতার যুগ মাত্র। তৃতীয়টী ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে এখন যাবৎ চলিতেছে—উহাকে ইউরোপীয়ান সাহিত্য-প্রথার বা গেঠের যুগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছি। ইউরোপে গেঠের সময় হইতে জার্ম্মনির শিল্পত্বে যে নব-সাহিত্য-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই ইংলণ্ডে নানাদিকে বার্ণস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, বায়রণ, স্কট হইতে আরম্ভ করিয়া কার্লাইল, ব্রাউনীং, জর্জ এলিয়ট, টেনিসন, সুইনবার্ণ, রাস্কিন, মেরিডিথ, হার্ডী ও মরিস প্রভৃতির মধ্য দিয়া আধুনিক কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে

প্রথমতঃ ইংরেজী সাহিত্যের এই ভব্যতা যুগের আদর্শেই জাগিতে পারিয়াছিল; উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর হইতেই বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যের তথা বিশ্বসাহিত্যের প্রথায় ন্যূনাধিক জাগ্রতভাবে সবল হইতে পারিয়াছে। এসিয়াবাসী বঙ্গসাহিত্য নানা বিষয়ে, বিধর্ম্মী ইংলণ্ড তথা ইউরোপ হইতে এত দূরবর্ত্তী ছিল যে,তাহার বুদ্ধিনাড়ীর গ্রাহিকা-শক্তি প্রথম আঘাতটীকে সামলাইয়া উঠিতে,প্রকৃতিস্থ হইতে ও বিশ্বসাহিত্যের সহানুভাবক হইতে যে ১২০ বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

ইংরেজাবির্ভাবের সময় বঙ্গসাহিত্য স্বয়ং সেক্‌সপীয়র যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজী সাহিত্য হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না, বরং শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিগণের কার্য্যফলে বিশেষতঃ সংস্কৃতের অনুবাদ-সাহিত্যের প্রভাবে নানা বিষয়ে উন্নত ছিল। এলিজাবেথ যুগের ইংলণ্ড, অতুলনীয় জাতীয় সৌভাগ্যের, এবং অপরূপ দৈবী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সমূহের সঙ্গম-গতিকেই যুগপদ্ বিশ্বধরিত্রীর বিষয়-রস অধিকার করিতে ও স্বকীয় সাহিত্যে জাতীয় হৃদয়-সমুদ্রের ধর্ম্মনীতি চির তরে ধারণ করিতে পারিয়াছিল। পরম সৌভাগ্য ও পুরষকার, উভয়ই অতুলিত ভাবে সজ্জিত হইয়া ইংরেজ জাতিকে ও তাহার সাহিত্যকে বিশ্বের গৌরব-শীর্ষে স্থাপন করিয়াছিল।

ইংরাজের সংসর্গ লাভ করিয়াও বাঙ্গালী বহুকাল কেবল তাহার দোকান পাট, খাতা পত্র, বাটখাড়া, লাঠি ও বন্দুক, সঙ্গীনের সম্পর্কেই জাগ্রত থাকিয়া চলিতেছিল। ইংরাজী ভাষার ফাষ্টবুক, সেকেণ্ডবুক, ও ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক প্রস্তাব পাঠেই চরিতার্থ হইতেছিল। এখনও, এইদেশে, ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের এত উন্নতি সত্ত্বেও আমরা অনেকে তদপেক্ষা অধিক লাভ করিতেছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইংরাজের বিজাতীয় প্রকৃতি ও পরিচ্ছদের ভিতর যে একটা পরম উন্নত সাহিত্য-হৃদয় রহিয়াছে, তাহা আমরা প্রথমে সন্দেহও করি নাই; ঠিক এই পোষাক পরিচ্ছদের ও চালচলনের বিজাতীয় পার্থক্য বশে তাহারাও অনেক সময় আমাদিগকে চিনিতে পারেন না। এইদেশে, অনেক ইংরাজের ঐশ্বর্য্য-সুখ-বিলাসী ও দেহাত্মভাবপূর্ণ বিকৃত জীবনের দৃষ্টান্তও যে সদ্ভাব-উদয়ে সাহায্য করে না, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইংরাজের স্বদেশে, ইংরাজের সহোদরগণ যে পরমোন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা সমস্ত সভ্যজগতের লুব্ধদৃষ্টি ও সম্মান সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে। বাঙ্গালী ইংরাজজাতির প্রকৃত মাহাত্ম্যজ্ঞানে ধীরগতি ক্রমেই জাগিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যের স্বীকার ও পরকীয় শক্তি, সঙ্গতি।

ইংরাজ আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে মহিমান্বিত কাব্যসাহিত্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এই কালে অধিকাংশ গ্রন্থই পদ্যচ্ছন্দে রচিত হইত, বঙ্গভাষার ছন্দোগতি ও লালিত্যগুণ অসামান্য; হৃদয়-ভাবের আবেগ এবং উচ্ছ্বাসকে সংপিণ্ডিত করিবার এবং সমুন্নত রসানন্দে পরিনামিত করিবার শক্তি বঙ্গভাষার প্রকৃতিসিদ্ধ। বীণাপাণির পরম অনুগ্রহ-পরিপুষ্টা এই বঙ্গভাষা আজন্মকাল পাণ্ডিত্যগম্ভীর সংস্কৃতের এবং শিরঃস্থিত পুরোহিত সংক্রান্তির প্রভুতায় এবং বিদ্বেষে নিপীড়িত হইয়াও কেবল আপনার হৃদয়-

বলেই এতকাল প্রাণ ধারণ করিয়া ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। সমাজের তথাকথিত উপরিস্থগণের বিদ্বেষবিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই অগ্রসর হওয়া, যেন বঙ্গভাষার চিরজীবনের কোষ্ঠীপত্রেই লিখিত আছে, এখন যাবৎ, এইরূপ দুরদৃষ্ট বশেই, বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য পদে পদে ইংরাজের সমক্ষেই নানামতে প্রপীড়িত হইতেছে। বঙ্গসাহিত্যকে চাপিয়া রাখিবার জন্য, তাহাকে চিরকালের 'পতিত' এবং কেবল মুটে-মজুর মাত্রের আশ্রিত করিয়া রাখিবার জন্য, পূর্ব্বকালে পণ্ডিত-পাতি প্রচারিত হইয়াছিল; পুরাণাদি আর্য্য-সংস্কৃতের বিষয়গুলিন যে "ভাষায়াং মানবো শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ" তাহা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার জনহৃদয় রৌরব-নরকের ভয়কে তুচ্ছ করিতে না পারিলে, এবং বঙ্গ-বাকৃদেবীর বক্ষঃস্তন্যেও পরম নরক দুঃখ-বিস্মরিণী অমৃতসুধা না থাকিলে, আজ আমরা এই স্থানে দাঁড়াইতেও পারিতাম না। ভাববীর বৈষ্ণব কবিগণই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষার কৌলীন্যগরিমা খ্যাপন করিতে সাহসী হন। এই বৈষ্ণবগণ কতদূর সাহসী! যাঁহারা সংস্কৃত প্রসঙ্গের মধ্যস্থলে, পরম পূজনীয় বেদ পুরাণাদির পবিত্র বাক্যের সমকক্ষতায় আমাদের এই পতিতা এবং অস্পৃশ্যা বঙ্গ-ভাষার পদপয়ারকেও উদ্ধার করিতে পারিতেন! সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে এবং গোঁড়া আর্য্যগাম্ভীর্য্যের আদর্শ নেত্রে, এই বৈষ্ণব-গণের নামের যে একটা 'ছি-ছি টি-টি' পড়িয়া গিয়াছিল, উহা নিতান্ত অকারণ কি? এই অভেদবাদের প্রবাহ অবারিত ভাবে চলিতে পারিলে, আজ ইতিহাসই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত! চিন্তা করিয়া দেখুন, সেই কালে কি পরিমাণের দুঃসাহস পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই দুষ্কার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছিল! যাঁহারা এই জাতীয় দুষ্কার্য্য সাধন করিতেন, তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে বঙ্গীয় মাতৃভাষার দেবীত্ব এবং আর্য্যসরস্বতীর সহিত তাঁহার পরম কৌলীন্য-'মেল' এবং সাম্য-সঙ্গতি স্বতঃই প্রমাণিত ছিল, সংস্কৃত বাণী-ভাণ্ডারের রিকৃথভাগিনী হইয়াও, সংস্কৃত অভিধান শাস্ত্রের দাসীপনা করিতে বাধ্য থাকিয়াও, তিনিই বাঙ্গালীর গৃহ-দেবী, তিনিই আমাদের অন্তরতম হৃদয়ের পূজা-গৌরবান্বিতা মাতৃদেবী!

পৃথিবীর সকল আদিভাষার প্রথম কথা পদ্যবন্ধেই মুদ্রিত। ভাব-প্রবাহিনী পদ্য প্রথাই সাহিত্যের জননী; বঙ্গভাষাও সেই নিয়ম-বহির্ভূত নহে। তবে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইংরাজের প্রভাবই বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক। বঙ্গীয় গদ্যও বহু প্রাচীন। একাদশ শতাব্দীর রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চণ্ডীদাস-কৃত "চৈত্যরূপ-প্রাপ্তি" গ্রন্থে, প্রাথমিক বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শন দৃষ্ট হইবে। ষোড়শ শতাব্দীর নীলাম্বর-কৃত "দ্বাদশ পাট নির্ণয়" ও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়-কৃত প্রায় ৫০ খানি গদ্যগ্রন্থ রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য গ্রন্থাবলীতে প্রাথমিক ইংরেজ-প্রভাবের গন্ধ হইতে নানাদিকে সজীব ও ওজস্বী গদ্য রচনাও লক্ষিত হইতেছে।

ইংরাজীর প্রভাব, বিশেষতঃ মুদ্রাঙ্কণের সহায়তাই যে বঙ্গসাহিত্য ও ভাষাকে স্থিতি-দৃঢ়তা ও সুসিদ্ধ নিয়তি প্রদান করিয়াছে, সর্ব্বোপরি তাহার সমক্ষে বিশ্বসাহিত্যের অসীমতা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। ক্রমশঃ শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

আত্মার অমরত্ব ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান।

আমাকে মিডিয়ম করিয়া কোন পরলোক-বাসী আত্মা নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। তিনি আপনাকে রাজা রামমোহন রায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। নব্যভারতের পাঠক-বর্গের নিকট উক্ত প্রবন্ধ উপস্থিত করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আত্মার অমরত্ব বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব। মানবাত্মা অবিনশ্বর পদার্থ। আত্মার অমরত্বে লোকের বিশ্বাস বড় অল্প। সমস্ত পৃথিবীর লোক আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু সে বিশ্বাস অতিশয় ক্ষীণ। সচরাচর লোকে মনে করে, যেন মৃত্যুতেই শেষ। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইলে যেরূপ শোক হইয়া থাকে, তাহাতেই বুঝা যায় যে, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস যাহা আছে, তাহা যথেষ্ট নহে। অত্যন্ত অল্প বিশ্বাস। আত্মার অমরত্বে লোকের বিশ্বাস যত বৃদ্ধি হইবে, ততই জগতের মঙ্গল। জগতের কি মঙ্গল হইবে, একটী একটী করিয়া প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম, এখন পৃথিবীতে যেরূপ শোকের যন্ত্রণা, তাহা দেখিলে যথার্থই মনে বড় কষ্ট হয়। শোকের জন্য কত লোক পাগল হইয়া যায়। কত লোক আত্মহত্যা করে। শোকের জন্য জগতের লোক হাহাকার করিতেছে। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বৃদ্ধি হইলে যে এ শোকযন্ত্রণা অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই। যে সকল পরিবারে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা পরলোকে বিশ্বাস অধিক হইয়াছে, সেখানে কাহারও মৃত্যু হইলে, শোক অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা লোকের পরলোকে বিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি হয়; এবং তখন তাঁহাদের কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের শোক অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। ইহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। সেই জন্য বিশ্বাস করি যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা জগতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অধ্যাত্মবিজ্ঞান এ পৃথিবীতে যত প্রচারিত হইবে, ততই শোকতাপ হ্রাস হইতে থাকিবে।

দ্বিতীয়, জগতের লোকের ধর্ম্মভয় আছে, সত্য, কিন্তু অধিক নহে। যাহা প্রার্থনীয়, তাহার সহিত তুলনা করিতে অতি অল্পই আছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা ধর্ম্মভয় ও ধর্ম্মানুরাগ যে বৃদ্ধি হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে পরকালে বিশ্বাস করিতেন না, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা যখন তাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস হইল, তখন দেখিলাম যে, তাঁহাদের ধর্ম্মভয় ও ধর্ম্মানুরাগও বৃদ্ধি হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। সে সকল লোকের চরিত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। যখন তাঁহারা পরকালে বিশ্বাস করিতেন না, তখনকার সহিত তুলনা করিলে, আশ্চর্য্য হইতে হয়।

পরলোকে বিশ্বাস বৃদ্ধিদ্বারা পরমেশ্বরেও বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়। এই দুই বিশ্বাসের মধ্যে পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ আছে কিনা, জানি না।

কিন্তু দেখিয়াছি, পরলোকে বিশ্বাস হইলে, পরমেশ্বরেও বিশ্বাস হয়। পরলোকে এমন ব্যক্তি সকল আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য মনে হয় যে, এ দুই বিশ্বাসে কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পৃথিবীতে যাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস হয়, তাঁহাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাসও হইয়া থাকে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস হইলে, তদ্দ্বারা যে মানুষের অনেক মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস, মানুষের অশেষ মঙ্গলের কারণ।

পরকালে বিশ্বাস বৃদ্ধি হইলে, মানুষের নিজের জীবনের মূল্য অধিক করিয়া বুঝিতে পারে। মরিলেই ফুরাইল, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে জীবনের কোন মূল্যবোধই হয় না। কয়টা দিনের জন্য এখানে থাকা? এ কয়দিনের সুখ ও দুঃখের কতই মূল্য? কিন্তু যদি বিশ্বাস হয় যে, এ জীবনের পর, এক অনন্ত জীবন আছে, তাহা হইলে, বহুপরিমাণে, এ জীবনের মূল্য অধিক করিয়া বোধ হয়। আমি ক্ষণকাল-স্থায়ী কীট নহি। আমি অনন্তকাল-স্থায়ী পরমেশ্বরের সন্তান। আমি অনন্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মের অধিকারী। এরূপ বিশ্বাস হইলে, মানুষ আপনার জীবনের মূল্য অনেক অধিক বলিয়া বুঝিতে পারে।

যে সকল দেশে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান অধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে, সে সকল দেশে, মানুষের পরলোকে বিশ্বাস অনেক অধিক। সেই জন্য দেখিতে পাই যে, সে সকল দেশে ঈশ্বরে বিশ্বাসও অনেক অধিক। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। যুক্তরাজ্যের অধিবাসিগণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব অন্য দেশের লোকের অপেক্ষা অনেক অধিক। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সচরাচর লোকে যুক্তরাজ্যবাসিগণকে সর্ব্বপ্রধান জাতি বলিয়া মনে করেন। তাহা যে অনেক পরিমাণে সত্য, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। যে জাতি ধর্ম্মে প্রধান হইবে, সে জাতি ক্রমে অন্য বিষয়েও প্রধান হইয়া উঠিবে।

যুক্তরাজ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চর্চ্চা যেরূপ প্রবল ভাবে চলিতেছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, এদেশে পরলোকে বিশ্বাস নিশ্চয়ই অধিক; এবং পরলোকে বিশ্বাস অধিক হইলেই পরমেশ্বরে বিশ্বাস অধিক হইবে; এবং পরমেশ্বরে বিশ্বাস অধিক হইলেই জাতীয় চরিত্র যে অধিকতর উন্নত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বৃদ্ধি হইলে, ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে। ইহা সামান্য কথা নহে। ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যত বাড়িবে, ততই জগতের উন্নতি। ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত জীবনে, এবং জাতীয় জীবনে প্রাণস্বরূপ। ধর্ম্মহীন হওয়া ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে, এবং জাতীয় জীবনের পক্ষে, বিপদ বলিয়া মনে করি। অনেক দেশের ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া ইহা প্রমাণ করা যায়।

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বৃদ্ধি হইলে, মনুষ্য অনেক পরিমাণে সুখী হয়। এ সংসারে দুইদিন মাত্র আছি। মৃত্যুতেই আমার শেষ। এরূপ বিশ্বাসে কি মানুষ সুখী হইতে পারে? আমি অনন্তকাল থাকিব; আমি অনন্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মের অধিকারী, এইরূপ বিশ্বাসে মানুষের কত আশা, কত ভরসা, কত আনন্দ!

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা বলিলাম। ইহার সত্যতা বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। এখন কথা এই যে, অমরত্বে বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় কিসে? আমার বিবেচনায় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা এ বিশ্বাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোচনা যত বৃদ্ধি হইবে, তত পরলোকে বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে, এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্মে বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি বৃদ্ধি হইবে। এদেশে যত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, এবং আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বৃদ্ধি হইলে ঈশ্বরে বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়। এইরূপে, মানুষের যথার্থ ধর্ম্মোন্নতি হইতে থাকে। যদি এদেশে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি হয়, দেশের যে কত উপকার হইবে, বলিয়া শেষ করা যায় না। এক সময়, এদেশে ঐ বিষয়ের আলোচনা অনেক হইয়াছিল। সে সময়ে দেখিয়াছিলাম যে, অনেক যুবা পুরুষ পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসও তাঁহাদের দৃঢ়তর হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ইহার কার্য্য করিতেছেন।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান দ্বারা যে কত উপকার হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রথম, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিবৃদ্ধি; তৃতীয়, চরিত্রের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি; ইত্যাদি অনেক উপকার হইয়া থাকে। এ দেশে যদি আবার অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোচনা বৃদ্ধি হয়, দেশের বিশেষ উপকার হইবে। পরলোক হইতেও বিশেষ আয়োজন হইবে, যাহাতে এ বিষয়ের চর্চ্চা ভালরূপ হইতে পারে। অনেক শক্তিশালী মহাত্মা আসিয়া সাহায্য করিবেন। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় অনেক ব্যাঘাত আছে, জানি। সে সকল ব্যাঘাত যাহাতে নিবারিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। এমন বন্দোবস্ত করা হইবে, যাহাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর আত্মারা আসিয়া উৎপাত করিতে না পারে। আমি জানি, কোন কোন বিশ্বাসী ব্যক্তিও ঐ প্রকার উৎপাতের জন্য, ইহার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যদি ভবিষ্যতে তাঁহারা উক্ত আলোচনা পুনর্ব্বার আরম্ভ করেন, নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করা হইবে।

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস ব্যতীত মানব প্রকৃতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নহে। যদি মানুষ জানে যে, মরিলেই সব ফুরাইল, এখানকার সুখ দুঃখ, এখানকার পাপ পুণ্যের এখানেই শেষ, যদি জানে যে, আর একটা উচ্চতর, পবিত্রতর, অধিকতর সুখকর জীবন নাই, তাহা হইলে, সকল মহৎ বিষয়ে তাহার উৎসাহ নিশ্চয়ই হ্রাস হইয়া যাইবে। মহৎ কার্য্যের জন্য কষ্ট স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে। এ জীবন কতক্ষণের জন্য? ইহার সুখ দুঃখ, ইহার মঙ্গলামঙ্গল কত ক্ষণের জন্য। জ্ঞান ও ধর্ম্ম জীবনের সার পদার্থ। তাহাইবা এখানে কতটুকু পাওয়া যায়? পাওয়া গেলেও তাহা যদি স্থায়ী না হয়, মৃত্যুতেই শেষ হয়, তবে সে পদার্থে ফল কি? জীবনের সকল আশা যদি মৃত্যুতেই শেষ, তবে এ জীবনে বিশেষ কি ফল? সেই জন্য আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিশ্বাস যত বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল; ব্যক্তিগত জীবনের মঙ্গল,

জাতীয় জীবনের মঙ্গল। অতএব, এদেশে যাহাতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা বৃদ্ধি হয়, তাহা এদেশের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

আমি জানি,এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ইহাতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু নিকৃষ্ট শ্রেণীর আত্মাদিগের উৎপাতের জন্য ইহার চর্চ্চা করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু যে প্রণালীতে ইহার চর্চ্চা করিলে ইহার চর্চ্চায় সুফল লাভ হয়, তাহা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। আমি তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

প্রথম, মনকে পবিত্র রাখিতে হইবে। মনের অপবিত্রতা থাকিলে কখনই শুভফল লাভ হইবে না। সেই জন্য, প্রথমেই পরমেশ্বরের উপাসনা করা প্রয়োজন। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিয়া তার পর অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ করিলে বিশেষ শুভফল অবশ্যই পাওয়া যাইবে। অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম এই যে, যাহার যেমন মন, তাহার নিকট সেইরূপ আত্মা আসে। মনের অবস্থানুসারে আত্মার সমাগম হয়। মানুষের মন যখন যেমন থাকে, তখন তাহার নিকট সেইরূপ আত্মার সমাগম হয়। সেইজন্য, উপাসনা দ্বারা মনকে পবিত্র করিয়া ইহার আলোচনা করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, যে সকল ব্যক্তির সহিত একত্রে বসিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, তাহাদের সহিত সদ্ভাব থাকা চাই। যদি এমন হয় যে, যাহাদের সহিত একত্রে বসা হইয়াছে, তাহাদের সহিত মনের মিল নাই, বরং যদি এমন হয় যে, পরস্পর অসদ্ভাব আছে, তাহা হইলে সুফল লাভের সম্ভাবনা অল্প।

স্ত্রীলোক ও পুরুষ সম সংখ্যায় বসিলে বিশেষ সুফল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা এদেশে সম্ভব নহে। সুতরাং সে বিষয় বলা বৃথা।

আর একটী নিয়ম এই যে, একত্রে বসিয়া অন্য কথা, বা অন্য চিন্তা না করিয়া আলোচ্য বিষয়ের চিন্তা করাই আবশ্যক। তাহা হইলে, আত্মারা সহজে মিডিয়মকে অধিকার করিতে পারেন।

এই কয়টী প্রধান নিয়ম। বসিবার সময় হাতে হাতে মিলাইয়া বসাও একটী নিয়ম। ইহাতে বিশেষ ফল হয়।

এইরূপে আলোচনা করিলে, নিশ্চয়ই সুফল লাভ হইবে। আমি দেখিতেছি, এদেশে আবার অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইবে। এবার সেবারের অপেক্ষা অধিকতর আন্দোলন হইবে। অনেক সুফল লাভ হইবে। সেজন্যই এই সকল কথা বলিলাম।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য যে সকল নিয়ম বলিলাম, এই সকল নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। নিকৃষ্ট শ্রেণীর আত্মাদ্বারা জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে। তাহারা সুবিধা পাইলেই আসিবে। আমি জানি, কত ভাললোক এ বিষয়ের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার অন্য কোন কারণ নাই, কেবল এই সকল নিকৃষ্ট শ্রেণীর আত্মাদের উৎপাতের জন্য ধর্ম্ম মনে করিয়া অতি পবিত্রভাবে এবিষয়ের আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

প্রাচীনকালে এ বিষয়ের আলোচনা ছিল। ঋষি মুনিদিগের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চ্চা ছিল। শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপনিষদে একস্থানে আছে যে, পরলোকবাসীদের সহিত কোন ঋষি

আলাপ পরিচয় করিতেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে। সেই জন্য তাঁহারা পরলোক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও সেইরূপ হইতে পারে। অনেকের এমন শক্তি আছে যে, তাহার বিকাশ হইলে অক্লেশে তাঁহারা পরলোকবাসীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারেন। চর্চ্চা নাই বলিয়াই কিছু জানিতে পারিতেছেন না। এ বিষয়ের আলোচনা হইলে এদেশের যে কত উপকার হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমেরিকার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহার বিষয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এদেশে সেইরূপ চর্চ্চা হইলে, এ দেশেরও সেইরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এদেশের লোকের আধ্যাত্মিক শক্তি, আমেরিকার লোকের অপেক্ষা অল্প নহে। আমেরিকায় যেমন আন্‌ড্রু জ্যাক্‌সন্ ডেবিস্ ছিলেন, সেইরূপ শক্তিশালী লোক এদেশেও আছেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলেই সহজে ভাল মিডিয়ম হইতে পারেন। এ বিষয়ের আলোচনা বৃদ্ধি হইলে, দেশের যে কত উন্নতি হয়, কি বলিব ?

আর কি বলিব ? আমি দেখিতেছি, শীঘ্রই এদেশে এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইবে। এবারের আলোচনার মূল নগেন্দ্র। নগেন্দ্র দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। অনেকেই বুঝিতে পারিবেন যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞান সত্য। এই সকল লোক যে কেবল অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিবেন, এমন নহে, ইঁহারা ধর্ম্মানুরাগী হইয়া বিশেষভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা আরম্ভ করিবেন। কেহ কেহ যোগ অবলম্বন করিবেন। যোগ, মেস্‌মেরিজিম্ ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান একই বিষয়ের তিন দিক্, ইহা নগেন্দ্র বুঝাইয়া দিবেন। বুঝাইয়া দিলে, অনেকে যোগ অবলম্বন করিবেন। দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইবে। পূর্ব্বে এ বিষয়ের যে আন্দোলন হইয়াছিল, এ আন্দোলন তদপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। ইহাদ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, বলিলেই হয়। গত কল্য প্রকাশ্য সভায় যে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। ক্রমেই আন্দোলন বৃদ্ধি হইবে। অনেক ভাল প্রবন্ধ লিখিত হইয়া প্রকাশ্য স্থানে পঠিত হইবে। সেই সকল মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশ হইবে। এই সকল প্রকাশ হইলে, দেশের সর্ব্বত্র আন্দোলন হইতে থাকিবে। নগেন্দ্রের মিডিয়ম শক্তির বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলিবেন। কেহ বলিবেন, তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি আপনার মনের ভাব আপনি লিখেন। বাস্তবিক, পরলোকবাসী আত্মাদের লেখা নয়। কেহ বলিবেন, উহা তাঁহার একটা চালাকি মাত্র। সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে এ বিষয় অনুসন্ধান করিবেন ; এবং পরিণামে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। একটা দেশব্যাপী আন্দোলন হইবে। অনেক স্থানে ইহার অনুসন্ধানের জন্য অধ্যাত্ম চক্র বসিবে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনার বিশেষ শুভফল দেখা যাইবে। অনেকেরই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। অনেকে পরমেশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করিবেন। অনেকেই আপনার চরিত্র সংশোধন করিবেন। পরলোকে বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে, এবং তজ্জন্য ধর্ম্মভয় বৃদ্ধি হইবে। এই সকল

যে হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। সেই জন্যই আমরা পরলোক পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া রহিয়াছি। যাহাতে ধর্ম্মের উন্নতি হয়, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা যে ধর্ম্মের উন্নতি হইবে, তদ্বিষয়ে লেশ মাত্র সংশয় নাই। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। চিরকাল দেশের যাহাতে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। এখন এই নূতন সুবিধা পাইয়া নূতন প্রকারে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ। তাঁহার কৃপায় এই নূতন সুবিধা পাইয়া এই নূতন উপায়ে তাঁহার কার্য্য করিতে পারিতেছি। মিডিয়মের শরীর ভাল নয়। তথাচ তিনি যেরূপ যত্নের সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইতে হয়। এরূপ মিডিয়ম আমরা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্, সুশিক্ষিত, ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি মিডিয়ম হওয়াতে বিশেষ সুফল লাভেরই সম্ভাবনা। যাহা হউক, তিনি যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহাতে স্পষ্টই দেখিতেছি, পরমেশ্বর উপযুক্ত ব্যক্তিকেই বর্ত্তমান সময়ের কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। এ প্রবন্ধটীর এখানেই শেষ হইল।

আধুনিক আর্ট।।

সম্প্রতি চোখের পলকে কাব্য ও চিত্রকলার পট পরিবর্ত্তন হইতেছে। আর্টের আবহাওয়া অহরহ বিস্ময়জনক মেঘাবর্ত্ত সৃজন করিয়া আর্টের আবহবিদ্যাকে অসম্ভব করিয়া তুলিতেছে।

বহুসাধনায় যে পদ্ধতিকে নানা যুক্তি ও তর্কে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়, হঠাৎ একদল নব্যপন্থী অবজ্ঞা ও অট্টহাস্যে তাহা উড়াইয়া দেয়। এইরূপে তিনচারি শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে।

চিত্ত পেণ্ডুলমের ন্যায় একমুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছে না—কখনও এ দিকে, কখনও ঐ দিকে নূতনত্বের নেশায় ঘুরিয়া মরিতেছে।

আধুনিক আর্ট, সনাতন কোন পদ্ধতিকেই অব্যাহত রাখে নাই। পদ্ধতি-নিষ্ঠতাই ইহার প্রাণ নহে। পুরাতন পদ্ধতিকে শিরোধার্য্য করিয়া শিল্পিগণ অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে—অলীক মৌলিকতার হুজুগে বর্ত্তমান আচ্ছন্ন। অতীতের সহিত বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করিয়াই নব্য শিল্পীরা কলা কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়।

কাজেই শিল্পিগণ আত্মপ্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া বিরোধ সৃজন করিয়াই অগ্রসর হয়।

যে শ্রেণীর আর্টে স্বাতন্ত্র্যের বাড়াবাড়ি নাই, যাহা গতানুগতিক, যাহা প্রাচীন কলাপদ্ধতি ও লক্ষণের উপর নির্ভর করে, তাহার পক্ষে নিত্য নূতনত্বের প্রয়োজন নাই। শতাব্দী হইতে অসংখ্য শিল্পচেষ্টায় আচ্ছন্ন হইলেও তাহার চন্দ্রাতপতলে অগণ্য শিল্পীর সাধনার স্থানাভাব হয় নাই।

পৌরস্ত্যদেশে ক্যাননের প্রতিষ্ঠা, শিল্প-ইতিহাসের প্রধান ঘটনা। প্রাচীন ভাবুকগণ বিশেষ বিচার ও অনুধাবনার পর জাতিচিত্তের আনুকূল্যে আর্টের বস্তু ও পদ্ধতি সম্বন্ধে

প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া এতৎসম্বন্ধে যাবতীয় কলহ নিঃশেষ করিয়াছে।

কাজেই শিল্পকে বহুরূপী সাজান এসমস্ত দেশের মৎলবই নহে—শিল্পবস্তুর থাকে তুলিকার নিপুণতা, রেখাভঙ্গী, সূক্ষ্মনিবেশ, মুখ্য অর্থকে বোধ্য করা—প্রভৃতিই শিল্পার কার্য্য হইয়াছে।

জাপানী শিল্প সম্বন্ধে কোন লেখক বলেনঃ—

"In the case of the Japanese connoisseur it is not so much the interest of the subject that appeals to him. He knows that the craftsman has gone for his designs to the collection of motives provided for him by many a talented artist. What he is interested in is rather the traces of the actual handling by the craftsman of his tools, whether chisel or graver. A healthy instinct has taught him to search in a work of art for the signs of the hand that has produced it. He seeks for the traces of the very play of the muscles that have directed the chisel ......The complete mastery and consistant use by the painter of a definite style of brush-work—and the number of these styles is le ion—is the sine-qua-non of which the above is fatal to his claim to a high position in the world of art in Japan."

ভূমিচিত্রের (landscape) থাকেই জাপানে প্রায় ছত্রিশটী তুলিকা ব্যবহারের প্রণালী আছে।

অপরদিকে ব্যক্তির প্রাধান্য ও নির্ম্মুক্তি সম্বন্ধে পশ্চিম গর্ব্ব করে। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোন সাধারণ আদর্শের সম্মান রক্ষা করিতে পারে নাই। কোন স্পেনভাবুক বলেন ঃ—"উচ্চতর ব্যক্তি শক্তি এবং সৃষ্টির মাঝে স্বাধীনতার স্ফুরণে অসংখ্য ভিন্নরূপী চিত্র ও চরিত্র সৃজনের ক্ষমতা দ্বারা গ্রীক্ আর্ট ভারতীয় কলাকে অতিক্রম করিয়াছে এবং প্রতীচ্য আর্ট এসিয়ার শিল্পসম্পত্তিকে পরাভূত করিয়াছে। পৌরস্ত্য জগতে প্রায় সব কিছুই এক ছাঁদের, একঘেয়ে ; যদিও তাহা মাঝে মাঝে কুৎসিৎ কিম্বা ঐশ্বর্য্যবিমুক্ত নহে, তবুও তাহা কাব্যপ্রভৃতিতে ক্লান্তিজনক।

সেক্ষপীয়রের নাট্যমুণ্ড-মালার এক একটী মুণ্ডের চেহারা একরকম—দ্বিতীয়টী আর একটীর মত নহে। হোগার্থের "লাফিং গ্যালারী"তে হাস্যটীর ভঙ্গী অন্যান্য হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। বিচিত্রতাকে বোঝাই করাই সেখানে আর্টের পরমার্থ—তাহার অভাব প্রশংসার হানি করে। বাইরণের নাটকগণের ঐক্য কিম্বা বটিসেলীর চিত্রসমূহের অন্যোন্যমুখীনতা এবং মূর্ত্তিসাদৃশ্য প্রশংসা অর্জ্জন করে নাই।

অপরদিকে পূর্ব্বাঞ্চলে সাহিত্য ও অলঙ্কার মাত্র। নাটকের নায়ক ও বস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে ইচ্ছাচারকে খর্ব্ব করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ, উদ্দেশ্য ও প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিগণ সেই প্রাচীন আচার অনুসারেই কল্পনাকে সংযত করে। এ সমস্ত দেশে যা' একটা কিছু লিখিয়া নায়ক বা নাট্যের কুশী লব সৃজন করা যায় না, সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া নাট্যের বিচার হয়।

নূতনকে রচনা করিয়া তোলা মুখ্য না হওয়াতে অতীত বর্ত্তমানের মাঝে একটী ভক্তিজড়িত আদর্শের অক্ষত প্রবাহ আছে—পূজ্য পূজকের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। পূর্ব্বদেশ সমূহে গুরুর প্রত্যক্ষ স্পর্শ নানা গূঢ় মঙ্গল আহ্বান করে। এখানকার শিক্ষা

ফ্যাক্টারি, যাদুকর, বা যন্ত্রানুসারী কলের চাপে নিষ্পন্ন হয় না—প্রত্যক্ষ হৃদয়ের স্পর্শ দীক্ষার সম্পর্ক লাভে মহার্ঘ হইয়া উঠে। কর্ণে উচ্চারিত কলাচারের বীজমন্ত্র—শিক্ষার্থীর একটা জীবনের সম্পত্তি। গুরুর নাম গ্রহণ কলাচেষ্টার সূত্রপাতে অপরিহার্য্য। আধুনিক কালেও তাহা ওস্তাদ ও সাক্রেত শ্রদ্ধা করিতেছে।

কাজেই একটা সুবিবেচিত পন্থা এবং প্রাচীন গুরুর সহিত সম্পর্ক থাকাতে অতীত ও বর্ত্তমানের মাঝে কোন প্রবল বিচ্ছেদ সম্ভব হয় নাই। যতটুকু শক্তি প্রাচীন পদ্ধতির তিরস্করণ এবং কল্পিত জঙ্গলসংস্কারে অতিবাহিত করা হয়, তাহা পৌরাণিক কলাবটের ছায়ায় প্রামাণ্য আদর্শের অনুসরণে ব্যয়িত করা যায়।

জাতির সম্মানকে অধ্যয়ন করিয়া প্রামাণ্য ভাবে একটা পন্থা উল্লেখ করা একটা পরম সৌভাগ্য—তাহা চুম্বকের ন্যায় যাবতীয় চেষ্টা সমূহ কেন্দ্রীভূত করে। একটী সাধারণ ভূমিতে দাঁড়াইলে বিচার বিবেচনা, তুলনা-সমালোচনা, ধ্যান ধারণা অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়। ভাল হউক, মন্দ হউক, একটা সাধারণ মঞ্চ একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ বিচারক্ষেত্র ও প্রণালী জটিল ও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ঠিক হোক্ কি ভুলই হোক্, এসিয়ার ধর্ম্মচেষ্টা নানা সাধনা দ্বারা, ইহপরকালের জন্য একটা আদর্শ খাড়া করিয়াছে—তাহাতে যত বিচিত্রতাই থাকুক না কেন, তাহার লক্ষ্য একদিকে! এই আদর্শই জগৎবস্তুকে একটা বিরোধবিহীন অর্থ দান করিয়াছে। এইরূপে জগৎকে উপলব্ধি করিবার জন্য এসিয়া একটা কেন্দ্রবিন্দু ঠিক করিয়া নির্ব্বিবাদে তাহা শিরোধার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করে নাই, ইহাই তাহার সমষ্টিজ্ঞানকে পূর্ণতা দান করিয়াছে।

চিত্ত যেখানে তন্ন তন্ন করিয়া কুড়াইয়া জ্ঞান ও বস্তুকণা আহরণ করে এবং বিচ্ছিন্নতার উপরই প্রাধান্য দিয়া অগ্রসর হয়, সেখানে জগতের জটিল প্রবাহে নিজকে নিমজ্জিত করা হয়। এজন্য যে দেশ বিশ্লেষণে মত্ত, সেখানে বস্তুপর্য্যায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে—কাজেই প্রতি পদক্ষেপে অতীতকে ভ্রান্ত মনে হয়। মানবচিত্তে গূঢ় লিপিতে অঙ্কিত জগতের সমগ্র চিত্র চোখে পড়ে না। ইউরোপের রিণাইসাঁস্ যুগ, মধ্যযুগকে উপহাস করিয়াছে, রোমান্টিক যুগ রিণাইসাঁস-যুগের প্রাকৃতবাদিতাকে নিন্দা করিয়াছে এবং রিয়ালিষ্টিক্-যুগ রোমান্টিক যুগকে প্রচুর অবজ্ঞায় দৃষ্টিপাত করিয়াছে—ধিক্কার দেওয়াও বাকী নাই।

বহির্জগৎ তন্ন তন্ন ভাবে খুঁজিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী এবং তাহার পরবর্ত্তী কাল শ্রান্ত হইয়াছে। দ্বিধা বাড়িতেছে—সংশয় পুঞ্জীভূত হইতেছে—কোন সমষ্টিজ্ঞানও সম্ভব হইতেছে না এবং সামঞ্জস্য স্থাপন সফল হইতেছে না।

যাহারা মনে করে, বিশ্বের বহুমুখী জটিল প্রশ্ন সমুচ্চয় জীবাত্মার গভীর কেন্দ্র হইতেই সার্থক হইয়া উঠিতেছে—যত প্রকার অস্তিত্ব আছে, সকলই আসিয়া সেই কেন্দ্রে একীভূত হইতেছে, তাঁহাদের সাধনা জগতের হেঁয়ালীকে অনেকটা সুবোধ্য করিয়াছে সন্দেহ নাই।

রিণাইসাঁসের প্রাথমিক দ্বন্দ্বে ইতালীতে যে গ্রীকভক্তি বাড়িয়া উঠে, তাহা কোন সুসংহত বিশ্বাসে নহে। দান্তে, পেট্রার্ক, বোকেসিওকে ভূমিসাৎ করিয়া সিসারো, প্লেটো, লিভি কিম্বা য়্যারিষ্টটোলকে লইয়া নৃত্য করা কোন সুচিন্তিত চিন্তা-প্রবাহের খাতিরে নহে। তাহা খ্রীষ্টীয় যাজকাধিষ্ঠিত চার্চ্চের ক্ষমতা খর্ব্বের পরম উৎসাহে অনে-

কটা সম্ভব হইয়াছিল। খ্রীষ্টসমাজ নানা রহস্য গূঢ়সাধন প্রণালী,এসিয়াসুলভ আচার-নিষ্ঠতা, এবং ধর্ম্মসাধনার মাঝে কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। নব্যস্থষ্ট ইয়ো-রোপীয় রাজ্য প্রভৃতির লোপ আধিপত্য বিস্তারের দাবী করে। এসমস্ত, জাগ্রত তরুণ তীক্ষ্ণবীর্য্য, নূতন জাতিদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহার আরও একটা দিক আছে। মধ্য-যুগের খ্রীষ্টসমাজ গ্রীক ও রোমান আদর্শের জন্য ফাঁসি কাষ্ঠের ব্যবস্থা করে। প্রফেসর ভিলারী বলেন, "মধ্যযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রের ধারণা ছিল যে,গ্রীক ও রোমের ইতিহাস, শিল্পনীতি-মূলক প্যাগান সমাজ ও বিধির, সভ্য (অর্থাৎ) গ্রীসীয়)জগতে কোন স্থান নাই। এইসমস্ত ভ্রান্তি ও প্রতারণা-মূলক,—ইতর, অসৎ, এবং সয়তানের কাণ্ড।"

এইযুগে পৌরোহিত্য-পীড়িত ইউরোপ উপস্থিতকে তিরস্কার মাত্রে কর্ত্তব্য নিঃশেষ করে নাই। বিখ্যাত মার্শিলিও ফিসনো তখন নানা রূপকের দ্বারা পূর্ব্ববিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা করে এবং গ্রীক আদর্শের প্রতি সম্মান জাগ্রত করিতে বলে। গ্রীক দেবতা এবং বাইবেলের য়্যাঞ্জেলে (angel) কোন পার্থক্য আছে মনে করা মূর্খতা।

বস্তুতঃ শিল্প ও সাহিত্যে এইযুগ হইতেই ইউরোপ ঐহিকতার পক্ষপাতিত্ব আরম্ভ করে। ইউরোপের আধুনিক উদারতাও মধ্যযুগের খ্রীষ্টিয়-যুগের প্রতি অনুকূল নহে। প্রফেসার ভিলারী বলেন, "Place the *Apollo Belvedere* next to a Christ by *Margharitone* or *Cimabue* and it will appear as a revelation of sun lit nature beside artificial conventionalities and combinations···Eyes were turned from Heaven back to Earth. Greeks and Romans in fact had never despised the cities of this world in favour of the city of God, nor their earthly country for the land of heaven."

ইউরোপ এই সময় হইতেই কলা ও কাব্যে তরবারি-ক্রীড়ার কসরৎ সুরু করে।

আর কিছু হোক্ না হোক্, পুরাতনকে প্রত্যাখ্যানের অভিশাপ হইতে বর্ত্তমানযুগ মুক্তিলাভ করে নাই। কত কবি ও শিল্পীর —এই তরবারি-ক্রীড়ার আঘাতে সদ্যমুকুলিত জীবনবৃন্ত ছিন্ন হইয়াছে, ইয়ত্তা নাই। কারণ সেকালে কাব্য বা চিত্র লোকের মনোরঞ্জন করিতে না পারিলে অনাদৃত থাকিত মাত্র এবং অবহেলায় অঙ্কুরেই শীর্ণ ও নষ্ট হইত। কিন্তু একালে জগতে প্রামাণ্য কিছুই নাই— এই যুক্তি একহস্তে এবং অন্য হস্তে তরবারি লইয়া সমালোচকগণ কলা ও সাহিত্য-মন্দিরে সিপাহীর কার্য্য গ্রহণ করিয়া সাধক, অসাধক সকলেরই বিভীষিকা জন্মাইতে আরম্ভ করে।

কিন্তু রিণাইসাস যুগেও প্রত্যক্ষবাদিতা সহসা স্বাতন্ত্র্যের বিকারে পরিণত হয় নাই। তরুণ শিল্পিগণের মৌলিকতার খাতিরে আত্ম-হত্যার উৎসাহ ছিল না। শিল্পিগণের মাঝে একটা সুচিন্তিত পৌর্ব্বাচার্য্য লক্ষ্য করা যায়— একে অন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। শিল্পাচার্য্যের চারিদিকে তরুণ শিল্প-প্রতিভা নত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিত। বস্তুতঃ রিণাইসাঁর যুগ পুরাতন সমস্ত আবহাওয়া উড়াইয়া দেয় নাই। অধ্যা-পক ওয়ালদি বলেন :—"প্রাচীনগণের পদ্ধতি বিচার করা যাক্···কোন শিল্পী স্বীয় প্রতিভা

ও সাধনা দ্বারা উচ্চতর শিল্প-চেষ্টার সফলতা লাভ করিয়া আচার্য্যের পদ লাভ করিয়া তাহার চারিদিকে অল্পাধিক অসংখ্য যুবক-বৃ্যহকে আকর্ষণ করে; তিনি ক্রমশঃ তাহাদিগকে নিজের সাধনার ফল এবং গুপ্ত-বিদ্যা জ্ঞাপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহারই আদর্শ ও তেজে অনুপ্রাণিত করেন। ক্রমশঃ তাহাদিগকে শিক্ষানবিশী হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার সহায়কপদে বরণ করেন; আরও কিছুকাল পরে তাহাকে সহকর্ম্মী করিয়া তোলেন। শিষ্যও পরিণামে আচার্য্যত্ব লাভ করে এবং শিষ্য সংগ্রহ করে; কিন্তু সে একপথেই চলে, এবং একই পদ্ধতিদ্বারাই চালিত হয়। ইহা যেন তাহার সংস্কারে পরিণত হয়। কাজেই পূর্ব্বপদ্ধতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছাই হয় না। তাহার শিল্প-প্রতিভার বিশেষত্ব ও শক্তি ক্রমশঃ তাহাকে এমনি সুন্দরতর দৃষ্টির উপযুক্ত করিয়া তোলে যে, সে হয়ত তাহার আচার্য্যকেও পরাস্ত করে—কিন্তু উভয়ের মাঝে যে বন্ধন ছিল, আদর্শগত ঐক্য ছিল, তাহা ছিন্ন করিয়া নহে।"

আদর্শের এই আনুগত্য চিত্রেও ভাস্কর্য্য বিস্ময়জনক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। একক শিল্পাচার্য্য বৃহত্তম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া শিষ্যগণকে তাহারই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করে, সে রচনা দেখিলে বোধ হয় তাহা যেন একই হাতের! স্থাপত্যে ইহার দৃষ্টান্ত সুলভ। গ্রীসের পার্থিনন,ফ্লোরেন্সের ক্যাম্পানাইল—অনেক শিল্পীর সমবায় প্রয়োজন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

ইহার অর্থ,—শিল্পাচার্য্য তাহার চারিদিকে শিষ্যগণকে আশ্চর্য্যরূপে অনুপ্রাণিত করিয়া, সেই সংহত শিল্পীচক্রকে কতকটা জীবধর্ম্মিত্ব দান করে।

এইরূপে পৌর্ব্বাচার্য্য রক্ষা করিয়া, অতীতের গুপ্ত শিল্প-রহস্যের বার্ত্তা এবং নানা গূঢ়-প্রণালী ও সঙ্কেত শিল্পাচার্য্য প্রিয়তম শিষ্যগণকে জানাইতেন।

যেখানে অতীতে ও বর্ত্তমানে এইরূপ জাগ্রত জীবন্ত সম্বন্ধ নাই, সেখানে কেতাবে পড়া বিদ্যা ব্যর্থতা আহরণ করিয়া নিবিড় হাস্য সৃজন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

প্রাচীন শিল্পিগণ ফ্রেস্কোচিত্র বড়ই পছন্দ করিত,—উদ্বাহ্য কলা—অর্থাৎ যাহা স্থানান্তরিত করা সম্ভব—তাহাদের ততটা প্রিয় ছিল না। এজন্য তাহাদের শ্রেষ্ঠতম কার্য ফ্রেস্কোচিত্রেই দেখা যায়। রাফ্যালের প্রধান কার্য্য ভ্যাটিক্যানের প্রকোষ্ঠের দেওয়াল চিত্রণে—তাহার কার্টুনগুলিও পর্দ্দার জন্য রচিত হয়। করেগিও পার্ম্মানগরীতে দুইটী গির্জ্জাগম্বুজ রচনায় তাঁহার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা দেখাইয়াছে। মাইক্যাল এঞ্জিলো পোপের নিজস্ব একটা চ্যাপেলের ছাদে তাহার ক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছে। টিন্‌টোরেট্ ভিনিস্ নগরীর একটী দাতব্যসমাজ-গৃহের দেওয়াল এবং ছাদ অঙ্কনে এবং টিশিয়ান ও পল ভিরোনিজ ভিনিসের ইটের দেওয়াল ও প্লাষ্টারে প্রতিভার চরম প্রমাণ দিয়াছে।

এ যুগের শিল্পিগণের এজন্য বড়ই প্রলোভন হইল। বিখ্যাত সার এডওয়ার্ড বার্ণ-জোন্‌স, রসেটি প্রভৃতি ইংলণ্ডের করতালি দ্বারা পুষ্ট হইয়া খেয়াল করিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটা স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিতেই হইবে। বিজ্ঞানের বল, ধনবল, প্রভৃতি দ্বারা উচ্ছ্বসিত হইয়া অক্সফোর্ড ইউনিয়ানের দেওয়ালে ফ্রেস্কোরচনা সুরু করিল।

দেখা গেল, কার্য্যটী শেষ হইবার পূর্ব্বেই

দেওয়াল হইতে ছবিগুলি গলিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

শিল্পের অনেক গূঢ় তথ্য আছে। তাহা আচার্য্যের পদতলে বসিয়া গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বাঞ্চলে এখনও অনেক রহস্য বংশনিষ্ঠ জ্ঞানবন্ধ হইতে মুক্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক জাপানে এখনও চীনদেশ হইতে প্রাচীন রঙ ক্রয় করে।

শিল্পাদর্শের ঐক্য অব্যাহত রাখার জন্য শিল্প-প্রয়াসের দিন অতীত হইয়াছে। ভাস্কর্য্যে ক্যানেভা যে শিল্পচেষ্টাকে জন্মদান করে—প্রাচীন প্রণালীর সহিত একটু সম্বন্ধ রাখার তাহাই একরকম শেষ চেষ্টা—অন্যান্যেরা মিশ্র পদ্ধতির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। থর-ওয়াল্ডসেন ফ্লাক্সম্যান প্রভৃতির মাঝে সেইরূপ একাগ্রতা নাই। ইংরাজী সমসাময়িক শিল্পী-দের মাঝে ওয়েষ্টমেকট, বেইলি প্রভৃতি সম্প্রতি পছন্দ হইতেছে না।

জর্ম্মণীতে হার্ডার, লেসিঙ ও গ্রেটের "বাটিকা ও চাপ" পদ্ধতিকে উল্টাইতে রোমান্তিক পদ্ধতির বেশী দিন প্রয়োজন হয় নাই। ক্লাসিক-যুগের দস্তরী সাহিত্য অতিক্রম করিয়া তাহা মধ্যযুগের স্বপ্ন ও রহস্যবাদিতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এইযুগে সংস্কৃতের চর্চ্চা এবং পারস্য-কবিদের মিষ্টিসিজম্ ইউরোপের চিত্তকে অভিভূত করে। তেমনি ফরাসী-ভূমিতে হিউগো প্রভৃতির রোমান্তিক পদ্ধতি কিছুকাল চলিতে থাকে।

কিন্তু প্রাকৃতবাদী, প্রত্যক্ষের পক্ষপাতী ইউরোপে রোমান্তিকের রহস্যবাদিতা বেশী-কাল টেঁকে নাই। পরিণত আধুনিক আর্টে নূতন দৃশ্য দেখা যাইতেছে।

আধুনিক আর্টে রহস্য নাই, মিষ্টিসিজম্ অলৌকিত, ইন্দ্রজাল বা বুজরুকির চালও অসম্ভব। হয়ত দেহের, না হয় মনের এনাটমি লইয়া আধুনিক শিল্পিগণ ব্যস্ত। কোন সঙ্কোচ নাই—আব্রু নাই, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত—শালীনতার অপেক্ষাও নাই, কারণ প্রত্যক্ষবাদীর ধর্ম্মই ছন্দে—অপবিত্র বা অসুন্দর প্রকৃতির কোথাও কিছু নাই।

সুন্দরকে রচনা নহে, রচনার সৌন্দর্য্যই গণ্য এবং এই সৌন্দর্য্য আধুনিকগনের মতে প্রতিলিপির অনুকরণে সফলতা। লেসিঙের মতে গ্রীক আর্টের উদ্দেশ্য ঠিক বিপরীতই ছিল।*

সেকালে আশ্চর্য্য অদ্ভুত পৌরাণিক সাহিত্য হইতে নাটকের বিষয় আহৃত হইত। গ্রীক, ইতালী, স্পেনীয়, এবং নানাদেশের মিথলজি নানা বিচিত্র আখ্যানে কাব্য ও চিত্রভাণ্ডার পূর্ণ হইত,—এখন তাহা সম্ভব হয় না।

কারণ, এ যুগে 'বিশ্বাস' নামক ব্যাপারটী নাই। পাঠকগণ কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাটী বৈজ্ঞানিক চোখে দেখে। "মোটিভ" এখন সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মভাবে ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যের মাঝে যুক্তিসম্মত কার্য্যকারণের প্রত্যাশা করে। সন্ন্যাসীর মন্ত্র, যাদুকরের ভৌজিবীজির দোহাই দিয়া কোন নাটকীয় প্লট হইতে মুক্তি পাও-য়ার যো নাই। বৈজ্ঞানিক যুগে উপায়ান্তর নাই।

দ্বিতীয়তঃ এই কলকারখানার যুগে প্রেমের, ক্রোধের বা জিঘাংসার ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড কেহ প্রত্যাশা করে না। (motive) মোটিভে সেকালে মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক যুগে একটা খণ্ড কবিতারও উপাদান হয় না। এ সময়ে মলয় মারুৎ, প্রমোদ বন, বাসন্ত জ্যোৎস্না, লক্ষ্য করিবার

* Laocoon.

অবকাশ কাহারও নাই—লক্ষ্য করিলেও তাহা অযুক্তি কিম্বা কৃত্রিম ভাবুকতা ফলান হয়, কাজেই হাস্যের উদ্রেক হয়। চারিদিকে এই সমস্ত লোককে আবহাওয়ার ঐশ্বর্য্যে কেহ ব্যক্তিজীবনকে চালিত করে না। হ্যামলেট নামক একটা চরিত্রের সম্ভাবনা এযুগে নাই, এবং এই নাটকখানির প্রতি পৃষ্ঠার মোটিভই „আধুনিক আর্ট অপ্রচুর ও অসম্ভব মনে করিবে। "ভূতযোনি", পরী, ও দেবতার আশীষ, 'ধর্ম্মের গদবাঁধা জয়'—এ সব এ যুগে চোখে ধূলি দিতে পারে না। —এই সমস্তের দোহাই মোটিভ হিসাবে অগণ্য ও অপ্রচুর।

বস্তুতঃ যুগের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান সময়ে ওথেলো, মেক্‌বেত্‌, ফষ্ট বা ম্যানফ্রেডে্‌র মত লোক পাওয়া গেলে তাহাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া কোন প্রদর্শনীতে দেখাইয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করা যাইত।

আর্টের সেকেলে প্রায় সমস্ত আজগবি মোটিভই অন্তর্হিত হইয়াছে। সোণার কাঠি, রূপার কাঠির ইন্দ্রজাল, প্রবল বৈরনির্য্যাতন, পরিমাণহীন ক্রোধ, কাল্পনিক অপমানে অভিশাপের বাড়াবাড়ি, ইত্যাদি প্রয়োগে এখন নাট্যের স্ক্রীং ঘোরে না।

অদৃষ্ট কেহ বিশ্বাস করে না, জন্মান্তরের ফলভোগ--ইউরোপে তাহা ত মোটিভই নহে।

প্রেম, ঈর্ষা, হিংসা, দয়া-দাক্ষিণ্য সব কিছুই বর্ত্তমান-যুগের কর্ম্মপ্রবাহে কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রিত ও প্রবর্ত্তিত করিতেছে। কিন্তু এই সমস্তের সেকেলে আবরণ নাই, সেকেলে ভঙ্গী, পরিণতি, প্রসার কিম্বা সজ্জা একালে নাই। এই সমস্ত বৃত্তি এখন নূতন পরিচ্ছদে, নূতন আয়ুধে সজ্জিত—পুরাণ অস্ত্রশাস্ত্রে আমাদিগকে আঘাত দেয় না। মরিস্ মিতরলিঙ্ক বলেন ঃ—"সম্প্রতি অতি কদাচিৎ উচ্চক্রন্দন শোনা যায়, রক্তপাতও দুর্লভ, অবিরল অশ্রুপাতও লক্ষ্য করা যায় না। এ যুগে কোন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে হয়ত কোন টেবিলের চারিদিকে চিম্‌নীর অগ্নিকুণ্ডের সমীপে লোকের সুখদুঃখের পরিমাপ হয়। যেখানেই থাকি না কেন, আমরা নিজেই কষ্ট অনুভব করি কিম্বা পরকেই কষ্ট দিই, আমাদের গৃহকোণেই আমরা ভালবাসিয়া মরি ও বাঁচি।"

এ যুগের ট্রাজিডি পরাক্রান্ত সম্রাট, ভীষণ দস্যু, রক্তাক্ত সমর, কিম্বা সতীত্বের অসম্ভব সংগ্রাম, দানের অসম্ভব আজগবিত্ব, কিম্বা অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ ও দেবস্তবের বা ঈশ্বরোপাসনার প্রাচুর্য্য লইয়া হয় না।

এ যুগের ট্রাজিডির ক্ষেত্র অবজ্ঞাত কুটীর কোণ কত মৌন তপস্যা ও ত্যাগের দ্বারা তাহা শিহরিত। অবজ্ঞাত দারিদ্র্যের মৌন আর্ত্তনাদ, নিবিড় সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্ন, যাহা ষ্টীম রোলারের ন্যায় লক্ষ হৃদয়কে নিষ্পেষিত করিতেছে, অথচ যাহা মৌন, ঘটনার বাহুল্য নাই, অট্টকোলাহল নাই, চন্দ্রালোকিত রজনী, ভীষণ অরণ্য বা কল্লোলিত তটিনী নাই! আছে হয়ত বিস্মৃত রাস্তার কর্দ্দমাক্ত ফুটপাত, ঘন জনতাপূর্ণ কোণ কিম্বা গলির ধারের গৃহের শয্যাপ্রান্তে অশ্রুধারা, ন্যায়ের কঠিন প্রাসাদ-শ্রেণীর প্রতি রন্ধ্রে, অব্যক্ত দীর্ঘশ্বাস, অর্থনীতির প্রবল যন্ত্রণা, শ্রমের নিঃশব্দ, দুর্লক্ষ্য হস্ত, পীড়া, বিপণি, পুয়র-হাউস প্রভৃতির কন্দরে নিষ্ঠুর ঋণের ভার বা উপার্জ্জনহীন বার্দ্ধক্যের রেখাঙ্কিত চিন্তামগ্ন ললাট। অপরদিকে গূঢ়-সামাজিক প্রশ্নসমূহ যাঁতার ন্যায় ব্যক্তিহৃদয় চূর্ণ করিতে প্রয়াসী—অবিশ্বাসী স্বামী কিম্বা স্ত্রী কর্মা

কিনা? বিবাহ প্রেম-মূলক হওয়া ভাল, না অর্থমূলক? পুত্রের প্রেমের ক্ষেত্রে পিতামাতার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা? ইত্যাদি অসংখ্য জটিলতার মাঝ দিয়া আধুনিক চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। ইহাদেরই ফলে গৃহে গৃহে কত হৃদয়-বিদারক নিঃশব্দ ট্র্যাজিডি হইতেছে, ইয়ত্তা নাই।

এই সমস্ত লইয়া যে নাটক লিখিত হয়, ইউরোপে তাহার নাম সমস্যা-নাট্য বা problem play.

য়্যালেক্জেণ্ডার ডুমাস্ ইহার প্রবর্ত্তক। ক্রমশঃ ইহা Bjornson এবং Ibsen প্রভৃতিতে পক্ক পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইবসেনকে লইয়া কিছুকাল ত হৈ হৈ রব ছুটিয়াছিল। এইদলের থাকে মিতরলিঙ্কের আদরও প্রচুর।

সামাজিক জীবনের নানা প্রশ্নদ্বারা আন্দোলিত নরনারীর চিত্ত ইহারা দয়াহীন ভাবে নগ্ন ও বিশ্লেষণ করিয়াছে। এই সমস্ত ট্র্যাজিডি দুর্ব্বহ মৃত্যুচিত্র হইতেও যন্ত্রণাময় পীড়া দেয়। এজন্য ইহাদের আবির্ভাবে নাট্যমঞ্চে অসম্ভব বা অলীক যুদ্ধের অভিনয় বা কাল্পনিক বিষপ্রয়োগে কুশীলবগণকে স্তুপাকার করার প্রয়োজন হয় নাই।

প্রাকৃতবাদীর দিক হইতে নাটক বা উপন্যাসের শেষ দিকটা সকলের মনের মতন হওয়া সম্বন্ধে প্রশ্নই উঠে না। এই সমস্ত সাহিত্যে প্রধান লক্ষ্য মোটিভের সূক্ষ্মবিচার এবং তদ্দ্বারা ঘটনা পরম্পরার পৌর্ব্বাচর্য্য সম্বন্ধে স্বাভাবিকতা; ঘটনা যেখানে যাহাকে উপস্থিত করে, তাহার উপর কাহারও হাত নাই। রাজা কিম্বা রাণীর গল্পের শেষে সুখে রাজত্ব করা—কিম্বা যে চরিত্রের প্রতি পাঠক অনুরক্ত, তাহার একটা সুপ্রতিষ্ঠা হওয়া এসব লক্ষ্যই নহে।

শিল্পীর কর্ত্তব্য সমাজকে বিশ্লেষণ মাত্র, কাহারও কোন যুক্তিতে চরিতার্থ করিবার জন্য সে নহে। সে বহু পরিমাণে নির্ব্বিকার—পরিণতি সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র ব্যগ্র নহে। নাটক সম্বন্ধে এশ্রেণীর কোন লেখক বলেনঃ—"The authors would present the spectator with a fragment of life which would force no conclusion upon him at the termination of the play."

এ যুগের কোন শেষ পরিণতি নাই। রোমান্টিক পার্শেসিয়্যান্ (Parnassian) ডিক্যায়েট্যাণের (Decadents) কলহ এবং সঙ্ঘর্ষও ক্রমশঃ পুরাতন হইয়া উঠিতেছে—এবং নূতন একটা মিশ্র পদ্ধতি ফরাসী ভূমিতে যোগাড় হইয়া উঠিতেছে।

চিত্রকলারও এইরূপ অসংখ্য সংগ্রাম দেখা যায় এবং ইহাদের পরিণতিও অপরিস্ফুট। ফ্লেমিশ স্কুলের রুবেনস্ (Rubens) ভ্যানডিক এবং ডচ্ স্কুলের রেম্ব্রান্ট্, হবিমা প্রভৃতি সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে স্বভাব-বাদিতা সুরু করিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ সমস্ত পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়াছে। আধুনিক আর্টিষ্টগণ একেবারে স্বাধীন—গলিত ক্ষতদেহ অঙ্কণে সফলতা কিম্বা ভগ্নদেহ চিত্রণে প্রতিভা যুগপৎ প্রশংসা অর্জ্জন করে। কলাক্ষেত্রে কাহারও কোন সঙ্কোচ নাই।

চিত্ররাজ্যে আধুনিক যুগে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা Impressionist school বা প্রত্যয়-পন্থী পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা। ইহার বাঙ্গালা একটা টেক্নিক্যাল শব্দ সৃজন কর্ম্মসাধ্য, সন্দেহ নাই। ইহাও একহিসাবের রিয়্যা-

লিজম। আমরা চোখে দূরের বা নিকটের জিনিষের অনুপরমাণু দেখি না--মোটামুটি বর্ণের স্তর ও সমুচ্চয় আমাদের চোখে পড়ে,—সমস্তটার সম্পর্কেই অংশ চোখে পড়ে। তবে কেন শিল্পীরা খুঁটিনাটী আঁকিতে যায়? ইংলণ্ডে বিখ্যাত Whistler এ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান হন। এই প্রসঙ্গে ফরাসী মুক্তবায়ু পদ্ধতিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই সমস্ত আয়োজন সত্বেও চিত্ত হয়রান্ হইয়াছে।

কাজেই নূতনত্বের অবিশ্রান্ত ফরমায়েস একটা মিশ্রণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। এ সমস্ত মিশ্র-চিত্রের মাঝে কোন সুসংযত কলাধর্ম্ম নাই এবং কোন সুনিবদ্ধ মৎলবও দুর্লভ।

সিম্বলিজম্, মিষ্টিসিজম, ভোগবৃত্তি প্রভৃতির এক অদ্ভুত খিচুড়ী হইতেছে। এদেশের লোকের পরিচিত ইংলণ্ডের Rosseti, Burnes, Jones, Watts, Aleva Tadena, Albert Moore প্রভৃতির থাকে এই মিশ্রণের বাড়াবাড়িই খুব বেশী। ভ্রমরের ন্যায় ইহারা নানাফুল হইতে মধুসঞ্চয় করিতেছে। আধুনিক যুগেরই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন Landseerএর জন্তুগাত্র, Stanfield ও Turnerএর সমুদ্র চিত্র, Calcott প্রভৃতির ভূমিচিত্র (আমি শুধু ইংলণ্ডের কথাই বলিতেছি, যদিও তাহা এইক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ) প্রভৃতি এরূপ আর চিত্তবিনোদন করে না।

এখন মিশর, ভারত, জাপান, প্রাচ্যের নানাভঙ্গী ইউরোপের চিত্রশিল্পে নিহিত হইয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে।

ইউরোপের আধুনিক আর্ট দেখিয়া ইহার পরিণতি কোথায়, বলা কঠিন। বিশিষ্টতা ক্রমশঃ বৈচিত্র্যে পরিণত হইয়াছে, নূতনত্বের নেশায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। নূতনত্বের নেশাও ক্রমশঃ কাপড় চোপড়ের ফ্যাসানের ধর্ম্মলাভ করিয়াছে। অহরহ পরিবর্ত্তন চাই। বিখ্যাত সমালোচক এনড্রু ল্যাঙ্ (Andrew Laing) সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলেন, চিত্র সম্বন্ধেও তাহা খাটে;—"The next century—nay next year or month is the waste paper basket of our fine new theories ...... our new poets last about three months......meanwhile we must endure constant exhibitions of crude and onesided experiment, symbolism, adventures in odd motives, tales without beginning end or interest, uncouth attempts at phonetic reproduction of rude dialects mincing emphasis, miscalled style ....of novelty of method, contortions not convulsions produce work which is good."

কথাটী এদেশের লোকের চোখে পড়া ভাল।

শ্রীযামিনী কান্ত সেন।

স্বপ্নতত্ত্ব।

বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে স্বপ্নতত্ত্বের অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্য বিশ্বস্ত ও সত্য স্বপ্ন-ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ ও আলোচনা এবং বিবিধরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা, এই দুই উপায়ই অবলম্বন করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ঘুমন্ত মানুষের উপর করা যায়। যেমন, ঘুমন্ত অবস্থায় একজনের অঙ্গস্পর্শ করা গেল এবং জাগিয়া উঠিলে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে, জিজ্ঞাসা করা হইল। অনেক সময় ঘুমন্ত ব্যক্তি কোনই স্বপ্ন দেখে নাই। এবং পরীক্ষার কোন ফল হয় নাই। কিন্তু অনেকস্থলে আবার ঘুমন্তব্যক্তি স্বপ্ন দেখার কথা বলিয়াছে। নিম্নে এইরূপ পরীক্ষার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

একজন ঘুমন্ত মানুষকে তাহার ঘাড়ের পশ্চাতদিক স্পর্শ করিয়া জাগানো হইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ? সে উত্তরে বলিল, "আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে আমি খুন করিয়াছি এবং তজ্জন্য বিচারালয়ে নীত হইয়াছি। আমি ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা, জুরিকে জজের পরামর্শদান, সমস্ত শুনিয়াছি! তারপর জুরির রায়ের জন্য অপেক্ষা করিয়াছি। আমাকে জুরিরা দোষী সাব্যস্ত করিল; তারপর আমাকে জেলখানার অপরাধীদের ঘরে লইয়া গেল। সেখানে আমি কয়েকদিন থাকিলাম। তার পর আমাকে বধ্যস্থানে লওয়া হইল এবং যখন গিলোটাইনের (Guillotine) খড়্গ আমার উপর পড়িল, তখন আমার ঘাড়ে স্পর্শ অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম।

রিচার্স নামে একজন জর্ম্মণ-লেখক একটী স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন। একজন মানুষকে বন্দুকের শব্দ করিয়া জাগানো গেল। তারপর জাগিয়া উঠিলে স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল যে, সে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। তারপর সৈন্যদল ত্যাগ করে; ফলে তাহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। তারপর সে ধৃত হয় এবং কোর্টে তাহার বিচার হয়। বিচারে তাহাকে গুলি করা হয় এবং সেই গুলির শব্দে সে জাগিয়া উঠে।

স্ট্রেন্স নামক একজন জর্ম্মণ-লেখক বলিয়াছেন যে, একদিন বাল্যকালে তিনি তাঁহার ভাইয়ের সঙ্গে একত্র শুইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি একটী ভীষণ বন্যজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি ভয়ে প্রাণপণে দৌড়াইতেছেন—কিন্তু চীৎকার করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে তিনি একটী সিঁড়ির নিকট পৌঁছিয়া সেই সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু ভয়ে ও দৌড়ানের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উঠিতে না পারিয়া সেই বন্যজন্তুর কবলে পড়িয়া গেলেন। বন্যজন্তুটী তাঁহার উরুদেশে গুরুতররূপে কামড়াইয়া দিল। সেই সময় তিনি চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং দেখিলেন যে, তাঁহার ভাই তাঁহার উরুদেশে চিমটী কাটিতেছে।

যে সমস্ত ঘটনা উপরে বিবৃত করা গেল, সেই গুলিতে স্বপ্নের উত্তেজক কারণ অবশ্য শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি বহির্জ্জগতের ব্যাপার হই-

তেই পাওয়া গেল। কিন্তু শব্দ বা স্পর্শের এবং জাগরণের পূর্ব্বে যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছিল, সেগুলির কিরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যগুলি কিরূপে এত বিচিত্র ও দীর্ঘ ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়া শব্দ বা স্পর্শানুভূতির ব্যাখ্যারূপে প্রতীয়মান হইল? আর কিরূপেই বা স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যগুলি শব্দ বা স্পর্শানুভূতির পরে ঘটিয়াও পূর্ব্বে সংঘটিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে? শরীরের কোন স্থান হইতে কোন অনুভূতি স্নায়ুপথ দ্বারা কতক্ষণ মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা রীতিমত হিসাব করিয়া ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু যে সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল, সেই সব স্থানে আমরা দেখিতে পাই যে, শরীরের বহিরিন্দ্রিয়ে শব্দ বা স্পর্শের অনুভূতির সূচনা এবং মস্তিষ্কে সেই শব্দ বা স্পর্শের জ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে অতি অল্পসময় থাকে। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলি ঘটনা স্বপ্নে অনুভব করা যায়। সুতরাং স্বপ্নকালে আমাদের জড়জগতের জ্ঞান যে শুধু স্নায়ুপথে চৈতন্যে (১) উপনীত হয়, তাহা নহে। স্নায়ুমণ্ডলীর পথ ব্যতীতও অন্য নূতন পথে বহির্জগতের জ্ঞান হইতে পারে। এই নূতন পথে বহির্জগতের যে অনুভূতি হয়, স্নায়ুমণ্ডলীর পথ অপেক্ষা তাহা অল্পসময়ে হইয়া থাকে। এই অনুমানটী মনে রাখিলে আমরা উল্লিখিত স্বপ্নদৃষ্ট-ঘটনাবলীর কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব,—কিরূপে শব্দ ও স্পর্শের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছানের পূর্ব্বেই স্বপ্ন-চেতনার বিবিধ ঘটনাবলীর সৃষ্টি হইয়া গেল, তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে। এই স্থলে জড়শরীর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ একটী মনঃক্লেশের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, স্বপ্নে যে সমস্ত বিচিত্র ঘটনাবলী আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা ঐ স্বতন্ত্র ক্রিয়া। এই মনঃকোষেরই সম্পূর্ণরূপে জড়তা-বর্জ্জিত মনঃকোষ নহে। ইহারও একপ্রকার নিজস্ব সূক্ষ্ম জড়ত্ব আছে। স্বপ্নে যেরূপ জড়-শরীর নিরপেক্ষ অনুভূতির কথা বলা গেল, সেইরূপ অনুভূতি কোন কোন মানসিক ব্যক্তি এবং সম্মোহিত অবস্থাতেও (১) চিকিৎসকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন। হিষ্টিরিয়ার অবস্থায় কোন কোন রোগীর কিয়ৎপরিমাণে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। সেই অবস্থায় স্বর্ণ বা চুম্বক রোগীর নিকটে আনিলে চক্ষু কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও তাহার অস্তিত্ব রোগী বুঝিতে পারে।

স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্যশক্তির এরূপ কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়, যাহাতে ইহাকে জাগ্রতাবস্থার চৈতন্যশক্তি হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে। জাগ্রতাবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থাতেই মন জড়শরীর হইতে অধিকতর স্বতন্ত্র থাকে, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাতেই মন যেন অধিক পরিমাণে জড়শরীরের সংস্পর্শ রহিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় নানারূপ ভাব ও ঘটনার চিত্র এরূপ দ্রুতভাবে আমাদের মনের উপর দিয়া চলিয়া যায় যে, জাগ্রতাবস্থায় আমরা তাহার কল্পনাই করিতে পারি না। স্থান, কাল প্রভৃতি চিন্তাশক্তির সাধারণ অবলম্বনগুলিও (২) স্বপ্নে অনেক সময় লোপ পায়। অথচ জাগ্রতাবস্থায় ঘটনা ও দৃশ্যাবলী হইতে স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দৃশ্যাদি বেশী সত্য ও প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। এখানে

(১) consciousness.

(১) Hypnotised state.

(২) Forms of thought.

স্বপ্নাবস্থার আর একটী বিশেষত্ব বিশেষরূপে চিন্তনীয়। স্বপ্নে যে সমস্ত ঘটনা দেখা যায়, তাহার মধ্যে স্বপ্নাবিষ্ট লোক সর্ব্বদাই যেন একজন প্রধান কর্ম্মী হইয়া রহিয়াছেন। জাগ্রতাবস্থায় আমরা নানারূপে ভাবের উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় কোন ভাবের উপলব্ধি হইলে সেই ভাবের কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরা অনুভূত হয়; এবং স্বপ্নদর্শক নিজে যেন তাহার মধ্যে একটী কর্ম্মী হইয়া উঠে। এইরূপ অভিনয়ের ভিতর দিয়াই সেইভাবের বিকাশ হয়। জাগ্রতাবস্থায় চিন্তা কিম্বা বিচার দ্বারা ভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্ন চেতনার এইরূপ উপায়ে ভাবের উপলব্ধি অতীব বিরল। স্বপ্নাবস্থায় এই অভিনয় ব্যাপারের সহিত জীব বিজ্ঞানে যাহাকে অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া (১) বলা হইয়াছে, তাহার অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। দেহের প্রতিঘাত-ক্রিয়া অনেকটা এইরূপ। মনে করুন, আপনি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। রাস্তার যে অপর লোকজন, গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে, আপনি এত চিন্তামগ্ন যে সে বিষয়ে আপনার আদৌ লক্ষ্য নাই। হঠাৎ এরূপ সময়ে আপনার নিকট একখানা গাড়ী আসিল। আপনি তৎক্ষণাৎ অপর পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। এরূপ স্থলে মনে যে চিন্তা করিয়া কোন কার্য্য করিলেন, তাহা নাও হইতে পারে। চক্ষুর উপরে বাহির হইতে একটী গতিশীল শকটের যে ছায়া পড়িল, তাহাতেই পদের গতি যেন স্বতঃই অন্যদিকে ফিরিয়া গেল। ইহা সকল সময়ে বিচারশক্তির ফল নহে; সম্পূর্ণরূপে দেহ যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াতেই হইতে পারে। আবার মনে করুন, আপনি অর্দ্ধ-সুপ্ত অবস্থায় শুইয়া আছেন। এরূপ সময়ে একটী মশা আপনার এক হাতে কামড়াইয়া দিল। যদিও আপনি ব্যাপারটী ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, তবুও একটু যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। এই যন্ত্রণানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে অপর হাতটী দষ্ট স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল। এই সবগুলিকেও দেহের এক প্রকার অভিনয় ব্যাপার বলা যাইতে পারে। দেহ একরূপ অভিনয় ব্যাপার করিয়া যেন একটা ভাবের বিকাশ করিতেছে। এই ভাবের বিকাশে মনের কোনও যোগ নাও থাকিতে পারে, স্থূল দেহের মত, যদি আমরা জড়ভাবের ছায়াযুক্ত একটী সূক্ষ্মদেহ অনুমান করিয়া লই, তবে সাদৃশ্য ধর্ম্মানুসারে (১) তাহাতেও এইরূপ অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া (২) হইতে পারে, এরূপ আমরা মনে করিতে পারি। এমার্সন বলিয়াছেন, "Nature is self-similar" অর্থাৎ প্রকৃতির নিম্নস্তরে যাহা ঘটিতেছে, উচ্চস্তরেও তাহার অনুরূপ কোন ঘটনার বিকাশ অবশ্য হইবে। সেইজন্য ঐ শরীরেরও কোনরূপ অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া আছে, সাদৃশ্য ধর্ম্মানুসারে আমরা এইরূপ আশা করিতে পারি। স্বপ্নের এই অভিনয় ব্যাপারকে যদি আমরা সূক্ষ্ম শরীরের অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া রূপে বুঝি, তাহা হইলে এই ব্যাপারটী অনেক পরিমাণে বিশদ হইয়া যায়। প্রসিদ্ধ Encyclopædia Britannica নামক গ্রন্থে স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের আলোচনায় বলা হইয়াছে—"অধ্যাত্মবাদী ও জড়বাদী, এই দুই মতবাদের মধ্যে আর একটী বৈজ্ঞানিক মত আছে। এই মতানুসারে শারীরিক ও

(১) Reflex action.

(১) Law of Analogy (২) Reflex action.

মানসিক জগত সম্পূর্ণ পৃথক। অথচ দুইয়ের মধ্যে এমন একটী সংযোগ আছে যে, মানসিক ঘটনা শারীরিক ঘটনার উপর নির্ভর করে বলিয়া বোধ হয়।" *

মায়ার্স তাঁহার Human Personality নামক গ্রন্থে স্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"আমি ধরিয়া লইয়াছি যে, মানুষ দেহ ও আত্মার সংযোগের ফল। এই মত গ্রহণ করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, আমরা এক সময়ে দুই প্রকার জগতে বাস করিতেছি। একটী পার্থিব জীবন, এই জড়দেহের মধ্যে, অপরটী অধ্যাত্মজীবন—সেটী আত্মার স্বাভাবিক আবাসভূমি, আধ্যাত্মিক-জগতে। সেই অধ্যাত্ম-জগত হইতে অবিরত আমাদের জীবদেহে শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। কিরূপে এই শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাহা যে কতক পরিমাণে জীববস্তুর সংসৃষ্ট কার্য্য—একদিকে জীববস্তু(১) ও ব্যোম (২), অন্যদিকে ব্যোমের অতীত সেই অজ্ঞাতবিষয়, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের ফল এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। † যে মতের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, উপরোক্ত মতগুলি তাহার অনুরূপ। জড়-শরীরে ক্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটী মনঃকোষ আছে এবং সেই মনঃকোষের সহিতও একপ্রকার জড়ভাবের সংশ্রব আছে, ইহাই আমাদের মত। এই জড়ভাবকেই আমরা সূক্ষ্মশরীর আখ্যা দিয়াছি। আমার বিবেচনায়, মৎব্যাখ্যাত মত উপরের উদ্ধৃত অন্যান্য মত অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। কারণ এই মত অনুসরণ করিলে স্বপ্নাবস্থাকে দার্শনিক ব্যাপার হইতে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মধ্যে আনা যায়। অধিকন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রবিদেরা মানসিক ব্যাধি ও বিকারাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত অনুসন্ধান করিয়াছেন, সেই গুলির ফলে এই মত কালে মনোবিজ্ঞানের একটী পরীক্ষিত সত্যের মধ্যে দাঁড়াইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরসীলাল সরকার।

---

* Midway between the spiritualist and materialist hypothesis is the scientific view in its narrower sense, namely, the doctrine that the mental and the bodily are perfect dissimilar regions of phenomena, which are yet connected in such a way that bodily events appear as condition of mental events.

(1) Protoplasm (2) Ether.

† "I have assumed that man is an organism informed or possessed by a soul. This view obviously involves the hypothesis that we are living a life in two worlds at once; a planetary life in these material world, to which the organism is intended to reach; and also a cosmic life in that spiritual or mateerial world which is the native element of the soul. From that unseen world, the energy of the organism needs to be perpetually replenished That replenishment we cannot understand; we may figure it to ourselves as a protoplasmic process;—as some relation between protoplasm, ether and whatever is beyond ether, on which it is at present useless to speculate."

ভূতের কথা।

আমরা ভূত,—বহুবচনটা সম্পাদকীয় নহে, গৌরবের অর্থেও নহে; আমরা বহু আত্মা এপারে আসিয়া একসঙ্গে প্রায় মিশিয়া যাই বলিয়াই এই বহুবচন। সে কথা পাঠকেরা পরে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ভূত, সেকালে মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রের বাহুল্যের পূর্ব্বে, স্ত্রীজাতির ঘাড়ে চাপিয়া, নাকি-সুরে কথা কহিয়া, খাসা আসর জমকাইতাম। এখনও যে ছাপা পত্রিকাগুলি, স্ত্রীলোক অপেক্ষা মানুষের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে, তাহা নহে। তবে অন্তঃপুরচারিণীর গতিবিধি পত্রিকা পরিভ্রমণের মত অবাধ নহে বলিয়া, একালে সম্পাদকদিগের স্কন্ধই আমাদের আবির্ভাবের সুপ্রশস্ত আসর। বৃষস্কন্ধ সম্পাদকেরা ক্ষুণ্ণ হইবেন না; তাঁহাদের ঘাড়ে যে সকল জীবিত লেখক আত্মকর্ম্মক্ষম-দেহের ভার চাপাইয়া থাকেন, এবং যে সকল ব্যাড়োরঙ্ক বাকীদার পাঠক ভর করিয়া থাকেন, আমাদের অশরীরী আত্মা তাহা অপেক্ষা ওজনে লঘু। অন্যদিকে আবার আমাদের অজীবিত জীবন-কাহিনী অতি মধুর। একে লঘু, তাহে মধুর; কাজেই এই ভূতের কথা বৈদ্যশাস্ত্রমতে নিশ্চয়ই সুপথ্য হইবে।

ইতিহাস শুনাইবার পূর্ব্বে আমাদের নাম কি, তাহা বলা আবশ্যক। আমরা জড়শরীর ফেলিয়া দিয়া তোমাদের চক্ষে অদৃশ্য হই বলিয়া, তোমরা প্রাচীনকালে আমাদিগকে "ইহলোক হইতে গত" অর্থে "প্রেত" নাম দিয়াছিলে। ধাতুর অর্থ বদলায় নাই, কিন্তু তোমাদের ধাতু এমনি বিগড়াইয়াছে যে, প্রেত অর্থে একটা ঘৃণ্য পদার্থ বুঝিয়া থাক। তোমরা কোন্ ধর্ম্মমতে এবং কি সাহসে আমাদিগকে গণ-বর্গের ভূত সংজ্ঞাটা দিয়াছ, তাহা জানি না। অন্যদিকে আবার আমরা জীবিত না হইলেও অতীত নহি; বরং এখন আজকালির প্রভেদ বুঝিতে পারি না, ইহলোক পরলোকের প্রভেদকে ধাঁধা বলিয়া বুঝিয়াছি। তবু আমাদিগকে ভূত বা অতীত বলিবে কেন?

এই দেখ, যেদিন বিহারীলাল ভাদুড়ী থিয়সফি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ডাইলিউসন প্রয়োগ করিয়া আমার জড়শরীরের উত্তাপটুকু রাখিতে পারিলেন না, দ্বারিক কবিরাজ আমার নাড়ী টিপিয়াই পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া গেলেন এবং ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু আমাকে গতায়ু মনে করিয়া ত্রস্তপদে ও ব্যস্তহস্তে ফিসের টাকা পকেটস্থ করিলেন, তখন সকলেই বলিল, আমি নাই। আমি কিন্তু তখন হোমিওপ্যাথির জল, বৈদ্যের গুলি এবং ডাক্তারের চোঙ্গাকে অগ্রাহ্য করিয়া, শরীরপরিহারের নব অনুভূতি উপভোগ করিতেছিলাম। পৃথিবীতে মাটী নাই, সাগরে জল নাই, আকাশে বায়ু নাই; ব্যোমপথে শূন্যতা নাই, আলোক নাই, অন্ধকার নাই; কেবল আমি বা আমরা আছি। আমরা লক্ষ লক্ষ আত্মা স্বতন্ত্র থাকিয়াও এমন ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া মিলিত হইতে লাগিলাম যে, যদি আমার পা থাকিত, তবে সে পাখানি চুলকাইলে বুঝিতে পারিতাম না যে, কাহার পা চুল্‌কাইতেছি। আমার এই মুখবন্ধ হইতেই

পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি খাঁটি ভূত, মেকি নহি।

কে খাঁটি, কে মেকি, পাঠকেরা তাহা একটু বুঝিয়া লইবেন। যাঁহারা এপারে আসিয়াও তোমাদের ওপারের লেখা অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতেছেন, অথবা মরিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াও হাতড়াইয়া যুক্তি দিয়া পরলোকের কথা বলিতেছেন, অথবা অশরীরী আত্মার জন্য সপ্তমলোক অষ্টমলোকের কল্পনা করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয় জাল, অত্যন্ত মেকি অথবা নিরবচ্ছিন্ন ধাঁধা। এবারে আমাদের প্রশান্ত ভূতের বাক্যে নূতন ধরণের ভূতের উৎপাত দেখিয়া, ভূতকুলের কলঙ্ক নিবারণের জন্য, সম্পাদকের গুরু শরীরে একটু লঘু চাপ দিতেছি।

অনেকেই ভূত দেখার গল্প শুনিয়া থাকেন; সে গল্পগুলি যে মিথ্যা, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝাইয়া দিতে পারি। পৃথিবীতে যাহার শরীরের যেমন চেহারা ছিল, সেই চেহারা লইয়া, সেই পরিচ্ছদ লইয়া, সেই দাড়ি গোঁফ লইয়া, কোন উপায়ে কোন আত্মা কাহাকেও দেখা দিতে পারে না; অথচ ভূতের গল্পে পরিচিত রূপ এবং পরিচিত পরিচ্ছদের কথা উঠে। আত্মাকে অশরীরী বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার তোমরা কেমন করিয়া সে আত্মার অবয়ব দেখিতে পাও, আমরা তাহার কৈফিয়ত চাহিতেছি। তোমরা কি বলিতে চাও যে মানুষের আত্মার মত তাহার পরিচ্ছদেরও আত্মা আছে? যদি না থাকে, তবে আমরা ভেল্কি করিয়া পরিচ্ছদ পড়িয়া দেখা দিব কেন? সমগ্র মানুষের একটা অশরীরী অরূপ আত্মা ছাড়াও কি বাহিরের দেহ আয়তনের একটা স্বতন্ত্র আত্মা আছে? যদি আমরা দাড়ি গোঁফ-যুক্ত সূক্ষ্মশরীর লইয়া থাকিতাম, তাহা হইলে প্রতিদিন যত দাড়িগোঁফ ও চুল কাটা যায়, নিশ্চয়ই তাহাদের আত্মা স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিত? তাহা হইলে এতদিন এই পরলোক অথবা স্বর্গটী "চুলের স্বর্গ" হইয়া উঠিত।

যাঁহারা ভূতের গান শুনিতে পান, স্পর্শ অনুভব করেন, অথবা ভূতের কেশগুচ্ছ দেখিতে পান, নিশ্চয়ই জানিবেন যে, হয় তাহারা শিরোরোগে ভুগিতেছেন, না হয় অতিমাত্রায় আফিম সেবন করেন, না হয় ডাহা মিথ্যাবাদী। যখন একটা কণ্ঠ ছিল এবং আমাদের পরিমিত ভাব কেবল সেই কণ্ঠপথেই বাহির হইত, তখন সঙ্গীত নামে পদার্থটীর সৃষ্টি হইত। এখন মাথা গিয়াছে, মাথার ব্যথাও গিয়াছে, কণ্ঠ গিয়াছে, সঙ্গীতও গিয়াছে। আমাদের এ পারের ভাবের উচ্ছ্বাসে যদি সত্য সত্যই সঙ্গীত উঠিত, তবে তাহা কদাচ শরীর-সঙ্গীত হইতে পারিত না। অর্থাৎ কণ্ঠের যন্ত্র-সাহায্যে যে যে গান যে প্রকার শব্দ করিয়া জাগিয়া উঠে, অথবা স্বর ও কণ্ঠযন্ত্র পরিমিত বলিয়া যে সঙ্গীত একটা ছন্দের তালে তালে কাঁপিয়া উঠে, সেই সঙ্গীত, সঙ্গীতের সে স্বর, সে ছন্দ, সে তাল, কদাপি আমাদের গানে থাকিতেই পারে না। আমাদের ভাবের উচ্ছ্বাস বিশেষকে সঙ্গীত নাম দিলেও সে সঙ্গীত শুনিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। আমাদের বিশেষ অনুরোধ তোমরা মেকি ভূতে বিশ্বাস করিও না। বর্ব্বরের ঘাড়ে বা কৃত্রিম ভূত নামিয়া পল্লীবাসীদিগকে চমকিত করে, থিয়সফির সভাতেও তাহারাই ঐ পোষাক পরিয়া খেলা করে। তাহারা সকলেই জাল, সকলেই মেকি, সকলেই ধাঁধা।

তাহারা ধাঁধা, কিন্তু আমরা নই। কিন্তু হায়, এবারে মরিয়া বাঁচিয়া উঠিয়া ভাবিতেছি

যে, আমরা ধাঁধা হইলাম না কেন? এই অসীম জীবনভার বহন করা দুঃসাধ্য হই উঠিয়াছে। যতদিন জীবিত ছিলাম, ছিলাম ভাল, দুঃখ কষ্ট হইলেই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতাম, একবার মরিলে বাঁচি। তখন মৃত্যুর পারে দুঃখ অবসানের একটা আশা ছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে মরিয়াও সত্য সত্য বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যাহাকে "মরিলে বাঁচি বলে", সে সুখটুকু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

রৌদ্রের সঙ্গে ছায়া নাই, জ্যোৎস্নার কোলে অন্ধকার নাই, দম্‌ফাটা আনন্দের সঙ্গে বুকভরা বিষাদের ভাবনা নাই। এই ছায়াহীন, এই নিশ্চিন্ত অসীম জীবন লইয়া বড় গোলে পড়িয়াছি। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে খ্রীষ্টানদের এঞ্জেলেরা একঘেয়ে সুরে এক অফুরন্ত মহিমা-গাথা বা দেবস্তুতি কতদিন গাহিবে? একদিন রাত্রে ঘুম না হইলেই তোমরা ছট্‌ফট কর, এবং ঔষধ খাও; কিন্তু আমাদের এই অশ্রান্ত অপরিমিত জাগরণ ডুবাইবার কোন ঔষধ নাই। আমরা জাগিয়া জাগিয়া, বাঁচিয়া বাঁচিয়া পরিশ্রান্ত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিরই ধর্ম্মকল্পনা বা পুরাণ পড়িয়া যে নরকের কথা শিখিয়াছিলাম, তাহা এখন অধিক প্রলোভনের সামগ্রী মনে করিতেছি; কেননা, তাহাতে বৈচিত্র্য আছে। তপস্বীরা যে স্বর্গের প্রলোভনে সংসারের খাঁটি সুখটুকু উপেক্ষা করিয়াছিল, পাদরিরা যাহা লাভ করিবার আয়োজনে শান্তিময় পৃথিবীতে বিদ্রোহ এবং অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, সে স্বর্গ এমন ভীষণ জানিলে, তাহারা নিশ্চয়ই নরক লাভের জন্য প্রার্থনা করিত। সুখে থাকিতে ভূতের কিল খাইয়া যাহারা সংসারকে উপেক্ষা করে, তাহারা যথার্থই পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করে; কেননা, হাসিশূন্য শুষ্ক মুখ লইয়া নির্জ্জনে পেচকসুলভ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলে পৃথিবীর উপর স্বর্গের প্রতিবিম্ব পড়ে। যখনি ভাবি যে এই সুদীর্ঘ জীবন কদাপি শেষ হইবে না, কখনও মরণের নিস্তব্ধ শান্তি আমাদের জাগরণের অশ্রান্ত শ্রান্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবে না, তখনই হাঁপাইয়া উঠি।

বৈদিক ঋষিগণ মাথা খুঁড়িয়া একশত বৎসর পরমায়ুর জন্য প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু নিশ্চয়ই ৭৭ বৎসর ৭ মাস ৭ দিনের পর যখন ভীমরথী উপস্থিত হইত, তখন ভোগময় যৌবনের প্রার্থনার ফল, সুখকর হইত না। নিশ্বাসটাকেই জীবন মনে করিয়া যোগীরা যখন নিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া চিরজীবন বাঁচিয়া থাকিবার উদ্যোগ করিতেন, তখন যদি তাঁহারা দম আটকাইয়া না মরিতেন, তবে নিশ্চয়ই অল্প দিনের পরেই যোগ পথের নূতন পথিকদিগকে ঐ বিকট সাধনার পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেন। ওপারে হউক, এ পারে হউক, কোথাও নিরবচ্ছিন্ন জীবন সুখকর হইতে পারে না।

যে দিন হেকেল-প্রমুখ পণ্ডিতদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের জীবনের যাহা পদার্থভূত বা উপাদান, তাহার বিনাশ হইলেই যাহা যাহা সেই জীবন হইতে জাত, তাহার সকলি ধ্বংস হইয়া যায়, সেদিন বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম। আমাদের লীলা খেলা, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ভালবাসা, আমাদের আমিজ্ঞান বা আত্মা যে দেহ পিণ্ডের অবস্থা পরিবর্ত্তনের ফল মাত্র, সে দেহপিণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে শুষ্ক জলাশয়ের তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদের মত আমাদের সকল তরঙ্গ,

সকল বুদ্বুদ, সকল আত্মা মিলাইয়া যাইবে বলিয়া আশা ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, গীতাকারের নাছোরবান্দা আত্মা জোঁকের মত বিশ্বশরীরে লাগিয়া রহিয়াছে; দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মত সে জলেও ডুবিল না, আগুনেও পুড়িল না।

আমরা এখন এই অসীম অনন্ত আত্মা লইয়া কি করিব? হেলেলুজাগীতি তিক্ত হইয়া গিয়াছে, সাধুদিগের নয়ন-নিমীলিত সাধনার দৃশ্য অসহ্য হইয়াছে এবং নেমাজ পড়িতে পড়িতে আত্মার কোমরে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছে। যাঁহারা ওপারে বেশ সুখে বসিয়া আছেন, এবং আলোচনা-ছায়া ও সুখ-দুঃখে বিচিত্রতাময় অনুভূতি উপভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুখের নামে অস্বাভাবিক দুঃখের কল্পনা করিয়া কবি-নামে খ্যাতিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্গীতে গীত হয়—"সেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চিরদীপ্তি নীলাকাশে।"

সেকালের স্বর্গ ছিল ভাল। কিন্তু যে ক্রমবিকাশের নিয়মে,বানর সদৃশ জীব মানুষ হইয়া উঠিল, সেই নিয়মে প্রাচীনকালের ইন্দ্র রাজার স্বর্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া অশরীরী আত্মার নূতন স্বর্গ গড়িয়া উঠিল। সেকালে মানুষ ছাড়া অন্য জীব জন্তুর আত্মাও স্বর্গে আসিতে পারিত; জড়-পদার্থের আত্মাও স্বর্গে আসিতে পারিত, কিন্তু এখন আর পারে না। শ্মশান-ঘাটে কড়িগুলি পড়িয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের আত্মা পারের কড়ি হইয়া ভবপারের খেয়াঘাটে উপস্থিত থাকিত, শ্রাদ্ধের উৎসর্গ করা বৃষের আত্মার লেজ ধরিয়া বৈতরণী পার হইতে পারা যাইত। এত সুবিধা থাকিতেও সেকালের লোক সকল ভোগের সামগ্রী চিতায় পুড়াইয়া এপারে আনিত না। কেবল কখন কখন কতকগুলি স্ত্রী-সংগ্রহ করিয়া আসিত। সুবিধা থাকিতেও যে তাহারা ধন-সম্পদ বহন করিয়া আনিত না, তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞ করিয়া এ পারেই তাহারা অনেক ভোগের সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত। তাহা ছাড়া আবার প্রভাত-ভ্রমণের জন্য মন্দাকিনীর তীর ছিল, বাগানবাড়ীর জন্য নন্দনকানন ছিল, ব্যায়ামের জন্য অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ ছিল, সন্ধ্যার শ্রান্তি অপনোদনের জন্য অফুরন্ত সুধা ছিল এবং বিনা টিকিটে ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্যগীত দেখিবার সুবিধা ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখন আর চুলদাড়ির স্বর্গ নাই, মানুষের আত্মা ছাড়া আর কেহই এপারে আসিতে পারে না। কিন্তু যদি আসিতে পারিত, তবে স্বর্গবাস একটু সুখকর হইতে পারিত। গয়ায় পিণ্ডদান না করিয়া পুত্রেরা যদি শ্রাদ্ধের সময় থিয়েটারের অভিনয় দিতেন, পণ্ডিতসভার কচ্‌কচি না করাইয়া একটা ইয়ারদলের হাসি-তামাসার মজ্‌লিস্ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে একটু নৃত্যগীত এবং হাসির আনন্দ, সেকালের বৃষের আত্মার মত, এপারে আসিয়া পৌছিতে পারিত। কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি হইবে? যতদিন মরণের ভয়ে বাঁচিয়াছিলাম, যতদিন আমার অনির্দ্দিষ্ট জীবনধারণের বাসনা একটা অনন্ত-জীবন-পিপাসার মত ছিল, এবং সেই বাসনার প্রমাণেই আত্মাকে অমর বলিয়া বুঝিয়া লইতাম, এবং কল্পনার বলে মৃত্যুঞ্জয় জয় করিতাম; সেদিনকায় উৎসাহ আর নাই। পরলোক যখন অজ্ঞেয় এবং অজ্ঞাত ছিল বলিয়া, তাহার আভাস পাইবার জন্য খিদ্য-

সফির বক্তৃতা শুনিতাম এবং কল্পিত ভূত নামাইয়া পরলোকের তত্ত্ব বুঝিতে চাহিতাম, সেদিনকার গাঢ় কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে। জীবনের পরপারে আসিয়া মৃত্যুর প্রহেলিকা সরলরেখার মত সোজা হইয়া গিয়াছে। ভ্রান্তিশূন্য দীর্ঘ জাগরণের পর সেই একই জাগরণ সূর্য্যের আলোক অপেক্ষাও প্রখর হইয়া আমার চিন্তাকে দগ্ধ করিতেছে। ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, আমাকে বা আত্মাকে বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে। এই দগ্ধ আত্মা বা দুরাত্মা যে পথ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, এখন সেই পথের দিকে তাকাই এবং অতীতের অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া আলোকের তীব্রতা পরিহার করিতে চেষ্টা করি। মন ভুলাইবার সকল চেষ্টাই যখন বিড়ম্বনা, তখন আমাদের ভ্রান্তিহীন ভূতের জীবন যেমন আছে, তেমনই থাকিবে।

আহার এবং প্রেম শারীরিক জীবনের ভিত্তি এবং অবলম্বন। না খাইলে কোন শরীরী বাঁচে না এবং পরের সঙ্গে ভাব না করিয়া অর্থাৎ সমাজ না গড়িয়া কেহ বাড়িয়া উঠিতে পারে না। কাজেই যখন শরীর খসিয়া পড়ে, তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত সকলি খসিয়া পড়ে। যখন পরের মুখের দিকে চাহিতে হয় না, পরের কাছে কিছু লাভ করিবার প্রয়োজন থাকে না, তখন শরীরজাত এবং সমাজ-সংঘর্ষণ-জাত সকল প্রবৃত্তি এবং ভাবনাই অস্তমিত হয়। আমাদের সকল ভালবাসার মূলেই পরকে টানিয়া আপনার করিয়া লইয়া আপনি বাড়িয়া উঠিবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে। যখন বাড়িয়া উঠিবার প্রয়োজন দূর হইয়া যায়, তখন সে ভালবাসা আমূল শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। মানুষের এমন সুখ, অনুভূতি বা চৈতন্য নাই, যাহা দুঃখ, অন্ধকার এবং জড়তা নিরপেক্ষ। মানুষের জীবননাশের গতিই দুঃখ, শারীরিক স্বাতন্ত্র্যই চৈতন্য এবং পরিমিত অনুভূতির নামই স্বতন্ত্রতা। এবং সেই পরিমিত ভাবেরই একদিকের নাম আলোক, অন্যদিকের নাম অন্ধকার। কাজেই শরীর খসিয়া পড়িলে শারীরিক জড়তা হইতে মানসিক চৈতন্য পর্য্যন্ত কিছুই বাঁচিয়া থাকে না।

যাঁহারা এই জলের মত তরল প্রবন্ধটী পড়িয়াও পরলোকতত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন, তাঁহাদিগকে একটা অমূল্য উপদেশ দিতেছি। পরলোকতত্ত্ব মানুষের বুদ্ধির অগম্য; কদাচ কেহ বুঝিতে পারে নাই, কদাচ কেহ বুঝিতে পারিবে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই কল্পনাবলে ইহলোকের পর্দাখানি ছিঁড়িয়া কত লোকে পরলোকের দিকে উঁকি মারে; এবং কখন বা মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া এবং কখন বা ধাঁধায় পড়িয়া "বুঝিয়া ফেলিবার" সুখ লাভ করিতে চায়। আমরা বলি যে, যাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা বুঝিয়া কাজ নাই। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহারা পিতার ক্রোড়ের সন্তানের মত পিতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন; তিনি যাহা করিবেন, তাহাই মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া আশ্বস্ত থাকুন। তোমাদের বিবেচনায় পরলোক যে প্রকার হওয়া উচিত মনে কর, অথবা কল্পনার তুলিতে নিজের বাসনার রঙ্গে পরলোকের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া ঈশ্বরকে ন্যায়বান্ বল, সেই প্রকার পরলোকই যে অশরীরী আত্মার জন্য বিহিত রহিয়াছে, এ কথা ভাবিবার তোমার কোন অধিকার নাই। দার্শনিক পণ্ডিতেরা উর্ণনাভের মত আত্মশরীর হইতে বুদ্ধির জাল বাহির করিয়া, সেই জালে আপনাকে

জড়াইয়া না মারিয়া ফেলিয়া, যাহা প্রত্যক্ষ এবং সুস্থির, তাহারই তত্ত্বে অনুরাগী হইলে ভাল হয়। সংসারে ধাঁধা যথেষ্ট আছে; আর অতিরিক্ত ধাঁধা রচনা করিয়া কি হইবে? বর্ব্বর যুগের কল্পিত ভূতগুলিকে যদি গর্ব্বস্ফীত মূর্খেরা নূতন পোষাকে সাজাইয়া থিয়সফির নূতন তন্ত্র রচনা করিতে চাহে, কিম্বা সভ্যতার বাল্যযুগের দার্শনিকের অদ্বৈতবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ যদি এ যুগের দার্শনিকেরা অদ্ভুত তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিতে চাহে, তবে তোমরা তাহাদিগে মধ্যে মধ্যে কশাঘাত করিও। এ উপায় অবলম্বন করিলেও যদি ভূতের কলঙ্ক না ঘুচে, তবে লোকশিক্ষার জন্য ভবিষ্যতে আরও কিছু লিখিব। আমাদের সেই প্রবন্ধগুলি আমাদের পক্ষ হইতে লিখিবেন—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র বা প্রকট ভক্তি। (৩)

ভক্তি-উদ্দীপ্তির অনুকূল স্থান।

সকল ভক্তজীবনের প্রারম্ভিক ভক্তির সূচনা, কাল ও স্থান-মাহাত্ম্যে কীর্ত্তিত। কেশবচন্দ্র যে জাতিতে, যে সময়ে, যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সমীচীনতা সদা স্মরণের যোগ্য। ধ্রুব, প্রহ্লাদের বংশের কথা,ইহুদী জাতির ইতিবৃত্ত, কোরেশ জাতির পৌনঃপুনিক কাহিনী ভক্তির ইতিহাসে চির উজ্জ্বল। সে সকল স্মরণে, মননে, কীর্ত্তনে অশ্রুপাত হওয়া অপরিহার্য্য। রামমোহন এবং কেশবচন্দ্রের অভ্যুত্থান যে জাতির গৌরবে বদ্ধমূল, তাঁহাদের অভিব্যক্তি যে জাতি ও বংশের কাহিনীতে নিবদ্ধ এবং তাঁহাদের তিরোধান যাঁহাদের কলঙ্ক-ঘোষণায় প্রোথিত, সে জাতির ইতিবৃত্ত রচনা অসাময়িক নহে। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে, সে সকলকথা নিরপেক্ষ ভাবে শুনিবার লোক এদেশে বড় অধিক নাই। কালের ইতিহাসে কালে সে সব ফুটিয়া উঠিবে—ভবিষ্যৎ সেজন্ত উন্মুখ।

আর স্থান? মনে হইতেছে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিন, বহুদূর হইতে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমরা কলুটোলার দ্বিতল-গৃহে উপনীত হইয়াছিলাম। বাড়ীর সদর দরজায় ঢাল-তরবারি প্রভৃতি বড়মানুষের আসবাব দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু ভীত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি নাই—অভীষ্ট সাধনের জন্য ধীরে ধীরে দ্বিতল-গৃহে উপনীত হইয়াছিলাম। স্থান ও বাড়ী দেখিলাম, যে ঘরে কেশবচন্দ্র দণ্ডায়মান ছিলেন, সে ঘর দেখিলাম, পরে তাঁহার জন্ম-কুটীরও দেখিয়াছি। বাড়ীর অন্যান্য লোকজন, জিনিসপত্র সব দেখিলাম। অসুর-গৃহে প্রহ্লাদ এবং রাজগৃহে শুদ্ধোদনের অধিষ্ঠানের কাহিনী স্মরণে দুই চারি বিন্দু অশ্রু চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িল! কেশবচন্দ্র নির্লিপ্ত, অন্যমনস্ক, কি গভীর চিন্তায় যেন বিভোর—এ দীনকে দেখিলেন না। দেখিয়া দেখিয়া, থাকিয়া থাকিয়া, ভাবে বিহ্বল হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। যে অপরূপ

দৃশ্য দেখিয়া আসিলাম, এ জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারি নাই।

আর একদিন, বোধ করি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মাঘোৎসবের সময়ে হইবে, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন—কলুটোলার বাড়ী হইতে নগর-কীর্ত্তন বাহির হইতেছে। সুবিখ্যাত ড্যালসাহেব হস্তে নিশান ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতেছেন—দলেদলে লোক আসিয়া কীর্ত্তনের দলে জমিতেছে। সকলের মুখে উৎসাহ ও উদ্যম, কি যেন এক অপরূপ অগ্নি-মন্ত্রে সকলে দীক্ষিত। সেই প্রমত্ত দলে দ্বিতীয়বার কেশব-দর্শন হইল। ভক্তি তখনও বোধ হয় জাগে নাই—বোধ হয়, জাগিবার আয়োজন করিতেছে—সাধকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা হইয়াছে—কলিকাতা কাঁপিয়া উঠিয়াছে। কীর্ত্তনের দল যখন গোলদিঘীর উত্তরপাড়ে উপনীত হইল, তখন মনে হইল যেন স্বর্গ হইতে কি এক অলৌকিক দৃশ্য ধরায় অবতরণ করিয়াছে। জীব তরাইবার কি এক প্রকট আয়োজন দেখিলাম! দেখিয়া জীবন যেন ধন্য হইল।

আর একবার, অল্প কিছু দিন পরে, কেশব চন্দ্রকে দেখিলাম, সিন্দূরিয়া-পটির ব্রাহ্মসমাজের উৎসব-মন্দিরে। সেখানে মহর্ষি, সেখানে রামকৃষ্ণ, সেখানে কেশবচন্দ্র, সেখানে শিবনাথ সমবেত। শিবনাথ চিরদিনই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি,—পোষাক পরিচ্ছদে, আহার বিহারে চির উদাসীন, —তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক,—কিন্তু তেজে বা অনুরাগে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। দেখিলাম, তিনি যেন প্রয়াগ-সম্মিলন-তীর্থে অহেতুকী অনাবিল কোন জিনিস সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। আমরা দেখিলাম—ভক্তি প্রকট-মূর্ত্তি রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান-মহর্ষি-ব্রহ্মকুণ্ড হইতে একধারাকে ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেশবচন্দ্র ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, কিন্তু, সিন্দূরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজে সকল ব্রাহ্ম-সাধকের আদর—সে যেন জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-সাধনার প্রয়াগ তীর্থ। রামকৃষ্ণ কি নারদ-ঋষি? কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের সম্মোহন-বাণীতে আকৃষ্ট হইলেন। কোথায় যাইবেন? বুঝি বা ভক্তি-সিন্ধুতে।

কলুটোলা, চিৎপুর-রোড, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, সিন্দূরিয়াপটি, মৃজাপুর-ষ্ট্রীট, কলেজ-স্কোয়ার, সার্কুলার রোড, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—এ সকলই কলিকাতায়। পত্নী আসিলেন বালীগ্রাম হইতে, তাহা কলিকাতার উপনগর। রামকৃষ্ণ আসিলেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে, তাহাও কলিকাতার উপনগর। বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ আসিলেন শান্তিপুর হইতে, তাহাও একপ্রকার কলিকাতার উপনগর। প্রতাপচন্দ্র আসিলেন, গরিফা হইতে, শিবনাথ, উমেশচন্দ্র আসিলেন, মজিলপুর হইতে, তাহাও একপ্রকার কলিকাতার উপনগর। কলিকাতা এবং তাহার উপনগর—ভক্তিশাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব ইতিহাস-বিজড়িত।

কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইতেছে, আমরা লিখিয়াছি, ইহাতে কলিকাতার খর্ব্বতা সাধিত হইবে। তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কলিকাতার উপনগর কালীঘাট, শাক্ত-ভক্ত-সঙ্গমস্থান, মুসলমান রাজত্বের সময়ে কি আকারে ছিল, জানি না। ভাগীরথী কালীঘাটে জমিয়া সামান্য খাতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বে কালীঘাটের গৌরব কালীগঙ্গার

মাহাত্ম্যে দিন দিনই বাড়িতেছিল। মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া, নবদ্বীপে ভাগীরথীর যেরূপ দশা দেখা যাইতেছে, তাহাতে কালে সুজলা ভাগীরথী জমিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রের ইতিহাসে কলিকাতা বৃন্দাবনে পরিণত হইয়া চির-আদৃত থাকিবে। কলিকাতায় যদি রাজধানী স্থাপিত না হইত, নির্ব্বিবাদে একথা লিখিতে পারি, একদিকে জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রতিভা ও শীলতায় বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ হইত না, অন্যদিকে ভক্তিশাস্ত্রের নব-বৃন্দাবন কলিকাতায় রচিত হইত কিনা, সন্দেহ। কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা, শান্তিপুর হইতে মজিলপুর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পুণ্য-প্রবাহ-পূত কত ভক্তের পদরেণুতে এই তীর্থ পবিত্র হইয়াছে, কে তাহার ইতিহাস লিখিতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিম-বঙ্গে ধর্ম্মের আন্দোলন কমিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। রাজধানী-সুলভ জড়বাদিতায় এই প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ দুঃখ করেন; কিন্তু আমরা যাহার আকর্ষণে এই প্রদেশের প্রতি অনুরক্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি, তাহা চিরদিন সকলের অধ্যয়নের বিষয় থাকিবে। কলিকাতায় যে সকল মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা এইস্থানে রাজধানী না থাকিলে হইত কিনা, গভীর সন্দেহের বিষয়। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া এযুগের সকল মহাত্মার অভ্যুত্থান যে কলিকাতায় হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ রাজধানী স্থাপন। রাজধানী-সুলভ জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রতিভা-অনুশীলন-বায়ুতে মহাত্মা উত্থানের কারণ নিবদ্ধ। রামমোহন, রামগোপাল, ঈশ্বরচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণদাস, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মাইকেল, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, আনন্দমোহন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ, উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সকল প্রথম শ্রেণীর লোকের অভ্যুদয়ে কলিকাতা ধন্য হইয়াছে, তাহার সকলের মূলেই রাজধানীর ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। যিনি যতই আন্দোলন করুন না কেন, রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে আর কখন এত প্রথম শ্রেণীর লোকের এই বঙ্গে অভ্যুদয় হইবে কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়। ভাগীরথী এই ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে, নবদ্বীপ শান্তিপুরের ভক্তির প্রবাহ এই ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়াছে, কালীঘাটের পীঠস্থান এই ভূমিকে সরস করিয়াছে এবং রাজধানীত্ব এই স্থানকে সর্ব্ববিশেষত্ব উজ্জ্বল করিয়াছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মসাধনায় এই প্রদেশ, শুধু ভারতের নয়, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা, উরুবিল্ব, রাজগৃহ, মেক্কা মদিনা, জেরুজালেম, নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মহা-সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আবার লিখিতেছি, কলিকাতার অভ্যুত্থান অপূর্ব্ব ইতিহাস-বিজড়িত।

অসংখ্য শাক্ত কালীঘাটের মাহাত্ম্যে প্রতিবৎসর এখানে সম্মিলিত হন, বহু বৈষ্ণব নবদ্বীপ শান্তিপুরে সমবেত হন। বহুভক্ত বেলুড় দক্ষিণেশ্বর দর্শন করেন, বহু একেশ্বরবাদী মাঘোৎসব দেখিতে কলিকাতায় আগমন করেন। আমরা ভক্ত-সমাগমের স্থান-মাহাত্ম্যে এই কলিকাতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এই স্থানেই রহিয়া গিয়াছি। বহু জ্ঞানী, মানী, ধনী লোকের সংস্পর্শে এই কলিকাতা প্রতিবৎসর টলমল করিত। লোক-সমাগমে এই নগর মহা প্রতিভা-বিকাশের পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। অলৌকিক তাড়নায়, মহেশের ফুৎকারে, এই

কলিকাতায় বাঙ্গালা ভাষা মহা তেজীয়ান মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা মহা সম্মানের কেন্দ্র—ইংরাজের ইঙ্গিতে এই স্থানের কত অবনতি হইবে, কে জানে? কেশবচন্দ্র থাকিলে এই স্থানকে খর্ব্ব হইতে দিতেন না, অন্ততঃ তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু সে সকল অপ্রিয় কথায় আর কাজ কি?

এই কলিকাতা কেশবের, এবং কেশবের এই কলিকাতা। জেরুজেলাম্ খ্রীষ্টের, নবদ্বীপ চৈতন্যের, মক্কা মোহম্মদের, উরুবিল্ব বুদ্ধের, এবং এই কলিকাতা রামমোহন, মহর্ষি, কেশব এবং রামকৃষ্ণের। কলিকাতা না হইলে জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমের সামঞ্জস্যে কেশব পৌঁছিতে পারিতেন না—বুঝিবা নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেন। কলিকাতা কেশবের আদি, কলিকাতা কেশবের মধ্য এবং কলিকাতা কেশবের অন্ত্যলীলা-ক্ষেত্র। যতদিন ভক্তিশাস্ত্রের আদর থাকিবে, এই কলিকাতা ততদিন ভক্তগণের আদরের জিনিস থাকিবে। কলিকাতার সর্ব্বস্ব যাইতে পারে, কিন্তু ভক্ত-সমাগমে যে ভূমি পবিত্র হইয়াছে, তাহার এই বিশেষত্ব কখনও যাইবে না। বিধাতার ইচ্ছার জয় হউক।

কেশবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কলিকাতার প্রতিভা ছিল, জ্ঞান ছিল, কর্ম্ম ছিল, কিন্তু নিরীশ্বরবাদের প্রাবল্যে দেশ ডুবিয়া যাইতেছিল। "খাও, দাও, বেড়াও," একসময়ে কলিকাতার মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ডিরোজিওর আদর্শ-গঠিত রসিককৃষ্ণ-প্রমুখ প্রথম সংস্কারকদল বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। তৎপরে রিচ র্ডসনের আদর্শও ধর্ম্মের অনুকূল ছিল না। ধর্ম্মগত প্রাণ যাঁহারা, তাঁহারা দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিলেন, অন্যদিকে ব্যভিচার ও মদ্যপানে দেশ ডুবিয়া যাইতেছিল। এইরূপ দুরূহ সময়ে কেশবের বিবেক-বংশী বাজিয়া উঠিল,—"প্রার্থনা কর,—দ্বার মুক্ত হইবে," কলিকাতায় এই নববাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই মধুর ধ্বনিতে কলিকাতা মাতিয়া উঠিল। ইংরেজ-রচিত কলিকাতার মাটীতে এমন কিছু ছিল, যাহাতে কেশবচন্দ্র জ্ঞান হইতে প্রেম, প্রেম হইতে কর্ম্ম, এবং এই জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্ম সাধনার পথ ধরিয়া ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে এক অপরূপ বৈরাগ্যের কাহিনী। ভক্তিতে দীক্ষা এবং নব বিধানের উত্থান—একই কথা। সে সকল কথা যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করিব।

জন্মদিনে।

সপ্তবিংশ বর্ষ-প্রান্তে, প্রসূন-অঞ্জলি হাতে,
হে মোর সুন্দর হরি, হৃদয়-রঞ্জন!
তোমার মন্দির-দ্বারে, উৎসর্গিতে আপনারে
নিয়ে এনু মুক্ত করি ধূলির বন্ধন!

এমনি প্রভাতে কবে একদিন তোমার ধরায়
এনেছিলে তুমি মোরে মনে আজ নাহি পড়ে হায়!
তারপর সেই হতে, এতকাল পথে পথে,
কত আলো-অন্ধকারে আশা-নিরাশায়,
নিঃশব্দে কাটিয়া গেছে, অন্বেষিয়া শুধু মিছে,
শাশ্বত কল্যাণ শান্তি গোপন কোথায়!

এ ক্ষুদ্র জীবনে মম, হে নাথ, হে প্রিয়তম,
কি উদ্দেশ্য গুপ্ত তব কহিতে না পারি ;
কবে কোথা যাত্রা-শেষ, নাহি জানি পরমেশ,
পেয়েছি সম্বল শুধু হাসি অশ্রুবারি !
এত প্রেম, এত স্নেহ, অবজ্ঞা আঘাত সুকঠোর,
কে জানিত তব লিপি হে বিধাতা ছিল ভাগ্যে মোর ?
কত সুখ, কত দুখ, ভরি দিলে সারা বুক,
অশনি-সম্পাত যেন ক্ষণপ্রভা সনে !
সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামি, কি অজ্ঞাত তব, স্বামি,
নিবেদিব কিবা আর ও রাঙ্গা চরণে !

৩

অনন্ত বিশ্বের মাঝ কত জনে কত কাজ,
তুমি দিলে হে কর্ম্মিন্, সাধিবার তরে,—
তোমার আকাশ-তলে, পূর্ণ তারি কোলাহলে,
মত্ত সবে কত হর্ষে কত গর্ব্বভরে !
একটী করুণ সুর, একটী আপনা-হারা তান,
মোরে শুধু দয়াময়, ভুলে বুঝি করেছিলে দান !
তোমারি প্রাসাদ-দ্বারে, ভগন বীণার তারে,
সকল পরাণে তারি দিতেছি ঝঙ্কার ;
যদি প্রতিধ্বনি কভু, তোমারে জানায় প্রভু,
তোমারি দুয়ারে কাঁদে ভিখারী তোমার !

৪

আর কতকাল হায়, যাবে বৃথা-প্রতীক্ষায়,
মর্ম্মভেদি' উঠিতেছে তীব্র হাহাকার ;—
বিশ্বাস নির্ভর দাও, করুণা-কটাক্ষে চাও,
দীনবন্ধু, বিশ্ব-রাজ, সুহৃদ্ আমার !
অবশ দুর্ব্বল হৃদি—নব শক্তি করগো সঞ্চার,
নবীন প্রেরণা দাও ঘুচে যাক্ সব অন্ধকার ?
মৃতপ্রাণ পাক্ প্রাণ, রহ তুমি দীপ্যমান
মোর অন্ধ নয়নের একান্ত সম্মুখে ;—
জনম সার্থক হোক্ সর্ব্ব গ্লানি-দৈন্য-শোক
ভুলায়ে নিমগ্ন কর অক্ষয় কৌতুকে !

মুমুক্ষু।

কতদিন কত ভাবে করিয়াছি অপরাধ
পড়িতেছে সব আজ মনে ;
নিঠুর পাষাণ আমি, তোমার কোমল বুকে
দিয়েছি বেদনা অকারণে !
তুমিত রোষ নি কভু, কহ নি একটী কথা,
সহিয়াছ সব হাসি মুখে ;
সকল হৃদয় তব চাহিয়াছ মিশাবারে
আমার সকল সুখে দুখে !
কি গভীর ভালবাসা, মাগ নাই প্রতিদান
বিলাইয়ে সর্ব্বস্ব আপন ;
মূক-দেবী-প্রতিমারে চিনিতে পারিনি হায়,
অন্ধ মোর আছিল নয়ন !
দরশ-পরশাতীত কোন্ মহা মায়া-দেশে
আজ তুমি চলে গেছ ফেলে ;—
অভাগা ভিখারী আমি করিতেছি অনুভব
কি রতন হারাইনু হেলে !
সাগরের অধিবাসী দারুণ তরঙ্গ-ঘায়
অকস্মাৎ উঠি যেন কূলে,
হেরিতেছে পারাবার উদার মহান্ কত
এতকাল ছিনু কিসে ভুলে !
আজ ধ্রুব পরিচয় তোমার আমার সনে,
বিশ্বে মোর নবীন চেতনা ;—
গোপন মরম-কোণে আকুল সারাটী চিত
করিবারে তোমারে অর্চ্চনা !
জীবনের যত ত্রুটী, যত ভুল-দোষ মোর
অয়ি দেবি, অয়ি নিরুপমা,
হতেছে বাসনা বড় ও রাঙা চরণ ছুঁয়ি',
একে একে যাচি লই ক্ষমা !
তুমি চির-দয়াময়ী, তব ভালবাসা পাশে
ধুয়ে যেত সকল কালিমা,—
পূত মন্দাকিনী-ধারা ভুবন-পাতক নাশি'
রাখে না কি আপন মহিমা ?

হায়রে সুযোগ নাই, নাই সেই অবসর,
আজ তুমি দূরে—বহু দূরে—
তোমার স্মৃতিটী শুধু জগৎ-পতির সনে
আছে যেন এ জগৎ জুড়ে!

তোমা যাহা বলিবার, তোমা যাহা সঁপিবার,
মাগিবার যাহা তব পাশে,—
মোর সারা প্রাণ সাথে, অর্পি সব তাঁরি হাতে,
চেয়ে আছি আমি মুক্তি-আশে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অর্থশাস্ত্র।

তৃতীয় খণ্ড

ব্যবহার বিধি।

প্রথম অধ্যায়।

সংগ্রহণ, দ্রোণমুখ এবং নগরে ও জনপদ সন্ধিস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ তিনব্যক্তি ও তিনজন রাজামাত্য বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। বিচারকগণ যে সকল ব্যবহার (চুক্তি) নির্জ্জনে, গৃহাভ্যন্তরে, গভীর রাত্রিতে, অরণ্যে, গোপনে এবং ছলপূর্ব্বক সমাপন হইয়াছে, অমাত্যগণ তাহা অগ্রাহ্য করিবেন। প্রস্তাবক ও সহযোগী প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। সাক্ষিগণের উপরোক্ত দণ্ডের অর্দ্ধাংশ এবং গ্রাহকের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহ্য করিতে হইবে। অপরের সম্মুখে অথবা যাহা অন্যপ্রকারে নিন্দনীয় নহে, এ সকল চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

যে সকল চুক্তি দায়-বিষয়ক, গচ্ছিত ধন ও বিবাহ সম্বন্ধীয়, যে সকল চুক্তি পীড়িতা বা অপরিত্যক্তা স্ত্রীলোক বিষয়ক, অথবা যে সকল চুক্তি প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সাধিত হয়, তাহা গৃহাভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হইলেও সেগুলি বলবৎ থাকিবে।

অপহরণ, মল্লযুদ্ধ, বিবাহ, অথবা রাজাদেশ প্রতিপালন এবং যাহারা রাত্রির প্রথম ভাগে কার্য্যাদি সম্পন্ন করে, এই সকল কার্য্য-সংক্রান্ত চুক্তি রাত্রিতেও সম্পাদিত হইতে পারে।

সার্থবাহ, গোপালক, শ্রমণ, ব্যাধ অথবা গুপ্তচর এই সকল ব্যক্তি যাহারা জীবনের প্রধানাংশ অরণ্যেই অতিবাহিত করে, তাহাদের চুক্তি অরণ্যে সম্পাদিত হইলেও বলবৎ থাকিবে।

ছলনা পূর্ব্বক যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়, তন্মধ্যে গুপ্তচরগণ কর্ত্তৃক চুক্তিই কেবল বলবৎ থাকিবে।

কোন সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক কোন চুক্তি নির্জ্জন স্থানে সম্পাদিত হইলেও তাহা বলবৎ থাকিবে।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে সম্পাদিত ব্যতীত অন্যান্য অপর সকল চুক্তিই অগ্রাহ্য বা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আশ্রিত বা যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই (যথা পিতামহী, পুত্র, পুত্রের পিতা, জাতিভ্রষ্ট ভ্রাতা, একান্নবর্ত্তী পরিবারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সধবা স্ত্রীলোক, পুত্রবতী স্ত্রী, কৃতদাস, ঠিকাভৃত্য, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি, বৃদ্ধ অভিশপ্ত (কয়েদী বা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি) এই সকল ব্যক্তির চুক্তি গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু ইহারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে ইহাদের চুক্তি গ্রাহ্য হইবে।

ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি উত্তেজনা ও উদ্বেগের বশবর্ত্তী হইয়া বা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া অথবা উন্মাদগ্রস্ত হইয়া চুক্তি করে, তবে তাহার কৃত চুক্তি গ্রাহ্য হইবে না। এই সকল ক্ষেত্রে প্রস্তাবক, সহযোগী এবং সাক্ষীগণ সকলেই অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

কিন্তু যদি নিজ সমাজভুক্ত লোকের সহিত উপযুক্ত স্থান ও সময়ে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়, এবং যদি চুক্তির বিবরণ, আচার, লক্ষণ ও প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে ঐ সকল চুক্তি গ্রাহ্য হইবে।

আদেশ (বিনিময় পত্র) ও বন্ধক-সংক্রান্ত চুক্তি তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে।

বিচার।

প্রথমতঃ বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, তারিখ এবং চুক্তির বিষয় ও স্থান, ঋণের পরিমাণ, দেশ, বাসস্থান, জাতি, গোত্র এবং বাদী প্রতিবাদীর নাম তালিকা ভুক্ত করিয়া পরে উভয় পক্ষের বিবরণ মোকর্দ্দমার অবস্থানুযায়ী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল বিবরণ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিতে হইবে।

পরোক্ত।

বিচার্য্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কোন পক্ষ যখন অন্য বিষয় অবলম্বন করে, প্রথমোক্ত বিবরণের সহিত শেষোক্ত বিবরণের কোন সাদৃশ্য না থাকা, তৃতীয় ব্যক্তির মতামত বিবেচনার জন্য জেদ করা (যদিও ঐ মত বিবেচনা করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না), বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে উত্তর করিতে করিতে থামিয়া যাওয়া ও আদিষ্ট হইলেও মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা, নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন ব্যতীত অন্যান্য প্রশ্ন করা; নিজের বিবরণ প্রত্যাখ্যান করা; নিজের সাক্ষীর বিবরণ অবিশ্বাস করা; অন্যায় স্থলে সাক্ষীর সহিত কথোপকথন—এই সকল অপরাধকে পরোক্ত বলে।

পরোক্ত দোষে পাঁচ গুণ অর্থদণ্ড হইবে। উপযুক্ত সাক্ষ্য ব্যতিরেকে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিলে দশগুণ অর্থদণ্ড হইবে।

সাক্ষীর পারিশ্রমিক।

সাক্ষীগণ সমষ্টির অষ্টাঙ্গ পাইবে। যে টাকার জন্য নালিশ করা হইয়াছে, তাহার অনুপাতে তাহাদের যাতায়াতের ব্যয় দিতে হইবে। পরাজিত পক্ষই এই দুই প্রকারের ব্যয় বহন করিবে।

প্রত্যভিযোগ।

কলহ, চৌর্য্য, সার্থবাহ ও সমবায় সদস্যগণের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ হইলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রত্যভিযোগ আনয়ন করিতে পারিবে না। প্রতিবাদীর পক্ষে কোনরূপ প্রত্যভিযোগ হইতেও পারে না।

মুলতুবি।

বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিবাদী উত্তর করিবার অব্যবহিত পরেই বাদী তাহার বক্তব্য বিষয় বলিবে। নতুবা বাদী পরোক্ত দোষে দোষী হইবে। কেন না, বাদী মোকর্দ্দমার সকল বিষয়ই অবগত আছে। কিন্তু বিবাদীর পক্ষে ইহা প্রযুজ্য হইতে পারে না। বিবাদী তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তিন কিম্বা সাত রাত্রি সময় পাইবেন।

যদি ঐ সময়ের মধ্যে সে নিজ পক্ষসমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে তিন হইতে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। যদি তিন পক্ষ অতিবাহিত হইলেও বিবাদী উত্তর না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পরোক্ত দোষে দণ্ডনীয় হইতে হইবে এবং বাদী বিবাদীর সম্পত্তি হইতে

তাহার টাকা আদায় করিতে পারিবে। কিন্তু যদি বাদী প্রত্যুপকারের জন্য নালিশ করিয়া থাকে, তবে কোন আদেশ দেওয়া হইবে না।

যে সকল বিবাদী তাহাদের মোকর্দ্দমা প্রমাণ করিতে পারিবে না, তাহাদেরও এই প্রকার দণ্ড হইবে। যদি বাদী তাহার মোকর্দ্দমা প্রমাণ করিতে না পারে, তবে সে প্রোক্ত দোষে দোষী হইবে। যদি সে মৃত, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ না করিতে পারে, তবে সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং মৃতের শ্রাদ্ধাদির ব্যয় বহন করিবে। যদি সে প্রমাণ করিতে পারে, তবে বন্দকী সম্পত্তি দখল লইতে পারিবে।

যদি বাদী ব্রাহ্মণ না হয় এবং মোকর্দ্দমা প্রমাণ করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহাকে ভূত প্রেত দূরীভূত করিবার জন্য যে সকল ক্রিয়া আছে, তাহাই করিতে হইবে। চতুর্বর্ণের স্ব স্ব কর্ত্তব্য ও আশ্রম-সমূহের আচরণ রক্ষা এবং সর্ব্বধর্ম্ম যাহাতে বিনষ্ট না হয়, এই সকল বিষয় রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকা-প্রযুক্তই রাজা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

* ধর্ম্ম, ব্যবহার, চরিত্র ও রাজ্যশাসন, এই চারিটীকেই আইনের চারিটী পদ বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে শেষোক্তটী প্রথম তিনটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মই পৃথিবীর সনাতন সত্য এবং ইহা সর্ব্বত্রই আধিপত্য বিস্তার করে। ব্যবহার সাক্ষিগণেই পাওয়া যায় এবং রাজাজ্ঞাই শাসন নামে কথিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মতঃ প্রজা শাসনই রাজার কর্ত্তব্য এবং এইরূপ করিলে তিনি স্বর্গবাসী হইতে পারেন। যিনি প্রজা রক্ষা না করেন, তাঁহার দণ্ড ধারণই বৃথা। রাজা যদি শত্রু ও পুত্র উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে দণ্ড পরিচালনা করেন, তবেই এই পৃথিবী ও পরলোক রক্ষা হয়। যে নরপতি ধর্ম্ম, ব্যবহার, চরিত্র এবং ন্যায়ানুযায়ী শাসন করেন, তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইবেন। যখন চরিত্রে ও ধর্ম্মে কোন বৈষম্য দেখা যাইবে, অথবা ব্যবহারে, ও ধর্ম্মে পার্থক্য দেখা যাইবে, তখন ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। অনুযোগ, সততা, হেতু এবং শপথ দ্বারাই লোকে বিচারে জয়ী হইতে পারে। যখন ব্যবহার দ্বারা কোন পক্ষের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হইবে এবং যখন রাজকীয় গুপ্তচর দ্বারা কোন পক্ষের বক্তব্য মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তখন সেই পক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা হইবে। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অন্ধ আবেগ।

গাইতে গিয়ে সুরটীরে যাই ভুলি',
চিন্‌তে লক্ষ্য নয়ন যখন মেলি
চারদিকেতে আঁধার করা ধূলি
লাগায় ধাঁধাঁ, তাই তো মুদি আঁখি।
ভাবনারে যাই ভুলে' ভাব্‌তে গেলে;
চলতে গিয়ে দাঁড়াই চরণ ফেলে',
ঘুমুতে চাই যখন, চক্ষু মেলে'
কেমন যেন অবাক্ হ'য়েই থাকি।
সত্য বলে জড়িয়ে ধরি যা'রে,

স্বপ্ন সম মিলায় অন্ধকারে।
মায়ার মোহে পথটা বারে বারে
এম্‌নি করে' হারিয়ে ফেলি তা'ই।
কাঁদ্‌তে চাহি, কান্না নাহি আসে,
বুকটা ভরা কেবল দীর্ঘশ্বাসে!
জীবন পথে শুধুই আশে পাশে
সংখ্যাবিহীন বাধাই দেখ্‌তে পাই!
হায়রে, এমন আপনা-ভোলা প্রাণে
কোথায় যেতে যা'ব যে কোন্‌খানে,
কেমন করে' কইব? কেইবা জানে
কোথায় গেলে শান্ত হ'বে মন!
ভুলকে যতই রাখ্‌তে চাইরে দূরে,
ততই তাহার মাঝেই বেড়াই ঘুরে',
ভ্রান্তি-দ্বিধা ভরা এ মরম-পুরে
শুনি এ তবু কিসের আবাহন!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

কামনা।

দিবা রাত্র—দুটী পুঁথি,
পত্রে তার অপূর্ব্ব কাহিনী,
কে যেন লিখিছে বসে
দিয়ে তার অমর লেখনী।

রুদ্র ভানু, শান্ত শশী,
আলো, ছায়া, উত্থান পতন,
জীবের কত না লীলা—
হাসি পরে অশ্রু বরিষণ!

কত গাথা, মহাকাব্য,
কত নাট্য, কে গণিবে তায়!—
যে লিখিছে নিরজনে,
আজি প্রাণ তাহারেই চায়।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

প্রেমে।

চিরবাস করে চরম মুক্তি
নিবিড় প্রেমের বন্ধনে,
গোপন মধুর সুখ উঠে ফুটি,
তীব্র ব্যাকুল ক্রন্দনে।
দেহের বিরহে প্রাণের মিলন
প্রগাঢ় হইয়া উঠে।
বেড়ে যায় ক্রমে "আমি"র প্রসার
স্বার্থ চরণে লুঠে
অন্তর মাঝে পশে অনায়াসে
বাহিরে রয়েছে যারা,
গণ্ডীবদ্ধ প্রাণ, বাহিরায়
ভাঙ্গিয়া বক্ষ-কারা

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুখ।

সুখ ওই প্রস্ফুটিত ফুলের মতন
সরল, সুন্দর হাসি,
পরাণে অমিয় রাশি,
পরিপূর্ণ, নিরমল, মধুর জীবন—
সুখ! ওই প্রস্ফুটিত ফুলের মতন॥

সুখ ওই কুসুমের আত্ম বিসর্জ্জন,
সারা দিন মান ধরি,
বিন্দু বিন্দু বিন্দু করি,
আপনার সবটুকু আলোকে অর্পণ—
সুখ ওই কুসুমের আত্ম বিসর্জ্জন॥
সুখ আহা কুসুমের মধুর মরণ,
দিবালোক অবসান,
শুষ্ক, শ্রান্ত দেহ প্রাণ,
সন্ধ্যার আঁধার কোলে নীরবে শয়ন—
সুখ আহা কুসুমের মধুর মরণ॥

শ্রীপুষ্পকুন্তলা দাসী।

আহ্বান।

শুকায়ে যাওয়া এ জীবন-কুঞ্জ
তুমি করগো সরস
তব অমৃত কিরণ পরশে

নবীন শোভায় সাজিয়া উঠুক
ফুটিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে
(ওগো) অপার বিমল হরষে।
সব কলঙ্ক কালিমা মুছায়ে
ফুটাও গো চির-কৌমুদী রাতি।
অমৃত আনন্দে হাসুক ধরণী
নিরখি তোমার পুণ্য ভাতি।
অপরূপ বেশে চিরবসন্ত (এস গো)
এস, কর প্রাণদান
দীর্ঘ কুয়াশা হিমানী শেষে।
ধ্বনিয়া উঠুক সঙ্গীত তব
শত তারে শত সুরে,
শত ভাবে শত ভাষায় মিশে।
যুগ যুগান্ত মরণের ছায়ে
ধূলায় লুটায়ে ওগো
পড়ে আছি যেন জীবন হারা।
চির পিপাসীর অমৃত নদী এস গো
শুষ্ক কঠিন মরুতে
বয়ে যাক্ তব অমৃতধারা।
নিবিড় আঁধারে ঢাকা মোর এই
চির নিরজন কুটীরে,
যুগ যুগান্ত একেলা পড়িয়া
ভাসিতেছে রাধা নয়ন-নীরে।
বিজন শ্মশানে নব বৃন্দাবন
করগো তুমি রচনা,
ঘুচাও সকল জটিল মায়া।
স্নিগ্ধ কিরণ বিতরি এস গো
এস, মুছাইয়া দাও
সকল বিষাদ অশান্ত ছায়া।
আকুল সুবাসে অধীর মলয়
চমকি বহিয়া যাবে,
শিহরি জাগিবে কানন স্থল ;
চির পূর্ণিমা ফুটিয়া যখন
জাগায়ে তুলিবে ধরা
উজলিবে নীল গগন তল।
কৌমুদীর-স্নিত সে মধু নিশায়
এস গো রাতুল চরণে,
স্তুতি গান তব ফুটিয়া উঠিবে
বিচিত্র কুসুম বরণে।
তোমারি রচিত সেই বৃন্দাবনে
হৃদয়-যমুনা-তীরে,
প্রস্ফুট সেই নীপতরু মূলে,
চির সাধনার বনমালী মোর (এস গো)
বাজাও তোমার বাঁশী
দিকে দিকে সুধা লহরী তুলে।

শ্রীচারুহাসিনী দেবী।

জীবনের প্রতি।

তোমায় আমায় দেখা কোন্ শুভক্ষণে
কোথায়, কেমনে কিছু নাহি পড়ে মনে ;
সহসা নয়নে যবে ফুটিল আলোক,
তুমি বহাইলে প্রাণে নবীন পুলক ;
দীর্ঘদিবা দুইজনে করিতে যাপন,
তোমায় আমায় হ'ল বন্ধুত্ব স্থাপন ;
কতসুখ, কতদুঃখ, কত ভালবাসা,
দুজনে পুষিনু হৃদে কত শত আশা ;
ক্রমে দিবা অবসান আসিছে আঁধার,
এ প্রাণে সহিতে হবে বিচ্ছেদ তোমার,
দুজনে নিভৃতে কত কহিয়াছি কথা
বুঝিয়াছি এমিলনে উভয়ের ব্যথা ;
হে প্রিয়, হে সখা, বন্ধু, আমার জীবন ;
বিদায়ে পড়িবে শ্বাস, ঝরিবে নয়ন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নীরব জয়।

মৃত্যু কহে "যতই কেন বাঁধিয়া রাখ তুমি,
কোথায় বাঁধা ? খুলিয়া যাবে ডাকিব যবে
আমি !

কাঁদিবে শোকে আছাড়ি ভূমে বিজয় মম
গাবে,
জীবন ভরা স্বপ্নে গড়া দুর্গ তব রবে।"
প্রেম কহে,"রোদনে মবে আমারি জয় গায়,
রহিব আমি তোমার (ও) পরে, রবেনা
তুমি, হায়।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সুখ কিসে ?

সুখ কি বাসিয়া ভাল কিম্বা পেয়ে ভালবাসা,
বুঝিতে নারিনু আজো মরমের গুপ্তভাষা।
কেন এ বাসনা তবে কেন এত অভিমান
আপনা স'পিয়া কেন চাহি তার প্রতিদান।

শ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী।

গান।

সুরট মল্লার—একতালা।

কিসের কর তুমি এত অহঙ্কার
দুদিনের তরে এসেছ সংসারে,নয়ন মুদিলে
সকলি আঁধার।
এই ধনজন জীবন যৌবন চিরদিন
কারো রবে না কখন,
তবে কেন তাহে মজি অকারণ ঘটেছে
তোমার এ বুদ্ধি-বিকার।

কা'ল ছিল যেই রাজরাজেশ্বর বিক্রমে অতুল
ভুবন ভিতর,
দারুণ দারিদ্র্যে আজ সে কাতর, রোগে,
শোকে তাপে বহে অশ্রুধার।

পেয়েছ জীবন পেয়েছ যৌবন, ধনজন
তব আছে অগণন,
জগতের হিতে কর তা অর্পণ অন্তরে
বাহিরে হয়ে নির্ব্বিকার।

কর গর্ব্ব খর্ব্ব ত্যজ অভিমান সুপ্রশস্ত কর
ক্ষুদ্রমন প্রাণ,
করহ অর্জ্জন বলবুদ্ধি জ্ঞান অনায়াসে পার
হবে এ সংসার॥

শ্রীকৃষ্ণবন্ধু সান্ন্যাল।

জীবন-তরী।

আমরা মাতৃমন্ত্রে লইনু দীক্ষা
সাক্ষী রহিলে গো হরি—
আজি নূতন ভাবে নূতন কাজে
ভাসানু জীবন-তরী।
ধূ ধূ করে শুধু জলধির জল
কূল নাহি যায় দেখা—
না জানি মোদের তরীর ভালে
কি আছে বিধি লেখা!
আঁধার আসিছে নামি ধীরে ধীরে,
জলধির কাল জলে।
ডুবে বুঝি তরী ঊর্ম্মির ঘাতে
ডুবে বুঝি প্রতি পলে।
এহেন নৌকায় উঠিবে কেগো
আইস করিয়ে ত্বরা।
স্থির হ'য়ে উঠ, রহিও অটল
নাহি ক'র নড়া চড়া।
দুলিবে নৌকা এ পাশ ওপাশ
ঊর্ম্মির ভীষণ ঘায়।
হেলিও না। একের সামান্য দোষে
জেন, তরী ডুবে যায়।
জানি না মোরা, জানিতে না চাই
কূল পাব কি না পাব—
জানি না মোরা ভাসিতে ভাসিতে
তরী সাথে কোথা যাব।
আমরা নৌকা চালাব তীব্রবেগে
হয় হ'ক তরী চূর্ণ—
লক্ষ্যের দিকে হব অগ্রসর
হউক না হউক পূর্ণ।
আমরা মাতৃমন্ত্রে লইনু দীক্ষা
সাক্ষী রহিলে গো হরি।
আজি নূতন ভাবে নূতন কাজে
ভাসানু জীবন-তরী।

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন-কথা। (৩)

বিবাহ।

কুমারী হ্যানের বিবাহ তাঁহার জীবনের অপরাপর ঘটনার ন্যায় এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ইহাকে বিবাহ না বলিয়া তাঁহার উদ্দাম গতি প্রকৃতি-প্রবাহের একটা আকস্মিক তরঙ্গ বলিলেই হয়।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী হ্যানের বিবাহ হইল। বিবাহটী নামমাত্রই হইয়াছিল, কিন্তু এই বিবাহ হইতেই তাঁহার বিশ্ব-বিশ্রুত ব্লাভাস্কী নাম। নাম পরিবর্ত্তন বা গোত্রান্তর-গমন অবশ্যই বিবাহের কোন উদ্দেশ্য মধ্যে পরিগণিত নহে। অতএব এরূপ বিবাহের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা,—কোন গুরুত্ব আছে কিনা, থাকিলে উহা কি—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যে দেশে বিবাহ কোন সংস্কারের মধ্যে গণ্য নহে, যে দেশে যেমন তেমন করিয়া কন্যার একটা বিবাহ হইলেই ত্রিকোটী কুল উদ্ধার হয় না, যেদেশে কন্যার বিবাহ মোটে না হইলেও চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয় না,—সে দেশে এরূপ একটা বিবাহ নামক বিড়ম্বনার কি আবশ্যকতা ছিল, বুঝি না। কিন্তু যাহা আবশ্যক, সংসারে তাহাই সকল সময় হয় না, যাহা হিতফলপ্রসূ, তাহাই সকল সময় ঘটে না। ইহাও কি সেই বিধিলিপি? পরন্তু অনেকের বিশ্বাস, সংসারে কিছুই অনাবশ্যক নহে, কিছুই অহেতুক নহে, কিছুই অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখের আকর নহে। কে বলিতে পারে, এই বিবাহ ব্লাভাস্কীর অন্তর-রাজ্যে একটা অদৃশ্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া কালে উহার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর উপর প্রতিফলিত করে নাই? কে বলিতে পারে, এই বিবাহ-বিভ্রাট হইতেই তাঁহার জীবন-তরঙ্গিণী সমাজ-বন্ধনের দুকূল ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন প্রণালীতে প্রধাবিত হইয়া মানব-জাতির পক্ষে মঙ্গল-জনক হয় নাই?

যে বিবাহে চিত্তের বিনিময়, ইহা সে বিবাহ নহে। অথচ যে দেশে ব্লাভাস্কীর জন্ম, সে দেশে চিত্ত-বিনিময়ই বিবাহের প্রধান ভিত্তি, প্রথম প্রয়োজন। তথায় প্রথমেই পাত্র-পাত্রীর পরস্পর সম্মতি চাই, নচেৎ উহাদের বিবাহে পিতা মাতা, অভিভাবক বা অন্য কোন গুরুজনের কোন হাত নাই, বাধ্য-বাধকতা ত দূরের কথা। ব্লাভাস্কী বিবাহ-ব্যাপারে চিত্ত-বিনিময়-মূলক স্বাভাবিক সম্মতির—অর্থাৎ তদ্দেশীয় শাস্ত্র ও আচার-সম্মত পরিণয়ের প্রথম সূত্রেরই অভাব দেখিতে পাই। সুতরাং উহাকে কি প্রকারে বিধি-সঙ্গত বিবাহ বলা যাইতে পারে? কিন্তু বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়া সমষ্টিকেই বাহ্যতঃ লোকে বিবাহানুষ্ঠান বলিয়া থাকে, কাজেই এরূপ অসঙ্গত বিবাহকে বিবাহ বলিতে হইবে। এ বিবাহ চিত্ত-বিনিময়-সঞ্জাত নহে, রূপজ মোহ বা গুণজ প্রণয়জাত নহে, অথবা অন্য কোন স্বার্থমূলকও নহে; অথচ যে পাশ্চাত্য খণ্ডে কন্যা স্বয়ম্বরা, স্বীয় পাত্রনির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনা, সেই স্থলেই এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইহা নিয়তির চক্র বলিব না ত কি?

এদেশের হিন্দু-সমাজে বিবাহ পূর্ব্বানুরাগের উপর নির্ভর করে না। অনুরাগ

দূরে থাকুক, পাত্র পাত্রী কেহ কাহাকে দেখিল না, অথচ বিবাহ হইয়া গেল। কেবল অভিভাবকগণের বিচারের উপর উভয়পক্ষের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিয়া থাকে। তবে কি হিন্দুর বিবাহও বিবাহ নামে উপযুক্ত নয়? উপযুক্ত কিনা, সে বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক। কিন্তু বিবাহ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশ ও বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে যে মূলতঃ প্রভেদ আছে, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সেইজন্য ফলেরও বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য সমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত। তথায় পাত্র-পাত্রীর পরস্পর নির্ব্বাচনে উভয়ের নিরঙ্কুশ-স্বাধীনতা প্রদত্ত থাকায়, যেস্থলে তদনুযায়ী কার্য্য না হয়, সেস্থলে ফল অশুভজনক হইবার অধিক সম্ভাবনা। তদনুযায়ী কার্য্য হইলেও যে ফল সর্ব্বত্র শুভজনক হইবে, ইহা নহে। বরং নির্ব্বাধ নির্ব্বাচণ-ক্ষেত্রে অত্যধিক স্বাধীনতায় এবং বয়ঃসুলভ প্রমত্ততায় স্থলবিশেষে একাধিক স্বার্থের সমাবেশ অসম্ভব নহে। তত্তৎস্থলে বিরুদ্ধ পন্থাভিমুখী স্বার্থনিচয়ের পরস্পর সংঘর্ষ জনিত একদিকে মহোচ্চ আত্ম-ত্যাগের অপার্থিব দৃশ্য, অন্যদিকে গুপ্ত বা প্রকাশ্য নর-হত্যাদির নারকীয় চিত্র—এই উভয়ই পাশ্চাত্য সামাজিক সভ্যতার প্রতিবিম্বস্বরূপ তদ্দেশীয় উপন্যাস সাহিত্যে সুস্পষ্ট অঙ্কিত। কিন্তু হিন্দু সমাজে প্রথমতঃ ঐরূপ স্বাধীনতার মূলতঃ অভাব। ইহা ভিন্ন, হিন্দু-কন্যার অদৃষ্টের উপর একান্ত নির্ভরতা, স্বামী যদবস্থ হউক, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীই স্বর্গ-মুক্তির অবলম্বন-স্বরূপ পরম দেবতা—এই বদ্ধমূল-জ্ঞান, পত্যন্তর গ্রহণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এবং শাস্ত্র-সম্মত হউক বা না হউক, উহার হেয়ত্বেও পাপজনকত্বে আজন্ম-লব্ধ সংস্কার, পাপ-পুণ্যের ফলে গভীর বিশ্বাস,—ইত্যাদি কারণ সমূহ হিন্দু-বিবাহে শুভফলের অন্তরায়গুলির প্রায়শঃ প্রতিঘাতক।

যাহা হউক, ব্লাভাস্কীর বিবাহ সর্ব্বদেশীয় রীতিবহির্ভূত কি স্বতন্ত্র ব্যাপার! এ ক্ষেত্রে জাতীয় প্রথানুযায়ী তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতা সত্ত্বেও উহা বিবাহ নামের উপযুক্ত নয়। ইহাকে স্বাধীনতার অপব্যবহার বলিতে পারেন। কিন্তু কোন্ স্বার্থবশে? যে বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, তখন নারী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান স্বার্থ বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার জন্মিয়াছে—ইহা আশা করা যায়। অথচ বক্ষ্যমান ঘটনায় দেখিতেছি, সে বিষয়ে একেবারেই অন্ধ, অথবা চিন্তাশূন্য বা ভ্রূক্ষেপ-রহিত।

বস্তুতঃ কুমারী হ্যানের যে বিবাহে আদৌ প্রবৃত্তি ছিল, ইহা কোন ক্রমেই অনুমান হয় না। যাঁহার বাল্যকাল হইতে 'স্বাধীনতা-দেবী' হইতে সাধ, তিনি কি কখনও সাংসারিক নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারেন? আজন্ম-স্বেচ্ছাচারিণী নির্লিপ্ত-তপস্বিনী কি কখনও গৃহিণীর আসন অধিকার করিতে পারে? তথাপি কিরূপে এ বিবাহ ঘটিল তাহা কৌতুহলোদ্দীপক, সন্দেহ নাই। ব্যাপারটীও একটু কৌতুকজনক, অধিকন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা কুমারী হ্যানের ফলাফল-নিরপেক্ষ স্বেচ্ছানুগামিতার আর একটী উদাহরণ। কুমারীর বয়স তখন সপ্তদশবর্ষ। অনেক যুবক তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজন রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, সম্পদে, সর্ব্বপ্রকারেই কুমারী হ্যানের উপযুক্ত পাত্র ছিল। তাঁহার বিবাহে ইচ্ছা থাকিলে ইহাদের কাহাকেও বরমাল্য দানে অনুগৃহীত

করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহাদের সহিত তিনি এমন ব্যবহার আরম্ভ করিলেন যে, কেহ অপমানে, কেহ ক্ষোভে, কেহ ভগ্নচিত্তে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময়-কার ঘটনা উল্লেখ করিয়া একজন লেখিকা বলিয়াছেন,—'She was an eagle at a nest of sparrows'—তিনি যেন চটকের বাসায় শ্যেন পক্ষিণীর মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় একদিন বাটীর শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে যেন একটু উপেক্ষার ভাবে ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—'তোমার যেরূপ স্বভাব ও আচরণ, তাহাতে কেহই তোমাকে বিবাহ করিবে না—ইহা আমি বেশ বলিতে পারি।' তারপর তাঁহাকে আরও একটু মর্ম্মবিদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী আবার কহিল,—'ঐ যে বৃদ্ধ কদাকার লোকটাকে দেখিয়া তুমি হাসিয়া থাক,—যাহাকে তুমি পালকহীন দাঁড়কাক বলিয়া ডাক,—সেও তোমার মত মেয়েকে বিবাহ করিতে চায় না।' আর বেশী কথার প্রয়োজন হইল না। শিক্ষয়িত্রী তাঁহার আত্মগৌরবে আঘাত করিয়া, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া যে কথা বলিল,—তাহা অবশ্যই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে,—ইহাই তখন তাঁহার সঙ্কল্প হইল। এই চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া-তিনি কি করিয়া ফেলিলেন? তিন দিন পরেই সেই বৃদ্ধকে দিয়া বিবাহ-প্রস্তাব উপ-স্থিত করিলেন।

উক্ত বৃদ্ধ আর কেহই নহেন,—ইনিই জেনারল ব্লাভাস্কী। ইহার বয়ঃক্রম তখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তবে তিনি নিজে তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ইনি একটী প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। যাহা হউক, কুমারী হ্যান ইঁহাকে বাক্য দান করিয়াই কিন্তু বিষয়টার গুরুত্ব ভাবিয়া বিপদ গণিলেন। ইহাই হইল, এই অযোগ্য বিবাহ রূপ মহা প্রমাদের মূল কারণ।

বিবাহের সময় কুমারী হ্যান মাতামহীর সহিত জেলালগ্নি নামক শৈলে বাস করিতে-ছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মাগমে টিফ্লিস নগরবাসীরা উক্ত শৈলনিবাসে গমন করিয়া থাকে। এই স্থানেই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কুমারী হ্যান বিবাহে সম্মতি দিয়া পর মুহূর্ত্তেই কিরূপে উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ জেনারল ব্লাভাস্কী মহোদয় এক স্বপ্নাতীত সুখ-কল্পনায় বিমুগ্ধ, এবং শীঘ্র শুভ কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কুমারী হ্যানের চৈতন্য হইল—যাঁহাকে তিনি স্বামী বলিয়া বরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন, সে ব্যক্তি তাঁহার কেমন প্রীতিপাত্র! অথবা আজ তাঁহারই সঙ্গে হস্তপদ বদ্ধ হইতে চলিল। তাঁহার একটা 'বিষম ভয়' জন্মিল একথা পরে তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া-ছেন। কোন মারাত্মক বিপৎপাতের সম্ভাবনায় জীব যেমন স্বতঃই প্রাণ-রক্ষার্থে ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ কুমারী হ্যানও এই আশু অনর্থের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। এদিকে সম্বন্ধ সুস্থির হইয়া গেল, কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হইল, বাটীর সকলকেই একথা জ্ঞাত করা হইল, আত্মীয় বন্ধুদিগকেও সংবাদ দেওয়া হইল। বন্ধুগণ প্রত্যুত্তরে আনন্দ-তত্ত্ব পাঠা-ইতে লাগিলেন। অপরিণামদর্শী বালিকা স্বকৃত বাগুড়ায় নিজেই আবদ্ধ হইয়া পড়ি-লেন। স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য ও বিবাহিত

জীবনের গুরুতর দায়িত্ব সম্বন্ধে বালিকার প্রতি অযাচিত উপদেশ-রাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। কুমারী হ্যানের তখন বাক্যব্যয় করা বৃথা হইল,—কে তাঁহার কথা শুনে? বন্ধুবর্গ বলিতে লাগিলেন, বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে যদি এই সম্বন্ধ এক্ষণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তবে যারপরনাই কলঙ্কের কথা হইবে। তাঁহার পিতা কর্ণেল পিটার হ্যান মহোদয় তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। কার্য্যোপলক্ষে আপন সৈন্যদল সহ সুদূর অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। যদিও পত্র দ্বারা তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কিরূপে এহেন বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপিত ও স্থিরীকৃত হইল, তাহার মূল বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। কাজেই এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং কিছুই ইতি-কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে পারেন নাই।

যথাসময়ে কুমারী হ্যান ধর্ম্মমন্দিরের বেদীর সম্মুখে আনীত হইলেন। পুরোহিত গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'তোমাকে স্বামীর সম্মান ও আজ্ঞা পালন করিয়া চলিতে হইবে—ইহা শাস্ত্রের আদেশ।' কোন কার্য্য "করিতেই হইবে" এরূপ বাধ্যতাসূচক কথা বালিকার চির অরুচিকর। পুরোহিতের কথা শুনিয়া ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তিমাকার ধারণ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার বিষময় ফল সম্বরণ করিয়া বিষাদের গাঢ় ছায়ায় মুখ ম্লান হইয়া গেল। 'স্বামীর আজ্ঞা পালন করিতে হইবে'—পুরোহিতের এই আদেশ শুনিয়া আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট স্বরে বলিয়া ফেলিলেন—'আমি কখনই তাহা করিতে পারিব না।' কুমারী হ্যানের এই প্রতিবাদ অনেকের কর্ণে আঘাত করিল। কিন্তু তাই বলিয়া 'বিবাহ' ক্রিয়াটী অননুষ্ঠিত রহিল না। ৭ই জুলাই তারিখে বিবাহকার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। অদৃষ্টের কঠোর পরিহাস!

ফলে, বিবাহের সময় হইতেই নানা গোলযোগের সূত্রপাত হইল। হইবারই কথা। একদিকে ক্রোধ, ভয়, অনুতাপ, বিক্ষোপ এবং এই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তির প্রবল প্রয়াস। অন্যদিকে সস্ত্রীক গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সুখাস্বাদনের উৎকট বাসনা! রাত্রি ও দিনের মধ্যে যত প্রভেদ জেনারল ব্লাভাস্কী ও তাঁহার তরুণী ভার্য্যার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে বোধ হয় তদপেক্ষা কম প্রভেদ ছিল না। সুতরাং বিবাহ-বাসর হইতেই এই পরস্পর-বিরোধী দুইটী প্রবৃত্তি-স্রোতে বিষম সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এই সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবনের দিন কয়েকটী যেভাবে কাটিল, তাহা উপন্যাসের অতি-রঞ্জিত কল্পনায়ও স্থান পায় কিনা, সন্দেহ।

বিবাহের পরদিন জেনারেল মহাশয় নব-বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া স্বীয় গ্রীষ্মাবাস দারিচিচাগ নামক স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যেই শ্রীমতী ব্লাভাস্কী তাঁহার সম্প্রতি-রচিত কৃত্রিম শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া পারস্যসীমান্তের দিকে পলায়নের উদ্যোগ করেন। কিন্তু যে সৈন্যটীর সাহায্যে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন, সে গিয়া জেনারলকে সকল কথা বলিয়া দেয়। সুতরাং বালিকাকে অতি-সাবধানে প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। যথাসময়ে সকলে শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরেই নব-দম্পতী যে কিয়ৎকাল একান্তে গিয়া বাস করে, তাহাকে 'হনিমুন' অর্থাৎ

মধুমাস বলা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত ব্লাভাস্কী মহাশয়ের ইচ্ছা হইল, এই প্রাসাদেই রীতিমত মধুমাসটী অতিবাহিত করেন। কিন্তু মধুমাসের মধুর রস তিক্তাস্বাদে পরিণত হইল।

তিন মাস মাত্র এই নব-দম্পতী একগৃহে একসঙ্গে রহিলেন। কিন্তু উহার একদিনও সদ্ভাবে, সম্প্রীতিতে নহে। একে অন্যকে আপন পথে আনিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই কাহারও বশীভূত হইলেন না। পরস্পর ঘোর কলহে ঐ কয়টা দিন কাটিয়া গেল। শেষে একদিন উভয়ের মধ্যে এমন বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল যে, তাহাতেই সহসা এই অপূর্ব্ব বিবাহ-নাট্যের যবনিকা-পাত হইয়া গেল! শ্রীমতী সেইদিনই স্বামী-গৃহ ত্যাগ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে টিফ্লিস-নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। টিফ্লিসে তখন তাঁহার মাতুল-পরিবারস্থ আত্মীয়-বর্গ বাস করিতেছিলেন।

তিনটী মাসের মধ্যে ব্লাভাস্কীর বিবাহিত জীবন শেষ হইয়া গেল। অবিমৃশ্যকারিতায় যাহার উৎপত্তি, চিরবিচ্ছেদে তাহার পরিসমাপ্তি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উত্তেজনায় যাহার সৃষ্টি—ঘোর অশান্তিতে তাহার নিবৃত্তি। তদবধি আর তাঁহার পরিত্যক্ত স্বামীর সহিত কোন সংশ্রব ছিল না, কিন্তু তিনি এক্ষণ হইতে মাদাম ব্লাভাস্কী নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। বিবাহ প্রকৃতপক্ষে এই নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। তারপর পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী পুনরায় উন্মুক্ত আকাশ-মার্গে উড্ডীন হইল।

ব্লাভাস্কীর জীবনে পুনঃপরিণয় রূপ আর একটী প্রহসন আমরা অতঃপর দেখিতে পাইব। ইহার রঙ্গস্থল আমেরিকার নিউ-ইয়র্কে। এই প্রহসনের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি একটু অন্য রকমের হইলেও, একদিকে তুল্য কৌতুকাবহ এবং অন্যদিকে ইহাতেও মোহান্ধ স্বামীর অবস্থা অনল-মুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় শোচনীয়। ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৭১। অভ্যর্থনা। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। সঞ্জীবনী হইতে পুনর্মুদ্রিত। বিশুদ্ধ ভাবে ও সরলতায় এ পুস্তক এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার যোগ্য। একটু স্থান উদ্ধৃত করিলাম—

এলে যদি এলে নরেশ্বর!
শুনাতে হৃদয় ব্যথা জানাতে মরম-কথা
কৃপা করি দাও অবসর।
ভারত-বিদ্বেষিগণ প্রচারয়ে অনুক্ষণ
রাজদ্রোহী ভারত-সন্তান;
কুকর্ম্মে, কুধর্ম্মে রত, ব্যবহারে পশু মত,
নাহি মাত্র হিতাহিত জ্ঞান।
নিজে তুমি রাজ-রাজ সাক্ষ্য তবে দাও আজ
রাজদ্রোহী মোরা কি সকলে?
কোটি কণ্ঠে শুন বাণী, "জয় রাজা জয় রাণী"
কোটি নেত্র দেখ ভাসে জলে।
তৈল বিনা গৃহ যার, বার মাস অন্ধকার,
সেও তোমা করিতে সম্মান,
একটি সলিতা লয়ে দেখ পুলকিত হ'য়ে,
করিতেছে দ্বারে দীপ দান।

জরাগ্রস্ত কলেবর যষ্ঠি পরে করি ভর
দেখ, অই ভিক্ষাজীবী জন
"জয় রাজা রাণী" বলি ছুটিয়াছে কুতুহলী
একি রাজদ্রোহের লক্ষণ?
আসমুদ্র হিমালয় গায় দেখ তব জয়,
ধনী, দুঃখী সুখী সর্ব্বজন;
বিচারিয়া মহারাজ বল তুমি, বল আজ
একি রাজদ্রোহের লক্ষণ?
যে দেশে বাল্মীকি ব্যাস ভবভূতি কালিদাস,
আর্য্যভট্ট, গৌতম শঙ্কর।
কাব্যের মধুর তানে বিজ্ঞান-দর্শন-জ্ঞানে
বিস্মিত করিলা চরাচর।
সেই দেশবাসী জনে কুটিল নিন্দক গণে
অসভ্য, অভব্য সদা কয়,
সভ্যতা কি কোটে হ্যাটে? ভব্যতা
কি গীতে নাটে?
ভারতের আদর্শ এ নয়।
জিতেন্দ্রিয় সাধু হোক্ ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি রোক্
ধনী, মানী, জ্ঞানী সদাশয়,
কৃষ্ণবর্ণ হেতু, হায়! মান রক্ষা করা দায়
মহারাজ! প্রাণে একি সয়?
করেছ যে বর দান মুগ্ধ তাহে মনঃ প্রাণ
অন্য বর কি চাহিব আর।
এই মাত্র মোরা চাই, যোগ্য হলে যেন পাই
ব্রিটিস প্রজার অধিকার।
এক রাজা, এক রাণী এই সবে মোরা জানি
ভেদাভেদ তবে কি কারণ?
এক প্রেম সূত্র দিয়া বাঁধি কোটী কোটী হিয়া
মহারাজ্য হউক স্থাপন।
কেরাণী, দপ্তরী হয়ে কলমের বোঝা বয়ে
বিশ্বে কারও হয় নি কল্যাণ,
এই কথা চিন্তি মনে লয়ে নিজ মন্ত্রিগণে
করুন্ যা উচিত বিধান।
ব্রিটনের রাজ ধর্ম্মে ব্রিটনের ন্যায় কর্ম্মে
ভারতের আছয়ে বিশ্বাস;
লইব দায়িত্ব ভার, পাব ন্যায্য অধিকার,
ভারতের এই অভিলাষ।
শুন মা ভারতেশ্বরি! জননী সদৃশ হেরি,
তোমারে মা! কি বলিব আর,
জান মা! সন্তান-স্নেহ তোমা বিনা আর কেহ
লবে বল কন্যাদের ভার?
ভারত-ললনা চয় স্নেহের অযোগ্য নয়,
হোক্ "কাল", হোক নিরক্ষর,
পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্মে মমতায়, গৃহকর্ম্মে
অতুলন পৃথিবী ভিতর।
কি আর অধিক কব আজ!
ভারতে নবীন প্রাণ উভয়ে করেছ দান,
জয় রাণী, জয় রাজ-রাজ
সুদীর্ঘ জীবন হোক সুখ শান্তি সদা রোক
সংগ্রামেতে হউক বিজয়;
রাজ-শক্তি থাক্ পূর্ণ দ্রোহিজন হ'ক চূর্ণ
মহারাজ্য হ'ক শান্তিময়।
রাজ-প্রতিনিধি সনে লয়ে নিজ মন্ত্রিগণে
সুখে রাজ্য করুন পালন;
অন্তর্যামী পরাৎপর, দাও প্রভো! এই বর
ভারতবাসীর নিবেদন।"

যোগীন্দ্রনাথের লেখনী নিত্য এইরূপ অমৃত বর্ষণ করুক।

৭৬। উচ্ছ্বাস। শ্রীব্রজনাথ মুন্সি প্রণীত। রাজভক্তির পুস্তক। এ পুস্তক খানিও সুন্দর হইয়াছে।

৭৭। ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেকে রাজভক্তি। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় প্রণীত। এ পুস্তকে রাজভক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু কোন বিশেষত্ব নাই। বিলাতী কাগজে ছাপা।

৭৮। ভক্তি-উপহার। শ্রীআবদুল বারি। এই উপহার সংক্ষিপ্ত হইলেও মনোজ্ঞ হইয়াছে।

৭৯। সঙ্গীত-তত্ত্ব। প্রথম ভাগ। কে, আর, দাশগুপ্ত প্রণীত, মূল্য ॥০।

সঙ্গীতগুলি ভক্তিপূর্ণ। এই পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই উপকৃত হইলাম।

৮০। যুথিকা। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ, এ-আর-এ-এস প্রণীত, মূল্য ।৵০। পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু লেখার পারিপাট্য বড়ই উপাদেয় হইয়াছে—পাঠক ভাষার মাধুর্য্য দেখুন—

যতন-খচিত রতন আসনে,
অলকা-বিজয়ী ললিত-ভূষণে
বাতায়ন পথে আসিয়া—
রক্তিমা মাখা তরল নয়নে,
উচ্চ প্রাসাদে, অর্দ্ধ শয়নে
ভারত-বিধাতা বসিয়া।

পুস্তকখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা যার-পর-নাই আনন্দিত হইব।

৮১। কল্পতরু রামকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন বি-এ। মূল্য ।০ আনা। রামকৃষ্ণ-লীলা কথা যত শুনি, ততই ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়। রামকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ, তাঁহার কথা যত প্রচার হয়, ততই দেশের মঙ্গল, ধর্ম্মের জয়।

৮২। অবকাশ। শ্রীরামসহায় কাব্য-তীর্থ প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। গ্রন্থকারের সব মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই, কিন্তু একথা নির্ভয়ে লিখিতে পারি, তাঁহার লেখা সংযত এবং সুন্দর। কালে তিনি ভাল লেখক হইতে পারিবেন, আশা করি।

৮৩। শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ। শ্রীশশধর বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, মূল্য ৵০ আনা। সরল ভাষায় ব্যাকরণের সমাস পর্য্যন্ত এই পুস্তক বিবৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়, পুস্তকখানি বালক বালিকাগণের বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

৮৪। সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা। শ্রীশশধর বিদ্যাভূষণ প্রণীত, মূল্য ॥০। এই পুস্তকে সংক্ষেপে ব্যাকরণের যাবতীয় কথা বিবৃতির পর, রচনা-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কৃতী লেখকের এ পুস্তকখানিও বেশ সুন্দর হইয়াছে। সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

৮৫। ব্যাকরণ-বিভীষিকা। শ্রীললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। অনেক পুণ্যের ফলে দেশে সুলেখকের আবির্ভাব হয়। কঠিন বিষয়কে যাঁহারা সরল এবং মনোজ্ঞ করিয়া প্রচার করিতে পারেন, এরূপ লেখকের সংখ্যা সর্ব্বদেশেই অল্প। আমাদের দেশে আরো অল্প। ললিত বাবুর কোন ত্রুটী নাই, আমরা এরূপ কথা বলি না। কিন্তু তিনি যে নীরস বিষয়কে সরস করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, এ গুণ অনন্য-সাধারণ। তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছে যে, তাঁহার বাঙ্গালা লিখিবার প্রণালী অতি সুন্দর। তাঁহার এই সুচিন্তিত পুস্তকের সব কথার সহিত একমত হইতে পারি নাই বটে, কিন্তু একথা না লিখিয়া পারি না, তাঁহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল। যখন একে একে বহু বাঙ্গালা-ভাষাবিৎ স্বর্গে চলিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার অভ্যুদয় বড়ই আশাপ্রদ। তাঁহাকে আমরা সাদরে অভিবাদন করিতেছি।

৮৬। আমিত্বের প্রসার। ২য় ভাগ। শ্রীযদুনাথ মজুমদার, এম-এ, বি-এল কর্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড গভীর চিন্তা ও গবেষণা-পূর্ণ হইয়াছিল। এ গ্রন্থ তাহারই উপসংহার। চিন্তা ও গবেষণায়

এ গ্রন্থও অতুলনীয়। গ্রন্থকারের সকল মত বিশদ নয়,—স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকল মতের সহিত আমরা মিলিতেও পারি নাই। তাহা হইলেও, সত্যের খাতিরে একথা বলা কর্ত্তব্য, উপন্যাস-বহুল যুগে গ্রন্থকার এই সুচিন্তিত পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গভীর চিন্তা-রাজ্যে যাঁহারা জাতিকে লইয়া যাইতে চাহেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

৮৭। An easy step to sanskrit Translation Composition by Sasadhar Bidyabhusan price Ten annas. এখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক। পুস্তকখানি প্রথম-শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা বলিতে পারি, গ্রন্থকারের স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক লিখিবার বিশেষ শক্তি আছে।

৮৮। অশোক। চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ১৷৷৹ যাহাদের অনুশীলনে ও লেখনী ধরণে বাঙ্গলা ভাষা আজ গৌরবান্বিত, চারুচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতর। তাঁহার বিশাল হৃদয়খানি দেশের মঙ্গলের জন্য ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার "ধর্ম্মপদ" অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

বুদ্ধদেবের প্রায় দুইশত বৎসর পরে অশোকের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও কীর্ত্তিরাশি এ দেশের গৌরবরসে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তিনি রাজা হইয়াও দয়ার অবতার ছিলেন। তাঁহার পুণ্যময় জীবনকাহিনী বাঙ্গলা ভাষায় বিবৃত করিয়া চারুবাবু এক অতুলিত কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক আমরা অল্পই পড়িয়াছি, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের অসাধারণ প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই পুস্তকখানি এদেশে যে বিশেষ রূপে তাদৃত হইবে সে বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। পুণ্যময় জীবনের পুণ্যময় কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক।

৮৯। পতিব্রতা পূর্ব্বভাগ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য ১, রাজসংস্করণ ১৷৷৹। প্রথম আধ্যায় সতী, দ্বিতীয় সুনীতি, তৃতীয় গান্ধারী, চতুর্থ সাবিত্রী, পঞ্চম দময়ন্তী ষষ্ঠ শকুন্তলা। চিত্র-সম্বলিত। যোগীন্দ্রনাথ যখন যে বিষয়ের হাত দেন, তাহাই উপাদেয় করিয়া তুলেন। এই গ্রন্থে তিনি যে গুণপণা দেখাইয়াছেন, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। এই কাজে ভাষা যেন সহচরীর ন্যায় তাঁহার লেখনীর সেবা করিয়াছে। এই সকল পবিত্র কাহিনী ভারতের ঘরে ঘরে সর্ব্বদা অধীত হইয়া থাকে। এই সকল কাহিনী বিবৃতিতে কৃতীত্ব প্রদর্শন করা সামান্য শক্তির কাজ নয়। যে বিশুদ্ধ সরল ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। তদুপরি তিনি যেন তাঁহার পবিত্র হৃদয়খানি ঢালিয়া দিয়াছেন। বঙ্গ-গৃহকে পবিত্রতার ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত করিতে যোগীন্দ্রনাথের কি অদম্য পিপাসা! পড়িবার সময় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, বহুবার অশ্রুপাত হইয়াছে। গ্রন্থখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গগৃহে প্রচারিত হউক—ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলুক।

বঙ্গ সাহিত্যের জাগরণ। (৩)

নব্যবঙ্গসাহিত্যের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কেরী প্রভৃতি ইংরাজ মহাত্মাগণ বঙ্গ-সাহিত্যের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম এই ভাষাকে দৈন্য অবমাননা এবং সংস্কৃতের পদ-ধূলি-নিপীড়িত অবস্থা হইতে উত্থান করিতে সাহায্য করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গসাহিত্য ও ভাষার নব-আশা-পূর্ণ জীবন আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় হইতে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৭৫ বৎসর কাল নববঙ্গ-সাহিত্যের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত বলিতে পারি। পূর্ব্বাপরের ও নূতন পুরাতনের অস্পষ্ট ছায়ামিলনময় এই মুহূর্ত্ত! ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের স্পষ্ট জাগ্রত অথচ আত্মস্থ কর্ম্মোদ্যোগই এই পৌণে এক শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস।

বৈদেশিক প্রভাব যথোচিতরূপে গ্রহণ করিতে পারাই ভাষার একটা প্রধান শক্তি। এই শক্তি না থাকিলে ভাষার কৌলীন্যই সিদ্ধ হয় না। যথোচিত আরাধিত হইলে কোন সভ্য ভাষাই যে মনুষ্য-হৃদয়ের সমগ্র ভাবচিন্তা প্রকাশে অসমর্থ থাকিবে, জর্ম্মণ-পণ্ডিত শ্লেনেন এই কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বঙ্গীয় গদ্য এই কালে অনুন্নত দশায় থাকিলেও, কেরী প্রভৃতি মহানুভবগণ যে উহার বিপুল সম্ভাবিনী শক্তি অনুভব করিয়াই সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি। এই গদ্যকে যে আমরা এখনও—এতকাল পরেও সম্পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছি, আমাদের এমন বিশ্বাস নাই। বাঙ্গালা গদ্য এখনো কৌমার দশায়, অসংযতলীলা-চাঞ্চল্যে অস্থির ও অপরিণত বয়োবৃদ্ধির অবস্থাতেই রহিয়াছে। শত শত সিদ্ধ-লেখনীর সমাহিত তুলিস্পর্শেই গদ্যভাষার বর্ণসুষমার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে। বঙ্গভাষার কথা ছাড়িয়া দিব, কি ইংরাজী, ফরাসী, কি জর্ম্মন্, কোন ভাষার গদ্যই যে এখন যাবৎ নিজের সমগ্র সুষমা-সীমা লাভ করিয়াছে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। ভাষার শক্তি অতলস্পর্শ ও অপরিসীম, উহা স্বয়ং ব্রাহ্মী শক্তি; সুতরাং অনন্ত ঐশ্বর্য্যের এবং সামর্থ্যের আধার-রূপেই মনুষ্যের হৃদয়ে ও কণ্ঠে জন্মলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকথিত কোন বিদেশীই বঙ্গভাষাকে অধিক অগ্রসর করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণের নিকটেও এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বিশেষ ঋণ নাই। মিশনারীগণ এখনও যেই ভাষায়, বঙ্গীয় অক্ষরে গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন, তাহার নাম বাঙ্গালা ভিন্ন আর যাহা, তাহা দেওয়া যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে এই পরমবুদ্ধিজীবী রাজজাতির দৃষ্টান্ত পরম কৌতূহল-দান করিতেছে। এই জাতি শতাধিক বৎসর বাঙ্গালীর সংস্পর্শে আসিয়াও, তাহার ভাষা এবং সাহিত্যের শক্তি বা প্রকৃতি কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। ইংরাজগণ যেমন "বাবু ইংরাজী"র দৃষ্টান্ত তুলিয়া আমাদের পরিহাস করেন, আমরাও তেমনি 'ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা'র মূর্ত্তি দেখাইয়া উহার পূর্ণ পরিশোধ দিয়া

আসিতেছি। ফলকথা, জাতীয় অন্তরাত্মা এবং ভাবতন্ত্রের মধ্য হইতে আত্মিকশক্তির অভ্যুত্থান না হইলে, কেবল উৎসাহে বা মহদুদ্দেশ্যের প্রণোদনায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র ফল দেখাইতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গে এই সুকৃতীসঙ্গম ঘটে নাই।

নব্যসাহিত্যাদর্শে রামমোহন রায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবেশমুখে সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা রামমোহন রায়ের * সহিত ঐতিহাসিকের সাক্ষাৎ হয়। রামমোহন রায় বাঙ্গালার ভাষায়, সাহিত্যে, সমাজধর্ম্মে, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি-ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য নিজের প্রভাব মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী তাঁহারই তেজঃপ্রভাবে অলোকিত। বঙ্গদেশে উচিত সময়েই এই মহাপুরুষ-সঙ্গম ঘটিয়াছিল। রাম মোহন ইংরাজ, মুসলমান ও প্রাচীন হিন্দুঋষির পরম রজঃসত্ত্ব গুণের সমষ্টি। প্রাচীন ব্রাহ্মণের সরল বেদবেদান্ত গামিনী বুদ্ধিও ঐ বুদ্ধির বিশ্বগ্রাহিণী উদারতা, ইংরাজের নির্ভীক কর্ম্মতৎপরতা, মুসলমান এবং হীব্রু ঋষির অকুণ্ঠিত একেশ্বরনিষ্ঠা, এই সমস্ত গুণসঙ্গমে রামমোহন এসিয়া ও য়ুরোপের সম্মিলিত সদ্ভাবগরিষ্ঠ বীরপুরুষ। বিশ্বসভ্যতার বর্ত্তমান যুগস্রোতে টিকিয়া থাকিতে হইলে,

* রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), বেদান্তসূত্র ও ভাষ্যানুবাদ (১৮১৫) ; বেদান্তসার অনুবাদ (১৮১৬) 'কেন'উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৭) কঠ ও মুণ্ডক (১৮১৭) শাস্ত্রীয় অর্থ (১৮১৮) ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১) ; পথ্য প্রদান (১৮২৪) প্রার্থনা পত্র (১৮২৩) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৮) আত্মানাত্ম বিবেক ; গায়ত্র্যা পরমোপাসিত্যাম্ (১৮২৭) ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮) ; অনুষ্ঠান (১৮২৯) ; গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩০) মজ্জানত তিমির নাশক ইত্যাদি।

আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, ভারতবর্ষকে যেরূপ মনুষ্যসৃষ্টি করিতে হইবে, তাহারই সর্ব্বাদর্শ-বীজভূত এই রামমোহন। পরাধীন বাঙ্গালী সর্ব্ববিষয়ে নির্জ্জীব নহে, বিশ্বরঙ্গভূমে তাহার লীলা ফুরায় নাই ; জীবন-যজ্ঞশালায় তাহার হৃদয়াগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই ; সমিধ্-প্রযুক্ত হইলে তাহা এখনো প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে, ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই রামমোহন। এই প্রকৃতির চরিত্রেই অধঃপতিত জাতির অপরিসীম আশা ও আশ্বাস রহিয়াছে। এই দেশীয় মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র যে একেবারে কঙ্করময় হইয়া পড়ে নাই, রামমোহনই তাহা সর্ব্বপ্রথম প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতনক্ষত্র। এখন, প্রদীপ্ত ঊষালোকে এই সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব লুকাইয়া গেলেও তিনিই এখন যাবৎ বঙ্গগগনে অতর্কিতে কার্য্য করিতেছেন।

ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মৌলিক ব্যবহার-বিধি, প্রাচীন দর্শন ও উপনিষদ্ বেদান্তের তথ্যানুসন্ধান, পক্ষাপক্ষতার যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবভক্তিপূর্ণ নীতিগাথা, সাহিত্য-সমাজে ও ধর্ম্মে বিশ্বোদার পন্থা নির্ণয়, এইসমস্ত বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে রামমোহনের কার্য্য। এই সময়ে ও পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসরে কেরী, হটন, মার্সম্যান প্রভৃতি ইংরাজ,

নবজাগরণ ও বহুমুখী
সাহিত্য-চেষ্টা।

রাম রাম বসু, (১) মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার (২)

(১) প্রতাপাদিত্য-চরিত (১৮০১) লিপিমালা ১৮০২)

(২) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০১) ; পুরুষ পরীক্ষা (১৮০৮) ; রাজাবলী (১৮০৮) প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩)

রাজা রাধাকান্ত দেব, (৩) মধুসূদন তর্কালঙ্কার, (৪) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, (৫) গৌরীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, (৬) মাণিকমোহন তর্কালঙ্কার (৭) প্রভৃতি লেখক ব্যাকরণ, অভিধান, নীতিগ্রন্থ, চরিতকথা, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা, ব্যবস্থা শাস্ত্র, সন্দর্ভ ও কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার শক্তি ও জ্ঞানভাব সম্পত্তির বৃদ্ধি বিধান করিয়া, বাঙ্গালী জাতির সমক্ষে তাঁহার মাতৃভাষার অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করেন। উহার প্রতিকে এইজাতি-মধ্যে যে অভিনব প্রাণস্পন্দন জাগিয়াছিল, রামমোহন রায় তাহারই ঘনীভূত আবর্ত্ত; এবং উহা হইতেই ১৮২৮ খ্রীঃ 'বঙ্গীয় অনুবাদ সমিতি' ১৮৩৬ খ্রীঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-সভা, ১৮৪১ খ্রীঃ তত্ত্ববোধিনী সভা ও ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় ভাষা ও সাহিত্য সভা স্থাপিত হয়; ১৮৩৯ খ্রীঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়ের 'জ্ঞানার্ণব ও ১৮৫৭ খ্রীঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'হিতপ্রভাকর' প্রকাশিত হইয়া উদীয়মান নবসাহিত্যের উষাদীপ্তি দেশময় প্রসারিত হইতে থাকে। এই সমস্ত নাম এবং কালাঙ্ক আপনাদের প্রণিধান যোগ্য বলিয়াই উল্লেখ করিলাম। এইসমস্তই এখন নানাদিকে আমাদের নিকটে ঐতিহাসিক নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই লেখক সম্প্রদায় ন্যূনাধিক ইউরোপীয় ও খাঁটিদেশীয় ভাব-ধারার সম্মিলন স্থান; তাঁহাদের উপরেই প্রাথমিক পলিমৃত্তিকা পতিত হইয়া, তাঁহাদের স্ফুট প্রভাব অদৃশ্য করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এই সাহিত্য-পাদপের আভ্যন্তরীণ প্রাণতত্ত্ব এবং উহার মূল শিকড় তাঁহাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে

প্রসারিত আদর্শ সাধনা ও
সাধক সম্প্রদায়।

ইহার পর, যে সকল কর্ম্মী পুরুষ এই সাহিত্যে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের নাম চির-কালের স্মরণীয় হইয়া আছে। অক্ষয়কুমার দত্ত (১) ও ঈশ্বর গুপ্তের (২) নাম পূর্ব্বেই আসিয়া পড়িয়াছে; ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (৩), কৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায় (৪), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (৫), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (৬),

(৩) স্ত্রীশিক্ষা (১৮২০) শব্দকল্পদ্রুম।
(৪) তোতার ইতিহাস (?)
(৫) কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত (১৮০১)
(৬) জ্ঞানাঞ্জন (১৮২৩)
(৭) (১৮০৫-১৮৪৭); বাসবদত্তা (১৮৩৬) শিশু-[illegible]) ১৮৪০) রসমঞ্জরী।

(১) (১৮২০-১৮৮৬) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক; (১৮৪৩) বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ (১৮৫১) ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫২) চারুপাঠ ১ম ভাগ (১৮৫২) ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৪) তৃতীয় ভাগ (১৮৫৬) পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬) ধর্ম্মনীতি (১৮৭৫) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৮৭০) ২য় ভাগ (১৮৮২)।

(২) (১৮০৯-১৮৫৮) পাষণ্ড পীড়ন মাসিক পত্র (১৮৪৬) প্রবোধ-প্রভাকর (১৮৫৮) হিতপ্রভাকর (১৮৬০) প্রাচীন কবিজীবনী সংগ্রহ ও কলিনাটক।

(৩) (১৮২১-১৮৯১) বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) প্রকৃতি ভূগোল; শিবজীর জীবনী; মিবারের ইতিহাস; ব্যাকরণ প্রবেশ; পত্র কৌমুদী; রহস্যসন্দর্ভ; শিল্পিকা-দর্পণ; কামন্দকী নীতিসার।

(৪) (১৮১৩-১৮৮৫) রোমের পুরাবৃত্ত (১৮৪৩) বিদ্যাকল্পদ্রুম (১৮৪৬) ইজিপ্টের পুরাবৃত্ত (১৮৪৭) পল চরিত্র; খ্রীষ্টচরিত; গ্যালেলিও-চরিত।

(৫) (১৮২৬-১৮৮৭) এডুকেশন গেজেটের সহ সম্পাদক (১৮৫৫) পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) কর্ম্মদেবী (১৮৬২) শূরসুন্দরী (১৮৬৮) বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ; শরীর সাধন; কুমার সম্ভব।

(৬) (১৮২৫ হইতে ১৮৯৪) শিক্ষাদর্পণ মাসিকপত্র

রামনারায়ণ তর্করত্ন (৭), প্যারীচাঁদ মিত্র (৮), রামকমল ভট্টাচার্য্য (৯), তারাশঙ্কর (১০), কবিরত্ন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১১), দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসার (১২)। ইঁহারা নব্য-বঙ্গের নবসাহিত্যাদর্শের নানা পন্থী সাধক; রামমোহন রায়ের দীক্ষা পথেই এই সাহিত্য-সাধনা অগ্রসর হইয়াছিল। বর্ত্তমানের বঙ্গ সাহিত্য ইঁহাদেরই শিষ্য প্রশিষ্যে পরিপূর্ণ।

ইঁহাদের মধ্যে সাহিত্যের আধুনিক ভাবতত্ত্ব ও আদর্শই ক্রিয়ান্বিত হইয়া বঙ্গ-ভাষাকে তাঁহাদের হৃদয়নীরে পরিস্নাত ও পরিমার্জ্জিত করিয়াছে। সেই পরম স্নান-পূত বঙ্গভাষাই আজ অক্ষুণ্ণ-ভাবে বাঙ্গালী জাতির প্রাণবেগ ধারণে সমর্থ হইতেছে।

(১৮৬৪); এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক (১৮৬৮) শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব, অঙ্গুরীয় বিনিময়; পুষ্পাঞ্জলি; পারিবারিক প্রবন্ধ; সামাজিক প্রবন্ধ; আচার প্রবন্ধ; ভারতবর্ষের ইতিহাস; বাঙ্গালার ইতিহাস।

(৭) (১৮২৩-১৮৮৫) পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫২) কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক (১৮৫৪); রত্নমালা; বেণী সংহার; শকুন্তলা; মালতী-মাধব; রুক্মিণী হরণ; নবনাটক।

(৮) (১৮১৬-১৮৮৬) আলালের ঘরের দুলাল, অভেদী; যৎকিঞ্চিৎ; আধ্যাত্মিকা; রামারঞ্জিকা; গীতাঙ্কুর; রসমজীর জীবনী।

(৯) দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ। ১৮৫৮?

(১০) কাদম্বরী (১৮৫৬?)

(১১)মহাভারতের বঙ্গানুবাদ (১৮৬৬); হুতোম পেঁচার নক্সা।

(১২) (১৮২০-১৮৯১) মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ ১৮৪১, বাসুদেব চরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৯, বোধোদয় ১৮৫১, উপক্রমণিকা ১৮৫১, ঋজুপাঠ ১ম ভাগ ১৮৫২, ২য়, ৩য় ভাগ ১৮৫৩, শকুন্তলা ১৮৪৯, চরিতাবলী ১৮৫৬, বর্ণপরিচয় ১৮৫৫, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ১৮৬০, সীতার বনবাস ১৮৬১, ব্যাকরণ-কৌমুদী ১৮৫৪, আখ্যান মঞ্জরী ১৮৬৪, বহুবিবাহ ১৮৭২, বিধবা বিবাহ।

বঙ্গদেশের বিরাট পুরুষ ইঁহাদের নির্ভরেই স্বীয় মস্তক উত্তোলিত করিয়াছেন ও এখন বিশ্বলোক দৃশ্য হইবার আশা করিতেছেন।

স্বদেশের ক্ষেত্রে নূতন পুরাতনের সমুচিত মিলন, দেশ বিদেশের ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের সুসিদ্ধসমন্বয়, ও সর্ব্বোপরি আপন হৃদয়-সমুদ্রের গভীর তল হইতে অপূর্ব্ব দৃষ্ট হীরামণি মুক্তা ও অমৃতসুধার স্বাধীন উপঢৌকন, এই সমস্ত গুণেই সাহিত্য বিশেষ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান লাভ করিতে পারে। এই সমস্ত পুরুষ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কৌলীন্য-মর্য্যাদা সর্ব্ববাদীসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ও ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীকে অনন্ত আশায় অনন্ত পথে পরিচালিত হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং এই স্থলে ইঁহাদের কার্য্য আর একটু বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করিব।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার এবং বঙ্গীয় সাধু ভাষার উদ্ধার।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সম্মিলন ফলে, রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে যেই সত্য-পিপাসা ও ভাবোৎসাহ সন্দীপিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান ফল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের ভাষা ক্ষত্রিয় পণ্ডিতের ন্যায় আবেগময়ী ও বৈভবপ্রিয়া; বিদ্যাসাগরের ভাষা অমায়িক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় সরল, ও বৈদর্ভী রীতির সংস্কৃতের ন্যায় সৌষ্টবময় ও প্রাঞ্জল। উভয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সন্দর্ভ ও কথা-সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত; উভয়েই অনতিগভীর ও অনাবিল জনহিতৈষণায় পরিচালিত। উভয়েই বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যে সংস্কৃতের ও প্রতীচ্য আদর্শের সমন্বয় সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা

দেশের বাস্তবিক জীবন হইতে বহুদূরে পরিপুষ্ট হইয়াছিল; তপোবনে ও অধ্যাপকগণের টোলে ও রাজার-মজলিশে বর্দ্ধিত হইয়া এই ভাষা পরিশেষে দেশবাসীর হৃদয় ও মস্তিষ্ককে জগদ্দল পাথরের ন্যায় ব্যাপিয়া রাখিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের নিকাশ করার পর হইতে, অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে এই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অপরিসীম কূটকাটব্যে ও কৌশলে জমাট বাঁধিয়া মৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ও ভারতের মানবাত্মাকে সর্ব্বদিকে মৃত্যুর অভিমুখে লইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষার এই অধোগতি যে ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতার এবং জাতিভেদ-প্রথার অপরিহার্য্য ফল, তাহা জিজ্ঞাসুমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। ভারতের তপোবন ক্রমে টোলে ও এই টোল ক্রমে 'অকেজো' শিক্ষার ভাণ্ডার হইয়া দেশের কর্ম্মজীবন হইতে, তথা ধর্ম্মজীবন হইতেও দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছিল। নিরবচ্ছিন্ন শাব্দশাস্ত্র ও ন্যায়বাদার্থের বিদ্যার্জ্জন করিয়া মানুষ ২০।২৫ বৎসর কাটাইয়া দিয়া নিজকে বিশ্বজ্ঞানী মনে করিতেছিল। সাধারণের মন হইতে ব্রাহ্মণের প্রকৃত মাহাত্ম্য ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধার ভাব অন্তর্হিত হইয়া কেবল একটা জাতিজন্মগত দূরতার ভাবই ঘনাইতেছিল; নিষ্কর্ম্মা পাণ্ডিত্য ও বেকুবীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর' গল্পটী সমাজে সর্ব্বত্র সকলের মনেই বসিয়া গিয়াছিল। স্বয়ং সংস্কৃত ভাষাটাই যখন দেশ-জীবন হইতে এত দূরবর্ত্তী, তখন তাহার কাব্য-কবিতা বা গদ্যের কথা বলাই বাহুল্য, প্রাচীন হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র ও নাট্য-সাহিত্যের স্থল বিশেষ ভিন্ন সংস্কৃত-ভাষায় প্রকৃত গদ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সংস্কৃতের গদ্য অনর্থক কাব্য ভাবুকতায় এবং বেগতিক শব্দ পাণ্ডিত্যে জটিল হইয়া, অন্যদিকে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিগড়বন্ধনে অটল হইয়াই রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক কিম্বা লাটিন ভাষার ন্যায় গদ্য-সংস্কৃত সাহিত্যে কদাচিৎ মিলিতেছে। উপনিষদে কিম্বা দর্শনাদির ভাষ্যে যেই গদ্য সূচিত হইয়াছিল, তাহাও অকালে বিপরীত সমাসগ্রস্থ হইয়া যায়। বুদ্ধিমান বাঙ্গালীর বাক্যপাণ্ডিত্য ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; বাঙ্গালী পাণ্ডিত্যের ঝোঁকে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এক অপরূপ গদ্যপ্রথা আবিষ্কার করে, তাহার নাম 'গৌড়ীয় রীতি।' পাণ্ডিতগণের সংসর্গে বঙ্গভাষার মধ্যেও এই গৌড়ীয় রীতি প্রবেশ করিতে থাকে ও উহার নাম হইয়াছিল—পাণ্ডিত বাঙ্গালা। এই রীতির প্রধান লক্ষণ কেবল, মনোগত অর্থকে অনর্থক শব্দ সাহায্যে জবরদস্ত ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া প্রকাশ, এককালে উহাই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছিল। স্বয়ং সংস্কৃতভাষাই এই প্রণালীবশে দুরূহ হইয়া যায়। মনে করুন, সংস্কৃতভাষায় সূর্য্যের নির্দ্দেশক অন্ততঃ ত্রিশটী শব্দ অভিধানে আছে। এখন, সূর্য্যোদয় বুঝাইতে গিয়া পণ্ডিতগণ অসঙ্কোচে বলিবেন, ত্বিষাম্পতি উদিত হইতেছেন "বা" বিরোচন উদিত হইতেছেন বা "আদিত্য উদিত হইতেছেন।" এই সকল বাক্যের সঙ্কেতের মধ্যে পরস্পরে যে কত ব্যবধান রহিয়াছে, উহা তাঁহারা মোটেই চিন্তা করিলেন না। সংস্কৃত ভাষার যেমন প্রকৃতি, উহাতে কোন শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না; সকল ভাষাতেই একার্থক শব্দ সংখ্যা পরিমিত। শব্দ উচ্চারিত হওয়ামাত্র মনের মধ্যে তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ একটা অর্থচ্ছবি স্ফুট হইয়া পড়ে; লেখক নিজের অভিপ্রায়ের সহিত উহার সামঞ্জস্য ঘটাইতে না পারিলেই শব্দ

নিরর্থক হইয়া যায়, বরং বিদ্রোহ করিতে থাকে। এই সামঞ্জস্য সিদ্ধি করিতে না পারিলে কেহই সুলেখক গণ্য হইতে পারেন না। এখন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বাঙ্গালীর মনকে এই ভণ্ড পাণ্ডিত্য হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং এই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিব না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা গদ্য যে সুস্থতা, যে সর্ব্বাঙ্গীনতা, যে দেশপ্রাণতার অন্বেষণ করিতেছিল, তাহা একদিকে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে আসিয়াই চরিতার্থ হইয়াছিল।

আধুনিক গদ্যের ভাষা সমূহে গদ্যের আবিষ্কার এবং উহার ভবিষ্যৎ।

সাহিত্যে গদ্যের প্রণালী কত শক্ত, এবং উহা যে কত সাধনায় কত বিলম্বে মানুষকে ধরা দিয়াছে, তাহা মনুষ্যসভ্যতা ও সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে কিছু কিছু ধারণা করিতে পারিব। মানুষের পক্ষে শব্দার্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করাই কত শক্ত, তন্মধ্যে মনের স্বাভাবিকতা সুস্থতা লাভ করাই আবার কত শক্ত হইয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গীন গদ্যের সৃষ্টি আধুনিক ভাষায় চারিশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পর হইতেই মানুষের এই সৌভাগ্য ঘটিয়াছে; মানুষের মন ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ লাভের সুবিধা পাইয়াছে। এখনও যে কোন ভাষা বা সাহিত্য গদ্য সাধনার সম্পূর্ণ সিদ্ধার্থ হইতে পারিয়াছে, তাহা মনে করিবেন না। মানুষ অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর পদ্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছে, অগণ্য অসংখ্য কাব্য কবিতাও পদ্যকথা রচনা করিয়া আসিয়াছে। তাহার অধিকাংশই (কোনটা বা তৎক্ষণে কোনটা বা দুদশ বৎসর পরে) ভস্মসাৎ বা ধূলিসাৎ করিয়া আসিয়াছে। সঞ্চিত সম্পত্তির তিনচতুর্থাংশ মানুষ বর্ত্তমানে শিকায় তুলিয়াছে; যৎসামান্য মাত্রই যে তাহার হৃদয়মনের ও জীবনের সঙ্গীত্ব লাভ করিয়াছে, —চলিত কথায়, তাহার 'চিরজীবনের সাথী' হইয়া আছে, ইহাই দেখিবেন। কোটী কোটী পদকর্ত্তার মধ্য হইতে গুটীকয়েকের মাত্র নামকরণ হইয়াছে—উঁহারা কবি। এত কালের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ শেষে এই মাত্র স্থির করিয়াছে যে, বাণী দেবতার পুত্র হইতে না পারিলে অর্থাৎ অদৃষ্ট শক্তিমান না হইলে কবি হওয়া যায় না। মনুষ্য এখন গদ্যসাধনায় মনোযোগী হইয়াছে। আরও চারি হাজার বৎসর! তৎপর, ফিরিয়া হয় ত গদ্যের বিষয়েও ওই কথাই বলিয়া বসিবে! সৌভাগ্য ভিন্ন অদৃষ্ট কৃপা ভিন্ন গদ্যও ধরা হয় না! বুঝিয়া লউন, গদ্যও কত শক্ত! কবি মলিউর হঠাৎ নবাবের ন্যায় আমরা এতকাল গদ্যই কহিয়া আসিয়াছি—অথচ টের পাই নাই, উহা কি? উহাকে মনের মধ্য হইতে সাহিত্যের মধ্যে অবতারিত করিতে, নিরূপিত করিতে পারি নাই। ঐ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতেও যে কত কঠিন সাধনার আবশ্যক হইবে, তাহা গত ৫০ বৎসরের সাহিত্য কার্য্যফলে আমরা কিছু কিছু বুঝিয়া উঠিতেছি মাত্র। বিংশ শতাব্দীর অপর পারে দাঁড়াইয়া যদি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী এই ক্ষেত্রে কিছু স্থির সঞ্চয়ের ও সঞ্চিত ধনের গৌরব করিতে পারে! বিশ্ব বিষয়কে নিজের মনের মধ্যে, আবার নিজের মাতৃভাষার মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারিলেই উহা প্রকৃত প্রাপ্তি—তৎপূর্ব্বে উহা মনঃ

সমক্ষে ভাসমান মরীচিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাহিত্য-সাধকের পক্ষে এইরূপ মনো-জাগরণ লাভ করাই কত কঠিন! আবার জাগরিত বা উদ্বুদ্ধ মনের পক্ষে সামর্থ্য এবং অধিকার লাভ করিয়া, উপস্থিত বিষয়টীর সর্ব্বত্র তীক্ষ্ণ অথচ সম্প্রসারিত দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া, সমুচিত শব্দদ্বারে অব্যাহত ভাবে উহাকে পরের হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত করা ব্যাপারটাই কত কঠিন! হৃদয় মধ্যস্থ অনন্ত ভাব প্রবাহের মধ্য হইতে কেবল সমুচিত ভাবটীকেই মুষ্টিনিবদ্ধ করিতে, কিম্বা উহার প্রকাশার্থে অপরিহার্য্য শব্দটাকে 'পাকড়' করিতে কেবল যত্নচেষ্টায় কিম্বা সমীক্ষা-পরীক্ষায় কুলায় না! গদ্যের প্রণালীতেও অনন্ত প্রকারের ছন্দ আছে; ঐ ছন্দ অনেক সময় কাব্যকবিতার ছন্দ অপেক্ষাও দুরায়ত্ব! উহার মধ্যে কোনরূপ বাঁধা গৎ, তাল কিম্বা 'বোলচাল' নাই বলিয়াই উহা দুরায়ত্ব! কত সময় ভাব শব্দকে, শব্দ ভাবকে, অথবা উভয়েই যোগাযোগে মনোগত উদ্দেশ্যে এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয়টিকে কত দিকে আবৃত, বিভ্রান্ত না খণ্ড বিখণ্ড করিতে থাকে! এই ব্যাপার, মনোযোগসিদ্ধ পাঠক ও অন্তর্দ্দর্শী লেখক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। তাই সাহিত্যের ইতিহাস খুলিলেই দেখিবেন, শতাব্দী মধ্যে নিতান্ত সামান্য পরিমাণ লেখকেই অসামান্য দৃষ্টি অথবা তদনুরূপ শব্দসিদ্ধি লাভ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইতে পারিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার বাঙ্গালীর জন্য এই সাধন পন্থা পরিষ্কার করিয়াছেন মাত্র; উহাই তাঁহাদের মাহাত্ম্য।

বঙ্গভাষা কর্ত্তৃক কৌলীন্য বিস্তার এবং মাহাত্ম্য-লাভ।

তাঁহারা বঙ্গভাষাকে গ্রামের বর্ব্বরতা, সহরের ইয়ারকি-পনা এবং প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও অপভ্রংশতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, বঙ্গভাষায় আর্য্যকৌলীন্য প্রমাণিত করিয়াছেন, বিপুল বঙ্গদেশ-ব্যাপ্ত এবং সপ্তকোটী মনুষ্যের হৃদয়মর্ম্ম-বাসিনী মাতৃকামূর্ত্তি পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি আর্য্যকথিত দেশভাষার ন্যায় বঙ্গভাষার প্রধান বিশেষত্ব উহার শব্দবিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি, সর্ব্বনাম অব্যয় এবং নির্দ্দেশক প্রভৃতির ব্যবহার; ইঁহারা নানাদিকে এই সমস্তের নিরূপণ এবং নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং কৃত্তিবাস প্রভৃতির সময় হইতেই বঙ্গভাষা একরূপ দ্বৈধসমস্যায়, পদ্যগতির শৃঙ্খলে সঙ্কুচিত হইয়া, নানাদিকে বিভ্রান্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছিল। ইঁহাদের হস্তেই বঙ্গীয় সাধুভাষা জাগরিত হইয়া, আত্মপরিচয় লাভ করিয়া এবং বাঙ্গালীর মনকে প্রসারিত করিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতের প্রধান দোষ উহার দুরতা, অনর্থক শব্দাড়ম্বর, সমাস, বিশেষণাদির দীর্ঘসূত্রতা, বাক্যগতির চিহ্নবিচ্ছেদ-বিহীন পাকচক্র এবং বিলম্বিত ছন্দ, তাঁহারা স্বয়ং এইসমস্ত দোষ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে না পারিলেও, তাঁহাদের ভাষা কিম্বা ভাব কদাচিৎ পরস্পরে ব্যভিচারী হইতে পারিয়াছে। তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে মহদন্তঃকরণের সুবিস্তারিত উচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল; এবং ঐ উচ্ছ্বাসেই অতর্কিতে তাঁহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তির গৌরবমাহাত্ম্য এবং বিস্তার নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। অন্তরাত্মার অভ্যন্তর হইতেই লেখকগণের বাক্যপ্রণালী মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে! 'সীতার বনবাস' কিম্বা 'স্বপ্নদর্শনের' অন্তরাত্মা প্রাকৃত বাঙ্গালার

কুশ্মালঙ্গময় উচ্চারণ পদ্ধতি অথবা কোমলতার মধ্যে আপনার স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই; উহাদের প্রাণ-কল্লোল সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা এবং সঙ্কীর্ণতাকে বিদীর্ণ করিয়া, পরিপ্লাবী হইয়া, চির-বিলুপ্ত আর্য্য সরস্বতীর বিপুল ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহাই বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় কুমার দত্তের বাক্য-প্রণালীর অন্তরঙ্গীয় রহস্য। তাঁহাদের জন্যেই বঙ্গসরস্বতী একদিকে আপনার বিলুপ্ত গৌরব লাভ করিয়া, অন্যদিকে দেশভক্তি এবং দেশপ্রাণতাকেও সুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

পূজার অবকাশে।

বঙ্গে বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিতে না বাজিতে, বিজয়ার দিন বৈকালে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলের বোম্বে মেলে, আমরা বোম্বাই যাত্রা করিলাম। দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে দ্রুত আসিয়া ট্রেণে চড়িতে একটু শ্রান্তিবোধ হইয়াছিল, কিন্তু গাড়ীর মধ্যে বৈদ্যুতিক ব্যজনী-সঞ্চালিত শীতল সমীর-সেবনে শীঘ্রই তাহা প্রশমিত হইল। বিশেষতঃ নীচের তিনটী বাথ্‌ই আমাদিগের দলের তিনজনের জন্য পূর্ব্ব হইতে রিজার্ভ করিয়া রাখায় অন্য আগন্তুকের কোন উপদ্রব সহ্য করিবার আশঙ্কা রহিল না—আমরা অচিরেই আপনাপন শয্যা বিছাইয়া নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম,—গাড়ীও ষ্টেসনের জনকোলাহল ভেদ করিয়া বিকট বংশীরব সহকারে গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইল।

প্রাচীনত্বে ও সম্পদগৌরবে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ভারতীয় রেলপথ সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও যাত্রীর স্বচ্ছন্দতা সাধন কল্পে বেঙ্গল-নাগপুর লাইন অনেকাংশে অগ্রণী বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যুতিক ব্যজনী ইহার অন্যতম পরিচয়। ঈষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এ সুখটুকু পাওয়া যায় না—বৈদ্যুতিক আলোকও অতি বিরল। পরন্তু দুইটী বিষয়ে বেঙ্গল-নাগপুর লাইনের একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হইল।—প্রথমতঃ উহার প্রত্যেক ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমই তরু-লতা-ফল-ফুলে সুসজ্জিত যেন একটী প্রমোদ-উদ্যানের ন্যায় রমণীয়; নিতান্ত নগণ্য ষ্টেসনে, বিশেষ কিছু না থাকিলেও দুই চারিটা গাঁদার গাছ, বা দশ পাঁচটা কদলীতরু উহার উপলময় প্লাট্‌ফরমে একটু শ্যামল শোভার সঞ্চার করিয়া থাকে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ানেও পূর্ব্বে এ প্রথার প্রচলন ছিল, কিন্তু কোথাও পুরাতনের পূর্ব্বাবশেষ ভিন্ন অধুনা আর উহার বড় আদর দেখা যায় না।—দ্বিতীয়তঃ অত্রত্য প্রত্যেক প্লাট্‌ফরমের অন্তবর্ত্তী নিম্নশ্রেণীর যাত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট

শৌচাগারের সম্মুখে,স্ত্রী পুরুষের পৃথক্ প্রবেশ-দ্বার-বিজ্ঞাপনের জন্য, ভাষায় লেখার পরিবর্ত্তে, মাত্র রমণী ও পুরুষের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এ ব্যবস্থা বড়ই সুন্দর বোধ হয়। নিম্নশ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই অধিক, লিখিত বিজ্ঞাপন পাঠে ভেদাভেদ বুঝা তাহাদিগের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু এই অঙ্কিত মূর্ত্তি দর্শনে যথা স্থান নির্ণয় করিয়া লইতে কোন অসুবিধাই ঘটে না। প্রত্যেক রেল-পথে এই সুপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়।

যাহা হউক, আমাদিগের এই বিচার-বিতর্কের অপেক্ষা না করিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে দৌড়িতে লাগিল এবং হোরমিলার কোম্পানীর জলযান-যোগে ঘাটাল ও তমলুক যাত্রীগণের জন্য কোলাঘাটে তিন মিনিট মাত্র থামিয়া, দুই ঘণ্টার মধ্যে খড়্গপুরে পৌঁছিল। এইটী এ লাইনের একটী বিশিষ্ট ষ্টেশন। সুবিশাল লৌহবর্ত্ম এখান হইতে ত্রিমুখী হইয়া দক্ষিণে ওয়ালটেয়ার অতিক্রম পূর্ব্বক মান্দ্রাজাভিমুখে, বায়ুকোণে মেদিনীপুর বাঁকুড়া ছাড়াইয়া আদ্রা হইতে পুরুলিয়ার পথে এবং পশ্চিমে নাগপুর পশ্চাৎ করিয়া বোম্বা'য়ের দিকে গিয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গাড়ী শেষোক্ত পথ অনুসরণ করিল। এই ত্রিপথের সন্ধিস্থল ভিন্ন, এ লাইনের যাবতীয় এঞ্জিন ও গাড়ী নির্ম্মাণের এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালনের কল-কারখানা এই ষ্টেশনে বিদ্যমান থাকায় এস্থানের প্রতিপত্তি অধিক। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের লিলুয়া ও জামালপুরের কারখানা সকলের তুলনায় হীন হইলেও, এখানকার ব্যাপারও বড় সামান্য নহে। ঐ ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য এখানে প্রায় সার্দ্ধ দুইশত বিঘা ব্যাপী কারখানায় একশত ইংরাজ ও পাঁচ সহস্রেরও অধিক দেশী কারিগর প্রত্যহ কাজ করিয়া থাকে।

১৫ মিনিট কাল গাড়ী এখানে অপেক্ষা করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল এবং মাঝে ২।৩টী ষ্টেশনে ক্ষণকাল মাত্র থামিয়া রাত্রি ৮টার সময় চক্রধরপুরে পৌঁছিল। এখানেই এই ট্রেণের সাহেব যাত্রীগণের সান্ধ্য-ভোজনের আড্ডা। দূর প্রবাসে যাতায়াত পক্ষে সাহেবদিগের এবং সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত বাবুদিগেরই সুবিধা;—কি বাষ্প-রথে, কি জলপথে, সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের প্রাতরাশ, জলযোগ, সান্ধ্যভোজ প্রভৃতি সরবরাহ করিবার সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু বাবর্চির প্রসাদ-রসে বীত-স্পৃহ আমাদের ন্যায় বর্ব্বরগণের পক্ষে বরাবরই বিষম কষ্ট। কোন রেলের কর্ত্তৃপক্ষই সে কষ্টের কথায় কর্ণপাত করেন না, সুতরাং সুব্রাহ্মণ-পরিচালিত সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন আহারের স্থান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ষ্টেশনসমূহে তবু ফল-মূল মিষ্টান্নাদি আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়, এ লাইনে তাহারও অসদ্ভাব; খড়্গপুর অতিক্রম করার পর আর ভদ্র বাঙ্গালীর খাদ্য বড় দেখা যায় না। চক্রধরপুরে অনেকের ভাগ্যে, বোধ হয়, চিপিটক-চর্ব্বণই ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদিগের কোন স্নেহাস্পদ আত্মীয় সেখানে থাকায় ও আমাদিগের আগমন-বার্ত্তা যথা সময়ে জানিতে পারায়, আমাদিগকে সে কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। আমরা বহুদিনের পর আত্মীয় সন্দর্শন সুখের সঙ্গে পরস্পর আলাপ আলিঙ্গনাদি বিজয়াকৃত্য সেখানেই সমাপন করিয়া সুখাদ্য-ভোজ্যে সুন্দর তৃপ্তি লাভ করিলাম।

অতঃপর নির্ব্বিঘ্ন নিদ্রায় নিশাযাপন করায় আর পথের পরিচয় লইতে পারি নাই। সুর্য্যোদয়ে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন গাড়ী মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ রায়পুর ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছে। উহা অতিক্রম করার পর মধ্যে দুইটী ষ্টেশনে মিনিট দুই অপেক্ষা করিয়া, নয়টা না বাজিতে, গাড়ী ডঙ্গরগড়ে পৌঁছিল। একসময়ে এই স্থান ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল ছিল—এমন কি, এই রেলপথের রচনা-কালে কত কুলি কর্ম্মচারী শার্দ্দুল-কবলিত হইয়াছে—আর এখন এই ষ্টেশনের শোভা দর্শনে নয়ন মুগ্ধ হয়। সাহেবদিগের প্রাত-রাশের জন্য গাড়ী এখানে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিল, সেই অবসরে আমরা প্রাতঃকৃত্য ও যথাসম্ভব সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া লইলাম। তখন ক্ষুধার উদ্রেক হইল, কিন্তু তন্নিবারণোপযোগী সঙ্গে বিশেষ কিছু না থাকায় শুষ্কমুখেই চলিতে হইল। প্রায় ১১টার সময় গাড়ী গণ্ডিয়ায় পৌছিল। এই স্থানে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত জনৈক বাঙ্গালী রেলকর্ম্মচারী ছিলেন। বেচারা তখন বালেশ্বরে বদলির হুকুম পাইয়া বোঁচকা বুঁচকি বাঁধিতে ব্যস্ত; সেই অবস্থাতেও আমাদিগের আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বপাক-নিষ্পন্ন সুন্দর লুচি-তরকারি লইয়া উপস্থিত। 'রেলের বাবু' সাধারণতঃ কলঙ্কের কাহিনীই শুনা যায়, কিন্তু এই সহৃদয় রেলের বাবুর ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকারও, বোধকরি, তদীয় চরিত্রে বিরল নহে। বলা বাহুল্য, তাঁহার বদান্যতায় আমরা অচিরে জঠর-জ্বালার শান্তি বিধান করিলাম।

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় আমরা নাগপুরে পৌছিলাম। বেঙ্গল-নাগপুর লাইনের পশ্চিম সীমা এইখানেই শেষ হইয়াছে; অতঃপর গাড়ী গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে অবলম্বন করিল। নাগ নামক ক্ষুদ্র নদের উপকূলে অবস্থিত বলিয়াই, বোধ হয়, এই নগরের নাম নাগপুর। অধুনাতন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী—এই প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী সহর রঘুজী ভোঁসলে-প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র-গৌরবের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দেয়। সহরের মধ্যে সীতাবল্‌দি নামক প্রধান জনপদের সন্নিহিত তন্নামধেয় শৈলদুর্গ ব্রিটীশ রাজ্যের বিজয়কেতন বহন করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই শৈলের উপরেই, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, আপাসাহেব ভোঁসলে কর্ত্তৃক তদা-নীন্তন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট আক্রান্ত হইয়াছিলেন; পরে কর্ণেল গোহেন-প্রমুখ ব্রিটীশ-সেনা কর্ত্তৃক অচিরে আপা সাহেব বিতাড়িত হয়েন এবং ব্রিটীশ-বিজয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, তথায় দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহা হউক, সে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। আমাদিগের ন্যায় সাধারণ যাত্রীর চিত্তাকর্ষক স্থানও এখানে যথেষ্ট আছে;—তুলসীবাগ, মহারাজবাগ প্রভৃতি উদ্যান,—অম্বাঝারি, তেলেঙ্খেরি প্রভৃতি দীর্ঘিকা, হিস্‌লপ ও মরিস কলেজ,—সার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেলের নামাঙ্কিত টাউনহল,—সাধারণ গ্রন্থালয় ও চিত্রশালিকা (Museum)—সুতার ও কাপড়ের কল প্রভৃতি সকলেরই দর্শনযোগ্য। এখানকার সুমিষ্ট কমলার পরিচয় কলিকাতা-বাসী পাঠকের অপরিজ্ঞাত নহে,—আমরা তাহারই রসাস্বাদন করিতে করিতে গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইলাম।

নাগপুর হইতে বোম্বায়ের পথে অনেক ষ্টেশন পড়ে, তন্মধ্যে ওআর্দ্ধা, বদ্‌নেরা, অকোলা, জলম্ব, ভুসাবাল, জলগাঁও, মমন্দ,

নাসিক ও কল্যাণ উল্লেখযোগ্য। ওয়াদ্ধা হইতে হিঙ্গনঘাট হইয়া বল্লাপুর—বদ্‌নেরা হইতে অমরাবতী, জলম্ব হইতে খামগাঁ,—ভুসাবাল হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলা রেলপথের সন্ধিস্থল জব্বলপুর,—জলগাঁও হইতে অমলনের হইয়া তাপ্তী-উপত্যকা-যোগে সৌরাষ্ট্র, মনমদ হইতে ধন্দ,—কল্যাণ হইতে পুণা, এইরূপ উল্লিখিত প্রায় প্রত্যেক ষ্টেসন হইতেই শাখা নির্গত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত স্থানই প্রাকৃতিক সম্পদে, ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায় বা বাণিজ্যসূত্রে, ন্যূনাধিক খ্যাতি ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন। তন্মধ্যে পুণ্যতোয়া গোদাবরীতীরস্থ নাসিক নগরই হিন্দুর চক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইস্থানে পঞ্চবটী-বনে, এককালে লোকাভিরাম রামচন্দ্র পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী সঙ্গে দারুণ নির্ব্বাসন-কাল-যাপন করিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটী মধ্যে পুণ্য-সলিল রামকুণ্ডে তিনি প্রতিদিন স্নানাহ্নিক করিতেন,—এইস্থানে নির্ম্মলচরিত্র ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ স্বেচ্ছাচারিণী শূর্পণখার নাসাচ্ছেদন করিয়াছিলেন, সে কারণে উহা একাল পর্য্যন্ত নাসিক নামে প্রসিদ্ধ। ইহারই সন্নিহিত গুহা হইতে দুষ্ট দশানন সাধ্বী সতী জনকনন্দিনীকে হরণ করেন। এই সমস্ত পুণ্য-স্মৃতি-বলে এস্থান এখনও পরম পবিত্র;—বস্তুতঃ পশ্চিম ভারতে গোদাবরী-বিধৌত নাসিক গঙ্গাতীরস্থ লোকবিশ্রুত বারাণসীর ন্যায় পুণ্য-ক্ষেত্র। শিলামণ্ডিত সোপান-সংলগ্ন গোদাবরী-সলিলে স্নান করিয়া শত শত নর-নারী পাপের পঙ্কিলতা দূর করিতেছে, তীরে নানা দেবমন্দির দর্শকের নয়নসার্থক করিতেছে—পঞ্চবটী-মধ্যস্থ শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে রামসীতা ও লক্ষ্মণের দিব্য মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে,—এবং অদূরে শিবমন্দির প্রাচীনত্বের ও বলরামের মন্দির মনোহারিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এ শোভার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও, এই পথে যাইতে যাইতে বঙ্গদেশদুর্ল্লভ অদৃষ্টপূর্ব্ব তূলার চাষ দর্শনে মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বোক্ত হিঙ্গনঘাট ও অকোলার অদূরবর্ত্তী অকোট নামক স্থানে উৎকৃষ্ট তূলার হাট হইয়া থাকে।

নাসিক ও কল্যাণের মধ্যে ঈগটপুরী নামক ষ্টেশন হইতে পরবর্ত্তী কাসাড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাঁচ ক্রোশ পথ সমগ্র জি-আই-পি রেলওয়ের মধ্যে, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ। উহা একাধারে নৈসর্গিক শোভার ভাণ্ডার এবং মানুষের অদ্ভুত উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয়-স্থল। এ শোভা স্বচক্ষে দেখিয়া, এ পরিচয় স্বয়ং লইয়া মুগ্ধ হইতে হয়,—অন্যের কথায় ইহা বুঝা সুকঠিন। তৃণ-লতা-বন-ফুলে পরিশোভিত সারি সারি শৈলমালা উচ্চ হইতে উচ্চে থালঘাট শৃঙ্গোপরি উঠিয়াছে এবং তথা হইতে স্তরে স্তরে নিম্নাভিমুখে কাসাড়ায় পৌঁছিয়াছে; প্রকৃতির গম্ভীর নিস্তব্ধ ভাব,—কোথাও বনজ-বিহঙ্গের কাকলি বা পার্ব্বত্য নির্ঝরের কুল-কুল-ধ্বনি মাত্র সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এই জনশূন্য শৈল-সমাচ্ছন্ন প্রদেশ ভেদ করিয়া কিরূপে লোকালয়ে পৌঁছিব—ভাবিয়া আকুল হইতে হয়। কিন্তু এঞ্জিনিয়ারের বুদ্ধিবলে এই দুর্ভেদ্য পথও সুগম হইয়াছে। সুরঙ্গের পর সুরঙ্গ ভেদ করিয়া রন্ধ্রপথে গাড়ী দ্রুতবেগে দৌড়িতে থাকে, কোথাও শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে অতলস্পর্শ উপত্যকা ভূমির উপর দোদুল্যমান সেতুপথ দিয়া চলে, এবং বিষম বক্রগতি পরিহার করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ষ্টেশনদ্বয়ের প্রায় মধ্যভাগে একস্থানে (Reversing Station)

একই পথে গাড়ী দুইবার চলিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। এইসকল ব্যবস্থা দেখিয়া চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয় ও একাধারে দার্জ্জিলিং ও সিমলা রেলপথের আভাস পাওয়া যায়। সাকল্যে দেড় মাইলেরও অধিক দূরব্যাপী ১২টী সুরঙ্গ (tunnels) ও প্রায় অর্দ্ধ মাইল-ব্যাপী গিরিশৃঙ্গোপরি দোদুল্যমান ছয়টী সেতুপথ (viaducts) ১৫টী সেতু এবং ৬২টী পয়োনালী (culverts) বিশিষ্ট, ছয় বৎসর-ব্যাপী চেষ্টায় পরিসমাপ্ত, উক্ত পাঁচক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে ৪৫ মিনিট মাত্র সময় অতিবাহিত হয়।

এই সমস্ত অপরূপ দৃশ্য অতিক্রম করিয়া গাড়ী কল্যাণে পৌছিল। বোম্বাই সহর হইতে সহরতলীর গাড়ী এ লাইনে এইস্থান পর্য্যন্তই যাতায়াত করে। এইগাড়ী গমনা-গমনের ব্যবস্থায় অস্মদ্দেশীয় রেলপথগুলি বোম্বায়ের অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী। রেলওয়ের অগ্রগণ্য ঈষ্ট-ইণ্ডিয়ান লাইন দিয়া রাজধানী কলিকাতার পার্শ্ব হইতে দিবারাত্রে মাত্র ৩৭ খানি ট্রেণ ছাড়ে, আর সেই সময়ের মধ্যে বোম্বাই হইতে গ্রেট-ইণ্ডিয়ান যোগে কল্যাণের পথে ৬৫ ও বম্বে-বরোদা লাইনে বিরারের দিকে ৬৪ খানি ট্রেণ যায়। সহর-তলীর কোনখানে যাইবার জন্য এখানে কাহাকেও সময় দেখিয়া বাহির হইতে হয় না,—ট্রামগাড়ীর ন্যায় দুইচারি মিনিট ষ্টেশনে অপেক্ষা করিলেই ট্রেণ পাওয়া যায়।

যাহা হউক, বর্ষার বন্যায় একাধিক স্থানে রেলপথের অবস্থা সহজ না থাকায়, আমা-দিগের গাড়ী, নিয়মিত সময়ের দুইঘণ্টা পরে, বেলা প্রায় ৯ টার সময় বম্বের ভিক্টোরিয়া টার্ম্মিনাস নামক বড় ষ্টেশনে পৌছিল। এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—ভারতের অন্যত্র এতবড় ও এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ষ্টেসন আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। প্রায় ৫০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আমাদের হাবড়া ষ্টেসন নির্ম্মিত হইল,—কিন্তু, কি স্থাপত্যগৌরবে, কি শৃঙ্খলা-সৌষ্ঠবে, উহা বম্বেবাসীর ভিক্টোরিয়া ষ্টেশ-নের পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য নহে। সহ-রের শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা সমূহের মধ্যে উহা এক দেখিবার সামগ্রী।

অপরিচিত আগন্তুকের পক্ষে রাজধানী কলিকাতা বড় বিষম স্থান! বাসের জন্য একটু স্থান নির্ণয় করিতে আমাদিগের ন্যায় যাত্রীকে এখানে অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। বোম্বায়ে সে অসুবিধা নাই;—সাহেবদিগের ন্যায় সেখানে হিন্দুর বাসোপ-যোগী সর্দ্দার হোটেল, কাশ্মীর হোটেল, এম্পায়ার হোটেল, প্রভৃতি ছোটবড় অনেক পান্থনিবাস আছে এবং তাহার কর্ম্মচারী-গণ ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিয়া, নিজ নিজ আবাসের সুবিধা স্বচ্ছন্দতা বুঝাইয়া যাত্রী-গণকে লইয়া যায়। আমরা এইরূপে পরিচিত হইয়া এম্পায়ার হোটেলে নীত হইলাম। উহা ষ্টেশনের অতি সন্নিকট—এক মিনিটের পথ—হর্ণবি নামক সুপ্রশস্ত রাজপথের উপর প্রকাণ্ড অট্টালিকার চতুর্থতলে অবস্থিত। সোপান সাহায্যে উচ্চে উঠিবার কষ্ট সহ্য করিতে হয় না,—বৈদ্যুতিক উত্তোলন-যন্ত্রে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলাম এবং রাজপথের সম্মুখীন তিনজনের বাসো-পযোগী এক প্রশস্ত গৃহে স্থান পাইলাম। এ হোটেলের প্রত্যেক গৃহ পরিষ্কৃত ও খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, আরশি-আলনা প্রভৃতি আবশ্যক গৃহসজ্জায় সজ্জিত এবং বৈদ্যুতিক ব্যজনী ও আলোক বিশিষ্ট। স্নানা

গার ও শৌচাগার মার্ব্বেল-মণ্ডিত। আহা-রের স্থান,কাল ও ব্যবস্থা সুন্দর ও সুসংযত; আহার্য্য সামগ্রী মৎস্য মাংস বর্জ্জিত। হোটে-লের কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারীগণ বিনয় বিনম্র ও পরিচর্য্যাপরায়ণ। ফলতঃ নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বাসের পক্ষে এ স্থান সর্ব্বাংশে তৃপ্তি-কর, অথচ ব্যয়ের মাত্রাও বড় অধিক নহে, —লোকপ্রতি দৈনিক দেড়টাকা মাত্র। কলি কাতায় আমাদিগের একাধিক বোর্ডিং-বাসের অভিজ্ঞতা আছে; হিন্দুর জন্য প্রতি-ষ্ঠিত হইলেও সেখানে অনেক বিষয় অহিন্দু-য়ানী লক্ষিত হয়,—প্রধানা পরিচারিকাই সেখানকার'সর্ব্বে সর্ব্বা,—ভৃত্যমাত্রেই উদ্ধত ও অবাধ্য,—আহার্য্য সামগ্রী অতি কদর্য্য, পরন্তু পরিবেশনের শৃঙ্খলাভাবে ভোজনকালে 'দেহিদেহি' রবে পাকশালা প্রকম্পিত হইয়া উঠে। সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিচালিত সেই সব বোর্ডিঙের তুলনায় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ পরিচালিত বোম্বের এই হোটেল আদর্শস্থল।

আহারান্তে আমরা সহর প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা করিলাম। কলিকাতা-সুলভঃ তৃতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণীর 'ছক্কড়' এখানে নাই—সমস্তই রাবার-টায়াড্ ফিটন। বাঙ্গালীর ন্যায় বম্বেবাসীগণ অবরোধ-রুদ্ধ না হওয়ায় এরূপ গাড়ীতে এখানকার জনসাধারণের কোন অসুবিধা ঘটে না, বরং লৌহচক্রে ঘর্ষিত না হওয়ায় পথের অবস্থা ভাল থাকে। সহরের সকলদিকে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ীও যথেষ্ট যাতায়াত করে এবং শ্রেণী নির্ব্বিশেষে চারি পয়সা মাত্র ব্যয়ে তাহাতে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ট্রামের টিকিটের ব্যবস্থাও সুন্দর—তাহাতে তারিখ, সময় (পূর্ব্বাহ্ন কিম্বা অপরাহ্ন) গন্তব্যস্থান, একাধিক পথের সন্ধিস্থল, প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট থাকায় প্রতারণার পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা এক-খান ফিটন আশ্রয় করিয়া ঘুরিতে লাগিলাম, এবং পোত-সংস্কারস্থান (Docks), ভিক্টো-রিয়া উদ্যান, মালাবর পাহাড়, পার্শি শ্মশান-ক্ষেত্র (Tower of Silence), Hanging Garden, পুষ্পপ্রস্রবন (Floral Fountain) হাইকোর্ট, সেক্রেটেরিয়েট, ইউনিভার্সিটী হল ও ক্লক টাওয়ার, ডাকঘর ও তারঘর, বম্বে-বরদা লাইনের আপিস, আপেলো বন্দর, তাজমহল হোটেল, টাউনহল, এলফিন্‌ষ্টোন কলেজ, মিউনিসিপ্যাল আফিস ও বাজার, প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানগুলি একে একে দেখিয়া চক্ষু চরিতার্থ করিলাম।

Victoria Garden একাধারে কলি-কাতার পশুশালা, উদ্ভিদ্যান ও চিত্রশালি-কার কার্য্য সাধন করে। এতিনের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, ইহা বেশ সুশৃঙ্খল ও সুরুচি-সম্পন্ন। মালাবর পাহাড়ের উপরে যত সম্ভ্রান্ত সাহেব ও পার্শি ধনকুবেরদিগের অট্টালিকা ও পুষ্পবাটিকা। ইহারই শেষ প্রান্তে অত্রত্য লাটভবন এবং এক অংশে বালুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহালক্ষ্মী ও দ্বারকানাথ নামক অপর দুই একটী ভিন্ন বম্বে সহরে হিন্দুর দেবদেবীর সংখ্যা অতি অল্প। সহরে সরবরাহোপযোগী সারি সারি জল-ভাণ্ডারের (reservoir) ছাদোপরি বিন্যস্ত কুসুমোদ্যানের নাম Hanging Gar-den; উহা কলিকাতার Wellington উদ্যানের অনুরূপ—কেবল একটী সযত্নরক্ষিত, অপরটী হতাদৃত, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। আপেলো বন্দরের কোন বিশেষত্ব নাই; তবে ইহাই বিলাত যাত্রীর জাহাজে

উঠা-নামার ঘাট, আর সুপ্রশস্ত শিলামণ্ডিত বাঁধা ঘাটের উপর সমুদ্রনিকর-সিক্ত সুশীতল সান্ধ্য-সমীরণ-সেবনোপযোগী সুন্দর বসিবার স্থান। উপরেই ষড়্ভূমিক তাজমহল-হোটেলের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বাহ্য সৌষ্ঠবে কলিকাতার কোন হোটেলই উহার সমকক্ষ বোধ হয় না। পার্শির প্রেতকৃত্য অপরূপ; মৃতদেহের দাহ বা সমাধি হয় না—নিভৃত অট্টালিকা-প্রাঙ্গণস্থ কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহা গৃধ্রকুলের তৃপ্তি সাধন করে। রুচি ও সংস্কার ভেদে মানুষ মৃতের যেরূপেই সৎকার করুক, উহার পরিণতি এক; অতএব পার্শির এই ব্যাপারে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, বরং প্রেতভূমির এই অভিনবত্ব ও নিভৃত গাম্ভীর্য্য দর্শনে মনে ভক্তিপ্রণোদিত ভয়ের সঞ্চার হয়। পার্শি ভিন্ন অপর সকল ধর্ম্মাবলম্বীর অন্ত্যেষ্টির জন্য বম্বে সহরের মধ্যে একই স্থান নির্দ্দিষ্ট; হিন্দুর শ্মশান, মুসলমানের কবরস্থান, খ্রীষ্টিয়ানের সমাধিক্ষেত্র, পরস্পর সংলগ্ন, উচ্চ প্রাচীর মাত্র প্রত্যেকের পার্থক্য রক্ষা করে। কলিকাতার হগ সাহেবের বাজারের অনুরূপ বোম্বায়ের ক্রফোর্ড্ মার্কেট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও শৃঙ্খলায় তাহা অপেক্ষা হীন নহে; পরন্তু উহার সন্নিহিত মিউনিসিপ্যাল-প্রাসাদ রচনা-পরিপাট্যে রাজধানীর তদনুরূপ অট্টালিকা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবযোগ্য বোধ হয়।

কি নৈসর্গিক শোভায়, কি জানপদ রচনায়, বম্বে সহর বিলক্ষণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। ইহার পথ ঘাট, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলা দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। সাধারণ হিতকর ও সহরের শোভাকর অনেক সামগ্রীই সহৃদয় পার্শি পুঙ্গবদিগের বদান্যতার পরিচয়স্থল। তাহার প্রত্যেকটীর যথাযথ বর্ণনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সীমাবহির্ভূত। সহরের অনতিদূরস্থ দাদর ও প্যারেল নামক স্থানে ন্যূনাধিক ৬৪টী সূতা ও কাপড়ের কল আছে; তাহার অধিকাংশই পার্শিগণের প্রতিষ্ঠিত। দুর্ভাগ্যক্রমে, তাহার একটীও দেখিবার আমাদিগের সময় ও সুযোগ হইল না। দিব্য গ্যাসালোক-দীপে উদ্ভাসিত প্রশস্ত রাজপথের নানাস্থানে সাহেবী ধরণের স্বদেশী-পরিচালিত রেষ্টরাণ্টগুলির শোভা দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমরা বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

পরদিন প্রাতে আমরা বম্বের তিন ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তী আরবসাগরের মধ্যস্থ এলিফাণ্টা দ্বীপ দর্শনে যাত্রা করিলাম। সেখানে যাওয়া পক্ষে কিল্লিক নিক্সন কোম্পানীর জাহাজেই সুবিধা। জাহাজ প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় মোদীবন্দর হইতে ছাড়িয়া এক ঘণ্টার মধ্যে দ্বীপে পৌঁছে, এবং ১১টার পরেই তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধ্যাহ্নে বম্বে আসে। ভাড়াও অল্প— প্রথম শ্রেণী এক টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী ছয় আনা এবং তৃতীয় শ্রেণী দশ পয়সা মাত্র। যথা সময়ে পৌঁছিতে না পারায় আমাদিগের সে সুবিধা ঘটিল না—অন্যতম উপায় 'জলি বোট' আশ্রয় করিতে হইল। এই ক্ষুদ্র নৌকাযোগে সাগর-বক্ষে যাইতে যাইতে "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনস্মি সাগরং" ভাবিয়া মনে শঙ্কা উপস্থিত হইল; কিন্তু বঙ্গোপসাগরের ন্যায় এ সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ নাই—এই লবণাম্বুরাশি ভাগীরথী-প্রবাহের ন্যায় ধীর, স্থির, প্রশান্ত,—বায়ুবিক্ষোভ ব্যতীত ইহার তরঙ্গভঙ্গি দেখা যায় না,—আমরা নির্ব্বিঘ্নে দ্বীপে উপনীত হইলাম। প্রত্যাগমনকালে মধ্যপথে একটু বাত্যা উপস্থিত হইল, সঙ্গে

সঙ্গে বিলক্ষণ একটু তুফানও দেখা দিল,—
"এযে অকূল পাথার, নাই(ক) সাঁতার
কুল-কিনারা আর কি পাব ?"—
ভাবিয়া মনে ঘোর আতঙ্কও জন্মিল,—তবে বিঘ্নবিনাশনের কৃপায় কোন বিপদে পড়িতে হইল না।

দ্বীপের দক্ষিণাংশে পূর্ব্বতন অবতরণস্থলে প্রকাণ্ড প্রস্তরে খোদিত হস্তীমূর্ত্তি ছিল বলিয়া পর্ত্তুগীজেরা উহার এলিফ্যাণ্টা নাম দিয়াছিলেন। এই দ্বীপ উহার মধ্যস্থ গুহা-সকলের জন্য প্রসিদ্ধ। অজন্তা বা ইলোরার তুলনায় এখনকার গুহাগুলি সংখ্যায় ও ভাস্কর্য্যে অনেকাংশে হীন হইলেও, উহা শৈব সম্প্রদায়ের পরম শ্রদ্ধার পদার্থ এবং হিন্দুর শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শনস্থল। শুনা যায়, পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসনকালে এই গুহা খোদিত করিয়া তথায় তপশ্চর্য্যা করিতেন। যিনিই খোদিত করুন, তিনি যে হিন্দু-ভাস্কর্য্যের অক্ষয়-কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কঠিন প্রস্তর কাটিয়া সারি সারি স্তম্ভোপরি অবস্থিত প্রকাণ্ড মণ্ডপ মধ্যে খোদিত দেবমূর্ত্তি দর্শনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়, আর স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মনে স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—"এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর-মূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য * * * পুরুষমূর্ত্তি (ও) * * * স্ত্রীমূর্ত্তি যা'রা গড়িয়াছে, তা'রা কি (আমাদের মত) হিন্দু?"—তখন যথার্থই মনে হয়, আমরা "হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসার্থক করিয়াছি।"—এখানে ছয়টী গুহা আছে, তন্মধ্যে চারিটী সম্পূর্ণ, একটী অসম্পূর্ণ, আর একটী আকারে বৃহৎ হইলেও এক্ষণে প্রায় মৃত্তিকাস্তূপে পরিপূর্ণ। খোদিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রধান গুহার পশ্চাদ্বর্ত্তী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একীভূত ত্রিমূর্ত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ত্রিমূর্ত্তির উভয়পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে; তন্মধ্যে হংসারূঢ় ব্রহ্মা, গরুড়াসীন বিষ্ণু, ঐরাবতপৃষ্ঠে ইন্দ্র, অৰ্দ্ধনারীশ্বর, মহাকাল, হরপার্ব্বতী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে।

গুহা দর্শনের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা দর্শনী দিতে হয়। উহা আদায়ের জন্য সরকারী কর্ম্মচারী আছেন এবং তাঁহার কার্য্যালয়ের সম্মুখে দর্শকগণের বিশ্রামোপযোগী বসিবার ব্যবস্থা আছে। এই স্থানে বম্বেবাসী সম্ভ্রান্তবংশীয় কতিপয় শিক্ষানবিশ যুবক বনভোজনার্থ গমন করিয়াছিলেন। আদর-আপ্যায়নে তাঁহারা আমাদিগকে মুগ্ধ করিলেন। স্বার্থপূর্ণ সংসারের গণ্ডিবহির্ভূত যুবক-সম্প্রদায় ভিন্ন এরূপ নিঃস্বার্থ যত্ন অন্যত্র দুর্লভ।

এইরূপে বম্বে যাত্রায় পূজার অবকাশ আমাদের বড় মন্দ কাটিল না।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

ভক্তকবি সূরদাস।

"সুর কবিত্ সুনি কৌন কবি, জো নহিঁ সির চালন ক'রে।"

নাভাজী, ভক্তমাল।

"সুর সুর (সূর্য্য), তুলসী শশী, উরগন (তারা) কেশব দাস।
অবকে কবি খদ্যোত সম, জহঁ তহঁ করত প্রকাশ॥"

"He and Tulsidas are the two great stars in the firmanent of Indian Vernacular poetry, Tulsi devoted to Ram, Suradas to Krishna."

Grierson.

কারণ-ভেদে কার্য্যভেদ। সকল যুগে জাতীয় চরিত্রের সকল গুণের বিকাশ হয় না। সকল অবস্থা জাতীয় জীবনের সকল ভাবোন্মেষের পক্ষে অনুকূল নহে। বীরত্ব, কবিত্ব, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রভৃতি কতক পরিমাণে বিশেষ বিশেষ জাতির নিজস্ব এবং প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হইলেও, যুগভেদে পর্য্যায়ক্রমে একই জাতির চরিত্রে বিভিন্ন শক্তির বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে একবার এমন এক যুগ আসিয়াছিল, যখন ভাব-নদীতে প্রেম ও ভক্তির বাণ ডাকিয়া উভয়কূল প্লাবিত করিয়াছিল। আদি রসের ঘুমঘোরে যবন বিজেতার হুঙ্কার শুনিয়া 'আলসলালস' নয়নে ভারতবাসী কি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল। সে মহাজাগরণের ভাবোচ্ছ্বাস কবির ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছিল। ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে এই হীরক-যুগের মহাকবি সুরদাস ও তুলসীদাস। ইঁহারা ব্যাস ও বাল্মীকির অবতার। সুতরাং ইঁহাদের বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা। ভারতীয় কবিত্বগগনে ইঁহারা চন্দ্র সূর্য্য।

দেবদূত মহম্মদ-প্রচারিত ইসলাম ধর্ম্ম যখন ভারতে রামকৃষ্ণ-প্রচারিত প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্মকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ সংস্কৃত যখন হিন্দী ও ব্রজভাষাকে আসর প্রদান করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিল, তখন এই দুই দেবযোনী সুধাকণ্ঠে মধুরতানে ব্যোমমার্গ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সে প্রেমের টানে, ভক্তির গানে আবার যমুনার জল উজান বহিয়াছিল, আবার অচল চঞ্চল হইয়াছিল, আবার গগনে চন্দ্র সূর্য্য মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারতের মৃতকল্প জড়দেহে নব চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল। সে সঙ্গীত-লহরীর সুধাঝঙ্কার, সে কাকলীতান এখনও নদী-পর্ব্বত-কানন-প্রান্তর-গুহা-সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ আর্য্যাবর্ত্তে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

উত্তর ভারতে প্রচলিত ভাষা-পরিবারে ব্রজভাষা আদি ভাষা। সে ভাষার পদাবলী অতি ললিত, অতি মধুর, অতি শ্রুতিসুখকর। তাহা কাণের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করে। এ হেন স্বাভাবিক কবিত্বের খনি ব্রজভাষার আদিকবি ভক্ত চূড়ামণি সুরদাস। সুরদাস,

ব্রজভাষায় এবং তুলসীদাস হিন্দী ভাষায় ভারতে যে নববেদ প্রচার করিয়াছিলেন, এখন তাহা কোটী মানবের জীবন-ধর্ম্ম।

ইংলণ্ডের অন্ধকবি অমর কাব্য রচনা করিয়া অক্ষয় ফল উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ তাহা আস্বাদন করিয়া অমর হইতে পারে নাই। (১) হিন্দুস্থানের অন্ধকবি সাধু সুরদাস যে ললিত মধুর পদাবলীর স্নিগ্ধ তরল স্রোত কৌমুদীর ন্যায় অযাচিত ভাবে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা পান করিয়া আপামর সাধারণ ধন্য হইতেছে। খিরথর, সুলেমান ও হালাপর্ব্বত সীমান্ত হইতে রাজমহলের গিরিপ্রান্ত পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তে এমন কে আছে, যে সুরদাসের নাম শুনে নাই? এমন কে আছে, যে দীন দরিদ্র অন্ধ দেখিলে আজও 'সুরদাস' বলিয়া কৃপা, দয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কাতর হইবে? যে সাধু-মহাকবির নামে জগতের অন্ধ ভিখারী সম্প্রদায় আভিজাত্য লাভ করিয়াছে, তিনি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন দৈববলে বলীয়ান্ মহাপুরুষ ছিলেন।

প্রতিভা আসে, বিদ্যুতের ন্যায় অন্ধকারে উদ্ভাসিত হইয়া ঘনঘটার অন্তরালে আঁধারে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং প্রতিভার কুল, শীল, বংশ পরিচয় লইয়া উত্তরকালে অনন্ত বিবাদের সৃষ্টি চিরকালই হইয়া আসিতেছে। কবি সুরদাসের বংশ, সময় ও জাতি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে দিল্লীর নিকট সিহীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রামদাস ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতেন এবং গৌঘাট নামক স্থানে বাস করিতেন। ভক্তমাল, চৌরাশীবার্ত্তা, ভক্তবিনোদ গ্রন্থকার মিয়াসিংহ এবং নব প্রকাশিত হিন্দী নবরত্ন এইমত সমর্থন করেন। কেহ কেহ বলেন, যে বংশে চাঁদকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রামদাস-নন্দন সুরদাস সেই ভাটবংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ভারত সম্রাট আকবরের সভার ভাটকবি এবং গায়ক ছিলেন। শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন সাহেব দৃঢ়তার সহিত এই মতের পোষকতা করেন। (১) কবি স্বয়ং দৃষ্টকূটে যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রার্থজ গোত্রীয় জগাত বংশীয় ব্রহ্মরাব নামে একব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। সেই বংশে ভারত-বিখ্যাত থানেশ্বরের বীর মহারাজ পৃথ্বীরাওর সভাকবি চন্দ্রবর্দ্দি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। চাঁদকবিকে পৃথ্বীরাজ জ্বালাদেশ সমগ্র দান করিয়াছিলেন। তাঁহার ৪ পুত্র। জ্যেষ্ঠ গুণচন্দ্র পিতৃরাজ্য জলাভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুণচন্দ্রের পুত্র শীলচন্দ্র, শীলচন্দ্রের পুত্র বীরচন্দ্র। ইনি রণথম্বরপতি বীরহামিরের বাল্যসখা ছিলেন। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তিমকালে আলাউদ্দীন খিলিজীর সহিত সংগ্রামে হামির নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহস্র মহিষী অনলে জীবনাহুতি প্রদান করিয়া 'সতী' হইয়াছিলেন। বীরচন্দ্রের বংশে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আগ্রায় বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র বা রামদাস কবি সুরজ চন্দ্র বা সুরদাসের পিতা। (২)

[1] Classical poet Milton.

[1] He was not a "Saraswat" Brahman and that his father was not a beggar and did not live at Ganghat. G. A Grierson.

[2] Grierson's Hindi Literature.

মতান্তরে বীরের ৭ পুত্র। যথা,—১। কৃষ্ণ-চন্দ্র, ২। উদারচন্দ্র, ৩। জুরূপচন্দ্র বা রূপ-চন্দ্র, ৪। বুদ্ধিচন্দ্র, ৫। দেবচন্দ্র, ৬। প্রবে'-ধচন্দ্র বা (সংস্কৃতচাঁদ) এবং ৭। সূরজচন্দ্র বা সূরদাস। (১) আর সকল ভ্রাতাই মুসলমান-দিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। সূর-অন্ধকূপে পতিত হইয়া ছয়দিন ছয়রাত্র ভগ-বান্‌কে ডাকিলেন। কেহই তাঁহাকে উদ্ধার করিল না। সপ্তমদিনে যদুপতি স্বয়ং তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দর্শন দিলেন। (২) এবং অন্ধ সূরদাসকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ভক্ত সূরদাস বলিলেন, "প্রভো, আমাকে এই বর দিন্ যেন শ্রীচরণে আমার অচলা ভক্তি থাকে. যেন আমার শত্রুনাশ হয় (৩) এবং যখন একবার প্রভুর শ্রীরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি, এ নয়নে যেন রাধাশ্যাম ভিন্ন আর কিছু কথ-নও দেখিতে না হয়।" কৃপাসিন্ধু বলিলেন, 'এবমস্তু', দক্ষিণ দেশীয় প্রবল প্রতাপ ব্রাহ্মণ তোমার শত্রুনাশ করিবেন।" (৪)

পরো কূপ পুকার (১) কাহু সুনীনা সংসার।
সাতয়েঁদিন আয় জদুপতি, কিয়োআয়ু (২) উধার।
দিব্য চখ দৈ কহী সিসু সুনু জোগবর (৩) জো চাহি।
হৌঁ কহি প্রভু ভগতি (৪) চাহত সত্রুনাশ স্বভাই। (৫)
দুসরো না রূপ দেখোঁ, দেখি রাধাশ্যাম।
সুনত করুণাসিন্ধু ভাখী (৬) 'এবমস্তু' সুধাম।
প্রবল দচ্ছিন (৭) বিপ্রকুলতে সত্রু হৈহৈ (৮)হৈ নাস।
অখিলবুদ্ধি বিচার বিদ্যা মানমানৈ মাস। (৯)
ইত্যাদি।

দৃষ্টকূট অনুসারে সূরদাস, সূরজদাস বা সূরশ্যাম জগাত কিম্বা জগাতিয়া ভাট ছিলেন। চাঁদকবিকে কেবল ভাট বলিয়াই সকলে জানে। দৃষ্টকূটে পেশোয়ার নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র শক্তির সমুত্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ভক্তবিনোদ গ্রন্থে সূরদাসের কূপপতন উল্লেখ আছে, কিন্তু বরদানের উল্লেখ নাই। এই সকল কারণে কেহ কেহ দৃষ্টকূটের এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (১০) কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও কতটুকু কৃত্রিম এবং কতটুকু অকৃত্রিম, কেহ তাহা নির্ণয় করিতে সাহস করেন নাই। অতএব আমরা শ্রীযুক্ত গ্রিয়ার্সন সাহেবের সহিত একমত হইয়া কবি সূরদাসকে ব্রহ্ম-ভাট বলিতে ইতস্তত: করিব না।

গ্রিয়ার্সন সাহেবের মতে সূরদাস ১৫৪০ সংবৎ (১৪৮৩ খ্রীঃ) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। (১) কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি ১৬৪০ সং জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) সূরদাসের গ্রন্থ বলিয়াছেন, তিনি গোস্বামী বল্লভাচার্য্য এবং তৎপুত্র বিঠ্‌ঠল নাথ গোস্বামীর সময় জীবিত ছিলেন।

"শ্রীবল্লভ সুচল সন্তত নিত উঠি গাউঁ"।
"শ্রীবল্লভগুরু তত্ত্ব সুনায়ো লীলাভেদবতায়ো।"

---

(১) হিন্দী নবরত্ন, (২) পক্ষে পাপ মুক্ত করিয়া জ্ঞানদান করিলেন। (৩) রিপুদমন হয়।

(4) "Thine enemy will be destroyed by a mighty Brahman of the Deccan."
Grierson.

(১) চীৎকার করিয়া টাকা, (২) জীবন, প্রাণ, (৩) যোগ্যবর (৪) ভক্তি (৫) সমস্ত, (৬) কহিলেন (৭) দক্ষিণ (৮) হইবে (৯) রাজ্য (১০) হিন্দী নবরত্ন।

(1) According to tradition he was born at Sambat 1540 (1483 A. D) Grierson,
(2) শিবসিংহসরোজ।

"থপি গোঁসাই করী মেরী আঠ মধ্যে ছাপ।"
"ভজি শ্রীবিঠঠল চরণ সরোজ ইত্যাদি।"

গোস্বামী বল্লভাচার্য্য ১৫৩৭—১৫৯৭ সং এবং গোস্বামী বিঠঠলনাথ ১৫৭২—১৬৪২ সং পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। (৩) সুরদাস-বিরচিত সাহিত্যলহরী গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণেও জানিতে পারা যায়, তিনি সম্ভবতঃ ১৫৪০ সংবৎ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মুনি পুনি বরসকে রস লেখ।
দসনগৌরী নন্দকো লিখি সুবল সম্বত পেখ।
নন্দনন্দন মাসছৈ তেহীন ত্রিতিয়াবার।
নন্দনন্দন জনমতে হৈঁ বাণ সুখ আগার।
তৃতিয় ঋক্ষ সুকর্ম্মজোগ বিচারী সূত নবীন।
নন্দনন্দন দাস হিত সাহিত্যলহরী কীন।

মুনি = ৭, বয়স = ০, রস = ৬, দসনগৌরিনন্দ = ১, = ১৬০৭

নন্দনন্দন মাস = বৈশাখ, ছৈতেহীন = তৃতীয়া, অক্ষয়তৃতীয়া, তৃতিয়ঋক্ষ = কৃত্তিকা নক্ষত্র, সুকর্ম্মযোগ। অতএব ১৬০৭ বিক্রমাব্দে সাহিত্যলহরী রচিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর ছিল। (১) তদনুসারে ১৪৮৩ কিম্বা ১৪৮৪খ্রীঃ কবি সুরদাসের জন্মবৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন কিনা, এ বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি আজন্ম চক্ষুহীন ছিলেন।—

"জনমহি তে হৈঁ নৈন বিহীনা।" (২)

অন্যমতে তিনি জন্মান্ধ ছিলেন না। (৩) কিন্তু যৌবনে কোন যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল। সাধু সুর আত্ম সংবরণ করিলেও তাঁহার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। যে ইন্দ্রিয় তাঁহাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তৎপ্রতি ঘৃণা ও রোষ জন্মিল। কাতর সুরদাস অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে স্বহস্তে সূচীদ্বারা উভয় চক্ষু ভেদ করিলেন। তদবধি সুরদাস 'নয়ন বিহীন' অন্ধ। এই প্রবাদ সাধারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিল্বমঙ্গলও এইরূপে দৃষ্টিহীন হইয়াছিলেন বলিয়া বিদিত। আমাদের দেশে একই উক্তি অনেকের প্রতি আরোপ করা হয়। বিক্রমাদিত্য, রাজাভোজ, কালিদাস ও সাধু রামপ্রসাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া এই প্রকার শত শত অলীকোক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। যে দেশে এতকাল কিম্বদন্তী ও লোকস্মৃতির উপর ইতিহাস নির্ভর করিয়াছে, সে দেশের প্রাচীন কাহিনী সন্দেহ ও সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হয়।

অষ্টমবর্ষে সুরদাসের যজ্ঞোপবীত হইয়াছিল। (১) আগ্রা বাস কালে তাঁহার পিতা রামদাস তাঁহাকে ভাষা (হিন্দী) পারশী এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। (২) আবুল ফজল বলেন, রামদাস গোয়ালিয়র হইতে আসিয়াছিলেন। বদৌনী বলেন, তিনি লক্ষ্ণৌবাসী ছিলেন। (৩)

সুরদাস বাল্যকালে তাঁহার জনক জননীর সমভিব্যাহারে মথুরা গিয়াছিলেন।

(3) হিন্দী নবরত্ন।

(১) হিন্দী নবরত্ন।

(২) রসরপিকাবলী, রেওয়ানরেশ মহারাজ রঘুনাথ সিংহ প্রণীত।

(৩) কিম্বদন্তী।

(1) হিন্দী নবরত্ন। (2) Grierson.

(3) Abul Fazl says Ramdas came from Gwaliyar, Badaoni says he came from Lakhnan. Grierson.

তাঁহার পিতা গৃহে প্রত্যাগমনোন্মুখ হইলে বালক সূর মিনতি করিয়া কহিলেন, "অব মুঝে য়ঁহী রহনে দো।" এখন আমাকে এখানেই থাকিতে দাও। পিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুঝে একেলে কিসকে সহার ছোড় জাবেঁ?" তোমাকে একেলাটী কার কাছে রেখে যাব? বিশ্বাসী সূর সরলভাবে নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণচন্দ্রকা সহারা ক্যা থোড়া হৈ?" (১) যে বালকের এমন সরল বিশ্বাসী প্রাণ, সে নিশ্চয়ই কোন স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত নররূপে ধরাতলে অবতীর্ণ। সূরদাস কলি-যুগে একাধারে ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। তাঁহার উক্তি শুনিয়া পিতামাতা অবাক হইয়া রহিলেন। বালক কিছুতেই মথুরা ছাড়িয়া যাইবে না। জনৈক সাধু রামদাসকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, তোমাদের কোন চিন্তা নাই। "মৈঁ ইস বালককো আপনে সাথ রক্‌খুঙ্গা।" সেইদিন হইতে সূর ব্রজধামে বাস করিতে লাগিলেন।

সূরদাসের কূপেপতন পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, কূপপতন সম্বন্ধীয় কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও হইতে পারে। কবি কি ভাবে উহা লিখিয়াছেন, নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই।

ইহার পর সূরদাস গঊঘাট গমন করিয়াছিলেন। গৌঘাট আগরা হইতে ৯ ক্রোশ দূরে মথুরার পথে অবস্থিত। তথায় গমন কালে সূর গোস্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। (২) তৎপর সূর বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে গোকুলে শ্রীনাথের মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় ভক্ত সূরদাস বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। শ্রীনাথের মন্দিরেই সূরদাসের সহিত গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথ জীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয়ে কৃষ্ণালাপে মহানন্দে সময় যাপন করিতেন। সূরদাসের অসাধারণ কবিত্ব, ভগবদ্‌প্রেম, এবং ভাগবত গ্রন্থে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথ তাঁহাকে 'অষ্টছাপ' ভুক্ত করিয়া লইলেন। (৩)

"থপি গোসাঁই করীমেরী আঠমধ্যে ছাপ।"

ব্রজের অষ্ট বৈষ্ণব চূড়ামণি তখন বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তকবি ছিলেন। ইঁহাদের নাম— ১। সূরদাস, ২। কুম্ভনদাস, ৩। পরমানন্দদাস, ৪। কৃষ্ণদাস, ৫। ছীতস্বামী, ৬। গোবিন্দস্বামী, ৭। চতুর্ভুজ দাস, ৮। নন্দদাস। ইঁহাদের প্রথম চারিজন বল্লভাচার্য্যের এবং শেষোক্ত চারিজন গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্য ছিলেন। ব্রজভাষার অরুণোদয়ে সকলেই কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এই অষ্ট কবি-চক্রে সূরদাস মহারাজ চক্রবর্ত্তী।

অন্ধকবি সূরদাস ভাবোন্মাদে মত্ত হইয়া মুখে মুখে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া অনর্গল কবিতা রচনা করিয়া যাইতেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া রাখিতেন। কথিত আছে, সূরদাস যখন এইরূপ ভাবাবেশে আকুল হইয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতেন, তাঁহার হৃদয়-সিন্ধুর গভীরতম প্রদেশ হইতে যখন কৃষ্ণপ্রেমের কবিত্ব-উৎস উচ্ছ্বসিত হইত, তখন কোন শিষ্য উপস্থিত না থাকিলে ভক্তের ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সূরদাসের মুখ-বিনিসৃত মধুর পদাবলী স্বহস্তে লিখিতেন। (১)

(১) "কৃষ্ণচন্দ্রের সহায়তা কি কম?"

(২) হিন্দী নবরত্ন।

(৩) I then went to live in Braja where the holymaster বিঠ্‌ঠলনাথ entered my name in অষ্টছাপ। Grierson.

(1) Subsequently to his becoming bl-

একদিন সূরদাস জানিতে পারিলেন, লেখক কবিতা মুখ হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই লিখিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সূরদাস অন্তর্যামী হৃদি-বৃন্দাবন-বিহারীর ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ লেখকের হস্ত চাঁপিয়া ধরিলেন। লেখক কোন প্রকারে বলপূর্ব্বক হাত ছিনাইয়া লইয়া অদৃশ্য হইলেন। সূর আকুল হইয়া গাহিলেন:—

"কর ছটকাই জাতু হো দুর্ব্বল জানি মোহি।
হৃদয় নে জো জাহুগে মরদ বখানো তোহি॥
(১)

এমন করিয়া তন্ময় না হইলে এবং এমন করিয়া নারায়ণকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে কি কেহ এতবড় মহাপুরুষ হইতে পারে?

এই সময় সূরদাসের কবিত্বের ছটা দিক্-দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল। তাঁহার অতুল যশের তরঙ্গভঙ্গ আগ্রার রাজপ্রাসাদে আঘাত করিয়াছিল। বহুশিষ্য সূর-চরণে শির অবনত করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিল। ভারতসম্রাট আকবর তাঁহার সৌরভের আঘ্রাণ পাইয়া সূরদাসকে রাজসভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। (২)

সূর বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা ও কৃষ্ণালাপে সময়াতিপাত করিতেন। গোস্বামীজী প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিয়া সাধু-সহবাস সুখভোগ করিতেন। অন্তিমদশা নিকটবর্ত্তী হইলে সূর বুঝিতে পারিয়া পাবাসোলী গমন করিলেন। গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখানে উভয়ে ভজন ও কৃষ্ণগুণালাপে মত্ত হইলেন। এই সময় সূর গুরুভক্তের ললিত পদ শুনাইয়াছিলেন।

"ভরোসা দৃঢ় ইনচরনন করো।
শ্রীবল্লভ নখচন্দ ছটা বিনু সব জগ মাঁঝ
অঁাধরো।
সাধন ঔরন হীয়া কলিমেঁ জাসোঁ হোত
নিবেরো। (১)
সূর কহা কহি দুবিধি অঁাধরো (২) বিনা
মোলক চেরো।" (৩)

শেষ মুহূর্ত্তে আসন্ন হইল সূর রাধাকৃষ্ণ ভজন করিতে লাগিলেন। সে ভজনে পশুপক্ষী মুগ্ধ হইল, পাষাণ বিগলিত হইয়া সুধাস্রোত প্রবাহিত হইল। সূরদাসের দুনয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল। গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"সূরদাসজী, নেত্রকীবৃত্তি কহাঁ হৈ?"
সূরদাস তোমার চক্ষুর ক্রিয়া কোথায়?
সূর উত্তর করিলেন:—

খঞ্জন নৈন রূপ রস মাতে।
অতি সৈ চারু চপল অনিয়ারে পল পিঞ্জরান
সমাতে॥
চলি চলি জাত নিকট শ্রবননকে উলটি পলটি
তাটক্ ফঁদাতে।
সূরদাস অঞ্জন গুণ অটকে না তরু অব
উড়িজাতে॥

---

ind, during the absence of his amanuensis, Krishna came himself and wrote down for him the words which welled forth from the unsuspecting poet's mouth.
Grierson.

(১) আমাকে দুর্ব্বল জানিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, যদি হৃদয় হইতে যাইতে পার, তবে বুঝিব তুমি কেমন 'মরদ'।

(২) In the old age his fame reached the ears of Akbar, who summoned him to his court. Grierson.

(১) মুক্তি (২) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অন্ধ। (Doubly blind) (৩) বিনামূল্যের দাস অর্থাৎ কেনা গোলাম।

খঞ্জন রূপ চক্ষু রূপরসে মত্ত। অতিশয় চারু চপল অপূর্ব্ব পল পিঞ্জরে সে প্রবেশ করে না। চলিতে চলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া কর্ণের নিকট যাইয়া কর্ণমূলও যেন সে লম্ফে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছে। সুরদাস খঞ্জন গুণে বৃন্তে আবদ্ধ না থাকিলে এতক্ষণ উড়িয়া যাইত।

কুহু কুজন কাকলী তান গাহিতে গাহিতে সুরদাসের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অনন্তে উড়িয়া গেল। সুরদাস ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার পূত আত্মা অমর ধামে বিষ্ণুলোকে, ভক্ত-সমাজে চির শান্তি লাভ করিল। সংসারে থাকিল তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি, তাঁহার প্রাণস্পর্শিনী কবিতা, তাঁহার প্রেম ভক্তির মর্ম্মগাথা, তাঁহার অতুল কীর্ত্তি এবং সাধু জীবনের আদর্শ। আজও কোটি প্রাণ তাঁহার কোমলময় মানযুত সঙ্গীত পদাবলীর মধুর পরশে সরস হইতেছে। এখনও ভারতের কি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, কি কুবেরের স্বর্ণপ্রাসাদে, সর্ব্বত্রই সুরদাসের সুরসাগর প্রেমিকের প্রাণে, ভক্তের হৃদয়ে ভাবলহরী জাগাইয়া তুলিতেছে। সুরদাসের কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা দেখিয়া, তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান, সখিভাব ও অনুরাগের উচ্চতা বুঝিতে পারিয়া বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাকে উদ্ধবের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১)

সুর ১৫৪০ সং মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং ১৬২০ সং (১৫৬৩ খ্রীঃ) ধরাধাম হইতে তিরোহিত হইয়াছিলেন। (২) অতএব তিনি প্রায় ৮০ বৎসর যাবৎ নরলোকে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণবলীলা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। সেই ৮০ বৎসর সুরকেন্দ্র হইতে ভারতে প্রেম, ভক্তি ও ভাষার যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছুটিয়াছিল, ৮০০০ বৎসরেও তাহার স্পন্দন নিবৃত্ত হইবে না।

সুরদাসের তিরোভাব কাল সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। আইন-আকবরী ১৫৯৬-৯৭ খ্রীঃ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। আইন-আকবরীর গ্রন্থকার বলেন, তখন সুরদাস ও তাঁহার পিতা রামদাস উভয়ই জীবিত ছিলেন। (৩) কিন্তু আইন-আকবরীর উক্তির পোষকতা করিবার কোনই প্রমাণ নাই। অতএব তাহা আস্থা-যোগ্য নহে।

সাধু সুরদাস সাধনাবলে ভক্তসমাজে অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নাভাজীর ভক্তমালে তিনি স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হিন্দু ভারতে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। ভক্তমালে সুরদাসকে "শ্রীসুরজী" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুরদাসের স্মৃতিতে ভারতে একতারা হস্তে অন্ধ সাধু ভিক্ষু মাত্রই আপামর সাধারণ কর্ত্তৃক সুরদাস নামে আখ্যাত হইতেছে। ইহাও সুরদাসের সাধু-জীবনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বঙ্গের সংস্কৃত কবি জয়দেবের ন্যায় মধ্যভারতের সুরকবি প্রেমের টানে ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া দ্বারস্থ করিয়াছিলেন। ভগবান স্বহস্তে তাঁহার কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসম্পূর্ণ কবিতা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা মানুষের ভক্তি ও প্রেমের আর কি অধিক পরিচয় সম্ভব? ভক্ত রামপ্রসাদের ইষ্টদেবতা আসিয়া তাঁহার বেড়ার বাঁধন ফিরাইয়া দিতেন।

(১) হিন্দী নবরত্ন।

(২) He died in Gokul about 1620 sambat (1563 H·D) হিন্দী নবরত্ন এবং Grierson.

(3) Ain Akbari (1596—97 completed) mention Suradas and Babu Ramdas both alive then. Grierson.

ভক্ত তুলসীর রামায়ণী গানে বীর হনু-মান নরদেহ ধারণ করিতেন। ভক্ত বিল্বমঙ্গলের ভোজন সামগ্রী স্বয়ং ভগবান রাখালবেশে যোগাইতেন। ভক্তকবি সূর-দাসের ভাবের টানে নন্দনন্দন লেখনী হস্তে কবিতা শুনিতে আবির্ভূত হইবেন, বিচিত্র কি? ভারতবাসী বিশ্বাস করে, জগদীশ্বর প্রত্যক্ষ দেবতা। যদি কঠোর-সাধনা থাকে, যদি ভাবের দৃঢ়তা থাকে, যদি প্রাণের ব্যগ্রতা থাকে, যদি মনের একাগ্রতা থাকে, তাহা হইলে পরম পুরুষ পরমাত্মাকে নিরাকার হইয়াও চিরান্ধকার নাগলোকবাসী ভক্ত বলীর দ্বারে দ্বারীরূপে প্রেমনিগড়ে আবদ্ধ হইতে হয়। তাই অন্ধ সূরের সাধনবলে যদু-পতি সাকার মূর্ত্তিতে লেখনীকরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিতত্ত্বে জড়বিজ্ঞানের যুক্তি বিদ্রূপ হাসিতে উড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকের যুক্তিতে যাহা অসম্ভব, বিশ্বাসীর চক্ষুতে তাহা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

কবি সূরদাস ভারতীয় আধুনিক সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। কেবল এক তুলসীদাস ভিন্ন তাঁহার আর দ্বিতীয় তুলনা স্থান নাই।

●ভক্তমাল সূরদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে সূরের ব্যক্তিগত জীবন ও ভাবভক্তির কথা ভুলিয়া কেবল তাঁহার কবিতার প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছিলেন।

"সূর" কবিত সুনি কৌন কবি,
জো নহি' সির চালন করৈ।
উক্তি, কাজ, অনুপ্রাস,
বরণ, অস্থিতি, অতিভারী।
বচনপ্রীতি নির্ব্বাহ,
অর্থঅদ্ভুত তুক ধারী।
প্রতিবিম্বিত দিবি দিষ্টি,
হৃদয় হরিলীলা ভাসী।
জনক করম গুন রূপ
বৈস রসনা পরকাসী।
বিমল বুদ্ধি গুণ ঔরকী,
জো বহ গুণ শ্রবননি ধরৈ।
সূর কবিত সুনি কৌন কবি,
জো নহি' শির চালন করৈ॥ (১)

অযোধ্যাসী সীতারাম শরণ সাধু ভগবান দাস ভক্তমালের টীকায় বলিয়াছেন যে, সূর-দাস সওয়ালক্ষ ভজন (পদ) রচনা করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াই দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অবশিষ্ট ২৫ সহস্র শ্লোক স্বয়ং রচনা করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া-ছিলেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দে

'দেহিপদপল্লবমুদারম্।'

গোপীবল্লভ আসিয়া স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কিম্বদন্তীর মূল্য যাহাই হউক, উহাতে কাব্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করি-তেছে। ভগবান দাসজী তাঁহার ভক্তমালের টীকায় নিম্নলিখিত দোহা উদ্ধৃত করিয়া সূর কবিতার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"কিধোঁ সূরকৌশর লগ্যো,
কিধোঁ সূরকী পীর।

(১) সূরদাসের কবিতা শুনিয়া কে এমন কবি আছে যে, মুগ্ধ হইয়া মস্তক চালন করিবে না? তাঁহার বাক্‌বিন্যাস, সারগর্ভ উক্তি, অলঙ্কার (অনুপ্রাস), যতি, গুরুত্ব, মধুরপদ, সঙ্গতি, অর্থগাম্ভীর্য্য, চমৎকারিত্ব, অল্প কথায় বহু অর্থ প্রকাশ, প্রতিবিম্বিত দিব্যজ্ঞান, হরিলীলামগ্ন হৃদয়, জন্ম, কর্ম্ম, রূপ, গুণ, বয়স, রুচি, প্রভৃতি রচনায় প্রকাশিত। যে এই সকল গুণ শ্রবণ করে, তাহার বিমল বুদ্ধি ও জ্ঞানোদয় হয়। অতএব কবিতা শুনিয়া ইত্যাদি।

ভক্তমাল সটীক, সীতারাম শরণ ভগবান্ প্রসাদ প্রণীত।

কিধোঁ সুরকী পদ সুন্যো,
স্যোঁ সির ধুনত অধীর ॥"(২)

"সুর সুর (সূর্য্য), তুলসী শশী,
উড়গন কেশব দাস।
অরকে কবি খদ্যোত সম,
জঁহ তঁহ করত প্রকাশ ॥ (১)

(পৃঃ ৮১৩—১৪)

কথিত আছে, উল্লিখিত প্রথম দোহা মিঞা তানসেন সুরদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। সুরদাস উত্তরে কহিয়াছিলেন।—

"বিধনা য়হ জিয় জানিকৈ সেসহিঁ দিয়েন কান।
ধরা মেরু ডোলতো, তানসেন কী তান ॥ (৩)

মহারাজ রঘুরাজ সিংহ হিন্দী কবিগণের সংক্ষিপ্ত সরস সমালোচনায় বলিয়াছেন :—

মতিরাম, ভূষণ, বিহারী, নীলকণ্ঠ, গঙ্গ, বেনী,
সম্ভু, তোষ, চিন্তামনি, কালিদাসকী।
ঠাকুর নেওয়াজ, সেনাপতি, সুখদেব, দেব,
পজন, ঘনানন্দহু, ঘনশ্যামদাসকী।
সুন্দর, মুবারি, বোধা, শ্রীপতিহূঁ,
দয়ানিধি, জুলুন, কবিন্দ, তোঁ গোবিন্দ
কেসোদাসকী।
রঘুরাজ ঔরকবিগনকী অনূঠী উক্তি
মোহিঁ লগী ঝুঠী জানি জুঠী সুরদাসকী ॥ (৪)

(১) কেহ সুরদাসের কবিতা-শরে বিদ্ধ, কাহারও প্রাণ তাঁহার কবিতা শুনিয়া ব্যথিত, কেহ তাঁহার দোহা শুনিয়া অস্থির।

(২) সুর সূর্য্য তুলসী চন্দ্র, তুলসীদাস কবি নক্ষত্র এক্ষণকার কবিগণ খদ্যোতের ন্যায় যেখানে সেখানে প্রকাশিত।

(৩) বিধাতা ইহা জানিতে পারিয়াই শেষ (বাসুকী) নাগকে কাণ দেন নাই। (কেননা) তানসেনের তান শুনিলে (বাসুকীর মস্তকস্থিত) ধরা ও মেরু দুলিত।

(৪) মতিরাম প্রভৃতি অন্যান্য কবিগণের অকর্ম্মণ্য ও সুরদাসের উচ্ছিষ্ট বলিয়া আমার নিকট বোধ হয়।

প্রচলিত দোহা হইতে নিম্নে দুইটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহা দ্বারা সাধারণে কবি সুরদাসের কিরূপ স্থান নির্দ্দেশ করে, বুঝিতে পারা যাইবে।

"কবিতা করতা তীনি হৈঁ, তুলসী, কেশব, সুর।
কবিতা খেতী ইনলুনী শীলা বিনত মজুর ॥"(১)

"তত্ত্বতত্ত্ব সুরা কহী, তুলসী কহী অনূঠী।
বচী খুচী কবিরা কহী, ঔর কহী সব ঝুঠী ॥ ২

সম্রাট আকবরের সভায় জনৈক কবি তাৎকালিক হিন্দী কবিগণের সমালোচনায় বলিয়াছিলেন :—

উত্তমপদ কবি গঙ্গকে, উপমাকাবরবীর
(বীরবল)।
কেসব অরথ গম্ভীরতা সুর তীনিগুণধীর ॥"(৩)

ভারতীয় প্রচলিত ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গ্রিয়ার্সন সাহেব বলিয়াছেন,—

Other poets may have equalled him in some particular quality, but he combined the best qualities of all.

অন্যান্য কবিগণ কোন কোন বিশেষ গুণে তাঁহার সমকক্ষ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু

(১) কবিতা রচনা করে তিনজন, তুলসী, কেশব ও সুর। কবিতা রূপ কৃষিক্ষেত্রে ইহারা খুঁটিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, মজুরেরা কেবল পাথর শিলা বহিয়া করিতেছে।

(২) প্রকৃত তত্ত্ব সুরদাস কহিয়াছেন, তুলসী যাহা কহিয়াছেন, তাহাও অমূল্য, অবশিষ্ট যাহা কিছু কবির কহিয়াছেন। আর সকলে কেবল মিথ্যা বকিয়াছে।

এই শ্লোক অন্য আকারেও প্রচলিত আছে।
যোকুছ কহা সো তুলসী কহা, বাকী কহা সো সুর।
বিসুর বিছুর কবিরা কহা, অবশেষ কহে সো কুর ॥

(3) Gang excels in sonnets and Birbal in the kabitta metre, Keshab's meaning is ever profound, but Sur possesses excellences of all three. Grierson

তাঁহার রচনায় সকলের সমবেত গুণের একত্র সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলিয়াছেন :—

Suradas and Tulsidas possessed the strength of giants and were far beyond their contemporaries in polish and in a sense of proportion.

সূরদাস এবং তুলসীদাস অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন কবি ছিলেন। রচনার পারিপাট্যে এবং ভাবসমন্বয়ে তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক কবিদিগের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। (১)

সূরদাসের তিন অমরগ্রন্থ তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বের যশ অক্ষয় করিয়াছে। সূরসাগর, সূরসারাবলী ও সাহিত্য-লহরীর সুধাপদাবলী যে আস্বাদন করিয়াছে, সে-ই অমর হইয়াছে। সূরসাগর গ্রন্থের সার লইয়া সূরসারাবলী রচিত। এতদ্ভিন্ন ব্যাহলো (বেহুলা) এবং নলদময়ন্তী নামক দুইখানি পুস্তকও সূরদাসের রচিত বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সংবৎ ১৬০৭ সনে সাহিত্য-লহরী সম্পূর্ণ হইয়াছিল। উহা রীতিবদ্ধ কবিতা নহে। স্বাভাবিক রীতিতে যেখানে যে বর্ণনা আবশ্যক,কবিত্বের অবাধস্রোত তাহা পূর্ণ করিয়াছে। টীকা ব্যতীত সাহিত্য-লহরীর অর্থবোধ দুরূহ। এই গ্রন্থ যমক ও অনুপ্রাস-বহুল এবং কূটপরিপূর্ণ। সাহিত্য-লহরীতে সূরদাসের নিজকৃত টীকা বিদ্যমান আছে। সরদার কৃত টীকায় প্রথমে ১১৭ পদ ছিল; পরে আরও ৬৩ পদের যোগ হইয়াছে। অতএব সাহিত্য-লহরীতে একণ সর্ব্বশুদ্ধ ১৮০ পদ।

সূরসারাবলী সূরসাগরের সূচীবিশেষ। উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১১০৭ ছন্দ। সমগ্র গ্রন্থ একই ছন্দে রচিত। সুতরাং পাঠকালে নিতান্ত একঘেয়ে বলিয়া বোধ হয়। সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে কবিকুলরবি সূরদাসের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূরসারাবলী কবির ৬৩ বৎসর বয়সে রচিত হইয়াছিল। অতএব সূরসাগর উহারও পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। রচনার ক্রমানুসারে সূরসাগর ১ম, সূরসারাবলী ২য় এবং সাহিত্য-লহরী ৩য় গ্রন্থ।

সূরসাগর কবির কীর্ত্তিকিরীটে কোহিনুর। এই বিশালগ্রন্থ ১২ স্কন্ধে সম্পূর্ণ। ১ম হইতে ৯ম স্কন্ধে বিবিধবার্ত্তা বর্ণিত হইয়াছে। ১০ম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা। তুলসীদাসের রামায়ণের বাল ও অযোধ্যাকাণ্ডের ন্যায় সূরদাসের সূরসাগরে ১০ম স্কন্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। কিন্তু দশম স্কন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধ, পরার্দ্ধ অপেক্ষাও চমৎকার। ১১শ স্কন্ধে উদ্ধবের বদরিকাশ্রম গমন এবং হংসাবতার, ১২শ স্কন্ধে বৌদ্ধ ও কল্কি অবতার, পরীক্ষিতের দেহত্যাগ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত বর্ণনাই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাব ও ছায়া লইয়া সংক্ষেপে লিখিত। কেবল নন্দগৃহে কৃষ্ণলীলা ও উদ্ধবসংবাদ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজত্যাগ বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত। সূর কৃষ্ণভক্ত, রাধাকৃষ্ণভক্ত, এবং ব্রজবাসী কৃষ্ণভক্ত। অতএব ব্রজবিলাস বর্ণনাই যেন তাঁহার গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সূরসাগরে ছন্দবৈচিত্র্যের অভাবে অনেকের নিকট তাহা সুখপাঠ্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, সূরদাসের সমস্ত দোহাই তালমানলয়যুক্ত সঙ্গীতের ন্যায় গীত হইতে পারে। সূরকবির কবিত্বগানের ইহাই এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

(১) Modern Vernacular Literature of India.—Grierson.

নিম্নে সুরসাগরের ভিন্নপ্রকার সূচী উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। সুরসাগর নিত্যকীর্ত্তন রাগকল্পদ্রুম।
২। " বধাই "
৩। " বাললীলা "
৪। " মাখনচোরী "
৫। " যমলার্জ্জুন "
৬। " বস্ত্রহরণ "
৭। " রাধাজুকে প্রথমমিলন "
৮। " গোবর্দ্ধনলীলা "
৯। " গোচারণ লীলা "
১০। " কালীয়দমন "
১১। " গোদুহনলীলা "
১২। " ভুরঙ্গভসনলীলা "
১৩। " বস্ত্রাহরণ লীলা "
১৪। " পনিঘটলীলা "
১৫। " দানলীলা "
১৬। " ঐ বড়ী "
১৭। " অনুরাগলীলা "
১৮। " মুরলীলীলা "
১৯। " রাসলীলা "
২০। " বিনয়পত্রিকা "
২১। " মথুরালীলা "
২২। " ভ্রমরগীত "
(উদ্ধবসংবাদ)

কবিতা।—ভক্তি ভাগবতের মূলমন্ত্র। সে ভক্তি মানুষকে ত্যাগ শিখায় এবং দিব্যজ্ঞানে পৌঁছাইয়া দেয়। তাহাতে স্বার্থ ও বাসনার পূতিগন্ধ নাই। সেই ভাগবতের প্রেমের গান ভক্ত সুরদাস হৃদ্‌বীণার ভাবতন্ত্রে সঙ্গত করিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে মধুরস্বরে গাহিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ললিতপদের অক্ষরে অক্ষরে ভক্তিরস চুয়াইয়া পড়িতেছে। সে ভক্তির উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক—কষ্টকল্পনা নহে। সে ভক্তির লহরী সাময়িক উত্তেজনা বা আকস্মিক উচ্ছ্বাস-সম্ভূত নহে। তাহা প্রাণের গভীরতম প্রদেশের স্থিরভাবাবেশ সঞ্চালনের ভাষায় অভিব্যক্তি। এজন্য সুরদাসের কবিতা নিষ্প্রভ বা প্রাণহীন নহে। উহা সজীব, সরস, ও স্বাভাবিক।

ব্রজভাষার শেষ মহাকবির শতসই পড়িয়া যোধপুর-মহারাজ যশোবন্তসিংহ মন্তব্য করিয়াছিলেন—"থারী কবিতামে সুলীলাগ গয়ো।" সুরদাসের ললিতপদাবলীতে এই বাক্যের সার্থকতা (১) পাওয়া যায়।

ভাগবতের ন্যায় সুরদাসও জাতিভেদ ও কর্ম্মভেদকে তুচ্ছ মানিয়া ভক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছেন। যে ভাগবতের ধর্ম্ম চৈতন্য জীবনে প্রতিফলিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সুরদাস তাহা 'কান্তাসম্মিত' উপদেশে মধুর পদে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতেও

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'
(পৃঃ ৪, সংখ্যা ১৫)

ভক্তিবিনা বাহ্যশুচি বৃথা। যে বৈষ্ণব ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়াছেন, তিনি পবিত্র ও ধন্য। (পৃঃ ৫, সংখ্যা ২৫) মানুষ কিরূপে ভক্তিহীন হইতে পারে, সুরদাস ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি ভক্তিবিমুখ নরপশুদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

তজোমন হরি বিমুখন কো সংগ।
জাকে সংগ কুবুধি উপজতি হৈ, পরত ভজন
মে ভঙ্গ॥ (২) ইত্যাদি।

---

(১) ভাদ্র ও আশ্বিনের (১৩১৮) নব্যভারতে কবি বিহারীলাল'—পৃঃ ৩৭৩ দ্রষ্টব্য।

"তোমার কবিতায় ঘুন ধরিয়াছে, অথবা তোমার কবিতা জীবন্ত।"

(২) হে মন, হরি বিমুখদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর।

পক্ষান্তরে তিনি সংসর্গের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

"জাদিন সন্ত পাহুনে আবত।
তীরথ কোটী অস্থান করৈঁ ফল জৈসো দরসন পাবত।" ইত্যাদি। (২)

তিনি কহিয়াছেন, ভক্তিহীন বিষয়ী লোকের হৃদয়ে বিষয়াসক্তির কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভক্তিরস প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের চক্ষুতে জগৎ বিষয় বাসনাময় রূপ ধারণ করে। তাহাদের কাল কম্বলে অন্য রং ধরে না।—

"সূরদাস খলকারী (১) কামরি চঢ়ত ন দুজো-রঙ্গ।" (২)

এবং ভগবদ্ভক্তিবিহীন সাধনভজনহীন মানব কুকুর শূকরবৎ।

"ভজন বিনু (৩) কুকুর সূকর জৈসো,
জৈসেঘর বিলাবকে (৫) মুসারহত ( ) বিষয় রসবৈসো।' (৬) ইত্যাদি
"উন্‌হুকে (৭) রহ সুতদারাহি উনহেঁ ভেদ কছু কৈসো।' ইত্যাদি

সূরদাসের ভক্তি ও ভজন চতুরঙ্গ বিশিষ্ট—
স্মরণ, ধ্যান, কীর্ত্তন ও সেবা।

"জোকোই হরিকো সুমারে (৮) নাম।
তাকে সকল পূরণ হৈঁ কাম।"
"জো ঠাকুরকো ধ্যান লগাবৈ।
ধ্রুব প্রহ্লাদকী পদবী পাবৈ॥"
জো হরি কীর্ত্তন মুখসোঁ করৈ।
মুক্তি চারহুঁ পাবন পরে।"
সেবা কো ফল কহেউ ন জাই। (৯)
সুখ সুমিরে শ্রীবল্লভ রাই॥
সেবা কো ফল সেবা পাবে।
সূরদাস প্রভু হৃদয় সমাবে॥" (১০)

সূঃ সাঃ সারাবলী

সূরদাস রাম, হরি, কৃষ্ণ, সূরশ্যাম, রাধাবল্লভ এবং জগদীশ্বরের মধ্যে কোনই পার্থক্য দেখিতে পান নাই। ভক্তের নিকট একই পরমাত্মা নামভেদে রূপভেদে প্রকাশিত।

"সোই বড় জু রামহিঁ গাবৈ।
স্বপচ প্রসন্ন হোয় বড় সেবক;
বিনুগোপাল, দ্বিজ জনম ন ভাবৈ।" (১)
ইত্যাদি।

এবং

হোয় অটল জগদীশ ভজনমেঁ।
সেবাতাসু চারিফল পাবৈ॥

সূরদাস একেশ্বরবাদী বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি এক বিষ্ণু ভিন্ন অপর দেবতার উপাসনা করিতেন না। তাঁহার নিকট ৩৩ কোটি দেবতার কি সমাদর নিম্নে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল।

"ঔর দেবসব রংক ভিখারী ত্যাগে বহুত অনেরে। (২)

কিন্তু তিনি কখন স্বপ্নেও অপর দেবতার নিন্দা করেন নাই।

সূর পরমাত্মার সগুণোপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানে স্থানে

তাহাদের সঙ্গে কুবুদ্ধি জন্মে এবং ভজনে বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। ইত্যাদি।

(২) যে দিন (গৃহে) কোন সাধু ভক্ত অতিথি স্বরূপ আসেন, তাঁহার দর্শনে কোটি তীর্থ ভ্রমণ করার তুল্য ফল লাভ হয়।

(১) কাল কম্বলে, (২) দোসরা, অন্য, (৩) বিনা (৪) গর্ত্ত, (৫) ইন্দুর, (৬) সেইরূপ বিষয় রস, (৭) উহাদেরও, (৮) স্মরণ করে, (৯) কহিতে পারা যায় না, (১০) প্রবেশ করিবে।

(১) সেই বড় যে রাম (গুণ) গান করে। রাজা সেবকের প্রতি যতই প্রসন্ন হউক না কেন, গোপালের কৃপাদৃষ্টি বিনা জীবন সার্থক হইতে পারে না।

(২) অন্যান্য দেবতা সকল কেবল ভেকধারী (রূপমাত্র)। বৃথা বলিয়া সকলে তাহাদিগকে ত্যাগ করে।

তিনি সাকারোপাসনা সম্বন্ধে স্পষ্টমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অবিগতি গতি কুক্ক কহতন আবৈ।
জ্যোঁ (১) গূঙ্গে (২) মীঠে ফলকো রস
অন্তর গাত (৩) হী ভাবৈ॥
মনবাণী কো অগর অগোচর সো জানৈ
জোপাবৈ।
রূপ দেখ, গুণ, জাতি জুগতি বিনু নিরা-
লম্ব মনচকিত ধাবৈ॥
সব বিধি অগর বিচারহি তাতে সূর
সগুণ লীলা পদ গাবৈ॥

সূর ও তুলসী উভয়েই ভক্ত। কিন্তু তাঁহাদের ভক্তিতে বহু অন্তর। রামভক্ত তুলসীর আদর্শ পবন-নন্দন, কৃষ্ণভক্ত সূরের আদর্শ উদ্ধব। তুলসীর দাস্য ভাব, সূরের সখ্যভাব। তুলসী রামের দাসানুদাস ভক্ত, সূর কৃষ্ণের উচিতবক্তা অনুগত সখা। তুলসী রামের নরলীলা বর্ণন করিতে বারংবার তাঁহার ঈশ্বরত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সূর কৃষ্ণের দেবলীলা বর্ণনাকালে কদাচিৎ কখনও ঈশারায় কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই বিরত হইয়াছেন। অথচ সূরদাসের অন্ধ নয়নের দৃষ্টি পলকের তরেও শয়নে স্বপনে জাগরণে কৃষ্ণরূপ হারা হইত না।

"সূরদাস প্রভু নিশিদিন বিসরতি মোহন
মুরতি সোয়ত জাগত।"

তুলসীর ভজন স্তুতিতে আছে দীনতা, বিনয়, কাতরতা। কিন্তু সূরের প্রীতি ভাবোচ্ছ্বাসে আছে কেবল অবাধ স্বাধীনতা। তিনি কৃষ্ণের সখা, অতএব বন্ধুর ত্রুটী দেখাইতেও তাঁহার অধিকার আছে। তিনি এই অধিকার বলে কৃষ্ণকে এবং তাঁহার রাইকিশোরীকেও 'দুকথা শুনাইয়া দিতে' ছাড়েন নাই। এমন কি, তিনি গোপীমুখে শ্যামনিন্দা বাহির করাও অনুচিত বোধ করেন নাই।

"সখীরী শ্যাম সবৈ কৈসরে।
মীঠৈ বচন সোহাগে বোলত, অন্তর
জারন হারে॥
ভঁবর কুরঙ্গ কাগ অরু কোকিল কপ-
টি নকী চটসরে॥ (ক)
সখিরী শ্যাম কহা হিতু জানৈ।
কোউ প্রীতি করৌ কৈসেহুবহ অপনে গুণ
ঠানৈ।
দেখৌ যা জলধরকী করণী বরষত পোষৈ
আনৈ।
সূরদাস সরবসু জো দীজৈ কারো কৃতাহ ন
মানৈ॥ (১)

(ক) সখি, শ্যামের কেমন ব্যবহার? সোহাগ করিয়া মিঠা বচন বলে, (কিন্তু) অন্তর দগ্ধ করে। ভ্রমর, কুরঙ্গ, কাক এবং কোকিলের ন্যায় কপট আচরণ করে।

এবং

তুম জানত রাধাহৈ ছোটী, হমসোঁ সদা দুরা-
বতি হৈ ইহ বাত কহৈ মুখ চোটী পোটী।
কবহুঁ শ্যাম সোঁ নেকুন বিছুরতি,কিয়ে রহতি
হমসোঁ হঠ জোটী।
নন্দ নন্দন যাহী কেবল হৈঁ বিরস দেখি বেঁদী
হবি চোটী।
সূরদাস প্রভুবৈ অতি খোঁটে, য়হ উনহুঁতে
অতিহী খোটী।

তুমি জান রাধা বটে ছোট, সে আমার সঙ্গে সর্ব্বদা দুর দুর ভাব রাখে এবং সকল কথাই গোপন করিয়া যায়। ক্ষণমাত্রও শ্যাম

(১) মূক যেরূপ (২) (৩) অন্তর্গত, অন্তর।

(১) Cf. চোরের মুখেতে ধরম কাহিনী শুনিয়া পায় যে হাসি—ইত্যাদি—এবং, উহার নাম করো না, নামে মোর নাহি কাব। চণ্ডীদাস।

হইতে বিচলিত হয় না, আমার সঙ্গে কেবল জিদ্ করিয়া থাকে এবং বলে এই কি কেবল একজনা নন্দনন্দন যে, তাহাকে বিরসবদন দেখিলে আমি প্রোষিত ভর্ত্তকার ন্যায় কাতর হইব? সূরদাস বলেন, শ্যামত অতি দুষ্ট বটেই রাধা তাঁহার অপেক্ষাও অধিক দুষ্টা।

অন্যত্র—

হম বিগরী তুম সবৈ সুধারী।
দ্বিজকানীন হমারে বাবা কুণ্ডজপিতা জগৎ মেঁ গারী।
হম সব জগ জাহির জারজ হৈঁ তাহুপর যকবাত বিগরী। ইত্যাদি।

আমি মন্দ তোমরা সকলেত ভাল। আমার পিতা দ্বিজকানীন এবং কুণ্ডজ (কমল যোনী) বলিয়া জগতে নিন্দিত। আমরা সকলে জারজ বলিয়া জগতে প্রচার, তারপর না হয় আর একটা দোষ যোগ হইল।

রচনার বিশুদ্ধতায়, লালিত্যে, মাধুর্য্যে, সরলতায় ও অনর্গল বাক্‌প্রবাহে হিন্দী ভাষায় সূরদাসের তুলনা নাই। তাঁহার প্রাঞ্জল ব্রজভাষায় কঠিন সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ নাই বলিলেও চলে। বিশনে সূরগ্রন্থে যুক্তবর্ণ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বিরল সংস্কৃত পদ যথাস্থানে আবশ্যকতানুযায়ী অতি সুন্দর রূপে ব্রজ ভাষার সহিত মিলাইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।(১) পক্ষান্তরে, সূরদাস তাঁহার ভগবদ্‌প্রেম পরিপূর্ণ গ্রন্থে যাবনিক তৎকাল প্রচলিত শব্দের স্থান দান করিয়া ভারতে মুসলমান বিজয়ের সাক্ষ্যদান করিয়াছেন।(২) হিন্দী সাহিত্যে সূরের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী গোসাঁই তুলসী দাসও তাঁহার রামায়ণে 'গরীব নেওয়াজ' পর্য্যন্ত চালাইয়া গিয়াছেন। সেই সময়ের বাঙ্গালী কবিগণও এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছিলেন। (৩)

সূরের প্রাঞ্জল রচনার প্রধান গুণ প্রসাদ ও স্নিগ্ধতা। ভাষা সরল হইলেও তাঁহার রচনা অর্থগাম্ভীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি যমক ও অনুপ্রাসের প্রিয় না হইলেও যথাস্থানে তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে কৃপণতা করেন নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে, যমক ও অনুপ্রাসের অনুরোধে সূর কখনও রচনার ভাবের ব্যত্যয় ঘটিতে দেন নাই।

সংস্কৃত কবিগণ সম্বন্ধে যেমন প্রবাদ আছে যে "মাঘে সন্তিত্রয়ঃ গুণাঃ" সেইরূপ প্রচলিত হিন্দীদোহা হইতে জানা যায় "সূরতীনিগুণ ধীর।" উত্তমপদ, উপমা ও রূপক এবং অর্থগাম্ভীর্য্য, এই তিন গুণ সূরদাসের রচনার বিশেষত্ব।

নিম্নে সূরের উপমার একটু নমুনা উদ্ধৃত হইল।

অদ্ভুত এক অনুপম বাগ। জুগল কমলপর গজবর ক্রীড়ত। তাপর সিংহ করত অনুরাগ। হরিপর সরবর, সরপর গিরিবর। গিরিপর ফুলে কঞ্জপরাগ। রুচির কপোত বসত তাউপর। তাহুপর অমৃত ফললাগ॥ ফলপর পুহুপ, পুহুয়াপর পলব, তাপর সুক, পিক, মৃগমদ কাগ॥ খঞ্জন ধনুষ চন্দ্রমা উপর, তাউপর এক মণিধর নাগ। অঙ্গ অঙ্গপ্রতি ঔরঔর ছবি উপমাতাকো করতন ত্যাগ॥ ইত্যাদি। (১)

(১) ইচ্ছসি যদি সততং ইত্যাদি।
যদি বাঞ্ছসি হরিভক্তি সুরঙ্গং ইত্যাদি।
(২) উপরে উদ্ধৃত 'জাহির জারজ' প্রভৃতি।

(৩) পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায়। ইত্যাদি, ভারতচন্দ্র।

(১) এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ। শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ।

রূপ বর্ণনার আরও একটু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেণী—প্রথমহি সুভগ শ্যাম বেণীকী সুষমা কহহুঁ বিচারি।

মানহুফণিক রহেভাপীবন কো সশিমুখ সুধানিহারি। (১)

প্রথমে সুন্দর বেণীর শোভা বিচার পূর্ব্বক বলিতেছি। যেন ফণী শশিমুখের সুধা দেখিয়া পান করিতে উদ্যত হইয়াছে।

বর্ণ—বরনৈ কগসীস সেন্দুরকো কবি জুবাহ্যো পচিহারি।

মানহু অরুণ কিরণ দিনকরকী নিসরী তিমির বিদারি।

সিথীর সিন্দুর বর্ণ কবি অনেক চিন্তা করিয়া ভাবিলেন যেন তরুণ অরুণ কিরণ তিমির (কেশরাশি) বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইতেছে।

ভ্রূ—ভ্রূকুটী বিকট নিকট নৈনন কে রাজত অতিবর নারি।

মনহু মদন জগভীতি জের কবি রাখউধমুক উতারি।

চক্ষুর নিকটে রমণীর বিকট ভ্রূভঙ্গি অতি সুন্দর শোভা পাইতেছে। যেন মদন জগৎ সংসার জয় করিয়া ধনুক নামাইয়া রাখিয়াছে।

বদন—চপল নৈন নাসা বিচ সোভা অধর সুরঙ্গ সুঢ়ারি।

মনো মধ্যে খঞ্জন সুক বৈঠ্যোলুব্ধ্যো বিম্ব বিচারি॥

চঞ্চল নয়ন, মধ্যে, নাসিকা অতি সুন্দর, অধর অতি সুশ্রী ও সুডৌল। মনে হয় যেন উভয় খঞ্জনের মধ্যে (অধরকে) বিম্বফল মনে করিয়া লুব্ধ শুক বসিয়া আছে।

ইহা হইতে বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও খুটিনাটি বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

সেকালের কবিদিগের সাধারণ দোষ জটিল রচনা ব্যাসকূটে সুরদাসও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টকুটের ভাবগ্রহ করিতে 'পণ্ডিতে লাগে ধন্ধ।' নিম্নে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল।

জনি হঠ করহু সারঙ্গ নৈনী।
সারঙ্গ সসি সারঙ্গ পর সারঙ্গতা
সারঙ্গ পর বৈনী।
সারঙ্গ বসন্ দ্যান্গুনি সারঙ্গ সারঙ্গসুত দৃঢ়
নিরখনি পৈনী।
সারঙ্গ কহো সুকৌন্ বিচারো সারঙ্গপতি
সারঙ্গ রচি সৈনী।

কমল যুগল পর চান্দকি মাল। তাপর উপজল তরুণ তমাল।
তাপর বেঢ়ল বিজুরী লতা। কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
ইত্যাদি। বিদ্যাপতি।

Cf. also যুগলরূপ বর্ণনা, জ্ঞানদাস।

পঙ্কজ উপরে,বিংশ শশধর,চাঁদের উপরে গজ। ইত্যাদি

(১) বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥ ভারতচন্দ্র

(২) কুটিল কবরী বেঢ়ি কুসুমের দাম।
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে অতি অনুপম। জ্ঞানদাস
সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু, সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবিশশী সঙ্গহি উয়ল পিছে করি আন্ধিয়ার।
বিদ্যাপতি

(৩) কি ছার মিছার কাম ধনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে। ভারতচন্দ্র
ভুরুযুগ সন্ধান, কামের কামান বাণ,
হিঙ্গুলে খঞ্জিত দুটী আঁখি। জ্ঞানদাস।

(৪) একে যে সুন্দরী কণক ধুতলী
খঞ্জন লোচন তার।
* * *
দন্তটী যে দাড়িম্ব বীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা। চণ্ডীদাস
কণক কমল মাঝে, কালভুজঙ্গিনী, শ্রীযুত খঞ্জন খেলা।
বিদ্যাপতি

সারঙ্গ সদনহি লৈজু বহনগয়ে অজহুঁ ন
মানত্ গত্ ভই রৈনী।
সূরদাস প্রভুতব মগজাবৈ অন্ধক
রিপু তা রিপু সুখ দৈনী ॥ (১) ইত্যাদি।

হে সারঙ্গ নয়নি! কলহ (জিদ) করিও না। ইত্যাদি।

বৈণী – বাণী, নিরখনী = নিরক্ষণকারিণী। পৈনী = মেঘ, সৈনী = কটাক্ষকারিণী, সদন = গৃহ, লৈ = লইয়া, জু = আপনি, বহনগয়ে = লইয়া গিয়াছে, অজহুঁ ন মানত = একটুও মানে না, রৈণী = রজনী, (পক্ষ রস)। মগ = রাস্তা, মার্গ, অন্ধক রিপু = সূর্য্য, তারিপু = চন্দ্র, দৈনী = দায়িনী ॥

তুলসীদাসের রচনার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ রামায়ণে, সূরদাসের রচনার সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় সূরসাগরে। সূরসাগরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সূরসাগরের ভাষার বাহার ও চাকচিক্য সাহিত্য জগতে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নিম্নে তাহার বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গ্রন্থের আদিতে সূরদাস প্রাচীন রীতি অনুসারে মঙ্গলোচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই "আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তু নির্দ্দেকার", তাঁহার সেই 'শুভমস্তু' তাঁহার নিজস্ব। প্রতিভা কষ্টকল্পনা ত্যাগ করিয়া অনুবর্ত্তিতা অগ্রাহ্য করিয়া আপনার ভাবে বিভোর হইয়া নূতন পথের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিল।

"মঙ্গল মাধো নাম উচার।
মঙ্গল বদন কমল কর, মঙ্গল মঙ্গল জনহি সদা সংসার।
দেখত মঙ্গল পূজত মঙ্গল গাবত মঙ্গল রচিত উদার।
মঙ্গল শ্রবণ কথা রস মঙ্গল মঙ্গল তন বসুদেব কুমার।
গোকুল মঙ্গল মধুবন মঙ্গল মঙ্গল রুচি বৃন্দাবন চন্দ।
মঙ্গল করণ গোবর্দ্ধনধারী মঙ্গল বেষ যশোদা নন্দ ॥ ইত্যাদি

এবং

মঙ্গলধেনু রেণু ভুব মঙ্গল মঙ্গল মধুর বজাবত বেণু।
মঙ্গল গোপবধূ পরিরম্ভন মঙ্গল কালিন্দী পয় ফেনু ॥ ইত্যাদি।

যশোদার ক্রোড়ে নন্দগোপের গৃহে নন্দদুলালের বাল্যলীলা সূরদাসের অতি উত্তম বর্ণনা। বালগোবিন্দের লীলা গান করিতে করিতে করিতে কবির অমর লেখনী সুধা বর্ষণ করিয়াছে। কৃষ্ণের আদর ও লালন, মাতার নিকট বাসুদেবের মাখন ভিক্ষা, যশোদার রোষ, আকাশের চাঁদের জন্য শিশু কৃষ্ণের আবদার, বালকৃষ্ণকে নলপত করিয়া দুধ পান করান, কৃষ্ণের নিকট রামের গল্প বলা প্রভৃতি যেমন স্বাভাবিক, তেমনই বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী। দুই একস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলে সে অদ্ভুত বর্ণনার রস গ্রহণ করা যাইতে পারে।

"মৈয়া কবহি বঢ়েগী চোটী। (১)

( ) সখীসহ রাজিত একজনি,
জলসুতাকো সুত তা সুতকো সুত তাসুত ভকবদনী ॥
তমঃ রিপুসুত. ভ্রাতা পিতঃ বাহন তা অরি কটি যৌবনী।
মীন সুতা সুত, তাসুত নাসা, তাপর জড়িত মণি ॥
কমলকস্বপর, যে সত কঞ্চুকী, নায়ত চরত ফণী।"
ইত্যাদি জ্ঞানদাস

এবং

সারঙ্গ বচন জনু সারঙ্গ নয়ন
সারঙ্গ তনু সমাধামে। ইত্যাদি বিদ্যাপতি।

(১) চোটী – কেশ, চূড়া। কিতীবার – কতবার। ভই – হইল।

কিতীবার মোহি দুধ পিয়ত ভই, যহ অজহুঁ
হৈ ছোটী ॥"

মা আমার মাথার ঝুটি কবে বাড়িবে? কতবার আমাকে দুধ খাওয়াইলে,ঝুটি আজও ছোট রহিয়া গেল। বলা বাহুল্য, জননীরা মধ্যভারতে, শিশু যখন দুগ্ধ পান করিতে চাহে না, তখন দুধ খাইলে মাথায় ঝুটি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে বলিয়া প্রলোভন দিয়া থাকেন।

অন্যত্র—

মাতু মোহিঁ দাউ বহুত খিঝায়ো।
মোসোঁ কহত মোলকো লীহ্নো তোহিঙ্গ
সুমতি কবজায়ো।।
কহা কহৌ যদি রিসকেমারে খেলন হৌ
নহি জাত।
পুনি পুনি কহত কৌন হৈ মাতা, কো হৈ
তোম্হারা তাত॥
গোরে নন্দ, যসোদা গোরী তুম কত স্যাম
সরীর।
চুটকী দৈ দৈ হঁসত গ্বাল (গোয়াল)
সব, সি খৈ দেত বলচোর॥ (২) ইত্যাদি।

কি সুন্দর স্বাভাবিক বর্ণনা! কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি! তৎপর মাখন চুরী বর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী। কালীয়দমন, দাবানল পান, বসন চুরী, (চীরহরণ) প্রভৃতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া রাসলীলা, মান ও মানভঞ্জনের পুনরায় বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। মাখন চুরী ও রাসলীলা উভয়ই এত বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুরসাগর আদি কি ভক্তিরসপ্রধান কাব্য, নির্ণয় করা সুকঠিন।

(২) দাউ—দাদা, খিঝায়ো—রাগিয়েছে, মোসোঁ—আমাকে মোলকো—কিনিয়া, জায়ো—প্রসব করিয়াছেন? রিস—রাগ, পুনি পুনি—বারংবার। গোরে—সাদা,

নাচত বৃষভানু সুতা হংসসুতা পুলিন মধ্য
হংস হংসিনী মধুর মণ্ডলী বলী।
গাবত গোপাললাল মিলওত ঝপতাল
লজ্জিত অলি মত্তমদন কামিনী অলি।
পদিকলাল কণ্ঠমাল তরলতিলক ছলকভাল
শ্রবণফুল বরতুকুল নাশকারনী।
নীলকঞ্চুকী সুদেশ চম্পকলী গলিতকেশ
মুখরিত মণিম বামকটি সুকাছনী।
মরকত মণি বলয়রাব মুখরিত নূপুর সুভাব
জাগক যুত চরণ নখন চন্দ্রিকা ঘনী। (১)

নৃত্যের তালে তালে, যেন ছন্দ নৃত্য করিতেছে। ব্রজবুলির সরস মধুভাষা যেন সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরা বাজাইতেছে!

সুরকাব্যে অসম্ভবোক্তি অতি বিরল। বর্ণনা সর্ব্বত্রই সরস ও স্বাভাবিক। এজন্য স্থানে স্থানে আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ অশ্লীল কবিতা স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণবকবি মাত্রই এই অপরাধে অপরাধী। এই অশ্লীলতার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সুরদাস অপেক্ষা তুলসী দাসের অধিক সমাদর করিয়া থাকেন। (১) কিন্তু বৈষ্ণবভক্ত কবিগণ যে আধ্যাত্মিক

(১) Cf. বাজত ডিগি ডিগি ধোদ্রিমী দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী, শ্যাম সঙ্গে মাতি, করে কুরুতাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া।
ডগমগ ডম্ফ ডিমিকি দ্রিমি মাদল, রুণু ঝুণু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিনী রণরণি, বলয়া কনয়া মনি, নিধুবনে রাসতুমুল উতরোল॥
বীণা রবাব মুরজ, স্বরমণ্ডল, সা রি গম প ধ নিস বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরযানি চঞ্চল স্বরমণ্ডল ঝরুরাব।
শ্রমভরে বলিত, লোলিত কবরীযুত, মালতী মাল বিথাবল মোতি। ইত্যাদি বিদ্যাপতি।

(1) Natives of India gives him the very highest uiche of fame, but I believe

উচ্চভাব লইয়া রাসলীলার মাধুরী উপভোগ করিতেন, তাহা বুঝিতে পারিলে এবং প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলে কেহ তাহাতে অশ্লীলতা দোষ দেখিবেন না। সাধারণের চক্ষে উপমার দোষে মূল বিষয় দুষ্ট হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

রাসলীলা ও রাধাকৃষ্ণের অনুরাগের আনুষঙ্গিক কিঞ্চিৎ নায়িকাভেদও সূর বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। কৃষ্ণের মথুরাগমন বর্ণনা অতি চমৎকার। ব্রজবিরহ বর্ণনার তুলনা হিন্দী ভাষায় নাই। আর কোন,ভাষায়ও আছে কিনা, জানি না। সুরদাস বিয়োগ-শৃঙ্গার বর্ণনায় অতিশয় পটু। ইহাতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষজ্ঞ। অতএব উদ্ধব-সংবাদ ও কৃষ্ণের মথুরাগমন লিখিতে লিখিতে তিনি নিপুণ হস্তে যে কবিত্বের ছটা দেখাইয়াছেন, তাহার সমকক্ষতা দেখাইতে পারে এমন কবি ভূভারতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

সুরদাস বুঝাইয়াছেন,—

"গোকুল সবৈ গোপাল উপাসী।
নামগোপাল জাতিকুল-গোপাল গোপ-
গোপাল উপাসী।" (২)

কৃষ্ণলাভের আদিতে যে যমুনা ব্রজললনাদিগের সখী, অন্তে কৃষ্ণ বিরহের দারুণ দিনেও সেই কালিন্দীর কালজল তাহাদের মনে কত ভাব জাগাইয়া দিত।

দেখিয়ত কালিন্দী অতিকারী। (১)
কহিয়ো পথিক জায় হরিসোঁ ভেঁ। ভই বিরহ
জুরজারী।
মনো পলিকা পে পরী ধরণি ধসী, তরঙ্গ
তলফ, তনুভারী।
তটবারু উপচারি চূর মনোস্বেদ প্রবাহ
পনারী।
বিগলিত কচ কুস কাস পুলিন, মনোপঙ্কজ
কজ্জলসারী।
ভ্রমর মনোমতি ভ্রমত চহুঁ দিশি ফিরতি হৈঁ
অঙ্গ দুখারী।
নিশিদিন চকই ব্যাজ বকত মুখ কিনি মানহুঁ
অনুহারী।
সুরদাস প্রভু জো যমুনা গতি সো গতি ভই
হমারী।

কাঙ্গাল সুরদাস রাজকবি ছিলেন না। রাজা ও যুদ্ধাদি বর্ণনায় তিনি আদৌ কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারেন নাই। তুলসী সকল বিষয়েই পারদর্শী ও সমান অধিকারী। সুর অন্য বিষয়ে তুলসীদাসকে আসন প্রদান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহার বিশেষ বিষয়ে গোস্বামী তুলসী কবিকে তিনি অনেক পশ্চাতে ফেলিতে পারিয়াছিলেন। ব্রজভাষায় মহাযুগের শেষ মহাকবি বিহারী লালের মার্জ্জিত, সংস্কৃত, সুরচিত, ওজনকরা কবিতা নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ঐ যুগের প্রবর্ত্তক আদি মহাকবি হিন্দী কবিগুরু সুরদাসের স্বাভাবিক ভাবপ্রবাহ ও প্রতিভার তুলনা সাহিত্য-জগতে দুর্লভ।

---

the European reader will prefer the nobility of character of all that Tulshidas wrote to the often too cloying sweetness of blind bard of Agra. Grierson.

(2) উপাসী—উপাসক।

(১) অতিকারী—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণা। ভই—হইয়াছে। বিরহজুরজারী—বিরহ জ্বরে জীর্ণ হইয়া। পলিকা—বস্ত্র। তলফ—স্ফীত হইয়া উঠা। তটবারু—তটোয়ারা—তীরস্থিত। উপচারি চূর—উপকারী চূর্ণ, বালু। পনারী—প্রবাহী। কচ—কেশ। কুস—কুশ, কাস—কাশ। মনোপঙ্কজ—পঙ্কজবৎ। মনোমতি—মন। চহুঁ—চারি চকই—চক্রবাক। ব্যাজ বকত—দুঃখকরে, আর্ত্তনাদ করে। কিনি—কোথায়। অনুহারী—অনুভব করা।

সুরদাসের রচনায় স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষ আছে। গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কবির শাস্ত্রজ্ঞান প্রতিফলিত হইয়াছে। যশোদা, নন্দ, কুব্জা প্রভৃতির চরিত্র বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সুরদাসের চরিত্র-চিত্রণ ক্ষমতা অসাধারণ ছিল।

অনেক স্থানে অবান্তরিক বিষয় সুর কবি অপরিমিত মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। মোহন মুরলী একাই পাঁচশ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে। নয়ন-বাণে অষ্টাদশ পৃষ্ঠা ভস্মীভূত হইয়াছে।

"শ্যাম অধর মৃদুসুনত মুরলিকা চক্রিত নারি ভই।
জো জৈসে সো তৈসেহি রহিগই সুখদুখ কহেউ নজাই।"

এবং

"মোহন মনমোহি লিয়ো ললিত বেণু বজাইবী।
মুরলী ধ্বনি শ্রবণ সুনত বিবশ ভই মাইরী।
লোকলাজ কুলকী মর্য্যাদা বিসরাইরী।
ঘর ঘর উপহাস সুনত নেকহুন লজাইরী।
উর জপতপ বেদপুরাণ কছু বৈন সুহাইরী।
সুরদাস প্রভুকি লীলা নিগম নেতি গাইরী।"

অতএব—

ধন্য মুরলী ধন্যতপ তুম্হারো।
ধন্য মাতা ধন্য ভ্রাতা ধন্য ধন্য পিতা ধন্যতুব ভক্তিসারো।
ধন্য বহ বাঁস ধনি ধন্য জহঁ তু রহী ধন্য বনঝার তোতে বড়াই॥
ইত্যাদি। (১)

সে মুরলী ধ্বনি শুনিয়া বিশ্বজগৎ পাগল হইত।

রাগ-ভৈরব।

"বাঁসুরী বজাই আজ রঙ্গ সোঁ মুরারী।
শিব সমাধি ভূলিগই; মুনি মনকী তারী।
বেদ ভনত ব্রহ্মা ভূলে, ভূলে ব্রহ্মচারী।
সুনতহী আনন্দ ভয়ো লগী হৈঁ করারী।
রম্ভা সব তাল চূকী ভূলী নৃত্যকারী।
যমুনা জল উলটি বহেউ, সুধিনা সম্হারী। ১
শ্রীবৃন্দাবন বংশবজী তিন লোক প্যারী।
গোয়াল বাল মগন ভয়ে ব্রজকী সব নারী॥
সুন্দর শ্যাম মোহনী মূরতি নটবর বপুধারী।
সুর কিশোর মদন মোহন চরণন বলিহারী।২

শ্যাম অধরে মুরলী দেখিয়া শ্রীরাধার হিংসা হইত। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন।—

"মুরলী হমকো সৌতি ভই।"

ও

"বাহীকে বশ ভয়ে নিরন্তর, বহ অধরনি রস লূটহিহৈ।" (৩)

---

(১) রহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি, পশিল হিয়ার মাঝে।
বয়জ তরুণী, হইল বাউরী, হরিল কুলের লাজে।
* * * *
কেহবা আছিল, শয়ন করিয়া, নয়নে আছিল নিঁদ।
যেমন চোরই, হরণ করিল, মানসে কাটিল সিঁদ।
চণ্ডীদাস।

(১) "কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান।"
জ্ঞানদাস।

(২) শ্যামের বাঁশীটী, দুপুরে ডাকাতি, সবরস হরি লৈল।
চণ্ডীদাস।

সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে, তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে। ঐ
হাঁরে সখি, কি নিদারুণ বাঁশী।
বাচিয়া যৌবন দিয়া হবু শ্যামের দাসী॥ ঐ

(৩) পিঁইয়ে অধর সুধা উগারে গরল। ঐ

অন্যত্র—

"বাঁস বংশ বংশী সব বশ্য জগতস্বামী।"

"সখী মুরলী ভই পটরাণী।"

এবং

"গাঝতি রাজতি শ্যাম অধর পরলাগত
তান সোহাই।"

নয়ন সম্বন্ধে—

"নৈনা নাহোঁ কছু বিচারত।
সম্মুখ সমর করত মোহনসোঁ যদ্যাপিহৈঁ হঠি
হারত॥
অবলোকত অলসাত নয়ন ছবি অমিততোয
অতি আরত।
তমকি তমকি তরকত মৃগপতি জ্যোঁ ঘুঁ ঘট
পটহি বিদারত॥ (১)

পিরীতি, এ তিন অক্ষর লইয়া সুর কবি যে দোহা রচিয়াছেন, তাহা আরো সুন্দর।

প্রীতি করি কাহু সুখ ন লহ্যো।
প্রীতি পতঙ্গকরী দীপক সোঁ আপৈ দেহ
দহ্যো। (২)
অলিসুত প্রীতিকরী জলসুত সোঁ সম্পতি
হাথ গহ্যো।
সারঙ্গ প্রীতি জুকরী নাদসোঁ সনমুখবাস
সহ্যো।
হমজো প্রীতিকরী মাধবসোঁ চলত ন কছু
কহ্যো।
সুরদাস প্রভু বিনুদুখ দুনো নৈননি নীর
বহ্যো॥ (৩)

উদ্ধব-সংবাদ কবি কাব্য রচনায় চরম নিপুণতা দেখাইয়াছেন। ভাগবতের উদ্ধব অন্তে জ্ঞান ভুলিয়া প্রেমমগ্ন হইয়াছিলেন। সুরদাসও সে চিত্র যথাযথ অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উদ্ধব-সংবাদ কবিকে কল্পনার সাহায্যে ভাব ও ভাষা সংগ্রহ করিতে হয় নাই। তিনি যেন উদ্ধবের মুখে প্রাণের কথায় জীবনের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করিয়াছেন। উদ্ধব-সংবাদ কবির অভিনয় নহে, আত্মপরিচয়। সুতরাং তাহা মর্ম্মস্পর্শী।

উধব মনন ভয়ে দসবীস।
একহু তো সো গয়ো শ্যাম সঙ্গ কো অব-
রাধৈ ইস॥
ইন্দ্রী সিথিল ভই কেসব বিণু জ্যোঁ দেহি
বিণু সীস।
আসালগী রহতি তনু স্বমো জী জৈ কেটি-
বরীস।
তুম তৌ সখা শ্যাম সুন্দরকে সকল জগকেঈস।
সুরদাস কহী রসকী মহিমা জোপুছে
জগদীশ। (১)

---

(১) "অরুণ নয়ন গতি বিজুরী চমক জিতি
দগধল কুলবতী লাজ।" গোবিন্দদাস

"তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ।" বিদ্যাপতি

(২) "দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সোফল ভুঞ্জইতে চাই।" বিদ্যাপতি

(৩) (ক) "পিরীতি পাবক কে জানে এত, পিরীতি
দুরন্ত কে বলে ভাল।" চণ্ডীদাস

(খ) "পিরীতি বলিয়া, এতিন আখর, যেন না
পড়য়ে মনে।" ঐ

(গ) পিরীতি পিরীতি, মধুর পিরীতি,
এ তিন ভুবন কয়।
পিরীতি করিয়ে, দেখিনু ভাবিয়ে,
কেবল গরলময়।। ঐ

(ঘ) কালার পিরীতি গরল সমান
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরিয়ে,
জনম যায় তার দুখে।। ঐ

(১) Cf. কানু বিনে জীবন জলতহি অনুখন
কো সহ এ হেন সন্তাপ।
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
পিব ইতে জীউ করে সাধ।। অক্রূর সংবাদ।
গোবিন্দদাস।

"সোচিয় উজসিত কাহ। তুয়া আশে আওল প্রাণ।।

ভাগবত ভক্তির জয় ঘোষণা করিয়াছিল। ভক্ত সুরদাসের হিন্দী কাব্যেও অন্তিমে প্রেম ও ভক্তির জয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন বিশিষ্ট হিন্দী সমালোচক বলিয়াছেন—

সুরদাসের বর্ণনা পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং তিনি হিন্দী সাহিত্যে মহর্ষি বাল্মীকির অবতার স্বরূপ। শুধু কবিতায় নহে, সাধনায় সুর অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্যজীবন আলোচনা করিলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। বহু তপস্যার ফলে আমাদের ভারতবর্ষে অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভা তুলসী ও সুর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

একন হৈঁ তপ পুঞ্জনকে ফল জোঁ তুলসী
অরু সুর গোঁসাই।

শ্রীরসিকলাল রায়।

শঙ্করাচার্য্যের মত

কর্ম্ম এবং জ্ঞান-কর্ম্মের বিরোধ।

আমরা স্থানান্তরে শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণন করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, বৈদিক কর্ম্ম বলিতে অগ্নিহোত্রাদিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করে। আমরা দেখাইয়াছি যে, পৌরাণিক দেব দেবী পূজা বৈদিককর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা দেখাইয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানমার্গের পথিক। কাম্য-কর্ম্মের বিরোধী। আমরা দেখাইয়াছি যে, এই অপরাধের জন্য পুরাণাদি তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে নিরস্ত হয় নাই। কর্ম্ম সম্বন্ধে এবং জ্ঞান-কর্ম্মের বিবাদ-সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের নিজের মত যথাসম্ভব পাঠকের নিকট প্রদর্শন করিতেছি।

উপনিষদ্ভাষ্যে, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এবং গীতাভাষ্যে বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ অনুবাদ করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। বৃহদারণ্যকোপনিষদ-ভাষ্যের ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন :—ধর্ম্ম (কর্ম্ম) দ্বিবিধ :—জ্ঞানপূর্ব্বক এবং কেবল (জ্ঞান-রহিত), তন্মধ্যে কেবল বা জ্ঞানরহিত কর্ম্মের ফল পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তি। জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মের ফল দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম যাহার সমান, তাহার মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি হয়। এইরূপে অবিদ্যা দোষযুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধনকৃত, নামরূপ এবং কর্ম্মাশ্রিত স্বাভাবিক সংসারগতি ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পৃঃ ১১। পরে আবার জ্ঞানের তুলনায় কর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি বলিতেছেন :—"যে ব্যক্তি নেতি নেতি বা নির্ব্বিশেষ আত্মাকে অর্থাৎ সর্ব্বাত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মা বলিয়া জানিয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মারম্ভের কোন স্থান থাকে না। যাহার চক্ষু আছে, তাহার পক্ষে দিবালোকে পথ চলিবার সময়ে কূপে বা কণ্টকে পতিত হওয়া সম্ভব নয়। অপরদিকে দেখা যায়, সমস্ত কর্ম্মফল

মিছ নহ ইহ আশোয়াস। কতত্তহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ঐ

আশ নিগড় করি জীউ, কত রাখব
অবহি যে কত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ
আওবেস বরখান।

বিদ্যাফলের অন্তর্ভুক্ত। যাহা বিনা যত্নে লাভ হয়, বুদ্ধিমান লোকে তাহার জন্য যত্ন করে না।" অধ্যায়—৬। ব্রাহ্মণ—৪—২২॥ আবার:—"কর্ম্মদ্বারা অবিদ্যার নাশ সম্ভব হয় না। কারণ কর্ম্মের সামর্থ্য দৃষ্ট বিষয়-সম্বন্ধী। কর্ম্মের সামর্থ্যের বিষয়:—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার এবং সংস্কার। কর্ম্মের সামর্থ্যে বস্তু বিশেষের উৎপত্তি হয়, প্রাপ্তি হয়, পরিণতি এবং সংস্কার হয়। এতদ্ভিন্ন কর্ম্ম সামর্থ্যের অন্য বিষয়ান্তর নাই, কারণ লোকে সেরূপ দেখা যায় না। মোক্ষ এই সকল কর্ম্মজনিত বিষয়ের অন্যতম নয়। জীব এবং তাহার মোক্ষ, এই দুয়ের মধ্যে অবিদ্যাই একমাত্র ব্যবধান, আমরা বলিতেছি। (আপত্তি) তাহা হয় হউক। কেবলমাত্র কর্ম্মের উক্তরূপ স্বভাব হয় হউক। কিন্তু বিদ্যা সংযুক্ত ফলাভিসন্ধি বা কামনা রহিত কর্ম্মের ফল অন্যরূপ। বিষ এবং দধি প্রভৃতি পদার্থের অন্যরূপ শক্তি জানা থাকিলেও বিদ্যা বিশেষ, বা মন্ত্র বা শর্করাদি যোগে তাহাদের অন্যরূপ শক্তি দৃষ্ট হয়। কর্ম্মসম্বন্ধেও সেরূপ হউক। (উত্তর) তাহা সম্ভব মনে করা যাইতে পারে না, কারণ প্রমাণাভাব। উৎপত্তি-প্রাপ্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল ভিন্ন অন্য বিষয়ে, কর্ম্মের সামর্থ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান (analogy) অর্থাপত্তি (circumstantial evidence) অথবা শব্দ (Revelation) কোনরূপ প্রমাণই বর্ত্তমান নাই।" ৫—৩—১॥

মুণ্ডকোপনিষদে ঋগ্বেদাদিকে "অপরাবিদ্যা" বলা হইয়াছে। তাহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—"অবিদ্যার ক্ষয় দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্তি। 'পরাবিদ্যা' বলিতে বেদ (ব্রহ্ম) বিষয়ক বিজ্ঞানকে বুঝায়। প্রাধান্য হেতু উপনিষদের অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞান "পরাবিদ্যা"। উপনিষদ শব্দরাশি মাত্র নয়। 'বেদ' শব্দে সর্ব্বত্রই শব্দরাশিকে লক্ষ্য করে। ১—১—৫॥ আবার বলিতেছেন:—"সাঙ্গ-বেদ সকলকে অপরাবিদ্যা বলা হইয়াছে। যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা 'পরাবিদ্যা'। 'অপরা' এবং 'পরা' এই বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে একের বিষয় সংসার, অপরের বিষয় মোক্ষ। কর্তৃ প্রভৃতি সাধনযুক্ত, ক্রিয়া এবং ফলাদিভেদযুক্ত সংসার অপরাবিদ্যার বিষয়। সেই সংসার অনাদি এবং অনন্ত। দুঃখ স্বরূপত্ব হেতু, তাহা জীবমাত্রেরই পরিত্যাজ্য। প্রথমে অপরা বিদ্যার বিষয় প্রদর্শিত হইল, কারণ তদ্দর্শনে অপরাবিদ্যার প্রতি বৈরাগ্য সঞ্চারের সম্ভাবনা। অপরাবিদ্যার বিষয় কি? অগ্নিহোত্রাদি যে সকল কর্ম্ম ঋগ্বেদাদি মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে,—বশিষ্ঠ প্রভৃতি মেধাবী ঋষিগণ যাহা দর্শন করিয়াছিলেন। ১—২—১। কর্ম্মের মধ্যে অগ্নিহোত্রই প্রথম, এজন্য প্রথমে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অগ্নি যখন ইন্ধন যোগে সম্যক প্রজ্বলিত হইয়া লেলীয়মান বা চঞ্চলশিখা-যুক্ত হয়, তখনই সেই লেলীয়মান শিখা মধ্যে দেবতার উদ্দেশে আজ্যভাগ ঘৃতাদি প্রদান করিবে এবং আজ্যভাগের মধ্যে মধ্যে আহুতি নিক্ষেপ করিবে। বিধিমত সম্যকরূপে অগ্নিতে আহুতি প্রক্ষেপাদি লক্ষণ কর্ম্মমার্গই লোকপ্রাপ্তির পথ। তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠান দুষ্কর, কারণ তাহাতে বিঘ্নবিপত্তি অনেক।" ১-২-২। "সে কেমন? যে অগ্নিহোত্রির অগ্নিহোত্র (অমাবস্যাতে কর্ত্তব্য) দর্শ নামক কর্ম্মবর্জ্জিত—(কারণ এই দর্শকর্ম্ম অগ্নিহোত্রির অবশ্য করণীয়) অথবা পৌর্ণমাস কর্ম্মবর্জ্জিত—(দর্শের ন্যায় পৌর্ণমাসও অগ্নিহোত্রির অবশ্য কর্ত্তব্য)

অথবা চাতুর্মাস্য কর্ম্মবর্জ্জিত, অথবা (শরৎকালে নবান্নদ্বারা কর্ত্তব্য) আগ্রয়ণাদি কর্ম্মবর্জ্জিত, অথবা প্রতিদিন যে অগ্নিহোত্রির গৃহে অতিথি পূজা না হয়, অথবা যাহার অগ্নিহোত্র নির্দ্দিষ্ট কালে অনুষ্ঠিত না হয়, অথবা যাহার অগ্নিহোত্র বৈশ্বদেব কর্ম্মবর্জ্জিত, অথবা যাহার অগ্নিহোত্রে বিধিপূর্ব্বক আহুতি অর্পিত না হয়,—ইত্যাদি নানা কারণে দুঃসম্পাদিত বা অসম্পাদিত অগ্নিহোত্রাদির কিরূপ ফল, তাহা উক্ত হইতেছেঃ—তদ্দ্বারা সেই অগ্নিহোত্র কর্ত্তার সপ্তম লোক পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। ভূলোক অবধি সত্য লোক পর্য্যন্ত সপ্তলোক এইরূপ দুঃসম্পাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মদ্বারা অপ্রাপ্য অতএব বিনষ্ট হয়,—বলা হইতেছে। অথবা পিণ্ডোদক দানাদি দ্বারা উপকার প্রাপ্ত পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহ, এই তিন এবং গ্রাসাদি দান দ্বারা উপকার প্রাপ্ত পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র এই তিন—এই উভয়লোক, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী রূপে যজমানের সহিত সম্বন্ধ। উক্তপ্রকারের অগ্নিহোত্রদ্বারা যজমানের এই সপ্তলোক থাকে না,—এজন্য বলা হইতেছে, বিনষ্ট হয়। কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং দেবী বিশ্বরুচী,—হবিঃ এবং আহুতি গ্রহণ জন্য অগ্নির এই লেলীয়মান সপ্তজিহ্বা। অগ্নিহোত্রী যদি অগ্নির এই প্রদীপ্ত সপ্তজিহ্বাতে কালোচিত কর্ম্ম আচরণ করে, তবে যজমান-প্রদত্ত সেই সকল আহুতি সূর্য্যরশ্মিরূপে সেই যজমানকে স্বর্গে লইয়া যায়। তথায় দেবগণের পতি ইন্দ্র একাকী সকলের উপরে বাস করেন। "আগমন কর, আগমন কর" এই বাক্যে পূজা এবং স্তুতিবাদ করিতে করিতে, "এই তোমাদের পুণ্যকর্ম্মের পথ, এবং ফল স্বরূপ ব্রহ্মলোক"—ইত্যাদি প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে লইয়া যায়। প্রকরণের তাৎপর্য্য অনুসারেই এস্থলে ব্রহ্মলোক শব্দে স্বর্গকে বুঝায়। জ্ঞান-রহিত কর্ম্মের ইহাই ফল, অবিদ্যা-জনিত কাম কর্ম্মের ইহাই কার্য্য, অতএব তাহা অসার, দুঃখজনক, নশ্বর এবং অস্থির। যজ্ঞরূপ কর্ম্ম অষ্টাদশাশ্রিত (ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান, এবং তৎপত্নী)-বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'অবর' অর্থাৎ জ্ঞান-বর্জ্জিত কর্ম্ম যে অষ্টাদশকে আশ্রয় করে, তাহা অদৃঢ়, অতএব নশ্বর। তৎসাধ্য ফলের সহিত সেই আশ্রয় নষ্ট হয়, যেমন পাত্রের বিনাশে পাত্রস্থিত ক্ষীর বা দধিও বিনষ্ট হয়। যে সকল মূঢ়লোক নশ্বর কর্ম্মকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়া আনন্দিত হয়, তাহারা কিছুকাল স্বর্গে বাস করিয়া পুনরায় জরা মৃত্যুর অধীন হয়। ১-২-৩ হইতে ৭। ইষ্ট বা যাগাদি শ্রৌতকর্ম্ম এবং পূর্ত্ত বা বাপী তড়াগাদি খননরূপ জনহিতকর স্মার্ত্ত কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধন ভাবিয়া, যাহারা আত্মজ্ঞানের শ্রেয়ঃ সাধনত্ব বিষয়ে অজ্ঞানী বা উদাসীন থাকে, পুত্র-পশু-বন্ধুতে আসক্ত সেই মূঢ়েরা স্বর্গপৃষ্ঠে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া, স্বীয় কর্ম্ম-শেষ অনুসারে পুনরায় এই মনুষ্যলোকে বা তদপেক্ষা হীনতর তির্য্যক্ বা নরকাদি লোকে প্রবেশ করে। ১—২—১০।

ঈশোপনিষদ্ভাষ্যের ভূমিকাতে শঙ্কর বলিতেছেনঃ "ঈশাবাস্য' ইত্যাদি মন্ত্র কর্ম্ম বিষয়ক নয়। এসকল আত্মারই যাথাত্ম্য বা স্বরূপ প্রকাশক। আত্মা কর্ম্মশেষ বা কর্ম্মের অঙ্গ নয়। শুদ্ধত্ব, অপাপবিদ্ধত্ব, একত্ব, নিত্যত্ব, অশরীরত্ব এবং সর্ব্বগতত্ব, যাহা এস্থলে বক্তব্য, তাহাই আত্মার যাথাত্ম্য বা স্বরূপ। তাহা কর্ম্মের বিরুদ্ধ। কর্ম্মে এসকল মন্ত্রের অবি-নিয়োগ মনে করাই সঙ্গত। শুদ্ধত্বাদি লক্ষ-

পযুক্ত আত্মার যাথাত্ম্য বা স্বরূপ উৎপাদ্য, বিকার্য্য, প্রাপ্তব্য, সংস্কার্য্য,অথবা কর্ত্তৃভোক্তৃ-রূপ হইতে পারে না, যদ্দ্বারা আত্মার কর্ম্ম-শেষত্ব সম্ভব হইবে। আত্মার অনেকত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অশুদ্ধত্ব, এবং পাপবিরুদ্ধ-ত্বাদি লোক বুদ্ধিসিদ্ধ মনে করিয়াই কর্ম্মসকল বিহিত হইয়াছে। কর্ম্মফলের প্রয়োজন: (১) দৃষ্ট যথা ব্রহ্মতেজাদি ; (২) অদৃষ্ট যথা স্বর্গাদি। অধিকারজ্ঞেরা বলেন:—'আমি দ্বিজাতি, আমি কাণকুব্জত্বাদি অনধিকারের প্রয়োজক ধর্ম্মবান্ নই', যে ব্যক্তি আত্মাকে এইরূপ মনে করে, তাহারই কর্ম্মে অনধিকার।' "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি'—ইত্যাদি শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন: —"অনাত্মজ্ঞত্ব হেতু যাহারা আত্মার গ্রহণে অসমর্থ, তাহাদিগের প্রতি এইমন্ত্র দ্বারা উপদিষ্ট হইতেছে, "অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শতবৎসর জীবন লাভ ইচ্ছা করিবে।" ইহা কিরূপে জানা গেল ? পূর্ব্বের 'ঈশাবাস্য' ইত্যাদি মন্ত্রে সন্ন্যাসীর জন্য জ্ঞাননিষ্ঠা বর্ণনা করিয়া, পরের মন্ত্রে যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের জন্য কর্ম্মনিষ্ঠা উপদিষ্ট হইতেছে। জ্ঞান এবং কর্ম্মের মধ্যে যে অকম্পা বা অটল পর্ব্বতবৎ বিরোধের কথা উক্ত হইয়াছে কেন, তাহা স্মরণ কর না ? জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই উভয়ের ফলভেদ বর্ণন করিতেছে:—এই দুইটীই মাত্র মার্গ বিস্তৃত হইয়াছে, ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি পথ এবং সন্ন্যাস বা নিবৃত্তি বা ত্রিবিধ বাসনা ত্যাগের পথ। এই পথদ্বয় মধ্যে সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। তৈত্তিরীয়কে উক্ত হইয়াছে:— এই দুইটীই পথ যাহার মধ্যে বেদসকল প্রতি-ষ্ঠিত, প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তির লক্ষণ ধর্ম্ম। ২। আবার ঈশোপনিষদ্ভাষ্যে পরের মন্ত্র বলিতেছেন:—অবিদ্যার নিন্দার্থ 'অসূর্য্যা' ইত্যাদি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। অদ্বয় পরমাত্মার তুলনায় দেবাদিও 'অসুর', এবং দেবাদির আত্মভূত লোক সকল 'অসূর্য্য'। সে সকলকেই লোক বলা হয়, কারণ তাহাতে কর্ম্মফল সকল দর্শন হয় (লোক্যন্তে)। সে সকল লোক আদর্শনাত্মক বা অজ্ঞানরূপ তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত। যাহারা আত্মঘাতী, দেহ ত্যাগের পর তাহারা সে সকল লোকমার্গে গমন করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যাহার যেমন কর্ম্ম,যাহার যেমন বিদ্যা, তাহার সেইরূপই পরিণাম। কাহারা সেই আত্মঘাতী ? যাহারা অবিদ্বান্। তাহারা কিরূপে নিত্য ও আত্মঘাত করে ? আত্মা নিত্য প্রকাশমান হইলেও তাহারা সেই প্রকাশমান আত্মাকে অবিদ্যার দোষে অপ্রকাশিত করে। আত্মার প্রকাশে অজরামরত্বের অনুভূতি-লক্ষণ-ফল লাভ হয়। সেই আত্মা অপ্রকাশিত হইলে, নিহতের ন্যায় অজরামরত্ব তিরোহিত হয়। এই কারণেই প্রাকৃত অবিদ্বান্ লোকদিগকে "আত্মহণ" বলা হইয়াছে। তাহারা সেই আত্ম-হনন দোষে সংসার গতি প্রাপ্ত হয়।"

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ভাষ্যের ভূমিকায় শঙ্কর বলিতেছেন :—কর্ম্মকাণ্ডের সহিত এই উপনিষদের সম্বন্ধ উক্ত হইতেছে। অগ্নিহোত্রাদি যাহা কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, যদি তাহা প্রাণ, অগ্নি প্রভৃতি অধিদেবতা বিষয়ক বিজ্ঞানযুক্ত হয়,তবে তাহা অর্চ্চরাদি পথে অর্থাৎ জ্যোতি-চিহ্নিত দেবযান পথে ব্রহ্মলোক অর্থাৎ কার্য্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কারণ হয়। আর কেবল বা অধিদেবতা বিষয়ক জ্ঞানবর্জ্জিত কর্ম্ম ধূমাদি-পথে অর্থাৎ ধূমচিহ্নিত পিতৃযান পথে চন্দ্রলোক-প্রাপ্তির কারণ হয়। আর যাহারা স্ব স্ব স্বভাবের মাত্র অধীন বা স্বেচ্ছাচারী,

তাহারা দেবযান এবং পিতৃযান, উভয়মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং কষ্টভোগ করে। অর্চিরাদিমার্গ এবং ধূমাদিমার্গ, এই মার্গদ্বয়ের কোনটীতেই আত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ হয় না। এ জন্যই কর্ম্ম-নিরপেক্ষ অদ্বৈতাত্ম বিজ্ঞানের উপদেশ আবশ্যক, কারণ তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সংসারগতির বীজ নষ্ট নয়।" আবার বলিতেছেন:—"অদ্বৈতাত্মদর্শন কর্ম্মের সহভাবী নয়। 'সৎস্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয়,' 'এই সকলই আত্মা"—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য জনিত প্রত্যয়ের বাধক প্রত্যয়ান্তর অসম্ভব, অতএব এতদ্দ্বারা ক্রিয়া, কারক এবং ফলাদির ভেদ বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। যদি বলা যায়, কর্ম্ম-বিধির প্রত্যয়ই তাহার বাধক, তাহা নয়। কারণ স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি প্রত্যয়যুক্ত, এবং তজ্জনিত কর্ম্মফল বিষয়ে রাগ দ্বেষাদি দোষযুক্ত অজ্ঞানীর জন্যই কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। যদি বল যে অধিগত-সকল-বেদার্থ এমন লোকের জন্যও কর্ম্ম বিহিত হওয়াতে অদ্বৈত জ্ঞানীর জন্যও কর্ম্ম বিহিত, তাহা নয়। 'সৎস্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয়', 'এই সকলই আত্মা, এই বাক্য দ্বারা কর্ম্মাধিকারীর স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি জ্ঞান বিনষ্ট হয়। অতএব অবিদ্যাদি দোষ যুক্তের জন্যই কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। অদ্বৈত জ্ঞানীর জন্য নয়।

"ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে জ্ঞান এবং কর্ম্মের বিরোধ প্রদর্শন।

ব্রহ্মসূত্রে "পুরুষার্থ অতঃ শব্দাৎ" (অ-৩। পা-৪। সূ-১) এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—"অতঃ অর্থাৎ বেদান্ত বিহিত আত্মজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিরপেক্ষ ভাবে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। তাহা কিরূপে জানা যায়? 'শব্দাৎ' অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে লাভ করে।"স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি"—'যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারে, সে সকল লোক এবং সকল কাম্যবস্তু লাভ করে।' এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য জৈমিনি প্রভৃতি কর্ম্মীদিগের মতের ব্যাখ্যা করিয়া পরে তাহা খণ্ডন করিতেছেন। ৩-৪২ হইতে ২৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। শঙ্কর প্রতি পক্ষের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন:—"আচার্য্য জৈমিনির মত যে আত্মজ্ঞানের প্রশংসাসূচক যে সকল ফলশ্রুতি আছে, তাহা সমস্তই অর্থবাদ বা প্রশংসা বাক্য মাত্র। কারণ আত্মা কর্ত্তা, অতএব কর্ম্মেরই অঙ্গ বা শেষ। আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান, জলসেচন দ্বারা ব্রীহিপ্রোক্ষনের ন্যায়, সংস্কারার্থক। আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মজ্ঞান যখন কর্ম্মদ্বারা অনধিগম্য, অধ্যয়ন দ্বারাই মাত্র লভ্য, তাহা কিরূপে ক্রতুর সহিত সংযুক্ত হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায়, কর্ত্তৃরূপে আত্মার ক্রতু সম্বন্ধ। তাহা হয় না, কারণ শ্রুতিবাক্যের সেরূপ অর্থ করা অসঙ্গত। কর্ম্মদ্বারা অনারভ্য, অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য আত্মজ্ঞানের শ্রুতি বাক্য জন্য ক্রতু সম্বন্ধ কোন অব্যভিচারী সূত্র থাকিলেই মাত্র সম্ভব। কিন্তু কর্ত্তৃত্ব সূত্র ব্যভিচারী, লৌকিক এবং বৈদিক উভয়বিধ কর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণ। অতএব কর্ত্তৃত্ব সূত্রে আত্ম জ্ঞানের ক্রতু সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। না, তাহা নয়, কারণ ব্যতিরেক বিজ্ঞান অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা পৃথক্, এই জ্ঞান বৈদিক কর্ম্ম ভিন্ন অন্যত্র সঙ্গত হয় না। আত্মার দেহ ব্যতিরিক্তত্ব-বিজ্ঞান কখনও লৌকিক কর্ম্মের উপযোগী হয় না, কারণ

লৌকিক কর্ম্ম সর্ব্বদাই দৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মের ফল দেহপাতের পরে প্রবৃত্ত হয়। আত্মার দেহব্যতিরিক্তত্ব-বিজ্ঞান ভিন্ন বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি সম্ভব নয়। অতএব ব্যতিরেক-বিজ্ঞানকে ক্রতু সম্বন্ধের উপযোগী বলা যায়। তবে যদি বল, অপহত পাপ্মত্বাদি বিশেষণ দৃষ্টে দেখা যায়, উপনিষদ্গম্য যে আত্মদর্শন, তাহা অসংসারী আত্মাসম্বন্ধী, তাহা কর্ম্ম-প্রবৃত্তির অঙ্গ হইতে পারে না। তাহা নয়। 'প্রিয়াদি' বিশেষণ যুক্ত হওয়াতে সংসারী আত্মারই দ্রষ্টব্যত্ব বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে অপহত পাপ্মত্বাদি বিশেষণ স্তত্যর্থক হওয়া সম্ভব।" ৩৪-২। পরের সূত্রেও শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তিই বর্ণন করিতেছেন :—"বিদেহরাজ জনক বহু দক্ষিণা সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অন্যান্য শ্রুতিবাক্যেও এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী-দিগের কর্ম্ম সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কেবল জ্ঞান দ্বারাই যদি পুরুষার্থ সিদ্ধি সম্ভব হইবে, তবে তাহারা কি জন্য বৃথা বহু-আয়াস সাধ্য কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবেন? "যদি আকন্দের গাছেই মধু পাওয়া যাইবে, তবে লোকে বৃথা পর্ব্বতে যাইবে কেন?" ৩-৪-৩॥ প্রতিপক্ষ আরও বলিতেছেন :—"বিদ্যাযোগে অথবা শ্রদ্ধা এবং উপনিষদ্ যোগে যে কর্ম্ম করা যায়,তাহা বীর্য্য বত্তর হয়'—ইহা দ্বারাও বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, অতএব কেবলা বা কর্ম্মবর্জ্জিত বিদ্যা পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ হইতে পারে না। ৩-৪-৪। 'বিদ্যা এবং কর্ম্ম মরণান্তে সহগামী হয়'—ইহা দ্বারাও দেখা যায়, বিদ্যা এবং কর্ম্মের ফল একত্রেই লাভ হয়। অতএব বিদ্যার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। আবার বিজ্ঞানবানের জন্যই কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। "আচার্য্যকুলে থাকিয়া বেদ অধ্যয়ন করিয়া, গুরুর কার্য্য যথাবিধি সম্যক্ সম্পন্ন করিয়া, কুটুম্ব মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়নে রত থাকিবে"—ইত্যাদি শ্রুতিবচন দ্বারাও সমস্ত বেদার্থ-বিজ্ঞানবানেরই কর্ম্ম অধিকার প্রতিপন্ন হয়। অতএব বিজ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে কোন ফল লাভের কারণ হয় না।" ৩৪-৬॥ "সংসারে কর্ম্ম করিয়াই শতবর্ষ জীবন লাভ ইচ্ছা করিবে' এই জাতীয় বিধি সকল দ্বারাও বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব অনুমিত হয়। ৩-৪-৭॥

এইরূপে প্রতিপক্ষের আপত্তি সকল বর্ণন করিয়া শঙ্কর তাহা খণ্ডন করিতেছেন:—"বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ, অতএব বিদ্যাদ্বারা পুরুষার্থ লাভ বিষয়ক শ্রুতিবচন সকল বিদ্যার প্রশংসা বাক্য মাত্র, এরূপ বলা অসঙ্গত। কেন? অধিকোপদেশ হেতু। সংসারী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা, জীবই শরীর হইতে ভিন্ন, যদি বেদান্তের উপদেশ এরূপ হইত, তাহা হইলে বিদ্যা ফলশ্রুতির অর্থবাদত্ব সিদ্ধ হইত। কিন্তু শারীর বা জীব হইতে অধিকের উপদেশ আছে। অসংসারী ঈশ্বর, কর্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মরহিত, অপহত পাপ্মত্বাদি বিশেষণ যুক্ত পরমাত্মাই বেদ্যরূপে বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। বরং সেই বিজ্ঞান, কর্ম্ম সকল নষ্ট করে, "উপমর্দ্দঞ্চ" এই সূত্রে তাহা প্রদর্শিত হইবে। অতএব আত্ম-বিজ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ লাভই শ্রুতিসিদ্ধ (পুরুষার্থ অতঃ-শব্দাৎ) তর্কদ্বারাও ভগবান বাদরায়ণের এই মতই অবিচলিত রহিয়াছে। কর্ম্মশেষত্ব প্রভৃতি হেত্বাভাষদ্বারা তাহা বিচলিত হইতে পারে না। আর যে বলা হয়, "আত্মনস্তু-কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের 'প্রিয়াদি' শব্দ দ্বারা সংসারী আত্মাই

সংকুচিত হইতেছে। তাহার উত্তর এই যে, অধিকোপদেশ থাকাতে সংসারী আত্মার বেদান্ত বলিলেও এই মাত্রই প্রকাশ পায় যে, সংসারী আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে অত্যন্ত ভেদ নাই। ইহাদ্বারা অবিরোধ প্রদর্শিত হইল। "তত্ত্বমসি" "নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা ইত্যাদি শ্রুতিবচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীর আত্মার ও পরমার্থিক স্বরূপ পারমেশ্বরিক শারীরত্ব উপাধিকৃত।" ৩-৪-৮। "আর যে বলা হইয়াছে (জনকাদির) আচার দৃষ্টেও বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব প্রমাণিত হয়, এ সম্বন্ধে আমরা বলিতেছি যে, বিদ্যার অকর্ম্মশেষত্ব সম্বন্ধে ও আচারের প্রমাণত্ব তুল্য। যে হেতু শ্রুতি বলিতেছে "সেই জ্ঞানী ঋষিগণ এবং কর্ম্মীগণ বলেন, আমরা কি জন্য অধ্যয়ন করিব, কি জন্য যজ্ঞ করিব! পূর্ব্বতন বিদ্বানগণ এই কারণেই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেন না ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানীগণেরও অকর্ম্মনিষ্ঠত্ব দৃষ্ট হয়। ৩-৪ ৯। আর যে বলা হয়, বিদ্যা এবং কর্ম্ম মৃত ব্যক্তির সহিত একত্রে গমন করে, "সমন্বারভেতে" এই শ্রুতি বাক্যের 'সমন্বারম্ভ' শব্দও বিদ্যার অস্বাতন্ত্র্যেরই লিঙ্গ, তাঁহার উত্তর এই:—এই শ্রুতিবাক্য বিভাগ অনুমান করিতে হইবে, অর্থাৎ কাহারও সঙ্গে বিদ্যা, আর কাহারও সঙ্গে কর্ম্ম গমন করে। যেমন 'এ দুজনকে শত মুদ্রা দান কর' বলিলে প্রত্যেককে পঞ্চাশ পঞ্চাশ মুদ্রা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। আর এই 'সমন্বারম্ভ' বচন মুমুক্ষু সম্বন্ধী নয়, কারণ উপসংহারে "ইতিনুকাময়মানঃ" বলাতেই তাহার সংসারী বিষয়কত্ব দৃষ্ট হয়। এবং সেই সঙ্গে "অথ অকাময়মানঃ" বলাতে মুমুক্ষুর পৃথক উল্লেখও দৃষ্ট হয়। ৩-৪-১১। আবার "আচার্য্যকুল হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া" ইত্যাদি বাক্যে অধ্যয়নেরই মাত্র উল্লেখ। আমরাও স্বীকার করি,—যিনি অধ্যয়ন মাত্র করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ হইলে অবিদ্বত্ব কর্ম্মে অনধিকারের কারণ হয়। সে দোষ হয় না, কারণ অধ্যয়ন-জনিত কর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান যে কর্ম্মে অধিকারের কারণ, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তবে কি? আমাদের কথা এই যে, উপনিষৎ-প্রতিপন্ন আত্মজ্ঞানের স্বতন্ত্র প্রয়োজন আছে জানা যায়, এবং তাহা কর্ম্মে অধিকার লাভের কারণ নয়। তাহাই আমরা দেখাইতেছি। যেমন কোন ক্রতু-বিশেষের অধিকারীর পক্ষে, অন্য ক্রতু বিশেষের সম্বন্ধী জ্ঞানের অপেক্ষা করে না, ইহাও সেরূপ। ৩—৪—১২। 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যাদি বিধি শ্রুতিতে এমন কোন বিশেষত্বের উল্লেখ নাই যে, তাহা বিদ্বানের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অবিশেষ ভাবেই বিধি উক্ত হইয়াছে। ৩-৪-১৩। "প্রকরণ বলে যদিও এস্থলে "কুর্ব্বন্" শব্দের সহিত বিদ্বানেরই সম্বন্ধ প্রতীত হয়, তথাপি ইহাকে বিদ্যার স্তুতির জন্য কর্ম্ম সম্বন্ধী অনুজ্ঞা মনে করিতে হইবে। "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্বান্ যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিলেও তাহার বিদ্যার বলে সেই কর্ম্মদ্বারা সে লিপ্ত হয় না। এইরূপে বিদ্যারই প্রশংসা করা হইয়াছে। ৩-৪-১৪। কোন কোন জ্ঞানী বিদ্যার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, তৎ প্রভাবে ফলান্তর-সাধক প্রজাদির প্রয়োজনাভাব অনুভব করিয়াছেন:—"ইহা দেখিয়া পূর্ব্বতন জ্ঞানীগণ প্রজা কামনা করেন নাই। এই আত্মাই যখন আমাদের, এই আত্মাই যখন আমাদের লোক, তখন প্রজা দ্বারা

আমরা কি করিব।" ৩-৪-১৪॥ "বিদ্যার ফল অনুভব সিদ্ধ, কর্ম্মফলের ন্যায় কালান্তরভাবী নয়। এজন্যও বিদ্যা কর্ম্ম শেষ হইতে পারে না, এবং বিদ্যাফলের অযথার্থতা কল্পনা করা যাইতে পারে না।" ৩.৪.১৫। "উপমর্দ্দঞ্চ"—"বিদ্যার প্রভাবে কর্ম্মাধিকারের হেতুভূত অবিদ্যাকৃত ক্রিয়া-কারক এবং ফল লক্ষণ সমস্ত প্রপঞ্চের উপমর্দ্দ (লয়) শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। "যখন সমস্তই তাঁহার আত্মা হইয়া যায়, তখন কি দিয়া কাহাকে দর্শন করিবে" ইত্যাদি। ইহা দ্বারাও বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হয়। ৩.৪.১৬। উর্দ্ধরেত আশ্রমে বিদ্যা লাভের কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। উর্দ্ধরেতার যখন কোন কর্ম্ম নাই, তখন তাহার পক্ষে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সম্ভব নয়, যেহেতু উর্দ্ধরেতাদিগের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মের ব্যবস্থা নাই। গার্হস্থ্য গ্রহণ করিয়া হউক, আর না করিয়াই হউক, ঋণ পরিশোধ করিয়াই হউক, আর না করিয়াই হউক, উর্দ্ধরেতত্ব গ্রহণ শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারাও বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়। ৩-৪-১৭।

আবার প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন:—"এয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা:'—ইত্যাদি যে সকল শ্রুতি বচন উর্দ্ধরেত প্রভৃতি আশ্রম সকলের অস্তিত্ব প্রতিপাদন জন্য উল্লেখ করা হয়, তদ্দ্বারা তাহাদের অনুষ্ঠেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয় না। আচার্য্য জৈমিনির মত যে এই সকল শ্রুতি উর্দ্ধরেত প্রভৃতি আশ্রমান্তর সম্বন্ধে আলোচনা মাত্র,—কিন্তু বিধি নয়। কেন? কারণ ইহাতে লিঙ্গ বা লক্ষণ ভিন্ন কোন চোদনা বা বিধিবোধক শব্দ নাই। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিধি ভিন্ন অন্য অর্থ দেখা যায়। "তিনটী ধর্ম্ম স্কন্ধ"—তন্মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান প্রথম। তপস্যাই দ্বিতীয়। আচার্য্য-কুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়—যেহেতু তিনি আচার্য্যকুলে বাস করিয়া আপনাকে অত্যন্ত সংযত করেন। ইহারা সকলেই পুণ্যলোকের অধিকারী। এইরূপ আলোচনা পূর্ব্বক আশ্রম সকলের অনাত্যন্তিক ফলত্ব কীর্ত্তন করিয়া আত্যন্তিক ফলত্ব হেতু ব্রহ্মসংস্থতার প্রশংসা করা হইতেছে:—"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি"—'যে ব্রহ্মেতে স্থিতি করে, সে অমৃতত্ব লাভ করে'। তবে আলোচনা মাত্র হইলেও ইহা দ্বারা যে আশ্রম সকল লক্ষিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বুঝিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু স্মৃতি এবং লোকাচার দ্বারাই তাহাদের বিহিতত্ব সিদ্ধ হয়, প্রত্যক্ষ স্থানীয় শ্রুতিদ্বারা নয়। অতএব প্রত্যক্ষ স্থানীয় শ্রুতির সহিত বিরোধহেতু, সে সকল স্মৃতি এবং লোকাচার আদর-যোগ্য নয়, অথবা সে সকল স্মৃতি এবং লোকাচার স্বীয় অধিকারের বহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধী। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান প্রথম বলাতে উর্দ্ধরেতার ন্যায় গৃহস্থও বিবেচিত হইয়াছে। তাহা সত্য। কিন্তু তথাপি গৃহস্থের জন্য অগ্নিহোত্রাদির বিধান থাকাতে তাহার অস্তিত্ব শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। অতএব উক্ত আলোচনা স্তুত্যর্থক মাত্র, বিধি নয়। আবার প্রত্যক্ষস্থানীয় শ্রুতিই গার্হস্থ্য ভিন্ন অন্য আশ্রমের নিন্দা করিতেছে:—"সে ব্যক্তি দেবতাদিগের বীরহা, যে অগ্নিকে উদ্বাসিত করে," "আচার্য্যের জন্য প্রিয়ধন আহরণ করিয়া প্রজাতন্তু ছেদন করিবে না," "পুত্রহীনের কোন লোকে স্থান নাই।" ৩—৪—১৮। উক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন:—"আচার্য্য বাদরায়ণের মত যে গার্হস্থ্য ভিন্ন অন্য আশ্রমও গ্রহণ করিতে হয়, কারণ শ্রুতিতে তাহা

উক্ত হইয়াছে। আবার অগ্নিহোত্রাদিও অবশ্য অনুষ্ঠেয়। শ্রুতিবাক্যে যখন এরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয়, তখন যাহারা গার্হস্থ্যের অনধিকারী (কাণকুজাদি) তাহাদেরই জন্য অন্য আশ্রম মনে করিতে হইবে। এইমত বাদরায়ণ খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহার মত যে গার্হস্থ্যের ন্যায় অন্য আশ্রমও অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করা আবশ্যক। কেন? কারণ শ্রুতিতে আশ্রম সকলের সমানত্ব উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ শ্রুতিদ্বারা ও গার্হস্থ্যের সহিত আশ্রমান্তরের সমানত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, কারণ "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে গার্হস্থ্য যেরূপ পরামৃষ্ট (বিবেচিত) হইয়াছে, আশ্রমান্তরও সেইরূপ দেখা যায়। অতএব আশ্রমান্তরের অনুষ্ঠেয়ত্ব গার্হস্থ্যেরই তুল্য। ৩—৪—১৯॥ ব্রহ্মসংস্থতার প্রশংসা দৃষ্টে তাহা অবশ্য বিধেয় মনে করিতে হইবে। এই "ব্রহ্মসংস্থতা" কি আশ্রম চতুষ্টয়ের যে কোন আশ্রমেই সম্ভব, অথবা তাহা কেবল মাত্র পরিব্রাজকেরই জন্য, তাহার বিচার করিতে হইতেছে। যদি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের উল্লেখ করাতেই পরিব্রাজকেরও উল্লেখ করা হইয়া থাকে, তবে সেই উল্লেখের অবিশেষত্ব হেতু অনাশ্রমী বলিয়া আর কেহ থাকে না, এবং চারি আশ্রমের মধ্যে যে কেহই 'ব্রহ্মসংস্থ' হইতে পারে। আর যদি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের মধ্যে পরিব্রাজকের উল্লেখ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'অবশিষ্ট পরিব্রাজকই ব্রহ্মসংস্থ' এরূপ সিদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বৈখানস-বোধক তপঃশব্দ দ্বারাই পরিব্রাজকেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এরূপ বলা অন্যায়। বানপ্রস্থের বোধক বিশেষণরূপে যাহা গৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পরিব্রাজকের গ্রহণ উচিত হয় না। উক্ত বাক্যে ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ যেমন স্ব স্ব অসাধারণ বিশেষণ দ্বারাই বিশেষিত হইয়াছে, ভিক্ষু এবং বৈখানসও সেইরূপ হওয়াই সম্ভব। 'তপঃ' বানপ্রস্থেরই অনন্য-সাধারণ ধর্ম্ম। কায়-ক্লেশ প্রধানত্ব হেতু তপঃশব্দ বানপ্রস্থেই রূঢ় হইয়াছে। ভিক্ষুর বিশেষ ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়-সংযমাদি লক্ষণ, তাহা তপঃ শব্দদ্বারা প্রকাশিত হয় না। আশ্রম চারিপ্রকার বলিয়াই প্রসিদ্ধ, তিন প্রকার মনে করাও অন্যায়। আর এস্থলে ভেদেরও উল্লেখ আছে। "ইহারা তিনজনই পুণ্যলোক ভাক্, অবশিষ্ট পরিব্রাট্ অমৃতত্বভাক্।" কিন্তু একত্র প্রবর্ত্তমান ব্রহ্মসংস্থ শব্দ যখন সকলেই প্রযুক্ত হইতে পারে, তখন একমাত্র পরিব্রাজকে কেন রূঢ় হইবে? আর যদি রূঢ়ত্ব স্বীকার করা যায়, তবে যখন পারিব্রাজ্যাশ্রম মাত্র গ্রহণেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি, তখন জ্ঞানের আনর্থক্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহার উত্তর এই :—"ব্রহ্মসংস্থ" শব্দে 'ব্রহ্মেতেই সম্যক অবস্থিতি' বা অন্য-ব্যাপার-রহিত ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব বুঝায়। তাহা অপর আশ্রমত্রয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তাহাদের স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু পরিব্রাটের সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসহেতু তাহার পক্ষে অননুষ্ঠান নিমিত্ত প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। আর পরিব্রাটের ধর্ম্ম শমদমাদি ব্রহ্মসংস্থতারই সহায়, বিরোধী নয়। শমদমাদি দ্বারা বর্দ্ধিত ব্রহ্মনিষ্ঠত্বই পরিব্রাটের আশ্রম-বিহিত-কর্ম্ম। অপর আশ্রমত্রয়ের জন্য যজ্ঞাদি বিহিত, তাহার ব্যতিক্রমে তাহাদিগের প্রত্যবায়। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মসংস্থের কর্ম্মাভাব উক্ত হইয়াছে। এই কারণে 'পারিব্রাজ্যাশ্রম মাত্র গ্রহণেই অমৃতত্বপ্রাপ্তি', 'জ্ঞান নিরর্থক'

এরূপ দোষারোপের কোন স্থান নাই। অতএব অপর আশ্রমত্রয়ের পরামর্শ বা আলোচনা মাত্র হইয়াছে বলিলেও পারিব্রাজ্যের লক্ষণ ব্রহ্মসংস্থতাই উক্ত হইয়াছে। আশ্রমান্তর সম্বন্ধে বিধি ও প্রত্যক্ষস্থানীয় শ্রুতিতেই বর্ত্তমান ঃ—ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া পরে বনী হইবে, বনী হইয়া পরে পরিব্রাট্ হইবে, আর যদি বৈরাগ্য হেতু অন্যরূপ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্যান্তেই পরিব্রাট হইবে,—গৃহ হইতেই হউক বা বন হইতেই হউক।" এই শ্রুতি বাক্য গার্হস্থ্যাদির অনধিকারী অন্ধাদি সম্বন্ধী হইতে পারে না, কারণ এই বিধি সাধারণ (বিশেষত্ব রহিত)। অন্ধাদি অনধিকারীর সন্ন্যাস সম্বন্ধে পৃথক্ বিধান রহিয়াছে। শ্রুতিতে আরও উক্ত হইয়াছে ঃ—"বিবর্ণবাসা মুণ্ড, অপরিগ্রহ, শুচি, অদ্রোহী, ভিক্ষান্নজীবী পরিব্রাট্ ব্রহ্মত্ব লাভ করে।" এইরূপে উর্দ্ধরেতাদিগের আশ্রম শ্রুতিসিদ্ধ হইতেছে, এবং উর্দ্ধরেতাদিগের জন্য বিদ্যা বিহিত হওয়াতে, বিদ্যারও স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইতেছে।" ৩-৪-৩০।

"বিদ্যা স্বয়ংই পুরুষার্থ সিদ্ধির হেতু। বিদ্যার স্বার্থসিদ্ধির জন্য অগ্নীন্ধনাদি আশ্রম-কর্ম্মের অপেক্ষা করে না"। ৩ ৪-২৫।

আবার বলিতেছেন ঃ—"এখন বিচার্য্য এই বিদ্যা কি সম্পূর্ণই আশ্রম-কর্ম্ম নিরপেক্ষ, অথবা কথঞ্চিৎ অপেক্ষা করে। পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা স্বার্থসিদ্ধির জন্য অগ্নীন্ধনাদি আশ্রম-কর্ম্মের অপেক্ষা করে না। ইহাতে যদি অত্যন্ত অনপেক্ষা মনে কর, তবে তাহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, বিদ্যা সর্ব্ব আশ্রম কর্ম্মেরই অপেক্ষা করে,—অত্যন্ত অনপেক্ষা নয়। কিন্তু এরূপ কথা বিরুদ্ধ হইতেছে, কারণ একবার বলা হইতেছে, বিদ্যা 'আশ্রম কর্ম্মের অপেক্ষা করে না,' আবার বলা হইতেছে 'অপেক্ষা করে।' আমরা বলিতেছি, বিরুদ্ধ নয়, কারণ বিদ্যা উৎপন্ন হইলে তাহার ফল সিদ্ধির জন্য অন্য কিছুরই অপেক্ষা করে না। কিন্তু বিদ্যার উৎপত্তির জন্য অপেক্ষা করে। যজ্ঞাদি বিষয়ক শ্রুতি দ্বারাই তাহা দেখা যায় ঃ— "ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচন দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, যজ্ঞ দ্বারা, দান দ্বারা এবং অনাহারে তপস্যা দ্বারা।" ইহা দ্বারা যজ্ঞাদির বিদ্যা সাধনত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। বিবিদিষার সহিত সংযোগ হেতু যজ্ঞাদির বিদ্যা উৎপত্তি-সাধনত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। "যাহাকে যজ্ঞ বলা যায়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই"— ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যা সাধনভূত ব্রহ্মচর্য্যের সহিত একত্রে যজ্ঞাদির প্রশংসা দ্বারাও তাহার বিদ্যা-সাধনত্ব সূচিত হইতেছে। "অশ্ববৎ" অশ্ব যেমন স্বীয় যোগ্যতা হেতুই লাঙ্গলাকর্ষণে ব্যবহৃত না হইয়া কেবল রথাকর্ষণেই ব্যবহৃত হয়, আশ্রম কর্ম্মও সেইরূপ বিদ্যার ফল সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন না হইলেও বিদ্যার উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন হয়। ৩-৪-২৬। আপত্তি হইতে পারে যে, যজ্ঞাদির বিদ্যা সাধনত্ব স্বীকার করা অসঙ্গত, কারণ বিধির অভাব। আর "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি বিদ্যারই স্তুত্যর্থক অনুবাদ মাত্র, যজ্ঞাদির বিধিপ্রকাশক নয়। ইহার তাৎপর্য্য এই মাত্র যে বিদ্যা এমনই মহামূল্য যে, যজ্ঞাদি দ্বারাও লোকে তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে। "যে ইহা জানে, সে শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে দেখিবে"—অতএব যজ্ঞাদি করিলেও বিদ্যার্থীকে শম দমাদিযুক্ত হইতে

হইবে। শম দমাদিই বিদ্যাসাধন রূপে বিহিত হইয়াছে। যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহাই অনুষ্ঠেয়। এ স্থলেও কেহ আপত্তি করিতে পারে যে "শমাদিযুক্ত হইয়া দেখে"—এই বাক্যে বর্ত্তমানেরই প্রয়োগ বিধি নাই। এরূপ আপত্তি অসঙ্গত, কারণ "তস্মাৎ" এরূপ বলিয়া প্রশংসা করাতেই বিধির প্রতীতি হয়। অতএব বিদ্যালাভ বিষয়ে যজ্ঞাদির অনপেক্ষা হইলেও শমাদির অপেক্ষা আছেই। বস্তুতঃ বিদ্যালাভ যজ্ঞাদিরও অপেক্ষা করে,—"যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি"ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাই উপলব্ধি হয়। তবে বলা হইতেছে যে, এই শ্রুতি বচনে বিধি দৃষ্ট হয় না। তাহা সত্য। তথাপি সংযোগের অপূর্ব্বত্ব দৃষ্টে বিধি কল্পনা করিতে হয়, কারণ 'যজ্ঞ' পদের সহিত "বিবিদিষা" পদের সম্বন্ধ পূর্ব্বক কুত্রাপি উক্ত হয় নাই, যাহার অনুবাদ মাত্র এ স্থলে করা হইবে। ভগবৎগীতা প্রভৃতি স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, নিষ্কাম ভাবে যে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা মুমুক্ষুর পক্ষে জ্ঞান লাভের সহায় হয়। অতএব শমাদি এবং যজ্ঞাদি এবং মুমুক্ষুর স্বীয় আশ্রম-বিহিত অপর সকল কর্ম্মই বিদ্যার উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন। "তত্রাপ্যেবংবিৎ শান্তো দান্ত" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত শমাদি বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ-হেতু প্রত্যাসন্ন বা নিকটতম বিদ্যা সাধন, এবং যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার সংযোগ হেতু, সে সকল বাহ্য সাধন মনে করিতে হইবে। ৩-৪-২৭ ॥

গীতা এবং শঙ্করের গীতা-ভাষ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (২য় অধ্যায় হইতে ৫ম অধ্যায়) কর্ম্ম এবং জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা অতি সারগর্ভ। গীতার মত যে কর্ম্মই মানবের স্বভাব, কর্ম্মভিন্ন মানবের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব। "শরীর যাত্রাপিচ তে ন প্রসিধ্যেদ কর্ম্মণঃ।" যজ্ঞ বা বৈদিক কর্ম্ম বলিতে গীতার মতে কেবল অগ্নিহোত্রাদিকে লক্ষ্য করে না। স্বাধ্যায় এবং জ্ঞানচর্চ্চাও গীতার মতে যজ্ঞই। গীতারও মতে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ, এই দ্বিবিধ পথ "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়া নঘ। জ্ঞান যোগেন সাঙ্খ্যানং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং॥" কিন্তু পরিণামে গীতার মতে দুই পথই এক। * পরমেশ্বরের প্রসন্নতার জন্য নিষ্কামভাবে স্ব স্ব উপযুক্ততা অনুসারে যে যাহা করে, গীতার মতে তাহাই যজ্ঞ। জ্ঞান কর্ম্মের সেই চিরন্তন বিরোধের অতি সুন্দর সামঞ্জস্য গীতাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞানের অধিকারী জ্ঞান চর্চ্চা করিবে, কর্ম্মের অধিকারী সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। জ্ঞানী এবং কর্ম্মী উভয়েই "যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ।" উভয়েই তুল্যভাবে একই মোক্ষফলের অধিকারী। জৈমীনিই হউন আর বাদরায়ণই হউন, যাঁহারা বলেন, জ্ঞান এবং কর্ম্মের লক্ষ্য পৃথক, তাঁহাদের কথা বালকোচিত প্রলাপ মাত্র। গীতার মতে জ্ঞান এবং কর্ম্ম মানুষের ডান হাত আর বাঁ হাত, কাহারও বা তাহার বিপরীত।

শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসী। গীতার কর্ম্মবিষয়ক উপদেশ সকলের তিনি সন্ন্যাস প্রধান ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তাঁহার গীতা-ভাষ্যে জ্ঞান এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। গীতা-ভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায়:—"হে পার্থ, শোক মোহাদি-

* বিবিধ পথ জুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সা মর্ণবইব। মহিম্নস্তব॥
বিবিধ পথগামী নদী সকলের যেমন গম্য সমুদ্র, বিবিধ পথগামী মনুষ্য সকলেরও একমাত্র গম্য তুমি।

সংসার-দোষের নিবর্ত্তক সাংখ্য অর্থাৎ পরমার্থ বস্তু বিবেক-বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিলাম। এখন তৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগ বা নিঃসঙ্গভাবে ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান, এবং সমাধি লাভ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই যোগের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলে, তুমি কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য বন্ধ-রহিত হইবে।৩৯। অবিবেকীরা পুষ্পিতবৃক্ষের ন্যায় আপাতরম্য বাক্য সকল বলিয়া থাকে। তাঁহারা বহুফল-সাধনের প্রকাশক বেদবাক্যে অনুরক্ত, যদিও সে সকল অর্থবাদ-মাত্র। তাঁহারা বলেন যে কর্ম্ম ভিন্ন স্বর্গ, এবং পশ্বাদি ফলের সাধন আর কিছুই নাই। ক্রিয়া বিশেষবহুল শ্রুতি বাক্য দ্বারা তাহাদের বিবেক বুদ্ধি আচ্ছন্ন। ৪৪। কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, জ্ঞান নিষ্ঠাতে নয়; কিন্তু দেখিও কর্ম্মের ফলে যেন তোমার অধিকার না থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মফলের প্রতি যেন কখনও তোমার তৃষ্ণা না থাকে। যদি কর্ম্মফলে তৃষ্ণাপ্রযুক্ত তুমি কর্ম্ম কর, তবে তুমি সেই কর্ম্মফল জন্য পুনর্জন্মের কারণ হইবে। অকর্ম্মে বা কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যেন তোমার আসক্তি না থাকে। ৪৭। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে, অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই ভাবে ফল-কামনা-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে। ফলতৃষ্ণা-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, সত্ত্বশুদ্ধি হেতু জ্ঞান-প্রাপ্তি-লক্ষণ সিদ্ধি লাভ হয়। ৪৮। কর্ম্মের স্বভাব বন্ধন, কিন্তু সমত্ব বুদ্ধির প্রভাবে কর্ম্ম স্বীয় স্বভাব হইতে নিবৃত্ত হয়। অতএব যোগ অর্থাৎ সিদ্ধ্যাসিদ্ধিতে সমত্ববুদ্ধি, এবং ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হওয়াই যথার্থ কর্ম্মকুশলতা। ৫০। এই যে লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার, এ সকলই অবিদ্যার কার্য্য। এজন্য স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিবেক-জ্ঞান লাভ হইলে, সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হেতু লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহারও নিবৃত্তি হয়। বিদ্যা অবিদ্যার বিরোধী, এজন্যই বিদ্যালাভ হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। কর্ম্ম প্রবৃত্তি অবিদ্যাবস্থারই জন্য, বিদ্যাবস্থার জন্য নয়। বিদ্যার উদয় হইলে, সূর্য্যোদয়ে নৈশ অন্ধকারের ন্যায় অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। বিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে ক্রিয়া-কারক এবং ফল ভেদরূপা অবিদ্যা প্রমাণরূপে গৃহীত হওয়াতে, কর্ম্ম হেতুত্ব লাভ করে। সেই অবিদ্যা অপ্রমাণরূপে গৃহীত হইলে, আর তাহার কর্ম্ম-হেতুত্ব সম্ভব হয় না। 'বেদ প্রমাণ স্বরূপ, বেদই কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া আমাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে'—ইহা ভাবিয়াই কর্ত্তা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, এবং যে বুঝিয়াছে যে এই সমস্ত ভেদজাত অবিদ্যা মাত্র, সেই আত্মজ্ঞানীর কর্ম্ম সন্ন্যাসেই অধিকার, কর্ম্ম প্রবৃত্তিতে নয়। জ্ঞাননিষ্ঠাতেই তাঁহার অধিকার। তবে যদি বল যে বেদরূপ প্রবর্ত্তক প্রমাণের অভাব হেতু জ্ঞানেতেও তাহার প্রবৃত্তি অসম্ভব, তাহা নয়। জ্ঞাতার স্বীয় আত্মাই আত্মজ্ঞানের বিষয়। জ্ঞাতার নিজের আত্মা সম্বন্ধে নিজের প্রবৃত্তি, কেবল অপর প্রবর্ত্তক প্রমাণের অপেক্ষা করে না,—যে হেতু জ্ঞাতার স্বীয় আত্মাতে সকল প্রমাণের প্রমাণত্বের অবসান হয়। আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হইলে, আর প্রমাণ প্রমেয়ের ভেদ-ব্যবহার সম্ভব হয় না। শেষ প্রমাণ জ্ঞাতার আত্মারই প্রমাতৃত্ব সিদ্ধ করে, এবং তাহা সিদ্ধ হইলে আর প্রমাণের প্রমাণত্ব থাকে না,—যেমন স্বপ্নকালের প্রমাণ জাগরিত সময়ে থাকে না। সংসারেও দেখা যায় যে, কোন বস্তু হস্তগত হইলে,

আর সেই বস্তুর জন্য চেষ্টার কোন হেতু থাকে না। ৬৯।

গীতা-ভাষ্য তৃতীয় অধ্যায়:—"শাস্ত্রে ভগবান্ দুই প্রকার বুদ্ধির উপদেশ করিয়াছেন,—প্রবৃত্তি বিষয়ক বা কর্ম্মবুদ্ধি, এবং নিবৃত্তি বিষয়ক বা সাঙ্খ্য বা জ্ঞান বুদ্ধি। কর্ম্ম দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, জ্ঞান দ্বারা বিমুক্ত হয়। কর্ম্ম জ্ঞানী বা সন্ন্যাসীর জন্য নয়। অতএব জ্ঞান কর্ম্মের যুগপৎ সাধন অসঙ্গত। যদি জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয় একজনেরই যুগপত অনুষ্ঠেয়, এরূপ বলা ভগবানের অভিপ্রায় হইবে, তবে "জ্যায়সী চেৎ" ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রশ্ন অসঙ্গত। জ্ঞান এবং কর্ম্মের বিরোধ হেতু যদি এক ব্যক্তির পক্ষে উভয়ের যুগপৎ অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তবেই মাত্র অর্জ্জুনের প্রশ্ন সঙ্গত। জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের অনুষ্ঠেয়, এই উভয়ের সমুচ্চয় বা যুগপৎ সাধন অসম্ভব। কেবল মাত্র জ্ঞান হইতেই মোক্ষ। গীতার এই অর্থ নিশ্চিত। ১। ভগবানের উত্তরও ইহারই অনুরূপ:—এই সংসারে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অধিকারী বর্ণত্রয়ের পক্ষে অভ্যুদয় এবং নিশ্রেয়স প্রাপ্তির জন্য দুই প্রকার নিষ্ঠা বা স্থিতি উপদেশ করিয়া, আমি বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছি। সেই দ্বিবিধ নিষ্ঠা কি? প্রথম সাংখ্য অর্থাৎ আত্মা এবং অনাত্মা বিষয়ক বিবেক লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যান্তে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তৎপর বেদান্ত প্রকাশিত ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মেতে অবস্থিতি। ইহাই পরম হংস পরিব্রাজকদিগের নিষ্ঠা। দ্বিতীয় কর্ম্মযোগে যোগী বা কর্ম্মীদিগের নিষ্ঠা। একই পুরুষের পক্ষে একই পুরুষার্থ লাভের উদ্দেশে জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়ই যুগপৎ অনুষ্ঠেয়, যদি ভগবানের এরূপ অভিপ্রায় হইবে, তবে তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে কেন বলিবেন যে, জ্ঞান এবং কর্ম্ম ভিন্ন পুরুষ বিশেষের জন্য। অথবা যদি কল্পনা করা যায় যে, উক্ত বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন স্বয়ং জ্ঞান এবং কর্ম্ম, উভয়ের অনুষ্ঠান করিবেন, কিন্তু অপর লোকের জন্য জ্ঞান কর্ম্মের ভিন্ন পুরুষানুষ্ঠেয়ত্বই ভগবানের অভিপ্রায়, তবে ভগবান রাগদ্বেষবান এবং তাঁহার বাক্য প্রমাণের অযোগ্য কল্পিত হয়। তাহা অসঙ্গত। অতএব কোন যুক্তি দ্বারাই জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় বা একত্রীকরণ সঙ্গত হইতে পারে না। ৩। 'জ্ঞান এবং কর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ, এবং এক ব্যক্তি যুগপৎ উভয়ের অনুষ্ঠান করিতে পারে না' বলাতে মনে হইতে পারে যে জ্ঞান এবং কর্ম্মের প্রত্যেকেই একে অন্যের অপেক্ষা না করিয়া পুরুষার্থ লাভের কারণ হয়। সেইরূপ কল্পনার নিরাকরণ জন্য বলা হইতেছে যে, কর্ম্ম-নিষ্ঠা, জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভের উপায় রূপেই পুরুষার্থ লাভের কারণ, স্বতন্ত্র রূপে নয়। কিন্তু কর্ম্ম-নিষ্ঠার সাহায্যে জ্ঞান-নিষ্ঠা একবার আত্মলাভ করিলে স্বতন্ত্ররূপেই পুরুষার্থ লাভের কারণ হয়। অতএব জ্ঞান-নিষ্ঠা অন্য-নিরপেক্ষ। এই কথা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন:—ইহজন্মের বা জন্মান্তরের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয়ে সত্ত্বশুদ্ধি লাভ হয়। সত্ত্বশুদ্ধি লাভ হইলেই জ্ঞানোদয় হয়। এইরূপে কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভের কারণ হয়। কেবল মাত্র যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্মশূন্য জ্ঞান যোগ নিষ্ঠা লাভ হয় না। বরং কর্ম্মযোগানুষ্ঠানই নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞানযোগ লাভের উপায়। উপায় ভিন্ন উপেয়ের উৎপত্তি হয় না। জ্ঞান-

রহিত সন্ন্যাস্ বা কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা জ্ঞান-যোগ-নিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয় না। ৪। কর্ম্মের অধিকারী অজ্ঞানী ব্যক্তি মনদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সংযত রাখিয়া, বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবে। ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত হইলেই তাহার পক্ষে বিশেষ। ৭। অতএব শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম দ্বারা যে ফল লাভের অধিকারী, সে তাহাই করিবে। কর্ম্ম না করা অপেক্ষা, কর্ম্ম করাই অধিকতর ফলদায়ক। কর্ম্ম না করিলে দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ৮। যদি মনে কর, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, অতএব অকর্ত্তব্য, তাহাও তোমার ভ্রম। "যজ্ঞই বিষ্ণু" এইশ্রুতি বচন দ্বারা দেখা যায়, যজ্ঞই ঈশ্বর। যজ্ঞ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা হয়, তদ্দ্বারাই লোক বদ্ধ হয়, কিন্তু যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা কেহ বদ্ধ হয় না। অতএব ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে, যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ৯। যজ্ঞসহভাবী প্রজা অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সৃষ্টি করিয়াই পূর্ব্বে প্রজাপতি বলিয়াছিলেনঃ—তোমরা যজ্ঞদ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর, যজ্ঞ তোমাদিগের জন্য ইষ্ট ফল সকল দোহন করিবে। ১০। যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্বর্দ্ধনা কর। দেবগণও বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা তোমাদিগকে প্রীতি করুন। তোমরা এইরূপে পরস্পরের সম্বর্দ্ধনা করিলে, ক্রমে তোমাদিগের মোক্ষ লক্ষণ জ্ঞান প্রাপ্তি, অথা স্বর্গ লাভ, অথবা পরম শ্রেয়-লাভ হইবে। ১১। যজ্ঞ দ্বারা পূজিত হইলে, দেবগণ তোমাদিগকে স্ত্রী-পশু, পুত্রাদি ইষ্ট-ভোগ্য বস্তু দান করিবেন। দেবগণের প্রদত্ত স্ত্রী পশু পুত্রাদি, দেবগণের প্রতি সমর্পণ না করিয়া, অর্থাৎ দেবগণের নিকটে অঋণী না হইয়া যে সম্ভোগ করে, সে দেবাদি স্বাপহারী তস্কর। ১২। দেবযজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া অমৃত তুল্য সেই যজ্ঞের অবশিষ্ট মাত্র যে ভোগ করে, সে চুল্ল্যাদি পঞ্চশূণা বা বধস্থান-কৃত অথবা প্রমাদ বা হিংসা-জনিত সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়। আর আত্মম্ভরি হইয়া যাহারা তাহা ভোগ করে, অথবা যাহারা নিজের ভোগের জন্য পাক করে, সেই সকল পাপাত্মা পাপই ভোগ করে। ১৩। অধিকারী ব্যক্তিরা অবশ্য কর্ম্ম করিবে, কারণ কর্ম্ম দ্বারাই এই জগচ্চক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কিরূপে শোণিতাদি রূপে পরিণত ভুক্ত অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি বৃষ্টি হইতে সেই অন্নের এবং যজ্ঞ হইতে সেই বৃষ্টির উৎপত্তি হয়। যজ্ঞের পূর্ব্বে আর কিছু নাই। সেই যজ্ঞ ঋত্বিক যজমানের ব্যাপার-তত কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন। ১৪। সেই কর্ম্ম কোথা হইতে উৎপন্ন? কর্ম্ম বেদ হইতে বেদ অক্ষর পরমাত্মা হইতে। বিশ্বপুরুষের নিশ্বাসের ন্যায় বেদ উৎপন্ন, অতএব সর্ব্বগত এবং সর্ব্বার্থ-প্রকাশক। বেদের প্রধান কার্য্য যজ্ঞ বিধি বিস্তার। অতএব যজ্ঞের মধ্যে বেদ নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ১৫। আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা-বিষয়ে যোগ্যতা লাভের পূর্ব্বে, এবং তাহা লাভ করিবার উদ্দেশে অনাত্মজ্ঞ অধিকারীর পক্ষে কর্ম্মযোগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ১৬। যে সাঙ্খ্য বা জ্ঞান যোগী আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠ, আত্মাতেই রমণ করে, এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, সে-ই সন্ন্যাসী। অপর সকল লোক বাহ্যার্থলাভে সন্তুষ্ট, কিন্তু সে বাহ্যার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এরূপ আত্মজ্ঞানীর আর অনুকরণীয় নাই। ১৭। জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি পূর্ব্বতন বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়গণ মোক্ষ সিদ্ধির উদ্দেশে

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদি তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত-সম্যক্ দর্শন কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা লোক সংগ্রহার্থ প্রারব্ধ কর্ম্ম বশাৎ কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়াই সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আর যদি জনকাদিকে অপ্রাপ্ত-সম্যক্-দর্শন কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা সত্বশুদ্ধির উপায় রূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যদি বল যে জনকাদিও অজ্ঞানাবস্থায়ই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহারা সম্যক্ দর্শনবান্ এবং কৃতার্থ, তাহাদের পক্ষে কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য নয়, অথাপি (হে অর্জ্জুন) তুমি প্রারব্ধ কর্ম্মের অধীন, লোকের উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণ উদ্দেশ্যেও তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।" (এ স্থলে অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ম্ম বলিতে যুদ্ধই বুঝাইতেছে)।

গীতা-ভাষ্য, চতুর্থ অধ্যায়:—গুণ বলিতে সত্ব, রজ, এবং তমঃ বুঝায়। তন্মধ্যে সত্ব প্রধান ব্রাহ্মণের কর্ম্ম শম, দম, এবং তপস্যা। সত্ব অপ্রধান, রজঃ-প্রধান ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম শৌর্য্য, তেজ প্রভৃতি। তমঃ অপ্রধান, রজঃ প্রধান বৈশ্যের কর্ম্ম কৃষ্যাদি। রজঃ অপ্রধান, তমঃ-প্রধান শূদ্রের কর্ম্ম শুশ্রূষা। এইরূপে গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ দৃষ্টে আমি বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছি। নরলোকেই এই চাতুর্ব্বর্ণ্য, অন্য লোক নাই। (যদি বল) চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মের কর্ত্তারূপে তুমি তাহার ফলের সহিতও সম্বন্ধ, অতএব তুমি নিত্যমুক্ত নিত্যেশ্বর নও। (তাহা নয়, কারণ) যদিও মায়া-শক্তির সদ্ব্যবহার হেতু আমি সেই কর্ম্মের কর্ত্তা, তথাপি পরমার্থতঃ আমাকে অকর্ত্তা, অতএব অব্যয় এবং অসংসারী বলিয়া জানিবে। ১৩। কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া মেধাবী পণ্ডিতগণও মোহে পড়িয়াছেন। তুমি মনে করিও না যে, কর্ম্ম বলিতে লোক-প্রসিদ্ধ দেহাদিচেষ্টা, এবং অকর্ম্ম বলিতে তাহার অভাব বা তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান বুঝায়। ১৬। কর্ম্ম যাহা শাস্ত্রে বিহিত, বিকর্ম্ম যাহা শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ, এবং অকর্ম্ম বা তুষ্ণীম্ভাব, এ সকলের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক,—যেহেতু কর্ম্মাদির প্রকৃত তত্ব অতি দুর্জ্জ্ঞেয়। ১৭। কর্ম্মে বা ক্রিয়মান ব্যাপার মাত্রেই যে অকর্ম্ম বা কর্ম্মাভাব দর্শন করে, এবং অকর্ম্মে বা কর্ম্মাভাবে যে কর্ম্ম দর্শন করে—(প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েই কর্ত্তার অধীন অতএব কর্ম্ম) এস্থলে অকর্ম্ম বলিতে অবিদ্যাভূমিকেই লক্ষ্য করে,—সেই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগী এবং সর্ব্ব কর্ম্মকারী। কর্ম্মাকর্ম্মের মধ্যে ইতরেতর দর্শন অর্থাৎ একের মধ্যে যে অন্য দর্শন করে, সে প্রশংসিত হইতেছে। কর্ম্মেতে অকর্ম্ম, অকর্ম্মেতে কর্ম্ম, এরূপ বিরুদ্ধ কথা কেন? কর্ম্ম কর্ম্ম নয়, অকর্ম্মও অকর্ম্ম নয়, দ্রষ্টা এরূপ বিরুদ্ধ দেখিবে কিরূপে? মূঢ় দৃষ্টির নিকটেই অকর্ম্ম সৎকর্ম্মরূপে এবং কর্ম্ম অকর্ম্ম রূপে প্রতিভাত হয়। এরূপ বিপরীত জ্ঞান দ্বারা অশুভ হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে যখন জীবের এরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় রহিয়াছে, তাহার নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ বলিতেছেন "কর্ম্মণ্য কর্ম্ম" ইত্যাদি। ইহার উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে অগ্নিকুণ্ডে বদরী নিক্ষেপের ন্যায় কর্ম্মাধিকারীকে অকর্ম্মে, বা অকর্ম্মাধিকারীকে কর্ম্মে নিক্ষেপ করা। মৃগ তৃষ্ণিকাতে উদক, বা শুক্তিকাতে রজত বুদ্ধির ন্যায় কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের বিপরীত বুদ্ধি রহিয়াছে। আবার কর্ম্ম সকলের পক্ষেই কর্ম্ম, ইহারও কোথাও ব্যভিচার নাই।

নৌকা যখন চলে, তখন নৌস্থিত ব্যক্তি তটস্থ বৃক্ষাদি স্থির পদার্থের প্রতিকূল গতি দর্শন করে, কিন্তু তাহার চক্ষু হইতে দূরস্থিত বস্তু সকলকে চলিতে দেখিলেও সে মনে করে যেন সে সকল চলে না। অকর্ম্মেতে কর্ম্ম দর্শন, এবং কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দর্শনও সেইরূপ। লোক সকল অত্যন্ত বিপরীত দর্শন দ্বারা মোমুহ্যমান, পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও তত্ত্ব কথা ভুলিয়া যায়, এবং মিথ্যা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। আত্মার কর্ম্মাভাব শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় প্রসিদ্ধ। কর্ম্ম দেহাদ্যাশ্রিত, কিন্তু আত্মাতে তাহার অধ্যারোপ হেতু 'আমি কর্ত্তা' 'আমার ইহা কর্ম্ম' এই কর্ম্মের ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে' 'অথবা আমি তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিব, তবেই আমি আয়াসশূন্য, কর্ম্ম শূন্য এবং সুখী হইব' ইত্যাদি অনুভব। কার্য্য করণ বা ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধী ব্যাপারের উপরমও কর্ম্মই, কারণ তাহাও করা হয়, আত্মাতে সেই উপরম-জনিত সুখীত্বের অধ্যারোপ করিয়াই লোকে মনে করে, 'আমি কিছুই করি না, তুষ্ণীম্ভাবে সুখে আছি।' কর্ম্মত্ব হেতুই কর্ম্ম সর্ব্বত্রই দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্য করণাশ্রিত। সকল লোকেই কর্ম্ম রহিত অবিক্রিয় আত্মাতে সেই কর্ম্ম আরোপ (অধ্যাস) করে। কর্ম্মের আত্ম-সমবেতত্ব সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতও, নদী তীরস্থিত বৃক্ষের প্রতিলোম গতির অনুভবের ন্যায়, মনে করে 'আমি করি।' যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মের মধ্যে যথাভূত তীরস্থ বৃক্ষের গত্যাভাবের ন্যায়, আত্মার অকর্ম্মত্ব দর্শন করেন, এবং যে ব্যক্তি দেহাদি কার্য্যকরণের ব্যাপারোপরম স্বরূপ অকর্ম্মে অহঙ্কার এবং অভিসন্ধি দর্শন করিয়াও কর্ম্ম মনে করেন, এইরূপে যে ব্যক্তি কর্ম্মাকর্ম্ম বিভাগজ্ঞ, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, সেই যোগী, সেই সর্ব্ব কর্ম্মকারী। সে অশুভ হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়। ১৮। শরীরস্থিতির কারণভূত অন্নাদির লাভালাভে যে যতির দৃষ্টি সমান, বা হর্ষ বিষাদ বর্জ্জিত, যিনি কর্ম্মাদিতে অকর্ম্মদর্শী, যিনি যথাভূতাত্মদর্শননিষ্ঠ, শরীর স্থিতির জন্য তিনি শরীরাদির দ্বারা ভিক্ষাটনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেও 'আমি কিছুই করি না' সর্ব্বদা এইরূপ বিচার করিয়া সেই সকল কার্য্যে আত্মার কর্ত্তৃত্বাভাব দর্শন করেন। অতএব সেই যতি ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না। কিন্তু সাধারণ লৌকিক ব্যবহার দৃষ্টে বলা যায় যে, লোকে ভিক্ষাটনাদি কর্ম্মে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া কর্ত্তা হয়। জ্ঞানী যতি শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ স্বানুভব দ্বারা ভিক্ষাটনাদি কার্য্য অকর্ত্তৃত্ব অনুসন্ধান করেন, অতএব তিনি অকর্ত্তা। শরীর স্থিতি নিমিত্ত ভিক্ষাটনাদি কার্য্যে অন্যেরা স্বীয় কর্ত্তৃত্বের অধ্যারোপ করেন, কিন্তু (কর্ত্তৃত্ব অধ্যারোপ না করাতে) যদি কার্য্য করিয়াও তদ্দ্বারা বদ্ধ হয়েন না।" ২২। যজ্ঞাদি সম্বন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন :—যজ্ঞ নামক কর্ম্ম কারক-বুদ্ধি রহিত দেখা যায় না। অগ্নিহোত্রাদি নামে অভিহিত দেবতা-বিশেষে আহুতি সম্প্রদানাদি কর্ম্মকারক বুদ্ধিযুক্ত, কর্ত্তৃত্বাভিমান যুক্ত, এবং ফলাভি সন্ধি-যুক্ত দেখা যায়, তাহা ক্রিয়াকারক, ফলভেদ বুদ্ধি-রহিত বা কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হয় না। কিন্তু ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা যজ্ঞাদি কার্ম্মের অর্পণাদি ক্রিয়াতে কারক ক্রিয়া ফলভেদ বুদ্ধি উপমর্দ্দিত বা নষ্ট হয়। অতএব কর্ম্ম হইলেও তাহা অকর্ম্ম। ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা অর্পণাদিতে কারক-ক্রিয়া ফল ভেদ বুদ্ধি উপমর্দ্দিত হইলে, জ্ঞানীর বাহ্য চেষ্টা

মাত্রাত্মক কর্ম্মও অকর্ম্মে পরিণত হয়। এজন্য বলা হইতেছে "সমগ্রং প্রবিলীয়তে সমস্ত লয় হয়। ক্রিয়মান কর্ম্ম স্বকার্য্য আরম্ভ না করিয়া লয় প্রাপ্ত হয় কি প্রকারে? অগ্নিতে হবি অর্পণ করিয়াও যে প্রকারে ব্রহ্মবিৎ অগ্নিতে ব্রহ্মই দেখেন। অর্থাৎ শুক্তিকাতে রজতের অভাবের ন্যায় —যথা ইহা শুক্তিকাই, রজত কিম্বা অন্য কিছু নয়—সেই-রূপে আত্মা ভিন্ন অগ্ন্যাদি বস্ত্বন্তরের অভাব দেখেন। যাহাকে লোকে অর্পণ জ্ঞান করে, ব্রহ্মবিদের নিকট তাহাও ব্রহ্মই। যাহাকে লোকে হবিঃ জ্ঞান করে, তাহাও ব্রহ্মই। যে অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাও ব্রহ্মই। এইরূপে হবন কর্ত্তা, হবন ক্রিয়া, এবং হবন ক্রিয়ার ফল ব্রহ্মবিদের নিকট সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্মস্বরূপ কর্ম্মেতে যাহার চিত্ত সমাহিত, তাহার গন্তব্যও ব্রহ্মই। লোক সংগ্রহের ইচ্ছায় এইরূপে যে কর্ম্ম করা হয়, পরমার্থতঃ তাহা অকর্ম্ম। যে হেতু ব্রহ্মবুদ্ধিদ্বারা তাহার কর্ম্মত্ব নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি জানে যে ব্রহ্মই এই সমস্ত, সেই জ্ঞানীর পক্ষে কারক বুদ্ধি অভাব হেতু সর্ব্ব কর্ম্মাভাব।" শঙ্কর আরও বলেন যে, অর্পণাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি শাস্ত্র প্রমাণ সিদ্ধ স্বানুভূতি। "প্রতিমাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতি বুদ্ধি অথবা নামাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধির ন্যায়, তাহা "আরোপ" বা কল্পনা মাত্র "এরূপ ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত।" কারণ অধ্যায়েরই উদ্দেশ্য সম্যক্ দর্শনের স্তুতি।" ২৪।

গীতাতে যজ্ঞ শব্দের যে ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, তাহা অতি উদার। কর্ম্মই হউক আর জ্ঞানালোকই হউক, যাহা কিছু ঈশ্বরোদ্দেশে করা হয়, গীতার মতে তাহাই যজ্ঞ। গীতার মতে অধুনাতন বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই জ্ঞান যজ্ঞের যাজ্ঞিক। গীতাতে নানাবিধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে (২৫ হইতে ৩৩ শ্লোক), তাহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতে-ছেনঃ—সম্যক্ দর্শনের যজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহারই স্তুতির উদ্দেশে গীতা অন্য-বিধ যজ্ঞেরও উল্লেখ করিতেছেনঃ—কর্ম্ম-যোগীগণ দেবতা বিশেষকে আহুতি দান করিয়া দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ব্রহ্ম-বিদ্‌গণ 'যজ্ঞ' শব্দ বাচ্য আহুতি স্থানীয় জীবকে অগ্নি স্থানীয় 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', 'যৎসাক্ষাদ পরো-ক্ষাৎ ব্রহ্ম', 'যে আত্মা সর্ব্বান্তর', ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ক্ষুধা প্রভৃতি সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম বর্জ্জিত, 'নেতি নেতীতি' নিরস্তা শেষ-বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্ম আহুতি দান করেন। (হোমাদি কর-ণত্ববিবক্ষাহেতু ব্রহ্মাগ্নি বলা হইতেছে)। পর-মার্থতঃ ব্রহ্ম স্বরূপ হইলেও জীব বুদ্ধ্যা দ্যুপাধি-সংযুক্ত। অধ্যস্ত উপাধি-ধর্ম্ম-কলা সকল আহুতি দানরূপ আত্ম যজ্ঞ দ্বারা, (ব্রহ্মবিদ্‌-গণ) হবন করেন। সোপাধিক জীবাত্মাকে নিরুপাধিক পরমব্রহ্মরূপে দর্শন করাই তাহাকে হোম করা। ব্রহ্মাত্মৈকত্ব দর্শন-নিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ এইরূপ হোম করিয়া থাকেন। ২৫। অন্য যোগীগণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করেন। কেহ বা শব্দাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। শ্রোত্রাদি দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞানের অনুকূল বিষয়-মাত্র গ্রহণকেই এস্থলে হোম কল্পনা করা হইয়াছে। ২৬। আর ঘৃতাদি স্থানীয় বিবেক-বিজ্ঞান দ্বারা আত্ম সংযমরূপ যোগাগ্নি উদ্দীপ্ত হইলে পর কেহ কেহ তাহাতে সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, এবং আকুঞ্চন প্রসারণাদি আধ্যাত্মিক প্রাণবায়ুর কর্ম্ম আহুতি প্রদান

করেন,—অর্থাৎ তাহাতে বিলীন করেন। ২৭। কেহবা ফললাভের জন্ত তীর্থাদি স্থান দ্রব্যাদি অর্পণ করিয়া দ্রব্য যজ্ঞ করেন, কেহ বা তপস্যা করিয়া তপোযজ্ঞ করেন, কেহ বা প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি লক্ষণ যোগ অভ্যাস দ্বারা যোগ যজ্ঞ করেন, কেহ বা যথাবিধি ঋগাদি অভ্যাস দ্বারা স্বাধ্যায় যজ্ঞ করেন, আর কেহ বা শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান-যজ্ঞ করেন। ২৮। কেহ বা আপন বৃত্তিতে (inhaled air) প্রাণ বৃত্তিকে (exhaled air) আহুতি প্রদান করিয়া পূরকাখ্য প্রাণায়াম, কেহ প্রাণ বৃত্তিতে (exhaled air) আপন বৃত্তিকে (inhaled air) আহুতি প্রদান করিয়া রেচকাখ্য প্রাণায়াম, এবং কেহ বা নাসিক পথে প্রাণ এবং অপাণ বায়ুর গতিরোধ করিয়া (Suppressed breathing) কুম্ভকাখ্য প্রাণায়াম করেন। (পাঠক লক্ষ্য করিবেন, যখনই কোন বিষয়ে আমরা বিশেষ মনোযোগ করি, তখনই স্বভাবতঃ আমাদের শ্বাস-ক্রিয়ার বেগ রুদ্ধ হয়,—ইহাকে একপ্রকার কুম্ভক বলা যায়। অপর কেহ পরিমিত আহারাদি দ্বারা প্রাণাদি বায়ু সকলকে প্রাণাদিতেই আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ যিনি যে বায়ুর জয় করিতে অভ্যাস করেন, তিনি অপর সকল বায়ু তাহাতে আহুতি প্রদান করেন,—অর্থাৎ যেন তাহারই মধ্যে অপর সকল বায়ু প্রবিষ্ট করাইয়া রাখেন। ২৯। ইহারা সকলেই যজ্ঞবিৎ। যজ্ঞদ্বারা ইহাদের সকলেরই পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। ৩০। বেদ হইতেই উক্ত বহুবিধ যজ্ঞ বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, যথা—"বাক্যে প্রাণকে আহুতি দিতেছি" ইত্যাদি। কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক কর্ম্ম হইতে সে সমস্ত উদ্ভূত জানিবে কিন্তু আত্মা স্বয়ং ব্যাপার-রহিত। 'আমি নির্ব্যাপার বা উদাসীন, এ সকল ব্যাপার আমার নয়'—যে ব্যক্তি এরূপ জানে, তাহার এই সম্যক্ জ্ঞানের প্রভাবে সে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩২। দ্রব্য সাধন দ্বারা সাধ্য যজ্ঞ হইতে জ্ঞানদ্বারা সাধ্য-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ দ্রব্য-যজ্ঞ ফলের আরম্ভক, কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞ ফলের আরম্ভক নয়। সমস্ত কর্ম্ম পরিণামে বন্ধ রহিত হইয়া 'সর্ব্বতঃ সম্প্লুতোদক' —স্থানীয় মোক্ষের সাধনভূত জ্ঞানেতেই পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ পরিণামদৃষ্টে কর্ম্মও জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। ৩৩।

গীতাভাষ্য, পঞ্চমাধ্যায়ঃ—গীতা জ্ঞান এবং কর্ম্মযোগের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহারই উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"ভগবান্ একবার সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের উপদেশ করিতেছেন, আবার বলিতেছেন কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মের সন্ন্যাস এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই উভয় স্থিতিগতির ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ, যুগপৎ কেহই এই উভয়ের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। কালান্তরে অনুষ্ঠানেরও কোন বিধান নাই। অতএব এই দুয়ের একটীরই মাত্র অনুষ্ঠান সম্ভব দেখা যায়। এই দুয়ের মধ্যে যেটী প্রশস্ততর, তাহারই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এইরূপে জ্ঞান এবং কর্ম্মের সহভাবিত্ব অসম্ভব মনে করিয়া, প্রশস্ততর হইবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেনঃ—"য চ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং।" এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেনঃ—জ্ঞানযোগে সাঙ্খ্য বা আত্মবিদ্‌দিগের নিষ্ঠা এবং কর্ম্মযোগে কর্ম্মীদিগের নিষ্ঠা। জ্ঞান-যুক্ত ব্যক্তির পক্ষেই মাত্র কর্ম্মযোগের সিদ্ধিসাধনত্ব, ভগবানের এই অভিপ্রায় মনে করিয়া, জ্ঞান-রহিতের

পক্ষে সন্ন্যাস শ্রেয়: কি কর্ম্মযোগ শ্রেয়:, তাহা জানিবার জন্য অর্জ্জুনের প্রশ্ন।১। জ্ঞান-রহিত বা কেবল কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যেহেতু সন্ন্যাস এবং কর্ম্ম যোগ পরস্পর বিরুদ্ধ এবং ভিন্ন পুরুষের অনুষ্ঠেয়, তখন এই দুয়ের মধ্যে ফলেরও বিরোধ থাকাই সম্ভব, উভয়ের নিঃশ্রেয়স-করত্ব (মুক্তিপ্রদত্ব) সম্ভব নয়। পাছে এরূপ মনে করা হয়, সেজন্য বলা যাইতেছে:—সাঙ্খ্য বা সন্ন্যাস-যোগ এবং যোগ বা কর্ম্মযোগ পরস্পর বিরুদ্ধ বা ভিন্ন ফলপ্রদ, এরূপ কথা বালকোচিত প্রলাপ মাত্র। পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায় এই যে সন্ন্যাস এবং কর্ম্ম, এই উভয়ের এক অবিরুদ্ধ ফল। কিরূপ? সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগের মধ্যে যে ব্যক্তি একটীরও সম্যক্ অনুষ্ঠান করে, সে উভয়েরই ফল, একই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভ করে।৪। একের সম্যগনুষ্ঠানে উভয়ের ফল কিরূপে লাভ করে, বলা যাইতেছে। সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী মোক্ষপদ লাভ করে। ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, নিজের সম্বন্ধে কোন ফলাশা মনে স্থান না দিয়া, জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় জানিয়া যে কর্ম্মযোগী কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেও পরমার্থ জ্ঞানরূপ সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া সেই মোক্ষপদ লাভ করে।৫। তবে কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ বিশেষ এরূপ বলা হইল কেন? একদিকে কেবল বা জ্ঞান-রহিত কর্ম্ম সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ এবং অপরদিকে কর্ম্মযোগ—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়, এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে যে, কেবল বা জ্ঞান-রহিত সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগ শ্রেয়:। কিন্তু সাঙ্খ্য শব্দদ্বারা জ্ঞান যুক্ত সন্ন্যাসই আমার লক্ষ্য। তাহাই পরমার্থ যোগ। তাহাই বৈদিক কর্ম্ম-যোগেরও লক্ষ্য। এজন্যই বৈদিক কর্ম্ম-যোগকেও যোগ বা সন্ন্যাস নামে অভিহিত করা যায়। ঈশ্বরার্পিত, ফল-নিরপেক্ষ বৈদিক কর্ম্মযোগ ভিন্ন পারমার্থিক সন্ন্যাস লাভ করা কঠিন। ঈশ্বরার্পিত, ফল-নিরপেক্ষ, বৈদিক কর্ম্মযোগ যুক্ত, ঈশ্বর মননশীল মুনি সত্বরই পরমাত্ম-জ্ঞান নিষ্ঠা লক্ষণ পরমার্থ-সন্ন্যাস লাভ করে। ৬। যে ব্যক্তি অতত্ত্ববিৎ অথচ কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত, সে ব্যক্তি যদি ভৃত্য যেরূপ তাহার স্বামীর জন্য কার্য্য করে, সেইরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া, কেবল মাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে, মোক্ষ ফলেও আসক্তি না রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তবে সে জলগত পদ্মপত্রের ন্যায় পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না। ৯। কর্ম্মের এক মাত্র উদ্দেশ্য সত্ত্বশুদ্ধি। কেবল মাত্র কায়, মন, বুদ্ধি অথবা ইঁন্দ্রিয় দ্বারা, ঈশ্বরেরই উদ্দেশে কর্ম্ম করিতেছি—ফলের জন্য নয়,এই ভাবে সর্ব্ব ব্যাপারে মমত্ব বর্জ্জন করিয়া কর্ম্মীগণ নিঃসঙ্গভাবে, আত্মশুদ্ধি বা সত্ত্বশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।১০। সেরূপ কর্ম্মী প্রথমে সত্ত্বশুদ্ধি, তারপর জ্ঞান-প্রাপ্তি, তারপর সর্ব্বকর্ম্মে-সন্ন্যাস, তারপর জ্ঞান-নিষ্ঠা—এই ক্রম অনুসারে মোক্ষাখ্য নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করে॥” ১১।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নামীয় বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছেন:—“কর্ম্মের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, বস্তূপলব্ধি নয়। বস্তু-জ্ঞান বিচার দ্বারাই সিদ্ধ হয়, কোটী কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হয় না।১১। বন্ধুজন, সুজন এবং গুরুজনের কথানুসারে, নিজের যুক্তি আশ্রয় করিয়া চলিলেই ফলসিদ্ধি সম্ভব, ইহাই সত্য জানিবে।” ৮৩। “কর্ম্ম বৃদ্ধিতে বীজের বৃদ্ধি এবং কর্ম্মের নাশে বীজের নাশ দেখা যায়, অতএব কর্ম্ম নিরুদ্ধ করিবে।”১০১।

"বাসনার বৃদ্ধিতে কর্ম্ম, এবং কর্ম্মের বৃদ্ধিতে বাসনা সর্ব্বথা বর্দ্ধিত হয়, এবং জীবের সংসার নিবৃত্তি অসম্ভব হয়।" ১০২। তবে বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থ-ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যেরই রচিত, কি অন্য কোন শঙ্করাচার্য্যের রচিত, স্থির করা কঠিন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের রচিত গ্রন্থের মধ্যে মাধবাচার্য্য ইহার নাম উল্লেখ করেন নাই। তবে গ্রন্থারম্ভে "গোবিন্দং পরমানন্দং সৎগুরুং প্রণতোঽস্ম্যহং"—শঙ্কর-গুরু গোবিন্দনাথের উল্লেখ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, 'বিবেকচূড়ামণি' ভাষ্যকারেরই রচিত।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

কি তাজ্জব !

(১)

কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !
তিনদিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব !
কেমন উদ্যম কি উৎসাহ, কেমন বীর্য্য বিশ্বদাহ,
কি প্রচণ্ড প্রবল প্রতাপ কেমন ভীষণ—কি ভৈরব !
কি প্রতিজ্ঞা—বজ্রপণ, দারুণ সাহস দারুণ মন,
দারুণ দৃঢ় অধ্যবসায় শত বজ্র পরাভব !
নাইক চিন্তা মরণ বাঁচন, কেবল কুদন কেবল নাচন,
নাই ঔদাস্য শোক নৈরাশ্য অট্টহাস্য—কি তাণ্ডব !
সবাই ক্ষিপ্ত খড়্গহস্ত, রক্তে রাঙ্গা দেশ সমস্ত,
খণ্ড খণ্ড রাজদণ্ড চরণতলে রাজশব !
তিনদিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

(২)

কেমন বাঁধন প্রাণে প্রাণে, অস্থি, মাংসে, রক্তে জানে,
পাহাড় উড়ায় টানে টানে অসীম শক্তি—অসম্ভব,
যুবক বৃদ্ধ ছুঁড়ী ছোঁড়া, সমান মত্ত কাণা খোঁড়া,
কি জিঘাংসা কি জিগীষা কি জীবন্ত জয়োৎসব !
কি দুর্জ্জয় সে বজ্রনাধি, চূর্ণ চূর্ণ মাঞ্চু জাতি,
কেমন দস্ত ভূমিকম্প কেমন গর্ব্ব কি গৌরব !
কাঁপছে ধরা থরথরি, কেবা বাঁচি কেবা মরি
ইউরেলে লাগ্‌ছে ধাক্কা ইউরোপটা কাঁপছে সব !
ঈশানকোণে লাগ্‌ছে ঝট্‌কা, নিশান কাঁপছে কাম-স্কট্‌কা,
আমেরিকার বিষম খট্‌কা ডরে ভয়ে জরদগব !
যুগল সূর্য্য উঠছে পূবে, পশ্চিমেতে সন্ধ্যা ডুবে,
'ক্যা হুয়া ? ক্যা হুয়া ?' তাই শ্বেত শিয়ালের কলরব !
তিনদিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

(৩)

দাসত্বের কলঙ্ক-টীকা, নাই সে শিরে দীর্ঘ শিখা,
কীর্ত্তি-কিরীট দীপ্ত ললাট কি সৌভাগ্য কি গৌরব !
মুক্তকণ্ঠে—স্বাধীনবাণী নাই সে আজ আর কাণাকাণি,
ভৃত্যযোগ্য নিত্যভোগ্য দুবারোগ্য সে রৌরব !
হলস্কন্ধে হাস্‌ছে কৃষাণ, হাতে উড়্‌ছে বিজয় নিশান,
পুলকিত শস্যক্ষেত্রে—স্বর্ণশীর্ষ নূতন যব,
স্বাধীন তরু স্বাধীন লতা, পুষ্পে হাসে স্বাধীনতা,
বহে মন্দ মধুগন্ধ স্বাধীনতার সুসৌরভ !
ইয়াংসিকিয়াং দিচ্ছে হুলু, শত জিহ্বায় কুলুকুলু,
ঘোর রোলে সিন্ধু তোলে বজ্র শঙ্খে বিজয় স্তব,
আজ্‌কে 'মেলিং' সবার সেরা, চন্দ্র সূর্য্যে নূপুর বেড়া,
'ধবল' নহে সবল, সে যে নগাধিরাজ অভিনব !
তিনদিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

(৪)

কতই মাটী কতই পাথর, বুকে চাঁপা ছিল কাতর,
যুগ যুগান্তের অধীনতা দাসত্বের ঘোর উপদ্রব,
আজ্‌কে তাহা ভেদী মহী, ছুট্‌ছে উর্দ্ধমুখে বহ্নি,

কি কালান্ত অতলস্ত জ্বলদগ্নি মহার্ণব !
বিশ্ব আজ বিস্মিত নেত্রে, দেখ্‌ছে ঐ অগ্নিক্ষেত্রে,
কোটী শীর্ষ কোটী বাহু জনশক্তির সমুদ্ভব,
রাজার শির আজ রাজমুকুটে, চাষার পায়ে ধূলায় লুটে,
মর্ত্ত্যে থাকুক স্বর্গ উঠে ইন্দ্রালয়ে হাহারব !
পদাঘাতে ঘৃণার সহ, রাজার দান—রাজ অনুগ্রহ
ফেলিয়ে দূরে দীন ভীক্ষু—জগতে যা অসম্ভব,
আত্মবলে আত্মস্বত্ব, করেছে সে আজ আয়ত্ত,
কেমন তাহার পুরুষত্ব কি মহত্ব কি গৌরব !
তিনদিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব !
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

(৫)

ক্রুর যারা ধূর্ত্ত যারা, পীতাতঙ্কে আত্মহারা,
চম্‌কে উঠ্‌ছে আজ্‌কে তারা কাপুরুষরা যত সব,
আত্মদ্রোহে দীপ্ত চীন, এইত সুযোগ, এই শুভদিন,
দল বেঁধেছে শক্তি নবীন কর্ত্তে তাহার পরাভব !
নতুবা সে দুদিন পরে, মুটিত্‌ করে টুটিত্‌ ধরে,
পার করিতে কাস্পিয়ানসি বেরিংষ্ট্রেইট বাবেলমাণ্ডব !
তাই, কেউ বা বসে কাম্বোডিয়া, পাদ্রীর টুপি মাথায় দিয়া,
কেউবা আছেন সেলিবিসে বোর্ণিও সুমাত্রা যব,
কেউবা আছেন ফিলিপাইনে, আপ্‌খোড়াকী বিনা মাইনে,
মাথা পাই ত ধ্বজা পাইনে রাহুর মত উপপ্লব !
চড় খেয়ে জাপানের কাছে, মঙ্গোলিয়ার পাছে পাছে,
কেউ বা আবার ভালুক নাচে—কি আত্মীয় ! কি বান্ধব !
ভেবেছিলেন আফ্রিকাটা, যেম্নি কর্ল্লে ছিঁড়াকাটা,
তেম্নিতর এসিয়াটা বেঁটে নিবে দৈত্য দানব,
খেয়ে খেয়ে বাড়্‌ছে জিভা, তুরুগ মুরুগ খোকন খিবা,
পার্সি গোলাপ-মধুর ডিবা দ্রাক্ষা খেজুর কাবুল আরব
যতসকল রাজ্যচোরা, অজগর আর উইলা বোড়া,
মরার মত পড়ে থাকে এম্নি জানে কায়দা আদব,
কিন্তু আবার সময় পেলে, ছায়া ধরে' আশু গেলে,
সুরসী সাপিনীর মত মুখটী মেলে আকাশ অর্ণব !

অভিমন্যুর সপ্তরথি, চীনের এখন তেম্নি গতি,
ভরসা কেবল বিশ্বপতি নাশেন যিনি মধুকৈটভ,
ভনলক্ষ্মী তারি কৃপা, হাসায়ে ধরা সপ্তদ্বীপা,
উঠিয়াছে পূব সমুদ্রে রাতুল পদে অতুল বিভব !
এক পা জাপের হৃদয় মনে, একপা চীনের জীবন পণে,
বিরাজিছে মাতৃমূর্ত্তি কি অপূর্ব্ব কি অভিনব,
সত্য ধর্ম্মে মুকুট গড়া, সর্ব্ববিদ্যা বসন পরা,
স্নেহ দয়া হৃদয় ভরা শান্তি সর্ব্ব অবয়ব !
শক্তি আর স্বাধীনতা, দুইভুজ দুই কল্পলতা,
চরণতলে অমরতা দুঃখ দৈন্য নাশে সব,
এক হাতে তার বরাভয় আরেক হাতে যশ আর জয়,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনময় সারা বিশ্ব করে স্তব !
তিন দিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব,
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

(৬)

এই যে আছি মৃত্যু শয্যায়, নাইক শক্তি অস্থি মজ্জায়,
কর্ণে শুনি তবু চীনের জয়ধ্বনি মন্ত্র-ভৈরব,
কি আহ্লাদে কি আনন্দে, হৃদয় নাচে বিরাট ছন্দে,
নবোদ্যমে নবোৎসাহে নবজীবন হয় অনুভব !
নূতন স্বাস্থ্য নূতন আয়ু, শ্বাসে বহে চীনের বায়ু,
চীনের শিরা চীনের স্নায়ু স্পর্দ্ধা স্পন্দন তেমনি সব,
তেম্নি শক্তি ভালবাসা, তেম্নি ইচ্ছা তেম্নি আশা,
তেম্নি চীনের পীত-পিপাসা ঠেক্‌ছে গিয়া 'লিয়াখব' !
ইয়াংসিকির নূতন বাণে, নূতন চিন্তা আনে ধ্যানে,
শতমুখে গঙ্গায় আনে নূতন চীনের নূতন বিভব,
নূতন কিরণ, নূতন উষা, নূতন চীনের নূতন ভূষা,
ভারতবেড়া সাগর জলে প্রতিবিম্বে জ্বলছে বাড়ব !
রাম লক্ষ্মণের লঙ্কা জয়ে, যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়ে,
অশোকের সে দিগ্বিজয়ে, এভাব মনে হয় নি উদ্ভব;
জাগে নাই আর এমন হর্ষ, আজ্‌কে যেমন ভারতবর্ষ,
বর্ণে নাই আর কোন কবি এমন ছবি দেবদুর্ল্লভ !

* * * * * * *

তিনদিনে চীন হ'ল স্বাধীন
জগৎ ভরা জয় জয় রব,
কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

শ্রীরাম রায়।

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থকার ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রসিক-মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংপ্রতি "শ্রীরাম রায়" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি রসিক বাবুর অগাধ পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল রামানন্দ রায়ের জীবনী অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাখার সাধনতত্ত্ব-কথায় এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দার্শনিক-তত্ত্ব এরূপ বিশদভাবে আর কোন গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না, আমি জানি না।

এই গ্রন্থ সাহায্যে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তৎসঙ্গে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এই বিশুদ্ধধর্ম্মে কোন্ ছন্দে কলুষ-রাশি প্রবেশ করিল, তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মহাপ্রভু পুরুষোত্তম হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গমন করিলেন। গোদাবরী-তীরে রামানন্দ রায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। যে মুহূর্ত্তে উভয়ের এই মিলন হইল, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে একটী পরম শুভমুহূর্ত্ত। কারণ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে যেরূপ অমৃতময়ী গীতার স্ফুরণ হইয়াছিল, রামরায়ের সহিত কথোপকথনেও সেইরূপ বৈষ্ণবের প্রেমধন সাধনতত্ত্বের বিকাশ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উভয়ের এই কথোপকথন লিখিত হইয়াছে। রসিক বাবুও তদবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

"সাধ্য বস্তু কি?" মহাপ্রভু রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে রামরায় বলিলেন—"বিষ্ণুভক্তিই সাধ্য, স্বধর্ম্মাচরণ তাহার বহিরঙ্গ সাধন। বর্ণাশ্রম পালন ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভক্তির উদয় হইতে পারে না।"

মহাপ্রভু। তারপর?

রামরায়। কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান।

মহা। তারপর?

রাম। স্বধর্ম্ম ত্যাগ, অর্থাৎ একমাত্র ভগবানে শরণাপত্তি বা আত্ম-নির্ভর।

মহা। ইহাও বহিরঙ্গ-সাধন, তারপর?

রাম। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

মহা। তারপর?

রাম। জ্ঞান শূন্যা বা অহৈতুকী ভক্তি, যাহার অপর নাম শুদ্ধাভক্তি।

মহা। কিন্তু ইহাই কি চরম?

রাম। নিশ্চয়ই না। এই শুদ্ধাভক্তির পরের সোপান হইতেছে প্রেমভক্তি। তাহার আবার পাঁচটী ধাপ আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব।

মহা। শান্ত প্রেম কাহাকে বলে?

রাম। শান্তপ্রেম জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল, যেমন শুক নারদাদির। তাহাতে ঐকান্তিকী কৃষ্ণ-নিষ্ঠা আছে, কিন্তু তাহা আবৃত; তাহার মধ্যে ততটা খোলাখুলি ভাব নাই।

মহা। আর দাস্য-প্রেম?

রাম। ভগবান্ প্রভু, আমি তাঁহার দাস এই ভাবে সেবা, যেমন হনুমান্ প্রভৃতির।

মহা। কিন্তু ইহাও বাহিরের সাধনা।

রাম। ঠিক, কিন্তু সখ্যভাবে এতটা দূরত্ব নাই। তাহাতে সেব্যসেবকের মধ্যে গলাগলি ভাব। আবার ইচ্ছা করিলে সখা ভগবানের সেবাও করিতে পারেন। এই সখ্যভাব হইতে ব্রজের সীমা আরম্ভ।

মহা। তারপর?

রাম। বাৎসল্য প্রেম। ইহাতে ঘনিষ্ঠতার আরও বৃদ্ধি। মা যশোদা প্রাণের গোপালকে ভৎর্সনা করেন, তাড়না করেন, এমন কি বন্ধনও করেন। আবার গোপালের অদর্শনে আত্মাহারা হন। বাৎসল্য প্রেমের ঘনাবস্থা।

মহা। তবে ইহাই কি প্রেমের চরম?

রাম। না, ইহার উপরে হইতেছে মধুর ভাব, যাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এই চারি রস পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান এবং তাহা ছাড়া আরও কিছু আছে। সে হইতেছে, প্রেমের সম্পূর্ণ একাত্মতা অর্থাৎ কান্তভাব। ইহাই প্রেমের চরম উৎকর্ষ। ইহা ব্রজগোপীর ভাব। এই কান্তভাবই সর্ব্বসাধ্যসার।

মহা। "সাধ্যের অবধি এই বটে। অর্থাৎ জীবদের সাধনের চরম সীমা এই পর্য্যন্ত। ব্রজসুন্দরীগণের ভাব লইয়া জগতের নরনারী যদি কৃষ্ণ ভজনের অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের সাধ্যের অবধি নির্ণয় হইল। ইহার পর যদি আর কিছু থাকে তবে বল।"

রামরায় এই কথা শুনিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—

"ত্রিজগতে শ্রীরাধার প্রেমের উপমা নাই। শ্রীরাধার প্রেমমাধুরী বৈকুণ্ঠের অনুপম অমৃত। ইহাই প্রেমের চরম উৎকর্ষ।"

মহাপ্রভু এতক্ষণে মনোনত কথা পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

এই সাধন প্রণালী পরম্পরায় অধিকারী ভেদে চারিটী স্পষ্ট সীমা-রেখা দেখা যায়।

(১) সংসারাসক্ত বিষয়ী লোকের সাধন-সীমা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন।

(২) ক্রমে এই ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইলে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান ও পরে কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া ভগবানে ঐকান্তিক নির্ভর।

(৩) তাহার পর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও অহৈতুকী ভক্তি আর একটী স্তর। এই সাধন হইতে শুক নারদাদি মুনি-জনোচিত শান্ত ভাবের উদয় হয়।

(৪) এইবার ব্রজের রাজ্য। শুক শনকাদি ঋষিগণের, এমন কি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরও সে রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। কেবল বহু জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফলে কয়েকটী প্রাণী পূর্ব্ব কামনার ফল লাভস্বরূপ এই ব্রজধামে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন,—অথবা কেবল তাঁহাদের জন্যই লীলাময় শ্রীভগবান্ এই অপূর্ব্ব ব্রজধাম রচনা করিয়াছিলেন। যদি আবার কখনও কোন নরনারী তপস্যা দ্বারা সেইরূপ সুকৃতি সঞ্চয় করিতে পারেন, তবে বাঞ্ছাকল্পতরু হরি তাঁহাদের জন্যও ব্রজের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারেন। জীব-জগতের সাধনের চরমসীমা এই পর্য্যন্ত। সাধ্যের অবধিও এই।

ইহার পর রাধা প্রেমের স্তর। তাহা সাধ্য নহে, অর্থাৎ সংসারের নরনারী সহস্র সাধনাবলেও তাহা লাভ করিতে পারে না। রাধা ও কৃষ্ণ একাত্মক স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, চন্দ্র ও তাহার দীধিতি—সেইরূপ রাধা ও কৃষ্ণ।

উভয়ে নিত্যসিদ্ধ অভেদাত্মক বস্তু। একেকে পাইতে অপরের সাধনার প্রয়োজন নাই। সুতরাং রাধা-প্রেমও সাধ্য নহে, স্বতঃসিদ্ধ। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, এই স্বতঃসিদ্ধ প্রেম নরনানীর অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম নহে।

তবে কি মানবদেহে কখনও রাধা প্রেমের বিকাশ হয় নাই? হইয়াছিল বৈকি। সে ঐ একবার। কিন্তু তাহাকে কি তুমি মানব দেহ বলিতে চাও? সে যে রাধা প্রেম ভাবিতে গৌরমূর্ত্তি গৌরতনু! ঐ একবার তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, একাধারে রাধা প্রেমের বিকাশ ধরাধামে বারে বারে হইতে পারে না।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, সাধারণ নরনারী এই রাধা প্রেমের অধিকারী নহে —তাহার নিম্নস্তর যে গোপী-প্রেম, তাহার অধিকারী নহে—তাহার নিম্নস্তর যে সখ্যবাৎসল্যাদি ব্রজের ভাব তাহার অধিকারী নহে—তাহার নিম্নস্তর যে শুক নারদাদি সেব্য শান্তরস, তাহার অধিকারী নহে—তাহার নিম্নস্তর যে নিষ্কাম কর্ম্মনুষ্ঠান ও সাকারাপত্তি, তাহারও অধিকারী নহে। কদাচিৎ কোনও ভাগ্যবান্ সকামকর্ম্ম-অনুষ্ঠান করিতে করিতে আসক্তিশূন্য হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ও ভগবানে আত্ম সমর্পন করিতে সক্ষম হন। সুতরাং সাধারণ মানবের সেব্য কি? না, সেই সর্ব্ব নিম্ন স্তরের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান। রসিক বাবুও সেই কথা বলেন :—

"প্রভু বর্ণাশ্রমাচার-জনিত সকাম নিষ্কাম কর্ম্মকে বহিরঙ্গ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ সাধ্যতত্ত্বের আলোচনায় সেই সকল বিষয় যে বাহ্য, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের দেহ শুদ্ধি হয় না। অশুদ্ধ দেহে কৃষ্ণ ভক্তির উদয় অসম্ভব। অসাত্ত্বিক আহার, গ্রাম্য কথায় কালযাপন, গ্রাম্য ভাবনায় মনের একাগ্রতা প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তির বাধক। সুতরাং আদৌ দেহশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রীয় বিধান মতে জীবনের কার্য্য নিয়মিত করা কর্ত্তব্য। জীবন যদি এইরূপে নিয়মিত না হয়, তবে ভক্তির সাধন রাজ্যে প্রবেশ পথ পাওয়াই অসম্ভব। প্রভু ঐ সকল কর্ম্মকে বহিরঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেও আমাদের ন্যায় বহিরঙ্গগণের সর্ব্বপ্রথমে ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য।" (৩৪ পৃষ্ঠা)

যাঁহারা বলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই ও আহার বিহারে উদারতা অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা অনুমোদিত, তাঁহাদিগকে এই কথাগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "তাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মকে যতটা "উদার" মনে করেন, অন্ততঃ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ততটা উদার নহে। আর যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনে বিমুখ হইয়া বৈষ্ণব হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন বা ভেক লন, তাঁহাদিগেরও সেই ভেক গ্রহণের অধিকার আছে কি না, তাহা বিবেচ্য। আর যে সকল বৈষ্ণব নামধারী নেড়ানেড়ীগণ ব্রজের ভাবের দোহাই দিয়া নানা ভাবে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও মহাপ্রভুর সর্ব্বলোক-বরেণ্য পবিত্র নামে কালিমা লেপন করিতেছে, তাহাদিগের এই অনধিকার চর্চ্চার জন্য কঠোর সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কিন্তু এ দোষ কেবল তাহাদের নয়। কবি জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক পদকর্ত্তা যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন, সাধারণ নর নারী

তাহার গূঢ় আধ্যাত্মিকভাব ধারণা করিতে না পারিয়া সেই পবিত্র আধ্যাত্মিক মিলনকে কাব্যালঙ্কারভূষিত আদিরস-ঘটিত ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। যে গোপী-প্রেম সর্ব্ববাসনাবিরহিত জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ-পুরুষগণের ধ্যেয় বস্তু, স্বয়ং মহাপ্রভু রাম-রায়াদি কতিপয় অন্তরঙ্গ পার্ষদের সহিত ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া যাহার আলোচনা করিতেন, কোন কোন পদকর্ত্তা তাহাকে ইন্দ্রিয় সম্ভোগরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, আর কীর্ত্তনওয়ালা ও কীর্ত্তনওয়ালীগণের প্রসাদে তাহা হাটে বাজারে সর্ব্বজন সমক্ষে নানা প্রকার হাব ভাবাদির সহিত অভিনীত হইতেছে। যে রাধা-প্রেম সাধ্য বস্তু নহে, স্বয়ং মহাপ্রভু যে প্রেমের ভিখারী, সেই রাধা-প্রেমের সাধনা ঘরে ঘরে হইতেছে। রাধা-প্রেম ত দূরের কথা, যে গোপী-প্রেমও বহু জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফল, আজ সেই গোপী-প্রেমের কত ছড়াছড়ি। এমন কি, কোন কোন শিক্ষিত পুরুষও রাধিকার সখী হইয়া গোপীভাবের সাধনা করেন। পুরুষ হইয়া প্রকৃতি সাধনা? কি ভয়ঙ্কর কথা! হৃদয়ে বিন্দুমাত্র পুরুষাভিমান থাকিতে সে সাধনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলিব কি, যাহার সন্তান হওয়ার বিরাম নাই, তিনিও রাধিকার সখী!

প্রকৃত কথা এই, সাধনের যে সকল সুপবিত্র পথ পড়িয়া রহিয়াছে, সে সকল পথে চলিতে এমন সব লোকের ধৈর্য্য নাই। কেবল বৈষ্ণব বলিয়া নহে, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেই এখন একটা shortcut অর্থাৎ সোজা পথের জন্য লালায়িত। তাই মহাপ্রভু কৃপাপরবশ হইয়া সাধারণ নরনারীর সাধন পরম্পরায় যে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই নাম সঙ্কীর্ত্তনে আজ কাল বড় কেহ সন্তুষ্ট নহেন। "জীবে দয়া, নামে রুচি", মহাপ্রভুর এই মহাবাক্য এখন সাধারণের নিকট আদৃত নহে। "তুমি প্রভু, আমি দাস" এই পরম পবিত্র সর্ব্বজনের সহজসাধ্য ভাবে আর এমন লোকের আস্থা নাই। তাই আপামর সাধারণ লোকে এখন রাধা প্রেমের জন্য লালায়িত, এখন কীর্ত্তন বলিতেই "রসকীর্ত্তন" বুঝায়! এই ঘোর অনধিকার চর্চ্চার জন্য বৈষ্ণব সমাজ কলুষিত। রসিক বাবু যথার্থ ই বলিয়াছেন,—

"এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরকে লইয়া ব্রজ গোপীরা যে রস-সাগরে নিমজ্জিত হয়েন, তাহার ধারণাও মর্ত্ত্যবাসী লোকের পক্ষে অসম্ভব; আর কেনই যে তিনি নারীরূপিনী আনন্দমূর্ত্তিগণের সহিত প্রেমরসে নিমজ্জিত রহেন, পরম যোগিগণের পরমার্থ বুদ্ধিও সেই রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ।" (২৯৪ পৃঃ)

"মানব-হৃদয়ের পুরুষোচিত প্রবৃত্তির বিদ্যমানতায় মধুর রসের ভজন অসম্ভব।" (২৯২-পৃঃ)

অতএব এই নিশিত-ক্ষুরধারা-সমাকীর্ণ-দুরতর ভজনপথ হইতে সাধারণ নর-নারীকে ফিরাইয়া আনা এখন সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এখন কীর্ত্তনাদি হইতে "পূর্ব্বরাগ", "বিরহ", "মান", "মিলন" "অভিসার", "খণ্ডিতা" প্রভৃতি পদাবলী বর্জ্জন করিয়া কেবল ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করা সকলের কর্ত্তব্য। রস-কীর্ত্তন শ্রবণের অধিকারী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে কয়জন আছেন, জানি না, মহাপ্রভুর সময়েও কিন্তু দুই তিন জনের বেশী ছিলেন না। বৈষ্ণব-সমাজের

এই দুর্দ্দিনে রসিক বাবু তাঁহার এই গ্রন্থ প্রচার দ্বারা মহোপকার-সাধন করিয়াছেন। দুই একটী স্থলে তাঁহার সহিত আমার মত-ভেদ হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

রসিক বাবু একস্থানে গোপীগণের কামানুরাগাভক্তির" সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'নারীত্বপ্রাপ্ত হওয়া মানবের শ্রেষ্ঠত্ব পরিণতি।" ইহার আবার একটী ইংরেজী নজির তুলিয়াছেন যথা:—

"The ultmirate destiny of man is to become a woman."

সমুদ্রের ন্যায় সুবিশাল ইংরেজী-সাহিত্য হইতে সকল রকম অদ্ভুত মতই উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। রসিক বাবুর এই কথা পড়িয়া যদি কোন কোন শিক্ষিত যুবক গোপীপ্রেমের জন্য লালায়িত হন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যাইবে কি? ভারতবর্ষে যদি এইমত অনুসৃত হয়, তবে ভারতমাতার বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। তাঁহার অনেক সন্তানই আজকাল সাহেব হইতেছেন; যে কয়টী বাকী থাকেন, তাঁহারাও যদি ধর্ম্মের নামে পুরুষত্ব বিসর্জ্জন দিয়া নারী হইতে চেষ্টা করেন, তবে ভারতমাতাকে মা বলিয়া কে ডাকিবে? এখনই শুনিতে পাই, কোন যুবক গোপী হইবার আশায় লম্বা চুল রাখিতেছেন, কেহ বা রমণীর ন্যায় রন্ধনবিদ্যা-শিক্ষা করিতেছেন। সুতরাং এই সব মত যুগধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া অতি সাবধানের সহিত প্রচার করা উচিত। সৃষ্ট-প্রাণিমাত্রেই স্ত্রী হইবে ভগবানের অভিপ্রায় থাকিলে তিনি স্বয়ং প্রকৃতিপুরুষ বা হরগৌরী বা রাধাকৃষ্ণ এই যুগল-তত্ত্বে বিভক্ত হইতেন না এবং সমস্ত প্রাণিজগতে কেবল স্ত্রীরূপই দেখা যাইত। গীতাতে ভগবান অর্জ্জুনকে এত উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু কৈ তাহার মধ্যে একটী উপদেশও ত নাই যে, তুমি তোমার পুরুষত্ব বিসর্জ্জন দিয়া স্ত্রীতে পরিণত হও। বরং তিনি বলিয়াছেন—যাহার যেটা সহজাত কর্ম্ম, তাহা সদোষ হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ("সহজমপি কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ।") সুতরাং পুরুষের পুরুষোচিত ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া নারীত্ব লাভকে পরমপুরুষার্থ কিরূপে বলিব?

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা উঠিল। ভগবান্ জগতের পিতা, ইহা একটী সকল ধর্ম্মে স্বীকৃত মহাসত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে অনেক স্থলে আপনাকে জগতের পিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

পিতাহহং সস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
অহং বীজপ্রদঃ পিতা। ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বৈষ্ণবই শ্রীকৃষ্ণকে পিতৃভাবে উপাসনা করেন না। আবার শ্রীরাধিকাকেও মাতৃসম্বোধন করিতে কোন বৈষ্ণবকে এপর্য্যন্ত শুনি নাই। ইহার একমাত্র অর্থ এই বোধ হয়, সকল বৈষ্ণবই রাধিকার সখী হইতে বাঞ্ছা করেন। সাধনক্ষেত্রে অনধিকার চর্চ্চার সীমা কতদূর বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে, ইহা হইতে বুঝা যায়।

আর একটী বিষয়েও রসিক বাবুর সহিত আমার ঝগড়া। আজকাল বৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথিবীর সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে অনেক মহাত্মা চেষ্টা করিতেছেন। পূজনীয় স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এই উদ্দেশ্যে তাঁহার "লর্ড গৌরাঙ্গ" (Lord Gouranga) পুস্তক লিখিয়াছেন। আমার যতদূর বিশ্বাস রসিক বাবুও সেই মতের পোষক। এরূপ স্থলে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির একটা পুরাতন বাতিল obsolete মত তুলিয়া সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি করা উচিত হয়

নাই। পুরাকালে কংস শিশুপালাদি কৃষ্ণ-দ্বেষিগণ কৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করে নাই। তাহাদের ন্যায় বিরুদ্ধ-বাদিগণের প্রবোধের নিমিত্তই বোধ হয় "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। তাই আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে একটী শ্লোক দেখিতে পাই—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

অর্থাৎ রামাদি অবতার ভগবানের অংশ কলা, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এখানে সাম্প্রদায়িক কলহের অঙ্কুর অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু সেই অঙ্কুরকে পল্লবিত করিয়া এক বিশালবৃক্ষে পরিণত করিলেন। তিনি এই শ্লোককে তাঁহার মনের মতন বচন মনে করিয়াই ইহার নাম দিয়াছেন 'বচনরাজ' এবং এই সম্বন্ধে বিচার করিয়া লিখিয়াছেন—

"অনুবাদ মনুক্ত্বৈব ন বিধেয় মুদীরয়েদিতি বচনাৎ কৃষ্ণস্য ভগবত্ত্ব লক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে নতু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমায়াতম্।" অর্থাৎ তাঁহার মতে কৃষ্ণই ভগবান্" এই সিদ্ধান্ত ঠিক, "ভগবান্ কৃষ্ণ" এসিদ্ধান্ত ঠিক নহে। পূজ্যপাদ গোস্বামী প্রভুর চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—"কৃষ্ণই ভগবান্" না বলিয়া "ভগবান্ই কৃষ্ণ" বলাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনিষ্টের আশঙ্কা কি? আমাদের সহজ-বুদ্ধিতে বরং বুঝি ভগবান্ই কৃষ্ণ হইয়াছেন বলিলে বরং কৃষ্ণের গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হয় এবং রামাদি অবতারের সহিত তাঁহার অভিন্নতা হেতু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন কারণ থাকে না। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন, "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি" অর্থাৎ বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে আমিই (অর্থাৎ ভগবান্) বাসুদেব (অর্থাৎ কৃষ্ণ)। আর কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ বলিলে কৃষ্ণকে অন্যান্য অবতার হইতে পৃথক করা হয়, আবার কৃষ্ণ রূপের নিত্যত্ব স্বীকার জন্য অন্য ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণরূপ যদি নিত্য হন, আর তিনিই যদি ভগবান্ হন, তবে মুসলমানের আল্লা ও খ্রীষ্টানের "গড্" কি ভগবান্ নহেন? এক ভগবান্ই গড্, আল্লা, কৃষ্ণ প্রভৃতি নামে পূজিত—তিনিই সাধকদিগের হিতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, এ কথা বলিলে কাহারও সহিত কোন বিরোধ থাকে না। বাস্তবিক এই সকল নাম ও রূপ যে নিত্য নহে, মায়িক পদার্থ, তাহা স্বয়ং ভাগবতই বলিয়াছেন। এই সকল অভাবের আলোচনা করিয়া ভাগবত বলেন—

"এতদ্রূপংভগবতো হ্যরূপস্যচিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈ বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি॥"

অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ং চিদাত্মা, বস্তুতঃ তাঁহার কোন রূপ নাই, তাঁহার এই সকল রূপ কেবল মায়ার গুণ যে মহদাদি, তাহাদের দ্বারা আত্মাতে কল্পিত। তারপর আবার বলিতেছেন—

"যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
"অবিদ্যয়াত্মনিকৃতে ইতি তদ্‌ব্রহ্ম দর্শনং।

অর্থাৎ যখন জীবের স্বরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আত্মাতে মায়াকল্পিত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় রহিত হয়, তখন জীব জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম হইয়া যায়। ("জীবো ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ"—ইতি শ্রীধর স্বামী।)

অতএব স্বয়ং ভাগবত যে সকল রূপকে মায়াকল্পিত বলিয়াছেন, যাহা অজ্ঞানের ফল, পূর্ণজ্ঞানোদয়ে যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহা লইয়া এত বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন কি!

ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন—
"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"
অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ এক অদ্বিতীয় জ্ঞানময় তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহারই নাম কেহ বলেন ব্রহ্ম, কেহ বলেন পরমাত্মা, কেহ বলেন ভগবান্। এই ভগবান্‌ই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের এক মাত্র উপাস্য দেবতা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

আলোচনা। (১)

সাহিত্যিক আলোচনায় কোন্ পথ অনুসরণ করা উচিত? প্রশ্নটা কেবল এই ভাবে থাকিলে কোনই উত্তর দেওয়া যায় না। ইহা আরও প্রশ্নের অপেক্ষা করে। কোন্ জাতির নিমিত্ত? কোন্ সময়ে? কোন্ দেশে? এই তিনটী প্রশ্ন করিলে, তাহার পর উত্তর দেওয়া যায়; নচেৎ অসম্ভব। যাঁহাদিগের আলোচনার কোন উদ্দেশ্য নাই, শুধু আলোচনা মাত্রই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই লইয়া আলোচনা করিতে পারেন, এবং তাহাতেই তাঁহার সুখ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা উদ্দেশ্যমূলক আলোচনা করা সঙ্গত বোধ করেন, তাঁহারা ব্যক্তির অঙ্গ বা জাতির কল্যাণই উদ্দেশ্য করিয়া থাকেন। অকল্যাণ কেহই ইচ্ছা করেন না। কিন্তু কল্যাণের তো কোন বাঁধা নিয়ম নাই; অন্ততঃ সাংসারিক হিসাবে নাই, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে কল্যাণ ও অকল্যাণ হয়, অকল্যাণও কল্যাণরূপে পরিণত হয়। যাহা আমার পক্ষে কল্যাণকর, তাহা অন্যের পক্ষে কল্যাণকর না হইতে পারে। যাহা আজ এইস্থানে কল্যাণকর, তাহা কালি অন্যস্থানে কল্যাণকর না হইতে পারে। এইনিমিত্ত যাঁহারা উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্যালোচনা করা সঙ্গত বোধ করেন, তাঁহারা উপরের তিনটী প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিবেন। কাহার মঙ্গলের নিমিত্ত সাহিত্যালোচনা করি? এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, সে কোন্ দেশীয়, সে কোন্ কালের? কারণ, যাহা সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, তাহাতে দেশকাল বিবেচনা না করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে মঙ্গলজনক হয় না। সুস্থ শরীর, পবিত্র মন, কাহার না কল্যাণকর? কে না ইচ্ছা করে? কিন্তু এমন দেশ ও এমনকাল অধুনা সকলেই অনুমান করিতে পারেন, যেখানে স্বাস্থ্যের প্রধান সহায় শারীরিক ব্যায়ামের আলোচনা করাও বিপজ্জনক হইতে পারে। অনুশীলন তো দূরের কথা, সত্যনিষ্ঠার বিচার করাও বিপদসঙ্কুল হইতে পারে। কবি কীট্‌স্ বলিতেছেন।

So I am safe emerged from these broils!
Amidst the wreck of thousands I am whole.
For every crime I have a laurel wreath,
For every lie a lordship"—

দেশের ও কালের এমন দুরবস্থাও হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করা এস্থলে প্রাসঙ্গিক হইবে না। যে কারণেই হউক, যদি তদ্রূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সাহিত্য কোন্ পথে

যাইবে? উত্তর—যাহার অথবা যাহাদিগের মঙ্গল কামনায় আলোচনা করা, তাহাদিগের যে আলোচনায় তৎকালে ও তদ্দেশে মঙ্গল হইবে, তাহাই অনুষ্ঠেয়। সংসারে মঙ্গলও নানাবিধ। কাহারও স্বাস্থ্য নাই, ধন আছে; তাহার মঙ্গল স্বাস্থ্যে। কাহারও ধন নাই, স্বাস্থ্য আছে; তাহার মঙ্গল ধনে। কাহারও এতদুভয়ই আছে, অপত্য নাই। তাঁহার ইষ্ট অপত্যলাভ। এইরূপ নানাবিধ হিতকর বিষয় মধ্যে যেটী অগ্রগণ্য, আলোচনাও তাহারই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। এতদ্দেশের ও সমাজের অবস্থা চিন্তা করিয়া চিন্তাশীল সুলেখক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় অনেকদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, †

"বিবর্ত্ত নীতির নির্ণায়ক গ্রন্থাবলী মানবের প্রধান শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত; * * * উহাপেক্ষা অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় মানবের আর নাই।" কিন্তু ঐ সারগর্ভ বাক্য এতদ্দেশে সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। চণ্ডীদাসের রামী যে পরিমাণ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বংশক্ষয়ও সেই পরিমাণ আলোচনার যোগ্য হয় নাই। যাক্, সে আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, করাও নিরাপদ নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে একে একে সকল আলোচ্য বিষয়েরই দাবী পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি; এবং কাহার দাবী কিভাবে গ্রহণীয়, তাহাও ইঙ্গিত করিতে ইচ্ছা আছে। এইকার্য্য অতি গুরুতর, ইহার পরীক্ষাও সহজ নহে, এ নিমিত্ত আমরা সংক্ষেপে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু অগ্রে একটী কথা অতীব স্পষ্টভাবে বলিয়া রাখি যে, আমরা কোন আলোচনারই বিরোধী নহি। আমরা ইহা স্বীকার করি যে, সকল আলোচনাই মঙ্গলজনক; আমরা কেবল দেশ, কাল, পাত্রভেদে আলোচনার গুরুত্ব লঘুত্ব নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করি; আর আলোচনার পদ্ধতি; অন্য কিছুই নহে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কাব্যপ্রিয় মহাত্মা লজ্ বলেন, "কেবলমাত্র একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সাহিত্যিক শ্রেণীর সাহিত্যালোচনার উপর নির্ভর করিয়া থাকা সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক; ঐরূপ করা কখনই বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না॥ † একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রভেদে প্রয়োজনীয়তার মাত্রাভেদ অথবা পরিমাণ ভেদ হয় না, ইহা স্বীকার করি না। প্রয়োজনীয়তার ইতরবিশেষ বশতঃই পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

সাহিত্য, গদ্য ও পদ্য। সাহিত্য বলিতে আমি মানব জাতির সমস্ত জ্ঞানের লিখিত বিবরণ বুঝি। কিন্তু এ অর্থ এখন প্রচলিত বলা যায় না। সুতরাং এস্থলে প্রচলিত অর্থেই শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। সাহিত্য বলিতে এস্থলে কাব্য সাহিত্য এবং সমালোচনাও বুঝিতে হইবে। "সাধু কাব্য নিষেবনে" চতুর্বর্গ ফল ফলে।* অলঙ্কার

---

† সমাজচিন্তা। নব্যভারত ১৩১১, পৃঃ ৪৫৯

† To decline to be informed by the great seers and prophets of the past, and to depend solely on a limited class of workers such as have been bred chiefly within the last century or two, would savour of a pitiful narrowness, and would be truly and in the largest sense unscientific. Reason and Belief p 199.

* ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষানাং বৈলক্ষণ্যং কলাসুচ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধু কাব্য নিষেবনং॥
সাহিত্য-দর্পণ।

শাস্ত্রে ইহা মানব হৃদয়ের বিশুদ্ধি-হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা সাধনার অঙ্গস্বরূপ। মানবের দেহ ও মন এখনও পশুভাব ছাড়াইতে পারে নাই; এখনও অসভ্যাবস্থার প্রভাব চলিতেছে। (সাধুকাব্য উন্নত চরিত্রের, পবিত্র ভাবসমূহের আলেখ্য পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহার দেহ মনের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে প্রয়াসী হয়। তাই, উহা সাধনার তুল্য। এবিষয়ে গদ্য পদ্যে প্রভেদ এইমাত্র যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের শক্তি অধিক; কারণ পদ্য স্বভাবের সঙ্গীত। যেমন সাধুকাব্য সর্ব্ব প্রযত্নে আলোচ্য, তেমনই কুকাব্য বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত। যে কবি মানব মনের অপবিত্র ভাব, অধর্ম্মবৃত্তি জাগাইয়া দেন, তাহার গ্রন্থ, গদ্য হউক পদ্য হউক, "চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াইয়া" ফেলা উচিত। অধুনা বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পরিতাপের সহিত অনুভব করিতেছেন। মানুষ স্বভাবতঃই অল্পাধিক রাগ-যুক্ত; তাহাতে কুকাব্য আহুতি প্রদান করা কখনই সঙ্গত নহে। শিহ্লন মিশ্র দুঃখের সহিত বলিয়াছেন—

> যদা প্রকৃত্যৈব জনস্য রাগিনো
> ভৃশং প্রদীপ্তো হৃদি মন্মথানলঃ।
> তদাত্র ভূয়ঃ কি সমর্থ পণ্ডিতৈঃ
> কু কাব্য হব্যাহুতয়ো নিবেশিতাঃ॥
>
> শান্তিশতকং ৩৩।

একথা সাহিত্যিকগণের এবং শিক্ষিত সমাজের বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদি কুবাক্য-প্রণেতাগণ সমাজে আদর প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে এ রোগ বড় একটা সংক্রামক হইবার সুবিধা পায় না। কুকাব্য ও কুকবিগণ তিরস্কৃত হওয়া আবশ্যক। এই নিমিত্তই সমালোচনার স্থান এত উচ্চে। কোন্ কাব্য ব্যক্তির ও সমাজের মঙ্গলজনক, কোন্ কাব্য অমঙ্গলজনক, সমালোচক প্রকৃত বিচারকের ন্যায় তাহা বুঝাইয়া দিবেন, কোনও ব্যক্তির মুখাপেক্ষা করিবেন না। তাহা হইলে সমাজে সু-সাহিত্য উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং কু-সাহিত্য অনাদৃত হইবে, এমত আশা করা যায়।)

এস্থলে ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও উল্লেখ করা উচিত। ব্যাকরণ জীবিত ভাষাকেও পরিচালিত করিবে। কিন্তু জীবিত ভাষা কখন কখন ব্যাকরণের সুশিষ্য হয় না। প্রতিভাশালী লেখকের হস্তে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু সাধারণ্যে তাঁহাদিগের অনুকরণ করিবে না। মৃত ভাষার তো ব্যাকরণই সর্ব্বস্ব, তাহাকে ছাড়াইয়া এক পদও যাওয়া যায় না, এবং যাওয়া কর্ত্তব্যও নহে। সে ভাষার মূল প্রকৃতি যাহা, তাহার ব্যাকরণও তদনুসারেই সেব্য। সাহিত্যিক আলোচনায় কাব্যের স্থান অতি উচ্চ। কিন্তু তথাপিও বিবেচনা করা আবশ্যক যে, যে দেশে যে কালে যে সমাজের জন্য উহার আলোচনা হইতেছে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অগ্রগণ্য প্রয়োজন কি? যাহা অধিক আবশ্যক, সাহিত্য সেই দিকেই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। যদিও এক অর্থে সাহিত্য গড়া যায় না সত্য, উহা আপনিই গড়িয়া উঠে, তথাপি উহা সর্ব্বথা প্রযত্নের বহির্ভূত নহে। সমাজে নৈতিক অথবা দৈহিক বলের অভাব থাকে,

সাহিত্য তাহার আদর্শ মনোজ্ঞ ভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবে গাম্ভীর্য্য কিম্বা ধর্ম্মভাবের অভাব থাকে, তাহাও তদ্বৎ ধারণ করিবে। অর্থ অথবা স্বাস্থের অভাব থাকিলেও তদ্রূপ। শিক্ষা মানবের অভাব পূর্ণ করিবার প্রধান সহায়। শিশু পড়িতে পড়িতে উহা শিখে; প্রকৃতি এই ভাবেই শিক্ষা দেন। মানবীয় শিক্ষা-প্রণালী প্রকৃতির অনুকরণ করিবে, এবং তাহার অভাব পূর্ণ করিবে। † তাহা হইলেই মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে। তখন তাহাকে কল্যাণকর পথে চালিত করা প্রতিভার কার্য্য। কাব্য-সাহিত্যের সফলতা এই পথেই; ইহার গতিও এই দিকেই হওয়া উচিত।

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব।

ব্যক্তির জীবনে যেমন ভ্রূণতত্ত্ব, শারীর তত্ত্ব ও নিদান, † সামাজিক জীবনে তেমনই ইতিহাস প্রভৃতি। কিন্তু ইতিহাসের এইরূপ অর্থ এখনও সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় নাই। অনেকে ইতিহাস বলিতে রাজমুকুটধারীদিগের অকীর্ত্তি, কুকীর্ত্তি এবং স্থল বিশেষে কিছু কিছু সৎকীর্ত্তি বর্ণনাই বুঝিয়া থাকেন। চৌর্য্য, দস্যুতা, শঠতা, নরহত্যা, লুণ্ঠন, লাম্পট্য, অত্যাচার প্রভৃতির ব্যাখ্যানই ইতিহাস পদবাচ্য ছিল। অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থ যুদ্ধ বিগ্রহ এবং নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনী মাত্র। এরূপ ইতিহাস রচনা সমাজের অমঙ্গলজনক। ইহাতে অনেক স্থলে বদমায়েসদিগের কুকীর্ত্তি সাধারণের নেত্রপথে উজ্জ্বল চিত্রে ধারণ করা হেতু, কুভাবেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এরূপ ইতিহাস রচনা দ্বারা ধীমান পাঠককে অবমাননা করা হয়, এবং অল্পবুদ্ধি পাঠকগণের কু প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া হয়। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ এরূপ ইতিহাস রচনা করেন নাই; তাহাতে আমাদিগের কিছু মাত্র দুঃখিত বা লজ্জিত হইবার কথা নাই, বরং শ্লাঘারই কথা। ঐ প্রকার ইতিহাস রচনা দ্বারা যে পাঠককে কুপথে নেওয়া হয়, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন। এস্থলে তাঁহাদিগের দুই একজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির মত উল্লেখ করিতেছি, ডাক্তার সেলিবি পাঠককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"কতকগুলি বদমায়েসদিগের কুকীর্ত্তি, খোসামুদেদের আষাঢ়ে গল্প, যুদ্ধ, নরহত্যা ও চৌর্য্যের বিবরণকে স্কুলে পড়ার সময় হইতে ইতিহাস বলিয়া আসিতেছি। সে সকল বৃথা কথার আলোচনা করিয়া পাঠককে অপমান করিতে ইচ্ছা করি না।"†

ঐতিহাসিকের রাজা, যাঁহাকে দার্শনিক বলা যাইতে পারে, সেই গিবন্ (Gibbon) স্বয়ং বলিয়াছেন, "ইতিহাস কতকগুলি দুরাচার, দুর্ব্বুদ্ধি, ও দুর্ভাগ্যের তালিকা মাত্র" (Register of the crimes, follies, and misfortunes of mankind)। চিরস্মরণীয় হাক্স্লি বলিতেছেন,—

---

† The object of what we commonly call education ** is to make good these defects in nature's methods to prepare the child to receive nature's education—Huxley's lectures and Lay Sermons, p 61

† Pathology.

† The reader will not expect to be insulted here with any discussion of the garbage and gassip, records of scoundrels, courts and courtesans, battles, murder and theft, which we were taught at school under the great name of history. If history be as nearly all historians have conceived it * * * * it is an empty and contemptible study.

Parenthood and Race culture p. 254.

"আমরা ইতিহাস চাই, রাজবংশাবলী, যুদ্ধ বিগ্রহের তালিকা চাহি না ; কতকগুলি জীবনীমাত্র চাহি না ; হুইগ বা টোরীরা ঈশ্বরের অনুগৃহীত, তাহার প্রমাণ চাহি না। অতীত কালে মানব যে প্রকারে বিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই অভিব্যক্তির ইতিহাস চাই বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পতিত হইয়া মানব কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারই ইতিহাস চাই।" †

জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক রে-ল্যাংকেষ্টারও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,

"মানুষ একদিন বিশ্বাস করিত যে, পুরাকালে যাহা ঘটিয়াছে, আবারও তাহা ঘটিতে পারে ; তাই রাজকর্ম্মচারিগণের ইতিহাস পাঠ করা উচিত। কিন্তু ইহা কেহই দেখাইতে পারিবেন না যে, কোন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র রাজনৈতিক ব্যক্তিও ইতিহাস পাঠে কোন আবশ্যকীয় কর্ম্মের সহায়তা লাভ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনা পুনরাবৃত্ত হয় না। যিনি মনে করেন, "হয়" তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইবেন। মজাদার পত্রিকালেখকগণ জীবনে বহুল ইতিহাস পাঠ করিয়া স্বীয় রচনায় বাহার দিতে পারেন সত্য, কিন্তু ইহা ইতিহাসকে উচ্চ আসন দিবার সঙ্গত কারণ নহে। ইতিহসের এত আদরের কারণ ইহাই বোধ হয় যে, যাঁহারা কেবল প্রাচীন সাহিত্যের অলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের উহা ভিন্ন আর গতি নাই। তাঁহাদিগের অন্য কোন সামান্য বিষয়েরও পাঠ আরম্ভ করা সহজ নহে।" *

প্রকৃতপক্ষেও এতদিন ইতিহাস বলিতে যেরূপ আলোচনা বুঝা যাইত, তাহাতে সমাজের কোন সুফল তো নাই-ই, বরং কুকর্ম্মের চিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করায় কুফলই উৎপন্ন হইত। অথচ ইতিহাস আলোচনার যোগ্য। কি ভাবে উহা আলোচ্য ? বৈজ্ঞানিক ভাবে, মানব তত্ত্বের একাংশ স্বরূপে। ইতিহাস মানবের জাতীয় বিবরণ স্বরূপে আলোচিত হইলে, তাহার উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত স্বরূপে, তাহার সভ্যতা বিকাশের বিবরণ স্বরূপে বর্ণিত হইলে, তাহার বিবর্ত্তন, † অথবা

† 'We must have history ; treated not as succession of battles and dynasties ; not as a series of biographies ; not as evidence that Providence has always been on the side of either Whigs or Tories ; but as the development of man in times past, and in other conditions than our own.

Lecture and Lay sermons p. 73.

* At one time men believed that history repeats itself and it was thought to be a proper and useful training for one who would take part in public affairs to store his mind with precedents and picturesque narratives of prominent statesmen in far off days and distant lands. As a matter of fact it cannot be shown that any statesman or even the humblest politician has ever been guided to useful action by such knowledge. History does not repeat itself, and the man who thinks that it does will be led by his fragmentary knowledge of stories of the fact into serious blunders. To the fashionable journalist such biographical history furnishes the seasoning for his essays on political questions of the day. But this does not seem to be a sufficient reason for assigning so prominent a place in university studies to this kind of history as is at present the case. The reason perhaps of the favour which it receives, is that it is one of the few subjects which a man of merely classical education can persue without commencing his education in elementary matters afresh.—The kingdom of man p 57.

† বিবর্ত্তন—Evolution.
বিবর্দ্ধন—Development.

বিবর্দ্ধনের কিম্বা অধোগতির কারণ অনুসন্ধানের সহায়ভূত হইলে, কার্য্যকারণ অনুসন্ধান করতঃ মানবের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথপ্রদর্শক হইলে, ইহা গভীর ভাবে আলোচ্য। মানব মনের ক্রমবিকাশ, মানব দেহের ক্রম-পরিবর্ত্তন, মানবসভ্যতার ক্রমোন্মেষ আলোচনা করিয়া মানব-সম্প্রদায় সকলের জীবন-সংগ্রাম লোপ অথবা বিস্মৃতির মূল রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ, ইতিহাস মানব তত্ত্বের অন্তর্গত ভাবে ("as a department of anthropology" Lankester) অধীত হইলে, এই শাস্ত্র ব্যক্তির, সমাজের ও জাতির অতীব হিতজনক, সন্দেহ নাই। অতীব পরিতাপের বিষয় যে, এই তথ্য, এ প্রয়োজনীয়তা এখনও এতদ্দেশে স্বীকৃত কিম্বা অনুভূত হইতেছে না। আর কবে হইবে, এতদ্দেশীয় সমাজ যে মৃতপ্রায়; ইতিহাসের ঈদৃশ আলোচনা আরম্ভই হইল না, অথচ নিরর্থক করতালিতে বঙ্গীয়-গগন প্রতি মুহূর্ত্তই প্রতিধ্বনিত হইতেছে! এখনও সময় আছে; এখনও ইতিহাসের ঈদৃশ আলোচনা আরব্ধ হউক।

ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধেও ঐ এক কথাই বলিতেছি। রাজমুকুট-শোভিত সিংহাসনাসীনগণের কথা বলিতে হয়, বল। কিন্তু এই তিন শাস্ত্রেরই প্রকৃত লক্ষ্য, জন-সাধারণ। ইহাদিগের অস্ত্রাদি,—(অস্থি নির্ম্মিত হউক, কিম্বা প্রস্তরের অথবা ধাতুনির্ম্মিত হউক,)—ইহাদিগের বেশভূষা, ইহাদিগের বস্ত্রালঙ্কার, ইহাদিগের বাসস্থান ও গৃহাদি,—(পর্ব্বত-গুহা হইতে সপ্ততল প্রাসাদ পর্য্যন্ত)—ইহাদিগের গৃহসজ্জা, ইহাদিগের পালিত পশুপক্ষী, ইহাদিগের আহার, ধনরত্ন, ইহাদিগের দল, পরিবার ও সমাজ, পারিবারিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ, আচার আচরণ, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসবাদি; চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, কৃষি-বাণিজ্য ও দেশভ্রমণ,—ইত্যাদি জনসাধারণের উত্থান পতনের সমস্ত বিবরণ, পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাস্ত্রের আলোচ্য। কিছুই পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক গ্রন্থ, প্রত্যেক ইষ্টক, প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ড,—গভীর গবেষণার বিষয়। আলিপণা হইতে কারুকার্য্য, সূচী হইতে কামান, ঘুড়ি হইতে বিমান পর্য্যন্ত সকলই পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। এই শাস্ত্রদ্বয় মানব মনের, সুতরাং মানবীয় শিল্পাদির ক্রমবিকাশ যেরূপ ভাবে আলোচনা করিতে পারে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু উহাই শেষ নহে। মানব মনের, মানবীয় সভ্যতার ধারাবাহিক বিবরণ হইতে তাহার গতি বিষয়ক সাধারণ নিয়ম সকল আবিষ্কার করিতে পারা চাই; উত্থান পতনের কারণ অথবা কারণ সমূহ যথাসম্ভব অবধারণ করিতে পারা চাই; বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের পথ মানব সমাজকে দেখাইয়া দেওয়া চাই; নচেৎ বৃথা ইষ্টক চর্ব্বণ সার হইবে। সামাজিক আচার ব্যবহার, বিধি নিষেধ সমূহ বিশেষ ভাবে এই অংশে আলোচ্য। প্রাচীন কালে কি ছিল, তাহা জানিয়া কিছুই ফল নাই, বরং কুফল আছে,—যদি তদ্দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে ধনে জনে, আচার আচরণে, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে লাভবান্ ও ধনবান হইতে না পারি। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলই লক্ষ্য, নচেৎ অতীতের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মনে করুন, একখানা এনামেল্ করা ইষ্টক মাটীর নীচে পাওয়া গেল; তাহাতে ফল কি? এনামেল্ কি পদার্থ, উহা কিরূপে প্রস্তুত হয়, ইষ্টকে উহা কিরূপে প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে

তাহাতে ইষ্টকের স্থায়ীত্ব অথবা অন্য কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা বাড়ে কিনা; যদি বাড়ে, তবে বর্ত্তমান সময়ে উহার ব্যবহার প্রচলন করা, অথবা ঐ শিল্প পুনর্জীবিত করা যায়, কি যায় না; উহার বাণিজ্য আর্থিক লাভজনক কিনা—ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচনা না হইলে, কেবল ঐ ইষ্টকখণ্ডের এনামেল্ যুক্ত রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলে কিছুই লাভ নাই। যদি ঐ এনামেল্ কেবল বিলাসিতারই পরিচায়ক হয়, আর উহার প্রচলনের পর হইতে যদি জাতীয় পতনের প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তো উহাকে সন্দেহের চোখে দেখিবার বিশেষ কারণ উপস্থিত হওয়াও সম্ভব; উহা হইতে জাতীয় পতনের অন্যতর কারণও আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। উহার প্রচলন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হওয়াও সঙ্গত হইতে পারে। সিদ্ধান্ত কোন্ দিকে যাইবে, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ঐ ইষ্টক খণ্ডের আলোচনা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পথেই হওয়া উচিত। অন্যপথ দেখা যায় না। পুরাতত্ব ও প্রত্নতত্ব মানব তত্বের অন্তর্গত ভাবে আলোচ্য। নচেৎ ইহার উপকারিতা কোথায়? অতীতকালে এক অবস্থায় একরূপ ঘটিয়াছিল; বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে বিভিন্ন অবস্থায় তদ্রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? তবে অতীতের ঘটনাবলী হইতে যদি কোন চিরন্তন সত্য উদ্ধার করা যায়, কোন নিত্য বিধির দর্শন লাভ হইতে পারে, তাহাই মানব জাতির উপকারে আসে। আর কিছুই সাক্ষাৎ স্বরূপে উপকারজনক হয় না, বরং অমঙ্গলজনক হইতে পারে।

ইতিহাস, পুরাতত্ব ও প্রত্নতত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, জীবনচরিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। ক্রমশঃ

শ্রীশশধর রায়।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

"The sun is but a spark of fire
A transient meteor in the sky
The soul immortal as its sire
Shall never die."

এক একটী করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সুধীবর্গ অন্তর্হিত হইতেছেন, যাঁহারা বঙ্গদেশের গৌরব, যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির মস্তিষ্ক, জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধিতে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, যাঁহাদের এই বঙ্গদেশে জন্ম হওয়াতে বঙ্গদেশ ধন্য, কালের নিষ্ঠুর দংষ্ট্র একে একে তাঁহাদিগকে করাল কবলে গ্রাস করিল!

উনবিংশ শতাব্দী ধন্য, কারণ দয়াময় দয়া করিয়া তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের বিধান পাঠাইয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। আচার্য্য কেশব চন্দ্র এই জন্য তাহাকে Apostolic Age বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সেই বিধানের অঙ্গ, বিধানের সেনাপতি, যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে দয়াময়ের পবিত্র বিধান-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, স্তম্ভরূপে যাঁহারা সেই পবিত্র বিধানের ধারণকর্ত্তা, আজি তাঁহাদের একজন প্রকৃত মহাত্মা কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই অনন্ত বিধানের নিয়োগ-কর্ত্তার পবিত্র দরবারে আহূত হইলেন।

লোকে বলে, উনবিংশ শতাব্দী আমাদের

দেশের বিলাসযুগ। ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকে বঙ্গদেশকে গাড়ী ঘুড়ী, চশমা বেড়ী, রকমওয়ারী দাড়ি, হ্যাটকোট প্রভৃতি নানা আভরণে সজ্জিত করিয়াছিল, সেই বিদেশীয় বিজাতীয় সভ্যতার যুগে নিষ্ঠাবান, আড়ম্বর-হীন, চরিত্রবল-সম্পন্ন অথচ সম্পূর্ণ Stoic ভাবাপন্ন আদর্শ মানবের কথা আমি বলিতেছি। যিনি একাধারে পণ্ডিত ও ভক্ত, বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রজ্ঞ, দার্শনিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ। অথচ বাঙ্গালী সে সমস্ত লোককে চিনে না, চিনিবার যুগ এক্ষণেও আসে নাই। গত-পূর্ব্ব-সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠকে সকল পরলোকগত গ্রন্থকারের নাম শুনিলাম, কিন্তু যিনি মুসলমান সাহিত্যের অমূল্য রত্ন কোরাণ, হাদিস, তাপস মালা প্রভৃতি বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট সাধুভাষায় অনূদিত করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, হায়, সেই গিরিশচন্দ্রের নাম কেহ করিল না! অবশেষে কেহ উল্লেখ করিলে লজ্জার খাতিরে নাম করা হইল। দেশটা এতই সাম্প্রদায়িক ভাব পরিপূর্ণ যে, যে মুসলমান জাতির তিনি এত উপকার করিলেন, তাঁহারা একটা স্মৃতি সভা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন না, কারণ তিনি মুসলমান নহেন। এই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাই দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। হিন্দু-সাহিত্য-সম্মিলন, ব্রাহ্ম বলিয়া, তাঁহার নাম করিতে ভুলিয়া গেলেন।

আজি যিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন, তিনি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের হস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়াছেন, গীতা ও বেদান্তের সমন্বয় ভাষ্য প্রকাশিত করিয়া এই দুই উজ্জ্বলরত্ন বঙ্গবাসীর নিকটে প্রদান করিলেন, এবং আজীবন ঋষির ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া, বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সাধুতা,ইন্দ্রিয়-সংযম ও ধর্ম্মজীবনের পবিত্র আদর্শ দেখাইলেন, ও ভৃত্যের ন্যায় বিনা বেতনে দেশের সেবা করিলেন, তিনিও যে বাঙ্গালী জাতির নিকট বিশেষ সম্মান পাইবেন, এরূপ আশা করি না।

কিন্তু তিনি কখনই তাহা চান নাই। আত্ম-বিসর্জ্জন তাঁহার জীবনের মহৎ ব্রত ছিল। এবং যে দল মধ্যে তিনি বিরাজ করিতেন, অন্যের মঙ্গল ভিন্ন নিজের কোন কামনা তাঁহাদের জীবনে ছিল না। জীবনের প্রারম্ভ হইতে, যখন সাধু মুখে এই পবিত্র আহ্বান আসিল, "কত আর নিদ্রা যাও ভারত সন্ততিগণ" তখন এই সকল পবিত্র মহাত্মারা, যাঁহারা পঠদ্দশায় পাঠ অর্দ্ধ সমাপ্ত করিয়া, বঙ্গের সারধন যে চাকুরী, সেই চাকুরী পরিত্যাগ ও গৃহ ধনজন পরিত্যাগ করিয়া এবং জীবনের সুখ সৌভাগ্য ঐশ্বর্য্য, এমন কি দারা পুত্র পরিত্যাগ করিয়া দয়াময়ের পবিত্র নামে আহূত হইলেন। লক্ষ্য—দেশ সেবা ও ধর্ম্মের প্রচার, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও চিনিতেন না। কাহারও নিকট পুরস্কার প্রার্থী হয়েন নাই। প্রথম জীবনে অত্যাচার যথেষ্ট সম্ভোগ করিয়াছেন, উপবাস, অনাহার, বসনহীন ও তিরস্কৃত হইয়া এই সকল মহাত্মা প্রাণপণে দেশের সেবা করিয়াছেন, দেশ তাঁহাদের জন্য কি করিয়াছিল; যাঁহারা অট্টালিকার উচ্চ মঞ্চে থাকিয়া নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা লোকের নিকট আদৃত হউন, আমাদের দুঃখ নাই। কিন্তু যাঁহারা জীবনটাকে কেবল দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের হস্তের নিয়োগ দেখিয়াই উৎসর্গ করিয়াছেন, বাঙ্গালী এ সকল লোকের মহত্ত্ব কি তুমি এখনও বুঝিবে না? অপ্রিয় সত্য

বলিয়াছেন, অন্যায় কার্য্যের জন্ত চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন, পরে তোমাদের প্রকৃত মঙ্গলই সাধন করিয়াছেন। হায়, তোমাদের অবহেলায় তাঁহারা চিরদিন অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন। তাঁহারা কি উপকার চাহিয়াছিলেন? না, তোমরা ভাল হও, তোমরা পাপ করিও না। তোমাদের হিতের জন্যই তোমাদের অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন।

মহাত্মা উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আজি যাঁহার জন্য শোকাশ্রুতে আমরা ভাসিতেছি, তিনি উত্তর বঙ্গে সিরাজগঞ্জের নিকট বৈদ্যপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের পুলিস ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে আহ্বান করিলেন,আর তিনি পুলিসের কার্য্য জীবনের ব্রত মনে না করিয়া, অনন্ত বিশ্বের অধীশ্বর সেই পরম দেবতার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এবং আজীবন তাঁহার ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সেবা করিয়া অনন্ত বিশ্রাম-নিকেতনে গমন করিয়াছেন। প্রথম জীবনে ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এক কথায়ই তিনি তাঁহাকে আকর্ষণ করেন। সে ঘটনা তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের সহিত যাঁহারা মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই সংসারের ক্ষুদ্রকূপে নিমগ্ন থাকিতে পারেন নাই। সাগর উদ্দেশে ধাবিত নদীর ন্যায় তাঁহারা আজীবন প্রবাহিত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মসাগরে মিলিত হইয়াছেন। গৌরগোবিন্দ তাঁহাদের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ রত্ন। কালে ইঁহাদের জীবনচরিত লিখিত হইবে, কিন্তু আমাদের নিকটে ইঁহারা যে পবিত্র জীবনের আদর্শ দেখাইয়া গেলেন, এ আদর্শ আমরা কখনও ভুলিব না।

গৌরগোবিন্দ কেশবের নববিধানের একটী প্রধান স্তম্ভ, দার্শনিক ও বিদ্বান,দৃঢ়তা ও চরিত্র-বল-সম্পন্ন। জ্ঞানী ও বিশ্বাসী এপ্রকার এক জন লোক থাকিলে ধর্ম্মবিধান জয়যুক্ত হয়। দোষ এবং ক্রটী অনেকের জীবনে আছে, মানব হইলেই ভ্রম স্বাভাবিক, কিন্তু গৌরগোবিন্দের শক্ররাও তাঁহার জীবনে কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যদি দোষ নামে কিছু থাকে, তাহা তাঁহার অতিরিক্ত আত্মত্যাগে নিবদ্ধ। এমন আত্মত্যাগী মহাত্মা নববিধান প্রচারকগণের মধ্যেও অতিবিরল। তিনি বিশ্বাস করিতেন, নব-বিধান ঈশ্বরের বিধান, এবং এই বিশ্বাসের বলে তিনি জীবনকে অগ্নির মুখে সমর্পণ করিতে পারিতেন। তাঁহার বিশ্বাসের দুইদিক ছিল না, হইতে পারে, সম্ভব,এরূপকথা ছিল না। তিনি যাহা সত্য মনে করিতেন, তাহার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে তাঁহার বাধা ছিল না। যখন কেশবের বিধান সঙ্কটাপন্ন, যখন চারিদিক হইতে শক্র মিত্রগণ নির্দ্দয় ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কেশবের জীবন চলিয়া গেল, ভক্তমণ্ডলী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল! তখন একাকী গৌরগোবিন্দ বিধানের নিশান হস্তে ধরিয়া সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ করিলেন, এবং বলিব কি, এই বিধানকে জয়যুক্ত করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষী, অশুভাকাঙ্ক্ষী সকলের মুখ নীরব হইল। প্রতিদ্বন্দী হইয়াও মহাত্মা পণ্ডিতাগ্রগণ্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহাকে শেষ দিন গুরুনামে অভিহিত করিলেন। প্রকৃত পক্ষে গৌরগোবিন্দ এ যুগের অতি শ্রেষ্ঠ গুরু। গৈরিক বসন ও ত্রিদণ্ড ধরিয়া, গলায় হরিনামের মালা পরিয়া ও চক্ষু মুদিয়া যাঁহারা শত শত লোককে আকর্ষণ করিতেন, গৌর-

গোবিন্দের আড়ম্বর-বিহীন সরল আচার এবং ব্যবহার, অপার জ্ঞান বিশ্বাস তাঁহাদের চক্ষে ধূলি দিতে পারে নাই। কিন্তু সারবোদ্ধা, পণ্ডিতমণ্ডলী, সারগ্রাহীগণ চিরদিন তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিবেন। তিনি প্রচ্ছন্ন সক্রেটিস, তিনি নববিধানের জীব গোস্বামী, দার্শনিক ও শাস্ত্রার্থ বোদ্ধা। ভাষা একটু কঠোর বলিয়া লোকে তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু আমরা যখন তাঁহার উপদেশ শুনিয়াছি, তখন মনে হইত, ইহা এক একটী প্রত্নতত্ত্বোদ্ধার, ভক্তি ও বিজ্ঞানের ইতিহাস। এমন জ্ঞানী ঊনবিংশ শতাব্দীতে অতি অল্প দেখিয়াছি। তিনি সংস্কৃত বেদান্ত, গীতা, উপনিষদের ভাষ্যকার, আবার মিল-কমটী, স্পেন্সার হাক্সলী, এ সকলের গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তাঁহার সহিত যখনই আলাপ করিয়াছি, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। প্রায় চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল। তাহার পর তিনি নারীমুখ দেখেন নাই। এমন পবিত্র জীবন সংসারে অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও বিশ্বাস অনুকরণীয়। স্বার্থ বলিয়া কোন পদার্থ সে জীবনে ছিল না। অনেকেই আত্মপ্রচার করিয়া থাকেন, আপনার সুখ সুবিধা অনেক জীবনেরই লক্ষ্য। অনেকে গুরুগিরি ও আত্মসেবার জন্য লালায়িত। গৌরগোবিন্দ কোনরূপ লোকসেবা গ্রহণের বিরোধী। তাঁহার কথা কেহ যেন না চিন্তা করে, কেহ যেন তাঁহার শুশ্রূষা না করে, এই আত্মত্যাগ জীবনের দৃঢ়ব্রত ছিল।

দ্বিসপ্ততি বর্ষে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, অর্দ্ধশতাব্দী তিনি দেশসেবায় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার এই অর্দ্ধ শতাব্দীর অক্লান্ত পরিশ্রম, অক্লান্ত দেশ-সেবায় তাঁহার শেষ জীবনের প্রায় এক বৎসর অকর্ম্মণ্য করিয়াছিল, এমন কি, তাঁহার প্রিয় সমাজেও উৎসবাদিতে তিনি যোগ দিতে পারেন নাই। অবশেষে বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় তিনি দয়াময়ের পবিত্র আহ্বানে সংসার হইতে চলিয়া গেলেন। যদি অক্লান্ত দেশ-সেবার পুরস্কার থাকে, যদি ধর্ম্ম পুণ্য পবিত্রতার আদর থাকে, যদি মহত্ত্ব আদৃত হয়, যদি বিশ্বাসের জয় হয়, তবে এই পরম সাধু গৌরগোবিন্দ একদিন দেশে ভক্তি ও আদর পাইয়া ধন্য হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২রা মার্চ্চ (১৯১২) ৩নং রমানাথ মজুমদারের লেন হইতে তাঁহার পবিত্র দেহ ভক্তগণের ভক্তি-পুষ্পের সহিত নানাবিধ সুগন্ধ কুসুমে ভূষিত হইয়া শত ব্যক্তির অশ্রুজলের সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। জগতের কর্ত্তব্য তাঁহার শেষ হইয়াছে। বঙ্গবাসী অশ্রুজলে ভাসিয়া তাঁহার দেহ ভস্মে পরিণত করিয়া গঙ্গাবক্ষে সেই ভস্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছেন।

দয়াময় তাহার অক্লান্ত সেবক ও বিশ্বাসী বীর-ভক্তকে তাঁহার পবিত্র দয়াতে অপার শান্তিসুখে জ্ঞান ও যোগ সাধনে নিয়োজিত করুন। তাঁহার পবিত্র নাম ধন্য হউক। এবং যাঁহারা তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিল, তাঁহারা কৃতার্থ হউক।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

অর্থ শাস্ত্র।

২য় অধ্যায়।

বিবাহ।

বিবাহ সকল প্রকার আচারের অগ্র-বর্ত্তী। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ, এই কয় প্রকার বিবাহ প্রচলিত। এই কয় প্রকার বিবাহ মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকারের বিবাহ প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে এবং কন্যার পিতা সম্মত হইলেই এই সকল বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্য প্রকারের বিবাহে পিতা মাতা উভয়েরই অনুমোদন আবশ্যক। কেন না, জামাতা তাহাদের কন্যাকে যে শুল্ক প্রদান করে, পিতা মাতাই এই শুল্কের অধিকারী। পিতা কিম্বা মাতার অনুপস্থিতে কিম্বা একের মৃত্যু হইলে অন্যজনে এই শুল্ক গ্রহণ করিবে। যদি পিতা মাতা উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে কন্যা নিজেই এই শুল্ক গ্রহণ করিবে। যাহারা বিবাহে সংসৃষ্ট, তাহারা সন্তুষ্ট হইলেই সকল প্রকার বিবাহই সিদ্ধ বলিয়া পরি-গণিত হইবে।

বৃত্তি এবং আবদ্ধই স্ত্রীলোকের স্ত্রীধন। দুই সহস্রাধিক বৃত্তি হইলে উহা স্ত্রীর নামে স্থাপন করিতে হইবে। আবদ্ধ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। প্রবাসী স্বামী ভরণ-পোষণের জন্য কোন ব্যবস্থা না করিয়া থাকিলে এই স্ত্রীধন দ্বারা নিজ পুত্র, পুত্রবধূ বা নিজের ভরণপোষণ করিলে উহা দূষণীয় বলিয়া বিবে-চিত হইবে না। বিপদে, ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, দুর্ভিক্ষ সময়ে, বিপদ প্রতিকারে এবং ধর্ম্ম-কার্য্যে স্বামীও স্ত্রীধন ব্যবহার করিতে পারেন। যে দম্পতির যুগল সন্তান হইয়াছে, তাহাদের পরস্পর সম্মতিতে স্ত্রীধন ব্যবহার বা যে দম্পতি প্রথমোক্ত চারি প্রকারের বিবাহানুযায়ী আচরণ সহ বিবাহিত হইয়াছে, তাহাদের কর্ত্তৃক স্ত্রীধন তিন বৎসর ব্যবহার করিলেও কোন অপরাধ হইবে না। কিন্তু গান্ধর্ব্ব বা আসুরিক প্রথায় বিবাহিত দম্পতি উহা ব্যবহার করিলে সুদ সহ পরিশোধ করিতে হইবে। রাক্ষস ও পৈশাচিক প্রথায় বিবাহিত দম্পতি পক্ষে ইহা ব্যবহার করিলে এ কার্য্য চৌর্য্যের সমান পরিগণিত হইবে। স্বামীর মৃত্যুর পরে ধর্ম্ম-কামা স্ত্রী তাহার বৃত্তি, আবদ্ধ এবং বাকী শুল্কও পাইবে। যদি বৃত্তি ও আবদ্ধ তাহার নিজ অধিকারে না থাকে, তবে সুদ সহ তদ্দণ্ডে তাহাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। যদি সে দ্বিতীয় বার বিবাহে অভিলাষিণী হয়, তবে তাহার শ্বশুর বা স্বামী তাহাকে যাহা দান করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে তাহাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোক কোন্ সময়ে পুনর্বিবাহ করিতে পারে, তাহা "স্বামীর প্রবাস" কালে বর্ণিত হইবে।

শ্বশুরের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ব্যতীত যদি অন্য পুরুষকে স্ত্রীলোক বিবাহ করে, তবে সেই স্ত্রীলোক শ্বশুর বা স্বামী-দত্ত ধনের অধিকা-রিণী হইবেন। স্ত্রীলোক জ্ঞাতির নিকট যে ধন গচ্ছিত করে, তাহা তাহাকে প্রত্যর্পণ

করিতে হইবে। যিনি কোন স্ত্রীলোককে আশ্রয় দান করেন, তিনি তাহার স্ত্রীধনও রক্ষা করিবেন। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন স্বত্ব থাকিবে না।

যদি স্ত্রীলোক ধর্ম্মপরায়ণা হয়,—তবে সে স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে। পুত্রবতী স্ত্রীলোক নিজ স্ত্রীধন বিতরণ করিতে পারিবে না। কেন না, তাহার সম্পত্তি তাহার পুত্র বা পুত্রগণ পাইবে। যদি কোন স্ত্রীলোক নিজ পুত্রের ভরণপোষণের জন্য নিজ সম্পত্তি স্বীয় অধিকারে আনয়নের চেষ্টা করে, তবে ঐ সম্পত্তি পুত্রগণের উপর সংস্থান করিতে হইবে। যদি কোন স্ত্রীলোকের অধিক পুত্রসন্তান থাকে, তবে স্বামীর সম্পত্তি যে অবস্থায় তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অবস্থায় রাখিবার জন্য যত্ন করিবে। যে সম্পত্তিতে তাহার সম্পূর্ণ ভোগের ও বিতরণের ক্ষমতা আছে, তাহাও তাহার পুত্রগণের উপর সংস্থান করিতে হইবে।

বন্ধ্যা স্ত্রীলোক সতী হইলে নিজ গুরুর অধীনে জীবনান্ত পর্য্যন্ত স্ত্রীধন ভোগ করিতে পারিবে। কেননা বিপদ প্রতিকারের জন্য স্ত্রীলোককে সম্পত্তি দান করা হয়। স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি তাহার আত্মীয়গণ পাইবেন। যদি স্বামী জীবিত থাকেন, এবং স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্ত্রীধন পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে বিভাগ হইবে। যদি পুত্র না থাকে, তবে কেবল কন্যাগণই পাইবে। যদি পুত্র কন্যা না থাকে, তবে স্বামীই পাইবেন, অথবা স্বামী যে শুল্ক প্রদান করিয়াছিলেন, কেবল মাত্র তাহাই গ্রহণ করিবেন এবং স্ত্রীর আত্মীয় বন্ধুগণ যে সকল উপহার মৃতাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ লইবেন।

যদি কোন স্ত্রীলোক মৃতবৎসা হয়, অথবা পুত্র উৎপাদনে অক্ষমা হয়, অথবা বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে তাহার স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহণের পূর্ব্বে আট বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি পত্নী কেবল কন্যা প্রসব করে, তবে স্বামীকে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। তৎপর, যদি তিনি পুত্র কামনা করেন, তবেই বিবাহ করিতে পারেন। যদি স্বামী এ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তবে পত্নীকে শুল্ক, স্ত্রীধন, এবং উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ ব্যতীত রাজাকেও তাঁহার চব্বিশ পণ দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। যে সকল স্ত্রী বিবাহের শুল্ক বা স্ত্রীধন পায় নাই, তাহাদেরও শুল্ক ও স্ত্রীধন দিয়া এবং স্ত্রীদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও বৃত্তিদান করিয়া পরে স্বামী ইচ্ছানুসারে যত গুলি ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন, কেননা পুত্রার্থেই স্ত্রীর প্রয়োজন। যদি স্বামীর অনেকগুলি পত্নী বা সকল পত্নীই এক সময়ে সন্তান-ধর্ম্মা হইয়া থাকেন, তবে যাহাকে সর্ব্বাগ্রে বিবাহ করা হইয়াছে, অথবা যে পুত্রবতী, তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি স্বামী ঋতুকালে, স্ত্রীর ধর্ম্ম রক্ষা না করেন, তবে তাহাকে ৯৬ পণ অর্থ দণ্ড দিতে হইবে। পুত্রবতী, ধার্ম্মিকা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, এবং যাহারা সন্তানবতী হইবার বয়স অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের অনভিমতে তাহাদের সহিত সহবাস নিষিদ্ধ। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা বা উন্মত্তা স্ত্রীর সহিত স্বামীর একত্র বাস করা না করা, ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। পুত্রার্থে স্ত্রী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বা উন্মত্ত স্বামীর সহবাস করিতে পারেন।

যদি স্বামী কুচরিত্র, বিদেশবাসী, রাজদ্রোহী অথবা স্ত্রীর প্রাণহানিজনক কার্য্য

করিতে পারে,—এরূপ সম্ভাবনা থাকে, অথবা জাতিচ্যুত বা ক্লীব হয়, তবে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে।

স্ত্রীলোক দ্বাদশ বর্ষে প্রাপ্তবয়স্কা (প্রাপ্ত ব্যবহারা) হয়। যদি প্রাপ্তবয়স্কা হইলে স্ত্রীলোক আদেশ প্রতিপালন না করে, তবে তাহার পঞ্চ দশ পণ অর্থ দণ্ড হইবে। যে স্ত্রীলোকের অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গ্রাসাচ্ছাদন প্রার্থনা করিবার দাবী আছে, তাহাকে পোষণ-কর্ত্তার আয়ের আবশ্যকীয় বা অতিরিক্ত বস্ত্র ও আহার্য্য প্রদান করিতে হইবে। যদি স্বামী সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী শ্বশুর কুলের কাহারও সহিত বসবাস করে, বা স্ত্রী স্বাধীনা হইয়া জীবন যাপন করে, তবে স্বামী স্ত্রার ভরণপোষণের জন্য দায়ী হইবেন না।

অবাধ্য স্ত্রীলোককে বিনয় শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে নিম্নলিখিত ভাবে আহ্বান করিতে হইবে, যথা "নগ্না, বিলগ্না, খঞ্জা, পিতৃ-মাতৃ-হীনা ইত্যাদি ইত্যাদি।" অথবা বেণু দল বা রর্জ্জু বা হস্তের তালুদ্বারা তাহার পৃষ্ঠ দেশে তিন বার আঘাত করিতে হইবে। যে স্ত্রী ঈর্ষা বা ঘৃণা বশতঃ স্বামীর প্রতি ক্রূর আচরণ করে, তাহাকেও এই প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। স্বামীর গৃহের দ্বারদেশে বা বহির্ভাগে বিহার করিলে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

ভর্ত্তা স্ত্রীকে ঘৃণা করিলে, তিনি তাহাকে ভিক্ষুণীর সহিত বা তাহার প্রতিপালক বা জ্ঞাতির সহিত বাস করিতে অনুমতি দিবেন। যদি কোন পুরুষ মিথ্যা পূর্ব্বক স্ত্রীকে তাহার বা নিজ আত্মীয়ের সহিত অথবা গুপ্তচরের সহিত ব্যভিচার দোষে দূষিত করে (কেবল মাত্র স্বচক্ষে দুই ব্যক্তিগণের দ্বারাই এই অপরাধ প্রমাণিত হইবে) অথবা স্বামীর সঙ্গ পরিহারে অনিচ্ছুক, এইরূপ মিথ্যাপবাদ আনয়ন করে, তাহা হইলে স্বামীর দ্বাদশ পণ অর্থ দণ্ড হইবে। স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করিলেও স্বামীর অনিচ্ছা থাকিলেও বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে না। কিন্তু পরস্পরের দ্বেষ হইলে বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে। যদি কোন স্বামী স্ত্রীর হস্তে বিপদ আশঙ্কা করিয়া বিবাহ ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করে, তবে স্বামী স্ত্রীর বিবাহ কালীন সকল দ্রব্য স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করিবেন। যদি স্ত্রী স্বামীর নিকট বিপদাশঙ্কা করিয়া বিবাহ ভগ্ন করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার সম্পত্তিতে তাহার কোন দাবী থাকিবে না। প্রথম প্রকারের বিবাহ চতুষ্টয় কিছুতেই ভগ্ন হইতে পারে না। পতির নিষেধ সত্ত্বেও যদি স্ত্রী দর্প ক্রীড়ায় বা মদ্যপানে আসক্তি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহার তিনপণ অর্থদণ্ড হইবে। দিবাভাগে ক্রীড়া বা বিহারে গমন করিলে ৬ পণ অর্থদণ্ড হইবে। ঐ সকল অপরাধ রাত্রিকালে সংঘটিত হইলে দ্বাদশপণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি কোন স্ত্রী রাত্রিকালে নিজ গৃহ হইতে নিষ্কাষিতা হয়, তবে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি অন্য পুরুষ বা বিহার দর্শনে গমন করে, তবে দ্বাদশপণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি কোন স্ত্রী-লোক নিদ্রিতা বা মত্ততাবস্থায় অন্য স্ত্রীলোক-কে হরণ করে, অথবা স্বামীকে গৃহের দ্বার-দেশ পর্য্যন্ত টানিয়া লয়, তবে তাহার দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রী কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কোন প্রকার ইসারা করে বা গোপনে আলাপ করে, তবে স্ত্রীর ২৪ পণ এবং পুরু-ষের ৪৮ পণ দণ্ড হইবে।

কোন স্ত্রীলোক চুল বিস্তৃত করিয়া রাখিলে, পরিধান-বস্ত্র কটি, দন্ত বা নখে জড়াইয়া রাখিলে, প্রথম প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিতা হইবে, এবং পুরুষ ঐ প্রকার আচরণ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। শঙ্কিত স্থানে (গোপনীয়) স্থানে বাক্যালাপ করিলে দণ্ডের পরিবর্ত্তে বেত্রাঘাত করিতে হইবে। গ্রামের মধ্যস্থলে চণ্ডাল এইপ্রকার স্ত্রীলোককে পাঁচবার করিয়া বেত্রাঘাত করিবে। প্রত্যেক আঘাতের পরিবর্ত্তে এক এক পণ অর্থ প্রদান করিলে বেত্রাঘাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

স্ত্রী ও পুরুষ নিষেধ সত্ত্বেও যদি উভয়ে উভয়কে সাহায্য করে, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যদ্বারা সাহায্য করিলে স্ত্রীলোকের দ্বাদশ পণ, স্থূল দ্রব্য হইলে ২৪ পণ এবং হিরণ্য বা মুদ্রাদি হইলে ৫৪ পণ অর্থদণ্ড হইবে। পুরুষের এ দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্রে মিশিতে পারেন, তাহারা ঐরূপ দোষে দূষিত হইলে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। পুরুষে এই প্রকার নিষিদ্ধ আচরণ করিলে তাহাদেরও এই প্রকার অর্থদণ্ড হইবে।

রাজদ্রোহিতা, অতিচার এবং ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণ করিলে স্ত্রীলোক স্ত্রীধন ব্যতীত শুল্ক (স্বামীর পুনর্ব্বিবাহে সম্পত্তি প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত) এবং শুল্ক (স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর পিতামাতাকে দত্ত) সকল হইতেই বঞ্চিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিপদ ব্যতীত অন্য কোন হেতুতে যদি স্ত্রী স্বামীর গৃহ হইতে বহির্গতা হয়, তবে তাহার ছয়পণ দণ্ড হইবে। যদি স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও বহির্গতা হয়, তবে দ্বাদশপণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি প্রতিবেশীর গৃহ হইতে অধিক দূরে যায়, তবে ছয়পণ দণ্ড হইবে। যদি সে প্রতিবেশীকে গৃহে আসিতে অনুমতি দেয়, বা ভিক্ষুকের পণ্য বা বৈদেহিকের পণ্য গৃহে আনয়ন করে, তবে দ্বাদশপণ অর্থদণ্ড হইবে। নিষেধ সত্ত্বেও যদি উপরোক্ত অপরাধ করে, তবে প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। যদি চতুষ্পার্শ্বের গৃহাদির বাহিরে গমন করে, তবে ২৪ পণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি বিপদ্হেতু ব্যতীত অন্য কোন কারণে গৃহে অপরের স্ত্রীকে আশ্রয় দান করে, তবে ১০০ পণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি তাহার বিনানুমতিতে বা তাহার আদেশ অমান্য করিয়া প্রবেশ করে, তবে সে দূষণীয় হইবে না। কৌটিল্যের আচার্য্য বলেন যে, বিপদ প্রতিরোধার্থ স্বামীর বা আত্মীয়ের নিকট গমন বা ধনী-ব্যক্তি বা গ্রামের দলপতি বা তাহার নিজের রক্ষক বা ভিক্ষুণী বা নিজের জ্ঞাতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহা দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কৌটিল্য এতদুত্তরে বলেন যে, সাধ্বী স্ত্রী কি করিয়া জানিবেন যে, তাঁহার জ্ঞাতিকুলের সকল পুরুষই সচ্চরিত্র। প্রেত, ব্যাধি, ব্যসন ও গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের আত্মীয়ের আশ্রয় দূষণীয় নহে। এই সকল ক্ষেত্রে যে তাহাকে বাধা দিবে, তাহার দ্বাদশপণ অর্থদণ্ড হইবে। এই অবস্থায় যদি কোন স্ত্রীলোক লুক্কায়িত থাকে, তবে তাহার স্ত্রীধনে দাবী থাকিবে না। যদি তাহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে গোপনে রাখে, তবে তাহারা শুল্কের অবশিষ্টাংশ হইতে বঞ্চিত হইবে।

যদি স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী অন্যগ্রামে গমন করে, তবে তাহার দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে এবং তদ্ব্যতীত সে স্ত্রীধনে ও আভরণে বঞ্চিত হইবে। যদি গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ বা তীর্থ গমন ব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায়

স্ত্রী অন্যত্র গমন করে, এরূপ ক্ষেত্রে ধার্ম্মিক লোকের সহিত গমন করিলেও, তাহার ২৪ পণ অর্থদণ্ড হইবে ও তাহার ধর্ম্মলোপ পাইবে। যে পুরুষ এই প্রকার স্ত্রীকে তাহার সহগামিনী হইতে অনুমতি দেয়, সেই পুরুষের প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। যদি উভয়েরই এক প্রকার আদর্শ হয়, তবে উভয়েই মধ্যম প্রকারের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। যদি স্ত্রীলোক তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত ভ্রমণ করে, তবে এরূপ ক্ষেত্রে আত্মীয়ের কোন শাস্তি হইবে না। নিষেধ সত্ত্বেও যদি কোন আত্মীয় কোন স্ত্রীলোককে নিজের সহগামিনী হইতে দেন, তবে তাঁহার অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। যদি রাজপথে বা বনমধ্যে অথবা গূঢ়দেশে কোন পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের দর্শন ঘটে বা স্ত্রীলোক নিষিদ্ধ ব্যক্তির সহগামিনী হয়, তবে উহাকে সংগৃহণ বলে। অভিনেতা, চারণ, মৎস্যজীবী, লুব্ধক, গোপালক, শৌণ্ডিক এবং যাহাদের সহিত স্ত্রীলোক থাকে, তাহাদের সহিত ভ্রমণ দূষণীয় নহে। যদি নিষেধ সত্ত্বেও কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে সঙ্গে লয়েন বা যদি কোন স্ত্রী নিষেধ সত্ত্বেও কোন পুরুষের সহগামিনী হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ জাতি-ভুক্তা যে সকল স্ত্রী সন্তান প্রসব করে নাই, তাহারা প্রবাসী স্বামীর জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিবে। কিন্তু যাহারা সন্তানবতী, তাহারা এক বৎসরের অধিক কাল স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিবে। যদি তাহাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তবে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কাল অপেক্ষা করিবে। যদি ঐ ব্যবস্থা না করা হইয়া থাকে, তবে তাহাদের ধনী জ্ঞাতিবর্গ তাহাদিগকে ৪ বা ৮ বৎসরের জন্য প্রতিপালন করিবে। তৎপর বিবাহের সময় যাহা দান করা হইয়াছিল, তাহা পুনর্গ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণ তাহাদের বিবাহে অনুমতি দিবে। যদি ব্রাহ্মণ স্বামী বিদ্যার্থী হইয়া বিদেশে বাস করেন, তবে অপুত্রবতী স্ত্রী দশ বৎসর অপেক্ষা করিবে; এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী গর্ভবতী হইলে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবে। যদি স্বামী ক্ষাত্রিয় হন, তবে স্বামীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। কিন্তু বংশ নাশ ভয়ে স্ত্রী, সবর্ণে বিবাহ করিয়া পুত্রবতী হইলে, সে ঘৃণাস্পদ হইবে না। যদি প্রোষিত ভর্ত্তৃকার ভরণ পোষণের অভাব হয় এবং ধনী জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে পরিত্যাগ করে, স্ত্রী তাহার ইচ্ছানুসারে পুনর্ব্বার যে তাহাকে প্রতিপালন করিতে পারে, এরূপ লোককে বিবাহ করিতে পারে।

প্রথমোক্ত চারি প্রকারে বিবাহিতা কুমারাদের মধ্যে যাহার স্বামী বিদেশে বাস করিতেছেন এবং যে স্বামীর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ স্ত্রী যদি স্বামীর নাম সাধারণে প্রকাশ না করিয়া থাকে, তবে সাত মাস অপেক্ষা করিবে। যদি নাম প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে এক বৎসর অপেক্ষা করিবে। প্রবাসী স্বামীর সংবাদ যদি অবগত না হওয়া যায়, তবে সাত মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি স্বামী প্রবাসী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার কোন সংবাদ না পাওয়া গিয়া থাকে, এবং স্ত্রী যদি শুল্কের অংশ বিশেষ মাত্র পাইয়া থাকেন, তবে স্ত্রী তিন মাস মাত্র অপেক্ষা করিবেন, কিন্তু স্বামীর সংবাদ পাইয়া থাকিলে সাত মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। যে স্ত্রী সম্পূর্ণ শুল্ক প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বামীর সংবাদ না পাইলে তিনি পাঁচ মাস

অপেক্ষা করিবেন, কিন্তু সংবাদ পাইলে দশ মাস অপেক্ষা করিবেন। পরে, বিচারকগণের অনুমতি লইয়া ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারেন, কেননা কৌটিল্য বলেন "ঋতুবতী স্ত্রীর ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে ধর্ম্ম বধ হয়।"

যে সকল স্বামী অনেক দিন প্রবাসী বা যাঁহারা মৃত, তাঁহাদের অপুত্রবতী স্ত্রীগণ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারেন। যদি মৃত স্বামীর অনেকগুলি ভ্রাতা থাকে, তবে স্ত্রী মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর অথবা যে ভ্রাতা ধার্ম্মিক ও তাহাকে প্রতিপালনে সক্ষম হইবেন, অথবা যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও অবিবাহিত, তাহাকে বিবাহ করিবেন। যদি মৃত স্বামীর ভ্রাতা না থাকে, তাহা হইলে স্বামীর আত্মীয়গণের সগোত্রে বিবাহ করিবেন। কিন্তু যদি উপযুক্ত অনেক গুলি ব্যক্তি থাকেন, তবে মৃত স্বামীর নিকট আত্মীয়কে বিবাহ করিবেন।

যদি কোন স্ত্রীলোক উপরিউক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী এবং যে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, যাহারা কন্যাকে দান করিয়াছে এবং যাহারা ইহাতে সম্মতি দান করিয়াছে, তাহারা সকলেই দণ্ডনীয় হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

পিতা, মাতা ও পূর্ব্বপুরুষ জীবিত থাকিলে পুত্রে সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে না। তাহাদের মৃত্যুর পরে পৈতৃক সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যে সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তির সাহায্যে উপার্জ্জিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত সোপার্জ্জিত সম্পত্তি বিভক্ত হইবে না। অবিচ্ছিন্ন পৈতৃক সম্পত্তির সাহায্যে যে সম্পত্তি অর্জ্জিত হইয়াছে, ৪ পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্র ও পৌত্রের তাহাতে নির্দ্ধারিত অংশ থাকিবে। কেননা ৪ পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ড অবিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু প্রথম পুরুষ হইতে যাহাদের পিণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাদের সম পরিমাণ বিভাগ হইবে। যাহারা একত্র বাস করিতেছে, তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি পূর্ব্বে বিভক্ত হইলেও তাহারা পুনর্ব্বার উহা বিভাগ করিয়া লইবে। যে পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির উন্নতি সাধন করিবে, সে লাভের অংশ পাইবে।

যদি কোন ব্যক্তি অপুত্রক হয়, তবে তাহার ভ্রাতা বা আত্মীয় যাঁহারা একত্র বাস করিত, তাহারাই উহার দ্রব্যাদি অধিকার করিবে; এরূপ ব্যক্তির কন্যাগণ রিক্থের অধিকারিণী হইবে। যাহার পুত্র আছে, তাহার সম্পত্তি পুত্রেই পাইবে। প্রথমোক্ত ৪ প্রকারের বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা থাকিলে ঐ কন্যাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে। যদি এই প্রকারের পুত্র বা কন্যা না থাকে, এবং মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত না থাকেন, তবে মৃত ব্যক্তির ভ্রাতাগণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সম্পত্তি পাইবেন; পিতৃহীন অনেক ভ্রাতা থাকিলে ইহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবেন এবং এই সকল ভ্রাতার প্রত্যেক পুত্রেই অংশীদার হইবে। যদি ভ্রাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন পিতার পুত্র হয়, তবে তাহার পিতা হইতে গণনা করিয়া অংশানুযায়ী সম্পত্তি ভাগ করিবে।

পিতা নিজ জীবনকালে সম্পত্তি বিভাগ করিলে পুত্রদিগের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ করিবেন না। বিশেষ কারণ না হইলে পিতা কোন পুত্রকে অংশচ্যুত করিবেন না। কনিষ্ঠগণ অসচ্চরিত্র না হইলে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।

উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে সম্পত্তি বিভাগ করিতে হইবে। যদি তৎপূর্ব্বে হয়, তবে নাবালকগণ ঋণশূন্যাবস্থায় তাহাদের অংশ পাইবে। নাবালকদের অংশ তাহাদের মাতার বন্ধুগণের হস্তে অথবা গ্রামস্থ বৃদ্ধের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। যাহারা প্রবাসী, তাহাদের পক্ষেও এই নিয়ম বর্ত্তিবে। অবিবাহিত ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের বিবাহের ব্যয়ের তুল্য ব্যয় পাইবে। অবিবাহিতা কন্যাও বিবাহ কালে যৌতুক পাইবে।

দেনা পাওনা সমভাবে বিভক্ত করিতে হইবে। গুরুদেব বলেন যে, দরিদ্রগণ মৃৎপাত্রও সমান ভাবে বিভক্ত করিবে। কৌটীল্য বলেন যে, উহা অনাবশ্যক। কেন না, যাহা থাকিবে, তাহারই বিভাগ করিতে হইবে। যাহা নাই, তাহা বিভাগের প্রয়োজন কি? সাক্ষিগণের সম্মুখে সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করিয়া উহা বিভক্ত করিতে হইবে। যাহা অন্যায় রূপে বা প্রতারণা পূর্ব্বক বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার ভাগ করিতে হইবে।

যে সম্পত্তির কোন দাবিদার নাই, রাজা ঐ সম্পত্তি পাইবেন। কিন্তু মৃতা স্ত্রীলোকের সম্পত্তি, যে মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই এবং কৃপণের সম্পত্তি (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্যতীত) ত্রিবেদজ্ঞ ব্যক্তিকে দান করিতে হইবে।

পতিত, পতিত জাত এবং ক্লীবে কোনরূপ অংশাধিকারী হইবে না। মূর্খ, উন্মত্ত, খঞ্জ, এবং কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তিও কোনরূপ অংশ পাইবে না। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির যদি স্ত্রী থাকে, বা অপত্য থাকে, তবে তাহারা সম্পত্তির অধিকারী হইবে। পতিত ব্যতীত এই সকল ব্যক্তি মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী। পতিত হইবার পূর্ব্বে যদি এই সকল ব্যক্তি বিবাহ করিয়া থাকে, এবং যদি বংশ নাশের সম্ভাবনা দেখা যায়, তবে তাহাদের বন্ধুগণ তাহাদের জন্য পুত্রোৎপাদন এবং এ সকল পুত্রকে অংশ দিতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একই স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র অজের অধিকারী হইবে; ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অশ্বের, বৈশ্যে গাভী ও শূদ্রের মেষের অধিকারী হইবে। মধ্যম পুত্রগণ অন্য জন্তুগুলি পাইবে। বিভিন্ন বর্ণের জন্তুগুলি কনিষ্ঠে পাইবে। চতুষ্পদ জন্তুর অভাবে জ্যেষ্ঠ মূল্যবান রত্নাদি ব্যতীত অপর সম্পত্তির অন্যাপেক্ষা দশাংশ অধিক পাইবে, কিন্তু এই জন্য তিনিই পিতৃপুরুষদিগের প্রতি কর্ম্ম তিনিই সম্পন্ন করিবেন।

পিতার মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ তাঁহার শকট ও আভরণ পাইবেন। তাঁহার শয্যা, আসন এবং ভোজনার্থ ব্যবহৃত কংস পাত্র মধ্যমপুত্র পাইবেন। কৃষ্ণধন্য, লৌহ, গৃহের আসবাব, গো, গোশকট কনিষ্ঠে পাইবেন। অন্যান্য সম্পত্তি সম পরিমাণে বিভক্ত হইবে। ভাগনীগণ সম্পত্তিতে কোন দাবী করিতে পারিবেন না। তাহারা তাহাদের মৃত্যুর পর তাঁহার কাংস্যপাত্র ও আভরণে অধিকারিণী হইবেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ক্লীব হইলে মাত্র এক তৃতীয়াংশ পাইবে। যদি জ্যেষ্ঠপুত্র অন্য বৃত্তি অবলম্বন করে, অথবা ধর্ম্ম-কার্য্যে-ব্রতী না হয়, তবে সে এক চতুর্থাংশের অধিকারী হইবে। কামাচারী হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র পৈতৃক কোন ধনেরই অধিকারী হইবে না। উপরোক্ত নিয়ম মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রেও বর্ত্তিবে।

এই দুইজনের মধ্যে মনুষ্যত্ব-বিশিষ্টই জ্যেষ্ঠের অর্দ্ধাংশ পাইবে। পুত্র-বিশিষ্টা দুই স্ত্রীর মধ্যে যদি এক স্ত্রী সংস্কৃতা হন, অথবা যদি উভয় স্ত্রীই কন্যাকালে সংস্কৃতা না হইয়া থাকেন, অথবা যদি একজন যুগ্মপুত্র প্রসব করিয়া থাকেন, তবে জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারিত হইবে। সূত, মাগধ, ব্রাত্য এবং রথকার, এই প্রকার পুত্রের অংশ পিতার সম্পত্তির প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করিবে। অনীশ্বর পুত্রগণ সমান অংশ পাইবে।

ব্রাহ্মণের ঔরসে চতুর্ব্বর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র ৪ অংশ, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ৩ অংশ, বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র ২ অংশ এবং শূদ্রাণীর গর্ভজাত-পুত্র ১ অংশ পাইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঔরস-জাত পুত্রেও ঐ নিয়ম বর্ত্তিবে।

ব্রাহ্মণের অনন্তর পুত্র, যদি মনুষ্যোচিত গুণাবলী ভূষিত হয়, তবে তুল্যাংশের অধিকারী হইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেও এই নিয়ম বর্ত্তিবে। বিভিন্নজাতীয় দুই মাতার একপুত্র হইলে ঐ পুত্র পিতার সকল সম্পত্তি অধিকার করিবে এবং পিতার আত্মীয়গণকে প্রতিপালন করিবে। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রের গর্ভজাত পুত্র এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিবে; ব্রাহ্মণের সপিণ্ড বা সকুল্য অন্য দুই অংশ গ্রহণ করিবেন এবং পিণ্ডদান করিবেন। অভাবে মৃতের শিক্ষক বা ছাত্র, এই দুই অংশ গ্রহণ করিবে। অথবা এই স্ত্রীর গর্ভে সগোত্রীয় ব্যক্তি অথবা মাতৃবন্ধু ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করিবেন। এই ক্ষেত্রজ সন্তানই দুই অংশ গ্রহণ করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ বলেন যে, অন্যের ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে ক্ষেত্রাধিকারীই বীজের অধিকারী হইয়া থাকেন। অপরপক্ষ বলেন যে, গর্ভধারিণী বীজের আধারমাত্র, সুতরাং জনকই পুত্রের অধিকারী। কৌটীল্য বলেন যে, পিতামাতা জীবিত থাকিলে উভয়েই সন্তানের অধিকারী।

বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদিত হইলে সেই পুত্রকে ঔরসজাত সন্তান বলে। পুত্রিকা পুত্র এই পুত্রের তুল্য। স্বামীর সগোত্র বা ভিন্ন গোত্রীয় ব্যক্তি স্বামী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষেত্রজ বলে। জনকের মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রজ পুত্র উভয় পিতারই পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে, উভয় পিতারই গোত্রাধিকারী হইয়া উভয়কেই পিণ্ডদান করিবে এবং উভয়েরই রিক্থের অধিকারী হইবে। বন্ধুগৃহে জাত গূঢ়পুত্রও ক্ষেত্রজপুত্রের পদ পাইবে। জনক জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র অপবিদ্ধ নামে কথিত হইবে। এবং যে ব্যক্তি তাহার সংস্কার কার্য্য করাইবে, সেই ঐ পুত্রের অধিকারী হইবে। কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলে। গর্ভাবস্থায় যে নারীর বিবাহ হইয়াছে, সেই নারীর গর্ভজাত সন্তানকে 'সহোঢ' এবং দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভেজাত-সন্তানকে পৌনর্ভব বলে।

জারজপুত্র, পিতা ও পিতৃবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারে, কিন্তু অপরের পুত্র হইলে কেবলমাত্র গৃহীতার সহিতই ঘনিষ্ঠতা হইবে। পিতা মাতা কর্ত্তৃক দত্তপুত্রও এই শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবে। পুত্র স্বেচ্ছায় বা বন্ধুগণের উপদেশানুযায়ী যদি অপরের পুত্র হইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে উপগত পুত্র বলে। যাহাকে পুত্ররূপে নিয়োগ করা যায়, তাহাকে কৃতক পুত্র এবং যাহাকে ক্রয় করা যায়, তাহাকে ক্রীত পুত্র বলে।

সর্ব্বজারজ পুত্র এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হইবে। অসবর্ণ হইলে কেবল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে, তদপেক্ষা এক শ্রেণী নিম্নস্থ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সবর্ণ কথিত হইয়া থাকে, ছুইশ্রেণী নিম্ন হইলে তাহাকে অসবর্ণ বলে। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যানীর গর্ভজাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ বলে। শূদ্রাণীর গর্ভে হইলে নিষাদ বা পার্ষব বলে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রণীর গর্ভজাত সন্তানকে উগ্র এবং বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত সন্তানকে শূদ্র বলে। অসচ্চরিত্র ব্যক্তির ঔরসজাত এবং তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ব্রাত্য নামে কথিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত পুত্রগণ অনুলোম নামে খ্যাত হয়। শূদ্রের ঔরসে উচ্চশ্রেণীর গর্ভজাত সন্তানকে অয়োগব, খাত এবং চণ্ডাল বলে। বৈশ্যের ঔরসে হইলে মাগধ এবং বৈদেহক বলে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত পুত্র সুত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাণোক্ত সুত ও মাগধ নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং উহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উপরোক্ত প্রকারের পুত্রকে প্রতিলোম বলে। রাজগণ স্বধর্ম্ম ভগ্ন করিলেই এইপ্রকার পুত্র জন্মে।

উগ্রের ঔরসে নিষাদের গর্ভজাত সন্তান কুটুক নামে অভিহিত হয়, এবং নিষাদের ঔরসে উগ্রের গর্ভজাত সন্তানকে পুক্কস বলে। অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈদেহকের গর্ভজাত সন্তানকে বৈণ এবং বৈদেহকের ঔরসে অম্বষ্ঠের গর্ভজাত পুত্রকে কুশীলব বলে। উগ্রের ঔরসে ক্ষত্তের গর্ভজাত পুত্রকে শ্বাপক বলে।

বৈশ্য রথকারের ব্যবসা করিবে এবং সবর্ণে বিবাহ করিবে। লোকাচার এবং ব্যবসায়ে তাহারা পূর্ব্ব পুরুষগণের পথাবলম্বন করিবে। তাহারা শূদ্র হইতে পারিবে, অথবা চণ্ডাল ব্যতীত অন্য জাতি হইতে পারিবে।

যে রাজা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী নিজ নিজ প্রজাকে পরিচালন করিবেন, তিনি স্বর্গগামী হইবেন। অন্যথা তাঁহার নরকে পতন হইবে।

অন্তরালগণ সমান ভাগে সম্পত্তি ভোগ করিবে। দায়ভাগ, দেশ জাতি সঙ্ঘ অথবা গ্রামানুযায়ী করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

বাস্তু।

বাস্তু সম্বন্ধীয় বিবাদের মীমাংসা স্থানীয় লোকের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিবে। গৃহ, ক্ষেত্র, উপবন, সেতুবন্ধ, হ্রদ ও পুষ্করিণী, প্রত্যেককে বাস্তু বলে। লৌহ-নির্ম্মিত মেখলা দ্বারা আড় কাষ্টের সহিত গৃহের ছাদ বন্ধন করাকে সেতু বলে। সেতুর স্থায়ীত্বানুযায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অপরের অধিকৃত স্থান দখল না করিয়া, নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

ভিত্তিমূল ২ অরত্নি দীর্ঘ এবং ৩ পদ বিস্তৃত করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের প্রসবের পর ১০ দিবসের জন্য যে অস্থায়ী গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তদ্ব্যতীত অন্য সকল গৃহের সহিত অংস্কর, ভ্রম, উদপান নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্যথা প্রথম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে। উৎসব কালোচিত নির্জ্জন গৃহ, ভ্রম ও মার্গ নির্ম্মাণে এই নিয়ম বর্জ্জিবে। প্রত্যেক গৃহ হইতে উপযুক্তরূপ ঢালু করিয়া এবং তিনপদ দীর্ঘ করিয়া জলনির্গম প্রণালী করিতে হইবে, যাহাতে জল ইহা হইতে নিষ্কাষিত হইতে পারে। এই আদেশ অমান্য করিলে ৫৪ পণ অর্থদণ্ড হইবে। পূজার অগ্নি বা উদঞ্জর, বা রোচন, বা কুট্টনী স্থানের

জন্য ৩ পদ দীর্ঘ ও ৪ পদ বিস্তৃত এক কক্ষ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্যথা ২৪ পণ অর্থ-দণ্ড হইবে।

প্রত্যেক গৃহের মধ্যে ৪ পদ বা ৩ পদ ব্যবধান রাখিতে হইবে। গৃহের ছাদের মধ্যে ৪ ইঞ্চ ব্যবধান রাখিতে হইবে অথবা একটী অপরকে আচ্ছাদন করিতে পারিবে। আনিদ্বার এক কিস্কু হইবে, যাহাতে দ্বার উন্মোচনের কোন ব্যাঘাত গৃহাভ্যন্তরে না থাকে তাহা করিতে হইবে। উপর তলায় একটী ক্ষুদ্র কিন্তু উচ্চ বাতায়ন রাখিতে হইবে। গৃহস্বামীগণ সমবেত ভাবে নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, কিন্তু যাহাতে অনিষ্ট হয় এরূপ কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গৃহের ছাদে মাদুর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, কিন্তু যাহাতে ঐ মাদুর বাতাসে উড়িয়া না যায় তাহা করিতে হইবে। ইহার অন্যথা করিলে প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। রাজমার্গ বা রাজপথ মধ্যস্থলে না থাকিলে, যদি কেহ দ্বার বা বাতায়ন নির্ম্মাণ দ্বারা অপরের বিরক্তিজনক কার্য্য করে, তবে সেও প্রথম প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

যদি গর্ত্ত, সিঁড়ি, প্রণালী, অবস্কর অথবা গৃহের অপর কোন অংশ কোন প্রকারে বিঘ্ন ঘটায় অথবা অপরের ভোগে প্রতিবন্ধক ঘটায়, অথবা যদি জল জমিয়া নিকটবর্ত্তী গৃহের প্রাচীরের অনিষ্ট করে, তবে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। যদি মূত্র ও পুরীষের জন্য এই বিরক্তি ঘটে, তবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। প্রণালী দ্বারা যাহাতে সহজে জল নিষ্কাশন হয় তাহা করিতে হইবে, নতুবা দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে।

নিষেধ করিলেও যে প্রজা বাস করিবে কিম্বা খাজনা পাওয়া সত্ত্বেও যে ভূস্বামী জোর করিয়া প্রজাকে গৃহচ্যুত করিবে, তাহাদেরও দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে। কিন্তু যদি প্রজা মান-হানি, চৌর্য্য, সাহস, সংগৃহণ, অথবা মিথ্যা-পূর্ব্বক ভোগ দখল করিতেছে এরূপ হয়, তবে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক যে গৃহ পরিত্যাগ করে, তাহাকে বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের খাজানা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

দলভুক্ত কোন ব্যক্তি যদি সাধারণের ব্যবহারের জন্য কোন গৃহ নির্ম্মাণে সাহায্য না করে, অথবা যদি কেহ ঐরূপ দলভুক্ত কোন ব্যক্তির গৃহের অংশ বিশেষ ব্যবহারে প্রতিবন্ধক ঘটায়, তাহা হইলে দ্বাদশপণ অর্থ দণ্ড হইবে। এই প্রকারে যদি কেহ অপরের এই প্রকার গৃহের ভোগদখলে প্রতি-বন্ধক ঘটায়, তবে দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। নিজ কোষ্ঠ বা অধ্যান ব্যতীত গৃহের অন্যান্য অংশ এবং যথায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে ও কুট্টনশালায়, সাধারণের ব্যবহারের জন্য দিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বাস্তু বিক্রয়।

জ্ঞাতিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ধনী ব্যক্তিগণ অথবা প্রতিবেশীবর্গ ভূমি এবং অন্যান্য ক্রয়ে অগ্রসর হইবেন। উপরোক্ত ক্রেতা ব্যতীত সদ্বংশীয় ৪০ জন প্রতিবেশী বিক্রয়ার্থ গৃহের সম্মুখে সমবেত হইবেন এবং উহা বিক্রয় হইবে এরূপ মত প্রকাশ করিবেন। ভূমি, সেতুবন্ধ, উদ্যান, হ্রদ ও পুষ্করিণীর সীমা গ্রামের বৃদ্ধগণের নিকট অথবা, প্রতিবেশী-বর্গের বর্ণনা করিতে হইবে। 'কে ইহা এরূপ মূল্যে ক্রয় করিবে" এই কথা তিনবার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাতে, যদি কেহ বাধা

না দেয়, তবে ক্রেতা বিক্রয়ার্থ স্থান ক্রয় করিতে পারেন। যদি এই সময়ে 'ডাকের' জন্ত মূল্য বৃদ্ধি হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধার্য্য মূল্যাপেক্ষা বৰ্দ্ধিত মূল্য ও শুল্ক রাজ-কোষে প্রদান করিতে হইবে। যে এই প্রকারে মূল্য বৃদ্ধি করিবে, তাহাকেই শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে 'ডাক' দিলে ২৪ পণ দণ্ড হইবে। যদি সাত রাত্রি অতিবাহিত হইলেও গৃহস্বামী উপস্থিত না হয়, তবে "বিক্রয় প্রতিকোষ্ঠা" উহা দখল করিতে পারে। বিক্রয় প্রতিকোষ্ঠা ব্যতীত অপরের নিকট বাস্তু বিক্রয় করিলে ২০০ পণ অর্থদণ্ড হইবে। বাস্তু ব্যতীত অন্ত কিছু বিষয়ে উপরোক্ত অপরাধ করিলে ২৪ পণ অর্থদণ্ড হইবে। দুই গ্রামের সীমা লইয়া বিবাদ হইলে, পঞ্চগ্রাম অথবা দশ গ্রামের বৃদ্ধগণ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক সীমা পরীক্ষা করিয়া উহা নির্দ্ধারণ করিবেন। কৃষক ও বৃদ্ধ গোপালক প্রথমতঃ সীমা বর্ণনা করিবে ও পরে বিপরীত বেশ ধারণ করিয়া তথায় গমন করিবে। যদি উদ্দিষ্ট সীমা না পাওয়া যায়, তবে সহস্রপণ দণ্ড হইবে। কিন্তু যদি তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছে, তবে যাহারা অন্যায় রূপে দখল করিয়াছে অথবা সীমাচিহ্ন নষ্ট করিয়াছে, তাহাদেরই পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে।

যে সকল ক্ষেত্রের সীমা নাই, অথবা যাহার কোন উত্তরাধিকারী নাই, রাজা সেই সকল ক্ষেত্র অপরকে বিতরণ করিবেন।

ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় বিবাদ প্রতিবেশী বা গ্রাম্য বৃদ্ধগণ কর্তৃক নিষ্পত্তি করিতে হইবে। যদি তাহাদিগের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে যে স্থানে সৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করেন, সেই-স্থানে নিষ্পত্তি করিতে হইবে; অথবা প্রতিদ্বন্দীগণ নিজেদের মধ্যে ঐ ক্ষেত্র বিভাগ করিয়া লইবেন। যদি উপরোক্ত প্রথার কোনটীই সফল না হয়, তবে রাজা ঐ ক্ষেত্র অধিকার করিবেন। যে ক্ষেত্রের কোন দাবীদার নাই, রাজা সে ক্ষেত্রও অধিকার করিবেন, অথবা ইহা প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ করা যাইতে পারে। বলপূর্ব্বক বাস্তু অধিকার করিলে উহা চৌর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে ও তদ্রূপ দণ্ড হইবে।

যদি উপযুক্ত কোন হেতুতে কেহ অপরের বাস্তু অধিকার করে, তবে বাস্তবাসীকে খাজানা দিতে হইবে। এই খাজানা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

সীমা অন্যায় পূর্ব্বক দখল করিলে প্রথম প্রকারের অর্থ দণ্ড হইবে। সীমা নষ্ট করিলে ২৪ পণ অর্থ দণ্ড হইবে। তপোবন, পশুচারণ ভূমি, রাজপথ, শ্মশান, মন্দির, যজ্ঞস্থান এবং পুণ্যস্থান সম্বন্ধে বিবাদ হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মীমাংসা করিতে হইবে। প্রতিবেশীবর্গের সাক্ষীর উপরই সকল বিবাদ নির্ভর করিবে। পশুচারণ ভূমি, কেদার, উপবন, খল, আবাস ভূমি, বাহন কোষ্ঠ সম্বন্ধীয় বিবাদে যে অগ্রে আসিবে তাহারই প্রতিবন্ধক অগ্রে অপসারিত করিতে হইবে।

যে সকল বনে ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, সোমলতা জন্মে এবং যজ্ঞ ও পুণ্যস্থান ব্যতীত অপর স্থানে যদি কেহ পুষ্করিণী, নদী বা ক্ষেত্রে যাইবার জন্য ক্ষুদ্র পথ করিয়া অপরের ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে, তাহা হইলে ক্ষতির সমপরিমাণে ক্ষতি-পূরণ দিতে হইবে।

যদি কেদার, আরাম বন অথবা কোন সেতুবন্ধ স্বামী অপরের অংশের ক্ষতি করে, তবে ক্ষতির দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

ময়ূরভঞ্জাধিপতি রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব।

উৎকল।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী উৎকল দেশ প্রথমতঃ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-হস্তগত হয়। ইহা তৎপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহারাষ্ট্রীয় শক্তি, হায়দ্রাবাদের নিজামের সৈন্যগণের সহিত যুক্ত ইংরাজ সিপাহীগণের নিকট, পরাস্ত হওয়াতে, উৎকল দেশ ও বেরার প্রভৃতি কয়টী প্রদেশ বিজয়ী সেনাগণের হস্তগত হয়। সাগরতীরবর্ত্তী প্রদেশ বণিক ইংরাজগণের আদরের বস্তু, বিশেষতঃ বালেশ্বর তখন প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল এবং বঙ্গদেশে প্রাচীনেরা উহাকে বালেশ্বর না বলিয়া "বন্দর"বলিতেন। কাজে কাজেই, জলচর ইংরাজগণ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ হইবে ভাবিয়া, বেরার প্রভৃতি কয়টী প্রদেশ, যুদ্ধে জয়লাভের অংশরূপে হায়দ্রাবাদের নিজামকে লইতে দেন, এবং পুরী, কটক ও বালেশ্বর নামক তিনটী প্রদেশ ও তৎতৎ-নিকটবর্ত্তী জঙ্গল মহলের বা ঝাড়খণ্ডের গড়জাৎ রাজ্যগুলি ইংরাজ-শক্তির অধীনে আসে।

এই উৎকল দেশ হিন্দুর গৌরবের স্থান। কারণ সৌর, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ধর্ম্মের ঢেউ, সমুদ্র-তরঙ্গ-রাশির মত, চিরদিনই এই পবিত্র ভূখণ্ডকে বিধৌত করিয়াছে। ঐ সমুদায় ধর্ম্ম ও সভ্যতার গুণে, উৎকল দেশ আমার চক্ষে অতীত-স্মৃতির সুষমায় মণ্ডিত। প্রতি গ্রামে, প্রতি পথে পথে, প্রতি পাদপের পদমূলে, কতই মানব সুখ দুঃখের,—বিপদ আপদের, উন্নতি অবনতির নাটকের অভিনয় হইয়াছে, কে তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে,—কে তাহার অতীন্দ্রিয়, অতীত সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিবে? কতই রাজবিপ্লবের,—কতই সমাজবিপ্লবের,—ও ধর্ম্মবিপ্লবের ঢেউ উৎকল দেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

যে দেশে জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির ও পুরুষোত্তম তীর্থ,—যে দেশে ভুবনেশ্বর ও খিচিং প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব্ব মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ অতীত-গৌরবের সাক্ষ্য-স্বরূপ দণ্ডায়মান,—যে দেশে বঙ্গ-গৌরব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব অধিক সময়ই থাকিতে ভালবাসিতেন,—সেদেশের গুণের কথা আর কি বলিব?

হিন্দুজাতির ইতিহাসে উৎকলের স্থান অতি উচ্চ। পরবর্ত্তী কালের বঙ্গবাসী, নিন্দার ছলে "উড়ে ও বাঙ্গাল" বলিয়া বঙ্গের "দক্ষিণ" ও "পূর্ব্ব"কে অভিহিত করিলেও, বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে যে, "উড়ে ও বাঙ্গালই" হিন্দুর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন!

বাঙ্গাল দেশের হিন্দু মনীষী সন্তানগণ যেমন বাঙ্গালী জাতিকে জগতের সম্মুখে উন্নত করিয়াছেন, এই প্রবন্ধের বিষয়, উৎকল দেশীয় স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর ময়ূরভঞ্জাধিপতিও তেমনি, বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র,—তাঁহার চরিত্রের মহত্ব,—তাঁহার রাজ্যশাসন বিষয়ে কৃতিত্ব ও নিজ-সুখ-স্পৃহা-শূন্য লোক-হিতৈষণা চিরদিনই তাঁহার নামকে অমর করিয়া রাখিবে এবং জনসমাজকে উন্নত আদর্শের দিকে উত্তোলন করিবে। ইনি জনসমাজে সুপরি-

চিত থাকিলে, নিশ্চয়ই বহু পূর্ব্বে "রাজর্ষি" আখ্যা লাভ করিতেন।

মযূরভঞ্জ।

বঙ্গদেশের দক্ষিণে উৎকল দেশ। সেই উৎকল দেশের বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত গড়জাতের মধ্যে মযূরভঞ্জ একটী।

২২—৩৫—৪৫ এবং ২১—১৭—০ উত্তর লেটিচিউড্ এবং ৮৫—৪৫—৩০ হইতে ৮৭—১৩—১৫ পূর্ব্ব লঙ্গিচিউড্ মধ্যে উহা স্থিত।

মযূরভঞ্জের উত্তরে মেদিনীপুর ও সিংহভূম, পূর্ব্বে মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলা,—দক্ষিণে কিওঞ্ঝর ও নীলগিরি রাজ্য এবং বালেশ্বর,—পশ্চিমে কিওঞ্ঝর রাজ্য ও সিংহভূম জেলা।

মযূরভঞ্জ রাজ্যের বিস্তৃতি ৪,২৪৩ বর্গ মাইল,—কুচবিহার রাজ্যের সাড়ে তিন গুণ, ও দুইটী বৃহৎ ব্রিটীস জেলার সমান।

মহারাজা ইংরাজ-রাজকে সম্মানের জন্য ১০০১ টাকা নজর দেন। জমিদারগণের ন্যায় ভূরাজস্ব দিতে হয় না। পূর্ব্বে এই নজর বা পেশ্‌কশ্‌ কয়েক কাহন কড়িমাত্র ছিল। পরে উহা টাকায় ও এত টাকার পরিবর্ত্তন করা হয়।

ইতিহাস।

দেশীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, এই রাজ্যটী স্থাপিত। আমার মতে, তাহার কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। তবে, বহুকাল পূর্ব্বে যে ইহা প্রতিষ্ঠিত, ইহার যথেষ্ঠ প্রমাণ আছে।

প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহোদয় তাঁহার "আরকিওলজিক্যাল্ সার্ভে-অব্-মযূরভঞ্জ" গ্রন্থে বলেন যে, এই রাজ্যের প্রাচীনতা বিষয়ে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"প্রাচীন ভঞ্জ বংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত, সংপ্রতি প্রাপ্ত তাম্র-ফলক সমূহ দেখিলে নিঃসন্দেহ জানা যায় যে, উৎকল দেশের এই অংশ অতি প্রাচীন।" (১৯-২৮ প্লেট্।)

অন্যত্রে,—"ষ্টার্লিঙ্গের বিবরণ মহারাজ দেখান। তাহাতে উল্লিখিত মোগল সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহিত স্থানীয় রাজাগণের যে চুক্তি পত্র হয়, তাহা এই,—

"মযূরভঞ্জের জমিদারের অধীন বারটী জমিদারী ভুক্ত দুইটী কিল্লা।

তাহার নিজের রাজ্য আঠারটী কিল্লা সমেত একটী জমিদারী, যথা, (১) ভঞ্জভূম, (২) মানুত্রী, (৩) হরিহরপুর, (৪) দেউলিয়া, (৫) পূর্ণীয়া, (৬) করকচুয়া (৭) বামনঘাটী, (৮) সিরহণ্ডা এবং কয়েকটী সামান্য ছোট ছোট কেল্লা,—দশটী অধীনস্থ সামন্ত রাজা, এগারটী জমিদারীর অন্তঃপাতি ২৪টী কেল্লা।

জমিদারী		কেল্লা	মন্তব্য।
নীলগিরি	১	১০	অন্য আর একটী স্বাধীন রাজ্য
সিংহভূম	১	১	এখন একটী জেলা।
বরাভূম	১	১	
পাথরহাই	১	১	
নরসিংহপুর	১	৪	মেদিনীপুরের অন্তর্গত।
দেবর ভীরচাঁদ জামকুণ্ডা			কটক ও সুবর্ণরেখার মুখে।
চারগড়	২		কটক ও সুবর্ণরেখার মুখে।
তালমুণ্ডা			কটকের অন্তর্গত কিল্লা।
জাম্বরাপাল			ঐ।

এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এমন এক সময় ছিল, যখন ভঞ্জরাজগণের শাসন, উত্তরে

মেদিনীপুর,—দক্ষিণে বৈতরণী পর্য্যন্ত কিঙ-ঞ্জরের সীমা,—পশ্চিমে সিংহভূম ও পূর্ব্বে বালেশ্বরের নানা অংশে, সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

এতদ্ব্যতীত বোধ ও গুমসরে প্রাপ্ত তাম্র-ফলক হইতে প্রমাণীত হয় যে, এই দুই রাজ্যেও ভঞ্জবংশের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।"

পাঁচপীড়ের অন্তর্গত "খিচিং" প্রভৃতি স্থানে, অশেষ প্রস্তর মূর্ত্তি ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে, পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে, প্রাচীন কালের সাক্ষ্য স্বরূপ প্রস্তর-গৃহ,—প্রস্তরে বাঁধা পুষ্করিণী ঘাট, প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। দুই তিন বৎসর ধরিয়া বন কাটিয়া, অগম্য বনের মধ্যে, প্রাচীন ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভের ষ্টেসন পয়েন্ট মিলাইতে গিয়া, জন-মানব-শূন্য, পার্ব্বত্য-প্রদেশীয়,—হস্তি-বরাহব্যাঘ্রভল্লুকসঙ্কুল, গভীর অরণ্য মধ্যে, অতি শোভন দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি! লতাগুল্মবেষ্টিত, অতীত-স্মৃতি-বিজড়িত,—প্রাচীন বনস্পতি-কুঞ্জের পদতলে উপবেশন করিয়া,—কল্পনাদেবীর আশীর্ব্বাদে,—বায়স্কোপের ছবির মত, কত অতীত ঘটনা-পরম্পরা নয়নগোচর করিয়াছি! সে সব অতীত গৌরবের অশ্রুমাখা স্মৃতি বলপূর্ব্বক চিত্তকে বর্ত্তমান হইতে বহুদূরে লইয়া যায়।

এখন বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জের কথা বলি।

কিম্বদন্তী এই যে, রাজপুতনার জয়পুর-রাজবংশীয় জনৈক ব্যক্তি সস্ত্রীক জগন্নাথ দেব দর্শনে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে পত্নীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে, স্ত্রীকে পথে বৃক্ষতলে রাখিয়া, তিনি আর এক "ডাক্" রাস্তা একাকী গমন করেন। রাত্রিকালে স্বপ্ন হইল,—"তুমি পুত্রসম্ভবা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, পুরী গমন করিতেছ, কিন্তু সেখানে আমার দেখা পাইবে না। যাও, স্ত্রীপুত্রের সংবাদ লও। আমি সেইখানেই তোমাকে দেখা দিব। তোমার পুত্র সেই স্থানের রাজা হইবে।"

জগন্নাথ যাত্রী রাজপুত, ফিরিয়া আসিয়া, দেখেন, পত্নী সুন্দর একটী পুত্র প্রসব করিয়া, বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত করিয়া, পার্শ্বে শয়ান। মুখে সূর্য্যকিরণ পতিত,—নিকটে ময়ূরী নৃত্য করিতেছে ও তাহার পুচ্ছদ্বারা সৌরকিরণ নিবারণ করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা হইতেই ময়ূরভঞ্জ নাম। অন্য কেহ কেহ বলেন যে, স্থানীয় ময়ূরধ্বজ নামক নরপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, আদি ভঞ্জ আদিপুরে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্যের নাম ময়ূরভঞ্জ হয়।

যাহাই হউক, অতি প্রাচীন কালে, রাজপুতনার জয়পুর বংশীয় কোন ক্ষত্রিয় এই রাজ্য স্থাপন করেন, ইহা সকল বিবরণ হইতেই জানা যায়।

লোক সংখ্যা।

বর্ত্তমান লোক গণনায় ফল জানা যায় নাই। শুনিতেছি, ময়ূরভঞ্জের লোক সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষাধিক হইয়াছে।

১৯০১ সালের গণনায় মোট ৬১০,৩৮৬ জন লোক হয়। তন্মধ্যে স্ত্রী ৩০৭,০০৩ এবং পুরুষ ৩০৩,৮৮৩।

হিন্দু ৫০৭,৭৩৮, মুসলমান ৩,৭৮৫।—অন্যান্য ৯৮,৭৫৭ জন। সাঁওতাল ১৮৫,০০০, হো ৬০,০০০, ভূমিজ ৫৬,০০০, কুর্ম্মী ৩৬,০০০,—ভুঁইয়া ৩২,০০০,—গৌড় ৩০,০০০ বাথুড়ী ৩০,০০০,—পান ২৫০০০,—খণ্ডাইৎ ১৫,০০০ হাজার।

১৮৭২ সালের গণনায় মোট ২৫৮, ৬৮০ জন,—১৮৮১ সালে গণনায় ৩৮৫, ৭৩৭,—১৮৯১ সালে ৫৩২, ২৩৮,—১৯০১ সালে ৬১০, ২৮৬ জন। অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর মধ্যে দুই গুণের অধিক হইয়াছে।

রাজধানী।

রাজধানী বারিপদা বেঙ্গল নাগপুর রেল-ওয়ের রূপসা ষ্টেশন হইতে মহারাজার রেলে প্রায় ত্রিশ মাইল। উহা বুড়া বুলঙ্গ ও আর একটী ছোটনদীর মধ্যবর্ত্তী।

নগরটী ছোট হইলেও, অতি সুন্দর ও পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মহারাজা রাজধানীতে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত করিয়াছিলেন। পথগুলি সুপ্রশস্ত ও সারি সারি দীপমালায় সুশোভিত।

নগর প্রবেশ করিলেই, জগন্নাথ মন্দির। রাজবাড়ী অনেকটা পুরাণ ধরণের। মহা-রাজের নাবালকীর শেষভাগে, বেল্‌গড়িয়া নামক স্থানে ইংরাজি-ধরণের বাড়ি তৈয়ার হয়। উহা দেখিতে মনোরম। একটী উচ্চ স্থানের উপর স্থাপিত। পাদদেশে একটী কৃত্রিম "বাঁধ",—হ্রদের মত,পাদবেষ্টন করিয়া আছে,-দেখিতে অনেকটা ভূপালের হ্রদের ন্যায় কিন্তু তাহাপেক্ষা অনেক ছোট।

নগরের চারিদিকে উচ্চাবচ শস্যক্ষেত্র,—নদীপার হইলেই বনভূমি,—দূরে সিমলিপাল পর্ব্বতমালা, সগৌরবে অভ্রভেদ করিয়া, উন্নত গ্রীবে দণ্ডায়মান। এই বিন্ধ্যাচলের শাখার সর্ব্বোচ্চশিখর মেঘাশনি, সমুদ্রবারিরাশি হইতে ৩,৮২৪ ফীট উচ্চে, মস্তক উত্তোলন করিয়া, ময়ূরভঞ্জের অভ্যাগত অতিথিগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। উহা শীতঋতুতে তুষারে আচ্ছাদিত হয়। সেইজন্য বেহার-উৎকল-নাগপুর-প্রদেশের লাটের গ্রীষ্মকালীন নিবাসের জন্য মেঘাশনিতে উপনিবেশ স্থাপ-নের প্রস্তাব হইয়াছিল। মহারাজকুমার নাবালক মহারাজা হইলেন। ইংরাজ তাঁহার অভিভাবক। তাই, সুবিচারক ইংরাজ-জাতি কদাচই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না বলিয়াই,বোধ হয়, রাঞ্চি প্রভৃতি স্থানে লাটের নিদাঘ-নিবাস কল্পনা করিতেছেন।

স্বর্গীয় মহারাজ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই মে হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত, এইস্থানে পর্য্যটন করিয়া, একটী স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন। তিনি জরামৃত্যু-রোগশোক-শূন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্যনিবাসের আর প্রয়োজন নাই। নির্ঝর নির্জ্জনে থাকিয়া, আজ তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

রাজধানী ছাড়া, পাঁচপীড় ও বামুনঘাটী মহকুমার প্রধান স্থান, করঞ্জিয়া ও বাহাল্দা নগরের মত। এই কয়টী স্থান ছাড়া, প্রায় চার হাজার গ্রাম এই রাজ্য মধ্যে আছে। আমি খ্রীষ্টীয় ১৮৯৫ সালের ২০শে নবেম্বর তারিখে, করঞ্জিয়ায় সবডিভিজনাল অফিসার হইয়া যাই। এই পদে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কলেক্টার ও মুন্‌সেফের ক্ষমতা প্রথমে দেওয়া হয়।

১৮৯৫ সালে একটী ডাকবাঙ্গালায় আমার বাসা ছিল। উহার চারিধারে রজনী-যোগে, ব্যাঘ্র ভল্লুক বিচরণ করিত। বাড়ীর-চারিধারে "উই ঢেণ্ডা" হইতে উই খাইতে ও পার্শ্ববর্ত্তী বাগানের গাছের ফল খাইতে, দলে দলে,ভালুক আসিয়া"গোঁৎ গোঁৎ" করিয়া বেড়াইত। অনেক ক্ষণ ধরিয়া,থাকিয়া থাকিয়া, "ফেউ ফেউ" শব্দ হইলেই, জানিতাম যে, বড় বা ছোট বাঘ নিকটবর্ত্তী। আমার বালিশের নীচে গুলিভরা রিভল্‌ভার ও ঘরের

কোণে রাইফল্ বড় বাঘ শিকারের গুলিতে বোঝাই থাকিত। আমার শয়নকক্ষের চারিধারে পুলিশ সিপাহী ও পাইক পাহারা থাকিত।

সেই আমার প্রথম ময়ূরভঞ্জ গমন। তখন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার।

বর্ত্তমান সময়ে,বারিপদায় সদরে একটী ও কপ্তিপদায় আর একটী মহকুমা হইয়াছে। মোট চারিটী সবডিভিজন্।

শাসনপ্রণালী।

স্বর্গবাসী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর ১৮৮২ সালে দেহত্যাগ করেন। ইংরাজি রাজপ্রণালী তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

১৮৮২ সালে আমাদের মহারাজা শ্রীরাম রামচন্দ্র ভঞ্জ দেব, দশম বর্ষে, রাজ্যাধিকারী হয়েন এবং অগতির গতি ইংরাজরাজ ইঁহার অভিভাবক হইয়া, ইঁহার নাবালকি আমলে রাজ্য-শাসন করেন।

এই সময়ে ভক্তিভাজন এইচ. পি, ওয়াইলি সাহেব মহোদয় ম্যানেজার হন। তিনি বিশেষ ভাবে ইংরাজ-শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। স্বর্গীয় মহারাজা পূর্ণভাবে তাহার প্রচলন করেন।

খ্রীঃ ১৮৯২ সালে, তিনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া, কটক কলেজের অধ্যাপক ও তাঁহার শিক্ষক শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ধর, এম-এ, বি-এল মহোদয়কে জুডিশিয়াল্ সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া, ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে, দুই বৎসর কাল রাজ্য চালনা করেন। ঐ সময়ে, তিনি মোহিনী বাবুর সাহায্যে আপিল নিষ্পত্তি করিতেন।

মহারাজার শৈশবকালে, ম্যানেজারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, প্রাতঃস্মরণীয়, স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার ঘোষাল মহাশয় রাজ্যের নানা প্রকার শ্রীবৃদ্ধি করেন।

রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াই, স্বর্গীয় মহারাজা নানা শাখায় শাসন বিভাগকে বিভক্ত করেন।

তিনি পুলিশকে ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্ত হইতে স্বতন্ত্র করেন। রাজস্ব ও বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করেন এবং দেওয়ানী, কালেক্টরী, ফৌজদারী, পুলিশ, জঙ্গল, সার্ভে ও সেটেল্মেণ্ট, প্রভৃতি বিভাগ ক্রমশঃ স্থাপন করেন।

তিনি রাজ্যের নানা প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া, একটী ব্যবস্থাপক সভাও স্থাপন করেন। ৪ জন সরকারী প্রধান কর্ম্মচারী ও ৪ জন বেসরকারী সভ্য লইয়া, এই সভা গঠিত হয়। দেওয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, জজ ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ সভার সরকারী সভ্য।

প্রত্যেক বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন মহারাজা স্বয়ং।

মহারাজা ১৮৯৪ সালে যে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক বিধি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে প্রজাগণকে প্রথমে প্রজাস্বত্ব দেওয়া হয়।

বংশ পরিচয়।

রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজবংশের জনৈক রাজপুত প্রাচীনকালে এই ভঞ্জবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহারাজের পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর সুরগুজার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব ময়ূরভঞ্জের মহারাজা হয়েন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশ্যামচন্দ্র,নীলগিরি রাজা কর্ত্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হইয়া, ঐ রাজ্যের সিংহাসনে

প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার পূর্ণ নাম শ্রীশ্যাম-চন্দ্র হরিচন্দন মরদ্রাজ। তৃতীয় পুত্র শ্রী শ্রীদামচন্দ্র ভঞ্জ দেব, রাউৎ রায় সাহেব,গৃহেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট থাকেন। ইঁহাদের এক ভগ্নী সিংহভূমের পোড়াহাটের রাজার সহিত ও অন্য ভগ্নী বাবপল্লীর রাজার সহিত বিবাহিতা হয়েন।

শ্রীরামচন্দ্র প্রথমে পঞ্চকোটের মহারাজা স্বর্গীয় নীলমণি সিংহ বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত এবং দ্বিতীয়বারে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুচারু দেবীর সহিত বিবাহিত হয়েন।

তাঁহার প্রথমা ভার্যার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর আমাদিগের বর্ত্তমান মহারাজা। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট রায় শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুরের সহিত, আজমীরের রাজপুত্রদের কলেজে, পাঠ করিতেছেন।

মৃত মহারাজার খুল্লতাত স্বর্গীয় মহাত্মা বৃন্দাবনচন্দ্র ভঞ্জ দেব ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু-শোক এড়াইবার জন্যই, বুঝি, অগ্রেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, বড় লাল শ্রীহরীশচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর বর্ত্তমান আছেন।

মহারাজার কনিষ্ঠ খুল্লতাত, মৃত রাউ-রায় সাহেব, বহু পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় লাল সাহেব শ্রীগিরীশচন্দ্র ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভঞ্জ দেব বর্ত্তমান আছেন।

স্বর্গীয় মহারাজার শৈশব ও শিক্ষা। অকালে পিতৃহীন হইয়া, তিনি পিতামহী, খুল্লতাত ও কনিষ্ঠ খুল্লতাত পত্নীর স্নেহে, ও অসহায় রাজকুমারগণের সহায়, ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের স্নেহে ও যত্নে, শ্রীরামচন্দ্র ক্রমশঃ চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া, কটক, কলিকাতা ও গৃহে, স্বর্গীয় মহাত্মা কিডেল, শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু ও স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র মহাপাত্র ও শ্রীহরিপ্রসাদ দাস প্রভৃতির শিক্ষকতায়, নানা বিদ্যা ও সদ্গুণে শোভিত হইয়া উঠেন। তিনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া, গুরুগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক, নানা উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

ইংরাজি,বাঙ্গলা, সংস্কৃত, উৎকল সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া, রাজকার্য্য করিতে করিতেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধির জন্য পরীক্ষা দেন। রাজ্যের ভার, শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য নানা কারণে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেও, বিদ্যা বুদ্ধিতে সাধারণ উপাধিধারী অপেক্ষা, তিনি অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

সর্ব্বদা সুপণ্ডিতগণের সহবাসে থাকিতে ও গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিতে,চিরদিনই তিনি ভাল বাসিতেন।

কিডেল্ সাহেব সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া, তাঁহার চরিত্রকে অতি সুন্দর ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন। মহারাজের স্বাভাবিক চরিত্র সৌষ্ঠবের সহিত, ইংরাজ চরিত্রের সদ্গুণ সমূহ যুক্ত হইয়া তাঁহাকে অসাধারণ-চরিত্র-সম্পন্ন করিয়াছিল। পূর্ব্বপুরুষগণের উদারতা, মিষ্টতা, স্নেহ-শীলতা, ও বৈষ্ণব বংশের নিষ্ঠা, বিনীত ভাব, ভদ্রতা, লোক-হিতৈষণা প্রভৃতি গুণ সমূহ,যেমন,তাঁহার চরিত্রকে মধুর করিয়াছিল, তেমনি, ইংরাজগণের কর্ম্ম নিষ্ঠা, পরিশ্রম-শীলতা,ন্যায়পরায়নতা,শৃঙ্খলা প্রভৃতিও তাঁহার চরিত্রকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়াছিল। কিডেল ও কিডেল পত্নী তজ্জন্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

স্বর্গীয় মহারাজার দৈনিক জীবন।

প্রাতে উঠিয়া, শৌচাদি কার্য্য সমাপনান্তে, ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক, সামান্য আহার করিয়া, উপাসনার পর, পাঠ ও লেখা পড়ার কার্য্য করিতেন। তৎপর, স্নানান্তে, ভোজন করিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পূর্ব্বক, কাছারীতে বসিয়া,অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মত, দরখাস্ত গ্রহণাদি ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি প্রভৃতি কার্য্য নিয়মিত রূপে করিয়া,বৈকালে কিছুক্ষণ বারাণ্ডায় আত্মীয় স্বজনগণের সহবাসে বাক্যালাপ ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতেন। তৎপর হাওয়া খাইবার জন্য, গাড়িতে করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিতেন।

সেই সময়ে, তাঁহার পাঠাগারের নিকটস্থ হলে, সান্ধ্য সম্মিলনের জন্য বিছানা প্রস্তুত হইত।

পণ্ডিতগণ একদিকে, মহারাজা মধ্যে, এবং অন্যদিকে ভদ্রমণ্ডলী ও সাধারণ লোক বসিতেন। ঐ সময়ে নানা শাস্ত্রাদি পাঠ ও ধর্ম্মাদি বিষয় আলোচনা হইত। দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত, তাঁহার সভা-পণ্ডিত ভক্তিভাজন্ বিদ্যাসাগর ও শাস্ত্রী মহাশয়, প্রায়ই বেদান্ত, দর্শন, প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনা করিতেন।

তৎপরে, কিছুক্ষণ সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা হইত। মহারাজের সঙ্গীতাচার্য্য, ধ্রুপদী ও সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ভক্তিভাজন্ শ্রীযদুনাথ রায় মহাশয় ও বিদেশীয় সঙ্গীত-বিদ্যা-পারদর্শী ব্যক্তিগণ কিয়ৎকাল কলা-বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। আমি যতদিন ময়ূরভঞ্জে ছিলাম, ততদিন এই প্রকারেই মহারাজা সন্ধ্যাকাল কাটাইতেন।

তৎপরে, কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপ বা বিলিয়ার্ড ক্রীড়া প্রভৃতির পরে, ভোজনান্তে নিদ্রা যাইতেন।

কোনও দিন মহারাজাকে কুবিষয়ে আমোদ করিতে দেখি নাই।

প্রজাগণের প্রতি মহারাজা।

স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতই শ্রীরাম নামের সার্থকতা দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বদাই প্রজাগণের কল্যাণ সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

প্রত্যহ কাছারী করিয়া প্রজাগণের দুঃখ দূর তো করিতেনই, তাহা ছাড়া প্রতিবৎসর রাজ্যের মধ্যে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, বিচরণ করিয়া দুইতিন মাস করিয়া, স্বয়ং প্রজাগণের অভাব জানিতেন ও তাহা মোচনের চেষ্টা করিতেন। আমি কতবার বলিয়াছি যে, "এতদিন পরিশ্রম করিলেন, একটুকু বিশ্রাম করুন।" তিনি বলিতেন,—"আপনাদের ছুটী আছে। প্রজারা যে আমাকে ছুটী দেয় না।" তাই বুঝি, বিশ্রাম লাভের জন্য প্রজাগণকে লুকাইয়া,—আমাদিগকে ভুলাইয়া,—এবং সতী সাধ্বী মহারাণী,—মহারাজ-কুমারগণ ও কুমারীকে, ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে কাঁদাইয়া, ইহলোকের কোলাহলময় অশান্তি হইতে চিরবিদায় লইলেন? মৃত্যুর পূর্ব্বেই, বুঝিতেছিলাম যে, জীবনের অবসাদ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

কতবার শুধাইয়াছি,—"জীবনে সুখ ভোগের ইচ্ছা হয় না কি?" তিনি বলিতেন, "অন্যে যে টাকা বিলাসের জন্য ব্যয় করে, আমি তাহা প্রজার হিতার্থে ব্যয় করি। ইহাতে দোষ কি?"

সর্ব্ব সময়ে, আহারে, বিহারে, বসনে, ভূষণে, এমন সাদা সিদে রাজা মহারাজা আর দেখি নাই। কিন্তু প্রজার ও রাজ্যের কল্যাণের জন্য, অকাতরে লাখের উপর লাখ ব্যয় করিতে,কোনও দিন, তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না।

প্রজাগণের সাহায্য জন্য, অগ্নিদাহ ও দুর্ভিক্ষাদি সময়ে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন, এবং দেওয়ানকে ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে মফস্বলে পাঠাইয়া, তাহাদের দুঃখ দূরের চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতেন।

প্রজাগণের দুঃখ শ্রবণ করিবার জন্য, মহারাজার দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত এবং হস্ত সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত।

খ্রীঃ ১৮৯৮ সালে দেওয়ান সীমা বিবাদ কার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিলে, সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব প্রথমতঃ আমার উপরেই ন্যস্ত হয়। "পদিকা" বা বংশ দণ্ডের মাপের স্থলে, আমিই ময়ূরভঞ্জে প্রথম কিস্তওয়ার সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট করি। ঐ বিভাগের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী সমালোচনা করিয়া, বোধ হয় ১৮৯৯—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্য বিবরণীর উপর, ১৯০০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের ১১ নম্বর রেজলিউসনে, কার্য্যের ক্ষিপ্রকারিতা, নির্ভুলতা, কালিকসা ও তাহার পরীক্ষা প্রণালী, কিস্তওয়ার জরিপের প্রশংসা ও রাজা-প্রজা-হিতকর জমাবন্দী কার্য্যের অনুমোদন করিয়া, এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের অসদ্ব্যবহার-নিবারণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"রাজা ও প্রজা উভয়ের হিতার্থেই বন্দোবস্ত কার্য্য পরিচালন করা উচিত।"

এমন কথা কোনও মনিবের মুখে শুনি নাই! বরং রাজা ও প্রজা উভয়ের হিতজনক রাজ্য-শাসন-প্রণালী অবলম্বন করাতে, আমাকে অনেক স্থলেই অশেষ বিপদে,—আম্লাগণের ষড়যন্ত্রে ও মনিবের কোপে পড়িতে হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া কার্য্য করিতে কখনই প্রস্তুত না থাকায়, অনেক ক্ষেত্রে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইয়াছে।

একমাত্র রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের কার্য্য করিয়া, অবাধে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সাধনের একত্র সুযোগ হইত। ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

একদা কোন গুরুতর বিষয়ের কার্য্যভার আমার উপর অর্পিত হয়। উহা আমার মতের বিরুদ্ধ বলিয়া, আমি করিতে নারাজ হওয়াতে, মহারাজ আমার উপর অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। এমন অনেক বার হইয়াছে।

ময়ূরভঞ্জে একটী প্রথা ছিল যে, লাখ্‌রাজদারগণের জমির খাজনা রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক আদায় হইত। ইহাতে শতকরা ১৫৲ টাকা বাদ্ দিয়া, বাকী টাকা লাখরাজদারগণকে দেওয়া হইত।

আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সেই ক্ষমতার বলে, আমি ঐ প্রথা রহিত করিয়া, লাখ্‌রাজদারগণের হস্তে নিজ সম্পত্তির খাজনা আদায়ের ক্ষমতা অর্পণ করি। অনেকেই মহারাজাকে বুঝাইলেন যে, আমি বিনা হুকুমে, একটা ভয়ানক বিপ্লব ঘটাইয়াছি। সদরে ফিরিয়া দেখি, চতুর্দ্দিকেই গোলযোগ। মহারাজার সঙ্গে দেখা করিয়া বুঝাইয়া বলিলাম যে, (১) দাতা দত্ত বিষয়ের উপর অধিকার রাখিলে, দানের উদ্দেশ্য বিফল হয়। অতএব, লাখ্‌রাজ ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি যাঁহারা দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দানের উদ্দেশ্য ও ফল লোপ করা কদাচই উচিত নহে। (২) লাখ্‌রাজদারগণ অনেকেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যাদি। তাঁহাদের ওয়ারিশগণ নিজেই নিজেদের রাজস্ব বা খাজনা আদায় করিতে পারেন। তাঁহাদের সে ক্ষমতা লোপ করার অধিকার দাতাদের উত্তরাধিকারি-

গণের নাই। (৩) নিজে যাহারা রাজস্ব বা খাজনা আদায় করিবে, তাহারা কেন রাজাকে শতকরা ১৫৲ টাকা আদায়ী খরচা দিবে? ঐ টাকা তাহারা আয় হইতে বাদ না দিয়া, নিজেই ভোগ করিতে পারে।

এই প্রকার, নানা যুক্তিদ্বারা, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"এখন আমার বিরুদ্ধে আপনার আর কিছু বলিবার আছে?" অমনি অসন্তোষের মেঘের আবরণ অপসৃত হইয়া, সন্তোষের জ্যোৎস্নাময়ী হাসি ফুটিয়া বাহির হইল, এবং আমার প্রতি মহারাজের স্নেহ ও বিশ্বাস, শত কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও, পূর্ব্ববৎ রহিল। কোন প্রজাহিতকর কার্য্য করিয়া, মহারাজ শ্রীরাম চন্দ্র ভঞ্জদেবের নিকট তিরস্কার লাভ করি নাই। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের ভ্রুকুটী দেখিয়াছি,—তাঁহার কোন কোন অন্নধ্বংশকারী, দূর সম্পর্কীয়গণের "মেজাজ্" ও অর্থশূন্য ভ্রুকুটী দেখিয়াছি,—মহারাজের মুখে কখনও কটুবাক্য বা বিরাগের চিহ্ন দেখি নাই। তাঁহার হৃদয় যেন নিত্যানন্দের ও অশেষ প্রসন্নতার চিরপ্রিয় বাসস্থান ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই বলা যায় যে, প্রজারঞ্জনই তাঁহার একমাত্র বিলাসের সামগ্রী ছিল। রাজ্যের ও প্রজার শ্রীবৃদ্ধিই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

তাঁহার সম্বন্ধে ইহাও বলা যায় যে, তাঁহাকে জানা ও তাঁহাকে ভালবাসা, একই কথা ছিল। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার সঙ্গে বহুকাল থাকিয়াও, তাঁহাকে যতই জানিতাম, ততই ভাল লাগিত।

একটী ফরাশিস্ প্রচলন আছে যে, কেহই তাঁহার ভৃত্যের নিকট বীরপুরুষ নহে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, আমাদের রাজর্ষি শ্রীরাম চন্দ্র ভঞ্জ দেব সম্বন্ধে লৌকিকপ্রবাদটী সত্য নহে।

১৩০৯-১০ সালের রাজ্যের কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ যে প্রজাগণের অবস্থা একারেক নিজে অবগত হইবার জন্য ও অন্যান্য রাজকার্য্যোপলক্ষে, কর্ত্তব্যানুরোধে, স্বর্গীয় মহারাজ ৫৯ দিন রাজধানী ছাড়িয়া, রাজ্য মধ্যে, বনে বনে, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন, রাজ্যের মধ্যে এমন ভাবে, বনে বনে, অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে কাহাকেও তো দেখি নাই!

অনেক সময় প্রজাহিতকর কার্য্য করিয়া তাঁহাকে জানাইলে, তিনি লিখিয়াছেন,—"আপনি যেমন নির্ভীক ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করুন। ভয় নাই। উপরে ভগবান ও পশ্চাতে আমি আছি।" এবং এই নির্ভীকতার জন্য আমাকে সর্ব্বদাই সাধুবাদ করিতেন ও বলিতেন,—"আপনি Bismark এর মত। আপনি একজন Hero of hundred fights,—আপনার ভয় কি?"

এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আপনার মনের বলের দ্বারা, আমাদের চিত্তের দুর্ব্বলতা, যেন হিপনটিক্ প্রণালীতে, যদি সারিয়া দেন, তো বড় ভাল হয়।" রাজকার্য্য বিষয়ে অধীনস্থ ব্যক্তিকে এমন সরল উদার ভাবে পত্র লিখিতে কাহাকেও দেখি নাই।

সার জন্ উড্‌বারণ যখন লাট্ ছিলেন, তখন তিনি এক পত্রে মহারাজকে লিখিয়াছিলেন যে,—"আপনার মত পরিশ্রমী লোক আমি দেখি নাই।" আমি ঐ পত্র দেখিয়াছিলাম, কারণ আমার প্রতি যে একটী কর্ম্ম ভার তিনি তৎকালে অর্পণ করেন, উড্‌বারণ মহোদয় তৎসম্বন্ধেই কোন কথা মহারাজকে লিখিয়াছিলেন।

এমন মহারাজের সহিত কার্য্য করা ও ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া

একই কথা। বেশ্যা, সুরা, বদ্‌মায়েশী, জাল, জুয়াচুরী, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি কোন কুকার্য্যেই লিপ্ত হইবার প্রয়োজন ছিল না। ধর্ম্মপথে চলিলেই, এক বৎসর অন্তর, শতকরা দশটাকা বেতন বৃদ্ধি ও গবর্ণমেণ্ট আইনানু-[illegible]টী ও পেন্‌সেন্‌। এই জন্যই অনেক সৎলোক তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এতৎব্যতীত মনিবের অকপট সৌহৃদ্য ও বন্ধুতাও তাহার একটী কারণ।

আত্মীয় ও স্বজনের প্রতি শ্রীরামচন্দ্র। স্বর্গীয় মহারাজার স্বভাব এতই মধুর ছিল, যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ও খুল্লতাতকে যিনি জানিতেন, তিনিই বুঝিতেন, তাঁহার প্রকৃতিতে এত কোমলতা ও মিষ্টতা কোথা হইতে আসিল। সুরগুজা রাজকন্যা মহারাজার জননী ছিলেন। তাই, মাতৃ-পিতৃ-কুলের গুণাবলীর একত্র সমাবেশ, মহারাজার প্রকৃতিকে পূর্ণচন্দ্রের সুষমায় জড়িত করিয়াছিল। বন প্রদেশেই এমন সুগন্ধ কুসুম ফোটে। তাই বুঝি, দশরথতনয় সীতাকে সঙ্গে লইয়া, সহোদরের সহিত অরণ্যের মধ্যে, চরিত্রের পূর্ণ সৌন্দর্য্য সাধন নিমিত্তে, অযোধ্যাকে আঁধার করিয়া, ভারতের দক্ষিণ দেশের বনভূমিকে পদধূলী দানে পবিত্র ও চিরগৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন? বার-বনিতা-পরিশোভিত, সৌণ্ডিকালয় পরিপূর্ণ, সভ্যতাভিমানী নব্য নগরে কচিৎ এমন অলৌকিক চরিত্র নয়নগোচর হয়। তাই, ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন যে,—"সমুদয় পুস্তকে যে জ্ঞান পাওয়া না যায়, বনভূমি হইতে আগত একটী মাত্র মলয়-হিল্লোল তাহা শিক্ষা দিতে পারে।"

এমারসন প্রেমকে স্বভাবের মিষ্টতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইহা শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও তাঁহার অশেষ স্নেহ ছিল। তবে, সকল লোকের সকল বাসনা চরিতার্থ করিতে, স্বয়ং ভগবান বিশ্ব-স্রষ্টাই অসমর্থ, তো মহারাজা কি প্রকারে সক্ষম হইবেন?

পত্নীর প্রতি তাঁহার অকৈতব নীরব প্রেম ছিল। সন্তানাদি, ভ্রাতৃবর্গ, আত্মীয় স্বজন, সকলেই সেই প্রেম নদীতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইত।

মহারাজের খুল্লতাত স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র বড়ই মিষ্ট ও স্নেহশীল প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু, মতান্তর হইলে, মহারাজের কার্য্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে ছাড়িতেন না। মহারাজ কোনও দিন মুখের উপর, বা তাঁহার পশ্চাতে খুল্লতাতের প্রতি কোন অসম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ বা ব্যবহার করেন নাই। সর্ব্বদাই পিতৃব্যকে ভক্তি, স্নেহ ও ভয় করিতেন।

নিজের শিক্ষকগণের প্রতিও ঐ প্রকার অচলা ভক্তি ছিল। সমস্ত জীবন ধরিয়া সে ভক্তির ঋণ শোধ করিয়াছেন। কোনও এক শিক্ষক, পরে দোষাবহ কার্য্য করিলেও, তাঁহার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করেন নাই। এই অভক্তির যুগে সহসা এমন গুরুভক্তি নয়নগোচর হয় না।

কবিরাজ গোস্বামী, প্রেমের লক্ষণ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—"তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ।" এই লক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রে পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। আহারে বিহারে, অগ্রে অন্যের বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না, দেখিয়া, তবে নিজের ব্যবস্থা করিতেন। নীরব মধুর প্রেমের কথা বর্ণন করিয়া রাম বসু গাহিয়াছেন,— *

"প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তখন বলি বলা হলো না,
মরমে মরম কথা কহা গেল না?"

রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রও কি ঠিক এই ভাবেই, এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সেই ইহ-জীবনের পরপারের অজানা দেশে, দীর্ঘ-প্রবাসে,—হৃদয়ের গুলি হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াই, নীরবে চলিয়া গেলেন না? কিছুই উচ্চবাচ্য করিলেন না! কেন জান কি? অপরের হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে বলিয়া!

এইপ্রকার নীরব প্রেমের ঔৎকর্ষ বর্ণন করিয়া সাদি গাহিয়াছেন,—

"হে বুল্‌বুল্‌! গোলাপের প্রতি তোমার প্রেমের কি বৃথা জারি কর? প্রেম শিখিতে চাও তো পতঙ্গের নিকট যাও। সে নীরবে, জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া, প্রেমানলে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তথাপি একটীও আর্ত্তনাদ তাহার মুখ হইতে নির্গত হইবে না।"

আমি বলি, হে বন্ধু! যদি প্রেম শিখিতে চাও, তবে সিরাজের কুসুমোদ্যানে যাইতে হইবে না,—পতঙ্গের নিকটও যাইতে হইবে না, ময়ুরভঞ্জাধিপতি রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেবের নিকট সে সুকঠিন পাঠ শিক্ষা কর।

কর্ম্মচারিগণের প্রতি মহারাজ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,তাঁহার নিকট যাইলেই, কত স্নেহ ও যত্ন পাইতাম। সকল কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণই অনুভব করিত যে, মহারাজা একটী অকপট সুহৃদ্‌।

রাজর্ষি শ্রীরামের চরিত্র।

সংসারে দুই শ্রেণীর চরিত্র দেখা যায়। এক প্রকার চরিত্র পুরুষকারজাত, ভালই হউক, আর মন্দই হউক। আর এক প্রকার চরিত্র স্বভাবজ। ইহারও ভাল মন্দ দুইই আছে।

শ্রীরামচন্দ্র, উত্তরাধিকার সূত্রে,—গর্ভ ও ঔরষের গুণে, অসাধারণ গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

(১) কোনও দিন তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কারের লেশ মাত্র দেখা যায় নাই। বড় লোকদের উচ্ছিষ্ট অন্নে প্রতিপালিত, মোসাহেব ও শ্যালক-গোষ্ঠির দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য দেখিলে মনে হয়, বুঝি হিমালয়ের শিখর দেশের নীচে যে "তেরাই" নামক অস্বাস্থ্যকর জলপূর্ণ উপত্যকা ভূমি পর্ব্বতের পাদদেশ চুম্বন করে, তাহার জল হাওয়া যেমন শিখর-দেশের জল হাওয়া হইতে স্বতন্ত্র ও বিপরীত, তেমনি, বড়লোক ও ছোট লোকের চরিত্রে অনেক প্রভেদ আছে।

প্রকৃত বড়লোকের নম্রতা, যেমন শিরোভূষণ, এমন কোন কোহিনুর-শোভিত রাজ-মুকুটও নহে। বিগত পৌষ মাসে, আমাদের মহামান্য মহিমার্ণব সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যে বিনয়, নম্রতা ও অহঙ্কারশূন্যতার আদর্শ দেখাইয়াছেন, মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রেও সেইপ্রকার সদ্গুণও "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব সর্ব্বদাই দেখা যাইত।

সামান্য প্রজা বা কর্ম্মচারী নিমন্ত্রণ করিলেও, তাঁহার গৃহে যাইতে, কখনও তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

কতবার স্বয়ং আমাকে, তাঁহার মোটর-যোগে,খিদিরপুর,৭নং বজ্‌বজ্‌ রোড ও অন্যান্য স্থান হইতে লইয়া, কলিকাতায় আমার ৭১।১ সিম্‌লা ষ্ট্রীটের বাসাতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমি বলিতাম,—"আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির গৃহে আসা কি শোভা পায়?" তিনি বলিতেন,—"ছোট বড় মিছে কথা। সবাই সমান্‌। আপনার সঙ্গে কি আমি টাকার সম্বন্ধ ধরি?"

যখনই দেখা করিতে গিয়াছি, দেখিয়াছি

মহারাজা সহাস্যবদনে, গৃহের বাহিরে আসিয়া, "কৈ? কৈ? হেমেন্দ্র বাবু কই?" বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নচেৎ, কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে, টেবিলের পার্শ্বে হাসিতে হাসিতে বসিতে বলিতেছেন। সকলেই জানিত যে, কি সু-নজরে প্রথম হইতেই আমাকে দেখিতেন। আমার "প্রেম" পাঠ করিয়াই, আমাকে প্রথমে খ্রীঃ ১৮৯৫ সালে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। সকলের প্রতিই তাঁহার এই প্রকার সস্নেহ ব্যবহার ছিল।

একদা "রাজা বাসা" নামক স্থানে তিনি তাম্বুতে ছিলেন। আমি অশ্বারোহণে তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি তাম্বুর ভিতর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া, আমাকে আহ্বান করিতে যাইয়া, তাম্বুর দড়িতে লাগিয়া পড়িয়া যান।

তিনি কোনও দিন কাহাকেও এমন অনুভব করাইতেন না যে, তিনি তাঁহাপেক্ষা বড়। তাঁহার টাকার অন্যায় চাপে, কাহাকেও কখন মস্তক অবনত করাইতে চাহিতেন না, এবং কথায় কথায় নিজের ধনমানের মাহাত্ম্য বুঝাইবার চেষ্টাও করিতেন না।

মানব আত্মার মূল্য টাকা, সিকি, কড়া গণ্ডা দ্বারা গণনা করা যায় না, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। কখনও কখনও, তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী, কোন কোন কর্ম্মচারী বা আত্মীয়, তাঁহাকে position রাখিয়া চলিতে শিখাইবার চেষ্টা করিলে,—তিনি গোপনে হাসিতেন ও বলিতেন,—'হেঃ! কি পোজিসন্?"

শেষের দিনে, যখন ভূকৈলাসের বাসগৃহে ছিলেন, তখন আমার বোধ হইত যে, ইনি মহারাজ তো নহেন, মহাদেব। এমনই আশুতোষ, ভোলানাথ তিনি! প্রেমে, বিনয়ে বিভোর। কি ভুলিতেন? অহঙ্কার!

তাঁহাপেক্ষা সামান্য ব্যক্তিগণেরও নাসিকা-কুঞ্চনে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, অথচ এই ক্রোড়পতি, বিদ্যাবুদ্ধিমানসত্ত্বে উচ্চ মহারাজা, আমাদের সহিত নিতান্ত আত্মীয়-বন্ধুর মত,—কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত ব্যবহার করিতেন, ভাবিলে, তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব ভাবিয়া অবাক্ হই! এমন মহারাজা কি রাজর্ষি পদবাচ্য নহেন?

(২) বিলাস-শূন্যতা। মহারাজা আহারে বিহারে সামান্য সাদাসিধে চালে চলিতে ভালবাসিতেন। কখনই উচ্চ কলারের, পেনামা হেটের বা রেশ্‌মি নেক্‌টাইয়ের গৌরবে, নিজেকে গৌরবান্বিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন না। যা না হইলেই চলে না, তাহাই পরিধান করিতেন।

অনেক সময়ে, ছেঁড়া জুতো, বা কাপড়েও মহারাজাকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। কেহ কোন কথা ইহার বিরুদ্ধে বলিলে বলিতেন,—"যাও! কি হবে? আমি ওসব চাই না।"

আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন,—"প্রজাগণের ও শাসন-প্রণালীর উন্নতিই আমার একমাত্র বিলাস-সামগ্রী।" রাজর্ষি আর কাহাকে বলে?

একদা আমি ও সাবেক দেওয়ান মহাশয়ের পুত্র তাঁহার সহিত, বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছি। সাতু বাবু বলিলেন,—"দেখুন দেখি! অমুক এই বাড়িতে কেমন রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন! আর আপনি সামান্য ভাবেই জীবন কাটাইলেন!"

মহারাজা সাতকড়ি বাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সহাস্যে বলিলেন,—

"সাতু বাবু! আজ তো তোমার রাজা বড় গাড়ি ও ধুমের জুড়ি লইয়া মজা করিতেছেন,—একদিন তো বাঁসের দোলাতে চেপে, না হয়, হুগ্গরথাটে শুয়ে, শ্মশানঘাটে যেতে

হবে। তখন এ বাড়ি ও জুড়ি ও তবলায় চাটী কোথায় থাকিবে?"

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা দ্বিপ্রহরের পর, কালীঘাটের শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী, কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে, গঙ্গা-তীরে, মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুরকে, বহ্নিমান চিতানলের মধ্যে, শান্ত শিশুটীর মত, শোকদুঃখজরা প্রভৃতির হস্ত এড়াইবার জন্য, বিশ্বজননীর অনন্ত-ক্রোড়ে শয়ান দেখিয়া, ও সাতু বাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঐ পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া, চক্ষের সজলতা নিবারণ করিতে পারিলাম না। খ্রীঃ ১৮৭২ তে জন্ম। ১৯১২ তে মৃত্যু।

যিনি সামান্য বসন ও ভুষণে সন্তুষ্ট থাকিয়াও,—যোগী ও সংযমীর ন্যায়, সংসারে বিচরণ-কালে, লোক-হিতার্থে আনন্দমনে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছিলেন,—জন-সমাজ ভাল করিয়া, সেই রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রকে জানিবার অবকাশ পাইল না।

জন-সমাজ আত্মধ্বজী,—শক্তিশালী ব্যক্তির পদলেহনকারী,—বিলাসভোগরত,—স্বার্থপর, কপট, চতুর ব্যক্তিগণের বাক্যজালে মোহিত ও জড়িত। সংসারে মেকীরই আদর বেশী। তাই, কবি গাহিয়াছেন,—'ধন্যরে কলিযুগ! মহিমা তোহারি! দুঃখ লাগে আর হাসি!"

আর ভারত-সমাজে, চৈতন্য নিত্যানন্দ নাই,—রামমোহন দেবেন্দ্র নাই,—দয়ানন্দ রামকৃষ্ণ নাই,—হরিশ্চন্দ্র রামগোপাল নাই, বিদ্যাসাগর বঙ্কিম নাই, হেমচন্দ্র নবীন নাই। এখন, অকপট মধুর-হৃদয় লোক সহসা দেখা যায় না,—হৃদয়ের দিকটা কমিতেছে,—জীবনসংগ্রামে মস্তিষ্কের দিক বাড়িতেছে। ইহাকেই বলে সভ্যতা!

(৩) সৌজন্য,—একদিকে যেমন, বড় বড় রাজকর্ম্মচারী ও উচ্চতর ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রীরামের নম্র ব্যবহার ছিল,—আমাদের মত ও অন্যান্য সকল অধীনস্থ ব্যক্তি ও প্রজাবৃন্দের প্রতিও, তেমনি, সমান অকপট ব্যবহার ছিল। উচ্চের প্রতি ভয়জনিত ভক্তি ও নিম্নস্থ লোকগণের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঔদ্ধত্য শ্রীরামে একদিনও লক্ষিত হয় নাই। সাধারণ প্রজা ও সামান্য ভৃত্যকেও সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। কখনও কাহারও প্রতি কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার করিতে, আমি তাঁহাকে দেখি নাই।

(৪) গুরুভক্তি।—শৈশবের অভিভাবক কিডেল ও তাঁহার পত্নীকে চিরদিন নিজের বাসাবাটী বেল্‌ঘোরিয়ার অট্টালিকায় রাখিয়া, গুরুর মতই সেবা করিয়াছেন। তাঁহারাও শ্রীরামকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন,—শ্রীরামও যথোচিত ভক্তিসহকারে দেবতার ন্যায় তাহাদিগকে যত্ন করিতেন। একদিনও কোন অভক্তি-সূচক কথা ও ব্যবহার শোনা বা দেখা যায় নাই। কিডেলকে প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পুলিশের সুপারিণ্টেডেণ্ট পদে প্রায় সহস্রাধিক টাকা মাহিনাতে রাখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া কিডেল-পত্নীকেও কত দিতেন ও বাড়ি ও সমুদায় গাড়ি ঘোড়া চাকর অমনি পাইতেন।

সুযোগ্য মোহিনী বাবুকে জুডিসিয়েলসেক্রেটারী, জজ ও পরে দেওয়ান-পদে, প্রায় এক সহস্র টাকা মাহিনা দিতেন। ৺গোবিন্দচন্দ্র মহাপাত্রকে প্রধান এসিষ্টেণ্ট জজ ও তৎপরে আমি সেটেল্‌মেণ্ট ও সার্ভে কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলে, আমার স্থানে নিযুক্ত করেন।

৺শ্রীহরিপ্রসাদ দাসকেও দেওয়ানের সহকারী ও সব্‌ডিভিজনাল অফিসার কার্য্যে শেষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

৺শ্রীহরিপ্রসাদ দাসকেও দেওয়ানের সহকারী ও সব্‌ডিভিজনাল অফিসার কার্য্যে শেষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

তিনি কাহাকেও ভুলিতেন না। নিজের খুল্লতাত ছোটরায় মহোদয় সে কালের লোক ছিলেন। কাজে কাজেই, অনেক বিষয়ে মত-বিরোধ হইলেও, পিতৃব্যের যথোচিত সম্মানের কোন দিনই ত্রুটি হয় নাই।

খুল্লতাত বৃন্দাবনচন্দ্র স্নেহশীল হইলেও, ক্ষত্রিয়বংশের শোনিতের গুণে, মতভেদ হইলে প্রতিবাদ করিতে ছাড়িতেন না। তিনি শ্রীরামকে অকপট ভাবে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, কারণ শ্রীরাম তাঁহার ক্রোড়েই পিতৃহীন অবস্থায় মানুষ হন।

(৫) হরিভক্তি। শ্রীরামের চরিত্রে পিতা মাতার অহেতুকী ভক্তির স্বাভাবিক লক্ষণ সর্ব্বদাই নয়নগোচর হইত। হরি-কথায়, হরিগুণগানে ও হরিনাম কীর্ত্তনে, সর্ব্বদাই তিনি আনন্দ লাভ করিতেন। যদি হরিনামে লোভ না থাকিবে, তবে প্রতি সন্ধ্যায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মাতিতেন কেন? তবে, হরিনামানন্দরসে রসিকের মত মগ্ন হইতেন কেন? তবে, শ্রীহরিচরণারবিন্দ-ধ্যানে, মধুপানে বিভোর ভৃঙ্গের মত, মাতোয়ারা হইতেন কেন? যদি তাহাই না হইবে, তবে, আজীবন নয়ন মেলিয়া নয়নাভিরামের দিকে চিত্তকে ধাবিত করিতেন কেন, এবং সময়ে সময়ে চক্ষুমুদিত করিয়া, হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে, কাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতেন?

হরিনামের অধিকার থাকিতে হইলে, যে যে গুণের প্রয়োজন, তাহা স্বর্গীয় রাজর্ষির চরিত্রে, পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল।

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

পরম হিন্দু মহারাজা তৃণাদপি বিনয়ী,—তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও নিজে অভিমান শূন্য এবং অন্যের প্রতি মানদ ছিলেন। ইঁহার যদি হরিনামে অধিকার না থাকিবে তো কাহার থাকিবে? তিনি দাম্ভিক ও ধর্ম্ম-ধ্বজী ছিলেন না। তিনি কোন দিন হিন্দুত্ব অস্বীকার বা তৎপ্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই।

সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে, অধ্যাত্ম-তত্ত্বের গভীর অনুসন্ধানে, অনেক সময়ে এই অকপট হরিভক্তি, তাঁহার চিত্তকে নিযুক্ত করিত।

তবে, লোকালয়ে বিজ্ঞাপন দিয়া, এরূপ কার্য্য তিনি করিতেন না। নীরবে, নিজের নিভৃত প্রকোষ্ঠে, কখন কখনও নিতান্ত নিজের লোকের নিকটে, তিনি হরি-সাধন করিতেন।

তিনি মহারাজা হইলেও ব্রহ্মান্বেষমান অনিসন্ধিৎসু এবং একজন আদর্শ হিন্দু নর-পতি ছিলেন, তাই, তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া উল্লেখ করিলাম। তাঁহার জীবদ্দশায়, তিনি ঐ আখ্যার যোগ্য থাকিলেও, নানা কারণে, জনসমাজে তাঁহার পরিচয় দেওয়া উপযুক্ত মনে করি নাই।

তিনি মহারাজা হইলেও যোগী ও সন্ন্যাসীর মত ত্যাগী ও সংযমী ছিলেন। তিনি ধন-বান হইলেও, নিরহঙ্কারী ও ভক্তিমান ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী ভক্ত ও মহন্তের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া বলিয়া-ছেন,—

"আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিয়ে মান।"

এ লক্ষণ রাজর্ষি ও ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রে পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান ছিল।

(৬) লোকহিতৈষণা। কেবল রাজ্য-শাসন বিষয়ে তাঁহার ত্যাগ ও কৃতিত্বের জন্যই শ্রীরামচন্দ্র প্রস্তরমূর্ত্তি পাইবার যোগ্য, কিন্তু তাহা ছাড়াও, নানা লোক হিতকর ব্যাপারে তাঁহার বহির্ম্মুখী চেষ্টা ছিল। (১) কলিকাতা রেফিউজের ইনি একজন প্রতিষ্ঠাতা। (২) নিজ রাজধানীর চারিদিকে শত শত মাইল রাস্তা, (৩) রূপ্‌সা হইতে বারিপদা পর্য্যন্ত ৩০ মাইল রেল ও বাঙ্গরিপোগী পর্য্যন্ত উহার বিস্তারের চেষ্টা, (৪) ভিক্‌টোরীয়া ডায়মণ্ড জুবিলী সাধারণ পুস্তকাগার, (৫) ময়ূরভঞ্জ কুষ্ঠাশ্রম, (৬) মহারাণী লক্ষ্মীকুমারী ধর্ম্মশালা, (৭) বারিপাদ অনাথ আশ্রম, (৮) বারিপদা এণ্ট্রান্‌স্ স্কুল প্রভৃতি মহারাজার লোকহিতকর চেষ্টার বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে।

তিনি জীবিত থাকিলে, বারিপদায় কলেজ হইত এবং বাহাল্‌দা এণ্ট্রান্‌স্ স্কুল ও অন্যান্য নানা হিতকর ব্রতের অনুষ্ঠান হইত।

(৭) রাজভক্তি। ব্রিটীস্ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার সত্য সত্যই প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সেই অনুরাগের গুণেই, নিজ রাজ্যকে ব্রিটীস্ রাজ্য শাসন প্রণালীতে পরিচালিত করিবার চেষ্ট করেন।

কোনও দিন তাঁহার মুখে, ইংরাজ বিদ্বেষের একটীও কথা শুনি নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিশক্তির বলে, তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড ব্যতিরেক ভারতের মুক্তি অসম্ভব, তাই বিধাতা সাত সমুদ্র তেরনদী পারে, এবয়নার তেজপাতের দোকানের মধ্য দিয়া, অদ্ভুত যাদু বিদ্যার বলে এই অলৌকিক সাম্রাজ্যের স্থাপনা করিয়াছেন।

বিধির বিধান খণ্ডায় সাধ্য কার? প্রথমে সংবাদ পত্রে যখন রুষ ও জাপ যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ পায়, তখন মহারাজার সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে আমার কথাবার্ত্তা হয়। তিনি বলিলেন যে, "নিশ্চয় দেখিবেন জাপান জয়লাভ করিবে। কারণ ইংরাজ ইহাদের সহায় ও জাপ নিজের শক্তি না জানিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই।" ইংরাজের উপর ইহাঁর গভীর আস্থা ছিল।

তবে, সময়ে অসময়ে, বাঙ্গালীকে গালি-দিয়া ও নিজের ইংরাজ-বিদ্বেষ গোপন করিয়া, যাঁহারা, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে, অভিনেতাদের মত, রাজভক্তির পরাকাষ্ঠার আত্যন্তিক আধিক্য দেখান, সে প্রকৃতির মর্কট-রাজভক্তি তাঁহার ছিল না। কোন বিষয়েই জেঁকো, হাম্‌বড়া ভাব তাঁহার ছিল না। তিনি "আপকি-ওয়াস্তে"ও ছিলেন না,—নীরব স্নেহশীল, ভক্ত, অকপট হৃদয়ের যে ভক্তি তাহাই তাঁহার ছিল। তাঁহার রাজভক্তি এই জাতীয়।

শ্রীরামচন্দ্রের আমলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি।

স্বর্গীয় মহারাজা যদুনাথ ভঞ্জের আমলে একলক্ষেরও কম আয় ছিল। শ্রীনাথ ভঞ্জের আমলে কিছু বর্দ্ধিত হয়। তৎপরে, মহারাজের পিতার আমলে, প্রায় তিন লক্ষের অধিক হয়। শ্রীরামচন্দ্রের নাবালকির সময়ে, উহা প্রায় পাঁচ লক্ষ হয়। ম্যানেজার সাহেবের পর, মহারাজার হস্তে কুড়ি বৎসর রাজ্যভার ছিল। ঐ বিশ বৎসরে, প্রায় পূর্ব্ব আয়ের তিন গুণ আয় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

আমি ১৮৯৫ সালে, ময়ূরভঞ্জে প্রথম প্রবেশ করি, তখন সাড়ে সাত লক্ষ টাকা আয় ছিল।

১৯০৯ সালের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখি

যে, কর্জ জমা পেন্‌সন্ চাঁদা ও ব্যাঙ্কের প্রেরিত টাকা এবং আন্যান্য নানা বাবৎ ছাড়া, ১২ লক্ষ, ৬৭ হাজার, ৮৯২৴৫ এবং ইহার সহিত সর্দ্দার ও প্রধানদিগকে প্রদত্ত তহসিল খরচ ১,১০,০০০ যোগ দিলে, মোট আয় ১৩,৭৭,৮৯২৲ টাকা হইবে।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, মহারাজার উন্নত রাজ্য-শাসন-প্রণালীতে, কুড়ি বৎসরে, প্রায় তিন গুণ আয় বাড়িয়াছে। ১৮৯৭-৮ খ্রীঃ ভূমিরাজস্ব বিভাগের বার্ষিক বিবরণ আমি লিখিয়াছিলাম। তাহাতে ভূগর্ভস্থ খনিজ বৈভবের কথা উল্লেখ করিয়া,ভবিষ্যতে উহার উদ্ধারের কথা ভবিষ্যদ্বাণী রূপে লিপিবদ্ধ করি। সেই ইঙ্গিতের ফলে, আজ টাটার, এসিয়া খণ্ডের মধ্যে প্রধান, লৌহখনির কারবারের সূচনা হইয়াছে। মহারাজা বাঁচিয়া থাকিলে, এ বৎসর আরও কত খনিজ বিষয়ের উন্নতির সূচনা হইত।

খ্রীঃ ১৮৯৫ সালে জঙ্গল বিভাগ ছিল না। ১৮৯৯-১৯০০ সালে জঙ্গল বিভাগ আমার হস্তে আসে ও সমুদায় দুষ্টলোক তাড়িত হয়। সেই বৎসর, ঐ বিভাগের আয়, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও, ৬৮, ২৭৬৲ টাকা হয়। ১৯০৯-১০ সালের প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ঐ বিভাগের আয়, ঐ বৎসর ৫,৩০,২৬০ টাকা হইয়াছিল। গত দুই বৎসরের আয় এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

পূর্ব্বকালে বাঁশের নলের দ্বারা জমির মাপ হইত। আমি ১৮৯৭-৯৮ সালে ঐ বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হই এবং প্রথমত কিস্তওয়ার বা কেডেষ্ট্রেল সার্ভে বহুল ভাবে ময়ূরভঞ্জে প্রচলিত করি এবং ঐ সেটেলমেণ্ট কার্য্যের ভবিষ্যৎ পরিচালনা বিষয়ে একটী প্রণালী স্থির করি। উড়িষ্যা গড়জাৎ রাজ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও বিভাগীয় কমিশনার মেরিভিন্ সাহেব, ঐ প্রণালী বিষয়ে মহারাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ১৯০০ সালের ৪ঠা মে তারিখের ইনস্‌পেক্‌সন্ নোটে; উহার অনুমোদন করেন। শুনিতে পাই, এখনও সেই প্রণালীতেই কার্য্য চলিতেছে ও চলিবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর এম্-এ, বি-এল্, মহোদয় দেওয়ান। তিনি স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঘোষাল মহাশয়ের পরে ঐ পদে বাহাল হন। ইনি স্বর্গীয় মহারাজার শিক্ষক ছিলেন ও ধার্ম্মিক ও সুযোগ্য ব্যক্তি। ইহাঁর পরামর্শে ও চেষ্টায় রাজ্যের নানা বিষয়ে উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ইনি পূর্ব্বে জজ ছিলেন। ইনি দেওয়ান হইলে,আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিনাথ বসু মহাশয় জজের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে, ইনি জজের প্রধান এসিষ্টেণ্ট ছিলেন। ইনি অতি প্রশংসার সহিত প্রধান বিচারকের কার্য্য করিতেছেন।

ইঁহাদের ও অন্যান্য নানা সুশিক্ষিত ও সাধুশীল,চরিত্রবান কর্ম্মচারিগণের কর্ম্মফলেই রাজ্যের এতটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।

যবনিকার পতন।

রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র নীলগিরি রাজ্য হইতে গত বর্ষের আগষ্ট মাসের শেষ তারিখে আমাকে লেখেন যে,—"আপনি আমার পাইকালী নাচের বিষয় কিছু করুন।**আপনার উপযুক্ত কোন কার্য্য আমি এখন দেখিতেছি না, তবে উহার সুযোগ হইলে আপনাকে ভুলিব না। আশা করি আপনি ভাল আছেন। আপনার অকপট শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব।"

তাঁহার এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, পাই-কালী সমর-নৃত্য, মহামান্ত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কলিকাতা দরবারে প্রদর্শিত হইলেই, করিন্থিয়ান থিয়েটারে মৌরভঞ্জ ভেরাইটী এণ্টার্টেন্মেণ্ট ট্রুপ নাম দিয়া, নানা দেশীয় নাচের সংমিশ্রণে, এক অভিনব নৃত্যাভিনয়ের বন্দোবস্ত আমাকে করিতে হয়। নানাদেশ, নানা লোক, নানা থিয়েটার কোম্পানী উহা দেখিতে ও দেখাইতে চাহিতেছিলেন। অন্ততঃ একমাস কাল কলিকাতায় ঐ নৃত্য হইবে এই প্রকার স্থির ছিল। কিন্তু জানি না কাহার মারাত্মক বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া, মহারাজা নৃত্য ছাড়িয়া, বনে মৃগয়াতে যাওয়ার স্থির করিলেন। হঠাৎ এ কার্য্য হইল। আমি শতবার বলিয়াও সে মন ফিরাইতে পারিলাম না।

ভবিতব্য নিবারণ করা অসম্ভব। শিকারে কে যমদূত হইয়া, মহারাজের প্রতি গুলি করিল, তাহা সুনিশ্চিত ভাবে জানা যায় নাই। নানা গুজব শুনা যায়। ইহার অনুসন্ধান ও সত্য বিবরণ প্রচার প্রয়োজন। লোকের মনে নানা কল্পিত বিষয়ের কথা উদিত হইতেছে এবং হয়তো, কতই নির্ম্মল-চরিত্র শিকারীর উপর সন্দেহ পতিত হইতেছে।

কে সেই মন্দভাগ্য ব্যক্তি, যাহার গুলি মহারাণীকে বিধবা করিল,—মহারাজ-কুমার-গণকে পিতৃহীন করিল,—তাঁহার ভ্রাতাগণকে ভ্রাতৃহীন করিল,—ময়ুরভঞ্জের প্রজাগণকে অনাথ করিল,—আমাদিগকে বন্ধুহীন ও অসহায় করিল,—এবং ভারতী মাতাকে এই দুঃখের দিনে, একটী অমূল্য অঞ্চলের নিধি হইতে বঞ্চিত করিয়া, শূন্যক্রোড় ও ভূষণহীনা করিল? মহারাজের মৃত্যুতে আমার যে কি ব্যক্তিগত ক্ষতি ও পরিতাপের বিষয় হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব? এখন মনে হয় যেন, নাচিতে নাচিতে, পূর্ণকাম মহারাজা, এই শোক-দুঃখময় সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে, হঠাৎ গোপনে চলিয়া গেলেন,—যেন সেই আ-সম্রাট-লোকচিত্তহারী নৃত্যকলার অভিনয়ের মধ্যেই হঠাৎ যবনিকার পতন হইল,—যেন সেই নৃত্যকলার প্রকটিত আনন্দলীলার মধ্যে,জীব-হিংসাকারী নিষ্ঠুর শিকার ও সর্ব্বনাশকারী বিষময় অসৎসঙ্গ মহারাজার সাত্ত্বিক প্রকৃতির অনুকূল হইল না বলিয়া, এই বিশ্বরঙ্গভূমের নটরাজ, ছলবলে, তাঁহাকে পুণ্যতর,—উন্নততর সমাজে ও লোকে, নিত্যানন্দ-লীলায় চিরমগ্ন করিতে, যেন, নেপথ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং জরামৃত্যু-রোগশোকের উভার চিরদিনের জন্ত যবনিকার নিঃশব্দ পতন হইল।

এই সুমধুর প্রকৃতির লোকের জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ যে এমন বিষময় ও যন্ত্রণাদায়ক হইবে, তাহা জানিতাম না,—জানিলে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আনন্দলীলার অন্তরঙ্গ হইয়া,সেই নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে, পণ্ডিত ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-রচিত এই গানটী দিতাম না,—জানিতাম না যে, এই গানটী তাঁহারই শেষ অবস্থার বর্ণনা-সূচক,—

"কানেড়া—আড়াঠেকা।
মন হুহু করে, কেন রে?
বসে থাকা দায়, প্রাণ যায়,
বুকে বাণ বিঁধে, যেন রে!"

কে জানিত যে, নাচিতে নাচিতে, মহারাজা জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিবেন? কে সেই ব্যক্তি,যে তাঁহাকে এই নৃত্যানন্দ ছাড়িয়া,সেই মারাত্মক জীবহিংসা-কারী আমোদে যোগ দিতে লইয়া গেল? সে জানিত না যে

সে আমাদের ও জনসমাজের কি সুমহান অমঙ্গল করিল?

শেষ আশা ও ভরসা।

ভগবান্ শোকসন্তপ্ত পরিবারের উপর কৃপাবারি বর্ষণ করুন,—এবং নাবালক মহারাজ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুরকে, জ্ঞান ও ধর্ম্মে বর্দ্ধিত ও চিরজীবী করিয়া, পিতৃপদাঙ্কানুগামী করুন! ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

আশা করি, মহামান্য ব্রিটীস-গবর্ণমেণ্ট শোকবিধুরা মহারাণী, মহারাজ-কুমার ও কুমারীর, মহারাজের ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনের এবং তাঁহার প্রজাগণের সুবন্দোবস্ত করিবেন। ভারত-গবর্ণমেণ্ট। পূর্ব্বকাল হইতেই, পূর্ব্ব মহারাজগণকে "কদর্দান্ দোস্তান" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন। হিস্ এক্সেলেন্সী বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় ও হিস্ অনার বঙ্গাধিপতি মহারাজকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। আশা করি, তাঁহার উত্তরাধিকারীও সেই স্নেহেরও উত্তরাধিকারী হইবেন।

"কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি।" স্বর্গীয় মহারাজা নিজ কর্ম্মফলে চিরজীবী তো হইবেনই। আমরা ভরসা করি, তাঁহার পদস্থ ও ধনবান বন্ধুগণ এমন একজন মহাত্মার স্মৃতিরক্ষায় ব্যবস্থায় কোনই ত্রুটী করিবেন না। *

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

সংখ্য-সূত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈরাগ্য।

এই অধ্যায়ে প্রকৃতির কার্য্য স্থূল পঞ্চ মহাভূত, প্রকৃতি হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম, দুই প্রকার শরীরের উৎপত্তি বিবরণ, পুরুষের বিভিন্ন যোনিতে গতি প্রভৃতি এবং জ্ঞান বৈরাগ্য সাধনের বিবরণ আছে।

১। অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হয়।

সূক্ষ্ম ভূত বা তন্মাত্রা হইতে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। অথবা অবিশেষ প্রকৃতি হইতে সত্ব (শান্ত) রজঃ (ঘোর) এবং তমঃ (মূঢ়) এই তিন ভাবের···যাহার শান্ত ঘোর মূঢ়াদি বিশেষ রূপ নাই, তাহাই অবিশেষ।)

পাতঞ্জল দর্শনে আছে যে, ভূত সকলের চারি অবস্থা—অলিঙ্গ, লিঙ্গ, অবিশেষ ও বিশেষ। অলিঙ্গ—মূল প্রকৃতি; লিঙ্গ অহঙ্কার, অবিশেষ-উৎপত্তি হয়, তন্মাত্রা আর বিশেষ স্থূল ভূত। বিলাতী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের Homogeneous ও অবিশেষ বোধ হয় একার্থক।)

২। তাহা হইতে শরীরের আরম্ভ হয়।

তাহা হইতে অর্থাৎ বিশেষ বা স্থূল ভূত হইতে মাংসাদিযুক্ত স্থূল শরীর হয়। অথবা পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ব হইতে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় বিধ শরীর সৃষ্টি হয়। (বিঃ)

৩। সেই বীজ হইতেই সংসার।

শরীর উৎপত্তি বীজ বা নিমিত্ত কারণ—ধর্ম্মাধর্ম্ম। যতকাল ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, ততকাল শরীর থাকে, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরুদ্ধ হইলে শরীর গ্রহণ হয় না। (অবিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, উক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্বই সংসার বীজ। শরীরে অবস্থিত হইয়াই

* ভ্রমসংশোধন—এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রথম ছত্রের শেষে ১৯০৩ না হইয়া ১৮০৩ হইবে। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

উপাধিদ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ভোগার্থ দেহান্তর হয় ও সংসারে গতাগতি হয়।

"মানসং মানসৈবায়ং উপভুঙ্ক্তে শুভাশুভং।
বাচা বাচা কৃতং কর্ম্ম কায়েনৈবতু কারিতাং॥"

পূর্ব্ব সৃষ্টির করণ দ্বারাই পর সৃষ্টিতে ভোগ হইয়া থাকে।

৪। বিবেক জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত অবিশেষাদির প্রবর্ত্তন হয়।

বিবেক জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ভূত তন্মাত্রগণের শরীরোৎপাদিকা শক্তি (?) থাকে। প্রলয় কালেও থাকে। (অবিঃ)

অবিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বর অনীশ্বরত্বাদি বিশেষ রহিত সকল পুরুষেরই বিবেক জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারে প্রবর্ত্তন হয়। (বিঃ ভিঃ)

৫। ইতরের উপভোগ হেতুও হয়।

ইতর অবিবেকী আত্মার উপভোগ অর্থাৎ কর্ম্ম ফল ভোগ জন্যও বিশেষাদির বা তাহা হইতে উৎপন্ন শরীরের বা সংসারের উক্ত রূপে প্রবর্ত্তন হয়। (অনিরুদ্ধে এই সূত্র নাই।)

৬। সম্প্রতি উভয় দ্বারা পরিমুক্ত থাকে।

এই সূত্রে অনিরুদ্ধের পাঠ "পরিষ্কক্ত; আর বিজ্ঞান ভিক্ষুক পাঠ "পরিমুক্ত"।

অনিরুদ্ধের অর্থ—সংসার দশায় ধর্ম্মাধর্ম্ম এই দুয়ের দ্বারা পরিষ্কক্ত, বিমিশ্রিত, জড়িত বা অনুবিদ্ধ থাকে। প্রলয় হইলেও সে ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা শরীর বীজ নষ্ট হয় না। পরে সৃষ্টিকালে, তাহা হইতেই আবার শরীর হয়।

বিজ্ঞান ভিক্ষু (পরিমুক্ত পাঠ অনুসারে) ইহার অর্থ করেন—সংসার দশাতেও পুরুষ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে পরিমুক্ত থাকে। কারিকায় আছে—

"সংসরতি নিরূপ ভোগং ভাবৈরধিবাসিতং।

ভাবৈঃ—অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বাসনাদি দ্বারা॥

অথবা "উভয়" শব্দের অর্থ—অবিশেষ ও বিশেষ। উভয়ই শরীরের কারণ।

৭। স্থূল শরীর প্রায়ই মাতৃ পিতৃজ। অপর শরীর সে রূপ নহে।

স্থূল শরীর প্রায়শঃ যোনিজ। যোনিজ ব্যতীত স্থূল শরীর অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ হইতে পারে। মৃত্যুতে স্থূল শরীরের নাশ হয়, সূক্ষ্ম শরীর থাকে। সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টির প্রথমেই উৎপন্ন। কারিকায় আছে—

"পূর্ব্বোৎপন্ন মসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তং।
সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং॥"

অতএব লিঙ্গ শরীর নিত্য। তবে প্রলয়ে তাহার নাশ হয়। তাহা দ্বিপরার্দ্ধ কাল স্থায়ী। গতিকালে উৎসর্গ অভিপ্রায়ে ভোগের অভাব উক্ত হইয়াছে, কদাচিৎ বায়বীয় শরীর প্রবেশের পর গতিকালেও ভোগ হইয়া থাকে। অতএব যমমার্গে সুখ দুঃখ ভোগ হয়।

(৩)

৮। যে শরীর পূর্ব্বোৎপন্ন পথ ভোগাদি তাহারই কার্য্য,—যে হেতু সেই একেরই ভোগ,—অপরের হয় না।

স্থূল শরীরের ভোগ গৌণ। মৃত শরীরে ভোগ নাই। আদি সৃষ্টি কালে ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ নিমিত্তের দ্বারা সূক্ষ্ম ভূতাদি যোগে সূক্ষ্ম

শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে তাহাতে ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা স্থূল শরীর বার বার উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম শরীরেই সংস্কার থাকে, তাহাতেই ভোগ হয়। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব জ্ঞান সেই লিঙ্গ শরীরেরই কার্য্য। পুরুষ লিঙ্গ শরীরকে উপাধি করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে।

৯। সপ্তদশ এক—লিঙ্গ শরীর।

বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, এই অষ্টাদশ তত্ত্ব মিলিয়াই সূক্ষ্ম শরীর। (অণিঃ)।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—এ সূত্রের অর্থ এই যে, সপ্তদশ মিলিয়া এক লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর হয়। বুদ্ধি একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ১৭টী লিঙ্গ শরীরের উপাদান বা উপকরণ। শরীর আধার আধেয় ভেদে দ্বিবিধ। সূক্ষ্ম শরীরকে সপ্তদশ তত্ত্বের সমষ্টি রূপে এক বলিয়া জানিতে হইবে। তাহাই ব্যষ্টি ভাবে প্রতি জীবে বিভিন্ন হইয়াছে। অহঙ্কার বুদ্ধি তত্ত্বের অন্তর্গত। অহঙ্কারকে স্বতন্ত্র গণনা করিবার আবশ্যক নাই। লিঙ্গ শরীরকে সর্ব্বত্র সপ্তদশ তত্ত্ববিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাকে অষ্টাদশ তত্ত্বযুক্ত বলিলে ভুল হইবে। এস্থলে লিঙ্গ শরীর যে এক, তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জন্য পরসূত্রে ব্যক্তি ভেদের কারণ বুঝান হইয়াছে।

লিঙ্গ শরীর স্থূল শরীরের ন্যায় অবয়বী নহে। বুদ্ধিরই ভোগ হয়, এজন্য লিঙ্গ দেহ ভোগের আয়তন। প্রাণ অন্তঃকরণের বৃত্তি—তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্য লিঙ্গ শরীরও প্রাণযুক্ত। চেষ্টা-ন্দ্রিয়ে আশ্রয়ই শরীর। (ন্যায় দর্শন।)

১০। কর্ম্মবিশেষ হইতে ব্যক্তি ভেদ হয়।

সব লিঙ্গ শরীর সমান হইলেও কর্ম্ম বা ধর্ম্মধর্ম্মাদিরূপ শরীর বীজের প্রভেদ থাকায় স্থূল শরীরে ভোগের তারতম্য হইয়া থাকে। তাই হস্তী শরীর কীট শরীর প্রভৃতিতে প্রভেদ হয়। (অণিঃ)।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,—লিঙ্গ শরীর এক হইলেও পুরুষ ভেদে নানারূপে তাহার প্রভেদ হয়। তাহাতেই পৃথক পৃথক পুরুষের বিভিন্ন ভোগ সম্ভব হয়?

যদিও সৃষ্টির প্রথমে হিরণ্যগর্ভের উপাধি-রূপ একই লিঙ্গ শরীর হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টিতে তাহা ব্যক্তিভেদ হইয়াছে। ব্যক্তিরূপে অংশতঃ তাহা নানা হইয়াছে। যেমন এক পিতার লিঙ্গ শরীর বিভক্ত হইয়া পুত্র কন্যা-দির লিঙ্গ শরীর রূপে নানা হইয়াছে। কর্ম্ম-বিশেষই এই বহু হইবার কারণ। অনন্ত জীবের ভোগের হেতু নানা কর্ম্ম। তাই লিঙ্গ দেহ নানা হইয়া অনন্ত কর্ম্মভোগের আশ্রয় হইয়াছে। এক এক লিঙ্গ শরীর এক একরূপ কর্ম্মভোগের আশ্রয়।

প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রথমে সমষ্টি বীজভূত কর্ম্ম অঙ্কুরিত হইয়া প্রথমে জীবের সমষ্টি (শরীর) সৃষ্টি হয়। মনুতে আছে—

"তেষাংত্ববয়বান সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমি-
তৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি
নির্ম্মমে।
* * *
তচ্ছরীর সমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈ স্তৈঃ
করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞা সমজায়ন্ত গাত্রেভ্য স্তস্য ধীমতঃ॥

(৪)

এস্থলে যে "ষণ্ণং" বলা হইয়াছে, তাহা সমস্ত লিঙ্গ শরীর উপলক্ষিত।

১১। তাহার অধিষ্ঠান আশ্রয়ে দেহে দেহবাদ হয় বলিয়া তাহারও দেহবাদ হয়।

আত্মা লিঙ্গদেহে অধিষ্টিত বা প্রতিবিম্বিত থাকায়, তাহার ভোগ আপনাতে আরোপ করেন, ইহাতে দেহাত্ম বীজ জন্মে। (অণিঃ)।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, সেই লিঙ্গ শরীরের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানভূত পঞ্চভূতের আশ্রয়েই ষট্‌কোষময় দেহে শরীর ব্যবহার হয়। লিঙ্গ শরীরের সম্বন্ধ বশতঃ তাহার অধিষ্ঠানের বা (স্থূল দেহের) দেহত্ব হয়। অর্থাৎ, শরীরের সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাত্মক আশ্রয়কে দেহ বলা যায় বলিয়া সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহের আশ্রয় স্থূল পঞ্চভূতাত্মক যে স্থূল-দেহ, তাহাকেও দেহ বলা যায়।

"আতিবাহিক একোঽস্তি দেহোন্যস্ত্বাধি
ভৌতিকঃ।
সর্ব্বাসং ভূতজাতী নাং ব্রহ্মণস্তেক
এক কিং॥"

ইহা হইতে দ্বিবিধ সূক্ষ্ম শরীরের কথা জানা যায়:—এক লিঙ্গ শরীর, আর এক অধিষ্ঠান শরীর উভয়ই সূক্ষ্ম শরীর। ইহারা পরস্পর নিয়ত ভাবে আছে। সর্ব্বভূতের এই দুই শরীর থাকিলেও ব্রহ্মার কেবল লিঙ্গ শরীর আছে। (বিঃ ভিঃ)।

কেহ কেহ অধিষ্ঠান শরীরকে আতিবাহিক শরীর বলেন।

১২। যেমন আবরণ ব্যতীত ছায়া থাকে না, ভিত্তি ব্যতীত চিত্র থাকে না, তেমনই আশ্রয় ব্যতীত তাহা স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না।

আত্মা না থাকিলে ও আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র না হইলে দেহে অহং অভিমান হইত না। (অণিঃ)

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন:—অধিষ্ঠান ভূত শরীর ব্যতিরেকে, স্বতন্ত্র রূপে লিঙ্গ শরীর থাকিতে পারে না। স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তর গমনের নিমিত্ত লিঙ্গ দেহের আধারভূত শরীরান্তর স্বীকার করিতে হয়। কারিকায় আছে—

"চিত্রং যথশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা
যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈ র্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং
লিঙ্গং॥"

(বিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্মাখ্য স্থূলভূত। ইহা স্থূলের অবান্তর ভেদ সূক্ষ্মরূপ। এই অধিষ্ঠান শরীর লিঙ্গ শরীর পর্য্যন্ত স্থায়ী।)

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্ম পর্য্যক্তং।"—এই কারিকায় সূক্ষ্মভূত পর্য্যন্ত লিঙ্গ শরীর—এরূপ অর্থ নহে।—মহদাদিরূপ যে লিঙ্গ, তাহাই স্বীয় আধারভূত সূক্ষ্ম শরীর পর্য্যন্ত অনুসরণ করে, ইহাই অর্থ।

যোগবাশিষ্ঠে আছে—

বাসনাভূত সূক্ষ্মঞ্চ কর্ম্মবিদ্যে তথৈবচ।
দশেন্দ্রিয়ং মনোবুদ্ধি রেতলিঙ্গং
বিদবুর্ধাঃ॥

অতএব—বাসনা, সূক্ষ্মভূত, কর্ম্ম বিদ্যা মন ও বুদ্ধি ইহাই লিঙ্গ শরীরের ঘটক।

এই লিঙ্গ শরীর প্রতিপাদক দ্বারা অষ্টপুর ব্যাখ্যাত হয়। উক্ত শ্লোকে সূক্ষ্মভূত অর্থে, তন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই তিন বুঝিতে হইবে। আর উক্ত পঞ্চ এই অষ্টপুর।

১৩। তাহা মূর্ত্ত, যিনি এই পূরে স্থিত, তিনি পুরুষ হইলেও সংঘাত যোগ ব্যতীত থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্ত সূর্য্য।

শরীর মূর্ত্ত পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিমান বলিয়া,

তাহা লিঙ্গসংঘাত যোগ বা অন্যের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত সূর্য্য।

যেমন প্রকাশকত্ব ও মূর্ত্তত্ব থাকিলেও সূর্য্য আত্মা নহে, তেমনি শরীরও আত্মা নহে (অণিঃ)।

সূর্য্য যেমন প্রকাশাত্মক তেজ পদার্থ হইলেও ভৌতিক পদার্থের সঙ্গ ব্যতীত প্রকাশ পায় না, সেইরূপ স্বতঃ প্রকাশ স্বরূপ লিঙ্গ শরীরও ভৌতিক সঙ্গ অধিষ্ঠান শরীর ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। তাহা কেবল আকাশকে প্রশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। (বিঃ ভিঃ)

(৫)

লিঙ্গ শরীর কার্য্য।

১৪। তাহা অণুপরিমাণ ও শ্রুতি অনুসারে তাহা কার্য্য।

মন—অণু পরিণাম ও কার্য্য বলিয়া তাহা আত্মা নহে। আত্মাব্যাপক নিরুপাধি। মন উপাধি। দেহমাত্রই উপাধি। আমার শিরোবেদনা হইয়াছে—দেহে দুঃখবোধ হইতেছে—এস্থলে দেহাবচ্ছিন্ন বৃত্তিলাভে আত্মাতে তাহার প্রতীতি হয়। যুগপৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না বলিয়া মন অনুপরিমাণ। ইহার যুক্তি অন্যত্র দেখান হইয়াছে)। (অণিঃ)।

লিঙ্গ শরীর অণুপরিমাণ। কিন্তু তাহা অত্যন্ত অণু নহে। তাহা হইলে লিঙ্গশরীর নিরবয়ব হইত। তাহার অবয়ব আছে। লিঙ্গশরীর পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন না হইলে উহার ক্রিয়া থাকিত না। শ্রুতিতে আছে—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপিচ।"

ইহাতে লিঙ্গ শরীরের ক্রিয়ার কথা উক্ত হইয়াছে। লিঙ্গ শরীর, মধ্যে বিজ্ঞানাখ্য বুদ্ধিই প্রধান। এইজন্ত বিজ্ঞানরূপ লিঙ্গ শরীরে অখিল কর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে। লিঙ্গ শরীর বিভু হইলে তাহার ক্রিয়া সম্ভব হইত না।

'তৎশক্তি শ্রুতে'—এই সূত্রের এইরূপ পাঠান্তর আছে, তাহা সঙ্গত নহে। এই পাঠ অনুসারে নিম্নরূপ অর্থ হয়—

লিঙ্গ শরীরের শক্তির কথা—শ্রুতিতে আছে—

"তম্ উৎক্রান্তং প্রাণোঽনুক্রামতি প্রাণেহনুৎক্রামন্তং সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানমেব অনুক্রামতি ইতি।···অতএব ইহা সবিজ্ঞান হইয়া বিচরণ করে। (বিঃ ভিঃ)।

১৫। শ্রুতিতে তাহার অন্নময়ত্ব উক্ত হইয়াছে।

শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, মন অন্নময়। অন্নের অভাবে মনের শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হয়—শ্রুতিতে ইহার বিবরণ আছে। শ্রুতিতে আছে—

"অন্নং বৈ প্রাণাঃ প্রাণশ্চ চন্দ্রময়ো জ্ঞেয়ঃ "চন্দ্রমা মনসো জাতঃ।

এখানে অন্ন অর্থে সোম, রবি।

অতএব মন অণু, তাহা আত্মা নহে। (অণিঃ)।

লিঙ্গ শরীরে একদেশ অন্নময়ত্ব বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ আপোময় প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্ ইত্যাদি।

মন ভৌতিক নহে, কিন্তু অন্ন সংসৃষ্ট সজাতীয় পদার্থে অংশ পূরণ হেতু তাহার অন্নময়ত্ব ব্যবহার হয়।

লিঙ্গ শরীর অন্নময়, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন।

শ্রুতি অনুসারে স্থূল শরীরই অন্নময়। সুতরাং লিঙ্গ শরীরকে কিরূপে অন্নময় বলা যায়? বেদান্ত মতে শরীর পাঁচ প্রকার।

তাহাকে কোষ বলে। যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। এই প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ লইয়া লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর। সাংখ্য মতে লিঙ্গশরীর সূক্ষ্ম ভৌতিক। পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশে গঠিত। শ্রুতি অনুসারে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করি, সেই অন্নরস ও তেজের সূক্ষ্মাংশ দ্বারাই সূক্ষ্ম শরীরের পুষ্টি। এইজন্য সূক্ষ্ম শরীরও অন্নময়। ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন-কথা।* (৪)

বাল্য জীবন—মাতুলালয়ে।

কুমারী হ্যান তাঁহার ভগ্নীর সহিত যখন পিতার নিকট প্রেরিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স অনুমান নয় বৎসর। পরবর্ত্তী দুই বৎসর তিনি পিতার কাছেই রহিলেন। পিতা সেনাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত। বালিকা দুটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার পদাতিক ভৃত্যগণের উপর পড়িল। অধীনস্থ সৈন্যদল সহ পিতা কার্য্যোপলক্ষে নানা স্থানে যাইতেন, কন্যা দুটীও সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। সকলে তাঁহাদিগকে শিশু সেনানী বলিয়া ডাকিত ও আদর করিত।

একাদশ বর্ষ বয়সে কুমারী হ্যানকে তাঁহার মাতুলালয়ে লইয়া রাখা হইল। মাতামহী বালিকার সর্ব্বাঙ্গীন ভার গ্রহণ করিলেন। মাতামহ অষ্ট্রাখান খণ্ডের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ছিলেন;—এক্ষণ শরতু অঞ্চলের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত। বালিকাও শরতুতে আসিয়া রহিলেন। কুমারী হ্যান শেষ জীবনে গল্প স্থলে বলিতেন যে, এই সময়ে তাহার ভাগ্যে কখনও আদর, কখনও বা শাস্তি ব্যবস্থা হইত,—ইহাতে এক দিকে তাঁহার পরকাল নষ্ট, অন্য দিকে স্বভাব কঠোর হইতে থাকিত। কিন্তু তাঁহার ন্যায় বালিকাকে এক ভাবে রাখাও সম্ভবপর ছিল না, দেশ শাসন করা বরং সহজ, কিন্তু তাঁহাকে সংযত রাখা বড় সহজ কর্ম্ম নয়, কাজেই ইহাতে তাঁহার মাতামহকেও হার মানিতে হইয়াছিল। শৈশবে ও বাল্যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না। তিনি নিজেই বলিতেন, এই সময়ে "নিতান্ত রোগা ও মর-মর" অবস্থায় থাকিতেন। কখন কখন নিদ্রিতাবস্থায় চলিয়া বেড়াইতেন। এই সকল দেখিয়া বাড়ীর ভৃত্যগণ স্থির করিল, তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। তজ্জন্য খুব 'ঝাড়-ফুঁকের' ব্যবস্থা হইত। তিনি ইদানিং গল্প করিতে করিতে প্রায়ই বলিতেন,—"বাল্যকালে আমাকে যে পরিমাণ পবিত্র জলে স্নান করাইয়াছে, তাহাতে স্বচ্ছন্দে এক খানা জাহাজ ভাসিতে পারে, আর ভূত ঝাড়াইবার জন্য পুরোহিতগণ যে সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন, সে গুলা বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারণ করিলেও ক্ষতি ছিল না, কেননা ফল সমানই হইত।"

কুমারী হ্যান বড়ই উত্তেজনশীল ছিলেন। এই উত্তেজনশীলতা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনেও লক্ষিত হইত। তিনি কিছুতেই কাহারও কর্ত্তৃত্ব বা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে কোন

* গত বারে যাহা ছাপা হইয়াছে, ইহা তাহার পূর্ব্বের অংশ। পাঠকগণ এই অংশ অগ্রে পড়িয়া সেই অংশ পড়িবেন।

বাধা সহ্য করিতে পারিতেন না। বাধা পাইলেই তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। আবার তাঁহার স্নেহশীলতা ও দয়াদ্রচিত্ততা এত অধিক ছিল যে, লোকে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারিত না। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে দ্বেষভাব কিছু মাত্র ছিল না। কেহ অনিষ্ট করিলেও তাঁহার প্রতি দ্বেষ করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি দয়ায় গঠিত ছিল। বাহিরে যে ক্ষণিক ক্রোধ চঞ্চলতা দেখা যাইত, কিছু পরে চিত্তে আর তাহার চিহ্ন মাত্রও থাকিত না।

কুমারী হ্যানের কোন নিকট আত্মীয়াকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন "আমরা মাদাম ব্লাভাস্কিকে বিশেষরূপে জানি। আমাদের কথা প্রামাণিক, কল্পিত নহে। তাঁহার প্রকৃতির সহিত কাহারও সাদৃশ্য ছিল না। তিনি অতীব বুদ্ধিমতী এবং সাহসসম্পন্না, আবার বিলক্ষণ রহস্যপটু ও স্ফূর্ত্তিমতী ছিলেন। তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা-ও-সেচ্ছানুবর্ত্তিতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। সাধারণ বালিকার ন্যায় তাঁহাকে চালিত করিতে যাওয়া কি ঘোরতর ভ্রমের কার্য্য, ইহা কিছু কাল পরে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চঞ্চল শরীর, তরল প্রকৃতি, শৈশবাবধিই প্রেত-জগতের প্রতি তাঁহার এক নির্নিমিত্তক ভয়মিশ্রিত আকর্ষণ, অজ্ঞাত-অদৃশ্য-রহস্যময় অতীন্দ্রিয় গূঢ় বিষয়াদিতে তাহার উন্মাদ কৌতুহলাসক্তি, সর্ব্বোপরি তাহার চিত্তের স্বাধীনতা ও কার্য্যের স্বতন্ত্রতা রক্ষার প্রবল প্রয়াস,—এই সকল চিহ্ন এবং তাঁহার কল্পনা শক্তির প্রাখর্য্য ও অদ্ভুত আবেগ-পূর্ণতা দেখিয়া আত্মীয় স্বজনের বুঝা উচিত ছিল, এ মেয়ে এক ভিন্ন প্রকৃতির জীব, সুতরাং ইহার শাসন-প্রণালীও ভিন্ন প্রকারের হওয়া আবশ্যক। তাঁহার স্বাধীনতায় বাধা না দিলে, তাঁহার বেগময়ী ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া সেই স্বভাবোগ্র চিত্তকে ক্রোধের মাত্রায় চড়াইয়া না দিলে, তিনি বড়ই স্বচ্ছন্দে থাকিতেন। ভৃত্যগণ তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া চলিত এবং আত্মীয়গণও তাঁহাকে "দুঃখিনী মাতৃহীনা শিশু" বলিয়া সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন। তিনি বাল্যেই এতদূর স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠেন যে, প্রকাশ্য ভাবে সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে থাকেন। তিনি পুরুষের জিনের উপর বসিয়া অশ্বারোহণে বহির্গত হইতেন, ইহাতে কেহ কিছু বলিলে গ্রাহ্য করিতেন না, কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতেন না, এবং আচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কিছু মাত্র শঙ্কিত হইতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরবর্ত্তী জীবনের ন্যায় বাল্যেও তাঁহার প্রীতি অনুরাগ নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতিই অধিক মাত্রায় ছিল। সমাবস্থাপন্ন বালক বালিকাদিগকে ছাড়িয়া ভৃত্যদের বালক বালিকাদের সঙ্গে খেলিতে ভালবাসিতেন। এমন কি, পাছে গৃহের বাহির হইয়া রাস্তার মলিন ইতর জাতীয় ছেলেগুলীর সঙ্গে মিশিয়া যান, এই ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদাই চক্ষুর সম্মুখে রাখা হইত। স্বয়ং যে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই জাতীয় সম্ভ্রান্ত কুলীন সমাজকে বাল্য-কাল হইতেই ঘোরতর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন।"

মাতুলালয়ে বাস কালীন কুমারী হ্যানের বাল্য চরিত্র তাঁহার ভগ্নী মাদাম জেলিহোবাস্কী নিম্নোক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাঁরা তখন নগর ছাড়িয়া পল্লীস্থ গ্রীষ্মাবাসে বাস করিতেছিলেন।

"আমরা যে পল্লী বাটীতে থাকিতাম, উহা একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন অট্টালিকা। উহার নিম্নদিকে মৃত্তিকা মধ্য পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, আগম-নির্গম পথগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে। উপরে উচ্চ চূড়া সকল বিরাজ করিতেছে, এবং আশে পাশে অনেক স্থান আছে, যাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে একটা ভয়ের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাটীর নির্ম্মাতা 'পঙ্কুলিদজেফ' নামে খ্যাত। এই বংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে বহুকাল ব্যাপিয়া শরতু ও পেঞ্জা প্রদেশের শাসন দণ্ড পরিচালন করেন। পেঞ্জা প্রদেশে ইঁহারাই কুলে ও সম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই বাড়ীটী মধ্যযুগের কোন গড়ের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হইত। সত্বাধিকারীর পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি এই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। উক্ত কর্ম্মচারী একটী ভয়ানক অত্যাচারী লোক ছিলেন। সে অধীন প্রজাদিগের কুকুর অপেক্ষাও অধম মনে করিত। ইহাকেও সকলে অভিসম্পাৎ করিত। ইহার পাশব অত্যাচারের অন্ত ছিল না। অনেক প্রজা ইহার হাতে প্রহার খাইয়া প্রাণ দিয়াছে; অনেকে ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় কারাগর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া হাহাকার করিত। মাদাম পিগ্নুর পূর্ব্বে পঙ্কুলিদজেফদের গৃহে ক্রমগত পঁচিশ বৎসর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তিন পুরুষ ঐ পরিবারের বালক বালিকারা ইহঁার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করে। তিনি আমাদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলে তাঁহার নিকট এই সকল অত্যাচার কাহিনী শুনিতাম। ভৌতিক গল্পেও আমাদের মস্তক পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শুনিতাম, যে সকল প্রজারা হত হইয়াছে, তাহাদের প্রেতদেহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নিশাকালে ঘুরিয়া বেড়াইত। কোন যুবতী উক্ত পাপাসক্ত কর্ম্মচারীর অবৈধ প্রেম প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে মন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলা হয়। শুনিতাম, ঐ রমণীর ছায়াদেহ প্রভাতে ও প্রদোষে ভূগর্ভগামী পথের একটী অর্গলাবদ্ধ দ্বার দিয়া যাতায়াত করিত। আমরা তখন বালিকা, এই সকল গল্প শুনিয়া কোন আঁধার ঘর বা পথ পার হইবার সময় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইতাম। আমরা একবার সেই ভূগর্ভনিহিত ভয়ঙ্কর পুরাতন গহ্বরগুলি দেখিবার জন্য ছয়জন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া এবং কতকগুলি মশাল জ্বালাইয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। চারিদিকের মাকড়সার জাল শরীরে জড়াইয়া গেল। দেখিলাম, সেখানে নর অস্থি বা প্রেত-পদলগ্ন শৃঙ্খলাদি কিছুই নাই, কিন্তু কতকগুলি ভাঙ্গা বোতল মাত্র পড়িয়া আছে। কিন্তু কল্পনা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছিল, প্রাচীর-গাত্রে যে ছায়া পড়িয়াছিল, সে গুলিই ভূত। হেলেন (কুমারী হ্যান্) কিন্তু গহ্বরগুলি দুই একবার দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পড়া শুনা এড়াইবার জন্য প্রায়ই সেই অপবিত্র স্থানটাতে গিয়া আশ্রয় লইতেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁর এই লুকাইবার স্থানটার কেহই সন্ধান পায় নাই। শেষে যখন জানা গেল, তখন অন্যত্র না পাইলে শাসনকর্ত্তার রক্ষী সৈনিকগণ সেখানে গিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া তুলিয়া নিয়া আসিত। বাটীর কতকগুলি ভাঙ্গা টেবিল চেয়ার দিয়া ছাত পর্য্যন্ত উচ্চ একটা মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া উহার ভিতর

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া লুকাইয়া তিনি 'সলমনের জ্ঞান-ভাণ্ডার' নামক একখানা পুস্তক পাঠ করিতেন। এই পুস্তক খানা নানা রকম গল্প উপকথায় পূর্ণ ছিল, কখন কখন তিনি উক্ত ভূগর্ভস্থ গহ্বরগুলির গোলক ধাঁধায় পথ হারাইয়া ফেলিতেন। তখন তাঁহাকে সেখানে খুঁজিয়া বাহির করাও দুষ্কর হইত। কিন্তু তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বরং জোর করিয়া বলিতেন, 'আমি কি সেখানে একা থাকি? আমার কত ছোট ছোট খেলার সঙ্গী আসিয়া জোটে, উহা দেখিতে কুঁজো।'

"হেলেন বড়ই চঞ্চল-স্বভাবা ছিলেন। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বয়স যখন বার বৎসরেরও কম, সেই সময় একদিন রাত্রে তাঁহাকে বাটীর ভিতর কোথাও দেখিতে না পাইয়া সকলে ভীতচিত্তে খুজিতে আরম্ভ করিল। খুজিতে খুজিতে দেখা গেল, তিনি মাটীর নীচে একটা লম্বা বারান্দায় পাইচারী করিতে করিতে কোন অদৃশ্য প্রাণীর সঙ্গে গভীর কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন। এরকম অদ্ভুত বালিকা কেহ কোথাও দেখে নাই। তাঁহার প্রকৃতিতে পরস্পর বিলক্ষণ দুইটী ভাব সুস্পষ্ট ভাসমান ছিল,—কেহ দেখিলে মনে করিত যেন বিভিন্ন প্রকৃতির দুইটী জীব একত্র একাধারে বর্ত্তমান। একটী উন্মার্গগামী, স্বেচ্ছাচারী, কলহপ্রবণ; অপরটী চিন্তাশীল, ভাবময়, মহাজ্ঞানীর ন্যায় মনস্তত্ত্বে নিমগ্ন। যখন ইচ্ছা হইত, তখন এরূপ মনযোগের সহিত পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন যে, কিছুতেই তাঁহাকে পুস্তক ছাড়াইয়া আনিতে পারা যাইত না। যতদিন এই ঝোঁক পূর্ণমাত্রায় থাকিত, ততদিন যেন গ্রন্থগুলি গ্রাস করিতে থাকিতেন। মাতামহের বিরাট পুস্তকাগারও তখন তাহার সেই অসীম পাঠ-ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে পারিত না।

"বাটীর সংলগ্ন একটী প্রকাণ্ড উদ্যান ছিল,—একটী উপবন বলিলেও চলে। এখানে কেহ বড় একটা যাইত না। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ভগ্ন কুটীর ও দেবালয় ছিল। উপবনটী একটী ক্রমোচ্চ পর্ব্বতোপরি অবস্থিত, এবং ইহার অপর প্রান্ত এক দুর্গম অরণ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই অরণ্য পথাচিহ্ন-শূন্য, গভীর শৈবাল-জালে আচ্ছাদিত, এবং পলাতক আসামী প্রভৃতি অপরাধীগণের আশ্রয় স্থল বলিয়া খ্যাত। হেলেন যখন দেখিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত গহ্বরগুলিতে গিয়া আর নিরুপদ্রবে থাকিতে পারেন না, তখন এই ভীষণ অরণ্যের আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিলেন।

"হেলেনের কল্পনাশক্তি অতীব বিস্ময়কর। কখন কখন তিনি বালক বৃদ্ধ সকলের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব, অবিশ্বাসযোগ্য নানা গল্প বলিতে থাকিতেন, এবং যেন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এইরূপ নিশ্চয়ের সহিত ঐ সকল বর্ণনা করিতেন। বাল্য হইতেই অকুতোভয়, কিন্তু সময় সময় নিজের কল্পনাসৃষ্ট বস্তুতেই ভয় খাইয়া মূর্চ্ছা যাইতেন। গৃহের আসবাব পত্র প্রভৃতি জড় বস্তুগুলির দিকে তাকাইতে তাকাইতে মনে করিতেন, ঐ সকলের ভিতর হইতে 'কতকগুলি ভীষণ জ্বলন্ত চক্ষু' নির্গত হইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চায়। সে 'ভীষণ জ্বলন্ত চক্ষু' অবশ্যই আর কাহারও চক্ষে পড়িত না, কাজেই সকলে ঐ সকল কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিত। তিনি নিজে কিন্তু এরূপ দৃশ্য দেখিলেই খুব আঁটিয়া চক্ষু বন্ধ

করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে পরিবারস্থ সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া গৃহ সামগ্রী বা পরিধেয় বস্ত্রাদি হইতে যে ভীষণ চক্ষু নির্গত হইত, উহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দূরে দৌড়াইয়া পলাইতেন। আবার কথন কথন ঘোরতর হাস্য করিয়া উঠিতেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তাঁহার সহচরদের নানা আমোদের খেলা দেখিয়া হাসিতেছেন। আঁধার গৃহ বা কোন বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ সেই নিবিড় উপবনে ঝোপের মধ্যে গিয়া ঐ সকল প্রাণীর সহিত দেখা করিতেন।

"শীতের সময় আমরা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম। আমাদের নগরস্থ আবাস বাটীর নিম্নতলায় কতকগুলি বড় বড় বৈঠকখানা-গৃহ সজ্জিত ছিল। এই সকল প্রকোষ্ঠ মধ্য-রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত খালি থাকিত। হেলেনকে কখন কখন রাত্রিকালে এই অন্ধকারময় গৃহমধ্যে অর্দ্ধ জাগ্রত বা গভীর নিদ্রিতাবস্থায় পাওয়া যাইত। কি উপায়ে তিনি রুদ্ধদ্বার গৃহগুলি ভেদ করিয়া আমাদের উপরিতলস্থ শয়নকক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। দিবাভাগেও সময় সময় ঐরূপে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেন। তল্লাস করিতে করিতে, ডাকিতে ডাকিতে, হয়ত তাঁহাকে কোন জনশূন্য স্থানে গিয়া পাওয়া যাইত। একদা তাঁহাকে ঐ রূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেল, তিনি বাটীর একটী উচ্চ কুঠরীর ভিতরে কতকগুলি কপোত-নীড়ের মধ্যস্থলে শত শত কপোত-বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। বলিলেন, 'সলমনের জ্ঞানভাণ্ডার' নামক পুস্তকের উপদেশানুসারে তিনি কপোতগুলিকে "ঘুম পাড়াইতে ছিলেন।" বস্তুতঃ কয়েকটা কপোত ক্রোড়ে নিদ্রিত না হউক, এক প্রকার মুগ্ধা বা স্তম্ভিতাবস্থায় পতিত হইয়াছিল। আমাদের মাতামহীর একটা প্রকাণ্ড যাদুঘর ছিল। তৎকালে রুসিয়াদেশে এই যাদুঘরটী বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় অশেষ প্রকার জীবজন্তু, উদ্ভিজ্জ এবং ঐতিহাসিক ও পুরাকালীন আশ্চর্য্যজনক বস্তু সকল রক্ষিত ছিল। হেলেন এই যাদুঘরে গিয়া জলপ্লাবনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের (antideluvian) প্রকাণ্ডকায় পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণের অস্থি মালার মধ্যে বসিয়া থাকিতেন, এবং সেই ঘরপোরা কুম্ভীরাদি সামুদ্রিক জন্তুগণের সহিত গভীর কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার কথায় যদি বিশ্বাস করিতে হয় ত, কপোতগণ তাঁহার নিকট সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান বলিত এবং পশুপক্ষীরা নির্জ্জনে গুপ্তভাবে তাহাদের নিজ নিজ জীবন বৃত্ত তাহাকে শুনাইত। তাঁহার কাছে সমস্ত প্রকৃতিই যেন জীবন্ত বলিয়া বোধ হইত। তিনি স্থাবর জঙ্গম প্রত্যেক পদার্থেরই একটা ভাষা উপলব্ধি করিতেন। প্রস্তর, মৃত্তিকা, বা সামান্য একখণ্ড ঘুনেধরা কাষ্ঠ—যে কোন দৃশ্য জড়বস্তুই হউক না কেন—প্রত্যেকেই সজীব,—সচেতন।

"আমাদের মাতামহীর সেই সুপ্রসিদ্ধ যাদুঘরে উন্নতির জন্য নূতন নূতন বস্তু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা ইতস্ততঃ বহির্গত হইতাম। এই উদ্দেশ্যেও বটে, এবং নিজেদের শিক্ষা ও আমোদের জন্যও বটে, আমরা কখনও দিবসে কখনও রাত্রে নানাদিকে অভিযান করিতাম। কিন্তু রাত্রিকালই আমাদের অধিকতর মনোরম বোধ হইত। তখন অতীব উৎসাহের সহিত আমরা ভ্রমণে বহির্গত হইতাম। তেমন আমোদ আমরা

আর কিছুতেই পাইতাম না। বাটীর অদূরেই বন। এই বনরাজি মধ্যে আমাদের সেই আনন্দদায়ক নৈশ-ভ্রমণ রাত্রি ৯টা হইতে ১টা, কখনও বা দুটা পর্য্যন্ত চলিত। এই ভ্রমণে সমবয়স্ক বন্ধুগণকে আহ্বান করা হইত। বার হইতে সতের বৎসরের বালক বালিকাদিগকে দলে মিশাইয়া, আর পঁচিশ ত্রিশ জন দাস-ভৃত্য ও পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া আমরা অভিযানে নির্গত হইতাম। কি প্রভু কি ভৃত্য, প্রত্যেকের হাতে আলোক ও মক্ষিকা ধরিবার জাল। আমাদের শরীর রক্ষার্থ পশ্চাতে দ্বাদশ জন বলিষ্ঠকায় অস্ত্র-শস্ত্র-ভূষিত ভৃত্য, কসাক-সৈন্য এবং দুই এক জন উচ্চ পদস্থ সৈনিক পুরুষও থাকিত। ভল্গা প্রদেশ অতীব মনোহর বৃহৎ প্রজাপতির জন্য প্রসিদ্ধ। সেই সকল প্রজাপতি ধরিবার জন্য আমাদের এই আয়োজন। প্রজাপতি গুলি দলে দলে উড়িয়া আসিয়া আমাদের লণ্ঠনের গ্লাসের উপর পড়িত এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের হস্তে উহাদের ক্ষণিক জীবনের অবসান হইত। আমরা এইরূপ একটা নির্দ্দয় আমোদের বশীভূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু ইহাতেও আমার ভগ্নী হেলেন আপন স্বাধীন প্রবৃত্তির পরিচয় দিতেন। তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদের এই নিষ্ঠুর কার্য্য মোটেই ভাল লাগিত না। তিনি প্রজাপতিগুলিকে আমাদের নির্দ্দয়তা হইতে রক্ষা করিয়া জীবন দান করিতেন। এই প্রজাপতিগুলির রোমাচ্ছাদিত মস্তক ও দেহ দেখিতে ঠিক একটী শ্বেত নরকপাল সদৃশ। পৌত্তলিকদিগের ন্যায় হেলেন বলিতেন—'এই প্রজাপতি গুলির দেহোপরি প্রকৃতি দেবী এক এক জন মৃত মহাপুরুষের কপাল সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন, উহারা বড়ই পবিত্র, উহাদিগকে বধ করিতে নাই।' আমরা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কীটগুলির পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেন, এরূপ অনুচিত কার্য্যে সেই পরলোকগত মহাপুরুষদের অত্যন্ত অশান্তি উৎপন্ন হইতেছে, কেননা, তাহাদের কপাল এই কীট গুলির দেহে সংলগ্ন রহিয়াছে।

"দিবা-ভ্রমণেও আমাদের আনন্দ কম ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা মাতামহ মহাশয়ের প্রাসাদের প্রায় ১০ মাইল দূরে একটা বিস্তীর্ণ ময়দান ছিল। এই ময়দানটী বালুকায় পূর্ণ,—দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইত, স্থানটী কোন কালে সমুদ্র বা কোন সুবৃহৎ জলাশয়ের কুক্ষিগত ছিল। এখানে মৎস্য শম্বুকাদির বিশ্লিষ্ট দেহাবশেষ এবং অনেক প্রকাণ্ডকায় জন্তুর দন্ত পাওয়া যাইত। কালের প্রবাহে এই ধ্বংসাবশিষ্ট জীবদেহগুলি প্রায়ই চূর্ণিত ও মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছিল। কিন্তু এখনও নানাবিধ তরুলতা, মৎস্য ও অন্যান্য জন্তুর চিত্রাঙ্কিত বিভিন্ন আকারের প্রস্তর খণ্ড বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইত। এই চিত্রাঙ্কিত জীবজাতি এক্ষণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এবং উহারা যে জলপ্লাবনের (Deluge) পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের জীব, তাহা ঐ সকল মূর্ত্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। আমরা সকল বালক বালিকা মিলিয়া হেলেনের নিকট উক্ত প্রাণীগণের বিষয়ে যে কত রোমহর্ষণকর অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, তাহার সংখ্যা হয় না। আমার বেশ মনে আছে, হেলেন কোমল ভূমির উপর সটান শুইয়া পড়িতেন,—কনুই দুটী কোমল বালুকারাশির মধ্যে নিমগ্ন এবং দুই করতলে বদন বিন্যস্ত। এই অবস্থায় যেন কোন এক স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সেই স্বপ্ন-

দৃষ্ট দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করিতেন,—শুনিয়া বোধ হইত, তাঁহার নিকট সেই সকল দৃশ্য যেন কতই জীবন্ত, কতই স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত। পূর্ব্বোক্ত জলচর প্রাণীগণের দেহাবশেষ অস্থি পঞ্জরাদি মৃত্তিকায় মিশিয়া যাইতেছে, কিন্তু উহাদের সেই সুদূর অতীত যুগের সামুদ্রিক জীবনের কি মনোহর জীবন্ত বর্ণনাই তিনি করিতেন! তিনি বলিতেন, উহাদের বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা বালুকার উপর সেই অতীত যুগের সমুদ্র রাক্ষসগণের বিচিত্র মূর্ত্তি কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেন! আমরা যেন সেই মৃত্যুলোক-স্থিত জীব জন্তু ও উদ্ভিদাদির জীবন্ত রূপ ঐ অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই-তাম। রবি-কর-বিম্বিত সুনীল মনোহর সাগর-তরঙ্গ-মালা, প্রবাল-গঠিত সামুদ্রিক শৈল-শ্রেণী, আকরীয় দ্রব্য-পূর্ণ পর্ব্বতকন্দর সমূহ, সুকোমল আভাযুক্ত কুসুমরাজি-জড়িত শ্যামল তৃণদল,—ইত্যাদি সামুদ্রিক বিষয় তাঁহার মুখ-বিগলিত বর্ণনা যখন আমরা সাগ্রহ চিত্তে শুনিতে থাকিতাম, তখন মনে হইত যেন সুশীতল সুখস্পর্শ জলরাশি আমাদের দেহ সেবা করিতেছে,—যেন আমাদের নর-দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আর আমরা সদা ক্রীড়াশীল সুন্দর সাগর-জীবে পরিণত হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। তাঁহার সেই বৈচিত্র্যময়ী কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল্পনাও বর্ত্তমানকে বিস্মৃতি-জলে ডুবাইয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট ভূত কালের মধ্যে ছুটিয়া যাইত।

"শৈশবে ও বাল্যে হেলেন অদ্ভুত বাক্-শক্তির পরিচয় দিতেন। শেষে কিন্তু তেমনটী আর পারিতেন না। এক কালে তাঁহার বক্তৃতা শক্তিতে শ্রোতৃবর্গ সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া যাইত। তিনি যাহা দেখিতেন, শ্রোতারাও যেন তাহাই প্রত্যক্ষ করিত। একদা তিনি আমাদিগকে ভয়ে প্রায় মূর্চ্ছিত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-স্রোতে চালিত হইয়া আমরা তখন এক মনোরম স্বপ্ন-জগতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় তিনি হঠাৎ স্রোত পরিবর্ত্তিত করিলেন,—হঠাৎ সুদূর ভূত কালকে প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের ভিতর আনিয়া ফেলিলেন। যে শীতল সুনীল সাগর-তরঙ্গমালার বর্ণনা চলিতেছিল—আমাদিগকে সহসা ভাবনা করিতে বলিলেন, সেই তরঙ্গ সমূহ যেন আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াই নৃত্য করিতেছে। আর তিনি বলিয়া উঠিলেন 'একবার কল্প-নার চক্ষে দেখ দেখি! কি অলৌকিক ব্যাপার! পৃথিবী সহসা বিক্ষুব্ধ হইতেছে, বায়ু ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সাগর-তরঙ্গে পরিণত হই-তেছে! ঐ চাহিয়া দেখ, অসংখ্য ঊর্ম্মিমালা কেমন এ দিক ওদিকে সঞ্চালিত হইতেছে! দেখিতেছ না? আমাদিগের চারিদিকেই যে জল ঘিরিয়া ফেলিল,—আমরা যে জলধির তলদেশে উপস্থিত হইয়াছি এবং কত অদ্ভুত সামগ্রী দেখিতে পাইতেছি!' এইরূপ বলিতে বলিতে বালির উপর হইতে উঠিয়া দাঁড়াই-লেন এবং গভীর নিশ্চয়তাব্যঞ্জক স্বরে ঐ কথা কহিতে লাগিলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও ভয়ের ভাব ধ্বনিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বাভ্যাস বশে চক্ষু দুটী উভয় করদ্বারা সহসা আচ্ছাদিত করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পুনরায় বালির উপর পড়িয়া গিয়া যখন তিনি বলিতে লাগিলেন— 'ঐ ঢেউ,—ঐ এল! ওগো সমুদ্র, সমুদ্র! আমরা ডুবিয়া মরিলাম',—তখন আমরা

সকলেই সটান আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমাদের হতাশ চীৎকারে গগন ভেদ করিতে লাগিল! সকলেরই মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সাগর আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—আমরা নাই।

"প্রাতঃকালে কিম্বা সন্ধ্যাবেলা আমাদের মত ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে একত্রিত করিয়া তিনি একটী দল গঠিত করিতেন, এবং সদলে পূর্ব্বোক্ত যাদুঘরটীতে গিয়া সকলকে নানারূপ ঐন্দ্রজালিক গল্পবিন্যাসে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ইহাতে তাঁহার বড়ই প্রীতিবোধ হইত। তখন তিনি নিজের সম্বন্ধে কল্পনাতীত নানা উপাখ্যানাদি কহিতেন, এবং রাত্রিতে নাকি তিনি কত কি দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সকল বলিতেন। যাদুঘরের ঘরপোরা জন্তুগুলি নাকি একে একে আপন আপন পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত সাদরে তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিত। খ্রীষ্টান পরিবারের ভিতর থাকিয়া তিনি পূর্ব্বজন্মতত্ত্ব কোথায় শুনিতে পাইলেন? কে তাঁহাকে খ্রীষ্টানের ধর্ম্মবিরুদ্ধ যোনি-ভ্রমণবাদের রহস্য সকল শিখাইল? যাদুঘরে 'সীল' নামক একটা সামুদ্রিক জন্তুর দেহ ছিল। এই 'সিলটী' হেলেনের বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি সীলটার গায়ে পড়িয়া উহার রজতোপম শুভ্র মসৃণ দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে তৎকথিত স্বীয় অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত আমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেন। এই সকল কথা তিনি এমন উচ্ছ্বাসপূর্ণ-ভাষায় বর্ণনা করিতেন যে, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণও অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বর্ণনায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেই একান্ত মনে তাঁহার গল্প শুনিতে থাকিত এবং শুনিতে শুনিতে উহার মনোহারিত্বে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িত। আর বাল শ্রোতাগণের ত কথাই নাই, তাহারা হেলেনের প্রত্যেকটী কথা বিশ্বাস করিয়া লইত। আমি একটী সুদীর্ঘকায় শ্বেত 'ফ্লেমিঙ্গো' পক্ষীর অদ্ভুত জীবন কথা কখনই ভুলিতে পারিব না। এই প্রকাণ্ড বিহঙ্গমটী একটী বড় আলমারিতে কাচের আবরণের ভিতর যেন অবিচলিত ধ্যানাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া আছে,—লোহিত রেখাস্ত পক্ষদ্বয় বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, যেন সদাই উড়িতে প্রস্তুত। হেলেন বলিতেন, বহুযুগ পূর্ব্বে এটী পক্ষী ছিল না, মানুষ ছিল। অনেক ভয়ঙ্কর পাপ ও নরহত্যা করিয়াছিল বলিয়া মহাপুরুষগণ ইহাকে মূঢ় তির্য্যক্ জাতিতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন,—আর পূর্ব্ব জন্মে যে জীবরক্তপাত করিয়াছিল, তাহাতেই উহার পক্ষদ্বয় অনুরঞ্জিত করা হইয়াছে; উহাকে চিরকাল পক্ষীরূপে মরুভূমি ও পঙ্কিল স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমি ঐ 'ফ্লেমিঙ্গো' টাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। মাতামহী ঠাকুরাণী আপনার পাঠগৃহ ছাড়িয়া বড় একটা উঠিতেন না। সন্ধ্যাবেলা তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য যাদু ঘরের মধ্যদিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে আমাকে যাইতে হইত। যাদুঘরটী পার হইবার সময় আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সটান দৌড়াইয়া পলাইতাম, ভয় পাছে ঐ রক্তাক্তকলেবর পক্ষীরূপী ভীষণ নরহন্তাকে দেখিয়া ফেলি!

"হেলেন যেমন নিজে গল্প করিতে ভালবাসিতেন, তেমনি অন্যের নিকট গল্প উপকথা ইত্যাদি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। ফেদিফ পরিবারের (মাতামহ বংশ) একটী বৃদ্ধা ধাত্রী গল্প-কথনে খুব পারদর্শী ছিল। তাহার গল্পের তালিকার শেষ কেহ পায় নাই।

আর তাহার স্মৃতি যত কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে উদ্যানে বৃক্ষ তলে বসিয়া এবং শীতের সন্ধ্যায় গৃহাভ্যন্তরে জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডের পার্শ্বে একত্রিত হইয়া আমরা সকলে সেই বৃদ্ধাকে ঘিরিয়া বসিতাম। আমাদের উত্তর খণ্ড সুন্দর সুন্দর উপকথার জন্য খ্যাত। তাহার দুই চারিটা তাহাকে দিয়া বলাইতে পারিলে আমাদের আর সুখের সীমা থাকিত না। আমরা অবশ্যই গল্পগুলি যেমন শুনিতাম, তেমনি ভুলিয়া যাইতাম, কিন্তু হেলেন কদাপি সে গুলি বিস্মৃত হইতেন না, বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি উপকথার নায়ক নায়িকাগণের ঘটনাবলিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, মানুষ ইচ্ছা করিলে ইতর প্রাণীর আকার ধারণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, কেবল প্রণালী জানিতে পারিলে হয়। মানুষও পক্ষীর ন্যায় উড়িতে সম্পূর্ণ সমর্থ, যদি তাহার দৃঢ় সংকল্প থাকে। সেইরূপ তত্ত্বাভিজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বযুগেই ছিলেন—এখনও আছেন। যাহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে বা চিনিতে পারে, যাহারা হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া তাঁহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারে, তাহাদের নিকট তাঁহারা আত্ম প্রকাশ করেন।

"উপরোক্ত কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি একজন শতবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধকে দেখাইয়া দিতেন। বৃদ্ধ আমাদের বাটীর অনতিদূরে 'বরনিগ-বয়রক' নামক একটা অরণ্য মধ্যে গহ্বরে বাস করিতেন। সাধারণের বিশ্বাস, বৃদ্ধ ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। লোকটী সাধুস্বভাব ও পরোপকারী ছিলেন এবং কোন পীড়িত ব্যক্তি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে স্বেচ্ছায় তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিতেন, তবে পাপাচারীদিগের পীড়া জন্মাইয়া কি প্রকারে শাস্তি দিতে হয়, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। গাছ গাছড়া, লতা পুষ্পাদির কোন্‌টার কি গূঢ় গুণ ও শক্তি, তাহা তিনি জানিতেন এবং ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তিনি অনেকগুলি মধুচক্র সযত্নে রক্ষা করিতেন—শত শত মধু-চক্রে তাঁহার কুটীর চক্রাকারে বেষ্টিত ছিল। গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ অপরাহ্নে তিনি চিরকাল আপন আশ্রমে থাকিয়া স্বীয় প্রিয়তম মধুকর-নিকরে পরিবেষ্টিত হইয়া আস্তে আস্তে পাদচারণা করিতেন,—গুঞ্জনশীল ভৃঙ্গবৃন্দে আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন,—যেন একটী জীবন্ত বর্ম্মে সর্ব্ব দেহ পরিরক্ষিত হইয়া আছে; সময় সময় নির্ব্বিঘ্নে চক্রাভ্যন্তরে উভয় হস্ত ডুবাইয়া দিতেছেন, কখনও বা তাহাদের কর্ণ-ভেদী রব মনযোগ সহকারে শ্রবণ করিতে-ছেন এবং যেন প্রত্যুত্তর চ্ছলে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া দুর্ব্বোধ ভাষায় অনুচ্চস্বরে কত কি কথা ও গাথা উচ্চারণ করিতেছেন—মক্ষিকাগুলি তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ মাত্র অমনি গুঞ্জন ত্যাগ করিয়া নীরব হইয়া যাই-তেছে। স্পষ্টতঃই বুঝা যাইত যেন সেই সুবর্ণ-পক্ষ ষটপদগণ এবং তাহাদের সেই শতবর্ষীয় প্রভু পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিত। ইতর প্রাণীর ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে হেলেনের কোন সংশয় ছিল না। 'বরনিগ-বয়রক' অরণ্য হেলেনের পক্ষে এক অনিবার্য্য আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। যখনই সুযোগ পাই-তেন, তখনই তিনি এই অদ্ভুত বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। সেখানে গিয়াই কি প্রকারে মধুমক্ষিকা, পক্ষী ও অপরাপর প্রাণীর ভাষা বুঝা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বৃদ্ধকে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন,

এবং উত্তরে বৃদ্ধ যাহা যাহা বলিতেন, বুঝাইতেন, তাহা তদ্গত চিত্তে, প্রবল অনুরাগ সহকারে বসিয়া শ্রবণ করিতেন। সেই অন্ধকারময় আরণ্যকন্দর তাঁহার চক্ষে একটী স্বপ্ন রাজ্য সদৃশ বোধ হইত। আর সেই বৃদ্ধও সর্ব্বদাই হেলেন সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিতেন "এই ক্ষুদ্র বালিকা তোমাদের মত নয়। ভবিষ্যতে ইহার জীবনে মহৎ ঘটনাবলী ঘটিবে। দুঃখ হয়, আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা আমি দেখিয়া যাইতে পারিব না, না পারি কিন্তু সে গুলি যে ঘটিবে, তাহা সুনিশ্চিত—নিঃসন্দেহ।" শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

ঋষি গৌরগোবিন্দ

জন্ম—১৭ই চৈত্র, ১৭৬২ শক, শনিবার, শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথি, ঘোড়াচরা, সিরাজগঞ্জ।

মৃত্যু—১৮ই ফাল্গুন, ১৩১৮, রাত্রি ১০-১৫, ৮রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পিতা—৮ গৌরমোহন রায়।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস-বেত্তারা পরস্পরের দোষকীর্ত্তনে যতই কৃতীত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং দলের বিশেষত্ব ঘোষণা করিয়া অপদার্থতার পরিচয় দিন না কেন, পূত ঋষিজীবন-সমবায়ে এই সমাজ সমগ্র ভারতের গৌরবের শীর্ষ স্থানে আজ যে উন্নীত, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা। দোষ ক্রটী প্রতি ব্যক্তির জীবনে থাকে, তাহা যাঁহারা বিনা কারণে কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা মহত্ত্বাভিধানে কদাপি অভিহিত হইতে পারেন না। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্ব সমাজেই জ্ঞানী, গুণী, মানী ব্যক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে,—ব্রাহ্মসমাজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, বিধাতার বিশেষ কৃপা যে, এই সমাজও বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাবেশে অত্যুজ্জ্বল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ, রামতনু, অঘোরনাথ, প্রতাপচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ঋষিজীবনের সমাবেশ এই সমাজে হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইয়াছে। এই সকল মহাত্মাদের মিলন-ক্ষেত্র উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ। তিনি সর্ব্ব-সমন্বয়ে সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে বৈদ্যসমাজ প্রকম্পিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে শোকের গাঢ়ছায়া নিপতিত হইয়াছে।

গৌরগোবিন্দ রায় সমন্বয়ের অবতার ছিলেন। তাঁহার গীতা এবং বেদান্ত সমন্বয়ই যে কেবল একথা ঘোষণা করিয়াছে, তাহা নহে; তদীয় চরিত্রের বিশেষত্বই সমন্বয়। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান, এবং পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অনুপ্রবেশ ছিল। তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মিলন-ভূমি। নববিধানেরও তিনি সমন্বয়-ক্ষেত্র—অদ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি যোগে অঘোরনাথ, ভক্তিতে বিজয়কৃষ্ণ, জ্ঞানে প্রতাপচন্দ্র, নিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র, বিশ্বাসে রামতনু, স্বার্থনাশে দেবেন্দ্রনাথ, সরলতায় রাজনারায়ণ, কবিত্বে ত্রৈলোক্যনাথ, নিরাড়ম্বরে কেদারনাথ, কৃতীত্বে মহেন্দ্রনাথ, উচ্ছ্বাসে অমৃতলাল, নির্লিপ্ততা ও মিষ্টতায় কান্তিচন্দ্র, আনুগত্যে ও নির্ব্বিকার-চিত্ততায় উমানাথ, শিষ্টতায় বৈকুণ্ঠনাথ, উৎসাহে প্রসন্নকুমার, গাম্ভীর্য্যে প্যারীমোহন, চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও বৈরাগ্যে কেশবচন্দ্র,—তিনি যেন ব্রাহ্মসমাজের সমন্বয়-ক্ষেত্র। সমঞ্জসীভূত উন্নতির কথা বহুদিন

হইতে ব্রাহ্মসমাজ কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন, তদীয় জীবনে এই কথা আশ্চর্য্য রূপে প্রকটিত হইয়াছে। ধন্য আদর্শ জীবন। তাঁহার পূত-জীবনাদর্শে বঙ্গদেশ ও বৈদ্যসমাজ ধন্য হইয়াছে।

তুলনা এজগতে অসম্ভব। প্রতি ব্যক্তিই বিশেষত্ব-পূর্ণ। এক জনের সহিত অন্যের তুলনা সম্ভবে না, যদি সম্ভব হইত, তবে নির্ভয়ে লিখিতে পারিতাম, তিনি যেন জ্ঞানে শঙ্করের, জীবনী-লেখায় যেন কবিরাজ গোস্বামীর, আনুগত্যে যেন নিত্যানন্দের, ভক্তিতে যেন অদ্বৈতের, নিরাড়ম্বরে যেন পুণ্ডরীকের, চরিত্রের বিশুদ্ধতায় যেন শুকদেবের, নির্ব্বাণে যেন বুদ্ধের এবং সন্ন্যাসে যেন রামকৃষ্ণের ছায়া। সমন্বয়পূর্ণ এমন মধুর জীবন এদেশে বড় অধিক দেখা যায় নাই।

গৌরগোবিন্দ যখন যে কাজে হাত দিয়াছেন, আশ্চর্য্য রূপে তাহা সাধন করিয়া গিয়াছেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা এবং অনলসতা তদীয় জীবনের বিশেষত্ব। গীতা-সমন্বয়-ভাষ্য প্রণয়নে তিনি যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। বেদান্তের সমন্বয়ের প্রভূত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু তবু কর্ত্তব্যে বিরত ছিলেন না। প্রতিদিন ১৪ হইতে ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেন। কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর এক বৎসর তিনি কমল-কুটীর পরিত্যাগ করেন নাই। পুত্রের কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনিয়াও তাহাকে দেখিতে যান নাই। ট্যাবলো-সমাজে অনেক প্রতিবাদকারী আচার্য্যগিরি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনও করেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির বা মন্দির-সংলগ্ন জমী জীবিত কালে তাঁহার পদস্পর্শে ধন্য হয় নাই। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনে একদিনও তাঁহার পদস্খলন হয় নাই। তিনি বৈরাগ্যে স্থির ও অটল, তিনি রিপুজয়ে বীর, তিনি নিষ্ঠায় অকৈতব সাধক, ব্যবহারে সরল ও নিরহঙ্কার, কার্য্যে নির্ভীক, তিনি সংসার-বিজয়ী নির্ব্বিকার-চিত্ত সন্ন্যাসী। আমরা অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ আড়ম্বরহীন নিষ্ঠাবান নিরহঙ্কার সাধক দেখি নাই। তিনি চিরকাল দলের মাহাত্ম্য এবং জয় ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু কখনও গুরুগিরি করেন নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন "ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে আমি হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, গুরুকরণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে হইতে পারে না। গুরুর কতকগুলি লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত গুরু পাওয়া একান্ত সুকঠিন। গৃহস্থের উদাসীনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। গৃহস্থের মধ্যে গুরুলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি অতি বিরল, লক্ষণাক্রান্ত গুরু হইলেও যাহার শিষ্য হইতে অর্থাদি প্রাপ্তির আশা আছে, তিনিও বর্জ্জনীয়। বিশেষতঃ একবর্ষ কাল গুরু শিষ্যকে ও শিষ্য গুরুকে পরীক্ষা করিবেন। এই সকল কারণে আমি গুরুকরণ করিতে পারিলাম না। এদিকে হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, আত্মাই আত্মার গুরু। ইহাতে আত্মার প্রতি দৃষ্টি পড়িল এবং আত্মা হইতে পরমাত্মায় গিয়া উপনীত হইলাম এবং বুঝিতে পারিলাম, পরমাত্মাই জীবের যথার্থ গুরু।" "ধর্ম্মতত্ত্ব ১লা চৈত্র, ১৮৩৩ শক। তাঁহার ন্যায় সংসারানাসক্ত অটল সাধক ব্রাহ্মসমাজে অধিক দেখা যায় নাই।

তাঁহার জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সমন্বয় দেখা গিয়াছে। তাঁহার রচিতপুস্তক (১) আচার্য্য কেশবচন্দ্র, একাদশ খণ্ড, (২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার যোগ, দুই

খণ্ড, (৩) শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম এবং জীবনী, (৪) গীতা সমন্বয় ভাষ্য, (৫) নবসংহিতার বাঙ্গালা অনুবাদ, (৬) বেদান্ত সমন্বয়, ত্রয়োদশ খণ্ড, (৭) "ট্রু ফেথের" বঙ্গানুবাদ। ইহা বাদে ধর্ম্ম-তত্ত্বে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত অষ্টোত্তর-শত-নামীয় শ্লোক ও

'সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরম সাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে--

শ্লোকে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যে কোন গ্রন্থ বা শ্লোকের দ্বারাই তিনি অমর হইতে পারিতেন। শাস্ত্রে তাঁহার গভীর সূক্ষ্ম দর্শন দেখিয়াই তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ 'উপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় নামের সার্থকতা তদীয় জীবনের প্রতি অংশে প্রতিফলিত হইয়াছে। খ্রীষ্টভক্ত ইউরোপ যেমন একেশ্বরবাদী ম্যাট্রিনিকে ভাল করিয়া চিনে নাই, তেমনি, একেশ্বরবাদী উপাধ্যায়কেও হিন্দু ভারতবর্ষ সম্যক রূপে আদর করে নাই। তবুও একথা আমরা বলিবই, তাঁহার নাম এদেশের সুবিখ্যাত টীকাকারদিগের শ্রেণীতে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও অনেক প্রচারক অর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এজন্য ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীর অলঙ্কারাদি বিতরণ করিয়া যে নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, আজীবন সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ সকল প্রচারাশ্রমে দান করিয়াছেন, ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহা কেবল ভাণ্ডারঅধ্যক্ষের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। সামান্য পরিচ্ছদ ও আহারেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন। কেহ কখনও তাঁহার মুখে কোন অভাবের কথা শুনিতে পায় নাই। মনে হইত, তিনি মহাযোগে নিমগ্ন, বহির্দৃষ্টি তাঁহার বিলুপ্ত হইয়াছে। সংসারের গণনা, সংসারের কামনা, সংসারের ভাবনা সব তিনি পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ততার রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। বাহিরে কখনও সন্ন্যাস গ্রহণ বা কখনও সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করেন নাই বটে, কিন্তু অন্তর্মুখী সাধনবলে তিনি সদা অবিচলিত ও নির্ব্বিকার-চিত্ত ছিলেন। তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসারের অতীত ছিলেন। নিত্যানন্দধামের অহেতুকী প্রেমভক্তির অতলে তিনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তিনি সদা-প্রসন্ন, সদা-সরল, সদা-সুমিষ্ট, সদা-অনলস, সদা-কর্ম্মযোগে নিমগ্ন থাকিতেন। এরূপ নিষ্কাম আড়ম্বরহীন সাধক এদেশে এবং সর্ব্বদেশেই পূজা পাইবার যোগ্য।

তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার দুরবগাহ চরিত্রমাহাত্ম্যে অনুপ্রবেশ করিতে পারি নাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া যিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মুটের কাজ করিব, উহাতে খুব স্বাধীনতা।" তাঁহার স্বাধীনতার স্পৃহা চিরদিন জীবনের পরলে পরলে ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহার চরিত্রের গাম্ভীর্য্যে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য ছিল। জীবনবেদের "স্বাধীনতা"—অধ্যায়ে তিনি যেন ডুবিয়া গিয়াছিলেন। "স্বাধীনতা" সম্বন্ধে তাঁহার নিকট এত কথা শুনিয়াছি যে, তাহার গভীরতার মর্ম্মভেদ করিতে পারি নাই। নিস্পৃহ, জীতেন্দ্রিয় সাধক জীবিত ছিলেন,

কেবল স্বাধীনতা-রস-সুধাপানে। একে স্থিতি, একে বিচরণ, একে রমণ, একে পরিণতি ;—গভীর হইতে গভীরে, অতল হইতে অতলে, তিনি নিশ্চন্ত এবং নির্ম্মমভাবে ডুবিয়া গেলেন ; শুষ্ক বা কোন কিছুরই অধীন হইলেন না, কোন কষ্ট তাঁহাকে বিচালত করিতে পারিল না ;—মহাযোগী অতীন্দ্রিয় নিত্যানন্দ-ধামে আরোহণ করিলেন। আজ তিনি অমরধামের অমরবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া মহানন্দে বিভোর। বিধাতার অপূর্ব্ব নব-বিধানের কীর্ত্তি—গৌরগোবিন্দের জীবন-লীলায়, এইরূপে,প্রকটিত হইল। পাঠক, তবুও কি তুমি বলিবে, নব-বিধান ব্যর্থ ? নববিধান উপাধ্যায়ের সমন্বয়ময় জীবনে পূর্ণ-ষোলকলায় প্রতিফলিত ও সার্থক হইয়াছে। সকলে আকাশ কাঁপাইয়া বল, জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

কায়স্থ-কুলপ্রদীপ

বা

মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বয়স ৮৪ বৎসর

মৃত্যু—১৩১৮ সাল, ২১শে মাঘ, রবিবার।

জন্ম—১২৫০ সাল, ১৫ই ফাল্গুন, সোমবার।

মৃত্যু—১৩১৮ সাল, ২৫ শে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

মনোমোহন প্রাচীন সাহিত্যিকের শেষ রশ্মি, গিরিশচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যের আদি প্রদীপ্তি। দুই জনই অসামান্ত, একের পদ্য-মালার "ভাগ্যে ভাই মা'র বুকে দুধটুকু ছিল, জিব দিয়ে চুষে তাই পরাণ বাঁচিল" এবং অন্সের চৈতন্ত-লীলার "ছিলাম গৃহবাসী কল্লে সন্ন্যাসী, এখন কুল ত্যজে অকুলে ভাসি"—যখনই স্মরণ হয়, তখনই ভক্তিভরে দুই জনকে প্রণাম করি। ইঁহারা সুদীর্ঘকাল সাহিত্যসেবা করিয়া যে অমূল্য রত্নরাজি রাখিয়া গিয়াছেন, এ দেশে কখনও তাহার অনাদর হইবে না। মনোমোহন কবিতায় ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এবং গিরিশচন্দ্র নাটক লেখায় ৺দীনবন্ধু মিত্রের এবং অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফীর শিষ্য। কৃতীত্বে দুইজনই অনন্ত-সাধারণ। ইঁহাদের পদ-স্পর্শে বঙ্গদেশ ধন্ত, কৃতীত্বে বাঙ্গালা ভাষা ও কায়স্থকুল গৌরবান্বিত। ইঁহাদের তিরো-ধানে ঘরে ঘরে আজ হাহাকার !!

কায়স্থ-প্রতিভা বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে লীলাচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহা যে কোন দেশের গৌরবের জিনিস। প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার, মাইকেল, রাজেন্দ্রলাল, শিশির কুমার, অক্ষয়চন্দ্র, রাজনারায়ণ, নগেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, কৃষ্ণকুমার, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু, দীনেশ, গোবিন্দচন্দ্র, যোগীন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্র চন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনিষীবর্গ কায়স্থ-প্রতিভায় এ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদের পার্শ্বে মনোমোহন ও গিরিশচন্দ্র। একেত্রে তুলনায় সমালোচনা চলে না, সকলেই আপন আপন বিভাগে মহা গৌরবে মণ্ডিত। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, এবঙ্গে ইঁহাদের নাম অক্ষয়।

আজকাল চরিত্র এবং রুচি লইয়া একটা মহা গণ্ডগোল চলিতেছে। তুমি এবং সে, আমি এবং তিনি, আমরা, যাঁহাদের পদ-রেণু বহনেরও অযোগ্য, তাঁহাদেরই দোষ প্রচারে বদ্ধপরিকর! শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া

যাই, কেহ কেহ বলিতেছেন, হাফ-আকড়াই বা নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ দুই মহাত্মা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত। প্রতিভার আদর চিরদিন জগতে হইবে—কেহ চাঁদে কলঙ্ক লেপন করিতে পারিবে না। বাঙ্গালা ভাষা মনোমোহন এবং গিরিশচন্দ্র উভয়ের নিকটই ঋণী, উভয়ই আমাদের প্রণম্য, উভয়ই কৃতজ্ঞতার পাত্র।

মাইকেল ও দীনবন্ধুর পর উপেন্দ্র নাথ দাস ও রাজকৃষ্ণ রায়, রাজকৃষ্ণ রায়ের পর গিরিশচন্দ্র,মনোমোহন, রবীন্দ্রনাথ,দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ এদেশের প্রধান নাট্যকার। অভিনয়ে প্রথম কৃতীত্ব দেখান অর্দ্ধেন্দুশেখর, তৎপর গিরিশচন্দ্র, তৎপর অমৃতলাল, তৎপর অমরেন্দ্রনাথ এবং আরো কতকত জন। বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং অভিনয়ের ইতিহাস অপূর্ব্ব কাহিনীতে পূর্ণ,তাহা অনুধ্যানের বিষয়, উপেক্ষার বিষয় মোটেই নয়। নাটক ভিন্ন কোন দেশ জাগে নাই, সংস্কৃত হয় নাই। নাটক যদি অভিনীত না হইত, জীবন্ত দৃশ্য দেখিয়া কেহই জাগিত না। নীলদর্পণ এবং সরলার অভিনয়ে এদেশের যে উপকার করিয়াছে, তাহা কেহই ভুলিতে পারিবে না। নাটকের অভিনয় জাগরণের মূল মন্ত্র। বক্তৃতায় যাহা না হয়, লেখায় তাহা হয়, লেখায় যাহা না হয়, অভিনয়ে তাহা ফুটিয়া উঠে। যে ব্যক্তি একথা অস্বীকার করে, সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার নাম কখনও তুলিও না। মনোমোহন ও গিরিশচন্দ্র এদেশের যে উপকার করিয়াছেন, যে দিন এদেশ তাহা ভুলিবে, সেদিন মরণের কোলে বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালা ভাষা ঢলিয়া পড়িবে। শোকের দিনে অধিক কথা বিবৃত করিতে পারিলাম না; আমরা এস্থলে উভয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম, বিধাতা শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

"১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন, সোমবার, শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে বাগবাজার বসুপাড়া পল্লীতে গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের পিতা ৺নীলকমল ঘোষ মহাশয় সওদাগারী আফিসে কার্য্য করিতেন।

পাঠাভ্যাস।

গিরিশচন্দ্র কিছুকাল পাঠশালায় পাঠ করিয়া সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বর্ত্তমান ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হন। ইহার পর কিছুদিন হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন।

পিতৃ বিয়োগ।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নীলকমল বাবুর মৃত্যু হয়। ইহার পর তিন বৎসর কাল বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন। ইহার পর বিদ্যালয়ে পাঠ করা তাঁহার পক্ষে নানাকারণে দুরূহ হইয়া পড়ে। তখন হইতেই গৃহে আসিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়নে রত ছিলেন। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ও এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হইয়া নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া কেবল অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ের ব্যাপারে তাঁহাকে 'বুক ওয়াম' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইত।

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থাদি হইতে গল্প শুনিয়া শৈশব কাল হইতেই তাঁহার হৃদয়-ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহার প্রণীত কৃষ্ণলীলা

সংক্রান্ত নাটকসমূহে তাঁহার হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল। বিরহভাবে তিনি উন্মত্ত ছিলেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র।

দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে গিরিশচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মার্চ্চেণ্ট আফিসে হিসাব নিকাশের কার্য্য আরম্ভ করেন। এইকর্ম্মে তিনি বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন।

যাত্রাদল গঠন।

গিরিশচন্দ্র সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবগণকে লইয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে একটী সখের যাত্রার দল সংগঠন করেন। এইখানেই তাঁহার নাট্য জীবনের অঙ্কুরোৎগম। এই সময় গিরিশচন্দ্র কতকগুলি গান রচনার জন্য নানা স্থানে নানা রচয়িতার নিকট গমন করেন এবং সিদ্ধমনোরথ না হইয়া নিজেই গান রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সখের যাত্রা দলই ক্রমে সখের থিয়েটারে পরিণত হয়, এবং প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়া দীনবন্ধু বাবুর "একাদশী" অভিনয় করেন। সেই অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথম অভিনয়েই গিরিশচন্দ্রের নাট্যাভিনয়-প্রতিভা দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় আকর্ষণ করে এবং সকলেই নাট্যাভিনয় পরিদর্শন করিয়া প্রীত হন ও শতমুখে গিরিশচন্দ্রের প্রশংসা করেন। এই থিয়েটার ক্রমে ন্যাসানাল থিয়েটার নামে অভিহিত হয় এবং টিকিট বিক্রয় করিয়া 'নীল দর্পণের' অভিনয় দেখাইবার প্রস্তাব উঠে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র টিকিট বিক্রয়ের বিরোধী হওয়ায় দলের সংশ্রব ত্যাগ করেন। থিয়েটারের অন্যান্য উদ্যোক্তাগণ টিকিট বিক্রয় করিয়া ক্রমে জামাই বারিক, নবীন তপস্বিনী প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করেন। অবশেষে যশোহর-গৌরব কবিকুল-শিরোমণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয়কালে তাঁহারা জোর করিয়া গিরিশচন্দ্রকে ভীমসিংহের ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য আনয়ন করেন। তখন গিরিশচন্দ্র চাকুরী করিতেন। তিনি অনারারী ভাবে অভিনয় করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু নাম প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হন না। ইহার পর হইতেই ৬ নং বিডন ষ্ট্রীটে 'গ্রেট ন্যাসানাল' নামে স্থায়ী মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ হয়। গিরিশচন্দ্র এখানে অবৈতনিক ভাবে অভিনয় করিতেন। এই সময়ে থিয়েটারের জন্য নাটক ও প্রহসন রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

গিরিশচন্দ্র এই সময় কিছুদিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন, কিন্তু লোকের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ত্যাগ করেন। শেষে জীবনের কয়েক বৎসর আবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া দীন-দরিদ্রগণকে বিনা মূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দিতেন।

ন্যাসনালের ম্যানেজার।

চাকুরি অভিনয়, ডাক্তারি অভিনয়, নাটক ও কবিতা রচনা করিতে করিতে কিছুকাল কাটিবার পর গিরিশচন্দ্র একশত টাকা বেতনে ন্যাসানাল থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন ও আফিসের কার্য্য ত্যাগ করেন।

গ্রন্থ রচনা।

শ্রীবৎস চিন্তা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনার পর গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্য-লীলা' রচনা

করেন। এই সময় হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম বিকাশ। তিনি যেরূপ হৃদয় দিয়া পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলেন, ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ও সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। চৈতন্য-লীলার অভিনয় দেখিতে দেখিতে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং গিরিশচন্দ্র পরমহংস দেবের চরণে স্থান প্রাপ্ত হন। তারপর গিরিশচন্দ্র প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নিকট গমন করিতে থাকেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রকে বিশেষ ভালবাসিতেন। এই পরশমণি রামকৃষ্ণমণির সংস্পর্শের পর তাঁহার যে সকল পুস্তক বাহির হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ধর্ম্ম-মূলক।

আমরা আর কি বলিব, গিরিশচন্দ্র বঙ্গের এক মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি একাধারে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বীর। তিনি প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক ও ঈশ্বর-উপাসক ছিলেন। উপনিষদ বলেন—

তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।

গিরিশচন্দ্র ভগবানের প্রীতি এবং প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা মানবজীবন ধন্য করিয়াছেন। তাঁহর জন্মে বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত।" যশোহর, ২৭শে মাঘ, ১৩১৮।

৺মনোমোহন বসু।

"বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে মনোমোহন বাবুর ন্যায় দীর্ঘজীবী ব্যক্তি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বঙ্গের অতীত ও বর্ত্তমান সাহিত্যযুগদ্বয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার মৃত্যুতে পুরাতনের সহিত নূতনের—অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সংযোগ-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল। সাহিত্যক্ষেত্রে মনোমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধুর সতীর্থ ছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর সাহিত্য-গুরু কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহারও সাহিত্যাচার্য্য ছিলেন। মনোমোহনের কবিতায় গুপ্ত কবির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্ত কবির কবিতার ন্যায় তাহার কবিতা-নিচয় খাঁটী বাঙ্গালা কবিতা,—তাহাতে পাশ্চাত্য কবিতার 'বোটকা' গন্ধ নাই। তাঁহার রচিত শিশুপাঠ্য পদ্যমালা—শিশুদিগের কণ্ঠে শিশিরজড়িত সেফালির মালা, তেমনই কোমল, কমনীয় এবং পবিত্র।

বঙ্কিম-যুগে সাহিত্যচর্চ্চায়-প্রবৃত্ত হইয়াও মনোমোহন বাবু নিজ সাধনা ও শক্তিবলে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, গদ্য ও পদ্য রচনায় সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত সতী নাটক, হরিশ্চন্দ্র, রামাভিষেক, প্রণয়পরীক্ষা, রাসলীলা প্রভৃতি নাটক তাঁহার শক্তিমত্তার পরিচায়ক। রসাবতারণায়, বিশেষতঃ করুণ ও হাস্য-রসের অবতারণায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার নাটক পড়িয়া ও উহার অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালী হাসিয়াছে এবং কাঁদিয়াছে। তিনি স্বপ্রণীত নাটক সমূহে নূতন চরিত্র চিত্রিত করিয়া এবং পৌরাণিক পুরাতন চরিত্র নূতন বর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। 'সতী-নাটকের' শাস্তে পাগলা, 'রামাভিষেকের' দশরথ সাহিত্যে প্রেমভক্তি-প্রীতির অপূর্ব্ব চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তৎপ্রণীত 'দুলিন' উপন্যাস পাঠে বঙ্গের অনেক পাঠক মুগ্ধ হইয়াছেন।

মনোমোহন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বদেশবৎসল হিন্দু ছিলেন। তিনি নিজ ধর্ম্ম ও সমাজকে কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন, কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন, আর কেমন করিয়াই বা সেই সমাজের মস্তকে ধর্ম্ম ও মহিমার মুকুট পরাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'হিন্দু আচার ব্যবহার" ও "বক্তৃতামালা" পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" বাহির হইবার পূর্ব্বে মনোমোহন বাবু "মধ্যস্থ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রচার করিয়া জন-সমাজে যশস্বী ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হন। মনোমোহন বাবু একরূপ অনন্য-সহায় হইয়াই এই সংবাদপত্র সম্পাদন ও পরিচালন করিতেন। 'মধ্যস্থ' সম্পাদন কার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পরিশেষে তিনি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। তজ্জন্য

তাঁহাকে বাধ্য হইয়া উক্ত পত্রের সম্পাদন কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মনোমোহন বাবু গান রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার সুললিত গান শুনিয়া অনেকেই প্রীত ও পুলকিত হইতেন। মনোমোহন বাবু যে সময়ে পরিণত-বয়স্ক, সেই সময় কলিকাতায় হাফ-আখড়াই নামক সঙ্গীত-সমর খুব প্রচলিত ছিল। তিনি এই সকল সঙ্গীত-যুদ্ধে উপস্থিত জবাব দিয়া প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতেন। এই সকল গীতি-যুদ্ধে তিনি এরূপ গীত-রচনা-কৌশল এবং ভাবসমাবেশ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেন যে, গুণগ্রাহী পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

শুনিতে পাই, একবার কাশীধামে হাফ-আখড়াইয়ের আসরে গুরুশিষ্যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। মনোমোহন নিজগুরু কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত গীতি-রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাশীর হাফ-আখড়াইয়ে 'শিষ্য বিত্তাই গরীয়সী' হইয়াছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মনোমোহনের গুণপণায় এরূপ প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই সঙ্গীত-ক্ষেত্রে স্বয়ং হারি মানিয়া শিষ্যের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবু গুণবান ব্যক্তি হইলেও নিরহঙ্কার ছিলেন। তাঁহার বিনয়, সরলতা ও প্রকৃতির মধুরতা তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট আদরণীয় করিয়াছিল। কেহ তাঁহাকে দিয়া গান রচনা করাইয়া লইতে চাহিলে তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতেন। মনোমোহনের স্বদেশানুরাগ বড় প্রবল ছিল। তিনি চিরদিন স্বদেশের ও স্বজাতির দুঃখে অশ্রুপাত করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন তাঁহার জীবনের একটি মহতী সাধনাস্বরূপ হইয়াছিল। "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন" "উন্নতি উন্নতি" "উল্লাস ভারতী, কেন দিবা রাতি বলরে" প্রভৃতি গানে তাঁহার স্বদেশানুরাগের প্রভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

দীর্ঘজীবীদিগের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে, মনোমোহন বাবুর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল; তিনি জীবনে অনেক শোক তাপ সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আধিব্যাধির যন্ত্রণা ও শোকের দাবদাহ তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য নষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি স্থির, ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন—দুঃখে দুর্দ্দিনে তিনি মেরুর ন্যায় অটল এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া থাকিতেন। নিদারুণ পুত্রশোকে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইলেও তিনি নীরবে সে শোক সহ্য করিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালার সজ্জন-সমাজের সৌজন্য ও উদারতার একটী উজ্জ্বল নিদর্শন বঙ্গের বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইল।"

হিতবাদী, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩১৮।

সামাজিক উপাসনা।

ভূমিকা।

বিগত কয়েক মাসের নব্যভারতে পরলোকবাসী মহাত্মাদের লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা লইয়া দেশবাসীগণের মধ্যে অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান মাসে পরলোকবাসীর লিখিত আর একটী প্রবন্ধ নিম্নে প্রকাশিত হইল। ইহার বিষয় 'সামাজিক উপাসনা'। ভবানীপুর-নিবাসী হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রবন্ধের লেখক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আমাকে মিডিয়ম করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। আমি জানি, হরিশ বাবু জীবদ্দশায় উক্ত বিষয়ে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার শিরোনামা ছিল, The utility of public worship.

হরিশ বাবু আমাকে মিডিয়ম করিয়া ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় আরও কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার লিখিত 'সামাজিক উপাসনা' বিষয়ক প্রবন্ধটী, নব্য-ভারতের পাঠকবর্গের জন্য, নিম্নে প্রকাশিত হইল। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সামাজিক উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব। সামাজিক উপাসনা মনুষ্যের পক্ষে যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, সে বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। মিল্‌টনের মহা কাব্যে আছে যে, আদম ও হবা যখন উপাসনা করিলেন, তখন তাঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া, পার্শ্বে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, করযোড়ে পরমেশ্বরের নিকট আরাধনা করিতে লাগিলেন। যদি মহাকবি এরূপ বর্ণনা করিতেন যে, আদম এক স্থানে গিয়া আরাধনা করিলেন, এবং হবা অন্য স্থানে গিয়া আরাধনা করিলেন, তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য অধিক প্রকাশ পাইত? না, উভয়কে পার্শ্বে পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আরাধনা করানতে, উহার সৌন্দর্য্য অধিক প্রকাশ পাইয়াছে? নিশ্চয়ই উভয়কে পার্শ্বে পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আরাধনা করানতে কাব্যের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, প্রেমে একত্র হইয়া ভগবানের ভজন করা অত্যন্ত স্বাভাবিক; স্বামী, স্ত্রী একত্র হইয়া যদি পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাহার অপেক্ষা সুন্দর আর কি আছে? ইহা সচরাচর দেখা যায় যে, লোকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইলে এবং সন্তানাদি হইলে, অধিকতর ঈশ্বরভক্ত হয়। তাহার একটী কারণ আছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা দ্বারা লোকের হৃদয় কোমল হয়, সুতরাং ভগবানের প্রতি মন সহজেই ধাবিত হয়।

ফ্রান্‌সিস নিউম্যান বলিয়াছেন যে, আত্মা নির্ম্মল অবস্থায় যখন একান্ত চিত্তে ভগবানকে দৃষ্টি করে, তখন সে তাহার সঙ্গে আরও অনেককে দেখে, ভগবানের সম্মুখে আপনি একাকী দাঁড়ায় না। মানুষের প্রকৃতি এই যে, মানুষ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যসংসর্গ ভালবাসে। কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল অবস্থাতেই মানুষ অন্যের সঙ্গ ভালবাসে।

সকল বিষয়ে যেমন, সামাজিক উপাসনা বিষয়েও সেইরূপ। একত্র উপাসনা করা মানুষের পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক। সেই জন্য সকল দেশে, সকল কালে, মানুষ সামাজিক উপাসনা করিয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন কালের ঋষিগণ নির্জ্জনে একাকী উপাসনা ও ধ্যান করিতেন। এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক সময় তাঁহারা নির্জ্জনে ধ্যান ধারণায় থাকিতেন বটে, কিন্তু এমনও অনেক সময় হইত যে, তাঁহারা একত্রে ভগবানের ভজন করিতেন।

হিন্দু ও মুসলমান জাতির তুলনা করিলে সামাজিক উপাসনার উপকারিতা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। মুসলমানদিগের মধ্যে হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে ঐক্য অধিক, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সামান্য একটা বিবাদের কারণ উপস্থিত হইলে শত শত মুসলমান একত্র হয়। যেখানে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ, সেখানে মুসলমান কখন হিন্দু পক্ষ অবলম্বন করে না। যদি হিন্দু পক্ষে ধনী জমীদারও থাকে, তাহা হইলেও মুসলমান কখন হিন্দুপক্ষ অবলম্বন করিবে না। তাহাদের মধ্যে এমন প্রবল ঐক্য। এ প্রকার ঐক্যের কারণ কি? কারণ কেবল এই যে, মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক উপাসনা বর্ত্তমান। অন্য কোন কারণ দেখা যায় না।

হিন্দুদের মধ্যে যে একতা অল্প, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহারই বা কারণ কি? ইহার আর কোন কারণ বোধ হয় না; সামাজিক উপাসনার অভাবই ইহার কারণ। যদি হিন্দু ও মুসলমানে বিবাদ হয়, তবে দেখা গিয়াছে, বরং হিন্দু, মুসলমান পক্ষে গিয়াছে; কিন্তু মুসলমান কখন হিন্দুপক্ষে আসিবে না। মুসলমান ধর্ম্মের এমন একটী শক্তি আছে যে, উহা যাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা পরস্পর মিলিত হয়। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সে শক্তি নাই। ইহার নিশ্চয় কারণ, হিন্দুদিগের মধ্যে সামাজিক উপাসনার অভাব।

আর একটী কথা। হিন্দুদিগের মধ্যে একতার অভাবের একটী প্রধান কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। মুসলমানদের মধ্যে এক দেবতা। সুতরাং হিন্দুর মধ্যে যে ঐক্যাভাব হইবে, এবং মুসলমানের মধ্যে ঐক্য থাকিবে, ইহা বিলক্ষণ সম্ভব। যাহাদের দেবতারাই পরস্পর বিবাদ করেন, তাহারা নিজে যে বিবাদ করিবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি!

ধর্ম্মের বন্ধন, সকল প্রকার বন্ধন অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। ধর্ম্মের বন্ধন কিসের জন্য অধিকতর দৃঢ়, তাহা বুঝা আবশ্যক। যদি ইষ্টদেবতা এক হয়, তাহা হইলে,একের পূজা, একের আরাধনাতে সকলের মন ধাবিত হয়। সুতরাং সকলের মনের গতি এক-প্রকার হয়। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন সম্ভব হয়। তারপর, এক দেবতার উপাসক হইলে, পরস্পরের উপর সদ্ভাব-সঞ্চারও অতিশয় স্বাভাবিক। এক ধর্ম্মাব-লম্বী লোকে পরস্পরকে ভালবাসে। তার উপর, আবার যদি উপাস্যদেবতাও সম্পূর্ণরূপে এক হয়, তাহা হইলে, তাহাদের সদ্ভাব আরও অধিক হয়। যেমন দেখুন, একজন খ্রীষ্টিয়ান ও একজন হিন্দুতে সে পরিমাণে সদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং একজন শাক্ত ও একজন বৈষ্ণবের সঙ্গে হইবে। কিন্তু আবার দুইজনই যদি শাক্ত হয়, অথবা দুইজনেই যদি বৈষ্ণব হয়, তাহাদের মধ্যে যেমন সদ্ভাব হইবে, ঐ খ্রীষ্টিয়ান ও হিন্দুতে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এক ইষ্ট দেবতা, সদ্ভাবের অতি প্রধান কারণ। তার পর যদি আবার সেই ইষ্টদেবতার উপাসনা একত্রে হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই।

খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়। সকলেই খ্রীষ্টিয়ান। কিন্তু মতভেদ যে কত, তাহার সীমা নাই। প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান্ ক্যাথলিক, এতো সাধারণ প্রভেদ। ইহার মধ্যে যে আবার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ, তাহার কথা কি বলিব? প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান্ ক্যাথলিকের মধ্যে যত প্রভেদ বোধ হয়,হিন্দু ও মুসলমানেও তত প্রভেদ নয়। কিন্তু ইষ্টদেবতার প্রভেদ কি ইহার কারণ নয়? প্রটেষ্টাণ্টের ইষ্ট দেবতা যীশু, রোম্যান-ক্যাথলিকের ইষ্টদেবতা মেরীর ক্রোড়ে যীশু। ক্যাথলিকেরা মেরীর নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কেবল যীশুর মার পূজা নহে, যীশুর পিতামহীর পূজা পর্য্যন্ত। তবে এ দুই সম্প্রদায়ে মিলিবে কেন?

এখন দেখা গেল, এক ইষ্টদেবতা হইলে পরস্পর একতা হয়, আবার সেই ইষ্টদেবতার উপাসনা একত্রে হইলে, তাহা হইতে অনেক পরিমাণে অধিক সদ্ভাবের সম্ভাবনা। হিন্দু-দিগের মধ্যে ইষ্টদেবতাও ভিন্ন ভিন্ন এবং একত্রে উপাসনা তো নাই। সেইজন্য হিন্দু-দিগের মধ্যে এত একতার অভাব। মুসল-মানদিগের মধ্যে ইষ্টদেবতা এক এবং একত্রে উপাসনার প্রথাও আছে। সেইজন্য তাঁহা-দিগের মধ্যে একতা হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক।

যতদিন পর্য্যন্ত না হিন্দুদিগের মধ্যে সামাজিক উপাসনার প্রথা প্রচলিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে ভাল করিয়া ঐক্যবন্ধন হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা হইবে? তাহার একটী কারণ ও আশা ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্ম-সমাজ এ দেশে সামাজিক উপাসনা প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই প্রথা ক্রমে ভারতের সকল প্রদেশে প্রচলিত হইতেছে। সেইজন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে সম্মিলন হইতেছে। কোনকালে যাহা হয় নাই, এখন তাহাই হইতেছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, সকল প্রদেশের লোকের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্মিলন হইতেছে। একধর্ম্ম ইহার এক কারণ, আর এক কারণ একত্রে উপা-সনা। মাদ্রাজ ও পঞ্জাব হইতে লোক আসিয়া মাঘোৎসবের উপাসনায় যোগদান করিতেছেন। এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মো-পাসনা ভারতবর্ষকে এক করিতেছে।

আর একটী কথা। হিন্দু ও মুসলমানে যে সম্মিলনের কোনকালে সম্ভাবনা ছিল না, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা হইবে। ইহা সক-লেই জানেন যে, মুসলমান অত্যন্ত পৌত্ত-লিকতা-বিদ্বেষী, হিন্দুও মুসলমানকে যবন বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মগণ এই

উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। তাঁহারা একেশ্বরবাদী। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত করিতে তাঁহারাই পারেন। ক্রমে, ব্রাহ্মগণ হিন্দু-গণকে একেশ্বরবাদী করিয়া তুলিতেছেন, এবং মুসলমানেরাও ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। একেবারে ব্রাহ্ম না হউক, ব্রাহ্মসমাজের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। আমি জানি, অনেক মুসলমানের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সদ্ভাব আছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ একত্র হইবে। যাহা কোনদিন সম্ভব হয় নাই, তাহা সম্ভব হইবে।

সামাজিক উপাসনার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, পরস্পরের ভাব পরস্পরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমি শুষ্ক হৃদয় লইয়া সমাজে গেলাম, দেখিলাম, একটী ভক্তলোক, সাশ্রুনয়নে, করযোড়ে পরমেশ্বরের উপাসনায় মগ্ন। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র আমার হৃদয় বিগলিত হইবে। পরস্পরের ভাব পরস্পরে সঞ্চারিত হয়। যিনি একাকী নির্জ্জনে উপাসনা করেন, তিনি এ উপকার লাভে বঞ্চিত।

সামাজিক উপাসনার আর একটী উপকার এই যে, ইহাতে পরস্পরের মধ্যে একটী পবিত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়। আমাদের মধ্যে যে সাংসারিক সম্বন্ধ আছে, কেবল তাহাই যদি থাকে, তাহা হইলে, আমরা বড় নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিয়া যাই। আমাদের যে উচ্চতর সম্বন্ধ, তাহা অনুভব করিবার কোন সামাজিক উপায় থাকে না। যিনি আমার প্রতিবাসী, তাহার সঙ্গে ঐ সম্বন্ধ। কিন্তু যদি একত্রে উপাসনা হয়, তাহা হইলে আমরা একটী উচ্চতর সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারি।

আমাদের পরস্পরের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী নহে। যে সম্বন্ধ কেবল ইহকালের নয়, যে সম্বন্ধ অনন্তকালস্থায়ী, সামাজিক উপাসনায় সেই সম্বন্ধ অনুভব করি। পরস্পরের মধ্যে যাহা উচ্চতম সম্বন্ধ, তাহাই অনুভব করি। ইহাতে জনসমাজে পবিত্রতা ও শান্তি অবতীর্ণ হয়। আমাদের মধ্যে যে সকল সাংসারিক সম্বন্ধ আছে, সে সকল সম্বন্ধ পবিত্র হইয়া যায়। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ, মাতা পিতা ও সন্তানের সম্বন্ধ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্বন্ধ, ইত্যাদি যতপ্রকার পারিবারিক সম্বন্ধ আছে, সামাজিক উপাসনা, সকল সম্বন্ধকে পবিত্র করিয়া দেয়। সেই জন্য, যে সমাজে সামাজিক উপাসনা প্রচলিত, তথায় পবিত্রতার অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা।

আর একটী কথা। নির্জ্জনে পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে, তাঁহার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, আমরা তাহাই অনুভব করিতে পারি; কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহা কেমন করিয়া অনুভব করিব? যখন একস্বরে বলি, "হে প্রভো! আমাদের পরিত্রাণ কর" তখন আমরা পরস্পরের মধ্যে যে পবিত্র সম্বন্ধ আছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।

ইহা ভিন্ন, আর একটী কথা এই যে, আমরা সামাজিক জীব। আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ সামাজিক। সুতরাং পরমেশ্বরকে সামাজিক ভাবে ভজনা করা আমাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক। নির্জ্জন উপাসনা যে অস্বাভাবিক, এরূপ বলিতেছি না। কিন্তু সামাজিক উপাসনা নিশ্চয়ই আমাদের প্রকৃতির একটী দিক্।

সামাজিক উপাসনা বিষয়ে আর একটী কথা এই যে, ইহা জনসমাজের শিক্ষার একটী উপায়। সামাজিক উপাসনা স্থানে যাঁহারা সর্ব্বদা গমন করেন, তাঁহাদের উহাতে বিশেষ শিক্ষা লাভ হয়। জ্ঞান শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, ভক্তি-শিক্ষা, প্রেম-শিক্ষা, বিশ্বজনীন নীতি-শিক্ষা হইয়া থাকে। এরূপ একটী সামাজিক ব্যবস্থাকে জনসমাজের পক্ষে উপকারী বলিব না ত কি বলিব?

আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ইহাতে মানুষের যেমন ভ্রাতৃভাব, সাম্য ও বিনয় শিক্ষা হয়, এমন আর কিসে হয়? জনসমাজের সকল অবস্থার লোক, সামাজিক উপাসনায় যেমন সমভাবে একত্র হন, এমন আর কিসে হয়? জনসমাজে সকলই ভিন্ন ভিন্ন। অবস্থার ঘোরতর প্রভেদ। কেহ রাজা, কেহ প্রজা; কেহ ধনবান, কেহ দরিদ্র; কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ; কেহ সম্ভ্রান্ত, কেহ সামান্য;

ইত্যাদি কতই প্রভেদ। সাংসারিক অবস্থার প্রভেদ, জ্ঞানের প্রভেদ, প্রকৃতির প্রভেদ, বয়সের প্রভেদ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, কত রূপ ভিন্ন প্রকার লোক, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, ঈশ্বরের মন্দিরে, ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, তাঁহারই পূজার জন্য সমবেত। সংসারে সর্ব্বত্রই পার্থক্য, কেবল সামাজিক উপাসনা স্থলে সাম্য।

সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধে যত কথা বলিলাম, এক্ষণে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার পুনরুক্তি করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। প্রথম কথা এই যে, ইহা মানব প্রকৃতিরূপ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহা দ্বারা পরস্পরের ভাব পরস্পরে সঞ্চারিত হয়। তৃতীয় কথা এই যে, ইহাতে একতা, ভ্রাতৃভাব ও সাম্যের উন্নতি হয়। চতুর্থ কথা, ইহাতে পরস্পরের ভাব পরস্পরে সঞ্চারিত হয়। পঞ্চম, ইহাতে মনুষ্যের মধ্যে যে পবিত্রতম, উচ্চতম, ও চিরস্থায়ী সম্বন্ধ, তাহা অনুভব করা যায়। ষষ্ঠ, ইহা জন-সমাজের প্রকৃত শিক্ষার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। সপ্তম, আমরা যেমন সামাজিক জীব, সেইরূপ ইহার পরমেশ্বরের সহিত সামাজিক ভাবে মিলনের একটী উপায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

সে।

সুন্দর কহিতে তা'রে চোখে আসে জল!
সে শুধু সুন্দর নহে—সে যে রে নির্ম্মল ?
তাহারে পড়িলে মনে, এ আঁধার-হিয়া
আনন্দ-উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে উদ্ভাসিয়া ?
লভিলে তাহারে কাছে, বিশ্বের মাঝার
হেরি সবি বিমোহন—সবি আপনার!
সে যে হৃদয়ের ধন, সে যে মোর সোণা,
সে যে অসীমের রশ্মি, আনন্দের কণা!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

বেদনানন্দ।

১

আজি দুঃখের মাঝ হে বিশ্ব-রাজ!
হর্ষ জাগিছে মনে,—
বজ্র-কঠিন লোহার নিগড়ে
তুমি বাঁধ মোরে তব ভীম-করে,
আমি চাব না মুক্তি কভু সকাতরে
কাঁদিব না ও চরণে!
আজি দুঃখের মাঝ হে বিশ্ব-রাজ!
হর্ষ জাগিছে মনে!

২

জানি এত নহে ব্যথা হে হৃদি-দেবতা!
তোমারি হাতের দান,—
শেষ-আলো-রেখা দাও নিভাইয়া,
হাসির কণাটী যাক্ মিলাইয়া,
তবু পলকে পলকে তোমারে স্মরিয়া
পুলকিত হবে প্রাণ!
জানি এত নহে ব্যথা হে হৃদি-দেবতা!
তোমারি হাতের দান!

৩

আন, মানস-গগনে নিরাশ-পবনে
নীরদ নিবিড়তর,—
হান কোটী বাজ এ মরু-জীবনে,
বিকাশ চপলা আলেয়া-ছলনে,
কভু পড়িবে না মোর পলক নয়নে,
হে মহা তাপসবর!
আন, মানস-গগনে নিরাশ-পবনে
নীরদ নিবিড়তর!

৪

মোর মুক্তির হায়, সকল উপায়
রুদ্ধ করিয়া দাও,—
ভৈরবের বেশে আজি হে রাজন্,
আমারি সমুখে প্রকট ভীষণ,
তব রুদ্র-মুরতি মানিয়া শোভন
বরিয়া লইব তা'ও!
মোর মুক্তির হায়, সকল উপায়
রুদ্ধ করিয়া দাও!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্থানাভাবে অন্যান্য কবিতা কম্পোজ হইয়াও গেল না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৯১। শিক্ষা-বিজ্ঞান। তৃতীয় বিভাগ। ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম-এ, প্রণীত; মূল্য ৬৵০। বিনয়কুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, এরূপ স্বদেশানুরাগী নির্ম্মল চরিত্রের যুবক অতি অল্পই দেখা যায়। স্বদেশের উন্নতির জন্য তিনি দেহ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার সহিত পুস্তকখানা লিখিত। এই গ্রন্থ এক অতুল সম্পত্তি বিশেষ। বাঙ্গালা এবং সংস্কৃতে লিখিত। আশা করি, সর্ব্বত্র এই গ্রন্থের আদর হইবে।

৯১। মৌনাবাবা। শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত, মূল্য ॥০। এই প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং অধিক কথা বলিতে সঙ্কুচিত। নির্ঝরিণীর ভাষা সুমিষ্ট এবং সরল। মৌনীবাবার পুণ্যময় জীবন-কথা অমৃতের সমান। যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই মোহিত হইবেন। যে সূত্রে মৌনীবাবার প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, এ পুস্তকে তাঁহার কোনই উল্লেখ নাই। মৌনীবাবার কলিকাতায় অবস্থিতির ধারাবাহিক কাহিনী কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে, বুঝিতেছি না। অযোগ্য লোকের সংসর্গ হইলেও, জীবনীতে তাহা বাদ দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে আমূল সমস্ত ঘটনা বিবৃত হইবে। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

৯২। জৈনধর্ম্ম। লোকমান্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ। বিনা মূল্যে বিতরিত।

সংক্ষেপে জৈন ধর্ম্মের যাবতীয় তত্ত্ব এই পুস্তিকায় সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

৯৩। ব্রাহ্মগণ হিন্দু কিনা? শ্রীবটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৴০। সুচিন্তিত প্রবন্ধ। প্রণিধানের যোগ্য।

৯৪। Loyalty by Sahitya charya Rajanikanta Kavyatirtha. সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত এবং ইংরাজী অনুবাদ। নামেই বিষয় বিবৃত। বিশেষ গুণের পরিচয় নাই।

৯৫। A short history of some of the Philanthropic Institutions of the Hindus No 1, Viswanath Annapurna Dan Vandar &. দানই প্রকৃত ধর্ম্ম। অন্নপূর্ণা দানভাণ্ডারের কার্য্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

৯৬। Social status of the Barendra Sahas. খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের অভিমত। এই জাতির শ্রীবৃদ্ধি হউক।

৯৭। আদর্শ লিপিমালা। শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৲। পত্রদ্বারা অপূর্ব্বভাবে শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় গ্রন্থকার এইপুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পত্র-সকল সুচিন্তিত, সুসংযত, এবং সুলিখিত। ঘরে ঘরে প্রচারিত হইলে ইহা পাঠে অনেকের জ্ঞানোদয় হইবে।

৯৮। সনাতন ধর্ম্ম সঙ্গীত। শ্রীঅতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ প্রণীত। এই পুস্তকে কয়েকটী সুন্দর সঙ্গীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৯৯। হিন্দুস্থান-কো-অপারেটীভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির বর্ত্তমান অবস্থা ও অংশীদারের প্রতি নিবেদন। অনেক গুহ্য কাহিনী এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই কোম্পানীর নানা কলঙ্কের কথা শুনা যাইতেছে। ডিরেক্টরগণ সতর্ক হউন।

১০০। আমার জীবনের লক্ষ্য। উপন্যাস, শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত, মূল্য ২৲। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। পুস্তকখানি ৩৭২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। জীবনের লক্ষ্য অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। পুস্তকখানি ধৈর্য্য সহ পাঠ করিলে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। কুড়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আশ্চর্য্য জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইয়াছি। পুস্তকখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

১০১। ভারত-মঙ্গল। শ্রীশৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত, মূল্য ৴৫। রাজ-

ভক্তির উচ্ছ্বাস। কোন বিশেষত্ব নাই।

১০১। বারভূঞা। শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত মূল্য ১৷৷০ টাকা। এই পুস্তকের কতকাংশ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই পাঠকগণ লেখকের অসাধারণ কৃতীত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। দারিদ্র্য-সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত হইয়াও আনন্দনাথ যে অদম্যোৎসাহে সাহিত্যসেবা করিয়াছেন, তাহা অনুকরণযোগ্য। এরূপ দৃষ্টান্ত বড় অধিক দেখা যায় না। পুস্তকখানি মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ। সরল ভাষায় আবশ্যকীয় বিষয় বিবৃত। সকলে দয়া করিয়া এক একখানি ক্রয় করিলে আমরা একান্ত বাধিত হইব।

১০২। An Examination of Historical records and other Documentary evidences on the social status of the Barendra Sahas by Bhagabatkumar Goswamy M.A, পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম।

১০৩। রচনা-সোপান। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১৲। বাঙ্গালা সাহিত্য এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে। কি প্রণালীতে রচনা লেখা উচিত, তাহার সুন্দর প্রণালী এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় একজন অসাধারণ ব্যাকরণ-ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি। এমন সুন্দর ভাবে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন যে, পড়িয়া যারপরনাই উপকৃত হইলাম। পদপ্রকরণ, বাক্যপ্রকরণ, অনুচ্ছেদ-প্রকরণ, মৌলিক ও অমৌলিক রচনা প্রকরণ এবং পরিশিষ্ট, এই পুস্তকে আছে। সকল প্রকরণ গুলিই বিশেষ কৃতীত্বের সহিত লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইবে, আমরা আশা করি।

১০৪। তীর্থযাত্রা। শ্রীকেদারেশ্বর সেন বি-এল, প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। অংশুমতীর ছবি অতি সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা পারিপাট্য, ভাব-সমন্বয়, রুচি-নির্ম্মাল্য, সকলই অতি মনোহর। ঘরে ঘরে পুস্তকখানি পঠিত হউক।

১০৫। আদর্শ সাহিত্য। শ্রীশশধর বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, মূল্য ৷৷/০ আনা। স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। ভাষা সরল এবং বিশুদ্ধ। রুচি মার্জ্জিত।

১০৬। আশীর্ব্বাদ। শ্রীরেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। যেমন পরিষ্কার ছাপা, তেমনই বিষয়-বিবৃতি, তেমনই রুচি, তেমনই ভাষাপারিপাঠ্য; যাহা ধরি, তাহাই সুন্দর। ছবি কয় খানিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ২।৩ বৎসরের মধ্যে ঢাকার ছাপাখানার এত উন্নতি হইয়াছে যে, বিস্ময়ে ডুবিয়া যাইতে হয়। দময়ন্তী, সাবিত্রী, রাণী ভবানী, শকুন্তলা, সতীধর্ম্ম, প্রভৃতি অতি সরল ভাষায় বিবৃত। পদ্য এবং গদ্য দুইয়েই গ্রন্থকারে অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা। গ্রন্থকারের লেখনীতে ফুল চন্দন বর্ষিত হউক।

১০৭। হিত-গ্রন্থাবলী। ৺হিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত; শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ২৲। হিতেন্দ্র নাথ বাঙ্গালা ভাষার নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ এই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করিয়া তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার "অসীমের মেলা" কবিতাটী এস্থানে তুলিয়া দিলাম। পাঠকগণ তাহাতেই হিতেন্দ্র নাথের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

"অসীম কালের স্রোতে সবে যায় আসে,
কতরূপ কত বর্ণ চারিদিকে ভাসে।
নীলাকাশে কিবা শুভ্র জাগায়ে আলোক
গ্রহ তারা সারি সারি কোটী কোটী লোক
পরিপূর্ণ চারিদিকে অণুপরমাণু
উদয়াস্তে খেলা করে চন্দ্র তারা ভানু।
কত বন উপবন কত ছায়া শোভা,
কত গিরি নদী নির্ঝরিণী মনোলোভা।
আকর্ষণ বিকর্ষণ কত আনা গোনা,
নিত্য যায় আর আসে ফিরে কত জনা।
প্রেমে প্রেমে কতদূরে চলে যোগাযোগ;
মহাযজ্ঞে সকলেই পাইতেছে ভোগ।
জ্যোতির গোলক লয়ে চলিয়াছে খেলা—
বিশ্বে কিবা চলিয়াছে অসীমের খেলা।"

এই গ্রন্থ হিতেন্দ্রনাথের অক্ষয় কীর্ত্তি হইয়া থাকুক।

চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলন।

এবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন বঙ্গের এক মহাপীঠে হইয়া গেল। যে স্থানের মধ্য দিয়া স্বয়ং গঙ্গা প্রবাহিতা, যাহার একদিকে মোহাম্মদ মোহসিনের ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সৎকীর্ত্তির যমুনাধারা, অপর দিকে বঙ্গ সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম-চন্দ্রের সরস্বতী প্রবাহ, তাহা যে বাঙ্গালার এক অভিনব ত্রিবেণী মহাতীর্থ, তাহাতে সন্দেহ আছে কি?

ঈদৃশ স্থানে সাহিত্য-মহারথ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের আহ্বানে এবং "বঙ্গের বিক্রমাদিত্য" মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুরের অধিনায়কত্বে যে সম্মিলন হইল, তাহাতে একটা প্রবল আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল। সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গের বহির্ভূত সুদূর কর্ম্মস্থল হইতে অনেক বাঙ্গালী ছুটিয়া আসিয়াছিলেন; এই লেখকও তন্মধ্যে একজন।

নৈহাটী ষ্টেশনে নামিয়াই যে একজন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার হইল, তিনি একটী মোসলমান ছাত্র। সাহিত্যের সেবকগণের সেবা-কল্পে মোসলমান যুব-কেরাও স্বেচ্ছাতঃ প্রবৃত্ত হইতেছেন, এইটা বড়ই আনন্দের কথা। নৈহাটী হইতে রাত্রি প্রায় ৭॥০ টার সময় গঙ্গা পার হইলাম; ট্রেনিং একাডেমিতে অবস্থান করিবার কথা ছিল; একাডেমির উত্তর দিকে একটা ঘাটে পৌছিয়া তীরে উঠিয়াই একজন ভদ্রলোককে দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, সম্মি-লনে অভ্যাগত ব্যক্তিগণ কোন্ বাড়ীটাতে থাকিবেন?" তিনি স্বরেই পরিচয় পাইয়া বলিয়া উঠিলেন:——"মহাশয় যে, আসুন আসুন, এই আপনারই খোঁজ করিতে আমি ঐ বাড়ীতে চলিয়াছি—।" নিকটে গিয়া তিনি আমার এক পুরাতন বন্ধু, একজন নীরব সাহিত্য সেবী; এই 'নব্যভারতেই' তাঁহার দুই একটী প্রবন্ধ আজ ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; নাম শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ, নিবাস দাসপাড়া, চুঁচুড়া। ভাবিলাম, যাত্রা শুভই হইয়াছে; প্রথমেই পুরাতন সাহিত্য-বান্ধবের সহিত সম্মিলন ঘটিল। শিলং হইতে যে "সাহিত্য-সেবক" নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল, পাঁচকড়ি বাবু তাহার প্রাণ ছিলেন। সেই সূত্রেই আমাদের আত্মী-য়তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল।

তাঁহারই সহিত একাডেমি গৃহে গিয়া সর্ব্ব প্রথম সাহিত্যিক সম্ভাষণ হইল, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে—সে নিয়ম মত কোলাকুলি। বন্ধু পাঁচকড়ি বাবু ডাক্তার রায়কে চিনিতেন না। তখন ডাক্তার রায় তদীয় বন্ধুবর্গ-পরিবৃত ছিলেন—কাহার সাধ্য যে সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর অস্পষ্ট আলোকে অঙ্গনে উপবিষ্ট, তাঁহা কে পোষাক পত্র দ্বারা পরিচয় করে? পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার নাম অবগত হইয়া তদীয় অমায়ি-কতা ও আড়ম্বর-শূন্যতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া-ছিলেন।

একাডেমিতে অভ্যাগতগণের যিনি তত্ত্বা-বধান করিতেছিলেন, সেই ভদ্রলোকটীর

নাম শ্রীযুক্ত হেমশশী সোম—সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন; তথাপি পাঁচকড়ি বাবুর সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে আমাকে তাঁহারই বাটীকায় গিয়া অবস্থান করিতে হইল। তিন দিন পাঁচকড়ি বাবু যেরূপ যত্ন সহকারে অতিথি-সৎকার করিয়াছেন, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়—ভগবান তাঁহাকে সপরিবারে কুশলে রাখুন।

পরদিন (শনিবার) হইতে সম্মিলনের কার্য্যারম্ভ। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে একাডেমিতে আসিয়া ডাক্তার রায়-প্রমুখ কয়েক জন সহ এই সম্মিলনের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনাধীনে সভাপতি শ্রীমন্মহারাজা বাহাদুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিমিত্ত যাওয়া গেল। মহারাজ চুঁচুড়ায় রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট বাগান-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন—সম্মিলনের তথা পরিষদের সম্পাদক ত্রিবেদী মহাশয়েরও ঐ খানেই বাসস্থান ছিল। স্থানটী বেশ—কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ একাডেমি হইতে প্রায় ক্রোশ খানিক ব্যবধান হওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গে সচরাচর সাক্ষাৎকারের বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছিল। একাডেমি ব্যতীত অপর এক স্থানে নাম ডচ্ ভিলা—অনেক সাহিত্য-সেবী ছিলেন। সেই স্থানটীর অতি সন্নিকটেই সম্মিলনের অধিবেশন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ স্থানও একাডেমি হইতে প্রায় আধমাইল দূরবর্ত্তী। সভাপতির বসতি-স্থান এবং সমস্ত অভ্যাগতগণের বাসস্থান সভা-মণ্ডপের সমীপবর্ত্তী কোনও জায়গায় হইতে পারিলেই বিশেষ সুবিধা হইত।

যাহা হউক, সভাপতি মহারাজের আবাস ভবন পর্য্যন্ত যাওয়াতে চুঁচুড়া সহরটীর অনেকটা দেখিতে পারিলাম। ম্যালেরিয়ায় স্থানটীর অনেক ক্ষতি করিয়াছে। দেখিলাম, জলের কলের বন্দোবস্ত হইতেছে—এতদিন যে ইহা হয় নাই, এইটাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

বাসায় ফিরিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপণ পূর্ব্বক সভাস্থলে যাইতে প্রায় একটা বাজিল। ১১টার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হইবার কথা ছিল, কিন্তু একটার সময়ও গিয়া দেখি, মণ্ডপে সভাপতি মহোদয়ের শুভাগমন হয় নাই। যে মণ্ডপটী সম্মিলনের অধিবেশনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা তদর্থে নির্ম্মিত হয় নাই—চুঁচুড়াতে একটা প্রদর্শনী হইয়াছিল, তদুপলক্ষে উহা নির্ম্মিত। ঘরটী অতি প্রকাণ্ড, দুই হাজার লোক ইহাতে অনায়াসে ধরিতে পারে, এক মঞ্চের উপরেই দুই শত লোকের সমাবেশ হইত।

মঞ্চের সম্মুখ ভাগে গৃহের অপর পার্শ্বে একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে খানিকটা জায়গা পরদা দেওয়া ছিল—মহিলাগণের উপবেশনার্থ। মেলা উপলক্ষেই ইহার ব্যবস্থা হইয়াছিল কিনা, জানিনা। কিন্তু কোনও মহিলাই উহাতে সমাগত হন নাই। পরদা যেরূপ স্বচ্ছ ছিল, তাহাতে তাঁহাদের না আসাই সমীচীন হইয়াছে। চুঁচুড়ায় রক্ষণশীলত্বের ইহাও এক নিদর্শন। সরকার মহাশয় তদীয় অভিভাষণে বলিয়াছেন, দিগ্বিজয়ী প্রচারক ৺কেশবচন্দ্র সেন ১৩২ বার চুঁচুড়া আসিয়াও একটী বালককেও নাকি নিজ মতাবলম্বী করিতে পারেন নাই। এমত অবস্থায় এখানে মহিলা-সভাপতির প্রস্তাব যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশাল বুদ্ধি-বিবেক নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ!

একটার কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর আসিয়া সভাধিষ্ঠিত হইলেন। শুভ-

দর্শনা কুমারীগণ মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনি ও স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তৎপর যথারীতি সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হইল।

প্রথমতঃ বিগত সম্মিলনের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় একটী সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। কলিকাতার এত সন্নিকটে সম্মিলন হইল—অথচ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র কর্ত্ত্ব্যানুরোধেও এস্থানে কয়েকটী ঘণ্টার জন্য পদার্পণ করিলেন না, এ বড় দুঃখের বিষয়। এতদুপলক্ষে দুঃখের সহিত আরও দু একটী কথা বলিতে হইল। সে দিন যাঁহাকে ভক্তেরা সম্রাট বলিয়া পাদ্যার্ঘ দিলেন—যিনি বঙ্গসাহিত্যের সম্মাননা হইল বলিয়া উহা গ্রহণ করিলেন, তিনি এই সাহিত্য সম্মিলনে—এত নিকটে, আগমন করিলেন না কেন? যাঁহারা স্বয়ং শিশুপালের প্রতিভূ হইলেও ভীষ্ম সাজিয়া সাহিত্য-গোপালের অর্ঘদান করিয়া এবং সপরিবারে টাউন হলে গিয়া জনতা বর্দ্ধন করিয়া সাহিত্য প্রীতি (?) প্রদর্শন করিলেন, তাঁহাদের অনেককেই সম্মিলনে দেখিলাম না কেন? ফল কথা, আমাদের দেশের ধুরন্ধরগণ মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাঁহাদের প্রীতি বা বিদ্বেষ ব্যক্তি বিশেষ অথবা 'দল' বিশেষ লইয়া। এবং যাঁহারা সাম্য মৈত্রীর ধ্বজা উড়ান, উহাদের ভিতরেও অনুদারতা ভরপুর। যাউক।

অতঃপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সরকার মহাশয় বর্ত্তমান বাঙ্গালী লেখকগণের আচার্য্য স্বরূপ, তাঁহার নিকট অনেকে সাহিত্য চর্চ্চার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষা-কন্দুক লইয়া তিনি যেমন দক্ষতা সহকারে লুফালুফি করিতে পারেন, এমন আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। তাঁহার সেই অননুকরণীয় ভাষায় যখন অভিভাষণটী পাঠ করিলেন, তখন মন্ত্রমুগ্ধবৎ সমবেত জনমণ্ডলী অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক এমন 'অভিভাষণ' আর শুনি নাই—শুনিতে পাইব কি না সন্দেহ, 'অক্ষয় সরকার' ত আর দেখিতেছি না। বাণী-বন্দনা, নিজেদের সুখ দুঃখের কথা, সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় এমন হৃদয়-গ্রাহী ভাবে বলিলেন যে, অনেকের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াই মনে হইল এই অধিবেশনে আসার নিমিত্ত শ্রম ও অর্থ-ব্যয় সার্থক হইয়াছে।

ইহার পর যথারীতি প্রস্তাবাদি হইয়া সম্মিলনের সভাপতি নিয়োগ কার্য্য সম্পন্ন হইল। তখন কোনও নবীন কবির একটী কবিতা পঠিত হইল। ইহার পরেই যেন সভায় একটু শান্তিভঙ্গের ভাব পরিলক্ষিত হইল।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সম্মিলনের আসরটী একটু গোলমেলে ধরণের হইয়াছিল। ময়মনসিংহের ন্যায় জনতাজনিত গণ্ডগোল হেতুক নহে। কিন্তু সভার পশ্চাদ্ভাগেই পান, তামাক, জলখাবার, ইত্যাদির স্থান থাকায় সেস্থানে একটা কলরব লাগিয়াই রহিয়াছিল, এবং তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সভাস্থ অনেকেই মধ্যে মধ্যে পান তামাক প্রভৃতি সেবনার্থ সভাস্থল হইতে যাতায়াত করিতেছিলেন। কলিকাতা হইতে অনেক 'ডেলি-পেসেঞ্জার' হইয়া আসাতে ৩।৪ টার সময় তাঁহারা গমনার্থ

চঞ্চল হইয়া উঠিতেন,—তাঁহাদের প্রয়াসেও সভার কতকটা অশান্তিজনক বিক্ষোভের তরঙ্গ উপজাত হইত।*

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি যেন 'চণ্ড কৈশিকের' অভিনয় হইতেছে। যাহা হউক, সাহিত্যপ্রাণ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত একটী কবিতা পাঠ করিলেন। শুনিলাম, বড়াল কবি নাকি সভায়ই ছিলেন। তাঁহার শঙ্খধ্বনি আমরা শুনিয়াছি,—কণ্ঠধ্বনিটাও শুনাইয়া এবং তদীয় কবিজনোচিত মূর্ত্তিটী প্রদর্শন করিয়া তিনি আমাদিগকে কেন আপ্যায়িত করিলেন না, বুঝিতে পারিলাম না। অথবা কোকিলকণ্ঠ কবিগণ বুঝি কোকিলেরই ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হন; আড়ালে থাকিয়াই কু-হুরবে প্রাণ ভুলাইতে ভালবাসেন।

'সাহিত্যের' হুঙ্কার ও কবিত্বের ঝঙ্কারের পর কমনীয় মূর্ত্তি সভাপতি শ্রীমন্ মহারাজ গাত্রোত্থান করিয়া স্বভাবসুলভ সুমধুর স্বরে স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সকলেই সুস্থিরভাবে মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন দেখিয়া প্রীত হইলাম। কেননা, পরিশ্রম পূর্ব্বক মহারাজ অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে উপহার দিয়াছেন। ইহা শুনিতে না পাইলে বাস্তবিক পরিতাপের বিষয় হইত। বক্তৃতার শেষভাগে গত বৈশাখ হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকিবারই সম্ভাবনা। 'বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের' প্রকাশিত গেজেটে' যথাসময়ে সমস্ত প্রকাশিত হয় কিনা সন্দেহ। অথচ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগেও ত অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দুই এক খানি নূতন গ্রন্থেরও নাম আমিই নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছিলাম। এ কাজটায় হাত না দেওয়াই বোধ হয় ভাল ছিল।

মহারাজের অভিভাষণের পর বহুমান্যাস্পদ ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহোদয় হিন্দী ভাষায় একটী বক্তৃতা করিলেন। ইহা যদিও সম্মিলনীর বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি বিশিষ্ট অভ্যাগতের সম্মানার্থে সকলেই তাঁহার বক্তৃতা সাগ্রহে শ্রবণ করিলেন।

অতঃপর সেই সভামণ্ডপের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া দুই চারিজন সাহিত্য-সেবীর সঙ্গে যখন আলাপ পরিচয় করিতে ব্যস্ত ছিলাম, শুনিলাম তখন পঠিত কোনও প্রবন্ধে নাকি ব্রাহ্মণদের উপরে কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতের অক্ষর সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া নাকি বলিয়াছিলেন যে, এক একটা জন্তুদ্বারা এক একটা অক্ষর বুঝাইত, যথা গর্দ্দভ দ্বারা ব্রাহ্মণ। ইহাতে অবশ্যই ব্রাহ্মণ কেহ কেহ চটিয়াছিলেন। অপিচ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, সেই সাহিত্য-সম্রাটের অপ্রকাশিত স্বহস্ত-লিখিত রচনা বলিয়া একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইয়াছি-

* কলিকাতায় অনেক সাহিত্যসেবী এ বৎসর সমাগত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে ২।৪ জন ব্যতীত কাহারও সঙ্গে এবার আলাপ পরিচয় হইতে পারে নাই। কেননা তাঁহারা অনেকেই কেবল সভাধিবেশনে সময় কয়েক ঘণ্টার নিমিত্ত চুঁচুড়ায় থাকিতে—আবার ইঁহাদের মধ্যে ২।৪ জন ব্যতীত আর সকলেই একদিন আসিয়াই আর সভাস্থলে পদার্পণ করেন নাই।

লেন, ইহাতে ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণদের উপরে গালিবর্ষণ ছিল। এই রচনার কিয়দংশ শুনিতে পাইয়াছিলাম। যখন শুনি, তখনই বোধ হইয়াছিল যেন কোথায় ইহা পড়িয়াছি। তাই সন্দেহভঞ্জনার্থ খোদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় সরকার মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ইহা নাকি 'ভ্রমর' নামক এক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ বলিলেন যে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাই নহে। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাই হয় এবং অপ্রকাশিতই হয়, তথাপি কেবল এক হস্তাক্ষর প্রদর্শনের জন্য উহা হাজির করিতে পারা যাইত। আর বঙ্কিমের 'নিষ্ঠ্যূতোদ্গীর্ণবান্তাদি' তাবৎই সাহিত্যিকবর্গের নিকট প্রকাশ্যে পরিবেশিত হইবার যোগ্য—এ কেমন কথা? যাহা হউক, তৃতীয় দিবসে বঙ্কিমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দেন যে, ঐ পাণ্ডুলেখ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নহে, ইত্যাদি।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সভ্যরূপে কয়েক জনের নাম তালিকা ভুক্ত হওয়ার পর সম্মিলনের প্রথম দিনের কার্য্য সমাপ্ত হইল।

রাত্রিতে সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের সেই ক্রোশৈক ব্যবহিত বাটীকায় "বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির" কার্য্যনির্ব্বাহার্থ অনেকের সঙ্গে গমন করিলাম। প্রায় সাড়ে আটটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত কাজ হইল—কেবল কোন্ কোন্ প্রবন্ধ সভায় পড়িতে দেওয়া যাইবে এবং কোন্টার কয় মিনিট করিয়া সময় দিতে পারা যায়, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল।* সভাতে কোন রূপ প্রস্তাব উপস্থাপন সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই। কিন্তু এইটা হওয়া উচিত ছিল।

এবার একটা নূতন বিধান হইয়াছিল। সভা মধ্যেই তর্ক বিতর্ক হইয়া মীমাংসা হইয়াছিল যে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি পরদিন প্রাতঃকালে পঠিত হইবে। ইহাতে জনসাধারণের উপস্থিতির তেমন আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞান রসে রসিক, তাঁহারাই মাত্র উপস্থিত হইবেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী সুতরাং অন্যান্য প্রবন্ধ হইতে পৃথক করিয়া তালিকাভুক্ত হইল। কিন্তু বলা আবশ্যক যে "বৈজ্ঞানিক" প্রবন্ধগুলি শিরোনামতঃ তাহা হইলেও উহার কোনওটীতে জন সাধারণের অবোধ্য কিছু ছিল বলিয়া বোধ হইল না।

দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে ৭॥ সাড়েসাতটার সময় বিজ্ঞান বিভাগের কার্য্যারম্ভ হইল। শিষ্যগণ সমন্বিত বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া গ্রহাদি পরিবৃত ভাস্করের ন্যায় দেদীপ্যমান হইলেন। কিন্তু শ্রোতৃসংখ্যা অতি কম ছিল,—বড়জোর ৩০।৪০ জন। যাহা হউক, রচনা পাঠকার্য্য শান্তিতে ও নিরাপদে চলিতে লাগিল। পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই শিক্ষার্থী যুবক ছিলেন; কিন্তু জটিল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ও তাঁহাদের ভাষার মাধুর্য্য সৌষ্ঠবে বাস্তবিক মুগ্ধ হইতে হইয়া-

* সম্ভবতঃ এতদ্বিষয়ে একটু ত্রুটি হইয়াছে। নির্দ্ধারিত সময় প্রত্যেক প্রবন্ধের উপর লিখিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা প্রবন্ধলেখক বা পাঠকের হাতে পাঠের কিছুটা পূর্ব্বে দেওয়া উচিত ছিল। তাহা বোধ হয় দেওয়া হয় নাই। সকলে সমান বেগে পড়িতে পারেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রবন্ধ পাইলে, তাঁহারা দুই একটা অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক কথা বাদ দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে পড়িবার উপযোগী করিয়া দিতে পারিতেন। এইরূপ করিলেই কাহার ও ক্ষোভের কারণ ঘটিত না।

ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে এবং খাদ্যাদিতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের পক্ষে স্বীয় গবেষণাপ্রসূত অভিমত প্রকাশ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন—এ যে প্রকৃতই হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। জীবতত্ত্বানুসন্ধিৎসা-পরায়ণ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের প্রবন্ধেও ঐরূপ অনেক কথা ছিল। এমন কি, তিনি একস্থলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রতিও চির-কৌমার্য্য ব্রতের দোষারোপ ব্যপদেশে কটাক্ষ পাত করিয়াছিলেন। *

প্রবন্ধ গুলি সমস্তই উপস্থিত ব্যক্তিগণের তৃপ্তিকর হইয়াছিল এবং কেহ কেহ এইরূপও মত প্রকাশ করিলেন যে, সাধারণের সমক্ষে প্রবন্ধগুলি পঠিত হইলেই শোভন হইত। তবে একথাও ঠিক যে, গণ্ডগোলের আসরে এই সকল অধিকাংশত ক্ষীণকণ্ঠ যুবকগণের পঠিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এতাদৃশ সমাদৃত হইত কিনা, সন্দেহের বিষয়।

বেলা এগারটার পরে এই শাখা সভার কার্য্য সমাপ্ত হইল। বাসায় গিয়া আহারাদি সমাপনান্তে ফিরিয়া আসিতে প্রায় ১টা বাজিল। আসিয়া দেখি, সভার কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর দুগ্ধ পরীক্ষা বিষয়ে যন্ত্রাদির সাহায্যে বক্তৃতা করিতেছেন। এই খাটি বৈজ্ঞানিক বিষয়টী সাধারণ সভাতেই আলোচ্য হইতে পারিল, ইহাতে অনেকেই বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক, ইহাতে অনেক সময় ব্যয়িত হইল। বোধ হয়, ঘণ্টা কাল বক্তৃতা চলিয়াছিল। তৎপর যখন রচনাগুলি পঠিত হইতেছিল, তখন ক্রমশঃ দুই প্রকারের দুইটী ঝঞ্ঝাবাতের আয়োজন হইতেছিল; এক (দার্শনিকের ভাষায়) আভিদৈবিক, দক্ষিণ পশ্চিম গগন প্রান্ত হইতে সজল জলধরের উদয় হইতে লাগিল; অপর আধ্যাত্মিক (না আধিভৌতিক) সেই পূর্ব্বদিনের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ-সূচক প্রবন্ধ-পাঠ-সঞ্জাত ব্রহ্মমন্যুর বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইতেছিল। আধিদৈবিকেরই আবির্ভাব প্রথম হইল। প্রবল বাত্যাসহ বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। দোদুল্যমান মণ্ডপ গৃহটী ছাড়িয়া সকলেই অঙ্গন-প্রান্তস্থিত অনুচ্চ বিপণি গৃহগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঐ গুলিতে একদিকে মাত্র বেড়া থাকায় সকলেই অল্পাধিক ভিজিতে লাগিলেন এবং ঝড়ের বেগে কখন আশ্রয় স্থান গুলিও ভূমিসাৎ হয়, ইহা ভাবিয়া ভীতি-বিহ্বল চিত্তে ত্রিপাপহারী ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, সেই দিন দোল পূর্ণিমা, আবির-কুঙ্কুমে মিশ্রিত পিচকারির হাত এড়াইয়া আমরা সভাস্থ হইয়াছিলাম, তাই ভগবান প্রকৃতির এই বিরাট পিচকারি দ্বারা সকলকে ধূলিরঞ্জিত জলে সুসিক্ত করিয়া দিলেন। কোনও কোনও সমন্যু ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই মণ্ডপে বিপ্র-নিন্দা হইয়াছে, তাই জল বর্ষণে ইহা প্রক্ষালিত ও বিশোধিত হইল।

আধিদৈবিক ব্যাপারের উপসংহার

* পূর্ব্ব দিনেও প্রাতঃকালে সভাপতি মহারাজা বাহাদুরের আবাস ভবনে যাইবার উপলক্ষে কথা প্রসঙ্গ ক্রমে শশধর বাবু মাদুলী ধারণের প্রত্যক্ষ উপকারিতা এবং ফলিত জ্যোতিষের অমোঘ সফলতা সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার উদাহরণ দ্বারা ডাক্তার রায়ের—তথা আমাদেরও—বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। যাঁহারা হাঁপানি রোগে ভুগিতেছে, তাঁহারা রাজসাহীতে শশধর বাবুর কাছে ঐ মাদুলীর সন্ধান নিতে পারেন।

সত্বরই হইল; সূর্য্যদেব আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াই যেন হাসিতে হাসিতে জলদ যবনিকা অপসারিত করিয়া পুনরাভিভূত হইলেন। সকলেই সভাস্থ হইলেন। তখন অপরবিধ ঝঞ্ঝামারুতের অভিনয় চলিল। ব্রাহ্মণ সমাজপতি,রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের বিপ্র-বিদ্বেষ-সূচক কথার প্রতিবাদ নিমিত্তে আহূত হইলেন। তিনি বক্তৃতায় প্রতিবাদ কারী-দের উপরও কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই। ফলতঃ কবিতায় ও বক্তৃতায় সঙ্গী-তে ও আখ্যায়িকায়,অনবরত যাহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রূপ বর্ষিত হইতেছে,আমরা তাহাদিগের প্রচারিত গ্রন্থ ও পত্রিকাদি টাকা দিয়া কিনি ও পড়ি; এমন কি, মধ্যে মধ্যে অভিনন্দনাদি দ্বারা তাহাদিগকে অভ্যর্থিত করিয়াও থাকি—আজ আমাদের একটা মোটা কথায় চটিয়া "চা পেয়ালার ঝড় বহান" কতদূর সুলঙ্গত, ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি?

এই ঝটিকারও এইরূপে অবসান হইলে, আরও দুই একটী প্রবন্ধ পাঠ হইল। দুই এক জন বক্তৃতাও করিলেন। শ্রীযুক্ত সত্য-চরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের বালী যব প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দু দেবমন্দিরাদি সম্বন্ধীয় এবং লাহোর সহর হইতে সমাগত জনৈক ভদ্র লোকের "পঞ্জাবে বাঙ্গালীর প্রভাব" বিষয়ক বক্তৃতা বড়ই উপাদেয় হইয়াছিল। অতঃপর সভাভঙ্গের সময় এই সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বাহাদুর কর্ত্তৃক সভাস্থ সকলেই তদীয় বাটীকায় স্বাস্থ্য-সমিতিতে আমন্ত্রিত হইলেন। অনেকেই তদীয় সাগ্রহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

রাত্রি প্রায় আটটার সময়ে সভা-মণ্ডপে আলোক-চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যো-পাধ্যায় মহোদয় এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় অনেক দর্শনীয় বিষয় সমবেত জনসাধারণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইলেন। উক্ত অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগী ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎ কুমার রায় মহাশয়ের উপরও ধন্যবাদ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হইল।

তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে বর্ত্তমান সাহিত্য-কুরুক্ষেত্রের ভীষ্ম (গঙ্গা-সুত) শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট পরিচিত হইবার জন্য তদীয় ভবনে গমন করিলাম। সেখানে দুই একজন সাহিত্য-সেবীর বাসা ছিল, আবার অনেকে গিয়া দেখা শুনার জন্য উপস্থিত হইলেন। ছোট খাট এক 'সম্মিলন' হইয়া গেল। হাস্য পরিহাস, গল্প-গুজবে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রসালাপে মজলিশ্ ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিলাম,অভ্যা-গতদিগের উপভোগার্থ স্থানীয় বিশেষত্ব-যুক্ত 'চণ্ডীর গানের' অনুষ্ঠান হইবার কথা ছিল, কিন্তু দল পাওয়া গেল না। এখানকার সম্মিলনে স্থানীয় কিছুই প্রদর্শিত হইল না, এইটা হইলে তবুও কিছু হইত।

মধ্যাহ্নে শারীরিক কিঞ্চিৎ অস্বাস্থ্য নিবন্ধন সভা-মণ্ডপে যাইতে বিলম্ব ঘটিয়া-ছিল। দুইটার কিছু পরে গিয়া দেখি, একের পর আর অনেকগুলি প্রস্তাব উপ-স্থাপিত, সমর্থিত, অনুমোদিত ও পরিগৃহীত হইতেছে। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে ঐগু-লির কোনও আলোচনাই হয় নাই। ফলে এই হইল যে, কোনও কোনও প্রস্তাব অনেক গোলমালের পর পরিগ্রহণীয় আকার ধারণ

করিয়াছিল। এই দিন কয়েক জন মোসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান সাহিত্য-সেবক সভাস্থ হইয়া সম্মিলনের কর্য্যে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন; ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। "সাধারণ-সম্মিলন-সমিতিরও" নব কলেবর গঠিত হইল। কিন্তু এই সমিতির কিম্বা এতন্নির্ব্বাচিত-সম্মিলন-পরিচালন সমিতির অস্তিত্বের বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার ধারণা নাই। সমস্ত ভার সাহিত্য-পরিষদের উপর অর্পণ করিলেই ঠিক্ হয়।

অতঃপর যথারীতি ধন্যবাদ আদান প্রদানের পর সম্মিলন ব্যাপার এবারকার মত সম্পূর্ণ হইল। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে, সভাপতি মহারাজ বাহাদুর বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, আগামী বর্ষে চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

এইবার সম্মিলনের পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ হইল। "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি" গেল, এখন তাড়নার অর্থাৎ প্রকৃত কাজ করিবার সময় আসিল। এই পাঁচ বৎসরে সম্মিলনের নিয়মাবলী গঠিত হইল; এখন সম্মিলনটী স্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এবার ত বহু বেগ পাইয়া চুঁচুড়ায় 'সম্মিলন' বসিল। দৈবাৎ রায় বাহাদুর মহেন্দ্র বাবুকে আমাদের মাতৃভাষাধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীরূপে স্বপ্নাদেশ * করিয়াছিলেন, তাই সম্মিলন ঘটিল; নচেৎ যে কি হইত, কে বলিতে পারে? আগামীতেও সৌভাগ্য বশতঃ চট্টগ্রাম সাহস করিয়া ডাকিয়াছে। কিন্তু এইরূপ দৈব বা ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা অনুচিত। সম্মিলনের ব্যাপারে নানা দোষ ঘটিতেছে এবং ঘটিবে; তাহা প্রদর্শন করিব। কিন্তু ঐ টীকে স্থায়ী করিতে হইবে, ইহা সাহিত্যসেবী মাত্রেরই প্রাণের আকাঙ্খা। পরিষদকে স্থায়ী করিবার জন্য ৫০,০০০৲ টাকার একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। ভগবৎ কৃপায় পরিষদের আর ভয় নাই; অন্ততঃ অর্থাভাবে পরিষদ মারা যাইবে না। কিন্তু সম্মিলন-ব্যাপারে ত অর্থই প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। ২।৩ হাজার টাকার কমে এ ব্যাপার সম্পাদিত হয় না। যে যে স্থানে সম্মিলনের, তথা বঙ্গ সাহিত্যের উদ্দীপনার প্রয়োজন, সেই সেই স্থানের লোকে ত অর্থের সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়াই সম্মিলন আহ্বান করিতেছে না। অথচ, সাহিত্য বিষয়টী রাজনীতির ন্যায় উকীল প্রভৃতি ধনী ও উদ্যমপরায়ণ ব্যক্তিদের সেব্য হয় নাই। তাই রাজনৈতিক মজলিশ গুলিতে স্থায়ী কোনও তহবিলের দরকার না হইলেও, সাহিত্য-সম্মিলনকে স্থায়ী করিতে হইলে একটী ভাণ্ডারের একান্ত প্রয়োজন। এমন ভাণ্ডারের প্রয়োজন, যাহার বার্ষিক আয় হইতে, সম্মিলন যেখানে বসিবে, ঐ স্থানে প্রভূত পরিমাণে অর্থ-সাহায্য প্রদান করিতে পারা যাইবে। এবং দরিদ্র সাহিত্য-সেবীগণের যাতায়াত ব্যয় নির্ব্বাহার্থও কিছু কিছু দেওয়া যাইতে পারে। ময়মনসিংহের অধিবেশনে দরিদ্র সাহিত্য-সেবকদিগের সাহিত্য চর্চ্চার সাহায্য বিধানার্থ একটী ভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বারকার সম্মিলনে ঐ সম্বন্ধে কোনও কিছু উচ্চ বাচ্য হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আবশ্যক বোধ হইলে এই ভাণ্ডার ও সম্মিলন ভাণ্ডার একীভূত

* পূর্ব্বে চণ্ডী মনসা, প্রভৃতি দেবতা স্বপ্ন দেখাইয়া কাব্য-রচনা করাইতেন। কেহ কেহ ইহা লইয়া রসিকতা করিয়া নিজেরই ধর্ম্মরুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এবার তাঁহারা কি বলিবেন?

হইতে পারে এবং সাহিত্য-পরিষদের হস্তে ইহা ন্যস্ত হইতে পারে। বেশী নয়, লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ করিয়া রাখিলেই চিরস্থায়ী ভাণ্ডার হয়। আমাদের সম্মিলন-শিশু যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এত বড় হইয়াছে, সেই শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর এতদ্বিষয়ে প্রণিধান করিয়া ইহার একটা ব্যবস্থা সত্বর করুন, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হউক।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

বঙ্গসাহিত্যের জাগরণ। (৪)

কিন্তু, ইহাঁদের কার্য্য মধ্যেও একটা বিশেষ অভিযোগের কারণ ছিল। বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সময় হইতেই বঙ্গীয় শব্দশাস্ত্র এবং অভিধানের ক্ষেত্রে একটা প্রবল সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে, ও উত্তরোত্তর ভয়াবহ হইয়া চলিতেছে। এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কৃতের দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; সুতরাং তাঁহাদের 'আর্য্যামী'-গৌরব এবং শুচিপ্রবণতাই স্বাভাবিক, আর্য্য আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আপাততঃ বঙ্গভাষার প্রধান সমস্যার পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন; স্বয়ং উহার পূরণবিষয়ে যথোচিত চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু, উহাই যে বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যের চিরকালীয় মহাসঙ্কট, তাহা বাঙ্গালী মাত্রকেই স্বীকার করিয়া এবং চিরকাল সতর্ক থাকিয়াই চলিতে হইতেছে।

বঙ্গভাষা হিন্দী প্রভৃতি প্রাকৃতভাষার সমজাতীয়; উহা আর্য্য এবং দেশীয় রক্তের সম্মিলনে, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত পদগতির সংমিশ্রণে, বঙ্গদেশের হৃদয় হইতে সমুৎপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায়, বিস্তর শব্দ বিদ্যাসাগরীয় অভিধান হইতে, অথবা লিপিবদ্ধ সাধুসাহিত্যের সীমা হইতে তিরস্কৃত হইয়া নিরালম্ব ভাবে দূরে দূরে এবং বাঙ্গালীর মুখে মুখে ভাসিতেছে। হিন্দীসাহিত্য ও অভিধান এই জাতীয় শব্দের অনেকগুলি পংক্তি ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। এই জাতীয় অনেক শব্দের কার্য্যকরী শক্তি ও অর্থশক্তি অসাধারণ। দেশের হৃদয় সহবাসে থাকিয়া, উহারা এই শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাসাগরাদির পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, বঙ্গসাহিত্য একদিকে এই জাতীয় শব্দ স্বীকার করিতেই লাগিয়া গিয়াছে। প্রাচীন গীতি কবি ও বরিত কবিগণের মধ্যে, উপাখ্যান-মঙ্গল এবং পুঁথি রচয়িতৃগণের মধ্যে, কবি খেউর ঝুমুর পাঁচালী মালসী গায়কগণের মধ্যে বঙ্গভাষার দেশভিত্তিই প্রকটিত। তৎপরে মুদ্রাযন্ত্র-প্রচলনের পর হইতে, মহানুভব কেরী প্রভৃতির মধ্য দিয়া (চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামনারায়ণ তর্করত্ন, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি হইতে আধুনিক কালের যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালা, নাটক, নভেল ও প্রহসন, লেখকগণের মধ্যে) বঙ্গভাষার এই প্রাকৃত ধারাই ন্যূনাধিক প্রবাহিত হইতেছে। বাঙ্গালীর অন্তর্জীবনের সহযোগী কোন লেখক ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। সকল সভ্যসাহিত্যের ন্যায়, এই ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর প্রধান সমস্যা; উহা লেখক মাত্রেরই

চিন্তনীয়। আমরা যথাস্থানে উহাকে পরিদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। যা'হোক, এই ক্ষেত্রেও, বঙ্গভাষার পদগতি এবং বাক্যশক্তি বিষয়ে, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের নিকট সকল সময়েই ন্যূনাধিক শিক্ষালাভ হইতে পারে। তাঁহারা আপনাদের অবলম্বিত বিষয় এবং অবস্থার গতিকে শব্দ-সমস্যার পাশ কাটিয়া গেলেও, বঙ্গীয় সাধু বাক্যের মূল মাহাত্ম্য-লক্ষণ এবং উহার শক্তিতত্ত্ব তাঁহাদের মধ্যেই প্রকাশিত; দিকদর্শনের সূচীশলাকা তাঁহাদের রচনা মধ্যেই নিহিত। তাঁহাদিগের অনুসৃত পদগতির 'ছক' অবলম্বন করিয়া, এবং তাঁহাদের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীকে নব নব শব্দার্থের উপার্জ্জন করিতে হইবে; কোন অসংস্কৃত পতিত অথবা বিজাতীয় শব্দকেও বঙ্গ সরস্বতীর অঞ্চলভুক্ত করিতে হইলে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই জাতসংস্কার অথবা পরিমার্জ্জনা ভিন্ন সাধু-সমাজে গ্রহণীয় হইবে না।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বাঙ্গালীকে সার্ব্বজনীন ভাব-পথে, দেশের সর্ব্ব-সামান্য ভাষা প্রকৃতির মধ্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, ও তাহার গদ্য প্রণালীকে সুমার্জ্জিত সংস্কৃত এবং সুদৃঢ় করিয়া, উহাকে বিশ্বভাব গ্রহণে দীক্ষাদান করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত চিন্তা করুন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, প্রায় ৪০ বৎসর, বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর (প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার শিক্ষা-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত) শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-জগতে এই দৃষ্টান্ত অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, নব্যবঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রকে বিদ্যাসাগরের মানস-পুত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ইঁহারা বিশ্বমানবের জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে বাঙ্গালী জীবনের সামঞ্জস্য চিন্তা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উহার ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে এই সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সকল মহাত্মার চেষ্টা ও চিন্তা বঙ্গভাষা ন্যূনাধিক গ্রহণ করিয়াছে; বাঙ্গালার সাহিত্য ও সমাজ ইঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা পথে কার্য্য করিয়া স্থির পরিণতির অন্বেষণ করিতেছে। কাব্যের ক্ষেত্রে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের, কার্য্যসূত্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত ও পারস্য আদর্শের সমন্বয়ে বঙ্গসাহিত্যে উপাখ্যান ও খণ্ড কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর ড্রাইডেন, পোপ প্রভৃতি ইংরাজ কবির ও বাঙ্গালী কবিওয়ালার সম্মিলন-জনিত অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাঁহার প্রভাবও এককালে কলিকাতা রাজধানী হইতে প্রসারিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে এক অপরূপ স্থিতিশীল ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; ও পরবর্ত্তী ক্ষমতাশালী কবিগণের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল। ব্যঙ্গভাব এই জাতির মারাত্মক দোষ; বাঙ্গালী কর্ম্মী নহে বলিয়াই এই দোষ তাহার পক্ষে বিশেষ মারাত্মক। গুপ্ত কবির মধ্যে আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা সাহিত্যের অধ্যাত্মলোকের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সত্য ও পুণ্য আদর্শের বিরোধী; উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমাজ এবং সাহিত্যের ক্ষয়রোগ। এই ব্যঙ্গ এবং বিদ্রোহভাব হইতে জন্ম লাভ করিয়াই, ফরাসী বিপ্লব শতাব্দী শেষে

সমগ্র য়ুরোপকে, আগুনে ও জলে বিদাহিত ও ধৌতবিধৌত করিয়া গিয়াছে ; স্বতঃপরতঃ নব সাহিত্য ও সমাজ-প্রথার পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে। প্রাচ্য হৃদয় জাতীয় বিপ্লব রূপ বিষচিকিৎসার, কিম্বা কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দুরাকাঙ্ক্ষা রাখে না; সুতরাং এই ব্যঙ্গভাবই তাহার চরিত্র মধ্যে আলর্ক বিষের ন্যায় দুশ্চিকিৎস ও সাঙ্ঘাতিক কার্য্য করিতে থাকে। বর্ত্তমান কালেও, এই অনুদার বিদ্বেষ-ব্যঙ্গই আমাদের সাহিত্যের অদৃষ্টে বসিয়া কীটের তথা মূষিকের ব্যবহারেই রত রহিয়াছে।

বাঙ্গালীর বুদ্ধিমান বলিয়া দুর্নাম আছে; এবং নিজের এই 'বুদ্ধি' লইয়া, তাহাকে অহমিকা প্রকাশ করিতে প্রায় দেখা যায়। এই অতি বুদ্ধিই জাতীয়, পারিবারীয় ও সাহিত্যক্ষেত্র সর্ব্বত্র তাহার সর্ব্বনাশিনী হইতেছে। জগতের যত নিষ্কর্ম্মাবতার, সকলকেই নিজের অধিক 'বুদ্ধির' গৌরব করিতে দেখা যাইবে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পরচর্চ্চায় তৎপর হইতে পারে। স্বয়ং কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই, জীবন যুদ্ধে ব্যাপৃত ভ্রাতার প্রতি সহৃদয়তা ও সহানুভূতি-স্ফূর্ত্তির অবসর ঘটে। আমাদের সমাজ ও পরিবার-বন্ধনের ফলে, এইদেশে নিষ্কর্ম্মার অভাব নাই; সুতরাং অনেকের জীবনেই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হইবার পথ সহজ হইয়াছে। যে কারণেই হউক, পূর্ব্বকালের বঙ্গসমাজে এই বুদ্ধিমানের সংখ্যা যেন অধিক ছিল না; অন্ততঃ তাহার শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব বা অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে এই দৃষ্টান্ত অধিক মিলে না; ভাড়ুদত্ত ও হীরামালিনীর সংখ্যাও বেশী নহে। কবিকঙ্কন স্বয়ং ভাড়ু দত্তকে ঘৃণা করিয়াছেন। কিন্তু রাজকবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আদ্যন্ত যে সাহিত্যাদর্শে বিরচিত, উহার অধ্যয়ন ফলে এই শক্তিশালী কবির প্রতি অন্ততঃ ভক্তি-সম্মানের ভাব জাগ্রত হয় না; তিনি স্বরচিত কাব্যের প্রতিপদে পরমানন্দ ভোগ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, মনে হয়। পলাশীর পণ্যক্ষেত্রে যাঁহারা মাতৃভূমিকে কড়ির মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিত্র-রুচিগন্ধ যেন তৎকালের এই কাব্য-রসোচ্ছ্বাসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত ও ভারতচন্দ্র, উভয়েই অকপট এবং সাধুচরিত্র ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; তৎ-সত্ত্বেও দেবমন্দিরের মধ্যস্থলে এই যে আরতি-চরিত্র প্রকট হইয়াছে, উহা তৎকালের জনহৃদয়ের অপরিহার্য্য প্রতিভাস বলিয়াই মনে হয়। বরং তাঁহাদের অকপটতার দরুণই যেন দেশব্যাপক সত্যমূর্ত্তি রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হইবার পক্ষে সমধিক সুবিধা পাইয়াছিল। আমাদের সমাজে নির্লজ্জ, সর্ব্ব ব্যঙ্গপ্রিয় ও সর্ব্ববুদ্ধিমান চরিত্রের মাত্রা বর্ত্তমানে অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমাদের দুর্দ্দশা বহুব্যাপক হইতে পারিয়াছে। যে জাতির অধিকাংশ লোক কোন বিষয়েই Serious হইতে পারে না—কার্য্যে পরিণত করার মতন পারে না, তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য। মহৎ চরিত্রের এবং সাহিত্য-প্রতিভার তত্ত্বভাব বা High seriousness আমাদের জাতীয় জীবনে একদা অবসন্ন হইয়াই, উহার অধঃপাত অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল; এবং এখনও আমাদিগকে পতিতের অবস্থা মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতেছে।

এই যুগের সাহিত্যে, আর তিন জন বিশিষ্ট কর্ম্মী ব্যক্তির কার্য্যোল্লেখ বাকী আছে।

ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের নাম শেষে আনিয়াছি; প্যারীচাদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোম ও দীনবন্ধু মিত্র। এই তিন জনের নামও বঙ্গীয় গদ্য-রীতি ক্ষেত্রে, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের সমযোগী, চিরস্মরণীয় ও চিরপ্রভাবশীল।

জাতীয়তার প্রভাব, বাস্তবিক জীবনের গভীর উদ্দেশ্যযুক্ত সত্য ও সৌন্দর্য্যচিত্র এবং ঋজু বাক্য-রীতিই ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। প্রাচীনকবি মুকুন্দ রাম একরূপ অতর্কিতে, কোন কোন দিকে এই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয়তা ও বাস্তবতার আদর্শও আমাদের সাহিত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিয়াছে। সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে, চরিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে প্রাকৃত আদর্শ এবং বাস্তবতাকে উদ্দেশ্য করিলে, বাক্য-রীতিকেও ন্যূনাধিক প্রচলিত ভাষা পদ্ধতির অনুগত হইতে হয়; আবার, এই বাস্তব-প্রিয়তাই চিরকাল সাহিত্যকে অচলতা ও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে থাকে। দেশের মধ্যে এই জাতীয় শিল্পীর অভ্যুদয় সাহিত্যের পরমমঙ্গলাবহ ও আশাপ্রদ। আমরা বিদ্যাসাগরাদির কার্য্যবিচার কালে এই বিষয়ের সঙ্কেত করিয়া আসিয়াছি। ফলতঃ ভাষার উভয়াত্মিকাশক্তি—উচ্চতম সত্য-সৌন্দর্য্য হইতে প্রাকৃততম ভাব ও ক্রিয়া-চেষ্টা পর্য্যন্ত যথাযোগ্যভাবে ধারণা করিবার শক্তি যে পর্য্যন্ত সুসিদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ভাষা কখনও জীবিত সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। বঙ্গসাহিত্যের নবজীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, একদিকে যেমন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার উহার আর্য্য-কৌলীন্য সিদ্ধ করিয়াছেন, অন্যদিকে "আলালের ঘরের দুলাল" "হুতোম পেঁচার নক্‌সা" প্রভৃতি উহার প্রাকৃতদেশভিত্তি এবং অনাস্থিকতাও প্রমাণিত করিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত এবং প্রাদেশিকতার মধ্যক্ষেত্রে বঙ্গভাষা আপনার স্বাতন্ত্র্যে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতেছে। বিশেষ অসংস্কৃত, অপভ্রংশ বা শ্রুতিকটু না হইলে, বাঙ্গালী লেখক উপস্থিত মতে সর্ব্বপ্রকার সংস্কৃত, দেশজ বা যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেছেন। এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বা ভারতীয় প্রদেশ-ভাষা মাত্রেরই যাহা চিরকালের সঙ্কট, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, আপন হৃদয়ের সামঞ্জস্য-জ্ঞানই শব্দ নির্ব্বাচন বিষয়ে লেখকগণের একমাত্র কাণ্ডারী এবং রক্ষক, ঔচিত্যবুদ্ধিই ভারতের প্রধান পরিচালক। বিপুল গভীর কিম্বা পরিনাহী মর্ম্মভাবকে চিরকালের বোধগম্য করিতে হইলে, যেমন চিরজীবী শব্দাভিধানের এবং সাধুনীতির সাহায্যে নিরূপিত না করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় না; তেমন, প্রাকৃত অথবা চলনসই ভাবকে চলনসই শব্দদ্বারা সমুজ্জ্বল করিতেনা পারিলেও যথেষ্ট হয়না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরস্বতীমাতার স্বাধীন পদগতি এবং অনন্ত মুখরতাকে নিগড়বদ্ধ করিতে পারে, মনুষ্যের এমন সাধ্য নাই। মুদ্রনযন্ত্রের প্রচলন হইতে জাতীয় সরস্বতী যে নানাদিকে চঞ্চলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোষ-গ্রন্থের অধিকারে আসিয়াই বিশ্রাম করিতে চাহিতেছেন, তাহা স্বীকার্য্য; এবং ইহাও নিশ্চিত যে, কথিত ভাষা নিত্যকাল নানারূপ অনীতি এবং দুর্নীতির বাধ্য হইয়া উপরন্তু বিচলিত হইয়াই চলিতে থাকে। আজ যেই শব্দকে সাধারণের মুখে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে

হইতেছে, বিশ বৎসর পরে, উহাই পুনর্ব্বার সাধারণের মুখেই বেগতিক হইয়া, বিরূপ হইয়া যাইবে। কথিত ভাষার এই চলতি ভাব বা জীবনগতি চিরকালের সত্য। সুতরাং যাঁহারা একান্তভাবে কথিত ভাষার উপরেই আস্থা স্থাপন করিবেন, তাঁহাদিগকে যে কখনও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবেনা, এই কথা কদাপি নিশ্চয় নির্ব্বন্ধে স্থির হইবার নহে। এই অবস্থার লেখকের নিজের যোগ্যতা এবং যোগ্যতাজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত অন্য উপায় নাই। বঙ্গভাষা চিরকালের আর্য্য-প্রকৃতি এবং সংস্কৃত অভিধানকে আত্মসিদ্ধ করিয়া লইয়াছে, এই কার্য্যে যেমন বিদ্যা-সাগর প্রভৃতির গৌরব; তেমন যাঁহারা কথিত বাঙ্গালীর শব্দ প্রকৃতিকেও মুদ্রালিপি-বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরবও কোন অংশে কম নহে। বলিতে কি, বঙ্গভাষায় চিরকাল চ্যুত-সংস্কৃতি অপেক্ষাও বরং শ্রুতিকটুতা ও বর্ব্বরতা, নির্জীবতা এবং অনার্জ্জব প্রভৃতিই মারাত্মক দোষ বলিয়া পরিগণিত। লেখকগণের আপনাপন হৃদয়ের সামঞ্জস্য-জ্ঞানই এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের এক মাত্র সহায়। বঙ্গভাষার বাক্যপ্রণালীও, ক্রমে সংস্কৃতের সমাস-বহুল প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া Analytic, বা অব্যয় ও নির্দ্দেশ-কাদি সাহায্যে বিস্তারী হইয়া পড়িতেছে। মুদ্রা যন্ত্রের প্রচলনের পর হইতে, সভ্যজাতির ভাষা ও সাহিত্যরীতি মাত্রেই এখন এই আদর্শে, জাতীর হৃদয়গতি ও প্রকাশ স্ফূর্ত্তির আদর্শেই প্রবাহিনী হইয়া চলিতেছে। ফলতঃ, এই সকল সুকৃতী সন্তানের হৃদয় হইতে, পরম গরীয়সী ও স্বাধীন গতিলাভ করিয়াই, বঙ্গভাষা পরবর্ত্তী সুধন্য শিল্পীগণের সমক্ষে "সপ্তকোটীকণ্ঠ কল কল নিদাদ করালে" মূর্ত্তিতে, বঙ্গদেশের আপামর মহাজনের হৃদয়-ঙ্গম মূর্ত্তিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এই ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর * কার্য্যও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু তাঁহার কাব্যা-দিতে উন্নত বাঙ্গালী জীবনের ছবি ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিল্প-তুলিকায়, প্রাকৃত বঙ্গজীবনের চিত্র—আদুরী, তোরাপ ও নিমচাঁদ প্রভৃতি, অপূর্ব্ব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষা ও রীতি বিষয়ে দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। আবার, ১৮৫৯ সালে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয়; তাহার পর বৎসরই দীনবন্ধুর নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী চারি বৎসরে, নব্যবঙ্গের প্রথম কবি মধু-সূদনের রত্নাবলী, শর্ম্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য মুদ্রিত হইয়াছিল। মধুসূদন পরবর্ত্তী যুগের কবি; সুতরাং তাঁহার বিষয় স্বতন্ত্র নিবন্ধেই আলোচ্য। দীনবন্ধুই বঙ্গ সাহিত্যের শিল্প-ক্ষেত্রে নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল। বাঙ্গালী তখন সবে মাত্র, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে, স্বাধীন সাহিত্য-শিল্পের আদর্শে জাগিতেছিল। তাহার ভাষা তখনও সর্ব্বাঙ্গীন যোগ্যতা লাভ করে নাই; মেঠো সুরে ও নিম্ন পর্য্যায়ে বিলক্ষণ সুসিদ্ধ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু উচ্চকণ্ঠে গান করিতে গেলেই, তাহার বীণাতন্ত্রী বিচ্ছিন্ন হইয়া, কণ্ঠস্বর বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। দীনবন্ধু এবং মধুসূদনের নাটকগুলি তাহারই প্রমাণ।

* দীনবন্ধু মিত্র—জন্ম ১২৩৬ সাল, ১৮৩০ খ্রীঃ অঃ; নদীয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী চৌবেড়িয়া গ্রাম; ১২৬১ সাল ১৮৫৫ খ্রী কলেজ ত্যাগ ও পোষ্টমাষ্টারের পদপ্রাপ্তি; নীল-দর্পণ (১৮৬০) নবীনতপস্বিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী. সুরধুনী কাব্য (১৮৭১), জামাই বারিক, দ্বাদশকবিতা, কমলেকামিনী; মৃত্যু ১২৮০ সাল বা ১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ।

কিন্তু দীনবন্ধুর হৃদয়ে আনন্দ আছে; উহা প্রকৃত কবিহৃদয়ের ও কারিকরের আন্তরিক সৃষ্টিসামর্থ্য-জনিত পরিতোষ ও পরিতৃপ্তি। দীনবন্ধু স্বয়ং হাস্যরসিক, সত্য; কিন্তু উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর ড্রাইডেন, পোপ বা বল্‌টেয়ারের হাস্যরস নহে; গুপ্তকবি কিম্বা কবিওয়ালার বঙ্গভাবও নহে। দীনবন্ধুর হাস্য, পরম সহৃদয় ও সহানুভাবক কবির নির্ব্বিদ্বেষ ও নির্ব্বিষ উচ্চহাস্য।

এই সময়ের পূর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রকৃত শিল্প-নাটক রচিত হয় নাই, বলিলেই ঠিক হয়। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর (১) স্বপ্নবিলাস ও রাই উন্মাদিনী প্রভৃতি, বৈষ্ণব-কবিগণের ভাবোচ্ছ্বাসকে কথোপকথন-সূত্রে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। উহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অপেরা বা গীতিনাট্য। রামবসু (২) হরুঠাকুর (৩) রামনিধি রায় (৪) ও দাশরথি রায় (৫) প্রভৃতি কবিগান, পাঁচালী ও সঙ্গীত রচনা করেন; তাঁহাদের এবং দীনবন্ধু ও রামনারায়ণ প্রভৃতি নাট্যকারগণের মধ্যপথে, কথাবার্ত্তার সূত্র ধরিয়া এবং জাতীয় প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বঙ্গদেশে 'যাত্রা' নামক একটী অতি বিপুল সাহিত্যচেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছে ও এখন যাবৎ অক্ষুণ্ণভাবে সন্ততি রক্ষা করিতেছে। উহা সকলদিকে য়ুরোপীয় মধ্যযুগের ধর্ম্মনাট্যগুলির সমপ্রকৃতিক। কিন্তু উহা স্বতন্ত্র কিম্বা গৌরবান্বিত সাহিত্য-শিল্পরূপে এখনও পরিণত হইতে পারে নাই,—দীনবন্ধু ও মধুসূদনের নাটকাদিতেই, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বা পূজা সম্পর্কহীন কাব্যরসের প্রথম আভাষ পাই। ইঁহারাই বঙ্গে প্রকৃত নাট্যসাহিত্যের অগ্রদূত, তাই, ভাষা ও শিল্প-রসতত্ত্বের প্রাথমিক ন্যূনতা, ক্ষীণতাও তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট। কিন্তু কবি-প্রতিভার আভ্যন্তরীণ যজ্ঞাগ্নিশিখা সর্ব্বত্র সজাগ, এবং উহাই স্থানে স্থানে স্ফুটপ্রভাসে প্রসারিত হইয়া হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিতে থাকে।

আমরা এইস্থলে,বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালী প্রতিভার স্ফুটজাগরণের পুরদ্বারে, এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে চাই। ইহার পর, বঙ্গসাহিত্য বিশ্ববাণীসঙ্গতে স্বতন্ত্র গতি অবলম্বন করিয়াছে। এই নবজাগরণের ও যুগস্বামীগণের কার্য্যবিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। এইস্থলে দাঁড়াইয়া, একবার প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি সমূহভাবে দৃষ্টিপাত করুন। জর্ম্মন-দার্শনিক ফিক্টে (Fichte) সাহিত্যের ও কাব্যের লক্ষণ অভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—"সাহিত্য মানবহৃদয়ের ধর্ম্মভাবের স্ফুটপ্রকাশ মাত্র "Poetry is an expression of a religious idea." দার্শনিক, সাহিত্যের সর্ব্বব্যাপক ও দেশকাল পাত্রের মধ্যস্থিত অবিচ্ছিন্ন প্রাণতত্ত্বকে ধারণা করিবার উদ্দেশ্যেই এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফিক্‌টে এই Religious idea বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালের প্লেটো ও বর্ত্তমানের ম্যাথু আর্ণল্ড প্রভৃতি Moral idea বলিতে তাহাই বুঝিয়াছেন। ভারতীয় সমাজ-দার্শনিক মনুও 'ধর্ম্ম' বলিতে, দেবসম্পর্কহীন ও সাম্প্রদায়িক পূজা-সম্পর্ক-হীন মরেল আইডিয়া বা মনুষ্যত্বই বুঝিয়াছেন। বুদ্ধদেব ত্রিরত্নের অন্তর্গত ও 'ধর্ম্ম'সংজ্ঞায় মনুষ্যত্বের এই অসাম্প্রদায়িক লক্ষণই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই দেবানুগ্রহ কিম্বা নিগ্রহবিহীন মনুষ্যত্ব ভাবই বর্ত্তমানের 'বিশ্বসাহিত্য'

(১) কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) (২) রামবসু (১৭৮৭-১৮২৮) (৩) হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮১৩) (৪) রামনিধি রায় (১৭৪১-১৮৩৪) (৫) দাশরথি রায় (১৮০৪-১৮৫৭)

সংজ্ঞার আদর্শ; উহা উনবিংশ শতাব্দীর স্পষ্টপরিদৃষ্ট আদর্শ। উনবিংশ শতাব্দীই অন্য বহুবিধ তত্ত্বের ন্যায়, সাহিত্যের এই লক্ষণের খ্যাপন, ব্যাখ্যান ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এবং উহাকে নানাদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। দৈব-সম্পর্ক-হীন মনুষ্যত্ব আদর্শের আদিসাধক রূপে মানবসমাজের সর্ব্বাদিম স্বাধীনতা গুরুরূপে, ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয় ঋষি বুদ্ধদেবকে নির্দ্দেশ করিলে, অত্যুক্তি হয় না। মানব-সমাজের এক তৃতীয়াংশ এখনো বুদ্ধের শিষ্যপ্রশিষ্যে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান সভ্যতার ইতিহাসেও, পৃথিবীতে সর্ব্বত্র বুদ্ধের আত্মাই কার্য্য করিতেছে, দেখিতে পাই, কিন্তু, বুদ্ধের আদর্শ ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে, বা বঙ্গদেশে, মুখ্যভাবে কার্য্যকর হয় নাই, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, সমগ্র সাহিত্য উহার গৌণ ফলেই নিয়ন্ত্রিত। এই দেশে, বুদ্ধাত্মা কার্য্য করিতে না পারিলে, বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি [illegible] রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত, আর কোন সাহিত্য জন্মলাভ করিতে বা রক্ষিত হইতে পারিত কি না, সন্দেহ। ভারতবর্ষ বহু সহস্র বৎসর কেবল বৈদিক সাহিত্য লইয়া প্রাণধারণ করিয়া আসিয়াছিল, অন্যবাক্য চেষ্টার 'আনর্থক্য' একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া গিয়াছিল। পূজা পৌরোহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবেই এই অভাবনীয় ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষ যাহাকে ত্রেতা বা দ্বাপর যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, পূর্ব্বোক্ত দুই তিন খানি সংগ্রহ গ্রন্থ ব্যতীত, তাহার আর কোন সাহিত্য বর্ত্তমান নাই। বুদ্ধদের কর্ত্তৃক বিদ্রোহের প্রভাবেই, ভারতের সাহিত্য ও দর্শনের উন্নতি। উহার ফলেই এইদেশের জনমন পৌরোহিত্য, দেবভীতি বা সাংসারিক প্রিয়ার্থকামের একান্ত সাধনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, নানা বিষয়গামী হইবার সুবিধা পাইয়াছিল। জনসাধারণের অভ্যুদয় ভিন্ন সাহিত্যের অভ্যুদয় হয় না; এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ভিন্নও ঐ অভ্যুদয়ের মাহাত্ম্য সিদ্ধ হয় না। কেন না, সাহিত্যক্ষেত্রে, সর্ব্বত্র ব্যক্তিত্বই মাহাত্ম্যের লক্ষণ; এই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট না হইলে, যেমন সাহিত্যশিল্পের, তেমন শিল্পীর মাহাত্ম্যও সিদ্ধ হয় না। বিধাতা কবির আত্মাকে একদিকে পরম সামাজিক, অন্যদিকে পরম অসামাজিক করিয়াই সৃষ্টি করেন; সে সাংসারিক হইয়াও সন্ন্যাসী; ভোগী হইয়াও যোগী; জনপ্রবাহের মধ্যে নির্ব্বিশেষে মিশিয়া গিয়াও সে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া আসে। এই কারণেই, অনেক সময়, সাংসারিক সংকীর্ণতা তাহাকে স্পর্শ করিতে বা তাহার হৃদয়কে কলুষিত করিতে পারে না। প্রাচীন ভারত কিরূপে নিজের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদর্শ এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্য হইতেও এই ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করিয়া, সমুন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল, তাহা পরম কৌতুকাবহ, ও স্বতন্ত্র ভাবে প্রণিধানের যোগ্য।

মানুষের ভাষাব্যাপারে, সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে, উহা বিশেষভাবে, মনুষের ভাববৃত্তির সৃষ্টি। এই বৃত্তি, মানুষের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সত্যকে ভিত্তি করিয়া, এবং মানুষের অধ্যাত্মজগৎ লক্ষ্য করিয়া যে ভাষা ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই সাহিত্য। তাই, জ্ঞানাধিকারের দর্শন বিজ্ঞান বা পুরাণ ইতিহাস কিম্বা ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্র প্রভৃতির প্রকৃতি সাহিত্য হইতে মূলেই বিভিন্ন।

সাহিত্য সকল জ্ঞানকেই ন্যূনাধিক অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু উহার স্বাতন্ত্র্য এই ভাব-বৃত্তির পরিপোষণেই স্থির থাকে। প্রাচীন কালের সাহিত্য-দার্শনিক প্লেটো প্রভৃতির পরিদৃষ্ট পন্থার অনুসরণ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীই সচেতন ভাবে সাহিত্যের এই আদর্শ দর্শন করিয়াছে।

এখন, এই আদর্শ চিন্তা করিলেই দেখিব, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনেক গ্রন্থ প্রকৃত সাহিত্যসংজ্ঞার আমল হইতে স্খলিত হইয়াছে। দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার কিম্বা পূজা প্রচারের সঙ্গে সাহিত্যের মুখ্য সম্পর্ক নাই। সাহিত্যের উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের মাহাত্ম্য প্রচার, এই মনুষ্যত্বের মধ্যে দেবত্বের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠাই সাহিত্যের কিকৃটে পরিদৃষ্ট religious idea. সাহিত্যের এই উচ্চতম, রসনিষ্পত্তি লক্ষ্য করিয়াই, সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন :—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্ব প্রকাশনন্দ চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ॥

সাহিত্য সত্ত্বের—মনুষ্যত্বের উদ্দীপনা করিবে, সাহিত্য স্বপ্রকাশাত্মক চিন্ময় আনন্দের উদ্রেক করিবে, এবং ঐ আনন্দে মনুষ্যমনকে সর্ব্বথা তন্ময় করিবার জন্য শক্তিশালী হইবে; ঐ আনন্দ মনুষ্যহৃদয়ে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সত্যশিবসুন্দরের—ব্রহ্মের—বৃহতের—অনন্তের যোগাস্বাদ উপনীত করিবে; আদি-করুণ প্রভৃতি মনুষ্যহৃদয়ের স্থায়ীভাবের অভিব্যক্তি সাহায্যে, বাহ্যিক ও আন্তরিক স্ফোট সাহায্যে ঐ আনন্দ মনুষ্যকে স্বাধীনতায়—স্বীয় তত্ত্বে, ব্রহ্মতত্ত্বে পরিচিত করিবে।

উপরোক্ত কথাগুলি নিবিষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে দেখিবেন, সাহিত্যের জাতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, কিম্বা দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি হইতে কতদূর পৃথক! সাহিত্যের ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নহে; অথচ সকল ধর্ম্মের সার সত্যই উহার ভিত্তি, সাহিত্যের সত্য কোন ইতিহাসের বস্তু-নিয়মাক্রান্ত সত্য নহে; অরিষ্টোটল (১) উহাকে ইতিহাস অধিকার হইতে উচ্চতর সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থ (২) উহাকে সকল সত্যের অন্তরস্থ মাধুরীধারা, এবং সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের বয়ান-মুখে ভাব-সমাবিষ্ট প্রসাদ-মূর্ত্তি (এক কথায়, সত্য প্রসাদ) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দর্শন বিজ্ঞানের, ধর্ম্মের, কিম্বা ইতিহাসের সত্য বা নীতি সাহিত্যের অপরিহার্য্য উপকরণ; কিন্তু এই দেশে সমস্তই আনন্দ নিমিত্তক; এবং আনন্দই সাহিত্য সংজ্ঞায় মুখ্য, সাহিত্য উপদেশ উপস্থিত করিতে পারে; কিন্তু উহা 'কান্তা-সম্মিতোপদেশ' (১) সাহিত্য-সংজ্ঞার এই বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াই প্রাচীন কাল হইতে দার্শনিকগণ উহাকে মনুষ্যের ভাষা ব্যাপার মধ্যে এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক কালের দার্শনিকগণও (২)

(1) "Poetry has a wider truth and a higher aim than history; for poetry deals rather with the universal, history with the particular".

(2) "Poetry is the finer essence of all knowledge" "Poetry is the impassional expression act in the countenance of all science." Wordsworth

(3) কাব্যপ্রকাশ।

(2) "We may be content to set out with a rough definition Literature, as consisting of works which, whether in verse or prose, are the handicraft of imagination rather than reflection, aim at the pleasure of the greatest posssble number of the nation rather than instruction and practical effect and appeal to general rather then specialised knowledge". Posnett.

গণও আনন্দকেই সাহিত্য-লক্ষণে মুখ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই আনন্দের 'বিষয়'-কেই সাহিত্যক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যনামে নির্দ্দেশ করা হয়।

এই ভাবে চিন্তা করিলে দেখিবেন, য়ুরোপের প্রাচীন হইতে আধুনিক পণ্ডিতগণ, কেহই, সাহিত্যের উন্নত আদর্শ ধারণায়, এই দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণ হইতে অগ্রগামী হন নাই। পরন্তু অদ্বৈততন্ত্রের দীক্ষা গতিকে আদর্শের বিশ্বব্যাপকতায় ও উহার মাহাত্ম্য ধারণায়, ভারতীয় ব্রাহ্মণ বরং অধিকতর উচ্চতা প্রদর্শন করিতেছেন।

এখন, সাহিত্যের এই আদর্শে যে বঙ্গসাহিত্যের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ উপনীত হয় নাই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না; দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াও নহে; পূজা প্রচারই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাজের মধ্যে যতকাল জগৎ-তত্ত্ব বিষয়ে ভয়ভীতি প্রবল থাকে, এবং ভীতি-লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম, পুনশ্চ ধর্ম্মের মধ্যে পৌরোহিত্যই একান্ত ভাবে প্রবল থাকে, তত কাল প্রকৃত সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হয় না। মনুষ্যসভ্যতার প্রধান লক্ষণ, জগদ্ ব্যাপারে মনুষ্যের নির্ভয় নির্ভর; জীবনের মধ্যে, প্রেম কল্যাণ ও আনন্দের অনুভব; জগতের 'কারণ' বিষয়ে সজ্ঞানে বা অতর্কিতে প্রীতি কল্যাণ ও পবিত্রতার আরোপ, এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্মে উহারই অনুভব সাধনা। বর্ব্বর জীবনের ও সভ্য জীবনের মধ্যে, এই স্থলেই নিদানের পার্থক্য। জাতি বিশেষের মধ্যে, বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার গতিও এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত; মানুষে মানুষে বর্ব্বর ও শিক্ষিতের মধ্যেও এই স্থলেই বিভিন্নতা। য়ুরোপীয় আধুনিক সভ্যজাতি সমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও এই লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জাতি, ন্যূনাধিক বর্ব্বরাবস্থা হইতেই হীব্রু ও গ্রীক রোমান সভ্যতার সঙ্গমফলে অভ্যুদিত হইয়া আসিয়াছে। উহার সাহিত্য-বেলায় সর্ব্বত্র জাতীয় হৃদয়গতির প্রবাহ-চিহ্ন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে; অধিকন্তু উহার উন্নত সাহিত্য-জীবনও কুত্রাপি পাঁচশত বৎসরের অধিক নহে।

বর্ত্তমানের বঙ্গভাষাও, সমাগত আর্য্য এবং দেশজ, দ্রাবিড়ীয় ও কোলেরীয় জাতির সঙ্গমফলে উৎপন্ন হইয়াছে, বাঙ্গালীর ভাষা, তাহার সমাজ ও ধর্ম্ম ন্যূনাধিক উভয় সভ্যতার লক্ষণই বহন করিতেছে, তাহার শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রণালীতেও সর্ব্বত্র আর্য্যদ্রাবিড়ের মিশ্র চিহ্নই পরিস্ফুট। বিজেতৃ আর্য্যগণের সমুন্নত জীবন এবং ধর্ম্মাদর্শে, বৈদিক সংস্কৃতের ও সংস্কৃত সাহিত্যের রাজচ্ছত্রতলে, ব্রাহ্মণ্য ও পৌরোহিত্যের প্রভাবে যুগপৎ নিগৃহীত ও অনুগৃহীত হইয়া, এই জাতি আপনার স্বতন্ত্র সাহিত্য-হৃদয়কে সন্তর্পণে বহন করিয়া, বর্ত্তমান যুগ-সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। উহার প্রকৃত সাহিত্যোচ্ছ্বাস সর্ব্ব প্রথম পঞ্চদশ শতাব্দীতে, বৈষ্ণবী প্রথায় উদ্ভূত হইয়াছিল, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম; উহার মধ্যে মনুষ্যত্বের অবসাধক কিম্বা স্বাধীনতার নিষেধক কোনরূপ ভয় ভীতি লক্ষণ নাই।

মানুষ যখন জগদীশ্বরকে প্রেমময় বলিয়া অনুভব করে, এবং প্রেমবলেই তাঁহার ভজন পূজনের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই মানুষের ধর্ম্মে, সমাজে, পরিবারে ও সাহিত্যে প্রকৃত মহাত্মতার সূত্রপাত হয়; তাহার সাহিত্য প্রকৃত জীবন প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালীকে নব জীবনে দীক্ষিত করিয়াছিল,

তাহার সাহিত্যকে অকস্মাৎ বিশ্বতো-মুখে বিস্ফারিত করিয়া দিয়াছিল; তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া, তন্মধ্যেই দেব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কল্পে তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। উহার ফল মহিমময় না হইয়া পারে না।

মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টের প্রীতি-পবিত্রতা এবং পরম বিনয়-মূলক ধর্ম্মের, অধিকন্তু তাঁহার পরম ব্যক্তিত্বের ছায়াগত হইয়াই, য়ুরোপীয় জাতিসমূহ আদিম বর্ব্বরতাকে বর্জ্জন পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইবার জন্ম একটা পন্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্য-সভ্যতার প্রধান মন্ত্র স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সাধনা; য়ুরোপীয় সমাজ তন্ত্রে, যীশুর আত্মাকে এই মন্ত্র সাবনার অবতার বলিলে অত্যুক্তি হয় না, মনুষ্যত্বের যে স্বর্গীয় অগ্নিদীক্ষায় এই মহাপুরুষ স্বয়ং দীক্ষিত হইয়া, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে স্বল্প পরিমিত শিষ্যমধ্যে উহার উদ্দীপনা করিয়া, ও পরিশেষে স্বয়ং এই সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এই পৃথিবী হইতে একদা পরম অগৌরবে ও নগণ্যভাবে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, উহাই পরকালে সমগ্র য়ুরোপকে নবজীবনের অগ্ন্যুপাসনায় দীক্ষিত করিয়াছে; য়ুরোপের বিপুল মনুষ্য সমাজকে ঐ অকিঞ্চনের রাজচ্ছত্রতলে নতশির করিয়া সমবেত করিয়াছে; তাঁহার বিন্দুটুই হৃদয়রক্তই এখন বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া, পশুত্বের কিলিবিলিময় নরসংঘকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম্যস্বপ্নে বিভোর করিয়া তুলিতেছে! এই বঙ্গদেশে বুদ্ধদেবের মহান্ স্বাতন্ত্র্যবাদ, আত্মত্যাগ ও দুঃখ বৈরাগ্য মূলক নিবৃত্তি ধর্ম্মের আদর্শ বিশেষ কার্য্যকর হইতে পারে নাই, বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারে নাই, তাহা আমরা দেখিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের প্রেমসঙ্কীর্ত্তনেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র নানাদিকে যীশুর প্রীতি-পবিত্রতা ও বিনয়-লঘিমার সহোদর। শ্রীচৈতন্য প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালী-হৃদয়ের আধ্যাত্মিক আদর্শ মূর্ত্তি; তাই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-পূর্ব্বেই বাঙ্গালীর প্রেমসিদ্ধ প্রথম কবি অধ্যাত্মলোকে উহার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। (১) পরে পরে,যখন উহার প্রকট আবির্ভাব হইল,তখন এই দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরম পরিচয়োল্লাসের জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল; শত শত হৃদয় হইতে প্রেমগঙ্গা-প্রবাহ নিঃসারিত হইয়া উহার ভাষা-সাহিত্যের চিরন্তন শুষ্কবক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালীর মহাকালী-প্রীতিকোমলতার এবং করুণার আদর্শে ভক্তগণের হৃদয়ঙ্গম মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিলেন; বজ্রকণ্ঠ শাক্তগণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী তন্ত্রী গ্রহণ করিয়া প্রসাদী সুর সঙ্গত করিবার পথ পরিচয় লাভ করিলেন। বৈরাগ্য-সাধনায় কঠোর শুষ্ক ও শান্তিপ্রিয় জাতীয় হৃদয়ে অনুরাগতন্ত্রের নব উপনিষদ্ গান করিয়া নাচিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, বঙ্গসাহিত্য এই পন্থায় কেবল বাহ্যিক রসের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ আদিরসের ক্ষেত্রেই সবিশেষ অগ্রসর হইয়াছিল। দেবাদি বিষয়ক প্রীতিও আদিরসের অন্তর্গত। কিন্তু, এই আদিরসেও কোনরূপ বিশিষ্ট আন্তরিকতা ব্যাপক ভাবে সুসিদ্ধ হয় নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নিধুবাবু ও

(১) আজু কেগো মুরলী বাজায়
এ'তো কভু নহে শ্যামরায়!
এর গৌর বরণে করে আলো
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিলো। চণ্ডীদাস।

রামপ্রসাদ সেনই, আধুনিক সম্মত ভাবে, আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। রসের বিষয়ে জাগ্রত গভীর আন্তরিকতা নানামতে আধুনিক, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; কোন প্রাচীন সাহিত্য সচেতন ভাবে এই আন্তরিকতাকে লক্ষ্য করেন নাই। ইহা নিশ্চিত যে, বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস, বা ভবভূতি, হোমর, সফেক্লীস বা এস্কাইলাস, সকলেই গভীর আন্তরিকতা সিদ্ধি করিয়াছিলেন—কোন প্রকৃত কবি, সজ্ঞানে বা অতর্কিতে আন্তরিক না হইয়া পারেন না। অর্থের বাহ্যিক চটক বা রসের বাহ্য-বিস্ফূর্ত্তিই রচনার একান্ত ফল হইলে, কেহই কবিসংজ্ঞা লাভ করিতে পারেন না। প্রকৃত কবি মাত্রেই নিজের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ হৃদয়ের অন্তস্থল হইতেই সঙ্গীত উৎসারিত করেন, এবং পাঠকের হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন; এই কারণে, তাঁহাদের রচনা চিরমানবের জন্য সত্য, সুন্দর ও আন্তরিক না হইয়া পারে না। এইক্ষেত্রে, অন্তর্লোকবাসী হওয়াই প্রথম কথা; বাহ্যিক শিক্ষাদীক্ষার মাহাত্ম্য চিরকাল দ্বিতীয়। কিন্তু, ইউরোপ, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ, এইক্ষেত্রে সচেতন ভাবে নানাদিকে প্রতিভার 'কল' চালাইয়াছে। ইউরোপে কাব্যতত্ত্বের সমালোচনা গ্রন্থ এত সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, ঐ ভূখণ্ডে এখন কাব্যলেখক মাত্রেই শিক্ষা বশে কিছু-না-কিছু আন্তরিক হইতে পারিতেছেন। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিতার একটা প্রধান লক্ষণ, তাহার সতর্ক-সঙ্কেত ও আন্তরিকতা। এই ক্ষেত্রে, ভাব ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের বহুপ্রচলন গতিকেই আধুনিক সাহিত্যের এই আন্তরিকতা লক্ষণ অভ্যাসসিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। আধুনিক কবিতা বলিলে, আমরা, এই আন্তরিক গভীরতা-সিদ্ধ, অধিকন্তু লেখকের ব্যক্তিত্বসিদ্ধ কবিতাই বুঝিতেছি।

কিন্তু, তাই বলিয়া, প্রকৃত সাহিত্য-শিল্পের সৃজন বা উপার্জ্জন যে আধুনিক কালে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে, এমন কেহ মনে করিবেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত শিল্পীর সংখ্যা, প্রকৃত কবির সংখ্যা চিরকালই পরিমিত। এই ক্ষেত্রে সহস্র বৎসরের বৃদ্ধ কবিনিবহ হইতে আধুনিক কবি যে প্রকৃত প্রস্তাবে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন, বা তাঁহাদিগকে সকল দিকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, এমন কেহ মনে করিবেন না। কবির মাহাত্ম্য, তাঁহার স্বসিদ্ধ শিল্পকৃতির উপরেই নির্ভর করে। দ্বিতীয় শকুন্তলা বা মেঘদূত রচিত হয় নাই, এই ক্ষেত্রে কেহ কালিদাসকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ও পারিবেন না, বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শিল্পের মাহাত্ম্য-লক্ষণে চিরকাল উহার ভাবতত্ত্ব এবং বিষয়-সামঞ্জস্যের উপরেই নির্ভর করে, এই ত্রিবিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া, এমন কি, কল চালাইতে জানিয়াও, আধুনিক কবি বাল্মীকি কালিদাসকে বা হোমর সফেক্লিসকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না, বলিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছি না। জ্ঞান মাত্রেই আয়াসসাধ্য—বিদ্যাসাধ্য; কিন্তু, সামঞ্জস্য-সিদ্ধি চিরকাল কবিজীবনের সহজাত, বিভুকৃপাজাত পদার্থ। এই অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্যের গতিকেই প্রকৃত সাহিত্য-শিল্পের অনির্ব্বচনীয় শক্তি; দেশ কাল ভেদে, পাত্র ভেদে তাহার অর্থতত্ত্ব বা সৌন্দর্য্য চিরকাল নব নব রূপে মানবের মনোহরণ করিতে সমর্থ হয়; সহস্র সহস্র বৎসর পরেও মনুষ্য মনে, অকস্মাৎ অতর্কিত অর্থসংকেতে

চির নূতন ভাবে প্রতিভাত হইতে থাকে। আধুনিক কবি অভিজ্ঞতা-সাহায্যে, একৈক ভাবে ভাবুক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক কিম্বা বিষয়-নিপুণ হইতে পারেন, কিন্তু, শিল্পীর অনির্ব্বচনীয় আত্মা বা নিজত্ব ও মাহাত্ম্য লাভ করাই সহজাত—শিল্পের নামরূপ লাভ করা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা, বা স্রষ্টা হওয়াই কঠিন। এই মূলগত অভাবের গতিকে, প্রকৃত সাহিত্যার্জ্জন প্রাচীন কালেও যেমন পরিমিত, আধুনিক কালেও তেমনই পরিমিত রহিয়াছে। আধুনিক কবি বিদ্যাসাধনার ফলে, নির্ভুল, মার্জ্জিত বা বিশুদ্ধ কাব্য রচনা করিতে পারেন, ভাবতত্ত্ব বা সৌন্দর্য্য বিষয়ে পরম গভীরতাও লাভ করিতে পারেন; তৎসত্ত্বেও, প্রকৃত দার্শনিকের চক্ষে,তাঁহাদের শিল্পকৃতির ছায়াবাদিতা, নিঃসারতা ও নির্জ্জীবতা দৃষ্টি মাত্রেই প্রকটিত হইয়া যায়। এই সতর্ক বা অতর্কিত সামঞ্জস্য-সিদ্ধির দরুণেই, শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার দুর্লভতা ও অলৌকিকতা চিরকালের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

সেইরূপ, কবি-মাহাত্ম্যের দ্বিতীয় লক্ষণ উহার স্বাধীনতা বা নিজত্ব। দৃষ্টান্তের জন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য-ক্ষেত্রেই দৃষ্টিপাত করুন। মেঘদূতের যক্ষাত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে কালিদাসেরই কবি-আত্মা। এই আত্মা বিশ্ব-মনুষ্যের গড্ডালিকা প্রবাহে অপরূপ দুর্লভ ও মধুর। কালিদাসের কবিতার মধ্যে তাঁহার অন্তরাত্মার যে নিসর্গ-তন্ময় উজ্জল-মধুর আনন্দ-স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য করিতেছি; উহা সাহিত্য-লোকে পরম মহার্ঘ। এই মহার্ঘতার উপরেই কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা। বাল্মীকির ভিতরে সেই রসমধুর মহানুভবতা দেখিতেছি,ব্যাসের মধ্যে সেই বিশ্ববিজয়ী দৃপ্ত-বর্ব্বর বিজ্ঞানাত্মার পরিচয় পাইতেছি—রামায়ণ মহাভারতের পাঠফলস্বরূপ যাহা হৃদয়ে চিরকালের জন্য বহিয়া যাইতেছি, তাহাও সাহিত্যের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে চিরকালের দুর্লভ পদার্থ। পরবর্ত্তী কবিগণ, ইঁহাদের ছায়ায় বসিয়া, ইহাদের আত্মগুণ ন্যূনাধিক উপার্জ্জন করিতে পারেন সত্য,কিন্তু ইঁহাদের স্বাধীনতা, নিজত্ব ও মাহাত্ম্যই চিরসিদ্ধ। অন্তরাত্মার ঐকান্তিক বিশেষত্ব গুণেই চিরকাল কবির মাহাত্ম্য—প্রকৃত সাহিত্য-রসিকের নিকট ইঁহাদের মাহাত্ম্য কদাপি খর্ব্ব হইবার নহে, মনুষ্যজাতি চিরকাল, হৃদয়ের ঋজু দৃষ্টি-সিদ্ধ ভাব-সত্যের আদিম গোমুখী ধারায় অবগাহন কল্পে ইহাদের শরণাগত হইতে বাধ্য হইবে। ইহাদের শিল্পকৃতি অনুসৃত, অনুকৃত, এমন কি, স্থানে স্থানে অতিক্রান্ত হইতেও পারে; কিন্তু সিদ্ধাত্মার বিশিষ্টতা চিরকাল পরকীয় করামর্ষের বহির্ভূত; দোষে ও গুণে কবি-জীবনে এবং কবি-কর্ম্মে, ইহারা গরিষ্ঠ ও অদ্বিতীয়।

আধুনিক কবিতাকে অতি জাগ্রত বলিলেই উহার একটা প্রধান লক্ষণ বিশোধিত হয়। এই অত্যন্ততার দরুণ আধুনিক কবিতা সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক নির্জ্জীব এবং নিরাকার হইয়া পড়িতেছে। আনন্দের কিম্বা রসের নিষ্পত্তি বিষয়েও নানাদিকে কৃত্রিমতার, সুদূরতার এবং দীর্ঘ-বিলম্বিত পাকচক্রের আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। আধুনিক কবিতার দোষগুণ আমরা পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে, স্থল বিশেষে দৃষ্টি করিতে পারিব।

ইংরাজাধিকার হইতে ১৮৬৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের* অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস, প্রকৃত প্রস্তাবে

উহার গদ্য-পরিপুষ্টির ইতিহাস। গদ্যরীতির পরিপুষ্টি ও পরিণতির দ্বারাই, ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন মাহাত্ম্য সিদ্ধ হয়। পদ্য শক্তি ভাষার অ-সাধারণ বিভাগের অন্তর্গত; এই অসাধারণতা, চিরকাল অসামান্য প্রতিভা ঘটনার ও জাতীয় সৌভাগ্যের উপরেই নির্ভর করে। ভাষার গদ্য-সমৃদ্ধিও উহার অষ্ট প্রহরীয় মতিরতি বিচার করিয়াই সকল সময় সমগ্র জাতির সভ্যতা ও চিত্তমর্য্যাদা পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পর হইতে গদ্যই, জাতিমাত্রের সাধারণ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাবের আধার রূপে পরিণত হইয়া, তাহার অতীতের দর্পণ, বর্ত্তমানের সহচর এবং ভবিষ্যতের গুরু হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই ক্ষেত্রেও বঙ্গসাহিত্য যাহার সূত্রপাত করিয়া আসিয়াছে, এবং যাহা সমাধা করিয়াছে, তাহা সম্যক চিন্তা করিলে, জগতের অন্যজাতি সমক্ষে বাঙ্গালীর লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার; মৃত্যুঞ্জয়, কৃষ্ণমোহন ও ভূদেব; হুতোম, টেকচাঁদ, রামকমল ও দীনবন্ধু, বাঙ্গালীর জাতীয় হৃদয়কে বিশ্বমনুষ্যের সভ্যতা-সামান্যে দণ্ডায়মান করিয়া গিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ঐ কালের পদ্যও গদ্যের লক্ষণযুক্ত। মদনমোহন, রঙ্গলাল, হরিশ্চন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের ড্রাইডেন, পোপ, জনসন প্রভৃতির সমধর্ম্মী। বাঙ্গালী কবিগণ তাঁহাদের কাব্যাদর্শেই পরিচালিত হইয়াছিলেন এবং বঙ্গের বীণাপাণিকেও স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন পদগতি, সুমার্জ্জিত সংস্কার এবং সংযত প্রসারণ-কলায় সমর্থ করিয়া নবযৌবনের লীলাভূমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল সুকৃত সন্তানের কর্ম্মফল হইতেই ভবিষ্যতের উপজীবিকা সংগ্রহ করত, বঙ্গসাহিত্য প্রসারিত রঙ্গভূমির জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

আমরা এই পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের স্বকীয় এবং পরকীয় ঐশ্বর্য্য অনুধাবন করিয়া আসিলাম; উহার যৌবন-পূর্ব্ববর্ত্তী সাধনা-চর্য্য, সৌন্দর্য্য এবং কৌলীন্যের অনুসরণ করিয়া আসিলাম; অতঃপর, বঙ্গসাহিত্য সূত্রের অনুসরণে কিম্বা মাহাত্ম্যের পরিবর্দ্ধনে, কোন্ দিকে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, কোথায় দাঁড়াইয়াছে, এবং উহার ভবিষ্যৎ কি, তাহারই রেখাপাত করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

তপস্যা-তত্ত্ব।

তপস্যাই আর্য্যদিগের সাধনার প্রথম পন্থা। এইজন্যই তাঁহাদের সাধক "তপস্বী" ও তাপস নামে এবং সাধনক্ষেত্র "তপোবন" নামে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আর্য্যদিগের সাহিত্যে "তপস্যা" শব্দটী এরূপই অনুস্যূত হইয়াছে যে, ইহা সাধারণ সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। তপস্যা বলিলেই হিন্দুমাত্রেরই মনে একটী অতি পবিত্র, নিষ্ঠাময় গম্ভীর ধর্ম্মানুষ্ঠানভাবের উদয় হয়। এইরূপে তপস্যার ভাব আমাদের স্বাভাবিক সংস্কারের বিষয় হইলেও, ইহার প্রকৃত-তত্ত্বের যথার্থ ধারণা করা তেমন সহজ নহে, প্রত্যুত তপস্যা ও তপস্বীর আদর্শ আমাদের সমাজ হইতে বহুকাল হইল অন্তর্হিত হওয়ায়, সেই ধারণা

বিশেষরূপেই দুরায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আমরা সেই লুপ্ত আদর্শটীর উদ্ধার করিতে পারি কিনা, তাহারই চেষ্টা করিব।

তপস্যা কার্যাটীকে আমরা মূলে স্বষ্টি-প্রক্রিয়ারই অনুকরণ বলিয়া মনে করি। তপস্যা শব্দটী তপঃ শব্দ হইতে উদ্ভূত। তপঃ শব্দটীও তপস্যা শব্দেরই অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। ঋগ্বেদে স্বষ্টিবর্ণন-মন্ত্রে তপঃই ঋত ও সত্যের আদি কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা "ঋতংচসত্যঞ্চ তপসোঽভীদ্ধাৎ ততো রাত্র্যজায়ত" ইত্যাদি। এখানে "তপঃ" শব্দ উত্তাপ বা তেজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বোধ হয়—তাহাতে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই হয় যে, প্রকটিত তাপ বা তেজ হইতেই ঋত ও সত্যের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভারতেও তপঃই স্বষ্টির মূল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,যথা—"প্রজাপতি ব্রহ্মা তপঃ প্রভাবেই এই সমস্ত স্বষ্টি করিয়াছেন"—শান্তিপর্ব্ব, ১৬১ অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। ফলতঃ "তপ" শব্দের মূলের তপ্ ধাতুর তাপপ্রদান অর্থ হইতে "তপঃ" শব্দের তাপ বা তেজ অর্থ করিতে কোনরূপ কষ্ট-কল্পনার আশ্রয়ই প্রয়োজন হয় না—অথচ তাহাতে বাক্যার্থেরও সুসঙ্গতি হয়।

বেদের পূর্ব্বোক্ত স্বষ্টিবর্ণনা মতে তাপই স্বষ্টির প্রথমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাপ বা energy স্বষ্টির মূলতত্ত্ব বলিয়া আধুনিক বিজ্ঞানেরও সম্মত।

স্বষ্টির সেই আদিতত্ত্বকে সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎ-সহায়ে আপনাদিগের জীবনে স্বষ্টির পরমোৎ-কর্ষ উৎপাদন, ইহাই তপস্যার প্রকৃত লক্ষ্য হইয়াছিল। স্বষ্টির মূল-বিজ্ঞান এইরূপে যাহার মূলাবলম্বন হইয়াছিল—তাহার কৃত-কার্য্যতা যে কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে, যেমন মূল স্বষ্টিতে তাপ হইতে প্রধান-ভাবে ঋত অর্থাৎ নিয়ম এবং সত্য উদ্ভূত হইয়াছিল—তদনুকরণ রূপ তপস্যাতেও নিয়ম-নিষ্ঠতা ও সত্যশীলতারূপ সর্ব্বোত্তম গুণদ্বয়ের বিকাশ হইয়াছিল। এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, স্বষ্টির মূলাধার যেমন সূক্ষ্ম তাপ,তপস্যার মূলাধারও বিশুদ্ধ তেজঃ। তপস্যা-সঞ্চিত এই তেজই "তপঃ" নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই তেজঃ অর্জ্জন করিয়াই ঋষিগণ 'তাপস' ও 'তপস্বী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তপেরই নামান্তর 'ব্রহ্ম-তেজঃ' বা 'ব্রহ্মবল'। ইহা ধারণ করিয়াই ঋষিগণ সকলের নিকট দুষ্প্রধর্ষ হইয়াছিলেন। এই তপোবলই যে ব্রাহ্মণকে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিল,—তাহা পুরাণেই উক্ত হইয়াছে।

'ব্রাহ্মণস্য তপোমূলং যজ্ঞঃ স্বাধ্যায় এবচ।"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত বহ্নিপুরাণ।

এই তপঃশক্তির নিকট রাজশক্তি পর্য্যন্তও কম্পমান হইত। এই শক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়াই বিশ্বামিত্র একদিন ক্ষত্রিয়শক্তিকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন—

"ধিগবলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মবলং বলং বলম্।"

"তপঃ" শব্দের আভিধানিক অর্থ বৈধ-কর্ম্মের দ্বারা শরীরকে কষ্ট প্রদান যথা—"তপঃবৈধক্লেশজনকং কর্ম্ম॥" শব্দকল্পদ্রুম্। উপবাসের ক্লেশই এই সমস্ত ক্লেশের প্রধান, যথা—"তপস্যা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে অনশন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"মহাভারত,শান্তিপর্ব্ব,১৬১ অধ্যায়।

'মাসোপবাসং কুর্ব্বতি চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাংশ্চ যে।
ঋতুস্তে তোয়পানা যে যে ধর্ম্মা সোপবাসকাঃ'

*　*　*　*　*
*　*　*　*　*

ইতোতৈর্নিয়মৈ যেতু ক্লিষ্টাস্থান স্তপোধনাঃ।
ব্রহ্মায়ুষস্তপোলোকে তে বসন্তো কুতোভয়াঃ॥
ইতি—শব্দকল্পদ্রুমধৃত পদ্মপুরাণম্॥

উপবাসের দ্বারা শরীরের কৃশতা সম্পাদন হইলেও তাহাতে যে আমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয় ও আমাদের জীবন তেজের দ্বারা আপূরিত হয়, "ব্রহ্মায়ুষস্তপোলোকে তে বসন্তো কুতোভয়া," তাহারা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে তপোলোকে বাস করেন, উপরি-উদ্ধৃত এই শাস্ত্রোক্তিই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়া থাকে। তপোলোকটী যে তেজঃ পরিপূরিত অবস্থান মাত্র, তাহাও ব্যাখ্যাত হয়, যথা—

"অস্যোপরি তপোলোক স্তেজোময় উদাহৃতঃ।"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত পদ্মপুরাণং।

উপবাস যে শরীরের প্রকৃত ক্ষয়করী ও গ্লানিকর নহে, প্রত্যুত তেজস্কর এবং লঘুতা ও স্বাস্থ্যজনক, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের বলবত্তর সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। সম্প্রতি সিন্‌ক্লেয়ার নামক পাশ্চাত্য ক্রিয়াবান্ উপবাসের যে সাক্ষাৎফল লাভ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি— তাহা হইতেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

"Fasting as the key to eternal youth, Mr. Upton Sinclair, the well-known author of the "Jungle" proclaims to the world in the April Contemporary Review, that if any one is ill, low spirited, too fat or too thin, he has only to fast to become perfectly well, to enjoy radiant good spirits and to restore his body to ideal proportions... .. Here is Mr Upton Sinclair's proclamation of his great discovery................ I have not only found wood health, but perfect health; I have found a new potentiality of life, a sense of lightness and clearness and joyfulness such as I did not know could exist in the human body .... No phase of the experience surprised me more than the activity of my mind. I read and wrote the more than I had dared to do for years before."

Review of Reviews—April, 1910.

আমরা উপবাসকে তপস্যার অঙ্গ বলিয়াছি—কিন্তু তৎসঙ্গে আতপ অর্থাৎ উত্তাপসেবনও অঙ্গরূপে গণিত হইয়া থাকে— ইহাকে "পঞ্চতপা" তপস্যা বলে। ইহাতে চারি প্রকার অগ্নি এবং সূর্য্যের উত্তাপ গ্রহণ করিতে হয়, যথাঃ

"যন্তান্তরে চতুর্ব্বহ্নীন্ কৃত্বা বৈশ্বানরেষ্টিমা।
তন্মধ্যস্থা সূর্য্যবিম্বং বীক্ষন্তী বহুলাংশুকা॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত কালিকা পুরাণ ৪২ অধ্যায়।

ইহাকে "পঞ্চাগ্নিতপঃ"ও বলিয়া থাকে। অগ্নি সন্তাপে শরীরের সম্পূর্ণ পবিত্রতা সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। অগ্নির পবিত্রকারিতা হইতেই পাবক নাম হইয়াছে।

তপস্বী চতুর্দ্দিকে অগ্নি স্থাপন করতঃ তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়া স্বদেহকে সম্পূর্ণরূপে অগ্নিপূত করিয়া লইতেন—তাহাতে শরীরের সমস্ত মল ভস্মীভূত হইয়া শরীর বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিত। দেহ পূর্ব্বোক্ত অগ্নিক্রিয়াদ্বারা নির্ম্মলীকৃত হইলে তবেই তাহাতে উপবাসের প্রকৃত ক্রিয়া হইতে থাকে। এই প্রকারেই তপস্যার জন্য একটী নূতন দেহ গঠিত হয়। পাশ্চাত্য তত্ত্ববিৎ Sinclair এ সম্বন্ধে স্বকীয় অভিজ্ঞতার যে ফল প্রকাশ করিয়াছেন,তাহা আমাদের মীমাংসার সম্পূর্ণ অনুকূল, যথা—

"The fact is used first, and after that the muscular tissue, true starvation begin only when the body has been reduced to the skeleton and the viscera."

প্রথম মেদ ও তৎপর মাংসপেশীর ভুক্ত

ক্ষয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, প্রকৃত উপবাস কেবল তখনই আরম্ভ হয়, যখন শরীর কঙ্কাল ও শিরাদি মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া পড়ে।

তপস্যার জন্য এই অগ্নি-সন্তাপ ও উপবাসের সঙ্গে আরও কয়েকটী সংযমাভ্যাসের আবশ্যকতা শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে, যেমন বর্ষাকালে ভূমিতে শয়ন, হেমন্ত ও শীতকালে রাত্রিতে জলে অবস্থান প্রভৃতি, যথা—

"যেহ শঙ্কুট্টাশ্চ মুময়ঃ শীর্ণপর্ণাশিনশ্চয়ে।
গ্রীষ্মে পঞ্চদগ্নি তপসো বর্ষানু স্থণ্ডিলেশয়াঃ।
হেমন্তে শিশিরে বা যে ক্ষিপন্তি সলিলে ক্ষেপাঃ॥
কুশাগ্র নীর বিন্দুংশ্চ তৃষিতা যতয়োঽপিবম্।
বাতাশিনোঽতি ক্ষুধিতাঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্র ভূস্পৃশ।

ইতিশব্দকল্পদ্রুম-ধৃত পদ্মপুরাণম্।

এই সমস্ত অভ্যাসের উদ্দেশ্য শরীরকে "শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু" করিয়া তপস্যার প্রকৃত ক্ষেত্ররূপে পরিণত করা। ইহা যে অসাধ্য ব্যাপার নহে, আমাদের সাধারণ কথাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

"শরীরের নাম মহাশয়
যাহা সওয়াও তাই সয়।"

এই সুকর্ষিত ক্ষেত্র হইতে যে সিদ্ধি-সম্পদ লাভ হয়, তাহাতে তাহার তুলনা নাই, মূল্য নাই। এই সম্পদ অন্য কোন সম্পদ নহে, ইহা তেজের রূপ সম্পদ্—ইহা বিশ্বের সারভূত পরম পদার্থ। এই ধনে ধনী হইলে তাহার আর অন্য ধনের প্রয়োজন হয় না। তাহাতেই ঋষিগণ এই ধন লাভ করিয়া "তপোধন" নামে পরিচিত হইতে গৌরব বোধ করিতেন।

ঋষিগণ তপের রূপ অতুল তেজের আধার ছিলেন বলিয়াই সকলেরই উপর তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। কেহই তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস পাইত না।

ঋষিদিগের এই তেজঃ কি প্রকৃতির ছিল, তাহা আমরা বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বলের উপর ব্রাহ্মণ-বলের প্রাধান্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র প্রবল প্রতাপান্বিত একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। বল-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তিনি একদিন মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত বল পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ সহায়-নিরপেক্ষ হইলেও একমাত্র ব্রহ্মতেজের দ্বারা বিশ্বামিত্রের বিপুল সৈন্য ধ্বংস ও অসংখ্য অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহার দর্প সমূলে চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অসীম ব্রহ্ম-বল লাভের জন্য কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র উৎকট তপস্যার দ্বারা এইরূপ ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিয়াছিলেন যে, মহারাজ দশরথের নিকট তিনি রাক্ষস বিনাশ পূর্ব্বক যজ্ঞ-রক্ষার্থ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে তৎসঙ্গে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিলে দশরথ তাঁহার ব্রহ্মতেজের ভয়ে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস পান নাই। তিনি সশঙ্কভাবে বলিয়াছিলেন :—

"ক্রুধান্ কুলং ধক্ষ্যতি বিপ্রবহ্নিঃ।"

'ক্রুদ্ধ ব্রহ্মতেজ বংশ দগ্ধ করিবে।' বাস্তবিক এই তেজটী আমাদের নিকট দাহগুণ-যুক্ত অথচ শান্তভাব বিধৃত একটী অদ্ভুত পদার্থ রূপে প্রতীয়মান হয়। কালিদাস রঘুবংশে ইহার প্রকৃতরূপে এই প্রকারেই বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"শম প্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ংহি দাহাত্মক মস্তিতেজঃ॥"

শমগুণ-প্রধান তপোধনদিগের মধ্যে লুক্কায়িত দাহগুণ-বিশিষ্ট তেজঃ আছে। সুতরাং

এই অলৌকিক তেজটীকে বৈদ্যুতিক বা অপর কোনরূপ মহত্তর দিব্য তেজঃ বলিয়া মনে করিলেই ইহার যথার্থ ধারণা হইতে পারে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। তপঃকে এই ভাবে বুঝিলে এতৎসম্বন্ধে প্রচলিত অনেক সংস্কারেরই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

তপঃপ্রভাবে ভস্ম করার কথা হিন্দুদিগের সাহিত্যে বহুল ভাবে প্রচারিত রহিয়াছে। ইহাকে কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতে কোন কারণ দেখা যায় না। তপোধনগণ আপনাদের অলৌকিক বিদ্যুৎ প্রকৃতিক তেজঃ প্রয়োগে যে কোন বস্তুকে ভস্মে পরিণত করিতে পারিবেন,তাহা অসম্ভব বোধ হয় না। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাদের তেজঃ কখন কখন এরূপ প্রদীপ্ত হইত যে, তাহা কখনই অগ্নি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপ্রিয়কারীর প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিত। মহাদেবের মদন-ভস্মে ইহারই উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে যথা—

"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবৎ গিরঃ যে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নি র্ভবনেত্র-জন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥"

ক্রোধের এই প্রকারের কার্য্য হইতেই "ক্রোধানল" শব্দটীর উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। উপরের বর্ণনা হইতে চক্ষুঃ সংযোগে যে অনেক সময় তেজের বহিঃপ্রকাশ হইত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহাভারতে আমরা যে "চাক্ষুষী-বিদ্যা" নামে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার নাম প্রাপ্ত হই, তাহাতে চক্ষুরই প্রাধান্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

চক্ষু হইতে তেজঃ বহিঃ প্রকটিত হওয়ার যেমন উল্লেখ পাওয়া যায়, তদ্রূপ মুখ হইতে তেজঃবহিঃ-প্রকটিত হওয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়। "শ্রীশ্রীচণ্ডী"তে চণ্ডীরূপের বিকাশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মুখসঞ্জাত কোপজনিত তেজ হইতে হয় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটী কুটিলাননৌ॥৯
ততোঽতি কোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রমে মহত্তেজোব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য॥ ১০
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর সৈন্যবধঃ।

চক্ষু ও মুখ তেজের প্রধান আধার হইলেও দেহের অপর সর্ব্বাঙ্গ হইতেও যে তেজঃ বিস্ফুরিত হইতে পারে এবং এবম্বিধ তেজঃ সমবায়ে যে প্রবল প্রচণ্ড বাহ্যশক্তি উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা মহাশক্তিরূপা চণ্ডীদেবীর আবির্ভাবের বিবরণে বিশদরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, যথাঃ—

"অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥ ১১
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরম্॥ ১২
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেব শরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ংত্বিষা॥১৩
ততঃ সমস্ত দেবানাং তেজোরাশি সমুদ্ভবম্
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ॥১১
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর সৈন্যবধঃ।

মহাদেবের চক্ষু-সঞ্জাত অগ্নিদ্বারা মদন ভস্মের বিবরণ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানে আমরা চণ্ডীদেবীর মুখনির্গত অগ্নিদ্বারা ধূম্রলোচন ভস্মের বিবরণ "শ্রীশ্রী চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবত্তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তংভস্ম সাচকারাম্বিকাততঃ॥ ১৩
দেবী মাহাত্ম্যে শুম্ভ নিশুম্ভ সেনানী ধূম্রলোচন বধঃ।

তেজের দ্বারা ভস্মকরার কার্য্য প্রসঙ্গে যে 'ভস্ম' শব্দের প্রয়োগ আমরা পাইয়া থাকি, তাহা আলঙ্কারিক ভাবে গ্রহণ না করিয়া বাস্তবিক ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ আলঙ্কারিক ভাব ইহার তাৎপর্য্য হইলে, 'বিনষ্ট', 'ধ্বস্ত' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইত—মুখ্যভাবে দাহকার্য্য প্রকাশক "ভস্ম" শব্দের প্রয়োগ হইত না।

উপরে আমরা দেবীর যে রূপ বর্ণনা দেখিতে পাইলাম, তাহাতে তিনি যে তেজঃ স্বরূপিণী,তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। চণ্ডীর দেবীসূক্তেও তিনি "তৈজস শরীরা" বলিয়া স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশিত হইয়াছেনঃ যথা—

মূর্ত্তিমন্তে কোটিচন্দ্রবদনায়ৈতে দুর্গে দেবি!
সর্ব্ববেদোস্তবে।
নারায়ণি তৈজস শরীরে পরমাত্মন্ প্রসীদতে
নমোনমঃ॥"

তপঃ সমুদ্ভুত তেজঃ পূর্ব্বোক্ত দিব্য তেজেরই স্বরূপ। ইহার ন্যায় সম্পদ, ইহার ন্যায় ঐশ্বর্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই। এজন্যই ঋষিগণ ইহাকে পরম ধনরূপে পরিগণিত করিয়াছেন এবং এই ধনে বলবান্ বলিয়া "তপোধন" নাম ধারণ করতঃ আপনাদিগকে পরম ধন্য মনে করিয়াছেন। তপস্যার্জ্জিত তেজকে প্রাগুক্ত দিব্যতেজেরই সম্পূর্ণ সজাতীয় বলিয়া মনে করিলে তবেই ঋষিদিগের অলৌকিক শক্তিরহস্য সহজে আমাদের বোধগম্য হয়। ঋষিদিগের শাপের দ্বারা ভস্ম করিবার ক্ষমতা ছিল, ইহা আমরা সকলেই জানি। শাপ শব্দটী শপ্ ধাতুর যোগে উৎপন্ন। শপ্ ধাতুর অর্থ আক্রোশ। আক্রোশের দ্বারা তর্জ্জন বুঝায়। তর্জ্জন সহকারে বিপ্রিয়কারীর প্রতি প্রজ্জ্বলিত তেজঃ প্রযুক্ত হইয়া তদ্বারা তাহার ভস্মসাৎ হওয়াই শাপের দ্বারা ভস্ম করা বুঝাইত। আমরা দেখিয়াছি, চণ্ডীও হুঙ্কার পূর্ব্বক ধূম্রলোচনকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। ক্রোধের দ্বারা যে সাধারণ তেজঃ উদ্দীপ্ত হয়, "উত্তেজনা" শব্দটীই তাহার প্রমাণ দিয়া থাকে। সুতরাং ঋষিদিগের অসাধারণ তেজঃ প্রদীপ্ত হইয়া যে প্রচণ্ড জ্বলদগ্নিতে পরিণত হইবে, তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ঋষিদিগের শাপাগ্নি মুখ হইতে বিনির্গত হইত বলিয়া সাধারণ সংস্কার এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্র যে বশিষ্ঠের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে হতবীর্য্য হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রামায়ণে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঘোরতর কলহ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সুরভি নামক হোম ধেনু যাচ্ঞা করিয়া বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে বল পূর্ব্বক ঋষি হইতে গাভী গ্রহণ করিবার জন্য ক্রোধ ভরে নিজ প্রবল সৈন্যের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে তদীয় সৈন্য সুরভিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সুরভি আপন দেহ হইতে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের সৈন্যের পূর্ণ ধ্বংস সাধন করেন। এখানে বশিষ্ঠের হোম ধেনু তাহার অপরিমেয় তপোবলেরই রূপক বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। যজ্ঞ তপস্যার বিশেষ বলিয়া এবং তদনুষ্ঠানে ধেনু প্রধান সহায় বলিয়া "তপোবল" যে হোমধেনুরূপে বর্ণিত হইবে, তাহা অসঙ্গত বিবেচিত হয় না। বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র যখন এবম্ভূত অসম্ভাবিত পরাভব প্রাপ্ত হইয়া আত্মগ্লানি প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন তিনি হোম-ধেনুতে পরাভব কারণ দেখিতে না পাইয়া তপোবলেই পরাভব কারণ

দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই তিনি অলন্ত ভাষায় তপোবলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন "ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মবলং বলং বলং॥"

বশিষ্ঠের পূর্ব্বোক্ত অলৌকিক কার্য্য তপোবলে কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাই আমরা এক্ষণে আলোচনা করিয়া দেখিব। তপঃ অভ্যাসের দ্বারা তপস্বিদিগের যে একপ্রকার তৈজস শরীর গঠিত হইতে পারে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি এবং সেই তেজঃ যে আমাদের পরিচিত বৈদ্যুতিক তেজেরই অনুরূপ, তাহাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। দৈহিক বিদ্যুৎ পরিচালন দ্বারা যে বিপক্ষ বিধ্বস্ত করা যাইতে পারে, তাহা বিজ্ঞানের অননুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা একজন পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদের মত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কি প্রকারে তৎকর্ত্তৃক দৈনিক বিদ্যুৎ ক্রিয়াই সদৃশ অতি নৈসর্গিক ব্যাপার বিশেষের কারণ রূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

ইহাদিগের ধর্ম্মপ্রাণতা মহাত্মা (মোজেস্ Moses) শাস্ত্র পিটকা (Ak) ধারমন্দির-শিবির (Tabernacle) বহন পূর্ব্বক যখন অনুচরবর্গ সহ মিশরের (Egypt) অবরোধ বাস হইতে সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশ যাত্রা (Exodus) করিয়াছিলেন, তখন শত্রুগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই তত্ত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্যুরে (Schure) তদীয় নব প্রকাশিত "রাম ও মোজেস্" (Ram and Moses) নামক গ্রন্থে প্রচারিত করিয়াছেন—

"In the Pentateuch Moses triumphs over all obstacles by miracles which are more than improbable. Jehovah, conceived of, as a personal. God is always at his disposal. He appears on the tabernacle as a shinning cloud, which is called the glory of the Lord. Moses alone can enter, any profane person who approaches is struck down dead. The tabernacle of the congregation containing the ark plays in the Biblical narrative the role of a gigantic electric battery, which once changed with the fire of Jehovah, scatters destruction amongst the people. The sons of Aran, the two hundred and fifty followers of Karah and Dathan, along with fourteen thousand people, are killed by it at one and the same time. Besides this, Moses produces at a given moment, an earth-quake which engulfs the three revolting chiefs with their tents and families." page, 138

"This is the place to say what amount of credence may be given to the so-called miracles of Moses from the view-point of a rational theosophy and the elucidations of occult science. The production of electrical phenomena in diverse forms by the will of powerful initiates is not attributed by antiquity to Moses alone. Chaldaean tradition ascrided it to the magi, the Greek and Latin traditions to certain priests of Jupiter and Apollo. In similar cases, the phenomena are indeed of an electrical nature. But the electricity of the terrestrial atmosphere must have been set in motion by a subtler and more universal force which great adepts would be skilled in attracting, concentrating, and projecting. This force is called by the Brahmans, akasha (আকাশ), by the magi of Chaldaea the *fire-principle*, and by the Kabbalists of the middle ages the great magic-agent. From the view-point of modern science if might be called etheric force. It can either be attracted directly or evoked by means of invisible, conscious, or semiconscious agents filling the atmosphere of earth, and which the will of the magi is able to control."

"There is nothing in this theory opposed to a rational conception of the universe; it is even indispensable to the explanation of

a host of phenomena, which other-wise would remain incomprehensible. It need only be added that these phenomena are governed by immutable laws, always proportioned to the intellectual, moral and magnetic strength of the adept."

pp, 139—40·

Ram and Moses by Edward Schure.

এখানে আমরা উদ্ধৃত স্থলের উপসংহার বাক্যটী পাঠককে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। ইহাতেই সমস্ত মন্তব্যের স্থূলমর্ম্ম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বলা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে "এই মাত্র বলাই অধিকন্তু আবশ্যক যে, এই সমস্ত ব্যাপার, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে এবং সাধকের মানসিক, নৈতিক ও তাড়িত-শক্তির সহিত নিয়তই সমনুপাতিক হইয়া থাকে।" সুতরাং মোটের উপর আমরা ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে, দেহস্থ তাড়িত শক্তিই অতি নৈসর্গিক ব্যাপার সংঘটন ক্ষমতার প্রকৃত মানদণ্ড স্বরূপ। যাহার এই তাড়িত শক্তি যত অধিক হইবে, তাহারই অলৌকিক ক্ষমতাও তত অধিক হইবে। বর্ত্তমান ব্যবহারিক বিজ্ঞান-শিরোমণি এডিসন্ (Edison) সাহেবও সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি জড় বিজ্ঞানের তাড়িত বিশেষ হওয়াই সম্ভবপর—

"Mr. Edison explained will power which drives the brain as possibly a form of electricity and declared whatever it is, it is material.

Indian Daily News, October, 28th, 1910.

মহর্ষি বশিষ্ঠ এই তাড়িত শক্তির দ্বারাই বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র নিরর্থক করিয়াছিলেন। রামায়ণে এই তাড়িত শক্তিই "ব্রহ্মদণ্ড" রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তপস্বিদিগের এই দৈহিক তাড়িতের বিস্তার দ্বারা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জীবজন্তু এরূপেই অভিভূত থাকিত যে, তাহারা আপনাদের হিংস্র স্বভাব ও প্রাকৃতিক বিরোধভাব বিস্মৃত হইয়া পরস্পর সদ্ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ হইত। এই অলৌকিক শান্ত ভাবের প্রভাব দ্বারাই তপোবন ও আশ্রমে, মর্ত্ত্যে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি।

৺হরিচরণ দাস গুপ্ত।

অহহ! বঙ্গদেশ একটী অমূল্য রত্ন হারাইল! এ রত্নটী দৈববিপাকে নিজ দিব্য প্রভা যথোচিত প্রকাশ করিতে পারিল না। অল্পপরিসর মধ্যেই নিজ বিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া অদৃশ্য হইল! ইঁহার নাম হরিচরণ দাস গুপ্ত। ইনি বিক্রমপুর বৈদ্যসমাজের অতি সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বৈদ্য বংশের কুলপাবন সন্তান। সংস্কৃত ব্যাকরণে, সাহিত্যে, অশেষ বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও নানা ভক্তিগ্রন্থে ইঁহার গাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, উভয় ভাষায় ইঁহার সুন্দর কবিত্ব শক্তি ছিল। এ দেশের বৈদ্যকুলাবতংস অগণ্য মনীষিগণ সংস্কৃত কাব্যজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। নিঃসংশয় এই কারণেই 'কবিরাজ' এ প্রসিদ্ধ উপাধি বৈদ্যগণের অধিকৃত হইয়া আছে। মহাত্মা হরিচরণের রচিত ভূরি ভূরি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা ভক্তিরসাত্মক ভগবৎসঙ্গীত লিপিবদ্ধ

আছে। সেগুলি যথোচিত প্রণালীবদ্ধ করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলে দেশের একটী মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়। তিনি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া দয়া করিয়া আমাকে দেখাইতেন, এবং তাহা আমার প্রীতিকর হইয়াছে জানিলেই কৃতার্থম্মন্য হইতেন। তাঁহার এক একটী সংস্কৃত শ্লোক এত উৎকৃষ্ট হইত যে, তাহা কোনক্রমেই এই কালের রচনা বলিয়া জ্ঞান হইত না।

আয়ুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিবিধ ভৈষজ্য-নির্ম্মাণে তাঁহার আন্তরিকতা, বিশুদ্ধতা ও নিপুণতা অসামান্য। স্বর্ণ-লৌহাদি ধাতুঘটিত ও পারদাদি-রসঘটিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঔষধ নির্ম্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জাদি উপকরণসামগ্রী চিনিতেন, এবং ঔষধ-তৈল-ঘৃতাদির বিশুদ্ধতাপক্ষে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, এজন্য তাঁহার ঔষধপ্রয়োগ প্রায় ব্যর্থ হইত না, এবং অনেক সময়ে তাহা দৈবশক্তির ন্যায় অচিরে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করিত। এতদ্ভিন্ন আকস্মিক ভীষণ রোগসঙ্কটে তাঁহার প্রতিভা-সমুদ্ভূত এক একটী অযত্নলভ্য উদ্ভিজ্জ-প্রয়োগ দিব্য মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিত।

লোকের রোগশান্তির দিকেই তাঁহার হৃদয়ের একাগ্রতা এবং অর্থাগমে উদাসীনতা থাকায়, তাঁহার সাংসারিক স্বচ্ছলতা ছিল না। নিজের ও পরিবারবর্গের কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন হইলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। নিত্য নিত্য কত লোক আসিয়া যে তাঁহার নিকট বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ লাভ করিত, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তদুপরি সেই নিদারুণ রোগযাতনাগ্রস্ত মহাত্মার উপর অহরহ আত্মীয়তার উপদ্রবের সীমা ছিল না। তিনি স্বয়ং আর্থিক কষ্টে ও রোগযাতনায় বিহ্বল হইয়াও সকলকেই আশ্রয় ও সাহায্য দান করিতেন, কখনও তাঁহার মুখে বিরক্তির অণুমাত্র ছায়াও কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

হে কৃপাসিন্ধো! জগদীশ্বর! তুমি যাহা কর, তাহাই মঙ্গল। আমরা তোমার অবোধ সন্তান, তাই হাহাকার করি। আজি তুমি যে রত্নটীকে আমাদের নিকট হইতে লইয়া গেলে, তাঁহার ইহলোকে অবস্থানকালে, আমরা কেহই তাঁহার প্রকৃত মর্য্যাদা করি নাই। তাই আজি তাঁহার অভাব আমাদের মর্ম্মে অনুতাপের তুষানল প্রজ্জ্বলিত করিল! হে সুরলোক-প্রাপ্ত সুহৃদ্বর! আজি তোমার অভাবেই আমরা তোমার মূল্য বুঝিলাম। তুমি অলক্ষ্যভাবে আমাদের সকলেরি অন্তরের অন্তরে গূঢ় ও গাঢ় অধিকার স্থাপন করিয়াছ! হা বিশ্ববন্ধো! হা পরার্থ-প্রাণ! হা ভগবদ্ভক্তির, সরলতার, সহিষ্ণুতার ও অমায়িকতার অবতার! তুমি ঘোর দুর্দ্দিনের নিশীথেও, নিজের লোমহর্ষণ রোগযন্ত্রণা অন্তরে চাপিয়া, পরের বিপদুদ্ধারে ছুটিয়াছ, আমাদের বিপদ্‌কে নিজ বিপদ্ অপেক্ষা অধিকতর দুঃখাবহ বোধ করিয়াছ। হায়! আজি আমরা সঙ্কটে পড়িয়া কাহার শরণাপন্ন হইব?

দয়াময় জগদীশ্বর তোমাকে নরলোকের অসাধ্য কঠোরতম পরীক্ষায় ফেলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তোমার সাত্ত্বিকতা পরীক্ষা করিয়াছেন। তুমি সেই মহাপরীক্ষা-সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়াছ। তাই তিনি তোমাকে নিজ অনন্ত-শান্তিময় শাশ্বত শ্রীচরণচ্ছায়ায় তুলিয়া লইলেন। কিন্তু হায়!

"জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
পরার্থবদ্ধকক্ষ্যাণাং ত্বাদৃশামুদ্ভবঃ কুতঃ॥"
—আমা হেন ক্ষুদ্রতম কীট কত শত—
আসিছে যাইছে এই ভবে অবিরত,
কিন্তু যার পরার্থেই বাঁধা প্রাণ-মন,
কোথা পা'ব তোমা হেন মহাত্মা তেমন ?
ওঁ তৎসৎ।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

তমসা—উত্তররামচরিত।

তমসা বুদ্ধিজ্বালাবিভাসিতা, কর্ত্তব্য-জ্ঞান-প্রখরা কার্য্যতৎপরা প্রগলভা রমণী। সীতার ভয়বিহ্বলতার পার্শ্বে তমসার প্রগলভতা রাম-সীতার প্রেমস্ফূরণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটার যথার্থতা প্রমাণ করা যাউক। সীতা-বিরহে ক্লিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রকে জনস্থানে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাহাকে সময়োচিত সান্ত্বনা প্রদানে সীতা একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, যেহেতু শ্রীরামচন্দ্রের বিনানুমতিতে সীতার তথায় আগমন শ্রীরামচন্দ্রের কোপের কারণ হইতে পারে। তমসা শ্রীরামচন্দ্রের কাতরতায় সীতাকে ক্লিষ্ট দেখিয়া অথচ সান্ত্বনার উপায় উদ্ভাবনে বিরত দেখিয়া বলিলেন :—

ত্বমেব নহু কল্যাণি সঞ্জীবয় জগৎপতিম্।
প্রিয় স্পর্শোহি পাণিস্তে তত্রৈব নিয়তাভব॥

হে কল্যাণি! তুমি জগৎপতিকে সঞ্জীবিত কর, যেহেতু তোমার পাণিই প্রিয়স্পর্শ, তাহাতেই নিযুক্ত হও।

তমসা সীতার ভয়ের কারণ অবগত হইয়াও শ্রীরামচন্দ্রের সেবার সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে উৎসাহ দিলেন। সীতার সেই সেবা শুশ্রূষা হইতেই জন স্থানে উহাদের প্রণয় পরিস্ফুট হইয়াছে, তমসা এই প্রণয়-বিকাশের মূল কারণ। তাহার ন্যায় সৎসাহসশীলা স্ত্রীলোক এইরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিলে দম্পতির ভালবাসা এত উজ্জ্বল ভাবে প্রতিভাত হইত না। তমসার বাক্যগুলি বড়ই মধুর ও দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া উতলা হইয়াছেন, তাহার হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সীতা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রিয় সখী তমসার নিকট বলিতেছেন :—

ভগবতি তমসে! নিষ্কারণ পরিত্যাগিনোঽপি এতস্ত এতেন এবম্বিধেন দর্শনেন কীদৃশো মে হৃদয়ানুবন্ধ ইতি ন জানামি ন জানামি।

ভগবতি তমসে! নিষ্কারণ পরিত্যক্তা হইয়াও তাঁহার এইরূপ দর্শনে আমার হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে পারিতেছিনা। তমসা বলিলেন :—

জানামি বৎসে! জানামি!
তটস্থং নৈরাশ্যাদপি চ কলুষং বিপ্রয়বশা-
দ্বিয়োগে দীর্ঘেঽস্মিন্ ঝটিতি ঘটনোত্তম্ভিতমিব।
প্রসন্নং সৌজন্যাদপি তু করুণৈর্গাঢ় করুণম্।
দ্রবীভূতং প্রেম্না তব হৃদয়মস্মিন্ ক্ষণ ইব॥

তোমার মন সমাগম সম্ভাবনা বিরহে উদাসীন, অপিচ, নিষ্কারণ নির্ব্বাসনরূপ অপ্রিয় কার্য্য বশতঃ কোপাকুলিত। দীর্ঘকালব্যাপী এই বিয়োগ বিরহের পর অকস্মাৎ মিলনে উত্তম্ভিতের ন্যায় হইয়াছে। প্রেমার্দ্রীভূতের ন্যায় অধুনা তোমার হৃদয় শোকব্যঞ্জক বাক্যাদি দ্বারা অতিশয় শোকাকুলিত হইয়াছে।

ইহা তমসার ন্যায় প্রতিভাময়ী রমণী-রই উত্তর বটে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইলে, সীতার মনো-বেদনার কারণ সমুপস্থিত হইত, এবং খাটি উত্তরও হইত না। তমসা দম্পতির মিলন-সুখ প্রার্থনা করিয়া উহাদের শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন, এই উত্তরে সীতার সন্দিগ্ধ মনে যেমন শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে, তদ্রূপ তাহার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যতার প্রতিও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। তমসার এই বাক্য-টীতে যেমন গাম্ভীর্য্য রহিয়াছে, তেমনি মহানুভাবকতার ভাব রহিয়াছে, সীতার ন্যায় রমণীর সখী এইরূপ গাম্ভীর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন না হইলে সীতার তৎসহ অরণ্য প্রবেশ শোভা পাইত না। ভাগীরথী এই তমসাকে সীতার সহচরী করিয়া গোদাবরীতে পাঠাইয়া-ছিলেন, তমসা যে সীতার প্রকৃত সহচরী হইবার যোগ্য, তাহা ভাগীরথীর এই কথায় প্রতিপন্ন হইবে।

তমসে! ত্বয়ি প্রকৃষ্ট প্রেমৈব বধূর্বৎসা জানকীতি, অত ত্বমেবাস্যাঃ প্রত্যন্তরী ভবেতি।

তমসে! বধূর্বৎসা জানকী তোমাতে প্রকৃষ্ট প্রেম-সম্পন্না, অতএব ইহার সহচরী হও।

আবার যখন সীতা শ্রীরামচন্দ্রের জল-ধর-গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পতিদর্শন আশায় উচ্ছ্বাসিত হইতেছেন, তমসা তদ্দর্শনে অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক বলিতেছেন, "মেঘের শব্দে ময়ূরীর ন্যায় কি জন্য অব্যক্ত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তুমি এইরূপ চকিতোৎকম্পিতা হইয়াছ?

সীতা। ভগবতি! অপরিস্ফুট বলিয়া কি বুঝাইতেছ? আমি স্বর শুনিয়া চিনিয়াছি, আর্য্যপুত্র কথা বলিতেছেন।

তমসা। শুনিয়াছি, তপস্বী শূদ্রের দণ্ডের জন্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা জনস্থানে আগমন করিয়াছেন।

সীতা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে অপরিস্ফুট শব্দ শ্রবণ করিতেছিলেন, উহা তাহার পতির সুকণ্ঠ বলিয়াই তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তথাপিও তমসাকে ঐ শব্দের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তমসা শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের কথা গোপন না করিয়া সরল ভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলি-লেন। সীতার সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা শান্তি-ময়ী তমসার শ্রান্তিহারী বাক্যে দূরীভূত হইল। তমসা যে সীতার দুঃখাপনয়নে দৃঢ়-সংকল্পা, তাহাও তাহার এই সদাচরণে প্রকাশ পাইল। সীতার অন্তরস্থ ক্ষত স্থানের প্রলেপ কিরূপ মাখাইয়া দিলে ক্ষত স্থান দোষ-মুক্ত হইবে, তমসা ভালরূপই তাহা জানিতেন। তিনি সীতার ব্যাধির একজন উৎকৃষ্ট চিকিৎসক। সীতা শ্রীরামচন্দ্রের কাতরতা শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যহীন হওয়ায় তমসা সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন:—

এ অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ রোদ-নই অন্তর্দ্দাহাগ্নি নির্ব্বাপণের অমোঘ উপায়। তমসা সীতাকে যে কথাটী দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন, তাহা বড়ই ভাবময়ী।

পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোক ক্ষোভেচ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥

বিশেষতো রামভদ্রস্য বহুতর প্রকার কষ্টো জীবলোকঃ ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধি-বদভিযুক্তেন মনসা প্রিয়াশোকো জীবং কুসুম-মিব ঘর্ম্মঃ ক্লাময়তি। স্বয়ং কৃত্বা ত্যাগং বিলপন বিনোদোঽপ্যসুলভ স্তদস্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি ননু লাভো বিরুদিতম্॥

জল বৃদ্ধির জন্য জলাশয়ের প্রবৃদ্ধ জলাংশ নিঃসরণই প্রতীকার। শোক ক্ষোভের সময় প্রমুক্ত কণ্ঠে রোদনই সান্ত্বনা লাভের উপায়, বিশেষতঃ সংসারে শ্রীরামচন্দ্রের বহু-প্রকার ক্লেশ। নিরন্তর অবহিত মনে এই জগৎ যথা বিধানে রক্ষণীয়, যে প্রকার আতপ কুসুমকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সীতা-বিচ্ছেদ সন্তাপ দগ্ধ করিতেছে, স্বয়ং পরিত্যাগ করিয়া রোদন পূর্ব্বক শোকাপনোদনের চেষ্টা নহে। সেই জন্য অদ্য আমাদের সমীপে শোক প্রকাশের রোদন সফল মনে করি।

মহাকবি ভবভূতি যে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাহার দর্শন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত বলিয়া আদৃত হওয়ার অপেক্ষা কবি বলিয়া পরিচিত হই-তেই অধিক চেষ্টা পাইয়াছেন। কবির বাসন্তী অপেক্ষাও তমসার বাক্যাবলী দার্শ-নিক ভাবে পরিপূর্ণ। তমসা পাপীর অনু-তাপই যেমন পাপক্ষলনের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত, তেমনি শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ রোদনই দুঃখ নির্ব্বাপণের প্রধান উপায় মনে করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের আত্মকৃত পাপের জন্যও গভীর শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করাইয়া সীতা প্রেমের পরিমাণ করাইবার জন্যই মহাকবি তমসার মুখ দিয়া উক্ত কথাগুলি বাহির করিয়াছেন। তমসার গভীর গবেষণাপূর্ণ ঐ বাক্যাবলী দ্বারা কবি বুঝাইয়াছেন যে, 'প্রকৃতির অনু-কূলে চলিলেই লোক প্রকৃতিস্থ হইতে পারে। তমসা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিতে প্রয়াসী নহেন। তাই শ্রীরামচন্দ্রকে তাহার প্রকৃতিগত কার্য্য করিতে দেখিয়া অধীর হইয়া পড়েন নাই। বরং বর্ত্তমান সময় শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃতি যাহা দাবী করে, তাহা সে উপভোগ করিতেছে কি না, তৎপ্রতি সীতার দৃষ্টি সংস্থাপনের জন্যই পরামর্শ দিতেছেন। তমসা ইহা দ্বারা সীতার রাম-শোক-দর্শন-জনিত দুঃখ কথঞ্চিত নিরা-করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ বিচক্ষণা রমণী রাম-সীতার মিলনে বড়ই শোভা পাইয়াছে। তমসা যেন উভয়ের বিভিন্নগামী শক্তি টানিয়া ধরিয়া সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই অবস্থায় যে সতর্কতা অব-লম্বন করা আবশ্যক, তমসা মনোযোগের সহিতই সেই সতর্কতা সর্ব্বত্র অবলম্বন করিয়াছেন।

তমসার কর্ত্তব্য-জ্ঞান কখনও অবস্থার বিশেষত্বে স্খলিত হইতে পারিত না। সীতাকে লইয়া তমসা কুশলবের বর্ষবর্দ্ধন মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য গোদাবরীতে যাইবেন, সীতা প্রিয়দর্শন শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাতে কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়াছেন, এমন কি, এই সময় প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের মাঙ্গলিক কার্য্যও তাহার স্মৃতিপথ-বিচ্যুত হইয়া তথায় শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা স্থান পাইয়াছে। পতির আকর্ষণ যে পুত্র অপেক্ষাও পত্নীর নিকট অধিক বিস্ময়-কর, তাহাও এই ভাবটী দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তমসা দম্পতির নিতান্ত শুভানু-ধ্যায়িনী হইলেও, কুশিলবের অনুষ্ঠেয় কার্য্যে উদাসীন হইতে পারিলেন না। সীতাকে শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গসুখ পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য গমন করিতে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন "আশ্বস্ত হও, আমরা দীর্ঘায়ু কুশলবের বর্ষবর্দ্ধন মঙ্গলানুষ্ঠান সম্পা-দনের জন্য ভাগীরথী প্রদেশে যাইব।"

এই দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতার এবম্বিধ মিলন তমসার অতিশয় আনন্দপ্রদ হইলেও, তমসা তজ্জন্য সীতার পুত্রদ্বয়ের

মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠান হইতে বিরত হইতে চাহিলেন না। যে সময়ের যাহা অনুষ্ঠেয়, তমসা তাহাতে ক্ষিপ্রহস্তা ছিলেন। তমসা যেমন সান্ত্বনা-দক্ষী, মধুরভাষিণী, সীতার প্রিয়সঙ্গিনী, তেমনি সীতার মঙ্গল কার্য্য-তৎপরা, গুরুজনাদেশ-প্রতিপালন-কারিণী, বুদ্ধিমতী, গাম্ভীর্য্যা। এইরূপ রমণীই পতি-ত্যক্তা সীতার সমভিব্যাহারিণী হইবার প্রকৃত পাত্রী।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

স্বপ্নতত্ত্ব। (২)

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, স্বপ্নাবস্থার বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়,—

মানুষের জড়দেহের শক্তি ও ক্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটী সূক্ষ্মদেহ আছে। এই দেহের মধ্যেও এক প্রকার জড়ত্ব আছে। সেই জড়ত্বকে অবলম্বন করিয়া জড়জগতের উত্তেজনা ঐ দেহে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা স্নায়ুমণ্ডলীর কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে না। আর স্বপ্নাবস্থায় ঐ দেহের কার্য্য প্রধানতঃ দেখা গিয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উপরোক্ত বিষয়েই সংশ্লেষণ প্রণালী (১) অবলম্বনে দেখাইতে চেষ্টা করিব। স্বপ্নাবস্থার লক্ষণগুলি ধরিয়া আলোচনা করিলেও যে এই মতে উপনীত হইতে পারা যায়, সংশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বনে তাহাই দেখা যাইবে। স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তকে সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার দ্বারা নিম্নলিখিত স্বপ্নাবস্থাগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় কি না, দেখিতে হইবে :—

(ক) স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলীর উৎপত্তি স্থান।

(খ) স্বপ্নের বিষয়গুলির পরস্পরের সম্বন্ধ ও পারম্পর্য্য।

(গ) স্বপ্নাবস্থার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ।

(ঘ) স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যাবলীর উৎপত্তি স্থান।

বৈজ্ঞানিকগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যাবলীর উৎপত্তির স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন :—(১) যে সমস্ত সংস্কার ও ভাব অল্পকাল পূর্ব্বে চিত্ত মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে ;—(২) ভাবসংযোগ * অর্থাৎ একটী ভাবের সহযোগে আর একটী ভাবের স্মৃতিপথে আগমন, (৩) শরীর-সঞ্জাত উত্তেজক কারণ।

শারীর-তত্ত্ব হিসাবে শরীরের কোন অংশে যে (ক) ও (খ) এর উল্লিখিত বিষয়গুলি সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানি না। এইগুলি মস্তিষ্কের কোষে (১) সঞ্চিত হইয়া থাকে মনে করিয়া লইলে, মৃত্যুর পরে মনুষ্যের অস্তিত্ব যে বুদ্ধি ও চেতনাযুক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে, ইহা আমাদিগকে অস্বীকার করিতে হইবে। কেননা, যদি আমাদের জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঞ্চয়-স্থান কেবলমাত্র শরীরকেই ধরিয়া লওয়া যায়, তবে মৃত্যুর পরে যে আত্মার অস্তিত্ব, তাহা সর্ব্বপ্রকার পার্থিব জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইবে, সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে, যদি মৃত্যুর পরে চেতনা ও বুদ্ধিযুক্ত আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঞ্চয় স্থান তাহার অন্যকোন স্থানে নিহিত আছে। এইমত গ্রহণ করিলে ইহাই

(1) Synthetical method,

* Association of Ideas.

(১) Brain-cells

যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় যে, যে সমস্ত সংস্কার স্মৃতিপটে সংগৃহীত ভাব ও তৎসহকারিত্বে উৎপন্ন অপর ভাবসমূহ স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশ পায়, সেগুলি এই স্বতন্ত্র সূক্ষ্মশরীর কিম্বা মনোকোষের কোন অংশ হইতেই আসিয়া থাকে। জড় শরীরের উপর নির্ভর করে না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এক-শ্রেণীর স্বপ্ন আছে, যে গুলিকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (১) বলা যায়। সেগুলি কোন প্রকার শারীরতত্ত্বের মতদ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায় না। এইরূপ স্বপ্নাবস্থায় লোকে দূরে যে সমস্ত ঘটনা হইতেছে বা কখনও কখনও ভবিষ্যতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিবে, তাহারই চিত্র চক্ষে দেখিতে পায়। এইরূপ স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহের কারণ নাই। এই সম্বন্ধে ইংলণ্ড,ইউরোপ ও আমেরিকাতে যথেষ্ট অনুসন্ধান করা হইয়াছে। ফ্রান্সে রিচট ও ম্যারিষ্টেন নামক পণ্ডিতদ্বয়, আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক উইলিয়ম জেমস্ ও ইংলণ্ডে প্রফেসর সিজউইক এই বিষয়ে প্রথম অনুসন্ধানে আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশে রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশশধর রায় এম-এ,বি-এল মহাশয় 'জাহ্নবী' নামক মাসিক পত্রে এই বিষয়ের আলোচনার সূচনা করেন। তাঁহার আলোচনার ফলে যে সমস্ত চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এ বিষয়ে লোকের উৎসাহ ভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে এই প্রকারের স্বপ্ন সম্বন্ধীয় অনেক বিশ্বস্ত ও সত্য-ঘটনা Psychical Research Society এর কার্য্যবিবরণীর ২৫ খণ্ডে দেখিতে পাইবেন। আমি নিজে এই প্রকারের অনেক স্বপ্নের ঘটনা আমার কয়েকজন ডাক্তার বন্ধুর নিকট হইতে শুনিয়াছি।

এই শ্রেণীর স্বপ্ন ঘটনার সহিত যে জীব-বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব জড়িত আছে, তাহা কেহ ভাল করিয়া অনুধাবন করেন নাই। এই অতীন্দ্রিয় দর্শনের ক্ষমতা যে কেবল এই শ্রেণীর স্বপ্নাবস্থাতেই দেখা যায়, এমন নহে। সম্মোহিত অবস্থায় (১) ও নানারূপ বিপর্য্যয়েও ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এই অতীন্দ্রিয় দর্শনের ক্ষমতা মানুষের অভ্যন্তরস্থ কোন গুপ্তশক্তির নিদর্শন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই গুপ্তশক্তির অর্থ কি? জীব-বিজ্ঞানের পাঠকেরা জানেন যে, জীবসৃষ্টিতে শক্তির ক্রমোন্নতির অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। উচ্চস্তরের প্রাণীতে এমন অনেক বৃত্তি ও শক্তি দেখা যায়, যাহার অস্তিত্ব নিম্নস্তরের প্রাণীতে ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দৃষ্টিশক্তির কথা ধরা যাইতে পারে। সৃষ্টির নিম্নতমস্তরে অপরিস্ফুট জীববস্তুতে (২) এই শক্তির বিকাশ দেখা যায় না। অথচ সেই সকল নিম্নস্তরের জীব বস্তুতঃই দৃষ্টি-শক্তি-বিশিষ্ট পরিণত জীবের পূর্ব্বপুরুষ বলা যাইতে পারে। আবার, স্বরশক্তি নিম্নস্তরস্থ প্রাণীদিগেরত নহেই, মৎস্যের ন্যায় উচ্চ-স্তরের জীবেরও নাই। কিন্তু তার পরেই ক্রমশঃ উন্নততর জীবে এই শক্তির বিকাশ হইয়াছে। এই জীববিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির দৃষ্টান্তানুসারে বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি যে মানসবার্ত্তার (৩) ক্ষমতাও ক্রমোন্নতির ফলে কালে মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হইতে পারে। মৃত্যুর পরেও এই আত্মার অস্তিত্ব ও ক্রমোন্নতির গতি থাকে, এরূপ বিশ্বাস করিলে এই অতীন্দ্রিয় দর্শন ও মানব-বার্ত্তাশক্তির কথা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাহার মাড়িতে ভবিষ্যৎ দন্তের বীজ দেখা দেয়। যে শিশুর ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা অবগত নহে, সে এই বীজদন্ত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে পারে। —ইহাকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিতে পারে। কিন্তু এই গুলিই পরিণতি লাভ করিয়া কালে স্থায়ী দন্তরূপে দেখা দেয়; তাহার দেহকে তাহার চারিদিকের অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলে। সেইরূপ ভাবে

(১) Clairvoyant dreams.

[১] Hypnotised state.

(2) Protoplasm

(3) Mental Telepathy,

আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মৃত্যুর পরে মানসবার্ত্তা-শক্তিও ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয় ও পরলোকের জীবগণের ভিতর ভাবের আদান প্রদানের সম্ভাবনা সহজ করিয়া দেয়। অতীন্দ্রিয় দর্শন বিষয়ক স্বপ্নের সংসৃষ্ট কতকগুলি ব্যাপার দ্বারা এই অনুমান দৃঢ়ীকৃত হয়। মৃত্যুর পরে আত্মা যে জগতে যায়, সেখানে জড়শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বায়ু ও আলোকের সাহায্যে পরস্পরের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা থাকে না; সুতরাং এই মানসবার্ত্তার ক্ষমতাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের ভাব প্রকাশের উপায়স্বরূপ হয়, এই অনুমান বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত নহে। এই জড়জগতেই ক্রমোন্নতির নিয়ম সীমাবদ্ধ,—ইহার পরপারে আর ইহার বিকাশ নাই—একথা কোন ক্রমেই বিজ্ঞানসম্মত নহে। পূর্ব্ববৎ মীমাংসার নিয়মে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে (১) যে, এই নিয়ম কেবল আমাদের পৃথিবীতে নয়, মৃত্যুর পরেও যে অদৃশ্য জগৎ আছে, তাহাতেও ইহার ক্রিয়া অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। ক্রমশঃ

শ্রীসরসীলাল সরকার।

রাজকর।

ছিল কোন পুরী নাম রত্নময়ী,
রাজা নামে বিশ্বেশ্বর;
আদেশে তাঁহার আসিয়াছে দূত
সাধিবারে রাজকর।
নিজজনে লয়ে বসিয়াছে দূত
নগরের সিংহদ্বারে,
পুরবাসী যত রাজকর সবে
আনিতেছে ভারে ভারে।
বহুকাল হ'তে প্রচলিত সেথা
রীতি এই অদ্‌ভুত,
বরষের মাঝে একটী সামগ্রী
শুধু লয় রাজদূত।
রজত কাঞ্চন মুদ্রা রাশি রাশি
হইয়াছে স্তূপাকার,
মণি, মুক্তা কত বহুমূল্য বাস,
কত রত্ন অলঙ্কার।
দধি, দুগ্ধ, মধু, পুষ্প নানা জাতি,
ফল, মূল রাশি রাশি,
রাখি যথা স্থানে আছে দাঁড়াইয়া
করযোড়ে পুরবাসী।
কত চিত্রপট, গ্রন্থ কতবিধ,
শিল্পদ্রব্য কত শত,
রাখিয়াছে সবে, লইবেন দূত
হ'বে যাহা মনোমত।
এক, এক করি নিরখিয়া সব
কহিলেন দূতবর,
"শুন পুরবাসী! বৃথা আয়োজন
রাজযোগ্য নাহি কর।"
যেন বজ্রাঘাত হইল সহসা,
চমকিত পুরজন,
রাজ-রোষে হায়! না জানি কি ঘটে
ভাবি সবে ক্ষুণ্ণ মন।
বলিলেন দূত "কহিব কেমনে
এ সংবাদ নৃপবরে,
দেখি একবার মিলে কিনা কিছু
অন্বেষিয়া ঘরে ঘরে।"

২

এত বলি দূত পশিলা নগরে,
সঙ্গে ধায় পুরবাসী,

(১) Law of continuity

চিন্তায় মলিন বদন সবার
নাহি স্ফূর্ত্তি নাহি হাসি।
উঠেছে মন্দির পর্ব্বত আকার
রত্নশিলা-বিনির্ম্মিত,
হেরিয়া কৌতুকে দ্বারে তার দূত
হইলেন উপস্থিত।
নিজে রাজদূত এসেছেন দ্বারে
শুনিয়া মন্দিরস্বামী
সগৌরবে আসি কহিলা তাঁহারে,
"কৃতার্থ হইনু আমি।
এ মন্দির তরে কোটি মুদ্রা আমি
দেখ, করিয়াছি ব্যয়,
তুলনা ইহার অন্বেষিলে তুমি
না পাইবে পৃথ্বীময়।
এই যে মর্ম্মর বহুদূর হ'তে
করিয়াছি আহরণ,
গজ দন্ত হেন না মিলে এ দেশে
দুর্ল্লভ এ মণিগণ।
এহেন মুকুতা নাহি গৃহে কারও
কি উজ্জ্বল, কি সুন্দর,
আদেশে আমার নানা দেশ ভ্রমি
আনিয়াছে অনুচর।
শুনিলাম তুমি রাজযোগ্য কর
পাও নাই মতিমান।
ভাবিতেছি মনে এ মন্দির আমি
রাজারে করিব দান।"
"ধন্য ধন্য" করি উঠে পুরবাসী—
শুনি ক'ন দূতবর,
"দান নিতে মোর নাহি অধিকার,
চাহি আমি রাজকর।"

৩

এত বলি দূত চলিলা আবার
সঙ্গে চলে পুরজন,
দেখিলা অদূরে অট্টালিকা এক
শোভা পায় সুশোভন।
দ্বারে রাজদূত শুনি গৃহস্বামী
আসি তথা ব্যগ্রচিত্,
কহিলা বিনয়ে "আগমনে তব
হইলাম সম্মানিত।
রাজযোগ্য কর আছে মোর গৃহে
করিব তা সমর্পণ,
মানব.জাতির ইতিহাস আমি
করিয়াছি বিরচন।
পঞ্চবিংশ বর্ষ সে গ্রন্থ রচনে
করিয়াছি কত শ্রম,
বুঝিবে দেখিলে অপূর্ব্ব সে গ্রন্থ,
নাহি ত্রুটী নাহি ভ্রম।
নাহি হেন শাস্ত্র অধ্যয়ন যাহা
করি নাই তার তরে,
রাখি নাই বাকী খুঁজিতে তা সব
জ্ঞাতব্য যা চরাচরে।
নর মাংসভোজী মানবের মাঝে
যাপিয়াছি কত মাস,
ভূগর্ভ খনিয়া দেখিয়াছি খুঁজি,
মানবের আদি বাস।
পর্ব্বত প্রমাণ উপাদান কত
দেখ এই স্তরে, স্তরে,
আমা বিনা কেহ না পারে রচিতে
হেন গ্রন্থ অন্য নরে।
শুনিলাম তুমি রাজযোগ্য কর
পাও নাই কিছু, দূত।
তাই দিব তোমা এই গ্রন্থ আজি
ধরাধামে অদ্ভূত।"
আনন্দে বিস্ময়ে শুনি রহে চাহি
নগরের অধিবাসী,
ডাকি গ্রন্থকারে ক'ন রাজদূত
অধরেতে মধুর হাসি,

এই যে বালুকা ইতিহাস তার
কর যদি বিরচন,
কহিনু নিশ্চয় তাও ভ্রমহীন
না হইবে কদাচন।
কি ধৃষ্টতা তব কহিলে গরবে
শুনিলে না রহে হাস,
লিখিয়াছ তুমি মানব জাতির
ভ্রমহীন ইতিহাস।
"তর্কে নাহি ফল লিখিয়াছ যাহা
থাকুক তা, সুধীবর!
দেখি অন্বেষিয়া পাই যদি আমি
'রাজযোগ্য অন্ন কর।"

৪

এত বলি দূত যান অন্য দিকে,
বেলা ক্রমে হয় শেষ,
ফুটি উঠে দীপ গৃহস্থের গৃহে,
ধরণী ধূসর বেশ।
নগরের বামে ছুটে প্রবাহিনী
বিষম তরঙ্গ ভঙ্গে,
আঘাতে আঘাতে পথ পার্শ্ব ভাঙ্গি
গহ্বর সৃজেছে রঙ্গে।
রাক্ষসীর মত রহিয়াছে তাহা
বদন ব্যাদান করি,
নিয়ে ঘূর্ণিজলে ক্ষণমাত্রে তাহে
ডুবে, যদি পড়ে তরী।
অদূরে তাহার পাতার কুটীর
দীপালোকে শোভা পায়,
পতিপুত্রহীনা অনাথিনী এক
বসতি করেন তায়।
সম্বল তাঁহার চরকা একটী,
কাটি সূতা দিন রাত,
কোন রূপে তিনি সে বিজন দেশে
করেন জীবন পাত।

কি জানি পথিক আসি অন্ধকারে
পড়ে সে গহ্বর তলে,
কি জানি নাবিক আসি তরী লয়ে
ডুবে সেই ঘূর্ণিজলে।
গহ্বরের পাশে দীপ জ্বালি তাই,
রাখি তিনি সযতনে,
নিবে যায় পাছে ভাবি সারা নিশি
কাটাতেন জাগরণে।
দৈবে তিন দিন সূতা অনাথার
না করিল কেহ ক্রয়,
দীনা বিধবার যা ছিল সম্বল
সকলই হইল ক্ষয়।
একটী পয়সা আছিল কেবল
অনাথিনী তাই লয়ে,
রহি অনাহারে জ্বালিলেন দীপ,
পূর্ব্ব মত হৃষ্ট হয়ে।
সে দীপের আলো দেখি দূর হতে
কহিলেন দূতবর,
যাব আমি তথা দেখা যায় অই
নদী তীরে কার ঘর।
কৌতুহলী হয়ে, সাথে সাথে তাঁর
যায় যত পুরজন;
ভাবে মনে মনে বৃথা এই শ্রম
হেথা কি মিলিবে ধন।
রাজদূত হেরি সম্ভ্রমে বিধবা
দাঁড়াইল আসি দ্বারে,
প্রণমি চরণে করযোড় করি
বিনয়ে কহিল তাঁরে,
"দুঃখিনীর গৃহে এলে যদি, দূত!
কোন কর বল দিব,
তণ্ডুলের কণা নাহি মাত্র গৃহে
কিবা দিয়ে আরাধিব?
যা কিছু আমার সকলি নৃপের
শুন, দূত মহাশয়।

তাঁর কার্য্য তরে রেখেছি এ দেহ
লহ যদি ইচ্ছা হয়।
কহিলেন দূত, "শুন সাধুশীলে
তব গৃহে আছে কর,
লইব তা' আমি হেরি তুষ্ট অতি
হইবেন বিশ্বেশ্বর।
এত বলি দূত লয়ে সেই দীপ
বাঁধিয়া আপন বাসে,
লয়ে নিজ ধন নগরের পানে
ফিরিলেন মহোল্লাসে।
গায় পুরবাসী ধন্য সাধুশীলে!
দিলে তুমি যোগ্যবর,
বাঁচাইলে সবে জয় পুণ্য ব্রতে
জয় রাজা বিশ্বেশ্বর।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

বিথলঙ্গের আখড়া। *

এই প্রসিদ্ধ আখড়া জেলা শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত, এবং পরগণা বিথলঙ্গস্থ শ্রীমঙ্গল গ্রামে অবস্থিত। ইহার কিছুদূরেই সুন্দরবন-ডিস্‌পাস্‌-ষ্টীমার-লাইনের কাকাইল-ছিয়া ও বিথঙ্গল নামে দুইটী ষ্টেসন আছে। শেষোক্ত ষ্টেসন হইতে আখড়াটী অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠ করিলে আখ-ড়ার সমৃদ্ধি, প্রভাব ও সৌন্দর্য্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাঙ্গালায় ইহার সমকক্ষ দ্বিতীয় একটী আখড়া বিদ্যমান আছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালার ধর্ম্মাচরণ-কেন্দ্র সমূহের মধ্যে বিথঙ্গলের আখড়া বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

বিথঙ্গলের আখড়ার দৈর্ঘ্য ৯২৪ হাত, এবং প্রস্থ ৬৭২ হাত। ইহা ৯৭ বিঘার কিঞ্চিদধিক স্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। দূর হইতে নেত্রপাত করিলে, দিকত্রয়ে বনলেখা-বেষ্টিত সুতুঙ্গ ভূমিতে অবস্থিত হর্ম্ম্যমালা-শোভিত এই বিরাট আখড়াটী দেবভবন অপেক্ষা বরং সকানন অধিত্যকা বিনিবিষ্ট গিরিদুর্গ বলিয়াই প্রতীত হয়, যদিও কার্য্যতঃ উহা রামাইত-সম্প্রদায়ের শাখাশ্রিত একটী ভজন-কেন্দ্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আখড়ার পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদিক হিজলগাছের বিশাল বন দ্বারা প্রায় আবৃত; পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ একটী সমতল বিশাল প্রান্তরে লগ্ন। আখড়ার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে এই বিশাল প্রান্তরের দৃশ্য অতি-চিত্তহারী।

এই বিশাল আখড়ার উত্তরদিকে চামার-দীঘি নামে একটী জলাশয় আছে। বর্ষাকালেই আখড়ায় অত্যধিক যাত্রি সমাগম হইয়া থাকে। তখন ঐ খাল পর্য্যন্ত আখড়ার ঘাট বান্ধিয়া দেওয়া হয়। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন ২০০ হইতে ২০০০ পর্য্যন্ত যাত্রী হইয়া থাকে; কাজেই বর্ষাকালে ঐ ঘাটে অসংখ্য নৌকা অবিরত সংলগ্ন থাকে।

আখড়ার লগ্ন পূর্ব্বেই একটী সুবিশাল দীর্ঘিকা বিদ্যমান। তাহার পরেই একটী নিম্নতল দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর। ঐ দীর্ঘিকায় অবরোহণের জন্য চারিটী ইষ্টক-নির্ম্মিত সোপান-পংক্তি বিদ্যমান। তন্মধ্যে তিনটী প্রচলিত সাধারণ বান্ধা ঘাটের ন্যায়। কিন্তু যে ঘাট আখড়ার দিক্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে

* অনেকেই "বিথলঙ্গ" না বলিয়া "বিথঙ্গল" বলেন। এইজন্য আমরা প্রবন্ধে "বিথঙ্গল" নামই ব্যবহার করিলাম।

দীর্ঘিকায় অবতরণ করিয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ বিশাল সোপান পংক্তিটীর শিরোভাগস্থ সোপানের প্রস্থ প্রায় ৪৫ হাত এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৫ হাত। এই প্রকাণ্ড সোপান হইতে ক্রমাগত-নিম্ন ৬ খানা সোপানের পরেই শিরোভাগস্থ প্রকাণ্ড সোপানের ন্যায় আর একটী প্রকাণ্ড সোপান; তাহার পর সোপান-পংক্তি ক্রমশঃ জলে অবতরণ করিয়াছে। আখড়ার পূর্ব্বদিক্ই সদর বলিয়া গণ্য, ঐ পূর্ব্বদিকেই দিগন্ত বিস্তৃতসমতল প্রান্তর। আখড়ার পশ্চিমদিকেও পাকা-ঘাট বিদ্যমান; উহা বর্ষাকালে ব্যবহার্য্য।

পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরের ঘাট হইতে আখড়ার "শ্রীমন্দির" পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল চত্বর আগন্ত-সুবদ্ধ ইষ্টকাস্তরণে আবৃত। আখড়ার মধ্যবর্ত্তী বিপুল অঙ্গনের চতুর্দ্দিকই দালান পংক্তি বেষ্টিত। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর, এই তিন দিকে দুই দুই সারি দালান। কেবল পশ্চিমদিকে একসারি দালান, এই সকল দালানে বহুসংখ্যক কুঠরি, উহাতে সমাগত যাত্রিকগণ বাসা করিয়া থাকেন, এবং আখড়ার বৈষ্ণবগণ বাস করেন।

এই সকল দালান-শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী প্রকাণ্ড আঙ্গিনা সুগ্রথিত ইষ্টকাবৃত। উহার মধ্যস্থলে আখড়ার অধিদেবতা আদি গোঁসাই রামকৃষ্ণজীর সমাধিমন্দির। সমাধিমন্দিরের সমক্ষেই দক্ষিণদিকে অতি প্রকাণ্ড নাটমন্দির। সমাধিমন্দির ও নাটমন্দিরের ভিত্তি এবং নাটমন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্বের পাকা আঙ্গিনার কতকস্থানও মারবল পাথরে গ্রথিত। সমাধিমন্দিরের বামপার্শ্বেই পূর্ব্বদিকে ভাণ্ডারদালান; উহার দক্ষিণে নাট-মন্দিরের ঠিক সমান আয়তন ভোগমন্দির। উহাতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাদি দেবতার আসন ও ভোগের স্থান। পশ্চিম বঙ্গের পাঠক, রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের সেই প্রসিদ্ধ ৺কালী বাড়ীর চিত্র স্মরণ করিলে, বিথঙ্গলের আখড়ার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। বর্ণিত সমাধিমন্দিরকে "শ্রীমন্দির" বলা হয়। উহাতে রামকৃষ্ণ গোঁসাইর আসন, পাদুকা ও ব্যজনাদি রক্ষিত আছে। এই আসন ও জগন্নাথাদি বিগ্রহই আখড়ার দেবতা। তাঁহাদের সেবার জন্যই আখড়ার এই বিপুল আয়োজন,—জমিদারী, অর্থ, হর্ম্ম্যমালা, উদ্যান, দীর্ঘিকা, শত শত পরিচারক, প্রায় দেড় লক্ষ শিষ্য, অসংখ্য যাত্রিক, বিচিত্র পূজা-সম্ভার ও রাশিকৃত ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি।

আখড়ার ভক্ত ও শিষ্যবর্গের দৃঢ়বিশ্বাস, আদি গোঁসাই রামকৃষ্ণ নিয়ত জাগ্রতভাবে এই আখড়া ও শিষ্যবর্গকে রক্ষা করেন। এই সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে, আমি একটীর উল্লেখ করিতেছি। আখড়ার বৈষ্ণবদিগকে কখনও ওলাউঠা রোগে আক্রমণ করে না, ইহাই বিশ্বাস। একবার ঐ রোগে অকস্মাৎ একটী বৈষ্ণব মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং অন্য দুই তিনটী বৈষ্ণব ঐ রোগে আক্রান্ত হন। ইহাতে মহান্ত রাত্রিতে সমাধিমন্দিরে "হত্যা" দিয়া পতিত হইলেন। রাত্রি প্রভাতে বহির্দ্বারে কতকগুলি স্থান ব্যাপিয়া সদ্যঃপতিত রাশিকৃত রক্ত বিদ্যমান দেখা গেল এবং পীড়িত বৈষ্ণবগণ ঐ দিনই রোগমুক্ত হইলেন। আমি পরীক্ষার জন্য আখড়ার দুই তিন জন শিক্ষিত শিষ্যকে বলিয়াছিলাম, দেশে এত বড় বড় ভট্টাচার্য্য ও বৈষ্ণব গোস্বামীবর্গ থাকিতে আপনারা আখড়ার শিষ্য কেন রহিয়াছেন? তাঁহারা উত্তর করিয়াছেন, "অন্যান্য শাক্ত ও বৈষ্ণব গোস্বামী-

গণের শিষ্য অপেক্ষা বিথঙ্গলের আখড়ার শিষ্যগণ অধিকতর শ্রীসম্পন্ন এবং অধিকতর সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। গ্রামে গ্রামে অন্যান্য গুরুর শিষ্য এবং আখড়ার শিষ্যের অবস্থা তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।" দেখুন কি অটল বিশ্বাস।

বিথঙ্গল গ্রামের ॥/০ আনা হিস্যার জমিদার মাধবচন্দ্র চৌধুরী বাজুগার বনপ্রান্ত হইতে রামকৃষ্ণ গোঁসাইজীকে আনয়ন করতঃ ১০৫৯ সালের শ্রাবণ মাসে বর্ত্তমান আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে রামকৃষ্ণ গোঁসাইকে স্থাপিত করেন। ১০৫৯ সালের শ্রাবণ মাসে এই অশেষ সমৃদ্ধিপূর্ণ হর্ম্ম্যমালা-শোভিত আখড়া মাধবচন্দ্র চৌধুরীর নবনির্ম্মিত কতিপয় পর্ণকুটীরের অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। বিগত ২৬০ বৎসর মধ্যে মহান্ত পরম্পরার প্রভাবে উহা ক্রমশঃ বর্ত্তমান বিপুল ও সমৃদ্ধিপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে।

আমরা নিম্নে আদিগোঁসাই রামকৃষ্ণ হইতে বর্ত্তমান মহান্ত পর্য্যন্ত শিষ্য পরম্পরা ক্রমে মহান্তগণের এবং মাধবচন্দ্র চৌধুরী হইতে তাঁহার বংশধর বর্গের তালিকা প্রদান করিলাম। পরে অন্যান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মহান্তগণ।

১। রামকৃষ্ণ গোঁসাইজী (আদি মহান্ত)
২। চূড়ামণি গোসাইজী
৩। কৃপালু গোঁসাইজী
৪। নয়ান গোঁসাইজী
৫। চৈতন্য গোঁসাইজী
৬। নরেন্দ্র গোঁসাইজী
৭। কুশল গোঁসাইজী
৮। রামহরি গোঁসাইজী
৯। রাজচন্দ্র গোঁসাইজী
(বর্ত্তমান মহান্ত)

১। মাধবচন্দ্র চৌধুরী (তৎপুত্র)
(॥/০ আনা হিস্যার জমিদার। আখড়া-স্থাপয়িতা)
২। মহানন্দ চৌধুরী (তৎপুত্র)
৩। বলরাম চৌধুরী (তৎপুত্র)
৪। বাণেশ্বর চৌধুরী (তৎপুত্র)
৫। ফকিরচান্দ চৌধুরী (তৎপুত্র)
৬। গোকুলচন্দ্র চৌধুরী (তৎপুত্র)
৭। স্বরূপচন্দ্র চৌধুরী (তৎপুত্র)
৮। নবীনচন্দ্র চৌধুরী (তৎপুত্র)
৯। নগেন্দ্র চৌধুরী
(বর্ত্তমান)

রামকৃষ্ণ গোঁসাইর পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুক্রম পরে প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহাদের সঙ্গে বিথঙ্গলের আখড়ার কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা সকলেই অন্য দেশীয়, পশ্চিম ভারতের লোক।

রামকৃষ্ণ গোঁসাই হইতে বর্ত্তমান মহান্ত রাজচন্দ্র গোঁসাই পর্য্যন্ত শিষ্য পরম্পরা ক্রমে ৯ জন মহান্ত গোঁসাই এবং আখড়ার স্থাপয়িতা মাধবচন্দ্র চৌধুরী, ইহারা সকলেই শ্রীহট্ট দেশীয় বাঙ্গালী। জাতিতে সকলেই মাহিষ্য দাস।

বিথঙ্গলের আখড়া এবং তাহার অধীন প্রায় সাড়ে তিনশত আখড়ায় মাহিষ্য, কায়স্থ, নবশায়ক এবং জীবর নমঃশূদ্র এবং ধীবরাদি সর্ব্বজাতীয় বৈষ্ণবই বহুসংখ্যায় বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বৈষ্ণব হইতেই ক্রমাগতঃ মহান্ত নির্ব্বাচিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। সকলেই তাহার

একই উত্তর দিয়াছেন। উদ্ধৃত কোর্সি-নামাঙ্কিত নবীনচন্দ্র চৌধুরী (১) লখিয়াছিলেন :—

"মাহিষ্য জাতীয় মহান্ত নিযুক্ত হইবার স্পষ্ট কোন কারণ নির্দ্দেশ নাই। তবে পূর্ব্ব মহাজন রামকৃষ্ণ গোঁসাই এই জাতীয় লোক ছিলেন, এবং তৎসময় হইতে এই জাতীয় বৈষ্ণব হইতে মহান্ত "নির্ব্বাচিত" হইয়া আসিতেছেন। এই বিষয়ে পূর্ব্ব মহাজনের কিছু অভিপ্রায় থাকিতে পারে। বিশেষতঃ এই জাতীয় বৈষ্ণবের সংখ্যাই আখড়াতে প্রবল, বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও কার্য্যদক্ষ।" (হঃ লিঃ ১১ পৃষ্ঠা)

এই আখড়ার অধীন প্রায় ৩৫০ শত আখড়া বিদ্যমান। তাহারও প্রায় বার আনা আখড়ায় ঐ শ্রেণীস্থ মহান্ত বিদ্যমান। অবশিষ্ট আখড়ার আর্থিক অবস্থাও ভাল। বিশেষতঃ মাছুলীয়া ও ঢাকার আখড়া বিশেষ সমৃদ্ধ। এই দুই আখড়ার মত ভিন্ন মূল আখড়ার মহান্ত নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না।

যে রামকৃষ্ণ গোঁসাইর সিদ্ধি প্রভাবে বিথঙ্গলে ধর্ম্মচর্য্যার এই এক বিপুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, যিনি এই আখড়ার জাগ্রত অধিদেবতারূপে এখন পূজিত, তাঁহার জীবন সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

রামকৃষ্ণ গোঁসাইজীর জীবন।

জেলা শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রীচি গ্রামে রামকৃষ্ণের পিত্রালয় ছিল। তাঁহার পিতার নাম বনমালী দাস চৌধুরী এবং মাতার নাম জাহ্নবী। তিনি জাতিতে মাহিষ্য দাস ছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তৎপর তিনি স্বগ্রামেই মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। ১৩০৭ সনের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশীয় একটী অতি বৃদ্ধা স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বনমালী চৌধুরীর ভিটায় রামকৃষ্ণের একখানা আসন সেবা করিতেন। উহার সমক্ষে স্থানীয় লোকে কিছু কিছু ভোগ নৈবিদ্যাদি দিত। রামকৃষ্ণের পূর্ব্বাশ্রমে ভাগিনেয় বুধাই বিশ্বাসের বংশ জেলা ময়মনসিংহে এখনও বিদ্যমান। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু প্যারীমোহন দাস (উকিল) মহাশয়ের মাতামহী বুধাই বিশ্বাস বংশীয়দের দৌহিত্রী।

রামকৃষ্ণ মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াই বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি অল্প সময়েই কি রূপে অনেক শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং শৈশবেই উদাসীন ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। এই অবস্থায় কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইবার পর মাছুলীয়ার (১) তদানীন্তন সিদ্ধ রামাইত মহান্ত শান্ত গোঁসাইজী রীচি গ্রামে শিষ্যালয়ে আগমন

(১) আখড়া সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ কালে এই ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হয়। ঐ সময়ে (১৩০৭ সালের বর্ষায়) ইঁহাকে আখড়া সম্বন্ধে আমি ২২টী প্রশ্ন পাঠাই। ইনি ১৩০৭ সালের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে উক্ত প্রশ্নের লিখিত উত্তর পাঠাইয়াছিলেন। উহা এই প্রবন্ধের প্রধান উপকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইনি আখড়ার একতর কর্ত্তৃত্বকারী এবং পুরুষানুক্রমে আখড়ার সহিত জড়িত বলিয়া ইনি অনেক বিবরণ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহা অন্যের পক্ষে প্রদান করা একরূপ অসম্ভব। আখড়া সম্বন্ধে ইঁহার প্রদত্ত বিবরণই পূর্ণাবয়ব, সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও সুন্দর।

(১) পূর্ব্ব হইতেই মাছুলীয়া রামাইত সম্প্রদায়ের এক আখড়া ছিল। সেই স্থানে জগন্মোহন গোঁসাই, গোবিন্দ গোঁসাই, ও শান্ত গোঁসাই ক্রমান্বয়ে মহান্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ গোঁসাই বিথঙ্গলে প্রভাব বিস্তার করিবার পর মাছুলীয়ার আখড়া তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়। মূল প্রবন্ধে রামকৃষ্ণের গুরুক্রম দেখুন।

করেন। রামকৃষ্ণ শান্ত গোঁসাইকে দর্শন করিতে যান, এবং তাঁহার বৈরাগ্য দর্শন ও ভাগবদ্ ভজন বিষয়িণী কথা শ্রবণ করিয়া সংসারে একেবারে বিরাগী হইয়া উঠেন। তিনি ঐ ঘটনার পরেই আর দার পরিগ্রহ না করিয়া মাছুলীয়ায় শান্ত গোঁসাই সমীপে যাইয়া রমাইত বৈষ্ণব মতে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তিনি কত বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহা লিখিত নাই; বোধ হয় ১৮।১৯ বৎসর বয়সে তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন।

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গুরু শান্ত গোঁসাইজীর আদেশে তিনি ১২ বৎসর সংযত চিত্তে নিযুক্ত থাকিয়া গুরু শুশ্রূষা করেন। দ্বাদশ বর্ষান্তে গুরু প্রসন্ন হইবার পর তাঁহার সম্পূর্ণ চিত্ত-শুদ্ধি লাভ হয়। তৎপর তিনি গুরুর আদেশে তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন।

তীর্থ-পর্য্যটন কালে অনেক সিদ্ধ গুরু ও সাধুজনের সঙ্গে তাঁহার সমাগম হওয়ায় তিনি কৃতার্থতা লাভ করেন। পরে তিনি "বিবিধ গিরিশৃঙ্গে ও গিরিগুহায় একাসনে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিয়া ভজনে তৎপরতা লাভ করেন।" তাহার পর তিনি "চীন, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি" হৈমবত জনপদে ভ্রমণ করিয়া নিম্ন ভূমিস্থিত "হরিদ্বার, জ্বালা-মুখী, পরেশনাথ প্রভৃতি" তীর্থ পর্য্যটন করেন। এই সঙ্কট-বহুল তীর্থ পর্য্যটনে তাঁহার ৩৬ বৎসর অতীত হয়।

তৎপর তিনি আসিয়া ঢাকা নগরীর পূর্ব্ব প্রান্তস্থ ফরিদাবাদের (*) তদানীন্তন গভীর বন মধ্যে প্রবিষ্ট হন, এবং ধুনী লাগাইয়া একাসনে ধ্যানে মগ্ন হইয়া অবস্থান করেন। রাখালগণ গোরুর অন্বেষণে ঐ বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে একাসনে ধ্যানমগ্ন দেখিতে পায়। ঐ স্থান তখন হিংস্র জন্তু-পূর্ণ বলিয়া দুর্গম ছিল। কাজেই ধ্যানমগ্ন তাপসের কথা শুনিয়াও কেহ সেই বনাভ্য-ন্তরে তাঁহাকে দেখিতে সাহসী হইলেন না। তখন ঢাকা ফরিদাবাদের রাজবাটীতে আগড়তলা রাজবংশীয় রাজা উৎসবানন্দ মাণিক্য বর্ম্ম বাহাদুর বাস করিতেছিলেন। তিনি ভাল ভাল লোকের মুখে 'হিংস্র জন্তু-পূর্ণ বন মধ্যে ধ্যানমগ্ন সাধুর কথা শ্রবণ করিয়া হাতী ঘোড়া লোকজন লইয়া বন কাটিয়া পথ করতঃ অন্বেষণ করিয়া রামকৃষ্ণ-জীকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন। রাজা তাপসের সেই প্রজ্বলিত মূর্ত্তি দর্শনে অভিভূত সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িয়া রহি-লেন; তখন লোকের কোলাহলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। রামকৃষ্ণজী রাজার প্রতি সদয় হইয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ কয়েকটী কথা বলিয়া রাজাকে বিদায় করিলেন।

রাজা উৎসবানন্দ বার বার তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহাকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রামকৃষ্ণ স্বস্থানে যাইয়া আবার ধ্যানে বসিলেন। ক্রমশঃ লোক-সমাগমে ভজনের ব্যাঘাত হওয়ায় রামকৃষ্ণজী অকস্মাৎ সেই স্থান হইতে অন্ত-র্হিত হইলেন।

যে স্থানে রামকৃষ্ণজী আসন করিয়া বসিয়াছিলেন, ঐ স্থানেই রামকৃষ্ণ-পন্থীর পুরাতন আখড়া বিদ্যমান। রাজার যত্নে ঐ আখড়া স্থাপিত হয়। উহা পাকা দালান সমূহ ও আতল ইষ্টকবদ্ধ পুষ্করিণী প্রভৃতিদ্বারা

(*) ফরিদাবাদে এখনও যে যে স্থানে জঙ্গল আছে, ঐ স্থানে এখনও মধ্যে মধ্যে বড় বড় সাধু আসিয়া অবস্থান করেন। পরে ঢাকার বড় বড় ধনীদিগের ভক্তির উৎপীড়নে চলিয়া যান। কি জন্য এই বনে এখনও বড় বড় সাধুর সমাগম হইয়া থাকে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

অলঙ্কৃত। রাজা ঐ আখড়ায় অনেক ভূম্যাদি দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা একটী বড় আখড়া। এখনও আগরতলার রাজ-সংসার হইতে এই আখড়ায় এবং বিথঙ্গলের মূল আখড়ায় পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

রামকৃষ্ণ ফরিদাবাদের বন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দীক্ষাস্থান মাছুলীয়া আখড়ার সন্নিহিত বৌলা নামক তদানীন্তন নিবিড় বন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন। পূর্ব্ববৎ রাখালগণ তাঁহাকে দেখিয়া তাহার সংবাদ জনসমাজে প্রচার করিয়াছিল। তখন শত শত ভক্ত সেই বনমধ্যে তাঁহার সমীপগত হইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং "যাহার যে অভাব, তাহা জানাইয়া অভাবমুক্ত হইতে লাগিলেন।"

তথাকার সুলতানসীর মুসলমান জমিদার বংশীয় ব্যক্তিগণ (যাহারা আউলিয়া-বংশ বলিয়া খ্যাত) তাঁহার এইরূপ প্রভাবের কথা শুনিয়া যেন রুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন এবং হিন্দুর অভক্ষ্য নানারূপ মাংস একটী প্রকাণ্ড পাত্রে স্তূপীকৃত করিয়া তাঁহার জন্য উপহার লইয়া গেলেন। রামকৃষ্ণজী তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অক্ষুব্ধ-চিত্তে ঐ পাত্র তাঁহার সম্মুখে রাখিতে আদেশ করিলেন, এবং তাহাদের নিকট হইতে এক খণ্ড বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাহা দ্বারা ঐ পাত্র ঢাকিয়া দিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে ব্রহ্মের আরতি গান করিতে লাগিলেন। গানের পদ এই:—

"ভোজন কর মন, জ্ঞান-অমৃত।"

আরতি সমাপ্ত করিয়া রামকৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদন উদ্‌ঘাটিত করিলেন; তখন সেই পাত্র আতপ চাউল, চিনি, কলা, দুগ্ধাদি সামগ্রীতে পূর্ণ দেখা গেল। তিনি ঐ প্রসাদ হিন্দু-মুসলমান সকলকে দিলেন। মুসলমান জমীদারগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে গোঁসাই-জী অভয় প্রদান করিলেন। তাঁহারা তদবধি সর্ব্বদা জ্ঞানোপদেশের জন্য তাঁহার সমীপে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দীক্ষাস্থান মাছুলীয়ার আখড়ায় প্রচুর সাহায্য করিতে লাগিলেন। লোক-সমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সেই স্থান হইতে আবার অদৃশ্য হইলেন। কতককাল কেহই তাঁহার সংবাদ জানিল না। তাঁহার প্রভাব তখন দিগ্-বিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল।

পরিশেষে এক আষাঢ় মাসের শেষভাগে বাজুগা নামক বনের প্রান্তে (যে বন পরে বাজুগা নামক গ্রামে পরিণত হইয়াছে) অকস্মাৎ দৃষ্টিগোচর হইলেন। তখন ঐ বনের চতুর্দ্দিক্ সাগরের ন্যায় জলরাশিতে প্লাবিত, বনের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন, বনের একপ্রান্তে জলমগ্ন-কল্প একটু সামান্য শুষ্ক স্থান ছিল; গোঁসাইজী একাকী সেইস্থানে দণ্ডায়মান। সেইস্থানের নিকট দিয়া একজন দোকান-দারকে বিথঙ্গল গ্রামাভিমুখে নৌকাযোগে প্রস্থিত দেখিয়া গোঁসাইজী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "বিথঙ্গল গ্রামে যাহার সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হইবে, তাঁহাকে তুমি এইস্থান হইতে রামকৃষ্ণ গোঁসাইকে লইয়া যাইতে বলিও।" দোকানদার এই কথা শুনিয়া বিস্ময় ও ভীতি-বিহ্বল চিত্তে দ্রুতগতিতে নৌকা চালাইয়া বিথঙ্গল গ্রামে উপস্থিত হইল এবং ঐ গ্রামের ॥৴০ আনি অংশের ভূম্যধিকারী মাধবচন্দ্র চৌধুরীকে ঘাটে স্নান করিতে উদ্যত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গোঁসাইজীর আদেশ জ্ঞাপন করিয়া নৌকা বাহিয়া চলিল।

মাধবচন্দ্র চৌধুরী স্নান না করিয়াই নৌকার

যোগাড় দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ৩ জন মাঝিসমেত একখানা পুরাতন ওথার নৌকা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া লাগিল। তিনি মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ঐ নৌকায় উঠিয়া অস্নাত অবস্থায়ই নৌকা চালাইয়া দিলেন। তিনি জানিতেনঃ—

"মহদ্ বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন চেতসাং নিঃশ্রেয়সায় ভবতি।"

দীনহৃদয় গৃহস্থগণের গৃহে মহান্ ব্যক্তির আগমনে অতীব মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে।

এদিকে দোকানদারের মুখে প্রায় সমকালেই গোঁসাইজীর কথা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিও উত্তম অধম নানারূপ নৌকা সাজাইয়া যথাশক্তি দ্রুতগতিতে গোঁসাইকে আনিবার জন্য সেই বাজুগা বনাভিমুখে ধাবিত হইল। মাধবচন্দ্র চৌধুরীর সমকালেই অনেক নৌকা যাইয়া গোঁসাইজীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিতে লাগিল; কিছুকাল মধ্যেই শত শত নৌকা রামকৃষ্ণ গোঁসাইকে সম্পূর্ণ ঘেরিয়া অবস্থিত হইল। সেই সেই নৌকার আরোহীগণ গোঁসাই কাহার নৌকায় পদার্পণ করেন—এই প্রতীক্ষায়, অথচ ভয়ে, নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই নৌকা-সংঘট্ট দর্শনে মাধবচন্দ্র চৌধুরী ভক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাঁহার সঙ্গেই যে দোকানদারের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, সে কথা তিনি বলিবার অবসর পাইলেন না; তাঁহার অর্দ্ধ-জীর্ণ ও ত্বরাবশতঃ অসজ্জিত নৌকা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট, সুসজ্জিত ও দ্রুতগামী নৌকা তখন সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল।

সমবেত নৌকাগুলি নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত হইবার পর, রামকৃষ্ণ গোঁসাই ধীরে ধীরে একখানা নৌকাভিমুখে যাইয়া ঐ নৌকায় নীরবে আরোহণ করিলেন; তাহাতে নীরবে কয়েক পাদনিক্ষেপ করিলেন, তৎপর সে নৌকা ছাড়িয়া নিঃশব্দে অন্য নৌকায় উঠিয়া ঐরূপ পাপবিক্ষেপ করিয়া আবার অন্য নৌকায় উঠিলেন। এইরূপে যত শত নৌকা সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক নৌকায় তিনি আরোহণ ও তাহা হইতে অবরোহণ করতঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বশেষে সেই কৃতাঞ্জলি মাধবচন্দ্র চৌধুরীর নৌকায় আসিয়া উঠিলেন, এবং সেই নৌকায় উপবিষ্ট হইয়া নৌকা চালাইতে আদেশ করিলেন!! এতক্ষণ সমবেত লোকগণ ভয়ে নীরব ছিলেন; তখন সকলেই জয়ধ্বনি করিয়া মাধবচন্দ্র চৌধুরীর নৌকার পার্শ্বে পার্শ্বে ও পশ্চাতে পশ্চাতে রামকৃষ্ণজীকে দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। শাস্ত্রে যোগিগণের এইরূপ অদ্ভুত আচরণের অনেক কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিথঙ্গল গ্রামে মাধবচন্দ্র চৌধুরীর ঘাটে নৌকা লাগিবার পর গোঁসাইজী তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া তাঁহার অঙ্গুরীয়কটী প্রথমতই ঐ বাড়ীতে প্রোথিত করিয়া ঐ গ্রামের নাম "শ্রীমঙ্গল" রাখিলেন। তদবধি ৷৷/০ হিস্যার দাস চৌধুরী মহাশয়দের বাড়ীর ঐ অংশ শ্রীমঙ্গল গ্রাম নামে খ্যাত হইল। গোঁসাইজীর অঙ্গুরীয়ককে "শ্রীঅঙ্গুরী" বলে।

মাধব চৌধুরী রামকৃষ্ণ গোঁসাইজীকে কয়েকদিবস নিজ বাটীতে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার বাড়ীর সন্নিহিত একটী স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ডে নব-নির্ম্মিত তৃণাচ্ছাদিত গৃহে রামকৃষ্ণ গোঁসাইজীকে স্থাপিত করিলেন। এইকার্য্য ১০৫৯ সালের শ্রাবণ মাসে * (১৬৫১ খ্রীঃ

* তখন দেশ মুসলমানগণের অধীন; দিল্লীর সিংহাসনে জাহাঙ্গীর এবং বাঙ্গালার নবাবিপদে সাহা-

জুলাই কি আগষ্ট মাসে) অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ২৬০ বৎসর অতীত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুমান ১৮।১৯ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তৎপর ১২ বৎসর গুরু শান্ত গোঁসাইর শুশ্রূষা করেন, ৩৬ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করেন, এবং অনুমান ৫ বৎসর ফরিদাবাদ, বৌলা ও বাজুগার বনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নির্জ্জনে অবস্থান করেন। কাজেই প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে তিনি বিথঙ্গলের নবনির্ম্মিত আশ্রমে স্থাপিত হন।

এইস্থান হইতে তিনি চতুর্দ্দিশাস্থিত মানবগণকে ভজন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। অসংখ্য লোক আসিয়া তাঁহার শরণাগত হন। এই সময় হইতে তিনি বিস্পষ্ট ভাবে তাঁহার যোগশক্তি দেখাইতে আরম্ভ করেন। তিনি অনেক সময়ে সন্নিহিত নদীতটে যাইয়া সন্ধ্যা কালে ঝম্প দিয়া নদীগর্ভে পতিত হইতেন, নদীর তলদেশে সমস্ত রাত্রি ধ্যানমগ্নাবস্থায় যাপন করিয়া প্রভাতে তীরে উঠিতেন, কখন বা দুই তিন দিন, এমন কি, সপ্তাহকাল নদীগর্ভে যাপন করিয়া আশ্রমে উপনীত হইতেন; ইহা শেষে তাহার নিত্যকর্ম্মের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তিনি নাকি মৃত গো, অশ্ব ও মনুষ্যকে জীবিত হইয়া চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিবার পর তাহারা সেইরূপ করিয়াছিল। আমাকে অনেক ভদ্র সন্তান বলিয়াছেন, রামকৃষ্ণের এইরূপ শক্তি বস্তুতই ছিল। এই প্রবন্ধে সেই সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিবার স্থান নাই।

নিম্নলিখিত গুরুক্রমানুসারে রামকৃষ্ণ গোঁসাইজী রামাইত-সম্প্রদায়েরই গোঁসাই সাব্যস্ত হন; কিন্তু তাঁহার ভজন-প্রণালী ঠিক রামাইতের সদৃশ নহে। তিনি দূর্ব্বাদলশ্যাম জানকীসহায় রঘুনাথ-মূর্ত্তি পূজা করিতেন না, এমন কি, তাঁহার সময়ে আখড়ায় কোন দেবতা স্থাপিত ছিলেন বলিয়াও বুঝা যায় না। তিনি ব্রহ্মবাদী রামাইত ছিলেন। তাঁহার ক্রমিকশিষ্য মহান্ত গোঁসাইগণ এখনও আমাদের ন্যায় "রাম রাম, হরেকৃষ্ণ, হরিবোল," এইরূপ শব্দ উচ্চারণ-সহকারে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন না; তাঁহারা ঐরূপ শব্দের পরিবর্ত্তে "পূর্ণব্রহ্ম" এই শব্দ উচ্চারণ করেন। আমরা "প্রেম সে কহ" ইত্যাদি বলিয়া প্রেমধ্বনি করি, কিন্তু ইঁহাদের প্রেমধ্বনি অন্যরূপ। ইঁহারা "সাধু ব্রহ্মকি বাণী গুরু সত্য" এই বলিয়া প্রেমধ্বনি করেন। ইঁহারা চাউলকে "শীতল," নূতন চাউলকে "নবীন," লবণকে "সরস" বলেন, এবং এই আকারের আরো শব্দ ব্যবহার করেন। রামকৃষ্ণ স্বয়ং বোধ হয় কেবল ব্রহ্ম উপাসনা করিতেন। পরবর্ত্তী গোঁসাইগণ ভজন-প্রণালীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চনা-প্রণালী যোগ করিয়া বিবিধ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। মনে হয়, এইটী রামাইত মত হইতে নির্গত, সগুণ ব্রহ্মবাদে পরিণত,—যোগ-প্রধান ভক্তি-পথে বিস্তৃত, চৈতন্য-মত দ্বারা আবৃত। আবরণ খসাইয়া ফেলিলে ইহাদের পথটী যোগাশ্রিত জ্ঞানমার্গ বলিয়াই বোধ হয়। ইঁহারা গীতা ও ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, নাম-গান, সেবা, মহোৎসব, যথানিয়মে আরতি ভোগ ও উৎসব করেন, মালা, শিখা, তিলক, কৌপীন ও বহির্ব্বাসধারণ, মন্ত্র দানাদি সকলগুলি গৌড়ীয় আচারই অনুসরণ করেন। যদিও "পূর্ণব্রহ্ম" বলেন, এবং "সাধু ব্রহ্মকি বাণী

জাদা সা সুজা সমাসীন। তখন পাশ্চাত্য বিদ্যার কোন আলোক দেশে প্রবেশ করে নাই।

গুরু সত্য" বলিয়া প্রেমধ্বনি করেন। রামকৃষ্ণ গোঁসাই নিজমত প্রচার ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত করিয়া আশ্রমেই (আখড়ায়) শেষ সমাধি-লাভ করেন। সমাধিমন্দিরস্থ তাঁহার আসন আখড়ার প্রধান অর্চ্চনীয় বস্তু।

নিম্নে রামকৃষ্ণের গুরুক্রম-লিখিত হইল। এই গুরুক্রমে রামকৃষ্ণ গোঁসাইজীর পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমিক ২৭ জন গুরুর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকজন ভারত-বিখ্যাত। ঐ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ গোঁসাইর পরবর্ত্তী ৮ জন গোঁসাইর তালিকা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

রামকৃষ্ণ গোঁসাইজীর গুরুক্রম।*

১। শ্রীশ্রীরামানুজজী।
২। শ্রুতিপ্রকাশজী।
৩। শ্রুতিপিয়া-জী।
৪। শ্রুতিবেদ-জী।
৫। সদেলাপ মুনি।
৬। পদ্মলোচন-জী।
৭। পদ্মাচার্য্য।
৮। শুক্রাচার্য্য।
৯। বংশীধরাচার্য্য।
১০। লীলাধরাচার্য্য।
১১। গঙ্গাধর আচার্য্য।
১২। নরোত্তমাচার্য্য।
১৩। সাগরাচার্য্য।
১৪। দ্বারানন্দাচার্য্য।
১৫। দেবানন্দ-জী।
১৬। অচ্যুতানন্দ-জী।
১৭। দড়িয়ানন্দ জী।
১৮। রামানন্দ জী।
১৯। অনন্তানন্দ-জী।
২০। কৃষ্ণদাস পাহাড়ী।
২১। কৃপাজী।
২২। সঙ্গীত-জী।
২৩। তুলসীদাস-জী।
২৪। দেওমুরারী-জী।
২৫। জগন্মোহন গোঁসাই-জী।
(মাছুলীয়ার মহান্ত)
২৬। গোবিন্দ গোঁসাই-জী (ঐ)
২৭। শান্ত গোঁসাই-জী (ঐ)
২৮। রামকৃষ্ণ গোঁসাই-জী।
(বিথঙ্গল আখড়ার প্রথম মহান্ত; ১০৫৯ সনের শ্রাবণে স্থাপিত।)

* গুরুক্রম কেহই দেখাইতে চাহেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত ৺নবীনচন্দ্র চৌধুরীর সহায়তায় আমি এই গুরুক্রমটী পাইয়াছিলাম।

রামকৃষ্ণ গোঁসাইজীর পরবর্ত্তী ৮জন গোঁসাইর মধ্যে কৃপালু গোঁসাই, চৈতন্য গোঁসাই, নরেন্দ্র গোঁসাই ও রামহরি গোঁসাই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কৃপালু গোঁসাই আখড়ার তৃতীয় মহান্ত। ইনি প্রায় রামকৃষ্ণ গোঁসাইর ন্যায় জ্ঞানী ও যোগবল-সম্পন্ন ছিলেন। ইনি ধ্যানস্থ হইয়া অপরোক্ষ বিষয় সমস্তই জানিতে পারেন। তিনি একাকীই বিথঙ্গল, মাছুলীয়া ও ঢাকার মহান্তগিরি করিতেন, এবং প্রবাদ এই, তাঁহার যোগ-প্রভাবে সন্ধ্যাকালে এই তিন আখড়ায় যুগপৎ আরতি-দীপ প্রজ্বলিত হইত। চৈতন্য গোঁসাই চতুর্থ মহান্ত। ইনি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনান্তে আখড়ায় আসিয়া এক "ভাণ্ডারা" করিয়া লক্ষাধিক লোককে ভোজন করাইয়াছিলেন।

নরেন্দ্র গোঁসাই ৬ষ্ঠ মহান্ত। ইনি বৈতরণী নদীর তীরে মঠ, মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠান্তে সেবা-প্রচলনার্থ বিত্তদান [illegible] সেবার জন্য সেইস্থানে একটী ব্রাহ্মণ [illegible] স্থাপন করেন। তিনি শ্রীক্ষেত্র [illegible] "খুনীয়া খাই" স্থানে এক আখড়া [illegible]

স্থাপন করিয়া সেবোপযুক্ত বিত্ত দান করেন; এই বিত্তদ্বারা এখনও পূজা চলিতেছে। কুশল গোঁসাই সপ্তম মহান্ত। ইঁহার সময় রথ প্রস্তুত এবং অন্যান্য উন্নতির কার্য্য হইয়াছিল।

রামহরি গোঁসাই ৮ম মহান্ত। ইনি পণ্ডিত, দাতা, রাজার ন্যায় প্রতাপ-সম্পন্ন, কতক যোগ-সম্পন্ন ছিলেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ইঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ইনি ভাগবতাদি শাস্ত্রে ও কীর্ত্তনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি আখড়ার গৃহ, অট্টালিকা, অঙ্গন ও প্রাচীরাদির পুনঃ সংস্কার করেন। কতক দালান নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুকার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ইনি ৺বৃন্দাবন ধামেও সেবাকুঞ্জের গলিতে আখড়া স্থাপন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইনি শ্রীক্ষেত্র পুরীর আখড়ায় ৬ কুঠরীযুক্ত এক প্রস্তরের দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার সমস্ত কার্য্য লিখিতে গেলে একখানা পুস্তক হইতে পারে। ইনি উদাসীন হইয়াও স্বসমাজের প্রতি বড়ই কৃপান্বিত ছিলেন। তিনি আখড়ায় চতুষ্পাঠী ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় কোন দুষ্টলোক তাঁহাকে বিষপান করাইয়াছিল। কিন্তু উহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই। তিনি বড় "চিন্তাশীল ও ভজনশীল লোক ছিলেন।" ইনি প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে সমাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য রাজচন্দ্র গোঁসাইজী এখন তাঁহার গদিতে উপবিষ্ট।

আখড়ার সেবক-সংগ্রহ।

রামকৃষ্ণ গোঁসাইর প্রভাবে এতদঞ্চলে লোক-সাধারণ মধ্যে বিশ্বাস এই যে, একটী পুত্র আখড়ার শিষ্য করিয়া দিলে বিশেষ পুণ্যকার্য্য হয়।* যাহাদের পুত্র জন্মে না, তাহাদের অনেকে আখড়ায় যাইয়া মানস করে, পুত্র হইলে প্রথমটী রামকৃষ্ণ গোঁসাইর সেবাকার্য্যে বৈষ্ণব করিয়া দিব, এইরূপ মানস করিবার পর অনেকের পুত্র জন্মিয়াছে। মানসকারিগণ কখন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে না। এই প্রণালীতে কায়স্থ, মাহিষ্য, নবশায়ক, এবং পাটুনী, ঝাল, ধীবর, নমঃশূদ্রাদি নানাজাতীয় শিশু আখড়ায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা যত্নে পালিত ও আখড়ার কার্য্যে শিক্ষিত হয়। তাহারা দীক্ষিত হইয়া আখড়ার বৈষ্ণবে পরিণত হন। আবশ্যক মত অধীন আখড়াপুঞ্জ হইতেও বৈষ্ণব পাওয়া যায়। অনেকে অধিক বয়সেও এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব হইয়া আখড়ার সেবায় প্রবেশ করেন। এই সকল বৈষ্ণব মধ্যে কায়স্থ, মাহিষ্য, ও নবশায়ক জাতীয় বৈষ্ণবগণ জলানয়ন ও পাকাদি কার্য্য এবং সেবা নির্ব্বাহের কার্য্যে নিযুক্ত হন; অন্যান্য জাতীয় বৈষ্ণবগণ বাহিরের অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইঁহারা সকলেই দেবসেবা ও অতিথি সেবার কার্য্যে ব্যাপৃত। বর্ষাকালে প্রতিদিন ২০০ হইতে ২০০০ পর্য্যন্ত যাত্রিক-অতিথি উপস্থিত হন। যাত্রিকগণ টাকা ও দ্রব্যসম্ভার প্রণামী দান করেন, তাহা দ্বারাই আখড়ার সেবা নির্ব্বাহ হয়। এইকার্য্যে নিয়ত ১২০ জন বৈষ্ণব নিযুক্ত থাকা নিয়ম—কখন কখন ইহার যৎসামান্য ব্যতিক্রম ঘটে। আখড়ায় স্ত্রী জাতির প্রবেশ নিষেধ; তবে কিছুদূর হইতে যাত্রিক-স্ত্রীগণ আরতি দর্শন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন সর্ব্বজাতীয়

* পূর্ব্বে হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বত্রই সংস্কার ছিল, একটী পুত্র সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণব হইলে ঊর্দ্ধাধঃ শত শত পুরুষের সদ্গতি হয়। (নির্ণয়-সিন্ধু দ্রষ্টব্য)

লোক আখড়ায় প্রসাদ পাইয়া থাকেন। যাত্রিকগণকে সিধাও দেওয়া হয়। যাঁহার ইচ্ছা সরকারে প্রসাদ পাইতে পারেন। ষোলআনা উপকরণ সহ সিধা দেওয়া হয়—বলিবার উপায় নাই, অমুক বস্তু পাই নাই, চাহিয়া আনি। ইহা এক বিরাট কাণ্ড। অতিথি-সেবা এই আখড়ার প্রধান ধর্ম্ম।

মহান্ত নির্ব্বাচন।

আখড়ার বড় বড় কার্য্য মীমাংসা করিবার জন্য একটী স্থায়ী পঞ্চায়ত আছে। বিথঙ্গ-শের ৷৷৶০ হিস্যা ও ।৶০ হিস্যার ভূম্যধিকারী, মাছুলীয়া ও ঢাকা আখড়ার মহান্তদ্বয় এবং আখড়ার পূজারীবর্গ লইয়া এই পঞ্চায়ত গঠিত। মহান্ত সিদ্ধিলাভ করিবার পর ইঁহারা একজন বৈষ্ণবকে বিজ্ঞতা, সাধুতা, চরিত্র ও দক্ষতা অনুসারে মহান্ত নির্ব্বাচন করেন।

অধীন আখড়া সমূহের অন্যান্য মহান্ত মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ঐ সময়ে অনেক বৈষ্ণব মহান্ত ও গৃহস্থ লোক উপস্থিত থাকেন। বর্ত্তমান মহান্তের নির্ব্বাচন কালে হবিগঞ্জের সবডিবিসনাল আফিসার উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। কেবল মহান্ত নিয়োগে নহে, আখড়ার সমস্ত প্রধান প্রধান কাজই ঐ পঞ্চায়তের মীমাংসা অপেক্ষা করে।

আখড়ার সেবাদি নির্ব্বাহক কর্ম্মচারী।

মহান্ত সর্ব্বোপরি কর্ত্তা। প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার শাসন ও দৃষ্টি অপেক্ষা করে। মহান্ত ছাড়া নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিবর্গের নিয়োগ পঞ্চায়ত দ্বারা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে মহান্ত নিয়োগের ন্যায় কোন আড়ম্বর নাই। এই সকল কর্ম্মচারী আখড়ার যোগ্যতম বৈষ্ণব হইতে নিযুক্ত হন। যথাঃ—(১) ভাণ্ডারী, (২) টহলিয়া ও (৩) পানের টহলিয়া। ইঁহাদের অধীনে অন্যান্য বৈষ্ণব এবং বেতন-ভোগী বাহিরের গৃহস্থ কর্ম্মচারী আছেন। (১) ভাণ্ডারী—ইনি ভাণ্ডারের কর্ত্তা। যাত্রিক ও শিষ্যবর্গের প্রদত্ত প্রণামী টাকা ও দ্রব্য সম্ভার ইঁহার জিম্মায়। আখড়ার জিনিস, আস্‌বাব পত্র, টাকা কড়ি ইঁহার হস্তে। যাত্রিকের অভ্যর্থনা, বাসা প্রদান, দৈনন্দিন সেবাদির জন্য হাট-বাজার করান ইঁহার কার্য্য। (২) টহলিয়া।—চাউল, ডাইল, তরকারী, পান, সুঁপারী প্রভৃতি বস্তু-জাত গোছাইয়া রাখা, রক্ষা করা, যাত্রিকদের সিধা বাঁটিয়া দেওয়া, ভোগের স্থান মার্জ্জন করান, ভোগের বাসনাদি পরিষ্কার করান, ইহার কার্য্য। (৩) পানের টহলিয়া।—সমাগত অতিথিগণকে বাসা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া ও পান দেওয়া ইহার কার্য্য। এই তিনের হুকুম অনুসারে অন্যান্য বৈষ্ণব ও কর্ম্মচারী ইঁহাদের সহায়তা করেন। সেবা ও আতিথি-সৎকার জন্য সাধারণতঃ ১২০ জন বৈষ্ণব ও অন্যান্য কর্ম্মচারী থাকেন। মহান্ত ইঁহাদের সকলের কার্য্য দেখেন। জমীদারী বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে মহান্তের অধীন।

আতিথ্য ও ভোগের শৃঙ্খলা।

আখড়া-দর্শনার্থী যাত্রিক মাত্রেই অতিথি বলিয়া গৃহীত হন। অতিথিকে সিধা দেওয়ার নিয়ম। বহুলোকে সিধা গ্রহণ করে না, প্রসাদ পাইয়া থাকেন। সিধা ও জল খাওয়ার দ্রব্যাদি অতিথিগণকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদত্ত হয়।

সিধার আনুষঙ্গিক কোন ক্রটী করা হয় না, খড়িকা ভাবে প্রদত্ত হয়। বা কোঠা অত্যন্ত পরিষ্কৃত রা

দেবতা ও সমাধিমন্দিরে দৈনিক পাঁচ বার ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। (১) প্রাতে আরতির পর বাল্যভোগ। ইহাতে সোপকরণ দধি, চিড়া, খিচুড়ী দেওয়া হয়। (২) মধ্যাহ্নে রাজভোগ। ইহাতে ঘৃত /১০, দুগ্ধ /৫, চিনি /২ সের প্রভৃতি উপকরণযুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগ লাগান হয়। (৩) দিবা একপ্রহর থাকিতে ছেপ্‌রিভোগ। ইহাতে চিড়া, দুগ্ধ, চিনি, ও নারিকেলাদি ফল দেওয়া হয়। (৪) সন্ধ্যার পর আল্‌তিভোগ—ইহাতে মালপুয়া, পুরী ও পায়স প্রদত্ত হয়। (৫) রাত্রি দেড়প্রহরান্তে পুনর্ব্বার রাজভোগ। ইহাতে মধ্যাহ্নের ন্যায় সোপকরণ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হয়। রাত্রির রাজভোগে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হইতে আষাঢ় সংক্রান্তি পর্য্যন্ত; অধিকন্তু প্রত্যহ বার সের দুগ্ধের ক্ষীর, এবং /২॥ সের চিনি, ছানা ও দুগ্ধ অধিক দেওয়া হয়। অতি পরিপাটী ক্রমে পূর্ণমাত্রায়, অতীব মনোযোগ সহকারে, এই সকল ভোগদ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া দোল, রথযাত্রাদি উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ভোগাদি দেওয়া হয় এবং ব্যয়াদি হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় হরিসঙ্কীর্ত্তন ও হরির-লুটের ব্যবস্থা আছে। আখড়ার তহবিলের লুটের পরিমাণ প্রতিদিন /১০ বাতাসা; কিন্তু ভক্তগণ তাহাতে একমণের অধিকও যোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে দিবারাত্র সেবোৎসবে অতিবাহিত হয়।

শিষ্য।

সর্ব্বজাতীয় শিষ্য সংখ্যা লক্ষাধিক। কায়স্থ, মাহিষ্য, নবশায়ক, পাটুনী, ঝাল, মাল, ধীবর, কাপালী, নমঃশূদ্র, ভূমিমালী, তীওর প্রভৃতি বিবিধ জাতিই শিষ্য আছেন। অন্যান্য বৈষ্ণব গুরু এবং শাক্ত গুরুর প্রতি তাঁহাদের শিষ্যদিগের যে-আকার-ভক্তি সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয়, আখড়ার মহান্তের প্রতি আখড়ার শিষ্যগণের ভক্তি তদপেক্ষা অনেক প্রবল, সজীব ও সতেজ। মহান্ত শিষ্যবর্গকে শত শত একত্র শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান করিয়া আনন্দের সহিত মন্ত্রদান করিতেছেন।

উপসংহার।

অপার ঐশ্বর্য্যশালিনী রাণী রাসমণির সেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে রামকৃষ্ণ নামক তাঁহার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পূজারী কালী সাধনা করিয়া পরমহংসত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের পাঠক সেই রামকৃষ্ণকেই চিনেন। কিন্তু বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে একজন মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারীর স্থাপিত আখড়ায় সম্ভবতঃ তদপেক্ষাও অধিকতর যোগশক্তি-সম্পন্ন অপর একজন রামকৃষ্ণ, তাঁহার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যে গোঁসাইত্ব লাভ করিয়া একটা প্রকাণ্ড সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অনেকেই জানেন না। কথা এই, রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব প্রভাবে পরমহংস দেব যতটী বড় বড় নব্যশিক্ষিত লোক পাইয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য কালীন গোঁসাই রামকৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ লোক পাইবার কোন উপায়ই ছিল না। আমরা সময় পাইলে বারান্তরে উভয়ের তুলনা করিয়া দেখাইব।

শ্রীবসন্তকুমার রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

জোয়ার।

অজানা আলয়ে পিক   সচকিয়া চারিদিক,
রহি' রহি' গাহে গান চিত-সম্মোহন;
কোথা ফুটিয়াছে ফুল   তা'রি বাসে বিয়াকুল,
আসিছে বহিয়া স্নিগ্ধ, সুগন্ধি পবন!

স্নান করি' চন্দ্র-করে,   মৃদু সমীরণ ভরে
সুখাবেশে শিহরিছে তরু-পত্র-রাজি;
উছলিছে অশ্রুধার—পারি না রোধিতে আর,
উথলিছে হিয়া মোর প্রেমানন্দে আজি!

এমন সুন্দর নিশা— জ্যোস্না-স্নাত দশ দিশা,
মরি, মরি যেন এক চিত্রিত স্বপন!
যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেঁপে'উঠে থাকি থাকি,
কোন্ অতলের তলে হই নিমগন!
তাপ-দগ্ধ ধরণীরে স্নিগ্ধ করি' মোহ-নীরে,
এল আজি চরাচরে আনন্দ-জোয়ার;
গেল গেল গেল ভাসি' সকল মালিন্য রাশি;
অম্লান লাবণ্যে পূর্ণ নিখিল-সংসার!
শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

দুঃখ ও সুখ।

দুঃখ আনে পরিপূর্ত্তি মুক্তি ও সান্ত্বনা,
সুখ আনে অভাব ও বন্ধন বঞ্চনা;
আহরণ করে দুঃখ শ্রম-পুরস্কার,
ব্যয় করে সুখ শুধু, সে ধন-ভাণ্ডার;
আত্মত্যাগে দুঃখ সদা করিছে সঞ্চয়,
সম্ভোগে—কুপুত্র সুখ, করে সদা ব্যয়।
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সর্ব্বময়।

কত শোভা গীত-গন্ধ হাসি ছন্দ ভরা,
বাহিরে ছিল যে পড়ে' এ বিচিত্র ধরা!
বন্ধ করি হৃদি-দ্বার অতি সঙ্গোপনে,
তাঁরি ধ্যানে মগ্ন সদা ছিনু একমনে।
একদা সহসা বেগে খুলে গেল দ্বার,
অমনি সে গৃহে বিশ্ব পশিল আমার।
কোলাহলে ধ্যান-ভগ্ন হেরি চমকিয়া,
সকলের সনে সে যে গিয়াছে মিশিয়া!
একজনে পেতে গিয়ে লভিনু সকল,
সকলের মাঝে হেরি তাঁরেই কেবল!
শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্রে মহৎ।

ক্ষুদ্র শুক্তি,—তা'র রুদ্ধ বক্ষ অভ্যন্তরে,
ফলে মুক্তা, মহামূল্য ধন;
ক্ষুদ্র নর,—গুপ্ত তা'র হৃদয়-কন্দরে,
জন্মে প্রেম,—অমূল্য রতন।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

'বসন্তে।'

(মিশ্র খাম্বাজ—আড়-কাওয়ালি)
মধু বসন্তে ধরা, সবি যেন মধুভরা,
গগন হাসির ছড়া, দিছে শশী তারকায়!
মুগ্ধ কুঞ্জ তলে, পিক-বঁধূ বহু বলে,
কুসুম হাসিয়ে দোলে, পরশে মলয় বায়!
আজিকে আপন ভুলি, কাননে কাননে অলি,
গুণ্ গুণ্ রব তুলি, ফুলমধু খায়!
জাগিয়ে প্রাণের কথা, ঘুচে যে মরম ব্যথা,
অমিয় পরশে যেন হৃদয় জুড়ায়!
আজি এ মধুর দিনে, মধুময় বৃন্দাবনে,
আনন্দ-হিল্লোলে সবে নাচিয়ে বেড়ায়!
সবাই মধুর তানে, রত হরিগুণ গানে;
ভকতি ভকত প্রাণে উথলিয়ে উঠে তা'য়!
শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

জীবন-প্রহেলিকা।

চির চঞ্চল সময়-সাগর-তীরে—
জীবন-দীপ কেন জ্বলে উঠে?
কেনবা নিবিছে ধীরে?

নৈশ আকাশে পাতিয়ে কাণ,
শুনেছ কি তথা কি মধুর গান,
শুনি চন্দ্র তারা আপন হারা,
শিথিল বিমান শিরে;

বসন্ত আসিলে ধরণী গায়,
কে ছাড়িয়ে দেয় মলয় বায়—
কে কহে কোকিলে, জগত নিখিলে
ঢালিতে মধুর সুরে।

ভুবনে ভুবনে জড় ও চেতনে,
কেন বাঁধাবাঁধি প্রাণ-কম্পনে,
বরষার ধারে কেন মনে পড়ে,
হারায়ে ফেলেছ যা'রে।

শান্ত মধুর শারদ প্রাতে
কৌমুদী বিভবা মাধবী রেতে
অনাদি কালের বিরহ মিলন
কেন পুন আসে

কে তুমি কোথায় কোন্ দূে
রচিলে এ ধরা অভিনব বে

তোমারি করুণা—পবিত্র বরুণা
ঝরিছে শিশির-নীরে।
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

অদৃশ্য-বিদ্যা।

হার মানিয়াছি আমি শুন খেলোয়ার,
তোমার অদৃশ্য-বিদ্যা আশ্চর্য্য অপার!
লোকে ভরা রঙ্গালয় তারি মাঝে থাকি,
সকলেরে দাও তুমি অবিরত ফাঁকি!
হাসাও কাঁদাও যেন বেদে'র বানর;
উল্লাসে উন্মত্ত কর বিপদে ফাঁপর।
কোন দিন বাজীকর না হেরি তোমায়;
কোন অন্তরালে তুমি লুকায়ে কোথায়।
অহর্নিশি খেলা কর অদৃশ্যে থাকিয়া,
ক্লান্ত শ্রান্ত হই মোরা তোমারে খুঁজিয়া।
যবে মোরা কাছে যাই তুমি এস কাছে,
যবে মোরা দূরে যাই, ফির পাছে পাছে!
অন্তরে বাজাও নিত্য মোহন মুরলী;
তবু নাহি পাই খোঁজ, ধন্য চাতুরালী!
শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

নির্ভর।

দিন শেষে ক্লান্ত প্রাণে আনত-শিরে,
হে জননি! দ্বারে তব এসেছি ফিরে।
সারাদিন ঘুরে ঘুরে গিয়েছিনু কত দূরে,
এত টুকু ঠাঁই কোথা পাইনি ও পারে,
দেখে শুনে ফিরিলাম তোমার দ্বারে।

বাহিরে নিভিয়া আসে সাঁঝের আলো,
এখন দুয়ার তব খোলো মা খোলো,
শ্রান্ত দেহে শূন্য হাতে পড়ে আছে দ্বার-পথে
আহত ব্যথিতে ধরে তোলো গো তোলো।
এসেছি হারায়ে সব নিভায়ে আলো।

জানি বিমলিন আমি সবার চেয়ে,
তবু জানি নিবে সব কালিমা ধুয়ে,
জানি আমি বড় হীন এও জানি চিরদিন
যত অপরাধ করি বিপথে যেয়ে,
তোমার ক্ষমা যে বড় (মোর) পাপের চেয়ে
শ্রীচারুহাসিনী দেবী।

জীবনের পথে।

কত বিঘ্ন,কত বাধা, বন্ধুর কঙ্কর গাথা,
সুখ দুঃখ সমাবৃত জীবনের পথে,
এক মহাশক্তি বলে চলিয়াছি সবে মিলে
কার্য্যক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ জগতে।

যেই জন কর্ম্মবীর মুগ্ধ নহে পৃথিবীর,
বাস্তব বিহীন ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রলোভনে,
সতত আকাঙ্ক্ষা যার বিশ্বহিত আত্মোদ্ধার
পরিপূর্ণ অনুরাগ সাধু অনুষ্ঠান ;—

জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম যার জীবনের অলঙ্কার
পরহিতে করে সদা আত্ম-সমর্পণ,
বিজয়ী সে ঐশবলে দাঁড়াইবে কেন্দ্রস্থলে
মৃত্যু পরিহারে তার প্রতিষ্ঠা সুনাম।

যে জন অলীক সুখে ভুলি থাকে আপনাকে,
অন্ধ সুখে আত্মহারা ইন্দ্রিয়-সাধন,
এ জগতের বৃথা তার মানব জীবন সার,
পথের সম্বল শুধু দুঃখের রোদন।
শ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী।

বিরহী

বসন্তের অধিপতি!
ছিলে তুমি কোন্ দেশে?
অভাগা সে মরে ছিল,
নিতান্ত মলিন বেশে।
জগত আঁধার ছিল
সুমেরু মলিন মুখ,
প্রকৃতি বিষাদ ভার
প্রাণে যেন ভরা দুখ।
চাঁদে সে ছিল না হাসি
তারকায় স্বর্ণ-জ্যোতিঃ,
দিগন্তে পশেনি কভু
হাসি তার এক রতি।
কুসুমে ছিল না শোভা
হাস্যময় পবিত্রতা,
মধুপে ছিল না সেই
আকুলতা উন্মত্ততা।
সঙ্গীতে ছিল না সুধা
মলয়ে সে সুশীলতা,

তটিনী সে সুমধুর
গাহেনি কল্লোল গাঁথা।
পাপিয়ার কণ্ঠ স্বরে
ছিল না সে সুধাধার,
সারাটী জগত যেন
শুষ্ক মৃত অন্ধকার।
হৃদয়ে জাগেনি সাধ
মরমে জাগেনি আশা,
জাগেনি এ বিশ্ব-প্রাণে
এক বিন্দু ভালবাসা।
হৃদয় ভাঙ্গিয়ে গেছে
কাঁদিতে মিলেনি স্থান,
যাতনায় বেদনায়
দগ্ধ ছিল সারা প্রাণ।
হৃদয়ে হৃদয় ঢাকি
ঢালিয়াছি অশ্রুধার,
লুকায়ে' মরম জ্বালা
বহিয়াছি অনিবার।
অনন্ত আরাম স্নেহ
রাখিয়াছি প্রাণে ঢেকে,
বেঁচেছিনু শুধু তব
সেই স্নেহ-স্মৃতি মেখে।

শ্রীবিভাবতী সেনগুপ্তা।

ভক্ত-বৎসল।

শৈশবে জননী রূপে এসো দয়াময়,
তিলেক বিচ্ছেদে যাঁর—জীবন সংশয়।
বাল্যেতে আসিও প্রভো হয়ে'মোর খেলা,
তোমাতে মগন হ'য়ে রব' সারা বেলা।
কৈশোরের সখা রূপে এসো প্রাণনাথ,
আনন্দে নাচিব সদা, ধরি তব হাত।
যৌবনে আসিও তুমি হ'য়ে প্রাণপ্রিয়া,
আনন্দে অন্তর মাঝে লইব বরিয়া।
প্রৌঢ়েতে আসিও তুমি হইয়া সন্তান,
বুকেতে চাপিয়া সদা জুড়াইব প্রাণ!
বার্দ্ধক্যে আসিও তুমি শুধু চিন্তা রূপে,
দিবানিশি মগ্ন হ'য়ে র'হিব সে কূপে।
অন্তিমে আসিও তুমি হ'য়ে মোক্ষধাম,
তোমাতে মিশিয়া যাব' লয়ে তব নাম।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

সাথী।

দুঃখ আসে অনিবার্য্য বৈরীর মতন,
কার সাধ্য তাহাদের করে দেবে রোধ?
সুখ বলে মনে হয় তাহারে তখন,
যখন তোমার মুখে শুনি পরবোধ।
অশ্রু যবে দুঃখ রাত্রে বহে ঝরঝর,
সে অশ্রু হাসিয়া উঠে হেরি মুখ খানি,
শিশির মুছিয়া যথা হাসে মৃদুতর,
বিশ্বখানি, হেরি' দূরে স্মিত ঊষারাণী।
সুখ আসে উচ্ছ্বসিত নদীর মতন,
হৃদয়ের দুই কূল প্লাবিয়া হঠাৎ,
তব তরী না ভাসিলে তাহাতে তখন
মনে হয় বিধাতার কি অভিসম্পাত।
সুখ দুঃখ একা কিগো করা যায় ভোগ?
বৃথা তাহা, যদি তুমি নাহি দিলে যোগ!

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

দুঃখ।

(অনুবাদ।)

রে দুখ, রে দুখ, তুই পরাণের এত
পাশে রহেছিস এত, করিতে আকর্ণ
অবিরত মোর শাদা বিলাপ-সঙ্গীত
তোর গীত তরে আছে আর্ত্ত উৎকর্ণ।
সতত কালিমা-মাখা হীনপ্রভ দূরে
ইহার মৃদুল কিন্তু' পষ্ট ধ্বনি উঠে,
যদিও অজানা, লোকে সুখ বলে যারে
গুড়ি মারি কোলে মোর তাহা আসি যোটে,
যখনি আমারে করে কুসুম অর্পণ,
তখনি তাহার সহ করিবারে চায়
বিষাদ-কুহক, দুখ, তোর বিক্ষেপণ
কতই সাহস সহ, মধুর মালায়।
কিন্তু দুখ তোর পথে মোরে চলিবারে
শিখায়ে রেখেছিস্ যে যাইবারে নারি,
নূতন অনেক পথে যাহা চোখে পড়ে,
অভ্যাস এহেন শিক্ষা তোর মোর 'পরি;
অন্ধ রেখেছিল মোরে অভ্যস্ত করিয়ে,
সদা ভারি বোঝাচাপা পিঠের উপরে,
হয়েছে থাকিতে মোরে সদা নত হয়ে।

না সুখ, রাখিতে নারি হাত তোর হাতে,
মৃদু দ্রুত সহকারে নারিবে নাচিতে।
শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

বর্ষ শেষে।

বৎসরের শেষ দিবা হ'ল অবসান;
এই সন্ধ্যা এ মুহূর্ত্ত ফিরিবে না আর—
করেছিল যেই রবি আলোক প্রদান
অস্তমিত এবে—ঘিরে আসিছে আঁধার।
গেল বর্ষ,—করি কা'রে ধরার অধিপ,
ভিখারী সাজায়ে কা'রে গেল সে চলিয়া,
কোন গৃহে নিবাইয়া সুখের প্রদীপ,
কোন গৃহে দিয়ে গেল আনন্দে জ্বালিয়া।
কত সুখ দুঃখ স্মৃতি সনে বিজড়িত
সে গেল চলিয়া—কই না চাহিল ফিরে!
করুণার ভিক্ষা ফুটি' কণ্ঠে সুললিত
বিহগের,—সমীরণে মিশে গেল ধীরে।
যে যায় সে এইরূপে কোথা চলি যায়।
যে থাকে পড়িয়া সেই করে হায় হায়।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রসাদী-ফুল।

(শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশে, সংসর্গে ও ব্যবহার দর্শনে লেখকের মনে যে সকল তত্ত্বের উদয় ও ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, সে সকলের কিয়দংশ অবলম্বন করিয়া "প্রসাদী-ফুল" প্রকাশিত হইল।)

ধর্ম্মজীবনের পঞ্চম স্তর।

উপদেশ প্রসঙ্গে একদিন শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাকে বলিলেন যে,সাধনজীবনের প্রধানতঃ পাঁচটী স্তর, যথা নীতি, ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও লীলা।

নীতি।

কতকগুলি লোক নীতিপালনকেই ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত এই যে, সমাজ-সেবা, লোক-সেবা, সত্যবাক্য বলা, কাহারও অনিষ্ট না করা, সমাজের সুখ সুবিধার জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দেওয়া, জগতের উন্নতির চেষ্টা করা প্রভৃতিই প্রকৃত ধর্ম্ম, ইহার অতিরিক্ত ধর্ম্ম আর কিছু নাই। যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে নীতিবাদী বলা যাইতে পারে। নীতিবাদীগণ, নীতি পালন করিতে পারিলেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকেন, তাঁহাদের হৃদয় এতদতিরিক্ত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষায় লালায়িত হয় না। ইঁহারা প্রথম স্তরের লোক।

ধর্ম্ম।

কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া অনেকের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। একটী পারলৌকিক ভাব দূরশ্রুত বংশীধ্বনির ন্যায় যাঁহাদের মনকে টানিয়া লয় এবং সেই ভাবকে উপেক্ষা করিলে সহজেই যাঁহাদের প্রাণ শান্তিহারা হয়, কোন হারানো প্রিয়তম ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিবার জন্য মানুষ যেমন ছুটোছুটী করে, কি যেন প্রাণের বস্তু হারাইয়াছে, কোথায় গেলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, প্রাণের শান্তিসুখ যেন সেই হারানো বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, এ সংসারে সকল থাকিতেও যেন কিছু নাই, এইরূপ একটা ভাব যাঁহাদের হৃদয়ে রাজত্ব করে, তাঁহারা শুধু নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকেরা ইহকালকে নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী মনে করিয়া পারলৌকিক কল্যাণের জন্য বিবিধ প্রকারের ধর্ম্মকার্য্য অর্থাৎ যাগযজ্ঞ, ব্রত-প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থপর্য্যটন ও বিবিধ উপচারে পূজা এবং বিবিধ প্রকারে উপাসনা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা "ধর্ম্মী" নামে অভিহিত হইতে পারেন।

ব্রহ্মজ্ঞান।

কেবল বাহ্যপূজা ও প্রণালীগত উপাসনা

প্রার্থনায় যাঁহাদের প্রাণ তৃপ্তিলাভ করেনা, ক্ষুদ্র ও খণ্ডবস্তুর আরাধনায় যাঁহারা শান্তি পান না, তাঁহারা এই বিশাল বিশ্ব-সৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তাকে অন্বেষণ করেন, এবং যিনি এই বিশ্বকার্য্যের কারণরূপী অব্যক্ত-ব্রহ্ম, তাঁহারাই উপাসনায় প্রবৃত্ত হন্। এই সৃষ্টিকার্য্যের অন্তরালে যে জ্ঞানবস্তু কারণ-রূপে রহিয়াছেন, উদ্দেশে তাঁহাকেই অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হন্। যে সকল ঋষি এই অব্যক্ত ব্রহ্ম বা কারণ ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার উদ্দেশে পূজা করিয়াছেন। "যো দেবোগ্নৌ যোঽপস্নু যো বিশ্বং ভুবন মাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৌ দেবায় নমোনমঃ॥ অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার নমস্কার। পুনশ্চ।

যতোবা ইমাণি ভূতানি জায়ন্তে, যেন
জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব
তদ্‌ব্রহ্ম।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই সকল ভূত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতিগমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

এই তৃতীয় স্তরটী পরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থা সূচিত করে। সৃষ্টি দর্শনে স্রষ্টা সম্বন্ধে যে অনুভূতি, অথবা শাস্ত্র ও সাধুবাক্য শ্রবণ করিয়া যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, উহা পরোক্ষ জ্ঞান। এই অবস্থার সাধকদিগকে "ব্রাহ্ম" নামে অভিহিত করা যায়।

যোগ।

উপরোক্ত তৃতীয় স্তরেও যাঁহার হৃদয় চরম তৃপ্তিলাভ না করে, কারণ-রূপী অব্যক্ত ব্রহ্মকে স্তব স্তুতি ও আত্মসমর্পণ করিয়াও যাঁহার আত্মা অধিকতর পিপাসায় তাঁহার সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতার জন্য ব্যাকুল হয়, তিনি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক বহির্জগতের অতীত হইয়া অন্তরের অন্তরে "প্রাণস্য প্রাণম্" রূপী জীবন্ত ভগবৎ সত্ত্বা সম্ভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীগুরুদেব একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটীকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যোগযুক্ত সাধকের নিকট ভগবান মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় অনুভূত হন। গর্ভিণী পাঁচজন সঙ্গিনীর সঙ্গে বসিয়া কথা-বার্ত্তা করিতেছেন, এমন সময় গর্ভস্থ শিশু পেটের ভিতর পা ছুড়িয়াছে, পোয়াতি "উ" করিয়া উঠিলেন, কেন না জীবন্ত শিশুর পায়ের লাথি তাঁহাকে লাগিয়াছে, কিন্তু সঙ্গিনীরা কিছুই বুঝিল না। এইরূপ যোগ-যুক্ত সাধকের হৃদয়মধ্যে প্রাণস্য প্রাণম্ রূপী জীবন্ত ব্রহ্ম নড়েন চড়েন, কিন্তু এই নড়াচড়া যে কিরূপ, যিনি তাহা অনুভব করেন নাই, তাঁহাকে বুঝানো অসাধ্য। বাহ্য জগৎ এবং কার্য্য জগৎ হইতে চিত্ত সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়া অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ না করিলে অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা না ঘটিলে, প্রাণস্য প্রাণম্ ব্রহ্মকে কিছুতেই উপলব্ধি করা যায় না। এ বিষয় জ্ঞানিচূড়ামণি ও কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ ভগবান শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার "বিবেক চূড়ামণি" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "সমাধির মধ্য দিয়া ভিন্ন অন্য কোনরূপে চিদ্‌ব্রহ্মের বিকাশের সম্ভাবনা নাই।"

এই অবস্থা সাধনের চতুর্থ অবস্থা, এই অবস্থায় সাধকদিগকে "যোগী" নামে অভি-হিত করা যায়। যোগী দুই প্রকার, জ্ঞান-যোগী ও যুক্ত যোগী, যিনি মাঝে মাঝে প্রাণস্য প্রাণকে অনুভব করেন, তিনি জ্ঞান-যোগী এবং যিনি পূর্ণগর্ভবতীর ন্যায় সর্ব্বদা জীবন্ত ব্রহ্মকে অন্তরে অনুভব করেন, তিনি যুক্তযোগী।

লীলা।

যোগের অবস্থায় যে ব্রহ্মকে সাধক গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় জীবন্ত অনুভব করেন, যোগের গাঢ় অবস্থায় তাঁহাকে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এই আকাঙ্ক্ষা অতীব স্বাভাবিক। গর্ভিণীর মনে সন্তানের মুখ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যেমন স্বাভাবিক, ইহাও তেমনই স্বাভাবিক। দেহধারী জীব আপনার প্রিয়তম বস্তুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা

সম্ভোগ না করিয়া পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁহারই বরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ইচ্ছামাত্র স্বামীকে অন্তরে দেখিতে পাইতেন, কাল্পনিক দর্শন নহে, সত্যসত্যই শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে প্রকাশিত হইতেন*। কিন্তু পতি-প্রাণা প্রিয়তমকে কেবল অন্তরে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, সেই হৃদয়স্থিত মূর্ত্তিকে বাহিরের চর্ম্মচক্ষে দেখিতে তাঁহার লালসা হইল, তখন হৃদয়স্থ মূর্ত্তিকে প্রতিরূপ বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত সেই গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। যোগী যতই প্রাণের প্রাণরূপ পরব্রহ্মকে অন্তরের অন্তরে অনুভব ও সম্ভোগ করেন, ততই তাঁহাকে অধিকতর-রূপে সম্ভোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন, স্বাভাবিক নিয়মে অথবা ভগবৎ কৃপায় গর্ভস্থ সন্তান প্রসূত হইয়া যেমন মাতার নয়ন মনকে পূর্ণ তৃপ্তি দান করে, ভগবানও সেই-রূপ যোগীর হৃদয় হইতে প্রসূত হইয়া সমস্ত বাহ্যজগতে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া সাধককে কৃতার্থ করেন। তখন একদিকে যেমন সমস্ত সৃষ্টি ব্রহ্মসত্তায় পরিপূর্ণ হয়, অন্য দিকে বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তির মধ্য দিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ ভাবের বিকাশ হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মের নাম "ভগবান্", এইখানেই তিনি লীলাময় এবং এই স্থান হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের আরম্ভ। একই সূর্য্যালোক সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর উপর পতিত হইয়া উহা বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত, কতই বর্ণ, কতই বর্ণ, কতই সৌন্দর্য্য, কতই বিভিন্নতা, কতই বিচিত্রতা, একের প্রকাশে বহু, বহুভাবে প্রকাশ পাইতেছে। তখন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর দিয়া ফুটিতেছে। ভগবান্ এখন গোপাল সাজিয়াছেন, কেন সৌভাগ্য-শালী নন্দ-যশোদা হইয়া তাঁহার মুখে ক্ষীর ননী দিতেছেন, কেহ বা সখ্যভাবে রাখাল হইয়াছেন, কেহবা কান্তাভাবে গোপীরূপ ধারণ করিয়াছেন, এখানে আর বৈধ-ভক্তি নাই, ভগবান্ এখানে পুত্ররূপে, সখারূপে, কান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, কেহ পুত্র-রূপে তাঁহাকে স্নেহ ও শাসন করেন, কেহ সখাভাবে আধখানি ফল খাইয়া উচ্ছিষ্ট ফল প্রদান করেন, কেহ বা সেই হৃদয়-রাজের সহিত অভিমান করেন। এই সমস্ত মহোচ্চ ভাবগুলি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আশ্চর্য্য-ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাই লীলার সাধারণ অবস্থা, ইহার উপরে অসাধারণ অবস্থা আছে।

প্রাচীনকালে অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী লীলা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ও এই লীলারই পুনরভিনয় হইয়াছে। তাঁহার অনুগত প্রধান প্রধান ভক্তগণ অধিকাংশই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। বৈষ্ণবগণ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের পরেই লীলার ধর্ম্মের আরম্ভ। কার্য্যতঃ সর্ব্বত্র ইহাই দেখা যাইতেছে, তবে যুক্তিমুখে ইহার প্রমাণ সহজ-সাধ্য নহে। ধর্ম্মরাজ্যের কোন্ তত্ত্বইবা যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয়? অনেকে মনুষ্য-দেহে ভগবানের আবির্ভাব দর্শনের কথা শুনিলে যেমন পরিহাস করেন, সেইরূপ, অনেক বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ ব্যক্তি ভগবানের অস্তিত্ব কি ব্যক্তিত্বের কথা শুনিয়াও পরিহাস করেন। যুক্তিমুখে সকলই অসিদ্ধ।

বিচিত্রতায় বিরোধ নাই।

উপরে যে পাঁচটী ভাবের কথা লিখিত হইল, উহার একটীর সহিত অপরটীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, বিরুদ্ধতা নাই, অপিচ একটী তরুর মূল, কাণ্ড, পুষ্প, পত্র ও ফল যেমন একেরই বিভিন্ন অঙ্গ, উক্ত পঞ্চভাবও একেরই বিভিন্ন অঙ্গ।

মূলকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল, কেহই বিকশিত হইতে পারে না, সেইরূপ, নীতিকে পরিত্যাগ করিয়া কি ধর্ম্ম, কি ব্রহ্মজ্ঞান এবং কি যোগ, কি লীলা, কিছুই বিকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু শুধু মূল লইয়াই যেমন বৃক্ষত্ব নহে,

* যাঁহারা ইউরোপের সাইকিক্যাল-রিসার্চ সোসাইটীর রিপোর্ট পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারেন।

সেইরূপ, শুধু নীতি লইয়াই সাধক জীবন স্বার্থকতা লাভ করে না। নীতি না হইলে ধর্ম্মই হয় না, কিন্তু নীতি হইলেই যে ধর্ম্ম হইল, তাহা নহে। ধর্ম্ম ক্রমবিকাশশীল, সুতরাং কোন অবস্থায়ই কোন স্তরের সহিত তাহার বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তবে যে বিরোধ দেখা যায়, সে কেবল মতের ধর্ম্ম, এবং শেখা ধর্ম্মের কথা লইয়া বিরোধ। যে সাধকের জীবনে ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিবে, তিনি দেখিবেন, সমস্ত ধর্ম্মই, সমস্ত স্তরই একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

চেন্নপট্টন।

জীবমাত্রেই আয়াস লঘু করিতে ব্যস্ত। সুবিধা তাবৎ বিষয়ের নিয়ামক। ধন্য ওয়াট সাহেব। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি অগ্রবর্ত্তী মনিষীগণের চেষ্টাতে, বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইলেন। পঞ্চাধিক ষট্‌দশতি সংবৎসর পরে, তদ্দ্বারা কামগ-যান চালিত হইল। ১৮৫৪ অব্দে, ভারতে ইংরাজ বণিক্ সমিতি দ্বারা, হাওড়া হইতে প্রদ্যুম্ন নগর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চালিত হইয়াছিল। অধুনা লৌহপথ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। নতুবা আমাদের পক্ষে, এতদূর পর্য্যটন অসম্ভব হইত।

দ্রবিড়ে, নব্যমাদ্রাজ নগরের "এগমোর" নামক অন্যতর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে আমি অভিলাষী। তদ্ধেতু, দিগ-দেশগামী শকট-শ্রেণীর সমাশ্রয় সমান্তরাল দীর্ঘ চত্বারিবলী যুক্ত, কেন্দ্র ভবনে উপস্থিত হইলাম না। অস্মদীয় ভ্রমণসন্দর্ভ, দক্ষিণাখণ্ডের পশ্চিম ভাগ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব উপকূলে সন্নিবদ্ধ হইল। এই ধূমযানে সেতুপতি আসিয়াছেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ নানা পরিচ্ছদধারী অভিজাতবর্গ উপস্থিত। যথা, রামনাদের রাজকর্ম্মচারী বেঙ্কট স্বামী নায়ডু, রাজা সর রাম স্বামী মুদেলি, দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও, জে, এডাম, বিজয় রঙ্গ মুদেলি, ইথেরা জুলু চেট্টি, বরট্টওর, বলবন্ত সহস্র বুধে, শিবগঙ্গা মুদেলি, আইয়া স্বামী মুদেলি, রায় বাহাদুর পঃ রঙ্গনাথং মুদেলি, আপ্পাস্বামী চেট্টি, রামস্বামী নায়ডু, পঃ রঙ্গীয়া নায়ডু, মঃ বীর রাঘব চেরিয়ার (আচার্য্য), সুব্রহ্মণ্য আইয়া, রামকৃষ্ণ আইয়া, কল্যাণ সুন্দরং চেট্টি, দামোদরং পিল্লৈ, শিবশঙ্করং পণ্ডিয়াজি, সুব্রহ্মণ্য চেট্টি, গোপীনাথ টাকার, আইয়া স্বামী পিল্লে প্রভৃতি। ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়া, লোকালয়ে যাইবার উদ্দেশ্য এখানেই কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইল।

নগরে পদার্পণ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে খ্রীষ্টীয়-ভজনালয় আমার নয়ন-পথে নিপতিত হইল। বাঙ্গালার সাত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রদেশ ইংরাজাধিকৃত হইয়াছিল। ভারতে প্রথমতঃ এখানে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্ববারে, যৎকালে রঙ্গনাথ ঠাকুরের সাউকার-পেটস্থিত গৃহে উপস্থিত হই, তখন কাঠিয়াওয়াড়-নিবাসী লাড শ্রেণীর গুর্জ্জর-বণিকগণের দীপান্বিতা উৎসব পরিসমাপ্ত হয় নাই। অধুনা, বড় দিনের সময় বলিয়া বাটীর [illegible] হইবে।

ব্রাহ্মীবর্ণ-মালার প্রত্যেক বর্ণের [illegible] চারি অক্ষর, দ্রাবিড় উচ্চারণে, কেবল [illegible] দ্বারা কার্য্য হইতে পারে। [illegible] রঙ্গনাথ গুজরাতি হইলেও তাঁহার ঠাকুর [illegible] টাকর হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের [illegible] এক্ষণে তামিল। গোপীনাথের সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী, কঞ্চুকও এতদ্দেশীয় মহিলার মত অষ্টাদশ হস্ত পরিমিত কৃষ্ণকার্পাস ও পীত-কৌষেয় সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্রে ব্রাহ্মণ পরিচায়ক, ত্রিকচ্ছ-সজ্জায় পরিহিত। বিজয়[illegible]-রাজের বাঙ্গালী সাহচর্য্য-হেতুক, অথবা ইংরাজী প্রথার প্রভাবে অমাত্য গোপী[illegible] বপন-কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ। তথা [illegible] বিদ্যমান্। প্রভাতে,—অনেকে [illegible]

সেই উষ্ণ চা তাঁহার অনুরোধে আমাকে পান করিতে হইল। এই পল্লীর মহাজনগণের উষ্ণীষে, চেন্নপট্টন একটী বিশেষত্ব দিয়াছেন। তাহা, গুজরাতি ও দ্রবিড় হইতে ভিন্ন।

সমস্ত প্রধান জনপদে, ইউরোপীয় পল্লী স্বাস্থ্যকর ও শোভান্বিত, নগরোপকণ্ঠে, পৃথক ভাবে স্থাপিত। স্থান-পরিচায়ক কোন বিশেষ অভিধান, প্রভেদ সূচনা করে। এখানে সেটী একবারে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। দণ্ড-বিধিতে আছে, অন্ধকে উক্ত অপ্রীতিকর নামে আহ্বান করা নিষিদ্ধ। যেভাগে দেশীয়গণের বসতি, উহা "ব্ল্যাক টাউন।" ইহাতে গ্যাসের আলোকাভাব। ড্রেনেজ হয় নাই, কিন্তু মুম্বই অপেক্ষা ইষ্টকালয়-সম্বন্ধে সমৃদ্ধ। নায়ক-প্রধান চেন্নপট্টন আপ্পার নামানুসারে মাদ্রাসকে প্রাচীনেরা চেন্নপট্টন কহেন। চেন্ন মহাশয়ের যত্নে, তদীয় প্রভু তদানীন্তন ভূস্বামী চন্দ্রগিরি-রাজের নিকট হইতে, ইংলণ্ডীয়-বণিক-সমিতি বন্দর নির্ম্মাণার্থ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়-সেনানী কর্ত্তৃক আক্রমণ-শঙ্কায়, ব্ল্যাক-টাউনের বহির্ভাগ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে হয়। অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলে, ৪ লক্ষ মানব-অধিষ্ঠিত, ১৩ বর্গ ক্রোশ ব্যাপিয়া এই নগর অবস্থিত। চত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে, আকাশবৃত্তি অবলম্বন করতঃ, বঙ্গদেশ হইতে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্ববৃত্তে লিখিয়াছেন, "সাউকার পেট প্রভৃতি যেস্থানে অবস্থিত, উহাই চীনা পাটন। সেণ্টজর্জ্জ দুর্গসন্নিহিত ভূভাগ, মন্দ্রাস। এখানে ৮।১০টী ছত্র আছে। চাউল ও আটা দেয়। কূপের জল, খারা এবং মিষ্ট। খাপরেল ও পাকাবাটী।"

কলিকাতার দুর্গ সন্নিহিত, সুন্দর তৃণক্ষেত্রের মত বৃহৎ প্রান্তর, প্রয়াগ বা অন্যত্র না থাকিলেও, অত্রত্য দুর্গের আবেষ্টক দূর্ব্বাদলশ্যাম প্রান্তরগুলির মধ্য দিয়া, রত্নাকরতীরে প্রশস্ত পথে ভ্রমণ করিয়া, অধিকতর রমণীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করিতে লাগিলাম। সৈনিক-সম্প্রদায়ের যান্ত্রিক বাদ্যনিঃস্বন, কর্ণপটহে অধিক আঘাত করিতেছে না। দূরশ্রুত সঙ্গীতের মাধুর্য্য কি সুন্দর! এপথে, উল্লাসিত পৌরগণ, এমন কি, শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে আসেন। শরীর ও মনের স্বাস্থ্যপ্রদ সামুদ্রিক সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিবার কালে ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। এখানে জনতার অভাব।

প্রাতেঃ তোয়নিধির ক্রোড়ে মৎস্যজীবীগণের জল-ক্রীড়া, অতি বিচিত্র। নৌকা তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে; কর্ণ ও ক্ষেপণীসঞ্চালনে তাল মনে দৃষ্ট হয়। মোহময়ী পুত্তাশ্রয়ের নাবিকবৎ, বিপরীত বলের সাহায্যে পাইল উড়াইয়া মধ্যবর্ত্তী ভাবে, বায়ুর প্রতিকূলে "লুন্নু" কাষ্ঠ তরণী যাইতে সমর্থ নহে। পুরীতে যেরূপ দেখিয়াছি— তরণী তিনখানি নিরেট কাষ্ঠ সংযোগে প্রস্তুত, রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ_ [illegible] নাই। প্রয়োজন না থাকিলে, উহা বেলাভূমির উপর ন্যস্ত থাকে। যৎকালে স্রোত তটের দিকে আসিতেছে, ধীবর জালখানি প্রস্থভাবে তৎসংলগ্ন দণ্ডদ্বারা, সিকতায় যেন আবদ্ধ করিয়া দিতেছে। স্রোতের আবর্ত্ত নিম্নগামী হইলেও, পূর্ব্বাগত মীনরাশি জালে আবদ্ধ হইয়া গেল। কৈবর্ত্ত-জননী, সহকারী বালকের জন্য চুবড়ি, আলুসিদ্ধ ও আক্কে পিষ্টক দিয়া গেল।

বালুকারাশির উপর আরণ্য স্থল পত্রক পুষ্প সজ্জানিভ আসন দর্শনান্তে, ঝাবুক বৃক্ষের বেষ্টন অতিক্রমণ করিয়া, তট সমীপবর্ত্তী উদ্যানমার্গে বিহার করিতে লাগিলাম। গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদের অনতিদূরে, "চিপক" বৃক্ষ-বাটিকা। কর্ণাটের নবাব ইহাতে বাস করিতেন। সারাসেনিক প্রণালীতে রচিত হর্ম্ম্য। দেবমূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। মহম্মদীয় শাস্ত্রে, জীবন্ত প্রাণীর অবয়ব শিল্পে অঙ্কন নিষিদ্ধ; উদ্ভিদের চিত্র, কর্ত্তব্য। যাঁহার আজ্ঞায় এই পূর্ত্ত বিনির্ম্মিত, তিনি উক্ত "সরা" জ্ঞাত ছিলেন না। শিখর দেশের স্বর্ণ-কলশোপরি বিরাজিত সেই চন্দ্র, আর সূর্য্যতেজে উদ্ভাষিত নহে। এখানে বৃটিশ রাজস্ব-কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রাজপুরুষের অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ হইয়া এবং ইংরাজ-বৈরী সহ মৈত্রী করিয়া কর্ণাট-পতির নবাবী গিয়াছে। সেই বংশ এক্ষণে টিপলীকন

পল্লিতে, অবদান বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিত।

বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট, ব্যবহার বিদ্যা পাঠাগারের দ্বারদেশে, দশাবতারের মূর্ত্তি ভূষিত। বিজিগাপট্টন-রাজপ্রদত্ত, ভারত-সংম্রাজ্ঞীর ধাতব-প্রতিমা দর্শন করিবার যোগ্য। এক মালাকর মহারাণীকে পুষ্প মালা দ্বারা, অন্য এক ব্যক্তি তাঁহাকে চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া অর্চ্চনা করে। মদুরাস্থ পুদ-মণ্ডপেও ভারতেশ্বরীর ঐ প্রকারে সেবা হইয়া থাকে।

নবনির্ম্মিত প্রধান বিচারালয়, এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। তাহার শিখর ও সোপানাধার এখনও আমার মনে জাগ্রত হইতেছে। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, এক কক্ষে উপনীত হইলাম। আপাদ-লম্বিত কঞ্চুক, রজত দণ্ডধৃত প্রতিহারী, প্রবীণ বিচারককে সমাসীন করিয়া গেল। সরমথু স্বামী আইয়া, স্বাধীনচেতা, বিদ্বান্ ও সর্ব্বপ্রকারে ভদ্র-পদবাচ্য। পুনর্ব্বিচারে তাঁহার নিষ্পত্তি অকাট্য। ধূতির উপর কৃষ্ণবর্ণের গাউন পরিয়া উপবিষ্ট। পাদুকা গ্রহণ করেন নাই। শ্বেত উষ্ণীষের স্বর্ণফুল, উভয় দিক দিয়া বক্রভাবে আসিয়া সম্মুখে মিলিয়াছে। তদীয় ললাটে শ্বেত বৃত্তার্দ্ধের মধ্যে কৃষ্ণ বিন্দুবৎ তিলক। এতদ্দেশের ব্রাহ্মণ শূদ্র, তিনবার ভাত খাইয়া থাকেন। প্রথমবারে পর্য্যুষিত অন্ন, ঘোল বা চাটনি সহ আহার করিতে হয়। তদনন্তর, একচমস কাফি সেব্য। প্রাতে বিভূতি ধারণ করিয়া আহারান্তে টীপ পরিতে হয়। সায়ংকালে, ইহা প্রক্ষালন করিয়া পুনরপি ত্রিপুণ্ড্র করা বিধেয়। কৃষ্ণ তিলক দৃষ্টে, স্মার্ত্তদিগের মধ্যাহ্ন ভোজন হইয়াছে কি না, বুঝা যায়। প্রাড়বিবেক স্মার্ত্ত, ওয়ারমা ব্রাহ্মণ। তাঁহার গুম্ফহীন শ্যাম মুখ-চ্ছবি, দ্রাবিড়কে উজ্জ্বল করিয়াছে। বিচার আরম্ভ হইল। ব্যবহারাজীব মুদ্রিত আবেদন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থী, অলিখিত লেখ্যপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া আপত্তি উপস্থাপিত করেন। ধর্ম্মাধিকরণ হাস্যে পুলকিত হইয়া উঠিল। অভিযোগ প্রত্যাখ্যাত হইল। উকীলেরা উঠিলেন। তাহার মধ্যে যিনি পেণ্টলুন পরিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইংরাজী উপানৎ ব্যবহারে আপত্তি নাই।

ওয়েনলক মহোদয়ের রাজকীয় উদ্যান, অবারিত-দ্বার নহে। এ দেশের উদ্ভিদ-জগতে প্রবেশ করিবার জন্য, সিংহ শার্দ্দূল-অধিষ্ঠিত পশুপালিকা সংযুক্ত, "পিযুপিলস পার্ক" উন্মুক্ত। তথায় কি দেখিয়াছি, আমার স্মারক লিপিতে তাহার কোন চিহ্ন নাই।

কোয়েম নদীর পূর্ব্বভাগে, দেশী অংশে সমুদ্র ঘেরিয়া পোতাশ্রয়। বৃহৎ কৃত্রিম প্রস্তর খণ্ড দ্বারা প্রাচীর নির্ম্মিত। তন্মধ্যে জলরাশি হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিক অর্ণবপোত চত্বরোপরি দ্রব্য সম্ভার অবতারিত করিতেছে। ইউরোপীয় পোত, বণিক্‌গণের বিপুল ভাণ্ডার, ন্যাস গৃহ ও স্থাপ্য ধনাগার ইহার সন্নিপস্থ। ডিগবি সাহেব এখান হইতে তাড়িত বলচালিত রথ লইয়া যাইবার জন্য, সত্বর সমুত্থান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কলিকাতা ও মুম্বই অপেক্ষা, মদ্রাসে পৌরগণের বর্ণমালিন্য অধিক। অন্ধ্র, দ্রবিড় ও কর্ণাটী পুরুষের বেশ দৃষ্টে, কে কোন দেশের অধিবাসী নির্ণয় করা দুরূহ। পরন্তু নারী জাতির বস্ত্র পরিধান প্রণালীতে সে পরিচয় মিলে। তাঁহারা অনবগুণ্ঠিতা, সুতরাং কটাক্ষের চাঞ্চল্য, আর হৃদয়ের চপলতা এখানে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবেন না। ইহাতে সংসারের কোমলতা বৃদ্ধি করিতেছে। অপরিচিত [illegible] সহিত আলাপ অবৈধ। কেরলের ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের ব্রহ্মচারীবৎ পরিধান দেখিলেই, আশ্রম স্থানের জ্ঞান জন্মে। উঁহারা পুরুষ [illegible]। আমাদের মত কর্ত্তিত-কেশ, শিখাহীন।

শ্রীরামপুরে নির্ম্মিত, কোয়েম্ব বস্ত্র-বিক্রেতা বা মৃদঙ্গার ব্যবসায়ী রামচন্দ্র বাবুর ভ্রাতকে, স্মরণ নাই, তিনি কহিয়াছিলেন, দেখ, এখানে স্ত্রীলোকের মস্তক উন্মুক্ত, কিন্তু পুরুষের আচ্ছাদিত। অনেক সময়, তাঁহাদিগকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত বস্ত্র শিরে ধারণ করিতে হয়। বিধবায় মস্তক আবৃত করে। যখন এই দশা উপস্থিত হয়, পদ যুগলের

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১০৮। ধ্রুব। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ।০।

"প্রসিদ্ধ" শব্দটী এই স্থলে ব্যবহৃত না হইলেই সুখী হইতাম। বিলাতী কাগজে বিলাতী কালীতে ছাপা। স্বদেশভক্ত গ্রন্থকারের এ ব্যবহার অমার্জ্জনীয়। পুস্তকখানি বিভিন্ন কালীতে সুন্দর করিয়া ছাপান হইয়াছে। শিশুপাঠ্য-তালিকায় এ পুস্তক স্থান পাইবে, আশা করি। ভাষা মার্জ্জিত।

১০৯। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব। শ্রীবিনোদবিহারী রায় প্রণীত, মূল্য ॥০। অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য গভীর তত্ত্ব সুন্দর ভাষায় এই পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের অসাধারণ গবেষণার পরিচয়ে মুগ্ধ হইলাম। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এ পুস্তক স্থান পাইবার যোগ্য।

১১০। ফোয়ারা। বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসর শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, প্রণীত। মূল্য ৸০। ১৬ টী বিষয় সুললিত সরস ভাষায় লিখিত। প্রতি প্রবন্ধে কৃতিত্বের পরিচয়। যিনি পড়িবেন, তিনিই মোহিত হইবেন।

১১১। হিন্দু জাতিভেদ ও বারুইজাতির ইতিহাস। মূল্য ।৵০ আনা। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ভাওয়াল, বি-এ, প্রণীত। শাস্ত্রীয় প্রমাণ ...রুই জাতির বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব-সম্বলিত ...াস লিখিত হইয়াছে। সুন্দর ভাষা ...মনোজ্ঞ কাহিনী। বিধাতা বারুইজাতির ...বৃদ্ধি করুন।

১১২। বাঙ্গালা রচনা-পদ্ধতি। শ্রীশশধর বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, মূল্য ৸০ আনা। বহুদর্শী লোকের লেখা—পাঠে ছাত্র...ন্দের বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। ...নেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

...ন্ম রাজ্যের দণ্ডবিধি। সচিত্র ...মূল্য ।৵০। ভূমিকা গভীর ...কালের দণ্ডবিধি পাঠে

১১৪। গিরিশ-গৌরব। শোকোচ্ছ্বাস-গীতি। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত প্রণীত। সুন্দর ভাষায় লিখিত। পড়িলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না।

১১৫। The fourth Annual Report of the Debalaya. ধীরে ধীরে দেবালয় উন্নতির পথে চলিয়াছে। স্থায়ী হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। সুলিখিত কার্য্যবিবরণ।

১১৬। নবভাব ও দেবালয়। শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক। সুলেখকের মন্তব্য সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ।

১১৭। সাহিত্য-কোরক। প্রথমভাগ। শ্রীগোপালগোবিন্দ দাসগুপ্ত-প্রণীত, মূল্য ৵০। সচিত্র স্কুলপাঠ্য পুস্তক। ভাষা প্রাঞ্জল এবং মার্জ্জিত। গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতীত্বের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

১১৮। The Seventeenth Annual Report of the Rajkumari-leper-asylum at Baidanath Deoghur for the year 1911. এই আশ্রম বাঙ্গালীর গৌরব। বর্ত্তমান সম্পাদকের কৃতীত্বে বিশেষ উন্নতি হইতেছে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। বিধাতা এবং সজ্জনবর্গের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

১১৯। সন্তান-পালন। শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য ।৹। সন্তান পালন সম্বন্ধীয় ইহা অতি সুন্দর পুস্তক। ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত হউক। লেখিকার প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয়ে মুগ্ধ হইলাম।

১২০। রাজপূজা। [illegible] প্রণীত। সুন্দর ক...তার উচ্ছ্বাস।

১২১। The Emperor & the Empress. ছবিখানি অতি সুন্দর চিত্র-সম্বলিত। রাজারাণীর এরূপ সুন্দর ছবি আর দেখি নাই। রাজভক্তিপূর্ণ ... কিন্তু তাহা কেবল এ গ্রন্থে ...

অঙ্গুলিত্র কাটিয়া ও গলদেশস্থ "তালি" সূত্র উন্মোচন করতঃ, দুগ্ধ বা জলে নিক্ষেপ করিবার কালে, শূদ্রা না হইলে মস্তক মুণ্ডন করিতে অবশিষ্ট রহেনা। কুঙ্কুমের পরিবর্ত্তে বিভূতি, চিতা-ভস্ম বলিলেও হয়, তখন গ্রহণ কর্ত্তব্য। প্রতি বৃহস্পতি বারে, তৈল হরিদ্রা আর ব্যবহার্য্য নহে। কি নিষ্ঠা! আমরা তাঁহাদের নিকট সংযম্ শিক্ষা করিব। ত্যাগে বাসনার তৃপ্তি হয়। ভোগে নহে।

কোতওয়াল চেড়ী হট্টে প্রবেশ করিয়া দেবালয় দৃষ্ট হইল। বিল্বপত্র, চন্দ্রমল্লিকা, করবীর শ্বেত ও পীত, পাটলাদি সুগন্ধি পুষ্প ও তুলসীদল বিক্রয় হইতেছে। বিবিধ প্রকারের কমলা জাতীয় জম্বির, দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, হরিত, লোহিত পক্ক কদলী, অঞ্জির, আম্র, পনস, কপিত্থ, কদলীপত্র, বার্ত্তাকু, চিচিণ্ডা, ঝিঙ্গা, বিবিধ শাক, আলু, ওল, কচু, অলাবু, কুষ্মাণ্ড, পলাণ্ডু ও করবেল্ল উপস্থিত। এদেশে যাহা জন্মে, তাহা বারমাস পাইতে পারা যায়, ঋতুভেদ নাই। একস্থানে, কৃষ্ণজিরা ও জম্বির খণ্ড নিহিত তক্র রহিয়াছে। শ্রান্তবিক্রয়ী, এক চিমুক পান করিয়া যাইতেছে। অপূপ ও তৎকঠিনীকৃত মৎস্য, স্থূল সরুচাকুলী (যাহা কটু অম্ল লেহদ্বারা ভক্ষণীয়) আরও কত কি, যাহা কেমন করিয়া উদরস্থ করিতে হইবে, কিম্বা কি প্রকারে প্রস্তুত, জ্ঞাত নহি. বিক্রয়ার্থ সজ্জিত আছে। লঘুপাক পাঁপর প্রভৃতি খাদ্যের নিকটে দক্ষিণাবর্ত্তের প্রাণদায়িকা, যাবৎ ব্যঞ্জনে ব্যবহৃতা, যমদূতিকা তিন্তিড়ী ফলের [illegible] তৎসংযোগে প্রস্তুত লঙ্কার লড্ডুক ক্রেতার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। পলাশ-পত্রের ঠোঙ্গা ও সীবন দ্বারা বর্দ্ধিত, ভোজনপত্রের বৃহৎবিপণি দর্শন করতঃ অঙ্গনে অবতরণ করিলাম। তথায় নানা বর্ণের চূর্ণক, হরিদ্রা, ধূপ, তিলক মৃত্তিকা প্রভৃতির [illegible]স্থি। বহির্ভাগে গুড়, তেঁতুল, চিকী[illegible] ম, খর্জুর ইত্যাদি গৃহস্থের [illegible]। তাম্বুল

জন্য উৎসব উপলক্ষে, শর্করা-নির্ম্মিত গণপতি, নটরাজ প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। হিন্দুর জন্য হইলে, দেবমূর্ত্তি ভক্ষণার্থ গঠিত হইত না। কপিশাক ক্রয়ের জন্য, আমাকে আমিষ হট্টে যাইতে হইয়াছিল। কোতোয়াল চেড়ীতে তাহা মিলে না। ইহা অপেক্ষাকৃত শীতল, বঙ্গলুর হইতে আনীত হইয়া থাকিবে। সনাতন মতাবলম্বীগণের ইহা অগ্রাহ্য। দ্বিজাঙ্গনা, গোলআলু বর্জ্জন করেন। এখানকার অধিকাংশ ফল ফুল ও তরকারী যে বিদেশীয়, তাঁহারা ইহা জ্ঞাত নহেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টানের দ্বারা যেমন নবভাব আসিয়াছে, তেমনই অন্নত্রের সুখাদ্য আনীত হওয়া সঙ্গত।

একদিন কোন সুহৃদ্ আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তদীয় পিতা ভীমশঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত আমার কলিকাতায় পরিচয় ছিল। বাঙ্গালী প্রণালীতে রাত্রের ভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছে, তৈলঙ্গী প্রথা অনুযায়ী নহে, অতএব বক্তব্য কিছুই নাই। অন্নাজী, প্রসঙ্গ ক্রমে কহিলেন, বহুকাল যাবৎ বঙ্গে বাস করিয়াছি, এখনও সংবাদ লয়, এমন ঘনিষ্ঠতা কাহারও সহিত দেখিনা। মন্দ্রাসিগণের জীবন, প্রফুল্ল, কর্ম্মঠ, সরল ও বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট। সেই জন্য আমাদের চক্ষে সুদরিদ্র।

কফি ও শ্বেত এলা এখান হইতে প্রেরিত, তণ্ডুল, মৃগনাভী, চামর ও থলে আনয়নের বস্তু। শাস্ত্রীজী মসলীপট্টম হইতে বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় ঘৃত লইয়া যাইতেন। নগরের মুসলমান ব্যবসায়ীগণ, ঘৃতের বসা মিশ্রিত করিবার প্রথা আবিষ্কৃত ক[illegible] য়াছেন। এখানকার গণ্ডূরে নারিকেল [illegible] চিনের বাদামের তৈল মিশ্রিত ঘৃত প্রচুর পরিমাণে, বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মিলে। ইহাতে ক্রেতৃগণ দেশকাল ভেদে যে দ্রব্যের তারতম্য ঘটে, তাহা বিবেচনা করিবার অবসর পান না। সকলই কৃত্রিম [illegible] নেলুকুপ্পম নামক স্থানে [illegible] "পামাররা" রসজাত যে [illegible] [illegible] কলিকাতায় তা[illegible]